CU6-M04259-9-P03023

বঙ্গশ্রী

সচিত্র বাঙ্গালা মাসিক

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

চতুর্দ্দশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড
[পৌষ ১৩৫৩—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

ষাণ্মাসিক সূচী

সম্পাদক
শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

…পলিটান প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস্ লিমিটেড্
৯০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

P 30231

বিষয় ও লেখক সূচী

প্রবন্ধ

বদে ব্রজলীলা — শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী — ১,৮৯,১৮৫,

াস্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বৈঠকে
ারতের অবধারিত নীতি — শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় — ১১

াইচ্, জি, ওয়েল্‌স্ (সচিত্র) — শ্রীমতিলাল দাশ — ৩২

াশ্মীর (সচিত্র) — শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ — ৩৮

রৎচন্দ্রের দত্তা — শ্রীকালিদাস রায় — ৫২

শবন্ধু-সুভাষ (সচিত্র) — শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত — ৫৮,১৫৩,২৪১,৩২১

ংগ্রেস রাষ্ট্রপতি আচার্য্য জে, বি, কৃপালনী (সচিত্র জীবনী) — ৬৩

ারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ — শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার — ৬৯

ধাকরে সেকালের সংবাদ — শ্রীসুধীরকুমার মিত্র — ৭৫

ীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে — শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী — ৯৭

ক্ষেত্রের ইতিবৃত্ত (সচিত্র) — শ্রীবিষ্ণুপদ কর — ১২৫

যুগের অবতরণ — শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী — ১৩৫

রশিল্পে বিজ্ঞান (সচিত্র) — শ্রীনিশানাথ মজুমদার — ১৩৯

দ্ধোত্তর ইউরোপের
ছেলে মেয়ে — শ্রীরঞ্জিত সিংহ — ১৪৯

দী কথাশিল্পী আচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সচিত্র) — ১৫১

াঙ্গলার নারী — শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার — ১৬৮

ারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা — সচ্চিদানন্দ — ১৭২

েঘনাদবধে ট্রাজিক পরিকল্পনা — শ্রীসুনীলঘোষ — ১৯৪

াপাদের দেশ (সচিত্র) — শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ — ২১১

াবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের
অন্ত্যলীলাপীঠ কাশীপুরের
উদ্যানবাড়ী — শ্রীদিলীপকুমার রায় — ২৩০

ারতের জাতীয় শিল্প-
বাণিজ্য-নীতি — শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৫৬

ধামাধবের কাব্যগ্রন্থমালা
(সচিত্র) — শ্রীসুধীরকুমার মিত্র — ২২৫,৩০৫

অমিতাভ — শ্রীফণীন্দ্রনাথ

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পূর্ণচন্দ্র
মুখোপাধ্যায় (সচিত্র) — শ্রীহেমন্তকুমার ব

লোকোত্তর পুরুষ সচ্চিদানন্দের
কর্ম্মবহুল জীবনের প্রতিভা-
দীপ্ত ঘটনাপঞ্জী (সচিত্র)

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ — শ্রীপুলিনবিহারী সর

ভারতের ষ্টার্লিং সংস্থিতি — শ্রীযতীন্দ্রমোহন ব

পুরাণো কথা — শ্রীসুবোধ রায়

আনন্দমঠের বাস্তব রূপ — শ্রীনমিতা ঘোষ

বাঙ্গলার নারী — শ্রীবিজয়রত্ন মজুম

দেশীয় রাজ্য বনাম গণ-পরিষদ — শ্রীঅমূল্য ভূষণ সে

ঐতিহাসিকও সামাজিক
উপন্যাসের উদ্ভব — ডক্টর শ্রীকুমার বন্দে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিম

নাট্যকার গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি (সচিত্র) — শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রব

ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের
হিন্দুসভ্যতা (সচিত্র) — শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্য-বিশ্লেষ — শ্রীরণজিৎ কুমার সে

একদিক — শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস — শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশ

ঝাঁসীর রাণী — শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত — ১০৫, ২০

বেগার মাই লেবার — শ্রীঅলকা মুখোপাধ — ২২, ১২৮, ২১

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা — শ্রীকুমুদনাথ দাস — ৭১, ১১৪, ২৬৬, ২১

কবি য়েট্‌স — শ্রীমতিলাল দাশ

পারস্যের শিল্প ও সংস্কৃতি — শ্রীগুরুদাস সরকার

ঝাঁসীর রাণী — শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

া পরিকল্পনার একদিক	শ্রীঅধীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	৫০৪
-কবি গোবিন্দ দাস	শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস	৫০৭
চলা	শ্রীসুধীরকুমার মিত্র	৫২৭
ন বাংলা সাহিত্যে		
শিল্প ও বাণিজ্য	অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী	৫৩৪
	নগেন দত্ত	৫৪৪

উপন্যাস

চেয়ে বড় Hall caine : অনুবাদ)	শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী	৪২২, ৪৯৬
—নীব ঘাট	শ্রীনীহাররঞ্জন দাশগুপ্ত	৬৪, ১০০, ২৬১, ৩৪৩, ৪৫১, ৫৪৬

গল্প

—দ	শ্রীশৈলবিহারী ঘোষ	৮
বক্ত	শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	১৫
	শ্রীরবিদাস সাহা রায়	১৭
	শ্রীগোপাল বটব্যাল	২৬
অনুবাদ)	শ্রীঅশোককুমার ঘোষ	৩৫
)	শ্রীকল্যাণকুমার চক্রবর্তী	৪৮
	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ	৯৩
র বৈঠক	শ্রীগোপালদাস চৌধুরী	১০৮
	শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭
	শ্রীজনরঞ্জন রায়	১৩২
আগে ও পরে	শ্রীহরিপদ ভারতী	১৪১
	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	১৬১
	শ্রীবিজয়কুমার বসু	১৮৯
	শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়	২০১
তিন আনা	শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়	২০৮
ও-কূল		
	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার ঘোষ	২১৫
দ)	শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়	২২১
	শ্রীভবেশ দত্ত	২৫৭
খি	শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ	২৮৮
নুবাদ)	শ্রীযতীশ বেদজ্ঞ	২৫২, ২৯৭
	শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	৩১৪
মুক্তি	ঝরাপাতা	৩২৭
প্রেতিনীর প্রেম	ডাঃ হৃষীকেশ হালদার	৩৫১
মৈনাক	শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু	৩৮২
দুর্বোধ্য	শ্রীধীরেন রায়	৩৯২
জীবনের একপাতা	শ্রীবেলা দে	৪১১
মধ্যবিত্তের স্ত্রী	শ্রীঅরুণবরণ চক্রবর্তী	৪৩২
স্থায়ী উপকার	শ্রীসরোজনাথ ঘোষ	৪৭৭
সূর্য্যাস্তের স্তব	অমিয় ভট্টাচার্য্য	৪৮৬
প্রশ্ন	শ্রীঅরুণেন্দ্রমণি দত্ত	৫১০
বলিদান	শ্রীশতদল বিশ্বাস	৫২৩
রক্ত একই	কানাই বসু	৫৩২
ডাইনী	শ্রীসুজাতা ঘটক	৫৪৪

কবিতা

ব্যর্থ দিন	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	৭
দেখা ও দর্শন	শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত	১৯
চোখ গেল	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩১
ভিখারী	শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৭
ফাল্গুনী	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৪৭
দুরাশার আলো	শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায়	৫৭
স্বাধীন ভারত (কোরাস)	শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৬৮
রুদ্র-তপস্বী	শ্রীসুবোধ রায়	৮৮
দূরের পাহাড়	—দিলীপ দাশগুপ্ত	১১৩
পাহাড়	—সামসুদ্দীন আমেদ	১১৩
সৌখীন	শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার ঘোষ	১২৭
কবিতা-ষষ্ঠক	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	১৩১
অবতার-তত্ত্ব	শ্রীভূবনমোহন দাশ	১৩৬
মন	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫৯
পিতৃ-তর্পণ	শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৭
আমি তাহাদের কবি	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত	২০০
পরাজয়	শ্রীজ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	২১০
শেষের গান (কাব্য-কাহিনী)	শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত	২৩৩
আহ্বান	শ্রীসুনীতিকুমার বসু	২৬০
চাঁদের তরী	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	২৮৭
দোলের দোল	শ্রীমন্মথনাথ সরকার	২৯১
মূকের ভাষা	শ্রীআশুতোষ সান্যাল	২৯৬

...ী-নেতাজী	শ্রীহিমা চক্রবর্ত্তী	৩২৬
...র্থিক	শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩২
...নার আহ্বানে	শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী	৩৩৬
...ঙ্গ	শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক	৩৫০
...ন ভ'বেছে আজ	শ্রীপ্রভাকর মিত্র	৩৬১
	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত	৩৫৩
...পদী	আহ্বাব সিদ্দিকী	৩৬১
...	শ্রীমতী নমিতা দত্ত	৩৮৮
	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	৩৯৫
...র বিহঙ্গ আজো		
...নভোচারী	শ্রীসুধীরকুমার নন্দী	৪১২
...না [অনুবাদ]	শ্রীঅরুণা চট্টোপাধ্যায়	৪২১
...াওয়াবই গর্ব্বে	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদার	৪২৮
...	শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৩৫
...দেশ	শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত	৪৩৫
...াই ডাক	শ্রীপান্নালাল বসু	৪৫০
...ছিনু কতোকাল	শ্রীকরুণাময় বসু	৪৫৪
...সত্য	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৭৬
...থেকে	শ্রীমণীষচন্দ্র মজুমদার	৪৮২
...ব	শামসুদ্দীন	৪৮২
...কর সকল	শ্রীকরুণাময় মুখোপাধ্যায়	৫২০
আফসোস	শ্রীসুধীন সেন	৫১৩
বাঙালী	গোপাল বটব্যাল	৫২৬
এই সকাল	জ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	৫২৮
মিলন-বিরহ	শ্রীমন্মথনাথ সরকার	৫৩১

নাটক

নাটক	সোহাগিনী দস্তিদার	৪৪১, ৫৫১

পুস্তক ও আলোচনা

সমাজ-দর্শন ; বন-জ্যোৎস্না ; দিল ডাক	৭৯
Indian National Congress ; The Rocial History of India ; সন্ধ্যা-মালতী ; শ্রীশ্রীউদ্ধবসংবাদ	১৭৩
তীর ও তরঙ্গ ; প্রান্তিক ; আগমনী ; কল-কল্লোল ; শ্রীমতিচ্ছন্ন শিবরাজ মহেন্দ্র-চরিত	২৭১
দীপপুঞ্জ ; জীবন ও যুদ্ধ ; তোমার পতাকা যারে দাও ; অভিযাত্রী	৩৬২
শেষের গান ; জনকল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান ; নতুন সূর্য্য ; Netaji Speaks ; বিদ্রূপ ও বহ্নি	৪৬১
রূপ-লোক	১৭৪, ২৭২, ৪৬২, ৫৫৭
সম্পাদকীয়	৮০, ১৭৫, ২৭২, ৩৬৫, ৪৩৬, ৫৫৯

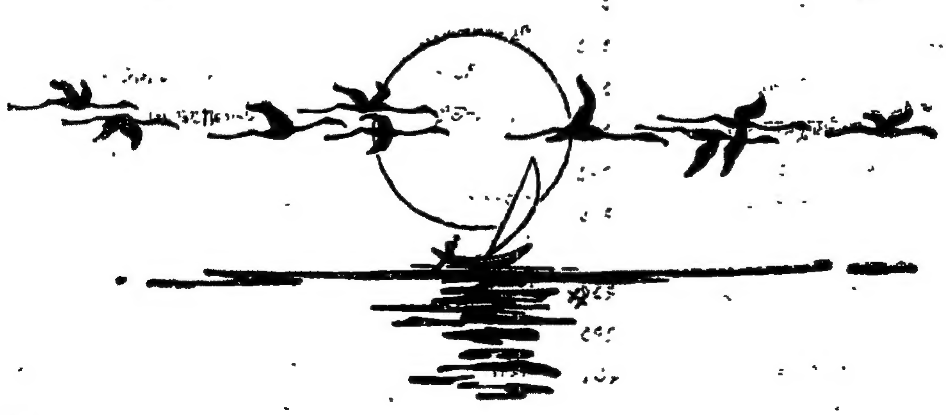

দিন প্রতীক্ষায়

ফটো—শ্রীসুনীল দত্ত

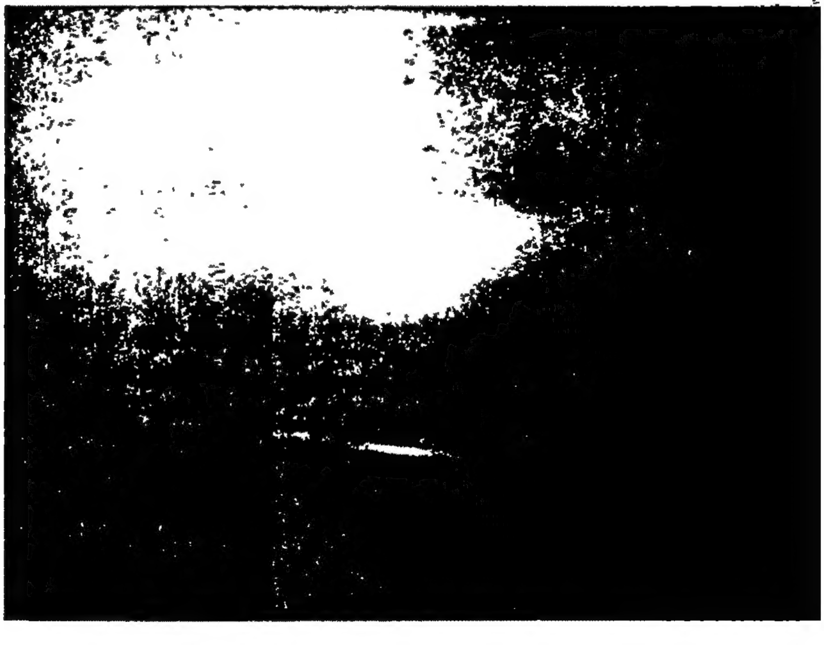

ম আলোর চরণধ্বনি

শ্রীশৈলবিহারী ঘোষ

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

বঙ্গশ্রী

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

চতুর্দ্দশ বর্ষ } পৌষ—১৩৫৩ { ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

বেদে ব্রজলীলা

শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী দেবশর্ম্মা

'শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।'

শ্রীধর স্বামী।

পরব্রহ্ম স্বয়ং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া দ্বাপরের শেষে মায়ামানুষবেশে ব্রজমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ভগবানের লীলা দ্বিবিধা। ঐশ্বর্য্যময়ী এবং মাধুর্য্যময়ী। যে লীলায় তিনি কোথাও জন্মগ্রহণ করেন না, কিংবা কাহারও সহিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সম্বন্ধ রাখেন না, কেবল নিজ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে ভক্তমনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য অবতার গ্রহণ করেন, শ্রীভগবানের সেই লীলা ঐশ্বর্য্যময়ী। শ্রীমৎস্য, শ্রীবরাহ, শ্রীনৃসিংহ প্রভৃতি এইরূপ ঐশ্বর্য্যময়ী লীলা। যে লীলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতামাতা প্রভৃতি সম্বন্ধের অনুগত থাকিয়া ভক্তমনোরথ পূরণ করেন, তাহা মাধুর্য্যময়ী। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীসঙ্কর্ষণ এইরূপ লীলা।

শ্রীভগবানের ধাম—গোলোক :

ভগবান চিন্ময় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র, এবং অন্তর্য্যামিরূপে সকল জীবহৃদয়ে অবস্থিত। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড বা জীবহৃদয় তাঁহার লোক বা ধাম নহে। শ্রীভগবানের ধাম ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মায়িক নহে, তাহা প্রকৃতিরও অতীত সচ্চিদানন্দময় স্থান। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। ভগবানও অনন্ত বৈকুণ্ঠে অনন্ত শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া লীলাস্বাদন করেন।

'স হি ভগবান্ কুত্র তিষ্ঠতি? মহিম্নি স্বে।'

গোপালতাপনী-উপনিষদ্।

অনন্ত বৈকুণ্ঠের মধ্যে গোলোকনামক বৈকুণ্ঠেই তাঁহার লীলার পরিপূর্ণতা। তথায় সমস্ত পার্ষদ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ মাধুর্য্যময়। তাই গোলোককে তাঁহার পরম ধাম বা শ্রেষ্ঠ লোক বলা হয়।

"পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ং।
অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকে ধাম্নি রাজতে।"

(গর্গসংহিতা। গোলোক। ১।২৮)

'অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি পরিপূর্ণতম সাক্ষাৎ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে বিরাজিত আছেন।'

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম।
গোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম।
সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু সম। উপর্য্যধো-ব্যাপি আছে
নাহিক নিয়ম।
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়। একই স্বরূপ তার নাহি
দুই কায়।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এই গোলোকধামে শ্রীভগবান্ গো, গোপ এবং গোপী-সহ নিত্যলীলা-বিলাস করেন।

'বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সদারামো বালকৈর্বৃতঃ। বৃন্দাবনান্তর্গতঃ
সদা ক্রীড়তি কংসহা।'

(স্কান্দে)

কংসনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ বলদেব, গোপবালক এবং বৎসাদি সহ বৃন্দাবনে নিত্য বিহার করিয়া থাকেন।

কোন কোন সময় জগৎ কৃতার্থ করিবার জন্য এই ধাম, পার্ষদ ও লীলা কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ডে,

'অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয়
কৃষ্ণের প্রকাশে॥
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)

'বেদনাগক্রোশভূমিং স্বধাম্নঃ শ্রীহরিঃ স্বয়ম্।
গোবর্দ্ধনঞ্চ যমুনাং প্রেষয়ামাস ভূপরি॥'
(গর্গসংহিতা। বৃন্দাবন। ৩।৩৩)

স্বয়ং শ্রীহরি নিজধাম (গোলোক) হইতে চৌরাশী ক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন-গিরি ও যমুনাকে ভূতলে প্রেরণ করিলেন।'

অবতার ও নরলীলা :

'পরমাত্মা নরাকৃতিঃ।'
'গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গং।'
'আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।'

শ্রীভগবান্ নরাকৃতিতে প্রপঞ্চের অতীত ধামে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন। তাঁহার অনন্ত লীলা থাকিলেও এই লীলাই সর্ব্বোত্তম।

'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু
তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলার হয়
অনুরূপ॥'
(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণরূপে তিনি একাধারে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, অবতারভাব ও অবতারিভাব প্রকটিত করিয়া নিজলীলাবিলাসে জগৎকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

এই মায়ামানুষদেহ জগতের জীবগণকে যোগমায়া-বৈভব দেখাইবার জন্য স্বেচ্ছায় গৃহীত।

'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।'
(শ্রীমদ্ভাগবতে।)

শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের মত মনুষ্য না হইলেও মায়া সাধারণ জীবের নিকট তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়াই ধারণা জন্মাইয়া দেয়। সাধারণে এই লীলার অপ্রাকৃত অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ। মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্।' (গীতা।৭।২৫)

'মহাযোগমায়াবিশেষানুযুক্তঃ বিভাসীশ লীলানরাকারবৃত্তিঃ।'
রামের প্রতি ইন্দ্রের স্তব, (অধ্যাত্মরামায়ণ। লঙ্কা। ১৩।২৮)

'হে ঈশ্বর! মহতী যোগমায়ার গুণবিশেষে সংশ্লিষ্ট হইয়া আপনি লীলা-মনুষ্যরূপে বিরাজ করিতেছেন।'

এই যে অপ্রাকৃতকে প্রাকৃত বোধ, ইহাতেও বোধ হয় তাঁহার লীলার মাধুর্য্যই প্রকাশ হয়।

'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'
গীতা।

ভগবান্ কখন অবতার গ্রহণ করেন? যুগে যুগে যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় তখন তিনি ধর্ম্মসংস্থাপন জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

'যদা যদা চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি সত্তম। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য
তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
তদাহং সম্প্রসূয়ামি গৃহেষু শুভকর্ম্মণাম্। প্রবিষ্টো মানুষং দেহং
সর্ব্বং প্রশময়াম্যহম্।
কর্ম্মকালে পুনর্দ্দেহমবিচিন্ত্যং সৃজাম্যহম। আবিশ্য মানুষং
দেহং মর্য্যাদাবন্ধকারণাৎ।'
(মহাভারত। বন। ১৮৯। ২৭-৩১)

কল্পাবসানে মার্কণ্ডেয়কে বটপত্রে শয়ান শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—'যে সময় ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেই সময় আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। আমি তখন মনুষ্যদেহে প্রবেশ করিয়া শুভকর্ম্মাদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া সকল প্রশমন করি। কর্ম্মকালে পুনরায় মর্য্যাদাবন্ধনের নিমিত্ত নবদেহে আবিষ্ট হইয়া অচিন্তনীয় শরীর সৃষ্টি করি।'

কিন্তু মূঢ় এবং আসুর প্রকৃতির জীবগণ শুধু যে মায়ামনুষ্যরূপধারী ভগবান্‌কে চিনিতে পারে না, তাহা নহে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি ব্যাস, ভীষ্ম, বিদুর ও ঋষিগণের শত উপদেশ পাইয়া—এমন কি (কৌরবসভায়) বিশ্বরূপ দেখিয়াও কেবল যে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে, তাঁহাকে দ্বেষ ও অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, এমন কি, বন্ধনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন।

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।'
গীতা।৯।১১

বেদপুরাণাদি-প্রতিপাদিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। কোন কোন সময় জগতের এরূপ দুর্ভাগ্য হয় যে, বেদ-পুরাণাদির অপেক্ষা না রাখিয়া লোকে নিজ ইচ্ছামত আচরণকেই ধর্ম্ম বলিতে চায়। শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও মনোমত করে। যে সকল নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব-পরম্পরামতে চলেন তাঁহাদের লাঞ্ছনা ও অপমান হয়। প্রকৃত ধর্ম্ম তখন সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামী, ভণ্ডামী বলিয়া পরিচিত হয়। স্বেচ্ছাচারই তখন উদারতা। ভোগ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের স্থান অধিকার করে। ইহাই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান।

আমাদের দুরদৃষ্টক্রমে আজ ভারতের এই অবস্থা উপস্থিত। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার সংঘাতে আজ সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ও কৃষ্টি উপহসিত। যথেচ্ছ আহার-বিহারই এখন বিধি হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আধুনিক মত :

কোনও ধর্ম্মকে অভিভব করিতে হইলে প্রথমে তাহার শাস্ত্রগ্রন্থের বিষয়ে সন্দেহ আনা দরকার। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদ, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি লইয়া প্রভূত পরিশ্রম ও গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইচ্ছায় বা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক ভ্রান্ত ও দুষ্ট মত প্রকটিত ও প্রচারিত হইতেছে। তাহাতে আর্যকাল-প্রসূত বৈদিক শাস্ত্র হেয় প্রতিপন্ন ও সনাতন ধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা হ্রাস হইতেছে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এতদ্দেশীয় একশ্রেণীর বিদ্বান্ ইহাদিগের যে কোনও

কপোল-কল্পিত মত বা উক্তির প্রতিধ্বনি বা পোষকতা করিয়া এই সকল ভ্রম বা দুষ্ট মতের পুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই অনুসন্ধিৎসার আঘাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই।

নিম্নে সংক্ষেপে কতকগুলি প্রধান মতের আলোচনা করিতেছি।

ভাগবত ধর্ম্মের সহিত খৃষ্টমতের কোথাও কোথাও সাদৃশ্য দেখা যায়। পাশ্চাত্য বিদ্বান্ ও পাদরীরা কেহ বলেন—ইহার কারণ যীশুর জন্মের পূর্ব্বেই শয়তান গোল বাধাইবার জন্য ভারতে ঐরূপ মতের কিছু প্রচার করিয়া রাখিয়াছিল। অন্য মতে যীশুর পরে জাল বাইবেল (apocryphd) হইতে উহার উদ্ভব। কেহ বলেন—বৈষ্ণবধর্ম্ম খ্রীষ্টানদের নিকট হইতে ধার করা।

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে কেহ অনৈতিহাসিক বলিয়া উড়াইয়া দেন। কাহারও মতে কৃষ্ণ একাধিক বা বহু। আবার কেহ বলেন, ব্রজের গোপাল-কৃষ্ণ ও বৃন্দাবনলীলা বাল-খ্রীষ্টের নাম ও কাহিনীর অনুকারমাত্র।

স্যার উইলিয়াম জোন্স্ লিখিয়াছেন,

"প্রথম খৃষ্টীয় যুগে বহু জাল বাইবেল ছিল এবং ভারতে আনীত হয়। হিন্দুদিগের নিকট সেগুলির অদ্ভুত অংশগুলি বিবৃত হইলে তাঁহারা কেশবের পুরাতন কাহিনীর ভিতরে সেগুলি মিলাইয়া লন। কেশব গ্রীসের এ্যাপোলো।"

Dr Welns বলেন যে, চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় সাধুরা সিরিয়া বা মিশরদেশে যাইয়া একান্ত ভক্তির কথা ও একেশ্বর বাদ (Worship of one god aud salvatich by faish) ভারতে লইয়া আসেন।

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার Comparative studies in Vaisharitch and Christianity পুস্তকে মহাভারতে নারদের শ্বেতদ্বীপে নারায়ণ দর্শন হইতে ভারতীয় বৈষ্ণবদিগের এই সিরিয়াগমন আবিষ্কার করিয়া অনেক গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

কোথাও তিনি বলিতেছেন—

"ভারতীয় বৈষ্ণবগণ আদিম খ্রীষ্টীয় মত হইতে একটিও নীতিবাদ বা অনুষ্ঠান-বিধি পরিগ্রহণ করেন নাই।"

অথচ ইহার পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়াছেন,

'বৈষ্ণব ধর্ম্ম নষ্টিক খৃষ্টীয় (জ্ঞানমার্গী) প্রভাবে পুষ্ট হইয়াছিল।' আবার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বিষয় বলিতেছেন, "শঙ্কর হুবহু নেষ্টরিয় মতের পুনরুক্তি করিয়াছেন।……শঙ্করের জন্মভূমি কেরলে, তাঁহার সমসময়ে খৃষ্টমত প্রবল ও সুপ্রসারিত ছিল। তিনি এখানে পরোক্ষে খৃষ্টীয় ভাগবতগণের উল্লেখ করিতেছেন।"

ইহার অর্থ হয়, কি জ্ঞান, কি ভক্তি, কি অদ্বৈতবাদ—সমুদয়ই বৈদিক ধর্ম্মে খৃষ্টীয় মত হইতে গৃহীত। এইরূপ উক্তিকে প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শ্বেতদ্বীপ যে সিরিয়া বা ভূপৃষ্ঠস্থ কোনও অন্য দেশ হইতে পারে না—তাহা তাহার বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। শ্বেতদ্বীপ গোলোক বা বৈকুণ্ঠধাম। ভাণ্ডারকর ও উইন্টারনিজ শ্বেতদ্বীপ লইয়া এই ভুল করেন নাই। স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃতা আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের সার গীতা সম্বন্ধে দু'একটি মত উদ্ধৃত করিতেছি। জার্মান লেখক F. Lorinser তাঁহার গীতার অনুবাদের উপসংহারে লিখিয়াছেন, "ভগবদ্গীতার লেখক যে শুধু নিউ টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থ জানিতেন ও প্রায়ই কাজে লাগাইয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু তিনি সাধারণ খৃষ্টীয় চিন্তাধারা ও দর্শনও তাঁহার মতবিন্দের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। • • প্রাচীন ভারতের মননশীলতার এই বহুপ্রশংসিত কীর্তিস্তম্ভ • • পৌত্তলিক পাণ্ডিত্যের এক বহুমূল্য বিকাশ তাহার পবিত্রতম এবং সর্ব্বোচ্চ-প্রশংসিত মতগুলির জন্য • • খৃষ্টীয় মূলের নিকট ঋণী •। Hopuiors ও তাঁহার Indra, old and new গ্রন্থে এইরূপ বলিয়াছেন।

উইন্টারনিজ গীতাকে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত তো বলিয়াছেনই, তদুপরি ইহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্তবাদে পূর্ণ বলিয়া গীতার সত্তা

• "Spurious Gospels which abounded in the first age of Christianity had been brought to India, and the wildest parts of them repeated to the Hindoos, who ingrafted them in the old fable of Cesava, the Apollo of Greece."

(Sir William Jones, Asiatic Researches)

"Not a single dogma or rite was derived by the Indian Vaishnava from primitive Christianity."

(Ditto, P. 102)

"The Vaisnava scheme was developed under Gnostic-Christian influence. • • Sankara exactly reproduces the Nestorian belief * Sankara who was born in a country (Kerala) where Christianity was powerful and widespread in his days, is here indirectly referring to the Christian Bhagabatas.

(Dr. B. N. Seal, Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity, P. 9)

"Svetadvipa or the white island is the heaven in which Narayana, spoken of sometimes as Hari, dwells. • There is, therefore no need to suppose that the white island was a Christian country peopled by white races."

(Vaisnavism, Saivism, and minor religious systems, Sir R. G. Bhandarkar, P. 32)

"In my opinion, the description of Svetadvipa does not remind us of the Christian Eucharist, but of heavenly regions such as Vaikuntha, Goloka".

Winternitz, Indian Literature, Vol. I, P. 440.)

"The author of the Bhagavadgita not only knew and frequently utilised the scriptures of the New Testament, but also wove into his system Christian ideas and views in general, • • This much admired

ও ভাগবত-সম্বন্ধ একেবারে বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, গীতা প্রতি পদে বৈপরীত্য ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ: মহাভারতের স্থায় গীতারও মূল রূপটি নাই। এখন আমরা যাহা পাই তাহা বহু প্রক্ষিপ্ত পদ ও সংশোধনের ফল। তাঁহার এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, মূল মহাভারত-কাব্যে ভগবদ্-গীতা ছিল না। খৃষ্টীয় প্রথম কয় শতাব্দীর মধ্যে সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণগণ গীতাকে বর্ত্তমান রূপটি দেন। উইণ্টারনিজের মতে—এইভাবে বিকৃত না হইলে গীতার আরও আদর হইত।

গীতা খৃষ্টশাস্ত্রের নিকট ঋণী এ কথা ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নহে। মহাভারতে প্রথমে গীতা ছিল না, বা পরে ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা লিখিয়া দিয়াছেন—এই সকল উক্তিরও ঐতিহাসিক বা অন্ত প্রমাণ নাই। গীতা যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাণী সে বিষয়ে অশ্রদ্ধা আনিবার ইহা কুচেষ্টা।

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী-প্রমুখ প্রগাঢ় পণ্ডিতগণ গীতার প্রত্যেকটি শ্লোক কেন, প্রত্যেকটি কথা যে যুক্তিযুক্ত ও অকাট্য পারম্পর্য্য-বিশিষ্ট, তাহা দেখাইয়াছেন। গীতার অর্থ যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহাদের পক্ষে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দেখা স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণের পিতৃপরিচয় সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য বিদ্বান্‌গণ সন্দেহে পড়িয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের কথা আছে। ইহা হইতে ইঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, বসুদেব কৃষ্ণের পিতা নহেন, তাহা হইলে দেবকীপুত্র না থাকিয়া বসুদেবপুত্রের উল্লেখ থাকিত। ইঁহারা বলেন, কৃষ্ণের বাসুদেব নাম হইতে তাঁহার পিতার নাম বসুদেব ব্যখ্যা হইয়াছে, বসুদেব হইতে বাসুদেব নাম হয় নাই। ভাণ্ডারকরও এই অদ্ভুত মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। ইহা হইতে কৃষ্ণ এক নহেন, একাধিক, এই কথাও উঠিয়াছে।

প্রথমতঃ ছান্দোগ্যের দেবকীনন্দন কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ নাও হইতে পারেন। যদি একই হন, দেবকীপুত্রের বসুদেবপুত্র বাসুদেব হইতে কি বাধা থাকিতে পারে? মাতার নামেও ভারতের বহু মহাপুরুষ পরিচিত। পার্থ, কৌন্তেয়, রাধেয়, সৌমিত্রির পিতৃপরিচয় সংশয়াম্বিত হয় নাই। আবার কৃষ্ণ নামে বহু ব্যক্তি এক বা বিভিন্ন কালে (যেমন শ্রীকৃষ্ণের সমকালে অর্জ্জুন বা দ্বৈপায়ন ব্যাস) থাকিলেও তাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব বা ঈশ্বরত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। তিনি যাদববংশীয় আনক-দুন্দুভি-বসুদেবের পুত্র—এ কথা পুরাণ, ইতিহাস সর্ব্বত্র বিখ্যাত ও অবিসম্বাদিত সত্য।

উইণ্টারনিজ্ তাঁহার Indian Literature এ লিখিয়াছেন যে, 'কৃষ্ণ যে যাদববংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা মহাভারতে বহুস্থানেই এক অসভ্য গোপজাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মূল প্রাচীন মহাভারত কাব্যে কৃষ্ণ ঐ গোপজাতির এক মুখ্য নেতা ছাড়া কিছুই ছিলেন না এবং তাঁহার মধ্যে ভগবত্তা কিছুই ছিল না। এক কৃষ্ণই যে একাধারে পাণ্ডবগণের বন্ধু ও পরামর্শদাতা, ভগবদ্গীতার বাণীর প্রচারক, যুগবীর অসুরনিহন্তা গোপীবল্লভ এবং শ্রেষ্ঠ দেব বিষ্ণুর অবতার হইতে পারেন—এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। বরং ইহাই অধিক সম্ভব যে, দুই বা অধিক প্রাচীন কাহিনীর কৃষ্ণ ছিলেন, পরে তাঁহাদিগকে এক দেবতায় পরিণত করা হইয়াছে। উপরন্তু ইহাও সম্ভব যে, মূল কাব্যে কৃষ্ণ মোটেই স্থান পান নাই। পরে বোধ হয় পাণ্ডবদিগের কুৎসিত ক্রিয়া-কলাপ সমর্থনের বিশেষ মতলবেই তাঁহাকে উপস্থিত করা হইয়াছে। কৃষ্ণের সমস্যার উপর বহু লেখা হইয়াছে, কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, তথাপি কোন সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায় নাই। যাহাই হউক, পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ হইতে হরিবংশের কৃষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ দেব বিষ্ণু যে বহু দূর কথা।"

---

monument of the ancient Indian mind * * one of the most precious blossoms of heathen philosophy, owes its purest and most highly praised doctrines * *" to Christian sources, (F. Lorinser, Translation of Gita)

": There are however other contradictions in the poem staring us in the face at every turn. * * the contradictions in the Gita can better be explained by the assumption that the poem has not come down to us in its original form, but like most parts of the Mahabbarata has only received its present form as a result of interpolations and revisions. * * There can hardly be any doubt that the Bhagavadgita did not belong to the original heroic poem. * * Most likely it was already in the early centuries A. D. that it received its present form at the hands of orthodox Brahmans ** would find still greater appreciaton, had the poem not been mutilated by additions and interpolations:" (Winternitz, Indian Literaturel, p. 433-39, Vol' I)

The story of Krisna being the son of a knight Vasudeva is not true : and the name of father seems to have been developed from his (Krishna's) very name Vasudeva."

" Vasudeva appears to be proper name and not a patronymic. * The conception of Vasudeva as his father must have arisen afterwards. Then the name Krishna as the son of Devoki occurs in the Chandogya Upanishad. (III, 1). "

(Vaisnavism etc, P 11)

" As regards Krisna, the race of the Yadavas to which he belongs is described in several places in the Mahabharata as a cowherd tribe of rough manners * * In the ancient heroic poem, he was certainly nothing more than a prominent leader of that cowherd tribe and had nothing divine about him. ** It is difficult to believe that Krisna, the friend and counselor of the Pandavas, Krisna, the herald of the doctrines of the Bhagavadgita, Krisna, the youthful hero and demon-slayer, Krisna, the favourite and lover of the cowherdesses, and finally Krisha, the incarnation of the excellent god Visnu, can be one and the same person. It is far more likely that there were two or several traditional Krisnas, who were merged into one deity at a later time. * * It is possible, moreover, that Krisna did not figure at all in the original epic, and was introduced only later, perhaps with the express intention of justifying the actions of the Pandavas, which were shady * * Much as has been written on the problem of Krisna, we must admit, never-

যাদবগণ অসভ্য গোপজাতি—ইহা উইন্টারনিজের অপূর্ব্ব আবিষ্কার। বালকেও জানে যে, তাঁহারা প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়সম্রাট্ যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশধর। উইন্টারনিজ প্রথমেই জোর গলায় শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা অস্বীকার করিলেন (হরিবংশেও প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ এ কথা ছিল না বলিয়াছেন)। তাহার পর কৃষ্ণ এক কিছুতেই হইতে পারেন না, তিনি দুই বা বহু। পাশ্চাত্ত্য বিদ্বান্‌দের মতে কৌরবরা ছিলেন মহাভারতের প্রকৃত নায়ক, ন্যায্য রাজ্যাধিকারী, পাণ্ডবরা বিদেশী ও অধার্ম্মিক। উইন্টারনিজ্ শেষে বলিতেছেন যে, এই দুষ্ট পাণ্ডবগণের সমর্থনের জন্যই জোর করিয়া মহাভারতের আখ্যায়িকায় শ্রীকৃষ্ণকে ঢ্কান হইয়াছে, তিনি প্রথমেই ছিলেন না। অর্থাৎ দুই বা বহু হইতে কৃষ্ণের অস্তিত্বই লোপ। কৃষ্ণ নিজেই প্রক্ষিপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণ দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম এবং ধার্ম্মিকের রক্ষার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য বিদ্বান্ ও মিশনরীদিগের পক্ষে সত্যই বিরাট্ সমস্যা। কংসও তাঁহাকে লইয়া বেগ পাইয়াছিলেন। এই সমস্যাটি যতদিন, বৈদিক ধর্ম্ম ততদিন যাইবার নয়।

সার্ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর বলেন—বৃষ্ণিকুমার বাসুদেব গোপ-গৃহে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার মহাভারতের চরিত্রের সহিত খাপ খায় না।

বৃষ্ণিকুমার শ্রীবলরাম(সঙ্কর্ষণ)ও ভগবানের অবতার। তিনিও কৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজে গোপগৃহে বর্দ্ধিত হন ও দ্বারকায় লীলা করেন। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কেহ উল্লেখ মাত্র করেন নাই।

ভাণ্ডারকর বাসুদেব-কৃষ্ণ ও গোপাল-কৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য আনিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধ ও জৈন মতের সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন।

'বৈদিক দেবতা' বিষ্ণু, 'জগতের উৎপত্তিস্থানীয় ও দর্শনের দেবতা' নারায়ণ এবং 'ঐতিহাসিক দেবতা' বাসুদেব-কৃষ্ণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের তিন বিভিন্ন ধারা লক্ষ্য করিয়া ইনি এক কল্পিত পার্থক্যের খিচুড়ী করিয়াছেন। অবতারবাদের ধার দিয়াও যান নাই।*

চতুর্থ ধারাটি ইনি মূল উৎস বাল-খৃষ্ট হইতে গোপ-কৃষ্ণরূপে আভীরগণের দ্বারা প্রথম শতাব্দী (খৃঃ)-তে ভারতে আনিয়াছেন। এই চারি ধারা নাকি এক হইয়া বৈষ্ণব মতের সৃষ্টি করিয়াছে। ভাণ্ডারকর কৃষ্ণের দেবত্ব বিষ্ণুত্ব রাখেন নাই, পরন্তু তাঁহাকে খৃষ্টের নকল বলিয়া ছাড়িয়াছেন।

---

theless that no satisfactory solution has been found. In any case, it is a far cry from Krisna the friend of the Pandavas, to the Krisna of the Harivansa and the exalted god Visnu,"

(Indian Literature, Winternitz, Vol. 1, p. p. 456-57)

* "And the story af the Vrsni prince Vasudeva having been brought up in a cowsettlement is incongruous with his later career as depicted in the Mahabharata. Nor does any part of it require the presupposition of such a boyhood as has been ascribed to him."

(P. 35. Vaisnavism etc.)

* "It (Vainsavism) first appeared as a religious reform like Buddhism and Jainism, but based on theistic principles. Its early name was Ekantika Dharma. * In its background stood the Bhagabat-gita, a discourse professing to be practised by Vasude vakrana,"

"In the Puranic times * three streams of religious thought, namely the one flowing from Visnu, the Vedic god at its source, another from Narayana, the cosmic and philosophic god, and the third from Vasudeva, the historical god, mingled togerher decisively and thus formed they later Vaisnavism. There is however a fourth stream."

"Soon after the beginning of the Christian ear, another element was contributed to this a system of religion by the Abhiras or cowherds, who belonged to a foreign tribe, in the shape of the marvellous deeds of the boy-Krisna, who came to be regarded as a God, and of his amorous dalliances with cow-herdesses" p 100

* "Abhiras" must have migrated into the country in the first century. They probably brought with them the worship of the boy-god (Christ) * The stories of Krisna's boyhood ** were developed after they came to India It is possible that they brought with them the name Christ also, and this name probably led to the substitution of the boy-god with Vasudeva-Krisna The Goanese and the Bengalees often pronounce the name Krisna as Kusto or Kesto, and so the Christ of the Abhiras was recognised as the Sanskrit Krisna. The dalliance of Krisna with cowherdesses * * was also an aftergrowth, consequent upon the freer intercourse between the wandering Abhiras and their more civilised Aryan neighbours. Morality cannot be expected to be high or strict among races in the condition of the Abhiras of the time ; and their gay neighbours took advantage of its looseness besides the Abhira women must have been fair and handsome as those of the Ahir Gavaliya or cowherds of the present day are."

(Vaisnavism, Saivism, and minor religious systems, pp 37-38, Sir R. S. Bhandarkar)

ব্রজবাসী গোপগণ বৈশ্য ছিলেন, বিদেশীয় ম্লেচ্ছ বা খৃষ্টান ছিলেন না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এশিয়া-মাইনরেও খৃষ্টানদের সংখ্যা ও শক্তি নগণ্য ছিল। তথা হইতে উত্তর-পশ্চিম ভূপথে ভারতে খৃষ্ট-উপাসনার আমদানী ও এদেশে নির্ব্বিচারে গ্রহণ এক অসম্ভব ও উদ্ভট খেয়াল। ভাণ্ডারকর রাসলীলা সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যজাতি ও আভীর-রমণীগণের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের কাহিনী রচনা করিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিয়াছেন ও অবস্থ রুচির পরিচয় দিয়াছেন। এ বিষয়ে অধিক না বলাই ভাল।

কৃষ্ণ যে খৃষ্টের বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতে ভগবান্ বলিয়া পূজিত হইতেছেন ইহা ঐতিহাসিক সত্য। (১)

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস্ শৌরসেনগণ-কর্ত্তৃক যমুনা-তীরস্থ মথুরা নগরে হারকিউলিসের উপাসনার উল্লেখ করেন(২)। ইহা কৃষ্ণপূজা একথা ambwdse History of Indi রতেও স্বীকৃত হইয়াছে। (Vol, I p 408)

পাণিনির কাল অনেকের মতে ১২০০ খৃঃ পূঃ। তিনি বাসুদেব ও অর্জ্জুনের উল্লেখ করিয়াছেন (বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং কুণ্)। ভারতযুদ্ধের কথাও আছে। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে মহাভারতের ও কৃষ্ণের অনেক কথা পাওয়া যায় ('অক্রূরো দদতে মণিঃ')। মহর্ষি পতঞ্জলি দ্বিতীয় শতাব্দীর (খ্রীঃ পূঃ) পরে নহেন (৩)।

রাজপুতানার ঘোষুণ্ডী শিলালিপিতে (Lüders, Brahmi Inscriptvous, no 6) রাজা সর্ব্বতাত-কর্ত্তৃক বাসুদেব-সঙ্কর্ষণের শিলাপ্রাকার গঠনের কথা আছে। ইহা অনুমান তৃতীয় শতাব্দী খ্রীঃ পূঃ।

বেশনগরে হেলিওডোরার প্রসিদ্ধ গরুড়ধ্বজ লেখ (Lüders no 669) বাসুদেব ও ভাগবত ধর্ম্মে গ্রীকদিগেরও খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে ভক্তির নিদর্শন।

নানাঘাটে ১নং গুহায় বাসুদেব-সঙ্কর্ষণের পূজার উল্লেখ আছে। ইহা বোধ হয় খৃঃ পূঃ প্রথম শতক।

মহাকবি ভাস অনেকের মতে খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে। তাঁহার বহু নাটকে কৃষ্ণ, বলরাম ও মহাভারতের কথা আছে।

কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে ছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে। তাঁহার কাব্যে ব্রজের শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

'বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।'

(মেঘদূতম্ ১৫)

'শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে' (মেঘ—৪৬)

'সকৌস্তুভং হ্রেপয়তীব কৃষ্ণম্।' (রঘু। ৬। ৪৯)

বলদেব, অর্জ্জুন ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথাও কালিদাসের কাব্যে আছে।

শকাব্দপ্রবর্ত্তক রাজা শালিবাহন বা সাতবাহন খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে 'গাথাসপ্তশতী' প্রণয়ন করেন। তাহাতে কৃষ্ণ ও গোপীলীলার উল্লেখ আছে।

'মুহমারুএণ তং কহ্ণ গোরঅং রাহিআএ অবনেন্তো।

এতাণং বল্লবীণং অণ্ণাণং বি গোরঅং হরসি।' (১।৮৯)

'হে কৃষ্ণ, তুমি মুখমারুতদ্বারা রাধিকার চক্ষু হইতে ধূলা অপনয়ন করিতেছ। ইহাদ্বারা অন্য গোপীগণেরও গৌরব হরণ করিতেছ।'

'অজ্জবি বালো দামোঅরো ত্তি ইঅ জম্পিএ জসোদাএ।

কহ্ণমুহপেসিঅচ্ছং নিহুঅং হসিঅং বজবহূহিং।' (২।১২)

'যশোদা বলিতেছেন, দামোদর এখনও বালক আছে। ইহাতে ব্রজবধূগণ গোপনে কৃষ্ণমুখ দেখিয়া হাসিতেছেন।

অনেকে রাধাকৃষ্ণলীলার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিয়া থাকেন। উপরের শ্লোক হইতে তাঁহাদিগের অবিশ্বাস কিঞ্চিৎ দূর হইতে পারে।

জ্যোতিষ ও বিভিন্ন পুরাণ আলোচনায় ভারতসমরের কাল ৩১০০ খৃঃ পূঃ বলিয়া স্থির হয়। অন্ততঃ ১৫০০ খৃঃ পূঃ বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়।

হিগিন্স্ (Sir G Higgins) বলেন, কৃষ্ণ যে যীশু অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে তাহা প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও গ্রন্থ হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়। তিনি আরও বলেন যে, ব্রাহ্মণরা একটা নূতন কাহিনী রচনা করিয়া এবং শাস্ত্রে জুড়িয়া এবং নূতন দেবতাকে সর্ব্বোচ্চ পদে বসাইয়া সমস্ত সামঞ্জস্য করিয়া বুঝাইয়া দিলেন,—আর কোটি কোটি লোক মিথ্যা জানিয়াও তাহাই মানিয়া লইয়া উপাসনা করিতেছে—ইহাও কি সম্ভব?

মোটের উপর, খৃষ্টের জন্মকাহিনী, জীবনের ঘটনাবলী ও ধর্ম্মমতের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র আলোচনা করিলে হেরডের

১ "There are satisfactory proofs of the anti-Christian growth of a Krishna legend in the Mahabharata story"

(Seal, Comparative Studies, P. 8)

২ "This Heracles is held in especial honour by the Sourasenoi, an Indian tribe, who possess two large cities Methora and Cleisobora"

(Megasthenes quoted by Arrian —McCrindle P. 206

ভগবানের তিরোধানের পর বজ্রপ্রমুখ যাদবগণ মথুরায় ফিরিয়াছিলেন, মেগাস্থিনিস্-কর্ত্তৃক শৌরসেনগণের উল্লেখে তাহা সম্পূর্ণ প্রমাণ হয়।

৩ "Patanjali's Mahabhashya (1/4/92, 4/1/14, 5/3/99.) also conclusively establishes the fact that Krishna was worshipped as a God or Avatar long before the commencement of the Christian era" (Seal, Comparative Studies, P. 9)

* "In fact, the sculptures on the walls of the most ancient temples * as well as written works equally old, prove beyond the possibility of doubt, the superior antiquity of the history of Cristna to that of Jesus," Anacalypsis, Vol 1, P 160, by Sir G. Higgins.

শিশুহত্যা প্রভৃতি দু'একটি গৌণ বিষয় ব্যতীত উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই দেখা যায় না।

খৃষ্টের প্রকৃত নাম Yeshua (হিব্রু) বা Jesus। ইংরাজী Christ শব্দ গ্রীক Christos হইতে। ইহা উপাধিবিশেষ—অর্থ মেশায়া বা অভিষিক্ত। বাঙ্গালী বা গোয়ালীজ্ আজ সময় সময় কেষ্ট বা কেষ্টো উচ্চারণ করিলেও দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে কৃষ্ণের এ উচ্চারণ কোথাও এবং কখনই ছিল না। গ্রীক ক্রাইষ্টস্ শব্দ কোনও কারচুপি করিয়াই কৃষ্ণতে পরিণত করা যায় না। বর্ণের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া ভাণ্ডারকর ও যে পাশ্চাত্য বিদ্বান্‌দের তিনি প্রতিধ্বনি করিয়াছেন তাঁহাদের কৃষ্ণ ও ক্রাইষ্টের এই যে একীকরণের প্রয়াস ইহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও কষ্টকল্পনা। শত বৎসরেরও পূর্ব্বে Menrice বলিয়াছেন যে, ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া এই ব্যুৎপত্তির কোনও সত্তা নাই; কারণ কৃষ্ণ এই শব্দের সহিত গ্রীক ক্রাইষ্টস্ শব্দের সামান্য সমতাও নাই।

ভাণ্ডারকর প্রভৃতির মতে মহাভারতে ব্রজলীলার উল্লেখ নাই, যেটুকু আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত। এ-বিষয় পরে আলোচনা হইবে। ক্রমশঃ

• "I can confidently affirm, there is not a syllable of truth in the orthographical derivation; for Crishna, not Cris-en, nor Christna (as to serve a worthless cause, subversive of civil society, he artfully perverts the word.) has not the least approach to the Greek word Christos"

(Ancient History of Hindostan, Vol 12, P 224, By Maurice)

ব্যর্থ দিন

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

আজি এই ব্যর্থ দিন অনাঘ্রাত কুসুমের প্রায়
ঝ'রে গেল অনাদরে জীবনের বৃন্ত হ'তে হায়,
অগোচরে। এলো না সে কোনো কাজে—পূজায় তোমার
লাগিল না—দয়াময় হে জীবন-বিধাতা আমার।

আত্মারে পীড়িত করি' উঞ্ছবৃত্তি ভিক্ষুকের প্রায়
দাসত্বের ক্লেদপঙ্ক নতশিরে মাখি' সারা গায়—
গেল কেটে বেলা মোর। পারিল না কভু একবার
মনের বনের পাখী তুলিবারে মধুর ঝঙ্কার,—
মেলিবারে আকুঞ্চিত পাখা। হায়, আপনার হাতে
রোধি' তার কলকণ্ঠ নিরন্তর রুদ্ধ বেদনাতে
মরিলাম গুমরিয়া। এ সংসারে দিন কয় বাঁচিবার আশে
উঠি, খাটি আর ছুটি অবিশ্রাম অসীম প্রয়াসে
দিগ্বিদিকে। তারপর একদিন অনন্ত বিশ্রাম।
এ নশ্বর জীবনের যদি এ অব্যর্থ পরিণাম,—
বস্তু যদি হয় বড় এ মহান্ মানবাত্মা হ'তে,
জীবন বাঁচাতে যদি জীবনান্ত হয় এ জগতে,—
কেন তবে বিশ্বে এত অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের বান?
তবে কেন কবি-চিত্তে গুঞ্জরিয়া উঠে সদা গান?
ছন্দের তরঙ্গ কেন রাত্রিদিন পড়ে আছাড়িয়া
মর্ম্মতটে? ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধে সদা ধাবমান হিয়া
জ্বালাময় এ ধরায় কেন আসে ফিরে নিরন্তর?
এক প্রান্তে ভাব আর কল্পনার উত্তুঙ্গ শিখর—
অন্যপ্রান্তে ক্ষমাহীন দেহধর্ম্ম—বাস্তব ভীষণ—
মাঝখানে অসহায় মানবাত্মা কাঁদে অনুক্ষণ।

তাই ভাবি ভগবান্, এ সন্ধ্যার সান্দ্র অন্ধকারে,
না আসিনু কোনো কাজে সুবিপুল তোমার সংসারে।
অতৃপ্ত কামনা আর অভীপ্সার বাড়বাগ্নি বুকে—
জীবনের অবাঞ্ছিত শতভার বহি' ম্লানমুখে,—
হয়তো পড়িবে ঝরি' একদিন এ জীবন মম
এ সংসার বৃন্ত হ'তে—আজিকার ব্যর্থ দিন সম!

লক্ষ্য-ভেদ

শ্রীশৈলবিহারী ঘোষ

অশোক রায় ফাল্গুনী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। ছিপছিপে চেহারা, টিকোলো নাক, রং উজ্জ্বল, মুখে প্রায়ই একটা চুরোট থাকে। টেবিলের ওপর রাশিকৃত পাণ্ডুলিপি থেকে মনমত কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প চয়ন করতে করতে হয়ত চুরোটের টুকরোটা নিভে গেল, সে দিকে খেয়াল নেই। কোন একটা আকর্ষনীয় গল্প পড়বার সময় কপালের দু'চারটি রেখা প্রস্ফুট হয়ে ওঠে।

বেয়ারা টিপয়ে চা রেখে গেছে, দু'এক চুমুক দিয়ে অবশিষ্টটুকু খেতে ভুলে যায়। গল্পের খানিকটা অংশ পড়ে, তৃতীয় বারে চুমুক দেবার সময় চীৎকার করে ডাকে—ভজা এই ভজা।

বেয়ারা ভজা সন্ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বলে, বলি তোর মাথাটা কি খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে? জানিস আমি ঠাণ্ডা চা মোটেই পছন্দ করিনা।

প্রত্যুত্তরে ভজা বলে—হুজুর, চা যে অনেকক্ষণ এনে দিয়েছি।

এবারে অশোক বাস্তব জগতে ফিরে আসে, সে ভাবে, সত্যিই ত চা তার অনেকক্ষণ এসে গেছে, দুর ছাই সম্পাদকের কাজ আর ভাল লাগেনা। ভাল ভাল লেখা ছাপার কি উপায় আছে! বাংলা দেশে এত লেখক গজিয়ে উঠেছে। সাত বছর আগে যে যায়গায় এক এক মাসে এসে পৌঁছাত দশখানি গল্প, তার মধ্যে থেকে গল্প বেছে নেওয়া কত সহজসাধ্য ছিল। এখন রাশি রাশি গল্প আর প্রবন্ধ আসছে, কি করি মুস্কিল, তার পর আছে লেখক বন্ধু বান্ধবের দল, দু'চার জন লেখিকাও আছেন।

অশোকের অফিসের চিঠির বাক্সটা প্রকাণ্ড। প্রত্যেক সপ্তাহে কত ধরনের চিঠি আসে। তবে আধুনিক যুগের সম্পাদক অশোকের একটা কি গুণ, প্রত্যেকটা চিঠি সে পড়ে দেখতে চেষ্টা করে। স্তূপীকৃত কবিতা, গল্পের মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা মৌলিক গল্প বা কবিতা চোখে পড়ে যায়। কাগজে বেরবার সঙ্গে সঙ্গে লেখক বা লেখিকার নাম পাঠক-পাঠিকাদের মুখে মুখে চলতে থাকে, কেউ বলেন—চমৎকার গল্পটা। লেখিকার কি অন্তর্দৃষ্টি; অতি সামান্য ফিরিওয়ালাকে নিয়ে কি চমৎকার ভাবে গল্পটা ফুটিয়েছেন। সামান্য পাগলকে নিয়ে কি অপূর্ব্ব কবিতা।

মাঝে মাঝে দু' একটা হাসির গল্প হাতে পড়লে সম্পাদক মহাশয়ের আনন্দের আর সীমা থাকেনা। একবারের যায়গায় চার বার পড়ে ফেলেন গল্পটা। সম্পাদক মহাশয়ের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে এই ধরনের দু'একটি হাসির গল্প ও কবিতা চিত্তাকাশে রংএর ছোঁয়াচ লাগিয়ে যায়।

কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ ছাপবার সময় হয়ত চোখে পড়ে গেল গভর্ণমেন্টের প্রতি একটা তীব্র ইঙ্গিতের দিকে, সেই কয়েকটা কথার ব্যবহারের জন্যে সম্পাদকের শ্রীঘর বাস অনিবার্য্য। আশ্চর্য্য, চোখে পড়ে গেল তাই রক্ষে। অমনি ডাক পড়ল প্রবন্ধকারকে, খবর পাওয়া গেল কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমান গেছেন। trunk call করে তাঁকে ডাকিয়ে আনা হোল, কারণ তার পরের দিনই ছাপা শেষ করতেই হবে।

সম্পাদক মহাশয়ের কোন বিশেষ ব্যবসায়ী বন্ধু এসে ধরলেন: অশোক ভাই, আমার তেলের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাটা করে দিতেই হবে। উত্তরে অশোক বলে,—দেখি অজয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করে, বিজ্ঞাপন বিভাগের সম্পূর্ণ ভার তার ওপর।

অজয় বাবুর চুল কদম ফুলের মত ছাঁটা। গায়ে গলাবন্ধ কোট, চশমা জোড়া নাকের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেচে, ঘাড় নেড়ে বললেন, অসম্ভব, আর দুদিন আগে এলেননা। সামনের ডান দিকের অর্দ্ধেকটা পাতাই খালি ছিল।

প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোক বলেন—অশোক, যে করেই হোক একটু space-এর বন্দোবস্ত আমায় করে দিতেই হবে।

অশোক—অজয়বাবু পারবেন না? দেখুন না চেষ্টা করে। এ-আমার বিশেষ বন্ধু।

অজয়বাবু একটু হাসির আভাব মুখে টেনে এনে বলেন—আচ্ছা, পেছনের দিকে কোনরকমে যায়গা করে দিতে পারি কিনা দেখি।

জবাব শুনে ভদ্রলোক আশ্বস্ত হোলেন। নানা সম্প্রদায়ের লোককেই অশোকের মনরঞ্জন করতে হয়, তার ওপর সাহিত্য-সভায় সভাপতি হিসাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আছে।

একদিন সম্পাদক মহাশয় কংগ্রেসের আন্দোলন নিয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা শেষ করছেন, এমন সময় একজন শীর্ণা তরুণী এসে হলঘরটায় প্রবেশ করলেন। দেখলে মনে হয় অকাল বার্দ্ধক্য এসে দেখা দিয়েছে। মহিলাটিকে দেখলে বোঝা যায় বার্দ্ধক্যকে এড়িয়ে যাবার কি প্রচেষ্টা। তির্য্যক ভঙ্গীতে নীলাম্বরী শাড়ীতে দেহকে আবৃত করেছেন। বাঁকা সিঁথি; অত্যন্ত মিহি ও ক্ষীণ স্বরে তিনি আরম্ভ করলেন—আমার অনেক দিনের কল্পনা আপনার সঙ্গে দেখা করবার, আমার আজ পরম সৌভাগ্য, আপনার মত জ্ঞানী লোকের সাক্ষাৎ আজ মিলল।

ভদ্রমহিলার ভাষণে অশোক বেশ একটু বিচলিত হয়ে ভাবে,—কি ব্যাপার, ভদ্রমহিলার কি মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয়েছে। অশোককে কোন উত্তর দিতে সময় না দিয়ে, (তরুণীটি) তিনি ব্যাগ থেকে সুন্দর একখানি Water Colour-এ আঁকা ছবি বার করলেন। ছবিটার বিষয়বস্তু হচ্ছে—বিরাটকায় এক নারী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সামনেই এক কারা-প্রাচীর, নারীর শরীরের দৈর্ঘ্য প্রাচীরকেও অতিক্রম করে গেছে; অবগুণ্ঠন তার খুলে পড়েছে, চোখদুটির মধ্যে আছে অপূর্ব্ব বিস্ময়।

অশোকের মন ছবির মধ্যে তলিয়ে গেল। তার সম্পাদকীয় জীবনে অনেক ছবি ছাপিয়েছে, কিন্তু কোন ছবিই তার মনের ভেতর গভীর রেখাপাত করতে পারে নি। অশোক সাহিত্যিক হলে হবে কি, শিল্পের বিষয়েও সে একজন পাকা সমজদার। ছবিখানিকে দু'হাতে ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করে আর ভাবে—যে-নারী সংস্কারের কারাপ্রাচীরের মধ্যে আশৈশব থেকে প্রতিপালিত হয়েছে, তার কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে খেয়ালের বশে কারা-প্রাচীরের বাহিরে বৃহত্তর সংস্কারমুক্ত জগৎকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে।

এবার মৌন ভঙ্গ ক'রে অশোক মহিলাটির দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল—চমৎকার, চমৎকার, এ-ছবি আমি পূজার সংখ্যায় ছাপিয়ে দেব ;-আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভদ্রমহিলা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে অশোকবাবুর দিকে তাকিয়ে ছবিটি সমর্পণ করে বেরিয়ে গেলেন।

অশোক বেশ' বুঝতে পারল, মহিলাটির জীবনের সঙ্কল্প এতদিনে সার্থক হ'তে চলেছে।

অশোক চুরুটে একবার ক'রে টান দেয়, আর ভাবে—বাইরের সৌন্দর্য্যটা এমন কিছু বড় নয়। হয়ত কোন নারীর বাইরের রূপ, সৌন্দর্য্য মানুষকে সাময়িকভাবে বিচলিত করতে পারে ; কিন্তু তার অন্তরের সৌন্দর্য্যের দীনতা অল্প দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে।

অশোকের ঘরে কত বিচিত্র লোকেরই না সমাগম হয়। দু'একবার সন্দেহক্রমে পুলিশের খানাতল্লাসী পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। অশোক এক একবার ভাবে—সেরকম কোন উপযুক্ত সহকারী সম্পাদক পেলে, তার হাতে কাগজের সম্পাদনার ভার চাপিয়ে কোন শৈলাবাসে অথবা সমুদ্রতীরে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসে। সাহস হয় না। যদি সম্পাদনার দিক থেকে কোন ত্রুটি হয়।

অশোকের এই কর্ম্মময় জীবনে হঠাৎ কেমন একটা অভিনব ঘটনা ঘটল।

বর্ষাকাল। ঝমঝম্ করে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। এমন সময় ডাকপিয়ন ভিজতে ভিজতে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে অশোকের হাতে একটা registry চিঠি দিল। অশোক চিঠিটা খুলে আগ্রহের সঙ্গে পড়তে আরম্ভ করে—

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনাকে কত যে কবিতা পাঠিয়েছি ; গল্পের সংখ্যাও কম পাঠাই নি। যদি সাহিত্যিক অথবা কবি হবার যোগ্যতা না থাকে তা হ'লে দয়া ক'রে কি কবিতা বা গল্পের কাঠামো বা বিষয়-বস্তুর সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবেন না ? চিঠির উত্তরের আশায় রইলাম। অনুমতি পেলেই আপনার শরণাপন্ন হ'তে পারি। আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানবেন। ইতি—

প্রণতা—
গীতিকা দেবী।

অশোক চিঠিটা পড়ে শেষ ক'রে আসবার অনুমতি-পত্র লিখে post করে দিল।

অশোক অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু ওই নামের কোনো লেখিকার লেখা কোন কবিতা অথবা গল্প পড়েছে ব'লে সে মনে করতে পারল না।

কলিংবেল টিপতেই বেয়ারা এসে হাজির।

অশোক—মণিশ বাবুকো বোলাও।

মণিশ বাবু সহ-সম্পাদক। গল্প ও কবিতা নির্ব্বাচনের দিক থেকে তাঁর কিছুটা অভিজ্ঞতা জন্মেছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত' সম্পাদক হ'বার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে পারেন।

মণিশ এসে সম্পাদকের ঘরে প্রবেশ করতেই, অশোক চুরুটে একটা লম্বা রকমের টান দিয়ে পাশের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত ক'রল তাঁকে।

মণিশ বাবু বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার বলুন ত ?

অশোক চিঠিটা মণিশ বাবুর হাতে দিয়ে ব'লল—পড়ে দেখুন।

চিঠি পড়া শেষ হ'তে অশোক প্রশ্ন করল—আচ্ছা, ওই নামে কোন লেখিকা ক'বার গল্প ও কবিতা পাঠিয়েছিলেন, সে কথা কি আপনার স্মরণ আছে ?

মণিশ বাবু মাথার পিছন দিক চুলকাতে চুলকাতে বললেন,—ভেবে দেখি।

কয়েকবার চিন্তা ক'রে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—ঠিক হয়েছে, দু'মাস আগে ওই লেখিকার একটা কবিতা এসেছিল, ওটা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, কারণ এই বৈজ্ঞানিক জগৎকে উদ্দেশ্য করে লেখা কবিতাগুলি, তবে সেগুলি রসোত্তীর্ণ হয়নি। মনে হয়েছিল যেন নিছক কয়েকখানি ফটোগ্রাফের reprint।

অশোক কোন প্রত্যুত্তর করল না। শুনে গেল কথাগুলি।

শ্রাবণমাসে গীতিকা দেবীর লেখা আর একটি গল্প এসে পৌঁছাল। অশোক খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ে গেল গল্পটি। গল্পটির নায়ক হ'ল একজন গায়ক, জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে কত সাধনা ক'রে তাকে বড় হ'তে হয়েছে, কত অন্তরায় ছিল তার বড় হ'বার পথে।

গায়কের জীবনের বর্ণনা বেশ চলেছে, হঠাৎ কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক চরিত্রের পূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে করে গল্পের শ্রী একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। অশোকের অনুমান করা শক্ত হয়ে দাঁড়াল, গল্পের প্রকৃত নায়ক কে !

যাই হোক—লেখিকাকে সে এক উপদেশ-পূর্ণ চিঠি লিখে জানাল—সাধনার প্রয়োজন।

নায়কের পূর্ণ বিকাশ দেখাতে হবে অল্প পরিসরের মধ্যে, ইত্যাদি।...কেবল নায়কের চরিত্র বিকাশের জন্য দু'একটা চরিত্রের অবতারণা করা যেতে পারে।

চিঠিটা পেয়ে গীতিকা দেবী পরম আনন্দের সঙ্গে সেটা খুলে ফেলল। মুখে খুশীর হাসি, মনে মনে ভাবে—সম্পাদক মহাশয় হয়ত' তার গল্প পড়ে খুশী হয়ে প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছেন। গীতিকা দেবীর চেহারা অপূর্ব্ব, চুল মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত নেমে গেছে, ঈষৎ কুঞ্চিত, চোখগুলি টানা টানা, একটা স্বপ্নের আবেশে চোখ দুটি বিভোর হয়ে আছে, উন্নত বক্ষ, অটুট স্বাস্থ্য। সুন্দরীর সব কটি লক্ষণ তার মধ্যে রয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের দেহের সৌন্দর্য্যের দিকে তাকিয়ে নিয়ে চিঠির প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

কয়েক লাইন পড়ার পর মুখখানা তাঁর বিবর্ণ হয়ে গেল. চিঠিখানা হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। দুটি হাত মুঠো করে ওপরের দিকে আস্ফালন করে বলল, না·· না, গল্প লেখা, কবিতা রচনা আমার হ'বে না, আমার জীবনের সব সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়ে গেল। আবার মনকে শক্ত করে নিয়ে সে ভাবে—তার দুঃখ

করার মত কিছু নেই ত। সম্পাদক মহাশয় তাকে ত নিরুৎসাহ করেননি; তার লেখার বিশেষ ত্রুটির দিকটাই সামনে মেলে ধরেছেন।

গীতিকাদেবীর অবস্থা স্বচ্ছল; মায়ের একমাত্র মেয়ে সে। বাবা বছর দশেক আগে মারা গেছেন। মা আধুনিকা। মেয়ের চলার পথে কোন রকম বাধা দেন না। তাঁর ইচ্ছে—স্বাধীন চিন্তা নিয়ে, স্বাধীন মনোবৃত্তি নিয়ে মেয়ে তাঁর বড় হয়ে উঠুক।

প্রসাধন শেষ করে একটা হাল্কা violet রংএর শাড়ী পরে parasole হাতে নিয়ে, বেরিয়ে পড়ল সম্পাদক মহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে। সামনে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে উঠে পড়ে বলল, চল কলেজ ষ্ট্রীট মে।

ট্যাক্সি ফাল্গুনী মাসিক পত্রিকা অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। গীতিকা দেবী ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে, অফিসের মধ্যে গিয়ে, বেয়ারার হাতে কার্ডখানা বার করে দিয়ে বলল, সাবকো মেরা সেলাম দো।

বেয়ারা এসে তাকে সঙ্গে ক'রে অশোকের ঘরে পৌঁছে দিল। গীতিকা ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করল।

অশোক—বসুন।

গীতিকা—অনেক দিন থেকে জল্পনা-কল্পনা করি, আপনার সঙ্গে দেখা করবার। ভাবলাম যা হয় হোক, আজ ফাল্গুনীর অফিসে যাবই, বড় জোর সম্পাদক মহাশয় হয়ত' বলবেন—সময় নেই, পরে দেখা করতে বল।

অশোক আর গম্ভীর হ'য়ে থাকতে পারে না, হেসে ফেলে, সে হাসিতে গীতিকাও যোগ দেয়।

গীতিকা—দেখুন, আপনি আমায় যে উপদেশপূর্ণ চিঠিখানা দিয়েছেন, তার জন্যে আপনার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

অশোক—কি আর এমন উপদেশ দিয়েছি আপনাকে। আপনার ভাষা সুন্দর, প্রকাশভঙ্গীও চমৎকার, সেগুলির দিক থেকে আমার বলবার কিছু নেই। গল্পের আঙ্গিকের দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষের সঙ্গে মিশবেন, আলোচনা করবেন, দেখবেন আপনার অভিজ্ঞতা কত বেড়ে গিয়েছে।

সে দিন বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আলাপ ক'রে গীতিকা দেবী বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ী ফেরার পথে গীতিকা দেবী ভাবেন, অশোক বাবুর সঙ্গে আলাপে সত্যিই খুব উপকৃত হোলাম, কি সুন্দর লোকটি, যেমন চেহারা, তেমন কথাবার্ত্তা।

বাড়ী ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে গীতিকা দেবী লেখকের একখানা গল্পের চয়ন নিয়ে তাতে মনোনিবেশ করলো। বইখানা গত কাল সন্ধ্যাবেলায় নিউমার্কেট থেকে কিনে এনেছেন। বইখানায় তাঁর এত মন বসে গিয়েছে যে, শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর অন্য দিকে লক্ষ্য নেই।

মা দু'-তিন বার খাবার-ঘর থেকে ডাক দিলেন—গীতু খাবে এস। কথা তাঁর কাণে প্রবেশ করে না। অনেকবার ডাকতেই সে বলে—যাই মা, সামান্য একটু বাকী আছে, এখুনি যাচ্ছি।

মাঝে মাঝে গীতিকা দেবী অশোক বাবুর সঙ্গে দেখা করতে যান। সাহিত্যের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান এখন অনেক বেড়ে গেছে।

অশোক বাবুর এটা দৃষ্টি এড়ায় না, দু'একখানা ছোট গল্প লিখে অশোককে গীতিকা দেবী দেখিয়েছেন। দেখে অশোক বলেছে—বেশ হয়েছে, এবারের সংখ্যায় ছাপিয়ে দিই, কেমন?

গীতিকা—না, না, এখনও আমার মন খুশী হচ্ছে না গল্প লিখে।

অশোকের আচরণে গীতিকা মুগ্ধ হ'য়ে ভাবেন—আমায় হয়ত অশোক বাবুর কিছুটা তবে ভাল লেগে থাকবে। এবার থেকে বেশভূষা প্রসাধনে দস্তুর মত মনোযোগ দিয়েছেন। কোন দিন নীলাম্বরী সাড়ী তার ওপর টকটকে রংএর ব্লাউজ পরেন। গলায় ঝুলিয়ে দেন Amber-এর মালা।

অশোক বাবুও তাঁর সঙ্গে একান্ত পরিচিতের মতই আলাপ করেন।

সেদিন বিছানায় শুয়ে একটা সুন্দর প্লট তাঁর মাথায় এল, সঙ্গে সঙ্গে পেনে কালি ভরে লিখতে বসে গেলেন।

গল্পের নায়ক হোল একটি রাখাল-বালক, নিজের গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে এক চাষার বাড়ীতে রাখালের কাজ নিয়েছে, সুন্দর বাঁশী বাজায় আর নাচতেও পারে চমৎকার। মাঠে মেষ, গরু চরায় আর প্রাণভরে পাহাড়ীসুরে বাঁশী বাজায়, একদিন এক রাখালী তার বাঁশীর মূর্চ্ছনায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার সামনে এসে বাঁশী শুনতে লাগল। রাখালীর চোখ দুটো হরিণের মত টানা টানা, কোমরে কাপড়ের আঁচল জড়ান। খোঁপা ঘেঁটু ফুলের গুচ্ছে সাজান। পরিচয় হয়ে গেল তাদের। রাখাল যে তাকে ভালবেসে ফেলেছে—এ কথা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনা।

একদিন সে রাখালীকে বলে ফেলল—তোকে সত্যিই আমি ভালবাসি।

রাখালী—আরে দূর, আর দশদিন পরেই যে আমার বিয়ে।

তা পরের দিন থেকে আর রাখালীকে মাঠে দেখা যায় না। রাখালের বাঁশীও জমে ওঠে না। গল্পটা অশোকের কাছে পাঠাতেই চৈত্র মাসের সংখ্যায় সে বার করে দিলে, পাঠকরা সকলেই পড়ে চমৎকৃত হোল।

গীতিকা দেবীকে গল্পের সম্বন্ধে প্রশংসা করে একটা চিঠিও দিলেন অশোক।

চিঠিখানা পড়ে আনন্দিত চিত্তে অশোকের দর্শন-মানসে বেরিয়ে পড়েন গীতিকা দেবী। যাবার পথে চিন্তা করেন—অশোক বাবু সম্ভবতঃ অবিবাহিত। ওঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে যদি সেরকম বুঝি, সুযোগ বুঝে বিয়ের কথাটা পেড়ে ফেললে কি হয়। আবার ভাবেন—না, না, তা হয় না। এই ধরণের কল্পনার জাল বুনতে বুনতে গীতিকা এসে অশোকের অফিসে পৌঁছালেন।

অশোক তাকে রীতিমত অভ্যর্থনা করলেন। আধুনিক গল্প, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হচ্ছে—এর মাঝে গীতিকা দেবী প্রশ্ন করলেন,—আচ্ছা অশোক বাবু, আপনার কি বিয়ে হয়েছে?

অশোক কিছুটা হেসে প্রশ্ন করল,—কেন বলুন ত?

গীতিকা দেবী—এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

আশ্চর্য্য, আপনি ফাল্গুনীর গ্রাহক, গত মাসে আমার বিয়ের সংবাদটা তাতে ছাপা হয়েছে, লক্ষ্য করেন নি।

কথাটা শুনে গীতিকা দেবীর মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। কিছুটা আলাপ করে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে প'ড়ল ধীরে ধীরে।

এর পর অনেক সন্ধ্যা, অনেক প্রভাত কেটে গেছে, ফাল্গুনী পত্রিকার অফিসে গীতিকা দেবীর আর কোন গল্প আসে নাই।

আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বৈঠকে ভারতের অবধারিত নীতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামী ইংরাজী নববর্ষের প্রথম পাদে যুক্তরাষ্ট্রে একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য বৈঠক বসিবে। নিখিল জগতে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং উপার্জ্জন-সমর্থ ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য কর্ম্ম-সংস্থান—এই বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়ের একটি সুসমঞ্জস কর্ম্মসূচী প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত গত ১লা অক্টোবর তারিখে লণ্ডনে বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রান্তর্গত দেশসমূহের একটি বৈঠক বসিয়াছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতে শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হেতু অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকার ঐ-বৈঠকে কোন জাতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন নাই। এক পক্ষ পরে গত ১৫ই অক্টোবর সম্মিলিত জাতিসমুচ্চয়ের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক শাখা কর্তৃক আহূত একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রস্তুতকারী (Preparatory) বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠকে বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রান্তর্গত দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান জাতীয় ভারত-সরকারও সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞ-সম্বলিত একটি বলিষ্ঠ প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই বৈঠকে আলাপ-আলোচনার ফলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবগুলির সমবায়ে যে সনন্দের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, আগামী সর্ব্বজাতির প্রতিনিধি-সমন্বিত আন্তর্জ্জাতিক মুখ্য বৈঠকে তাহার বিচার-বিশ্লেষণান্তে তাহাকে কায়েমী সনন্দে পরিণতি প্রদান করা হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে এবং আয়োজনে এই নিখিল জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্ম্মসংস্থান-সংক্রান্ত আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের অধিবেশন হইবে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতকগুলি গুরুতর প্রস্তাব সর্ব্বজাতির বিচার-বিবেচনার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্ব্বসাধারণ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে মূল প্রস্তাবগুলি এইরূপ:—(১) শুল্ক (Tariff) এবং হিস্‌সা (Quota) মূলক ব্যবসায়ের রাষ্ট্র-প্রতিবন্ধকগুলিকে খর্ব্ব; রাষ্ট্র-কর্তৃক রপ্তানীকারীকে প্রদত্ত অর্থসাহায্যের (Subsidy) তত্ত্বাবধান, এবং ব্যবসায়ের অন্তরস্বরূপ অত্যধিক স্থানীয় কর পরিহার করিতে হইবে। (২) নিখিল জগতের বাজারগুলির বিভেদকারী এবং প্রতিযোগিতা খর্ব্বকারী বেসরকারী কারবারী ষড়যন্ত্রের (cartel) পরিবর্জ্জন। (৩) নিখিল জগতের বাজারে কোন বিশেষ পণ্যের অভাব বা অনটন হইলে, সার্ব্বত্রিক চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ আবশ্যকানুযায়ী অল্পকালস্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক পণ্য সরবরাহ চুক্তির ব্যবস্থা। (৪) কোন দেশ বা জাতিবিশেষের নিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সংসাধনার্থ আমদানী বন্ধ, কিংবা অর্থ-সাহায্যদ্বারা রপ্তানী-প্রচেষ্টামূলক কূটনীতি নিবারণার্থ সর্ব্ব জাতির সমবেত সঙ্কল্প ও চুক্তি।

নিখিল জগতের সর্ব্বজাতিই যে এই সকল সর্ত্তে সম্মত হইবে, যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিতই তাহা আশা করেন না, কারণ এই ভূমণ্ডলে শিল্প-বাণিজ্যে সমুন্নত জাতিগুলির তুলনায় শিল্প-বাণিজ্যে অর্দ্ধোন্নত ও অনুন্নত জাতিসমূহের সংখ্যা ন্যূন নহে। ভারতবর্ষ এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। যুদ্ধকালে প্রবর্ত্তিত ইজারা-ঋণমূলক পারস্পরিক বাধ্যবাধকতার শেষ চুক্তিপত্রে যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষকে এ বিষয়ে বিশেষ আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধান্তে ভারতে যে ব্যাপকভাবে বিপুল শিল্প ও কৃষি সমুন্নয়নের প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রভূত পরিমাণে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যাহাতে উভয় দেশের পারস্পরিক কল্যাণ সাধিত হয় তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্য মহান্, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের সহযোগ সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রবলের অনুকূল এবং দুর্ব্বলের প্রতিকূল হয়। এই হেতু সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষকে আত্মশক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। ভারতের নবনিযুক্ত অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকার এ বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হইয়াছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে শাসনভার গ্রহণ করিয়াই অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার নয়া দিল্লীতে একটি ব্যবসায়-নীতি-নির্দ্ধারক সমিতি আহ্বান করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রদেশের সংশ্লিষ্ট সরকারী মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী এবং বিশিষ্ট বেসরকারী শিল্পী, ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গের এই অধিবেশনে ভারতের নূতন বাণিজ্য-সচিব অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকারের সমবেত শিল্প-বাণিজ্যনীতি ঘোষণা করেন। নিখিল ভারতের শান্তি ও স্বাধীনতা সমুন্নয়নার্থ কেন্দ্রীয় সরকার সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে যোগদান করিবেন, এবং শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহের সর্ব্বতোমুখী উন্নতির নিমিত্ত সর্ব্ববিধ সমীচীন সুযোগ-সুবিধার দাবী করিবেন, যাহাতে অনুন্নতের উন্নতির সহিত সমুন্নত দেশসমূহেরও কালক্রমে অধিকতর কল্যাণ সাধিত হয়। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সর্ব্বপ্রধান প্রচেষ্টা হইবে, ভারত হইতে পরিণত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি। অর্থাৎ আমাদের দেশের সুপ্রচুর বিবিধ কাঁচা মালকে জাতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানে, জাতীয় শিল্পী-কারিকর দ্বারা, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাকা মালে পরিণত করিয়া, আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন সাধনান্তর, উদ্বৃত্ত পণ্যের উত্তরোত্তর অধিকতর রপ্তানীদ্বারা দেশের ধনসম্পদ্ বৃদ্ধি ও জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের বর্ত্তমান অতি-হীন মানকে স্বচ্ছলতার পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠা। এই সকল উদ্বৃত্ত পণ্যের স্বাভাবিক বিক্রয়ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশদ্বয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত। প্রয়োজনানুযায়ী শুল্ক ও সরকারী বৃত্তি সাহায্যে বিদেশ হইতে আনীত অনাবশ্যক অথবা স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের অনিষ্টকারক পণ্যের সংখ্যা এবং পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অতি-স্বল্প আয়ের যে অংশ অনর্থক বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত হয়, তাহাকেও সঞ্চয় ও সংস্থান দ্বারা দেশের কল্যাণকর কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিয়োজিত করিলে দেশের ও দেশবাসীর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে এবং আমাদের স্বদেশের শিল্পকে নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান এবং পুরাতনের প্রবর্দ্ধন দ্বারা অধিকতর উন্নত ও বিস্তৃত এবং ব্যাপক করা যাইবে।

ভারতের বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্ম্মসংস্থান

এবং অন্যান্য বিষয়েও সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার পক্ষপাতী। কিন্তু বর্ত্তমানে, আর্থিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে, যে সকল শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত দেশ সমুন্নত দেশগুলির উপর নির্ভরশীল, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির আন্তরিক এবং গঠনমূলক প্রচেষ্টা ব্যতীত কোন আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার পরিকল্পনা কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। যে কোন প্রকারে নিখিল জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা নহে। সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা এবং প্রতিষ্ঠানের এবং আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, সর্ব্বদেশের সর্ব্বজাতির সর্ব্বসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন পূর্ব্বক তাহাদের জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়ন এবং বিশেষ ভাবে জগতের অনুন্নত জাতিগুলির অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিয়া তাহাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা সাধন। দূরদৃষ্টি দ্বারা পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে আমরা সহজেই অনুধাবন করিতে পারি যে, অনুন্নতের উন্নতি সাধনপূর্ব্বক জগতে শান্তি, স্বাস্থ্য ও শৃঙ্খলা বিধান করিতে না পারিলে, সমুন্নতেরও সুখ, স্বাস্থ্য ও শান্তি সুদুর্লভ। সামাজিক জীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি না ঘটিলে, কোন সম্প্রদায়, অথবা জাতিবিশেষের অক্ষুণ্ণ সুখ-শান্তি অসম্ভব। ব্যষ্টিকে লইয়াই সমষ্টি। সুতরাং, নিখিল জগতের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য-বৈঠকে ভারতের জাতীয় প্রতিনিধিগণ সর্ব্বজাতির সর্ব্বশ্রেণীর লোকের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন পরিণামে-শুভকর নীতিই সমর্থন করিবেন।

ঢালাওভাবে প্রচলিত শুল্ক হ্রাস, কিংবা অন্যান্য তথাকথিত ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্তরায় (Trade barriers) দূর করিলেই যে, দ্রুত ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্বজনহিতকর প্রসার ও উন্নতি ঘটিবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই। পরন্তু এইরূপ অসমীচীন ব্যবস্থা অনুন্নত দেশগুলির উন্নতি ব্যাহত করিবে, এবং তাহাদের অগণ্য জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি এবং ক্রয়শক্তি নিস্তেজ করিবে। আমাদের বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, অনুন্নত দেশগুলিতে বর্ত্তমানে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত নূতন ও দুর্ব্বল পুরাতন শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা সংরক্ষণমূলক শুল্ক-প্রকরণ ও রাষ্ট্রপ্রদত্ত অর্থসাহায্য প্রভৃতি বিবিধ উপায়, —যাহা তাহাদের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সাধনার্থ এবং সমষ্টিগত ভাবে নিখিল জগতের আর্থিক আয় এবং উত্তরোত্তর অধিকতর কর্ম্মসংস্থান দ্বারা বেকারসমস্যার সমাধানে সক্ষম,—যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে হইবে। যাহাতে তাহাদের অপব্যবহার না হয়, তৎপ্রতি অবশ্য সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং তাহাদের যথাযোগ্য ব্যবহার সমর্থন করিতে হইবে। আগামী আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য-বৈঠকে ভারতের জাতীয় প্রতিনিধিগণ মুখ্যতঃ এই চারিটি নীতি অবলম্বন করিবেন:— (১) জনসাধারণের আর্থিক উন্নতিদ্বারা তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন-হেতু অপরিহার্য্য শুল্ক-প্রকরণ এবং রাষ্ট্রকর্ত্তৃক অর্থ সাহায্য প্রদান প্রভৃতি অর্থনৈতিক উপায় অবলম্বন করিবার অধিকার ভারত সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিবে। (২) ভারতের একরূপ একটি বাণিজ্য-নৌবহরের অতি প্রয়োজন; যাহা তাহার উপকূল ও বৈদেশিক উভয় প্রকার বাণিজ্য-সংবাহনের পক্ষে যথোপযুক্ত। (৩) বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতিসাধন কল্পে ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের গুরুত্ব কখনই খর্ব্ব করা হইবে না। (৪) ভারত এইরূপ কোন ভোট-নীতি সমর্থন করিবে না, যাহার ফলে পরিকল্পিত আন্তর্জ্জাতিক সংগঠনে, অর্থনৈতিক হিসাবে অনুন্নত দেশগুলি আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য-নীতি অবলম্বনে দৃঢ়ভাবে তাহাদের মতামতের প্রভাব পরিচালন করিতে অসমর্থ হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, যুদ্ধান্তে যুদ্ধোত্তর জগতে শান্তিপূর্ণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনার্থ কয়েকটি সঙ্কটসঙ্কুল সমস্যার সমুদ্ভব ঘটিয়াছে। তাহাদের সমীচীন সমাধানের উপর জনসাধারণের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান—বেকার-সমস্যা; এই দুরূহ সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি প্রয়োজন। যুদ্ধের সময় বহুসংখ্যক যুদ্ধ-শিল্পে বহু লোক নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধোপকরণের প্রয়োজনের নিবৃত্তির সহিত এই সকল শিল্পে নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ লোককে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করা হইয়াছে। যুদ্ধশিল্পকে শান্তিকালীন অসামরিক শিল্পে পরিবর্ত্তিত করিয়া জনসাধারণের আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদনে যুদ্ধকালীন বিপুল প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখিতে না পারিলে, বেকার-সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করিয়া, বিষম সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিবে। এই অবশ্যম্ভাবী অপরিহার্য্য অর্থনৈতিক বিপ্লব নিবারণার্থ সর্ব্বদেশে আভ্যন্তরীণ কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত সংগঠন ও সম্প্রসারণ হেতু বিপুল প্রচেষ্টা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত সম্মিলিত-জাতিসমূহের রাজনৈতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক খাদ্যসংস্থান, আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নিয়ন্ত্রণ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ ও নির্ব্বিঘ্ন সহযোগিতামূলক পরিচালন সম্পর্কে যুদ্ধবিরতির বহু পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতাসূচক প্রতিকার ও প্রতিবিধান-প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছেন।

পঞ্চবিংশতি বর্ষের মধ্যে পর পর দুইটি পৃথিবীব্যাপী সর্ব্ববিধ্বংসী যুদ্ধের অভিঘাতে জগতের সর্ব্বত্র জাতীয় স্বতন্ত্রতার পরিবর্ত্তে আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী ও আন্তরিক সহযোগিতার অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য্য প্রয়োজন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত হইয়াছে। পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় যুদ্ধের মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতার ফলে জগতের প্রবল-দুর্ব্বল সকল জাতিই যেন এক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যৌথ পরিবারে পরিণত হইয়াছে। তথাপি, জাতীয় স্বার্থের প্রকৃষ্ট প্রয়োজনে কোন-কোন ক্ষেত্রে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিবার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিভিন্ন। শাসন-তন্ত্রও বিভিন্ন। সুতরাং তাহাদের কৃষ্টিগত ও কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রয়োজন ও পরিণতিও বিভিন্ন। গণতান্ত্রিক দেশের সহিত পরাধীন দেশের পার্থক্য প্রচুর; আবার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে অত্যুন্নত দেশের সহিত ঐ সকল বিষয়ে অনুন্নত দেশের প্রভেদ প্রভূত। সুতরাং কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে যুক্তরাজ্য কিংবা যুক্তরাষ্ট্র যেরূপ উদার শুল্কনীতি অবলম্বন করিতে পারে, ভারতের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যকে

যে শতাধিক কোটি টাকা ঋণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার কয়েকটি সর্ত্তের সহিত বৃটিশ-শাসনাধীন ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যুদ্ধান্তে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার সাধনার্থ জাতিসমূহের মধ্যে স্ব স্ব দেশের অন্তর্গত কৃষি-শিল্পের প্রগতিকে ভিন্ন-দেশীয় আমদানি-পণ্যের অসঙ্গত প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে-সকল-শুল্ক প্রাচীর (Tariff wall) রচিত হইয়াছে, তাহার এবং অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক (Trade barriers) দূরীকরণই প্রথম ও প্রধান। এই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বোক্ত আন্তর্জ্জাতিক বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। এই বৈঠকে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্ববিধ বাধা-বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া বাণিজ্যের সাহায্যে সর্ব্বদেশের কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারদ্বারা বহু লোকের কর্ম্ম-সংস্থান করিয়া বেকার-সমস্যা সমাধান করিবার প্রচেষ্টা হইবে। ইহা অবশ্য সত্য যে, সর্ব্বত্র জনসমূহের জীবনযাত্রার ধারা শীঘ্র উন্নত করিতে না পারিলে জগতে স্থায়ী শান্তি সংস্থাপনের কোন সম্ভাবনা নাই।

আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং প্রায় প্রতি আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে আমরা দেখিতে পাই যে,প্রত্যেক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক কূটনীতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। আসন্ন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য-বৈঠকেও এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটিবে না। সর্ব্বদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একরূপ নহে; বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থা ও ব্যবস্থা। দুই মহাযুদ্ধের ব্যবধানে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিরোধকল্পে যে-সকল বিধি-ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছিল, তাহার ন্যায়সঙ্গত প্রতিকার যদি এই আসন্ন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বিশেষ কোন আপত্তির কারণ ঘটিবে না। কিন্তু এই বৈঠক যদি কোন দেশ-বিশেষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশিষ্ট অবস্থা ও ব্যবস্থা বিবেচনা করিয়া তদুপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থার অনুমোদন না করেন, তাহা হইলে বিচার-বিভ্রাট ও মতদ্বৈধ ঘটিবে। শিল্পে সমুন্নত দেশগুলি যদি শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিতে প্রবর্ত্তিত তত্তদ্দেশীয় অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য রক্ষণশুল্কপ্রকরণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া স্ব স্ব দেশের উন্নত কৃষি-শিল্পকে অধিকতর উন্নত ও বিস্তৃত করিবার উদ্দেশ্যে অনুন্নত দেশগুলির আত্ম-প্রতিষ্ঠাশীল কৃষি-শিল্পকে পঙ্গু করিয়া ঐ সকল দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার কূট-কৌশল অবলম্বন করে, তাহা হইলে বিবাদ-বিরোধ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হইবে এবং আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের অবাধ-বাণিজ্য বিস্তারের ও পৃথিবীব্যাপী বেকার-সমস্যা সমাধানের সাধু উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। প্রত্যেক দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া অনুন্নত দেশসমূহের প্রগতিশীল কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যপ্রচেষ্টার অন্তরায়হীন বিধি-ব্যবস্থাদ্বারা সর্ব্ব দেশের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে। অনুন্নতকে উন্নত না করিলে, সমুন্নতেরও সম্যক্ কল্যাণ সাধিত হয় না। কিন্তু ইঙ্গ মার্কিণ-প্রমুখ প্রবল জাতিগুলি স্ব স্ব দেশের শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ও প্রসারের প্রতি শ্যেনদৃষ্টি-সম্পন্ন। ফলে, আসন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য বৈঠকে বিচার-বিবেচনার নিমিত্ত যুক্তরাষ্ট্র যে-সকল প্রস্তাব পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা ভারত ও চীন প্রভৃতির ন্যায় শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত দেশের অনুকূল নহে—সেগুলি শিল্পে সমুন্নত দেশসমূহের অবস্থা ও ব্যবস্থার বিশেষ অনুকূল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবগুলি পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ শিল্পে অত্যুন্নত এবং শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে যে প্রচণ্ড সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক প্রভেদ-পার্থক্য আছে, তৎপ্রতি আদৌ অবহিত হয়েন নাই। পরন্তু, তাঁহারা শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির প্রকৃষ্ট স্বার্থের প্রতি বিমুখ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমাজমাত্রেই অনুন্নতকে উন্নত না করিলে সমুন্নতেরও কল্যাণ নাই। সর্ব্ব দেশের এবং সর্ব্ব সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে, সর্ব্বসাধারণের আর্থিক ও কায়িক অবস্থার, সর্ব্বসমতুল না হউক, অন্ততঃ একটি যুক্তিসঙ্গত নিদিষ্ট-নির্দ্ধারিত মানকে লক্ষ্যে রাখিয়া, জনসাধারণের জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিতে হয়। এবং তাহার একমাত্র উপায় অনুন্নত দেশগুলির কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্য যাহাতে দ্রুত উন্নতি ও বিস্তার লাভ করে তদুপযুক্ত নিয়ম ও নীতি অবলম্বন। বস্তুতঃ শিল্পে সমুন্নত দেশগুলির সর্ব্বতোভাবে দেখা কর্ত্তব্য যে, অনুন্নত দেশগুলির অর্থ-নৈতিক উন্নতির পথে কোন বাধাবিঘ্ন সমুপস্থিত না হয়; তাহাতে যদি তাহাদের নিজেদেরও কিছু কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়—নিখিল জগতের ও সমগ্র মানবসমাজের অকুণ্ঠিত কল্যাণসাধনার্থ তাহাও শ্রেয়ঃ। অনুন্নত দেশগুলির স্থায়ী হিতকল্পে সেই সকল দেশে রক্ষণ-শুল্কের সাহায্যে তাহাদের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া, তত্রত্য কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যকে পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। ইঙ্গ-মার্কিণ-প্রমুখ প্রবল-প্রতাপান্বিত দেশগুলিকে এমন শিল্প-বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে অনুন্নত দেশগুলির বিভিন্ন ও বিশিষ্ট অবস্থার বিভিন্ন পর্য্যায় উন্নতি ঘটে। সুতরাং, একই প্রকার শিল্প-বাণিজ্য-নীতি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য-বৈঠকে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্র প্রগতির অনুকূল বিধি-বিধান নির্দ্ধারিত করিতে হইবে; অথচ, সকলের সহিত আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম-নীতির যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকিবে। শিল্পে সমুন্নত দেশগুলিকে সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সহিত শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য ও সমর্থন দিতে হইবে।

ফলতঃ আন্তর্জ্জাতিক বিধি-ব্যবস্থার সফলতা নির্ভর করিবে, শিল্পে অনুন্নত দেশগুলির অনুন্নত অবস্থার ক্রমোন্নতির উপর। যাহাতে শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের দ্রুত ও দৃঢ় উন্নতি ঘটে, শিল্পে-সমুন্নত দেশগুলিকে সেইরূপ বিধি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন ও প্রবর্দ্ধন করিতে হইবে। ব্যষ্টির উন্নতিতেই সমষ্টির উন্নতি; সুতরাং উন্নত-অনুন্নত অবস্থানির্ব্বিশেষে, সকল দেশের যুগপৎ উন্নতি বিহিত না হইলে, সমগ্র জগতের অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। সমাজ-দেহের কোন অংশ দুর্ব্বল কিংবা পঙ্গু হইলে, সমগ্র দেহ অসুস্থ হইবে,—ইহাই চিরন্তন স্বাভাবিক নিয়ম। বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক ইতিহাস আলোচনা

করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সংরক্ষণ-নীতিই (Protection) অর্থাৎ শুল্ক অথবা রাষ্ট্রপ্রদত্ত অর্থ-সাহায্য (Subsidy) দ্বারা শিল্প-সংরক্ষণ-প্রচেষ্টাই অধিকাংশ শিল্পে সমুন্নত দেশগুলির উন্নতির মুখ্য কারণ। এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের স্ব স্ব শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শুল্ক অথবা রাষ্ট্র সাহায্য দ্বারা সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিতে হইতেছে। এই সকল সমুন্নত দেশের কর্ম্মপটুতা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতধারা রাষ্ট্র সাহায্যেই সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং শিল্পে অনুন্নত দেশগুলি যে, যুক্তি-সঙ্গত রক্ষণ শুল্ক-প্রকরণ (Protectionist toriff) দ্বারা তাহাদের দুর্ব্বল এবং নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে, তাহাতে শিল্পে-সমুন্নত দেশগুলির সম্পূর্ণ সম্মতি ও সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন। এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ রক্ষণ-নীতি অনুন্নত দেশগুলির স্বাভাবিক সম্পদ্ এবং শ্রমিক-শক্তি ও শিক্ষিত-পটুতাকে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া, আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাকে প্রবৃদ্ধ এবং বহুজনের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবে।

বলা বাহুল্য যে, ভারত চিরদিনই আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক সংগঠন-সমুন্নয়ন-প্রচেষ্টাতে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। কারণ, নিখিল জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনসাধারণের কর্ম্ম-সংস্থানের যথোপযুক্ত প্রসার তাহারও কাম্য। তবে, শিল্পে-সমুন্নত জাতিগুলিকেও অকপটে শিল্পে অনুন্নত জাতিগুলির কল্যাণ-জনক পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে; অন্ততঃ তাহাদের প্রকৃষ্ট স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। যে বাণিজ্য-নীতি দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতিকে দ্রুত এবং বিপুল বিস্তৃত, এবং জনসাধারণের ক্রয়শক্তিকে প্রবৃদ্ধ করিবে, তাহাতে ভারত সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু, প্রবল প্রতাপ ও প্রভাব-সম্পন্ন পাশ্চাত্য জাতির ন্যায়, ভারত শিল্পে সমুন্নত নহে; পরন্তু অনুন্নত; অথচ, তাহার সর্ব্বপ্রকার কাঁচা-মাল-সম্পদ্ প্রচুর। ভারতের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আশু প্রয়োজন, তাহার প্রভূত কাঁচামাল-সম্পদ্‌কে শ্রম-শিল্প ও যন্ত্রশিল্প সাহায্যে পরিণত পণ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া জাতীয় শ্রমিক ও শিল্পীসমূহের কর্ম্মসংস্থানদ্বারা, দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতিসাধন। এই প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টাই জনসাধারণের বর্ত্তমান দীনহীন জীবনযাত্রার ধারা উন্নত করিবার একমাত্র উপায়। সুতরাং দেশাভ্যন্তরে সর্ব্ববিধ পুরাতন ও নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত রক্ষণ-নীতি অবলম্বনের অপরিহার্য্য প্রয়োজন এবং এই রক্ষণ-নীতিমূলক শুল্ক-প্রকরণ যথোপযুক্ত এবং সর্ব্বত্র সমব্যবহার-সম্পন্ন হইবে। শুল্কপ্রকরণ অবশ্য সর্ব্বনিম্ন পর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে। অর্থ-নৈতিক সম্পদের যাহাতে কোন হানি না ঘটে, তন্নিমিত্ত এই রক্ষণ-নীতি একটি উপযুক্ত এবং স্থায়ী শুল্ক-নির্দ্ধারণ-মণ্ডলী (Tariff-Board) দ্বারা পরিচালিত হইবে। একটি নিরপেক্ষ, সুদক্ষ এবং স্থায়ী শুল্ক-নির্দ্ধারণ-মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে জনসাধারণের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এ বিষয়ে ক্যানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার শুল্ক-নির্দ্ধারণ-মণ্ডলীর কর্ম্মপদ্ধতির অভিজ্ঞতা আমাদের কর্ত্তব্যপথ নির্দ্দেশে সাহায্য করিবে।

রক্ষণনীতির অভ্যন্তরে পক্ষপাতমূলক শুল্ক-প্রশমন অনিষ্ট-জনক, সুতরাং অনভিপ্রেত। সাম্রাজ্যিক শুল্ক-প্রশমন-ব্যবস্থা দ্বারা প্রভেদ-পার্থক্যের সৃষ্টি ভারতের বাণিজ্য-নীতিকে জটিল করিয়া তুলিবে। এইরূপ পক্ষপাতমূলক প্রভেদ-পার্থক্য আত্মম্ভরি আত্মনির্ভরশীলতার প্রশ্রয় দেয় এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যকে খর্ব্ব করে। পরন্ত, সাম্রাজ্যিক শুল্ক-প্রশমন-পরি-কল্পনার প্রয়োগফলে, ভারত বিশেষ কিছু উপকার লাভ করে নাই। ভবিষ্যতেও ভারত এইরূপ প্রভেদ-পার্থক্যমূলক শুল্ক-প্রশমন-নীতি হইতে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারিবে না; কারণ, ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের গঠন-প্রণালী অন্যান্য দেশের শিল্প-বাণিজ্য-প্রকরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং ভারত যদি তাহার বাণিজ্য-নীতি হইতে সাম্রাজ্যিক শুল্ক-প্রশমন-নীতি পরিহার করে, তাহা হইলে ভারত যে, তাহার বাণিজ্যিক স্বার্থের উন্নতি সাধন করিতে পারিবে তাহাই নহে, আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক সংগঠনেও সে প্রভূত সাহায্য করিতে পারিবে। তাহার যুক্তিসঙ্গত অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনের উপযুক্ত, পরিমিত রক্ষণমূলক শুল্ক-প্রকরণ সাহায্যে নিরঙ্কুশভাবে, সর্ব্বাপেক্ষা অনুগৃহীত জাতির প্রতি প্রযুক্ত নিয়ম নীতি-সমন্বিত (Most Favoured Nation Clause), প্রভূত পরিসর-সম্বলিত বাণিজ্যিক সন্ধিসর্ত্তে বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ ভারতের বাণিজ্যনীতি হইতে প্রভেদ-পার্থক্যমূলক শুল্ক-প্রকরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে হইবে। যদি ভারতের বাণিজ্য নীতি এইরূপ প্রথায় পরিচালিত হয়, তাহা হইলে, ভারত ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা-প্রতিবন্ধকের সংখ্যা হ্রাস এবং আন্তর্জ্জাতিক অর্থ-নৈতিক সম্পর্কের উন্নতিসাধন করিতে প্রভূত সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে।

কয়েক মাস পূর্ব্বে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এটলী সাহেব পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মৃত অথবা মুমূর্ষু শিল্পের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত সর্ব্বপ্রকারে নূতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রবৃদ্ধি সাধন করিবেন। সাম্রাজ্যান্তর্গত স্বায়ত্ত-শাসনশীল রাষ্ট্রগুলিও স্পষ্টরূপে বিজ্ঞাপন করিয়াছে যে, প্রচলিত ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা-প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ বিধিনিষেধ, পরিহার করিবার অনুরোধে তাহারা তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্প-সমুন্নতি কোন মতে খর্ব্ব করিবে না। সুতরাং কেবল মাত্র শিল্প-সমুন্নয়ন অথবা শিল্প-সংরক্ষণ কিংবা শুল্ক-প্রশমন-নীতিই ভারতের সমস্যা নহে, ভারতের সমস্যা তদপেক্ষা বহুগুণে ব্যাপকতর এবং বিপুল-তর। ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা সমগ্র সামাজিক কর্ম্মসংস্থান-(Social employement) প্রশ্নের সহিত নিবিড় ভাবে বিজড়িত। ইহারই অন্তরালে আমাদের কূটকৌশল ও জাতীয় সংরক্ষণ (strategy and natinal defence)-প্রচেষ্টা নিহিত। যদিও ভারতের অর্থ নৈতিক সম্পদ্ সম্পত্তি প্রচুর, তথাপি আমাদের জনসংখ্যা চল্লিশ কোটি এবং আমাদের বর্ত্তমান সম্পদ্-সম্পত্তির সদ্ব্যবহার এবং আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন কলা-কৌশল অনুপযুক্ত এবং অনিষ্টজনক। আমাদের দ্রুত বর্দ্ধমান জনসংখ্যার অন্নবস্ত্র সংস্থান হেতু সংগঠন-সমুন্নয়ন পরিকল্পনার যথোপযুক্ত প্রয়োগ ও পুষ্টি সাধনার্থ উপযুক্ত পরিমাণ

মূলধন সংগ্রহ ও তাহার সদ্ব্যবহার আমাদের মুখ্য সমস্যা। জাতীয় শাসনতন্ত্রকে ইহারই সম্যক্ ও সমীচীন ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদের সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা ভারত-ভূমি কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের উৎপাদন-কৌশল যেমন আদিম ও অনুন্নত, আমাদের কৃষককুলও তেমনি দীন হীন ও ঋণ-প্রপীড়িত। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে লঘু ব্যয়ে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন দ্রব্যজাতের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে, কৃষককুলের দুঃখ-দুর্দ্দশা প্রশমিত হইবে। কিন্তু একমাত্র কৃষিপ্রচেষ্টা আমাদের বিপুল জনসংখ্যার সম্যক্ ভরণ-পোষণ করিতে সক্ষম নহে। কৃষির উন্নতি ও প্রসারের সহিত কৃষিজ, ভূমিজ এবং খনিজ কাঁচা মালকে শ্রম ও যন্ত্রশিল্প সাহায্যে পরিণত পণ্যে পরিবর্ত্তন প্রক্রিয়া দ্বারা সর্ব্ববিধ শিল্পের উন্নতি ও প্রসার সাধন করিতে হইবে। কৃষি ও শিল্প—এতদুভয়ের উন্নতি ও প্রসার পরস্পর-সাপেক্ষ; একের উন্নতি ও প্রসার ব্যতীত অন্যের উন্নতি ও প্রসার সম্ভবপর নহে, এবং উভয়ের যুগপৎ উন্নতি ও প্রসার ব্যতীত ভারতের দ্রুত বর্দ্ধমান বিপুল জনসংখ্যার অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান দ্বারা জাতীয় জীবন-যাত্রার ধারা উন্নত হইতে পারে না। জনসাধারণের ক্রয়শক্তিবৃদ্ধিই জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির মুখ্য উপায়। সুতরাং যাঁহারা এখনও মনে করেন যে, শিল্পের উন্নতি ও প্রসার কৃষি-প্রধান ভারতের কৃষির উন্নতি ও প্রসার ব্যাহত করিবে, তাঁহাদের ধারণা ভ্রান্ত। আর একটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিল্পের উন্নতি ও প্রসার সাধনার্থ যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়, তাহাদের কার্য্যকারিতা সাধারণতঃ কৃষির উন্নতি ও প্রসার সম্পাদনার্থ প্রযুক্ত উপায় সকল হইতে অধিকতর। পরন্তু, কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ উন্নতি ও প্রসার ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নতির সামঞ্জস্য সম্পাদিত হইতে পারে না; এবং সামঞ্জস্য ব্যতিরেকে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি স্থায়ী ও দৃঢ় হইতে পারে না। পুনশ্চ, ভারতের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারে বৈদেশিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদেরও আতঙ্কের কোন কারণ নাই। ভারতের বিপুল জনসংখ্যার ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইলে, তাহারা স্বদেশজাত দ্রব্যসামগ্রী ব্যতীত, বিদেশজাত বহু পণ্য, প্রয়োজনের তাগিদে, স্বেচ্ছায় ক্রয় করিবে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে বর্ত্তমানে অনুন্নত ভারত অপেক্ষা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে সমুন্নত ভারত আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করিবে।

হলুদ ও রক্ত

শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়

দেবেশ পণ্ডিত রান্নাঘরে বসে তখন রাঁধছিলেন—।

কয়েক দিন থেকে লোকে নানারকম বলাবলি করছে। পাঠশালায় পড়াশুনা কিছুই হয় না, পণ্ডিত শুধু ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেয়; ছেলেদের দিয়ে সংসারের কাজ করিয়ে নেয়, রান্না করার বাটনা বাঁটায়—এই সব।

কথাটা খানিকটা সত্যি। পণ্ডিত নিজে একা—তাই সকাল বেলায় ছেলেরা পাঠশালায় এলে তাদের কাউকে হয় ত' কোনদিন বাজারটা করতে দিয়েছেন; কাউকে হয় ত' একটু বাটনা বাঁটতে দিয়েছেন কিন্তু পড়াশুনার ক্ষতি তো কারও হয়নি। ছেলেরা পণ্ডিতের কাজ করে দেয়, পণ্ডিত পাশে বসে-বসে ছেলেদের কাজ দেখেন; তন্ময় হয়ে ভাবতে থাকেন: এই ছেলেরাই হবে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রদূত। এদের এই কাজ করার মধ্যে যে উৎসাহ, যে নিষ্ঠা তা যেমন অকৃত্রিম তেমনই গঠনমূলক—; এদের নিয়েই তৈরী হবে মুক্তিসেনা—এরা জোর কদমে পা ফেলে চলবে শত্রু নাশ করতে, এরা বুক ফুলিয়ে সঙ্গীন উঁচিয়ে পরাধীন দেশকে করবে শৃঙ্খলমুক্ত, দেশমাতাকে করবে স্বাধীন—

পণ্ডিতের হঠাৎ তন্ময়তা ভেঙে যায় ডাক শুনে। গ্রামের তারিণী মোড়ল এসেছে ছেলেকে ডাকতে। ছেলে তার রাগ ক'রে ভাত না খেয়ে চলে এসেছে পাঠশালে, তারিণী তাই খুঁজতে এসেছে তাকে—

'ও বাপ বদন—বদন রে'—তারিণী মোড়ল পাঠশালার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকতে সুরু করে। ছেলেরা পড়া বন্ধ করে তারিণীর দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। কেউ কেউ আস্তে আস্তে ভ্যাঙায়—'ও বাপ বদন—'।

বদনের সাড়া না পেয়ে মোড়ল আরও জোরে ডাকতে থাকে—। সারা পাঠশালার ছেলেরা বেশ আমোদ করবার একটা উপায় দেখে খুব হাসাহাসি করে—।

একজন বলে—বদন পণ্ডিত ম'শায়ের বাটনা বাঁটছে—

'বলি ও বাপ বদন—বদন রে'—মোড়ল মাষ্টার ম'শায়ের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। পণ্ডিত ম'শায়ের হঠাৎ চমক ভাঙে, বদন তাড়াতাড়ি হলুদের হাতেই বাবার কাছে ছুটে আসে।

এই জন্তে ইস্কুলে পড়তে এইচিস্—ঘরে চল হতভাগা ছেলে—

বদনের পাঠশালায় পড়া শেষ এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত ম'শাই-এরও সুনাম থেকে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে।

পণ্ডিত রান্নাঘরে বসে বসে ভাবতে থাকেন—বাড়ীর কথা। বৌ লিখেছে টাকা পাঠাতে তাড়াতাড়ি। ছেলেগুলোকে এখানে নিয়ে এসে পড়াশুনা করাতে হবে—দিনরাত তারা খেলা করেই বেড়ায়, ভাইটা পাড়ায় পাড়ায় যাত্রা ক'রে আড্ডাবেশা ক'রে দিন কাটায়। মাঠে লাঙল দেবার সময় এসেছে কিন্তু পয়সার অভাবে লাঙল দেওয়া হচ্ছে না; মা বুড়োমানুষ, পয়সার অভাবে সময়মত

তাঁকে দুটো খাওয়ানো যায় না, পয়সা ধার পেলে কোনদিন খাওয়া হয়, কোনদিন শুধু জল খেয়েই থাকতে হয়—বোন বড় হ'য়ে উঠেছে, তার বিয়ে দেবার কোনই নাম নেই, পাড়ার লোকে নানা কথা বলে—

পণ্ডিত বাটনা বাটতে বাটতে বাড়ীর কথা ভাবেন, আর মধ্যে মধ্যে ছেলেদের এক একবার তাড়া দেন—।

পাঠশালার প্রথম আসার দিনের কথা মনে পড়ে। কয়েকটা ছেলে নিয়ে কি বিপুল উৎসাহেই না তিনি কাজ আরম্ভ করে-ছিলেন। দেশকর্ম্মী তিনি, দেশকে নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে সকলের। দেশের মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হ'বে দেশসেবীদের—বিদেশীর টুঁটি চেপে ধরতে হ'বে শক্ত মুঠোতে, বিদেশী বর্জ্জন করতে হ'বে একজোটে—

পণ্ডিত সজাগ হ'য়ে ওঠেন ডাল পোড়ার গন্ধে। ভাবতে ভাবতে নীচের ডাল ধরে উঠেছে, পণ্ডিত ডালে জল দিয়ে আবার ভাবতে থাকেন।

আ-জীবন দেশের সেবা ক'রে জীবন বলি দেয় যারা তারা কারা? তাদের স্ত্রীপুত্র পরিবার থাকে না—তাদের পিছনের দিকে তাকাবার কেউ থাকে না।

ভাবতে ভাবতে পণ্ডিত জানালা দিয়ে দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকেন। দু'পুরের কড়া রোদে সারা পৃথিবী অসহায় পশুর মত শুয়ে থাকে—এদিক ওদিকে কোন গাছ থেকে দু'একটা ঘুঘু উদাস সুরে ডেকে ওঠে। পণ্ডিত জানালা দিয়ে মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠেন। একজন লোক যেন হাতে একখানা কাপড় নিয়ে চলে গেল মনে হোল। কাপড়টা বিলিতি কাপড় নয় ত?

পণ্ডিত বাটনা বাটা বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি হলুদমাখা হাতে বাইরে ছুটে যান। লোকটা ততক্ষণে হন হন করে চলেছে। রোদে মাঠ তেতে আগুন। পণ্ডিত ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরে ফেললেন—কাপড় কোথা হ'তে নিয়ে এলে।

এজ্ঞে, পণ্ডিত ম'শাই নমস্কার, ও দোকান হ'তে নিয়ে আসলাম।

কোন্ দোকান থেকে নিয়ে এলে?

এজ্ঞে, বসন্ত যুগীর দোকান হ'তে।

এটা বিলিতি কাপড়, কেন এ কাপড় নিয়ে এলে?

এজ্ঞে, ওয়া দিল—আমিতো চাইনি—

খদ্দরের কাপড় ছিল না?

ছিল—

চল ত' দেখি, কেন তারা বিলিতি কাপড় দোকানে রাখবে। পণ্ডিত ম'শাই রাগে ফুলতে থাকেন। লোকটাকে নিয়ে পণ্ডিত ম'শাই হলুদমাখা হাতেই ছোটেন বাজারের দিকে।

রাস্তার লোক অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে পণ্ডিতের দিকে। পণ্ডিত যেন টানতে টানতে লোকটাকে নিয়ে চলেছেন বাজারে, লোকটা যত বলছে যে সে কিছু জানে না—তবু পণ্ডিত তার কথা কানেই তুলছেন না, জোর করে তাকে যেন নিয়ে যাচ্ছেন।

এজ্ঞে, পণ্ডিত ম'শাই আস্তে চলুন—

না, না, দেশের শত্রু দেশের লোক—

রাস্তার লোক চেয়ে থাকে। তারা জানে পণ্ডিত উগ্র জাতীয়তাবাদী—পণ্ডিত কোনদিন খদ্দর ছাড়া অন্য কোন কাপড়ই পরেন না। তারা জানে পণ্ডিত দেশের নামে একেবারে পাগল—দেশের কাজে তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারেন, তবু হলুদমাখা হাতে পণ্ডিত কেন এত উত্তেজিত হ'য়ে লোকটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন—তা তারা বুঝতে পারে না। লোকটার যে কি দোষ, কেন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—সে কথা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার উত্তর দেন না, শুধু মুখে বলেন—দেশকে এরাই উচ্ছন্নে দেবে—

পণ্ডিত ম'শায়ের রাগ দেখে লোকগুলো পণ্ডিত ম'শায়ের পিছু পিছু যেতে থাকে। আজ একটা কিছু অঘটন না হয়ে যায় না—। পণ্ডিত ম'শাই এ সব ব্যাপারে একেবারে দুর্ব্বাসা, দেশের নামে পণ্ডিত ম'শায়ের অন্তরে আগুন জলে ওঠে—

দোকানে উঠেই পণ্ডিত ম'শাই বসন্ত যুগীকে সামনে পেয়ে তাকে মারমূর্ত্তিতে শুধান—'বিলিতি কাপড় রেখেছ কেন দোকানে?'

বসন্ত ভয় পেয়ে যায় পণ্ডিতের চেহারা দেখে—তার ওপর পণ্ডিতের হাতে মাখা হলুদ, বসন্ত ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়—আজ্ঞে ব্যবসার খাতিরে একখানা আধখানা রাখতে হয়—

রাখতে হয়। পাজী কোথাকার। মেরে তোমার ভূত তাগাবো—

পণ্ডিত ম'শাই তাঁর হলুদের হাত দিয়ে বসন্ত যুগীর জামা চেপে ধরেন— কেন বিক্রী করেছ বল—বসন্ত ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—।

ইতিমধ্যে বসন্তর ছেলে ও বসন্ত সকলে মিলে চীৎকার করতে লাগলে ওখানে একটা মহাগোলযোগের সৃষ্টি হয়—একজন গিয়ে তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দিয়ে আসে।

পুলিশ যখন এসেছে তখনও পণ্ডিত ম'শায় শান্ত হ'ননি। বসন্তকে মারেন আর কি—এমনি ভাব। পুলিশ এসে পণ্ডিত ম'শাইকে গ্রেপ্তার করে। বিলিতি দ্রব্য বর্জ্জনের আন্দোলন চালানোর জন্য তিনি অপরাধী।

পণ্ডিত ম'শাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তখন পণ্ডিত ম'শাই 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে বাজার ভরিয়ে তোলেন।

পণ্ডিত ম'শাইকে পুলিশ ধরে নিয়ে চলল রাস্তা দিয়ে। রাস্তার দুই পাশে লোকে লোকারণ্য। পণ্ডিত ম'শাইকে নিয়ে যাবার সময় যখন পুলিশ পাঠশালার কাছে এসেছে, তখন পণ্ডিত ম'শায়ের হঠাৎ হাতের দিকে লক্ষ্য পড়ে। হলুদমাখা হাত দেখে পণ্ডিত ম'শায়ের দু'ঘণ্টা আগের সেই পাঠশালার রান্নাঘরের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, এতক্ষণে হয় ত' ডালের জল শুকিয়ে গিয়েছে—।

পণ্ডিত ম'শাই রাস্তার মাঝে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে যান এবং রান্নাঘরের জানালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। তখনও রান্নাঘরের জানালা দিয়ে ধোঁয়া বার হচ্ছিল।

মর্ম্মর

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

মাথার উপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মাঠ পার হইয়া, ক্ষেতের সরু আলপথ ধরিয়া কাঙালীচরণ বাড়ীর দিকে চলিল। বাগ্‌দীপাড়ার গদাধরের ছেলের ওষুধের ব্যবস্থা করিয়া, যাদব মণ্ডলের স্ত্রীর ভূত ছাড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে তাহার আজ অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। তাই একটু তাড়াতাড়ি চলিল কাঙালীচরণ। গিয়া তাহাকে নিজের হাতেই ভাত রাঁধিতে হইবে—দত্তবাড়ীর পুকুরে গিয়া স্নান করিতে হইবে—তারপর হইবে খাওয়া দাওয়া। রোদ গড়াইয়া পড়িতে তখন আর বেশী বাকী থাকিবে না। তারপর হীরুঠাকুরের মেয়েকে না দেখিতে গেলেই চলিবে না। তাহার অবস্থা কাল খুব খারাপ দেখিয়া আসিয়াছে।

কাঙালীচরণ গাঁয়ের হেকেমী চিকিৎসক—কেউ বলে তাহাকে ওঝা। ভূত ঝাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া কোন চিকিৎসাই তাহার অজানা নাই। কাজেই অবসরও তাহার মিলে না। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ঘুরিয়া কম পয়সায় কখনও বা বিনা পয়সায় নানারূপ চিকিৎসা করিতেই তাহার দিনের বেশীর ভাগ কাটিয়া যায়। দত্তবাড়ীর বাইরের উঠোন দিয়া ঘুরিয়া আসিল কাঙালীচরণ। সেখানে পা দিতেই দেখিল দত্তদের বৈঠকখানা ঘরটি এতকাল ভাঙ্গাচোরা ও পতিত অবস্থায় ছিল, সেটা মেরামত করা হইতেছে। নিতাই মণ্ডল আর কয়েকজন বাগ্‌দী করিতেছে ঘরামীর কাজ। কাছে আসিতেই নিতাই দুই হাত জোড় করিয়া বলিল—পেন্নাম হই কাঙালী ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হয়েছিল।

—গিয়েছিলাম রোগী দেখতে, আজ বড্ড দেরী হয়ে গেল।

—তা আমাদের বাড়ীতে যাবার সময় একটু পায়ের ধূলো দিয়ে যাবেন ঠাকুর কর্ত্তা।

—তোর বাড়ীতে আবার কি হ'ল ?

—ছেলেটার সর্দ্দিজ্বর।

—তা হবে না ? তোর ঘরের চাল ঠিক নেই। রাত্তির বলায় ঠাণ্ডা বাতাস, কুয়াসা ঘরে ঢুকে ছেলেটার অসুখ করেছে। ঘরটা মেরামত করতে পারিস না ?

—এই সামনের মাসেই করবো কর্ত্তা। আকালের সময় টিন বাঁধা রেখে খেয়েছি। কয়েকটা টিন বাঁধা ছুটিয়ে এনেছি—কষ্টে সৃষ্টে আর দুটো টিন আনতে পারলেই ঘরের চালটা বেঁধে ফেলবো।

—সামনের মাস করতে করতে তো কত মাসই তোর কেটে গেল। ঘরামীর কাজ করিস, তবু নিজের ঘর বাঁধতে পারলি না ? কথায় বলে—অতি বড় ঘরামী না পায় ঘর—অতি বড় সুন্দরী—

কাঙালীচরণ ধীরে ধীরে পা বাড়াইতে থাকে। আবার থামিয়া বলে—তা দত্তদের এই ঘর আবার এতদিন পরে বাঁধা হচ্ছে কেন ?

নিতাই জবাব দেয়—তা তো জানিনে ঠাকুর কর্ত্তা। তবে শুনলুম, কে একজন বাবু নাকি সহর থেকে এখানে এসে থাকবেন।

—সহর থেকে পাড়াগাঁয়ে ? এ আবার কেমন কথা হে ?

কাঙালীচরণ চলিতে থাকে।

রান্নাবান্না সারিয়া পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সারিয়া লইল কাঙালীচরণ। অত্যধিক পরিশ্রমে গায়ে যেন জড়তা আসিয়াছে। ভাবিল একবার বিছানার একটু গা গড়াইয়া লইবে। কিন্তু তাহার যে অনেক কাজ বাকী। নিতাইর ছেলেকে ওষুধ দিয়া দয়ালের বাড়ীতে যাইতে হইবে। তারপর হীরুঠাকুরের মেয়েকে না দেখিলেই চলিবে না।

কাঙালীচরণ উঠিল।

সূর্য্য তখন পশ্চিমের আকাশে গড়াইয়া পড়িয়াছে। শীতের রোদ গাছের মাথায় ঝিকমিক করিতেছে। বলাকারা সাদা পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। সাদা মেঘের সঙ্গে তাদের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে যেন। কাঙালীচরণ ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

হীরুঠাকুরের মেয়েটির কচিমুখখানি বারে বারেই তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে; এ-মুখ যেন তাহারই পরিচিত কোন একটি মুখের প্রতিচ্ছবি।

হয় তো তাই। তাহার কন্যা মালতীরও ঠিক এমনটি মুখচ্ছবি ছিল। সে অনেক দিনের কথা। মালতী গিয়াছে—তাহার স্ত্রী গিয়াছে—সংসারও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এতদিন পরে সেই সব কথা মনে পড়িয়া বুকের ভিতরটা হঠাৎ খচ্ করিয়া উঠিল।

দয়ালের বৌকে ভূতে ধরিয়াছে। দয়াল বলিল—কাঙাল ঠাকুর, দেশে বড় ভূতের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এত ভূতের প্রাদুর্ভাব হ'লে গাঁয়ে মেয়েছেলে নিয়ে বাস করাই যাবে না। এত ঝাড়ন-মন্ত্র জানেন, ভূতগুলিকে তাড়িয়ে দিতে পারেন না ?

কাঙাল হাসিয়া জবাব দিল—এবার তাড়াব। ওদেরে দেশছাড়া করব।

ভূতে ধরার ব্যাধিটা যেন মেয়েদের ভিতর একচেটিয়া হইয়া গিয়াছে। আজ যাদবের স্ত্রী—কাল কৈলাসের সোমত্ত মেয়ে—পরশু দয়ালের বৌ—ভূত যেন পালা করিয়া মেয়েদের ভিতরই ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অদ্ভুত মেয়ে-ধরা ভূতকে গাঁ থেকে না তাড়াইলেই নয়।

দয়ালের বৌর ভূত ঝাড়িয়া হীরুঠাকুরের বাড়ীতে যাইতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মেয়েটির অসুখের কোন পরিবর্ত্তন নাই। সমস্ত চিকিৎসা ও তুকিতাকি ব্যর্থ হইয়াছে। রোগী যেন উন্মুখ হইয়া আছে মরণের প্রতীক্ষায়।

কাঙালীর মাথাটা ঘুরিয়া গেল। ধীরে ধীরে মৃত্যুদূত নিশ্চিন্তভাবে শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইবে। কেহ কিছু বলিতে

পারিবে না—কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না,—এই সোনার প্রতিমা চলিয়া যাইবে।

কাঙালীচরণের অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। ইহাকে কি বাঁচানো যায় না? বিধাতার এমন নির্দ্দয় ইচ্ছার উপর কি হস্তক্ষেপ করা যায় না?

হীরুঠাকুরের স্ত্রী কাঁদিয়া কাঙালীচরণের পা জড়াইয়া ধরিল।—ওগো ঠাকুর, আমার মেয়েকে বাঁচাও। গয়না বেচে তোমাকে টাকা দেব। ওকে ভাল করে চিকিৎসা কর ঠাকুর।

কিন্তু হায় রে। কাঙালীচরণ কি তাহার সাধ্যমত চিকিৎসার কিছু বাকী রাখিয়াছে?

হীরু ঠাকুর গিয়াছে দূর সহরে বড় ডাক্তারের জন্য। কিন্তু শত ডাক্তার বাটিয়া খাওয়াইলেও যে এই রোগী সারিয়া উঠিবে না। হয় তো ডাক্তার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই রোগী চিরতরে শান্তি লাভ করিবে।

কিছুক্ষণ পরে হীরু ঠাকুর বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিল। বলিল— ডাক্তার এলো না। দশ টাকা পর্য্যন্ত স্বীকার হয়েছিলাম তবু ডাক্তার বললেন—সহরের এত সব জরুরী রোগী ফেলে তিনি এই দূর পাড়া গাঁয়ে আসতে পারবেন না।

কাঙালী বলিল—তা আমি আগেই জানি হে। ওরা বই পাড়া সাহেবি ডাক্তার। ম্লেচ্ছ ভাষা শিখে ওদের আদব-কায়দাও সব ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে। গাঁয়ের গরীব লোকের দুঃখকষ্ট ওরা কি বুঝবে?

কাঙালীচরণ ভাবিয়াছিল—আজ রাত্রিটা রোগীর শয্যাপার্শ্বেই কাটাইয়া দিবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে মতি পরিবর্ত্তন করিল। সে গাঁয়ের বৈদ্য—তাহার এত স্নেহপ্রবণতা কেন? গৃহহারা সন্ন্যাসীর আবার খেলাঘরের পুতুলের প্রতি এত মায়া-মোহ কিসের?

কাঙালীচরণ ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিল—গাঁয়ের এক শ্রেণীর লোকের তাহার উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই। তাহারা ধনী ও শিক্ষিত সমাজ। সেই প্রভাবে পড়িয়া অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত লোকও তাহাকে অবিশ্বাস করিতেছে। তাহারা বলে—ঝাড়মন্ত্র ফুঁ সব ফাঁকি। গাছের শেকড়ে রোগ ভাল হয়? তাবিজ কবচে কি অসুখ সারে?

কাঙালীচরণের একবার ইচ্ছা হয় চিৎকার করিয়া বলে—ওরে ম্লেচ্ছভাষা শিখে তোদের মাথা বিগড়ে গেছে। আমাদের দেশে কি আগে সাহেবী ওষুধ ছিল? তখন কি লোকের রোগ ভাল হয়নি?

নূতন ডাক্তার আসিল। হ্যাট-কোট পরা সাহেবী দুরন্ত বাবু। বুকে ষ্টেথিস্‌কোপ বসাইয়া রোগী পরীক্ষা করে। জ্বর হইলে থার্মোমিটার বগলে চাপাইয়া রোগ নিরূপণ করে। লোকে বলে—হ্যাঁ, ডাক্তার বটে। রোগ যদি হয় তো যাও ঐ ডাক্তারের কাছে—নির্ঘাত রোগ সারবে।

কাঙালীচরণ সেদিন ঘোষপাড়ায় রোগী দেখিতে গিয়া একেবারে বেকুব বনিয়া গেল। বধুঘোষের অনেকদিন যাবৎ জ্বর। কাঙালীচরণ তাবিজ কবচ দিয়া এমন কি ওষুধ-পত্র দিয়াও তাহার জ্বর একেবারে সারাইতে পারে নাই। ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাঝে মাঝে তাহার জ্বর হইতেছে। আজ বধু অনেকটা বিরক্ত হইয়াই বলিয়া ফেলিল—ওসব তাবিজ কবচে আর লতাপাতার ওষুধে কি অসুখ ভাল হয়? ঐ তো নবহরির অসুখ হয়েছিল, গেল ঐ নতুন ডাক্তারের কাছে—বুকে কলের নল লাগিয়ে পরীক্ষা করলে—বগলে একটা কাঁচের কাঠি লাগিয়ে দেখলে—আর শিশিতে ভরে লাল রঙের ওষুধ দিলে—ব্যাস্; দু'দিনেই অসুখ ভাল হ'য়ে গেল।

কাঙালীচরণের শরীর রাগে গিস্ গিস্ করিতে লাগিল। কিন্তু মুখে শুধু বলিল—যদি সেই ওষুধই তোর খেতে ইচ্ছে হয়—খাস্। তবে আমাকে আবার ডাকিস কেন?

কাঙালীচরণ সরোষে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

নন্দকুমারের স্ত্রীকে ভূতে ধরিয়াছে। কাঙালীচরণ গর্জ্জন করিয়া বলিল—এবার আন তো দেখি তোদের পাশ করা সাহেবী ডাক্তারকে, কেমন ভূত ছাড়ায় দেখি। এবার আর বাবুজীর কাছে আসতে হবে না। শুধু ডাক্তারী পাশ করলেই হয় না—ভূত ছাড়াতে হলে তন্ত্রমন্ত্র শিখতে হয়।

ডাক্তার কিন্তু ভূত বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন—ভূত-টুত কিছু নয়। ওসব হিষ্টিরিয়া গোছের রোগ।

লাল, নীল রং করা, শিশির গায়ে লেবেল আঁটা ওষুধের মোহ অনেক। দলে দলে রোগী আসিয়া নূতন ডাক্তারখানায় ভীড় জমাইতে লাগিল। ডাক্তার রোগী দেখিয়া আলমারী হইতে নানারঙের শিশি বাহির করিয়া ছোট ছোট কাঁচের গ্লাসে মাপিয়া ঔষধ তৈয়ার করিয়া দেন—কি সুন্দর তার রং—কি মধুর তার চাকচিক্য—দেখিয়া রোগীদের চোখ জুড়াইয়া যায়।

গদাধরের ছেলেকে ভাত পথ্য দিয়া কাঙালীচরণ সেদিন গর্ব্ব সহকারে বলিল—ওষুধের উপর বিশ্বাস ও ভক্তি থাকলে রোগ কি না সেরে পারে? ম্লেচ্ছজাতের হাতে তৈরী রং-বেরংয়ের ওষুধ দেখে তোদের মাথা বিগড়ে গেছে। জানিস্ কি দিয়ে ওসব ওষুধ তৈরী করে? ঘোড়ার রক্ত, ভেড়ার চর্ব্বি, জীব-জানোয়ারের হাড়…

কিন্তু সেই ম্লেচ্ছ ঔষধ ও লোকের ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে।

বাগ্দী পাড়ার কানাই কাপড়ের আঁচলে ঔষধের শিশি লুকাইয়া কাঙালীচরণের বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতেছিল। কাঙালীচরণ দেখিতে পাইয়া ডাকিল—কি রে কানাই, কোত্থেকে এলি?

কানাই কাঁচুমাচু হইয়া জবাব দিল—এই তো 'ঠাকুরদা' একটু নিতাইর বাড়ী থেকে ঘুরে এলাম।

—তোর বৌর শরীর কেমন?

—আপনার ওষুধ খেয়ে দু'দিন ধরে তো ভালই আছে। তবে বড় দুর্ব্বল।

—তা ভাত খেলেই সেরে যাবে।

কাঙালীচরণ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—ফল পাইয়াও তাহার ঔষধে লোকের বিশ্বাস নাই। হায় রে, লোকের কি মোহ, কি ভ্রান্তি। ইচ্ছা হইল সে চিৎকার করিয়া বলে—ওরে তোদের বিশ্বাস নেই—তোদের রোগ সারবে না—তোরা উৎসন্ন যাবি।

বসন্তে গাছের জীর্ণপাতা ঝরিয়া যায়। নূতনের আগমন-সঙ্কেত বিদায় করে পুরাতনকে। নূতন বর্ষ যেমন করিয়া পুরাতন বর্ষকে পিছনে-ঠেলিয়া দেয়; তরুণ যুবক যেমন করিয়া সংসারে অধিষ্ঠিত হইয়া বৃদ্ধকে অনাবশ্যক প্রতিপন্ন করে—তেমন করিয়াই জীর্ণ ও পুরাতনকে বিদায় দিবার জন্য যুগে যুগে সংসারে অবশ্যম্ভাবী আবর্ত্তন দেখা দেয়।

কাঙ্গালীচরণ বুঝিতে পারিল—তাহার আবশ্যকতা ফুরাইয়া গিয়াছে। বৃক্ষের সে জীর্ণ পাতা—বসন্ত আসিয়াছে তাহাকে ঝরাইয়া ফেলিবার জন্য। তাহাকে পাড়ি জমাইতে হইবে, অন্য এক দূর দেশে। এতকাল সে গ্রামের ভূত ছাড়াইয়াছে—এবার তাহাকেই ছাড়াইতে হইবে।

চলিতে চলিতে কত কথাই ভাবিতে লাগিল কাঙ্গালীচরণ। সারি সারি কলাগাছের ফাঁক দিয়া দেখা যায় হীরু ঠাকুরের বাড়ী। সেদিকে তাকাইয়া তাহার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বাগদী-পাড়া, মণ্ডলপাড়া, দত্তবাড়ী, পলাশপুর—সকলই ধীরে ধীরে দৃষ্টি-পথ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। কাঙ্গালীচরণ শেষ বারের মত পিছনে ফেলিয়া আসা গাঁয়ের দিকে সতৃষ্ণ নয়ন মেলিয়া চাহিল।

দেখা ও দর্শন

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শূন্যে ওড়ে একটা অচিন পাখী,
সে শূন্যে দিক্ নেই—দেশ নেই—
শুধু একটা চলবার সম্ভাবনা।
পাখী শুধু ওড়ে—
পাখা ঝাপটায়
আর গান গায়।
ডানার পালকে নিত্য ফোটে নতুন রঙ—
শূন্যে যত ছোটে
তত ফোটে নতুন রঙ—
তত ওঠে গান
নিত্য নতুন সুরে।

তার রঙ স্পষ্ট কখনো ধরা পড়েনি
মর্ত্যের কোন চোখে—
তবু সবাই বলে,
কখন যেন দেখেছি তাকে
মেঘের ঝিলিকের মত—
যেন থমথমে সবুজ ঘাসের মাঝে
নীল-বেগুনি ফুলের মত—
ছড়া নিয়ে ফুলে উঠবার আগে
ধানের কম্প্র শীষের মত—
সূর্য্যকরে কিচ্‌কিচে বালুর মত—
যেন বাদল সাঁঝে ফুটে ওঠা ঝিঙে ফুল—
ঝড়ের আগে নিস্তব্ধ কালো মেঘ।
কত রূপ তার!
কিছু চেনা যায় না—
তবু কত অপরূপ!

মর্ত্যের কানে
স্পষ্ট ক'রে ধরা পড়েনি তার গান
কোনো দিন
(কালহীন তার যাত্রা;)
তবু সবাই চমকে' উঠে' বলে—
এই যেন শুনেছি তার সুর—
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-ধ্বনির সঙ্গে—
আছে তার গভীর মিল।
সেই সুর—সেই মিলের মূর্চ্ছনা কাঁপে—
গ্রহ-নক্ষত্রের ঘূর্ণিবেগে।
ঘন বর্ষায় গম্ভীর বিশ্রামে—
ভিজা ভিজা অন্ধকারে
মাটির নীচে ঐক্যতান বাজায়
নাম-না-জানা-সহস্রেক কীট পোকা—
বিচিত্র সুরের জটলা।
যেন সেই সুর—
যে সুরে চলার পথে গান গায়
অচিন পাখী।
মনে লাগে সে-সুরের ছোঁওয়া—
রক্তে লাগে দোল—
হৃদয়ে নামে প্রশান্তি—
তবু আশ্চর্য্য!
ধরা পড়ল না তার বাণী—
কোনো দেশে—
কোনো কালে;
ছড়িয়ে রইল তার সকল রূপের ছটা
চলার পথের আঁকে বাঁকে—

ছড়িয়ে পড়ল তার সুর—
চলার পথের আকাশ জুড়ে'।

বার বছরের নোটন—
চাঞ্চল্যের অবতার।
ডেকে বলে,—'দাদু',—
'কেন ?'
'ছুটব ঐ পাখীর পেছনে।'
'কেন ?'
'দেখব ওকে—শুনব ওর গান।'
'তাতে ছুটতে হবে কেন ওর সঙ্গে ?'
'নইলে ওর সবটা দেখব কি করে ?'
'আকাশে জাল ফেলব।'
'তারপর ?'
'ওকে ধ'রে নিয়ে এনে পুরব খাঁচায়।'
'তাতে কি হবে ?'
'ওকে পাব একেবারে নিঃসংশয়রূপে।'

সায় দেয় না মন নোটনের।
শূন্যের পাখী
শুধু ওড়ে আর গান গায়—
অনেক দূরে—আরও দূরে।
তাকে কখনো ধরা যায় জাল ফেলে ।
তাকে পোরা যায় খাঁচায়।
ভুল—দাদুর ভুল—।
ডাক দেয় তারে পাখী—
রঙে আর সুরে;
সে ছোটে তার পেছনে—
দাঁড়ায় না কোথাও
ভাল ক'রে পাখী দেখতে।
ও কি ক'রে বুঝতে পেরেছে ওর মনে
দাঁড়িয়ে কখনো দেখা যায় না—
শূন্যগামী পাখীকে।
দাদু বসে আছে রুদ্ধ কক্ষে—
নাকে চশমা-আঁটা,
কুঁচকোনো শুভ্র ভ্রূ;
মুখে কথা নেই—হাসি নেই—
আহার নেই—বিহার নেই—নিদ্রা নেই;
নিশিদিন চলেছে তার কৃচ্ছ্র সন্ধান
শূন্যবিহারী পাখীর জন্যে।
দিন নেই—রাত নেই—
শুধু খোঁজে চিন্তার সূত্র—
তাকে ডাইনে বাঁয়ে পাক দেয়,
তাই দিয়ে তৈরী হয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ন্যায়ের জাল—
তার ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে যুক্তির গ্রন্থি,
এড়াবার ফাঁক নেই এতটুকু।

দিন নেই—রাত নেই—
চলে পাখী ধরার জালবোনা
নির্জ্জন কক্ষে।
ডাইনে বাঁয়ে তাকে তাকে
রাশি রাশি গ্রন্থ;
স্থূল তাহাদের বপু—
আনুপাতিক ভার।
কাগজে-পত্তরে দোয়াতে-কলমে
রন্ধ্রহীন ঘর;
যাকে বলে রীতিমত
পাখি-ধরার জাল বুনবার—
বিস্ময়কর কারখানা।

জানালার ফাঁক দিয়ে মুখ গলিয়ে
বা'র হ'তে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে নোটন—
মুখখানা তার লাল চক্চকে ঘামে,—
'দাদু, পাখী দেখবে ?'
'চুপ, গোল করিস নি'—
ভেতর থেকে বেরোলো বজ্র গম্ভীর নির্ঘোষ,-
'সত্যি বলছি,—দেখবে ?'
'কোথায় ?'
গোঁফের ফাঁকে সকরুণ উপহাসের চাপা হাসি।
'পুবের মাঠে।
বান ডেকেছিল ঘাঘর নদীর ভরা জলে,
জল জমেছিল ধানের মাঠে;
লগি ঠেলে ছোট্ট নায়ে
বা'চ খেলেছি সারাটা সকাল;
ঘুরতে ঘুরতে পড়েছি চাণ্ডল-বিলে;
সেখানে দেখলুম পাখীর পালক
ছড়িয়ে গেছে সাদায়-লালে
কত শাফলা ফুলের পাপড়িতে।'
কুঞ্চিত কপালে চশমা তুলে দাদু বললেন,—
'হুঁ'।

আর একদিন বিকেল বেলায়—
নোটন এসে দাঁড়াল
জানালার রেলিং ধ'রে;

ডাকল,—'দাদু'—
'হুঁ'—
'গান শুনবে ?'
'কার ?'
'পাখীর।'
'কোথায় ?'
'হাটের পথে।
এই পথে আজ একবার দেখেছিলেম নেন পাখী,-
তাই দুপুর থেকে
দাঁড়িয়েছিলুম পথের ধারে।
চলে গেল কত লোক—
বলে গেল কত কথা—
সুখের দুঃখের।
কত কণ্ঠের কত সুর—
কিন্তু সব যেন মিলে মিশে যায় এক হ'য়ে।
লাগল যেন কেমন কানে—
মনে হ'ল, পাখীর গান ছড়িয়ে গেল
আজ এই হাটের পথে।'
প্রত্যুত্তরে বেরিয়ে এল
সৃষ্টির যেন এক আদিম অনাহতধ্বনি—
'হুঁ—।'
নিরুৎসাহে শুকিয়ে গেল
নোটনের আশাদীপ্ত মুখখানি।
তারপরে এল একদিন দাদুর পালা।
দাদু ডাকল,—'নোটন,—
পাখী দেখবি ?'
'কোথায় ?
'এই খাঁচায় পুরেছি।'
'কি করে ?'
'আকাশে জাল ফেলে।'
'কই দাদু, তোমার এতটুকু খাঁচায় ?'
'তাই বই কি।'
'এর ত পালকে রঙ নেই।'
'খাঁচায় ঢুকোতে মুছে গেছে।'
'এ ত আর গান করে না—'
'গান করলে ওড়ে—
তাতে ভাল দেখা যায় না।'
'এ পাখী আমি দেখব না।'
'এ ত দেখবার কথা নয়—দর্শনের কথা।'
'সে কি—দাদু ?'
'তুই ঠিক বুঝবি নে।'
'কাজ নেই আমার বুঝতে গিয়ে—
আমি ছুটে ছুটেই দেখি।'
'তোর খুসী হয় তুই তাই দেখ।'
'আর তুমি ?'
'আমি 'দর্শন' করি।'

কংগ্রেসের আদর্শ

... ... কংগ্রেসের জনপ্রিয় হইতে হইলে, জনসাধারণের অবস্থা যাহাতে সৌভাগ্যময় হয়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং ঐ কর্ত্তব্য সাধিত করিতে হইলে ভারতবাসীর সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বস্তরের মানুষ যাহাতে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা হইলে আর ভারতবাসীর পক্ষে ইংরাজকে তাড়াইয়া দিবার অথবা ইংরাজকে জব্দ করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করা চলে না। কারণ, ইংরাজকে তাড়াইয়া দিবার অথবা তাহাকে জব্দ করিবার কোন চেষ্টায় ভারতবাসী প্রবৃত্ত হইলে ইংরাজেরও ভারতবাসীকে জব্দ করিবার এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে অনৈক্য বিদ্যমান থাকে, তাহা করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিদ্যমান থাকিবে। ... ...

বঙ্গশ্রী – ১৩৫৩ কার্ত্তিক]

P3023 |

বেগার মাই নেবার

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

তিন

পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদের বক্তব্য দিয়া দুটো সাম্প্রতিক প্রধান সমস্যাকে খুঁচিয়ে তোলার দায়ে দায়ী হব। সাম্প্রতিক দুটো ধারণা সকলের মনে স্পষ্ট : যুদ্ধ অবধারিত এবং আমাদের কর্ত্তব্য সমস্ত শক্তি তাতে নিয়োজিত করা, শুধু তাই নয়, যতদূর সম্ভব অন্যান্য-জাতিকেও যুদ্ধে আমাদের পক্ষে যোগ দেওয়াতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যতে, যুদ্ধ আমরা এড়িয়ে যাব' অভাব অজ্ঞতা ইত্যাদি দূর ক'রে গণতন্ত্রকে নিরাপদে বাঁচিয়ে রেখে। আজকের এই দুই ধারণার প্রচার-প্রাচুর্য্যের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে এর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশ করা বিপজ্জনক বোধ হয় আমার। একটা জনপ্রিয় মতবাদ প্রচারিত হ'য়েছে যে, এই বিংশ শতাব্দীর সংঘাতের মূলে আছে হিটলার ও জার্ম্মানী, ব্রিটেনের পৃথিবীর একচতুর্থাংশের আর প্রভুত্ব করা নয়। এখানে মনে করিয়া দেওয়া অসঙ্গত নয় যে, যুদ্ধকালীন ধারণা স্থায়ী হয় না। আজকের প্রচার-প্রাচুর্য্যে—বিজ্ঞাপন, বেতার, ছায়াচিত্র প্রভৃতির মধ্যস্থতায় যে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে—এগুলো অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং অচিরেই এর রূপান্তর ঘটবে শান্তি ও মৈত্রীতে। গত শতাব্দীর সামান্য পরিধির মধ্যে ব্রিটেন যুদ্ধ করেছে, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া টার্কি দক্ষিণ-আফ্রিকা, জাপান ও জার্মানীর সঙ্গে, অথচ ঐ সময়ের মধ্যেই এদের প্রত্যেকের সঙ্গে মৈত্রীও ছিল। যখন যে অবস্থা ছিল তখনকার প্রচার-প্রাচুর্য্য সেই অবস্থাকে বড় ক'রে তুলেছে—কখনও ঘৃণার বিষ উদ্গার করেছে, আবার কখনও প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ মুখর হ'য়ে উঠেছে। আজকের দিনের ইতিহাস সেই গত শতাব্দীর পুনরাবৃত্তি, কাজেই আমাদের আজকের মনোভাব—ঘৃণা অথবা মৈত্রী—যে অন্যান্য যুদ্ধকালীন মনোভাবের-চেয়ে অধিকতর স্থায়ী হবে, এমন কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

এ কথা বলবার আমার একমাত্র কারণ হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, সাময়িক ধারণা আপাত দৃষ্টিতে যতই ন্যায়সঙ্গত মনে হ'ক না কেন, বিস্তৃত ক্ষেত্রে হয়ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। বৈজ্ঞানিক. অথবা ঘটনা-বিশারদের দল, আজকের দিনে যাঁরা অত্যন্ত জনপ্রিয়, তাঁরা মনে করেন যে, সব কিছুই অঙ্কের আঁচড় কেটে বোঝানো যায়। অথচ তাঁদেরই যদি প্রশ্ন করা যায় যে, ভেলাকুইজ বড় শিল্পী ছিলেন কেন অথবা ক্রাইষ্টের উপাখ্যান পৃথিবীশুদ্ধ লোককে প্রভাবান্বিত করেছে কেন, তাহ'লে তাঁরা প্রমাদ গণবেন। যে কোন ধারণার দুটো ধারা বিচার্য্য ; প্রথমতঃ জানা দরকার ধারণাটি কি এবং দ্বিতীয়তঃ তার মূল্য কতখানি। শয়নে কিম্বা দানে হাঁচি অশুভ কিম্বা কালো বেড়াল পথ আগলালে তা শুভ—এসব ধারণা কুসংস্কার মাত্র এবং সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু ক্রাইষ্ট খারাপ লোক ছিলেন কিম্বা সোক্রেটিসের চিন্তাধারায় কোন মূল তথ্য নেই কিম্বা সেকস্পীয়ার নিতান্ত সাধারণ পর্য্যায়ের কবি—এ ধরণের কথা নিয়ে তর্ক তুলতে পারেন এমন লোক খুব কমই আছেন। বস্তুতঃ এঁরা যে আপন আপন ক্ষেত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, সে কথা মানুষের বুদ্ধির গণ্ডিতে চরম সত্য ব'লে স্বীকৃত হ'য়েছে। তাহ'লে বোঝা গেল যে, কয়েকটি ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যে খুব সাধারণ ভাবে জড়িয়ে আছে। আরও একটু এগিয়ে গেলে সহজেই বলা চলে, যে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভালো কিম্বা সত্য তা যতই গোপন থাক না কেন, মনের অগোচরে, অবচেতনায়, কিম্বা থাক অর্থনৈতিক সমস্যার অন্তরালে একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে সহজেই ধরা পড়ে। গান্ধী সম্বন্ধে যখন আমি "অবসারভার" (Observer) পত্রিকায় অডাক্স ছদ্মনামে লিখেছিলাম, যে "তিনি কেবল সেণ্ট ম্যাথ্যুজের পঞ্চম পরিচ্ছেদ কার্য্যে পরিণত করছেন" তখন একজন পাঠক প্রতিবাদ করেছিলেন "যীশু যা কিছু বলে গেছেন তা ব্যক্তি-বিশেষের জন্যে, সরকার অথবা সরকারী কাজের জন্যে নয়।" যিনি একথা বলেছিলেন তিনি যে আত্মসমর্থনের শেষ সীমানায় পৌঁছেছিলেন তা বলাই বাহুল্য। আপাত দৃষ্টিতে তাঁর ওজর নিতান্ত বোকামী কিন্তু তবু আমরা আপন আপন মনে কিম্বা কাজে ক'জন একথা কার্য্যক্ষেত্রে মেনে চলি।

এ সবের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ কোনখানে? যোগাযোগ শুধু এই যে যুদ্ধের সমস্যার মতন ভারতীয় সমস্যাও অত্যন্ত সুকঠিন, কারণ উচিত, অনুচিত, সৎ এবং অসৎ, ন্যায় ও অন্যায় নিয়ে তুমুল তর্ক উঠবে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আসল প্রশ্ন হ'ল ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে যে পথ বেয়ে আমরা চলেছি সেটা কি ঠিক? ভারতবর্ষকে পশ্চিম রণনীতি কিম্বা য়ুরোপীয় জীবনযাত্রার পথে টেনে নিয়ে আসা কি ন্যায়-সঙ্গত? যদি ন্যায়-সঙ্গত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত যদি আমরা সক্ষমও হই তা হ'লেই কি আমাদের উদ্দেশ্য সফল হ'বে? ভারতবর্ষ কি কখনও ব্রিটেনের সপক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে যুদ্ধ করবে? যুদ্ধোত্তর কালে ভারতবর্ষের ব্যবসা-ক্ষেত্র যখন ব্রিটেনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু তখন ভারতবর্ষ কি মিত্রভাবে ব্রিটেনকে সাহায্য করবে? উৎপীড়িত, নিষ্পেষিত ভারতবর্ষের চাইতে মৈত্রিত ভারতবর্ষ কিম্বা অন্ততঃ নিরপেক্ষ ভারতবর্ষ কি অনাগত দুর্দিনে বেশী সাহায্য করবে না? আজকের অচল অবস্থা, ব্রিটেনের রাজনৈতিক দৈন্য এবং অপরিসীম নির্ব্বুদ্ধিতা কি ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি লোক—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চতুর্থ-পঞ্চাংশকে হারাতে বসে নি? এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানিনা। কেউ জানে না। আমি কেবল এইটুকুই বলতে পারি

যে, ভারতীয় সমস্যার সমাধান কখনই হবে না যতক্ষণ না আমরা বৈজ্ঞানিক ধারা ও অঙ্কশাস্ত্রের মূল তথ্যকে সম্পূর্ণ না হ'লেও আংশিক ভাবে বাদ দি। সাংখ্যার বাহুল্য ও তথ্যের তাৎপর্য্য সাধারণতঃ সুবিধাজনক ও প্রয়োজনীয় হ'লেও কখনও কখনও ভ্রমাত্মক, কারণ তাতে বুদ্ধি থাকলেও, অনুভূতি নেই।

চার

স্পষ্টই তাহ'লে বোঝা গেল যে, সংখ্যানৈতিক হেঁয়ালী কিম্বা তথ্য-তালিকার সঙ্গে এ ব'য়ের কোন যোগাযোগ নেই। সংখ্যানৈতিক গবেষণা অথবা তথ্যের বাহুল্য সহজেই মিলবে, ভারত সম্বন্ধে সেই সব অসংখ্য বইতে, যাতে লেখকের ধৈর্য্য, চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসু মনের মননশীল প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁদের বই প'ড়ে যা শিখেছি তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের চিন্তাশীলতা ও বুদ্ধির ওপর কোন মন্তব্য আরোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে আমার কেবলই মনে হয়, আমি যদি ওদের বিচার্য্য পদার্থ হ'তাম তাহ'লে অনেকটা এই ধরণের কথা ওঁরা বলতেন: ল্যাওনেল্ ফিল্‌ডেন্ ছ' ফুট ছ' ইঞ্চি লম্বা এবং ওজনে এক মণ তিরিশ সের। তিনি দুর্ব্বল, কারণ (ক) ব্যায়াম পছন্দ করেন না বলে শারীরিক পরিশ্রম করেন না। (খ) গাজর খেতে ভালবাসেন না ব'লে তিনি তা খান না। তাঁকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি: (১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে, (২) যুদ্ধ ও সংগ্রামকে (৩) শীকারকে স্বীকার করেন না, সম্মানও নয়। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করেন, অন্যের সঙ্গে কলহ। তিনি ভড়বড়ে, স্নায়ু এবং মনোবিকারগ্রস্ত। অতএব, আমরা মনে করি, যে তাঁকে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে, হাঁটতে স্নান করতে ইত্যাদি দেবার আগে, আমাদের বিচার, সিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশানুযায়ী তাঁর উচিত (১) প্রত্যেক ভোজনের সঙ্গে পাকা তিন সের ওজনের গাজর খাওয়া (২) সকালবেলা জলখাবার খাওয়ার আগে বার পাঁচেক গড়ের মাঠের চারিদিকে দৌড়ে আসার ক্ষমতা কেবল অর্জ্জনই নয়, প্রমাণ ক'রে দেখানো, (৩) রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনা কণ্ঠস্থ করা, (৪) অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রত্যেকটি বা সামরিক আলোচনা মন দিয়ে শোনা, (৫) পুলিসে ও পল্টনে শিক্ষানবিশী করে মানুষ মারবার কায়দা আয়ত্ত করা, (৬) স্ত্রীর ওপর অত্যাচার নিবারণ করবার জন্যে বাড়ীতে পুলিশ রাখা এবং (৭) যে কোন কাজ করবার আগে এক থেকে কুড়ি পর্য্যন্ত গোণা। এইসব যদি উনি ঠিকমত করেন, তা হ'লে আমরা মনে করি, যে ৮০ বছর পরে অথবা যুদ্ধসমাপ্তির পরে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অল্প-বিস্তর তিনি আয়ত্ত করতে পারবেন।" এইসব শুনে আমি যদি প্রতিবাদ জানিয়ে বলি যে, কলহ আমার মজ্জাগত এবং ভারতবর্ষের আবহাওয়া আমার পক্ষে অসহ্য, তাহ'লে তাঁরা আমায় শুনিয়ে দেবেন যে আমি অত্যন্ত অবাধ্য এবং অবোধ, বিশেষ ক'রে যখন গণ্যমান্য এবং বিচক্ষণ বিচারকেরা আমার জন্য এতটা পরিশ্রম স্বীকার করেছেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এতগুলো বই থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসী অসন্তুষ্ট। অবশ্য সংখ্যাবিদেরা এবং গুরুপন্থীরা আমার কথায় প্রতিবাদ করবেন। আপন আপন সংখ্যানৈতিক মতবাদকে এবং তথ্য-তালিকাকে সমর্থন করার পেছনে স্বার্থ আছে, আর আছে আত্ম-বিশ্বাস। কিন্তু আমি নিজে, তাদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে থাকব কারণ তথ্য-তালিকা সহজলভ্য। ভারতবর্ষে পাঁচ বছর অবস্থানকালে, কম ক'রে পাঁচশো মাইল কাগজের ওপর তথ্য-তালিকা করেছি—নানান রকম তথ্য: ষ্টুডিওর আয়তন, কিম্বা ট্র্যান্‌স্‌মিটারের দাম, লাইসেন্স সংখ্যা কিম্বা কোষকের মাইনে, অনুষ্ঠানের সময় কিম্বা লাইসেন্সে-এর আয়, শুল্ক থেকে কর আদায়, কর থেকে আয়, আয় থেকে ব্যয়—এইসব নানান বাতুলতার মধ্যে লাভ কিছু না হ'লেও, ভাবনার বোঝা কম ছিল, কারণ তথ্য দিয়ে আদর্শের ওজন না চললেও, জাবদা খাতার হিসাব মেলে। যত দিন যাচ্ছে আমার ধারণা ততই স্পষ্ট হচ্ছে যে, হিন্দু মুসলমান, এবং রাজন্যবর্গ এবং চাষ আবাদ এবং লর্ড লিনলিথ্‌গোর এবং অন্যান্য আরো কিছু ও অনেক কিছুর নানান তথ্যের ফলে আমাদের অস্থিরতার শান্তি ঘটলেও, উদ্দেশ্য ক্রমশঃই ঘোলাটে হ'য়ে উঠছে। আসলে, অত্যন্ত সরল ভাবে নিজেদের কয়েকটি প্রশ্ন করতে হবে এবং অকপটে উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করলেও আমার মতে সেগুলো হ'ল':-

(১) ভারতবর্ষের এই যুদ্ধে যোগ দেবার পক্ষে কি কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ আছে?

(২) সাম্রাজ্য সংযোগস্থল, যুদ্ধক্ষেত্র, পণ্য-ব্যবসার প্রশস্ত ক্ষেত্র কিম্বা বন্দর হিসেবে আমাদের কাছে ভারতের যদি কোন প্রয়োজন না থাকে তা হ'লে আমরা কেন ভারতবর্ষে থাকব?'

(৩) ভারতীয় আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা করা যদি আমাদের দায়িত্ব হয়, তাহ'লে মাঞ্চুরিয়া, স্পেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ঘরোয়া যুদ্ধের সময় কিম্বা ফ্রান্সের বিদ্রোহের সময় আমরা হস্তক্ষেপ করিনি কেন? (রাশিয়ার বিদ্রোহের সময় আমরা যে হস্তক্ষেপ ক'রেছিলাম, সেটা আত্ম-প্রশংসার উপযুক্ত কি-না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে?)

(৪) ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হ'বার পর থেকে ভারতবর্ষ কি সুখী?

(৫) ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত মন্ত্রী-মণ্ডলী যদি ভারতীয় প্রদেশগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে শাসন ক'রে থাকেন, তা' হ'লে এখন তাঁ'রা পারবেন না—এ-কথা ভাববার কি বিশেষ কোন কারণ আছে?

(৬) কংগ্রেসের চাইতে বড় অথবা বেশী প্রতিরূপক কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কি আছে? এবং এ-কথা কি ধারণা করা যায় যে জাতীয় নেতাদের কারারুদ্ধ করায় ভারতবাসীর আনন্দ, সুখ, ঐক্য অথবা মত আছে?

ছ'টি অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন এবং কোন তথ্যের বিশেষ প্রয়োজন নেই। সাধারণ ব্রিটেনবাসী এই ছ'টি প্রশ্নের যা উত্তর দেবে এবং অত্যন্ত আন্তরিকভাবে, তা' হ'ল এই:—

(১) হ্যাঁ, নিশ্চয়, কারণ তা' না হ'লে জাপান ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলিত করবে।

(২) হয় ত না, কিন্তু এ প্রশ্নই ওঠে না—আমরা ভারতবর্ষে আছি, ভারতবর্ষ আমাদের রাজত্বের একটি বিশেষ অংশ এবং আমরা ভারত ত্যাগ করতে পারি না।

(৩) কারণ, ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, যা অন্য কোন দেশের প্রতি নেই।

(৪) হ্যাঁ, কারণ ভারতকে আমরা আইন দিয়েছি, শান্তি-রক্ষার পদ্ধতি দিয়েছি, রেলগাড়ী, জলসেচনের ব্যবস্থা, শাসনতন্ত্র দিয়েছি, আর দিয়েছি একতা-মন্ত্র।

(৫) না, কিন্তু তাঁ'রা নিজেরাই মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন।

(৬) না, কিন্তু পূর্ণ স্বরাজ ছাড়া কংগ্রেস আর কিছু মেনে নিতে রাজী নয়, আবার অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পূর্ণ স্বরাজ চায় না। তা ছাড়া কংগ্রেস একান্ত যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

* *

যদি এ-কথা ধ'রে নেওয়া যায় যে যুদ্ধে জয়লাভে এবং য়ুরোপীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনার ভারতের স্থাপত্য ও শান্তি নির্ভর করে, তা হ'লে ওপরের উত্তরগুলো খানিকটা যুক্তিপূর্ণ ব'লে স্বীকার করা যায়। এ কথাও ঠিক যে, হয়ত' এই সব বিষয়ে আমাদের ধারণা অনুরূপ আশাপ্রদ ফল নাও পাওয়া যেতে পারে। আমার প্রশ্নের ওপর ভিত্তি ক'রে দেখা যায় যে আমাদের ধারণা অনুযায়ী কাজ করলে ফলাফল কি হবে। ধরুন আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন একজন ভারতবাসী—যিনি আপন কৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন এবং অতীত সম্বন্ধে গর্ব্বিত, যিনি য়ুরোপীয়দের মনে করেন বর্ব্বর—যারা চিরদিন কেবল সংগ্রাম করে, শান্তিপ্রিয় লোকদের শক্তি দিয়ে দমন করে, যাদের ধ্যান,—ব্যবসা, মদ ও ব্রিজখেলা, যারা অল্প দিনের মেয়াদে সভ্যতার বড়াই করে, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে চারিদিকে কেবল যক্ষ্মা ও যৌনব্যাধি ছড়িয়ে বেড়ায়—যাদের শিল্প কিম্বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা! এই ধরণের ভারতবাসী হয়ত' বলবেন, এবং আমি প্রতিবাদ করব' না, যে সেক্সপীয়রের চাইতে কবীর কোন অংশে ছোট কবি নন, বেদ বাইবেলের চাইতে কোন রকমেই হেয় নয়। তিনি হয়ত' বলবেন যে, প্রবাহিত নদীর জলে স্নান না ক'রে যে জলে মুখ-হাত ধুয়েছি সেই জলে স্নান করা কেবল অস্বাস্থ্যকর নয়, নোংরামী। তিনি প্রমাণ করবেন এবং আমি মেনে নেব যে, ভারতবাসীর তুলনায় ইংরেজ জাতি হিসেবে নোংরা। তিনি হয়ত' দাবী করবেন এবং পারব' কি আমি অস্বীকার করতে যে, অর্দ্ধধৌত ছুরি কাঁটা চামচ দিয়ে, চারজন খাওয়ার চাইতে ভারতীয় শুধু হাতে খাওয়া অনেক বিশুদ্ধ। তাঁর মতে হয়ত' পরিষ্কার দেওয়াল ঘেরা কার্পেট-পাতা ঘর, হাজার রকম আসবাব-পত্রময় পাতাকাটা ঘরের চাইতে অনেক ভাল। শেষকালে হয়ত' তিনি বলবেন, "ভারতবর্ষ য়ুরোপের মতন বড়ই শুধু নয়; বৈচিত্র্যময়। তোমরা কেবলই আমাদের ঝগড়া করতে বারণ কর, অথচ তোমাদের কলহ কখনও থামে না। তোমরা চীৎকার কর—একতা—মৈত্রী—অথচ তোমরা তার হাজার মাইলের মধ্যে দিয়েও যাও না। তোমরা ক্রিশ্চানিটির বড়াই কর, অথচ তোমরা তার এক কথাও মেনে চল না। আমাদের সাম্প্রদায়িক গোল-যোগের সুযোগ নিয়ে আমাদের বল অশিক্ষিত, বর্ব্বর—অথচ য়ুরোপীয় বর্ব্বরতার তুলনা নেই ইতিহাসে। এই ধরণের ভারতবাসী (ওরা অনেকেই এই ধরণের!) আমার প্রশ্নের উত্তর অনেকটা এই ভাবে দেবে :—

ভারতবর্ষের কি উচিত এই যুদ্ধে যোগ দেওয়া?

আমি জানি না। আমরা ভারতবাসীরা আক্রমণকে ঘৃণা করি ঠিকই, কিন্তু ভুললে চলবে না যে, আক্রমণের ফলে আমাদের দেশে এসেছে বিলেত থেকে ব্রাউন্, স্মিথ্, জোনস্, যারা অশিক্ষিত, অজ্ঞ, অনুভূতিহীন, যাদের এই গত কুড়ি বছরের মধ্যে আমরা চিনে নিয়েছি! যারা আমাদের দরিদ্র দেশকে দলন ক'রে, পেষণ ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করে—ইংলণ্ডে যা রোজগার করতে পারত তার চাইতে অনেক বেশী এবং তারপর ফিরে যায় দেশে, কারণ এখানে বসবাস করবার স্পৃহা তাদের নেই। তারা আমাদের সাহিত্য, শিল্প, কাব্য অথবা ইতিহাস কিছুই জানে না—জানবার আগ্রহও নেই। তারা তাদের ব্রিজ, টেনিস্ ও যাজ্ (Jazz) থেকে আমাদের তাচ্ছিল্যভরে বাদ দেয়! তারা আমাদের ডিগ্রীকে বিশ্বাস করে না, মাতৃভাষায় শিক্ষাকে স্বীকার করে না: আমাদের সব কিছু শিখতে হয় ইংরেজিতে, কাজেই কিছুই আমাদের ভালো ক'রে শেখা হয় না! এমনি ভাবে আমাদের ছেলেমেয়েরা অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষ হয়—যে সাহিত্য আমাদের গর্ব্ব,যে সংস্কৃতি আমাদের গৌরব, সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অচেতন! সরকারী গোলামী ছাড়া অন্য কিছু আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য এবং সরকারী চাকরি পেতে হ'লে য়ুরোপীয় পোষাক, আসবাব, কাঁটা চামচ, আদব-কায়দা আমাদের মানতেই হয়—ইংরেজি সভ্যতার মুখোস পরতেই হয়—অথচ এ সবই আমাদের কাছে অর্থহীন, অতএব অবাস্তব। আমরা কারো শাসনাধীন থাকতে রাজি নই, আমরা চাই আমাদের ইতিহাস, ধর্ম্ম, রুচি এবং দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিজস্ব জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস রেজোল্যুস্যানে ব্রিটেনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি? যদি হয় সাম্রাজ্য-সংক্রান্ত তা হ'লে ভারত-বর্ষের তাতে কোন সংস্রব নেই, যদি হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম, তা হ'লে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষ সাহায্য করবে। এ প্রশ্নের কোন ন্যায়-সঙ্গত উত্তর আমরা পাইনি! পাইনি বলেই তোমাদের আসল উদ্দেশ্য আমরা বুঝে নিয়েছি। যদি প্রশ্ন ওঠে—আমরা কি জাপানের শাসন মানতে প্রস্তুত: যথার্থ উত্তর হচ্ছে—না—আমরা কারো শাসন চাই না—কিন্তু এ কথা মনে করবার কি কোন কারণ আছে যে, যে জাপান প্রাচ্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত এবং এসিয়ায় সমোন্নতির আশাও অন্ততঃ পোষণ করে—সে শাসক হিসেবে ব্রিটেনের চাইতে খারাপ হবে—সেই ব্রিটেনের চাইতে—যারা কারাগার ছাড়া অন্য কোথাও আমাদের মোহ-

মনীষীদের রাখবার জায়গা পায় না—আমাদের সবল সহজ দীন দরিদ্র দেশবাসীর ওপর মেসিনগান্ করে—পথে চাবুক মারে—যারা দুশো বছর রাজত্ব করেও ভারতবাসীকে ভালো বাসতে শেখেনি, আপন করে নিতে পারেনি! তা ছাড়া জাপান যে আমাদের শাসন করবেই এমন কোন কথা নেই। যদি আমরা ইজিপ্টের উদাহরণ অনুসরণ করি, যারা এখনও যুদ্ধ ঘোষণা করেনি (যে বিষয়ে তোমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।) তা হ'লে আশা করা যায় যে সমগ্র চীন এবং রাশিয়া আমাদের হয়ত' বন্ধু ব'লে স্বীকার ক'রে নিতেও পারে, যা তোমাদের জোন্‌স্, স্মিথ কখনও পারবে না। একথাও আমরা মনে করি যে, আমরা নিজেরাই নিজেদের শাসন্ করতে পারি—এবং শাসন করা মানেই বন্দুক, সেইসাজ্যান, রাইফেল্ বা ট্যাঙ্ক নয়। তোমাদের প্রভুত্বপরায়ণ বুলি, তোমাদের পিঠচাপড়ানো কথা, ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাবের মধ্যে যার প্রকাশ—তা আমরা অপছন্দ করি। আমরা যদি তোমাদের এ কথা বলতে পারতাম যে, ব্রিটেন এবং য়ুরোপ স্বাধীন হবে না যতক্ষণ না তোমরা প্রাচ্য ধারা অনুযায়ী য়ুরোপে সংযুক্ত শাসন-পদ্ধতির প্রচলন কর—তা হ'লে তোমরা আমাদের অনুভূতি খানিকটা অনুভব করতে পারবে। আর, যদি আমরা তোমাদের মতামত না নিয়ে অথবা গ্রাহ্য না ক'রে তোমাদের হ'য়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতাম, যা তোমরা করেছ, তা হ'লে তোমরা বিজাতীয় নরহত্যার লীলাখেলায় যোগদান সম্বন্ধে ঠিক এতটাই সন্দিহান হ'য়ে উঠতে যতটা আমরা পেরেছি। তোমরা যে পোনেরো লক্ষ ভারতবাসীকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছ তার সহজ কারণ রাজকীয় শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা সহানুভূতি নয়, আমাদের দারিদ্র্য, দৈন্য, দীনতা ও অনাহারের হাত থেকে মুক্তি পাবার সহজ উপায়। চল্লিশ কোটি ভারতবাসী আজ অন্নাভাবে হাহাকার করছে—তার থেকে মুষ্টিমেয় লোক—প্রতি তিনশো জনের মধ্যে একজন—আত্মবিক্রয় ক'রে অন্নের সংস্থান করেছি মাত্র।

(২) ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের দরকার না হত তা হ'লে ইংলণ্ড কি ভারতে থাকত? অর্থাৎ কেবল মানবতার আদর্শে কি ইংলণ্ড ভারতে থাকত?

নিশ্চয় না। উত্তরটা এতই স্পষ্ট যে, এ বিষয়ে কোন দোষারোপ করা চলে না। ভারতবর্ষ সমৃদ্ধিশালী এবং আয়তনে বড়। আমরা নিজেরাই চাই যে, ভারতবর্ষ নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করুক সকলের কাছে! কিন্তু যখন বল উঁচু গলায় যে ভারতের ভালোর জন্যে তোমরা নিঃস্বার্থ হ'য়ে এখানে আছ, তখন তোমাদের ভণ্ডামীকে আমরা ঘৃণা করি। তোমরা এখানে আছ বর্ব্বর শক্তির প্রাচুর্য্যে, লুণ্ঠন করছ ভারতবর্ষকে—রেলপথ, পেন্‌সন্, বাণিজ্য-লাভ সৈন্যদল ইত্যাদি দিয়ে ভোলাতে চাও, কিন্তু এ কথাও বলা চলে যে, তাতে তোমাদের নিজেদের লাভও কিছু কম নয় ভারতবর্ষের চাইতে আসলে অনেক বেশী। এই সাধারণ নিয়মের বাইরেও অনেক কিছু আছে—যেমন তোমাদের ধর্ম্মযাজকেরা—তাঁরা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করেন—অবশ্য তাঁরা যদি ধর্ম্মান্তরবাদ প্রচারে অল্প সময় ব্যয় ক'রে···অধিক পরিমাণে বুঝতেন যে, আমাদের পক্ষে যীশুর মতন মহম্মদও যথেষ্ট অনুপ্রেরণা কিম্বা অধিকাংশ খ্রীশ্চানীয় নীতিকথাই হিন্দুত্বের গণ্ডীভূত, তা হ'লে আমরা অধিকতর সুখী হতাম! দীনবন্ধু অ্যানড্রুজ (Andrews) অথবা ভেরিয়ার এলউইনের (Verrier Elwin) মতন লোকদের আমরা শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি, তাদের আমরা চাই কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমাদের যদি ব্যবহার করা হয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিম্বা রণ-নৈতিক উদ্দেশ্যে এবং বলা হয় যে এসবই আমাদের ভালোর জন্যে, তা হ'লে আমরা নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব।

(৩) ভারতীয় আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য কি ব্রিটেন দায়ী?

জটিল প্রশ্ন। তোমরা কখনও আমাদের সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুলবার সুযোগ দাওনি, এখনও দাও না! তা'ছাড়া যে বাহিনী শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখে তাদের ওপরও তোমাদের সতর্ক দৃষ্টি। কাজেই তোমরা যদি তর্ক কর যে, তোমরা ভারত ছাড়লে শান্তি ও শৃঙ্খলাও ভারত ছাড়বে তাহ'লে তর্কের খাতিরে তোমাদের মন্তব্য অস্বীকার করা চলে না।—কিন্তু, দোষটা কি সম্পূর্ণ আমাদের? ছেলেকে যদি আঠারো বছর বয়স পর্য্যন্ত কোলছাড়া করা না হয় তাহ'লে পাঁচজনের কাছে সে পদে পদে ঠকবে তাতে আশ্চর্য্য কি? অথচ সেও তো এ্‌কথা বলতে পারে যে, দোষ তোমাদেরই! তা সত্ত্বেও যখন কয়েকজন ভারতীয় মন্ত্রী 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখবার ভার নিয়েছিলেন, তখন তাঁদের শাসনভার কি ব্রিটিশ শাসনের চাইতে কোন অংশে খারাপ হ'য়েছিল? এ সম্পর্কে আরও একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মধ্যে যতক্ষণ তৃতীয় ব্যক্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করবে ততক্ষণ আমাদের আপোষের মধ্যে কোন মীমাংসা সহজ নয়। আমাদের নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা শাসনতন্ত্র থেকে বঞ্চিত হ'য়ে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যে মেতে থাকব' এটা এমন আশ্চর্য্য কথা কি? আমাদের হাতে যদি থাকত ব্রিটেনের শাসনভার, আমরা যদি গ'ড়ে তুলতাম ব্রিটিশ-শাসনপদ্ধতি, আমরা মাইনে দিয়ে যদি রাখতাম সৈন্য, নাবিক, বিমানবাহিনী, এবং আমরা যদি জাতীয় সরকারের হাতে তুলে দিতে চাইতাম শাসনভার তা হ'লে আমরা কি করতাম? হয়ত' আমরা বলতে পারতাম যে, কনসারভেটিভ্ (Conservative) আর লেবার (Labour) ভোট প্রায় সমান সমান, কাজেই এ দুটোর মধ্যে কোনটাকেই ব্রিটেনের প্রতিনিধি বলা চলে না; লিবারেল ও কম্যুনিষ্ট দুটো বিশিষ্ট দল, কাজেই তাদেরও অবজ্ঞা করা চলে না। অতএব, জাতীয় পরিষদ গঠন করতে হ'লে মিঃ চার্চ্চিল এবং মিঃ গ্রীণউডকে (মিঃ এটলীকে কোন দলীয় নেতা হিসাবে স্বীকার করা চলে না।) মিঃ ম্যাকস্টন, মিঃ হ্যারি পলিট এবং আর্চিবল্ট্ সিনক্লেয়ার—এদের প্রস্তাবিত পরিষদের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে একমত হ'তে হবে। প্রত্যেকে হয় ত' ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাব আমাদের কাছে দেবেন, কাজেই গোলমালের মধ্যে ব্রিটেনকে ছেড়ে যাবার কোন সঙ্গত কারণই আমাদের থা কতে পারে না। তা'সত্ত্বেও যদি আমরা ছেড়ে চলে যাই তাহ'লে হয়ত' শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের মধ্যে ঐক্য সম্ভব!—ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও কি এই কথাই খাটে না?   (ক্রমশঃ)

রমণী

গোপাল বটব্যাল

লোকটিকে দেখিলে ভয় হয়। সমস্ত দাঁতগুলি বিসদৃশভাবে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় মুখের এক পাশ একেবারে উড়িয়া গিয়া তাহাকে এক কদর্য্য রূপ দিয়াছে। মমতা জন্মিলেও তাহার দিকে চাহিতে ভয় হয়, কেমন এক প্রকারের বিতৃষ্ণায় মন ভরিয়া উঠে।

দেশ হইতে ট্রেনে করিয়া কলিকাতায় ফিরিতেছিলাম, ট্রেনে উঠিয়া বসিতে যাইয়াই লোকটির দিকে দৃষ্টি পড়িল। কি ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি! সর্ব্বাঙ্গ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। একটু দূরে বসিতে পারিলে ভালো হইত, কিন্তু স্থানাভাবের জন্য সেই অদ্ভুত লোকটির ঠিক সামনেই আমাকে বসিতে হইল। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে, উহার পানে চাহিব না, জোর করিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তে যেন কোন অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে আমার দৃষ্টি আসিয়া সেই বীভৎস চর্ম্মহীন মুখের উপরেই পড়িতে লাগিল। লোকটীর একটি চক্ষু স্থির, নিষ্পলক। সেই নিষ্পলক অর্ধ ছিন্ন চক্ষু দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

—দেখেছেন ম'শাই, কি কুৎসিৎ সমস্ত মুখটা। কথাটা শুনিয়া চোখ ফিরাইলাম। এতোক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, আমার পার্শ্ববর্ত্তী আর এক ভদ্রলোক সেই অদ্ভুত লোকটীর প্রতি আমার কৌতূহলী দৃষ্টি এক মনে দেখিতেছিলেন। তিনিই আমাকে নিম্নকণ্ঠে কথাগুলি বলিলেন। হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তির নিকটে আমার এই অনুসন্ধিৎসা ধরা পড়িয়া যাওয়াতে লজ্জিত হইলাম।

ভদ্রলোক কিন্তু আমার নিকটে সরিয়া আসিয়া অযাচিত ভাবে চুপি চুপি কহিলেন—আমার গ্রামেই ওই লোকটির বাড়ী। দেখছেন তো অত কুৎসিৎ মুখ। একদিন ওই মুখই এতো সুন্দর ছিলো যে মেয়েরা দেখলে পরে পাগলা হ'য়ে যেতো। আধুনিক ডনজুয়ান আর কি, হেঁ হেঁ—ভদ্রলোক নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া উঠিলেন।

তাঁহার হাসির সঙ্গে সেই অদ্ভুত লোকটি এবারে আমাদের পানে চোখ ফিরাইল। কী বিভৎস কুৎসিত মুখ! মুখের সমস্ত চামড়া কুঞ্চিত হইয়া একপাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এতোক্ষণে লক্ষ্য করিলাম, দুইটি চক্ষুর একটি তাহার নাই, সেখানে শুধু অক্ষিকোটর এক কদর্য্য গর্ত্তের সৃষ্টি করিয়াছে, আর একটি চোখ যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও স্থির, নিষ্পলক, ভাবলেশহীন, যেন মানুষের দৃষ্টি তাহাতে নাই, কোন অশরীরী আত্মার আর্ত্তনাদ তাহা হইতে ফুটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে।

লোকটি আমার পাশের ভদ্রলোককে দেখিয়া কথা কহিল, এই যে পানুদা, কোথা থেকে আসা হচ্ছে? বর্দ্ধমান? কী সুন্দর কণ্ঠস্বর। চোখ বুজিয়া থাকিলে ভাবিতেই পারা যায় না যে, ওই রকম মুখবিবর হইতে এইরূপ সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি নির্গত হইতে পারে।

আমার পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোক অর্থাৎ পানুদা লোকটিকে এড়াইবার জন্য শুধু একবার ঘাড় নাড়াইয়া অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। বুঝিলাম, শুধু আমিই না, স্বগ্রামের বাসিন্দা হইয়াও পানুদা ওই বীভৎস মুখাকৃতি সহ্য করিতে পারেন না।

চলুন মশাই, ওদিকে গিয়ে বসা যাক। আমায় পানুদা অত্যন্ত অন্তরঙ্গের মত বলিলেন—আসুন, আসুন, ওর কথা সমস্ত খুলে বলব, যা শুনে রীতিমত আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবেন।

আমি জানি, গ্রামের এই নিকর্ম্মা লোকগুলি পরচর্চ্চা পাইলে আর কিছু চায় না। আমি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত, আমাকে একজন স্বগ্রামবাসীর অতীত ইতিহাস শুনাইবার কী মানে হইতে পারে। মনে জানিবার ইচ্ছা প্রবল থাকিলেও পানুদাকে এড়াইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিলাম, পানুদাকে এড়াইতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। তিনি আমার হাত ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়া দিলেন, তাঁহার এই জেদাজেদিতে আশেপাশের লোকেরা বেশ অবাক্ হইয়া চাহিতে লাগিল, এমন কি সেই লোকটিও কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে মনে হইল। অগত্যা এই নাছোড়বান্দা ভদ্রলোকের হাত হইতে রক্ষা পাইবার আশায় একটু দূরের এক বেঞ্চিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম।

বেঞ্চিতে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত পানুদা পকেট হইতে বিরাট এক পানের ডিবা বাহির করিলেন, তারপরে ডিবা খুলিয়া গুটি আষ্টেক পান একসাথে মুখে পুরিয়া দিয়া আমাকেও ডিবাটা আগাইয়া দিলেন। ভদ্রতার খাতিরে পান লইতে হইল।

শুনুন তবে বলি। পানুদা আরম্ভ করিলেন—ওই লোকটাকে দেখলেন না, ওর নাম হরেন মণ্ডল। পাঁচ-ছয় বৎসর আগেও হরেন ছিল যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি গাইতে পারতো চমৎকার। ওর কীর্ত্তন-গান শোনবার জন্যে দশ খানা গাঁয়ের লোক পাগল হয়ে উঠতো।

পরচর্চ্চা করিতে সংস্কারে বাধিলেও পানুদার কথায় এবারে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলাম।

একবারের ঘটনা তবে শুনুন। ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন। —তখন বুঝি পৌষ মাস, দারুণ শীত। সেই শীতের মধ্যে একদিন হরেন মণ্ডলের কীর্ত্তন-দলের নিমন্ত্রণ এলো পাকৃশীলা গ্রাম থেকে। আমি ম'শাই গাইতে-টাইতে জানি না,তবে কিনা হেঁ হেঁ……পানুদা সেই বিচিত্র হাসিতে চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া আনিলেন—হরেন আমায় ভালবাসে খুব! ও বললে, পানুদা তোমায় যেতে হবে আমার দলের সঙ্গে। ভাবলাম, মন্দ কি, ঘুরেই আসা যাক, আর কিছু না হোক খাওয়ার সুখটাতো হবে।

—আরে ম'শাই, আগে কি জানতাম পাকৃশীলা গ্রামে যেতে এতো হ্যাপাজত পোহাতে হবে! দামোদর পার হয়ে ধোঁকাতে ধোঁকাতে আমরা রাত ন'টা নাগাদ তো গাঁয়ে পঁহুছালায়। তারপরে গিয়ে যা শুনতে পেলাম তাতে চক্ষু চড়কগাছ। পানুদা আর দুটি পান ডিবা হইতে লইয়া মুখ-বিবরে চালাইয়া দিলেন।

মনে হইল সেই অদ্ভুত লোকের কাহিনীটি যেন ক্রমেই জমিয়া উঠিতেছে। ট্রেন বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে দুইপার্শ্বের ক্রমবিলীয়মান ধান্যক্ষেত্রকে পশ্চাতে ফেলিয়া, দ্রুত চলার শব্দ একছন্দে ভাসিয়া আসিতেছে। আমি উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—তারপরে কী হ'ল?

পানুদা পুনরায় সুরু করিলেন—তারপরে আমরা সেই রাত্রে গাঁয়ে গিয়ে শুনলাম যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আমাদের গান গাইবার কথা ছিল, সেই বাড়ীর গিন্নী হঠাৎ হার্টফেল্ করে মারা গেছেন। তখন বুঝতেই পাচ্ছেন আমাদের অবস্থা। বিদেশ বিভুঁই, শীতকাল, তাতে রাত হয়েছে, আর এমন অবস্থা যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েও উঠা যায় না। কী করা যায়, দলের সকলে তো পথের ওপরেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

—আমার তখন বুঝতে পারছেন মনের অবস্থা। যার লোভে এতদূর এলাম তা তো জুটলোই না, উপরন্তু কোথায় গিয়ে যে রাতটুকু কাটাবো, তারও ঠিক নেই।

—এতো বিপদেও কিন্তু হরেনমণ্ডল ভয় পেলো না। সে দলের আর সকলকে বললে, দাঁড়াও আমি দেখছি কোনো আস্তানা পাওয়া যায় কিনা।

—আমরা রাস্তার একপাশে বসে রইলাম, হরেন সেই রাত্রে আস্তানার সন্ধানে বেরিয়ে গেল একলাই।

—প্রায় আধঘণ্টা বসে আছি, হরেনের কোনো পাত্তাই নেই। মনে মনে গজরাচ্ছি আর হরেনের মুণ্ডু-পাত করছি, এমন সময় ব'লব কি মশায় সে যেন এক অদ্ভুত ব্যাপার—পানুদা তাহার পানের রঙে রঞ্জিত দন্তগুলি বিকশিত করিলেন।

—হরেনমণ্ডল এসে হাজির হ'ল। কিন্তু একা নয় সঙ্গে একজন মেয়েছেলে। অন্ধকারে ভালো ঠাহর না হ'লেও মনে হ'ল মেয়েটির বয়স খুব বেশী নয়, এই চব্বিশ পঁচিশ হবে। পরণে সাদা থান, বিধবার বেশ, কি অতো অন্ধকারের মধ্যেও মেয়েটির রূপ যেন বিদ্যুতে মত মনে হ'ল, আঃ, কী রূপের জৌলুষ ম'শায়!

আমি অধৈর্য্য হইয়া বলিলাম—দেখুন সময় কম, ওসব বাজে অলঙ্কার বাদ দিয়ে গল্পটা সংক্ষেপে বলুন।—হেঁ হেঁ বুঝলেন কিনা ওসব না বললে আবার গল্প জমে না পানুদা পুনরায় দন্ত বিকশিত করিলেন।—যাক, তারপর শুনুন। হরেন তো সকলের সামনে এসে বলে উঠল—আজ রাতের মত ইনি আমাদের ওনার বাড়ীতে থাকতে দিতে রাজী হয়েছেন। আমরা সকলেই মেয়েটির দিকে চাইলাম। আমাদের বিস্মিত দৃষ্টি দেখে মেয়েটি এবারে কথা কইলে—আপনারা যদি দয়া করে আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেন, তা'হলে ধন্য হ'ব।

মেয়েটির কথার ধরণ দেখে আরো অবাক্ হয়ে গেলাম। এই অজ পাড়াগাঁর মধ্যে কে এই সাহসী মেয়েটি—যে এতোগুলি লোককে এই গভীর রাত্রে নিমন্ত্রণ করতে একা এসেছে? সকলেই বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে আমরা মেয়েটির সঙ্গে তার বাড়ীর দিকে যাবার জন্য চলতে লাগলাম।

তারপরে শুনুন ম'শাই আরো আশ্চর্য্যের কথা পানুদা আরও দুইটি বিরাট পান মুখে চালাইয়া দিয়া বলিলেন—প্রায় দশমিনিট চলার পরে আমরা যে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম তাকে ঠিক বাড়ী বলা যায় না প্রাসাদ বললেই চলে। পাড়াগায়ের মধ্যে অতবড় বাড়ী প্রায় দেখা যায় না। প্রকাণ্ড বাড়ীটা ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে সেই বিরাট বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন যেন শিউরে উঠল।

মেয়েটি আমাদের মৃদুস্বরে বললে—আসুন, ভেতরে আসুন। আমি আর কৌতূহল চাপতে না পেরে হরেনকে বললাম—হরেন, কে এই মেয়েটি?

হরেন বললে চুপি চুপি—রায়দের সেজ তরফের মেয়ে, এর বেশী আমি আর কিছুই জানি না পানুদা।

প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীর মালিকের প্রাচীন কালের ঐশ্বর্য্য এখনও এখানে সেখানে অতীত দিনের সাক্ষীর মতই দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অতবড় বাড়ীতে এক জন বুড়ো চাকর ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পেলাম না।

বিধবা মেয়েটি আমাদের বাইরের ঘরে বসতে বলে অন্ধকার বাড়ীর মধ্যে দ্রুতপদে মিলিয়ে গেল, আমার কেমন যেন ভালো লাগছিল না সমস্ত ব্যাপারটা। সার

রাস্তা মেয়েটি সঙ্গে ছিলো বলে কৌতূহল চাপতে হয়েছিল, এবারে সুযোগ পেয়ে হরেনকে বললাম—হরেন, ব্যাপার কি বল দেখি, এতো বড়ো বাড়ী, মেয়েছেলে এলো আমাদের এগিয়ে নিতে, এর মানে কি?

হরেন বিরক্ত হয়ে বললে—কেন এতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কোনো পুরুষ অভিভাবক নেই, কাজেই ভদ্রতার খাতিরে ওঁকে নিজেই আসতে হয়েছিল তোমাদের আনবার জন্যে। থাকবার মধ্যে এক আছে বুড়ো চাকর দীনু, সেও আবার রাতকাণা।

আমি আরো আশ্চর্য্য হলাম হরেনের কথা শুনে। এতো বড়ো বাড়ীতে এই মাত্র একটি কম বয়েসি মেয়ে থাকে সঙ্গে একটা অথর্ব্ব চাকর নিয়ে?

কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটি একটি হ্যারিকেন হাতে করে আমাদের সামনে এসে বললে—আপনারা বাইরের ওই ঘরটায় আর বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিন, আসুন।

হ্যারিকেনের আলোকে এইবারে মেয়েটিকে ভালো করে দেখবার আমার সুযোগ হ'ল। কী অপূর্ব্ব রূপ ম'শায়, সমস্ত গা দিয়ে যেন রূপ-যৌবন ঠিকরে পড়ছে। পানুদাকে অলঙ্কার বাদ দিয়ে কাহিনীটি শেষ করিবার জন্য পুনরায় সতর্ক করিয়া দিলাম।

হ্যাঁ হ্যাঁ, শিগ্‌গিরই শেষ করছি। পানুদা বলিলেন —সে রাত্তির আমাদের কোনো ঝঞ্ঝাট হল না, বেশ ভালো ভাবেই কেটে গেল। বুড়ো দীনু মুড়ি-নারকেল, নাড়ু-দুধ ও জল দিয়ে গেল। তাই খেয়েই তক্তাপোষে গড়িয়ে পড়লাম। তারপরে কখন যে ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলাম তা মনে নেই।...

সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথমে চোখ পড়ল পাশের দিকে। দেখি হরেন বসে রয়েছে, দলের আর সবাই তখনো ঘুমাচ্ছে।

হরেন আমাকে জাগতে দেখে বললে—পানুদা শ্যামা ঠাকুরুণ আজও আমাদের ছাড়বেন না বলে পাঠিয়েছেন। কাল রাতে ভালো করে খাওয়া হয়নি, কাজেই এইখানে খেয়ে তারপরে সবাই যেতে পারব।

শ্যামা ঠাকুরুণ? সে আবার কে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।

—কাল যে বিধবা মেয়েটিকে দেখলে, তাঁরই নাম শ্যামা। বিশ বৎসর আগেও রায়েরা ছিল দুর্দ্দান্ত জমিদার। দীনুর মুখে সব শুনছিলাম। একদিন এ-বাড়ীতে নাকি হাতী বাঁধা থাকত। তারপরে একে একে সবই উবে গেছে কর্পূরের মত, শেষ অবধি মানুষ একটাও রইল না বংশে বাতি দিতে। একমাত্র বেঁচে আছে ওই মেয়ে শ্যামা, ওরও শ্বশুর-বংশের কেউ বেঁচে নেই। থাকে একা এখানে। একমাত্র বুড়ো দীনু ওর সহায়। আমি কাল বাড়ী এসে কড়া নাড়তেই দীনু বেরিয়ে আসে, তারপরে দীনুকে সব কথা খুলে বলাতে উনি আড়াল থেকে সব কথা শোনেন, নিজেই বেরিয়ে এসে বলেন—চলুন, আমি গিয়ে আপনার দলের লোককে নিয়ে আসছি। আপনারা আজ আমার বাড়ীতেই থাকবেন। সে কি কথা, এতোগুলি ভদ্রলোক কষ্ট পাবেন এই শীতে সারা-রাত বাইরে বসে বসে? ওঁনার বাপের বাড়ী এখানে হলেও বিয়ে হয়েছিল পশ্চিমে, যেখানে হয় ত পাড়াগাঁয়ের মত খুব আবরুর বালাই ছিলো না, তাই মনে হয় একাই কাল রাতে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহস করেছিলেন। তারপরেতো সবই জানো পানুদা। আজ সকালেও দীনুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন যে, আমাদের যাওয়া হবে না, খেয়ে যেতে হবে। আর এরকম উঁচুমন হবে নাই-বা কেন? কত বড় ঘরের মেয়ে দেখতে হবে তো।

আমি বলিলাম—না, মেয়েটি ভালোই বলতে হবে। এ বাজারে কে কার জন্যে এমন করে বাপু। তা এক কাজ করনা হরেন। আমরা অমনি অমনি কেন খেয়ে যাব ওঁনার? সকালেই দুএকখানা গান জুড়ে দাও-না বরঞ্চ। তবু খানিকটা শোধ দেয়া হবে।

হরেন লাফিয়ে উঠল—ঠিক বলেছ পানুদা। আমার মনটাও খচ্‌খচ্ করছিল, একা মেয়েছেলে হয়ে আমাদের এমন উপকার করছেন, আর আমরা কিছুই দিতে পারছি না। খাসা বুদ্ধি বাতলিয়েছ পানুদা। ওরে ওই ওঠ-ওঠ-সব। উঠে পড, গান ধরতে হবে। হরেনমণ্ডল দলের সকলকে তাড়া দিলে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তোড়জোড় করে আসর তৈরী হ'ল। ইতিমধ্যে দীনুর মুখে খবর পেয়ে বহু লোক এসে রায়বাড়ীতে জড়ো হয়েছিল গান শোনবার জন্যে। আসর নিজেরাই তৈরী করে নিলাম। বাঁ পাশে পুরুষেরা বসেছে, আর ডানদিকে একটু উঁচু দাওয়ায় মেয়েরা, ওদের মধ্যে আমাদের আশ্রয়দাত্রী শ্যামাকেও দেখলাম। বয়স পঁচিশের মধ্যেই হবে, আঁটসাঁট দেহের গড়ন, সমস্ত শরীরে একটা লাবণ্য মাখানো রয়েছে, যা দেখলেই চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

আমি এবারে না হাসিয়া পারিলাম না। বলিলাম—পানুদা আপনি নিশ্চয়ই কবি, কিন্তু কাব্য বাদ দিয়ে না বললে সবটা শোনা হবে না যে। সত্য কথা বলতে কি, ঘটনাটির শেষ শুনিবার জন্য আমি ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম।

আচ্ছা আচ্ছা ম'শায় শিগ্‌গির শেষ করছি। আর আমাকেও পরের ষ্টেশনে নেমে যেতে হবে। পানুদা হাসিয়া উত্তর দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গান সুরু হ'ল। হরেন মণ্ডল শ্রীকৃষ্ণ সেজে আসরে এসে নামল। চমৎকার মানাত ম'শাই ওকে ওই শ্রীকৃষ্ণের বেশে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল, কপালে তিলক আঁকা, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ হলদে শাড়ী পাক দিয়ে পরা। হরেনের সে রূপ দেখলে মুগ্ধ হত না এমন লোক খুব কমই ছিল, বিশেষ করে মেয়ে লোক, পানুদা অদ্ভুত ভঙ্গিতে চোখ কুঞ্চিত করিলেন।—তারপরে গান সুরু হল, কুঞ্জভঙ্গের গান। সে কি কণ্ঠ ম'শাই, যেন বাঁশী থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে। হরেনের গলার সুরে আর বলার ভঙ্গিতে সবারই চোখ জলে ভরে গেল।

তারপরে সেদিন তো বটেই উপরি উপরি সাতদিন ধরে আমাদের সে গ্রামেতে গান চলল। তাতে দলের আয় হচ্ছিল মন্দ নয়।

আমরা থাকতাম কিন্তু রায়েদের বাইরের বাড়ীতে। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজেরাই করে নিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে দীনুর মারফতে শ্যামা ঠাকরুণ আমাদের সাহায্য করে পাঠাতেন, তদ্বিরের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আর কোন দিনের জন্য শ্যামাঠাকরুণ আমাদের সামনে বেরোননি, অথচ যখন আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম, তখন অতরাত্রে একা আমাদের এগিয়ে আনবার জন্যে গেছলেন। ব্যাপারটা যেন কেমন হেঁয়ালী বলে মনে হচ্ছিল।

পাশাপাশি তিনখানি ঘর। এক খানিতে রান্না হ'ত, দ্বিতীয় খানিতে দলের আর সকলে থাকে, আর তৃতীয় খানিতে আমি ও হরেন থাকি।

সেদিন দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে সবে ঘুমিয়েছি। হঠাৎ একটা বিকট চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। চিৎকারটা মনে হয় অন্দর-মহলের দিক থেকে আসছে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! গলার আওয়াজটা হরেনের না? দলের কেউ তখন বাড়ী নেই, সবাই খেয়ে আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। আমি খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করলাম, তারপরে অন্দরের দিকে ছুটে গেলাম ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে। তখনও করুণ আর্ত্তনাদ সমস্ত বাড়ীটায় ধাক্কা খেয়ে ঘুরছে।

সন্ধান করে করে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম, দরজা বন্ধ, আর্ত্তনাদ তার মধ্য থেকেই আসছে, হ্যাঁ এ হরেনের আর্ত্তনাদ, যেন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। হরেন কি তবে বিপদে পড়েছে? কোন চিন্তা করবার আগেই মারলাম দরজায় এক লাথি। দরজাটা ভেজানোই ছিল, দড়াম করে খুলে গেল। খুলে যেতেই যে দৃশ্য আমার চোখে পড়ল, তা ম'শাই মনে হলে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। নিজের চোখকেই যেন তখন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দেখলাম হরেন মণ্ডলকে একটা খাটের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে আষ্টে-পৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে। সামনে দাঁড়িয়ে শ্যামাঠাকরুণ আর দীনু। দীনুর হাতে একটা হাতা, পাশে এক প্রকাণ্ড মালসায় কাঠকয়লার আগুন গন্‌গন্ করছে। আর বেচারা হরেন! তার সমস্ত মুখটা পুড়ে গিয়ে কুঁকড়ে বীভৎস হয়ে গেছে, চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছে, জলন্ত কাঠকয়লা তার মুখের ওপর চেপে ধরা হয়েছে। একী কোন রূপকথার দৈত্যের কাহিনীর অভিনয় দেখছি? বিস্ময়ে প্রথমটা আমি আড়ষ্ট হয়ে গেলাম।

পানুদার মুখে একজন নারীর এরূপ নৃশংস মনোবৃত্তি শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। উঃ! কী পৈশাচিক, কী অমানুষিক!

পানুদা বলিলেন—সে কিন্তু খানিকক্ষণ, তারপরেই রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। এ কি রাক্ষসী না দানবী? মিষ্টি কথায় আমাদের ভুলিয়ে রেখে এখন আত্মপ্রকাশ করেছে। কি করছি ভাববার আগেই দারুণ উত্তেজনায় আমি পাশ থেকে দরজার হুড়কোটা তুলে নিলাম। তারপরে সে হুড়কো দিয়ে মারলাম দীনুর কোমরে এক ঘা। দীনু 'বাপ' বলে বসে পড়লো। এ সব ঘটনাগুলো ঘটে গেল এক নিমেষে। শ্যামা চকিতে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। উঃ কি রূপ! এই রূপের মধ্যে এতখানি পাপ। হোক মেয়েছেলে, ওরও আজ নিস্তার নাই আমার হাতে।

—বাধা দিলে হরেনের অবস্থা। নির্ম্মম অত্যাচারে সে তখন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছে।

—আমি নিজেকে সামলে নিয়ে হরেনের কাছে এসে ওর মুখের অবস্থা দেখে বুঝলাম শিগ্‌গীর ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে ওকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁই, আমি একা কি করি। আমি ওর দড়ির বাঁধন-গুলো খুলে দিলাম। শ্যামা তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবারে ভাবলাম, ও পাগল নাকি, গ্রামের লোকজনকে ডাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

—গ্রামের লোক ভেঙে পড়লো সংবাদ পেয়ে। হরেনকে ওপারে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল নৌকা করে। খবর পেয়ে পুলিশ এলো অনুসন্ধানে। আমাদের সাক্ষ্য নিয়ে দীনু ও শ্যামাকে সদরে চালান দিলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে পুলিশের হাজার জেরাতেও শ্যামা একটিও জবাব দিলে না। অদ্ভুত তার দৃষ্টি, যেন কোন পাপই তার দ্বারা ঘটতে পারে না।

সরকারের সঙ্গে শ্যামার মামলা চলতে লাগল। দলের অপরেরা, গ্রামের লোকেরা এবং আমি সাক্ষ্য দিতে লাগলাম দিনের পর দিন। দীনু স্বীকারোক্তি করলে যে, শ্যামাঠাকরুণ তাকে প্ররোচিত করেছিল—মূল পায়ের

হরেনের মুখটা যাতে বিকৃত হয়ে যায় তার জন্যে। সে নিজে এর কারণ জানে না। তবে দিদিমণির কাছে শুনেছিল, ওর মুখ বিকৃত না করলে রায়বংশে কলঙ্ক লাগবে। দীনু রায়বংশের নিমক খেয়ে মানুষ, কাজেই সে বংশের কলঙ্ক বাঁচাবার জন্যে দীনু সব করতে পারে।

—দীনুর স্বীকারোক্তি শুনে আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এ আবার কি ব্যাপার,-হরেনের সুন্দর মুখখানা বিকৃত না করলে রায়বংশের কলঙ্ক হবে। আমাদের বিস্ময় ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে।

—দীনুর স্বীকারোক্তি আর আমাদের সাক্ষ্য একত্র করে প্রমাণিত হল—শ্যামা ও দীনুর অপরাধ। এখনও হরেনের সাক্ষ্য বাকী।

কিছুদিন বাদে হরেন সুস্থ হয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালো। তাহার মুখের দিকে চেয়ে আদালতের সমস্ত লোক শিউরে উঠল। উঃ! কী সাংঘাতিক মুখের চেহারা। সমস্ত চামড়া কুঁচকে গিয়ে একধারে ঝুলে পড়েছে, বীভৎস চোখের দৃষ্টি মলিন, হরেনের সেই সুন্দর মুখ রাক্ষসীর জন্যে কী অবস্থা হয়েছে। সকলেই হরেনের জন্যে সহানুভূতির নিশ্বাস ফেললে।

হরেনকে উকিল জিজ্ঞাসা করলে—আপনার মুখের ওইরূপ অবস্থার জন্যে দায়ী কে?

হরেন গম্ভীরভাবে বললে—আমি নিজে।

—আদালতে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় লোকে অতো বিস্মিত হ'ত না, যেমন হ'ল হরেনের উত্তরে। আমরা ভাবলাম, লোকটা বলে কি? পাগল হ'ল নাকি। সমস্ত আদালতে একটা গুঞ্জন উঠল।

—সরকারী উকিলও এরকম উত্তরের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। সামনে গিয়ে তিনি বললেন—দেখুন তো সামনের ওই মেয়েছেলেটাকে চেনেন কি না? সামনের আসামীর কাঠগড়ায় শ্যামার দিকে তিনি আঙুল দেখিয়ে দিলেন।

—হরেন তার বীভৎস চোখ দুটো দিয়ে স্থিরভাবে শ্যামার মুখের পানে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। শ্যামার সমস্ত মুখ কেমন যেন পাংশুল হয়ে গেল, সে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিলে।

—হরেন মৃদু হেসে পরিষ্কার ভাবে বললে, হাঁা, চিনি বই কি ওঁনাকে। উনি একবার আমাদের বাঁচিয়েছিলেন আশ্রয় দিয়ে, তারপরে সাতদিন ক্রমাগত ওঁর বাড়ীতে থেকেই আমরা গ্রামে গান গেয়েছিলাম। আর আমার এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে তো ওঁনারই বাড়ীতে। তামাক খাবার জন্যে আমি শ্যামাঠাকরুণের রান্নাঘরে যাই, তারপরে কীসে যেন হোঁচট্ খেয়ে পড়ে যাই পাশের উনানের ওপরে মুখ থুবড়ে। দীনু আর উনি আমায় বাঁচাবার জন্যে ছুটে আসেন। তারপরে আর আমার কিছু মনে নেই। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।

উকিল বললেন,—আপনি জানেন কি, দীনু কিন্তু স্বীকার করেছে যে, সে শ্যামাঠাকরুণের আদেশে আপনার মুখের এ-অবস্থা করেছে।

হরেন উত্তেজিত হয়ে উঠল—আপনারা জেরায় বুড়ো মানুষের কাছ থেকে কি কথা আদায় করে নিয়েছেন আমি জানি না, কিন্তু যা সত্য তাই বললাম। আমার এই অবস্থার জন্য কেহ দায়ী নয়, দায়ী আমি নিজে।

—আমি তো মশাই থ'। এ বলে কি? ওর ভালোর জন্যে এতো করলাম, আর আমাদের মিথ্যেবাদী বলে সকলকার সামনে প্রচার করলে? বুঝলাম, ভিতরে গভীর রহস্য আছে। শ্যামার যৌবন ও রূপ ছোঁড়াটার মাথা খেয়েছে।

—উকিল আর কি করবেন। তবু তিনি পাঁচ-সাত বার নানারকম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা করলেন। কিন্তু হরেনের সেই একই উত্তর পেয়ে শেষকালে তিনি বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। ওদিকে হরেনের জেরা শুনতে শুনতে শ্যামাঠাকরুণ কাঠগড়াতেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। ছিনালী আর কি, ওসব মেয়ে কত ঢঙই জানে, কি বলেন ম'শাই।

ট্রেনের গতি ক্রমে মন্থর হইয়া আসিতেছিল, শীঘ্রই কোন ষ্টেশনে দাঁড়াইবে বোধ হয়। পানুদা আননবিবরে আরো দুইটা পান চালাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—আচ্ছা নমস্কার, চলি ম'শাই, আমাদের ষ্টেশন এসে গেছে। হরেন মণ্ডলের কাহিনী শুনিতে শুনিতে কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পানুদার কথায় চমক ভাঙ্গিল।

ট্রেন মন্থর-গতিতে ষ্টেশনে প্রবেশ করিতেছে। পানুদা উদ্যোগী হইয়া কামরার দরজা খুলিয়া ফেলিলেন।

ট্রেন একটা ধাক্কা দিয়া ষ্টেশনে একেবারে তাহার গতিরোধ করিল। ষ্টেশনের ফেরিওয়ালাদের বিচিত্র চিৎকারে আর যাত্রীদের ব্যস্ততার কলগুঞ্জনে সমস্ত ষ্টেশনটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

আমি আগ্রহ চাপিতে না পারিয়া পানুদাকে চুপি চুপি বলিলাম—হরেন মণ্ডলকে তো দেখলাম। আর সেই শ্যামাঠাকরুণ কোথায়? সে এখনো বেঁচে আছে?

পানুদা দরজার হাতল ধরিয়া প্ল্যাটফরমে নামিতে নামিতে আমার দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন—কে? শ্যামাঠাকরুণ? সে এখন হরেনের সঙ্গেই বাস করছে। ওই যে এই ট্রেনেই যাচ্ছে। ওই যে হরেনের একটু দূরে

ও পাশেই যে স্ত্রীলোকটি বসে রয়েছে, সেই-ই। ওরাও নামবে এখানেই, আপনার পাশ দিয়েই আসতে হবে, দেখুন না। হেঁ হেঁ দাদা, নাকি মেয়েছেলের কথা, দেবতারাই বুঝতে পারেন না, আমরা তো মানুষ, বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসিতে হাসিতে পানুদা গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন।

আমি বিস্ময়ে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম হরেনের পাশে একটি নারীকে। কিছুটা আড়াল পড়াতে পূর্ব্বে আর একে লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই। যৌবন গত হইবার উপক্রম করিলেও নারীটি তাহার সমস্ত দেহে বসন্তকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এমন একখানি নিখুঁত মুখ আমি ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই বলিয়াই মনে হইল। এই-ই শ্যামাঠাকরুণ? আমি অবাক্ বিস্ময়ে উহাদের পানে চাহিয়া রহিলাম।

হরেনের হাত ধরিয়া শ্যামাঠাকরুণ আমার সামনে দিয়াই গাড়ী হইতে নামিল। নামিবার সময় কি সন্তর্পণতা, যাহাতে না হরেন পড়িয়া যায়। ধীরে ধীরে পরম যত্নে ও একাগ্রতায় শ্যামা হরেনকে ধরিয়া নামাইল। হরেনও একান্ত নির্ভরশীলতায় শ্যামার হাতে নিজেকে অর্পণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

আমি মুহ্যমান অবস্থায় উহাদের গতি-পথে চাহিয়া রহিলাম। অকস্মাৎ দেখি, শ্যামা ও হরেন ষ্টেশনের ভীড়ের মধ্যে কখন মিলাইয়া গিয়াছে।

চোখ গেল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শুনিতেছি পাখী চারিদিকে মোর 'চোখ গেল' বলে ডাকে,
সত্য কি তারা দেশের খবর রাখে?
চলে সুগঠিত গুণ্ডাদলের হত্যার অভিযান,
নিতি নারীদের লাঞ্ছনা অপমান,

বিদ্যালয়েতে স্তূত লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রদর্শনী,
প্রার্থনাগার মারণাস্ত্রের খনি!
ভ্রমণোদ্যান শ্মশান হয়েছে শকুনি নাড়িছে পাখা।
জনাকীর্ণ সে বাজার হয়েছে ফাঁকা,

মহড়া দিতেছে যুগের যুগের যুক্ত বর্ব্বরতা
দেখিয়া পাখীর বক্ষে বাজে কি ব্যথা?
দেখ্‌ছি হঠাৎ শান্ত্রী পাহারা হয়েছে পুত্তলিকা।
রাজশ্রীর সে বর্ণ হয়েছে ফিকা।

সহজ সরল জীবনযাত্রা সহসা হয়েছে চুপ
শাসন-যন্ত্রে শিথিল সকল ক্রূপ।
বদল হ'য়েছে বদল হ'তেছে যেটুকু রয়েছে বাকি
দেখিতে শুনিতে উৎসুক হয়ে থাকি,
ভাবি কোন দিন হয় তো শুনিব প্রিয় ও পাখীর ঝাঁকে
'চোখ গেল' নয় 'প্রাণ গেল' বলে ডাকে।

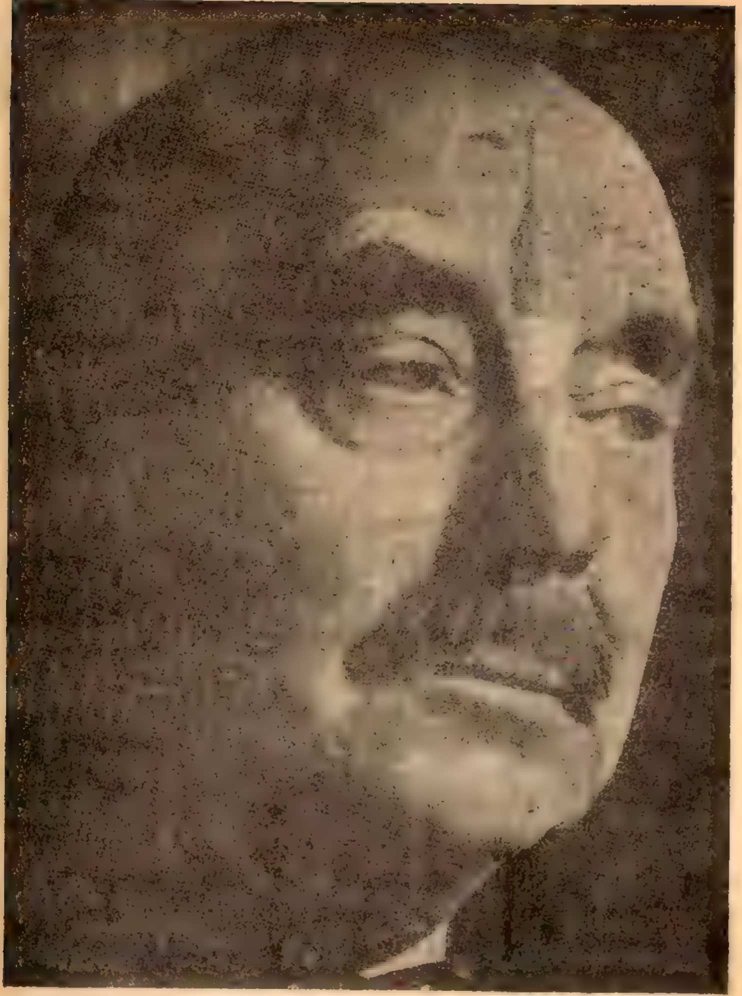

এইচ, জি, ওয়েল্‌স

শ্রীমতিলাল দাশ

গত ১৩ই আগষ্ট বৈকালে যশস্বী লেখক ওয়েল্স্ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সংসারে বড় জীবন, স্বপ্নবিলাসী মন সুলভ নয়। রসজ্ঞ, গুণী, জ্ঞানী ও ভাবুক তিনি ছিলেন, কিন্তু সকলের উপর ছিল তাঁর বিশ্বজনীন আত্মীয়তা-বোধ। বর্ত্তমানের জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে তিনি শাস্ত্রীর মত আয়ত্ত করিয়া এক মহাসামঞ্জস্যময় জগৎরাষ্ট্র গড়িবার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সে স্বপ্ন তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয়। তাঁহার ছিল গগন-বিহারী তৃষ্ণা। তাঁহার নানা লেখা ও নানা পুস্তকে তিনি বিশ্ববোধের এবং বিশ্বরাষ্ট্রের যে কল্পনা যুক্তি, ইতিহাস ও বার্ত্তার সমন্বয়ে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা বাস্তবে পরিণত হয় নাই, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার লেখাকে ভালবাসেন, তাঁহারা তাঁহার শ্রদ্ধার তর্পণ করিবেন, তাঁহার মহৎ অনুভূতিকে সত্যে রূপান্বিত এবং বাস্তবে প্রকটিত করিবার জন্য—ইহা আদৌ দুরাশা নহে।

ওয়েল্সকে আমি ভালবাসি। আজ তাঁহার মৃত্যুর বিয়োগ-ব্যথায় তাঁহার বিরাট অবদানকে সমালোচকের দৃষ্টিতে আলোচনার সময় নয়। আজ এই দরদী বিশ্ববন্ধুর দরদী হৃদয়ের পরিচয় দেওয়ার দিন। তাঁর লেখায় যাদু নাই, নাই কবির অনুপম স্বপ্ন। তাঁহার লেখায় আছে শান্ত ধ্যান-মৌন গাম্ভীর্য্য। তাহা রস-সংবেদনাময় কিন্তু সুর ও আলোকে ভুবন ছাইয়া ফেলে না। কবি দেন আলো, যে আলো আমাদের ভাব-ব্যাকুল হৃদয়-তটে আছড়াইয়া পড়িয়া প্রেমের তরঙ্গে তরঙ্গে উদ্বসিত হইয়া ওঠে। ওয়েল্সের লেখায় এই মাধুরী বন্যা নাই। গানে, তানে, ছবিতে রেখায়, গন্ধে ও বর্ণে তাঁহার রচনা কল্লোলিত নয়। কিন্তু তাঁহার সংহত শিল্পী-মন সত্যকার রূপশিল্পী। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে বুদ্ধির দীপ্ত মশাল চাই, কিন্তু সেই মশালালোকে একবার তাঁহার কাব্যগুহার ভিতরে প্রবেশ করিলে পাঠক সত্যকার কাব্যরসামৃত উপভোগ করিবেন। ওয়েল্সের কথায় সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে তাঁহার রচনার বহু শাখান্বিত বিচিত্রতা এবং বিপুলতা। তাঁহার পুরা নাম হারবার্ট জর্জ্জ ওয়েল্স্। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কেণ্ট জেলার ব্রমলি নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দরিদ্রের সন্তান; প্রথমে তিনি এক কাপড়ের দোকানে কাজ করেন—পরে এক স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষকরূপে একযোগে কাজ করেন। শেষে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস্-সি ডিগ্রি গ্রহণ করেন। এখানে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হাক্স্লির বক্তৃতা তাঁহার বৈজ্ঞানিক অনুরাগ বাড়াইয়া তোলে। তাহার পর তিনি নানাকাজে নানাভাবে তাঁহার দীর্ঘজীবন যাপন করিয়াছেন।

১৮৯৫ সালে তিনি প্রথম উপন্যাস রচনায় হাত দেন। তাহার পর নানাদিকে নানাভাবে নানাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা একটি ছোট প্রবন্ধে সম্ভব নয়। আমরা কেবল দিক্ নির্দ্দেশ করিতে পারি। বিজ্ঞানের মধ্যে যে অদ্ভুত রস আছে, জীবতত্ত্ব এবং পদার্থবিদ্যার সেই সব অনুপম সম্ভাবনা নিয়া তিনি নানা বৈজ্ঞানিক গল্প এবং উপন্যাস লেখেন। বিজ্ঞানের মায়া ভুলিয়া পরে তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। সাম্যবাদী এবং সমাজ-বিজ্ঞানী ওয়েল্স্ তাঁহার বহু রচনায় কেমন করিয়া মানুষ এই পৃথিবীতে সুন্দরতর, মধুরতর এবং শ্রেষ্ঠতর জীবন যাপন করিতে পারে—তাহার সন্ধান করিয়াছেন।

বিশ্বজীবনের পটভূমিকায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের নাট্য-

রসকে কেন্দ্র করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বহুসমৃদ্ধ এই সব উপন্যাসের মূলকথা সমষ্টি ও ব্যষ্টি মানবের ঘাত-প্রতিঘাত। মানুষের জীবনে যে কুশ্রীতা, যে অসুন্দর, যে অমঙ্গল, যে ব্যাধি, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া তিনি চাহিয়াছেন ভাবী সমাধানের ইঙ্গিত করিতে, তাই এখানে বাকী সর্ব্বস্ব আর্টকে তিনি বড় বলিয়া মানেন নাই—তিনি দিতে চাহিয়াছেন ধ্বংসের ও প্রলয়ের মাঝে সৃষ্টির ও বিবর্দ্ধনের গীতা। তাই তাঁহার লেখা রসপরিবেশনকেই চরম মনে করে নাই; রসের পরিধির শেষে যে শিব আছেন, তাঁহাকে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ বৈজ্ঞানিক হইয়াও কার্ল টন্ এবং রাস্কিনের মত অর্দ্ধ আধ্যাত্মরসসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। রহস্তের পরিবেশ তাঁহার কল্পনাকে স্নিগ্ধ ও মেদুর করিয়াছে, বিস্ময়ের বিদগ্ধ রসিক তিনি, গভীর আকুতির সঙ্গে জীবনের পরম রহস্যকে বুঝিতে চাহিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়া যুগে ইংরেজী সাহিত্য ছিল পরিতৃপ্তির সাহিত্য। সেই নব রোমান্টিক যুগের শ্রুতিমধুর অসার বাণী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই নিঃশেষ হইয়া আসে। ওয়েল্‌স যখন লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন এই অশান্তির বেদনা, এই অভাববোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। রোমান্টিক যুগের ভাববিলাস, বর্ণচ্ছটা, ভাবের অন্তর্মুখিতা, রঙের ও সুরের অনুরণন আর রহিল না, বলদৃপ্ত বিশ্বাসী সাধকেরা আপন তেজে পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িবে, এই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হইল। এই সংস্কারক মনোভাব গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ওয়েল্‌সকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কর্ম্ম-পদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও সকলেই চাহে মোহনতর ও উজ্জ্বলতর জগৎ।

জর্জ্জ বার্ণাড শ' এবং হার্বার্ট জর্জ্জ ওয়েল্‌স দু'জনে এই মুক্তির পথ লাভ করিয়াছেন সাম্রাজ্যবাদের মাঝে। দু'জনের অনুপ্রেরণা এক হইলেও, উভয়ের আত্মপ্রকাশ বিভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। উভয়েই বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধির ক্ষুরধার চাকচিক্য উভয়ের পথের সহায়। এই শাণিত ও প্রোজ্জ্বল বুদ্ধির উপর উভয়ে সত্য, ধর্ম্ম ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা চাহেন। উভয়েই ফেবিয়ান সাম্যবাদের ভাবধারায় পরিপুষ্ট। কিন্তু শ' ন্যায়ের দীপ্তিতে জীবনের সফলতার সন্ধান করেন, তাই তাঁহার লেখায় ওয়েল্‌সের সেই যাদু নাই যাহা তাঁহাকে নবযুগের নবী করিয়া তুলিয়াছে। ওয়েল্‌স বাস্তববাদী—কিন্তু সেই বাস্তবতা তাঁহাকে জানাইয়াছে—মানুষের জীবনে আছে একটা অপরিমেয় অবিজ্ঞেয় স্বপ্ন ও সৌন্দর্য্য, তাই ভাবালুতা উপেক্ষণীয় নহে। আমাদের চেতন হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে পায় অজানার রহস্যপূর্ণ অগাধ অস্তিত্ব।

ওয়েল্‌স তাই শ্রীহীন যুক্তিবাদী হইয়া আমাদিগকে পীড়া দেন নাই, আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এক মহীয়ান্ পরিকল্পনার তাজমহলে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। আনতোল ফ্রান্স তাঁহার একটী লেখায় বলিয়াছেন—লেখাকে আমরা নিজের মন দিয়া খুঁজি, সেখানে আমরা যাহা চাই তাহাই পাই—লেখককে চাই না। ওয়েলসেক যদি এমনই ভাবে আমরা আপন করিয়া লইতে পারি, যদি তাঁর বহুব্যঞ্জনাময় বিশ্বাত্মবোধকে আমাদের নব জীবনের বেদ গড়িয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সার্থকতা লাভ করিতে পারিব।

গত যুদ্ধের নৃশংস ও নিষ্ঠুর বেদনা তাঁহার প্রেমময় হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তোলে। তিনি মানুষের জীবনের এই দানবিকতাকে শেষ করিয়া শান্তিময় সুখময় এক সোনালী ভবিষ্যৎ গড়িতে চান। তাঁর The outline of History, The science of life, The work wealth and happiness of mankind নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর অপূর্ব্ব বিশ্বাসকে কাব্যের ও যুক্তির ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিয়াছেন।

বিশ্বজনীনতা ওয়েল্‌সকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। তিনি যে বেদ হৃদয়-মন্দিরে পূজা করেন; তাহা বিশ্বপ্রেম। তাঁহার সুনিপুণ বুদ্ধি, তাঁহার তপঃসুন্দর দৃষ্টি, মানুষের শক্তির পরম পরিপূর্ণতা দেখে এই পৃথিবীর সর্ব্বভৌম বিশ্বরাষ্ট্রে। ধরণী দুর্ব্বহতার-দীর্ণা—তাহার সান্ত্বনার জন্য চাই সুগভীর মিলনের আকুতি। মানুষে মানুষে যে ভেদ তাহা বড় নয়। দেশ ও কালের যে ব্যবধান মানুষকে পরস্পরের নিকট অপরিচিত রাখিয়াছিল, সে অন্তরায় আজ খসিয়া পড়িতেছে। আজ সংকীর্ণতার অচলায়তন গড়িয়া চলিলে ভুল হইবে—আজ বিদ্বেষের সমস্ত প্রাচীর ভাঙ্গিয়া অচলায়তনকে বাহিরের মুক্ত প্রান্তরের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে হইবে।

তাঁর প্রথম জীবনের লেখা The time machine, The first man in the moon প্রভৃতি লেখার মধ্যে যে অপটু হস্তের লীলা-বৈচিত্র্য, ওয়েল্‌স নিজেই সে দৈন্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও এইসব রচনার সারল্য, সুন্দর রচনারীতি কৌতূহলী পাঠককে মুগ্ধ করে।

সমাজে মানুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের যে নব নব সমস্যা ফোটে, তাহা নিয়া তিনি যে সমস্ত বই লিখিয়াছেন, সেখানে তিনি বস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে জাতীয় অনুভূতির, বাস্তবতার সহিত প্রেমের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছেন।

ওয়েল্‌স অনেক উপন্যাস লিখিয়াছেন। ঘটনার মাঝে চরিত্রের রূপায়ন এই সকল উপন্যাসের উদ্দেশ্য নয়। ইহার আঙ্গিক, ইহার শিল্পরস স্বতন্ত্র। তাঁহার উপন্যাসে যেমন গভীরতর রস-বোধের অনুরাগ দেখি, তেমনই অমার্জ্জনীয় অনেক ত্রুটী দেখিতে পাই। লেখক তাঁহার আপন মতামত, আপন সমালোচনা, আপন দৃষ্টিভঙ্গী, বিষয় ও বিশ্লেষণ দিয়া তাঁহার চরিত্রগুলিকে অযথা ভারাক্রান্ত করিয়াছেন। চরিত্রগুলি খুব কম স্থানেই বাস্তব মানুষের প্রতিরূপ। সাধারণতঃ তাহা তাঁহার কল্পনার সৃষ্টি—হৃদয়ের রসাবেগে নয়, বুদ্ধির প্রদীপ্ত বর্ণরেখায়। নারী-চরিত্রের রূপাঙ্কনে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। সাধারণতঃ ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির রূপাঙ্কনে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা দেখি। তাঁহার রসবোধ সহজ ও সুন্দর, কিন্তু কোথাও তাহা অপূর্ব্ব সৌকুমার্য্যে ভাস্বর হইয়া ওঠে নাই।

কিন্তু ইহা মনে রাখিয়াও বলা যায়, তাঁহার রচনা প্রথম শ্রেণীর। সর্ব্বত্রই তাহা রসোত্তীর্ণ হইয়া পাঠককে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। সৌন্দর্য্যের সাধনায়, সুষমায় প্রদীপ্তিতে ঝলকিত না হইলেও, তাহা কোথাও বন্ধ্যা হয় নাই। আনন্দঘন কাব্য

তাহা নয়. কিন্তু তাহা বিদগ্ধ-চিত্তের প্রিয় বস্তু, সে বিষয়ে সন্দেহের আদৌ অবকাশ নাই।

তাঁর লেখা অজস্র। আজ মাত্র তাঁর দুইটি বইয়ের কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। A modern utopia বইটি তাঁর ১৯০৫ সালে লেখা, আর The work, wealth and happiness of mankind ১৯৩২ সালের লেখা। প্রথম পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বলেন যে, কল্পনাবিলাসীর দৃষ্টিতে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক নানা সমস্যার সমাধান এই পুস্তকটিতে তিনি করিতে চাহিয়াছেন। ইহার কাঠামো অচল নয়, তিনি চাহিয়াছিলেন সচল-সজীব গতি, যাহা নব নব পটভূমিকায় নব নব রূপান্তর লাভ করিতে পারে।

তাহার অনুবাদ ভাবা তুলিতেছি :—"For I see about me a great multitude of little souls and groups of souls as darkened, as derivative as my own; with the passage of years I understand more and more clearly the quality of the motives that urge me and urge them to do whatever we do. Yet that is not all I see, and I am not bounded altogether by my littleness. Even and again, contrasting with their immediate vision, come glompses of a comprehensive scheme, in which these personalities float, the scheme of a synthetic wider being, the great State mankind, in which we all move and go, like blood corpuscles, like nerve cells, it may be at terms like brain cells, in the body of a man. But the two visions are not seen consistently together. The motives needed in these wider issues come not into the interplay of my vanitis and wishes. That greater scheme lies about the men and women I know, as I have tried to make the vistas and spaces, the mountains, cilis, laws and order of utopia lie about my talking couple, too great for their sustained comprehension. When one focuses upon these two that wide landscape becomes indistinct and distant, and when one regards that, then the real persons one knows, grow vague and unreal. Nevertheless, I cannot separate these two aspects of human life, each connecting the other. In that incongruity between great and individual inheres the incompatibility I could not resolve, and which therefore, I have had to present in these conflicting form. At times that great scheme does seem to me to enter certain men's lives as a passion as a real and living motive; there are those who know it almost as it was a thing of derive; even for me, upon occasion, the little lures of the immediate life are seen small and vain, and the soul goes out to that mighty Being, to apprehend it and serve it and possess. But this is an illumination that passes as it comes, a rare transitory lucidity, leaving the soul's desine suddenly turned to presumption and hypocrisy upon the lips. One grasps at the universe and attain—Bathos. The hungers, the jealousies, the prejudices and habits have us again, and we are forced back to think that it is so, and not otherwise, that we are meant to serve the mysteries; that in these blinkers it is we are driven to an end we cannot understand. And their in measured merits in the right watches, or as can walk alone a while one bits in thought and speech with a friend, the wider aspirations glow again with a sincere emotion, with the colours of attainable derive."

মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে মাঝে মাঝে আসে আলোর চমক। মানুষ অনুভব করে এক বিরাট অনুভূতি। সেদিন তার ক্ষুধা, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, বিদায় লয়—সে বিপুলতায় ও বিরাটের অনুধ্যান করে। এই চমক স্থায়ী নয়—ক্ষণিক আসে ক্ষণিক যায়। মানুষের ছোট মন তার সর্ব্বস্ব নয়। আসে বৃহৎ রাষ্ট্রের, ভূমার স্পন্দন। এই দুই দ্বৈত মনোভাব উপেক্ষণীয় নয়। মানুষের মধ্যে আছে এই দুই দিক—তার দেবতাত্মা তার অন্তরাত্মা। প্রতি মানুষই এক সময় না এক সময় এই মহৎ বিরাটের সুসন্ধান পায়, মনে করে, তাহার সেবায় সে জীবন উৎসর্গ করিবে।

তাঁহার কল্পনার এই অপূর্ব্ব সৃষ্টিতে নব জগতের তিনি যে রূপ দিত চাহিয়াছেন, তাহা রহস্যের এই অগাধ অপরিমেয় মাধুর্য্যে একান্ত মধুর হইয়াছে। আজ মনীষীর মৃত্যু তাঁহার কল্পনাকে কি আমাদের জীবনে দীপ্ততর এবং সুন্দরতর করিবে না?—তা যদি না করে তবে আমাদের শ্রদ্ধা ব্যর্থ, আমাদের পূজা নিরর্থক।

দ্বিতীয় পুস্তকে প্রথমের কল্পনা প্রথমের ব্যঞ্জনা নাই; কিন্তু তথাপি মানুষের কর্ম্ম, শ্রম, অর্থ ও সুখের সন্ধানে বোদ্ধা লেখক যে তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন; তাহাও আশার সুরে অনুরঞ্জিত। মানুষের জীবনের কর্ম্ম-ইতিহাস গবেষণা করিয়া তিনি দেখিলেন যে, মানুষ চলিয়াছে প্রগতির পথে। দিনে দিনে তাহার শক্তি, তাহার প্রভাব, তাহার বুদ্ধি বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতেছে। মানুষের জীবনে বিঘ্ন ও বিপদ, ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি আসে, কিন্তু সকলকে ছাপাইয়া চলিয়াছে বিবর্দ্ধন ও ক্রমোন্নত গতি। দেশ ও কালের সমস্ত ব্যবধান ঘুচাইয়া মানুষ দেবমানবের বা মহামানবের জন্মোৎসবের ক্ষণে সমুপস্থিত; তিনি আশা করেন—বিশ্বরাষ্ট্র কেবল কল্পনা নয়,

তাহা সত্যে পরিণত হইবে এবং তাহার পর নব নব অভ্যুদয়ে সমুজ্জল প্রগতি ও সংস্কৃতি মানুষের জীবনে অভিব্যক্ত হইবে।

আমাদের জয়যাত্রা দুঃসাহসের জয়যাত্রা। আমাদের অভিযানে বাধা নাই, ব্যত্যয় নাই। মানুষের শ্রীবৃদ্ধির কোনও পরিসীমা নাই—অনন্ত অপরিমেয় তার সংস্কৃতির বৃত্ত। জ্ঞান—যাহা নিত্য বর্দ্ধমান, শক্তি ও কৌশল—যাহা নব নব রূপে অভিব্যক্ত, তাহার কাছে আগামী দিনের সমস্ত বাধা মাথা নোয়াইবে। আমাদের দৃষ্টি অসীমের দিগ্বলয়ে ঘা খাইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট নিয়তি বা পরিণতি আমাদের নয়। আমাদের শিখিবার কত আছে, জানিবার কত আছে। সেই অজ্ঞাত লোক আমাদিগকে পাঠায় আমন্ত্রণ। আমরা বিজয়ী হইব। মানুষের অপরাজেয় ও অনমনীয় সংকল্পের নিকট সমস্ত বিপর্য্যয় পরাজিত হইবে এবং অচিন্তনীয় এবং অকল্পনীয় সমৃদ্ধি, দীপ্তি ও গৌরবে আমাদের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

আশাবাদী ওয়েল্‌সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে সেই দুরধিগম্য নিত্য নব রূপশালী সংস্কৃতি-লক্ষ্মীর সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। নিরাশা আমাদিগকে ব্যাকুল করিবে না—কারণ আমরা জানি আমাদের মধ্যে এই যে বাঁচিবার ইচ্ছা — ইহার পিছনে রহিয়াছে এক অব্যক্ত, অনন্তভবনীয় তেজ, যাহার জ্যোতিতেও ইঙ্গিতে জগৎ পরিচালিত। "We are unable to belive that the universe that has evoked the will to love in ns can be without will" চিন্তাশীল ওয়েল্‌স যে অতীন্দ্রিয় উর্দ্ধতর লোকের দ্বারে আসিয়া থামিয়াছেন, ভারতীয় সংস্কৃতি সেখানে পথ দেখাইবে। বিজ্ঞানের ও প্রজ্ঞার সেই সমন্বয়ের দিকে পীড়িতা ধরিত্রী তাকাইয়া আছে।

সাড়া

[নুট্ হামসুন]

অনুবাদক—শ্রীঅশোককুমার ঘোষ

কোপেনহেগেন বন্দরের কোল ঘেঁসে ভেষ্টারভলড্ নামে রাস্তাটা সবে তৈরি কিন্তু ফুটপাতগুলো বেমালুম ফাঁকা। এক আধটা বাড়ি ও গ্যাসের আলো দেখা যায় রাস্তার উপর কিন্তু মানুষের সাড়াশব্দ নেই কোথাও। এখন, গ্রীষ্মকালেও কদাচিৎ লোককে বেড়াতে দেখা যায় এ দিকটায়।

গতকাল সন্ধ্যায় ঐ রাস্তায় উপর কিছু দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কয়েকবার এদিক ওদিক পায়চারি করেছি, এমন সময় উল্টো দিক থেকে একটি মহিলা এলো আমার দিকে। কাছে পিঠে আর কোন লোক নজরে পড়ে না। জ্বলছে গ্যাসের বাতিগুলো। কিন্তু তবুও সব অন্ধকার—এত অন্ধকার যে মহিলাটির মুখটাও ঠাওর করতে পারলুম না। মনে মনে আঁচ করলুম নিশাচারিণী শ্রেণীর হবে কেউ ; পাশ কাটিয়ে চলে গেলুম।

ফুটপাথের শেষে গিয়ে আবার ঘুরে হাঁটতে আরম্ভ করলুম পিছন দিকে। মহিলাটিও ঘুরলো, পুনরায় দেখা হ'ল তার সঙ্গে, ভাবলুম কারুর জন্যে বোধ হয় অপেক্ষা করছে। কার জন্য দেখতে কৌতূহল হ'ল আমার। আবার তার পাশ দিয়ে চলে গেলুম।

তৃতীয়বার তার কাছে এসে টুপিটা একটু নামিয়ে বল্লুম তাকে :

—শুভসন্ধ্যা! কারুর জন্যে কি আপনি অপেক্ষা করছেন ?

চম্‌কে উঠলো সে। না......হাঁ, অপেক্ষা সে করছে কারুর জন্যে। তার ঈপ্সিত লোকটি না আসা পর্য্যন্ত আমি তার সঙ্গে থাকতে সে আপত্তি জানিয়েছিল ?

না—মোটেই নয়, বরং ধন্যবাদ দিয়েছিল আর সেই জন্যেই সে বল্‌ল পরে যে কারুর প্রতীক্ষাই আসলে সে করছে না। হাওয়া খাচ্ছে কেবল ; এত নিঃসাড় আর নিস্তব্ধ জায়গাটা। পায়চারি করতে লাগলাম পাশাপাশি। একথা সেকথা হাল্‌কা আলাপ চল্‌তে লাগল। হাতটা আমার বাড়িয়ে দিলুম তার দিকে।

—না, ধন্যবাদ, বলে সে মাথা নাড়লে।

কোন আমোদ নেই এ রকম বেড়িয়ে বেড়ানর ; অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না তাকে। ক'টা বাজে দেখবার জন্যে দেশলাই জ্বাললুম। কাঠিটা তুলে ধরলুম তাকে দেখবার জন্যে।

— সাড়ে ন'টা, বললুম আমি।

কেঁপে উঠলো সে, যেন জমে যাচ্ছে ঠাণ্ডায়। সুযোগের সদ্ব্যবহার করলুম আমি :

—শীত করছে ? জিজ্ঞাসা করলুম—কিছু পান করলে হয় না কোথাও গিয়ে ? টিভলি কিংবা ন্যাশন্যালে চলুন না।

—এখন কোথাও যেতে পারি না আমি। দেখতে পাচ্ছেন না। উত্তর দিল সে।

এই প্রথম আমি লক্ষ্য করলুম একটা লম্বা কাল ভেল্ পরে আছে সে। ক্ষমা চাইলুম, অন্ধকারকে দোষ দিলুম আমার ভুলের জন্য। এমনভাবে আমার ক্ষমা সে গ্রহণ করল যে, তখনি বুঝতে পারলুম সাধারণ নিশাচারিণী নয় এ।

হাতটা ধরুন না আমার? পুনরায় বল্লুম আমি। হয় তো একটু গরম হতে পারেন।

হাতের মধ্যে হাত রাখলে।

ঘুরলুম কয়েকটা বাঁক। ফের সে আমায় সময় কত দেখতে বল্লে।

—দশটা; কোথায় থাকেন আপনি?

—গ্যামলি কনগেডিতে। থামালুম তাকে।

—বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিতে পারি আপনাকে? জিজ্ঞাসা করলুম।

—মোটেই না, উত্তর দিল সে—না, আপনাকে যেতে দিতে পারি না...... ব্রেড্‌গেটে থাকেন আপনি, না?

—কেমন করে জান্‌লেন? আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

চুপচাপ যায় কিছুক্ষণ। আলোকিত পথের উপর হাত ধরে ঘুরে বেড়াই আমরা। হনহন করে চলেছে সে, উড়ছে পিছনে লম্বা ভেলটা।

—একটু পা চালিয়ে চলুন—সে বল্লে।

গ্যামলি কনগেডিতে বাড়ীর দরজায় এসে সে ঘুরে দাঁড়ায় আমার দিকে, তাকে পৌছে দেবার জন্য ধন্যবাদ দিতে চায়। দরজাটা আমি খুলে ধরি নিঃশব্দ শিথিল পায়ে সে ভিতরে চলে যায়। কাঁধ দিয়ে আলতো করে দরজায় চাপ দিয়ে আমি সেঁধিয়ে পড়ি তার পিছন পিছন। ভিতরে এসে হাতটা আমার চেপে ধরে সে। কথা নেই; চুপচাপ দু'জনে।

দু'সারি সিঁড়ি পেরিয়ে চারতলায় এসে আমরা থামলুম। মহিলাটি নিজের ঘরের দরজার চাবি খুলল; তারপর দ্বিতীয় দরজাটা খুলে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে গেল আমায়। সম্ভবতঃ এটা ড্রইংরুম। দেওয়ালে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ কানে আসছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে এক মুহূর্ত্ত থাম্‌ল মহিলাটি, তারপর হঠাৎ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমাকে: থরথর করে সারা দেহ, এক লোলুপ আবেগে চুমু খায় আমার মুখে। ঠিক মুখের উপর।

—বসুন না, সে বললে—এই ত সোফা। ততক্ষণে আলো আন্‌ছি একটা, বাতিটা জ্বালালে।

বিস্ময়ে নিজের দিকে তাকাই; মজা লাগে আমার, চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম লম্বা চওড়া পরিপাটি করে সাজানো এক ড্রইংরুমে বসে আছি; দরজাটা আধখানা খোলা। সেখান থেকে অনেকগুলো ঘরে যাওয়া যায়। ঠিক বুঝতে পারলাম না কেমন মেয়ের পাল্লায় পড়েছি।

—"সুন্দর ঘর ত" বললুম আমি—এখানে থাক নাকি তুমি?

—হ্যাঁ, এটাই আমার ঘর - বললে সে।

—তোমারই ঘর এটা? তাহলে বাপ-মার সঙ্গে থাক তুমি?

—ওঃ, না, হেসে উঠল সে—অনেক বয়েস হয়ে গেছে আমার? দেখবেন? খসিয়ে ফেললে তার ওড়ন। আবরণ।

এই যে দেখুন? কেমন, বলিনি আপনাকে। ক্ষিপ্র হাত দুটি দিয়ে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরল: কোন অদম্য তাগিদে উদগ্র হয়ে উঠল সে।

বছর বাইস তেইস বয়স। ডান হাতে একটা আংটি থাকাতে বিবাহিতা বলেই ঠাওর করলুম। সুন্দরী? না, মুখে দাগ, ভুরু প্রায় নেই কিন্তু জীবনের আভায় উজ্জ্বল তার সর্ব্বাঙ্গ। মুখটুটু তার অবিশ্বাস্য রকমের সুন্দর।

কে সে, কোথায় বা তার স্বামী—যদি কেউ থাকে; আর এই বাড়িটাই বা কার, যতবার আমি জিজ্ঞাসা করতে মুখ খুলি ততবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মুখের উপর মুখ আটকে দাবিয়ে দেয় সব কৌতূহল।

—এলেন আমার নাম—বললে সে—কিছু পান করবেন? ঘণ্টা বাজালে কেউই বিরক্ত হ'বে না। ততক্ষণ শোবার ঘরে গিয়ে বসুন।

শোবার ঘরে এলাম। ড্রইংরুমের আলোয় ঘরটা খানিকটা আলোকিত হয়ে আছে। দুটো বিছানা। ঘণ্টা বাজিয়ে এলেন মদ আনতে আদেশ দেয়। আওয়াজ পেলুম মদ রেখে ঝি বেরিয়ে গেল। এলেন খানিক বাদেই আমার পেছু পেছু ঢুকলো শোবার ঘরে, থমকে দাঁড়ায় এক পলক দরজার কাছে। তার দিকে এক পা এগোই।

ঈষৎ শব্দ করে সে: আসে আমার দিকে। এই শেষ সন্ধ্যা। তার পরে আরো জানতে চান্? ধৈর্য্য ধরুন, আছে আরো।

এইদিন সকালে যখন চোখ মেললুম আলো ফুটতে সুরু করেছে তখন। পর্দার দুপাশ দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে ঘরে। এলেন ও জেগেছে, হাসছে আমার দিকে চেয়ে মখমলের মত নরম ধবধবে সাদা দুটো হাত, বুকটা অসাধারণ উঁচু। কানের কাছে তার মুখ নামিয়ে কথা বলি আর এক কঠিন কোমলতায় আমার মুখে চেপে ধরে তার মুখটা। দিনের আলো ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

দু'ঘণ্টা পর আমি উঠে পড়ি। এলেনও উঠল, তাড়াতাড়ি সাজ করতে থাকে, জুতোটা তার পরাই ছিল। তারপর হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলুম—এখনও যা আমার কাছে বীভৎস স্বপ্নের মত মনে হয়। হাত ধোবার জায়গায় দাঁড়িয়েছিলুম, পাশের ঘরে খবর দেবার বা কিছুর দরকার হয় এলেনের ; দরজাটা একটু খুলতে এক পাশ ফিরে এক ঝলক উঁকি দিই ভিতরটায়। ঘরটার খোলা জানালা দিয়ে ঝাপটা লাগলো ঠাণ্ডা বাতাসের। ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপর একটা শোয়ান মৃতদেহ নজরে পড়ল। সাদা পোষাক, শনের মত দাড়িওলা একটি মৃতদেহ কফিনের মধ্যে শোয়ানো। চাদরের ভিতর দিয়ে হাড়ালো হাঁটু উদ্যত মুঠির মত উঁচু হয়ে আছে। মুখটা ফ্যাকাশে ও মর্ম্মান্তিক রকমের রক্তহীন, টাট্‌কা দিনের আলোয় সবটাই দেখতে পেলুম। একটা কথাও না বলে ঘুরে দাঁড়াই।

এলেন যখন ফিরল তখন আমি জামা পরে চলে যাবার জন্যে তৈরী। তার আলিঙ্গনে আমি তখন প্রকৃতিস্থভাবে সাড়া দিতে পারলুম না। আরো কয়েকটা কাপড় জড়ায় সে : সদর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্যে আমার সঙ্গে আসে, কিছু না বলে চললুম তার সঙ্গে নীচে। দরজার কাছে এসে এমনভাবে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল সে কেউ না তাকে দেখতে পায়।

—আচ্ছা বিদায়, চাপা গলায় বললে সে।

—কাল পর্য্যন্ত, বাজিয়ে নেবার জন্য বললুম আমি।

—না, কালকে না।

—কেন নয় কাল ?

—লক্ষ্মি, অত প্রশ্ন করো না। আমার এক আত্মীয় মারা গেছে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যেতে হবে কাল। কেমন ? সব ত তুমি বোঝো।

কিন্তু পরশু !

—হ্যাঁ, পরশু এখানে, এই দরজায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বিদায়।

—চলে এলাম।

কে সে ? আর ঐ মড়াটা—হাত মুঠো আর ঝুলে পড়েছে মুখের কোনটা—কি বীভৎস প্রহসন। কালকে বাদ পরশু আবার সে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার জন্য। দেখা করব তার সঙ্গে আবার—ভাবলুম।

সোজা চলে এলুম বারনীনা কাফেতে। ডিরেক্টারিটা চেয়ে নিয়ে গ্যাব্রেল কনগেভির সেই নম্বরটা খুঁজি—ঐই যে নাম। সকালের কাগজ না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে রইলুম খানিকটা। তার পর কাগজ আসতে তাড়াতাড়ি উল্টে যাই মৃত্যু-সংবাদের স্তম্ভটা। তারটাও সেখানে দেখতে পাই—বড় অক্ষরে লিষ্টের গোড়াতেই আছে : "আমার স্বামী, বয়স তিয়াত্তর, বহুদিন ভোগার পর মারা গেছেন কাল।" বিবরণের তারিখ গত পরশু !

বসে বসে ভাবলুম অনেকক্ষণ : বিয়ে করল একজন লোক, স্ত্রী তার চেয়েও তিরিশ বছরের ছোট। দীর্ঘ রোগভোগের পর একদিন সে মারা গেল।

যুবতী বিধবা ফেললে মুক্তির নিশ্বাস।

ভিখারি

শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভিখারি আসিয়া দ্বারে ডাক দিল, "মা গো,
একমুষ্টি খেতে দাও, আর পারি না গো
সহিতে ক্ষুধার জ্বালা ; তিন দিন হল
খাই নে কিছুই—কেমনে বাঁচিব বলো !"
গৃহিনীর কর্ণে যেই পশিল সে স্বর
অমনি উঠিল রুষি, কহিল, 'গহর'
দূর করি দে এখুনি লক্ষ্মীছাড়াদের
মারিয়া করিবি খুন যদি আসে ফের।"
পার্শ্বস্থিত কক্ষ হ'তে শুনিলাম সব
বলিতে নারিনু কিছু—রহিনু নীরব।
ভাবিলাম মনে মনে, একদিন আমি
ফিরিয়াছি ওরই মতো—জানে অন্তর্য্যামী—
ভিক্ষা মাগি দ্বারে দ্বারে ; গিয়েছে সে-দিন।
আজি মোর গৃহচূড়ে হয়েছে উড্ডীন
ঐশ্বর্য্যের জয়ধ্বজা ; সেই গর্ব্বে আজ
মত্ত আমি, তাই আজি নাহি পাই লাজ।
শুনিয়া এমন কথা, "......লক্ষ্মীছাড়াদের
মারিয়া করিবি খুন যদি আসে ফের।"
ভিক্ষা মাগি আজি হায় গৃহ হ'তে মোর
ভিখারি বিমুখ হয়, ফেলে আঁখি-লোর !
পদশব্দে চেয়ে দেখি—দুয়ারে গৃহিনী,
অমনি কহিনু হেসে, "এসো সুভাষিনি।"
হেন কালে এল এক দুরন্ত বাতাস
তারই সাথে মিশে গেল মোর দীর্ঘশ্বাস !

কাশ্মীর

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর অন্য দিক দিয়া যাহাই হউন, স্বভাবশোভার উপাসক ছিলেন। কাশ্মীরের নিরুপম নিসর্গের দিকে সম্রাট জাহাঙ্গীরের চিত্ত এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি তাঁহার আত্মচরিতে কাশ্মীরের কমনীয় কান্তির কথা কহিবার সময় ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়াছেন। "কাশ্মীরের মনোমদ ময়দান ও যাদুমন্ত্রের ন্যায় মুগ্ধকর প্রপাতশ্রেণী বর্ণনাতীত। যে-দিকে নেত্রপাত করা যায় সেই দিকেই তৃণ-তরুলতার শ্যামলা সুষমা, চল-চঞ্চলা জলধারা। এই দেশে আলতা-বর্ণ গোলাপ এবং ভাইওলেট ও ন্যারসিগাস্ ফুল স্বয়ং সম্ভূত হইয়া থাকে। মাঠে-মাঠে সর্ব্বপ্রকার পুষ্প, সকল রকম সুমধুর সুরভিশালী ঔষধি দেখা যায়। এই সকল পদার্থ এত প্রকারের যে, মানুষের পক্ষে গণনা করা সম্ভব নয়। চিত্তোন্মাদক বসন্ত ঋতুতে পাহাড়শ্রেণী ও প্রান্তরাবলী সমস্তই প্রস্ফুটিত পুষ্পপুঞ্জে পূর্ণ হইয়া পড়ে; এমন কি, গৃহের তোরণ, প্রাচীর, ছাদ ও প্রাঙ্গণ (যাহাদের দ্বারা ভোজ-সভা ভূষিত হয়) টিউইলপ ফুলের সমুজ্জ্বল শিখাসমূহের দ্বারা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।" ইহা আমাদের উক্তি নহে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের উক্তির অনুবাদ। জাহাঙ্গীর এবং নুরজাহান উভয়েই কাশ্মীরকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় সময়গুলি এই ভূস্বর্গেই অতিবাহিত হইয়াছিল।

কাশ্মীরের মন্দিরাবলীও বিশেষ দর্শনযোগ্য। বহু সুন্দর প্রাচীন মন্দির এই পর্ব্বত-বন্ধুর প্রদেশে বর্ত্তমান। সুখের বিষয়, মন্দিরগুলি সেরূপ দুর্গম স্থানে অবস্থিত নয়। অবশ্য অমরনাথগুহা দুর্গম স্থানে বটে কিন্তু উহা তীর্থ হইলেও দর্শনীয় কোন মন্দির তথায় নাই। পাণ্ড্রাথান, অবন্তীপুর ও মার্ত্তণ্ড এই তিনটি স্থান শ্রীনগর হইতে মোটরযোগে একদিনেই যাওয়া যায়। পাণ্ড্রাথান শ্রীনগর হইতে দুই মাইল দূরে—শ্রীনগর ও জম্মুর মধ্যবর্ত্তী পথের পার্শ্বে বিরাজিত।

খৃষ্টীয় দশম শতকে পাণ্ড্রাথান কাশ্মীরের রাজধানী ছিল। সুতরাং মন্দিরটির অবস্থান-স্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরের অবশেষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধদেবের একটি দন্ত এই মন্দিরে রক্ষিত ছিল বলিয়া জানা যায়। সম্রাট অশোককর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে শুধু সেই প্রাচীন বৌদ্ধ

মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ

মন্দির নয়, সমগ্র রাজধানীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কেবল পাণ্ড্রাথানের এই মন্দিরটি ধ্বংস হয় নাই। চারিদিকে পরিখা থাকার জন্য অগ্নিশিখা ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৯৬০ খৃষ্টাব্দে সজ্ঘটিত হয়। পরিখাটি এখনও রহিয়াছে। পাণ্ড্রাথান মন্দিরটির উচ্চচূড় ছাদ চিত্তাকর্ষক এবং গ্রীক ও রোম্যান ভাস্কর্য্য-স্থাপত্যের সহিত ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালীর সাদৃশ্যের কথা বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।

কেবল পাণ্ড্রাথান নয়, কাশ্মীরের অন্যান্য প্রাচীন মন্দিরও পরিখাবেষ্টিত এই সত্য এখানে স্মরণীয়। অতি প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে নাগপূজা প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। অসংখ্য হ্রদ-নদাদিতে পরিপূর্ণ কাশ্মীরবাসীরা নাগশ্রেণীর দেবতাদিগকে ঐ সকল জলাশয়ের বা জল-ধারার অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন মন্দির-গাত্রে যে সব চিত্র খোদিত রহিয়াছে তাহা দেখিলে কাশ্মীরবাসীর এই বিশ্বাসের বার্ত্তা আমরা অবগত হইতে পারি। যাহারা জলের অধিষ্ঠাত্রী বা জল যাহাদের অধিষ্ঠান-স্থান তাহাদের মন্দির জলের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলে তাহারা অধিকতর সন্তুষ্ট হইবে এরূপ মনে করা এই দেশের সাধারণ নরনারীর পক্ষে স্বাভাবিক। পরে এই নাগার্চ্চনা ক্রমশঃ বিচিত্রতর শিবার্চ্চনার ভিতর প্রবেশ করে। কাশ্মীর ক্রমশঃ নাগোপাসক হইতে শিবোপাসক হইয়া পড়ে। সদাশিব তাঁহার জটাজালে নাগ বা সর্পগণকে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবী-জলধারাকে ধারণ করিয়া থাকেন; সুতরাং শিবের পূজা করিলে সঙ্গে সঙ্গে নাগেরও পূজা করা হয় এবং নাগগণের বাসস্থল জলেরও অর্চ্চনা করা হয় বলা চলে। নাগ-বেষ্টিত শিবমূর্ত্তি কাশ্মীরে বহু রহিয়াছে। মন্দিরকে পরিখা-পরিবেষ্টিত করার প্রথা অতি প্রাচীন বা আদিম নাগবাদের অবশেষ বলিয়া পণ্ডিতদের অভিমত। যেখানে প্রাকৃতিক পয়ঃ-

প্রবাহ নাই, সেখানে কৃত্রিম খাল খনন করা হইয়াছে। এক দগ্রাসম্প্রদায়ভুক্ত সহৃদয় ব্যক্তি আমাদিগকে পাণ্ড্রাথান মন্দিরটি দর্শনে সাহায্য করেন। দগ্রা কাশ্মীরবাসী সম্প্রদায়গণের অন্যতম। অনেকে সৈনিকরূপে সমর-বিভাগে প্রবেশপূর্ব্বক শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

অবন্তীপুর শ্রীনগর এবং ইসলামাবাদ উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা রাজা অবন্তীবর্ম্মার রাজধানী ছিল। এই রাজা ৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮৮৩ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইঁহাকে আশ্রয় করিয়া বহু বিচিত্র ও চিত্তরঞ্জন কথা ও কিম্বদন্তী জন্মলাভ করিয়াছে। ইনি অনুকম্পা ও উদারতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। ইনি প্রজাদের নিকট হইতে কর বা কাজ কিছুই চাহিতেন না। নিজের যাহা কিছু ছিল সমস্ত দরিদ্রদিগকে দিয়া ইনি অবশেষে কুম্ভকারবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন বলিয়া জানা যায়। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অবন্তীবর্ম্মা দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই দুইটি মন্দির ব্যতিরেকে অবন্তীপুরের কোনও অবশেষ বর্ত্তমানে দেখা যায় না। আর যাহা আছে তাহা উপেক্ষণীয়।

অবন্তীপুরের মন্দিরদ্বয় এবং মার্ত্তণ্ড-মন্দির উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য স্বীকার্য্য। মধ্যবর্ত্তী দেবালয়ের বক্ষে শিবলিঙ্গ বিরাজিত। যে চতুষ্ক ক্ষেত্রের বক্ষে মন্দির দণ্ডায়মান তাহার প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যস্থলে একটি করিয়া তোরণ বা দ্বার। এই ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে পরিখা। এখন পরিখায় জল নাই, উহা ভ্রমণস্থানে পরিণত। স্তম্ভশ্রেণী চতুষ্কটির চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়া মন্দিরের গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে। স্তম্ভগুলি গ্রীক প্রভাবের পরিচায়ক,—পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই অভিমত আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতে পারি না। প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যে স্তম্ভশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে, এই সত্য অস্বীকার করিবে কে? হিমাদ্রিবক্ষে বিরাজিত মন্দিরাবলী হইতে ভারতবর্ষের পাদপদ্মচুম্বী মহাসমুদ্রের তটদেশে দণ্ডায়মান গুরুগম্ভীর রামেশ্বর, মন্দির পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই আমরা অপূর্ব্ব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্যের পরিচায়ক স্তম্ভশ্রেণী দেখিতে পাই।

আমরা অবন্তীপুর হইতে ইসলামাবাদে আসিলাম। ইহার সঙ্কীর্ণ পথগুলির উপর দিয়া আমরা আচিবালের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলাম। পথে আমরা উষ্ট্রশ্রেণী দেখিলাম। উষ্ট্রের পৃষ্ঠে রেশমের বোঝা। কাশ্মীর রেশম ও পশম উভয়ের জন্যই বিখ্যাত। আমরা অবশেষে আচিবালে পৌঁছিলাম। অচিবালকে কাশ্মীরের উদ্যানাবলীর ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম বলা চলে। ভূস্বর্গ শব্দটি আচিবালের পক্ষে প্রযোজ্য বটে। ইহা পাইন-পাদপ-শ্রেণীমণ্ডিত একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এই স্থানে একটি উৎস কলতানে চারিদিক মুখরিত করিয়া ভূগর্ভ হইতে উৎসারিত হইতেছে। এই উৎস হইতে তিনটি স্রোতস্বিনী উদ্গত হইয়াছে। এই স্রোতস্বিনীত্রয় তিনটি প্রপাতে পরিণত হইবার পর প্রত্যেক মোগল উদ্যানের শোভাবর্দ্ধক পয়ঃপ্রণালীর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রপাতত্রয়ের পুরোভাগে টেরাস। টেরাসের বক্ষে দুইটি ক্ষুদ্র প্যাভিলিয়ন। প্যাভিলিয়নের প্রাচীরে জাফরির কাজ এবং ছাদের উপর সবুজ তৃণরাজি। প্রধান প্রবাহিণীটি একটি চতুষ্কজলাশয়ের বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। জলাশয়ের বক্ষে ফোয়ারা। ফোয়ারা হইতে শীকরকণা পার্শ্ববর্ত্তী পথের প্রান্তস্থ পাদপশ্রেণীর উপর পড়িতেছে। প্রধান প্যাভিলিয়নের দালানের নিম্ন দিয়া স্রোতস্বিনী অনুরূপ আর একটি ফোয়ারা-মণ্ডিত জলাশয়ের ভিতর দিয়া বহিতেছে। বহিতে বহিতে অবশেষে ইহা বহিঃপ্রাচীরের নিম্নদেশ দিয়া উদ্যানবাটিকার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেণার গাছ গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়া তন্দ্রাসঞ্চারক শান্ত-শীতল ছায়া চারিদিকে প্রসারিত করিতেছে। কেহ এই উদ্যান-বাটিকার অপরূপ অঙ্গনে তরুতলে শুইলে স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় জলকলতান শুনিতে শুনিতে মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিদ্রামগ্ন হইবে বলিয়া মনে হয়।

কোহালার দৃশ্য

আমরা মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের সম্মুখে যখন পৌঁছিলাম তখন অপরাহ্ণের শান্ত সূর্য্যকিরণে চতুর্দ্দিকের প্রকৃতি অপূর্ব্ব

মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। মার্ত্তণ্ড-মন্দির কবে নির্ম্মিত তাহা বলা সহজ নয়; রাজতরঙ্গিণী-নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে যাহা আছে তাহা সত্য হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকে রামাদিত্য নামক কাশ্মীরাধিপতির দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হয়। অনেকে এই মত স্বীকার করেন না। শেষোক্ত ব্যক্তিরা কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যকে মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের কিয়দংশের নির্ম্মাতা বলিয়া মনে করেন। ললিতাদিত্য ৬৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুদৃশ্য স্তম্ভশ্রেণী ললিতাদিত্যের কীর্ত্তি বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহারা মন্দির-প্রতিষ্ঠার সময় ৩৭০ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ এই ১শত ৩০ বৎসরের মধ্যে কোন একটি সময়ে এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। জনসাধারণের ধারণা অন্যরূপ। তাহাদের বিশ্বাস, মার্ত্তণ্ড-মন্দির পাণ্ডবদের দ্বারা প্রস্তুত। অজ্ঞাতবাস বা বনবাসকালে পাণ্ডবগণ কাশ্মীরে গিয়াছিলেন বলিয়া কাশ্মীরবাসীর ধারণা। ঐ সময় তাঁহারা শুধু মার্ত্তণ্ড-মন্দির নয়,—কয়েকটি মন্দির কাশ্মীরে স্থাপন করেন। ভিগনে এবং ব্যারণ হগল যখন এই

কাশ্মীরাধিপতির প্রাসাদ—জম্মু

মন্দির দর্শন করেন তখন মার্ত্তণ্ড-নামক স্থানটিকে পাণ্ডু-কুরু বলা হইত, ইহা আমরা উভয়ের রচনা হইতে জানিতে পারি।

কারিয়াহ নামক প্রান্তরের একটি উচ্চস্থানের উপর মার্ত্তণ্ড-মন্দির মহত্বমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পশ্চাতে অম্বরচুম্বী পর্ব্বতশ্রেণী, পদতলে পরম মনোরম কাশ্মীর উপত্যকা। যত গভীর সম্ভ্রমসঞ্চারক গুরুগম্ভীর ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীতে রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দির অন্যতম। দেখিলে মিশরের থেবিস ও হেলিওপলিস, গ্রীসের এথেন্স এবং ইটালীর রোমের সুবিখ্যাত ধ্বংসাবশেষসমূহের স্মৃতি উদ্রিক্ত হয়। চারিদিকের চিত্তচমৎকারী মহিমময় দৃশ্য এই মহান্ মন্দিরের অবশেষকে মহিমতর করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর কোন ধ্বংসাবশেষ এরূপ বিস্ময়কর পরিবেশ বা আশ্চার্য্য নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যরাশির বক্ষে বিরাজিত নহে। ৬০ মাইল প্রশস্ত এবং ৬ শত মাইল দীর্ঘ কাশ্মীর-উপত্যকাটির সমগ্র ভাগ এই ধ্বংসাবশেষ হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহারা এথেন্সে মিনার্ভা মন্দির পার্থেননের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিয়াছেন—The finest edifice on the finest sete in the world (অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর সৌধ) তাঁহারা মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের অবশেষ অবশ্যই দেখেন নাই। স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যে বা ভাস্কর্য্য ঐশ্বর্য্যে পার্থেনন অদ্বিতীয় হইতে পারে কিন্তু মার্ত্তণ্ড মন্দিরের মত পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর কোন মন্দিরই পায় নাই, এই সত্য সংশয়াতীত।

চূর্ণ প্রস্তরের উপর চূর্ণ প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া সুদক্ষ স্থপতি এই প্রকাণ্ড মার্ত্তণ্ড-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে। সূক্ষ্ম কারুকার্য্য এখানে দেখা যায় না, এখানে সুন্দর অপেক্ষা সুমহান্ই অধিক। এখানকার সমস্তই বিশাল গম্ভীর। যাঁহারা পশ্চিম-এশিয়ার সিরিয়া রাজ্যে বায়ালবের্কের মন্দির দর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা কাশ্মীরের এই সূর্য্য-মন্দির এবং পশ্চিম-এশিয়ার বায়াল দেবের মন্দিরের সাদৃশ্যের কথা নিশ্চয়ই চিন্তা করিবেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড বায়ালবের্কেও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। তবে এরূপ বিরাট পারিপার্শ্বিক বা পরিবেশ বায়ালবের্কে নাই।

দূর অতীতের মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের বহু অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সম-দ্বিভুজ একটি ইমারত স্তম্ভ-শ্রেণী বেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই ইমারতের পুরোভাগে বিরাজিত প্রাচীরও সম-দ্বিভুজ। তিনটি তোরণের অবশেষ দৃষ্ট হয়। তিনটি এরূপ সুদৃঢ় যে, কালের করাল করাঘাত বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। এই তোরণ পার হইলে মন্দিরপ্রাঙ্গণ পাওয়া যায়। স্তম্ভের সংখ্যা ৮৪। অনেকের অভিমত সপ্তাহের সপ্ত দিবস এবং দ্বাদশরাশি অর্থাৎ ১২ ও ৭ এই দুইটি সংখ্যা গুণ করিলে যাহা হয়, ততগুলি স্তম্ভ এই সূর্য্য-মন্দিরে রহিয়াছে। সূর্য্যদেব গ্রহ-নক্ষত্রগুলির অধিপতি সুতরাং তাঁহার মন্দিরে এইরূপ হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। মন্দিরের ছাদটি বহুদিন হইল বিলুপ্ত হইয়াছে। হয় ভূকম্পন বা কোন মুসলমান সুলতান এই বিলোপের

হেতু বলিয়া সকলের বিশ্বাস। ছাদের ভগ্নাবশেষ চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ছাদটি পিরামিড আকার ছিল এবং ৭০ ফিট উচ্চ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

শ্রীনগরের সাধারণ দৃশ্য—সম্মুখে ঝোলাম নদ

দেবালয়ে যাইবার পথে মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত একটি কক্ষের প্রাচীরে সূর্য্য এবং লক্ষ্মীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। পশ্চিম তোরণের পার্শ্বে ঠিক এইরূপ মূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে ক্ষোদিত করা হইয়াছে। তোরণের পর একটি খিলান। খিলানের দুই পার্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্র অর্চনা-কক্ষ। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁহারা মার্ত্তণ্ড-মন্দির সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক আপনাদের অভিমত বিস্তৃতভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং অন্যান্য দেশের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির সহিত তাহার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভিগ্‌নেই প্রধান। ভিগ্‌নের মত মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালী কাশ্মীরের নিজস্ব। হিন্দু শিল্পীরা প্রাচীন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পার্থিয়ানরা সিরিয়া জয় করিলে প্রাচ্যদেশীয় শিল্পীরা সিরিয়ার এবং এমন কি মিশরের প্রাচীন সৌধ-মন্দিরাদি দর্শনের সুযোগ লাভ করে এবং ঐ সময়েই তাহারা গ্রীক ও রোম্যান স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের সহিত পরিচিত হয়, ইহাই কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মনে করেন। এই অনুমানকে আমরা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি।

মার্ত্তণ্ড বা সূর্য্যদেবের মন্দির হইতেও প্রাচীনতর কালে এখানে শিবমন্দির ছিল, তাহা চূর্ণ প্রস্তরে প্রস্তুত একটি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ধ্বংসাবশেষের বক্ষ হইতে প্রাপ্ত হওয়ায় প্রমাণিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বিশুষ্ক পরিখাটিতেই এই শিবলিঙ্গটি পাওয়া গিয়াছে। লিঙ্গটি ভগ্নাবশেষসমূহের দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়া লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল, অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে হারুৎ মারুৎ নামক কূপ। কূপটি অতিপ্রাচীন এবং বিশেষ গভীর। বিচিত্র কিম্বদন্তী এই কূপটি সম্বন্ধে এই অঞ্চলে প্রচারিত আছে। হারুৎ এবং মারুৎ উভয়েই দেবদূত। এই দেবদূতদ্বয় একদিন ভগবানের কাছে গিয়া পৃথিবীবাসীর প্রবল পাপের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে সংশোধিত করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল। ভগবান তাহাদিগকে কহিলেন, পাপপঙ্কিল পৃথিবীকে পুণ্যোজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করার অধিকার আমি তোমাদিগকে দিতেছি। তাহারা তখন আকাশ হইতে এক বেশ্যার গৃহে অবতরণ করিল এবং তথায় তাহাকে পুণ্যপথে পরিচালিত করিবে বলিয়া কয়েকদিন রহিল। অবশেষে পরিণাম এই হইল তাহারা উভয়েই সেই নারীর প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। ভগবান্ তখন শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে (চাহি-ই-বাবুল নামক) এই কূপে বন্দী করিয়া রাখিলেন। অহঙ্কারের ফলে পতিত দেবদূতদ্বয় এখনও এই কূপে রহিয়াছে বলিয়া কথিত। হারুৎ-মারুৎ বন্দী আছে বলিয়া এই কূপকে ঐ নামেই অভিহিত করা হইয়া থাকে।

দুই

কাশ্মীরে বিশেষ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে যাইবার তিনটি পথ বর্ত্তমান। এই তিনটিই মোটর চলিবার যোগ্য। প্রত্যেক পথই নর্থওয়েষ্টার্ণ রেলপথের কোন একটি ষ্টেশন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই তিনটি পথের মধ্যে যেটি দীর্ঘতম সেটি ২শত মাইল অপেক্ষা যৎ সামান্য কম। মারীর পথ রাওলপিণ্ডি হইতে আরম্ভ। রাওলপিণ্ডি রেলষ্টেশন হইতে এই পথেই সরকারী ডাক লইয়া যাওয়া হয়। এবটাবাদের পথ হাভেলিয়ান ষ্টেশন হইতে আরম্ভ। বানিহালের পথ জম্মু ষ্টেশন হইতে আগাইয়া

গিয়াছে। কোহালা হইতে মারীর পথ বরাবর ঝেলাম উপত্যকা অনুবর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কোহালা রাওলপিণ্ডি হইতে ৬৪ মাইল। শ্রীনগর হইতে কোহালার দূরত্ব ১শত ৩০ মাইল। এবটাবাদের পথ ডোমেলের নিকট ঝেলাম উপত্যকার সহিত সম্মিলিত

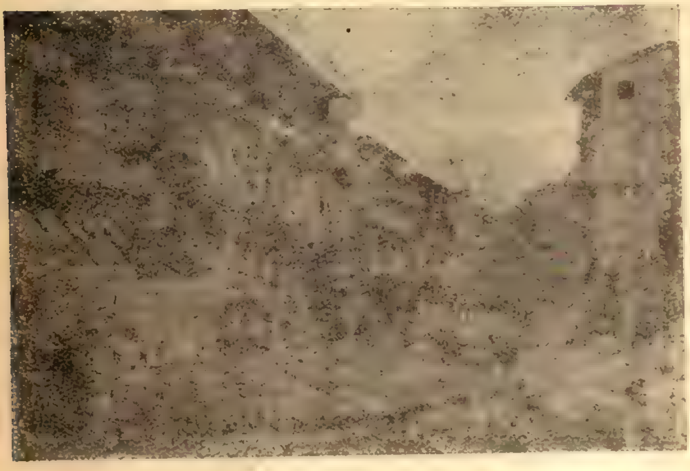

শ্রীনগর—খাসের পার্শ্বস্থ গৃহাবলী

হইয়াছে। সম্প্রতি সঙ্ঘটিত পণ্ডিত জওহরলালের কাশ্মীর অভিযানের সহিত সংযুক্ত বলিয়া কোহালা, ডোমেল প্রভৃতি নামগুলির সহিত পাঠকগণ সংবাদ-পত্রের মারফৎ পরিচিত হইয়াছেন। কোহালা হইতে ডোমেলের দূরত্ব ১৯ মাইল। ঝেলাম এবং তাহার কয়দ নদসমূহ কোহালা এবং ডোমেলে প্রস্তুত সেতুসমূহকে প্রবল প্লাবনের দ্বারা প্রায়ই ভাঙ্গিয়া ফেলায় মারী এবং এবটাবাদের পথ বর্ষায় বিপজ্জনক হইয়া পড়ে।

সুদূর-প্রসারিত প্রাচীন রাজপথ বিশ্ববিখ্যাত গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কলিকাতা হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জম্মুর পথ ওয়াজিরাবাদ নামক স্থানে এই প্রাচীন প্রসিদ্ধ পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক শিয়ালকোটের সেনানিবাস অতিক্রম করিয়া আগাইয়া গিয়াছে। শিয়ালকোট-সেনানিবাসের বাহিরে একটি সামরিক স্মৃতিফলক প্রস্তুত রহিয়াছে। ঠিক ট্রিনিটি 'চার্চ্চ' নামক গীর্জ্জাগৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান এই সামরিক শিলা-ফলকের গাত্রে লিখিত রহিয়াছে উত্তরের পথ শৈলমালা-শ্যামলা উপত্যকা এবং স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনীসমূহের সুদৃশ্য দেশের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাকে কাশ্মীরের নিসর্গবর্ণনার সংক্ষিপ্ত সার বলা চলে। এই শিলা-ফলকটিকে র‍্যান্‌কিনের শিলা বলা হয়। ইহার গাত্রে শিয়ালকোট হইতে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব লিখিত রহিয়াছে। এই ফলকটি ভ্রমণকারীর পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

শিয়ালকোট হইতে জম্মুর দূরত্ব ২৮ মাইল। জম্মু কাশ্মীরাধিপতির শীতনিবাস। শ্রীনগরে শীতের তীব্রতা অত্যন্ত অধিক বলিয়া এইরূপ করা হইয়াছে। তাউই নদীর উপর প্রস্তুত একটি ঝোলা সেতুর উপর দিয়া জম্মু সহরে প্রবেশ করিতে হইত। এখন সুদৃশ্য সুদৃঢ় লৌহ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। লোহিতবর্ণাভ বালুকা-প্রস্তরে প্রস্তুত সৌধাবলীমণ্ডিত এই নগর একান্ত নয়নাভিরাম, সন্দেহ নাই। সৌধাবলীর শীর্ষসমূহ স্বর্ণবর্ণ। রবি রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সেই স্বর্ণবর্ণ-শীর্ষশালী লাল বালুকা-প্রস্তরপুঞ্জে প্রস্তুত অট্টালিকাগুলিকে আরও বিচিত্রদর্শন করিয়া তুলিয়াছে। কাশ্মীরাধিপতির হস্তীগুলি শ্রীনগরের পরিবর্ত্তে জম্মু সহরেই সাধারণতঃ রক্ষিত হয়। যখন মাহুতরা এই সকল মাতঙ্গগুলিকে দৈনন্দিন ব্যায়ামের জন্য পথে পথে বিচরণ করায় তখন পথের বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধি পায়। জম্মু হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত প্রসারিত পথ জম্মু শহরের প্রান্তে শৈলমালার শীর্ষে আরোহণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আমরা মোটর হইতে নৃপতির শীতনিবাস প্রাসাদটি দর্শন করিলাম। প্রাসাদটি পাশ্চাত্য প্রণালীতে প্রস্তুত এবং প্রীতিপ্রদ।

আমরা কুদ এবং বাতোৎ ডাকবাংলোর মধ্যবর্ত্তী পাটনি গিরিপথে যখন পৌঁছিলাম তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মেঘমালামণ্ডিত, বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ, বজ্রনাদ-বিধ্বনিত গগনমণ্ডলের মহিম্ন দৃশ্য এবং সেই আকাশের তলে প্রসারিত পার্ব্বত্য প্রকৃতির পরম প্রীতিকর রূপ আমাদিগকে বিপদের কথা ভুলাইয়া দিল। মোটরচালক ক্রম-বর্দ্ধমান বর্ষণের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া প্রাণপণে মোটর চালাইতে লাগিল। পাটনি গিরিবর্ত্ম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিট উচ্চ। এই সমুচ্চ গিরিপথের চারিদিকে চিত্ত-চমৎকারী দৃশ্য। যাহা অল্পকাল পূর্ব্বে সূর্য্যকরোজ্জ্বল ছিল, তাহা এখন মেঘমলিন, বর্ষণ-ধূসর।

আমরা যখন বাতোৎ পৌঁছিলাম তখনও বৃষ্টি সমভাবেই চলিতেছে। শিয়ালকোটে বিরাজিত র‍্যান্‌কিনের শিলাফলক হইতে বাতোৎ ডাকবাংলোর দূরত্ব ১শত ৬ মাইল। বাতোৎ হইতে চেনাব নদের উপত্যকার বক্ষে বিস্তৃত পর্ব্বতপুঞ্জের দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম, কিন্তু বর্ষণের জন্য সেই দৃশ্য স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইতেছিল না। আমরা বাতোৎ বাংলোয় রাত্রি যাপন করিলাম। মৃদু-মন্দ বর্ষণ প্রায় সারা রাত্রি চলিল। প্রাতঃকালে যখন আমরা শয্যা ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে

লাগিলাম তখন মেঘ-মুক্ত আকাশ হাসিতেছে এবং চেনাব নদের উপত্যকার বক্ষঃস্থিত গিরিশ্রেণী সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। আমরা বাংলোতে প্রাতরাশ সমাপন করিয়া যাত্রা করিলাম। এইবার পথ আরোহণ না করিয়া অবতরণ করিতেছে। রামবাণ পর্য্যন্ত নামিবার পর চেনাব নদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। চেনাবের রোষরুদ্র মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, সে যেন সকল শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে এবং মুক্তি না পাইয়া নিষ্ফল ক্রোধে গর্জ্জিতেছে। চেনাবের সেতুর যে অংশটি শ্রীনগরের দিকে অবস্থিত, তাহার প্রান্তে শুল্ক আদায়ের জন্য একটি দ্বার নির্ম্মিত আছে। এই দ্বারে শুল্ক-কর্ম্মচারীরা প্রত্যেক মোটরকারের নিকট দশ টাকা হিসাবে লইতেছে। সেতুর সহিত একটি লৌহফলক সংযুক্ত আছে। উহাতে লিখিত আছে—জম্মুর লৌহ-কারখানার দ্বারা সেতুটি নির্ম্মিত। সেতুর পথটি এত সঙ্কীর্ণ যে, একটি গাড়ী ছাড়া একই সময় আর কিছুই যাইতে পারে না। ঐ সময় পথে কোন লোক থাকিলে তাহাকে অতি কষ্টে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া আগাইয়া যাইতে হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রামবাণের পর পথটি আবার গিরিগাত্রে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। (পথের সহিত সমরেখায় অগ্রসর) চেনাব নদের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অকস্মাৎ অন্যদিকে আগাইয়া যাওয়ার সময় এই রমণীয় রাস্তাটি বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বলা চলে। চেনাব নদের একটি করদ প্রবাহিণীকে অনুসরণ করিয়া পথটি উত্তরে অগ্রসর

আচিবাল জলপ্রপাত

হইয়াছে। বানিহান পর্য্যন্ত এই অনুসরণ চলিয়াছে। পীর-পাঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণীর শিলা-সুকঠিন বক্ষ উৎকীর্ণ করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া অগ্রসর পার্ব্বত্য পথের উপর দিয়া মোটরযোগে যাওয়া অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, সন্দেহ

ঝেলাম নদ

নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাসাদসমূহের ভগ্নাবশেষের ন্যায় চারিদিকে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। সময়ে সময়ে গৃহের ন্যায় বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া পর্ব্বত-পার্শ্ব বাহিয়া নীচে পড়িয়া থাকে। বিশেষ, বর্ষাকালে তুঙ্গতনু পর্ব্বতপুঞ্জের পার্শ্বস্থ এই সুবিশাল শিলাগুলি এঞ্জিনীয়ার দলের নিকট বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহারা মোটরে যাতায়াত করে তাহাদিগকেও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। স্থানচ্যুত শিলাখণ্ড শৈলশীর্ষ হইতে প্রচণ্ড বেগে মোটরের উপর পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। সুখের বিষয় যে জায়গা বিপজ্জনক সেখানে পরে সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হওয়ার জন্য তথায় এইরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা নাই বলিলে চলিতে পারে।

বানিহালে উপত্যকাটি বিশেষ প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তথায় কৃষিকার্য্য করা সহজ হইয়াছে। শস্যের ভিতর ধান্যের চাষই এই অঞ্চলে অধিক হইয়া থাকে। অনেকে শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, কাশ্মীরে আমাদের বাঙ্গালা দেশের মত ভাত খাওয়ার প্রথাই প্রবর্ত্তিত আছে। স্থানে স্থানে প্রচুর ধান্য জন্মে বলিয়াই এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। চাষ আবাদ চলে বলিয়া বানিহাল গ্রামটি বড় এবং সমৃদ্ধিশালী হইয়া পড়িয়াছে। এখানে একটি পেট্রল-পাম্প এবং ডাক ও তারঘর রহিয়াছে। এখানকার ডাকবাংলোটিও ভাল। বাংলোর খানশামা বরফ হইতে 'ট্রাউট' মাছ ধরিয়া আনিয়া রসনাতৃপ্তিকর ভোজ্য পদার্থ প্রস্তুত করে বলিয়া সাহেবরা এই বাংলোতে রাত্রিবাস করিতে ভালবাসে। আমরা বানিহালের এক গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলাম। এই গৃহস্থের এক আত্মীয়ের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব আছে। আসিবার সময় বন্ধু তাঁহার আত্মীয়কে একখানি পত্রের দ্বারা আমাদিগকে আশ্রয় ও আহার্য্য-দানের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। বন্ধুর আত্মীয়ের দ্বারা আমরা যেরূপ সমাদৃত হইয়াছিলাম এরূপ দুর্গম গিরিপুরীতে সেরূপ সমাদর পাইবার কল্পনা আমরা কখনও করি নাই।

বানিহাল গিরিবর্ত্মের উত্তরস্থ সরীসৃপাকার আঁকা-বাঁকা পথ

বানিহাল গ্রাম হইতে বানিহাল গিরিবর্ত্মের শীর্ষদেশ প্রায় ২৫ মাইল। পথটি এই পঁচিশ মাইল ব্যাপিয়া কিরূপ আঁকিয়া বাঁকিয়া আগাইয়া গিয়াছে তাহা একটি চিত্র হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। শীর্ষদেশে একটি ছয় বা সাত শত ফিট দীর্ঘ সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত রহিয়াছে। এই সুন্দর সুড়ঙ্গের উত্তরদ্বারটিকে ভূস্বর্গ কাশ্মীর-উপত্যকার প্রবেশ-দ্বার বলা চলে। ইহাকে স্বর্গদ্বার বলিলেও বোধ হয় অতিরঞ্জন হয় না। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে সুইট্‌জারল্যাণ্ড অপেক্ষাও যাহা মনোমদ সেই কাশ্মীর উপত্যকা এই সুড়ঙ্গের উত্তর-তোরণ হইতে দৃষ্টিপথে প্রসারিত হইয়া ভ্রমণকারীর মনকে বিস্ময়বিমিশ্র ভাব-সম্ভারে অভিভূত করিয়া ফেলে বলা চলে। ভূস্বর্গ কাশ্মীর প্রবেশের এই সমুচ্চ তোরণটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯ হাজার ফিট উচ্চ। এখানে দাঁড়াইয়া মেঘমুক্ত দিনে দূর দিক-চক্রের দিকে চাহিলে বৃহত্তর হিমাচলের মহিম ও মহান্‌ মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের উত্তর ব্যাপিয়া প্রকাণ্ড প্রাকৃতিক প্রাকারের প্রায় দণ্ডায়মান হিমাদ্রির তরঙ্গায়িত তুঙ্গতনু ও অভ্রভেদী তুহিন-শুভ্র শৃঙ্গশ্রেণীকে কোন অপার্থিব দিব্য দেশ বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। বানিহাল গিরিবর্ত্মের উত্তর দ্বারে দাঁড়াইয়া হিমাদ্রির বৃহত্তর শিখরাবলী দর্শনকালে মনে হইতে পারে,—সেই ভারতবর্ষকে দর্শন করিতেছি, যেখানে 'গভীর ওঙ্কারে সামঝঙ্কারে কাঁপিত দূর বিমান' বলিয়া ভাব-বিহ্বল কবি গাহিয়াছেন।

পথের দুই পাশে দীর্ঘকায় পপলার পাদপশ্রেণী, পাদপশ্রেণীর দুই পাশে শ্যামল ধান্যক্ষেত্র। মাইলের পর মাইল প্রসারিত পপলার বৃক্ষসারি কিরূপ মনোহারী তাহা না দেখিলে শুধু বর্ণনার দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। সমুচ্চ শৈলশীর্ষ হইতে সহসা সমতল, শস্যশ্যামল, বৃক্ষচ্ছায়া-শীতল উপত্যকাতলে অবতরণ অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি অন্তর-তলে সঞ্চারিত করে। কাশ্মীরের অতি প্রাচীন ও বিচিত্র জলপথ ঝেলাম নদ উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া গিয়া ইহার চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে। ঝেলামের বক্ষে নানাজাতীয় নৌকা। কতকগুলি নৌকা শ্রীনগরে অবস্থিত রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের জন্য ধান্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। ধান্যবাহী নৌকার পার্শ্বে যাত্রীবাহী নৌকা অনুকূল

বাতাসে পাল তুলিয়া দিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। মনে হয়, কোথা হইতে কোথায় আসিলাম। হাউস বোট বা গৃহ-নৌকাগুলির আকার কৌতুকজনক।

অবন্তীপুরের নিকটে শ্রীনগরের পথ একটি সেতুর সহায়তায় ঝেলাম নদ অতিক্রম করিয়াছে। সেতুটি দারু-নির্ম্মিত। পরে এই সেতুটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে পুড়িয়া যাওয়ায় পুনরায় খেয়াঘাট প্রবর্ত্তিত হয়। খেয়া নৌকায় মোটরও পার করা হয়। ইহার পর শিয়ালকোর্ট হইতে ২ শত ৩৩ মাইল অতিক্রম করিবার পর আমাদের পথ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করিল। আমরা ইচ্ছা করিলে ইস্লামাবাদ নামক স্থান হইতে গৃহ নৌকা-যোগে ঝেলাম নদের বক্ষ দিয়া শ্রীনগরে আসিতে পারিতাম।

শ্রীনগরবাসী এক বন্ধুর গৃহে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছিল। আমাদের এই দ্বিতীয়বার কাশ্মীরে আসা। আমরা প্রথম বারেও এই বন্ধুর গৃহেই ছিলাম। প্রথম বারে আসিয়াছিলাম রাওলপিণ্ডি হইতে মারীর পথে। বন্ধু আমাদের জন্য মোটর আসিবার স্থানে দুইটি লোক পূর্ব্ব হইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদের কোন অসুবিধাই হয় নাই।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর বিচিত্র সহর। ইহাকে পাশ্চাত্য পর্য্যটকরা 'প্রাচীর ভেনিস' আখ্যায় অভিহিত করেন। উভয় সহরেই স্থলময় সাধারণ রাজপথের পরিবর্ত্তে জলপথ বিদ্যমান আছে। শ্রীনগরবাসীর পক্ষে ঝেলাম নদই প্রধান পথ। নৌকাই এখানকার প্রধান যান। অবশ্য সাধারণ পথ নাই তাহা নহে। বহু পথ রহিয়াছে এবং এই পথগুলি বিচিত্রদর্শনও বটে। কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং নানা ভঙ্গীতে উৎকীর্ণ গৃহগুলি এই নগরের এক বিস্ময়জনক বৈশিষ্ট্য। সাধারণ পথগুলি অতি সঙ্কীর্ণ, গলি বলিলেই চলিতে পারে। প্রস্তরে প্রস্তুত সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত পথও দুই একটি আছে বটে কিন্তু এখানকার প্রধান পথ ঝেলাম নদই সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই নদের কর্ম্মব্যস্ত অগণিত তরণীপূর্ণ মূর্ত্তি কাশ্মীরে প্রথমাগত ব্যক্তিকে অত্যন্ত বিস্মিত করিয়া তুলে। ক্রয়-বিক্রয় কার্য্যও নদীর বক্ষেই সম্পাদিত হইতেছে। ফেরিওয়ালা ফেরি করিতেছে নদীর বুকে নৌকায় চড়িয়া। দোকানী তাহার পণ্য নৌকায় সাজাইয়া গৃহ-নৌকাগুলির আরোহীদের নিকট লইয়া যাইতেছে। নৌকায় বসিয়াই তাহারা অপনাদের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি পাইতে পারে।

প্রথম দিন বিশ্রাম করার পর শ্রীনগরবাসী এক বন্ধু আমাদের জন্য দাল-হ্রদবক্ষে ভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। দশবর্গমাইলব্যাপী এই হ্রদটির জল অত্যন্ত স্বচ্ছ। ঠিক যেন একখানি প্রকাণ্ড সুনির্ম্মল দর্পণ। পার্শ্বস্থ প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি সেই দর্পণে সর্ব্বদা প্রতিফলিত। দালহ্রদবক্ষে নৌকায় দাঁড়াইলে এবং চারিদিকে চাহিলে যে দিব্য দৃশ্য

কাশ্মীরী রমণী চাউল ছাটিতেছে

দৃষ্টিপথে পতিত হইল, তাহা বর্ণনাতীত। প্রথমে ভাসমান উদ্যানগুলি বিস্ময় জন্মায়। অন্য কোথাও জলবক্ষে চলন্ত উদ্যান আমরা দেখি নাই। যে দেশের স্থলে ও জলে সর্ব্বত্র উদ্যান—উহা কি প্রকার বিচিত্রদর্শন তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। আমাদের পশ্চাতে পীরপাঞ্জাল পর্ব্বত-শ্রেণী এবং হরিপর্ব্বত। সম্রাট্ আকবর এই পর্ব্বতশীর্ষে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করান। সেই দুর্গটিও দেখা যায়। আমাদের ডাহিনে 'তক্ত-ই-সুলেমান' গিরি। গিরিশীর্ষে দেবমন্দির। এই সুপ্রসিদ্ধ শৈলটি শ্রীনগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বলা চলে। পরীদের প্রাসাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ পরীমহলও আমাদের নেত্রপথে পতিত হইল। ইহাও মোগলযুগের রচনা। নক্ষত্রপুঞ্জ পর্য্যবেক্ষণের জন্য মান-মন্দিররূপে ইহা নির্ম্মিত বলিয়া জানা যায়। ইহার যৎকিঞ্চিৎ বামে 'চস্‌ম-ই-শাহী'। একটি চতুষ্ক উপবন ব্যতিরেকে এই মোগলকীর্ত্তির অন্য কোন অবশেষ বিদ্যমান

নাই। নিশংবাগের অস্পষ্ট মূর্ত্তিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সম্মুখে সরাসরি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে সুপ্রসিদ্ধ শালিমারের বৃক্ষশ্যাম মূর্ত্তির আভাসও পাওয়া যায়।

আমরা অগ্রসর হইবার সময় দালহ্রদের মধ্যস্থলে একটি চতুষ্ক ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলাম। একজন মৎস্যজীবী ধীবরকে আমরা তথায় মৎস্যানুসন্ধানে রত দেখিলাম। এখানে বর্শার দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মৎস্য ধরিবার প্রথা প্রচলিত আছে। দালহ্রদে প্রচুর মাছ আছে বলিয়া ধীবর আমাদিগকে জানাইল। এই ধ্বংসাবশেষটি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দ্বারা নুরজাহানের জন্য প্রস্তুত 'চেহার চেনার' নামক দ্বীপের অবশেষ। ইহাকে 'সোনার লঙ্কা' বলিয়াও অভিহিত করা হয়। চেনারনামক কাশ্মীর-সুলভ পাদপ এই দ্বীপের বৈশিষ্ট্য। চারিটি চেনার গাছের দুইটি এখনও বিদ্যমান আছে। শাহজাহান এবং মুমতাজমহল এই দ্বীপে আসিয়া পরস্পর প্রণয় নিবেদন করিতেন বলিয়া জানা যায়। শুনা যায়, আজিও এই স্থানটি প্রণয়ীদের প্রণয়ালাপের উপযোগী একটি বিশেষ নির্জ্জন ও নিভৃত স্থান বলিয়া বিবেচিত।

বানিহালের পথে বিরাজিত পরমপ্রীতিপ্রদ পপলার পাদপশ্রেণী

জম্মু বা বানিহালের পথটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইলেও মারী-শ্রীনগর পথটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মারী হইতে শ্রীনগর প্রায় ১ শত ৯৮ মাইল। পথে বিলম্ব না হইলে এই পথ অতিক্রম করিতে কারে দেড় দিনের অধিক লাগে না। লরিতে দুই দিন লাগিতে পারে। ঘণ্টায় ১৪ মাইল করিয়া চলা আইন অনুযায়ী নিয়ম। রাওলপিণ্ডী হইতে মারী ৪০ মাইল। সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এই ৪০ মাইল পথে যাতায়াত নিষিদ্ধ। রাওলপিণ্ডিতে অনেকগুলি মোটর কোম্পানী রহিয়াছে। সমগ্র ফাইভসীটার বা পাঁচটি আসনবিশিষ্ট কার ভাড়া লইলে ১ শত হইতে দেড়শত টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া লাগিতে পারে। একটি মাত্র আসনের জন্য ৩০ হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত লাগে। লরিতে যাইলে ১০ টাকা হইতে ২০ টাকা ভাড়া লাগার কথা আমাদের জানা আছে। কারে ২ মণ জিনিষ এমনই লইয়া যাওয়া যায়। লরীর যাত্রী প্রত্যেক আসনের জন্য ২০ সের জিনিষ লইয়া যাইতে অধিকারী। ইহার অতিরিক্ত লাগেজ লরিযোগে (কারে নহে) লইয়া যাওয়া হয়। ইহার জন্য প্রতি মণে সাড়ে পাঁচ টাকা ভাড়া দিতে হয়।

মারীর পথও কম মনোরম নয়। মারীর পথকে শান্ত ও কান্ত এবং বানিহালের পথকে ভীমকান্ত বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। রাওলপিণ্ডি হইতে ১৩৮ মাইল দুরবর্ত্তী বারাকাত পর্য্যন্ত পথটি প্রায়ই সমতল এবং তরু-ছায়াশীতল। তারপর পথটির মনোমদ দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া ২ হাজার ফিট আরোহণ অত্যন্ত উপভোগ্য। বারাকাত হইতে ১২ মাইল দুরবর্ত্তী ট্রেট নামক স্থানের বাংলোতে আমরা প্রথমবার আশ্রয় লইয়াছিলাম। ইহার পর সাড়ে ১৩ মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা মারীতে পৌঁছিয়াছিলাম। মারী একটি প্রসিদ্ধ শৈলাবাস, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ৭ হাজার ফিট। ইহা একটি উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যনিবাসও বটে। এখান হইতে উত্তরস্থ তুঙ্গ শৃঙ্গশ্রেণী এবং দক্ষিণস্থ দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর উভয়ের দৃশ্যই মনোমুগ্ধকর। মারী হইতে ২৯॥ মাইল দূরে কোহালা। মারীর পথে (প্রথমবার) আসিবার সময় আমরা কোহালায় রাত্রিবাস করিয়াছিলাম। কোহালা মারীর মত মনোরম ও স্বাস্থ্যজনক নয়। কোহালায় ঝেলাম নদের সহিত সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হইলে ভ্রমণকারীর মনে হয়, এইবার সে কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে। ঝেলাম নদকে অনুসরণ করিয়া এইবার আগাইয়া যাওয়া চলে।

ঝেলাম নদের বাম তীরে বারামুল্লা। এই পথে ইহার পর ভুলাই ও ডোমেল। ১৪ হাজার ফিট উচ্চ কুর্ণাল শৃঙ্গ এই অঞ্চলে দৃষ্ট হয়। ডোমেলে মারীর পথ এবটাবাদের পথের সহিত মিলিয়াছে। উভয়ে সম্মিলিত হইয়া শ্রীনগরের দিকে আগাইয়া গিয়াছে।

এবটাবাদের পথের একটি সুবিধা,—যখন মারীর পথ তুষাররাশির জন্য রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন এবটাবাদের পথ উন্মুক্ত থাকে। বানিহালের পথও সেই সময় বন্ধ হইয়া যায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। ট্যাক্সিলা বা তক্ষশীলা হইতে হাভেলিয়ান পর্য্যন্ত একটি (নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের) শাখা-রেলপথ রহিয়াছে। হাভেলিয়ান হইতে এবটাবাদের পথ আরম্ভ হইয়াছে বলা চলে। হাভেলিয়ান হইতে শ্রীনগরের দূরত্ব ১ শত ৬৯ মাইল। মারীর পথ ১ শত ৯৮ মাইল দীর্ঘ সুতরাং এবটাবাদের পথে কিঞ্চিৎ অল্প ব্যবধান অতিক্রম করিতে হয়। তবে এ-বিষয়ে সংশয় নাই যে, মারীর পথে যান ও বিশ্রামস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে অধিক সুবিধা বিদ্যমান।

ফাল্গুনি

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।
বেলা-শেষের কুঞ্জে আমার তুই রে ছোট টুনটুনি।
কোন্ কাননে কোথায় ছিলি,
এসেই এ-ঘর মাতিয়ে দিলি ?
ভাঙ্গা বুকে জড়িয়ে তোরে, আয় রে নতুন গান শুনি,
ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।
স্বর্গ হোতে আস্‌লি কি রে
গরীবের এই নীরব নীড়ে ?
আয় তবে এই জীর্ণ বুকে আবার স্বপন-জাল বুনি ;
ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।

ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।
আমার সন্ধ্যা-সঙ্গীতে তুই সকাল বেলার ধন্দুনি।
মরা-গাঙে ছুটিয়ে বান,
কল্লোলে তুই তুল্‌লি তান ;
বিষাদ-অবসাদের মাঝে এলি রে তুই গুন্-গুনি' ;
ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।
এক ফালি তুই চাঁদের হাসি,
রুগুত-গলা জ্যোৎস্নারাশি,
একদলা তুই কমল-হীরে, রাজ-মুকুটের লাল চুনি ;
ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।

ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।
বাঁধন-ছেঁড়া নৌকো আমার ভিড়বে না—তাই জানতুমই।
যা'বার মুখে নতুন কোরে,
বাঁধলি এসে নতুন ডোরে,
নতুন আলো জ্বালিয়ে দিয়ে, বাজিয়ে নতুন ঝুনঝুনি ;
ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।
আবার কচি মায়া-মুকুল,
শুকনো প্রাণে ফোটালো ফুল ;
আবার ফিরে চাইতে হোল, পেছনে তোর ডাক শুনি' ;
ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।

ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।
শক্তিহীন, দীন ভিখারী, নিঃস্ব আমি, নিগুণী।
বৈরাগীর এ মরু-ভুঁই
দেবার তোরে নাই কিছুই ;
নাইকো কোন মৃগনাভি, নাইকো আতর-চন্দনি ;
ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।
রিক্তবুকের আসন 'পরে
বসিয়েছি রাজ-রাজেশ্বরে ;
তাঁরি চরণ-ধূলি দিলাম, মাথায় কোরে নাও তুমি ;
ফাল্গুনি রে ফাল্গুনি।

চাঁদমারি

শ্রীকল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী

ছোট্ট ষ্টীমার-কোম্পানীর টিকিট-ঘরটাও সেই অনুপাতে ছোট। সেই ঘরের মধ্যে বসেই অমরবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

অমর গাঙ্গুলী এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। অর্থাৎ, তিনি একাধারে অপিসের বড়কর্ত্তা, হেডক্লার্ক, টিকিট-বিক্রেতাও বলা যেতে পারে। অবিশ্যি সুনীল আছে বটে একজন কেরাণীবাবু, এবং দয়াল টিকিটবাবু, তথাপি তাদের উপস্থিতি ঠিক নিয়মিত নয়। এবং গ্রামসম্পর্কে তাদের সঙ্গে অমরবাবুর খুড়ো-ভাইপো সুবাদ হওয়াতে তাদের অনেক ত্রুটিই দেখতে পেয়েও তাঁকে এড়িয়ে যেতে হয়।

টিকিট কাটতে এসে জীবনবাবু শুনলেন, ষ্টীমার আধঘণ্টা আগে ছেড়ে দিয়েছে।

ছোট্ট ঘুলঘুলির ফাঁকে চোখ রেখে জীবনবাবু প্রশ্ন করলেন, "দাদা, ক'টা বাজে একটু বলুন তো।"

টিকিট-ঘরে নির্জ্জীব কাগজপত্র আর শুকনো কাঠ লোহার মাঝখানে একা একা বসে অমরবাবুর প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠছিল। জীবনবাবুর জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, "ভেতরে আসুন না, ম'শায়। কাঁহাতক আর দুপুরে রোদে পুড়বেন ?"

বলা বাহুল্য, জীবনবাবুও সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কারণ, পরের ষ্টীমার সেই রাত্রি আটটায়; এবং পশ্চিম বঙ্গে দুপুরে রোদের ধাক্কা সামলান খুব সহজ ব্যাপার নয়।

জীবনবাবু টিনের সেডের টিকিট-ঘরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সে ঘরে বসেও তিনি যে খুব আরাম বোধ করলেন, তা নয়। কারণ, সূর্য্যের উত্তাপ টিনের সেড ভেদ করে ঘরের মধ্যেকার বাতাসকেও যথেষ্ট উত্তপ্ত করে তুলেছিল।

জীবনবাবুর বাড়ী মাইল দশেক দূরে নন্দপুর গ্রামে। গ্রামটি এককালে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। শান্ত ছায়ায় ঘেরা সুশ্রী মাটির কুটীরগুলো সন্ধ্যার সোনালী আলোয় প্রকৃতই যেন নন্দন কাননের সৌরভ সেখানে বয়ে আনত। গোধূলী বেলায় গাছের ফাঁকে সোনালী ধূলো উড়ত; আর সন্ধ্যায় দিঘীর ধার হ'তে আমের বোলের মৃদু সুঘ্রাণ ভেসে আসত।

এও অনেক দিনের কথা। তখনো কলকাতা সহর এখনকার মতো বিরাট হয়ে উঠে ভীরু, নিরীহ পল্লীগুলোকে গলা টিপে মারেনি। তারপর, কলকাতার যতই শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো, ততই গ্রামগুলি একের পর এক মরুভূমিতে পরিণত হ'তে লাগল

জীবনবাবুও ছিলেন এমনি এক গ্রামের বাসিন্দা। অন্য অনেক লোকের মতো তিনিও একই ভাঁটার টানে কলকাতার অভিমুখে ভেসে যাচ্ছিলেন।

টিকিট-ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে সামনেই গঙ্গা চোখে পড়ে। গঙ্গা এখানে প্রায় মাইল তিনেক চওড়া। মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণ প'ড়ে গৈরিক ঢেউগুলি চিক্‌মিক্ করে উঠছে উর্ব্বশীর স্বর্ণ-বিজড়িত অঞ্চলের মতো; কাছে-দূরে কতকগুলো বয়া ঢেউয়ের তালে তালে হেলছে দুলছে; গঙ্গাচিলগুলো জলের উপর চক্কর দিতে দিতে এক একবার সহসা জলের বুকে লাফিয়ে পড়ছে মাছ ধরবার আশায়; অনেক দূরে দুটো একটা পালতোলা নৌকা স্রোতের টানে মন্থর গতিতে ভেসে আসছে। মধ্যাহ্নের এই নিস্তব্ধ পরিবেশটুকুর মধ্যে যেন মহাকালের গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যুগযুগান্ত ধরে এখানে রূপকথার রাজকুমারী পদ্মকোরকটির মধ্যে শুয়ে পরম আরামে যেন সোনালী স্বপ্ন উপভোগ করছে।

অমরবাবু প্রশ্ন করলেন, "মশায়ের বাড়ী কোন্ গাঁয়ে ?"

জীবনবাবু উত্তর দিলেন।

তারপর এই সূত্র ধরেই আলাপ-আলোচনা এগিয়ে চলল। নন্দনপুরে আলুর সের এখন কত, মাছ কি দরে বিকোচ্ছে প্রভৃতি কথা জিজ্ঞাসা করতেও অমরবাবুর ভুল হোল না।

ঘরের মধ্যেকার উত্তপ্ত বাতাস ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠল

অমরবাবু বললেন, "চলুন দাদা, বাইরে হাওয়ায় গিয়ে বসি।"

দুজনে বাইরে এসে রকের ওপর বসে পড়লেন। অমরবাবু পানের পিক ফেললেন ধূলোর ওপর, সেটা ধূলোতে ধূলোতে শুষে গেল না; ধূলোশুদ্ধ গোল হয়ে গড়িয়ে উঠল।

গঙ্গার বুকে জেটীতে জলপুলিশের লঞ্চটা বাঁধা রয়েছে। সামনে একসারি নারকোল গাছ; তাদের ঝালর দেওয়া পাতাগুলো একটা সুসমঞ্জস ছন্দে দুলছে; নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তার শর্ শর্ ধ্বনি বেশ মিষ্টি শোনাচ্ছে।

অমরবাবু তাঁর কাহিনী বলতে সুরু করলেন। তিনি যা বললেন তা এই—

* * *

সেবার বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে খানিক কলহ হয়ে যাবার পর কাউকে না বলে অমরবাবু বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন; এবং কালীগাঁয়ে ভাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

কালী গাঁ দামোদরের পারে একটা ছোট্ট গ্রাম। সেবার বন্যাতে দামোদরের বাঁধ ভেঙে অনেক গ্রামকেই একেবারে ধুয়ে মুছে নিয়ে গিয়েছিল। কালী গাঁয়ের বিশেষ কিছু ক্ষতি না হলেও কয়েক বিঘা আবাদী জমি জলের তলায় চলে গিয়েছিল, আর প্রায় পনেরো বিশ ঘর লোক ঘরছাড়া হয়েছিল।

ক্রমে ক্রমে বন্যার জল সরে যেতে লাগল, আর সেই সঙ্গে নানারকম রোগ গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কলকাতা সহর থেকে আর্ত্তত্রাণ-সমিতির একটা দল কালী-গাঁয়ে এসে উঠল। সে দলে ছিল পাঁচজন কলেজের ছাত্র। রঙীন নেশায় ভরা মনে, অনেক আদর্শের স্বপ্ন নিয়ে তারা রিলিফের কাজে এসেছিল।

অমরবাবুর সঙ্গে এদের দেখা হয়েছিল নৌকায়। সেখানেই কথায় কথায় অমরবাবু জানলেন, রিলিফের কাজে এরা কলকাতা থেকে আসছে। কালীগাঁয়েই এরা কাজ করবে। অমরবাবু তাদের প্রচুর ধন্যবাদ জানালেন, আরো জানালেন যে, তিনিও

আপাততঃ কালীগাঁয়েই থাকবেন, এবং রিলিফের কাজে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

অমরবাবু ভাইয়ের বাড়ীতে এসে উঠলেন।

সমরবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে একটু সঙ্গতিপন্ন লোক। তাঁর বিঘে দশেক জমি, তিনটে গাই আছে। রিলিফের দলটিও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মতো সমরবাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় নিল।

সমরবাবুর বাড়ী থেকে রেল-ষ্টেশন দেড় মাইলের পথ। ষ্টেশনে একটি চায়ের ষ্টল আছে; ধারে-কাছে আর কোনো চায়ের দোকান নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছেলেরা সেখানে চা-পাঁউরুটি খেতে যেত। মধ্যাহ্নে সমরবাবুর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করত। তারপর দুপুর দেড়টা-দুটো থেকে সন্ধ্যে সাতটা অবধি বাড়ী বাড়ী ঘুরে খুঁটিনাটি অনেক বিবরণ সংগ্রহ করত—কার কত জমি জলে ডুবেছে, বাড়ীতে কার কি অসুখ, তাদের কি রকম আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি। পথে ফিরতে অন্ধকার হয়ে যেত। লণ্ঠন জালিয়ে তার আলোর পথ দেখে খালবিল এড়িয়ে তারা বাড়ী ফিরত।

সমরবাবুর মতোই আরো অনেকে মনে করেছিলেন, এরা যেন স্বর্গের দেবদূতের মতো এখানে এসে পড়েছে ছাত্রদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় এদের হৃদয় ভরে উঠত। এমন কি, একদিন অমরবাবু এদের দশটা টাকাও দান করে ফেললেন।

ছাত্রদলটি দিন সাতেক কালীগাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ ক'রে অবশেষে একদিন সহরে ফিরে আসা মনস্থ করল। ফিরে আসার সময় তারা গ্রামের মোড়লশ্রেণীর লোকেদের একটা সভায় বলে এসেছিল, কলকাতায় গিয়েই তারা ওষুধ, পথ্য প্রভৃতি পাঠাবে।

অমর বসেছিল শ্রীশ দাসের দালানে। শ্রীশ, সমরবাবু, অমর বাবু এবং আরো জনা পাঁচ ছয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সলিল বলছিল "দেখুন, আপাততঃ আমাদের হাতে জিনিষপত্র কিছুই নেই। কলকাতায় গিয়েই আমরা এখানে সব পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেব।"

উঠোনের এক কোণে উবু হয়ে বসে পরাণমাঝি পিঠ চুলকোচ্ছিল। সে বলল, "বাবু, সর্ব্বাগ্রে দয়া করে কুনিন পাঠাবেন। গ্রামে ম্যালোয়ারি দেখা দিয়েচে, আর সব পটাপট্ মরে যাচ্ছে।"

রমেশ বলল, "শুধু কুনিন নয়, পরাণ; এখানে কলেরা-ইঞ্জেক্‌শান, তারপর খাবার-দাবার সব কিছুই পাঠাতে হবে।"

কলেরা এখনো দেখা দেয়নি বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে, এমন আশঙ্কাও রয়েছে।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চালানোর পর ছেলেরা উঠে এলো। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তখনো সেখানে বসে রইল।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সমরবাবু হ্যারিকেন জালিয়ে উঠোনের ওপর রাখলেন। সকলে তার চারিধারে গোল হয়ে বসল।

শ্রীশ দাসের একটা মুদীর দোকান আছে। তাঁর পরণে একটা ফতুয়া, কাপড়ের আঁচলটা কুঁচিয়ে কোমরে গোঁজা, চোখে-মুখে বেশ একটু মুরুব্বিয়ানার ভাব। বারোয়ারী হুঁকোয় একটা টান দিয়ে সেটা সমরবাবুর হাতে দিয়ে তিনি বললেন, "বুঝলেন কিনা সমরবাবু, আমার কেমন সন্দো হচ্চে, এদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না। নইলে, এতদিন রইল অথচ শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ালো; আর কিছুই করতে পারল না?

সমরবাবুর মনেও এ আশঙ্কা জেগেছিল। কিন্তু দশজনের সামনে প্রকাশ করে বললে, পাছে তা আরো বদ্ধমূল হয়ে যায়, সেই ভেবে তিনি শ্রীশের কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আরে না, না। কেন মিথ্যে ওঁদের সন্দেহ কচ্চ? রিলিফের কাজ এমনি করেই হয়। ওঁরা আগে খোঁজ-খবর নিয়ে যাবেন, সেই বুঝেই না সহর থেকে জিনিষপত্র পাঠাবেন?

শ্রীশ বললেন, "তা যা বলেছেন। ওঁদের অবিশ্বাস করে তো আর কিছু করতে পারব না। বিশ্বাস করেই দেখা যাক্।"

পরাণ টেনে টেনে ফোড়ন কেটে উঠল, "বিশ্বাসে মিলে কিষ্টো, তক্কে বহু—দূর।"

ছেলেরা তার পরের দিনই কলকাতায় ফিরে যাবে। অমরবাবুও স্থির করলেন, তিনিও কাল ওদের সঙ্গে এক নৌকাতেই স্বগ্রামে ফিরে আসবেন। রাত্রিতেই তিনি সেইমতো সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন।

ছেলেরা থাকত একটা একতলা বাংলো বাড়ীতে। সেটাও সমরবাবুরই বাড়ী। বাড়ী বলতে মোটে একটা শোবার ঘর, আর একটা ছোট্ট ভাঁড়ার ঘর। সেই ঘরের পরে মাঠ, আরো পরে রান্নাঘর।

ঘরের মধ্যে বসে সলিল তার নোটবুকে আজকের সংগৃহীত বিবরণগুলো গুছিয়ে লিখে রাখছিল। আর একধারে বিনোদ একখানা গল্পের বই হ্যারিকেনের আলোতে ধরে পড়ছিল।

সলিলের হিসাব টোকা শেষ হয়ে গেলে পর বিনোদের দিকে চেয়ে সে বলল, "ওহে, চেঁচিয়ে পড় না; একটু আমরাও শুনি।

কিন্তু গল্প আর শোনা হোল না। অমরবাবু ঘরে প্রবেশ করে বললেন, "আপনারা সব খেতে আসুন, সলিলবাবু; জায়গা হয়ে গেছে।"

রান্নাঘরের দাওয়ায় সকলে খেতে বসল। মাটির দাওয়া; এখানে-ওখানে উঁচু-নীচু। সেখানেই একটু সুবিধেমতো জায়গা দেখে ওদের আসন করে দেওয়া হয়েছিল।

সামনে একটা হ্যারিকেন জ্বলচে। সবাই নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে চলেছে। হঠাৎ, একি! কে যেন অনেক দূরে বিশ্রী ভাঙ্গা গলায় গান গাইছে না? অনেকক্ষণ মন দিয়ে শুনে তারা গানের পদগুলো ধরবার চেষ্টা করল। কে যেন টেনে টেনে গান গাইছে—

"দামোদরের বাঁধ ভেঙেচে
পটাপট্ সব পটল তুলেচে।
তোল্, তোল্, পটল তো—ল্।"

ছেলেরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে সামনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল।—কিছুই দেখা গেল না; অস্পষ্ট চাঁদের আলোর ঝোপে ঝোপে শুধু অন্ধকারটাই দেখা যাচ্ছে, আর কিছু না।

আবার সেই গান শোনা গেল; আর গানের শেষে একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি। মাঝে মাঝে কাশির ধমকে হাসি থেমে যাচ্ছে, তারপরে আবার দ্বিগুণ জোরে ধ্বনিত হয়ে উঠে যেন রাত্রির শান্ত আবহাওয়াকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিচ্ছে।

অমরবাবু হেসে উঠে বললেন, "ও কিছু না। পরাণ মাঝি গাঁজা টেনে গান গাইছে।"

বিনোদ বলল, "ও বাবা, এ আবার কি রকম গান?"

এদের পরিবেশন করতে করতে ঠাকুর বলল, "এই বাঁধ ভাঙার পর থেকেই পরাণ প্রায় রাতে এই গান করে।"

সলিল জিজ্ঞাসা করল, "গানটা ও নিজেই তৈরী করেছে বুঝি?"

ঠাকুর বলল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

রমেশ সমবেদনা প্রকাশ করে বলল, "আহা, বেচারী বোধ হয় শোকে-দুঃখে পাগল হয়ে গেছে।"

রমেশ ঠিকই অনুমান করেছে।

কয়েক বছর আগে আর একবার দামোদরের বাঁধ ভেঙেছিল। সেবার পরাণের বৌ-ছেলেমেয়ে সবাই রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় বানের জলে ভেসে গিয়েছিল। শুধু পরাণ সেবার কেমন করে যেন বেঁচে গিয়েছিল। সেই থেকেই পরাণ মাঝে মাঝে পাগলামী করে বেড়াত।

এবারের বান ডাকার পর তার পাগলামী অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। ইদানীং, সেটা কিছু কম ছিল বলেই ছেলেরা পরাণের গান শুনতে পায়নি। পরাণের পাগলামীর অনেক গল্প তারা অমরবাবুর কাছে শুনল।

দামোদরের বাঁধ ভাঙার কিছুদিন পরেই অমরবাবু আরো একবার কালীগাঁয়ে এসেছিলেন। এ ঘটনা সেই সময়েই ঘটেছিল।

একদিন অনেক রাত করে অমরবাবু ভাইয়ের বাড়ীতে ফিরছিলেন; হঠাৎ সড়কের ওপর চেয়ে দেখতে পেলেন, পিঠে একটা বোঁচকা নিয়ে পরাণ নদীর দিকে যাচ্ছে। দু'জনে মুখোমুখি এসে পড়তেই অমরবাবু প্রশ্ন করলেন, "কোথায় যাচ্ছিস রে পরাণ, এত রাতে?"

পরাণ মুষ্টিবদ্ধ ডানহাতটা আস্ফালন করে বলল, "যাচ্ছি শালা দামোদরকে শায়েস্তা করতে। শালা অনেক লোক খেয়েছে! এবার শালাকে টাকা দিয়ে বাঁধ তুলে আটকাব।"

অমরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোর পিঠে কিসের বোঁচকা?"

পরাণ বলল, "বাঁধ।"

অমরবাবু বলে উঠলেন, "তুই কি ক্ষেপে গেলি, পরাণ?"

পরাণ তাঁর দিকে একবার তির্য্যক ভঙ্গীতে চেয়ে বলল, 'তুমি আমাকে রুখতে এয়োচো, দা' ঠাকুর? আমি এই দৌড় দিলাম; ধরো তো দেখি কেমন ধরতে পার?" বলে সত্যিই পরাণ প্রচণ্ডবেগে দৌড়ে চলল।

অমরবাবুও পরাণের পেছনে পেছনে ছুটলেন। শেষকালে পাগলাটা জলে লাফিয়ে পড়বে নাকি?

কিন্তু ততক্ষণে পরাণ বাঁধের ভাঙা জায়গার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে এক হাতে তার টাকার থলিটা ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুঁড়ে নদীর জলে ফেলে দিল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, "নে শালা, খা। খেয়ে খিদে মিটো। দেখিস্ আর যেন খেতে চাস্ নি।"

বাঁধটা ইট দিয়ে তৈরী। তার ওপর লোহার তার দিয়ে বাঁধা ছিল; বন্যার জল তারই একটা বিরাট অংশ ভেঙে ফেলেছে। মানুষের শক্তিকে উপহাস করতে করতে সেখানে সোল্লাসে তরঙ্গের পর তরঙ্গ গর্জ্জন তুলে ভেঙে পড়ছে।

*

এই পর্য্যন্ত বলেই অমরবাবু থামলেন। তারপরে বললেন, "খেয়ে উঠে আপনাদের কাহিনীর শেষটা শোনাব।"

খাওয়া দাওয়া শেষ করে মশলা চিবোতে চিবোতে ঘরে এসে অমরবাবু আবার শুরু করলেন।—

হ্যারিকেনের চারিধারে ওরা বসে আছে। আলোটা নীচু দিক হতে ওদের মুখের কতকাংশে এসে পড়ে ওদের কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি যেন অধিকতর পরিস্ফুট করে তুলছে। পেছনে চারিদিকের দেওয়ালে কালো ছায়াগুলো মস্ত বড় দেখাচ্ছে।...

ভাঙা মাটীর বাড়ীতে বাস করে পরাণ ঐ সামান্য সঞ্চয়টুকু করেছিল। সেটা নদীর জলে বিসর্জ্জন দেবার পরে পরাণকে বাপের আমলের পুরোণো আমকাঠের নৌকোটা আবার বার করতে হোল।

কালীগাঁয়ের মাইল চারেক দূরে নদীর ওপারে একটা বড় গঞ্জে প্রায়ই লোক যাতায়াত করত। অন্য অনেক মাঝির মতো পরাণও সেই খেয়া পারাপারের কাজে লেগে গেল।

বাপ মারা যাবার পর বোধ হয় বছর দুই পরাণ নৌকো বেয়েছিল। তারপরে চলে এসেছিল ক্ষেতমজুরের কাজে। সেই ক্ষেতটুকু এবার অন্য অনেক ক্ষেতের সঙ্গেই জলের তলায় চলে গিয়েছে। কাজেই পরাণকে আবার সেই পুরাতন বৃত্তিই অবলম্বন করতে হোল।

গাঁয়ের ঘাট আগে যেখানে ছিল, বন্যার পর তার থেকে প্রায় সিকি মাইল সরে এসেছে। যেখানে দিন কয়েক আগেও কচি ধানের চারাগুলো হাল্কা কেশগুচ্ছের মতো হাওয়ার তালে একসঙ্গে হেলত-দুলত, সেখানে এখন থই থই করচে জল। দেখে বোঝবার উপায় নেই, কোনোদিন এখানে শুকনো জমি ছিল।

সেদিন অমরবাবু পরাণের নৌকোয় চেপে ওপারে যাচ্ছিলেন। নদীতে বেজায় স্রোতের টান। নৌকো আড়পার চালানো একেবারেই অসম্ভব। পরাণ নৌকোর মুখ বেঁকিয়ে দিয়ে টেরচা করে বাইতে লাগল।

অমরবাবু এক সময় বলে উঠলেন, "একটু তাড়াতাড়ি হাত চালা রে পরাণ।"

দাঁড়ের একঘায়ে নৌকোটাকে একেবারে স্থিরভাবে দাঁড় করিয়ে পরাণ বলল, "নৌকো আর চলছে না, দা' ঠাকুর।"

—কেন, কি হয়েছে?

দাঁড় আটকে যাচ্ছে।

অমরবাবু অবাক হয়ে বললেন, "দাঁড় আটকে যাচ্ছে কি রে? ওই মাঝনদীতে কিসে আবার তোর দাঁড় আটকালো?

পরাণ জলের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললে, "দেখতে পাচ্ছ না, ধানগাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে? ওর মধ্যে দিয়ে কি নৌকো চলে?"

অমরবাবু অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, পরাণের পাগলামী আবার হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। এখন যে ও কি করে বসবে তা কে জানে। হয় ত' বা নৌকোর মুখই ঘুরিয়ে দেবে।

অমরবাবু তাই তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন; "হাঁ রে পরাণ, এখনো তুই ও-গুলো খাস্—ঐ যে কি বলে।

এইটুকু ইঙ্গিতই পরাণের পক্ষে যথেষ্ট। লাজুকের মতো মুখ কাঁচুমাচু করে সে বললে, "তা দাঠাকুর ও-গুলো না খেলে শরীরে বল পাই না।"

অমরবাবু আবার বললেন, "খাস তো। ও-গুলো কি জিনিষ, তা জানিস্?"

প্রসঙ্গটা চলতে দেখে মনে মনে পরাণ ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠছিল। কোনোমতে মাথা নেড়ে সে শুধু জানালো, "না।"

কেমন করে শনগাছ থেকে গাঁজা তৈরী হয়, অমরবাবু তাকে বোঝাতে লাগলেন। এবং অমরবাবুর কথা শুনতে শুনতে একসময় পরাণ আবার দাঁড় হাতে তুলে নিল।

পরাণ আবার নৌকা বাইতে লাগল। বাইতে বাইতে এক সময় প্রশ্ন করল, "দ'ঠাকুর, তুমি তো কয়েকবার সহরে গেছ। ঘোড়দৌড় দেখেচ কখনো?"

অমরবাবু বললেন, "দুবার দেখতে গেছিলাম। ওঃ, গড়ের মাঠে সে কি লোকের ভীড়!"

—আচ্ছা দা' ঠাকুর, রেস খেলে কি রকম টাকা পাওয়া যায়?

—সবাই তো আর পায় না; যারা পায় লাখ-লাখ টাকা পায়। কেন রে?

পরাণ ঝপ করে দাঁড় দুখানা জলে ফেলে দিয়ে টানতে লাগল; এ কথার কোনো উত্তর দিল না। তার সবল পেশীবহুল হাত দুটো ঠিক যেন যন্ত্রের মতো চলতে লাগল; তার শক্ত মুঠোর মধ্যে কাঠের দাঁড়গুলো ঝপ্ ঝপ্ করে জল কাটতে লাগল;

পরাণের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অমরবাবু একসময় বললেন, "পরাণ, তুই কি আর বিয়ে করবি না?"

পরাণ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "না।"

পুঁটীর মা অমরবাবুকে ধরেছিলেন, পুঁটীর সঙ্গে পরাণের বিয়ে দেবার জন্যে। সেকথা মনে করে অমরবাবু বললেন, "কেন, ঐ পুঁটীকে দেখতে খারাপ নাকি?"

পরাণের কানদুটো রাঙ্গা হয়ে উঠল; সে সজোরে মাথা নেড়ে বলল, "ধেৎ। ও তো আমার নাতনীর বয়সী।"

অমরবাবু বললেন, কে বললে নাতনীর বয়সী? আর হোলই বা, বলে তোর চেয়ে কত বুড়ো-বুড়ো লোকের পুঁটীর মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে!"

পরাণ বলল, "হোক গে। বিয়ে করার সুখ আমার খুব জানা আছে। লক্ষ্মীমণি আমায় কত সুখ দিল!"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলল, "আর দশ বছর বাদে তো আমি মরে যাব; তখন হতভাগা কোথায় থাকবে?"

অমরবাবু আবার বললেন, "দশ বছর বাদে তুই মরে যাবি, কে বলেছে? তোর বাপ তো নব্বই বছর বয়সেও নিমকাঠি দিয়ে দাঁতন করত।"

পরাণ অধৈর্য্যের মতো বলে উঠল, "আর আমাকে ত্যাক্ত করো নি বলচি, দা' ঠাকুর; আর আমি ভরুক করতে পারিনে। বিয়ে আমি করব নি, ব্যাস্, চুকে গেল!"

পরাণের রকম-সকম দেখে গাঁয়ের লোক সহসা কৌতূহলী হয়ে উঠল। মাঝে মাঝেই পরাণ কলকাতায় যেত, আর আসত দু'তিন দিন পরে। ছোট্ট গ্রামের মধ্যে কোনো কথাই বেশি দিন চাপা থাকে না। পরাণের রেসখেলার খবরটাও একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল।

কথাটা প্রকাশ করে দিলে পরাণ নিজেই।

শ্রীশ একদিন পরাণকে জিজ্ঞেস করছিলেন, আজকাল এত ঘন ঘন সহরে ও কি জন্য যায়।

পরাণ কোনোরকম ভূমিকা না করে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "রেস খেলাতে যাই। টাকা চাই, টাকা চাই। দামোদরের বাঁধ ভেঙে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না? আমার লক্ষ্মীমণি, টৌকন, লিটু, দামোদরের জলেই ভেসে গেছে না? তোমার আর কি, খুড়ো? আমার পাঁজরা ভেঙে গিয়েছে। ও-শালা আমার ঘরে আগুন দিয়েচে, আমিও ওকে ঠাণ্ডা করে ছাড়ব।"

এই উন্মাদকে কিছু বোঝাতে যাওয়া বিড়ম্বনা। শ্রীশ ফিরে এলেন।

*

সলিল জিজ্ঞেস করল, "পরাণ কিছু পেয়েছে রেস খেলে?"

অমরবাবু বললেন, "সে গুড়ে বালি। আর, তা'ছাড়া, ভাগের মা গঙ্গা পায় না সে তো জানা কথা।"

রমেশ সংক্ষেপে শুধু বললে, "হায় রে বেচারী!"

*

জীবনবাবু প্রশ্ন করলেন, "তারপর, কাজী গাঁয়েরিলিফের কি হোল?"

অমরবাবু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ! সহরে ফিরে গিয়ে নাকি তিরিশ মণ চাল ওঁরা কাজীগাঁয়ে পাঠিয়েছিলেন, শুনেছি।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

জীবনবাবু জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে ধরলেন। অস্তগামী সূর্য্যের বিরাট চাকা ধীরে ধীরে গাছের সারির নীচে নেমে যাচ্ছে। গঙ্গার পারেই দুটো নারকোল গাছ গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছ দুটোকে কালো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন, দুটো সরু ঠ্যাঙে ভর দিয়ে একটা ঢেঙা ভূত আঁন্ধে অন্ধে মাথা নাড়ছে।

শরৎচন্দ্রের দত্তা

শ্রীকালিদাস রায়

আর্টের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে দত্তাকে একখানি নিখুঁত উপন্যাস বলিতে হয়। শরৎচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাসে যে ভাবাকুলতা, অস্বাভাবিকতা, অতিরঞ্জন, অভিভাষণ ইত্যাদি দোষ দেখা যায়—এই উপন্যাসখানিতে তাহার কিছুই নাই। অনেকের মতে এই পুস্তকখানিই শরৎচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কেহ কেহ মনে করেন—উপন্যাসখানিতে শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন—ব্রাহ্ম-চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। একথা সত্য নয়। ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করা শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য নয়।

শরৎচন্দ্র যে সময় এই উপন্যাস রচনা করেন—তখন হিন্দুসমাজে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত হয় নাই—অধিক বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের অবিবাহিতা রাখার প্রথা ছিল না—কাজেই স্বাধীন প্রণয়েরও সুযোগ ছিল না। দত্তার প্রধান রসবস্তু বিজয়ার স্বাধীন ভাবে পতিনির্ব্বাচন এবং বিবাহের আগে তাহার সহিত প্রণয়। ইহাকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার জন্যই বিজয়াকে ব্রাহ্মসমাজের মহিলা করিতে হইয়াছে। বিজয়ার জন্যই ব্রাহ্ম-পরিবেষ্টনী আসিয়াছে, ব্রাহ্ম-চরিত্র রাসবিহারী ও তৎপুত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। রাসবিহারীর চরিত্রের কুটিলতা কথাবস্তুর পরিপোষণেই আসিয়া পড়িয়াছে। এই চরিত্র অঙ্কনে যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অবিচার হইয়া থাকে—শরৎচন্দ্র তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন দয়াল-চিত্র অঙ্কন করিয়া।...

বিজয়া বিপুল সম্পত্তিশালিনী সুন্দরী শিক্ষিতা যুবতী। তাহার অভিভাবক ছিল পিতৃবন্ধু রাসবিহারী। রাসবিহারী তাহার পুত্র বিলাসের সঙ্গে বিজয়ার বিবাহ দিয়া সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ছিল। বিজয়া বিলাসকে পছন্দ করে নাই—সে নরেনকে বিবাহ করিতে চাহিল—তাহার সহিতই বিজয়ার বিবাহ হইল। এই ত ব্যাপার। ইহাতে একখানা উপন্যাস হয় কি করিয়া? ব্যাপারটা যতটা সহজ মনে হইতেছে—ততটা সহজ নয়। প্রেমের পথটি বেশ সহজ সরল ছিল না—ইহাতে অনেক বাধা ছিল—এই বাধাগুলির অতিক্রম—ক্রমে বিজয়ার আত্মস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা, 'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ', এবং পূর্ব্বরাগের অপূর্ব্ব লীলায় আপাত-সহজ ব্যাপারটি একটি উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে।

রাসবিহারী বিজয়ার পিতৃবন্ধু—অত্যন্ত হিসাবী বৈষয়িক লোক। পিতা তাহার হাতে বিজয়ার সম্পত্তি ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছিলেন। রাসবিহারী (অবশ্য স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া) বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা ত' করিয়াছেই—দিন দিন তাহার উন্নতি সাধনই করিয়াছে। রাসবিহারীর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া বিজয়ার পক্ষে অসঙ্গত। রাসবিহারী তাহার পুত্র বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব বিজয়াকে বার বার শুনাইয়া আসিয়াছেন। বিজয়া প্রেমের স্পর্শ যতদিন লাভ না করিয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত এ বিবাহে অমতও করে নাই—একরূপ মৌনের দ্বারা এবং বিলাসের উপদ্রব সহ্য করিয়া সম্মতিই দিয়া আসিয়াছে। নরেনের আবির্ভাবের পর হইতে বিজয়ার মতিগতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন দৃঢ়সংকল্পে পরিণত হইতে যথেষ্ট সময় লইয়াছে—এই পরিণতির সরস বিবৃতিই উপন্যাসকে পুষ্ট করিয়াছে। নরেন হিন্দু—বিজয়া ব্রাহ্মিকা—ইহাও একটা বাধা। এই সমস্ত বাধার অতিক্রম সহসা হয় না—একে একে বাধা অতিক্রান্তিই একটি গল্পকে উপন্যাসের রূপ দিয়াছে।

তার পর 'অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ'। বিজয়া ও নরেনের প্রেমধারা অহির মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—এই আঁকা বাঁকা পথ, সরল পথের তুলনায় রীতিমত দীর্ঘ। এই পথটিকে একটি গল্পের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে ধরাইতে পারা যায় নাই—উপন্যাসের প্রশস্ত পরিসরের প্রয়োজন হইয়াছে। বিজয়া ও নরেন পরস্পর পরস্পরকে চিনিত না—পরস্পরের চরিত্রের অন্তর্লোকের সঙ্গে পরিচিত হইতে অনেকগুলি দৃশ্যের অবতারণা করিতে হইয়াছে। এদিকে বিলাস চিরপরিচিত হইলেও বিজয়া তাহার প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় এতদিন পায় নাই। বিলাস যখন দেখিল বিজয়ার সহিত তাহার বিবাহে আর কোন অনৈশ্চিত্য নাই—তখন সে স্বামিত্বের সর্ব্ববিধ দাবি জাহির করিতে লাগিল এবং নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার সংগোপিত চরিত্রটিকে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। বিজয়া তখন দেখিল—সে চরিত্র কি ভয়ানক! বিলাসের চরিত্রের ঘৃণিত দিকটা ফুটাইবার জন্য একাধিক দৃশ্যের অবতারণা করিতে হইয়াছে। বিলাস-চরিত্রের ঘৃণিত দিকটা হয় ত বিজয়ার চোখে উপেক্ষিত হইত—কারণ, রাসবিহারী প্রাণপণে বিলাসের ত্রুটীবিচ্যুতিগুলি সামলাইয়া তাহার চরিত্রকে সুধা-ধবলিত (whitewashed) করিবার চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু নরেনের চরিত্রের উজ্জ্বল আলোকে রাসবিহারীর ব্যর্থচেষ্টা ও বিলাস-চরিত্রের আসল রূপটা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল বিজয়ার চোখে। আর তাহাকে ভুলাইবার উপায় ছিল না। এই ব্যাপারটা উপন্যাসকে যথেষ্ট পুষ্টি দান করিয়াছে।

তার পর বিজয়ার দৃঢ় সংকল্পে পৌঁছিতে রাসবিহারী ; যথেষ্ট বাধা দিয়াছে। রাসবিহারী এতই সূক্ষ্ম বিবেচনার সহিত সন্তর্পণে ধীর শান্তভাবে নিজের অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইয়াছে যে, বিজয়ার পক্ষে সহসা একটা কিছু করা অসম্ভব ছিল। বিলাসকে প্রত্যাখ্যান করিলে রাসবিহারীর সঙ্গে সম্পর্ক লোপ পাইবে—"একটা কড়া রকমের বোঝাপড়ার সময় আসিবে, তাহার সমস্ত বীভৎসতার নগ্নমূর্তিটা কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া অবধি বিজয়ার মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না।" বিজয়া খাঁটি বাঙ্গালী মেয়ে, ব্রাহ্মিকা হইলেও বাঙ্গালী হিন্দুনারীর সঙ্কোচ, লজ্জা, শালীনতা, সৌজন্য সমস্তই তাহার ছিল। যখনই বিজয়ার মন বিরূপ হইয়াছে, রাসবিহারী তখনই তাহার নিজস্ব বাকপটুতা ও উদার ধর্মভীরুতার ভানের দ্বারা বিজয়াকে প্রসন্ন করিয়াছে। এইভাবে উপন্যাসের পরিপুষ্টি হইয়াছে। বিজয়া রাসবিহারীকে পিতার মত শ্রদ্ধাই করিত—রাসবিহারীর কপটতা ও ভণ্ডতা ধরিয়া ফেলা বিজয়ার পক্ষে সহজ ছিল না। রাসবিহারী এতই ধূর্ত যে, বিজয়া বুদ্ধিমতী হইয়াও তাহার ভিতরের রূপটা ধরিতে পারে নাই। বিলাসকে সে সহজেই চিনিয়া ফেলিয়াছিল—কারণ, সে আত্মগোপন করিতেই জানিত না। কিন্তু রাসবিহারীর সম্পর্কে বিজয়ার সঙ্কোচের অন্ত ছিল না। বিলাসকে বাদ দিয়া রাসবিহারীর অভিভাবকতা স্বীকার করিয়া চলাও সম্ভব ছিল না। দোটানায় পড়িয়া বিজয়ার অন্তরে শান্তি ছিল না। বিজয়ার জীবনে সঙ্কোচ-দ্বিধা-দ্বন্দ্বের লীলা এই ভাবে কতদিন চলিত, তাহার ঠিক কি ?

একটি সমাধানে পৌঁছিবার জন্য শরৎচন্দ্র দয়াল-চরিত্রের আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন। দয়াল-চরিত্রটি পুস্তকের অতি অল্প স্থানই গ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু চরিত্রটির প্রয়োজন ছিল খুব বেশী। দয়ালকে আচার্য্যপদে বাহাল করিয়া রাসবিহারী খাল কাটিয়া কুমীর আনাইয়াছিলেন। দয়ালের পরিবারটিকে অবলম্বন করিয়াই নরেন্দ্রের গ্রামে যাতায়াতের অজুহাত মিলিয়াছিল। বিজয়ার সহিত নরেনের বিবাহ কিছুতেই সম্ভব হইত না—যদি দয়াল আপন গৃহে সাহস করিয়া এই ব্যবস্থা না করিত। এই সাহস দুই দিক হইতে প্রয়োজন হইয়াছে। প্রথম, প্রবলপ্রতাপান্বিত রাসবিহারীর বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস—দ্বিতীয়, নিজে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হইয়া নিজের বাড়ীতে ব্রাহ্মিকা বিজয়ার হিন্দুমতে হিন্দুর সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার সাহস! অবশ্য এই সাহস সঞ্চার করিয়াছিল তাহার ভাগিনেয়ী নলিনী!

দয়ালই আদর্শ ব্রাহ্ম—ভগবদ্‌ভক্ত, ধীর, শান্ত, সহিষ্ণু, সাধু চরিত্রের ব্যক্তি। শরৎচন্দ্র বলিয়াছেন—

"তিনি নূতন বৎসরের প্রথম দিনটিতে প্রায় ১৫ মিনিট ধরিয়া একটি সুন্দর উপাসনা করিলেন। তাঁহার নিজের মধ্যে অকপট ও আন্তরিক বিশ্বাস ছিল বলিয়া যাহা কিছু কহিলেন সমস্তই সত্য ও মধুর হইয়া সকলের হৃদয়ে বাজিল।"

বিলাস-চরিত্র রাসবিহারীর ছায়ায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। পিতার ভণ্ডতার সে সর্ব্বাঙ্গীণ উত্তরাধিকারী হইতে পারে নাই, সে মনের ভাব অকপটভাবে প্রকাশ করিয়া পিতার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। বিজয়ার সহিত তাহার সম্পত্তি সে লাভ করিবে এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত ছিল। তাই সে স্বামিত্বের অধিকারে বিজয়াকে শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পিতার তুলনায় তাহার বুদ্ধিও অনেক কম। সে বিজয়াকে ভালবাসিত কিন্তু মুখে যাহাই বলুক, তাহার সম্পত্তিকে আরো ভালবাসিত। তাই যখন সে জানিতে পারিল বিজয়া তাহাকে ভালবাসে না, সে নরেন্দ্রকে ভালবাসে—সে তখনও বিজয়াকে বিবাহ করিবার জন্য বরবেশে সজ্জিত হইতেছিল।

বিলাস বিজয়াকে ভালবাসিত, তাহার বিনিময়ে বিজয়া ভালবাসিতে পারে নাই বটে, কিন্তু তাহার প্রতিদানে প্রেমের অনুকল্পস্বরূপ করুণা ও স্নিগ্ধভাব পোষণ করিত। বিজয়া যখন বুঝিল নরেন্দ্র নলিনীকে ভালবাসে তাহাকে ভালবাসে না, তখন তাহার মনে হইল—নরেন যখন অপ্রাপ্য, তখন সে নিজে ভালবাসুক আর নাই বাসুক, নানা কারণে আত্মত্যাগ করিয়া যে বিলাস ভালবাসে তাহার হাতে আত্মসমর্পণ মন্দের ভাল। নরেন্দ্রের প্রতি দারুণ অভিমানে সে বিলাসের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া একপ্রকার আত্মহত্যা করিতে স্বীকৃত হইল—বিবাহ-রেজেষ্টারি দলিলে ক্ষোভকম্পিত হস্তে নিজের নাম সহি করিয়া দিল। হাত বাহা করিল, আঁৎ তাহাতে সায় দেয় নাই। তাই বিলাসের নহুষের মত স্বর্গ হইতে পতন হইল।

এই উপন্যাসে সর্ব্বাপেক্ষা সন্তর্পণে সাবধানে পরিকল্পিত চরিত্র রাসবিহারীর। আগাগোড়া এই চরিত্রটির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণে শরৎচন্দ্র অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। রাসবিহারী আচরণে ও মুখের জবানী কথায় জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

এই শ্রেণীর চরিত্র শরৎচন্দ্রের অন্য কোন গ্রন্থে নাই। ইহা অদ্বিতীয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে সাধারণ নারী-চরিত্রেরই প্রাধান্য—পুরুষচরিত্রগুলি সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ—অনেক স্থলে নির্ব্বিকার, কূটস্থ। রাসবিহারী চরিত্রটি সে শ্রেণীর নয়। এমন সক্রিয়, সচেতন, আত্মপ্রতিষ্ঠাপরায়ণ চরিত্র বঙ্গসাহিত্যেই অল্প আছে।

রাসবিহারী দৈবক্রমে ব্রাহ্মসমাজের লোক। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে বহু সত্যনিষ্ঠ অকপট ধর্ম্মভীরু চরিত্রবান্ লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পরে ব্রাহ্মসমাজেরও অধোগতি হইয়াছিল—ব্রাহ্মসমাজেও কাপট্য ও ভণ্ডতা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজেও তখন রাসবিহারীর মত ভণ্ড কপট লোকের আবির্ভাব অস্বাভাবিক ছিল না। রাসবিহারীর চরিত্রের উন্মেষসাধনের জন্য তাহার মুখে এমন অনেক কথা বলাইতে হইয়াছে; যাহাতে মনে হইতে পারে—শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে উপহাস করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ উপহাসই শরৎচন্দ্রের উদ্দিষ্ট নয়। আর্টের প্রয়োজনে এবং চরিত্রের সহিত তাহার উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই ঐ সব কথা আসিয়া পড়িয়াছে।

রাসবিহারী ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও স্বার্থান্বেষী। সে তাহার বন্ধুর বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিত ও বিজয়ার অভিভাবকতা করিত—নিজেরই প্রয়োজনে। বিলাসের মারফতে সে সমস্ত সম্পত্তিই গ্রাস করিতে চেষ্টা করিতেছিল। সে জানিত, বিজয়ার পিতা নরেনকে বিলাত পাঠাইয়াছিল বিজয়ার সঙ্গেই বিবাহ দেওয়ার জন্য। ঋণের দায়ে নরেনের বাড়ী ও বিষয় অধিকার করিবার ইচ্ছা বিজয়ার পিতারও ছিল না—বিজয়ারও ছিল না। রাসবিহারী তাহা জানিয়া শুনিয়া অধিকার করিয়াছিল—একদিন উহা নিজের অধিকারেই আসিবে বলিয়া। ধূর্ত্ত রাসবিহারী দেখিল—বিজয়া করুণাবশে উহার অধিকার ত্যাগ করিবে, তাই ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির প্রতিষ্ঠার ছল করিয়া অধিকার করিল। ধর্ম্মের নামে যাহা অধিকৃত হইল, তাহাতে বিজয়ার আপত্তি থাকিবে না। সমাজ প্রতিষ্ঠার উৎসবও গৌণ—মুখ্য উদ্দেশ্য বিলাসের বিবাহের প্রস্তাব সমাজে গণ্যমান্য লোকদের শুনাইয়া রাখা। নব বৎসরের উৎসবও একটা অছিলা মাত্র—সর্ব্বজন সমক্ষে বিজয়ার হাতে "অত্যাচারের হাতকড়ি আশীর্ব্বাদের স্বর্ণবলয় পরাইয়া দেওয়া।" আরও সাঙ্ঘাতিক চেষ্টা দলিলপত্রগুলি হস্তগত করার চেষ্টা। রাসবিহারীর শেষ চেষ্টা বিবাহের রেজেষ্টারি-পত্রে বিজয়ার সহি করানো।

বিলাসের মঙ্গলের জন্য রাসবিহারী অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছে—সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত কাপট্য ও ভণ্ডতার স্বরূপ আবিষ্কার করিতে বিজয়ার বহু বিলম্বই হইয়াছিল। রাসবিহারী যাহা বহুযত্নে গড়িয়া তুলিতেছিল—বিলাস তাহা মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। রাসবিহারী আবার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের দ্বারা তাহার মেরামত করিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্র দয়াল ও নলিনীর সাহায্যে তাহার অভ্রভেদী সৌধকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। রাসবিহারী সমস্ত অবস্থার সঙ্গে মহাবীরের মত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইয়াছে, কেবল শেষ পর্য্যন্ত প্রেমের সহিত সংগ্রামেই পরাজিত হইয়াছে। দয়ালের গৃহ হইতে রাসবিহারীর নিষ্ক্রমণ ভিনিসের আদালত-গৃহ হইতে শাইলকের নিষ্ক্রমণ মনে পড়ায়।

দত্তার চরিত্রগুলির মধ্যে চারিটি চরিত্র প্রধান। রাসবিহারী, বিজয়া, নরেন ও দয়াল। এই চরিত্রগুলির অঙ্কনে শরৎচন্দ্র অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। এই চরিত্রগুলির পরিকল্পনা, ক্রমোন্মেষ, মানসিক দ্বন্দ্বের লীলায় পরিপুষ্টি ও পরিণতি, আদ্যন্ত সামঞ্জস্য ও স্বভাবানুগত্য সমস্তই অনবদ্য। শরৎচন্দ্র অতিসন্তর্পণে অদ্ভুত কলা-কৌশলের সহিত চরিত্রগুলিকে নিশ্ছিদ্ররূপে গঠন করিয়াছেন।

নরেনের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিজয়ার চরিত্র যেন ঘুমন্ত হইয়া ছিল সাধারণ বাঙ্গালী নারীর মাধুর্য্য মাত্র তাহার সম্বল ছিল। প্রেমের স্পর্শ লাভ করিয়া এই চরিত্র সচেতন হইয়া উঠিল—তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। শেষপর্য্যন্ত সে সর্ব্বসংস্কার ও সর্ব্বশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী হইয়া উঠিল। এ পরিবর্ত্তন সহসা হয় নাই—ইহা ঘটিয়াছে ধীরে ধীরে। একটি একটি করিয়া পাঁপড়ি মেলিয়া সমগ্র চরিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই চরিত্রের বিকাশ সাধনে অদ্ভুত সংযম, ধীরতা, সহিষ্ণুতা ও কলাকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। নরেনের প্রতি বিজয়ার আকর্ষণ অহেতুক নয়—রূপজ মোহ নয়—তারামৈত্রী নয়—দেখিলাম আর মজিলাম ভাবেরও নয়। নরেন রূপবান্‌ও ছিল—তাহার দেহে প্রভূত বলও ছিল—সে বিলাতে পাশ করা ডাক্তার। কিন্তু এ সমস্ত বিজয়ার চিত্ত আকর্ষণ করে নাই। বিজয়ার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল নরেন্দ্রের অসামান্য গুণগুলি, আর তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল নরেন্দ্রের চরিত্রের বৈচিত্র্য। নরেনের মধ্যে বিজয়া যে বিচিত্রকে দেখিয়াছিল সেই বিচিত্রই তাহার জীবনকে আলোড়িত করিয়াছিল।

শরৎচন্দ্র এই ভাবে বিজয়া-চরিত্রের মাধুর্য্য, মহিমা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। প্রাচীন যুগ ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যবর্ত্তী বিবর্ত্তনকালের (Transition Periodএর) প্রতিনিধিস্থানীয়া নারীর চরিত্র এই বিজয়া। প্রাচীন যুগের শ্রী ও হ্রীর সহিত বর্ত্তমান যুগের ধী-র অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছে এই বিজয়া-চরিত্রে। এই মিলন ঘটাইতে শরৎচন্দ্র যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অসাধারণ। ধর্ম্মসমাজ ও পারিবারিক জীবনের কৃত্রিম শাসন-সংস্কারের উপর স্বাধীন প্রেমকে বিজয়ী করিয়া বিজয়ার বিজয়া নাম সার্থক হইয়াছে।

এই উপন্যাসের কলা-চাতুর্য্যবিস্তার ও আবেষ্টনীরচনা এমনই শুচি-সংযত যে, গতানুগতিকতার বিরোধী হইয়াও ইহা অতিবড় গোঁড়া সমালোচকেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের দোষ ধরেন—তাঁহারাও দত্তার সম্বন্ধে নীরব অথবা শ্রদ্ধাবান্।

শরৎচন্দ্র বিজয়া-চরিত্রটিকে এমন ভাবেই গোড়া হইতে পরিকল্পিত করিয়াছেন এবং সাধারণ হিন্দুনারীর স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি তাহার চরিত্রে এমন ভাবে সমাবেশ করিয়াছেন যে—ব্রাহ্মিকা হইয়াও তাহার পক্ষে হিন্দু-বিবাহে সম্মতিদান অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু তাহার চেয়ে বড় কথা—যাহা শরৎচন্দ্রের নিজস্ব ধর্ম্মগত ও সমাজগত আদর্শ তাহা নলিনীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন "তাঁর বাবা তাঁকে যার হাতে দিয়ে গেছেন—তোমরা তাঁর হাতেই তাঁকে দাও। নইলে ব্রাহ্ম বিবাহের ছল ক'রে যদি অপাত্রে দান কর ত' অধর্ম্মের সীমা থাক্‌বে না। আর মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ। নইলে বিয়ের মন্তর বাংলা হবে কি সংস্কৃত হবে, ভট্টাচার্যি ম'শায় পড়াবেন কি আচার্যি ম'শায় পড়াবেন, তাতে কি আসে যায় মামা।"

বিজয়া ব্রাহ্মবিবাহের দলিলে সই করিয়াছিল একটা আবিষ্ট মুহূর্ত্তে—স্বভাবসিদ্ধ দুর্ব্বলতাবশে কতকটা শাসনের চাপে।

নরেনকে বিবাহ করায় তাহার পক্ষে সত্যভঙ্গ হয়। নৈতিকসংস্কারভঙ্গে বিজয়া-চরিত্রের মর্য্যাদা ইহাতে ক্ষুণ্ণ হয়। নলিনীর মুখ দিয়াই শরৎচন্দ্র যে জবাবদিহি দিয়াছেন—তাহাও পরম সত্য। দয়াল বলিলেন—"বিজয়া এ সত্য ভাঙ্‌বে কি ক'রে?"

নলিনী বল্‌ল—"মামা তুমি ত জানো, বিজয়ার অন্তর্যামী কখনও সায় দেন নি। তাঁর চেয়ে কি বিজয়ার কথাটাই বড় হলো? তার হৃদয়ের সত্যকে লঙ্ঘন ক'রে কি তার মুখের কথাটাকেই বড় ক'রে তুল্‌তে হবে।..

সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে বার হয়েছে ব'লেই কোন জিনিস কখন সত্য হ'য়ে উঠে না। তবুও তাকেই যারা সকলের অগ্রে সকলের উর্দ্ধে স্থাপন করতে চায়, তা'রা সত্যকে ভাল বাসে ব'লেই করে না, তা'রা সত্যভাষণের দম্ভকেই ভাল বাসে ব'লে করে।"

নরেন্দ্র-চরিত্র শরৎচন্দ্রের একটি চমৎকার সৃষ্টি। এই চরিত্রটির ছায়াপাত হইয়াছে—শরৎচন্দ্রের রচিত আরও অনেক চরিত্রে।

প্রসঙ্গক্রমে নরেন্দ্রের পিতার চরিত্রের আভাস উপন্যাসে পাওয়া যায়। সেই চরিত্রের দোষগুলি বাদ দিলে তাহার সঙ্গে নরেন্দ্রের চরিত্রের মূলগত ঐক্য আছে নরেন্দ্র রূপবান্, গুণবান্, বিদ্বান্, বলবান্ ব্যক্তি। সে বিলাতফেরতা ডাক্তার হইয়াও দরিদ্র, তাহার কারণ দারিদ্র্যে তাহার লজ্জা নাই—সাংসারিক সুখদুঃখে সে উদাসীন—অর্থবিষয়ে সে নিঃস্পৃহ—সে আত্মবিস্মৃত,—উচ্চতর ব্রতে সে সর্ব্বদা তন্ময়। সন্ন্যাসীর আড়ম্বর, সমারোহ ও ভেক তাহার নাই। তবু সে সন্ন্যাসীই। সে আত্মসুখদুঃখে উদাসীন, কিন্তু পরোপকার তাহার ব্রত। আত্মমর্য্যাদাবোধও তাহার অসাধারণ। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য তাহার অর্থের প্রয়োজন আছে। তাই বলিয়া সে কাহারো ভিক্ষা বা দয়ার দান গ্রহণ করিতে রাজী নয়। ধৈর্য্য, সংযম, তিতিক্ষা, ক্ষমা, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি বহুগুণে সে ভূষিত।

সে উচ্চতর ব্রতে তন্ময়, তাই সে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক। সে নিজেই বলিয়াছে—"সব কথায় আপনার ওজন ঠিক রাখিতে পারি নে, কিন্তু সে আমার অন্যমনস্ক স্বভাবের দোষে।" তাহার স্বভাব ঠিক বিলাসের বিপরীত। দুই-জনের তুলনা করিয়া বিজয়া ভাবিত—"যে লোকটি সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসে, সংসারযাত্রার দুর্গম পথে সহায় বা সহযোগী হিসাবে মূল্য তাহার বিলাসের চেয়ে কম। সে যেমন অপটু, তেমনি নিরুপায়। বিপদের দিনে ইহার কাছে কোন সাহায্যই মিলিবে না—তবুও এই অকেজো মানুষটির সমস্ত অকাজের বোঝা সে নিজে সারাজীবন মাথায় লইয়া চলিতেছে। মনে করিতেও বিজয়ার সমস্ত দেহমন অপরিমিত আনন্দাবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে।"

অর্থে নিস্পৃহ, বালকের মত সরল, আপন ভাবে তন্ময়, সংসারক্ষেত্রে অপদার্থ, দরিদ্র, দারিদ্র্যগর্ব্বে গর্ব্বিত এই পুরুষটিকে বিজয়ার অসাধারণ পুরুষ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাহার চরিত্রের এই বৈচিত্র্যই—বিজয়াকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

বিজয়ার ধনসম্পদের অভাব ছিল না—নরেন্দ্রের তাহারই অভাব ছিল, বাকি সমস্তই ছিল তাহার প্রভূত-পরিমাণে। কিন্তু সে সমস্তও বিজয়াকে আকৃষ্ট করে নাই। তাহার চরিত্রের বৈচিত্র্যই বিজয়ার হৃদয়ে প্রেমসঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বিজয়ার সংসর্গে আসিয়া বৈজ্ঞানিক তাপসের তপোভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু প্রেমস্পর্শ লাভ করিবার পরও তাহার মূল চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। নিজেকে সে প্রেমিক নাগরের রূপ দান করে নাই—বিজয়াকে স্ববশে আনিবার জন্য কোন চেষ্টাই করে নাই। বিজয়ার পিতার প্রতিশ্রুতিবাহী পত্র দুইখানিও সে পকেটে করিয়া দেখাইবার জন্য আনে নাই। কথাপ্রসঙ্গে পরিহাস-চ্ছলে পত্রের প্রসঙ্গটা আসিয়া পড়িয়াছিল। পত্রের

প্রতিশ্রুতির উপর সে কোন জোরই দেয় নাই। নরেন্দ্র-চরিত্রে আগাগোড়া সামঞ্জস্যই রক্ষিত হইয়াছে।

বিলাতফেরতা বাঙ্গালী যুবক সাধারণতঃ এমন কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত, বেশভূষা, আচার আচরণে উদাসীন এবং ভোগবিলাসে নিস্পৃহ হয় না। এই হিসাবে নরেন্দ্র-চরিত্র অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে। শরৎচন্দ্র তাহা বুঝিতেন—তাই তিনি নরেন্দ্রকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তন্ময় জ্ঞান-সাধক বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ইহাতে তাহার চরিত্রের স্বাভাবিকতা রক্ষিত হইয়াছে।

নরেন্দ্র প্রথমটা আত্মগোপনের চেষ্টা করিয়াছিল। এরূপ প্রকৃতির লোকের পক্ষে আত্মগোপনের অভিনয় বেশীক্ষণ চলিতে পারে না। তাই কয়েকটা কথার পরই সে ভুল করিয়া ফেলিল। ইহাই স্বাভাবিক।

নরেন্দ্র দরিদ্র ছিল—কিন্তু তাহার দারিদ্র্য প্রেমের পথে বাধার সৃষ্টি করে নাই—বরং তাহাই প্রেমের দুতিয়ালি করিয়াছে। দারিদ্র্যই নরেন্দ্রকে বিজয়ার কাছাকাছি লইয়া আসিয়াছে-দারিদ্র্যের জন্যই নরেন বারবার বিজয়ার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছে। এমন কি—নরেনের দারিদ্র্যই বিজয়ার চিত্তে সহানুভূতি ও করুণা জাগাইয়াছে। এই করুণা ও সহানুভূতিই ক্রমে গভীর প্রেমে পরিণত হইয়াছে। ইহাই বিজয়ার চিত্তকে ক্রমে বিলাসের দিক হইতে বিমুখ ও রাসবিহারীর শাসনে পরাঙ্মুখ করিয়া তুলিয়াছে।

বিজয়া নিজের অন্তরে যে গভীর দরদ অনুভব করিয়াছে—তাহা নরেনের কাছে প্রকাশ করে নাই—উপন্যাসের মনস্তত্ত্বগত কলাকৌশল সৃষ্টির জন্যই তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। বিজয়া বরং আপাত নিষ্ঠুরতা ও রুক্ষতার দ্বারা নরেনকে বারবার আঘাত করিয়াছে। ইহা নরেনের চিত্ত লইয়া বিজয়ার প্রেমপরবশ চিত্তের খেলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় গোবৎস যেমন নিজের মস্তকের দ্বারা গাভীর আপীনে বারবার আঘাত করিয়া অধিকতর দুগ্ধ আদায় করে ইহা সেইরূপ, অর্থাৎ বিজয়া বার বার নরেন্দ্রকে আঘাত করিয়া তাহার চরিত্রের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যকে আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছে, ইহা প্রেমের একপ্রকার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় বিপদ আছে। সে বিপদ একেবারে ঘটে নাই তাহা নয়—নরেন্দ্র বিজয়ার প্রত্যাশা একেবারে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল—ভুল বুঝিয়া সে সরিয়া পড়িবার কথাই ভাবিয়াছিল, বিজয়াকে নিজের অপরাধের জন্য চোখের জলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে, নরেনের চিত্ত লইয়া বিজয়ার খেলা—নরেনের প্রেমের পরীক্ষা—মান-অভিমান, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাত রাসবিহারী ও বিলাসের স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ—ধীরে ধীরে বাধা অতিক্রম "অহেরিব গতিঃ প্রেমণঃ" ইত্যাদির যথাযথ সমাবেশে উপন্যাসখানির চমৎকার পরিপুষ্টি হইয়াছে।

বিজয়ার চরিত্রে যাহাতে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা স্পর্শ না করে শরৎচন্দ্রের সেদিকে যথেষ্ট সতর্কতা ছিল। বিজয়া শিক্ষিতা, স্বাধীনা, ব্রাহ্মিকা—তবু সে খাঁটি বাঙ্গালী নারী। ব্রাহ্মিকা ও স্বাধীনা হইলেও বিজয়ার আচরণ ছিল সাধারণ হিন্দুমহিলারই মত। নরেন বিজয়াকে বলিয়াছিল, "ব্রাহ্ম হলেও আপনাদের আচার-ব্যবহার আমাদেরই মত।"—শরৎচন্দ্র আত্মীয়পরিজন অতিথি ও প্রতিপাল্যগণের সেবাযত্ন ও তাহাদের প্রতি স্নিগ্ধ আচরণকে হিন্দুনারীর প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। বিজয়াচরিত্রে এই ধর্ম্মের সমাবেশ করিতে তিনি ভুলেন নাই।

বাঙ্গালী নারীর স্বভাবসঙ্গত দুর্ব্বলতা, সঙ্কোচ-দ্বিধা ও নম্রতা বিজয়া-চরিত্রকে শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে নাই। পিতা জীবিত থাকিলে তাহার চরিত্রে যে সবলতা আসিতে পারিত, সে অপরের অধীনে আসিয়া পড়ায় সে সবলতা তাহার ছিল না—এত'টা সাহস ও বিদ্রোহভাব তাহার স্বভাবসুলভ শালীনতা, নম্রতা ও সৌজন্যের সঙ্গে সমঞ্জস হইত না। নরেন্দ্রের মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য এবং বিলাসের বর্ব্বরতা বিজয়ার হৃদয়ে যে দৃঢ়তার সঞ্চার করিয়াছিল তাহা বিলাসের দিক হইতে বিমুখতার পক্ষে যথেষ্ট—নরেন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু নরেন্দ্রকে পতিত্বে বরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিজয়া চিরদিন অবিবাহিতা থাকিয়া নরেন্দ্রকে ভালবাসিয়াই তৃপ্ত হইতে পারিত। বিজয়ার স্বয়ম্বরা হইবার সাহস ছিল না—তাহার চরিত্রের বাঙ্গালী নারী-সুলভ হ্রী, শ্রী, অপ্রগল্‌ভতা, সঙ্কোচ ও শালীনতাই এ বিষয়ে বাধা ছিল। ইহা ছাড়া আর একটি পরম বাধা ছিল—নরেন্দ্র হিন্দু—সে ব্রাহ্মিকা। বিবাহে প্রেমের পর্য্যবসান কি করিয়া হয়? কে তাহাকে দান করে? স্বাধীনভাবে নরেন্দ্রকে বরণ করা সে কুলত্যাগের মত অপরাধই মনে করিত। সে সম্প্রদাত্রী নয়, সম্প্রদেয়। শরৎচন্দ্র এই সমস্যার চমৎকার সমাধান করিয়াছেন। বিজয়া জানিতে পারিল—তাঁহার পিতাই নরেন্দ্রের পিতার নামে লিখিত পত্রে তাহাকে নরেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সে দত্তা এই তথ্যটি জানিতে পারিয়া বিজয়ার মনে আর কোন দ্বিধা থাকিল না—তাহার দুর্ব্বল চিত্ত অপরিমিত বল লাভ করিল, আর লৌকিক হিসাবে সে সম্প্রদানের জন্য অভিভাবক পাইল সমাজের আচার্য্য দয়ালবাবুকে।

সমাপ্তির কাছাকাছি আনিয়া শরৎচন্দ্র একটা মস্তবড় বাধার সৃষ্টি করিয়া উপন্যাসখানির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। সাহিত্যে প্রেমের প্রসঙ্গে ঈর্ষ্যার স্থান অভিনব রস সৃষ্টির সহায়তা করে। ইহাতে প্রেমের একটা কঠোর পরীক্ষাও হয়। শরৎচন্দ্র এই সত্য উপলব্ধি করিয়া নলিনীর প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। একটা মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি করিয়া শরৎচন্দ্র একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছেন—এই ব্যবধানটাকে রীতিমত দুর্লঙ্ঘ্য করিয়া সমাপ্তির রসটাকে গাঢ়তরই করিয়াছেন। বিজয়ার পক্ষে যে চরম সবলতা সাহসের প্রয়োজন হইয়াছে—তাহা এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধাটি অতিক্রম করিতে গিয়াই সঞ্চারিত হইয়াছে। একদিকে নলিনীর প্রসঙ্গে নরেন্দ্রের সম্বন্ধে নৈরাশ্য এবং নিজের মতি পরিবর্ত্তন—অন্যদিকে বিবাহের দলিলে নিজের স্বাক্ষর। এ বাধ রীতিমত দুর্লঙ্ঘ্য। বিজয়া যাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনে করিয়াছিল সেই নলিনীই হাতে ধরিয়া তাহাকে এই দুরারোহ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করিতে সহায়তা করিল। বিজয়া অকুল পাথারে ভাসিতেছিল—তাহার একটি ভেলার প্রয়োজন হইয়াছিল—নলিনীই এই ভেলার কাজ করিয়াছে। 'যে মাটীতে পড়ে লোক উঠে তাই ধরে।'

বাঙ্গালী নারীর স্বভাব সুলভ দুর্ব্বলতা, সঙ্কোচ ও হ্রী হইতে বিজয়া চরিত্রকে বঞ্চিত না করিয়া সম্পূর্ণ স্বাতাবিকতা রক্ষা করিয়া শরৎচন্দ্র একটা মস্তবড় সমস্যার সমাধান করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন।

দুরাশার আলো

শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায়

কালো আচ্ছাদন নিয়ে আপনি আচ্ছাদি'
হেথা আস যদি
অন্তরের আলো মোর করে দিতে কালো,
— সেই হোক্ ভালো।

দেহের সংঘাতে মোর প্রদীপ্ত কামনা,
সঞ্চিত বাসনা
দেহ-কণা হতে তব যে দেহ উদ্ভাসি'
উঠিল বিকশি'
লুপ্ত হক প্রকৃতির তমসার তলে
অবহেলে ;
নহি ক্ষুব্ধ আমি।

অন্তর্য্যামি
লুপ্ত করে তার মাঝে জগতের ছায়া,
শুধু মায়া
অবহেলে থাকে পড়ে জগৎ প্রান্তরে।
হৃদয় অন্তরে
নিভে যাক্ মোহময় দুরাশার আলো,
সেই হোক ভালো॥

দেশবন্ধু—সুভাষ*

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মান্দালয় জেলের কথা বলিতে বলিতে অন্য কাজের চাপে সুভাষ সম্বন্ধে লেখনী বন্ধ করিয়াছিলাম। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জেলে বসিয়াও বাঙ্গালাকে যে কত ভালবাসিতেন সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিনা। তিনি বহুলোকের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাহার মনের অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দেশবন্ধু সম্বন্ধে গত পত্রখানিতে পাঠক তাহা দেখিয়া থাকিবেন। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎবাবুকে লিখিত পত্রখানিতেও তাঁহার এই স্বদেশ-প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। দেখিতে পাই বাঙ্গালাকে তিনি কত ভালবাসিতেন।

তিনি লিখিতেছেন—"এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাংলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে অসময়ে মনে হয় বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা ক'রে লিখেছেন—

"সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

সুভাষচন্দ্র কতবার কারাভোগ করিয়াছেন তাহার সীমা নাই

কারারুদ্ধ অবস্থায় মন যে তিক্ত হইয়া উঠে, দেশপ্রীতি হেতু শৃঙ্খলের কথা ভাবিলে হাসিও পায়, স্বাধীন চিত্ত শৃঙ্খলিত সিংহের ন্যায় যে অন্তর্দগ্ধ হয়, তাহা স্বাভাবিক। তথাপি জেলকে স্বদেশী কর্ম্মবীরের সাময়িক অপরিহার্য্য বাসস্থান মনে করিয়া চিত্ত স্থির করিতেই হয়। তাই সুভাষচন্দ্র বলিতেন: "কারাভোগ! কষ্ট হ'লেও তাতে আনন্দ আ'ছে। দেশের জন্য দুঃখভোগ কচ্ছি, এ তো গৌরবের কথা। এ আনন্দ ও গৌরববোধ না থাক্‌লে লোক পাগল হয়ে যেতো।"

বস্তুতঃ দুঃখে আনন্দ—এই বোধেই দেশবীরগণ নানারূপ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। সুভাষচন্দ্রও করিতেন। তাই তিনি বৈষ্ণবকবির কথা আওড়াইতেন—"তোমার লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা বহিতে আমার সুখ।" আর বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দুঃখভোগেও সুভাষচন্দ্র কিরূপ স্বাধীনভাবটি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন।

জেলে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হইয়া পড়ে, তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, প্রতিদিন জ্বর হইতে থাকে, ওজন হ্রাস হয়, কাশি দেখা দেয়, সর্ব্বশরীরে ব্যথা হয়, টিউবারকিউ-লিসের পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুভাষচন্দ্র শারীরিক অবস্থায় শঙ্কান্বিত হইয়া পড়েন। তাঁহার চতুর্থ সহোদর প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুনীলবাবু তাঁহাকে মান্দালয় জেলে দেখিতে আসেন। টিবি বলিয়া তাঁহারও সন্দেহ হয় এবং তিনি মনে করেন, সুইজারল্যাণ্ডে থাকিলে তাঁহার অসুখ ভাল হইতে পারে। ডাক্তারের রিপোর্ট পাইয়া বাঙ্গলা সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব অনারেবল মিঃ মোবার্লি জানান যে সুভাষ বিদেশে গিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়া আসিতে পারে, নতুবা তাঁহাকে ভারতের কোন কারাগৃহেই বাস করিতে হইবে। বাড়ীর লোকের অনুরোধ, বন্ধুবর্গের অনুরোধ যে, তিনি কারাগৃহ ছাড়িয়া বিদেশ যাত্রা করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনি মনে করেন, কেন বিদেশে গিয়া বিদেশী

* গত শ্রাবণ সংখ্যার পর

গুপ্তচর ও পুলিসের কবলে পড়িব, আমার অপরাধ কি? গভর্ণমেণ্টের উচিত, ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য ছিল, সেরূপ সুস্থতায় আমাকে ফিরাইয়া আনা। আমি বরং জেলে পচিয়াই মরিব, তথাপি আমি এই অবস্থায় মা, বাপ, আত্মীয়বন্ধু সব ছাড়িয়া বিদেশে কিছুতেই পা বাড়াইব না।

১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসে সুভাষ ইনসিন্ জেলে স্থানান্তরিত হন। কিন্তু এখানেও অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। আর সুভাষচন্দ্র কিছুতেই আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ড যাইতে রাজী হন নাই।

অতঃপর একদিন সকলেই শুনিতে পাইল যে সুভাষচন্দ্র 'এরোণ্ডা' জাহাজে কলিকাতায় আসিতেছেন আর রেঙ্গুন হইতে ১২ই মে রওনা হইয়াছেন। ১৫ই মে জাহাজ আসিয়া আউটরাম ঘাটে নামিল, কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে না দেখিয়া সকলেই নিরাশ হইয়া পড়িল। অনুসন্ধানে জানা গেল, ১০টার সময় তাঁহাকে মেটিয়াবুরুজের নিকটবর্ত্তী স্থানে একখানি ইন্‌ভেলিড্ (রোগী-দিগের) চেয়ারে নামাইয়া একটী পুলিশ-লঞ্চে রাখা হইয়াছে। শুনা গেল সুভাষচন্দ্র অতিমাত্রায় কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন। চারিজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন যে, তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক। কেবলমাত্র তাঁহার মধ্যম সহোদর শরৎবাবু তাঁহার সহিত লঞ্চে দেখা করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। যে চারিজন পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন গভর্ণরের পারিবারিক চিকিৎসক মেজর হিংষ্টন, আর বাকী তিনজন লেপ্টানাণ্ট কর্ণেল স্যাণ্ডিস্, স্যার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

অতঃপরে আত্মীয়স্বজন বান্ধব সহযাত্রিগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে ১৬ই মে তারিখে অসুস্থতার জন্য বিনাসর্ত্তে মুক্তি প্রদান করা হয়, কিন্তু কি কারণে, কেহ বলিতে পারিল না ১৬ই মে তারিখের 'মিউনিসিপাল গেজেটে' বাহির হইল যে, কর্পোরেশনের সহিত তাঁহার চাকুরীর সম্বন্ধ রহিত হইল।

যাহা হউক মুক্তির সংবাদে চারিদিকে আনন্দ কোলাহল উঠিল, সহরের দোকানপাট বন্ধ হইল, ফরওয়ার্ড, ইংলিসম্যান মুক্তি সংবাদ সম্বলিত বিশেষ সংখ্যা বাহির করিল এবং কেহ কেহ নিজ নিজ গৃহ দীপালোকে সুসজ্জিত করিলেন।

অনুসন্ধানে জানা গেল, সুভাষচন্দ্রকে শিবপুরের কাছে নামাইতে চাহিলে তিনি কিছুতেই নামিতে চাহেন না। তিনি বলেন, রেঙ্গুন হইতে বলিয়া আনা হইয়াছে যে, কলিকাতায় লওয়া হইতেছে। সুতরাং কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে তিনি কোথাও নামিবেন না। পুলিশের অন্যতম প্রধান সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া শরৎবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। পরে শরৎবাবুর অনুরোধে সুভাষচন্দ্র লঞ্চে নামিয়া আসেন। ইন্‌সিনজেল হইতে সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে একজন সাধারণ কয়েদী সুভাষচন্দ্রকে সেবা করিবার জন্য জাহাজে আসিয়াছিল। বিদায়ের সময় সুভাষচন্দ্র মিঃ লোম্যানকে অনুরোধ করেন, এ বেচারীকে আর হাতকড়ি লাগাইবেন না। মিঃ লোম্যান স্বীকৃত হইলেন।

বেলা ১২টার সময় সুভাষচন্দ্র আসিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিবার আশায় বাড়ীতে বহুলোক উপস্থিত হইয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া পূজনীয়া বাসন্তী দেবীও আসিলেন। দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থানের পরে এই প্রথম সাক্ষাৎ—সেই দৃশ্য কি মর্ম্মন্তুদ! সুভাষের শরীরের অবস্থা দেখিয়া তিনিও শঙ্কিতা হইলেন। বাসন্তী দেবী এবং পুত্রসম সুভাষ কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

লোকের ভিড়ে সুভাষচন্দ্রের অসুখ বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয়া ডাক্তার সরকার ও রায় একটী বুলেটিন বাহির করিয়া জানাইয়াছেন যে, অগণিত বন্ধু ও হিতৈষিগণ যেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বন্ধ রাখেন; ইহার দুই একদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র রুগ্নাবস্থায়ই এই বাণী প্রচার করেন—

"বহুদিন পরে আবার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। এখন আমার সর্ব্বপ্রধান ও প্রধান কাজ—হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা। এখন অন্যান্য সহ-বন্দীদের কথাই অহর্নিশ আমার মনে জাগিতেছে। ভরসা করি আমার বন্ধুগণ, শীঘ্র শীঘ্র আমি যেন রোগ মুক্ত হ সেই কামনাই করিবেন। সকলের শুভেচ্ছায় আরোগ্য লা করিয়াই আমি আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসাধনে প্রাণমন ঢালিয়া দিব।"

জেলে থাকিতে ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র উত্তর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ ছিলেন মাননীয় যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। মুক্তি লাভ করিয়া তিনি উত্তর কলিকাতার কর্ম্মী-বৃন্দ এবং ভোটারগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিন চারি মাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। মুক্তি লাভ করিবার পরে, ঠিক কতদিন পরে মনে নাই, তবে একদিন উভয়ে বসিয়া নানা কথাবার্ত্তার মধ্যে দেশবন্ধু সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা হয়, সেটি এখন পাঠকের কাছে উপস্থিত করিব। তিনি বলেন—

'হেমবাবু, শুনেছি দেশবন্ধু পীরের ব্যাপার নিয়া বড়ই অশান্তি ভোগ করেছেন, সেই সময়কার অবস্থাটা একটু বলুন তো।'

এই কথোপকথন প্রসঙ্গে সেই ঘটনাটির একটু পরিচয় আবশ্যক।

আট দশ বৎসর যাবৎ একটী মান্দ্রাজবাসী ভিক্ষুক হগ সাহেবের বাজারে দোকানে দোকানে ভিক্ষা করিয়া খাইত। সে কথা কহিতে পারিত না! কানেও শুনিত না, বুদ্ধিও কতকটা হাবার মত জড় প্রকৃতির ছিল। সে হিন্দু কি মুসলমান কেহ জানিত না। লোকে তাহাকে 'দাতা' বলিয়া ডাকিত। তাহার দাড়ি ছিল, ফলওয়ালারা ফল দিত, কসাইরা মাংস দিত। হঠাৎ একদিন তাহার মৃত্যু হয় এবং তাহাকে কবরখানায় গোর দেওয়ার জন্য বাজারের মুসলমানরা সকলেই আয়োজন করিয়া রাখিল।

যখন বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইবে তাহার পূর্ব্বে কাহার মনে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল যে দাতাকে বাজারেই মাটী দেওয়া হউক না কেন। সকলে কমিশনার সামসুল হকের (বড় মিঞা) শরণাপন্ন হয়। তিনি কিছু করিতে না পারায় ডেপুটী মেয়র সুরাউর্দ্দিকে অনুরোধ করা হইল। কিন্তু চীফ একজিকিউটিভ অফিসার অনুমতি না দিলে বাজারের ভিতরে কবর দেওয়া সম্ভব নয়। কশাইরা সুরাউর্দ্দি সাহেবকে 'আপহি তো মালিক হায়'

প্রভৃতি কথায় এমন তুষ্ট করিতে লাগিল যে ইনি অতঃপরে সুভাষের সম্মতি নিয়া বাজারের ভিতরই কবরের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহার অল্পদিন পরে সুভাষ তিন রেগুলেশনে অন্তরীণাবদ্ধ হন। কিন্তু চারিদিক হইতে আক্রমণে এবং প্রতিবাদে দেশবন্ধুকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। আপত্তি যে কেবল হিন্দুদের তরফ হইতেই আসিল তাহা নয়, ইহুদি ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ও সমভাবে মুখর হইয়া উঠে। তিনি দার্জ্জিলিংএ এই সব প্রতিবাদে খুবই বিচলিত হন। আমাকে (লেখককে) সেখানে নেওয়াইয়া শরৎ বাবু এবং মিঃ সুরাউর্দ্দির কাছে পত্র দেন। কিন্তু আমি যে সময়ে শরৎবাবু ও সুরাউর্দ্দির সহিত এই বিষয় পরামর্শ করিতে ১৭ই জুন (১৯২৫) মেয়রের ঘরে উপবিষ্ট, খবর আসিল দেশবন্ধু চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছেন।

আমার নিকট সমস্ত কথা শুনিবার পরে সুভাষচন্দ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলেন—

"হেমবাবু, যখন আমি পীড়িত ছিলাম, সুরাউর্দ্দি সাহেব হন্তদন্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন,"সুভাষ, যদি ঐখান হইতে পীরের মৃতদেহ কবরখানায় লইয়া যাওয়া হয়, মুসলমানেরা ভয়ানক বিরোধী হইবে। তাহারা মারামারি, দাঙ্গা, রক্তারক্তি না করিয়া কিছুতেই উহা সরাইতে দিবে না, তোমাকে মিলিটারী ডাকিতে হইবে। মুসলমানের রক্তে কলিকাতা প্লাবিত হইবে। তখন তোমাদের হিন্দু মুসলমান ঐক্যের স্বপ্ন কোথায় থাকিবে—তোমাদের প্যাক্টেরই বা অর্থ কি? সমস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া মিঃ সুরাউর্দ্দির কথায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয় পাইয়া আমি অনিচ্ছায় এই আদেশ দিয়া ছিলাম। এখন দেখিতেছি আমি সাময়িক দুর্ব্বলতা না দেখাইলে দেশবন্ধুকে এইজন্য এত ভুগিতে হইত না।"

সুভাষের চক্ষু হইতে দুই এক ফোঁটা জলও বাহির হইয়াছিল।

যাহা হউক ঐ দিন সুভাষচন্দ্রের বিশেষ অনুরোধে আমি আমার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কো-অপ্টেট্ মেম্বর হইতে রাজী হইলাম। দেশবন্ধুর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আমিও এক রকম রাজনৈতিক সংসর্গ পরিত্যাগই করিয়াছিলাম। এবার সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে আবার সানন্দে ফিরিয়া আসিলাম।

১৬ই জুন (১৯২৫) দেশবন্ধু দেহরক্ষা করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত কয়েকদিন কাটিয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী তখন স্বর্গত মহাদেও দেশাই এবং আচার্য্য কৃপালনী (বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি) সহ তখন দেশবন্ধুর বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। মহাত্মাজী ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীতে আসিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে দেশবন্ধুর বাড়ীতে তাঁহার অতিথি হইয়াই অবস্থান করিতেছিলেন। দেশবন্ধু স্বাস্থ্য লাভের আশায় দার্জ্জিলিং-এ যান। ১৪৮ নম্বর বাড়ীতে মহাত্মাজী যখন অবস্থান করেন, আমি দেশবন্ধুর প্রতিনিধিরূপে মহাত্মাজীর দেখাশুনা করিতাম। কর্ম্মিগণ এইখানেই সমাগত হইয়া মহাত্মাজীর সঙ্গে আলাপালোচনা করিতেন।

দেশবন্ধুর তিনজন প্রধান শিষ্য—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল এবং সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন মান্দালয় জেলে।

বীরেন্দ্রনাথ চীফ্ একজিকিউটার পদলাভে ব্যর্থকাম হইয়া মেদিনীপুরে থাকিয়াই ব্যারিষ্টারের ব্যবসা চালাইতে নিরত থাকেন। সেনগুপ্ত মহাশয় ১৯২২ সালের জুলাই মাস হইতে কলিকাতায় ব্যারিষ্টারের ব্যবসা চালাইতেছেন। স্বরাজ্যদলের কাজ ব্যতীত তনি অপর বিশেষ কিছু করিতেন বলিয়া শুনি নাই। ১৯২৪ সালের কংগ্রেসে ত্রি-বর্জ্জন (Triple boycott of Councils, Practice and Schools and Colleges) উঠিয়া যাওয়ার পরে শাসমল প্রাকটিস আরম্ভ করেন। সেনগুপ্ত মহাশয় আরম্ভ করেন কংগ্রেস নির্দ্দেশের পূর্ব্বেই, সুতরাং দলের লোকের নিকট তিনি একটু অপ্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে দেশবন্ধুর পরিত্যক্ত কাজ যেন নষ্ট না হয় এই জন্য মহাত্মাজী দেশবন্ধুর তিনটি কার্য্যে—কংগ্রেস সভাপতি, স্বরাজ্যদলের সভাপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র রূপে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকেই মনোনীত করেন। কর্ম্মিগণ এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন, কিন্তু মুষ্টিমেয় প্রসিদ্ধ কর্ম্মী মনে করেন, সেনগুপ্ত মহাশয় মেয়র এবং স্বরাজ্যদলের সভাপতিরূপে খুব যোগ্য ব্যক্তি হইলেও কংগ্রেসের সভাপতিত্ব অপর কোন অধিকতর গঠন-শক্তি-পারদর্শী, শ্রমবিমুখ ও ত্যাগ-ব্রতী অধিনায়কের হাতে ন্যস্ত থাকাই সঙ্গত। কিন্তু মহাত্মাজী দেশবন্ধুর কোন স্থানই অপূর্ণ রাখিতে রাজী হন নাই। বিশেষতঃ তিনি মনে করেন স্বরাজ্যদলের কাজই যখন বেলগাঁও কংগ্রেসের পরে কংগ্রেসের প্রধানকার্য্যরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন স্বরাজ্য-দলপতিকেই কংগ্রেস সভাপতিপদে বৃত করা উচিত।

সে সময়ে মিঃ সেনগুপ্ত আসিয়া না পড়িলে বাঙ্গালার পক্ষে খুবই ক্ষতি হইত। ১৯২১ সালে সেনগুপ্ত যখন কংগ্রেসের কাজ করিতেন, দেশবন্ধু মনে করিতেন, যতীনের মত driving capacity (কার্য্যসাধনের ক্ষমতা) কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতার নাই। প্রথম শ্রেণীর নেতা বলিতে তখন তিনি মহাত্মাজী, পণ্ডিত মতিলালজী এবং নিজেকেই মনে করিতেন। বস্তুতঃ কার্য্যেও দেখিয়াছি দেশবন্ধুর পরে সেনগুপ্তের মত এরূপ উপযুক্ত মেয়র কেহ হয় নাই। স্বরাজ্য দলপতির কাজও খুব যোগ্যতার সহিতই তিনি নিষ্পন্ন করেন। কংগ্রেসের করণীয় যাহা ছিল, তাহা একরকম চলিয়া যাইত। এই ভাবে মিঃ সেনগুপ্ত তিন বৎসর বাঙ্গলার অবিসম্বাদী নেতার পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। বিশেষ তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

১৯২৬ সালের প্রথম দিকে, অন্তরীণাবদ্ধ অনেক কর্ম্মী তখন মুক্ত হইয়াছেন। তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে আসায় অবস্থা একটু পরিবর্ত্তন হইল। যুগান্তর ও অনুশীলন দলের সভ্যগণ উৎকৃষ্ট কর্ম্মী, কিন্তু বহুদিন হইতে এই দুইটি দলের মধ্যে রেশারেশি থাকায়, ইহাদের একটা দল কোন রাজনৈতিক নেতার সহযোগিতা করিলে অপরটি তাহার বিরুদ্ধে যাইতই। এই দুইদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঙ্গলার রাজনীতি যে নেতার নিরপেক্ষতাগুণ থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়ে প্রভাবিত হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আবার অন্যদিকটাও স্বীকার করা উচিত। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, তাহারা না থাকিলে কংগ্রেসের কাজই পণ্ড হইত। যাহা হউক সেনগুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক ব্যবহারে এপর্য্যন্ত কোন দলেরই অবিশ্বাসভাজন হন নাই। বরং স্বরাজ্যদলের নেতা হিসাবে কাউন্সিলে উপর্য্যুপরি

কয়টি প্রস্তাবে জয়লাভ করিয়া সকলের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতেই সক্ষম হইয়াছিলেন। মেয়র হিসাবেও তিনি হিন্দু-মুসলমান এবং ইউরোপীয় তিনদলেরই সহানুভূতি ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন।

১৯২৫ সালে কানপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে সভানেত্রী হন মিসেস্ সরোজিনী নাইডু। ১৯২৬এর মে ও জুন মাসে তিনি বাঙ্গলার কোন কোন স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং মে মাসে কৃষ্ণনগর প্রাদেশিক সম্মেলনে মিঃ সেনগুপ্তসহ উপস্থিত হন।

১৯২৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন হয় কৃষ্ণনগরে এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইহার সভাপতি মনোনীত হন। শাসমল মহাশয় তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন: 'আমার বিশ্বাস, বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক লোক কংগ্রেসে রহিয়াছেন, এবং আমার মতে কার্য্যকরী সমিতিতে ঐরূপ লোক থাকা সঙ্গত নয়। তবে ইহা আমার ব্যক্তিগত মত।" শাসমল মহাশয় ইদানীং কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কিছু জানিতেন না। এমতাবস্থায় তাঁহার উক্ত উক্তি কংগ্রেসের নীতি অনুমোদিত হইলেও, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিতে ঐরূপ ব্যক্তি আছেন, এইরূপ উক্তি সর্ব্বসমক্ষে সভাপতির আসন হইতে বাহির হওয়া অত্যন্ত দোষনীয়। অনেকে মনে করেন তিনি কর্পোরেশনের চীফের পদের জন্য সুভাষচন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পার্টির কাছে হারিয়া যাওয়ায় ঐরূপ অসঙ্গতোক্তির সহায়তায় নিজের গায়ের ঝাল মিটাইলেন। অভিভাষণের পূর্ব্বে অনেকে ঐরূপ উক্তিসম্বন্ধে আপত্তি করায় তিনি অভিভাষণের সময় ঐ সকল উক্তি সম্বন্ধে বলেন, "এইগুলি আমার ব্যক্তিগত মত, তবে অনেকের আপত্তি হওয়ায় আমি এইগুলি বাদ দিলাম।" অভিভাষণে ঐরূপ উক্তি লিপিবদ্ধ হওয়ায় এবং একেবারে প্রত্যাহৃত না হওয়ায় সভায় তীব্র মন্তব্য এবং গোলযোগ হয়। শাসমল মহাশয় সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যান।

১৯২৫ সালের কংগ্রেস অধিবেশনের সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনি এবং মিঃ সেনগুপ্ত উভয়েই সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি অনুরোধ করেন—

"আমিওতো বাঙ্গলা দেশেরই মেয়ে, আমি বলি আপনারা গণতন্ত্রের খাতিরে উদারতা দেখাইয়া তাঁহাকে আবার আহ্বান করুন। তিনি তো ঐ অংশ একরকম পরিহারই করিয়াছেন, তবে কেন আপনাদের হইয়া আমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিব না?"

সকলের সম্মতিক্রমে আবার শাসমল আসিলেন এবং আসিয়া বাকীটুকু শেষ করিলেন। কিন্তু পরের দিন আবার গোলমাল হয়। বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় একটা অনাস্থা প্রস্তাব হয় এবং তিনি সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন।

দুইদিনই দেখিয়াছি শাসমল সভার কার্য্যে যে উচ্চ ও বিকাররহিত ভাব (dignity) এবং নিয়মতান্ত্রিকতা দেখাইয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসার্হ। অতঃপরে সেনগুপ্ত মহাশয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি হিসাবে কনফারেন্স স্থগিত রাখিয়া দেন। কিন্তু ঐ দিনই বিরোধী দল শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী মহাশয়কে সভাপতি করিয়া হিন্দু মুসলমান চুক্তি নাকচ করিয়া দেন এবং শাসমলের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করেন। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত সভাটি বে-আইনী; বিশেষতঃ মিঃ চৌধুরী ডেলিগেট ছিলেন না, কেবল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

কৃষ্ণনগরের ব্যাপার এবং হিন্দু মুসলমান চুক্তি ব্যাপারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নেতৃবর্গের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ ও অসদ্ভাব হয়।

কলিকাতায় আসিয়া মিঃ সেনগুপ্ত ও কিরণ শঙ্কর রায় (বি পি সি সির সভাপতি ও সম্পাদক) ১৩ই জুন (১৯২৬) সভা করিয়া হিন্দু মুসলমান চুক্তি পাশ করিয়া ফেলেন। এই সময় কর্ম্মীসঙ্ঘ নামে একটা প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়া এমন সব কার্য্য করেন যাহাতে তাহা কংগ্রেসের মধ্যে গোলযোগ বৃদ্ধি করে। সুতরাং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এই প্রস্তাব পাশ হওয়ায় কর্ম্মীসঙ্ঘের সমর্থক (সভ্য নহেন) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচরণ গোস্বামী সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যান। তখন দুইটি দল প্রকট হয়—একদলে থাকেন মিঃ সেনগুপ্ত; শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় প্রভৃতি পুরাতন কংগ্রেস কর্ম্মীসঙ্ঘ ও কর্ম্মিগণ। অন্যদলে থাকেন উক্ত তিনজন ভদ্রলোক ও ডাক্তার বিধান রায় এবং শ্রীযুক্ত নলিনী সরকার। ইহারাই অতঃপরে (Big five) 'পঞ্চপ্রধান' নামে অভিহিত হন। বিবাদ এমন পাকিয়া উঠে যে যতীন্দ্রমোহনকে সমর্থন করিতে গিয়া ফরওয়ার্ড সম্পাদক প্রফুল্ল* কুমার চক্রবর্ত্তী (ব্যারিষ্টার) মহাশয়েরও চাকুরী যায়। শাসমল মহাশয় হিন্দু মুসলমান চুক্তির সম্পূর্ণ সমর্থক ছিলেন।

১৯২৬ সালে আবার কাউন্সিল নির্ব্বাচন হয় এবং ১৯২৭ সালের মার্চ্চে কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনের সময় আসে। এই সূত্রে আবার সাময়িক মিল হয়। এইবারে নভেম্বর মাসে কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচন সময়ে সেনগুপ্ত মহাশয় আর সভাপতি হইতে ইচ্ছা না করায় ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের প্রস্তাবে শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবী সভানেত্রী ও বীরেন শাসমল মহাশয় সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবী রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণই করিয়াছেন। তিনি ঐরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বর্গীয় বাগ্মী জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচিত হইয়া শাসমল কাউন্সিল এবং কর্পোরেশনে নির্ব্বাচনপ্রার্থী মনোনীত করিতে আরম্ভ করেন। আরও কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হয়। অতঃপরে সভাপতি, সম্পাদক ও কার্য্যকরী সমিতির উপরে একটী অনাস্থাপ্রস্তাব (Vote of No-Confidence) পাশ হয়। কিন্তু তথাপি তাঁহারা পদ পরিত্যাগ করেন না। এমতাবস্থায় সেনগুপ্ত মহাশয়, কিরণবাবু, Big five ও কর্ম্মীসঙ্ঘ একত্র হইয়া কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের সহায়তায় কলিকাতার পাঁচটি জিলার

* তিনি Contraband Carriers নামক একটী সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াছিলেন কিন্তু ফরওয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ উহা বন্ধ করিয়া দেন। পরে উহা ইংরাজী "The daily Basumatiতে" বাহির হয়।

কমিটীর সভাপতি ও সম্পাদক লইয়া একটী নির্ব্বাচন কমিটী স্থির করিয়া লন। ইঁহারাই কাউন্সিল ও কর্পোরেশনে উপযুক্ত ব্যক্তি পাঠাইতে লাগিলেন। ১৯২৬ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে হয় গৌহাটীতে। এই অধিবেশনে ডেলিগেট নির্ব্বাচন ছাড়া, শাসমল-দলের বিশেষ কোন কাজ ছিল না। তবে তাঁহারাও নিজদল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া নির্ব্বাচন সমরে অবতীর্ণ হন।

১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে সেনগুপ্ত মহাশয় কর্পোরেশনের মেয়র এবং স্বরাজ্যদলের নেতা থাকেন। এই দুইটী স্থানে সেনগুপ্তের বিশেষ ক্ষমতা থাকিলেও, নানাকারণে কংগ্রেস কমিটী নির্জ্জীব হইয়া পড়ে।

হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্বন্ধেও বিশেষ গোলযোগ হয়। দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সম্বন্ধে এত প্রগাঢ় আশাবাদী ছিলেন যে পূর্ব্ব হইতেই স্থির করেন যে, আমাদের "অভীষ্ট স্বরাজ লাভ হইলে" হিন্দু এবং মুসলমানগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। কাউন্সেল নির্ব্বাচন বোর্ডে নির্ব্বাচন, বাজনা এবং গোহত্যা সম্বন্ধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে (সেই সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে) কতগুলি নিয়ম করিয়া দেন। সুভাষচন্দ্র তখনও অন্তরীণাবদ্ধ হন নাই। পরে ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মিলনীতে প্রায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা পাশ করিয়া লন। উভয় সম্প্রদায়ের বেশ সদ্ভাবে কাটিতে লাগিল কিন্তু ১৯২৫ সালে দেশবন্ধুর জীবিতাবস্থায়ই সেই ভাবে একটু বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। জানুয়ারী মাসে হ্যালিডে পার্কে (বর্ত্তমান মহম্মদ আলি পার্কে) হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন হয়। তাঁহার সভাপতি হন লালা রাজপতরায় এবং প্রধান উদ্যোক্তা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। তখন হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল সংগঠন—অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়া সমস্ত হিন্দু জাতিকে এক করা। দ্বিতীয় শুদ্ধি অর্থাৎ যাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরিত করা হইয়াছে, তাহারা স্বেচ্ছায় আবার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাদিগকে সসম্মানে হিন্দুসমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। ইলেকসনের বাহুল্য ছিলনা এবং আত্মরক্ষা সেই অনুষ্ঠানের মূলে ছিল বলিয়া তখন হিন্দুমাত্রই ইহার সভ্য হইতে দ্বিধাবোধ করে নাই। দেশবন্ধু তখন রাজগৃহে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন করিবার জন্ত গিয়াছিলেন। তিনি নির্দ্দেশ দেন এই সকল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ নেতাগণকে যেন কর্পোরেশন হইতে অভিনন্দন (civic address) দেওয়া হয়। কিন্তু ডেপুটী মেয়র মিঃ সুরাবর্দ্দি সকলকে বলিলেন, "এঁদের যদি অভিনন্দন দেওয়া হয়, তবে কলিকাতার রাস্তাঘাট মানুষের রক্তে রঞ্জিত হবে, ভয়ানক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিবে।" দেশবন্ধুর কাছে খবর গেল। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। ঐ সমস্ত নেতাগণকে অভিনন্দন দিতেই হইল। ফলে কোন গোলমালই হইল না।

ইহার কয়েক মাস পরে (দেশবন্ধুর পরলোকগমণের পরে) চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এবং হ্যারিসনরোডের মোড়ে মসজিদের নিকটে সঙ্গীত অজুহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা হয় এবং সেই দাঙ্গা প্রায় ৪।৫ দিন ব্যাপী হয়। অনেক হিন্দু মুসলমান মারা যায়। ১৯২৬ (এপ্রিল)।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে ডেপুটি মেয়র মিঃ এইচ, এস সুরাউর্দ্দি উক্ত গোলযোগের সময় কোন কোন পেশোয়ারী গুণ্ডার সহায়তা করিয়াছিলেন সন্দেহ করিয়া কয়েকজন কাউন্সিলার তাঁহাকে ডেপুটী মেয়রের পদ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্ত একটী অনাস্থাপ্রস্তাব আনয়ন করেন এবং শ্বেতাঙ্গ কাউন্সিলারগণও এই প্রস্তাবে সহযোগিতা করেন। মিঃ সুরাউর্দ্দির কার্য্যকলাপ তদন্ত করিবার জন্ত একটী কমিটী গঠিত হয়। ইহাতে অনেক মুসলমান একটী সভা করিয়া মুসলমান কাউন্সিলারদিগকে একযোগে পদত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দেন। ইহার ফলে ১৫ জন মুসলমান সদস্য একযোগে পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন। অতঃপরে মেয়র যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় বিষয়টি সকলের আপোষে মিটাইয়া দেন।

এই দাঙ্গাহাঙ্গামার পরে হিন্দু-মুসলমান প্যাক্টের প্রতি দেশবন্ধুর শিষ্যগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা থাকিলেও, সাধারণ লোকের মধ্যে প্যাক্টের বিরোধীভাবই প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে মুসলমানগণও কাউন্সিল ইলেকসনে অতঃপরে কংগ্রেসের সমর্থন লাভ করিতে আর ব্যর্থ হন না। এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পূর্ব্বসদ্ভাব অনেকাংশে কমিয়া যায়।

বাঙ্গলায় যখন রাজনৈতিক, সামাজিক, এরূপ সাম্প্রদায়িক অবস্থা বাঙ্গলার জনসাধারণ সুভাষচন্দ্রকে পুনরায় সুস্থদেহে তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাইয়া অপরিসীম উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলে সমোৎসাহে সুভাষচন্দ্রকে নেতৃপদে বরণ করিল। ১৯২০ সালের পরে ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলার কোন কর্ম্মনিরত নেতাই এরূপ অভিনন্দন সমাদর সহযোগিতা লাভ করে নাই। সকলে সমভাবে তাঁহাকে বরণ করিয়া লন। ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভা হয়, তাহাতে শুভ্রবেশে নবোৎসাহে মধ্যস্থলে উপবিষ্ট সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়া কত যে আনন্দ হইল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। সুভাষবাবু হইলেন প্রেসিডেন্ট, কিরণশঙ্করবাবু সেক্রেটারী। সেনগুপ্ত মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কংগ্রেস নেতার আসনে সুভাষচন্দ্রকে উপবিষ্ট দেখিয়া আনন্দিত হন। বীগ্ ফাইভ্ ও কর্ম্মীসঙ্ঘের স্থানে আবার পুরাতন ও খাঁটি কর্ম্মী আসিল। ১৯২৭শে নভেম্বর হইতে অভিষিক্ত হইয়া অতঃপরে ত্যাগবীর ও সংযম পরায়ণ অবিসম্বাদী নেতা সুভাষচন্দ্রই বাঙ্গলায় স্নেহ ও শ্রদ্ধাপরায়ণ জননায়ক হইয়া উঠিলেন।

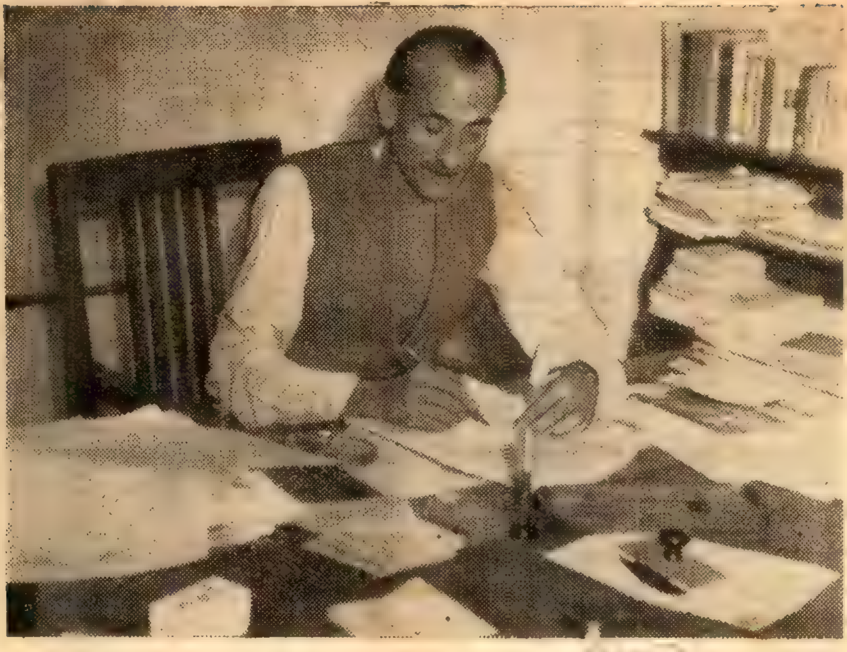

কংগ্রেস-রাষ্ট্রপতি

আচার্য্য

জে, বি, কৃপালনী

কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী হায়দরাবাদের এক আমিল পরিবারে ১৮৮৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। আজ হইতে ৫৮ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তাঁহার পিতা কাকা ভগবানদাস রাজভক্ত ও গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার সাতপুত্র ও এক কন্যা। কৃপালনী তাঁহার পিতার ষষ্ঠ সন্তান! কাকা ভগবানদাসের সন্তানদের মধ্যে বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপতি কৃপালনী ও একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কীকা বেনই শুধু জীবিত আছেন।

কৃপালনী এণ্ট্রান্স পাশ করিবার পর বোম্বাইতে উইলসন্ কলেজে ভর্ত্তি হন। বালক বয়সেই তিনি জ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরবর্ত্তীকালে ইতিহাস ও অর্থনীতিশাস্ত্রে এম্-এ পাশ করেন। ইহার পরে শক্করে তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তথায় শিক্ষকতা করিতে থাকেন। অতঃপর মজঃফরপুরে সরকারী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। এখানেই চম্পারণ সত্যাগ্রহের কালে মহাত্মা গান্ধীর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তাঁহার জীবনে পরিবর্ত্তন আসে। দুঃখ ও বিপদের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়িতে তিনি এতটুকুও ইতস্ততঃ করেন না। সরকার তাঁহাকে চাকরী ত্যাগে বাধ্য করেন!...তিনি কিছুকাল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর পদে কাজ করেন, এবং কাশী শ্রীগান্ধী আশ্রমে যোগদান করেন। পরে গান্ধীজী সবরমতীতে গুজরাট বিদ্যাপীট স্থাপনের জন্য কৃপালনীকে আহ্বান করেন; কৃপালনী এখানে আচার্য্য নিযুক্ত হন।

আচার্য্য কৃপালনী বাংলার বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিয়া হিংসাত্মক মতবাদে দীক্ষিত হইয়া স্বদেশসেবায় অগ্রসর হন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে গান্ধীজীর প্রভাবে আসিয়া অহিংসাপন্থী হইয়া উঠেন। গুজরাট বিদ্যাপীঠে ১৯২২ সাল ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত কাজ করিবার পর আচার্য্য কৃপালনী মীরাটে তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তোলেন। ১৯৩৪ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে আচার্য্য কৃপালনীকে উক্ত পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি তদবধি ১৯৪৬ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সহিত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদে কার্য্য করেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস হইতে তিনি আমেদনগর দুর্গে অপরাপর কংগ্রেস নেতৃবর্গ সহ আটক ছিলেন এবং ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময় মুক্তি পান।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা সুচেতা মজুমদারের সহিত ১৯৩৭ সালে আচার্য্য কৃপালনীর বিবাহ হয়। তাহার দুই বৎসর পর তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকার পদ ত্যাগ করিয়া স্বামীর কর্ম্মসঙ্গিনী হন এবং ১৯৩৯ সালে ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার নিকট হইতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈদেশিক বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারতের নির্য্যাতীত নারীজাতীর মর্ম্মবেদনা তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি নোয়াখালীর অত্যাচারিতাদের পাশে দাঁড়াইয়া যে সেবা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মশক্তি, সাহস, তেজস্বিতা ও নির্য্যাতিত মানবের প্রতি তাঁহার গভীর মমত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি নোয়াখালী ও ত্রিপুরার নির্য্যাতিতদের কাছে 'দেবী মা' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম-এ, বার-এট-ল

দুই

মেজদা চলে যাওয়ার পর বাড়ীটা দিনকতক যেন কেমন থমথমে হয়ে গেল। মেজবৌদির বাহিরের হাসি খুসী ভাবটা, মেজবৌদির বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকটা গেল কমে—এটা আর কেউ লক্ষ্য করুক আর না করুক আমি বিশেষ করেই লক্ষ্য করলাম। মেজবৌদির সঙ্গে হাসি গল্প আর তেমন যেন জমে না।

দাদা একদিন বাবার কাছে বললেন, "মেজবৌমা দিনকতক না হয় বাপের বাড়ী ঘুরে আসুক। অনেক দিন ত মার কাছে যায় নি।"

বাবা কোনও উত্তর দিলেন না।

দাদা আবার বললেন, "শুধু ভাবি বাবা তোমাকে নিয়ে।"

আমরা সবাই বাবাকে 'তুমি' বলেই বলতাম। দাদা বললেন, "মেজবৌমা চলে গেলে তোমার বিশেষ কষ্ট হবে—সে অভাব আমরা ত কেউ পূরণ করতে পারব না।"

বাবা বললেন, "যদি ভাল মনে কর, দিনকতক না হয় পাঠিয়ে দাও। আমার যা হয় হবে—সবাই মিলে কোন রকমে চালিয়ে নিও।"

দাদা বললেন "রাত্রের জন্য ভাবি না। আমি থাকব তোমার কাছে। দিনের বেলাটায়—বুল'টার টেষ্ট পরীক্ষা এসে পড়েছে, তাইত ভাবি।"

আমি শুধালাম, "কদিনের জন্য পাঠাতে চাও?"

দাদা বললেন, মাসখানেক ঘুরে আসুক।"

বেশ মুরুব্বিয়ানা চালে যেন সমস্ত সিদ্ধান্ত সমাধান করে দিয়ে বললাম, "দিন পনেরোর জন্য পাঠিয়ে দাও, আমি চালিয়ে নেব—আমার বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না পনের দিনে।"

দাদা একটু হেসে বললেন, "গেলে মাসখানেকের জন্যই যেতে হয়—নেহাত ত কাছে নয়। বুলা! তুই একবার মেজবৌমাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌, তাঁর মতটা কি?"

মেজবৌদির কাছে কথাটা তুলতেই মেজবৌদি বললেন, "না, না, এখন দিনকতক থাক। তোমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তারপর যা হয় হবে।"

শুধালাম, "মার কাছে যেতে তোমার ইচ্ছে করে না মেজবৌদি?"

হেসে বললেন, "ইচ্ছে আবার করে না; ৫।৬ মাস মাকে দেখি না। ইচ্ছে করলেই কি সব জিনিষ করা যায় ঠাকুরঝি?"

মেজবৌদির মা মেজবৌদির ছেলে হওয়ার সময় এসে মাস দুই আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। সে সময় তা নিয়ে নাকি মেজবৌদির বাপের বাড়ীর গ্রামে বেশ কথাকথি হয়েছিল—সবাই নিন্দে করে বলেছিল, নাতি হওয়ার আগে জামাইয়ের অন্ন মুখে দেওয়া নাকি গভীর লজ্জার ও ঘৃণার কথা। মেজবৌদির মা সে কথা গ্রাহ্য না করে জোরের সহিতই বলেছিলেন, "ওঁদের অন্ন ত নতুন খেতে যাচ্ছি না—ওঁদের অন্নেই ত আমার পূর্ব্বপুরুষ মানুষ হয়েছেন।"

যাই হোক, মেজবৌদির মাকে সে সময় আমার বিশেষ ভাল লেগেছিল। কি সুন্দর মিষ্টি কথাবার্ত্তা, আমাকে কি যত্নটাই না করেছিলেন।

মেজবৌদির বাপের বাড়ী যাওয়াটা বন্ধ হওয়াতে মনে মনে আমি বিশেষ খুসী হলাম। মেজবৌদির জন্য যতটা না হক, বাচ্চাটাকে ছেড়ে থাকবার কথা ভাবতে বুকটা হুহু করে উঠেছিল। বাচ্চাটা দিন দিন কি মিষ্টিই হচ্ছে—খালি কোলে করে আদর করতে ইচ্ছে করে।

... ...

এই সময় আমার এক প্রাণের বন্ধু ছিল—নাম যমুনা, আমাদের বাড়ী থেকে চার খানা বাড়ীর পরে এক গলির মধ্যে যমুনাদের বাড়ী -আমার সঙ্গে একই স্কুলে এক

ক্লাসে পড়ে। যখন তখন আমাদের বাড়ীতে এসে আমার সঙ্গে গল্প করে, কখন হয় ত সমস্ত দিনই কাটিয়ে দেয়—আমাদের বাড়ীর সবাই তাকে ভালবাসে, যেন সে আমাদের বাড়ীরই একজন। আমিও মাঝে মাঝে যমুনাদের বাড়ীতে যাই; কিন্তু যমুনাদের অবস্থা বোধ হয় তেমন ভাল নয়, তাদের ছোট্ট বাড়ীতে অনেক লোক বাস করে, তাই যমুনাই বেশী আমাদের বাড়ীতে আসে—এখানেই আমাদের গল্প জমে ভাল।

যমুনার সঙ্গে ভাবটা আমার বছরখানেক থেকেই খুব বেশী জমেছে। যমুনা আমার চেয়ে বোধ হয় বছর খানেকের বছর দেড়েকের বড় হ'বে—স্কুলে এক ক্লাস উঁচুতে পড়ত কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে ক্লাস-প্রমোশন পেল না, আমি সগৌরবে উঠলাম দ্বিতীয় শ্রেণীতে, ক্লাসে উচ্চস্থান অধিকার ক'রে, সেই থেকেই যমুনার সঙ্গে আলাপ। ভাবটা জমল দ্বিতীয় শ্রেণীর বাৎসরিক পরীক্ষার সময়। যমুনা তখন প্রায়ই আমার কাছে পড়তে আসত। এবার দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে প্রথম শ্রেণীতে উঠল বটে—তাও কোনও ক্রমে। এবার তারও প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার কথা, কিন্তু কিছুদিন হ'ল একদিন হাঁসতে হাঁসতে আমাকে বলে গেল "মা এবার পরীক্ষা দিতে বারণ করেছেন,—বাঁচলাম ভাই।" সত্যিই বেঁচেছিল, কেন না আর যাই হোক, লেখাপড়ার দিকে টান যমুনার কোন কালেই ছিল না।

বললাম, "এটা ঠিক হ'ল না, পরীক্ষাটা দেওয়া উচিত ছিল।"

বললে, "কি জানি, মা হয়ত ভাবলেন—পাশ ত করতে পারবেই না, শুধু শুধু কতকগুলো টাকা কেন খরচ হয়।"

বললাম, "পাশ ফেল বলা যায় না—অদৃষ্টের কথা।"

যমুনারা আট ভাই বোন—যমুনা তৃতীয়, উপরে দুই ভাই বড়। বড় ভাই এবার বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে, তার জন্য কিছু টাকা খরচ হ'বে, তাই বোধ হয় যমুনার বাপ-মা এ মেয়ের জন্য এবার অর্থ খরচ করতে নারাজ, বিশেষতঃ যখন এ মেয়ের সাফল্য গভীর সন্দেহজনক। ওদের অবস্থা ত বিশেষ ভাল নয়—সে কথা ত আগেই বলেছি।

পড়াশুনায় যাই হোক, যমুনা কিন্তু এদিকে মেয়ে ভাল—আমি সত্যই ওকে আন্তরিক ভালবাসি। যমুনা দেখতে সুশ্রী নয়, ঠিক কালো না হ'লেও গাঢ় শ্যামবর্ণ গায়ের রং এবং য'দিও মুখ, নাক-চোখ ভালই তবুও এত রোগা, যে, এ বয়সেও যৌবন-শ্রী অঙ্গে অঙ্গে ভেসে উঠবার ঠিক সুযোগ খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু দেহের দিক দিয়ে যাই হোক, যমুনার মনটা অসাধারণ কোমল, সব সময় ভাবের ঢেউয়ে টলমল করছে। আমার কাছে বসে দাদার কাছে নানা রকম গল্প শুনতে সে একেবারে মজগুল হয়ে ওঠে—নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়, আমাকেই তাড়া দিয়ে পাঠাতে হয়। শুধু তাই নয়, দাদার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে যমুনার মনটা সব সময়ই যেন নুয়ে আছে—দাদার কথা যমুনার কাছে যেন বেদবাক্য, তার উপরে যেন জগতে আর কোনও কথাই চলে না। দাদা এ যুগের কবি রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা দাদা মাঝে মাঝে আমাকে পড়ে শোনান—সত্যিই চমৎকার পড়েন দাদা। যমুনাও রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ দাদার কাছ থেকে নিয়ে একাধিক কবিতা মুখস্থ করে ফেলেছে—দাদার মত পড়বার তার অসাধারণ সখ, চুপি চুপি মাঝে মাঝে আমাকে শোনায়। আমি বলি "তুমি দাদার কাছে একদিন আবৃত্তি কর না—দাদা ঠিক ভাল করে শিখিয়ে দেবেন।" যমুনা কিন্তু সে কথায় কোনও দিনই রাজী হয় না। ভিতরে ভাবে টলমল করলেও যমুনা আসলে অত্যন্ত লাজুক—নিজকে জাহির করার প্রচেষ্টা একেবারেই নেই।

যমুনার বিষয় অত্যন্ত গোপনে দু'চারটে কথা বলি—আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। যমুনা মাঝে মাঝে প্রাণের আবেগে প্রেমে পড়ে' হাবুডুবু খায়—হা-হুতাশ, কান্নাকাটী সবই কিন্তু চুপি চুপি আমার কাছে, আবার কিছুদিন পরে আপনা থেকেই সেরে যায়—আমার সে সময় ভারী মজা লাগে। যমুনার মনের এদিকটার পরিচয় আমার কাছে প্রথম প্রকাশ হ'ল—বছরখানেক পূর্ব্বে বাৎসরিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে। ওর দাদার একটী বন্ধু প্রায়ই সে সময়টা ওদের বাড়ীতে আসত, যমুনা সে-সময় তার প্রেমে পাগল। মনের আবেগে চুপি চুপি কত কথা সে-সময় আমাকে বলেছিল—সব আমার ঠিক মনে নাই। আমিও যমুনাকে নিয়ে নানা মজা করতাম। একদিন বললাম, "আমার কাছে এত উচ্ছ্বাস, সবই ত বৃথা হচ্ছে। এক কাজ কর—তুই তার কাছে একখানা চিঠি লেখ, আমি চুপি চুপি পৌঁছে দেওয়ার ভার নিচ্ছি।"

বললে, "ছিঃ!—কি যে বলিস্।"

ব'ললাম, "নইলে আর কি উপায় আছে বল্। মুখ ফুটে ত' বলতে পারবি না—চিঠিতে জানিয়ে দে মনের কথা, তাকে একটু বুঝতে দে।"

বললে, "ইস্—আমাকে কি ভাবিস্?"

বললাম, "তা হ'লে হা-হুতাশ করে মর। আর কি উপায়?"

তখন বললে, "না ভাই, কি হ'বে? ওর সঙ্গে বিয়ে না হ'লে আমি বাঁচব না।"

তার সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা কোনও দিক দিয়ে কিছু ছিল কি না আমি জানি না এবং তা নিয়ে কোনও খোঁজও করিনি। তবে যমুনার বিশেষ আগ্রহে একদিন লোকটিকে দেখতে গিয়েছিলাম যমুনাদের বাড়ী—দেখে আমার মন্দ লাগে নি। রং যদিও ফর্সা নয় কিন্তু লম্বা চেহারা, মুখখানা বেশ দেখতে—চোখ দুটী ভারী সুন্দর। বিকেলবেলা লোকটী বাইরের ঘরে বসে যমুনার দাদার সঙ্গে গল্প করছিল—রাস্তা থেকে বাড়ীর ভেতর যেতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বাড়ীর ভেতরের বারান্দা থেকে দরজার ফাঁক দিয়ে যে একেবারেই দেখা যায় না, এমন নয়—আমি ও যমুনা সেই বারান্দায়ই বেশীর ভাগ গল্প করছিলাম,এবং যমুনার ত কথাই নেই, আমিও লোকটীকে অনেকবার লক্ষ্য করে দেখলাম। যমুনা সেইখানেই দু'তিনবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল "বল্না ভাই, কেমন লাগল?"

আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপি চুপি বললাম "চুপ—ওসব কথা পরে।"

একবার বললাম "দাদার সঙ্গে একটা কথা বলার ছুঁতো করে—যা-না ও-ঘরে। তাহ'লেই হয়ত আলাপ হয়ে যাবে।"

বললে "সে কথা আমি অনেকবার ভেবেছি ভাই, কিন্তু পারি না, বড্ড লজ্জা করে।"

বললাম "ভাই লোকটী এলে পাঁচবার শুধু সামনে দিয়ে আসা-যাওয়াই করিস—এই ত? তোর দ্বারা জগতের কোনওদিন কোনও উপকার হ'বে না।"

শুধালে "তা তুই-ই বা কি করতিস্?"

বললাম "আমার তোর অবস্থা হ'লে তোর মতন আড়ালে কান্নাকাটী করেই সময় কাটিয়ে দিতাম না। আমি হ'লে, এমন আলাপ জমিয়ে নিতাম যে, আমার টানেই লোকটীকে আসতে হ'ত এ বাড়ী—লোকটীর কাছে আমিই হয়ে উঠ্তাম মুখ্য—যদিও গোপনে। দাদাকে কোন্ কালে হটিয়ে গৌণ করে রেখে দিতাম।"

যমুনা শুধাল "ও মা সে কি? তুই কি স্পষ্টাস্পষ্টি প্রেম করতিস্ না কি?"

বললাম "হয় ত করতাম কিংবা হয় ত করতাম না—জানি না। তবে আড়ালে পড়ে তোর মতন মার খেতাম না—এটা নিশ্চয়।"

যমুনাকে নিয়ে একটু মজা করার ইচ্ছে হ'ল।

বললাম "কিন্তু দু-একটা জিনিষ বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করলাম।"

পরম আগ্রহভরে যমুনা শুধাল "কি ভাই, বল্ না।"

গম্ভীরভাবে বললাম "এখন নয়, পরে। লোকটীকে নিয়ে একটু গম্ভীরভাবে আলোচনা করা দরকার।"

যমুনার পক্ষে তখন আমার সঙ্গ ছাড়া অসম্ভব। লোকটী চলে গেলে আমার সঙ্গে এল আমাদের বাড়ী। আসার সময় মাকে বলে এল—"মা বুলা রাত্রে ওদের বাড়ী আমাকে খেতে বলছে। আমি খেয়ে দেয়ে রাত্রে আসব।"

কেন জানি না, যমুনার মা আমাকে শুধু স্নেহের চক্ষেই দেখতেন না—যমুনার বিষয় যখন যা অনুরোধ করেছি, শুনেছেন, কখনও 'না' বলেন নি। যদিও মেয়েদের বিষয় তাঁর মতামত মোটেই একালের উপযোগী ছিল না, তবুও যমুনাকে আমি যখন যেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছি এক কথায় রাজী হয়েছেন, বলেছেন "তা তোমার সঙ্গে যাবে তাতে আর আপত্তি কি"—আমি যেন যমুনার বুড়ো দিদিমা, আমার সঙ্গে থাকলে যেন তার গায়ে আঁচড়টী পর্য্যন্ত লাগবে না। তাই দু' একবার যমুনাকে নিয়ে দাদার সঙ্গে বাটানিক্স্ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি—যমুনার মা একটী কথাও বলেন নি।

যমুনা এল আমাদের বাড়ী আমার সঙ্গে সঙ্গে এবং বাড়ী থেকে বেরিয়েই অনবরত "কি ভাই বল্না—কি বলবি?" এই প্রশ্নে আমাকে অস্থির করে তুলল। আমিও দিদিমারই ঢংয়ে মুরুব্বিয়ানা চালে ধমক দিয়ে বললাম "চুপ কর, ব্যস্ত হ'লে জীবনে কোনও কাজ হয় না।"

বাড়ী এসেও, যেন আমার কত কাজ এই ভাবে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বেচারী যমুনা আমাদের দোতলার বারান্দার একপার্শে চুপ করে একটী বেঞ্চির উপর বসে রইল। আকুল দুটো চোখ আমার পানে চেয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে বেড়াচ্ছে—আড় নয়নে সেটুকু লক্ষ্য করে নেওয়া আমার পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নি। বেচারীর দুর্দ্দশায় আমার ভারী মজা লাগল, কষ্ট এতটুকুও হ'ল না। খানিকক্ষণ পরে যমুনার কাছে গিয়ে বললাম "দাদা ফিরে এসেছেন, চল্ দাদার ঘরে গিয়ে একটু গল্প করা যাক্।"

একটু অভিমানভরে যমুনা বলল "তুমি কি এইজন্য আমাকে নিয়ে এলে?"

বললাম "আমি ত আনিনি। নিজেই ত এলে—নিজের গরজে।"

যমুনার ধৈর্য্যের বাঁধন তখন প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। শুধাল "তুমি আমাকে বলবে কি না শুনি?"

ব্যাপারটা নিয়ে যেন বিশেষ চিন্তিত—এই ভাবে বললাম "তাই ত' ভাবছি—বলাটা ঠিক হবে কি না। আচ্ছা চল, ছাদে ত যাই।"

সঙ্গে সঙ্গে যমুনা উঠে দাঁড়াল এবং দু'জনায় গেলাম তিনতলার পিছন দিককার ছাদে।

কি তিথি জানি না, কিন্তু চারিদিকে বেশ জমাট অন্ধকার। দুঃখের বিষয়—এমন মধুর প্রেমের ব্যাপার—আকাশে চাঁদ ছিল না।

একটু চুপ করে আছি, যমুনা শুধাল "কি বলতে চেয়েছিলি, বল্ না। এখুনিই যে মেজবৌদি' খেতে ডাকবে।"

গম্ভীরভাবে বললাম "বলাটা কিন্তু তোকে উচিত নয়।"

যমুনার আগ্রহ বোধ হয় আরও শতগুণ বেড়ে গেল। বললে "বল্না—আচ্ছা মেয়ে যা হোক্।"

বললাম "লোকটাকে ভাল ক'রে লক্ষ্য করলাম। লোকটা কিন্তু প্রেমিক।"

শুধাল "তার মানে কি ?"

নিজের মনেই বলে যেতে লাগ্‌লাম—"চোখের মধ্যে একটা নিবিড় আকুলতা রয়েছে—যেন কিসের ভাবে বিভোর।"

বললে "একটু স্পষ্ট করে বল্ ভাই—কি সব বলছিস্ ?"

বললাম "আচ্ছা, দু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভেবে ঠিক জবাব দে ত।"

শুধাল "কি ?"

শুধালাম "তোদের বাড়ী এলে লোকটা কি তোকেই খালি দেখতে চায় ?"

বললে "তা আমি কি জানি ?"

শুধালাম "লক্ষ্য করিস্ নি ?"

বললে "আমি কি ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি না কি ?"

বললাম "সেকি কথা ? প্রেমে পাগল হয়েছিস্, অথচ মুখের দিকে চেয়ে দেখিস্ না ?"

বললে "সে ত আড়াল থেকে।"

বললাম "সেই কথাই ত বলছি। আড়াল থেকে যখন দেখিস্, তখন এটা লক্ষ্য করেছিস্ কি—যে তার চোখ দু'টোও চারিদেকে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে ?"

বললে "না ভাই, সেরকম কিছু লক্ষ্য করি নি। দাদার সঙ্গেই ত খালি গল্প করে।"

গম্ভীরভাবে "হুঁ" বলে চুপ করে রইলাম।

আকুলভাবে শুধাল "কি ভাই—বল্না স্পষ্ট করে ?"

বললাম "যমুনা-সুন্দরি। আমি তোমার জন্ত বিশেষ দুঃখিত। কোনও আশা নেই।"

কাতরভাবে শুধাল "এই যে বল্লি লোকটা প্রেমিক ?"

বললাম "সেইজন্যই ত কোনও আশা নেই।"—

প্রেমিক—এবং মন ধরা দিয়েছে; কোথায় তা অবশ্য আমি জানি না। কিন্তু সেই ভাবেই মন বিভোর, অন্তদিকে চাইবার ফুরসুতও নেই।"

একটু চুপ করে থেকে পরম হতাশাভরে শুধাল "সত্যি বলছিস্ ভাই ?"

বললাম "আমি যা বুঝেছি, তাই বললাম। আমার ভুলও ত হ'তে পারে।"

"ভুল ত তোর সহজে হয় না"—এই বলে যমুনা ছাদের এককোণে বসে পড়ল। আমিও বস্‌লাম পাশে।

শুধালাম "কি একেবারে বসে পড়লি যে ?"

যমুনা খানিকক্ষণ কোনও কথা কইলে না। একটু পরে এক হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে মাথাটা রাখল আমার কাঁধের উপরে। ঠাট্টা করে বললাম "কি রে কাঁদতে সুরু করলি নাকি ?"

সত্যিই যে যমুনার চোখদিয়ে জল পড়ছিল, অন্ধকারে আমি তা মোটেই টের পাইনি। তা হলে হয় ত ও প্রশ্ন করতাম না। আমার কথা শুনে আমাকে আরও একটু জড়িয়ে ধরে ভাঙ্গা গলায় বললে—"কি হ'বে ভাই ?"

অবাক্ হ'লাম। এ ব্যাপার নিয়ে মানুষ যে সত্যিই কাঁদতে পারে—এ ধারণাও আমার তখন ছিল না।

বললাম "আরে, সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেললি ? এমন পাগল ত' দেখিনি।"

যমুনা কোনও কথা কইলে না—খালি আঁচল দিয়ে দু'চোখ পুছতে লাগলো। অপ্রস্তুত বোধ হ'ল।

বললাম "আমি এতক্ষণ তোর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। আমি কি সত্যিই অত বুঝি নাকি—কি বোকা তুই।"

একটু সামলে নিয়ে যমুনা বললে—

"না ভাই, তুই ঠিকই বলেছিস্। তোর কথা আমার মনে লেগেছে। সত্যিই আমি বোকা—নইলে মিথ্যে নিয়ে এমন পাগল হই।"

•

যমুনার এ ব্যাধি আর বেশীদিন ছিল না, কিছুদিনের মধ্যেই সেরে গেল—আমার কথার ফলে অবশ্য নয়, সে লোকটাই, যমুনার সঙ্গে আমার ছাদে কথাবার্ত্তা হওয়ার কিছুদিন পর থেকে হঠাৎ যমুনাদের বাড়ী আসা-যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলে, কারণ যমুনা কিছুই বুঝতে পারেনি। মেজদার বিলেত যাওয়ার দু' তিন মাস আগে একদিন—যমুনা তখন সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত—হাঁসতে হাঁসতে আমার কাছে এসে বললে "তুই ঠিকই বলেছিলি ভাই।"

শুধালাম "কি ঠিক বলেছিলাম ?"

বললে "দাদার সেই বন্ধু, সেই যে লোকটা, নাম রমেন—"

বললাম "বুঝেছি, যার জন্ম একদিন কেঁদে ভাসিয়েছিলে গো—"

বললে "সে লোকটা বাপ-মার মতের বিরুদ্ধে একটি মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে এবং পালিয়ে গিয়ে তাকে নাকি বিয়ে করেছে।"

বললাম "বা—বা, সত্যিই বাহাদুর ছেলে তা হ'লে।"

বললাম "শুনলাম নাকি ঐ মেয়েটার সঙ্গে ওর অনেকদিন থেকেই প্রেম ছিল।"

বললাম "বটে, লোকটার তা হ'লে প্রাণের জোর আছে বলতে হ'বে।"

বললে "সে যাই হোক, তুই এক নজরে কি করে বুঝলি?"

কথাটা সত্যিই প্রথমে ধরতে পারিনি। এবং ছাদে যমুনার সঙ্গে সেদিনের কথাবার্ত্তা ভাল মনেও ছিল না।

শুধালাম "কি বুঝলাম এক নজরে?"

বললে "কেন, একনজর দেখেই ত বলেছিলি—

ওর মন ধরা পড়েছে অন্য জায়গায়, কোনও আশা নেই।"

"ও সেই কথা" বলে হেসে উঠলাম। যমুনা কিন্তু নাছোড়বান্দা।

আবার শুধাল "সত্যি ভাই বল্‌না কি করে বুঝলি?"

বললাম "তোর মতন ত আমার চোখে প্রেমের ছানি পড়ে নি, তাই সোজা জিনিষ সোজাই দেখতে পাই।"

বললে "ও সব চালাকীর কথা রাখ। প্রেমে তুমি কখনও পড়নি এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না। প্রেমের অ-আ-ক-খ থেকে জানতে ত কিছু বাকি নাই দেখি, গভীর জলের মাছ, তাই চেপে থাকতে জান।"

এ কথা নিয়ে যমুনার সঙ্গে তর্ক ক'রে কিছু লাভ নাই, তাই কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু প্রেম জিনিষটা প্রাণ দিয়ে সত্যিই তখন পর্য্যন্ত আমি উপলব্ধি করিনি। প্রেমের প্রতি আমার একটা বিশেষ রকম কৌতূহল ছিল—একথা চুপি চুপি স্বীকার করতে রাজী আছি। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এমন একটা লোকও পাইনি, যার চিন্তায় অন্ততঃ কিছুক্ষণ সরস মনে মশগুল হয়ে থাকতে পারি। বাইরের যত পুরুষই দেখি, কাউকেই যেন ষোল আনা নিতে পারি না—হয় বাইরের, নয় অন্তরের এমন একটা কিছু পাই যা আমাকে পীড়া দেয়, মন হয়ে যায় সঙ্কুচিত। হয়ত আমারই মনের দৈন্য! অনেক সময় সে কথাও যে ভাবি না, তা নয়।

যমুনা সত্যিই অভিমানভরে বললে "আমার কাছে গোপন করে চল, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। বেশ, এবার থেকে আমিও কিছু বলব না।"

কিন্তু যমুনার এ সঙ্কল্প মাসখানেক পরেই ভেসে গেল—একদিন আমাদের বাড়ীতে এসে আকুলভাবে বললে "এবার কিন্তু সত্যি সত্যিই মরেছি ভাই।"

ওর দাদার ইতিমধ্যেই বিয়ে হয়েছিল এবং এবারকার লোকটী ওর নতুন বৌদির ভাই—বিদেশে কোন অফিসে চাকরী করে। দিন পনেরোর জন্য কলকাতায় এসে ওদের বাড়ীতেই আছে। এবার আর আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখা নয়, যমুনার সঙ্গে নাকি আলাপও জমেছে বেশ।

বললাম "ভালই ত, বল ত ঘটকালী করি।"

বললে "যদি পারিস্ ভাই, চিরকাল তোর কেনা গোলাম হ'য়ে থাকব।"

বললাম "গোলাম তুমি হবে কি ক'রে—বড়জোর বিবি হ'তে পার। যে লোকটী গোলাম হ'তে পারে তার গোলাম হওয়ার যোগ্যতা আছে কিনা দেখি আগে।"

[ক্রমশঃ

স্বাধীন ভারত

[কোরাস]

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

স্বাধীন ভারত, স্বাধীন ভারত, দূরে নও তুমি জানি যে জানি,
অতি নিকটের তাইতো তোমায় পাঠাই প্রাণের প্রণামখানি।
দু'শো বছরের বিভেদ-যজ্ঞে হ'য়ে গেল কত হৃদয়-বলি,
বারুদে-অস্ত্রে শাস্ত্রে শাস্ত্রে আগুন উঠেছে ঝলমলি,
তৃণপল্লবে কান পেতে আজ শুনি সুনিবিড় শান্তি বাণী;
স্বাধীন ভারত স্বাধীন ভারত দূরে নও তুমি জানি যে জানি।

কত মার খেয়ে ফুলের শিশুরা জ্বেলেছে নীরবে আপন চিতা,
লোহার শিকলে বাঁধা প'ড়ে হায় কেঁদেছ তুমি যে অনাদৃতা।
শ্বেত দস্যুর ছিলানো বপুর পেষণে পিষ্ট হ'য়েছে মাটি,
স্বরাজ-সমরে এসে ভিন্-রাজ-গুলি মেরে লুটে নিয়েছে লাঠি।
দু'শো বছরের সেদিন অতীত, পাঞ্চজন্যে শুনি যে বাণী;
স্বাধীন ভারত স্বাধীন ভারত, দূরে নও তুমি জানি যে জানি।

ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

কায়দে আজাম জিন্না বলেন, ভারতবর্ষে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ বটে কিন্তু তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর কর্তৃত্বাধীনে কখনই বাস করিবে না। হিন্দুর কর্তৃত্বাধীনে বসবাস করার চেয়ে গৌরাঙ্গচরণে চিরাশ্রয় গ্রহণ প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ। মিষ্টার জিন্না বৈষ্ণব না হইয়াও গৌরাঙ্গচরণে আত্মসমর্পণের যে বাসনা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অভিনব বটে! জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ—একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্য্যন্ত অধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, আ[illegible]তের শ্রেষ্ঠ নেতা পরাধীনতার শৃঙ্খলকে গৌরবমণ্ডিত মহামূল্য অলঙ্কার জ্ঞানে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছেন। স্বীকার করি, হিন্দু শয়তান, বিধর্ম্মী, কাফের, মুসলমানবিদ্বেষী; এ সবই সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াও প্রশ্ন করিতেছি, তবু গৌরাঙ্গ ভাল কিসে? হিন্দু যদি এ-দেশ শাসনও করে, সে কি দেশের সমৃদ্ধি, দেশের ধনসম্পদ ছ' হাজার মাইল দূরবর্ত্তী 'পিত্রালয়' অথবা 'মাত্রালয়ে' লইয়া যাইতে পারিবে? তাহার (হিন্দুর) এইরূপ কোন পিত্রালয়, মাত্রালয় অথবা শ্বশুরালয় ভারতবর্ষের বাহিরে আছে কি? কায়দে আজাম কি বলিবেন, জানি না, পৃথিবীর লোক একবাক্যে স্বীকার করিবে যে, হিন্দুস্থানের বাহিরে হিন্দুর এক ইঞ্চি ভূমি, এক তিল স্বার্থও নাই। হিন্দুর হিন্দুস্থানই ঘর, হিন্দুস্থানই তাহার স্বর্গ। ইহকালেও হিন্দুস্থান, পরকালেও হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানের মাটিতেই হিন্দুর জন্ম এবং হিন্দুস্থানের অগ্নিতেই তাহার ইহকালের অবসান। হিন্দু যত্তপি হিন্দুস্থান শাসন ও শোষণ করে, তাহা হইলেও হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের দ্বারাই তাহার শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতে হইবে এবং হিন্দুস্থানে শোষিত অর্থ হিন্দুস্থানেই ব্যয় করিতে হইবে। 'গতিরন্যথা' নাই।

ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাটদিগের রাজত্বকালের ইতিহাস কায়দে আজমের জানা আছে, এরূপ আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়। মুঘলগণ হিন্দুস্থানের অধিবাসী নহেন; অন্য দেশ হইতে আসিয়া এই দেশ বহু শত বর্ষ ধরিয়া 'শাসন ও শোষণ' করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিচরণক্ষেত্র এই হিন্দুস্থানের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুস্থানের রাজস্ব হিন্দুস্থানেই ব্যয়িত হইত; হিন্দুস্থানের শাসন পরিচালনে হিন্দুস্থানের অধিবাসিগণেরই একাধিপত্য ছিল। বোধ করি এ কথাটা না বলিলেও চলে যে, মুঘলগণ হিন্দুস্থানের অর্থ হিন্দুস্থানে ব্যয় করিতেন বলিয়াই হিন্দুস্থানের সমৃদ্ধির অপহ্নব হয় নাই। মুঘলদিগের দানে ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ হইয়াছিল এবং আজ পাঁচ শত বর্ষ অতীত হইলেও সেদিনের যে ধ্বংসাবশেষ আজও বিত্তমান রহিয়াছে তাহাতে জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুস্থানের অধিবাসী মাত্রেই গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিয়া থাকে। শাজাহাঁ বাদশার অমর কীর্ত্তি তুষারধবল মর্ম্মরাভ্র তাজমহলকে মুঘল বা মুসলমানের সম্পত্তি বলিয়া মনে করে এমন গোঁড়া হিন্দুর জন্ম ভারতবর্ষে হইয়াছে বলিয়া আজও ত শুনি নাই। তাজমহল যাঁহারই পরিকল্পনা হৌক না কেন, তাঁহার গাত্রচর্ম্ম যেমনই হৌক না কেন, তাঁহার আচরিতধর্ম্ম যাহাই হৌক না কেন, হিন্দুস্থানকেই তিনি সমৃদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছেন। তাজমহলাভ্যন্তরস্থ কবরখানায় হিন্দুও জুতা খুলিয়া পবিত্রচিত্তে প্রবেশ করে, মুঘলদিগের স্বধর্ম্মীয় মুসলমানগণও তাহাই করে। মুসলমানগণও কবরে মাল্যদান করেন, পাঁচশত বর্ষকাল মধ্যে যে কোটী কোটী হিন্দু ঐ কবর দর্শন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র হিন্দুও ইহার অন্যথা অথবা ব্যতিক্রম করিয়াছে, এ খবর আজ এই সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারপীড়িত নিশীথেও কেহ দিতে পারিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে রাম ভজে, কে বা আল্লা আরাধনা করে, তাহা কণ্ঠরেও মনে স্থান না দিয়া সমাধিপৃষ্ঠে পুষ্প সুগন্ধি অর্পণ করিয়াছে। ধূপ দীপ প্রজ্বালিত করিয়া প্রেমের স্বর্গ আলোড়িত ও সুরভিত করিয়াছে।

মুঘলগণ তুরস্ক হইতেই আসিয়া থাকুন অথবা তাঁহারা তুর্ক বা তাতার যাহাই হৌন, হিন্দুস্থানে বসবাস করিয়া তাঁহারা হিন্দুস্থানী হইয়াছিলেন এবং এই দেশেরই অধিবাসী হইয়া এই দেশের সঙ্গে আপন ভাগ্য বিজড়িত করিয়াছিলেন বলিয়াই এই দেশ মুঘল রাজ্যকালে পরাধীনতার গ্লানি ও বেদনা বোধ করেন নাই। মুঘলদিগের রাজত্বকালে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য। মুঘল সাম্রাজ্য অবসানের অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের ইতিহাস পরম গৌরবজনক। হিন্দুর মন্দিরে দেবার্চ্চনা, পূজারতি, মুসলমানের মসজিদে পাঁচ ওক্ত নামাজ, হিন্দুর বেদ, গীতা, চণ্ডী, মুসলমানের কোরআন্ সরিফ সাগরাভিমুখী দু'টি স্বচ্ছসলিলা নদীর মত অবাধে অব্যাহতগতিতে প্রবাহিত। নদীজলে তরঙ্গ তরঙ্গভঙ্গে সুমধুর সঙ্গীত, কোথায়ও, কোনও কারণেই ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী মুঘলদিগের সাম্রাজ্যকালে হিন্দুর জাতি, হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর বেদ, গীতা, চণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারতের শুচিতা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ ও অটুট ছিল এবং কণ্ঠরবেও 'গেল গেল' রব ও 'হায় হায়' হাহাকার উত্থিত হয় নাই। বিধর্ম্মী মুঘল রাজত্ব গ্রহণ করিতেন, রাজ্যের হিত চিন্তা করিতেন, প্রজাপালন ও প্রজানুরঞ্জন করিতেন; পক্ষান্তরে প্রজা রাজস্ব দান করিত, রাজার নিকট অভয় প্রাপ্ত হইত, আপন কর্ম্ম, আপন ধর্ম্ম পালন করিত। রাজ্য শাসন ও পরিচালনে 'ধর্ম্মের' সংঘাতের অবসর নাই, সংঘর্ষও ঘটে নাই। শোষণ ছিল না, তাই বিদ্বেষও ছিল না; পীড়ন ছিল না, তাই ঘৃণাও ছিল না, বিদ্রোহেরও সম্ভাবনা দেখা দেয় নাই।

তারপর একটা পঙ্কিল আবর্ত্তের উদ্ভব হইল। সে-দিন ধর্ম্মের বিভেদ আসিল; রাজার জাতি ও প্রজার জাতির মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর উঠিল; সাম্য ঘুচিল, রাজা উচ্চ ও প্রজা নীচ বিবেচিত হইল; সিংহাসনে বসিয়া রাজা কঠোরভাবে ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করিলেন; রাজার ধর্ম্মে উন্নতি, প্রজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে অবনতি প্রত্যক্ষীভূত হইল; বিধর্ম্মীর শিরে অতিরিক্ত করভার

চাপিল। রাজধর্ম্মে উল্লাস, ভিন্নধর্ম্মে উৎপীড়ন—প্রজা উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল এবং প্রজার উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসেই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য একখণ্ড মেঘের মত কোথায় যে ভাসিয়া গেল—নীলাকাশে তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না, ইহা ত ইতিহাসেরই অবদান।

বৃহৎ ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দেখা যাইবে যে, বাঙ্গলাদেশে হিন্দু রাজা অথবা মুসলমান নবাবদিগের আমলে সাম্প্রদায়িক সজ্ঘর্ষ কদাচ ইতিহাস কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। বাঙ্গলার ভাগ্য-রবি যে-দিন অস্তমিত হইল, যে-দিন যে-ক্ষণ হইতে বাঙ্গলার আকাশ মসীমণ্ডিত করিয়া অনন্ত অমাবস্যার রাত্রি নামিয়া আসিল, বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নরপতি সিরাজদ্দৌলাকে এক বস্ত্রে নগ্ন পদে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিতে হইল, সে-দিনও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব ছিল না। নবাবের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র সে-দিন হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুর গোপন হস্ত থাকিলেও মূলতঃ মুসলমান মিরজাফরই তাহার নায়ক। সে-দিনের অনুষ্ঠিত মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত আজও, দুইশতবর্ষ ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমানে করিতেছে; সে-দিন দুর্ম্মতিবশে বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান যে লৌহ-শৃঙ্খল সাধ করিয়া অলঙ্কারভ্রমে অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল, সেই শৃঙ্খল বিসর্পিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে নিগড়বদ্ধ করিয়াছে; আজও, এতকাল পরেও শৃঙ্খল ভাঙ্গে নাই, শৃঙ্খল-মুক্তিও ঘটে নাই।

বাঙ্গলায় হিন্দু রাজাদিগের ইতিহাসও আছে। ইতিহাস-পাঠকের ইহা অবিদিত থাকিবার কথা নহে যে, হিন্দু রাজত্বের অবসানে হিন্দুর ষড়যন্ত্রই কার্য্যকরী হইয়াছে। হিন্দুর প্রাধান্য, অতএব তাহার ধ্বংস সাধন করিতে হইবে, মুসলমান প্রজার চিত্তাকাশে এই কৃষ্ণ মেঘ কখনও উদিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা দুইটি উদাহরণ দিতেছি। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের পতনের মূলে মুসলমানের হাত ছিল না, পরন্তু হিন্দুর কেরামতিতেই হিন্দুরাজ্যের অবসান ঘটিয়াছিল। রাজা সীতারাম রায়ের ভাগ্যাকাশে হিন্দুই শনি।

যে কথাটি বুঝাইবার জন্ত আমাকে এত কথা বলিতে হইল (হয় ত না বলিলেও চলিত) তাহা এই যে, ভারতবর্ষে কোন সময়েই সম্প্রদায়-বিশেষের প্রাধান্যহেতু সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিদ্বেষের অনল প্রজ্জলিত হয় নাই। আজিকার অনলকুণ্ডোত্থিত আকাশচুম্বী শিখার পানে চাহিয়া জড় ও জীব যুগপৎ স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে। কায়েদে আজম জিন্না এই ভীষণ আতঙ্কই আজ মুসলমানের অন্তরে সূচিকাভরণের দ্বারা দৃঢ়ীভূত করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, যেহেতু হিন্দুস্থানে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য সেইহেতু হিন্দু-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। সহীদ্ সাবধান! বলা বাহুল্য সহীদগণ যথেষ্ট সাবধান হইয়াছেন, ফল যাহা হইয়াছে তাহা ত সকলেরই মালুম। অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় মালুম।

বৃটিশ দুইশত বর্ষ কাল ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছে (এখনও করিতেছে), শাসন ও শোষণ করিয়াছে (এখনও বন্ধ হয় নাই), কূটনীতিবশে কখনও হিন্দুকে আদর মুসলমানকে অনাদর করিয়াছে, কখনও হিন্দুকে দমন মুসলমানকে আস্কারা দিয়াছে। কখনও মুসলমানকে খেলাৎ দান হিন্দুকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে এবং বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত ভাগ্যচক্রের বিঘূর্ণনে ও উত্থান-পতনে একের ক্রোধ অপরের উল্লাস, একের সন্তোষ অপরের অবসাদ, একের তৃপ্তি অপরের বিক্ষোভ দেখিয়া অন্তরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছে। বিগত দুই শত বৎসরের ইতিহাস এই আলো-আঁধারের রেখাচিত্রে কত যে সহজ হইয়া আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানেও আমি দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিব। পূর্ব্ববঙ্গের এক দুষ্টবুদ্ধি শাসক মুসলমান-সম্প্রদায়কে সুয়োরাণীর সুখৈশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন। মুসলমানের উল্লাস দেখে কে? হিন্দুর ক্রোধ বোমা, পিস্তল ও বন্দুকের মুখে সুব্যক্ত হইয়াছিল। সেই যুগটি অগ্নিযুগ নামে খ্যাত ও সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপের ফলে নিখিল ভারত আতঙ্কিত হইয়াছিল। অপর উদাহরণ সাম্প্রতিকার। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসকে (হিন্দু জওহর-লালকে) দিল্লীতে বড় লাটের মন্ত্রণা-সভা গঠনে আমন্ত্রণ দিবামাত্র, মুসলমান ডাইরেক্ট এ্যাক্সন নির্দ্দেশ দিলেন। ১৬ই আগষ্ট (১৯৪৬) কলিকাতায় 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শীর্ষক নাটকের প্রথম দৃশ্য অভিনীত হইল; বীভৎসতায় অপরাজেয় পারস্যদেশাগত নাদির শাহ পরাস্ত ও ম্লান হইয়া গেল।

সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেল যে, ভারতবর্ষের বহুগুণ সংখ্যাগুরু হিন্দুর হাতে যদি শাসনবল্গা অর্পিত হয় তাহা হইলে সংখ্যালঘু মুসলমান কখনই তাহা মানিয়া লইবে না। সকল দেশে, সকল সভ্য-সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন পরিচালন করে বটে কিন্তু ভারত-বর্ষে সংখ্যাগুরু নীতি প্রবর্তিত হইলে ডাইরেক্ট এ্যাক্সন্ অথবা ১৬ই আগষ্টের পুনরভিনয় অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগিয়াছে, ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, মুসলমান হিন্দুর প্রাধান্য মান্য করিবেন না—প্রাণ যায়, ভিক্ষা মাগিবেন, সেও ভাল—তথাপি হিন্দুর প্রভাব বরদাস্ত করিবেন না, ইহা কায়েদে আজম ভারতে এবং ভারতের বাহিরে—দেশে এবং বিদেশে—এখানে ও ইংলণ্ডে শেষ কথা হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন। ভাল।

বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে মুসলমান-গণ চিরদিন সংখ্যালঘিষ্ঠ। কোন কোন প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা 'শোচনীয়' ভাবে দুর্ব্বল। সেখানে হিন্দু অত্যন্ত প্রবল। সেই সকল স্থানে হিন্দুর যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবার কোন কৌশল বা অপকৌশলই জিন্না মহাশয়ের হাতে নাই। তর্কস্থলে আমরা ধরিয়া লইতে বাধ্য যে, যে সকল প্রদেশে মুসলমানের শোচনীয় দুর্ব্বলতা সেখানে প্রবল হিন্দু তাহার খুশীমতো শাসন-যন্ত্র রচনা করিল, জিন্না-ধর্ম্মীগণ তাহাতে বাধা দিবেন কিরূপে? অত্যন্ত দুষ্টবুদ্ধি অথবা বুদ্ধিহীনতা বশে তাঁহারা বলিতে পারেন যে, সেরূপ ক্ষেত্রে 'হোস্টেজ' নীতি অবলম্বিত হইবে। যেখানে মুসলমান সংখ্যায় 'প্রবল' ও হিন্দু সংখ্যায় 'দুর্ব্বল', সেইখানে প্রতিশোধ লওয়া হইবে। সম্প্রতি এইরূপ একটা ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কলিকাতা ও নোয়াখালির পাশব বর্ব্বরতার উত্তর বিহার যখন হাতে নাতে এবং উত্তম-মধ্যম করিয়া দিল, তখন ত জিন্নাজীর

আর্তনাদ আকাশ-ভুবন ছাইয়া ফেলা ছাড়া প্রতিবিধানের কোন পথেরই নির্দ্দেশ দিতে পারিল না।

জিন্নাজী স্বীকার করুন আর নাই করুন, গণিতের তীব্র ও কঠোর সত্য স্বীকার না করিয়া কোন উপায় নাই। সংখ্যার ভার বড় ভার। পাঁচের বিরুদ্ধে একের লড়াইয়ে জয়লাভের আশা নিতান্ত মূর্খ ছাড়া কেহ করে না, পাঁচকে সম্মুখযুদ্ধে এক ঘায়েল করিতে পারে না। অতর্কিতে পিছন হইতে ছুরিকাঘাতে এক অবশ্য পাঁচকে খতম করিতে সক্ষম; কিন্তু সেটা যুদ্ধের রীতি নহে; সভ্যতাসম্মত পদ্ধতিও নহে।

অন্ধ দেশী, বিদেশী, তুর্কী, ইস্তাম্বুলি যে প্রণালীতেই কথা হোক না কেন, দেখা যাইবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট সংখ্যাল্পকে নতি স্বীকার করিতেই হইবে। এগারোর মধ্যে সাতটি প্রদেশে যাহারা সংখ্যালঘু ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সংখ্যাগুরুর সঙ্গে তাহাদিগকে সদ্ভাবে বাস করিতেই হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও যাঁহারা 'লড়কে লেঙ্গে' পাকিস্তানের ধুয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারা গণিতের গতি পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিতেছেন। বাস্তবে তাহা সম্ভব হইবে কি ?

বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধেও কি তাঁহার ঐ মত ? বাঙ্গলার হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাহারা ত' জিন্না-নীতি অনুসরণ করিয়া অবশ্যই বলিতে পারে যে, বাঙ্গলার সংখ্যালঘু হিন্দু সংখ্যাগুরু মুসলমানের প্রাধান্য মান্য করিবে না। কেনই বা করিবে ? জিন্না সাহেব নিজেই যখন ভারতের সংখ্যাগুরুকে নস্যাৎ করিতে চাহিতেছেন, তখন বাঙ্গলার সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগুরুর 'পদপল্লবমুদারম্' করিয়া রাখিবেন কিরূপে ? 'নিজের বেলা আঁটিসাঁটি পরের বেলা দাঁত খামাটি,' ছেলেখেলায় চলে বটে, রাজনীতিতেও কি তাহাই চালু করিতে হইবে ?

বাংলায় যাহারা সংখ্যালঘু তাহাদের মামলাটা আরও সঙ্গীন। বাঙ্গলার সংখ্যালঘু হিন্দু শতকরা ৪৬, সংখ্যাগুরু মুসলমান ৫৪; শতকরা ৮টির তারতম্য। তারপর বঙ্গদেশের রাজস্বের হিসাবটা কিরূপ ? ঐ সংখ্যালঘু হিন্দুর দেয় রাজস্বের পরিমাণ, শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ টাকা। অর্থাৎ যাঁহারা সংখ্যাগুরু বলিয়া বাঙ্গলার মসনদে মোকররী-মৌরসী পাট্টা-কবুলতী লইয়া বসিয়া আছেন, বসিয়া থাকিবার সুখস্বপ্নে মশগুল, তাঁহারা দয়া করিয়া শতকরা কুড়িটি টাকা রাজস্ব-তহবিলে দেন-কি-দেন-না, আর যে সংখ্যালঘু হিন্দুর উপর চিরকালের জন্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার দুরাশা পোষণ করিতেছেন, একশ' টাকার মধ্যে পঁচাত্তর হইতে আশী টাকা দেয় তাহারা। সোজা কথায়, তাহাদের শীল, তাহাদেরই নোড়া, আবার ভাঙ্গিতে হইবে তাহাদেরই দাঁতের গোড়া।

শিক্ষায় দীক্ষায়, কৃষ্টিতে সংস্কৃতিতে বাঙ্গলার সংখ্যাগুরু ও সংখ্যাল ঘুর তুলনা আমি করি না; ইচ্ছা করিয়াই করিব না বিদ্বেষ সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। ইতিহাস ও গণিত সাহায্যেই আমি এক নীতির দুই বিধানের অসামঞ্জস্য বিবৃত করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে চাহি। সংখ্যার গুরুত্ব যদি জাহান্নমে প্রেরণ করিতে হয় তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমাধি রচনা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠকে অধঃপাতে প্রেরণ করিয়া ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বাঙ্গলার সংখ্যাগরিষ্ঠকে স্বর্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখিতে হইবে, ইহাকে নীতি বলে না দুর্নীতি বলে ?

ভারতের সেরা নেতা কায়েদে আজম বাঙ্গলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বিদ্রোহে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন ? ন্যায়-নীতি, সত্যের পক্ষ ? না—

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

শ্রীকুমুদনাথ দাস

[সাহিত্যের পথে]

'সহিত' শব্দ হইতে 'সাহিত্য' হইয়াছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানবের সঙ্গে মানবকে সহিত করা (to extend our contact with our fellowmen)। আর্টের উদ্দেশ্যও ইহাই।* মানবে মানবে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী-ভাব বিস্তারই সাহিত্য ও আর্টের চরম লক্ষ্য।

*

সাহিত্য মানবজীবনের দর্পণস্বরূপ। মানবের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা দর্পণে প্রতিফলিত বিম্বের ন্যায় সাহিত্যে প্রতিভাত হয়। সাহিত্যপাঠে মানব জীবনে কি দেখিয়াছে, কি শিখিয়াছে, যে সমস্ত বিষয়ে আমরা সকলেই ভাবি, সেই সমস্ত বিষয়ে কি ভাবিয়াছে সব জানিতে পারি। It 'makes us partakers in a life large, richer and more varied than we ourselves can ever know of our own individual knowledge.'

*

অ্যারিষ্টটলের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ডি কুয়েন্সী দুই প্রকার সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন—'Literature of knowledge' ও 'Literature of power'। বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে গ্রন্থ 'Literature of knowledge'-এর অন্তর্গত। নূতন গবেষণার সঙ্গে এই সব গ্রন্থে অনেক জিনিষ নূতন করিয়া লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু Literature of power মানব-হৃদয়ের ইতিহাস। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানবের মূল প্রবৃত্তিগুলির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং যে সব গ্রন্থে এই সব প্রবৃত্তির বর্ণনা আছে সেগুলি নূতন করিয়া লেখার প্রয়োজন নাই। Howevet old in years, they remain "as fresh

* "It (art) is a mean's of union among men, joining them together in the same feelings"—Tostoy.

and vital in their human interest as in the days when they were written." যাটি সাহিত্য গ্রন্থ বলিতে এইসব গ্রন্থই বুঝায়।

মর্লি বলিয়াছেন, 'Literature consists of all the books —and they are not many—where moral truth and human passion are touched with a certain largeness sanity and attraction of form'.

সাহিত্যের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি* 'Dans l'art d'intersse consiste l'art d'e-crire'। ধর্ম্মোপদেষ্টা সদুপদেশ দান করেন এবং সুধী ব্যক্তি জ্ঞান বিতরণ করেন, কিন্তু সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য তাহা নয়। সাহিত্যিক মানব-হৃদয়, সংসার সমাজ, ও প্রকৃতির এমন চিত্র অঙ্কন করেন যাহাতে সকলেই আনন্দ পায়। যে সাহিত্য আনন্দ দান করিতে পারে না, তাহা সাহিত্য নামের যোগ্য নয়। তবে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যে মানব-হৃদয়-বিশ্লেষণে এমন জ্ঞান এবং পাপপুণ্যের চিত্রস্বরূপ উপদেশ লাভ করা যায় যাহা দ্বারা জীবন অনেকটা প্রভাবিত; হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কে নিলওয়ার্থ, ফাউষ্ট, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে যেমন অসাধারণ আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি মানব-প্রকৃতির গূঢ় পরিচয় ও পাপপুণ্যের পরিণাম-দর্শনে সদুপদেশ লাভ করা যায়।

কার্লাইল বলিয়াছেন, "সাহিত্য দিন দিন আমাদের উপাসনা-মন্দির, আমাদের শাসন-পরিষদ, আমাদের সমাজতন্ত্র, আমাদের সর্ব্বস্ব হইতে চলিয়াছে।"

"The way to be original is to be healthy." যে সাহিত্যিক তাঁহার ভাব, ভাষা অথবা উভয়ের সংমিশ্রণে বিশেষ নূতন কিছু দিয়া সাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারেন, সাহিত্যজগতে তাঁহার নাম স্থায়ী হইতে পারে না। এমার্সন বলিয়াছেন, 'অনুকরণ আত্মহত্যা'। মিল্টন মধুসূদনের ধরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য এবং এ যুগে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষার অনুকরণে কবিতা লিখিতে অনেকে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং এখনও পাইতেছেন, কিন্তু কাহারও সেরূপ নাম হয় নাই। শুধু অনুকরণ করিয়া কেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। নিজস্ব কিছু থাকা চাই।

কোন প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক অথবা অধ্যাপকের শিষ্য বলিয়াই পরিচিত হওয়া গৌরবের বিষয়, কিন্তু কোনও বিশিষ্ট লোকের—তিনি যতই প্রথিতযশাঃ হউন না কেন—শিষ্য বলিয়া পরিচিত হওয়া আদৌ গৌরবের বিষয় নহে। ইহাতে প্রমাণিত হয় তাঁহার রচনার মৌলিকতা নাই।

সাহিত্য-রথীরা আসেন ধ্বংস করিতে নয়, পূর্ণ করিতে—['not to destroy, but to fulfil']।

"Take all that is given, whether wealth
Or language or love; nothing comes amiss;
A good digestion turneth all to health."

* 'যাদ: কাব্যার্থসম্ভেদাদাত্মানন্দসমুদ্ভবঃ রস ইত্যুচ্যতে'।

এ-যুগে বিভিন্নদেশীয় লোকের মধ্যে যেমন মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদান চলিতেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্ব্বে এমন আর হয় নাই। এমন এক যুগ ছিল যখন প্রত্যেক জাতীয় লোক কেবল নিজেদের আদর্শকেই ভাল বলিয়া ভাবিত, অন্য-জাতীয় লোকের নিকট যে কিছু গ্রহণ করার আছে তাহা মনে করিত না। এ-যুগে সে ভাবটা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেক জাতীয় লোকের নিকটই কিছু শিখিবার আছে, এইরূপ চিন্তার ফলে এখন বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও আদর্শের বিনিময় চলিতেছে। বিভিন্ন দেশীয় ভাবের রং মিলিয়া প্রত্যেক সাহিত্যে একটা বিচিত্র ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হইতেছে। Nationalism এর মধ্যে এইরূপ Internationalism মানুষের মনকে ক্রমেই উদার ও মহান্ করিতেছে।

ইংরেজীতে প্রবচন আছে, 'যাহার শুধু একখানি বই পড়া আছে তাহার হাত হইতে ভগবান্ আমাকে রক্ষা করুন।' এ যুগে শুধু একখানি বই নয়, একটা সাহিত্যের সহিত পরিচয় যথেষ্ট নয়। গ্যেটে বলিয়াছেন, 'বিদেশীয় ভাষায় যাঁহার জ্ঞান নাই, মাতৃভাষায়ও তিনি অজ্ঞ'।'

বিজ্ঞানের ন্যায় সাহিত্যও দেশকালাতীত।

মানুষের ভিতরে এক জগৎ—বাহিরে এক জগৎ। উভয় জগতে দিবানিশি কত আলোছায়া রূপ-রঙের খেলা হইতেছে। বাহিরের ও ভিতরের এই সব খেলাই সাহিত্যের মালমসলা। যেখানে তারকাখচিত নীল আকাশ, হাস্যলাস্যময়ী ধরণী, কলস্বনা তটিনী, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, শ্রবণ-নয়নানন্দদায়িনী নির্ঝরিণী, ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্র বা ফল-ফুল-তরুলতা শোভিত পল্লীগ্রাম, যেখানে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী বা অমানিশার আবির্ভাব হয়, যেখানে সুখ দুঃখ-প্রেম-প্রীতি-সম্পন্ন মানব-হৃদয় আছে, সেখানেই সাহিত্যিক তাঁহার রচনার উপাদান পাইবেন। 'The poet can never have far to seek for a subject'।

এ যুগের সাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের স্থান নাই—It is the human element that counts in literature now।

অনেকে পরিবর্ত্তন চায় না। কিন্তু পরিবর্ত্তনের ফলেই যেমন প্রকৃতির তেমনি সাহিত্যের রাজ্যে অনন্ত সুষমার সৃষ্টি। Literature fulfils herself in many ways lest one good custom should corrupt the world.

'ক্লাসিক' ও 'রোমান্টিক' সাহিত্যে কি প্রভেদ তৎসম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। Stendhal এর মতে উৎকৃষ্ট আর্ট প্রথম অবস্থায় রোমান্টিকই থাকে, অধিক পরিচিতির সহিত উহা ক্লাসিক হইয়া যায়। "Romanticism is the art of presenting to people the literary works which in the actual state of their habits and beliefs, are capable of giving them the greatest possible pleasuri; Classicism, on the contrary, if presenting them with that which gave the greatest possible pleasure to their grandfathers." কিন্তু একদল লেখকের মতে ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্যে মূলগত পার্থক্য। ক্লাসিক সাহিত্যে যুক্তি ও শৃঙ্খলা

প্রিয়তা, রোমান্টিক সাহিত্যে স্বাভাবিক অনুভূতি ও কল্পনার প্রাধান্য; ক্লাসিক প্রচলিত; এবং রোমান্টিক স্বাধীন চিন্তার পথ ধরিয়া চলে। দুইয়ের রচনাভঙ্গীও স্বতন্ত্র।*

ইউরোপীয় সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট যুগের সহিত 'রোমান্টিক' সংজ্ঞাটি যুক্ত হইলেও, ইহার লক্ষণসমূহ সর্ব্বযুগে বিদ্যমান। সেক্সপীয়ার ও মিণ্টন রোমান্টিক যুগের না হইয়াও romanticists par excellence।

রচনার সৌন্দর্য্য স্বাভাবিকতা—যেখানে যে কথা যেভাবে বলা উচিত তাহা বলা। শুধু পাণ্ডিত্য-প্রদর্শন, কতকগুলি সুন্দর জিনিষ যেমন-তেমন ভাবে জোড়া লাগাইয়া দেওয়ায় রচনার উৎকর্ষ হইতে পারে না। রচনার শব্দযোজনার মধ্যে স্বাভাবিকতা ও ভাবসংযোগের মধ্যে একটা অখণ্ড সত্তা থাকিবেই*। তাহা না থাকিলে সমস্ত রচনা কেমন এলোমেলো লাগে। যে রচনায় স্বাভাবিকতা আছে, তাহা স্বভাবের উদ্যানে প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সুন্দর ও মনোরম। যে রচনায় স্বাভাবিকতা নাই তাহা কাগজের ফুলের মত। তাহার সৌন্দর্য্য ও প্রাণ নাই।

যেমন অলঙ্কার-ব্যবহারে রমণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনি অলঙ্কার-প্রয়োগে রচনার সৌন্দর্য্য অনেক সময় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কারের দিকে মানব-হৃদয়ের একটা টান আছে। এ টান হইতে ভাষায় অলঙ্কারের সৃষ্টি। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকগণ অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়াছেন। কালিদাসের রচনার অনুপম সৌন্দর্য্য অলঙ্কার-প্রয়োগে। অনেক সময় যেমন 'Beauty unadorned is adorned the most'—সেই সৌন্দর্য্যই সব চেয়ে মনোহর, যাহা অলঙ্কৃত নহে—তেমনি সেই রচনাই খুব ভাল যাহার মধ্যে বেশী অলঙ্কার প্রয়োগ নাই। 'কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।' অন্যান্য যুগের লেখকগণের তুলনায় এ যুগের লেককগণের (বিশেষতঃ ইংরেজ লেখকগণের) অলঙ্কারের দিকে ঝোঁক কম। তাঁহারা জটিল অলঙ্কৃত ভাষা অপেক্ষা সরল অনাড়ম্বর গতিশীল ভাষার পক্ষপাতী।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা।' কিন্তু এ যুগে অনেক রচনা হইতে লেখক কি বলিতে চান, ভাল করিয়া বুঝা যায় না—সব যেন ভাসা-ভাসা, শুধু কুহেলিকা মাত্র—কিছুদূর পর্য্যন্ত বোধগম্য, আর সব অবোধ্য। এরূপ রচনার কি যে সার্থকতা বুঝা শক্ত। লোককে বুঝাইবার জন্যই লেখা—সেই লেখাই যদি লোকে না বুঝিল, তাহার প্রয়োজনীয়তা কি?

'The test of art is infection', যে ভাব হইতে লেখক কিছু রচনা করিয়াছেন তাহাই যদি তিনি পাঠকের মধ্যে সৃষ্টি করিতে পারেন, পাঠকের যদি ধারণা হয় যে—ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল ছিল, লেখক তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন, তবেই তাঁহার চরম কৃতিত্ব। খাঁটি আর্ট লেখক ও পাঠকের মধ্যে পার্থক্য দূর করিয়া দেয়।

মাসিক সাহিত্যে হঠাৎ মাঝে মাঝে দু'একজন অখ্যাতনামা লেখকের খুব উঁচুদরের—দু'একটা কবিতা বাহির হয়। তাঁদের রচনা ঘন ঘন প্রকাশিত হয় না বলিয়া সকলের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়ে না। বাংলা কবিতার যিনি ভবিষ্যতে চয়নিকা বা কোষগ্রন্থ প্রকাশ করিবেন, তাঁহার দেখা উচিত যে এই সব অখ্যাতনামা লেখকের কোন ভাল কবিতা বা গান তাঁহাদের সঙ্কলন হইতে বাদ না পড়ে। কেহ যদি একটিমাত্র উঁচুদরের কবিতা বা গানের দ্বারাও বঙ্গসাহিত্য পরিপুষ্ট করেন, তিনি সমগ্র বঙ্গবাসীর সমাদরের পাত্র। নির্জ্জন অরণ্যে অনেক সুন্দর সুগন্ধ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এই সব অজ্ঞাত অখ্যাতনামা লেখকের রচনা ভাল করিয়া খোঁজ করিলে যে দু'একটা ভাল জিনিষ বাহির না হইবে তাহা নহে।

ইংরেজেরা এ বিষয়ে খুব সাবধান; খ্যাতনামা হউক বা অখ্যাতনামা হউক, কোন লেখকের কোন ভাল লেখা একবার বাহির হইয়া গেলে আদর করিয়া রাখিতে জানে। Chamber's 'Cyclopaedia of English Literature'-এ ছোটবড় খ্যাত অখ্যাত লেখকের পরিচয় আমরা পাই। আমরা সেইরূপ গুণের সমাদর করিতে জানি না। ফলে অতীত ও বর্ত্তমানের অনেক ভাল জিনিষ আমাদের নিকট অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

সেবাই সেবকের পুরস্কার—Literature is its own reward। অর্থ ও যশোলাভ হইলে সাহিত্যিকের মনে আনন্দ হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সাহিত্যে নূতন কিছু অবদান বা সৃষ্টি করিতে পারিলে যে আনন্দ হয়, তাহার সঙ্গে অন্য আনন্দের তুলনা হয় না।

> 'There is a pleasure in poetic pains
> Which none but poets know.

অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জীবৎকালে কোন আদরই হয় নাই। পরে তাঁহাদের রচনার সমাদর হইয়াছে। যাঁহারা আদর্শ সাহিত্যসেবী, তাঁহাদের যশের আকাঙ্ক্ষা বা অর্থের লোভ নাই। তাঁহারা একাগ্রচিত্তে সাহিত্যসেবা করিয়া যান। ভাল কিছু করাই তাঁহাদের লক্ষ্য, অন্য চিন্তা তাঁদের চিত্তে স্থান পায় না। যশ বা অর্থের জন্য যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদের রচনা অনেক সময় তত উঁচুদরের হয় না। যশ বা অর্থলিপ্সা তাঁদের মধ্যে এত প্রবল যে, একাগ্র সাধনার ভাবটা তাঁদের ভিতর হইতে চলিয়া যায় এবং তাঁহারা তাড়াতাড়ি যা'-তা লিখিয়া অর্থ বা খ্যাতিলাভ করিতে চান। ফলে তাঁহাদের রচনা নিম্নশ্রেণীর হইয়া পড়ে। One cannot serve Literature and Mammon.*

প্লেটোর মতে—স্থায়ী উঁচুদরের সাহিত্যের ভিত্তি লেখকের আন্তরিকতা—'entire sincerity to oneself, to one's own

* Vide 'what is Art ? p 153,

* "To give the phrase, the sentence, the structural member, the entire composition, song, or essay, a similar unity with its subject and with it self :—she is in the right way when it tends towards that"—Pater.

* cf. Professionalism is the first condition of the diffusion of false, counterfit art—Tolstoy.

experience of life, and to the truth of things as one is privileged to see it." প্রত্যেক লেখকের কাছেই আমরা অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি বা অভিজ্ঞতা আশা করিতে পারি না। কিন্তু তিনি যাহা লিখিবেন তাহা তাঁহার খাঁটি জিনিষ হওয়া চাই।

"The one great quality which a work of art truly contagious in its sincerity"—Tostoy.

Elegyকে মনোহর রূপ দিতে গ্রেব ১২ বৎসর লাগিয়াছিল; টলষ্টয় একুশ পৃষ্ঠার গল্প ১০১ বার সংশোধন করিয়াছিলেন; এবং কথিত আছে এইচ্ জি, ওয়েলস তাঁহার "History of the World" চৌদ্দবার লিখিয়াছিলেন। আর বাংলা দেশের উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিকেরা কালি না শুকাতেই রচনা প্রকাশিত করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠেন। They should know that no creation is ever easy. Jove has severe pains and fire-flames in the head out of which an armed Pallas is ever struggling.

রচনার ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত—সাধুভাষা না কথিত ভাষা ইহা লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একটা মল্লযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পোপ এবং তাঁহার সমসাময়িক কবিবৃন্দ মার্জ্জিত ভাষায় কবিতা লিখিতেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই ভাষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে মার্জ্জিত ভাষা কৃত্রিমতায় পূর্ণ। লোকে দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা প্রয়োগ করে, তাহাই গদ্য ও পদ্য রচনার অবলম্বন হওয়া বাঞ্ছনীয়, এই ছিল তাঁর মত এবং এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি অনেক কবিতা লেখেন। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা প্রয়োগ করায় তাঁহার অনেক কবিতা গদ্যের মত হইয়া গিয়াছে, এবং 'Tintern Abbey,' She was a phantom of Delight' প্রভৃতি কবিতায় তিনি স্থানে স্থানে যে মার্জ্জিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সমালোচকগণের মতে সেই কবিতাগুলির সৌন্দর্য্য। তবু ওয়ার্ডসওয়ার্থের theoryতে যথেষ্ট সত্য আছে। কৃষকের ভাষায়ও উঁচুদরের রচনা সম্ভবপর—বার্ণসের গান ও কবিতাগুলি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম কথিত ভাষার প্রয়োগ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, "যে ভাষা সমস্ত বাঙ্গালীর বোধগম্য ও সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিয়াছিলেন। * * আমি বলিতেছি না যে 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্য ও বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে উন্নত ভাব সকল সম্যক্ পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল, যে বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত ও প্রচলিত তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়। সে রচনা সুন্দর হয় এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এ কথা জানিতে পারা বাঙ্গালীর পক্ষে অল্প লাভ নহে। এ কথা জানিতে পারার পর হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে। * * * প্যারীচাঁদ মিত্র আদর্শ গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার কীর্ত্তি।" বঙ্কিম সাধু ও কথিত ভাষার সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব রচনাভঙ্গি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। রবীন্দ্র-নাথের কথায় "আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মত এক তারে বাঁধা ছিল; কেবল সহজ সুরে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ত্তন করিবার উপযোগী ছিল, বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন, পূর্ব্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়াছে।" এ যুগের বাংলা লেখকগণের ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত। কলিকাতার কথিত ভাষা ইহাদের হস্তে অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষা বঙ্কিমের ধরণে, কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সের ভাষা আধুনিক ছাঁচ, যাহার অন্যতম প্রবর্ত্তকও তিনি। মোটামুটিভাবে ছাঁচের সৃষ্টি ১৯১৪ সালে 'সবুজ পত্রে' যাহা কিছুদিন চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়।

রচনাভঙ্গী হইতে লেখককে চেনা যায়—'Le style est l' homme meme' ।

সংস্কৃত হইতে বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা উচিত, কিন্তু সংস্কৃতের নিকট বাংলা ভাষার ঋণ বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের অভিধান দৃষ্টে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শব্দের এইরূপ হার নির্ণয় করিয়াছেন :—

তৎসম (বা সংস্কৃত) শব্দ......৪৪·০০
তদ্ভব (সংস্কৃত হইতে জাত) ও দেশী শব্দ...৫১·৪৫
বিদেশী (পারসী ও আরবী)...৩·৩০
অন্য বিদেশী ... ১·২৫

চোখে যাহা দেখা যায় না তাহাই দেখিতে, কানে যাহা শোনা যায় না তাহাই শুনিতে, স্বপ্নের বিষয়কে ভাষা দিয়া নব নব রূপলোক সৃষ্টি করিতে যিনি পারেন, তিনিই খাঁটি কবি। His imagination bodies forth the shapes of things unknow—his pen gives to airy nothing a local habitation and a name.

সৌন্দর্য্যের উপাসনাই কবির একমাত্র ধর্ম্ম—তাঁহার অর্থের চরম নীতি ও লক্ষ্য—

'Beauty is truth, truth beauty—that is all
ye know on earth, and ye all need to know"
'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জ্জয়তি ॥'

'কবিভারতীর জয় হউক; কারণ কবিভারতীর যে সৃষ্টি, তাহা নয় প্রকার রসে রমণীয়া; প্রজাপতির সৃষ্টিতে কেবলমাত্র

† cf: "The way to speak and write what shall go of fashion is, is to speak and write sincerely"—Emerson.

ছয়টি রস আছে এবং সেই ষড়্বিধ রসের প্রত্যেকটি মধুর নহে।—প্রজাপতির সৃষ্টিতে সুখ থাকিলেও দুঃখ আছে, মোহও আছে, কিন্তু কবি-সৃষ্টিতে আনন্দই আছে, দুঃখও নাই, মোহও নাই। বিধাতা সৃষ্টি করিতে উপাদান, নিমিত্ত ও সহকারী এই ত্রিবিধ কারণের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কবি তাঁহার কোনটিরই অপেক্ষা করেন না, বিধাতার সৃষ্টিতে পরতন্ত্রতা আছে, কবির সৃষ্টিতে তাহা নাই।'

চারুকলাশ্রেণীর মধ্যে হেগেল কবিতার স্থান সকলের উপরে এবং স্থাপত্যের স্থান সকলের নীচে দিয়াছেন।

কবির জগৎ সাধারণ মানুষের জগৎ হইতে পৃথক্। তাই বলিয়া তাহা অলীক নয়।

'ন কর্ষ্মেণনং মিথ্যা কবিঃ সৃষ্টিকরঃ পরঃ।
সর্ব্বোপর্য্যের পশ্যন্তি কররোঽস্তে ন চৈব হি॥'

'Poetry comes nearer to vital truth than history;' এ্যারিষ্টট্ল বলিয়াছেন, 'Literary truth transcends facts and turns facts into ideal-reals. The truth is not factral, it is not a copy of reality but a higher truth.' গ্যেটে বলিয়াছেন, 'The artist's work is real in so far as it is always true, ideal, in that it is never actual.'

'কাব্যাস্যাত্মা ধ্বনিঃ।' তৃণগুচ্ছের উপর স্বর্ণের শিশির-বিন্দুর ন্যায় যে কবিতা পাঠকের কর্ণে না পতিত হয়, তাহা কবিতা নয়, তাহা না পড়িলে চলে।

'I had rather hear a brazm canstick turn'd,
Or a dry wheel grate on axle tree;
And that would set my teeth nothing on edge,
Nothing so much as mincing poetry.'
—Shakespeare

গদ্য লিখিবার জন্য চাই যুক্তির অবতারণা; কবিতা লিখিবার জন্য চাই ভাবের উপাসনা। কবি ইচ্ছা করিয়া দার্শনিক হইবে না। A poet should sing but as the linnets do, and if there be any philosophy in him, it should find an unconscious expression. 'Philosophy will clip an angel's wings'*.

'কটুকৌষধবচ্ছাস্ত্রমবিদ্যাব্যাধিনাশকম্।
আহ্লাদ্যমৃতবৎ কাব্যমবিবেকগদাপহম্।'

'অপরাপর শাস্ত্র কটু ঔষধের ন্যায় অজ্ঞানরূপ ব্যাধি বিনাশ করে, কিন্তু কাব্য অমৃতের ন্যায় আনন্দদায়ক অথচ অবিবেক-নাশক।'

মানবের ন্যায় কবিতাও দেহ-মন-প্রাণ-বিশিষ্ট। ভাষা কবিতার দেহ, ভাব মন, এবং ভাব ও ভাষা ছাড়া আর একটি জিনিষ আছে—Suggestiveness—ভাবব্যঞ্জনা, তাহাই কবিতার প্রাণ। যে কবিতাটি খুব উঁচুদরের বাহিরের কান দিয়া তাহার এক অর্থ পাওয়া যায়। ভিতরের কান দিয়া আর এক ভাবে, যেন একটি 'violet half hidden from the eye:'

কবিরা স্বর্গের দূত। তাঁহারা যে বাণী ব্যক্ত করেন, তাহার মর্ম্ম অনেক সময় নিজেরাই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। 'Poets utter wise and great tnoughts which they themselves do not understand." (Plato)

কবিতার শব্দ-যোজনার মধ্যে এমন যাদু আছে, যাহা নীরব অধ্যয়নে উপভোগ করা যায় না। সেইজন্য কবিতা উচ্চস্বরে পাঠ করা উচিত—'all poetry should be read aloud'। কানে যদি ইহা ভাল লাগে, বার বার পড়িতে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত অর্থ পাঠকের নিকট প্রকটিত হয় এবং তাহার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করিয়া থাকে। ক্রমশঃ

* if. 'Durch Verminftelur wird poesic vertrieben Aber sic mag das Vermiftige lieben'.—Goethe

সুধাকরে সেকালের সংবাদ*

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র

কবি রাধামাধব মিত্র সম্পাদিত 'সুধাকর' নামক পাক্ষিক পত্র সাধারণতঃ কবিতায় প্রকাশিত হইত, তাহা গত শ্রাবণ-সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি; এতদ্ব্যতীত প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি 'প্রার্থনা' বা 'স্তোত্র' প্রকাশিত হইত। নিম্নে একটি প্রার্থনা এবং শীলস্-ফ্রি-কলেজ ও বিষম বিলাপকর আয়কর সম্বন্ধে গদ্যে প্রকাশিত দুইটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল। 'সুধাকর' সম্পাদকের রচনার নিদর্শন ইহা হইতে উপলব্ধি করা যাইবে।

প্রার্থনা

হে-ভবেশ,　　হে-ভূতেশ,　　হে-চিত্তরঞ্জন।
জ-য়প্রদ,　　জ-গদীশ,　　জ-য় নিরঞ্জন॥
গ-ণি মনে,　　গ-ত দিন',　　গ-তি নাই আর।
দী-ননাথ,　　দী-ন দেখে,　　দী-নে কর পার॥
শ-মনের,　　শ-ঙ্কাতেই,　　শ-রীর শুকায়।
ত-ব কৃপা,　　ত-রি পেলে,　　ত-বে তরা যায়॥
ব-লহীনে,　　ব-ল দেহ,　　ব-লি তব কাছে।
দা-সে দয়া,　　দা-ন করে,　　দা-তা কেবা আছে॥
স-র্ব্বসার,　　স-র্ব্বময়,　　স-দা চিন্তা মনে।
রা-ত্র দিন,　　রা-খো, রাখো,　　রা-জীব চরণে॥
ধা-র্ম্মিকের　　ধা-রা আমি,　　ধা-রণ না করি।
মা-নসাভি　　মা-নী হোয়ে,　　মা-য়া কত ধরি॥
ধ-রণীর　　ধ-ন প্রতি,　　ধ-রি অনুরাগ।
ব-সুর ত　　ব-শে মনে,　　ব-সে না বিরাগ॥

* গত শ্রাবণ সংখ্যার পর।

কে-শে ধরি,	কে-টানে হে,	কে-মন সহসা।
কৃ-পাময়,	কৃ-পা রূপ,	কৃ-পাণ ভরসা ॥
পা-রি ভব,	পা-রা বার,	পা-র হতে তবে।
ক-র যদি,	ক-টাক্ষেতে	ক-রুণা এ ভবে ॥
র-ক্ষা কর,	র-ক্ষা কর,	র-হুক গৌরব।
হে-র দীনে,	হে-দীনেশ,	হে-দীনবান্ধব ॥

[১লা জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭]

কবিতাটির প্রতি লাইন তিন ভাগে বিভক্ত এবং প্রতি-বাক্যের প্রথম পদটি উপর হইতে পাঠ করিলে "হে জগদীশ, তব দাস রাধামাধবকে কৃপা কর হে" এই কথাটি লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে এই ধরণের কবিতা রচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাষার উপর বিশেষ দখল না থাকিলে এইরূপ কবিতা রচনা করিতে পারা যায় না।

শীলস্ ফ্রি কালেজ

আমরা সানন্দচিত্তে সর্ব্বসাধারণকে অবগত করিতেছি যে বিগত ৭ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা পাঁচটার সময় শীলস্ ফ্রি কালেজ নামক সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যামন্দিরের পরীক্ষোত্তীর্ণ সুপাত্র ছাত্রবৃন্দকে বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য সুশৃঙ্খলপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।

পারিতোষিক বিতরণ কার্য্যোপলক্ষে একটা প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় মহানগর কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত মহাত্মাগণ উপস্থিত ছিলেন। ধনরাশি গুণরাশি বাবু হীরালাল শীল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অসামান্য শীলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সভাস্থ সমস্ত মহানুভব লোকদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে অন্যথা করেন নাই। ঐ সভায় রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু রাজেন্দ্র নাথ দত্ত, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বাবু সাতকড়ী দত্ত এবং বাবু কানাইলাল দে প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত হইয়া সভার গৌরবোন্নতি করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ সুযোগ্য সুলেখক বহুদর্শী মান্যবর সেক্রেটারি বাবু কৃষ্ণমোহন মল্লিক মহাশয় সভাস্থ মহোদয় সমগ্রের সম্মতি অনুসারে নানা-বিদ্যাবিশারদ বিদ্যোৎসাহি রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া শীলস্ ফ্রি কালেজের আদ্যোপান্ত বিবরণ পাঠ করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি প্রশংসা লাভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা অতি সুদীর্ঘ এবং রচনা অতি সুন্দর। তাহার ভাষার লালিত্য সভাসীন সকল লোককেই সন্তুষ্ট করিয়াছে। এদেশীয় কোন প্রাচীন লোক কর্ত্তৃক বিজাতীয় ভাষায় এতাদৃশ পারদর্শিতা ও বুৎপত্তি প্রদর্শিত হওয়া সামান্য বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। তদনন্তর সভাপতি রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গত বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে তাহারদের প্রাপ্য পারিতোষিক পুস্তকাবলী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি-পত্র প্রদান করিয়া ক্রমে অপরাপর সমস্ত শ্রেণীস্থ সুযোগ্য ছাত্রবৃন্দকে তাহাদের স্ব স্ব প্রাপ্য পারিতোষিক স্বহস্তে অর্পণ করিলেন।

এইরূপে সকলকে পারিতোষিক প্রদান করিবার পর তিনি লোকান্তরগামি মহাত্মা ৺বাবু মতিলাল শীলের অসাধারণ বদান্যতার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার উপযুক্ত সন্তানসমূহকে যথোচিত প্রশংসা করিয়া বালকপুঞ্জকে বিদ্যাবিষয়ক নানা উপদেশ দিয়া একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলেই সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

শীলস্ ফ্রী কালেজ বাঙ্গালির বদান্যতার একটী প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছে, এই নিমিত্তই আমরা ইহার বিষয় কিছু না বলিয়া কোনমতে নিরস্ত হইতে পারি না। অধুনা ইহার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষের এবং তাঁহার সহকারিগণের প্রযত্নে উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

প্রতি বৎসরেই ইহার ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উৎকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইতেছে। আমরা এস্থলে মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতেছি যে, যদুবাবু ইহার প্রধান শিক্ষকের পদাভিষিক্ত হওয়াতেই ইহার এতাদৃশ শ্রীবৃদ্ধির অনুষ্ঠান হইয়াছে। আমরা ভরসা করিতেছি যে অতি স্বল্পসময়ের মধ্যেই লোক-সমাজে ইহার আরো গৌরবোন্নতি হইবে।

বিখ্যাত শীল বাবুরা এবং বাবু কৃষ্ণমোহন মল্লিক বিশেষ আগ্রহ সহকারে এই বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শীল বাবুরা একটী নূতন প্রথাবলম্বন করিয়া তাহারদের পিতৃভক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন এবং জন-সমাজে প্রশংসা লাভও করিতেছেন।

২০শে মে এই বিদ্যালয় সংস্থাপক মহাত্মা ৺মতিলাল শীল মানবলীলা সম্বরণ করেন। অতএব তজ্জন্য শীল বাবুরা প্রতি বৎসর তাঁহাদের অদ্বিতীয় পিতার সম্মান রক্ষার্থে ঐ ২০শে মে ছাত্রগণের পারিতোষিক প্রাপণের দিন স্থির করিয়াছেন। অপর অপর বিদ্যালয়ে এই সময় গ্রীষ্মাবকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু শীলবাবুরা এই গ্রীষ্মাবকাশকে গ্রীষ্মাবকাশ না বলিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপকের সম্মানসূচক অবকাশ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন।

মহাত্মা ৺বাবু মতিলাল শীলের পরলোকগমনাবধি এই চমৎকার ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইয়াছে। দিনগণনায়

তাঁহার মৃত্যুর পর ষোড়শ বৎসর বিগত হইয়াছে বলিয়া ইহা ষোড়শ বাৎসরিক সভা নামে পরিচালিত হইয়াছে। ক্রমশঃ কালসহযোগে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ বাৎসরিক সভা বলিয়া গণনা করিয়া শীলবংশাবলীক্রমে এই প্রথা প্রচলিত থাকিবে।

এক ব্যক্তির দ্বারা সাধারণের এরূপ বিশেষ উপকার হইয়া আসিতেছে বলিয়াই আমরা এ-বিষয়ে সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করণার্থ এক বিষয় লইয়া এত আন্দোলন করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে মিসনরি সাহেবদিগের অধীনস্থ সমস্ত বিদ্যালয়ই অবৈতনিক ছিল এবং ঐ সমস্ত অবৈতনিক বিদ্যামন্দিরে এতদ্দেশীয় অনেকানেক অনাথ বালক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া সুচারুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু অধুনা মিসনরি বিদ্যালয়-সমূহে বিনা বেতনে আর কেহই বিদ্যাভাস করিতে পায় না, সুতরাং দরিদ্রবালকপুঞ্জের বিদ্যা শিক্ষা করিবার উপায় অতি বিরল হইয়া উঠিয়াছে। মান্যবর গবর্ণমেণ্টও এই সময়ে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অনেক ব্যয় ন্যূন করিতেছেন। অতএব এই বিদ্যামন্দির ব্যতীত দীনহীন বালক সমগ্রের বিদ্যাভাসের আর উপায়ান্তর নাই। এইরূপ উপস্থিত নানা কারণ বশতঃ এই বিদ্যালয়ের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা সকলেরই চিত্ত আকর্ষিত হইয়াছে।

ধন্য বাবু মতিলাল, ধন্য তাঁর ধন।
ধরিয়াছিলেন তিনি সার্থক জীবন॥
ধন্য বলি গণ্য ছিল, সে মতির মতি।
কাজেতে ছিলেন তিনি, যথার্থই মতি।
তাঁর উপকার ঋণে, বদ্ধ বহু জন।
না গায় তাহার গুণ, কে আছে এমন॥
কত দীনহীন শিশু, অনুগ্রহে তাঁর।
পরিয়াছে বিদ্যাহার, অগোচর কার॥
কত বড় লোক তিনি, ছিলেন ধরায়।
বিদ্যালয় দেখায়ে, দিতেছে পায় পায়॥
মতিলাল পরলোকে, গেছেন কে বলে।
জীবিত আছেন তিনি, নিজ কীর্ত্তিবলে।
কীর্ত্তি রেখে পরলোকে যাঁহার গমন।
কালের করেতে হয়, তাঁর কি নিধন॥
সকল দানের সার, বিদ্যাধন দান।
বিদ্যাধন দাতা হন্ নরের প্রধান॥
ঈশ্বরের কাছে করি প্রার্থনা এখন।
এমন দাতার বংশ সুখে যেন রন্॥
দীর্ঘজীবী হোয়ে রন তাঁর সুতচয়।
সকল বিষয়ে হোক তাঁহাদের পয়॥
বঙ্গদেশ আরো মতি করুন প্রসব।
[illegible]॥
এক মতিলাল হোতে এত শুভোদয়!
বহু মতিলাল হোলে দেশে কি না হয়॥

[১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭]

বিষম বিলাপকর এই আয়কর! মাগো, এই আয়কর!!

হে মাতঃ! হে ইংলণ্ডেশ্বরী! হে ভারতেশ্বরী! তুমি আমাদের মহাভাগ্যধরী রাজ্যেশ্বরী, আমরা তোমার হতভাগ্য প্রজা। তুমি আমাদের সৌভাগ্যশালিনী জননী, আমরা তোমার হতভাগ্য অকৃতি সন্তান। সন্তানসমূহের কোন অসহনীয় কষ্ট উপস্থিত হইলে যেমন তাহারা তাহাদের দুঃখ নিবারণ করণার্থ তাহাদের জননীর নিকটে গিয়া রোদন করে, সেইরূপ আমরাও তোমার কাছে রোদন-বদন হইয়া আমাদের দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। সামান্যা জননীর কাছে তাঁহার সন্তান দুঃখ প্রকাশ করিলে, তাহার দুঃখ নিবারণের ক্ষমতা না থাকিলেও তিনি সাধ্যানুসারে স্বীয় সন্তানের দুঃখ বিমোচন করিতে কখনই অন্যথা করেন না। তুমি আমাদের অসামান্যা জননী, আমরা তোমার নিকট আমাদের অসামান্য দুঃখ নিবেদন করিতেছি। তোমার যখন অসামান্য ক্ষমতা আছে তখন তুমি অবশ্যই আমাদের দুঃখে কর্ণপাত করিয়া আমাদের দুঃখ নিবারণের উপায় করিবে এই প্রত্যাশা আমাদের অন্তঃকরণে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে। যখন তুমি প্রজাপালিনী রাজ্যেশ্বরী এবং সন্তানপালিনী জননী এবং আমাদের প্রতি তোমার বিশেষ স্নেহও আছে তখন আমরা আর এরূপ দুঃখ-সাগরে কখনই নিমগ্ন থাকিব না। তোমার এই বিশাল রাজ্যে বাস করিয়া আমরা যে কি সুখে দিনাতিপাত করিতেছি তাহা বলা যায় না। আমরা অকপট চিত্তেই এই কথা বলিতেছি তাহার আর সন্দেহ নাই। তোমার নিকট আমরা যে সমস্ত উপকার ঋণে বদ্ধ আছি তাহা এ-স্থলে বলা বাহুল্য মাত্র। তোমার রাজ্যে এই উপস্থিত ভয়ঙ্কর ক্লেশকর আয়করটী সংস্থাপিত হওয়াতে লোকের মনে এমনি বোধ জন্মিয়াছে যে যেন এক কলস দুগ্ধে গোমূত্র বিন্দু প্রদান করা হইয়াছে। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের ক্লেশ ঘটিয়া থাকে তাহা অত্যন্ত কষ্টকর তাহার সংশয় মাত্র নাই। তুমি তোমার সর্ব্বসাধারণ প্রজার আবেদন পত্র শ্রবণ করিলেই কি পর্য্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে সমস্ত অবগত হইতে পারিবে। এ-দুঃখ নিবারণ করিতে অপর কোন ব্যক্তির ক্ষমতা নাই এবং অপর কোন ব্যক্তি এ-বিষয়ে তাদৃশ প্রণিধানও করিবেন না। তজ্জন্য তোমাকে না জানাইয়া আর কাহাকে জানাইব? আমাদের দুঃখ আর কে শুনিবে?

[১৬ই বৈশাখ ১২৭৭]

কবি রাধামাধব মিত্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত সুনীল গুণাকর মিত্রের নিকট 'সুধাকর' পত্রের ফাইল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বর্ত্তমানে উক্ত ফাইল [illegible] রক্ষিত হইয়াছে।

রুদ্র-তপস্বী

শ্রীসুবোধ-রায়

ঘুমের লতার স্বপ্নের ফুল
জাগরণে ঝ'রে যায়,
জাগ্রত প্রাণে স্বপ্ন-কুসুম
ফোটে যে তপস্যায়।
এই স্বপ্নের পরাগ-রেণুর মাঝে
সৃষ্টির বীজ নিভৃতে গোপনে রাজে;
রূপের জগতে এই অপরূপ
আনে যে রূপান্তর,
সেই রূপকার সাধকের লাগি'
জাগে যে যুগান্তর।

নয়নে তাঁহার চাপা বিদ্যুৎ
বক্ষে বহ্নি-জ্বালা,
পঞ্চতপের আসনে ব'সিয়া
জপে সে স্বপ্নমালা।
শয়নে নয়ন তন্দ্রাবিহীন;
কর্ম্ম—নীরব-সাধনা বিলীন;
অন্তরে তাঁর অগ্নিগিরির
প্রলয়োচ্ছ্বাস ভায়,
বিস্ফোরণের মুহূর্ত্ত খোঁজে
অধীর প্রতীক্ষায়।

বোঝে না তাঁহারে আপনার জন
দেশবাসী করে হেলা,
শক্তিমাতাল অপদার্থেরা
মারে বিদ্রূপঢেলা।
উদাসী পথিক অতিদীনব্রত,
ফেরে পথে পথে পাগলের মত,
ভুলে যায় সবে,—ভস্মাবরণ
ভিখারীর চীরধারী,
প্রলয়দেবতা রুদ্র যে,—সেও
উদাসী শ্মশানচারী।

এ মহাসাধক তপস্বী যবে
মহাকাল-ইঙ্গিতে
আপন বাঁশীতে ফুৎকার হানে
প্রলয়-রাগিণী-গীতে,
ছন্দে তাহার নাচে মহাকাল,—
শূন্যে দাঁড়ায় কালের রাখাল
সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকার সাথে
বিস্ময়ভরা প্রাণ,
শোনে প্রলয়ের রাগিণী-আড়ালে
নবসৃজনের গান।

মুহূর্ত্তে সেই ভিখারী পথিক
দেব-অধিদেব সম,
বিরাজে দেশের হৃদয়-আসনে
অপূর্ব্ব অনুপম।
তাঁর পূজা লাগি' উন্মাদ সবে,
ছুটে আসে জনে মহাকাল-রবে;
রুদ্র পথিক এখন শান্ত,—
মুখেতে হাসির আলা,
জপিছে আপন স্বপ্ন-সূত্রে
সত্য-অক্ষমালা।

সমাজ-দর্শন : শ্রীরণজিৎ কুমার সেন প্রণীত সামাজিক দর্শন-সাহিত্য। ব্রতী প্রকাশনী, ৩৮, সুরি লেন, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে লেখক 'শতাব্দী', 'বিপ্লব' ও 'সব্যসাচী' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া নিয়াছেন। এতদিন তাঁহার জাতীয় কবিতা ও সঙ্গীত এবং কথাসাহিত্যের সঙ্গেই পাঠকেরা বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন; আলোচ্য গ্রন্থদ্বারা এবারে লেখকের আমরা আর একটি নতুন পরিচয় পাইলাম। প্রবন্ধ-সাহিত্যকে এমন প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রকাশ করা যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিভারই পরিচায়ক। ভূমিকায় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন: 'বাংলা সাহিত্যে এইরূপ আলোচনামূলক গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নহে। কাজেই গ্রন্থকার এরূপ গ্রন্থ রচনার দ্বারা যে আমাদের সাহিত্যিক প্রসার ও সমৃদ্ধি বাড়াইতেছেন, তাহা নিঃসন্দেহ।' 'সমাজ-দর্শন'-এর পাঠকেরাও ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথারই প্রতিধ্বনি করিবেন।

সামাজিক দুর্নীতি, আত্মসর্ব্বস্বতাবোধ, পরশ্রীকাতরতা, সামাজিক কল্যাণের পরিবর্ত্তে বর্ণস্বাতন্ত্র্য, ভ্রাতৃবিরোধ ও যুদ্ধ, মানব-প্রকৃতির দ্বৈত জটিলতা এবং বর্ত্তমান সভ্যতার প্রতিবেশে পরিপূর্ণ মানবিকতার বিকাশের অন্তরায়—লেখক গভীর চিন্তাশীলতার সহিত এই সমস্যাগুলি লইয়াই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃত মানবীয় জ্ঞান, শিক্ষা ও আত্মবিস্মৃত প্রেমের বিকাশ ভিন্ন বর্ত্তমান পার্থিব এই নারকীয় ধ্বংসের মূলে জীবনের জয়গান ও শান্তি উদ্গীত হইতে পারে না; নানা তথ্যালোচনার মধ্য দিয়া লেখকের ইহাই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাজ আজ অতল নিকৃষ্টতার মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, সমস্ত পৃথিবী আজ বিরাট দ্বন্দ্ব-হুতাশনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—এই সময়ে এইজাতীয় গ্রন্থের অত্যন্ত বেশী প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। মানুষের মন হইতে আজ সৌন্দর্য্যবোধ অপসারিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে জিঘাংসা আর লুণ্ঠন-নীতি। তাই বারবার এই অখণ্ড বিশ্বসমাজে আমরা লক্ষ্য করিতেছি ধ্বংস, তাপ, যন্ত্রণা, বৈষম্য আর শ্রীহীনতা। মানুষের হৃদয়-দেবতা জাগ্রত হইবার সেই সাধনা কোথায়? 'সমাজ-দর্শন'-এ তাহার ইঙ্গিত ও নির্দ্দেশের সার্থক রূপ আমরা দেখিতে পাই। প্রত্যেকটি সভ্য মানুষের পক্ষে আলোচ্য গ্রন্থখানি পড়া অপরিহার্য্য। পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীদের বাণীও গ্রন্থখানিকে সার্থক প্রণয়ন করিয়া তুলিয়াছে। ঝকঝকে সুন্দর ছাপা ও আলগা বাঁধাই অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক হইতে মনোরম করিয়াছে গ্রন্থখানিকে। নিঃসন্দেহে গ্রন্থখানির সার্থক প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বন-জ্যোৎস্না : গল্প-গ্রন্থ। শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকালয়, ২৯, বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচয় নতুন করিয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বাংলা দেশের ছোট বড় প্রায় প্রত্যেক কাগজে বহুল প্রকাশিত তাঁহার ছোট গল্পের সঙ্গে পাঠকমাত্রেই পরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের আটটি গল্প সঙ্কলিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'বন-জ্যোৎস্না', 'মৃত্যুবাণ' ও 'আলুখলিফার শেষ খুন' বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গল্পও প্রাকৃতিক বর্ণনার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রধানতঃ প্রকৃতি-ধর্ম্মী লেখক। প্রকৃতির স্বাভাবিক শ্যামলতা তাই তাঁহার প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে প্রধান অংশ লইয়া দাঁড়ায় এবং প্রকৃতি-সন্ধানী পাঠক-চিত্তকে আনন্দ দেয়। 'বন-জ্যোৎস্না'য় চরিত্রের দিক দিয়া 'আলু খলিফা' সার্থক সৃষ্টি। গ্রন্থের সংগঠন পারিপাট্যের জন্য প্রকাশকের শিল্প-রুচিকে প্রশংসা করিতে হয়।

দিল ডাক : উপন্যাস। শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বুক ষ্ট্যাণ্ড, ১১।১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে পরিমল বাবু ভাণ্ডা ভাসিলিয়েভ্স্কায়ার 'রেইন-বো' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া বাংলা সাহিত্যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। কথাসাহিত্যে অনাবশ্যক কথার অবতারণা করিয়া মূল বিষয়কে ভারবাহী ও রসহীন করিবার লেখক ন'ন তিনি। তাঁহার সেই পরিমিত কথার সার্থক ব্যবহার-বোধের পরিচয় পাওয়া যায় সাম্প্রতিক প্রকাশিত তাঁহার প্রথম মৌলিক উপন্যাস 'দিল ডাক'-এ। ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের মাঝামাঝি একটি ব্যাসকে কেন্দ্র করিয়া যুদ্ধের অফিস বসিল। বিভিন্ন ধরণের বিচিত্র নারী-পুরুষের সমাগমে স্থানটি পূর্ণ হইয়া উঠিল, যেমন: ষ্টিফেন, প্রবীর, সুসেনা, বোজিটা, ষ্টেলা, বেটি, জুলিয়ান, ফ্রেডরিক, ললিতা, সুষমা প্রভৃতি এবং বিশেষ ভাবে তাহাদের মধ্যে অতি সাধারণ বাঙালী মেয়ে মিতাও। এই মিতাই গ্রন্থের প্রধান নায়িকা। তাঁহার জীবনের ঘাত-সংঘাত ও বৈচিত্র্য লেখক অত্যন্ত নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। শাখা-চরিত্রের মধ্যে কলিকাতার স্বদেশী কর্ম্মী শিখর আদর্শবাদী সার্থক বলিষ্ঠ পুরুষ। মিতার চরিত্র প্রগতিধর্ম্মী, ক্ষণভঙ্গুর ও অসংলগ্ন এবং স্বামীকে অস্বীকার করিয়াও স্বামিপ্রাণা। এতৎসত্ত্বেও গ্রন্থখানিতে সামান্য অসঙ্গতি চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। আশা করি, পরিমলবাবুর পরবর্ত্তী গ্রন্থ আরও বলিষ্ঠ ও উচ্চাঙ্গের কাহিনীমূলক হইবে। 'দিল ডাক'-এর যে সার্থক প্রচার হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সম্পাদকীয়

লণ্ডনে ভারত সম্বন্ধে আলোচনা

গত মে মাসে ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, দেশ-রক্ষা-সচিব মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার ও অন্যতম মন্ত্রী স্যার ষ্টাফর্ড ক্রীপস্ ভারতের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ১৫ই মে তারিখে যে একটি সরকারী বিবৃতি দিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। ইহার পরে ২৫শে মে তারিখে আবার তাঁহারা একটি ভাষ্যও প্রদান করেন। মন্ত্রী-মিশনের ১৫ই মে তারিখে প্রস্তাবের দুইটী মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রথম—একটি অন্তর্ব্বর্ত্তী অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট (Interim Government) গঠন, দ্বিতীয়টি ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটী গণপরিষদ (Constituent Assembly) গঠন দ্বিতীয়টি দীর্ঘস্থায়ী সঙ্কল্প, আর প্রথমটী স্বল্পস্থায়ী ব্যবস্থা (Short term arrangement).

ইহার পরে ৬ই জুন তারিখে মুসলীম-লীগ উভয় প্রস্তাব গ্রহণ করিবে বলিয়া স্বীকৃত হয়। কিন্তু কংগ্রেস ২৩শে জুন তারিখে দুই সপ্তাহ পরে স্থায়ী প্রস্তাব (Constituent Assembly) গঠন প্রস্তাবটি গ্রহণ করে এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে সেই অবস্থায় যাইতে অসম্মত হয়। উভয় দলই দীর্ঘকালস্থায়ী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মন্ত্রীমিশন আশ্বস্তভাবে বিলাত চলিয়া যায় এবং যাইবার সময় অদূরভবিষ্যতে দীর্ঘকালস্থায়ী প্রস্তাব যাহারা গ্রহণ করিয়াছে সেই সেই দল হইতে বাছাই লোক লইয়া বড়লাট লর্ড ওয়াভেল যেন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করেন, তাঁহাকে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়া যান। বিলাতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বেই মন্ত্রীমিশন কেন বড়লাটকে দিয়া মুসলীম-লীগের ইচ্ছামত লোক লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করিলেন না, ইহাতে উক্ত লীগ রাগত হইয়া ২৯শে জুলাই তারিখে (১) উভয় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করিয়া (২) ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম-দিবস বলিয়া ঘোষণা করে।

ইতিমধ্যে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিলাত যান এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে মন্ত্রীসভা-গঠন করিতে অনুরোধ করেন। পণ্ডিতজী কংগ্রেস হইতে ৬জন, মুসলীম লীগ ৫জন, পার্শী একজন, খৃষ্টান এক, শিখ এক, এই ১৪জন দিয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিতে স্বীকৃত হন এবং ২রা সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করেন। মুসলীমলীগ ঐ তারিখে যোগদানে বিরত থাকায় তাহাদের জন্য পাঁচটি আসন খালি রাখা হয়। অতঃপরে সেপ্টেম্বরের শেষ ও অক্টোবরে কংগ্রেস ও লীগে আবার আলোচনা হয়, কিন্তু উহা সাফল্যযুক্ত না হওয়ায় লীগের ৫জন সভ্য বিনাসর্ত্তে মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। কংগ্রেস নিরাপত্তিতে পাঁচটি আসন ছাড়িয়া দেয়।

কিছুদিন এইভাবে কাজ চলিবার পরে গণপরিষদ বসিবার তারিখ স্থির হয় ৯ই ডিসেম্বর। কিন্তু লীগ ঘোষণা করিলেন, গণপরিষদে যোগদান করিবেন না। ইহাতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাতে ব্রিটিশ সরকারের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এট্‌লি একটা আপোষ মীমাংসায় আসিবার জন্য পণ্ডিত নেহরু এবং মিঃ জিন্নাকে লণ্ডনে আমন্ত্রণ করেন। জিন্না সাহেব যাইতে রাজী হন, কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল যাইতে অস্বীকার করেন। অতঃপর মিঃ এট্‌লি বিশেষভাবে অনুরোধ করায় এবং গণপরিষদের বৈঠক স্থগিত হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় পণ্ডিতজীও নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন।

লণ্ডনে অনেক ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার পরে গত ৬ই ডিসেম্বর একটী গোলটেবিল বৈঠক হয় এবং শেষ-দিকে মিঃ এট্‌লি পণ্ডিতজীকে ও মিঃ জিন্নাকে তাঁহার উক্তিসহ একখানি কাগজ প্রদান করেন। সেখানকার আলোচনায় কোন ফলাফল হয় নাই এবং উভয়েই নিজ-দলস্থ সভ্যগণের মত গ্রহণ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। মিঃ জিন্না বিলাতে থাকিয়া মিঃ চার্চ্চিল প্রমুখ কয়েকজন রক্ষণশীলদলনেতাকে এবং মন্ত্রীমিশনকে একটী ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত বিলাতেই থাকেন। পণ্ডিতজী ৭ই রওনা হইয়া ৮ই ডিসেম্বর আসিয়া করাচী পৌছেন।

৯ই ডিসেম্বর হইতে গণপরিষদের কার্য্য চলিতেছে। মনে হয় ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সমভাবে চলিবে।

মিঃ জিন্নার পৃষ্ঠপোষক মিঃ চার্চ্চিল পার্লেমেণ্টে ভারতীয় প্রশ্ন লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতে জেদ করায় গত ১২ই ও ১৩ই তারিখে কমন্সসভায় আলোচনা হইয়াছে, এবং ১৬ই তারিখে হয় লর্ডসভায়। কমন্সসভায়

বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে মিঃ জিন্না, মিঃ লিয়াকত আলী, মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও মিসেস্ অমৃতকুমারী কৌয়াব উপস্থিত ছিলেন।

গোলটেবিল বৈঠক ও মণ্ডলীগঠন

মন্ত্রী মিশন পাকিস্থানের প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু মুসলীম লীগের মনবস্কার্থ প্রথম গ্রুপে অ-মুসলমান প্রদেশগুলি (বোম্বাই মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বেহার ও উড়িষ্যা) রাখিয়া দ্বিতীয় গ্রুপে পাঞ্জাব,সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ ও বেলুচিস্থান এবং তৃতীয় গ্রুপে বাঙ্গলা ও আসাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন সুসভ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক স্থানেই অখণ্ড ভারতের সাধারণ সংস্কৃতির সহিত এক হইয়াও নিজ নিজ অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক, ভাষা ও আচারগত নিজস্ব একটি সংস্কৃতিও রহিয়াছে। তাই সমগ্র ভারতের সহিত যুক্ত হইবার পরে, অপর কোন প্রদেশের সহিত উক্ত সংস্কৃতি প্রসারের সুবিধা বুঝিলে যুক্ত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অনিচ্ছায় নয়। বাঙ্গলা এবং ভারতের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই রক্ষণশীলদলনেতা স্তার জন এণ্ডারসনও গত ১২ই ডিসেম্বরের আলোচনায় তারস্বরে ঠিক কথাটি বলিয়াছেন—"The fundamental unity of India as a constitutional entity should be preserved."

যাহা হউক এখন আমাদের বক্তব্য বিষয় এই যে, কোন প্রদেশকে উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য প্রদেশের সহিত এক মণ্ডলীতে (Groupএ) যুক্ত ও আবদ্ধ করা উচিত কিনা। কার্যাতঃ প্রাদেশিক ইচ্ছাশক্তির উপর ভার দিয়াই সেদিন পার্লামেণ্টের আলোচনায় মন্ত্রীমিশনের অন্যতম সভা এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষীয় প্রধান আলোচনাকারী স্তর ষ্টাফর্ড ক্রীপস্ও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রদেশকে গ্রুপে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না—

"It was however provided that no province could be forced into a Group against its will."

তবে এখন কথা হইতেছে গ্রুপ গঠিত হইবার পুর্বেই প্রদেশগুলির বাহিরে থাকিবার অধিকার থাকিবে কি গ্রুপে যাইবার পরে শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পরে থাকিবে? এই বিষয়ে মতভেদ আছে। জাতীয় নেতা পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, "গণ-পরিষদের প্রাথমিক কার্য্যবিধি হইয়া গেলে, আমরা বিভাগে (Sectionএ) যাইব, কিন্তু গ্রুপে যাওয়া না যাওয়া আমাদের ইচ্ছাধীন।" কিন্তু গত ৬ই ডিসেম্বর গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী এট্লি বলেন, "আপনাদিগকে সেকসনে গিয়া প্রদেশমণ্ডলী গঠিত করিতেই হইবে। শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া গেলে নব কাউন্সিল নির্ব্বাচনের পরে কোন প্রদেশ না চাহিলে সেই গ্রুপে থাকিবে না।" মিঃ এটলি মিশনপ্রস্তাবের ১৯ প্যারা ৫ ও ৮ ধারার উল্লেখ করিয়াছেন:

'19(5) These Sections shal proceed to settle provincial constitutions for the provinces included in each section and shall also decide whether any Group constitution shall be set up for those provinces and if so with what provincial subjects the Group should deal. Provinces should have power to opt out of the Groups in accordance with the provisions of Sub-Clause (8) below.

Paragraph 19(8):

"As soon as the new constitutional agreements have come into operation, it shall be open to any province to elect to come out of any Group in which it has been placed Such a decision shall be taken by the Legislature of the province after the first General election under the New Constituent Assembly"

এই দুইটী ধারায় এই বুঝা যায় যে, সেকসনে যাইবার পরে সেখানে প্রদেশের শাসনতন্ত্র রচিত হইবে আর কোন মণ্ডলীর (Group) শাসনতন্ত্র একত্র রচিত হইবে কি না, হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ে হইবে, তাহাও স্থির হইবে। তবে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করিলে মণ্ডলীর (Group এর) বাহিরে আসিতে পারিবে এবং নূতন শাসনতন্ত্রানুযায়ী নির্ব্বাচন হইবার পরে প্রদেশটি ইচ্ছামত বাহিরে আসিতে পারিবে। মিঃ এটলি, এবং লর্ড পেথিক লরেন্স প্রভৃতি এক কথাই বলেন যে,"এরূপ সিদ্ধান্তই আমাদের মনোগত উদ্দেশ্য।"

আমাদের মনে হয় প্রধান সচিব মিঃ এটলি ও ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স মিঃ জিন্নার তোষণার্থে কেবল ১৯ ধারাটিই উদ্ধৃত করিয়া একদেশদর্শিতা দেখাইয়াছেন। কারণ উক্ত ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাবে ১৫ ধারায় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে প্রদেশসমূহের গ্রুপ গঠন করা না করা ইচ্ছাধীন, এবং কোন প্রদেশ কোন গ্রুপে যাইবে, কি কিছু করিবে ইহাও তাহার ইচ্ছা। ধারাগুলি—

"(2) All subjects other than the union subjects and all residuary powers should vest in the provinces

(5) Provinces should be free to form Groups with executives and legislatures and each Group should determine the Provincial Subjects to be taken in common."

এই দুইটি ধারা ১৫ ও ১৯ একত্র মিলাইয়া দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, কোন প্রদেশ সেকসনে যাইবার পরেই স্থির করিবে যে মণ্ডলী গঠিত হইবে কি না। ইহাতে প্রদেশগুলির ক্ষমতা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। যদি মণ্ডলী গঠিত হয় এবং শাসনতন্ত্র রচিত হয়, ইহার পরেও আবার প্রদেশ বা প্রদেশবিশেষের মণ্ডলীর বাহিরে আসিবার ক্ষমতা থাকিবে। অর্থাৎ প্রথমে মণ্ডলীতে যাইবে কি না যাইবে ইহা প্রদেশবিশেষের ইচ্ছাধীন। যদি না যায়, ফুরাইয়া গেল। আর যদি যায়, তবেও আবার অভিজ্ঞ-

তার পরে বাহিরে আসিবার অধিকার থাকিবে। আমাদের মনে হয় দুই ধারা একত্র বিবেচনা করিলেই গণতন্ত্রের দিক্ দিয়া ঠিক হয়। সুতরাং কংগ্রেস সম্বন্ধে মিঃ এটলি ঠিকই ধরিয়াছেন, "Congress has asserted that the true meaning of the statement read as a whole is that the provinces have the right to decide both as to Grouping and to their own Constitution. নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির এরূপ উদ্দেশ্য থাকাই স্বাভাবিক। এইরূপ অর্থানুযায়ী কাজ না হওয়াই যে গণতন্ত্রবিরোধী, সম্প্রতি তাহার একটী কারণও উদ্ভূত হইয়াছে। গত ৬ই ডিসেম্বর মিঃ এটলি যে একটি নূতন কথা বলিলেন, যে প্রত্যেক সেক্সনে প্রত্যেক মেম্বরের এক একটী ভোটের উপর নির্ভর হইয়া কাজ হইবে, তাহাতে আবার নূতন সমস্যা হইয়াছে, কারণ ধরুন, সি সেক্সনে (বিভাগে) ৩৬ জন মুসলমান-সদস্যের আছে ৩৬টি ভোট আর অ-মুসলমানের আছে ৩৪টি। ৩৬টি মুসলমান সকলেই পাকিস্থান সমর্থক লীগপন্থী, ইহারা সকলেই ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার পক্ষে। এক্ষণে এই ৩৬টি পাকিস্থানপন্থী লীগ প্রত্যেক ভোটে প্রতি বিষয়েই তাহারা জয়লাভ করিবে। এখন আসামে ৩ জন মুসলমান এবং ৭ জন অমুসলমান গণ-পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এখানে দেখুন আসামকে খুব বেশী অনুপাতে অমুসলমান প্রধান থাকা সত্ত্বেও, শাসনতন্ত্র রচনায় প্রতিপদক্ষেপে ৩৬ জনের ভোটের অধীন থাকিতে হইবে। তাই আসাম প্রদেশটির (অমুসলমান হওয়া সত্ত্বেও) যদি সংস্কৃতি, সভ্যতা, ধর্ম্ম, আচার, সামাজিক নিয়ম পদে পদে বিপর্য্যস্ত হয় ও অখণ্ড ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে তবে গ্রুপে পড়িয়া এই প্রদেশটি একেবারে মাঠে মারা যাইবে। সুতরাং এরূপ ব্যবস্থা কখনও গণতন্ত্র অনুযায়ী হইতে পারে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি একেবারে পুরোপুরি দুইটিকে এক ও অভিন্ন করিয়া দিতেন, তখনকার অবস্থা বরং স্পষ্ট বুঝা যাইত। এখন যখন ইহার মনোভাব "No Province could be forced into a group against its will" যে কোন প্রদেশ ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রুপভুক্ত হইবে না।—তখন হাত-পা বাঁধিবার পূর্ব্বেই সেই will (ইচ্ছার) সদ্ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। নতুবা ইচ্ছার (will) খুব খর্ব্ব হইয়া গেলে আর তাহার সদ্ব্যবহার কিরূপে চলিবে?

তৃতীয়তঃ—প্রদেশগুলিকেও কার্য্যসাফল্যের দিক দিয়াও স্বাতন্ত্র্য দেওয়াই একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, ধরুন যদি বাঙ্গলা এবং আসাম সেক্সনে (বিভাগে) যাওয়ার পরে আসাম বলিয়া বসেন 'আমি গ্রুপে যাইব না', তখন আসামকে ছাড়িয়া বাঙ্গলা যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবে, তাহা কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসামের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে? আমাদের মনে হয়, আসাম যদি ঐ শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রানুযায়ী মনে করে এবং জাতিধর্ম্মবর্ণ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর ধর্ম্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সম্বন্ধে স্বায়ত্তাধিকার থাকে ও ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে—তবে আসাম তাহা গ্রহণ করিতে পারে, সেরূপ না হইলে গ্রহণ করিবে না। সুতরাং অধিক সংখ্যক পাকীস্থানপন্থী মুসলমান গঠিত শাসনতন্ত্র আসাম গ্রহণ করিতে না চাহিলে এটলি সাহেব লীগ সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছেন, ন্যায়ের দিক হইতে আসামের বেলাও সেই কথাই চলিবে—

"Should the constitution come to be framed by a Constituent Assembly in which a large section of the Indian Population had not been represented, His Majesty's Government could not of course, contemplate—as the Congress have stated they would not contemplate—forcing such a constitution upon any unwilling parts of the country."

সেইরূপ পাঞ্জাবে মুসলমান আছে এক কোটি ৬২ লক্ষ, আর অমুসলমান এক কোটি ২২ লক্ষ। গণ-পরিষদে মুসলমান প্রতিনিধি ১৬ জন এবং অমুসলমান ১২ জন। ভোটাধিক্যে এই ১৬ জনের সিদ্ধান্ত কি এক কোটি ২২ লক্ষ অমুসলমানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইবে? আর বাঙ্গলায় অমুসলমানরাও বা কেন (২৭ জন) মুসলমান ৩৩ জনের ভোটে পরাজিত হইয়া সর্ব্বদা তাহাদের তটস্থ হইয়াই থাকিবে? তবে আসামের অবস্থাই সর্ব্বাগ্রে অনুধাবন করা সঙ্গত। তাই বলিতেছি কাগজে পত্রে পাকীস্থান নাকচ করিলেও, আসামকে উহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রথমাবস্থা হইতেই লীগপন্থী মুসলমান-প্রধান বাঙ্গলার সহিত জুড়িয়া দিলে কার্য্যতঃ একরকম পাকিস্থানই দেওয়া হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দুইদিক না রাখিয়া, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন ইহা বুঝিতে দেরী করিলে, তাঁহারাই সকলের বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিবেন, এই খাঁটি কথাটি আরও তাহাদের অবহিত হইতে বলি।

এদিকে আবার এই অখণ্ড ভারতের একত্ব রক্ষা করিয়াই গণ-পরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল যে গণতান্ত্রিক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন এবং গান্ধীজী যাহা সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন—সমগ্র ভারতবাসীর সেই স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্য ও ভারতের একত্ব রক্ষাকল্পে একমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসীর সমস্বরে দৃঢ় সঙ্কল্প করা উচিত "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

পার্লেমেণ্টে পাকিস্থান প্রশ্ন

এ-কথা সকলেই জানেন মিঃ মহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্থান ছাড়া আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইবেন না। তিনি বলেন, "আমাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, আচার পদ্ধতির জন্য পাকিস্থান ছাড়া কোনরূপ মীমাংসা সম্ভব নয়। আমাদিগকে আমাদের মাতৃভূমি দাও, হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান নির্দ্দিষ্ট রহুক। There is no other way but Divide India. Give Muslims their homeland and give Hindns Hindusthan, মোটামুটি দেখিতেছি এখন ভারতে দুইটি সম্প্রদায় আছে—একটী পাকিস্থান-পন্থী; অপরটি পাকিস্থানবিরোধী জাতীয়তাবাদী ভারতবাসিগণ। কোন অবস্থায় পাকিস্থান সম্ভব নয়, তাহা ১৬ই মের প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। গ্রুপিং-এও পাকিস্থান আসে না। ইহা ছেলে-ভুলানো খেলনা মাত্র। ৩৬ : ৩৪-এ যেখানে অনুপাত, সেখানে মিঃ জিন্না-কল্পিত পাকিস্থানের ছায়াও ধরা যায় না। যাহা

হউক এমন বহু জাতীয়তাবাদী ভারতের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী মুসলমান আছেন, যাঁহারা পাকিস্থান-প্রশ্নকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের জাতীয়তা, স্বাধীনতা, মিলন এবং স্বরাজের পরিপন্থী মনে করেন। আবার বাবু যোগেন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ মুষ্টিমেয় অ-মুসলমান পাকিস্থানের পক্ষভুক্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের সংখ্যা কম বটে, কিন্তু তাহারা অ-মুসলমান। সুতরাং ভারতীয়গণকে কংগ্রেসের বা মুসলীম লীগের লোক, হিন্দু বা মুসলমান এইরূপ লোকবিভাগ করিলে খুবই ভুল হইবে। যাহা হউক মিঃ জিন্নার সংজ্ঞানুযায়ী পাকিস্থান সম্বন্ধে পার্লেমেন্টের সভ্যদের নিকট মিঃ জিন্না কিরূপ ফললাভ করিয়াছেন, তাহাই এখন একমাত্র বিবেচ্য বিষয়।

পার্লেমেন্টে এখন তিনটি দল আছে, একটি শ্রমিক (Labour) দ্বিতীয় উদারনৈতিক, তৃতীয় রক্ষণশীল। বর্ত্তমান গভর্ণমেন্ট শ্রমিক দলদ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন, পাকিস্থান অসম্ভব; তাঁহারা বলেন,—

"আসাম, পশ্চিম বঙ্গ (স-কলিকাতা), পঞ্চনদ প্রভৃতি স্থানের কথা ধর। পাকিস্থান একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান করিয়া তাহাতে অ-মুসলমান প্রধান, আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত অযৌক্তিক আর শিখদিগকেই বা পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা কিরূপে সম্ভব? যে যুক্তিবলে এই সমস্ত স্থান পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাও,সেই যুক্তিতেই এই সমস্ত স্থানের বাহিরে থাকা সমীচীন। Every argument that can be used in favour of Pakisthan, can equally in our view be used in favour of the non-Muslim areas from Pakisthan. This point would particularly affect position of Sikhs."

দুইটি রাজ্য এবং পাকিস্থানের কল্পনা বাতিল করিয়া দিয়া মন্ত্রিমিশন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "We are therefore unable to advise the British Government that the power which at present resides in British hands should be handed over to the entirely separate soverign states."

ইহার পরেও জিন্না নানাপ্রকারে চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়া লণ্ডনে গিয়াও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, "পাকিস্থান না হইলে অভাবনীয় ব্যাপার হইবে, মুসলমান কিছুতেই শান্ত হইবে না।"

এই সমস্ত উক্তির কি ফলাফল তাহা পরে নিবেদন করিব। কিন্তু পার্লামেন্টে তিনি কি প্রকার ব্যর্থকাম হইয়াছেন, তাহাই আলোচ্য বিষয়। রক্ষণশীল দলের নেতা মিঃ চার্চ্চিল থাকিলেও ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনই বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষ। গত ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় তিনি ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদের একজন প্রধান স্তম্ভ ছিলেন, বৃদ্ধ চার্চ্চিলের মত তিনি গলিত-নখদন্ত নহেন। বিরোধীগণ মিঃ চার্চ্চিলের কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, Shame, dirty প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করিয়াছে, আর স্যার জনের কথা বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া শুনিয়াছে। বিশেষতঃ তিনি বহুদিন বাঙ্গলা প্রদেশে ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

"পাকিস্থান অসম্ভব। অর্থনৈতিক দিক দিয়াই বল দেশরক্ষার দিক দিয়াই বল, যে কোন দিক দিয়াই ধর না কেন, পাঞ্জাবে হিন্দু, মুসলমান এবং শিখদের এক সঙ্গে থাকাই সঙ্গত, আর আসাম এবং স-কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গকে পাকিস্থানের অন্তর্গত করা অত্যন্ত অন্যায়, অসঙ্গত, তিনি বলেন—

"The North-western frontier seems to be comparatively simple. You have N. W. F. Province, you have Sind and Beluchisthan. But the Punjab presents features which are deserving of special consideration under any plan and I should very greatly hope that some way would be found, however situation may ultimately shape itself, of keeping together the communities in the Punjab—Sikhs, Moslims and Hindus—I am glad to learn from something said the other day that responsible leaders of Muslims have expressed themselves as representing to that conception.

"This when we come to North East India, that the canception of Partition presents in my view the most formidable difficulty.

"Assam and West Bengal,

"Not only in Assam, an area in which there is not a Moslem majority, but Bengal in the west contains a community which is predominatly Hindu and the great city of Calcutta which is the only effective outlet for the products of Bengal, as 75 p c. Hindu I think that arguments that could be advanced on one side or the other in regard to Calcutta in relation to the Partition of India present very formidable difficulties indeed."

আসাম, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ এবং পঞ্চনদের উল্লেখ করিয়া স্যার জন এণ্ডারসন যে-সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা অকাট্য। পরে এক সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে লীগপন্থীগণকে একেবারে মধ্যগঙ্গায় নিমজ্জিত করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী হিন্দু মুসলমান যেমন অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনার সতত যত্নশীল, রক্ষণশীল-দল-নায়ক স্যার জন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"It is the most important that the fundamental unity of India as constitutional entity should be preserved,"

ইহার পরে যদি মিঃ জিন্না আশা করেন যে, রক্ষণশীলদল

ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার পাকিস্তানের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবে এবং অপর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা তাঁহার কথা গ্রহণ করিবে, তবে আমরা বলিব, তিনি কি ভ্রান্তপথে আমাদের এক্টা সংখ্যাধিক ভ্রাতৃগণকে ভারতের উন্নতির পথে অন্তরায় করিয়া তুলিতেছেন !

কেবল স্যার জন নয়, কোন রক্ষণশীল সদস্যই তাঁহাকে এবং আর্ল উইন্টারটন্‌কে সমর্থন করেন নাই। অপর একজন রক্ষণশীল সদস্য ও স্যার ষ্ট্যানলি রীডও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভরসা করি মিঃ জিন্না লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিলাতের অভিজ্ঞতার সহায়তায় গণ-পরিষদে সম্পূর্ণ সহযোগিতার ভাব লইয়া দেশের শাসনতন্ত্র রচনা করার সহায়তা করিবেন এবং গণ-পরিষদ তাঁহার ধীশক্তির সহায়তা পাইতে বঞ্চিত হইবে না'।

স্যার জন একটী বিষয় উল্লেখ না করিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে বাঙ্গলার গবর্ণর ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধেও অনেক বিষয় জানেন। কিন্তু এ-স্থানের সংস্কৃতি এবং হিন্দু-মুসলমান-প্রীতি সম্বন্ধে যদি একবার ভাবিয়া দেখিতেন তবে পূর্ব্ববঙ্গেরও যে ন্যায়ের দিক হইতে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত কস্মিন্‌কালেও হওয়া উচিৎ নয়, এরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেন।

পূর্ব্ববঙ্গে রামপাল, বাজাবাড়ীর মঠ, রাজবল্লভের বাড়ী, ইহার টোল চতুষ্পাঠী, বিক্রমপুর কোটালীপাড়ার বিদ্যাস্থান সবই একটা গৌরবের বস্তু ছিল। সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, আনন্দমোহন; গুরুপ্রসাদ, লালমোহন, মনোমোহন, কৃষ্ণগোবিন্দ, কালীকুমার, শ্যামাকান্ত, নবীনচন্দ্র, দুর্গামোহন, কালীমোহন, এবং কালীপ্রসন্ন, অশ্বিনীকুমার, সর্ব্বোপরি জগদীশচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাধকগণ সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী। কেদার রায় ও ঈশা খাঁ শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। সীতারাম রায় (ভূষণার) স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। নবাব আবদুল্লাতি, নবাব আসাদুল্লা, কফিলুদ্দিন চৌধুরী, চাঁদ মিঞা প্রভৃতি সকলেই হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। এমতাবস্থায় এরূপ সংস্কৃতিপূর্ণ শান্তিময় পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে উল্লেখ না করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

মিঃ চার্চ্চিল ও ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সকলেই জানেন মিঃ চার্চ্চিলের পীড়াপীড়িতেই পার্লেমেন্টে ভারতীয় বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার যুক্তি এবং মিঃ জিন্নার লণ্ডনে বক্তৃতার যুক্তি এমনই একসুরে বাঁধা যে, মনে হয়, মিঃ চার্চ্চিল মিঃ জিন্নার পক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মনে হয় যেন, 'It is the voice of Jacob but the hand of Easu. কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় মিঃ জিন্নার "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে"র সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার ভীষণ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং নোয়াখালিতে হত্যা, জোর করিয়া বিবাহ, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও বলাৎকার প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা একবারও উল্লেখ করিলেন না। স্যার ষ্ট্যাফর্ড ক্রীপস প্রকৃষ্টভাবে সব বিষয়েই তো বিবৃতি দিয়াছেন। পরন্তু তিনি বলেন যেন ঐরূপ নৃশংসকার্য্য প্রকারান্তরে মিঃ চার্চ্চিলের কাছে প্রশ্রয় পাইতেছে। পক্ষান্তরে মিঃ চার্চ্চিল বলেন, স্যার ষ্ট্যাফর্ড যে ভারতীয় বিভিন্ন দলকে হাঙ্গাম-হুজ্জতি করিতে নিষেধ করিতেছেন এবং যাহাতে গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বোধী দলও যোগ দিয়াছে, তাহাতেই ভারতের দাঙ্গা বাড়িবে—

"Sir Stafford Crip's appeal to parties in India to abstain from violent propaganda and innective against each other might have the effect of bringing about a recrudescencé or intensification of the grave disorders which had occured"—

কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল এমনভাবে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই মনে হয়, তিনি যেন 'পাকিস্থান অথবা সংগ্রাম' এইরূপ-ভাবেই উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, পার্লামেন্টে অন্যতম সদস্য মিঃ টমাস রীড্ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"Mr. Churchhill's speech was tantamount to an incitement to the minorities to continue to block the way to Self-Government."

বস্তুতঃ মিঃ চার্চ্চিল যদি ভারতের উন্নতির পথে অন্তরায় না হইতেন, যদি ১৯৩১ সালে পার্লেমেণ্ট অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীকে "নেংটা লোকটা" বলিয়া উপেক্ষা না করিতেন, তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিতেন, এই দুরন্ত শীতকালেও সেই কটিবস্ত্র পরিহিত, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষটি কেবল যষ্টির সহায়তায়, বার্দ্ধক্য ও স্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া প্রাণপাত করিয়া নোয়াখালীর মত অস্বাস্থ্যকর, অধঃপতিত স্থানে হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য, দিবারাত্রি কিরূপ অনন্ত সাধনায় রত আছেন। দেখিতেন, গত আড়াইমাস মধ্যেও সেখানে অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল না, মিঃ জিন্না একবার এ সমস্ত উপদ্রুত স্থান দেখিলেন না, আর পণ্ডিত জওহরলাল তিনদিনের চেষ্টায় বিহার শান্ত করিয়া দিয়াছেন। আরও দেখিতেন জাতীয়বাদী জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বদা মিলনের কথাই বলিতেছেন, আর সেদিনও জিন্না বলিয়াছেন, 'সব ন্যায়সঙ্গত উপায় বিদায় গ্রহণ করিল। আমরা যে কোন পথ অবলম্বন করিতে পারি।' মিঃ গজনফর আলি কখনও বলিতেছেন, ৩০ কোটি হিন্দু, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই ভারতের মুক্তি, কখনও বলিতেছেন, হিন্দুরা ত' গোলামের জাতি, আবার কখনও বলিতেছেন, আমরা অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগ দিয়াছি আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অন্যতম কর্ম্মপন্থা হিসাবে। এই সব কথাতেই ফল বিষময় হয় কিনা একবার কি মিঃ চার্চ্চিল লক্ষ্যই করিলেন না? অতঃপরে মিঃ চার্চ্চিলের কথা শুনিয়া তাঁহার নিজের দলের লোকেরাও মনে করেন, তিনি কোন কার্য্যকরী কথা বলিতে বা সুযুক্তি দিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহার পক্ষে না থাকিয়া গভর্ণমেন্টের পক্ষেই আছেন, ভারতের জন্য যাহা নির্দ্দেশিত হইয়াছে ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতে পারে না,—ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মিঃ চার্চ্চিলের দৈহিক শক্তি হ্রাস ও বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুদ্ধিশক্তিও আর স্বাভাবিক নাই, তাহাই কি মনে হয় না?

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাহার কথা mischivous বলিয়াছেন, বার্ম্মার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ও বর্ত্তমান সময়ের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ 'উ'স' বলিয়াছেন, "A finished leader"—আমাদের কিন্তু মনে হয় softening of the Brainআরম্ভ হইয়াছে।

মিঃ চার্চ্চিল ও ভারতের উন্নতি

মিঃ চার্চ্চিল যখন বক্তৃতা দেন, তখন মিঃ জিন্না খুব কান পাতিয়া শুনেন এবং বক্তৃতাটি বলেন 'খুব ব্রিলিয়েন্ট'।

মিঃ চার্চ্চিলের মতে ব্রিটিশগণের শাসন পরিবর্ত্তনে অনিচ্ছা নাই, আর অনিচ্ছুক দেশ বা জনপদকে সাম্রাজ্যের ভিতরে রাখিবার প্রয়োজনও নাই। তবে সকলে একমত না হইলে কিছুতেই ভারতকে হাতছাড়া করা হইবে না। ১৮৮৫ সালে তাহার পিতা Randolf Churchhill যেমনটি বলিয়াছিলেন, তিনিও তাহাই মনে করেন—"ইংরাজ শাসন সমুদ্রের উপরে ভাসমান তৈলরাশির মত। ইহার ভিতরের সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও দুর্য্যোগ এই বহিরাবরণের সহায়তায়ই নিবৃত্ত থাকিবে। সুতরাং তাহার মতে ইংরাজ চলিয়া গেলে ত বিশৃঙ্খলাই চলিবে। তাই ইংরাজ থাকিবেই! আর যদি পাকিস্থান হয় তবে ইংরাজ চলিয়া যাইতে পারে, পাকিস্থান না হইলে ইংরাজ যাইবে না।" কিন্তু পাকিস্থান যে অসম্ভব তাহা স্যার জন এণ্ডারসন ও মিঃ বিড্ প্রমুখ চার্চ্চিলের দলের লোকেরাই বলিতেছেন। সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইতেই পারে না। মিঃ জিন্নার সমর্থক মিঃ চার্চ্চিলের ব্যাখ্যানুসারে—হিন্দুমুসলমানের ঐক্যের জন্য ইংরাজ সরকারের এদেশে থাকাই দরকার। সুতরাং ভারতবাসী যাহারা নিজহাতে ক্ষমতা চাহেন, তাহারা মিঃ জিন্নার অবলম্বিত নীতি সম্বন্ধে একবার প্রণিধান করুন। কেবল মিঃ চার্চ্চিলই যে তাহার সমর্থক তাহা নয়। লর্ড সাইমন এবং ভারতের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড লিনলিথ্গোও বটেনই।

গণ-পরিষদ বৈধ কি না?

গণ-পরিষদের অধিবেশন চলিতেছে। সাময়িক সভাপতি হইয়াছিলেন পাটনার শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ এবং স্থায়ী সভাপতি হইয়াছেন ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। গণ-পরিষদের উদ্দেশ্য ইহার গুরুতর দায়িত্ব ও সমদর্শিতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের প্রতি নিরপেক্ষতা অবলম্বন সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় এবং স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকিশন যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা অতিশয় বিজ্ঞমস্তিষ্ক-প্রসূত বাস্তা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু মিঃ চার্চ্চিল বারবার প্রশ্ন করিয়াছেন, লীগ যোগদান করে নাই, এমত অবস্থায় গণ-পরিষদ বৈধ কি না? গভর্ণমেন্ট পক্ষে মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার বলেন, "লীগকে যোগদান করিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি। আশাকরি, গণ-পরিষদ চলিতেছে, চলিবেই। লীগ যোগদান করিবে।" মোটকথা, গণ-পরিষদ চলিবে না এরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এবং বৈধ নয় এরূপ কথার কোন উত্তর দেওয়াই তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পণ্ডিত জওহরলাল বলিতেছেন—

"আপনারা আসুন, কিন্তু সহযোগিতার ভাব লইয়া আসুন। আসুন ভাল, না আসিলেও গণ-পরিষদের কাজ ব্যাহত থাকিবে না। এবং গণ-পরিষদ যে বৈধ তাহাতে সন্দেহ নাই।"

ভরসা করি মুসলীম লীগ অতঃপরে সহযোগিতার ভাব লইয়া গণ-পরিষদে যোগ দিবেন এবং একত্র হইয়া ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন।

এখন প্রশ্ন এই, লীগের সদস্যগণের অনুপস্থিতিতে যে শাসনতন্ত্র রচিত হইবে তাহা লীগ গ্রহণ করিতে বাধ্য কি না? প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিমিশনের সভ্যগণ বলিতেছেন—"তাহারা বাধ্য থাকিবে না।" তবে পণ্ডিত জওহরলাল-প্রমুখ জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ সমগ্র ভারতের মুক্তির জন্যই প্রয়াস করিতেছেন। কোন সম্প্রদায় বা দলের হইয়া তাঁহারা কাজ করিবেন, এরূপ বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যদি তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বা দল বা জাতি-বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভারতের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করিয়া, জাতিধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করেন এবং সেই নীতি অনুযায়ী রচিত শাসনতন্ত্র গ্রহণযোগ্য হয়, তবে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টই বা কেন গ্রহণ করিবে না? যদি সেইরূপ সার্ব্বজনীন শাসনতন্ত্র প্রস্তুত হইয়া জগৎসমক্ষে উপস্থিত করা হয়, তবে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা অসমদর্শিতা না থাকিলে জগতের সভ্যজাতিই বা তাহা অনুমোদন করিবে না কেন? যদিচ মিঃ জিন্নার সমর্থক মিঃ চার্চ্চিল হুমকি দিয়াছেন, ৯ কোটি মুসলমান এবং ৬ কোটি অনুন্নত জাতির উপরে কি উন্নত জাতিগুলি ইংরাজ সৈন্যের সহায়তায় প্রভুত্ব করিবে? ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্যগণ সেই আশঙ্কা করেন বলিয়া ভাবিবার কোন কারণ নাই। সম্প্রতি তো পণ্ডিত জওহরলালের প্রস্তাবটি খুবই উদার, বিচক্ষণতাপূর্ণ এবং সার্ব্বজনীন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার প্রস্তাবটি এই—

(১) স্বাধীন সার্ব্বভৌম ভারতের যুক্তরাষ্ট্র হইবে—(ক) সমস্ত ইংরাজশাসিত প্রদেশ (খ) স্বাধীন অথবা করদ বা মিত্ররাজ্য লইয়া (গ) এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্য স্থান—যদি তাহারা স্বেচ্ছায় আসে তাহাদের লইয়া।

(২) এই যুক্তরাষ্ট্রের মূলাধার হইতেছে জনসাধারণ। ইহার প্রত্যেকটি লোকের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে ন্যায় বিচার, সমান মর্য্যাদা, সমান সুযোগ ও আইনের চক্ষে সমান আচরণ পাইবার অধিকার থাকিবে। বাক্যে, ধর্ম্মে, বৃত্তিতে তাহাদের সমান স্বাধীনতা থাকিবে এবং উপাসনায় বা পূজায় ও সঙ্ঘগঠনেও তুল্যাধিকার থাকিবে। সংখ্যালঘু, পশ্চাৎপদ এবং খণ্ড-অঞ্চলের জন্য এবং অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য রক্ষাকবচ থাকিবে। ভারত অখণ্ড থাকিবে। অন্যান্য সভ্যজাতির যেরূপ আইন-কানুন, ভারতেরও সেইরূপ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ও জল-স্থল ও অন্তরীক্ষে সার্ব্বভৌম অধিকার থাকিবে। প্রাচীন সভ্যতার ও সংস্কৃতির পীঠস্থান লীলাক্ষেত্র এই ভারতভূমি বিশ্বের দরবারে তাহার যোগ্য আসন লাভ করিবে ও জগতের শান্তি ও মানব কল্যাণ সাধনে একান্ত ব্রতী হইবে।"

এই প্রস্তাবটিতে কোনরূপ ক্ষুদ্রতা বা সাম্প্রদায়িকতা নাই। প্রত্যেকটি নরনারীর সমান অধিকারবলে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র ও সুযোগ আছে, আর আছে ভারতের অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধারের কথা। আছে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সকলের মহামিলনের কথা। আমাদের মনে হয়, এই আদর্শে রচিত শাসনতন্ত্র কোন জাতি বা গভর্ণমেণ্টের প্রত্যাখ্যান করিবার সাধ্য হইবে না। তবে এই সাধনায় ভারতের প্রত্যেক নরনারীকে সজাগ ও সাবহিত থাকিতে হইবে। এই সাধনায় আত্মত্যাগও সার্থক। পণ্ডিত নেহরু সত্যই বলিয়াছেন "মৃত্যুর ছায়া-সমন্বিত দীর্ঘপথ আমরা অতিক্রান্ত হইয়া আসিয়াছি। আবার প্রয়োজন হইলে সেই পথে চলিতে আমরা দ্বিধাসঙ্কোচ করিব না।"

লণ্ডনে পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল লণ্ডন হইতে ক্ষুণ্ণ হইয়া আসিয়াছেন। ইহার অর্থ এই নয় যে, বিলাতের মন্ত্রীমণ্ডলী তাহার সমস্ত উদ্যম

ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কারণ, গণপরিষদ চলিবার সম্বন্ধে কোন বাধাই হয় নাই। তবে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ১৬ই মের প্রস্তাবের উপরে যে ভাষ্য দিয়াছেন, তাহাতে এত নূতন কথা সংযোজিত হইয়াছে যে, আমরা যে আশা লইয়া কাজে অগ্রসর হইয়াছি, প্রারম্ভেই এইরূপ নূতন নূতন কথায় আমরা বড়ই ব্যথিত হই, বস্তুতঃ নানা জায়গায় ও নানা সময়ে এইরূপ কথান্তর হইতেছে যে, এখনও স্পষ্ট করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কি উদ্দেশ্যে এই সব করিতেছেন। তাহারা কি প্রকৃতই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে ইচ্ছুক, না খান আবদুল গফুর খাঁ যে বলিতেছেন, কংগ্রেস ও লীগকে লইয়া খেলাইতেছেন, ইহাই ঠিক? আমরা এখনও প্রকৃত ভাব ধারণা করিতে পরিতেছি না। মিঃ জিন্না যেমন বলেন, চার্চ্চিলও বলিয়াছেন, স্যার ষ্টাফর্ড ক্রীপস হিন্দুর (কংগ্রেসের অর্থ তাহাদের মতে হিন্দু) পক্ষপাতী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ-কথা তো যথার্থ নয়ই, বরং তাহারা লীগকেই অতিমাত্রায় তোষণ করিতেছেন। গত পার্লেমেণ্টি আলোচনায় কমন্সসভায় মিঃ সিলভারম্যান সত্যই বলিয়াছেন—

"Mr. Silverman asked whether it was right that recalcitrant minority simply by the exercise of intransigence should be able to stay the march of the whole people for independence. He thought if the Cabinet Mission had erred, it erred more towards the side of the Muslims rather than to the Congress."

এখন প্রত্যেক বিষয়েই মন্ত্রিমিশন যে লীগের প্রতি অতিমাত্রায় তোষণ-নীতি আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমরা একটি একটি করিয়া প্রমাণ দিতেছি—

(১) গত মার্চ্চ মাসে মিঃ এটলি বলিয়াছিলেন, সংখ্যাল্পের (minority) জেদে সংখ্যাগরিষ্ঠের উন্নতি ব্যাহত হইবে না। আবার এবার বলিতেছেন—

"অনিচ্ছুক ভারতের কোন অংশের উপর শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। লর্ড পেথিক লরেন্স লর্ড সভায় মিঃ এট্লির মার্চ্চ মাসের কথার প্রতিধ্বনি করিলেও ঐ শব্দটি এমন পৃথক যে ইহাতে ইচ্ছানুরূপ অর্থ করাও অসম্ভব নয়।

(২) কোন অংশ (Part) বলিতে প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতের যে কোন অংশকেই ধরিবেন। কিন্তু মিঃ জয়াকর বলেন—এই কথা কেবল মুসলীম লীগের বেলাই প্রযোজ্য হইবে। অবশ্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আজও সেরূপ ব্যাখ্যা করে নাই। এবং এইরূপ মনের ভাব মিঃ জয়াকর কিরূপে জানিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। যদি ইহা প্রকৃতই মন্ত্রীমিশনেরও মনোগত ভাব হয়, তবে তাহাও লীগের প্রতি তোষণ-নীতির অন্য নিদর্শন।

(৩) মন্ত্রীমিশন এবং মিঃ এটলি যে প্রস্তাব-সম্বলিত হোয়াইট পেপারে কেবল ১৯ ধারাটির উল্লেখ করিয়া ১৫ ধারাটি উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাহাও লীগ-তোষণ-নীতিই মনে হয়। কারণ ঐ ধারাটি বিবেচনা করিলে বলিতেন না যে "গ্রুপে গিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিবার পূর্ব্বে কোন প্রদেশ বাহিরে আসিতে পারিবে না।"

(৪) প্রত্যেক সভ্যের এক একটি ভোট থাকিবে ইহা এই প্রথমে জানা গেল। ইহার পূর্ব্বে কিরূপ ভোট হইবে তাহা কিছুই বলেন নাই।

(৫) ফেডারেল কোর্টের কাছে উপস্থিত করিবার জন্য বৃহদাকারের সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের কথা ছিল। এখন সকল প্রকার প্রশ্নের কথাই বলা হইতেছে।

(৬) মন্ত্রিমিশন ফেডারেল কোর্টে যাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত মানিবেন না। তবে সে যাওয়ার মূল্য কি এবং উহা সময়ের অপব্যহার কিনা তাহা সকলেই বুঝিবেন। মানিবেন না, ইহা পূর্ব্বে শোনা যায় নাই।

(৭) স্যার ষ্টাফর্ড ক্রীপস বলিয়াছেন, লীগ যোগদান না করিলে দেশীয় রাজ্যগুলি যোগদান করে কি না সন্দেহ। এবিষয়ে দেশীয় রাজ্য কিছু বলে নাই। অথচ স্যার ষ্টাফর্ড যেন লীগ না আসা পর্য্যন্ত তাহাদিগকেও দূরে থাকিতেই ইঙ্গিত করিতেছেন বলিয়া মনে হয়।

সমস্ত অবস্থা দেখিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত মনোভাব সম্বন্ধে প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যক্তিই সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন।

এট্‌লি সাহেবের নিকটে এমন নূতন কথা শুনা যাইতেছে বটে। কিন্তু তিনি কথায় বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন। লর্ড সভায় কিন্তু লর্ড সাইমন, মিঃ চার্চ্চিলের মতই মিঃ জিন্নার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষক। তবে ফল উভয়ের কথারই সমান হইবে বলিয়া মনে হয়।

গত ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের (এখন লর্ড সাইমন) যে একটি রয়েল কমিশন বসিয়াছিল তাহাতে মিঃ এটলিও আসিয়া ছিলেন। আমাদের একটি রসজ্ঞবন্ধু কালিকা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বক্তৃতায় বলিতেন, সাইমন না ছাইমন। আর এটলি না আরও আটলি। এবারকার মিঃ এটলির একরকম প্রতিশ্রুতিতে পণ্ডিত জওহরলালকে বিলাতে লইয়া যাওয়ায় এবং অন্যরকম কথা শুনাইয়া দেওয়ায় মনে হইতেছে প্রকৃতই তিনি আটিতে চাহিয়া নিজের নামের সার্থকতা করিতেছেন। কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো, একথা যেন তিনি না বিস্মৃত হন। গণ-পরিষদ এখন পর্য্যন্ত ৬ই ডিসেম্বরের কোন কথারই উত্তর দেয় নাই। যদি গণপরিষদ কেবল হোয়াইট পেপার অর্থাৎ ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লয় এবং পরবর্ত্তী কোন ভাষ্যের প্রতি কর্ণপাত না করিয়া গণপরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া ক্রমশঃ অগ্রগতির দিকেই চলিতে পারে, তবে গণপরিষদের কার্য্য বিশ্বস্তভাবে সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিব।

মোট কথা, বৃটেন যতই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধের কথা বলুক না কেন, ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির পক্ষে ক্ষমতা এখন গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

বিজয়লক্ষ্মীর বিজয়াভিযান

সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘে (ইউনো) দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের প্রতি আসন ও ঘৃণ্যব্যবহার সম্বন্ধে ভারতীয়গণের প্রতিনিধি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত যে আন্দোলন করিয়াছেন, তাহা সাফল্যযুক্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতিনিধি ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌সের সম্পূর্ণ সহায়তা করিলেও বিজয়লক্ষ্মী তিনভাগের দুইভাগের উপরে ভোট পাইয়া জয় লাভ করিয়াছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর সাফল্যে মনে হয় ন্যায়, সত্য ও সমদর্শিতার প্রশ্নে বিশ্বের দরবারে—বিজয়লক্ষ্মী সর্ব্বদাই ভারতমাতার কণ্ঠ বিজয়মাল্যে সুশোভিত করিয়া দিবেন। এই ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতীয় ব্যথা-বেদনায় যেরূপ সমবেদনা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে মিঃ মলোটভকে আমরা ভারতীয়গণের পক্ষ হইতে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। ফ্রান্স, পোলাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেশও ভারতবর্ষকে সমর্থন করিবার জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী আমেরিকা হইতে লণ্ডন হইয়া ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি সাংবাদিকদের নিকটে বলিয়াছেন যে, তিনি যে সমস্যার সমাধানে গিয়াছিলেন তাহা কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসিদেরই নহে, উহা সমগ্র মানবজাতির চিন্তার বিষয়, আর উহার ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসার উপরে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করিতেছে।

কংগ্রেসের মীরাট অধিবেশন

মীরাট সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ছয় বৎসরেরও অধিক কংগ্রেস অধিবেশন হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে অধিবেশন হইয়াছিল ১৯৪০ সালে চতুঃপঞ্চাশৎ অধিবেশন ফেব্রুয়ারী মাসে রামগড়ে। ইহার পরেই বহু নেতাকে কারাগৃহে বাস করিতে হয়। ১৯৪৫ সালে তাঁহারা মুক্ত হন এবং ১৯৪৫ ও ১৯৪৬ সালে কেবল বড়লাট, অথবা পার্লেমেণ্টের সভ্য বা মন্ত্রীবর্গের সহিত আলাপ আলোচনায়ই অতিবাহিত হইয়াছে। কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে কলিকাতায় ও নোয়াখালী, কুমিল্লা, বেহারে ও গড়মুক্তেশ্বরে যে আত্মঘাতী দাঙ্গা হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে এরূপ আশা করা যায় নাই। যাহা হউক, সাফল্যের সহিতই কংগ্রেসের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এবার সভাপতি হ'ন আচার্য্য কৃপালনী। ইনি বহু বৎসর যাবৎ কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী এবং সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় স্বার্থত্যাগী অনন্ত-কর্ম্মা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতির সম্মান দিয়া কংগ্রেস খুব উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছে। তাঁহার অভিভাষণে কর্ম্মপ্রবাহ এবং বিচক্ষণতার নিদর্শন পাওয়া যায়।

তাঁহার এই সম্মানে বাঙ্গলা দেশের আনন্দ এবং প্রীতি একাধিক কারণে। প্রথমতঃ দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থানের পরে তিনি মহাত্মাজীর সঙ্গে থাকিয়া দেশবন্ধু-স্মৃতভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে খুব বেশী পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ গত নোয়াখালীতে বিপদের সময় তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়া যেরূপ পরিশ্রম ও আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহা প্রাণশীলতার পরিচায়ক।

তৃতীয়তঃ তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুচেতা বাঙ্গালী মেয়ে এবং বাঙ্গলার উপদ্রুত ও লাঞ্ছিত স্থানসমূহে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্য যেরূপ অনন্যসাধনায় আত্মনিয়োগ

করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালীমাত্রেই গৌরব বোধ করিবেন। এই কর্ম্মীযুগলকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

এবারকার অধিবেশনে যে সমস্ত প্রস্তাব হয়, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :

প্রথম প্রস্তাবটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু উত্থাপন করেন এবং পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ তাহা সমর্থন করেন। এই প্রস্তাবে বিগত সাড়ে ছয় বৎসরের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব অবসানে এবং অতীতে ভারতের জনসাধারণ স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনায় যে মনোভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল তদনুরূপ মনোভাব লইয়া সম্মিলিত জাতি হিসাবে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিপদের সম্মুখীন হইয়া সমস্ত প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত পুনরায় গ্রহণ করা হয়।

বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই ব্যাপারে কলিকাতা, নোয়াখালি ও বিহারে অনুষ্ঠিত ঘটনার জন্য এবং ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও নারীহরণ ইত্যাদির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়। পরস্পরের প্রতি প্রযুক্ত হিংসা ও ঘৃণামূলক প্ররোচনা ও প্রচার, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে সর্ব্বসম্প্রদায়কে সাবধান করিয়া দেওয়া হয়।

দেশীয় রাজ্যসমূহ সম্বন্ধে প্রস্তাবে বলা হয় যে, কয়েকটি অল্পসংখ্যক দেশীয় রাজ্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতেছে, তাহার তালে পা ফেলিয়া চলিতেছে, কিন্তু অনেক দেশীয় রাজ্য যে কেবল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে নাই তাহা নহে, তাহারা জনগণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, এজন্য কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। রাজনীতিক বিভাগ ভারত সরকারের কর্ত্তৃত্বের বাহিরে থাকিয়া যে ভাবে কাজ করিতেছে, তাহা দেশীয় রাজ্যের প্রজাসমূহের অনভিপ্রেত ও প্রতিক্রিয়াশীল। কংগ্রেসের এই প্রস্তাবেই রাজনীতিক বিভাগকে ভারত-সরকারের ক্ষমতা-বহির্ভূত করিয়া রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। সংশ্লিষ্ট প্রজাগণের সম্মতিব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহকে বৃহত্তর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা বা তাহাদের লইয়া যুক্তরাজ্য গঠনের পরিকল্পনা সম্বন্ধেও এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের অসমর্থন জানান হয়। দেশীয় রাজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কটহেতু এইরূপ ঘোষণা করা হয় যে, দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতের বৃহত্তর সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কাশ্মীর রাজ্যে নিপীড়নমূলক পরিস্থিতির জন্য প্রতিবাদ জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এতদ্ভিন্ন দক্ষিণ-আফ্রিকা, পূর্ব্ব-আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, কংগ্রেসের নির্ব্বাচন-ইস্তাহারে বর্ণিত ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গত সাড়ে ছয় বৎসরের মধ্যে যে সব জাতীয় নেতা ও দেশসেবক পরলোকগমন করেন, তাঁহাদের সম্পর্কে একটি শোকমূলক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

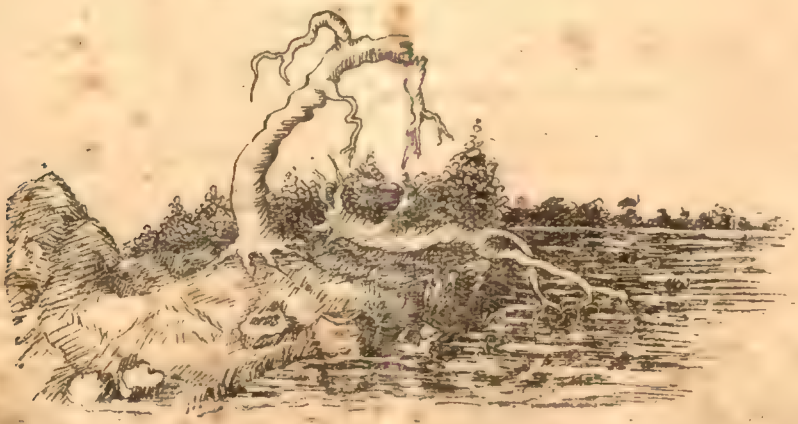

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মধ্যে বামে—'নদীসৈকত' ফটো—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

উপরে—'গ্রামপথে' ; মধ্যে দক্ষিণে—'প্রতীক' , নীচে—'কপোতাক্ষী' ফটো— শ্রীনিশানাথ মজুমদার

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

বঙ্গশ্রী

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

LIBRARY

চতুর্দ্দশ বর্ষ } মাঘ—১৩৫৩ { ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

বেদে ব্রজলীলা

শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী দেবশর্ম্মা

দুই

নিম্নে শ্রুতি হইতে যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার বৈদিকত্ব ও সুপ্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ব্রজলীলার বৈদিক প্রমাণ :

আধুনিক বিদ্বান্‌গণ ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ-ইতিহাসকে অর্ব্বাচীন ও প্রক্ষিপ্তবাদে পূর্ণ বলিয়া মনে করেন। এমন কি, উপনিষদেও ইঁহারা প্রাচীন ও নূতন ভেদ ধরেন। কিন্তু বেদের মন্ত্রভাগের মধ্যে যাহা অধুনা উপলব্ধ, তাহার প্রত্যেকটি মাত্রারও হিসাব আছে বলিয়া ইঁহারা বেদমন্ত্রে প্রক্ষিপ্তবাদের কথা তুলিতে এখনও সাহস করেন নাই।

পণ্ডিতকুলধুরন্ধর শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ সূরি খিল হরিবংশে তাঁহার বিখ্যাত 'ভারতভাবদীপ' টীকায় কয়েকটি বেদমন্ত্রের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই মন্ত্রগুলির সায়ণের ভাষ্য* অন্যরূপ। নীলকণ্ঠের পাণ্ডিত্যও সর্ব্বসম্মত এবং তাঁহার ব্যাখ্যাও সর্ব্বজনগ্রাহ্য। ইহা হইতে দেখা যায়, ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রায় প্রত্যেকটি লীলারই বেদে উল্লেখ আছে। মন্ত্রগুলি নীলকণ্ঠের টীকাসহ এখানে দেওয়া হইল।

১। শকটভঞ্জন (হরিবংশ। বিষ্ণু। ৬। ৪-৭)।

'পৃথু রথো দক্ষিণায়া অযোজ্যেনং দেবাসো অমৃতাসো অস্থুঃ।
কৃষ্ণাদুদস্থাদর্য্যা বিহায়শ্চিকিৎসন্তী মানুষায় ক্ষয়ায়েতেন।'
(ঋগ্বেদ।১।১২৩।১)

(পৃথু) মহান্ (রথো) শকটং (দক্ষিণায়াঃ) দিশঃ সম্বন্ধী মৃত্যুকরমিত্যর্থঃ (অযোজি) যোজিতঃ শত্রুভিরিত্যর্থাল্লভ্যতে। তম্ (এনং) রথং (দেবাসো) দেবাঃ (অমৃতাসো) অমৃতাঃ আ সমন্তাৎ (অস্থুঃ) পরিবার্য্য স্থিতবন্তঃ। এতস্মিন্নন্তরে সঃ রথঃ (কৃষ্ণাৎ) কৃষ্ণং প্রাপ্য তৎপ্রেরণেন (উদস্থাৎ) উত্থিতঃ (বিহায়) আকাশমাশ্রিতঃ বিশেষেন হয়তে গচ্ছতীতি বা, যন্ত্রোৎক্ষিপ্তগোলকবদাকাশমার্গেণোত্থায় পতিতঃ সন্নষ্ট ইত্যর্থঃ। ততশ্চ (অর্য্যা) ঈশ্বরী স্বামিনী মাতা তত্রত্যপ্রজা বা, (চিকিৎসন্তী) সংশয়বতী (মানুষায়) মানুষস্য (ক্ষয়ায়) নাশায় এতেন পততা রথেনায়ং বালকঃ কথং ন নাশিত ইত্যত্র কারণবিশেষমপশ্যন্তী সন্দিহানৈবাতিষ্ঠ মহীশ্বরকৃত্যমেতদিত্যবেদীতি ভাবঃ। এবমেব সর্ব্বেষামর্থানাং প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলকত্বমূহ্যম্। বেদোপবৃংহণত্বাদস্য শাস্ত্রস্য।

শত্রুগণ সেই বৃহৎ ও ভয়ঙ্কর শকট যোজিত করিয়াছিল। অমর দেবগণ শকটটি পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। ইতোমধ্যে সেই শকট কৃষ্ণকর্ত্তৃক আকাশে যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত গোলকের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া পতিত ও নষ্ট হইল। অতঃপর মাতা বা তথাকার লোকজন মানুষ মরিতে পারে এরূপভাবে পতিত রথদ্বারা এই বালক কেন মরিল না ইহার কারণ না বুঝিতে পারিয়া

*শ্রুতিমন্ত্রের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বহু প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। সায়ণাচার্য্য অধিযজ্ঞ ভাষ্য করিয়াছেন।

সন্দেহ করিতে লাগিলেন, অথচ ইহা ঈশ্বরের কৃত তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

এইভাবে সকল অর্থই প্রত্যক্ষ শ্রুতিমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ এই শাস্ত্র বেদেরই অর্থ নিশ্চিত করে।

২। পূতনাবধ (বিষ্ণু। ৬।৩০-৩৪)।

'হেতিঃ পক্ষিণী ন দভাত্যস্মানাষ্ট্র্যাং পদং কৃণুতে অগ্নিধানে।
শন্নো গোভ্যশ্চ পুরুষেভ্যশ্চাস্তু মা নো হিংসীদিহ দেবাঃ কপোত।'

ঋগ্বেদ। ১০।১৬৫।৩; অথর্ব ৬।২৭।৩

(হেতিঃ) আয়ুধবদ্বধকারিণী (পক্ষিণী) পূতনারূপা (অস্মান্) ব্রজস্থান্ (ন দভাতি) নাভিভবতি প্রত্যুত (অগ্নিধানে) জঠরাগ্নেধানে নিমিত্তে শিশোর্জঠরমগ্নিং স্তনদানেন তর্পয়িতুম্ (আষ্ট্র্যাম্) 'আরগতিদীপ্ত্যাদানেষু' আরয়তি পরলোকং গময়তি মৃত্যুনা প্রাহয়তি বা দেহং দীপয়তি বা আষ্ট্রী কৃষ্ণতনুস্তস্যাং (পদং) স্থানং (কৃণুতে) কৃষ্ণং পায়য়িতুং যমমৃত্যুরূপাং তাং তনুং স্পৃশতি স্মেত্যর্থঃ।

পূতনারূপা সেই বধকারিণী পক্ষিণী (বকী) ব্রজস্থ আমাদিগকে অভিভব করিতে পারে নাই, প্রত্যুত স্তনপান করাইয়া শিশুর (কৃষ্ণের) ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টায় যমমৃত্যুস্বরূপা কৃষ্ণতনু স্পর্শ করিয়াছিল।

গো ও পুরুষগণের মঙ্গল হউক। এই ব্রজে দেবগণ যেন আমাদিগকে হিংসা করেন না।

৩। যমলার্জ্জুন উদ্ধার (বিষ্ণু। ৮।১৭-২১)।

'যত্র মন্থাং বিবধ্নতে রশ্মীন্ যমিতবা ইব। উলূখলসুতানামবেদ্বিন্দ্র জল্গুলঃ। তা নো অদ্য বনস্পতী ঋষ্বাবৃষ্বেভিঃ সোতৃভিঃ ইন্দ্রায় মধুমৎ সুতম্।' (ঋগ্বেদ ১।২৮।৪)

(যত্র) উলূখলে (মন্থাং) মন্থানমিব মন্থানং লোকক্লেশকরং মাং (বিবধ্নতে) বিশেষেণ বধ্নন্তি মাতরঃ (রশ্মীন্) আদায় রশ্মিভিরিত্যর্থঃ। (যমিতবা ইব) নিগ্রহীতুমিব নতু বস্তুতো নিগ্রহীতুং মাতৃত্বেন ময়ি স্নিগ্ধত্বাৎ তেন (উলূখলেন সুতানাং) পীড়িতানাং কর্ম্মণি ষষ্ঠী। উলূখলপীড়িতান্ অস্মান্ হে (ইন্দ্র) মোচনসমর্থ (অব) রক্ষ। পাদাদিত্বাদাহ্যবাত্তমাখ্যাতম্। (ইন্দ্র) এবমেব ত্বং (জল্গুলঃ) অসি এনম্ মুঞ্চামীতি জল্পিতুং মাং চ গোপিতুং-ত্রাতুং লাতুম্ আদাতুং স্বাধীনং কর্ত্তুঞ্চ সমর্থোঽসি যতঃ অতোঽব মামিত্যর্থঃ। এবং যদা সর্ব্বান্ প্রার্থয়ন্নপি ন মোচনং লভতে ততো বনস্পত্যোরন্তরা গত্বা বন্ধনদাম ত্রোটিতুং বারম্বলং করোতি তাবদ্বনস্পতী এব উন্মূলিতৌ দৃষ্ট্বা বদতি (তা নো) ইতি। ত্রাতৌ (নৌ) অস্মাকং ব্রজবাসিনাং বনস্পতিভূতৌ অতিপ্রসিদ্ধৌ যমলৌ অর্জ্জুনজাতীয়ৌ ভো (বনস্পতী অদ্য ইন্দ্রায়) ইন্দ্রং প্রতি গন্তং (সুতং) তদুন্মূলনেন আত্মানং পীড়য়ন্তং তমেব (মধুমৎ) অমৃতযুক্তম্ অতিসম্যগিত্যর্থঃ। যতঃ (ঋষ্বৌ গতিমন্তৌ যুবাং স্থাবরত্বান্মুক্তৌ স্থ ইত্যর্থঃ। (ঋষ্বেভিঃ) গতিমদ্ভির্জ্জবৈঃ জবৈঃ (সোতৃভিঃ) অশ্ববন্ধনকবৈকপলাক্ষিতৌ।

'মাতৃগণ উৎপাতকারী আমাকে যেন নিগ্রহ করিবার জন্ত রজ্জুদ্বারা উত্তমরূপে মন্থনদণ্ডের স্তায় উলূখলে বন্ধন করিয়াছেন। হে ইন্দ্র, আপনি আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ এবং জল্গুল (ইহাকে মুক্ত করিতেছি এইরূপ বলিতে এবং আমাকে রক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিতে সক্ষম) সুতরাং আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' (কৃষ্ণ) এইভাবে সকলের নিকট প্রার্থনা করিয়াও মুক্তি লাভ না করায় দুই বৃক্ষের মধ্যে যাইয়া বন্ধনদাম ছাড়াইবার জন্ত বলপ্রকাশ করাতে বনস্পতি দুইটি উন্মূলিত দেখিয়া বলিতেছেন, 'হে আমাদের বৃক্ষদ্বয়! তোমরা স্থাবরত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া গতিশক্তি প্রাপ্ত হইলে। তোমরা ইন্দ্রের নিকট গমন কর। তোমাদের উন্মূলন জন্ত তিনি নিজকে কষ্ট দিয়াছেন। তিনি অমৃতস্বরূপ।'

৪। বৃকদর্শন (বিষ্ণু ৮):

'সুদেবো অদ্য প্রপতেদনাবৃৎ পরাবতং পরমাং গন্তবা উ অধাশয়ীত নির্ঋতেরুপস্থে ধৈনং বৃকা রভসাসো অদ্যুঃ।'

(ঋগ্বেদ।১০।৯৫।১৪)

পুরূরবসং প্রত্যুর্ব্বশী বদতি। (সুদেবঃ) শোভনস্বামিকো ব্রজঃ আত্মক্ষরলোপেণ বাসুদেবো বা (অদ্য প্রপতেৎ) অদ্যৈব উপদ্রবসমকালং গচ্ছেৎ। (অনাবৃৎ) নাস্তি আবৃৎ নিরোধকো যস্য তদৃশোঽপি (পরাবতং) পরমাং দূরাদ্দূরতরং (গন্তবৈ) গন্তুম্ (উ) নিশ্চিতম্ প্রপতেদিত্যন্বয়ঃ। অথ পক্ষান্তরে যদি সুদেবো ন প্রপতেত্তর্হি (নির্ঋতেরুপস্থে শয়ীত অধ) অথবা (এনং) ব্রজং বাসুদেবপরিজনং (রভসাসো) বেগবন্তঃ বৃকাঃ (অদ্যুঃ) ভক্ষয়েয়ুঃ তস্মাদ্বাসুদেবো বা তৎপরিগৃহীতো ব্রজো বা বৃকেভ্যো বিভেতি অতস্তাদৃশেনাপি ইন্দ্রিয়বৃকেভ্যঃ সুতরাং ভেতব্যমিতি ভাবঃ।

উর্ব্বশী পুরূরবাকে বলিতেছেন। শোভনস্বামিক ব্রজবাসিগণকে অথবা বাসুদেবকে বাধা না থাকিলেও দূর হইতে দূরে যাইতে হইবে। না গেলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, অথবা বেগশালী বৃকগণ বাসুদেবপরিজন ব্রজকে ভক্ষণ করিবে। সাধকের পক্ষে ইন্দ্রিয়জনিত উৎপাত হইতে ভয় বুঝিতে হইবে।

৫। কালিয়দমন (বিষ্ণু।১২)।

'যোঽহয়াহিমরিণাৎসর্দেত্যপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রম্।'

(যোঽহিঃ) সর্পঃ (অপঃ) যমুনাজলানি (ততর্দ) বিষসম্পর্কেণ নাশিতবান্। তমিন্দ্রো (অহন্) হিংসিতবান্। পীড়নমাত্রমত্র হন্ত্যর্থঃ। স চ অহিঃ (অপাদ্) পাদহীনঃ (অহস্তঃ) শ্বসন্ (ইন্দ্রম্ অপৃতন্যৎ) অযোধয়দিতি। এতেনাস্য সর্পরূপস্থমুক্তমতোঽহির্ব্রাখ্যো যত্রাপ্রসঙ্গস্তত্রায়মেব বোদ্ধব্যঃ।

যে সর্প বিষদ্বারা যমুনাজল নষ্ট করিয়াছিল, তাহাকে ভগবান্ পীড়ন করিয়াছিলেন। সেই পদহীন ও হস্তহীন সর্প শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

ইহা ছাড়াও ঋগ্বেদসংহিতা সপ্তম মণ্ডলে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাওয়া যায়।

'কালিকো নাম সর্পো নবনাগসহস্রবলঃ। যমুনাহ্রদে হ সো জাতো যো নারায়ণবাহনঃ।

যদি কালিকদূতস্য যদি কাঃ কালিকাত্তয়ং। উর্ম্মভূমিপরিক্রান্তো নির্ব্বিষো যাতি কালিকঃ।

(ঋগ্বেদ খিল ।৭।৫৫।৪)

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় এই মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে ঋগ্বেদীয় বৃষোৎসর্গে দশদিক্‌পাল পূজায় অনন্তের স্তুতিরূপে এই মন্ত্রের ব্যবহার হয়।

কালিক বা কবিয়ক কালীয় নাগের নামান্তর। উপরের মন্ত্র হইতে পাওয়া যায় যে, কালীয় নবসহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী ছিল। সে যমুনাহ্রদে জাত হয় এবং শ্রীহরি তাহার উপর চরণবিন্যাস করিয়াছিলেন। তাহাকে নির্ব্বিষ অবস্থায় যমুনা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল।

ইহা ঋগ্বেদে কালিয়দমনের স্পষ্ট উল্লেখ। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রবাদমূলকত্ব বা অর্ব্বাচীনত্বের কথা উঠিতেই পারে না।

৬। ধেনুকবধ (বিষ্ণু । ১৩)।

'সমিন্দ্র গর্দ্দভং মৃণ।

(ঋগ্বেদ ।১।২৯।৫ ; অথর্ব্ব ।২০।৭৪।৫)

হে (ইন্দ্র গর্দ্দভং সমৃণ) মারয়েতি মন্ত্রপদার্থঃ। হে ইন্দ্র, গর্দ্দভকে বধ করুন।

৭।. প্রলম্ববধ (বিষ্ণু ।১৪)।

'বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যা বিশ্বা উত ক্ষিতয়ো হস্তে অস্য।
অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্ মধ্বো অংশুঃ পবত ইন্দ্রিয়ায়।'

(ঋগ্বেদ ।৯।৮৭।২)

হে সোম, তে তব (মধ্বো) ব্রহ্মস্বরূপিণঃ অংশুরিব (অংশুঃ) অংশঃ (পৃথিব্যা ধরুণঃ) ভূমের্দ্ধর্ত্তা রামরূপধারী শেষঃ (তে) ত্বয়া (অসৎ) অন্তর্য্যামিণা প্রবোধিতঃ সন্দীপ্যমানঃ অতএব (উৎসঃ) ত্বদাজ্ঞাকরণে উৎকণ্ঠিতঃ (নিযুত্বান্) জগতঃ প্রাণবায়ুরূপী সূত্রাত্মা সন্ (গৃণতে) আত্মনঃ স্বরূপং ত্বদ্বাক্যাদবগতং ভাবয়তি অহং পরমেশ্বরাদনন্যোঽস্মি দেবকার্য্যার্থমবতীর্ণোঽস্মীত্যালোচয়তীত্যর্থঃ। ততো হেতোঃ (দিবঃ) দ্যুলোকমণ্ডলস্য (বিষ্টম্ভঃ) স্তম্ভা ইব ভবন্তি তে বিষ্টম্ভঃ কিবন্তস্যেদং দ্বিতীয়া বহুবচনম্। অত্যুচ্ছ্রিতান্ প্রলম্বাদীন্। বহুত্বং বিভূত্যর্থে। (ইন্দ্রিয়ায়) তদ্বধেন স্ববীর্য্যং প্রদর্শয়িতুং (পবতে) গচ্ছতি। কিমস্যায়ুধং তদাহ—বিশ্বা ইতি। সর্ব্বাঃ (ক্ষিতয়ঃ) নাশসাধনান্যায়ুধানি (অস্য হস্তে) এব সন্তি অতো মুষ্টিমাত্রেণ তং জঘানেত্যর্থঃ। বিষ্ণোঃ সর্ব্বদেবতাময়ত্বাদত্র সোমরূপেণৈবাস্য স্তুতির্বোদ্ধব্যা। এবমন্যত্রাপি।

হে সোম (বিষ্ণু সর্ব্বদেবময়, সেজন্য সোমরূপে এখানে তাঁহার স্তুতি করা হইতেছে)। আপনার ব্রহ্মস্বরূপের অংশ পৃথিবীধারণকারী রামরূপধর অনন্তদেব অন্তর্য্যামী আপনার দ্বারা প্রবোধিত হইয়া আপনার আজ্ঞা পালনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি জগতের প্রাণবায়ুরূপী সূত্রাত্মা। আপনার বাক্যে স্ব স্বরূপ অবগত হইয়া 'আমি পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, দেবকার্য্য জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি' এইরূপ আলোচনা করিতেছেন। স্বর্গলোকের স্তম্ভস্বরূপ অতি স্ফীত প্রলম্বাদির বধদ্বারা নিজবীর্য্য প্রদর্শন জন্য তিনি যাইতেছেন। তাঁহার অস্ত্র কি? সকল নাশযোগ্য আয়ুধই ইহার হস্তে—তজ্জন্য মুষ্টিদ্বারাই তাহাকে বধ করিলেন।

৮। ব্রজে মহাবৃষ্টি (বিষ্ণু ।১৫)।

'আগ্রাবভিরহন্যেভিরক্তুভির্বরিষ্ঠং বজ্রমাজিঘর্ত্তি মায়িনি শতং বা যস্য প্রচরন্ স্বদমে সংবর্ত্তয়ন্তো বিচবর্ত্তয়ন্নহ। (ঋগ্বেদ ।৫।৪৮।৩)

যস্য বহ্নিণঃ (স্বদমে) স্বগৃহে বায়ুর্বেদ্রো বান্তরিক্ষস্থান্ ইত্যুক্তেরন্তরিক্ষে (শতং বা) ততোঽধিকং বা (সংবর্ত্তয়ন্তঃ) সংবর্ত্তং প্রলয়ং কুর্ব্বন্তঃ সাংবর্ত্তকা নাম মেঘাঃ (প্রচরন্) প্রাচরন্ সঞ্চারং কৃতবন্তঃ সঃ (মায়িনি) মায়মনুষ্যে শ্রীকৃষ্ণে (বরিষ্ঠং) শ্রেষ্ঠতমং (বজ্রম্) অশনিম তদ্বতীং মহাবৃষ্টিং (আজিঘর্ত্তি) ক্ষরতি। (অক্তুভিঃ) রাত্রিভিঃ সপ্তভিরিতি পুরাণতঃ সপ্তরাত্রং বজ্রধারং পর্জ্জন্যেন ববর্ষেত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—আগ্রাবভিরহন্যেভিরিতি। (গ্রাবভিরিতি) সমুদায়িভিঃ গ্রাবসমুদায়ঃ শিলোচ্চয়ো লক্ষ্যতে যৈঃ (অহন্যেভিঃ) অহঃ ক্রতুমর্হন্তি তেঽহন্যাস্তৈ পর্ব্বতে ক্রতুভাজি সতীত্যর্থঃ। মায়ী পুনঃ কিং চকারেত্যত আহ—(বিচবর্ত্তয়ন্নহ) ইতি চ অনন্তরং মায়ী। অহঃ ক্রতূন্ বিবর্ত্তয়ন্ বিপরীতং বর্ত্তয়ন্তে ইতি শেষঃ। ইন্দ্রযাগার্থমাহৃতৈঃ সম্ভারৈর্গিরিযাগং প্রবর্ত্তয়তি মায়িনি ইন্দ্রো মহতীং বৃষ্টিং চকারেত্যর্থঃ।

ইন্দ্রের স্থান অন্তরীক্ষে শত শত প্রসরকারী সংবর্ত্তক নামক মেঘের সঞ্চার করিয়া মায়ামনুষ্য শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রেষ্ঠ বজ্র এবং মহা বৃষ্টিপাত হইল। বহু (সপ্ত) রাত্রি বজ্রধারে পর্জ্জন্য বর্ষণ করিলেন। তাহার কারণ—ইন্দ্রযাগার্থ আহৃত সম্ভারদ্বারা কৃষ্ণের বিপরীতভাবে গিরিযাগ প্রবর্ত্তন।

৯। গোবর্দ্ধনধারণ (বিষ্ণু ।১৮)।

'তমস্য রাজা বরুণস্তমশ্বিনা ক্রতুং সচন্ত মারুতস্য বেধসঃ। দাধার দক্ষমুত্তমমহর্বিদং ব্রজঞ্চ বিষ্ণুঃ সখিবাঁ অপোর্ণুতে।'

(ঋগ্বেদ ।১।১৫৬।৪)

(অস্য) বিষ্ণোঃ (তং) পর্ব্বতার্থং কৃতং যং যেন সম্পাদিতং (ক্রতুং) যজ্ঞং (বরুণোঽশ্বিনৌ) চ (সচন্ত) অনুমোদন্ত মারুতস্য বায়োরপি (বেধসঃ) স্রষ্টুঃ, ততস্ত মখভঙ্গে কৃতে ইন্দ্রে কুপিতে সতি (বিষ্ণুঃ উত্তমং) শ্রেষ্ঠং (দক্ষং) বৃষ্টিনিবারণক্ষমম্ (অহর্বিদং) ক্রতোলব্ধারং পর্ব্বতং [দাধার] দধার ধৃতবান্, যতঃ [সখিবান্] মহান্ ব্রজাখ্যসখিসমুদায়বান্ [ব্রজম্] অপোর্ণুতে তেনার্হবিদা শৈলেন আচ্ছাদয়তীতি।

বায়ুরও স্রষ্টা বিষ্ণুর সেই পর্ব্বতার্থে কৃত যজ্ঞ বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় অনুমোদন করিয়াছিলেন। অতঃপর নিজযজ্ঞভঙ্গে ইন্দ্র কুপিত হওয়াতে বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ বৃষ্টিনিবারণক্ষম যজ্ঞের দ্রব্যভোক্তা সেই পর্ব্বত ধারণ করিলেন, যদ্দ্বারা তিনি সেই মহান্ সপরিজন ব্রজ আচ্ছাদন করিলেন।

১০। কৃষ্ণাভিষেক (বিষ্ণু ।১১।৩৫।৩৮)।

'তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরি।'

(ঋগ্বেদ ।১।১৫৪।৬

তানি (বাং) যুবয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ (বাস্তূনি রম্যাস্থানানি (গমধ্যৈ) উশ্মসি উশ্মঃ কাময়ামহে ন তু তত্র গন্তুং প্রভবামঃ (যত্র) যেষু বাস্তষু (ভূরিশৃঙ্গাঃ) মহাশৃঙ্গবত্যো (গাবঃ অয়াসঃ) সঞ্চরন্তি। (অত্র) ভূলোকে (অহ) নিশ্চিতং (তৎ) গোলোকাখ্যং (পরমং পদং ভূরি) অত্যন্তং মুখ্যাদপি বিশিষ্টম্ (অবভাতি) অত্যন্তং শোভতে। (বৃষ্ণঃ) আনন্দবর্ষকস্য (উরুগায়স্য) মহাকীর্ত্তেরিত্যর্থঃ।

রামকৃষ্ণের সেই রম্যস্থানগুলিতে যাইতে কামনা করি, কিন্তু পারি না। তথায় মহাশৃঙ্গবতী গোসকল বিচরণ করে। আনন্দ-বর্ষণকারী মহাকীর্ত্তি ভগবানের সেই গোলোকাখ্য পরম পদ ভূলোকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত শোভা পাইতেছে।

'ঋষভং মা সমানানাং সপত্নানাং বিষাসহিম্। হন্তারং শত্রূণাং কৃধি বিরাজং গোপতিং গবাং।'

(ঋগ্বেদ ।১০।১৬৬।১)

(বিষাসহিম্) সহনসমর্থ।

হে ইন্দ্র! আমাকে আমার বংশের মধ্যে ঋষভের ন্যায় শ্রেষ্ঠ করুন। অপর শত্রুগণের বধকারী করুন। সকল গোসমূহের স্বামী (গবামিন্দ্র-গোবিন্দ) করিয়া বিশেষ শোভমান করুন।

'অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ।
গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং স্তোষ্যন্তি ভুবি শাশ্বতম্।'

(হরিবংশ। বিষ্ণু ।১৯।৪৫।)

ইন্দ্র এই বলিয়া কৃষ্ণের গোবিন্দ নামে গোগণের ইন্দ্রত্বে অভিষেক করেন।

১১। হল্লীসক ক্রীড়ন (রাস)

(বিষ্ণু ।২০)

'পথ্যা বস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্দ্ধা তস্থৌ ত্র্যবিং রেরিহাণা ঋতস্য সদ্ম বিচরামি বিদ্বান্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্।'

(ঋগ্বেদ ।৩।৫৫।১৪)

(পথ্যা) পন্তুম্ অভিসারিণীভির্গোপীভিরভিসর্ত্তুং যোগ্যা কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ পুরুরূপা (বহুরূপা) (বপূংষি) বহূনি (বস্তে) পরিধত্তে বহুধাধত্তং গতেত্যর্থঃ। তথাপ্যন্যা (ঊর্দ্ধা) (গোপী সম্পর্কম্ বিনা (তস্থৌ) স্থিতা মধ্যে ইতি শেষঃ। কীদৃশী (ত্র্যাবং) ত্রীন্ দেশান্ পার্শ্বদ্বয়ং পুরস্তাচ্চ অবতি প্রকাশত ইতি ত্র্যবিঃ ত্রেধাভূতাং দৃষ্টিং (রেরিহাণা) লিলন্তী। উক্তরূপে রাসমণ্ডলে হি একৈকস্যা গোপ্যা উভয়তঃ কৃষ্ণদ্বয়ং পুরস্তাদেকঃ, সর্ব্বসাধারণাং ত্রিধাভূতামপি দৃষ্টিং প্রদেশত্রয়স্থঃ কাৎস্ন্যেন লিলতি ততোঽন্যত্র নাপৈতীত্যর্থঃ। সা মূর্ত্তিঃ (ঋতস্য) ধর্ম্মস্য (সদ্মীভূতা) তামনুচিন্ত্য (বিচরামি) ত্বদ্বিযুক্তা সতী বিদ্বীতি কৃষ্ণলীলানুকারাৎ পুংস্ত্বম্ আরোপয়ন্তী কাপ্যবদৎ। (দেবানাং) কৃষ্ণাদীনামন্যেষাং বা কৃষ্ণেন বিয়োজয়তাম্। (অসুরত্বং) নির্দ্দয়ত্বং মহৎ (একম্) মুখ্যং কস্যাশ্চিদ্রাসক্রীড়ায়াং তিরোহিতে কৃষ্ণে ইদং বাক্যং।

অভিসারিণী গোপীগণের অভিসারের যোগ্য। কৃষ্ণমূর্ত্তি সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বহু দেহ ধারণ করিল। তথাপি একটি মূর্ত্তি একা মধ্যে অবস্থিত ছিল। সেই মূর্ত্তি গোপীগণের ত্রিধাভূতা দৃষ্টি যেন পান করিতেছিল। রাসমণ্ডলে এক এক গোপীর উভয় পার্শ্বে দুই কৃষ্ণ সম্মুখে এক (মণ্ডলের কেন্দ্রস্থ) সাধারণ কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত। প্রতি গোপী এই তিন দিকেই কৃষ্ণকে একচিত্তে দেখিতেছেন। তাঁহাদিগের এই ত্রিধাভূতা দৃষ্টি যেন প্রদেশত্রয়স্থ কৃষ্ণমূর্ত্তি সম্পূর্ণ পান করিতেছেন। গোপীগণের দৃষ্টি সেই কৃষ্ণে কেন্দ্রীভূত, অন্যত্র যাইবার নহে।

সেই ধর্ম্মের ভবনস্বরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি অনুচিন্তন করিয়া তাঁহার বিরহাতুরা হইয়া বিচরণ করিতেছি। অহো, কৃষ্ণের (বা কৃষ্ণকে যাঁহারা নিযুক্ত করিয়াছেন সেই দেবগণের ইহা অত্যন্ত নির্দ্দয়তা।'

রাসলীলায় তিরোহিত কৃষ্ণের প্রতি কোনও গোপী (রাধিকা ?) এই বাক্য বলিতেছেন। তিনি কৃষ্ণলীলানুকরণে * আপনাকে পুরুষ (কৃষ্ণ) ভাবিয়া ("কাপি চ কৃষ্ণায়ন্তী") এই কথা বলিয়াছিলেন (("বিদ্বান" শব্দ সেই জন্য ব্যবহার করিয়াছেন)।

শঙ্করাচার্য্য

কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণ্যঃ।
কৃষ্ণস্য গতিগামিন্যস্তরণ্যস্তা বরাঙ্গনাঃ (হরি। বিষ্ণু। ২১।২৬।

সেই তরুণী বরাঙ্গনা (গোপী)গণ কৃষ্ণলীলানুকারিণী, কৃষ্ণে তাঁহাদিগের দৃষ্টি নিবদ্ধ এবং কৃষ্ণের গতি অনুসারেই তাঁহাদের গতি।

১২। বৃষভাসুর (অরিষ্ট) বধ (বিষ্ণু। ২১)

প্রপেমস্মিন্ মদৃশে সোমো অন্তর্গোপা নেমমাবিরস্থা কৃণোতি স তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং যুযুৎসন্দ্রুহস্তস্থৌ বহুলে বদ্ধো অন্তঃ।'

(ঋগ্বেদ। ১০। ৪৮। ১০)

(অন্তর্গোপাঃ) অন্তঃ স্থিত্বা গোপায়ন্নন্তর্য্যামী (নেমস্মিন্) অর্দ্ধপ্রপঞ্চে (স্থাবরে) (সোমঃ) সোমাদিরূপঃ (প্রদদৃশে) প্রকর্ষেণ দৃষ্টঃ (নেমম্) অর্দ্ধং প্রপঞ্চম্ (অস্থা) অস্থিরং জঙ্গমম্ (আবিঃকৃণোতি) প্রকটীকরোতি। (স তিগ্মশৃঙ্গং বৃষভং যুযুৎসন্) যোদ্ধুমিচ্ছন্ দৃঙ্মাত্রেণ ভস্মীকর্ত্তুং শক্তোঽপি লীলয়া তেন সহ যুযুৎসন্ (দ্রুহঃ) দ্রোহং কৃতবান্ তং হতবানিত্যর্থঃ। ততশ্চ (বহুলে) ব্রজে অন্তঃ রাসমণ্ডলমধ্যে (বদ্ধঃ) ভক্তজনেন প্রেমপাশেন বদ্ধঃ সন্ (তস্থৌ) ক্রীড়িতুমিতি শেষঃ।

সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিত সেই অন্তর্য্যামী সৃষ্টির অর্দ্ধেক স্থাবরে সোমাদিরূপে প্রদৃষ্ট হন। অর্দ্ধেকে অস্থির জঙ্গম সৃষ্টিকে প্রকট করেন। তিনি দৃষ্টিমাত্রে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হইয়াও তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষভের সহিত লীলাদ্বারা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। তৎপরে ব্রজে অন্তঃরাসমণ্ডলে ভক্তগণের প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া ক্রীড়া করিবার জন্য দাঁড়াইলেন।

[ক্রমশঃ

সমাধান

শ্রীসুমথনাথ ঘোষ

চিঠিখানা হাতে ক'রে রুবি রান্নাঘরে এলো। তারপর মায়ের কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, কি উত্তর দেবো বলে দাও, তারা লিখেছে হোষ্টেলে থাকা এবং খাওয়া ফ্রি, আর মাইনে দেবে ষাট টাকা।

মা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তোকে কতবার বলবো রুবি যে চাকরী করা তোর হবে না; তোর কাকারা মোটে পছন্দ করেন না যে, তাঁদের বংশের কোন মেয়ে বাইরে বেরোয় চাকরী করতে।

উত্তেজিতস্বরে রুবি বললে, তাঁরা বুঝি পছন্দ করেন যে বিয়ে পাশ ক'রে আমি চুপচাপ ঘরে বসে থাকবো আর চোখের সামনে দেখবো আমার ছোট ভাইবোনদের পরণের কাপড় নেই, স্কুলের বই কেনার পয়সা নেই, রোগ হলে না ওষুধ না পথ্য। এইজন্যে কি বাবা আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন মা? না—আমি পারবো না এ দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে। তুমি মা হ'য়ে কি ক'রে যে বলো আমি ভেবে পাই না।

কি করবো মা! তিনি বেঁচে থাকলে আমি একটা কথাও তোর মুখের ওপর বলতুম না। কিন্তু এখন যাঁরা অভিভাবক তাঁরা যদি এটা না চান ত, আমি কি করতে পারি! তাঁরাই যখন খেতে পরতে দিচ্ছেন তখন তাঁদের কথার বিরুদ্ধে যাই কি করে বল।

আমি বিরুদ্ধে যেতে বলছি না। তবে আমাদের এই অভাব যদি তাঁরা সম্পূর্ণ রূপে দূর করতেন তাহ'লে আমার বলবার কিছু ছিল না কিন্তু তাঁরা যা সাহায্য পাঠান তাতে যখন আমাদের অভাব মেটে না তখন কি চাকরী করাটা এতই অন্যায়?

মা বললেন, কি জানি মা আমি ন্যায় অন্যায়ের। তবে তোমার কাকারা বলেন যে ঘরের মেয়ে একবার বাইরে বেরুলে আর ভাল ঘরে বিয়ে হয় না—

আমার বিয়ের জন্যে যদি তাঁদের এতই মাথাব্যথা, তবে বিয়েটাই না হয় দিতে বলো। রুবি রেগে উঠলো।

তাঁদের ওকথা বলে দোষ দিস্ নি মা; তাঁরা ত চেষ্টা করছেন, তবে যে-পাত্র পছন্দ হয় সেই চায় এতো টাকা, তোর কাকাদেরও ত অবস্থা জানিস্—কোথায় পাবে তারা এত টাকা; বল দেখি। এই যুদ্ধের বাজারে তাঁরা যা করছেন তাই ঢের।

রুবি বললে, সেই জন্যেই ত বরং আরো চাকরী করা উচিত। মাইনের টাকা থেকে চাই কি একটা ভাল পাত্রের সঙ্গে বিয়েও হয়ে যেতে পারে।

মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কি যে তোর কথার ছিরি বুঝতে পারি না! নিজের বিয়ের টাকা নিজে রোজকার করবি?

হাঁ মা, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে! টাকা না হলে যখন ভাল পাত্র পাওয়া যায় না, আর টাকা দেবার মত লোক যখন আমাদের নেই তখন নিজের বিয়ের ব্যবস্থা যদি নিজেই করি, তাতে দোষ কিসের?

ছিঃ! ও কথা কি বলতে আছে মা, তোর কাকারা ত চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। বলে একটু থেমে আবার বললেন, আজই ত দুপুরে তোকে দেখতে আসার কথা সেই বাগবাজারের চৌধুরীদের।

রুবি বললে, তারা ত অনেক টাকা চায় শুনলুম।

মা বললেন, হাঁ প্রথমে তাই বলেছিল কিন্তু কাল আবার ঘটকী তোর কাকাকে খবর দিয়ে গিয়েছে যে কে নাকি পাত্রের মামিমা এসেছেন পাটনা থেকে, তাঁর দেখে যদি পছন্দ হয় তাহ'লে দেনা-পাওনার জন্যে আটকাবে না।

রুবি এবারে রীতিমত চটে উঠলো, বললে, মা, মেয়েরা কি শাক-মাছ যে একবার বাবা, একবার খুড়ো, একবার পিসে, একবার মামী—যার যখন খুশি এসে দেখবে, তারপর যাবার সময় বলে যাবে পছন্দ হ'লো না—মেয়ের রঙ কালো, চোখ ছোট, চুল কম কিংবা গড়ন ততটা সুবিধে নয়! আমি কিন্তু আবার গিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো না—তোমায় এখন থেকে বলে রাখছি।

মা মিষ্ট কণ্ঠে বলেন, ছিঃ মা ওকথা বলতে নেই—তুই এত লেখাপড়া শিখেছিস আর এটুকু বুঝিস না যে, আমাদের দেশের মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানোই পাপ।

রুবি ক্রুদ্ধস্বরে বললে, মেয়ে হয়ে জন্মানো পাপ নয় মা, তোমাদের মত অভিভাবকদের মেয়ে হ'য়ে জন্মানো পাপ! কবে এদেশ থেকে কুসংস্কার যাবে, কবে সব লোকেরা শিক্ষিত হবে জানি না! বলতে বলতে রুবি দুম্ দুম্ করে পা ফেলে নিজের ঘরে চলে গেল।

দুপুর হ'লে যথাসময়ে একটা ট্যাক্সি এসে দরজায় দাঁড়ালো। রুবির মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন পাত্রের মামীমাকে অভ্যর্থনা করতে। চশমা চোখে শান্তিপুরী চওড়া জরিপাড় শাড়ীর ওপর সিল্কের চাদর জড়িয়ে গাড়ী থেকে নেমে এলেন তিনি, সঙ্গে ঘটকী ও একটি ছোট ছেলে।

গতানুগতিক প্রথায় কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর রুবির মা মেয়েকে সেখানে ডাকলেন। রুবি এসে নমস্কার ক'রে তার ভাবী মামীশাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাতেই তিনি তার দাড়িতে হাত ঠেকিয়ে সশব্দে নিজের হাতে ছোট্ট একটি চুমু খেলেন। তারপর বললেন, বা দিব্যি দেখতে, ঠিক এমনিটিই আমি সুকুমারের জন্যে খুঁজছিলুম।

ঘটকী ভাঙা কাঁসির মত গলায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, পাঁচটা নাপ্তিনী তেমন কাজ করে না, যা বলবে তার একটুকুর নড়চড় হবে না। তবুও লেখাপড়া, গানবাজনা, হাতের কাজ সব এখনো দেখেন নি! মামীমা সুগন্ধি জরদার কৌটা আঁচল থেকে খুলে একটু গালে দিতে দিতে বললেন, ও-সব ওরা দেখে গিয়েছে, তবে আমার সুকুমার যেটা দেখতে বলেছিল আমার তা দেখা হয়েছে।

ঘটকী এইবারে রুবির মার দিকে চেয়ে বললে, কনের মাকে কিন্তু সোণার কাণপাশা দিয়ে ঘটকী বিদেয় করতে হবে। তা' আগে থাকতেই ব'লে রাখছি।

সঙ্গে সঙ্গে রুবির মা বললেন, ভগবান তাই করুন, তোর পাওনা তুই নিশ্চয়ই পাবি মা। বলে একটু থেমে একটু ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন, তাহ'লে বেয়ান গরীবকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার করে নিষ্কৃতি দাও ভাই—

ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন দিদি,উদ্ধার করার মালিক সেই এক-জন। এই বলে একবার ওপর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে তিনি বললেন, আমি তো উপলক্ষ্য বই ত' নয় ?

রুবির মা বললেন, আমি শুনেছি আপনি-ই সব—আপনি যা বলবেন তার ওপর আর কেউ কথা কইবে না।

গর্ব্বিত দৃষ্টিতে একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন তা আমার ভাগনেরা সেদিক দিয়ে আমায় খুবই মান্য করে, বড় মামি, ছেলেবেলায় আমাদের মা মরে গিয়েছিল কিন্তু তোমার জন্যে কোনদিন তা বুঝতে পারিনি ! কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ কণ্ঠস্বর একটু থামিয়ে একপ্রকার সুর টানতে টানতে শুরু করলেন, তবে একেবারে খালি হাতে ত বিয়ে হয় না, দু'হাজার টাকা ভাই দেবেন, আর কিছু চাই না। আপনাদের অবস্থার কথা সবই শুনেছি তা না হ'লে আট হাজার, দশ হাজার টাকা নিয়ে কত লোক সাধাসাধি করছে !

রুবির মা বললেন, কিন্তু ভাই আমার পক্ষে ও দেওয়াও যে সম্ভব নয়। অনেক ক'রে দেওরের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে ও তাঁর কিছু টাকা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে জমান ছিল তাই দিয়ে মিলিয়ে এক হাজার টাকা জোগাড় করেছি। আপনারা বড়লোক, গরীবকে যদি এতই দয়া করলেন ত' এই নিয়ে আমায় কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করুন—দোহাই আপনার—

বড়লোক বলে কি আমাদের ঘর থেকে সব খরচ করতে বলেন ? আজকালকার দিনে দু'হাজার টাকায় কি হয় তা ত' জানেন ? ব'লে বার দুই ঢোক গিলে তিনি বললেন, শুধু লোকজন আনা নেওয়ার ট্যাক্সিভাড়া, সানাই, মেরাপ-সামিয়ানার খরচা ও যে ওই টাকায় কুলাবে না। কি বলিস পাঁচীর মা ?

সঙ্গে সঙ্গে ঘটকী বলে উঠলো, তা আবার নয়। তারপর রুবির মায়ের দিকে বাঁকাচোখে চেয়ে বললে; এ-কি যে-সে ঘরে কাজ করছো মা তোমার মেয়ে আর জন্মে কত পুণ্যি যে করে এসেছিল তা পরে বুঝতে পারবে। কলকাতার যতসব বনেদী কায়স্থ দেখছো সকলের সঙ্গেই এদের কুটুম্বিতে। কাজকর্ম্মে রাস্তায় মোটরগাড়ীর হাটবাজার বসে যায়। দেখলেই বুঝতে পারবে, আমায় আর বলতে হবে না।

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে রুবির মা বললেন, কিন্তু মা আমার অবস্থা ত জানিস্। ওঁদের ঘরের চাকরাণীর যোগ্যও যে, আমার মেয়ে নয় সে কি আমি বুঝি না।

বরের মামী তাড়াতাড়ি বললেন, আপনার অবস্থা সব জানি বলেই ত' দু'হাজার টাকার কথা বলছি, তা না হ'লে এম-এ, বি-এল্ পাশকরা ছেলে, আলিপুরের উকিল, ওই টাকায় কি আজকের দিনে মেলে ভাই ?

সব জানি কিন্তু ভাই আমার যে কোন উপায় নেই আর। এই বলে ভাবী বেয়ানের হাতে ধরে রুবির মা বললেন, আপনারা বড় মানুষ, হাজারটা টাকা আপনাদের কাছে কিছুই নয়—যখন মেয়েকে পছন্দ করেছেন তখন দয়া করে এই গরীবকে উদ্ধার করুন। আমি বড় গরীব, ছেলেমেয়েদের ভাল ক'রে খেতে পরতে দিতে পারি না। এর চেয়ে বেশী কি কথা আপনাকে বলবো। বলতে বলতে তিনি একেবারে কেঁদে ফেললেন।

অমনি উঠে দাঁড়িয়ে বরের মামী সুমিষ্ট কণ্ঠে বললেন, এর চেয়ে আর কম করতে বলবেন না, পারবো না আপনার কথা রাখতে। তারপর মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, যা হয় খবর দেবেন দু'তিন দিনের মধ্যে—আপনাদের মতামত না পাওয়া পর্য্যন্ত আবার অপর জায়গায় কথাবার্ত্তা পাকা করতে পারবো না।

এই বলে দু'এক পা অগ্রসর হতেই ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এসে রুবি তাঁর সামনে দাঁড়ালো। তার সর্ব্বশরীর তখন থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে। কণ্ঠের উত্তেজনা দমন করতে করতে সে বললে, তাহ'লে অন্য জায়গায় পাকা কথা দেবেন, আমাদের আর অন্য কোন মতামত নেই জানবেন।

রুবির মা সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের ওপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তুই থাম, তোকে কে ডাকছে সর্দ্দারী করতে ? তারপর অপরাধীর মত সঙ্কোচের সঙ্গে ভাবী বেয়ানকে বললেন, ওর হ'য়ে আমি মাপ চাইছি—ওর কথায় কিছু মনে করবেন না ভাই।

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বেয়ান জবাব দিলেন, মনে করবার আর এতে কি আছে, ভালই হ'ল উত্তরটা জেনেই গেলুম।

এইবার রুবির মা অশ্রুরুদ্ধ স্বরে ভাবী বেয়ানের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, রুবি ছেলেমানুষ আপনার মেয়ের মত। ও কি বলেছে, তাই মনে করে রাগ করো না ভাই, ওকে ক্ষমা করো।

রুবির মামি পরিষ্কার কণ্ঠে উত্তর দিলেন, ওর কথায় রাগ করবো, আমি কি এতই ছেলে মানুষ।

—তা হ'লে গরীবের প্রার্থনা কি মঞ্জুর হবে না ?

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমি ত বলেই দিয়েছি দু' হাজার টাকার কম কিছুতেই হবে না।

এর উত্তরে রুবির মা কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রুবি ছুটে এসে তার মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের দিকে নিয়ে এসে বললে, মা ফের যদি তুমি ওঁকে আমার বিয়ের জন্যে কিছু বলবে ত আমি আত্মহত্যা ক'রে মরবো, তা তোমায় বলে রাখছি—

বরের মামি অবাক্ হয়ে রুবির মুখের দিকে চেয়েছিলেন। সাপের জিহ্বার মত তার সর্ব্বাঙ্গ যেন লক্ লক্ করে কাঁপছিল। একটু থেমে রুবি একবার তাঁর দিকে চাইল, তারপর লজ্জা-অভিমান ও আত্মগ্লানি-ভরা কণ্ঠে বললে, মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি বলে কি এতই অপরাধ করেছি যে, তোমরা যা ইচ্ছে তাই করবে ? যাদের কাছে ট্যাক্সি ভাড়া ও সামিয়ানার মূল্য মেয়ের চেয়ে বড়,

তাদের কাছে তুমি যাও দয়া ভিক্ষা করতে? ছিঃ! তোমার লজ্জা করে না মা?

বরের মামি এইবার মুখ খুললেন। বললেন, ওই সামান্য খরচটা চেয়েছি বলে কি আমাদের অপরাধ হয়েছে?

রুবি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, আপনারা চেয়েছেন বলে আপনাদের অপরাধ হবে কেন? আমরা দিতে পারবো না বলে অপরাধ আমাদের হয়েছে।

আট হাজার নয়, দশ হাজার নয়—মাত্র ছ' হাজার টাকা!—তাও যদি না দিতে পারো ত এমন পাত্র আশা করো কোন্ লজ্জায়, তিরিশ, চল্লিশ টাকার কেরাণীর ত' অভাব নেই দেশে। বলতে বলতে বরের মামি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রুবির মা মেয়ের মুখের দিকে একবার অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠলেন, আমার যেন মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে তোর জন্যে—লেখাপড়া যেন আর কেউ মেয়েকে না শেখায়। রাগে অভিমানে দুঃখে তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। মায়ের এই কথার প্রতিবাদ করার মত বুঝি মেয়ের আর কিছু ছিল না। তাই বজ্রাহতের মত নীরব ও নিশ্চল মূর্ত্তিতে রুবি যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে ললিত এলো। তার হাতে একটা সাবানের বাক্স। রুবিদের সে দূর সম্পর্কের আত্মীয়। রুবির মাকে মাসিমা ব'লে ডাকে, আর রুবিকে গোপনে প্রেমের কবিতা লিখে উপহার দেয়।

বাড়ীতে পা দিয়েই ললিত অনুভব করলে বাড়ীটা যেন বড্ড বেশী নিস্তব্ধ, থমথম করছে। মাসিমা, মাসিমা বলে বারকতক সে ডাকলে কিন্তু কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। শেষে বারান্দার ওপরে উঠতেই সামনে রুবিকে দেখে তার সন্দেহটাই যে ঠিক তা বুঝতে পারলে। রুবির মুখখানা গম্ভীর, বর্ষার আকাশের মত—তাই নিয়ে প্রথমে একটু রসিকতা করবার সে চেষ্টা করলে কিন্তু তখনো তার দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ললিত একটু দমে গেল। তারপর মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে সে আবার প্রশ্ন করলে, রুবি তোমার কি হয়েছে, বলো, আমার কাছে গোপন ক'রো না লক্ষ্মীটি।

রুবি তখনো কোন উত্তর দিলে না।

তখন তার একটা হাত ধরে ললিত অনুরোধ করলে রুবি, কথা বলছো না কেন—আমি কি অপরাধ করেছি?

রুবি নিঃশব্দে তার হাতটা টেনে নিয়ে বললে, ললিতদা, আমায় বিয়ে করবে?

ললিত চমকে উঠলো। যেন তার চোখের সামনে একটা বজ্রপাত হলো।

বলো—জবাব দাও—?

রুবির কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা লক্ষ্য ক'রে ললিত ঘাবড়িয়ে যায় যেন। তবু মুখে একটা অবিশ্বাসের ভাব ক'রে বলে, যাঃ—কি ইয়ারকি হচ্ছে—মাইরি সত্যিকথা বল না?

ললিতদা! ধমক দিয়ে উঠলো রুবি। তারপর অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বললে, ইয়ারকি করারও একটা সময় আছে ভুলে যেয়ো না। আমি জানতে চাই তুমি আমায় বিয়ে করতে প্রস্তুত আছো কি না?

ললিত হতভম্বের মত মুখে তার চোখের দিকে চেয়ে ইতস্তত করতে করতে বললে, তা—তা কি ক'রে সম্ভব হয় রুবি?

রুবির চোখ দুটো দপ্ ক'রে জ্বলে উঠলো। বললে, কেন সম্ভব হয় না শুনি—

বাবা-মার মত না নিয়ে—

বাবা-মার মত নিয়ে কি তুমি আমার গোপনে প্রেম নিবেদন করতে আসো?

ললিত তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললে, তুমি এত চটছো কেন, ব্যাপারটা কি শুনি আগে—

রুবি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, তারো আগে আমি শুনতে চাই তুমি আমায় বিয়ে করতে রাজী আছো কি না? এই মুহূর্ত্তে বলো, হ্যাঁ কি না?

ললিত জানতো যে তার বাপ-মা পাশ করা মেয়ের ওপর হাড়ে চটা, তাই রুবিকে কি ভাবে সেই কথা জানাবে ভাবতে লাগল। রুবি বোধ হয় তার মুখ দেখেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল, তাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ললিতের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে বললে, মা-বাবার বুঝি মত নেই?

ললিত যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তার মনের কথাটা এইভাবে রুবি নিজেই যখন বলে ফেললে তখন সে অপেক্ষাকৃত সহজ কণ্ঠে বললে, মানে আর কোন কারণ নেই—তবে পাশকরা মেয়েতে তাঁদের বড্ড আপত্তি।

অগ্নিশিখার মত রুবির সর্ব্বশরীর যেন নিমেষে কেঁপে উঠলো। সে বললে, তাই যদি জানতে তবে পাশ-করা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে এসেছিলে কোন্ লজ্জায়? ভেবেছিলে বুঝি পাশ করা মেয়েদের সর্ব্বনাশ করা সহজ। তারা লেখাপড়া জানে বলে তারা উদার-চরিত্র। রুবির কণ্ঠস্বর থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। বললে, দূর হ'য়ে যাও এখনি আমার সামনে থেকে—আর কোন-দিন যদি এ বাড়ীতে দেখি তা হ'লে পাঁচজনের সামনে তোমায় অপমান করবো বলে রাখছি—

ললিত অনেকদিন থেকেই তাকে মনে মনে ভালবাসতো। তাই এত অপমান হজম ক'রেও রুবিকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করতে লাগল। বললে, কিন্তু—

না; না, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। তুমি দূর হয়ে যাও আগে আমাদের বাড়ী থেকে—

মাথা হেঁট ক'রে ললিত বেরিয়ে গেল।

এইবার নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিয়ে রুবি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

পরের দিন রুবি তার মাকে গিয়ে বললে, মা আমি বিনোদ বাবুকে বিয়ে করবো। বিনোদ বাবু হ'লো তাদের বাড়ীওয়ালা। তিনতলায় থাকে। মৃতদার, বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। মার্চ্চেন্ট অফিসের কেরাণী।

মা গালে একটা আঙুল দিয়ে বললেন, ও মা! বিনোদবাবু যে অশিক্ষিত, মূর্খ—

রুবি বললে, তোমার শিক্ষিতদের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে মা। তা'ছাড়া ইউনিভারসিটীর ছাপ মারা থাকলেই যে শিক্ষিত হতে হবে তার অর্থ কি? শিক্ষিত বলতে কি তোমরা বোঝ? আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-ভদ্রতা, কোনটা বিনোদবাবুর কম আছে শুনি? বলতে বলতে একটু থেমে সে আবার বললে, ইউনিভারসিটির ছাপমারা অনেক পাত্র-ই ত দেখলে মা—

মা একটু চিন্তা ক'রে বললেন, কিন্তু তুই বি, এ, পাশ, আর বিনোদবাবু একটা পাশও করেনি—লোকে বলবে কি?

রুবি বললে, লোকের কথায় আমাদের কি আসে যায় মা! তারা কি আমাদের খেতে পরতে দেবে? না আমাদের অসময়ে দেখতে আসবে? তা ছাড়া আমি পাশ করেছি আর উনি পাশ করেন নি—তাতে সংসারের জীবনযাত্রার পথে কি বাধা হতে পারে? যদি এম্-এ, বি-এ পাশ করা পাত্ররা অশিক্ষিত গেঁয়ো মেয়েদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করতে পারে, তা হ'লে তার উল্টোটাই বা হবে না কেন? একটু মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ভেবে দেখো মা—

মা বললেন, আমি দেখলে ত' হবে না—তোর কাকাদের মত নিতে হবে ত?

রুবি বললে, কাকাদের মত তোমাকে নিতে হবে না—আমি নিজেই নেবো মা!

আচ্ছা, যা তুই ভাল বুঝিস, করিস্। বলতে বলতে মা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন বটে কিন্তু এদিকে গোপনে তিনি ছেলেকে পাঠালেন বড় কাকাকে ডেকে আনবার জন্যে। একটু পরেই বড় কাকা এলেন। রুবির মা মেয়ের সব কথাই রান্নাঘরে তাঁকে চুপি চুপি বললেন। তিনি বললেন, অসম্ভব! এ হতে পারে না। বি-এ পাশ করা মেয়েকে ওই মূর্খটার হাতে দিলে লোকে যে আমাদের গায়ে থুথু দেবে বৌদি!

আমিও ত তাই বলি কিন্তু মেয়ে যে একেবারে বেঁকে বসেছে।

মেয়ে বেঁকে বসলে চলবে না—তোমাকে কঠিন হতে হবে বৌদি,—সমাজে আমাদের একটা 'পজিশন' আছে, ওই মেয়ের জন্যে আমাদের মাথা কি সকলের কাছে হেঁট হবে!

পেছন দিক থেকে নাটকীয় ভাবে এসে রুবি উত্তর দিলে, মাথা তোমাদের হেঁট হবে কেন বড় কাকা? বরং যদি হয় ত আমারই হবে, আমি বি-এ পাশ করে একটা মূর্খের গলায় মালা দিচ্ছি!

বড় কাকা বললেন, তোর মাথা হেঁট হলেই যে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হ'লো—এটা কি বুঝতে পারিস না?

পারি, কিন্তু আমি যদি তাতে মাথা হেঁট মনে না করি, তা' হ'লে তোমাদের ত কিছু এসে যায় না!

বড় কাকা একবার তাঁর মাথাজোড়া টাকে হাত বুলিয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, সে কি রকম!

রুবি বললে, পাশ করা মেয়ের জন্যে বেশী পাশ করা পাত্র খুঁজতে গেলে যে বেশী দক্ষিণা দিতে হয়—এটা ত নিশ্চয়ই বোঝেন, অথচ সমাজে এখনো লেখাপড়া শেখা মেয়েদের সম্বন্ধে ঘৃণাও রয়েছে ঢের, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা কিছুতেই পাশ করা মেয়েদের পুত্রবধূ করতে রাজী নয়—তা হ'লে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-ঘরের মেয়েরা যারা প্রতি বছর দলে দলে পাশ করে বেরুচ্ছে তারা বিয়ে করবে কাদের? একটু থেমে রুবি আবার বললে, আপনারা কেবল ভাবেন সমাজে আপনাদের মুখ কতখানি উজ্জ্বল হলো! অথচ একবারও কি ভেবে দেখেছেন যে এই সব মেয়েদের বিয়ে ঠিকমত না হ'লে তার কলঙ্ক গিয়ে আপনাদেরই মুখে লাগবে! সমাজের গৌরব যারা দাবী করে সমাজের কলঙ্কও তাদেরই! কি অপরাধ করেছে তারা যারা ইউনিভারসিটীর ছাপ পায়নি। পাশকরা মেয়েদের বিয়ে করার কি তাদের কোন যোগ্যতা নেই! শিক্ষা বলতে, শিক্ষিত বলতে কি শুধু ওই ছাপটাকে বোঝায়? আর যদি তাই সত্যি হয় তাহ'লে শিক্ষিত মেয়েরা যে সেই সব অশিক্ষিতদের সঙ্গে ঘর করতে পারবে না—এ ধারণাই বা কোথা থেকে আসে আপনাদের মনে! রুবির কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল। সে বললে, শিক্ষিত মেয়েরা কি তাহ'লে তাদের অশিক্ষিত বাপ, মা, ভাই, বোনের সঙ্গে একত্র বাস করে না?

বড় কাকা মাথার বিরাট টাকে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, কথাটা সত্যিই বলেছিস, তা ছাড়া বিনোদ এই এত বড় বাড়ীর মালিক বড় অমায়িক, বিনয়ী ছেলে। আর সব চেয়ে বড় কথা তোর যখন তাতে কোন আপত্তি নেই, তখন বিয়েতে আমরা বাধা দিতে যাই কেন!

রুবি নমস্কার ক'রে তার বড় কাকার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন, তোর মনের বাসনা পূর্ণ হোক মা।

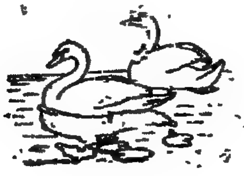

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'

বিশ্বপতি চৌধুরী

'চতুরঙ্গ' হইতে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক প্রতিভা একটি নূতন পথ ধরিয়া চলিয়াছে। কি ভাবের দিক হইতে, কি ভাষার দিক হইতে তাঁহার কথাসাহিত্যের ধারা এক নূতন ভঙ্গিতে প্রবাহিত হইতে সুরু করিয়াছে। 'ঘরে-বাইরে'-র মধ্যে এই অভিনব ভঙ্গিরই সন্ধান পাওয়া যায়।

আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে যে সকল চরিত্র আমদানি করা হইয়াছে, তাহাদের-মধ্যে অনেকেই ঠিক আমাদের মত সাধারণ মানুষ নয়। তাহাদের চিন্তা, তাহাদের বাসনা, তাহাদের স্বভাব এবং কর্ম্মের মধ্যে কোথায় যেন একটা অসাধারণত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। আসল কথা, ইহাদের মনের গঠনটাই কেমন যেন একটু অদ্ভুত ধরণের। অনেক সময় সন্দেহ হয়, বুঝি বা ইহারা ঠিক রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ নয়, কয়েকটি মতবাদ বা ভাবের শরীরী প্রকাশমাত্র।

কথা উঠিতে পারে; 'ঘরে-বাইরে'-র অন্যান্য চরিত্রের কথা না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া গেল, কিন্তু সন্দীপের মধ্যে রক্তমাংসের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না—একথা কেমন করিয়া বলা যায়? বরং এই কথাই বলিতে হয় যে, তাহার মধ্যে রক্তমাংসের পরিচয়টা খুবই প্রকট এবং হয়ত বা অতিরিক্ত প্রকট। সুতরাং তাহার মধ্যে জীবনের সাড়া পাওয়া যায় না, একথা বলিলে চলিবে কেন?

ইহার উত্তরে আমরা এই কথাই বলিতে চাই যে, মানুষের মধ্যে রক্তমাংসের আবেদন যেমন সত্য, রক্তমাংসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টাটাও ঠিক তেমনি সত্য। আমি নামক জীবটি ত আর সোজাসুজি এবং মোটামুটি গুটিকতক বাঁধাধরা প্রবৃত্তির সমষ্টিমাত্র নয়। তাহার মধ্যে যে কত বৈপরীত্য, কত জটিলতা বর্ত্তমান, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাহার কারণ, আমরা ত আর শুধু নিজেকে লইয়াই সম্পূর্ণ নই; আমরা যে আমাদের চারিদিককার মানবসমাজ এবং মানবসভ্যতার অঙ্গীভূত একটি জীবও বটে।

এই যে স্বতন্ত্র আমি এবং সামাজিক আমি, এই দুই আমির মধ্যকার সীমারেখা যে কোথায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইহারা আমাদের মধ্যে জট পাকাইয়া ভিতরে ভিতরে কখন যে একাকার হইয়া গিয়াছে তাহা কে জানে? আমরা কেবল এই জটিলতাটিকে স্বীকার করিয়া লই; এবং উপন্যাসের ভিতর দিয়া এই জটিলতার কর্ম্মরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া একশ্রেণীর সারস্বত আনন্দ উপভোগ করি। তাই চরিত্রবিশ্লেষণ উপন্যাসের প্রধানতম অঙ্গ। তাই মানবমনের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিচেতনা এবং সমাজ-চেতনার অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাসই উপন্যাসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

নানা বিপরীত চিত্তবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত এবং মানুষের চিন্তা ও কার্য্যের মধ্য দিয়া সংসারক্ষেত্রে তাহার প্রকাশ,—ইহারই নাম মানবজীবন। খাঁটি ঔপন্যাসিক চরিত্রের মধ্য দিয়া এই সত্যকার মানবজীবনই রূপায়িত হইয়া উঠে। সুতরাং যে সকল চরিত্রের মধ্যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই, বিপরীত চিত্তবৃত্তির এই সংঘাত নাই, তাহাদিগকে আমরা ঠিক স্বাভাবিক জীবন্ত মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তাই ঔপন্যাসিক যখন কোন চরিত্রকে শুধু একটা দিক হইতে ফুটাইয়া তুলেন, তখন আপনা হইতেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, তিনি মানবজীবনকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিতেছেন, না তাঁহার মনগড়া, সুবিধামত একটা চরিত্র আমদানি করিয়া তাঁহার বিশেষ কোন বক্তব্য বা মতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন?

অবশ্য একথা সত্য যে, ঔপন্যাসিক অনেক সময় তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের ভিতর দিয়া একটা না একটা সত্য ফুটাইয়া তুলেন। কিন্তু এই সত্যটি বাহির হইতে আসে না, মানবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আবর্ত্তিত হইয়া উঠে। তাই এই সকল সত্য আমাদের বিচার-বুদ্ধিকেই শুধু নাড়া দেয় না, সেই সঙ্গে আমাদের সমগ্র চেতনাকে সজাগ করিয়া তুলে।

'ঘরে-বাইরে'-র ভিতর দিয়া যে সকল সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেগুলি ঠিক স্বাভাবিক ভাবে মানব-জীবনের ভিতর দিয়া আপনা হইতে উৎসারিত হয় নাই, সেগুলিকে যেন মানব-জীবন হইতে সূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক এবং সচেতন বিশ্লেষণ-বুদ্ধির সাহায্যে আবিষ্কার করা হইয়াছে। তাই এই শ্রেণীর উপন্যাসের ভিতরকার সত্যকে আমরা বুদ্ধির দ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া গ্রহণ করি, ঠিক সমগ্র চেতনার দ্বারা উপলব্ধি করি না। এই শ্রেণীর উপন্যাস আমাদের অসতর্ক চেতনা অপেক্ষা আমাদের সতর্ক বুদ্ধিকে অনেক বেশি সজাগ করিয়া তুলে। লেখক নিজেও সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাই 'ঘরে-বাইরে'-র প্রত্যেকটি চরিত্রকে তিনি সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি এবং সুনিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তির অধিকারী করিয়া গড়িয়াছেন, যাহাতে তাহারা তাহাদের জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা এবং কার্য্যকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার ফলাফল আমাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে পারে এবং সেই সঙ্গে আমাদের বিচার ও বিশ্লেষণ-বুদ্ধিকেও সজাগ করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়।

ইহাতে করিয়া ফল হইয়াছে এই যে, এই সকল নরনারীর প্রতি এবং ইহাদের জীবনের প্রতি আমরা যত না আকৃষ্ট হই, তাহার চেয়ে অনেক বেশি আকৃষ্ট হই, ইহাদের আত্মবিশ্লেষণজাত সূক্ষ্ম সত্যের দিকে।

তাই অনেক সময় মনে হয়, কেহ যদি 'ঘরে-বাইরে'—শ্রেণীর সৃষ্টিকে রূপক নাট্যশ্রেণীর রচনার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে আমাদের আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকে না।

খাঁটি উপন্যাস-রচয়িতাদের সব চেয়ে বড় কাজ হচ্ছে পাঠক-চিত্তে এই বিশ্বাসটুকু জাগাইয়া তোলা যে, তাহারা গল্প শুনিতেছে না, তাহারা সত্যকার মানবজীবনকে প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই বিশ্বাস উপন্যাসবর্ণিত চরিত্র এবং ঘটনাবলীর স্বাভাবিকত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। তাই ঘটনা-সমাবেশ এবং চরিত্রাঙ্কন যাহাতে স্বাভাবিক হয়, খাঁটি ঔপন্যাসিককে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। চরিত্রগুলি যাহাতে কথা-বার্ত্তায়, কাজে-কর্ম্মে,

ভাবে-ভঙ্গিতে জীবন্ত মানুষের মত স্বাভাবিক হইয়া উঠে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি না রাখিতে পারিলে ঔপন্যাসিকের উপন্যাস-রচনার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়।

'ঘরে-বাইরে'-র লেখক কিন্তু এই জাতীয় স্বাভাবিকত্বের প্রতি খুব বেশি শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা দেখান নাই। এই বইয়ের চরিত্রগুলিই শুধু অসাধারণ নয়, তাহারা যে ভাষায় কথা কয়, তাহাও আদৌ সাধারণ নয়।

বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে আমরা নিজেরাই অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়াইয়া থাকি, তাই নিজেদের বর্ত্তমানকে আমরা ঠিক সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি দিয়া সচেতনভাবে জানিতে বা বুঝিতে পারি না। অতীত হইতে আমরা কিন্তু ছাড়া পাই, তাই আমাদের অতীত জীবনকে আমরা দূর হইতে, তফাত হইতে দেখিতে, বুঝিতে এবং বিচার করিতে পারি। যাহা আমাদের অঙ্গীভূত, তাহার সম্বন্ধে আমরা ঠিক সচেতনভাবে জ্ঞান আহরণ করিতে পারি না। তাই কোন জিনিষকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইলে, তাহাকে খানিকটা দূরে সরাইয়া দেখিতে হয়।

আমাদের বর্ত্তমান আমাদের সমগ্র অস্তিত্বের সহিত জড়িত। তাই তাহাকে আমরা সমগ্র চেতনার দ্বারা ভোগ করিতে পারি, কিন্তু স্বতন্ত্র সজাগ বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে পারি না। আমাদের অতীত জীবন আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় বলিয়াই তাহাকে আমরা সচেতনভাবে বিচার করিতে পারি, বিশ্লেষণ করিতে পারি। সেখানে ভোগমুক্ত সচেতন বুদ্ধিকে আমরা অনায়াসে কাজে লাগাইতে পারি। 'ঘরে-বাইরে'-র লেখক তাই তাঁর উপন্যাসবর্ণিত চরিত্রগুলিকে তাহাদের বর্ত্তমান জীবনক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের অলক্ষিতে তাহাদের কার্য্যকলাপ গোপনে প্রত্যক্ষ করিয়া উপন্যাসাকারে প্রস্তুত করেন নাই, তাহাদিগকে নিজের বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া তাহাদের মুখ হইতেই তাহাদের অতীত জীবনের কাহিনী শুনিয়া লইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাই বিমলা, নিখিলেশ এবং সন্দীপকে আমরা তাহাদের জীবনযাত্রার পথে প্রত্যক্ষভাবে বিচরণ করিতে দেখি না, তাহাদের সহিত আমাদের দেখাশোনা তাহাদের লিখিত আত্মকাহিনীর পরোক্ষ ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তাহাদিগকে আমরা কাছ হইতে দেখি না, দেখি দূর হইতে।

কোন জিনিষকে দূর হইতে দেখার সুবিধা এই যে, ইচ্ছা করিলে জিনিষটাকে আমরা যেমন সজাগ বুদ্ধির দ্বারা সুবিধামত বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি (যে কথা এতক্ষণ বলিতেছিলাম), তেমনি ইচ্ছা করিলে জিনিষটিকে তার দূরত্বের ভিতর দিয়া স্বপ্নময় উচ্ছ্বাসময় দৃষ্টিতেও দেখিতে পারি।

তাই 'ঘরে-বাইরে'-র মধ্যে দুইটি জিনিষ বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি হচ্ছে তার সতর্ক বিচার-বিশ্লেষণের দিক, আর একটি হচ্ছে তার কবিত্বময় উচ্ছ্বাসের দিক। তাই 'ঘরে-বাইরে'-র ভাষা একদিকে যেমন সজাগ বিশ্লেষণের নিপুণতায় তীক্ষ্ণ; অপরদিকে তেমনি কবিত্বময় উচ্ছ্বাসের দ্বারা ঝঙ্কার-মুখর।

এই শ্রেণীর রচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা স্বাভাবিক মমতা এবং আকর্ষণ আছে। তাহার কারণ—রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একদিকে যেমন একটি সৌন্দর্য্যমুগ্ধ ভাবুক কবি আছে, অপর দিকে তেমনি একটি চিন্তাশীল সত্যানুসন্ধানী দার্শনিকও বর্ত্তমান। এই দুইটি প্রাণী তাঁহার মধ্যে পৃথক্‌ভাবে বাস করিতেছে না, ইহাদের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে তাঁহার মধ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি তথা মানবজীবনের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য এবং কবিত্ব যেমন একদিকে গভীরভাবে উপভোগ করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি ইহার অন্তর্নিহিত সত্যকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যও তাঁহার ব্যাকুলতার অন্ত নাই। যে ধ্যানদৃষ্টি তাঁহার নিকট সৃষ্টি তথা মানবজীবকে সুন্দর এবং কবিত্বপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, সেই গভীর ধ্যানদৃষ্টিই তাঁহাকে মানবজীবনের গভীরতম প্রদেশ হইতে সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য প্রেরণা দান করিয়াছে। এ দৃষ্টি ভাবুক কবির দৃষ্টি, এ দৃষ্টি চিন্তাশীল সত্যানুসন্ধানীর দৃষ্টি,—এ দৃষ্টি খাঁটি ঔপন্যাসিকের দৃষ্টি নয়।

'ঘরে-বাইরে' যে আমাদের ভাল লাগে, সে চরিত্র-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যের জন্যও নয়, ঘটনাবিন্যাসের কলাকৌশলের জন্যও নয়, সে কেবল তার বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিধর্ম্মী, সুতীক্ষ্ণ, শাণিত অথচ উচ্ছ্বাসময়, আবেগময়, অপূর্ব্ব ভাষার জন্য। এই পুস্তকখানির ভিতর দিয়া মানবজীবন ততটা রূপায়িত হইয়া উঠে নাই, যতটা রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে কয়েকটি সূক্ষ্ম সত্য এবং গভীর চিন্তা। এই সত্য এবং চিন্তাগুলিকে বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিপূর্ণ শাণিত, সতেজ ভাষার সাহায্যে রূপায়িত করিবার জন্য লেখক তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে ঔপন্যাসিক স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘিত হইয়াছে জানিয়াও তিনি এতটুকু চিন্তিত ন'ন।

'গোরা' উপন্যাসের মধ্যেও যুক্তিতর্ক এবং বক্তৃতার মধ্য দিয়া একটি গভীর সত্যকে ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা পরিস্ফুট; কিন্তু লেখক সেখানে ঔপন্যাসিক মনোবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেখানে ঔপন্যাসিক বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘন করিতে তিনি রীতিমত দ্বিধাবোধ করিয়াছেন। তাই উক্ত উপন্যাসে আমরা শুধু গোরা এবং পরেশ বাবুকেই পাই না, সেই সঙ্গে পানু বাবু, মহিম, হরিমোহিনী মাসী, সতীশ, অবিনাশ, বরদাসুন্দরী প্রভৃতি এমন কয়েকটি নরনারীর দেখা পাই, যাহারা কোন গভীর চিন্তা বা সূক্ষ্ম সত্যকে আমাদের মনে জাগাইয়া তুলে না, যাহারা কেবল বিচিত্র মানবজীবনকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করে।

লেখক ইহাদিগকে আমদানি করিয়াছেন নিছক ঔপন্যাসিক প্রয়োজনে। গোরা এবং পরেশবাবুর চিন্তা এবং মন্তব্যের মধ্য দিয়া যে সকল সত্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এই সকল চরিত্র তাহাদের উপর এতটুকুও আলোকপাত করে নাই, এবং লেখক সে উদ্দেশ্য লইয়া ইহাদিগকে আমদানিও করেন নাই। লেখক ইহাদিগকে আনিয়াছেন উপন্যাসের মধ্যে জীবনের একটি সহজ, স্বাভাবিক, তাজা আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্য।

এই চরিত্রগুলি না আসিলে উপন্যাসবর্ণিত গল্প যেমন অগ্রসর হইত না, সেইরূপ উপন্যাসের বাস্তবতাও রক্ষিত হইত না। কোন সত্যকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে কয়টি চরিত্রের প্রয়োজন,

সেই কয়টি গোণাগুন্তি চরিত্রের সাহায্যে কেবল প্রতিপাদ্য সত্যকেই ফুটাইয়া তোলা যায়, জীবনকে প্রতিফলিত করা যায় না।

সৃষ্টি এবং সংসার যেমন বিচিত্র; তাহার মধ্যে যেমন ভাল-মন্দ, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয়, প্রধান-অপ্রধান সবই ভীড় করিয়া রহিয়াছে, উপন্যাসের মধ্যেও সেইরূপ ছোট-বড়, ভাল-মন্দ, প্রধান-অপ্রধান, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা চরিত্রের আমদানি করিতে হয়।

বাস্তব সংসারের এই নিরপেক্ষ উদারতা, এই জাতিবিচারহীন অপক্ষপাতের মধ্যে জীবনের যে স্বাভাবিক, অবাধ, স্বাধীন সাবলীল গতিভঙ্গিটি রহিয়াছে, উপন্যাসে আমরা তাহারই আভাস পাইতে চাই।

উপন্যাস অবশ্য প্রত্যক্ষ সংসারের মত একবারে বেপরোয়া হইতে পারে না, কারণ উপন্যাস জীবন নয়—জীবনের সারবস্তু প্রকাশ, সুতরাং উহার তলে তলে একটি সূক্ষ্ম অন্তর্লীন ভাবসূত্র না থাকিয়া পারে না, কিন্তু ঐ সূত্রটি এত প্রচ্ছন্নভাবে থাকা চাই, যাহাতে উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পাঠকচিত্ত কোনদিন সচেতন হইয়া উঠিতে না পারে। সূত্রগোপনের এই নৈপুণ্যটির উপর উপন্যাসের বাস্তবতা অনেকখানি নির্ভর করে। তাই খাঁটি উপন্যাসে এমন অনেক ছোট-খাটো চরিত্র আমদানি করিতে হয়, যাহারা শুধু উপন্যাসবর্ণিত গল্পটিকেই আগাইয়া লইয়া যায় না, সেই সঙ্গে উপন্যাসের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য-সূত্র বা ভাবসূত্রটিকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি যত অনন্যসাধারণ হয়, এই সকল ছোটখাটো অতিসাধারণ চরিত্রের আমদানি তত অধিক প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।

'গোরা' উপন্যাসের মধ্যে কয়েকটি অনন্যসাধারণ চরিত্র আছে বলিয়াই রবীন্দ্রনাথকে তাহাদের চারিপাশে এমন কতকগুলি ছোটখাটো চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইয়াছে, যাহারা শুধু সাধারণ এবং স্বাভাবিক নয়, এত একান্তভাবে সাধারণ এবং পরিচিত যে, মনে হয়, তাহাদিগকে আমরা প্রতিদিন আমাদের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি।

গোরা এবং পরেশ বাবুর চিন্তা ও আত্মজিজ্ঞাসার ভিতর দিয়া উপন্যাসের যে উদ্দেশ্যসূত্রটি মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহাকে চারিদিক হইতে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছে এই সকল চরিত্র। গোরা ও পরেশ বাবুর বক্তৃতা এবং আলোচনা যখনই উপন্যাসের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যটিকে প্রচার করিবার জন্য নিতান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে, তখনই এই সকল ছোটখাটো চরিত্র জীবন-প্রবাহের বিচিত্র কলকল্লোলে সেই মুখরতাকে কোথায় ডুবাইয়া দিয়াছে।

'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে কিন্তু এই শ্রেণীর চরিত্র নাই বলিলেই চলে। একমাত্র মেজরাণী (বিমলার মেজ-জা) ছাড়া এই গ্রন্থখানির মধ্যে এমন একটি চরিত্রও নাই, যাহা উপন্যাসের প্রতিপাদ্য সত্যের সীমাবদ্ধ, রুদ্ধদ্বার গৃহের বাহিরে জীবনের স্বাধীন, অবাধ মুক্তপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া সহজভাবে নিঃশ্বাস ছাড়িতে পারিয়াছে।

আসল কথা, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস নয়; ইহা এক শ্রেণীর নূতন ধরণের সাহিত্যিক সৃষ্টি।

কতকগুলি চিন্তা লেখকের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিয়াছে, এবং এইগুলিকে ভাষার সাহায্যে রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার মধ্যে আসিয়াছে সাহিত্যিক তাগিদ। তাহারই ফলে হইয়াছে 'ঘরে-বাইরে'র সৃষ্টি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, গ্রন্থকার তাঁর চিন্তাগুলিকে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিলেই ত পারিতেন। তাহার উত্তর এই যে, ঐগুলিকে সাজাইয়া প্রবন্ধ লিখিলে চিন্তাগুলি বিবৃত হইত মাত্র,—রূপ লাভ করিতে পারিত না।

আমাদের যুক্তি, তর্ক, চিন্তা ততক্ষণ পর্য্যন্ত শুষ্ক প্রাণহীন মানসিক ক্রিয়ামাত্র, যতক্ষণ পর্য্যন্ত উহারা মানবজীবনের গভীর অনুভূতির সহিত মিলিত না হয়।

মানব-জীবনের সহিত আমাদের চিন্তাগুলিকে কোনপ্রকারে একবার যুক্ত করিয়া দিতে পারিলে আমাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মায়াস্পর্শে উহারা দেখিতে দেখিতে সজীব হইয়া উঠে, উহাদের মধ্যে আসিয়া উঠে জীবনের ছন্দলীলা।

ইহার জন্য একটা গোটা মানবজীবনের দরকার হয় না; দরকার হয় কেবল মানবজীবনের সেইটুকু বৈদ্যুতিক স্পর্শ যাহা চিন্তাগুলিকে গতিশীল করিয়া তুলিতে পারে।

'ঘরে-বাইরে-র' লেখক ত' আর মানব-জীবনকে রূপায়িত করিতে চান নাই, তিনি মানবজীবন হইতে সেই উত্তাপটুকু মাত্র সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছেন, যাহা তাঁহার চিন্তাগুলির মধ্যে আবেগ-সঞ্চার করিতে পারে। তাই 'ঘরে-বাইরে'-র চরিত্রগুলিকে নিতান্ত একপেশে করিয়া আঁকিতে লেখক এতটুকু কুণ্ঠিত হন নাই: ইহাদের জীবনের যেটুকু নিবিড় স্পর্শ তাঁহার চিন্তাগুলিকে সজীব করিয়া তুলিবার পক্ষে প্রয়োজনীয়, ততটুকুই কেবল তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

সন্দীপ-চরিত্রটি চারিদিক হইতে কতটা স্বাভাবিক হইল বা কতটা হইল না, তাহা লইয়া লেখক খুব বেশি মাথা ঘামাইতে চান না; তিনি কেবল এই লোকটির জীবনের সেই অংশটির উপর একান্তভাবে জোর দিতে চান, যাহা তার জড়বাদী চিত্তের উদ্দাম, অপ্রমত্ত চিন্তাগুলির উপর আনিয়া দিতে পারে তার বিদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রচণ্ড তড়িৎস্পর্শ। তার জীবনের এই একটিমাত্র দিকের উপর এতখানি জোর দেওয়ার ফলে তার চরিত্রের বাস্তবতা এবং স্বাভাবিকতা যদি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে—উপায় নাই। তাহার জীবনের ভিতর দিয়া স্থূল জড়বাদীর ধর্ম্মহীন উদ্দাম চিন্তাগুলিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে হইবে, সুতরাং চরিত্রটিকে একেবারে জড়বাদী করিয়া অঙ্কিত না করিয়া উপায় কি? তাহাতে চরিত্রটির বাস্তবতা এবং স্বাভাবিকতা যদি ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে, লেখক সেজন্য আদৌ দুঃখিত ন'ন। তিনি কেবল দেখিতে চান, যে চিন্তাগুলিকে তিনি রূপ দিতে চাহিয়াছেন, সেগুলি তাঁর সৃষ্ট নরনারীর জীবনের স্পর্শ লাভ করিয়া কতটা সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

আসল কথা, প্রাণহীন চিন্তাকে যে মানুষ ভাষার ভিতর দিয়া কতখানি সজীবতা, কতখানি সরসতা দান করিতে পারে; শুষ্ক বিচারবুদ্ধির মধ্যে যে মানুষ কতখানি সারস্বত আবেগ আনিয়া দিতে পারে—'ঘরে-বাইরে'-র লেখক তাহাই চূড়ান্তভাবে দেখাইয়াছেন।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম-এ, বার-এট-ল

তিন

কিন্তু লোকটাকে দেখে আমার মোটেই পছন্দ হ'ল না। রঙ ফর্শা নয়, রোগা ছোট্ট চেহারা, মাথায় এক-ঝাঁক কোঁকড়া চুল—কেমন মেয়েদের মতন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে।

যমুনাকে বললাম "ঘটকালী করতে পারবো না ভাই।"

যমুনা শুধাল, "কেন?"

বললাম, "ছিঃ-ছিঃ—গোলাম কেন, তাসের বাজারে ওর ছুরী হওয়ারও যোগ্যতা নেই; ওর পাশে কি বিবি বসাতে পারি?"

যাই হোক, এ ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াল না—সহজেই গেল থেমে। লোকটাও দিন পনেরো থেকেই গেল চলে এবং যমুনাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাধিমুক্ত হয়ে উঠল। পরে বুঝলাম—আড়ালে-আবডালে যমুনাকে একলা পেলেই, একটু গায়ে-পড়া রঙ্গ-রসিকতায় যমুনার মাথাটা কিছু দিনের জন্য ঘুরিয়ে দিয়েছিল মাত্র।

এবার কিন্তু যমুনার ব্যাপারটা হ'ল একটু অন্য ধরণের। মেজদা' বিলেত রওয়ানা হয়ে যাওয়ার মাস দুই পরে—আমার ক্লাশের টেষ্ট পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে,—যমুনা একদিন এল আমাদের বাড়ী। চোখ দেখেই বুঝলাম কিছু একটা ঘটেছে।

শুধালাম, "আবার কি হ'ল যমুনারানী?"

ব্যাকুল ভাবে বললে, "এবার সত্যিই আমার বিষ খেয়ে মরা ছাড়া উপায় নেই ভাই।"

শুধালাম, "কেন, কি হয়েছে?"

বললে, "বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল ভাই। এই ফাল্গুন কি বড়জোর বৈশাখেই বিয়ে হবে।"

শুধালাম "সে কি! এত দূর কবে গড়াল?

বললে, "কালকেই পাকা কথা হয়ে গেল।"

শুধালাম, "তা এ ত সু-খবর। বিষ খেয়ে মরবি কেন?"

যমুনা যেন ভেঙ্গে পড়ল। কোনও রকমে বললে, "লোকটা ভাই অতি বিশ্রী দেখতে। বয়সও প্রায় বছর চল্লিশের কাছাকাছি। তার উপর দ্বিতীয় পক্ষ।"

একটু চুপ করে থেকে শুধালাম, "তা লোকটাকে তুই কবে দেখলি?"

বললে "আমাকে দেখতে এসেছিল নিজেই। তখন বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম ছেলের বড় ভাই টাই কিছু হ'বে। আমার কাছে সবাই বোধহয় লুকিয়েছিল।"

একটু ভেবে গম্ভীর ভাবে বললাম, "তুই ভাবিস্ না যমুনা। এর একটা কিছু বিহিত করবই। একটু ভেবে দেখি।"

যমুনা তাড়াতাড়ি বললে, "কিন্তু ভাই, আমি যে তোমায় কিছু বলেছি, কেউ যেন টের না পায়।"

বললাম, "না, না। সে বুদ্ধিটুকু আমার আছে।"

যমুনার কথা শুনে সত্যই রাগ হয়ে গেল। কি অন্যায়! যমুনা—প্রাণভরা কত সাধ-আহ্লাদ—তার কি না বিয়ে হ'বে একটা চল্লিশ বছরের বুড়োর সঙ্গে। তাও আবার দ্বিতীয় পক্ষ। দেখতে খারাপ—সেটা অবশ্য কিছু বড় কথা নয়। সবাই কিছু দেখতে সুপুরুষ হয় না। কিন্তু লোকটার কি আক্কেল! বুড়োবয়সে একটা কচি মেয়ে বিয়ে করতে চায়! এমন লোকের হাতে যমুনাকে কিছুতেই দেওয়া হ'বে না। তার চেয়ে, যদি উপায় করতে না পারি—আমিই ওর হাতে বিষ তুলে দেব।

যমুনাকে ঝোঁকের মাথায় জোর করে বলেছি—একটা কিছু বিহিত করবই। কিন্তু আমি কি করতে পারি? সমস্ত দিন কথাটা নিয়ে ভাবলাম, কোনও দিকে

কোনও উপায় খুঁজে পেলাম না। মন আমার তবুও কিছুতেই পরাজিত হ'তে রাজী নয়। মনের অন্তস্তল থেকে একটা জোর যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে—প্রয়োজন হ'লে আমি যেন জগৎটাকেই নাড়া দিতে পারি, এ ত তুচ্ছ একটা ব্যাপার।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এ নিয়ে অনেক ক্ষণ ভাবলাম—কোনও উপায় খুঁজে পেলাম না। একবার ভাবলাম মেজবৌদি'র সঙ্গে পরামর্শ করি। কিন্তু মেজবৌদির প্রতি আমার যতই শ্রদ্ধা থাকুক না কেন, এ ব্যাপারে মেজবৌদির কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না—এটা বোঝা আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। শুনলে হয়ত অবাক্ হয়ে বলবেন, "ও মা! সে কি কথা! বাপ মা দেখে শুনে বুঝে সুঝে বিয়ে দিচ্ছে—তার উপর আবার মেয়ের মতামত কি? বাপ মা কি মেয়ের শত্রু না মেয়ের চেয়ে কম বোঝেন?" শুধু শুধু যমুনাকে মেজবৌদির কাছে খেলো করাই হবে।

চুপ করে শুয়ে শুয়ে নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম।

পরের দিন সকালে উঠেই সমস্যাটা কিন্তু হঠাৎ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। ঠিক করে নিলাম প্রথমেই যমুনার মার সঙ্গে কথা বলা দরকার। যমুনাকে বাঁচিয়ে কথাটা কোন দিক দিয়ে কি ভাবে সুরু করতে হবে—সেটা যা হয় করা যাবে বিশেষ কিছু কঠিন বলে মনে হ'ল না। যদি ফল কিছু না হয় ত দাদাকে সব বলে দাদাকে নিয়ে লোকটার সঙ্গে গিয়ে আমি নিজেই দেখা করব। তাই ত! দাদাকে বললে ত অনেকটা কাজ হ'তে পারে—এ কথাটা কাল কেন আমার মনে হয়নি?

সকাল সকাল স্নান সেরেই যমুনাদের বাড়ী গেলাম। যমুনার মা তখন নীচের তালায় উঠানের পাশে বারান্দায় বসে কুটনো কুটছিলেন—যমুনা বসে ছিল পাশেই।

যমুনার মা আমাকে দেখেই এক-গাল হেসে বললেন, "এসো বুলামা, এসো! আজ এত সকালেই মা-লক্ষ্মীর আবির্ভাব?"

একটা পিঁড়ে টেনে নিয়ে পাশে বসলাম। যমুনাটা কিন্তু এমন বোকা, আমাকে দেখেই কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো—যেন উঠে চলে যেতে পারলে বাঁচে।

তাড়াতাড়ি বললাম, "যমুনা! তোর ত নাওয়াও হয়নি দেখছি। কি করছিলি এত বেলা পর্য্যন্ত? চট্ করে নেয়ে নে, তারপর তোকে নিয়ে বাড়ী যাব। পিসিমা! যমুনা আজ আমাদের বাড়ীতেই খাবে।"

যমুনার মাকে আমি 'পিসিমা' বলতাম। কেননা, যমুনার সঙ্গে আমার আব সুরু হতেই যমুনার বাবা মা একদিন আমাদের বাড়ীতে বাবাকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং যমুনার মা পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা ভরে বাবাকে "দাদা" বলে ডেকে একটা আত্মীয়তার সূচনা করে এসেছিলেন।

আমার কথা শুনেই যমুনা উঠে পড়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যমুনা চলে গেলে যমুনার মাকে বললাম, "পিসিমা! যমুনা এবার পরীক্ষাটা দিল না কেন?"

তিনি বললেন, "ও মেয়ের আর পরীক্ষা দিয়ে কি হ'বে—ও কি আর পাশ করতে পারতো।"

বললাম, "তা বলা যায় না। পাশ ফেল অদৃষ্টের কথা। পরীক্ষাটা দেওয়া উচিত ছিল।"

বললেন, "লেখাপড়া আর বেশী শিখে কিই বা হ'বে—এবার বিয়েটা হ'য়ে গেলে বাঁচি।"

শুধালাম, "বিয়ে—সেকি কথা পিসিমা? যমুনার এখুনিই বিয়ে হ'বে নাকি?"

একটু হেসে বললেন, "তা বিয়ের বয়স কি হয়নি?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "সে কথা বলছি না; ম্যাট্রিকটা অন্ততঃ পাশ করুক। তারপর না হয় বিয়ে হ'বে।"

বললেন, "একটা ভাল সম্বন্ধ পাওয়া গেছে—এখন যত শীঘ্র হয়ে যায় ততই মঙ্গল।"

বিশেষ যেন আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে শুধালাম, "সে কি পিসিমা? কোথায়?"

বললেন, "ছেলেটী কলকাতার এক আপিসে ভাল কাজ করে—আড়াইশো টাকা মাহিনা পায়। কলকাতায় পৈতৃক বাড়ীও আছে একখানা পটলডাঙ্গায়।"

আগ্রহভরে শুধালাম, "তা কবে বিয়ে হ'বে পিসিমা?"

বললেন, "আমাদের ত এই ফাল্গুন মাসেই দেওয়ার ইচ্ছা, ছেলের ইচ্ছা বৈশাখ মাসে। বৈশাখের চেয়ে আর পেছোবে না।"

একটু ভেবে শুধালাম, "ছেলের বাবা কি করেন?"

বললেন, "ছেলের বাপ-মা নেই। এক বিধবা পিসি আছেন সংসারে—সেই সংসার দেখা-শোনা করে। ছেলেই নিজে দেখে পছন্দ করেছেন।"

কথাটা যেন এইখানেই শেষ হয়ে গেল—আসল কথায় পৌঁছাল না। কোন্ দিক দিয়ে কথাটাকে কি ভাবে টেনে নেওয়া যায়—একটু ভাবছি, এমন সময় পিসিমাই বললেন, "ছেলেটী চমৎকার—একটা পয়সার দাবী-দাওয়া নাই। যমুনার অদৃষ্টে যে এমনতর জুটবে এত আশা করিনি কখনও—"

বললাম, "অবস্থা বোধ হয় খুব ভাল।"

বললেন, "পৈতৃক কিছু নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া কলকাতায় বাড়ী, ছেলের ভাল চাকুরী—আর কি হ'বে।"

শুধালাম, "তা এমন ভাল সম্বন্ধ পেলে কি ক'রে পিসিমা?"

একটু হেসে গর্ব্বভরে বললেন, "ভগবানই যোগাযোগ করিয়ে দেন। উনি যে আপিসের বড় বাবু, সেই আপিসেই একটি লোক কাজ করে—সে দূর সম্পর্কে ছেলেটির কিরকম শালা হয়—"

পিসিমা কথাটা যেন হঠাৎ চেপে নিলেন,—বোধহয় ভাবী জামাতার ওদিকটা আমাকে জানাবার ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু ভগবান্ সত্যিই যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। এইবার সুযোগ হ'ল।

অবাক্ হয়ে শুধালাম, "সে কি কথা পিসিমা! শালা হয় কি রকম?"

পিসিমা একটু যেন ঢোক গিলে বললেন, "মানে, ছেলেটার অল্প বয়সে আর একবার বিয়ে হয়েছিল। সে বৌ অনেক দিন মারা গেছে। তাতে আর কি।"

গম্ভীর ভাবে শুধালাম, "তা তোমার ভাবী জামাইয়ের বয়স কত পিসিমা?"

তাড়াতাড়ি বললেন, "না না, বয়স এমন কিছু বেশী হয়নি। এই, বছর পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হবে।"

বেশ জোরের সঙ্গে বললাম, "এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না পিসিমা।"

পিসিমা একটু অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন।

আবার বললাম, "তুমি তোমার যমুনাকে একটা দোজবরে বুড়োর হাতে তুলে দেবে? আর তাই নিয়ে, মা হয়ে আহ্লাদ করছ? না পিসিমা, এ কিছুতেই হ'তে পারে না। পিসেমশাইয়ের যা-ই মত হোক, তুমি এ বিয়ে জোর করে ভেঙ্গে দাও।"

পিসিমা কোনও কথা কইলেন না। চুপ করে কুটনো কুটতে লাগলেন।

আবার বললাম, "তুমি 'মা' হয়ে যদি মেয়ের দিকটা না দেখ, কে দেখবে পিসিমা?" মেয়ে পার করে শুধু তোমাদের বাঁচলেই ত' হ'বে না—মেয়েকেও ত' বাঁচতে হ'বে।

এই বলে উঠে দাঁড়ালাম। পিসিমা চোখ তুলে বললেন, "বস না—যাচ্ছ কেন?"

পিসিমার গলার সুরে যেন মনে হ'ল—তিনি হয়ত একটু অভিভূত হয়েছেন।

বললাম, "না পিসিমা। আমার থাকতে ইচ্ছে করছে না। আর তুমি যদি এ বিয়ে ভেঙ্গে না দাও, আমি আর তোমাদের বাড়ী কখনও আসব না।"

বললেন, "বস—মা-লক্ষ্মী বস। রাগ কোর না। ছেলেমানুষ তোমরা—কথাটা সবদিক দিয়ে ভেবে দেখতে হয়। কোন্ মায়ের আর অসাধ বল যে মেয়েটাকে একটী সচ্চরিত্র সুশ্রী তরুণ ছেলের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু সব সময় কি আর তা সম্ভব হয়ে উঠে মা?"

আবার বললাম।—

বললাম, "তা এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার দরকার কি?"

একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, "এতগুলো ছেলেমেয়ে—আমাদের অবস্থা ত তেমন ভাল নয়, আর আমার যমুনা দেখতেও তেমন কিছু নয়। সবদিক বিবেচনা করে এর চেয়ে আর ভাল কোথায় পাব বল? যা জুটেছে, বয়স হয়ে গেলে হয়ত তাও জুটবে না।"

তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "তোমার মতন রাজকন্যার রূপ নিয়ে যদি জন্মাত ত' রাজপুত্র বর না পেলে কিছুতেই বিয়ে দিতাম না।"

হাসিটী কিন্তু প্রাণভরা নয়, করুণ—সেটুকু আমার লক্ষ্য এড়ায় নি।

যমুনার মার সঙ্গে কথা বলে যে খুব সুফল হ'বে—এ আশা আমি করিনি। তবুও ভেবেছিলাম—মায়ের প্রাণ—যদি একটু গলিয়ে দিয়ে কোনও দিক দিয়ে কিছু করা যায়। যমুনার মার মনটা সত্যিই যে বড় কোমল এবং তিনি যে যমুনাকে সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে ভাল বাসেন সেটা আমার অবিদিত ছিল না। এবং যমুনার মার সঙ্গে সহজ সরল ভাবে কথা বলতে আমার ভয় বা লজ্জা কোনও দিনই নাই। সত্যিই যমুনার মা বড় ভাল।

যমুনার মার করুণ হাসিটী দেখে বুঝতে আমার দেরী হ'ল না যে মেয়েকে দ্বিতীয় পক্ষের হাতে তুলে দিতে তাঁর মনেও ব্যথা বেজেছে। কিন্তু সব দিক ভেবে, উপায় নেই বুঝে, তাই নিয়েই খুসি হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছেন—বোধ হয় মেয়েরই মঙ্গলের জন্য। তাই বোধ হয় তাঁর মনের ব্যথার দিকটা নিয়ে আর আলোচনা করতে আমার মনেও বাজলো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শুধু বললাম "তা আর কিছুদিন অপেক্ষা করলেই পারতে?"

বললেন "উনি বড় ব্যস্ত হয়েছেন। যমুনার বিয়ের ভাবনায়, ওঁর মনে শান্তি নাই—শরীর ত' ওঁর ভাল নয়।"

কথা আর এগুলো না। যমুনা স্নান করে ফিরে এলে তাকে নিয়ে গেলাম বাড়ী। এ সব কথা যমুনার কাছে আর কিছুই বলিনি—যমুনাও ওদিক দিয়ে, কেন জানি না, কোনও কথাই তুলল না আর।

*

দাদার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হ'ল সেদিন রাত্রেই, যমুনা

চলে যাওয়ার পর। দাদাকে সব কথা বলে শুধালাম "দাদা! এখন কি উপায় করা যায় বল ত ?"

দাদা সমস্ত শুনে বললেন "তুই যতটা রাগ করছিস্, ততটা রাগ করার বিশেষ কোনও কারণ আছে বলে ত মনে হয় না।"

শুধালাম "কেন ?"

দাদা ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন "দ্বিতীয় পক্ষ—তাতে ত আপত্তি হওয়ার কোনও কারণ নাই। এ বিষয় আমার মতামত ত' তুই জানিস্। পুরুষের স্ত্রীবিয়োগের পর আবার বিবাহে এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহে আমার মতে কোনও বাধা থাকা উচিত নয়। আমি শুধু বলি, এবিষয়ে পুরুষ এবং মেয়েদের একই নিয়ম হওয়া উচিত। তারপর বয়স বেশী—তাও বলছিস্ চল্লিশের কাছাকাছি। বিবাহের পক্ষে এমন কিছু বেশী বয়স নয়।"

উত্তেজিত ভাবে বললাম "বল কি দাদা, চল্লিশ বয়সটা কি কম হ'ল ?"

দাদা একটু হেসে বললেন "চল্লিশ বয়সটা অবশ্য কম নয়, কিন্তু বিবাহটা শুধু আনন্দ ও ভোগের জিনিষ নয় ত। বিবাহের মধ্যে একটা গুরুতর দায়িত্ব আছে এবং আমার বিশ্বাস, সে দায়িত্ব নেওয়ার অধিকার সাধারণতঃ একটু বয়সেই হয়।"

বললাম "কিন্তু মেয়ের বয়স যে অত্যন্ত কম। সেদিক দিয়ে যে বেমানান হয়ে যাচ্ছে।"

দাদা শুধালেন "যমুনার বয়স কত ?"

বললাম "কত আর, আমার চেয়ে বড় জোর বছর খানেকের বড় হ'বে।"

দাদা একটু ভেবে বললেন "সেদিক দিয়ে বাইরের দৃষ্টিতে একটু বেমানান হয় ত' হচ্ছে। কিন্তু কম বয়সের অপাত্রের চেয়ে বেশী বয়সের সুপাত্র অনেক ভাল। বেশী বয়সের সুপাত্রের হাতে মেয়েরা সাধারণতঃ সুখী হয়।"

বললাম "কি যে বল দাদা—বুঝতে পারি না। চল্লিশ বছরের একটা লোককে কি যমুনার মতন বয়সের মেয়ের ভালবাসা সম্ভব ? কেমন করে যমুনা সুখী হ'বে ?"

আমার এ ধরণের প্রশ্নে দাদা বোধ হয় মনে মনে বিশেষ একটা কৌতুক উপভোগ করছিলেন। আমার প্রশ্নের পর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন—চোখে ঠোঁটে একটা মৃদু হাসি সমস্তক্ষণ খেলা করছিল। একটু পরে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন—

"ভালবাসা বলতে তোরা যা বুঝিস্—তাও যে একেবারে অসম্ভব, তা নয়। জগতের ইতিহাসে অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে কম বয়সের মেয়ে বা পুরুষ বেশী বয়সের পুরুষ বা মেয়ের জন্য পাগল হয়। কিন্তু আমার বক্তব্যটা সেদিক দিয়ে নয়। তোদের ঐ ভালবাসা জিনিষটার মূল্য খুব বেশী আছে বলে আমার মনে হয় না—বিশেষতঃ বিবাহিত জীবনে। ওটা একটা নেশা—বেশীদিন থাকে না। প্রেমের বিবাহেও ও জিনিষটা কিছু দিন ঘর করার পর ক্রমেই কর্পূরের মতন যায় উড়ে। তারপর যে জিনিষটা থাকে সেইটেই আসল। তারই যথার্থ মূল্য। যদি কিছুদিন এক সঙ্গে সহবাসের দরুণ পরস্পরের মধ্যে নিবিড় সহানুভূতির ফলে একটা মমতা ও আন্তরিকতার সৃষ্টি হয়, তবেই বিবাহ সার্থক হ'ল। প্রচণ্ড প্রেমের বিবাহও অল্প দিনেই দারুণ বিরোধের মধ্য দিয়ে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যায় এর দৃষ্টান্ত কুড়ি কুড়ি আছে।"

দাদা যে কি বলেন! প্রেমে পড়ে লোক শুধু চমৎকার কাব্য সৃষ্টিই করে না, জলে ঝাঁপ দেয়, আগুনে পুড়ে মরে—অথচ সে প্রেমের মূল্য কিছু নেই। বুঝতে পারলাম না।

শুধালাম "তুমি বলতে চাও, যমুনার বিয়ে ভালই হচ্ছে ?"

বললেন "তা কেমন করে বলব। ভাল হচ্ছে কিনা সেটা নির্ভর করে পুরুষটা সুপাত্র কিনা তার উপরে।"

বললাম "কিন্তু দাদা, লোকটা শুনলাম দেখতে কুৎসিত।"

বললেন "তুই বলতে চাস্ কুৎসিত যারা, তাদের বিয়ে না হওয়াই ভাল ?"

দাদার সঙ্গে সত্যিই পেরে ওঠা যায় না। বললাম—"সে কথা কে বলছে—যমুনার কুৎসিত বর কেন হ'বে ?"

বললেন "সব মেয়ের আপনার লোক যদি সেই কথাই ভাবে তবে ত কুৎসিত লোকগুলোর বিয়েই হয় না। একটা কথা জেনে রাখিস্—বিবাহিত জীবনের শারীরিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ কোনও ঠাঁই নাই। বিবাহ সার্থক হলে, দুদিন পরে স্বামীর বা স্ত্রীর সে কথা মনেও হয় না।"

বললাম "কিন্তু একটা কুৎসিত লোক নিয়ে সারা জীবন ঘর করার মধ্যে একটা লজ্জা নেই কি ?"

দাদার সঙ্গে সব বিষয়ই সহজ ভাবে আলোচনা করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই—তবুও কথাটা বলেই কেমন যেন লজ্জা হল। দাদার মুখের দিকে না চেয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

দাদা বললেন "সে লজ্জার মধ্যে মনের দৈন্য আছে—সে দৈন্য কাটিয়ে ওঠাই উচিত বিবাহ সার্থক হ'লে লজ্জা হয় বলে আমার বিশ্বাস নয়।"

দাদার কথাগুলো সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে নিলাম কিনা জানি না কিন্তু দাদা সত্যিই ভাবিয়ে দিলেন। দাদার মতামতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অপরিসীম; তাই দাদার কথাগুলো ঠেলে ফেলে দেওয়ার শক্তি আমার নেই। কিন্তু দাদা বল্লে কি—এতবড় জিনিষ একটা—প্রেম—যার বিষয় কত শুনেছি, কত পড়েছি, তার বিশেষ কোনও মূল্যই নেই? চল্লিশ বছরের একটা কুৎসিত লোককে নিয়ে ঘর করেও সুখী হওয়া যায়। সব যেন কেমন গোলমেলে হয়ে গেল। ফলে যমুনার বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার যে একটা জোর প্রাণের মধ্যে অনুভব করছিলাম—সেটায় ক্রমে পড়ল ভাঁটা।

পরের দিন দাদাকে বললাম "লোকটি সুপাত্র কিনা একবার দেখে নিলে হ'ত না?"

দাদা সে সময় একটা বই পড়ছিলেন। একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে শুধালেন "কোন্ লোকটা?"

দাদার প্রশ্নের মধ্যে আমার প্রতিই যে রসিকতার একটু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল, বুঝতে আমার দেরী হ'ল না।

সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি বললাম

"আ-হা! যেন বুঝতে পার নি। যমুনার যে লোকটার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা হচ্ছেছে।"

বললেন "তা সে দায়িত্ব ত তার বাপ-মার।"

বললাম "বাপ-মার প্রতি আমার আস্থা বেশী নেই, তাই একবার যাচাই করে দেখতে চাই।"

শুধালেন "তা আমরা কি করতে পারি?"

বললাম "আমাকে একদিন নিয়ে চল। লোকটার সঙ্গে আলাপ করে আসি। তা হ'লেই অনেকটা বুঝতে পারব।"

দাদার সঙ্গে কথায় কথায় শেষ পর্য্যন্ত দাদাকে মত করালাম—তবে দাদা আমাকে নিয়ে যেতে রাজী হলেন না। দাদা একলা গিয়ে লোকটার সঙ্গে আলাপ করে এসে সরল ভাবে নিজের মতামত আমাকে জানাবেন—এই হল সিদ্ধান্ত। লোকটার নাম-ধাম, ঠিকানা, দু এক দিনের মধ্যে আমিই জোগাড় করে দাদাকে দিলাম।

পাঁচ ছয়দিন কেটে গেল, একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে দাদা আমাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর বাইরের ঘরে।

বললেন "আজ দেখে এলাম তোর সেই লোকটাকে।"

আগ্রহভরে শুধালাম "আজ গিয়েছিলে?"

বললেন "হ্যাঁ" বলে চুপ করে রইলেন।

শুধালাম "চুপ করে আছ কেন, বল না কি রকম দেখলে?"

বললেন "খুব ভাল লাগলো।

শুধালাম "কি রকম?"

বললেন "খাসা লোকটা—গম্ভীর, ভদ্র, মিষ্টভাষী। দেখতে ত কিছু খারাপ নয়—রংটা অবশ্য খুব কালো। কিন্তু মুখের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ সুবুদ্ধির ছাপ আছে—তাইতেই লোককে আকর্ষণ করে।"

মনটা আহ্লাদে ভরে উঠল।

শুধালাম "তুমি কি বলে গিয়ে আলাপ করলে দাদা?"

বললেন "কেন, ভদ্রলোক যেমন ভাবে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে।"

বললাম "তা ত' বুঝেছি। কিন্তু হঠাৎ গিয়ে দেখা করলে কি বলে?"

বললেন "আমাদের পাড়ায় 'জনহিতৈষিণী সভা' আছে জানিস্ ত—আমি যার সম্পাদক। সোজা গিয়ে বললাম যে, আমাদের পাড়ায় বিয়ে হচ্ছে—তাই ভদ্রলোকটাকে সভ্য হিসাবে পেতে চাই।"

শুধালাম "রাজী হলেন?"

বললেন "হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে আমার সঙ্গে নানান আলোচনা করলেন, একটা কথা আমার চমৎকার লাগল।"

শুধালাম 'কি?'

বললেন "সভার মেয়ে সভ্য থাকা উচিত। মেয়েদের আড়ালে রেখে সমাজের কাজ সুনিপুণ ভাবে চলে না।"

একটু চুপ করে থেকে শুধালাম "তা তোমার মতে লোকটা সুপাত্র ত?"

বললেন "যমুনাকে আমি যতদূর জানি, এ বিয়ে হ'লে মাস ছয়েক পরে যমুনার আনন্দে বোধ হয় মাটীতে পা পড়বে না।

*

সু-খবরটা দেওয়ার জন্য পরের দিন সকালে উঠেই যমুনাদের বাড়ীতে গেলাম। আমাকে পেয়েই যমুনা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—

"ভাই, শোন্, তোকে যা বলেছি সে সব ভুলে যা। ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাটী করিস্ না।"

শুধালাম "তার মানে কি?"

বললে "তুই মাকে কি বলেছিস্ ভাই, তাই নিয়ে বোধ হয় মা পরশুদিন রাত্রে বাবার কাছে কান্নাকাটি করেছেন। বাবার ত হার্টের অসুখ আছে—শেষটা বুকের অস্থিরতা সুরু হয়। বাড়ীশুদ্ধ সব তাই নিয়ে হুলুস্থুল।"

শুধালাম "তা এখন কেমন আছেন?"

বললে "কমে গেছে, ভাল আছেন। তাই বলছিলাম—আর কিছু ঘাঁটাঘাটী করে কাজ নাই। আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হ'বে।" ক্রমশঃ

ঝাঁসীর রাণী

লক্ষ্মীবাই

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

[আজাদ হিন্দ ফৌজের সহিত ঝাঁসীর রাণী-বাহিনীর নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। যে বীরাঙ্গনা মহীয়সী মহিলার নামের সহিত ইহার স্মৃতি বিজড়িত, আমরা এখানে তাঁহার ইতিহাস প্রদান করিলাম।]

এক

ঝাঁসী প্রদেশের রাজধানীর নাম ঝাঁসী। বিখ্যাত আগ্রানগরী হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ১৪২ মাইল। এ প্রদেশের ইতিহাসে বৈচিত্র্য আছে। আলমগীর বাদশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরদের মধ্যে যখন নানা বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল, মোগলের সেই অধঃপতনের যুগে চারিদিকে দস্যুবৃত্তির ছিল প্রাদুর্ভাব। সে সময়ে বুন্দেলখণ্ডের কিয়দংশ পেশোয়ার অধীনস্থ একজন মরাঠা কর্ম্মচারী উচচরি রাজার অধিকারভুক্ত ঐ প্রদেশটি অধিকার করেন। তিনি পেশোয়ার নিকট হইতে সনদ লাভ করেন। এই ভাবে ঝাঁসী রাজ্য একজন মারাঠা সর্দ্দারের করতলগত হইল।

ঝাঁসী রাজ্যের পরিমাণ ৩,৬৩৪'৩৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা তৎকালে ছিল প্রায় তিন লক্ষ। যতদিন পর্য্যন্ত পেশোয়াদের প্রাধান্য ছিল ততদিন মারাঠা কর্ম্মচারী ও তাঁহার বংশধরগণের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার প্রভুত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বুন্দেলখণ্ড এবং তন্নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ রাজ্য ও প্রদেশগুলি ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হইল। ঝাঁসীও ব্রিটিশ অধিকারে আসিল। সেকালে ঝাঁসীর অধিপতি "সর্দ্দার" নামে অভিহিত হইতেন। ঝাঁসীর সর্দ্দার ব্রিটিশের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। চুয়াত্তর হাজার টাকা বার্ষিক কর বাধ্য হইল। ঝাঁসীর প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা সে কর দিতে হইত।

ঝাঁসী যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এলাহাবাদ বিভাগের মধ্যে ঝাঁসী প্রধান—যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে ইহার অবস্থান, সাধারণতঃ ব্রিটিশ বুন্দেলখণ্ড নামে পরিচিত। ঝাঁসীর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে জলৌন, সাঁথার বা সাথথার রাজ্য, দাতিয়া ও গোয়ালিয়ার এবং ভূপাল রাজ্য। পূর্ব্বদিকে ওর্চা রাজ্য। সগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের উত্তরে ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত—বাঁদা, এলাহাবাদ এবং মীর্জ্জাপুর জেলা।

ব্রিটিশ গভমেণ্ট সর্দ্দারের এই আনুগত্যস্বীকারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিলেন এবং বংশপরম্পরাগতভাবে এই রাজ্যের সর্দ্দারের বংশধরেরাই রাজা হইবেন ইহাও স্বীকৃত হইল। এই সুবাদারের নাম ছিল রামচাঁদ রাও। রামচাঁদরাও সুদক্ষ রাজা ছিলেন, পনেরো বৎসরকাল তাঁহার শাসনদক্ষতা দেখিয়াই ব্রিটিশ গভমেণ্ট তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দিয়াছিলেন। রাজা উপাধি লাভের পর রামচাঁদ মাত্র তিন বৎসরকাল বাঁচিয়াছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। মৃত্যুকালে রামচাঁদ কোনও দত্তক গ্রহণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৩৫ সালের ২০শে আগষ্ট তাঁহার মৃত্যু হয়। এই রামচাঁদের সময়েই ঝাঁসীর 'সর্দ্দারেরা' 'রাজা' উপাধি ব্যবহারের অধিকার লাভ করেন। রামচাঁদের শাসন-দক্ষতা একেবারেই ছিল না, তাঁহার সময় রাজ্যমধ্যে বিবিধ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। রামচাঁদ রাও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তাঁহার মৃত্যুর পর চারিব্যক্তি সিংহাসনের দাবীদার হইলেন। রামচাঁদ রাওয়ের এক পোষ্য-পুত্র কৃষ্ণ রাও, রামচাঁদের দূর সম্পর্কীয় এক ব্যক্তি নারায়ণ রাও এবং শিউ রাও ভাওয়ের দুই পুত্র রঘুনাথ রাও ও গঙ্গাধর রাও। ১৮১৭ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত যে সন্ধি হয় সেই সন্ধি অনুসারে শিউ রাও ভাওয়ের বংশধরেরাই সিংহাসনের অধিকারী হইবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, কাজেই সে সিদ্ধান্ত অনুসারে ঝাঁসীর রাজা হইলেন—শিউরাও ভাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ রাও।

রঘুনাথ রাও ছিলেন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। শাসনকার্য্যে তাঁহার যোগ্যতা একেবারেই ছিল না। রাজা রামচাঁদ রাওয়ের সময় হইতেই রাজস্ব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে, তাঁহার সময় বারোলক্ষ টাকা মাত্র আয় দাঁড়াইয়াছিল। রঘুনাথ রাওয়ের সময় তাহা হ্রাস পাইয়া তিন লক্ষ টাকায় পরিণত হইল। রঘুনাথ রাও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এজন্য বাধ্য হইয়া তাঁহার কয়েকখানি গ্রাম গোয়ালিয়র ও ওর্চার রাজাদের বন্ধক দেন। তিন বৎসরকাল মাত্র রঘুনাথ রাও ছিলেন ঝাঁসীর রাজা। রঘুনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। ১৮৩৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। রঘুনাথ রাওয়ের আলি বাহাদুর নামে এক অবৈধ সন্তান ছিলেন।

রঘুনাথ রাওয়ের মৃত্যুর পর আবার সিংহাসন লাভের জন্য গোল বাঁধিল এবং চারিজন দাবিদার দাঁড়াইল। একজন রঘুনাথ রাওয়ের অবৈধ সন্তান—আলি বাহাদুর, জানকী বাঈ—রঘুনাথের বিধবা পত্নী, কৃষ্ণ রাও এবং রঘুনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধর রাও। সে সময়ে বড়লাট ছিলেন লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬—৪২ খৃঃ অঃ)। এইরূপ গোলযোগের দরুণ গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি বা

এজেন্ট সিংহাসনের প্রকৃত দাবীদার নির্ব্বাচিত হইয়া রাজ্যের গদিতে বসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এজেন্টই লইলেন রাজ্যশাসনের দায়িত্ব। কৃষ্ণ রাওয়ের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য—সকুবাই নির্ভীকভাবে দাঁড়াইলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এজন্য সৈন্য সমাবেশ পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। অবশেষে এক কমিশন নির্ব্বাচিত হয় এবং বিভিন্ন দাবীদারের বিষয় আলোচনার পর গঙ্গাধর রাওকে ঝাঁসীর 'রাজা' করা হইল। ইংল্যাণ্ড হইতেও কমিশনের এই সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করায় আর কোনও গোলযোগ হইল না।

রাজা গঙ্গাধর রাও রাজ্যশাসনের যোগ্য একেবারেই ছিলেন না। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যমধ্যে নানা অশান্তি, অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। এজন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা আনিবার জন্য ব্রিটিশ এজেন্সীর হস্তে রাজ্যপরিচালনার ভার দিলেন। রাজাকে তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য একটা বার্ষিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইল এবং তাঁহাকে জানানো হইল যে, রাজা যতদিন তাঁহার রাজ্যশাসনও সংরক্ষণ-ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহার হইয়া ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিই রাজ্য শাসন করিবেন। ক্যাপ্টেন রস (Captain Ross) হইলেন—প্রধান কর্ম্মসচিব। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সেই সুযোগ আসিল। ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সুশাসনগুণে রাজ্যের পূর্ব্ব শ্রী ফিরিয়া আসিল। সে সময়ে গঙ্গাধর রাওয়ের হাতে রাজ্য-শাসনভার প্রত্যর্পণ করিলেন।

রাজা গঙ্গাধর রাও এগার বৎসর কাল ঝাঁসী-রাজ্য শাসন করেন। রাজ্যশাসনে তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে না পারিলেও, কোনরূপ গোলযোগ বা অশান্তির উৎপত্তি হয় নাই। মোটের উপর ভালই ছিল। গঙ্গাধর রাওও নিঃসন্তান ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।—রাজা গঙ্গাধর রাও জনসাধারণের কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং জনহিতকর কার্য্য করার ফলে প্রজা-সাধারণের প্রিয় ছিলেন। গঙ্গাধর রাওও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। সে সময়ে ভারতবর্ষের গভর্ণার জেনারেল ছিলেন লর্ড ড্যালহৌসী (১৭৪৮-১৮৫৬ খৃঃ অঃ)।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ঝাঁসীর উত্তরাধিকার-সূত্রের যে বিধান দিয়াছিলেন—গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর সহিতই ঝাঁসী-রাজ্যের উত্তরাধিকার-সূত্রের সে দাবী উপেক্ষিত হইল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ড কর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত করিবার নিমিত্ত যে কমিশন বসিয়াছিল তাহাও লর্ড ড্যালহৌসীর অনুকূল হইল, কাজেই গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর যাঁহারা সিংহাসনের দাবীদার হইলেন, তাঁহাদের সকলের দাবী উপেক্ষিত হইল,—বিধবা রাণী লক্ষ্মী বাই সিংহাসন লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন-নিবেদন করিয়াও সুফল পাইলেন না। লর্ড ড্যালহৌসী অপুত্রক দেশীয় রাজ্য অধিকার (The doctrine of lapse) নীতির অনুসরণ করিলেন। সে বিধান এই যে, যদি দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে কেহ অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে কোম্পানীই হইবেন ঐ রাজ্যের অধিকারী। প্রাচীন হিন্দু বিধানানুযায়ী হিন্দুরাজ্য মধ্যে যে পোষ্য পুত্র লইবার বিধান চলিয়া আসিতেছিল, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিলেন এবং বুন্দেলখণ্ডের ঝাঁসী, নাগপুর (ভোসলা) মধ্য-প্রদেশের জয়পুর, সম্বলপুর, সাতারা প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। নাগপুরের রঘুজী ভোসলা অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তিনি তাঁহার পোষ্য-পুত্রকে রাজ্যাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর ঝাঁসীও ইংরাজ অধিকারে আসিল। রাণী লক্ষ্মী বাঈয়ের জন্য মাসিক ৫, ০০০) টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল।

একদিন মারাঠাবীর মলহর রাও হোলকার গোবিন্দরাও (গোবিন্দ পণ্ডিত এবং গোবিন্দ বুন্দেলা নামেও পরিচিত) চ্যান্দেরীর রাজা দুর্জ্জন সিংহকে পরাজিত করিয়া ভিলসা, সিরোঞ্জ, উদিপুর, বসোদা প্রভৃতি যেমন অধিকার করেন, তেমনি ঝাঁসীর কাছাকাছি এক স্থানে ওর্চার রাজা অম্ভোৎ সিং দাতিয়ার রাজাকে পরাজিত করিয়া এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ওর্চার রাজা অম্ভোৎ সিংহ এই যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন। এ সময়ে রাজা ইন্দ্রগির গোসাঞ ছিলেন ঝাঁসী দুর্গের শাসনকর্ত্তা। তিনি এ সময়ে মোঠ নামক স্থানে রাজধানী করিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছিল ১৭৩৫-১৭৬২ খৃষ্টাব্দ কাল মধ্যে।

এ সময়ে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাজিরাওয়ের মৃত্যুর পর বালাজি বাজীরাও ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকৃত পক্ষে মারাঠাদের রাজা হইলেন। মোগল প্রাসাদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শাহু সাতারাতে রাজা হন—(১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ)। শাহুর মৃত্যুর পর সাতারাতে কে মারাঠার সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবেন তাহা লইয়া কোন প্রশ্নই উঠিল না। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই এ সত্য অবগত আছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠাজাতির শাসন-সংরক্ষণ, রাজ্যশাসন সমুদয়ই পেশবাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। মহারাজা শাহু অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন—মোগল দরবারে প্রথম জীবন অতিবাহিত হওয়ার ফলেই তাহা সম্ভবতঃ হইয়াছিল। শাহুর রাজত্বকালে বালাজী বিশ্বনাথ নামক একজন কোঙ্কণ

দেশবাসী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন সিন্ধিয়ার শাসনকর্ত্তা। শাহুর বিরুদ্ধাচারী বহু শত্রুকে ও সামন্তরাজদের পরাজিত করিয়া তিনি শাহুর প্রীতিভাজন হন এবং এই জন্য শাহু তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী বা পেশবার পদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে এই পেশবাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং যেমন নেপালের বর্ত্তমান মন্ত্রি-প্রাধান্য তেমনি ক্রমশঃ পেশবারই হইলেন সর্ব্ববিধ রাজ্যাধিনায়ক —'রাজা' নাম বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তৃতীয় পেশবা বালাজী বাজীরাওয়ের (১৭৪০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে) শাসনকালে মারাঠারা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মালব, খান্দেশ, বেরার, মধ্যপ্রদেশের ও নিজামরাজ্যের কিয়দংশ পর্য্যন্ত মারাঠা-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিল। সুদূর দক্ষিণের মহীশূর, তাঞ্জোর এবং রাজপুতানার নৃপতিরা পর্য্যন্ত উহাদিগকে কর দিতেন। বালাজী বাজীরাও পেশবা হইয়াই নরু শঙ্কর নামক একজন রণদক্ষ সেনাপতিকে ওর্চ্চারাজ্য জয় করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ওর্চ্চার রাজা পরাজয় মানিয়া লইলেন। অন্যান্য বিজিত রাজ্য বিভক্ত হইলে পর—নরু শঙ্কর ঝাঁসীদুর্গ রক্ষার জন্য ৮, ০ ৫, ৩৩৬ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর নিজের ভাগে লইবার ব্যবস্থা করিলেন—৯, ৯০, ৯৯১ টাকা মারাঠা এবং বুন্দেলদের অংশে বিভক্ত হইল। বিজিত রাজ্য বর্ত্তমান ওর্চ্চা বা তিহিরি, পরগণা পাচোর ও করারা কতকঅংশ সহ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার অন্তর্ভুক্ত হইল। বর্ত্তমান ঝাঁসী জেলা কয়েকটি গ্রাম বাদে গুরুসরাই জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত হইল। নরু শঙ্কর ঝাঁসীর দুর্গের বিবিধরূপ সংস্কার এবং ঝাঁসী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঝাঁসী রাজ্যের সহিত—পরগণা দুভোও সংযুক্ত হইল। এই দুভো পরগণা ছিল দাতিয়ার রাজ্যভুক্ত। নরু শঙ্কর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পেশবা কর্ত্তৃক পুনরায় আহূত হইলে পর তাঁহার স্থানে ঝাঁসীর সুবাদার হইয়া আসিলেন—মাধোজি গোবিন্দ। মাধোজীর পর সুবাদার হইলেন বাবুরাও কানাইরায়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে নরুশঙ্কর স্বয়ং ঝাঁসীতে আসিয়া সুবাদারের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। নরুশঙ্করের মৃত্যুর পর ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ্বাস রাও লছমন সুবাদার ছিলেন। অতঃপর ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ রাও হরি সুবাদারের পদে নিযুক্ত হইয়া চব্বিশ বৎসরকাল স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। পেশবাদের কোন প্রাধান্য তিনি স্বীকার করেন নাই। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ রাও হরির মৃত্যুর পর শিওরাও হরি হইলেন সুবাদার। তিনি সাধারণতঃ শিওরাও ভাও নামে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে ঝাঁসীর বার্ষিক আয় দাঁড়াইয়াছিল ৩৬,১৬,০০০, টাকা।

১৮০৩ সালে আলিবাহাদুর বুন্দেলখণ্ডের অধিকৃত রাজ্যসমূহ পুনা মারাঠার অধিকারভুক্ত বলিয়া দাবী করেন। এলাহাবাদ হইতে যমুনা পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহ রাজা হিম্মৎবাহাদুরের সহযোগিতায় ব্রিটিশ রাজ ১৮০৩-৪ সালে যুদ্ধ করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলেন— সে সময়ে ইংরাজ রাজের অনেক মারাঠা ও বুন্দেলার রাজাদের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল। ১৮০১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখ ইংরাজের সহিত শিও রাও ভাওয়ের এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তাহার ফলে শিও রাও রাওয়ের অধিকৃত রাজ্যসমূহ তাঁহার শাসনভুক্ত রহিয়া গেল, পুনা দরবারের প্রাধান্য তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজও বিপৎকালে তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে শিও রাও ভাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্র রামচাঁদ রাও হইলেন ঝাঁসীর সুবাদার। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ফেব্রুয়ারী এক সন্ধি হইল, সেই সন্ধিবলে রামচাঁদ রাওয়ের বংশধরেরা বংশপরম্পরাক্রমে রাজ্যের অধিকার লাভ করিবেন। শুধু পরগণা মোঠ নরুশঙ্করের পৌত্র রঙ্গরাও রাজাবাহাদুরের অধিকারভুক্ত রহিয়া গেল। ঝাঁসীর উপর পেশবাদের কর্ত্তৃত্বভার—এই সন্ধির কয়েক মাস পূর্ব্বে ১৮১৭ সালের ১৩ই জুনমাসের যে সন্ধি—ব্রিটিশ রাজের সহিত পেশবাদের যে সন্ধি হয়—সে সন্ধি অনুসারে পেশবাদের ঝাঁসীর উপর যে কর্ত্তৃত্ব ভার ছিল, তাহা ব্রিটিশের হাতে আসিল। এইরূপে ইংরাজ ঝাঁসীর উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

রামচাঁদ রাওয়ের পরবর্ত্তী রাজাদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী বাই ছিলেন গঙ্গাধর রাওয়ের পত্নী।

[আগামী বারে সমাপ্য

পঞ্চানন্দের বৈঠক

শ্রীগোপালদাস চৌধুরী

চিরকালই যে কথাটা অখণ্ডনীয় সত্য আজই বা ত অসত্য হতে যাবে কেন ? সভা, সমিতি, বৈঠক ইত্যাদি করে পাঁচ-মিশালী সংঘগুলি পাঁচজনের চেষ্টায়ই গড়ে উঠে, পাঁচজনের উৎসাহ-আনন্দেই জাঁকিয়ে আসর জমায়। আবার যেদিন বৈঠকের উপর বিধাতা বিরূপ হন, সে দিন পাঁচজনেরই মতামতের ঠোকাঠুকিতে তাহার অন্তর্জলী হয়।

একদিন আমাদের শহরের পাঁচের পল্লীর পাঁচজন পত্নীহীন প্রাচীনের চেষ্টা-উদ্যোগে যে বৈঠকটির জাতকর্ম সম্পন্ন হইল, পল্লী-জোয়ানরা পরিহাস-প্রবণতায় তার নামকরণ করিল "কেওড়া-তলা-ক্লাব"। আর এই নামে আতঙ্কিত হইয়া শ্মশানযাত্রী বৃদ্ধেরা নাম রাখিলেন "পঞ্চানন্দের বৈঠক"।

এই "পঞ্চানন্দের বৈঠক" সঠিক পাঁচজনেরই বৈঠক। আঙুল গুণে গুণে যে পাঁচজন "অবসরপ্রাপ্ত" বিপত্নীক বৈঠকের সভ্য হইলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সন্ধ্যাবধি রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত বৈঠকেই আড্ডা জমাইয়া নিত্য নিত্য বাদশা উজির মারিতেন। ইহার অতিরিক্ত যাহা করিতেন তাহাও পরে বলিতেছি।

বৈঠকের পাঁচজন সভ্যই যে স্ত্রীর জোয়ালমুক্ত ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যুবকদের ত কথাই নাই, বৃদ্ধরাও বিপত্নীক হইলে কন্যাদায়গ্রস্ত মাতৃবাহিনীর শ্যেন দৃষ্টি (শনির দৃষ্টিও বলা যাইতে পারে) সহসা আসিয়া তাঁহাদের উপর নিপতিত হয়। কেহ বা সৌন্দর্য্যের টোপ-গাঁথা বড়সি গিলিয়া ফেলে, কেহ বা বিত্তাবত্তার টোপ গিলিয়া বড়সি বিদ্ধ হইয়া "পুনর্মূষিক" হয় এবং অবলার বশংবদ হইয়া নূতন ঘরণীর হাতে গৃহস্থালি ছাড়িয়া দিয়া নিজে শুধু গৃহস্বামীর অভিনয়েই মশগুল হইয়া পড়ে।

আমাদের পঞ্চানন্দের বৈঠকের বিপত্নীক-পঞ্চকের উপরও অনূঢ়া তরুণীদের মাতৃবাহিনীর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল কিন্তু সভ্যদের নারী-বৈরাগ্যের প্রাবল্যে গ্রহসঙ্কট সাময়িক ভাবে খণ্ডিত হইয়া গেলেও ভবিষ্যৎ সফলতার আশায় মাতৃবাহিনী এই বেয়াড়া বিপত্নীক-পঞ্চকের অনাগত প্রবলতম পত্নীপ্লাবনের প্রতীক্ষায় দিন গুণিতে লাগিলেন। রণোৎসবে না হইলেও পরিণয়োৎসবে ইঁহারা প্রত্যেকেই রবার্ট ব্রুসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। ইঁহাদের নীতি-বাক্যই হইতেছে—একবারে না পারিলে দেখো সাতবার।

পাঁচজন সভ্যই আপাততঃ পারিবারিক-দৌরাত্ম্যমুক্তির নিবিড় আনন্দে পরস্পরের সহিত সংঘবদ্ধ হইলেও ইঁহাদের মধ্যে যে খুব বেশী অন্তরঙ্গতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা নয়। ডালনার আলু, ফুলকপি, ভেট্‌কি, ছানা, কিসমিসের মতন ইঁহারাও আপন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। তাহা সত্ত্বেও পাঁচজন সভ্যের সহযোগ-সম্মিলনে বৈঠক-গৃহে নিত্য নিশিতে যে একটি স্বাদু রসধারার সৃষ্টি হইত, তা' ঘৃত, হিং, নুন, মশলাদির মিশ্রণে ডালনার রসটুকুর মতই তৃপ্তিকর ছিল। ইঁহারা বহু বিষয়ে ভিন্ন রুচির হইলেও প্রেততত্ত্ব-গবেষণায় পাঁচজনই একদিল ও একমত ছিলেন।

পঞ্চানন্দের বৈঠকের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সাধারণ সভা-সমিতির যেমন সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী, হিসাব-পরীক্ষক থাকে, বৈঠকের সে-সব বালাই ছিল না। গোণাগুণতি হিসাবে পাঁচজন সভ্য; আর পাঁচজনই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। কাজেই সভ্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকারের তারতম্যের প্রশ্নে হাতাহাতি কিম্বা খুনো-খুনির কোনই সুযোগ-সুবিধা ছিল না।

নাম রাখতে টেক্স লাগে না বলিয়াই হয় ত বাঙ্গালীদের কুল-নাম, রাশনাম, ডাকনাম উপনামগুলো যোগ দিলে কম হলেও কোন না গণ্ডাখানেক হবে। তার পর বোঝার উপর শাক আঁটি—সুগৃহিণীদত্ত আদরের নাম ত ফাউ আছেই। কিন্তু পঞ্চানন্দের বৈঠকের সভ্যদের নামের বাহুল্য ছিল না। বৈঠকের বাহিরে তাঁদের কি নাম-গোত্র ছিল, সে সন্ধান আমরা করি নাই; তবে বৈঠকের নৈশ আসরে ইঁহারা পরস্পরের প্রদত্ত উপনামেই সুপরিচিত ছিলেন। নেশাখোরদের অভ্যস্ত সময়ে নেশা করিবার স্পৃহার মতন নিশাকালীন বৈঠকের আসরে পরস্পর কর্তৃক নিজ নিজ উপনামে অভিহিত না হইলে সদস্যদের আহ্লাদ-আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হইত না।

সভ্যদের প্রকৃতিগত বৈষম্য যেমন ছিল তেমনি বয়সের তারতম্যটাও ছিল যথেষ্ট। এই দ্বিবিধ বিভিন্নতার জন্য ইঁহাদের আনন্দানুভূতির বিষয়ও ছিল বিভিন্নরূপ। সভ্যদের মধ্যে যাঁর বয়সের সীমা ষাট পার হইয়াছিল, তিনি ছিলেন নস্যের বরস্ত, সভ্যরা তাঁর উপনাম রাখিয়াছিলেন নস্যানন্দ। একাধিক বোম্বাইটিপের "ট্যাডি" নামক বৈদেশিক নস্য নাসিকা-বিবরে গাদা বন্দুকে বারুদ ঠাসার মত সশব্দে ঠাসিয়া বৈঠকে না আসিলে এঁর আনন্দ দানাদার হইবার সুযোগ পাইত না। সভ্যদের মধ্যে বয়সে যেমন প্রবীণ ছিলেন ইনি, তেমনি আলস্যেও ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজাধিরাজ।

যাঁর বয়স পৌঁছিয়াছিল পঞ্চাশের পাশাপাশি। তাম্রকূট-বিলাসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন আমির; আর এই আমিরীর জন্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন গড়গড়ানন্দ উপনাম। কেহ হয় ত কূতর্ক তুলিতে পারেন গড়গড়ানন্দ না হইয়া হুকানন্দ হইলে আপত্তির কি কারণ ছিল? যথেষ্টই ছিল—গড়গড়া অভিজাত, হুকা ইতর। দিল্লীর আমির-ওমরাহরা সকলেই ছিলেন গড়গড়া-সেবী, হুকার আদর ছিল নোকর-চাকরের দরবারে। তা ছাড়া, আমাদের গড়গড়ানন্দ জীবনে কোন দিনই হুকা-আস্বাদন ত' দূরের কথা, স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি চিরদিন গড়গড়ার অনুরক্ত, আসক্ত—এমন কি সংসক্ত পর্য্যন্ত। আর কিছুর জন্য না হইলেও গড়গড়াটির বিশিষ্টতার জন্যও এই তাম্রকূট-বিলাসপ্রিয় আধুনিক আমিরটির "গড়গড়ানন্দ" সার্থক উপনাম। গড়গড়াটি আকারে ছিল মাঝারি রকমের একটি গাগরী; কাজেই তার আকারের সহিত সমতা বজায় রাখিতে

গিয়া কলকে'টিকে হইতে হইয়াছিল একটি ধুনুচি-বিশেষ। গড়গড়া বড়, কল্‌কে বড়, নলটির কি অপরাধ যে সে ছোট হতে যাবে? সঙ্গীদের সঙ্গে সমতা রক্ষা করিতে গিয়া তাকেও বাধ্য হইয়া হইতে হইয়াছিল নাগরাজের নাতিটি—গজের মাপের পুরা দু' গিরা কম দশ হাত।

বৈঠক-বাসরে শ্রীগড়গড়ানন্দের প্রথম কাজই ছিল গড়গড়ার জল বদলাইয়া নলের অন্তর্ধৌতি সারিয়া কলকের ছুটাকভর অম্বরী-তামাক টিপিয়া ওজন দুই টিকে চড়াইয়া আগুন ধরাইয়া মিনিট পাঁচেকের জন্য একটু আরাম-বিরাম করিয়া নেওয়া। আরাম অন্তে যখন অম্বরী-গন্ধে অন্তর সরস হইয়া ওঠে তখন গড়গড়ানন্দের একমাত্র কাজ ছিল আড়াইযুণে দেহভার তাকিয়ায় এলাইয়া দিয়া নাগরাজের নাতির পুচ্ছাগ্রটি মুখে তুলিয়া ফুরুক ফুরুক গুড়ুক টানা।

বয়সের লহর চলিয়াছিল যাঁর পঞ্চাশের পুলিন ঘেঁষিয়া, তিনি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ও তিন পো ইঞ্চি ব্যাসের 'হাভানা' চুরুটের ভক্ত ও ভোক্তা ছিলেন বলিয়া সহ-সভ্যরা তাঁকে চুরুটানন্দ উপনামে ডাকিতেন। যিনি পরভাল্লিশে পায়চারি করছিলেন, তিনি মনমোহিনী বিড়ীর অনুরাগী বলিয়া বিড়ী-আনন্দ আর যিনি চল্লিশে চলিষ্ণু ছিলেন তিনি আধসেরী পেয়ালার দু' পেয়ালা চা বৈঠকে বসিয়া নিঃশেষে পান করিতেন বলিয়া টী-আনন্দ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই উপনামগুলি সভ্যদের মধ্যেই জানাজানি ছিল, বাইরে ছিল তন্ত্রোক্ত মূলমন্ত্রেরই মত গুহ্যাতিগুহ্য।

একদিকে যেমন সভ্যদের আনন্দের রকমফের ছিল, তেমনি অপরদিকে প্রেতচর্চা ছিল তাদের পাঞ্জনীন আনন্দ। এই আনন্দের বিনোদক ছিল একটি প্ল্যানচেট (Planchette) বা প্রেতলিপি যন্ত্র। নিত্য নিশাগমে এই পঞ্চ আনন্দরা কোন না কোন মৃতের প্রাণশক্তি বা আত্মাকে আহ্বান ও আকর্ষণ করিয়া আনিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে জ্বালাতন করিয়া তুলিতেন। এঁরা সব চেয়ে উৎসাহী ছিলেন মৃত স্ত্রীদের পারলৌকিক গতিবিধি ও মতিগতির খোঁজ-খবর নিতে। এ আনন্দদের প্রেতচর্চা যতই প্রবল প্রচণ্ড হইতেছিল, প্রেতপুরীতে প্রেতদের সুখ-শান্তি ও স্বাধীনতা ততই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল। এই প্রশ্ন-উৎপাতের মূলে ছিল আনন্দদের দুরারোগ্য 'সন্দ-বাই'। বিপত্নীকরা যেমন দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি চতুর্থবার সপত্নীক হইয়া নূতন করিয়া ঘর-সংসার সাজান, মৃত পত্নীরাও তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিয়া নিঃসঙ্গ জীবনের দুর্বহ ভার লাঘব করেন কিনা তাহা জানিবার জন্য ইঁহাদের মন অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। কিন্তু স্বকীয়াদের ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিতে অন্তরে ভয় ও কুণ্ঠা বোধ করিতেন বলিয়া পরকীয়া আত্মাদের প্রশ্নবাণে জর্জর করিতেন। She-আত্মারা স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা বলিয়া আনন্দদের প্রশ্নের সরল উত্তর না দিয়া জটিল ও রহস্যময় রূপকের সাহায্য নিতেন। কাজেই বৈঠকের সভ্যরা মন-মরা ও নিরুৎসাহ হইয়া অগত্যা He-আত্মাদের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু ইঁহারাও প্রেত-জগতের গোপনীয়তা ফাঁস করিতে গররাজী দেখিয়া আনন্দরা এঁদেরও প্রশ্ন, প্রতিপ্রশ্ন করিয়া হয়রাণ করিয়া তুলিলেন।

হইলই বা প্রেত, প্রেতের কি সুখ-সোয়াস্তি থাকিতে নাই! মরজগতের মানুষ বলিয়াই কি যখন-তখন ডাকিয়া পাঠাইবে তাদের? প্রেতের বর্গ ডাকিলেই তাদের যাইতে হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া কি সময়-অসময় নাই, কারণ-অকারণ নাই? আনন্দদের এই অত্যধিক দৌরাত্ম্যে প্রেত-লোক চঞ্চল হইয়া উঠিল, প্রেতের রোষ-বহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কয়েকজন বাঙ্গালী প্রেত এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন এবং অদম্য উৎসাহে ঢেঁড়া পিটাইয়া, শিঙ্গা ফুঁকিয়া, বিজ্ঞাপন ছড়াইয়া সর্বশ্রেণীর প্রেতদের এক পূর্ণাঙ্গ সভা আহ্বান করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বে বিভিন্ন স্তরের প্রেতগণ বাতাসে ভর করিয়া সভাপ্রাঙ্গণে আসিয়া হাজির হইল এবং যে যে-আসন সুমুখে পাইল তাতে জাঁকাইয়া বসিল। সভা-আহ্বানকারী ও নামকরা নেতারা আসিলেন সভারম্ভের নির্দ্ধারিত সময়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে। এবং আসিয়াই অতি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একজন সর্বজনবরেণ্য নেতাকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া সভার কার্য্য সুরু করিলেন।

সভাপতির আহ্বানে প্রথম যিনি বলিতে উঠিলেন, তিনি ছিলেন পূর্ব্বজীবনে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। প্রেতলোকে আসিয়াও বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পাইয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া এক তেজালো অভিভাষণ ফাঁদিলেন। প্রথমে সুরু করিলেন—মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সমবেত প্রেত ও প্রেতিনীগণ-চারিদিক হইতে আপত্তির তুফান উঠিল—প্রেত ও প্রেতিনী শব্দ মর্য্যাদাবাচক নয়, সুরুচিসূচকও নয়। শব্দ দুইটি প্রত্যাহার করিয়া বক্তা পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন—প্রেত-মহিলা ও মহোদয়গণ, আপনারা সকলেই জানেন ভূমণ্ডলের একপ্রান্তে পঞ্চানন্দের বৈঠকের পাঁচজন "আনন্দ"ই পরলোকতত্ত্বের একটি চুম্বক তৈরী করে নিতে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। পঞ্চানন্দদের প্রেততত্ত্ব-সংগ্রহে যেরূপ প্রবল প্রবণতা দেখছি, তাতে করে আমার আশঙ্কা হচ্ছে এই তমসাচ্ছন্ন জগতের গোপন তত্ত্ব আর বেশীদিন গোপন রাখা চলবে না। মরজগতের এই হিমালয়স্পর্শী অশোভনীয় স্পর্দ্ধাকে পিষে চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে, গুঁড়ো গুঁড়ো করতে হবে, বিমর্দ্দন,...। সভাপতির বক্তৃতা-ঠেকানো ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল: বক্তা বিমর্ষচিত্তে গোঁজমুখো হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে মহিলা মহল হইতে সায়া, শাড়ি, সেমিজের খসখসানি (যুদ্ধের দরুণ আক্রা বাজারে সাতাশি টাকা ভরি সোনার চুড়ি-বালার ঠুনঠুনি এখন অচল) ভাসিয়া আসিয়া সভাপতি মহাশয়কে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তিনি সভয়ে কাষ্ঠহাসির সহিত মহিলামণ্ডলীর দিকে চাহিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে ইচ্ছা করেন কিনা জানিতে চাহিলেন। সভাপতির আহ্বান পাইয়া একটি আধা-বয়সী সধবা সঙ্কোচহীন সচ্ছন্দ গতিতে সটান মঞ্চোপরি উঠিয়া আসিলেন। সিংহ যেমন নির্ভয়ে শৃগালের পানে তাকায় তেমনি পৌরুষ-পরাক্রমে পলকের জন্য সভাস্থ সকলকে অপাঙ্গে দেখিয়া উদাত্ত স্বরে আরম্ভ করিলেন:—

'সভাপতি মহাশয় ও মাননীয় ভগিনী ও ভ্রাতাগণ, আপনারা হয়ত জানেন না, কত বড় বর্ব্বর, এই আনন্দের দল।'

চতুর্দিক প্রকম্পিত ক'রে শ্রোতারা চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলেন—তাঁহারা জানেন। মহিলা বক্তার মাথার কাপড় এতক্ষণে কাঁধের উপর খসে পড়েছে। সে দিকে দৃক্‌পাত না করে, মুষ্টিবদ্ধ করতল সজোরে সম্মুখস্থ টেবিলের উপর ছুঁড়ে তারস্বরে বলে উঠলেন—না, আপানারা কখনও জানে না। জানলে সভাপতি মহাশয় এই সভায় সর্ব্বাগ্রে বক্তৃতা দিবার প্রাধান্য পুরুষকে না দিয়ে একজন রমণীকেই দিতেন। তার কারণ, পঞ্চাননের বৈঠকের পাঁচ বিটলে মিলে মহিলাদেরই জ্বালাতন করছে সব চেয়ে বেশী। এরা সধবা বিধবা কুমারীদের ডেকে এনে অমর্য্যাদাকর প্রশ্নে হয়রাণ ক'রছে। কেন, কেন এই দৌরাত্ম্য শুনি? কেন আমরা প্রানচেটের ডাকে দাসীর মতন ছুটবো? কেন, কিসের জন্য আমরা আমাদের ঘরের খবর, হাঁড়ির খবর বিটলেদের কাছে বেফাঁস করবো?

She-আত্মারা সঘন করতালি ও হর্ষনাদে বক্তাকে উৎসাহিত করলেন। আর He-আত্মারা একটি অর্দ্ধ-প্রাচীনার মুখে এই জোর বক্তৃতা শুনে' প্রেতলোকের সামাজিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবার আশঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া স্বাভাবিক বাক্‌চাতুর্য্য হারাইলেন। শুধু একজন অর্ব্বাচীন—প্রাচীন প্রেত সাহসের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? কবে এসেছেন প্রেতলোকে? এই সেদিনও ত আপনাকে বৈতরণীতীরে বিধবার সাজে দেখেছি বলে মনে পড়ছে। এরি মধ্যে এসে সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে শাঁখা-শাড়ি পরে সধবা সাজলেন? সধবাটি লজ্জাভাসের সহিত মাথায় একটু কাপড় ও মুখে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া বলিলেন—আপনি ঠিকই দেখেছিলেন, বিধবার সাজেই আমি বৈতরণী পার হই, আর ঐ বৈতরণীতীরেই আবার সধবার জীবন বরণ করি। আর আমি কে জিজ্ঞেস করছেন? আমাকে না চেনবার কোন কারণই নাই। ভূবণ্ডীর মাঠের নেওকালীকে না জানে কে? আমি তারই ছোট বোন। প্রবীণ প্রেতরা এক বাক্যে চেঁচিয়ে বললেন—কি সর্ব্বনাশ! প্রেত লোকেও বিধবা বিবাহ! তাও কিশোরী বা যুবতীর নয় প্রাচীনার! প্রেত-লোক এত দিন পরে সত্য সত্যই জাহান্নমে যেতে বসেছে।

অর্ব্বাচীন প্রাচীনটির কথার তাতে সধবা প্রৌঢ়াটি আগুন হইয়া উঠিলেন। পুরুষ হইয়া মেয়েদের সমালোচনা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! কে রে বিটলে বুড়ো, একবার মুখখানা দেখি! ওমা মামাশ্বশুর-ঠাকুর যে! বলেই জিবে কামড় ও মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিলেন। She—আত্মাদের মধ্যে কুমারী, নব-বিবাহিতা কিশোরী ও যুবতীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, অর্দ্ধবয়সী ও বুড়ীরাও হাসিল, তবে হি হি করিয়া নয়—মুচ্‌কে। বক্তা মামাশ্বশুরকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জভাবে মঞ্চ হইতে নামিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু She—আত্মারা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—ও কি, নেমে যাচ্ছেন যে বড়! না না যাবেন না। আমরা আপনার কাছে অনেক কিছু শুনতে পাবো আশা করছি, এ প্রেতরাজ্য; এখানে পূর্ণ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত। এখানে পুরুষকে আমরা শ্রদ্ধা করি না। তা' ছাড়া, আমাদের মর্ত্ত্য-লীলায়ও আজকাল কোন পুরুষকে—হোক্‌গে মামাশ্বশুর, হোক্‌গে ভাশুর, লজ্জা-সরম করি না। আপনি ঘোমটা খুলে, লজ্জাভয় তুচ্ছ করে আবার আরম্ভ করুন।

সধবাটি সাহসে ভর করিয়া মঞ্চোপরি উঠিয়া মাথার কাপড় সরাইয়া আবার বলিতে সুরু করিলেন—দেখুন আমার, বয়স পঞ্চাশ হ'লেও বিবাহের পক্ষে মোটেই বেশী নয়। তাছাড়া, আমি বিধবা হয়ে মাত্র একবার বিয়ে করেছি। পুরুষরা যতবার বিপত্নীক হয় প্রায় ততবার বিয়ে করে। এই আমার মামাশ্বশুরটিকে সাক্ষাতে দেখছেন আপনারা, ইনি একজন নামজাদা তেজবরে। তৃতীয় পক্ষের বৌটিকেও প্রেতলোকে পাঠিয়ে যখন "চতুর্থপক্ষের" চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করছিলেন বে-রসিক যম একদিন নিজ দরবারে ডেকে আনলেন এই আশী বছরের বিবাহ-বিশারদকে। একজন আশীবছরের তেজবরের যদি নতুন করে টোপর পরবার সাধ জাগতে পারে তা'হ'লে আমি পঞ্চাশ বছর বয়সে নতুন করে সধবা সেজে এমন কি দোষ করেছি?

She—প্রেতরা একবাক্যে উচ্চকণ্ঠে জানাইলেন—কোন দোষ করেন নি। অবলা হয়ে আপনি প্রবল সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

সধবাটি ইহাতেও খুশি না হইয়া বলিলেন—আপনাদের বিচারেও আমি নির্দ্দোষ; কিন্তু পুরুষ—প্রেতরা নীরব কেন? সভাপতি মহাশয় কি আমার এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবেন?

সভাপতি মহাশয়ের প্রচুর সৎসাহস ছিল; তা'ছাড়া সধবাটি সভার সময়ের যথেষ্ট অপব্যয় করিয়াছেন দেখিয়া কৌশলে তাঁকে আসনস্থ করিবার উদ্দেশ্যে উল্লাসপূর্ণ তৎপরতার সহিত বলিলেন—আমি এই সভার প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে জানাচ্ছি, আপনি কোন দোষই করেননি। সত্য সত্যই সৎসাহসের কাজ করেছেন। আপনি প্রেতলোকে এসেও যে সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছেন এই জন্য সভার পক্ষ হতে আপনাকে একটি স্বর্ণ-পদক দেয়া হো'ক এই প্রস্তাব করছি। সমস্ত She—আত্মারা এবং কিশোর ও যুবক He—আত্মারা সমস্বরে সভাপতিকে সাধুবাদ দিলেন। সধবাটি পুনর্ব্বার বলিবার জন্যে জিহ্বা শানাইতেছিলেন দেখিয়া সভাপতি হাত জোড় করিয়া মোলায়েম কণ্ঠে বলিলেন—সভার সময় সংক্ষেপ; অন্যদেরকেও বলবার সুবিধা দেওয়া চাই। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখন আসন গ্রহণ করেন, তাহারা কিছু বলতে পারে। সধবাটি স্মিত মুখে মঞ্চ থেকে নেমে এসে নিজের আসনে বসিলেন।

সভাপতির ইঙ্গিতে এবং He-প্রেতদের সঘন করতালির মধ্যে এবার যিনি সদম্ভে বক্তৃতা দিতে উঠলেন, তিনি ছিলেন মরজগতের মহকুমার মোক্তার। মোক্তার মহাশয় সুরুতেই "হুজুর" সম্বোধন করায় সভাতে হাসির ফোয়ারা ছুটিল। সভাপতি অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিলেন—মোক্তার মহাশয় হয়ত ভুলে গেছেন এটা ফৌজদারী কাছারী নয়, আর আমিও বিচারপতি নই। মোক্তার ইহাতে লজ্জা পাইলেন না; কারণ লজ্জা-সরম থাকিলে মোক্তারী অচল। নূতন উৎসাহে আরম্ভ করিলেন—হুজুর—না-না হুজুর নয়, সভাপতি মহাশয়, ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, আজ আমাদের এই প্রেত-লোক বিষম বিপন্ন।

পঞ্চানন্দের বৈঠকের বিপক্ষীক-পক্ষকের স্পর্দ্ধা পঞ্চমে উঠেছে। আমার প্রথম প্রস্তাব ইহাদের অবিলম্বে "শ্রীঘরে" অর্থাৎ প্রেত-লোকে আনবার ব্যবস্থা করা হোক।

কিশোর-কিশোরী আর যুবক-যুবতী আত্মারা এক সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে বলিল—"শ্রীঘরে আসুন, শ্রীঘরে আসুন।"

নাকের ডগায় চশমাধারী একজন জজের আত্মা বললেন—চিত্রগুপ্তের দপ্তরে এমন কোন নজীর নাই।

মোক্তারী আত্মা টেবিলের উপর সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলছিলেন—নাই-বা থাকলো; টাকায় কি না হয়। একটা নজীর নূতন করে ঢুকিয়ে দিতে এমন কি লেঠা? একবার যদি কোন রকমে "আনন্দ"দের এখানে আনা যায়, বেশ এক হাত দেখে নেওয়া চলবে।

কাঁচা বয়সের She-আত্মা ও He আত্মারা সমস্বরে বলে উঠেন—আনন্দদের আসুন, শীগ্‌গীর আসুন।

—আলবৎ আনবো, বলে মোক্তার-আত্মা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

জজের-আত্মা বলিলেন—কী মুস্কিল! জ্যান্ত মানুষকে প্রেত-লোকে আনবেন কেমন করে?

—ছলে বলে কলে কৌশলে যেমন করে পারি। মোক্তার হুঙ্কার করিয়া কহিলেন, জ্যান্তরা কি মানুষ! ওরা পশুর অধম! নিমকহারাম! বেইমানের শিরোমণি। আমি মর্ত্তে থাকা কালে বহু মক্কেলের ট্যাঁকের টাকা নিজের সিন্দুকজাত করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়...

সভাপতি মহাশয় ঘন্টি বাজাইয়া বলিলেন—আপনি বসুন; নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হয়েছে।

মোক্তারী আত্মা কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিলেন—হুজুর, আমার যে অনেক ভালো ভালো নজীরের কথা বলবার আছে। একটি ফক্কড় কিশোর-আত্মা বলিয়া উঠিল—এখন ধামাচাপা রাখুন; আগামী জন্মে মহকুমার হাকিমের কাছে বলবেন। সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে একটি হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল। অগত্যা মোক্তারী-আত্মা মঞ্চ হইতে নামিয়া পড়িলেন।

সভাপতির আহ্বানে এবার যিনি উঠিলেন, গড়গড়ানন্দের গড়গড়াটির মতনই ছিল তাঁর গঠন গারিষ্ঠ। প্রেত-লোকে ইনিই ছিলেন বৃহত্তম দেহ, গুরুতম ভুঁড়ি আর উচ্চতম কণ্ঠের গৌরবিত অধিকারী। বাক্যালাপ ও বক্তৃতার সময় ইহার তালতরুসম বপুখানা যখন ডাইনে-বাঁয়ে হেলিত দুলিত তখন ভুঁড়িটিও সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ-সাগরের নিঃসঙ্গ একটি ঢেউয়েরই মত তরঙ্গায়িত হইত। ইনি শিষ্টাচার-নীতিকে যৌবনেই 'হাত' দিয়েছিলেন; তাই শিষ্টাচারের বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া ভীমনাদে হুঙ্কার দিলেন—শুনুন, আপনারা সবাই। যে গুরুতর সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত তার সুমীমাংসা উকিল-মোক্তার কিম্বা অবলা-প্রবলা দ্বারা সম্ভব নয়। এরূপ জটিল দুরূহ দুঃসাহসিক কাজ একমাত্র আমার দ্বারাই সফল হইতে পারে। দুষ্টের দমনে পার্থিব লোকে আমার বেশ একটু সুনামও ছিল। আপনারা হয় ত আমাকে চেনেন না, সে-জন্য একটু আত্মপরিচয় দিচ্ছি।

শুনুন, মর-লোকে আমি ছিলাম এক সাক্ষী গোপাল জমিদারের খ্যাতনামা ম্যানেজার; দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল আমার। শত্রু-মিত্র সকলেই স্বীকার করিত, ইচ্ছা করলে বাঘ মোষকে একঘাটে জল খাওয়াতে পারি আমি। ম্যানেজারী আমলে শ'য়ে শ'য়ে উকিল মোক্তারকে ঘোল খাইয়েছি। তাদের এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দিতে পারতাম। এখানে অনেক উকিল-মোক্তারের আত্মাই উপস্থিত আছেন; অনেকেই হয়ত আমাকে চেনেন।

নরম গলায় ভজনখানেক আইনজ্ঞ বলিলেন—কই, আপনাকে ত' আমরা চিনি না।

ম্যানেজারী আত্মা বলিয়া চলিলেন—আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান্ দেখছি। কেউই চুল সরিয়ে কাটা-কাণ দেখাতে রাজী ন'ন। বেশ, বেশ; আমিও বুদ্ধিমানের ভক্ত। আপনাদের কথা শুনে আমি খুবই খুশী হ'লাম। এখন আমার কথা শুনুন। দুষ্টের দমনে আমি যে বিশেষ অভিজ্ঞ, তা পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি সভায়। বৈঠকের আনন্দরাও অতি দুষ্ট। সভা যদি এদের দমনের ভার আমার উপর ছেড়ে দেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি নিশ্চয়ই সফলকাম হ'ব। আমার সুদীর্ঘ ঐহিক জীবনে কোন দিনই আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই নি।

একজন কণ্ঠিধারী প্রেত ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হয়েছ বহু বারই, তবে স্বার্থভ্রষ্ট হওনি একবারও।

চারিদিক হইতে "চুপ করুন," "চুপ করুন," "বেরিয়ে যান," বলিয়া শ্রোতারা হৈ চৈ করে উঠলো।

ম্যানেজার সদম্ভে বলিলেন—প্রেতলোকে আমি কারো ম্যানেজার নই যে, যে-সে আমাকে 'তুমি' বলবে। এ-বিষয়ে আমি সভাপতির মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

বাক-বিতণ্ডায় বিরক্ত হইয়া সভাপতি বলিলেন—আপনারা হিন্দুস্থানে যেমন সভাসমিতি পণ্ড করেন প্রেত-স্থানেও কি তাই করবেন?

শ্রোতাদের তরফ থেকে একজন বলিলেন—সভাপতির স্মরণ রাখা উচিত যে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভানে।

পাকিস্থানপন্থী একজন হাঁকিয়া বলিলেন—হিন্দুস্থানের পাশাপাশি পাকিস্থান হ'লেই গোলমাল ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

মোক্তার অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—থামুন, থামুন; প্রেত-স্থানে বসে পাকিস্থানের ওকালতি করবেন না। পাকিস্থান করবে গোলমাল ঠাণ্ডা! আমি একাই ঠাণ্ডা করে দিতে পারি পাকিস্থান হিন্দুস্থান দুই-ই—যদি ঐ বে-খাপ্পা আর্ণস্ একটা চোখ না রাঙাতো।

নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলেও শ্রোতাদের আগ্রহে সভাপতি বক্তাকে আরো দশ মিনিট সময় দিলেন। ম্যানেজার পুনরায় সবিক্রমে সুরু করিলেন—চুলোয় যাক পাকিস্থান হিন্দুস্থান, সভার অনুমতি পেলে পাপাত্মা পঞ্চানন্দদের আমি একাই ঠাণ্ডা করে দিতে পারি।

শ্রোতারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া করতালি দিয়া বলিলেন—ঠাণ্ডা করে দিন, ঠাণ্ডা করে দিন।

শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানাইয়া ম্যানেজার বলিলেন—অদ্য মহালয়া অমাবস্যা ; তার ওপর শনিবারও। প্রেতের পক্ষে নর-শত্রু দমনের এমন সিদ্ধিযোগ সহজে মিলে না। অতএব আপনাদের প্রতিনিধি হ'য়ে পঞ্চানন্দের বৈঠকে হাজির হ'বার অনুমতি দিন আমাকে। দেখুন, বাছাধনদের কী রকম সায়েস্তা করে আসি।

বহু বাদ-বিতণ্ডার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ম্যানেজারের আবেদন মঞ্জুর হইল। হৃষ্ট-চিত্ত প্রেতদের বজ্র-বিদারী হর্ষনাদ ও করতালি শব্দ প্রেত-লোকে যে ভৈরব শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করিল, তার প্রতিধ্বনি সন্ধ্যানিলে ভাসিয়া আসিয়া আনন্দের অন্তর স্পর্শ করিল ; তাঁরা প্রেতলিপি-যন্ত্র নিয়া প্রেতাহ্বানে বসিয়া গেলেন

প্ল্যানচেট হাতে করিয়া গড়গড়ানন্দ বলিলেন—এসো হে, আনন্দ ভায়ারা, সন্ত লোকান্তরিত দিবাকর শর্ম্মাকে ডাকা যাক আজ। শর্ম্মা মস্তবড় কবি। নস্যানন্দ কোঁচায় নাসাগ্র মুছিয়া বলিলেন—কবি টবিকে ডেকে কি কাজ? দার্শনিক দত্তজাকে ডাকো। চুকটানন্দ একটু আগাইয়া বসিয়া বলিলেন—দর্শনের কি জান যে দার্শনিক ডাকবে? তার চেয়ে হালে যারা যুদ্ধে মরেছে তাদের একজনকে ডাকো। সেন্সরদের কাটাকুটির জ্বালায় একটাও যদি খাঁটি খবর পাওয়া যায়!

গড়গড়ানন্দ হতাশের স্বরে বলিলেন—তা ডাকতে হয় ডাকো, কিন্তু খাঁটি খবর পাবে না। লড়াইতে কি শুধু লড়য়েই মরেছে, সেন্সর কি একটাও মরেনি মনে করছো।

বিড়ি-আনন্দ ভারিক্কি চালে বলিলেন—আজ আর বাইরের লোক ডেকে কাজ নেই। মহালয়ার দিনটা, আমাদের পল্লীর কুলাবধূত বাড়ুজ্যে মশায়কেই না হয় ডাকো।

ধার্ম্মিক সাজতে অনেকেরই অগস্ত্য রকম সখ দেখা যায়। বিড়ি-আনন্দ ধার্ম্মিক সাজিয়া সকলের ওপর টেক্কা দেয়, টী-আনন্দের তা' বরদাস্ত হইল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন—ঐ যা, ভায়া যে আমারই মুখের কথাটা কেড়ে নিলে হে। আমি বাড়ুজ্জে মশায়ের কথাই বলতে যাচ্ছিলুম।

কুলাবধূতকে ডাকাই স্থির হ'ল। লিপি-যন্ত্রের উপর হাত রাখিয়া সকলেই আত্মার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কিছুক্ষণ অচঞ্চল থাকিয়া যন্ত্র সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। পঞ্চানন্দ পরস্পরকে চাপা-কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন—এসে গেছেন।

গড়গড়ানন্দ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি কুলাবধূত বাড়ুজ্যে মশায়?

লিপিযন্ত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া লিখিল—আমি চাটুজ্যে, বাড়ুজ্যে, কুলাবধূত সব ; আজ আমি সমস্ত প্রেতের প্রতিনিধি।

চুকটানন্দ বলিলেন—না না, আপনি বাড়ুজ্যে মশায় নন ; তিনি ছিলেন প্রকাণ্ড পণ্ডিত। আপনি মূর্খ, অবধূত লিখতে ধ-য়ে হ্রস্ব-উকার দিয়েছেন।

প্রেত লিখিল—প্রেত-লোকে সবই হ্রস্ব ; সেখানে দীর্ঘ বলে কিছু নেই।

টী-আনন্দ বলিলেন—সত্যি করে লিখুন, কে আপনি

প্রেত লিখিল—সিংহপুরের ম্যানেজার।

সকল আনন্দরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কী সর্ব্বনাশ! বটব্যাল ম'শায়? আমাদের জমিদার বাবুর ম্যানেজার?

—আজ্ঞে হজুর ; এবার ত চিনলেন? এখন বাকী বকেয়া খাজনা ফেলুন ঝন ঝন ক'রে।

—আপনি ত জালিয়াতির জন্য জেলে গেছলেন? টী-আনন্দ প্রশ্ন করিলেন।

গড়গড়ানন্দ গড় গড় করিয়া বললেন—জেলে একটা প্রজা-কয়েদী ঠেঙাতে গিয়ে লোকটার যে ফাঁসী হ'য়েছিল হে।

লিপি-যন্ত্র লিখিল—ফাঁসী নয়, কাশী ; জেল নয়, শ্বশুবালয়।

পঞ্চানন্দরা সজোরে মাথা নাড়িয়া বললেন—না না ; আমরা আপনাকে চাই না ; আপনি চ'লে যান।

লিপি-যন্ত্র লিখিল—চাই না বললেই চলে! বাড়ীতে ডেকে এনে খালি হাতে বিদেয় ক'রতে চাও? তোমরা সিংহপুরের প্রজা ; স্বয়ং ম্যানেজার সমুখে হাজির ; কোথায় নজরসহ বাকী-বকেয়া ও হালের খাজনা শোধ করবে, না শুধু হাতে বিদায় করতে চাচ্ছ! বাকীজায়টা না হয় পড়েই শোনাচ্ছি।

সমস্ত আনন্দরা শিব-নেত্র করিয়া বলিলেন—কী ভয়ানক লোক! প্রেত-লোকে গিয়েও বাকীজায় লিখছেন।

প্রেত-লিপিযন্ত্র লিখিল—বাকীজায় লিখবো না ত কী—তোমাদের জন্য তামাক আর চায়ের চাষ ক'রবো? শোন, বাকীজায়টা—গড়গড়ানন্দ পাঁচ হাজার, নস্যানন্দ পাঁচ শ', টী-আনন্দ পাঁচ, চুকটানন্দ পাঁচসিকে আর বিড়ি-আনন্দ পাঁচ আনা মাত্র। ফেলো পাওনা-গণ্ডা, টাকাপয়সার ঝনৎকারে প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক।

নস্যানন্দ নাকি স্বরে বলিলেন—দোহাই ম্যানেজারবাবু, ট্যাঁকে একটিও টাকা নেই ; থাকলে আজই একশিশি "ট্যাডি" কিনতুম। নস্য বাড়ন্ত ; তা' হোক, নিন এক টিপ ; এক টিপ নিয়েই কিন্তু রেহাই দিতে হ'বে।

অন্যান্য আনন্দরাও জানিয়ে দিলেন তাঁদের ট্যাকও সিকের তোলা গোছের ; কাণে ধ'রে টানলেও একটি কানাকড়ি মিলবে না।

প্রেত লিখিলো—মাতালে ঠকাবে শুঁড়িকে। প্রজা দেবে চোখে ধূলো ম্যানেজারের! ট্যাঁকে টাকা না থাকলেও কাছায় বাঁধা আছে নিশ্চয়ই। ফেলো ঝন ঝন ক'রে—নইলে কিন্তু এখুনি পেয়াদার হাওলা ক'রবো।

আনন্দরা নিরানন্দ হইয়া বলিলেন—আমরা না হয় যন্ত্রটা তুলেই রাখছি, আপনি চ'লে যান।

যন্ত্র লিখিল—পার ত' রাখো তুলে।

আনন্দদের হাত যেন যন্ত্রের সঙ্গে পেরেক দিয়া আঁটা। সভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

যন্ত্র লিখিল—এটা একটা তান্ত্রিক পীঠস্থান ; এখানে পাতা রয়েছে পঞ্চমুণ্ডীর আসন। ইহা ভয়েরও ভয়, ভীষণেরও ভীষণ।

ঘরের মধ্যে কারা যেন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আনন্দরা চেঁচাইয়া উঠিলেন—কী সব ভুতুড়ে কাণ্ড শুরু হ'য়েছে।

প্রেত লিখিল—ভূত নামাতে বসেছ, ভুতুড়ে কাণ্ড হবে না ত কী পরীর নাচ-গান হবে? ও আমার পেয়াদা-পাইকের হাসি।

আনন্দরা বলিলেন—মিছে কথা; ও ত' মেয়েলি হাসি।

প্রেত লিখিল—মেয়েলি হাসিই ত'; ওরা পৃথিবীর প্রগতি-পন্থিনী। প্রেত-লোকের পেয়াদা-পাইকের পদগুলি এখন ওদেরই একচেটিয়া। আফিস-আদালতের কাজও কিছু কিছু ওদের আয়ত্তে এসে গেছে।

আনন্দরা স্বীকার করিলেন, তাঁদের খুব শিক্ষা হ'য়েছে। তাঁ'রা আর প্রেত-তত্ত্ব ঘাঁটবেন না। তাঁ'রা ম্যানেজারকে চ'লে যেতে ব'ললেন।

ম্যানেজার—প্রেত হা হা করিয়া উচ্চ-হাস্যে বলিলেন—ধুলো পায় বিদায় করতে চাচ্ছ যে; কোথায় মিঠাই-মণ্ডা খাওয়াবে, না বলছো—আপনি চ'লে যান। বেশ, আমি চ'লে যাচ্ছি; কিন্তু তার আগে তোমাদের কিছু খাইয়ে যেতে চাই। নাও, এবার নিজে নিজে কাণমলা খাও ত' আমার আনন্দ ভাইরা।

আনন্দরা—আজ্ঞে, হাত যে তুলতে পারছি না।

প্রেত—বেশ, তা' হ'লে নাক-খৎ খাও।

পঞ্চানন্দ নাক-খৎ খাইতেই, 'কে-যেন' লিপি-যন্ত্রটা ছুঁড়িয়া দিল দেয়ালের গায়। টেবিলটা পড়লো পা উল্টাইয়া—মেঝের উপর মুখ থুবড়ে; সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা বাতাস ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল দরজা ঠেলিয়া—যেন লক্ষ শকুনি পাখসাট মারিয়া উড়িয়া গেল।

টী-আনন্দ—নাঃ, এটা পঞ্চমুণ্ডীর আসন না হ'য়ে যায় না।

গড়গড়ানন্দ—এসো পঞ্চানন্দের বৈঠকের আজ অন্তর্জলি করা যাক।

নস্যানন্দ—তাই করো; রাত-বে-রাতে আর বাইরে থাকা নয়।

বিড়ি-আনন্দ—এসো আবার নতুন ক'রে ঘর-সংসার পাতা যাক:

চুরুটানন্দ—নতুন গিন্নীর আঁচলের গেঁড়ো হ'য়ে থাকা যাবে—কি বলো?

সকল আনন্দ মতৈক্য হ'য়ে আনন্দে বলিলেন—তথাস্তু।

দূরের পাহাড়

দিলীপ দাশগুপ্ত

মনে ছিলো যেন আশা—
তিমির-তরাস প্রভাতের বুকে রচিব খেলার বাসা।
সেখানে থাকিবে আপন করার মতন একটি মোহ—
মাতা নহে, নহে কন্যা, নহে কো প্রেয়সী-জনার স্নেহ।
এক সাথে রবে আদিম হইতে অনাদিকালের পথে—
স্রোতে ভাসা নয়; বাস্তব-ধূলি দলিত করিয়া রথে
চলিব যখন—দু'ধারে থাকিবে সংকেত অযুতের—
মাতা ও কন্যা, প্রেমিকা ও প্রিয়া এক হবে চিত্তের।
উর্বশী তাই আসিল নীরবে, পদি নাই ধ্বনি তার—
এসেছিলো তাই বক্ষ ভরিয়া স্বরগের সম্ভার।
এক হাতে নিয়ে তরোয়াল আর অপর হাতেতে মালা—
এক চক্ষুতে সুধারে ক'রিয়া—অপরে ধরেছে জালা।
উর্বশী এসে তাই
মুছে নিল যেন মন থেকে মোর সব কিছু—নাই—নাই।

পাহাড়ী

শামসুদ্দীন

এখানে আলোক ছিল, ছিল ঘিরে রঙীন আকাশ
সোণার মুকুট পরি' ছিল চেয়ে ঝাউ বীথিকায়
ছোট ছোট মেঘ দল, ডানা মেলে জাগার মাথায়
শূন্য জয় রথে চড়ি দিগন্তরে করেছে বিলাস।
কুয়াশা এসেছে ঘিরে, ছেয়ে গেছে দূর বন পথ,
ঝরণার কলগীতি গেছে মিশে একটি নিমেষে;
নীরব নিস্তব্ধ যেন প্রকৃতির দুই তীর ভেসে
নিয়ে গেছে আরো দূরে নিরালায় অন্ধ ছায়ারথ।
আলোর কিরণ লেগে ছিল যারা মুখর, আবার
নিরালা নিকুঞ্জ তীরে চায় তারা আকুল আশায়
হয়ত' আসিতে ফিরে পুনঃ এই ধরণীর তীরে;
কী বা তার মনবনে আছে ঘিরে অমৃত নিশায়
সোণার স্বপন কথা গায়ে লেগে অপূর্ব্ব মায়ায়,—
তাই যেন লাগে চোখে বাজে কানে চরণ মঞ্জীরে।

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

শ্রীকুমুদনাথ দাস

[২]

কোন কবিতা (যেমন শেলীর Skylark, কীটসের Nightingale অথবা Grecian urn সম্বন্ধে Ode) ভালভাবে উপভোগ করিতে হইলে পাঠকের কবি-বর্ণিত প্রত্যেকটি দৃশ্য মনে মনে আঁকিতে হইবে এবং তিনি যে-সমস্ত শব্দ ও উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির নিগূঢ় অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। Julius Caesar পড়িতে সিজারের যুগে রোমের অবস্থা কল্পনা করিয়া প্রত্যেকটি চরিত্র ও দৃশ্য বিচার করিতে হইবে। এই কল্পনা-শক্তি (বা মানস-দৃষ্টি) যে পাঠকের যত ভাল, তিনি তত অধিক আনন্দ পাইবেন। কার্লাইল বলিয়াছেন, 'কবিতা ভাল করিয়া পাঠ করিবার সময় আমরা কবি হইয়া যাই।'

কবিতা রচনা ইচ্ছাধীন নয়—"Poetry is not like reasoning a power to be exerted according to the determination of the will. A man cannot say, I will compose poetry.' The greatest poet even cannot say it.*

'সরসা বিরসায়তে।'

কোন খাঁটি কবিতাকে গদ্যে পরিণত করা ও তাহাকে হত্যা করা একই কথা নয় কি ? রামধনুর রংগুলি ভিন্নভাবে যোজনা করিলে অথবা কুসুমের দলগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া অন্যভাবে সাজাইলে তাহার সৌন্দর্য্য থাকে ? মলি বলিয়াছেন, 'It is a beggarly conception to judge as if poetry should always be capable of a prose rendering,'

'গানাৎ পরতরং নহি'। সঙ্গীত কবিতার সার। প্লেটো বলিয়াছেন, দেহের উন্নতির জন্য যেমন ব্যায়াম চাই, আত্মার উন্নতির জন্য তেমনি সঙ্গীত চাই। চিত্ত-বৃত্তিগুলির উপর সঙ্গীতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। সঙ্গীত যে না ভালবাসে সেকস্‌পীয়র তাহাকে বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন। 'He is fit for treasons, stratagems, and spoil's.'

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের রাজ্য, সঙ্গীতের রাজ্য স্বর্গের রাজ্য খণ্ডভাবে আছে। সেই খণ্ডরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনই কবির প্রধান ও প্রথম কাজ।

নিছক আনন্দের জন্য এ যুগে অধিকাংশ পাঠক কবিতা পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্যর জর্জ্জ বোমণ্টকে লিখিয়াছিলেন, 'The poet is a teacher ; I wish to be considered as a teacher or as nothing,' নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন 'কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।' ডিসরেলী বলিয়াছেন 'Poets are the unacknowledged legislators of the world' কার্লাইলের মতে আনন্দের সহিত শিক্ষাদানই ('instruct by pleasing') কবির কার্য্য। কাব্যপাঠের ফল সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণে' উক্ত হইয়াছে—

'চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি কাব্যাদেব'*

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ছন্দ বর্জ্জন করিয়া কবিতা লিখিবার প্রয়াস ইংলণ্ডে চলিতেছে। আমাদের বৃদ্ধ কবিগুরু এবং তাঁহার দেখাদেখি দেশের উদীয়মান কবিরাও সেই পথের পথিক হইয়াছেন। 'It is not poetry, but prose run mad,' কবিতার নামে এইরূপ হেঁয়ালী সাহিত্যে আর কতদিন চলিবে ? 'ফিরিবে না, ফিরিবে না, অস্ত গেছে যে গৌরব-শশী' ?

যেখানে সেখানে এখন নিত্যনূতন কবি গজাইতেছে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তি—furor poeticus—অত সহজে লাভ করা যায় না।

'নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।' *

'God giveth speech to all, song to the few.'
'The poet is hidden in the light of thought.'

কাব্য হইতে কবির সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহাই তাঁহার সঠিক পরিচয়।

যে জাতি একজন শ্রেষ্ঠ ভাবুক, সাধক অথবা কবি পাইয়াছে সে জাতি ধন্য—তাহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল।

মহাকাব্যের যুগ অতীত হইয়াছে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, এইরূপ উক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। এই উক্তির পিছনে কোন যুক্তি নাই। গীতি-কবিতার ন্যায় মহাকাব্য নিত্যনূতন প্রস্তুত হয় না। এক শতকেও সমগ্র সাহিত্য-জগতে একখানি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য না বাহির হইতে পারে। মহাকাব্য লিখিতে অধিকতর সাধনা ও মহত্তর প্রেরণা চাই। হোমরের পর গ্রীক সাহিত্যে, দান্তের পর ইতালীয় সাহিত্যে, মিল্টনের পর ইংরেজী সাহিত্যে এবং মধুসূদনের পর বঙ্গ-সাহিত্যে ভাল মহাকাব্য বাহির হয় নাই। ইহার কারণ, মহাকাব্য লিখিতে যে স্বর্গীয় প্রেরণা চাই, তাকে লইয়া কোন লোক এ-সব ভাষা-ভাষীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতেও যে করিবেন না, তাহা বলা চলে না। যদি কোনদিন করেন, আবার মর্ত্ত্যবাসিগণ স্বর্গীয় মেঘমল্লার-রাগিণী শ্রবণ করিবে।

Poetry is fallen on evil times and evil tongues — তাহার কারণ অতিরিক্ত অপাঠ্য কবিতার কলন, মেকলে যাহা বলিয়াছেন তাহা নয়।* খাঁটি কবিতার অনাদর হইলে বুঝিতে হইবে মানুষ আবার বর্ব্বর হইয়াছে।†

---

* if : 'কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি ন তৎকবিঃ।
ভবানীভ্রুকুটীভঙ্গিং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ।'

* Shelley

* সাহিত্যদর্পণ।

* As civilisation advances poetry neccessarily decline ;— Macaulay.

† 'He who has no ear for poetry is a barbarian, be he who may.'— Goethe.

'A thing of beauty is a joy for ever'. সাহিত্যে যে সব সত্যিকারের সৃষ্টি তাহাদের সৌন্দর্য্য কোন দিন ম্লান হয় না। রামায়ণ, মহাভারত, ওডেসি, ম্যাকবেথ, মেঘদূত, রঘুবংশ প্রথম পাঠকদের নিকট যেরূপ আনন্দদায়ক ছিল, এখনকার পাঠকদের নিকটও সেইরূপ আনন্দদায়ক—their beauty 'like the world's unwithered countenance, is bright as at the day of their creation'। এ যুগে সাহিত্যে নিত্যনূতন গ্রন্থ বাহির হইতেছে। যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতি অনুসারে ইহাদের মধ্যে যেগুলি খাঁটি শুধু সেইগুলিই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিবে।

যে কবির যে যুগে আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাকে সেই যুগের মাপকাঠিতে বিচার করিতে হইবে। চসার অথবা স্পেন্সারের সহিত শেলী বা কীটশের তুলনা আদৌ শোভন নয়—'Such comparisons are odious,'

কোন গ্রন্থের এক কালে প্রয়োজন ছিল, এখন নাই, তাই বলিয়া যদি তাদের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করা হয়, বড় দুঃখের কথা।

কোন শ্রেষ্ঠ রচনা যে ভাষায় রচিত, সেই ভাষায় পাঠ করা উচিত। নতুবা তাহার সঠিক পরিচয় হয় না। অনুবাদে রচনার সমস্ত সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় না।

সোণা হইতে খাদ কাটিয়া গেলে যেমন তাঁদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়, সুনিয়ন্ত্রিত নির্ব্বাচনের ফলে খাদ বাদ পড়িলে তেমনি রচনার সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে। বিনা নির্ব্বাচনে অনেক শ্রেষ্ঠ লেখকের গ্রন্থাবলী পড়িতে বিরক্তি লাগে।

মধুসূদন অথবা বঙ্কিমের রচনার অভিনবত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে পাঠকের মনকে তাঁহাদের যুগে লইয়া যাইতে হইবে—তাঁহাদের পূর্ব্বে বঙ্গভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল এবং তাঁহারা নূতন কি দিয়াছেন, ইহাই বিচার করিতে হইবে।

পাটনা সাহিত্যসম্মিলনে স্যর মন্মথ বঙ্গ-সাহিত্যের ধারাকে আবার বঙ্কিমের দিকে ফিরাইয়া লইবার জন্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু নদীর স্রোতকে কি এখনও পিছন দিকে ফিরাইয়া লওয়া যায়? বঙ্গ-সাহিত্যের ধারা সমুখ দিকেই আগাইয়া চলিবে, কিন্তু তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রতিভাশালী লেখকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। সেরূপ লেখককে ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায় না—ফরমাস মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানাসমূহে তৈরী করা যায় না—সময় হইলে তিনি আসেন।

সাহিত্যের মূল উপাদান চারিটি—অনুধাবনা (the intellectual element), অনুভূতি (the emotional element), কল্পনা (the element of imagination) এবং আঙ্গিক বা রচনাভঙ্গী (the technical element)।

কার্লাইল বলিয়াছেন, 'style has little to do with the worth or unworth of a book। তাঁহার এই উক্তিটি ঠিক নয়। রচনাভঙ্গী যদি মধুর হয়, নিতান্ত নীরস বিষয়ও সরস লাগে। কিন্তু রচনাভঙ্গী যদি নীরস হয় যতই সরস বিষয় হউক না কেন, পাঠক তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। style gives value and currency to thought—'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'।

কতকগুলি শ্রুতিমধুর শব্দ যোজনা করিলেই রচনাভঙ্গী মধুর হয় না। 'The finest language is chiefly made up of imposing word's.

কিরূপ রচনা পাঠকগণের মনে অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তৎসম্বন্ধে এমার্সন বলিয়াছেন "The effect of any writing on the public mind is mathematically measurable by its depth of thought. How much water does it draw? If it awakens you to think, if it lifts you from your feet with the great voice of eloquence, then the effect is to be wide, slow, permanent over the minds of men; if the pages instruct you not, they will die like flies in the hour."

যতটুকু রং দিলে প্রতিমা সুন্দর দেখায়, ততটুকুই রং দেওয়া উচিত—তার বেশী নয়। বেশী দিলে প্রতিমার সৌন্দর্য্যহানি হয়। সেইরূপ যতটুকু বলিলে ভাবকে রূপ দেওয়া যায়, ততটুকুই বলা উচিত। তার বেশী বলিলে ভাবের সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়।

মলিয়র বলিয়াছেন, ব্যাকরণ ভূপতিগণের উপরও প্রভুত্ব করিয়া থাকে। সত্য, কিন্তু ব্যাকরণ শক্তিশালী লেখকগণের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যাকরণ, তাঁহাদের অভিধান, তাঁহাদের ভাবধারা, তাঁহাদের রচনাভঙ্গী সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

ইংরেজ-শাসন যখন এ দেশে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, ইংরেজিতে ভাবা, কথা কহা এমন কি স্বপ্ন দেখার সাধ দেশে দেখা দিয়াছিল। এখন দেশে Anglomania অনেকটা কমিয়াছে, তবুও আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে মা হইতে দূরদেশীয়া মাসীরই আদর বেশী। পৃথিবীর আর কোথাও শিশু-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে না করিতেই তাহাকে জোর করিয়া বিদেশীয় ভাষা গলাধঃকরণ করাইবার চেষ্টা দেখা যায় না।

আমাদের বিদেশীয় ভাষা সেই ভাবে শিখা উচিত, যাহাতে আমরা মাতৃভাষা পুষ্ট করিতে পারি। আমরা বিদেশীয় ভাষার চর্চ্চা করিব সেই ভাষা সমৃদ্ধ করিবার জন্য নয়, সেই ভাষার রত্নরাজির দ্বারা নিজেদের মাতৃরূপ সমৃদ্ধ করিবার জন্য। 'A poet must sing for his own people and in his own tongue.' মিল্টনের ল্যাটিন রচনা এখন কে পড়ে? মধুসূদন শুধু ইংরেজিতে লিখিলে আজ কি কেহ তাঁহাকে চিনিত? মধুসূদন বিদেশীয় ভাষাসমুদ্র মন্থন করিয়া বহুমূল্য মণিমালার দ্বারা বঙ্গবাসীকে বিভূষিত করিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গালী জাতি তাঁহার স্মৃতিপূজা করে। সেইভাবে প্রত্যেক বাঙ্গালীর বিদেশীয় ভাষা চর্চ্চা করা উচিত।

যে-সব লেখকের বড় কিছু সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের কর্ত্তব্য দিনের কিছু সময় নির্জ্জন চিন্তার জন্য রাখা। 'The highest melody dwells only in silence.' নির্জ্জনতার মন্দিরেই জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, ভাবুক সাধকের সৃষ্টি হইয়াছে।

কবির যা প্রয়োজন ভিতরে থাকিলেও* দেশভ্রমণে তাঁহার

*"Sufficiently provided from within, he has need of little from without.—Goethe on the poet.

চিত্ত নব নব উন্মাদনা লাভ করিয়া থাকে—'New scenes impress new ideas, enrich the imagination and enlarge the power of reason.'

এমার্সন লেখকদিগকে বিভিন্ন প্রকার লোকের সহিত মিশিতে বলিয়াছেন, If you would learn to write, 'tis in the street you must learn it. Both for the vehecle and for the aims of fine arts, you must frequent the public square. The people, and not the college, is the writer's home.' (Society and Solitude')

বিভিন্ন প্রকার ভাবুকের মাঝে মাঝে মিলন এবং ভাববিনিময়ের পক্ষে ক্লাব উত্তম জিনিষ। সেক্সপীয়র, বেন জনসন, চ্যাপমান, হেরিক, বোমন্ট এবং ফ্লেচার Me rmaid club-এ সমবেত হইতেন। নিউটন, কক, রেন, ইভলীন, Dr. Bentley's club-এ সমবেত হইতেন। Dr. Johnson's club-এর সভ্য ছিলেন গোল্ডস্মিথ, বার্ক, গিবন, গ্যারিক—এখানে যে কথাবার্ত্তা আমোদ-প্রমোদ—'feast and flow of soul'—চলিত তাহা দ্বারা ইংরেজীভাষা পুষ্ট এবং ইংরেজ জাতি উপকৃত হইয়াছে।

এককালে সাহিত্য বলিতে কেবল কাব্যই বুঝা যাইত। এ-যুগে উপন্যাস ও ছোট গল্প সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

ছোট বড় সমস্ত উপন্যাস রচনায় এই ছয়টি জিনিষ চাই—প্লট, চরিত্রাঙ্কণ, কথোপকথন, ঘটনার কাল ও স্থান, রচনাভঙ্গী, এবং গুপ্ত অথবা ব্যক্ত জীবন-দর্শন।

অনেক উপন্যাস গল্পের মতই মনোহর। লে মিজারেব্‌ল বা কপালকুণ্ডলা পড়িতে ভুল হয়—কি পড়িতেছি—কাব্য না উপন্যাস?

ছোট গল্পের বিষয়বস্তু কোন চিত্তাকর্ষক ঘটনা—জীবনের কোন অধ্যায়—কিন্তু তাহা এমনভাবে বর্ণনা করা চাই যেন পাঠকের পড়িতে কোন ক্লান্তি বোধ না হয় এবং বেশী সময়ও না লাগে। এ-যুগে জীবন-সংগ্রাম কঠোর হওয়ায় মানুষের অবসর অল্প। সেই জন্য উপন্যাস হইতে ছোট গল্প পড়ার ঝোঁক সাধারণ পাঠকের বেশী।

'নাট্যং লোকানুকৃতিঃ'—'জীবনের জলন্ত অনুকরণ নাট্য।'

'নীলদর্পণ' অভিনয়কালে একটি দৃশ্য দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, তিনি অভিনেতার (অমৃতলাল) প্রতি পাদুকা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। (অবশ্য পরে সেই অভিনেতা সেই পাদুকা সসম্ভ্রমে মস্তকে ধারণ করিয়া দর্শকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন)। যে নাটক দৃশ্য ও অভিনয়ে এইরূপ বাস্তবতার ভাব দর্শকের মনে আনিয়া দিতে পারে তাহাই খাঁটি নাটক। নাটকে উপন্যাসের খুঁটিনাটি থাকিবে না—অথচ সব জিনিষ এমন ভাবে চিত্রিত করা হইবে—যেন সত্য ঘটনা বলিয়া ভ্রম হয়। নাটকের সৌন্দর্য্য অনেকটা অভিনয়ের সফলতার উপর নির্ভর করে।

কোন প্রকার সংঘাত (conflict) নাটকীয় উপাখ্যানের প্রাণ। এই সংঘাতের অভাবে Henry V ও Tempest এর রস সেরূপ জমে নাই।

নাটকীয় আখ্যানবস্তুতে পাঁচটি জিনিষ দেখা যায়—তাহাদিগকে dramatic line বা নাটকীয় রেখা বলে। (১) কোন ঘটনা—যাহা হইতে সংঘাতের সৃষ্টি ('Some Incident or Incidents, in which the conflict originates') (২) সংঘাতবৃদ্ধি (The Rising Action, or Growth or complication, comprising that part of the play in which the conflict continues to increase in intensity while the outcome remains uncertain')। (৩) সংঘাতের চরম-সীমা ('The climax, crisis or Turning Point, at which one of the contending forces obtains such controlling power that henceforth its ultimate success is assured')। (৪) সংঘাত-হ্রাস ('The Falling Action, or Resolution or Denouement, comprising that part of the play in which the stages in the movement of events towards this success are marked out')। (৫) উপসংহার ('The conclusion or catastrophe, in which the conflict is brought to a close')।

জাতীয় জীবনের উপর নাটকের প্রভাব স্বল্প নহে। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের উপর সেক্সপীয়রের নাটকগুলির প্রভাবই সবচেয়ে বেশী। জাতীয় রঙ্গালয় নয়া আদর্শও সৃষ্টি করিয়াছে। স্বদেশী যুগে যখন স্বদেশপ্রীতির বন্যা বাংলার উপর দিয়া যাইতেছিল, তখন গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলাল-নাটকগুলি কম উন্মাদনার সঞ্চার করে নাই।

ভিতর হইতে প্রেরণা না আসিলে কিছু না লেখাই ভাল। সে-লেখা প্রায়ই হৃদয়গ্রাহী হয় না।

লেখক সব জিনিষ নিজের চোখে দেখিবেন, নিজের মত ভাবিবেন, নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিবেন—তবেই তাঁহার নূতনত্ব ফুটিয়া উঠিবে।

পীথাগোরাস বলিয়াছেন, 'Be silent or say something better than silence.'

'যদি ভাল কিছু দিবার না থাকে না লেখাই ভাল। তাহাতে লেখক ও পাঠকের শক্তির অপচয় হয় না।' [ক্রমশঃ

দ্বন্দ্ব

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৫ সালের নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ। কলকাতা চৌরঙ্গী স্কোয়ারের একটী অফিসের ঝুল-বারান্দায় এসে বিমল দাঁড়াল দেখল যে, জাতি আজ জেগেছে— আজাদ-হিন্দ ফৌজের তিনটী বিশিষ্ট সেনাপতির দিল্লীর লাল-কেল্লায় সামরিক বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে আজ সকলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, বিরাট শোভাযাত্রা—অগণিত জনস্রোত —হিন্দু, মুসলমান, শিখ সকলে একতাবদ্ধ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ সকলের মুখে চোখে—ছাত্র এবং ছাত্রীর আন্দোলন আরও বেশী—জীবনের প্রথম প্রভাতের ঔজ্জ্বল্যে তারা পূর্ণ এবং প্রাণবন্ত—তারা তাদের বিক্ষোভ জানাবে ডালহৌসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত তারা শোভাযাত্রা নিয়ে যাবেই।

আগের দিন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট সভায় স্থির হয়েছে যে, যেমন করেই হোক, শোভাযাত্রা কলকাতার প্রসিদ্ধ রাজপথ দিয়ে নিয়ে যেতে হ'বে— পুলিশের জুলুম মানবে না। সেইদিন বিকেলবেলা শোভাযাত্রা এস্‌প্লানেডের কাছে এসে থেমেছে—পুলিশ প্রবল বাধা দিয়েছে—লাঠি এবং গুলি চলেছে—তা সত্ত্বেও শোভাযাত্রীরা অচল অটল। সারা রাত্রি ধরে পুলিশে ও শোভাযাত্রীদের সঙ্ঘর্ষ চলেছে।

বিমল চৌরঙ্গী স্কোয়ারের একটি মিলিটারী অফিসে চাকরী করে। অতি সাধারণ বাঙ্গালীর মত তার মনোবৃত্তি; নিজের এবং পরিবারের ভরণ-পোষণ করা তার নিকট জীবনের চরম ও পরম কর্ত্তব্য এবং সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে যদি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত ব্যয়িত হয়ে যায় তার জন্য সে কোনদিনও নালিস জানাবে না তার সৃষ্টি-কর্ত্তার কাছে। কংগ্রেস বেঁচে থাকুক—নেতারা কারা-বরণ করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্যে, তাতে সে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করা প্রয়োজন এবং বিনাযুদ্ধে যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না তাও তার অজানা নেই। কিন্তু তাই বলে তার মত একটি শক্ত সমর্থ শিক্ষিত যুবক যে দেশোদ্ধারের বিলাসিতায় মেতে পরিবারবর্গকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো ব্রিটিশের জেলখানায় অপচয় করবে—এমন মূর্খতায় সে সায় দিতে পারে না। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করবে এক বিশেষ জাতের লোক—তারা শ্বেতাঙ্গ সার্জ্জেন্টের লাথি খাবে, জেল খাটবে, পুলিশের লাঠিগুলি এবং অকথ্য অত্যাচার সহ্য করবে এবং সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ শ্রেণীর জীবদের দ্বারা চিরদিন লাঞ্ছিত ও অবমানিত হবে। বিমল তাদের বীর বলে মেনে নিতে কুণ্ঠিত নয় কিন্তু তা অতি সংগোপনে—যেন কেউ জানতে না পারে।

কলেজীয় জীবনে বিমল কোনরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে নিজেকে অতি সন্তর্পণে সরিয়ে রেখেছে। দেশনেতাদের কেউ কলকাতায় এলে অন্যান্য সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে সে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করা দূরে থাকুক, চাক্ষুষ আলাপ পর্য্যন্ত করতে চায়নি। তার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রী লাভ এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে ভাল ছেলের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা জীবনের চূড়ান্ত আদর্শ।

গবর্ণমেন্টের চাকুরী যোগাড় করা বিমলের পক্ষে বিশেষ শক্ত হয়নি। মিলিটারী অফিসের সে বিভাগীয় অফিসার এবং অফিসে কার্য্যকুশলতা, বাধ্যতা, সময়ানুবর্ত্তিতা ও কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য সে প্রসিদ্ধ। মিলিটারী শিক্ষা পাবার সুযোগ তার জীবনে কোনদিনও হয়ে উঠেনি কিন্তু তার হাবে ভাবে আকারে ও আচরণে সে সামরিক কায়দায় অভ্যস্ত বা কেতাদুরস্ত। এইজন্যে উর্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ সামরিক কর্ম্মচারী তার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট।

এই ভাবে বিমলের জীবন চলে আসছিল। তার সুনিয়ন্ত্রিত মনের দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভেদ ক'রে দেশের ডাক কখনও পৌঁছে নি এবং পৌঁছুতে পারে এমন আশঙ্কাও নেই—কারণ বিমল ইংরেজজাতির কতকগুলি গুণ আয়ত্ত করেছে, যথা অবিচলিতচিত্ততা, অসাধারণ অধ্যবসায়, সময়ানুবর্ত্তিতা এবং সহজে কোন বিরুদ্ধ বা নতুন ভাবধারায় বিহ্বল না হওয়া। ১৯৪২ সালের ঐতিহাসিক আগষ্ট-আন্দোলনকে যে মনপ্রাণ দিয়ে অস্বীকার করেছে, মহাত্মাজীর বিজয়-অভিযানকে নাটকীয় বলে আখ্যা-দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি, এবং এই আন্দোলনে স্বাধীনতার পথে দেশ যে কতখানি পেছিয়ে পড়ল একথা তার স্ত্রী ও বিশিষ্ট বন্ধুদের নানা যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝাবার ত্রুটী করে নি।

ভারতবাসীর পক্ষে রাজনীতির আলোচনা করা বিমলের কাছে একটা মানসিক বিলাস। তার মতে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর রাজনীতির চর্চ্চা শুধু অন্যায়ই নয়—অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা। যে জাতি সামান্য উদরান্নের জন্য এক বিদেশী শাসকের কাছে সদা মুখাপেক্ষী—তার আর যাই থাকুক রাজনীতি থাকতে পারে না। মুষ্টিমেয় বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় যদি তাদের অজ্ঞতা, দুর্ব্বলতা ও দলাদলির সুযোগ নিয়ে এই বিশাল ভূখণ্ড পদানত করে রাখতে পারে, বিমলের অন্তর প্রায়ই বলে উঠত যে

তাদের এই মূর্খ ও নির্বীর্য্য জাতির পিঠে কষাঘাত করে যা কিছু প্রাপ্য, কড়ায় গণ্ডায় শোষণ করবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাদের আছে—এ বিষয়ে কোনরকম যুক্তি-তর্ক সে প্রাণের মধ্যেই আনত না। ভারতবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া যে কতদূর আয়াস-সাধ্য সে বিষয়ে তাহার যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জন করতে উপস্থিত অক্ষম, এ বিষয়ে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে তার শ্বেতাঙ্গ ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে সে তাদের ঐ কথা জানাতে দ্বিধা বোধ করেনি যে, আগষ্ট আন্দোলন ভারতের জাতীয় জীবনে একটা গভীর এবং দুরপনেয় কলঙ্ক।

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাস থেকেই চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। জাপানের যুদ্ধ শেষ হয়েছে—আজাদ-হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আলোচনায় সমগ্র ভারত মুখর। ঘরে-বাইরে, রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, রেস্তোরাঁয় ঐ এক প্রসঙ্গ,—কেমন করে এই মহান্ বিপ্লবী ধূর্ত্ত ব্রিটিশ চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে বাইরে গিয়ে এই বিরাট্ জাতীয় বাহিনী ও স্বাধীন সরকার স্থাপন করলেন - সংবাদপত্রে, নেতাদের কণ্ঠে নেতাজী ও তাঁর সৃষ্ট আজাদী ফৌজের প্রশংসা নব জীবনের আশ্বাসে আসমুদ্রহিমাচল চঞ্চল হয়ে উঠে। এমন সময় ভারতবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে শুনল সরকারী ঘোষণা যে, নেতাজীর সেনাপতি যারা দু শ'বছরের পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল ভেঙে ফেলবার পুণ্যব্রত নিয়ে জীবন পণ করেছিলেন—'দিল্লীর লালকেল্লায় সামরিক আদালতে ব্রিটিশ অফিসারগণ কর্ত্তৃক তাদের বিচার হবে। অপরাধ গুরুতর—দেশদ্রোহিতা—রাজারই সৈনিক হ'য়ে রাজারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। বিমল লক্ষ্য করছিল নবজাগরণের চেতনায় জাতি যেন আজ উদ্বুদ্ধ—আর আজাদ হিন্দ ফৌজ তার শুভ উদ্বোধনকারী। এই আকস্মিক গণ-অভ্যুত্থান—এই অত্যাশ্চর্য্য সংঘবদ্ধতা বিমলের কাছে নতুন রূপে দেখা দিল। কিন্তু এতে তার মনের পরিবর্ত্তন কিছু হয়নি। ২১শে নভেম্বর অফিস থেকে বাড়ী ফেরার সময় এস্‌প্লানেডের মোড়ে সে ট্রাম-বাস পায়নি—কারণ দেখল দূরে ধর্ম্মতলার গির্জ্জার ওধার পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভীড়, পুলিশের লালপাগড়ীতে পরিপূর্ণ। বিরক্ত হয়ে তাকে হেঁটে হাওড়া ষ্টেশনে আসতে হোল। বাড়ী আসতেই তার স্ত্রী ব্যস্তসমস্ত হয়ে বললে; এসেছ—যাক্, বাঁচলুম। এতক্ষণ ভাবনা হচ্ছিল। কলকাতায় নাকি ভীষণ গণ্ডগোল, পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে; গুলিও চালাচ্ছে ?

গম্ভীর ভাবে 'হুঁ' বলে বিমল কোটপ্যাণ্ট ছাড়তে লাগল। এ সময়ে বাড়ীতে কেউ তাকে বিরক্ত করে না সংসারে চার বছরের মেয়েটী তার অত্যন্ত প্রিয়, বিমলের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যকে হাসির এবং খুসীর লঘুতায় গলিয়ে দিতো তার এই সদা হাস্যময়ী মূর্ত্তিময়ী আনন্দস্বরূপা চার-বছরের মেয়েটী। আজ বিমল পোষাক ছাড়তে না ছাড়তে সে তার বাবার কাছে সামরিক কায়দায় কপালে আঙুল ঠেকিয়ে অভিবাদন করল, "বাবা, জয় হিন্দ্"। বিমল অবাক্ হয়ে গেল—তা'হলে তার ছোট মেয়েটিও পর্য্যন্ত বাদ যায় নি। অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে সে জুতো খুলতে আরম্ভ করল - কন্যার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে গেল। মেয়েটী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবদার করে বলল—বাবা তুমি ত আমার 'জয় হিন্দ' ফিরে দিলে না ? তুমিও বল 'জয় হিন্দ্' তবে ত হবে।"

আরও বেশী আশ্চর্য্য হয়ে বিমল অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, "জয় হিন্দ্"। কন্যার আনন্দের সীমা নেই—তক্ষুণি নাচতে নাচতে তার দাদাদের কাছে ঘোষণা করল, 'জানিস বাবা জয় হিন্দ্ বলেছে, আমার জয় হিন্দ্ ফিরে দিয়েছে।'

বিমলের বড় ছেলে, আন্দাজ ১২।১৩ বছর বয়স, চাপা গলায় বলল—"হাঁরে এমনি ফিরিয়ে দিয়েছে কি না—তুই অমন হ্যাংলার মত চাইলি কেন্তে না—আমি হলে কখনও বলতুম না যে, বাবা আমার জয় হিন্দ্ ফিরিয়ে দাও।"

কন্যা বলল—"তা'হলে তুই কি করতিস ?"

পুত্র—"যে জয় হিন্দ্ ভালবাসে না তার কাছে জয় হিন্দ্ বলতুম না মোটেই।"

বিমল এসব কথোপকথন শুনছিল। পৃথিবীর গতি হঠাৎ উল্টো হয়ে গেল নাকি, তা না হলে এই সমস্ত অসম্ভাব্য ব্যাপার তার বাড়ীতেও ঘটে। ছেলেমেয়েদের কঠোর শাসনে রাখার পক্ষপাতী, বিমল এবং তার স্ত্রী—আদরও মাঝে মাঝে করে থাকে; কিন্তু তাই বলে তার বড় ছেলে কি করে ধারণা করল যে, সে জয় হিন্দ্ ভাল-বাসে না। ইচ্ছে হচ্ছিল এখুনি ডেকে তার বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে যে এ ধারণা কোথা থেকে জন্মাল কিন্তু হঠাৎ তাতে বাদানুবাদে পুত্রের উপর অযথা অত্যাচার হতে পারে, বিশেষতঃ সারা দিন বাইরের পরিশ্রম তার দেহ-মন বিশ্রাম চাইছিল। তাই কোন কিছু না বলে সে তার নিত্য করণীয় কাজগুলো সেরে নিল।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গেছে। বিছানায় শুয়ে বিমল তার স্ত্রীকে ডাকল—"একবার শুনে যেয়ো তো—কতকগুলো কথা আছে।"

বিমলের স্ত্রী প্রমীলা স্বামীর এই জাতীয় আজ্ঞার সঙ্গে অপরিচিতা নয়। বিশেষ কারণে বিচলিত না হ'লে তার স্বামী কখনও রাত্রে খাওয়ার পর ডাকে না—খাওয়ার

পরই সাধারনতঃ একটা ইংরেজী নভেল্ নিয়ে পড়ে ঘণ্টা-দুই বা দেড়েক, তার পর দৈনন্দিন খরচের হিসেব লিখে শুয়ে পড়ে। আজ তার ব্যতিক্রম হ'ল।

বিমলের স্ত্রী কাছে এলে, বিমল গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করল—'এ সব কি দেখছি। তুমি কি বাড়ীর কেউ নও যে তোমার সামনেই ছেলেমেয়েরা এমনি বেয়াড়াপণা শিখবে?"

প্রমীলা—ছেলেদের বেয়াড়াপণা কোথায় দেখলে?

বিমল ক্রোধ চেপে—"এই যে ছোট মেয়েটা পর্য্যন্ত 'জয় হিন্দ' শিখেছে, এটা বেয়াড়াপণা নয়?"

প্রমীলা—"কথাটা যখন উঠলো তখন এটার ভাল করেই আলোচনা হোক। সব দিন তো সমান যায় না—আজ দেশের হাওয়া বদলেছে। তুমি সরকারী অফিসে চাকরী কর, কাজেই সরকারের বিরুদ্ধে কিছু দেখলে জলে উঠ। কিন্তু তাই বলে তোমার ইচ্ছাই ত সকলের ইচ্ছা নয়—আর সকলের ত স্বাধীন ইচ্ছা বা মতামত আছে—"

বিস্ময়াবিষ্ট বিমল ভাবছিল, প্রমীলা—যার সঙ্গে আজ সুদীর্ঘ ষোল বৎসর ঘর করছে—এত বাধ্য সেও আজ মুখরা হয়ে উঠল! তাকে শেষ করতে না দিয়ে বিমল তার স্বাভাবিক ধৈর্য্য হারিয়ে অধীর ভাবে বলল—"ভূমিকা থামাও। তোমার আসল বক্তব্যটা কি তাই জানতে চাই। তোমার কথায় মনে হচ্ছে—এই সব অনাচার তুমি সমর্থন কর—ছেলেমেয়েদের এই হুজুগে নাচন-কোঁদনে লজ্জিত না হয়ে, তাদের হয়ে ওকালতি করছ অর্থাৎ তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেছো। উত্তম, এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই—তবে যে গাছের ডালে বসে আছ সেটাকেই কাটতে যাওয়া প্রচণ্ড দুঃসাহস নয় কি?"

প্রমীলা ইঙ্গিতটা বুঝল, সেও উত্তর দিল—দ্যাখো, তুমি সর্ব্বদা আমাকে এবং তোমার ছেলে-মেয়েদের যেন একটা নিজ অধিকারের গণ্ডীর মধ্যেই অনুভব করতে চাও এবং কেউ যে তোমার মতের বিরুদ্ধে যায় এটা তোমার অনভিপ্রেত। আমার মনে হয়, এটা তোমার দুর্ব্বলতা। যে মহাপুরুষের অক্ষয় কীর্ত্তি আজ আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয় জয় করেছে, যাঁর 'ঝান্সীর রাণী-বাহিনী'তে আমার মত স্ত্রী স্বামী, পুত্র, সংসার সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়ে দেশের মুক্তি-যুদ্ধে মৃত্যুপণ করে বেরিয়ে এসেছিল, বলতে পার মনুষ্যত্বের দিকদিয়ে আমরা কি এতই দেউলে যে, এ অমর কাহিনী আমাদের হৃদয়ে কোনই আলোড়ন সৃষ্টি করবে না? আজ নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সম্মান যেন তাঁর দেশবাসীর হাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতেই হ'বে—

বিমল বাধা দিয়ে হেসে বলে উঠল—এই তো দেখছি বেশ বক্তৃতা দিতে পার—পার্কে গিয়ে দিতে পারলে দেশ-প্রেমিকা বলে লোকে খুব বাহবা দিবে। তা' হলে আর বাড়ীর মধ্যে কেন—বাইরে গিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে সস্তা দেশ-প্রেমিকদের সঙ্গে চীৎকার সুরু করে দাও—

প্রমীলা দৃপ্ত স্বরে জবাব দিল—যদি দরকার হয় তাই করবো। তোমার ভয়ে পেছপা হ'ব না নিশ্চয়ই। শেয়াল, কুকুর তাদের পেট ভরায়, আর আমার এই সারা জীবন ত কেবল হাঁড়ী বেড়ী নাড়তেই শেষ হয়ে গেল—তবু যদি দেশের এই নব জাগরণের সময় জীবন দিয়েও এই সাময়িক মনোভাবের কিছুটা সংশোধন হয়, মানুষ বলে অন্ততঃ এক মুহূর্ত্ত পরিচয় দিতে পারি, তা' হলে জানবো যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

বিমল বিহ্বল হয়ে পড়েছিল—প্রমীলা কি উন্মাদ হয়ে গেল, সে কি বুঝতে পারছে না যে, রাজনীতি তাদের নয়—সগোষ্ঠী যে তা' হলে উপবাস দিতে হবে—আত্মীয় পরিচিত বন্ধু কাণাকড়িও সাহায্য করবে না, বা সহানুভূতি আসবে না কারুর কাছ থেকে—সারা জীবন ধরে এ কথাই বুঝিয়েছে—প্রমীলাও সর্ব্বান্তঃকরণে তার অনুমোদন করেছে—কিন্তু আজ এ কি সর্ব্বনেশে কথা বলছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বিমল তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলল—প্রমীলা, তোমার এই মনোভাবকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আগেও যেমন বলেছি এখনও তেমন বলছি যে, রাজনীতি আমাদের নয়। আমরা সেই জাতের, যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করবে, দুঃখে-কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে মরবে। এর বেশী আমাদের আর কিছু করবার নেই। ভেবে দেখ, কত কষ্টে যত্নে আর একান্ত অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ আজ কোনরকমে এই সংসার খাড়া করেছি। দেশের কাজ কখনও করি নি, আর তার অবসরই বা কোথায়। এই সংসার প্রতিপালনের যে দায়িত্ব ভগবান্ আমার কাঁধে চাপিয়েছেন, বল ত এছেড়ে দেশের কাজে লাগা কি উচিত? তা' হলে এ সংসার ছারখার হয়ে যাবে, তোমরা যে কে কোথায় ছিটকে পড়বে তার ঠিক নেই—কেউ দিবে না আশ্রয়, পথের কুকুরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে। আর আমি একলা কিছুই করতে পারবো না, কেবল লাভের মধ্যে ব্রিটিশ-জেলে পচবো। ব্রিটিশের শক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ তো পেয়েছ? এতো বড়ো যুদ্ধে তারা জার্ম্মানী জাপানের প্রচণ্ড শক্তিকে ভেঙে চুরমার করে দিল। আর আমরা পরাধীন, নিরস্ত্র—কোনও সুযোগ নেই যে তাদের সঙ্গে

যুদ্ধ করি—সুতরাং কতকগুলো বুলি আউড়ে আর হাত-পা ছুঁড়ে লাভ কিছু আছে কি?"

প্রমীলা—"কিন্তু তাই বলে চুপচাপ বসে থাকলে হাজার বছর ধরেও এর কোন প্রতিকার হবে না। জগতের যা কিছু ভাল, মহান্ এবং সুন্দর তা কেবল দুঃখ-সহিষ্ণুতা আর আত্মবলিদানের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। আমি জানিনে আজ কেন আমার এমন মনে হচ্ছে, তবুও ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু উপলব্ধি করছি যে, একটা কিছু করা চাই, চুপ করে উদ্ভিদের মত স্থাণু হয়ে এক জায়গায় বসে থাকবার সময় নেই—তাতে একটা প্রচণ্ড ওলোট-পালোট হ'বে—তা হোক। তার মধ্যেও কল্যাণময়ের মঙ্গল স্পর্শ আমরা অনুভব করতে পারবো।"

বিমল—কিন্তু এর দাম কত তা জানো? জানো তোমার দেহের প্রতি-রক্তবিন্দু দিয়ে তিলে তিলে গড়া এই যে সংসার—ঠিক তাসের ঘরের মতো এক ফুৎকারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—মুহূর্ত্তের এই উত্তেজনার আগুনে তোমার সমস্ত পরিবারবর্গ, তোমার যা কিছু শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি এবং আদর্শ জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। উত্তেজনা নিভিয়ে গেলে তখন কেবল যদি অনুতাপই হয় পুরস্কার, তা' হলে ভেবে দেখ যে, আজ কতবড় ব্যাপার নিয়ে তুমি বিচলিত হয়ে উঠেছ।"

প্রমীলা—আমি কাউকে ত কিছু করতে বলছি না। আমার ব্যক্তিগত দিক হ'তে যতটুকু সম্ভব তাই করবো। আমার ভরণ-পোষণের জন্য যা খরচ হয় তা থেকে আমাকে বাঁচাতে হবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সাহায্য-ভাণ্ডারের জন্যে—তা সে যত ক্ষুদ্রই হোক, আমার অন্তরাত্মা বলেন সেইটাই আমার প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য; ছেলেদের বোঝাব—শুধু 'জয় হিন্দ্' বললেই হবে না—তাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় ছাড়া অন্য সমস্ত কিছু সাহায্যভাণ্ডারে দান করতে হবে। আর কলকাতার রাজপথে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনাপতিদের বিচারের প্রতিবাদে যে শোভাযাত্রা বিজয়অভিযানে বেরিয়েছে, যদি পুলিশ এবং মিলিটারীর গুলিতে সমস্ত শোভাযাত্রা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তাদের পরিত্যক্ত রক্তরঞ্জিত পতাকা বয়ে নিয়ে যাওয়ার যে গৌরব তা অর্জ্জন করার সুসংহত চেষ্টা আমরা অন্তঃপুরচারিণীরা করব বই কি।'

প্রমীলার মুখ-চোখ যেন একটা আগ্নেয় অনুভূতিতে উজ্জ্বল এবং দৃপ্ত হয়ে উঠে। তার দৃঢ় সঙ্কল্প তার সমস্ত শরীরে প্রকাশমান। বিমল কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে উঠে; চির স্বল্পভাষিণী স্বামীর ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নিজের সমস্ত সত্তা যে একদিন মনে প্রাণে সমর্পণ করেছে, স্বামীর সমস্ত খুশী ও খেয়ালকে পরম স্নেহভরে ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় মেনে এসেছে, আজ জীবনের মধ্যাহ্নে সেই প্রমীলার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন—একেবারে আমূল। তবে কি সত্যিই ভাঙ্গণ ধরেছে?

হঠাৎ কিছু একটা সিদ্ধান্ত করা বা মতামত দেওয়া বিমলের স্বভাববিরুদ্ধ। কোনও কথা না বলে একটা সিগারেট ধরিয়ে গভীরভাবে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সহজ-সুরে বলল—"আচ্ছা প্রমীলা, তোমার যুক্তি-তর্ক শোনা গেল—আজ আমার মতামতের দাম তোমার কাছে একেবারে অবান্তর, কারণ তুমি তোমার কর্ম্মসূচী যখন আগেই ঠিক করে ফেলেছ সে ক্ষেত্রে আমার নাক ঢোকাতে যাওয়া অর্থহীন। বেশ; অনেক রাত্রি হয়েছে, তুমি এখন শুতে যেতে পারো।"

প্রমীলার সারাদিন আজ উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে—সে মনে মনে অনেক গড়েছে অনেক ভেঙেছে। যদি স্বামী নিজে যেচে কথাটা না পাড়েন, তা' হলে কি ভাবে তার ভূমিকা সে নিজেই পাড়বে ঐ নিয়ে সে অনেকবার মহড়া দিয়েছে। কিন্তু সে তো নিজেকে সামলাতে পারল না যা তার অন্তরের মণিকোঠায় প্রতিমুহূর্ত্তে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে তার চেতনাকে করে তুলেছে জাগ্রত এবং যে তীক্ষ্ণ, প্রবল অনুভূতিকে সে চেপে রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে—বিমলের দুই একটা প্রশ্নের ঠেলায় তার সমস্তই উজাড় হয়ে গেল; অথচ দুর্জ্জেয় ওই পুরুষটার অন্তঃপুরের কোন হদিসই ত মিলল না। প্রমীলার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছিল—অতিকষ্টে দুঃসহ আবেগকে নিরুদ্ধ ক'রে মরিয়া হয়েই জিজ্ঞাসা করল—"কিন্তু তোমার নিজস্ব মতামত কিছুই ত জানলুম না—তোমার চোখের সামনেই এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটেছে, তুমিও কি বিচলিত হও নি? সত্যি বল, তোমারও মন কি আমার কথায় সায় দেয় না? আজ ষোলো বছর অনেক সুখ-দুঃখের মধ্যেদিয়ে আমরা সংসারের রাস্তা বেয়ে চলে এসেছি। আজ আমার প্রাণে যেটা লাগল তা কি তোমার প্রাণেও লাগবে না? বলো, আমার কথার উত্তর দাও।"

ইতিমধ্যে বিমল তার স্বাভাবিক স্থৈর্য্য ফিরে পেয়েছে। স্থির কণ্ঠে সে বলল—আমার মনোভাব জানতে চাওয়াটা তোমার পাগলামী প্রমীলা। তুমি জিনিষটাকে যেভাবে নিয়েছ আমি সেভাবেই নিইনি। এইখানেই তোমার সঙ্গে তফাৎ। তবে হাঁ, আজ দেশে একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে। এর আবর্ত্ত যে কতদূর বিস্তৃত হবে তা বলা শক্ত। আপাততঃ আমার কোন মতামত নেই।

একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রমীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাৎসল্য [শিল্পী—শ্রীমুকুন্দ মজুমদার

দুই

বিমলের বিছানায় তার সেই মেয়েটী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রাত্রি প্রায় ১১টা। সাধারণতঃ রাত্রি দশটার মধ্যে বিমল শুয়ে পড়ে—প্রমীলার সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় আজ দেরী হয়ে গেছে। সিগারেটটা প্রায় শেষ করে এনেছে; আর একটা সিগারেট ধরিয়ে—আলো নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল কিন্তু ঘুমের চিহ্ন আজ আর নেই। আজ তার ঘুমুলে চলবে না, অনেক ভাববার অনেক সিদ্ধান্ত করবার রয়েছে। বিমলের সুনিয়ন্ত্রিত মন তার আলোচ্য বিষয়ের একটা খসড়া করে ফেলল, যথা—

১। আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য কি ছিল? জাপানীদের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ কি? সত্যিই কি তারা দেশোদ্ধারের জন্য জীবন পণ করেছিল?

২। আজাদ হিন্দ ফৌজের যে সমস্ত সেনানী আজ ব্রিটিশকর্ত্তৃক ধৃত ও জেলে আটক আছে—তাদের বিচার, অবরোধ বা উৎপীড়নের কোনও ন্যায়সঙ্গত অধিকার ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের আছে কি? যদি তারা দেশদ্রোহিতাই ক'রে থাকে, তাহলে তাদের দেশবাসীই তার সমালোচনা বা প্রয়োজনবোধে বিচার করতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশের কি অধিকার?

৩। কথা উঠেছে যে, সৈনিক হ'বার সময় এই সমস্ত সৈনিক ও সেনানীরা রাজ-অনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন—তাঁরা সেই আনুগত্য ভঙ্গ ক'রে রাজারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন কিন্তু সিঙ্গাপুর পতনের সময় পদস্থ ব্রিটিশ সৈনিকরা নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ভারতীয় সৈনিকদের দস্তুর মত জাপানীদের হাতে সমর্পণ করে নিজেরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন—এই তিক্ত ঘটনার পরও কি রাজানুগত্যের প্রশ্ন উঠতে পারে?

৪। কাজেই বিমলের তথা দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি?

বিছানা থেকে উঠে তক্তপোষের নীচে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে সে খেল। মাথাটা অনেক পরিষ্কার হয়েছে, এইবার এই চারদফা আলোচনা সুরু হতে পারে। আচ্ছা প্রথমে ধরা যাক। খবরের কাগজে ও অন্যান্য অনেক কাগজে সে পড়েছে যে, সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ ফৌজকে পূর্ণগঠন করেছিলেন—আগে এই ফৌজ জেনারেল মোহন সিং গঠন করেছিলেন—কিন্তু একটা সুষ্ঠু কর্ম্মসূচীর ভিতর দিয়ে তাঁর প্রথম সেনাবাহিনী কাজ করতে পারে নি। সুভাষচন্দ্রের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং জলন্ত দেশপ্রেমের আওতায় এসে এই ফৌজ একটা দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদলে পরিণত হয়েছিল। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কার্য্য-কারণ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করাই সুভাষ-ফৌজের একমাত্র কামনা ছিল। উদ্দেশ্য মহৎ—সন্দেহ নেই, কিন্তু সামান্য সঙ্গতি নিয়ে বৃটেন ও আমেরিকার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ একটা অসম দুঃসাহস—যে বিষয়ে সুভাষচন্দ্র কি সচেতন ছিলেন? পুরুষসিংহ মহাবিপ্লবীর কি এ কথা মনে জাগেনি? হয় তো জেগেছিল, সমস্ত দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, সুভাষচন্দ্র তাঁর দেশবাসীর সহযোগিতাই প্রার্থনা করেছিলেন—একবার আজাদী ফৌজ ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে এসে দেশবাসীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারলে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হ'ত। তৎকালীন অবস্থায় এ ছাড়া যোগ্যতর উপায় ছিল না। সুতরাং বিমলের প্রথম সিদ্ধান্ত হল যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে মহৎ ছিল।

সুভাষচন্দ্রের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে স্থির সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, জাপানের সহযোগিতায় অথবা সাহায্য নিয়ে দেশকে স্বাধীন করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। জাপানকে মিত্র ব'লে অবশ্য তিনি স্বীকার করেছিলেন কিন্তু ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব তাঁর কাজের মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট হয়েছে। জাপানের সঙ্গে তাঁর অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ ছিল না।

উপোরক্ত ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতায় এবং তাঁহার সামরিক কর্ম্মচারীদের প্রতিজ্ঞা এবং তদনুযায়ী কাজে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে—দেশকে উদ্ধার করাই তাঁদের একমাত্র ব্রত ছিল।

প্রথম প্রশ্নের সমাধানের পর বাকীগুলোর সিদ্ধান্ত সহজেই হয়ে যায়। ব্রিটিশের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার নেই আজাদী ফৌজের সামরিক বিচারের, কারণ, ভারতবর্ষ ব্রিটিশের দেশ নয়—যদি বিচার করতে হয় তা'হলে সে দায়িত্ব ভারতবাসীর। সুতরাং ব্রিটিশ কর্ত্তৃক এই বিচার-প্রহসন সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর আরও পরিষ্কার। ব্রিটিশ আগেই তাদের জাপানীদের হাতে সমর্পণ ক'রে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। একবারও চিন্তা করে নি—তাদের দশা কি হ'বে। এই আচরণেই তাদের নীচ মনোবৃত্তির পরিচয়ই পাওয়া যায় এবং একবার যখন অবলীলাক্রমে শত্রুদের হাতে ভারতীয় সৈন্যদের সমর্পণ করে এল, কোন্ লজ্জায় আজ তাহারা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের দাবী করতে পারে। কাজেই এই অভিযোগ অর্থহীন এবং সর্ব্বতোভাবে অন্যায়।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর আর বলবার প্রয়োজন হয় না। উপস্থিত কর্ত্তব্য যেমন ক'রেই হোক এই মহাপ্রাণ দেশ-সেবকদের জীবন রক্ষা, তাতে যদি জীবন যায়, সেও ভাল।

ভারতের ৪০ কোটী নরনারীর আজ এই আন্দোলনে যোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যে তিনটী সেনানীর বিরুদ্ধে লালকেল্লায় বিচার চলছে ৫ই নভেম্বর থেকে, তাদের অবিলম্বে মুক্ত ক'রে এই বিচার-প্রহসন বন্ধ করা আশু কর্ত্তব্য।

স্থির মস্তিষ্কে এইগুলো সিদ্ধান্ত ক'রে বিমল ভাবল তার কর্ত্তব্য কি? আজ চল্লিশ বৎসর বয়স হ'ল; জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত বহু এসেছে—প্রথম জীবনের দুঃসহ কষ্ট, ভোগ তার জীবনে গভীর দাগ এঁকে দিয়েছে। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে আজ মাত্র বছর ২।৩ নিরুদ্বেগ ও শান্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। সত্যিই কি তার করণীয় কিছুই নেই? জীবনে কেবলমাত্র নিরবচ্ছিন্ন আরাম, সংসার প্রতিপালন করলেই কি সব কাজ শেষ হয়ে যায়। বৃহত্তর জীবন কি? দুঃখকষ্ট সে যথেষ্টই ভোগ করেছে—সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তার জীবনে হয় তো নেই, নাই বা রইল—সকলের ভাগ্য কি সমান। স্বামী বিবেকানন্দকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, পূজো করে। তাঁর কথা—'একটা ভাল কাজ করতে গিয়ে মরাও ভাল'—সে পড়েছে কিন্তু বাস্তব জগতে তা প্রমাণ করতে যায় নি। সত্যিই ত সে ঘোর স্বার্থপরের মত এ জগতে বেঁচে আছে। বেঁচে থাকার জন্যেই সে বেঁচেছে—উদ্ভিদের মত জড় ও অকর্ম্মণ্য। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সে ব্রিটিশ জাতিকে —তাদের সমস্ত কার্য্যকলাপকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছে। চিরদিনই তাদের সহযোগিতা করে এসেছে—ব্রিটিশকে সেবাই একদা তার জীবনে মহৎ ব্রত ছিল বা আজও আছে। নিজের সমস্ত সত্তা, স্বাধীন চিন্তা সরকারী দপ্তরখানার সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়েছে। অথচ চিন্তা করতেও আজ শিউরে উঠে যে, সে যখন কায়মনে যুদ্ধের কাজ করেছে—মিত্রপক্ষের জয় হচ্ছে, ঊর্দ্ধতন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর বাহবায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছে—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে নেতাজীর ফকির সেনা দুর্গম গিরি-কান্তার পেরিয়ে ঘাসমাত্র আহার ক'রে দেশ-মুক্তির চরম সাধনায় দুর্জ্জয় আত্মশক্তির প্রেরণায় যুদ্ধ করেছে;—আর তাদের তপ্ত শোণিতধারায় আরাকানের অরণ্যভূমি, ইম্ফলের সমতল অভিষিক্ত হয়েছে। তারা জয়লাভ করতে পারেনি সত্য কিন্তু তাদের অবিনশ্বর কীর্ত্তি আর মরণজয়ের সাধনা কোন্‌টা না শ্রদ্ধেয়? তার জীবন পরিপূর্ণ স্বার্থে ভরা—এতো বৎসর তার বৃথাই কেটেছে; তার হিসাবের খাতায় জমার দিকে মারাত্মক রকমের ফাঁকি, অথচ খরচ সবই হয়ে বসে আছে।

বিমল উত্তেজিত হয়ে উঠে। চোখে তার জল কখন এসেছে কি না জানা নেই। কিন্তু দু ফোঁটা অশ্রু তার নেহাৎই বাধা মানল না। সে উঠে বাইরে দাঁড়াল, তার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলল। আগামী কাল ২২শে নভেম্বর যদি শোভাযাত্রা ধর্ম্মতলার মোড়েই থাকে—তা'হলে সে ঐ শোভাযাত্রায় যোগ দেবে, বুলেট এবং লাঠির সামনে দাঁড়াবে, কিছুতেই ভয় পাবে না—শোভাযাত্রা ডালহৌসি স্কোয়ারে পৌছানো চাই। যেমন করেই হোক ঐ বীর সেনাপতিদের মুক্ত করতেই হ'বে। আজ পিছন ফিরে বিমল দেখে তার এই অগৌরব-পূর্ণ জীবনে কোথাও এতটুকু পুণ্যের চিহ্ন নেই, যা এই গভীর অন্ধকারের মধ্যে নিকষে কনক-রেখার মত প্রতিভাত হয়।

মন স্থির করে সে প্রমীলাকে ডাকল, তখন রাত্রি প্রায় দেড়টা। উদ্বেগ-ভারাক্রান্ত স্বরে প্রমীলার ঘরের সামনে গিয়ে ডাকল—প্রমীলা, প্রমীলা শুনছো, একবার উঠ তো, তোমার সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা আছে।

প্রমীলা ধড়মড় করে উঠে স্বামীর দিকে চেয়ে যেন অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল—তোমার এ কি চেহারা হয়েছে? তুমি অমন করে চেয়ে আছ কেন—কি হয়েছে বলো?

বিমল আস্তে জবাব দিল—কিছু ত হয়নি—শোনো আমার বিছানায় এস তোমার সঙ্গে গল্প করবো।

প্রমীলা—আমার মনে হয় তুমি এখনও ঘুমোওনি। যাও শোওগে—কাল সকালে শুনবো।

বাধা দিয়ে বিমল বলল—উঁহু, তা তো হবে না, তোমাকে এখনি শুনতে হ'বে, ব্যাপারটা খুবই জরুরী।

প্রমীলা বাধ্য হয়ে বিমলের বিছানায় আসে। কোন রকম ভূমিকা না ক'রে বিমল বলে পরিষ্কার কণ্ঠে—প্রমীলা, আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে তুমি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলে—কিন্তু অতিসহজে কি বলা যায়? আমি তখন থেকে ভেবে দেখলুম—তোমার সঙ্গে আমার মত মেলে। আমাদের উচিত যথাসাধ্য করা, এমন কি প্রয়োজন হ'লে যদি জীবনও যায় তারও জন্য প্রস্তুত থাকা।

আনন্দে প্রমীলার চোখে জল এসে গেল—গাঢ় স্বরে বলল—তুমি সত্য বলছ, না আমাকে ঠাট্টা করছ। ঠাকুর কি তোমায় সত্যিই সুমতি দিয়েছেন, জানো, তোমার জন্য আমি ঠাকুরের কাছে যে কতো—

তার উচ্ছ্বাসকে বাধা দিয়ে বিমল আগের মতই গম্ভীর ভাবে বলল—দেখ প্রমীলা, এখন উচ্ছ্বাসের সময় নয়। অনেক ভাববার এবং স্থির করবার রয়েছে। আমার এই পাপপূর্ণ জীবনের যদি যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি তা' হলে জানবো যে কিছু করলুম—আহার, নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধির পরিধির মধ্যে আমার মন-প্রাণ, জীবন

ওতপ্রোতভাবে আবদ্ধ। কিন্তু লাভ ত কিছুই হ'ল না প্রমীলা—সমস্ত জীবন পণ করেছি তোমাদের সুখে-সাচ্ছন্দ্যে রাখবার জন্যে। নিজেকে কত বঞ্চিত করেছি—আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত সংসারের ঘানি টেনেছি—একটি দিনও তার বিরাম নেই। ৪০ বছর বয়স হ'ল, পরকালের ডাক কখন আসে তার ঠিক নেই, সময়মত তৈরী থাকা ভাল। কিন্তু তৈরী হ'য়েছি কই? আমার যে সম্বল আজ কিছুই নেই! প্রমীলা, তাই আমি স্থির করেছি যে কলকাতার শোভাযাত্রীদের সঙ্গে কাল সকালে আমিও যোগ দেব, সেই রক্তস্নাত পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে আমি বীর-পদক্ষেপে বিচরণ করব—পুলিশের লাঠি ও বুলেটের সামনে এগিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হ'ব না ভয় পাব না।

প্রমীলা আর্ত্তস্বরে বলে উঠল—তুমি কি সত্যিই শোভাযাত্রীদের সঙ্গে যোগ দেবে?

বিমল একটু হেসে ধীরভাবে বলল—হ্যাঁ, এবং মরবার জন্যেও তৈরী হয়েছি। এ তো জানা কথা। তবে আমার স্বভাব তো জানো—আমি হুজুগে মাতি না, উত্তেজনার মুহূর্ত্তে কোন কাজ করি না—আজ যা উপলব্ধি করেছি, তাই আমাকে এই পথে ঠেলে দিয়েছে—যদি পুলিশের গুলিতে আমার জীবন শেষ হয় ক্ষতি নেই—তুমি জানো আমার ১২০০০৲ টাকার লাইফ-ইন্সিওরেন্স আছে। আমার ক্যাশবাক্সের মধ্যে সমস্ত কাগজ-পত্র আছে—তোমার নামে assign করাও আছে—টাকা পেতে কোন বেগ পেতে হবে না। আশা করি এই টাকায় তুমি সংসার চালাতে পারবে। কিন্তু আমার অনুরোধ, কারুর কাছে তুমি সাহায্য ভিক্ষা করতে পারবে না। ছেলে-মেয়েদের যে ভাবে পারো মানুষ কর। আর ব্যাঙ্কে নগদ ২৫০০ টাকা ত' তোমার নামে আছেই—আমার নামেও ১৫০০ টাকা আছে—সেসব কাগজপত্র ওই ক্যাশবাক্সেই পাবে। এতেই কোনরকমে চালাতে পারবে না?

এবার প্রমীলা কেঁদে ফেলল—তুমি ওরকম ভাবে কথা বলছ কেন? শোভাযাত্রায় যোগ দেবে তা শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে কিন্তু তাই বলে মরবে কেন—সকলেই কি মরবে?

ম্লান হেসে বিমল বলল—হাঁ, এটা যা বলেছ খাঁটি সাংসারিক কথা। আমি আন্দোলনে যোগ দেব—শোভাযাত্রায় যোগ দেব কিন্তু গায়ে আঁচড়টী যেন না লাগে—বুলেট লাঠি যেন অপরের ওপর দিয়েই যায়—আমাদের মেয়েরা যুক্তকরে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেন—'ঠাকুর দেখো, আমার স্বামীপুত্রের যেন কোন অকল্যাণ না হয়—তাদের ফিরিয়ে দিও।' আমাদের মনোভাব সর্ব্বত্রই ঐ একরকম। বুলেট লাঠি যেন শূন্যেই লাগে। কিন্তু তা হয় না প্রমীলা—এ রকম দো-মনা হলে কোনও কাজ হয় না—সেই জন্যেই আমাদের এত অশান্তি। এটা আত্ম-প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রমীলা লজ্জিত হ'ল, ধীরে ধীরে বলল—তোমার কথাই ঠিক। বাঙ্গালী মেয়ে এমনি দুর্ব্বল, তোমার কথায় আমার চমক ভেঙ্গেছে। আমি ঠাকুরের কাছে চাইবো শক্তি—যেন সহ্য করতে পারি।

বিমল—আজ আমাদের এই সিদ্ধান্তে কোন মঙ্গল আছে কিনা জানি না, কিন্তু বিশ্বমানবত্বের ইতিহাসে আমাদের মত অজানা-অচেনা পথিকের আত্মত্যাগ ঠিকই লেখা থাকে। কলকাতার বিস্তৃত রাজপথে আমি একটা ন-গণ্য মানুষ মাত্র কিন্তু তোমাদের কাছে, তোমার পরিচিতদের কাছে—আমার পরিচয় স্বতন্ত্র। যাক সিদ্ধান্ত স্থির হয়েছে—এতেই আমি আনন্দিত। কি জানো, এতদিন মনে হচ্ছে বৃথা বেঁচেছি, আজ এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে—জাতির জাগরণের এই শুভক্ষণে যদি বিদায় নেওয়ার জন্যে তৈরী হতে পারি তা' হলে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হ'বে—বলেই সে উদাত্ত স্বরে বলল—'জয় হিন্দ'।

প্রমীলাও উত্তর দিল—জয় হিন্দ্।

সকালে বিমল তার জ্যেষ্ঠপুত্রকে অভিবাদন জানাল—জয় হিন্দ্।

পুত্র অবাক্ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যভিবাদন জানাল—জয় হিন্দ্।

বিমল তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে, মুখে কিছুই বলে না। প্রমীলার সকাল থেকেই মুখ ভার। কিছুতেই অশ্রু আর বেগ মানতে চাইছে না—দুর্ব্বল নারী, হৃদয়াবেগই তাকে চালনা করে—যুক্তিতর্কের কিছু বোঝে না। কেন যে সে বিমলের মধ্যে সুপ্ত সিংহকে জাগিয়ে তুলল? এ যে তার পক্ষে চরম সর্ব্বনাশ। বিমলকে সে জানে—তাকে সহজে টলানো যায় না, কিন্তু একবার যদি কিছু স্থির করে বসে, তা' হ'তে তাকে টলানো অসম্ভব। প্রমীলা বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করে রাখল—সে কিছুতেই তার দুর্ব্বলতা ধরা দিবে না।

আজ বাইশে নভেম্বর—অন্যান্যদিনের মত আজও খাওয়া দাওয়া সেরে বিমল অফিসের পোষাক পরে রওনা হ'ল।

অফিসে গিয়ে ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল—বিপুল শোভাযাত্রা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে আসছে। এস্‌প্লানেডে পুলিশের বিরাট ব্যূহ—শোভাযাত্রীরা ধর্ম্মতলার গির্জ্জার কাছে সমবেত—তারা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে—পুলিশ লাঠি ও গুলি চালিয়ে তাদের প্রতিরোধ করছে।

বেলা এগারটার সময় বিমল দেখল একদল কলেজের ছাত্রী এবং ছাত্র চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে এস্‌প্লানেডের দিকে আসছে—তাদের 'জয় হিন্দ' ও বন্দে মাতরমের শব্দে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠছে। তার অফিসের সাহেবরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা লক্ষ্য করছিল—ছাত্র-ছাত্রী তাদের লক্ষ্য ক'রে উদাত্ত স্বরে বলছে—Britishers quit India ভয়-সঙ্কোচহীন নির্ভীক তরুণ-তরুণী এগিয়ে চলেছে। হটাৎ একটা ছোট মোটর গাড়ী তাদের মধ্যে এসে পড়ল—গাড়ী থেকে নামল তিনটি তরুণী—মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—তাজা রক্ত তখনও চুইয়ে চুইয়ে ঝরছে—তাদের মধ্যে একজন জাতীয় পতাকা নিয়ে অগ্রসর হ'ল।

বিমলের চেতনার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। এ এক ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান—এ অভ্যুত্থানে কেউ স্থির থাকতে পারে না। পিস্তলধারী ব্রিটিশ M. P. এল—শোভাযাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করল—কিন্তু পুরোভাগে অবস্থিতা পতাকাবাহিনী রক্তাপ্লুতা বীরাঙ্গণাদের কাছে তাদের পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হল হয় তো!

বিমল দেখল—আর সময় নষ্ট করা চলে না—এই জাতীয় আহবে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার, আজ এস্‌প্লানেডের ওই শোণিতসিক্ত পবিত্র মুক্তিযজ্ঞ-ভূমিতে সেও দাঁড়াবে—তার পাপপূর্ণ জীবন আজ রক্তস্নানে ধন্য হোক। কোন কথা না বলে সে সকলের অজ্ঞাতসারে রাস্তায় নামল—অতিকষ্টে সে ধর্ম্মতলায় অবস্থিত শোভাযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হ'ল।

বেলা ১২টা হ'তে ৩টা পর্য্যন্ত এক মহান্ এবং বিরাট দৃশ্য এসপ্লানেডের মোড়ে দেখা গেল। লাঠি ও বুলেট সমানে চলেছে; বিমলের চোখের সামনে কত মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ মৃত্যুকে সহাস্যে আলিঙ্গন করল—আর স্থির থাকতে পারে না বিমল, ওর শিরায় উপশিরায় উত্তেজনার আগুন বইতে থাকে। সে আজ জীবন-মৃত্যুর মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছে, একটা বুলেট ঠিক ওর পাস দিয়ে চলে যায়—বিমলের গায়ে লাগে না। কিন্তু বিমল আজ বেপরোয়া, তার সকল পাপের বোঝার ভারমুক্ত আজ তাকে হ'তেই হ'বে—মাথা উঁচু করে নির্ভীক পদক্ষেপে এগিয়ে চলে বিমল—

এমন সময় হঠাৎ এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে গেল। পুলিশ তাদের ব্যূহ সরিয়ে নিল—আর বিজয়োল্লাসে শোভাযাত্রীরা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনি করতে করতে এসপ্লানেডের দিকে অগ্রসর হ'ল, কেউ বাধা দিল না। বিমল দেখল প্রায় দেড় হ'তে দু-লক্ষ লোক সেই শোভাযাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছে, ওরা এগিয়ে চলল 'ডালহৌসী স্কোয়ার' ওদের গন্তব্য স্থান।

বিমল আর অফিসে ফিরল না—সোজা হাওড়া ষ্টেশনের দিকে হেঁটে গেল। আজ বিজয়-অভিযানের অপূর্ব্ব আনন্দে তার মন ভরপুর। কিন্তু একটা খোচা থেকে গেল যে, এই জাতীয় আহ্বানে সাড়া দিয়ে বুলেটের মুখে দাঁড়িয়ে তার পাপপূর্ণ জীবনের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারল না।

বাড়ী যখন ফিরল আনন্দের বেগ তখনও তার মনে ছিল। বিমলকে দেখেই প্রমীলার ইচ্ছা হচ্ছিল—যেন দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে—কিন্তু নিজেকে সামলিয়ে নিল। ক্লান্তস্বরে বিমল বলল—'প্রমীলা, আমি এমন পাপী যে, পুলিশের গুলিও আমার গায়ে বিঁধল না—লাগলে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যেত। কিন্তু তা হয় নি। যাই হোক, জানলে আমাদের জয়—ডাল হৌসী স্কোয়ার পর্য্যন্ত শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে আমরা পেরেছি; সে যে কি দৃশ্য তা জীবনেও ভুলব না। আজ যে অননুভূত আনন্দের স্বাদ পেয়েছি—জীবনে আর কোনদিন পাব বলে মনে হয় না।'

তারপর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটন শুনে প্রমীলা দৃপ্তস্বরে বলল—তোমার গায়ে বুলেট লাগেনি বলে দুঃখ করো না, কিন্তু তোমার সাহস এবং মনুষ্যত্ব আজ তোমাকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। আমার পরম ভাগ্য যে, ঠাকুরের দয়ায় তোমার মত স্বামী পেয়েছি।

জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বিমল বললে—আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি—কালকেই চাকরিতে ইস্তফা দেব—দেশীয় কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি জোগাড় করবো। বাড়ীতে একটা আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহায্যকেন্দ্র খোলা যাক—নিজেদের আরও বঞ্চিত ক'রে প্রত্যেক মাসে আজাদ ফৌজ সাহায্যভাণ্ডারে টাকা পাঠানো চাই। এ ছাড়া উপস্থিত আমার কোন কর্ত্তব্য নেই।

পরদিন চৌরঙ্গী-স্কোয়ারের সেই মিলিটারী অফিসের সমস্ত লোকে অবাক্ হয়ে শুনল যে, বিমল চৌধুরী তার ১৮ বছরের পাকা চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছে, কারণ কিছুই দেখায় নি।

শ্রীক্ষেত্রের ইতিবৃত্ত

শ্রীবিষ্ণুপদ কর

ভারতবর্ষের মধ্যে যতগুলি তীর্থক্ষেত্র আছে তন্মধ্যে পুরীর শ্রীক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতম, পুরাণে পুরুষোত্তমক্ষেত্রের মাহাত্ম্য যেরূপ লিখিত আছে, অন্য কোন তীর্থের মাহাত্ম্য সেরূপ ভাবে নাই। জীবের ভববন্ধন বিমোচনের জন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্র অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র নাই। কেননা, শ্রীক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান্ দারুময় রূপ ধারণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। এইজন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্রকে ভূস্বর্গ বলা হইয়া থাকে। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের অপর একটি নাম দশাবতারক্ষেত্র। এই নাম হইবার তাৎপর্য্য এই যে, এইস্থানেই ভগবান্ পর্য্যায়ক্রমে দশবিধ অবতার হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে লীলা করিয়াছিলেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গ যে কোন জীব হউক না কেন এখানে মৃত্যু হইলে তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

"উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥"

উৎকলে ভগবতীর নাভি পতিত হয়। ইহাকে বিরজাক্ষেত্র বলে। এখানে বিমলাদেবী ও জগন্নাথ নামে ভৈরব আছেন।

বিরাজ মণ্ডল হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের আয়তন দশ যোজন। ইহা চারি মণ্ডলে বিভক্ত। নীলাচলের সহিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে পাঁচ ক্রোশ শঙ্খমণ্ডল। মহানদীতীরস্থ ভুবনেশ্বর চক্রমণ্ডল। বৈতরণী তীরবর্ত্তী যাজপুর গদামণ্ডল। চন্দ্রভাগা নদীতীরবর্ত্তী অর্কক্ষেত্র পদ্মমণ্ডল।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কঠোর তপস্যা দ্বারা সপ্তকল্প পরিমিত পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য যখন মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীবজন্তু বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। যখন পৃথিবী জলমগ্ন হইল, তখন তিনি অতি ক্লিষ্ট হইযা নিখিল জলরাশির অচ্যুত উর্ম্মিমালা সহ ভাসিতে ভাসিতে শ্রীক্ষেত্র-সন্নিকটবর্ত্তী হইলে নীলপর্ব্বতোপরি অক্ষয়বট তাঁহার নেত্রগোচর হইল। তিনি আশ্রয়লাভের আশায় আশান্বিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কেনই বা এই বটবৃক্ষ সমুদ্রে নিমগ্ন হয় নাই, এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, —এমন সময়ে সেই নির্জ্জনতা ভগ্ন করিয়া এক বালক-কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি সবিস্ময়ে শুনিলেন বৃক্ষোপরি হইতে কে যেন বলিতেছে— হে মার্কণ্ডেয়! শোক করিও না, আমার নিকট আসিয়া তোমার ক্লেশাপনয়ন কর। ক্ষণকাল পরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্বর শ্রুত হইল, তখন তিনি বৃক্ষসন্নিকটে অধিকতর অগ্রসর

জগন্নাথদেবের মন্দির

হইলে তন্মূলদেশে ভগবানের নীলেন্দ্রিয় মণিময় নীলমাধব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও বহু স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান কহিলেন, বৎস, বৃক্ষোপরি যে সর্ব্বকালাত্মা বালকমূর্ত্তি শায়িত আছেন তুমি তাঁহার বদনযোগে উদরমধ্যে গমন করিয়া তথায় অবস্থান কর। মার্কণ্ডেয় ইহাতে অধিকতর চমৎকৃত ও কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া বৃক্ষোপরি আরোহণপূর্ব্বক পত্রসম্পুটস্থ এক অতি সুন্দর বালকমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহার উদরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর তথায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-দেব-দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, জীব জন্তু, পর্ব্বত, পাহাড়, সরিৎ-সিন্ধু, বৃক্ষলতা প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন। বহুকাল মার্কণ্ডেয় বালকের উদরমধ্যে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলেন কিন্তু কিছুতেই কুক্ষি-সীমা প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে উদর হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক ভগবানের আদেশ মতে তথায় চিরকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এখানে মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর নামে একটি সরোবর আছে। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভগবান কর্ত্তৃক তীর্থ নির্ম্মাণে আদিষ্ট হইয়া অক্ষয়বটের বায়ুকোণে সুদর্শনচক্র দ্বারা এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে এই সরোবরে বহু লোক স্নান করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার পরম ভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন এক সময়ে এক পরিব্রাজক-প্রমুখাৎ নীলাচলস্থিত অক্ষয়বটমূলে ভগবান নীলমাধবের স্থিতি-সন্দেশ-শ্রবণে শ্রীক্ষেত্র সন্দর্শনার্থ স্বীয় পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে সানুচর তথায় প্রেরণ করেন। তিনি বাসু নামক এক শবর-কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার যত্নে ও কৌশলে বহুক্লেশে নীলমাধব দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলে, মহারাজ স্বীয় পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অমাত্য-পারিষদ, প্রজাবর্গ ও সৈন্যসামন্তসমভিব্যাহারে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া চিরজীবন তথায় বাস করিবার জন্য

যাত্রা করিলেন। নারদও তাঁহাদের সাহায্যার্থে গমন করিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক আম্রকাননে ভুবনেশ্বর মহাদেব ও কপোতেশ্বর মহাদেব দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বর মহাদেবের নিকট শিবির সংস্থাপন করিলেন; এমন সময় তাঁহার বামাঙ্গ বারংবার স্পন্দিত হইতে দেখিয়া, বিপদাশঙ্কায় ভীত হইয়া নারদকে তদ্বিষয় জানাইলেন। নারদ কহিলেন, সকল শুভকার্য্যই বাধাবিঘ্ন-পরিপূর্ণ। আমাদের এই সদনুষ্ঠানেও বিষম বিঘ্ন ঘটিয়াছে, যেদিন বিদ্যাপতি ভগবান্ নীলমাধব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করেন, সেই দিবাশেষে প্রবল ঝটিকাযোগে সমুদ্রের বালুকারাশি দ্বারা নীলাচল আবৃত ও নীলমাধব প্রোথিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন, সুতরাং আপনার অদৃষ্টে তাঁহার দর্শন লাভ হইল না। মহারাজ নারদমুখে এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। মহর্ষি নারদ বহু যত্নে ইন্দ্রদ্যুম্নের চৈতন্য সম্পাদনানন্তর নানা প্রকার সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতে দিতে কহিলেন, যদিও আপনি নীলমাধবমূর্ত্তি দর্শন করিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার দারুময় চারি মূর্ত্তি দর্শনে আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এক্ষণে সেই বিশ্বপতির প্রীত্যর্থে সহস্র

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি-মন্দির

অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, যজ্ঞ সমাপনান্তে আপনি সফল-মনোরথ হইবেন।

মহারাজ ইন্দ্রাদি দেবগণ সাহায্যে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইহা সহস্র বৎসর ধরিয়া মহাসমারোহে সমাধা হইয়াছিল। একদিন কতিপয় লোক মহারাজ সমীপে নিবেদন করিল যে, সমুদ্রেরতটে একটি অদ্ভুত বৃক্ষ দেখা গিয়াছে, উহার অগ্রভাগ সমুদ্র জলে নিহিত, কিন্তু মূলদেশ স্নানগৃহ সন্নিকটে আসিয়াছে, উহা কৃষ্ণবর্ণ ও শঙ্খচক্রাদি-চিহ্নে চিহ্নিত, ইহার তেজ ও সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত ও আনন্দিত হইয়াছে।

মহারাজ এতচ্ছ্রবণে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া দেবর্ষি নারদকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রতীরে গমন করিলেন এবং দারুব্রহ্মের পূজা করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন কিরূপে বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে।

এমন সময় এক আকাশবাণী হইল, "ভগবান নিজেই আপনার প্রতিমূর্ত্তির বিষয় বিচার করিয়া আবির্ভূত হইবেন।"

পরে বৃদ্ধ পুরুষের রূপধারী নারায়ণ আগমন করিয়া মহারাজকে কহিলেন; আপনি স্বপ্নে যে সকল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, আমি সেই দিব্যরূপ দারুদ্বারা তাঁহার নির্ম্মাণ করিব।

পরে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, রত্নময় বেদীর উপর জগন্নাথ, বলরাম, মধ্যে সুভদ্রা ও বামপার্শ্বে সুদর্শন চক্র এই চারি মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। জগন্নাথদেবকে নীলবর্ণে, বলরামকে শুভ্রবর্ণে ও সুভদ্রা দেবীকে কুঙ্কুম বর্ণে রঞ্জিত ও পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইল।

উৎকলের রাজা গজপতি বংশীয় অনঙ্গ ভীম দেবের অধিকার কালে ১১১৯ শকাব্দে জগন্নাথ দেবের প্রধান দেউল নির্ম্মিত হয়। এই দেউল নির্ম্মাণে ৩০।৪০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। শিখসম্রাট্ রণজিৎ সিং মন্দিরে "কোহিনুর" দিয়াছিলেন। ইহার মূল্য ৩৫০০০০০০ তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই কোহিনুর এক্ষণে বিলাতে রাজার নিকট আছে। মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল দেশবাসীদিগের স্থপতিবিদ্যার পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক।

জগন্নাথদেবের সর্ব্বপ্রধান মন্দিরের শুণ্ডভাগ ১৯২ ফিট উচ্চ। ইহা বিষ্ণুচক্র ও ধ্বজা দ্বারা শোভিত। পরমহংস বাজপেয়ী সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। এখানে ১২০টি মন্দির আছে।

অনঙ্গভীমদেব শ্রীক্ষেত্রে বহুসংখ্যক দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরমধ্যে ১২০ জন নর্ত্তকী আছেন। ইহারা ভোগের সময় কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীমন্দির সমুদ্র হইতে এক মাইল দূরস্থ নীলাচলে অবস্থিত। মন্দিরের চারি দ্বার। পূর্ব্বে—প্রধান বা

সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ

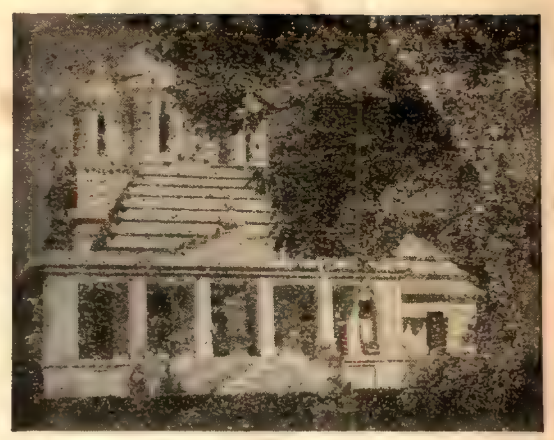

প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি-মন্দির

সিংহদ্বার। পশ্চিমে—খাণ্ডাদ্বার। উত্তরে—হস্তীদ্বার। দক্ষিণে—অশ্বদ্বার।

মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত দ্বাবিংশ হস্ত উচ্চ একটি স্তম্ভ আছে। ইহাকে অরুণস্তম্ভ বলা হয়। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরকে মেঘনাদ কহে। মেঘনাদ ২৪ ফিট উচ্চ, ২২ ফিট প্রস্থ। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ৬৬৬ ফিট ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৬৮৭ ফিট।

মন্দির ৪ ভাগে বিভক্ত:—মূল মন্দির, নাট্যমন্দির, ভোগ মন্দির ও জগমোহন।

রথযাত্রার সময় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা প্রত্যেকের জন্য তিনটি রথ প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। রথ ৩১ ফুট প্রস্থ ও ৪৮ ফুট উচ্চ, ৭ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ১৬ খানি চাকা আছে। ৪২০০ লোক কর্ত্তৃক রাজার উপস্থিতিতে রথ টানা হয়। রথ উপলক্ষে ১৫ দিনের মেলা হয় ও প্রায় দশলক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়।

মূল মন্দিরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে নরেন্দ্র সরোবর বা চন্দনপুকুর নামে একটি সরোবর আছে, এই সরোবর মধ্যে মন্দিরের মহাপ্রভুর চন্দনযাত্রা, বৈশাখ—অক্ষয় তৃতীয়াতে হইয়া থাকে। এই নরেন্দ্র সরোবরের পার্শ্বেই প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি-মন্দির এবং তাহার পার্শ্বেই ৺কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমাধি-মন্দির অবস্থিত। এই দুইটি মন্দির এতই নয়নমুগ্ধকর, এতই স্নিগ্ধ ও পবিত্র এবং নানারূপ ফুল-ফলে শোভিত যে, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

পুরীতে সমুদ্রের দৃশ্য একটি দেখিবার জিনিষ। ইহা সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তকালে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সমুদ্রের তরঙ্গে বহুলোক স্নান-সুখানুভব করিয়া থাকেন। এবং প্রাতঃকালে ও বৈকালে সমুদ্র তীরে বালুকারাশির উপর দিয়া মুক্ত বায়ু সেবন করিয়া থাকেন। আজকাল সমুদ্রের ধারে বহু সুন্দর সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখানে বাস করিবার বিশেষ কিছুই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সব সামগ্রীই অল্প-বিস্তর পাওয়া যায়।

মোটের উপর একাধারে শ্রীক্ষেত্র একটি মহাতীর্থ ও ভ্রমণ ও উপভোগের স্থান, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

সৌখীন

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার ঘোষ

মূল একদিন বিকচ ফুলেরে
কহিল দারুণ রোষে,
"তুমি সৌখীন সবার উপরে
মহাসুখে আছ ব'সে।"
ফুল কেঁদে কয়, "তাই বুঝি হায়
সব আগে যাব খ'সে।"

বেগার মাই নেবার

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

পাঁচ

(যতদিন বাংলায় ছিলাম ততদিন ছদ্মনামের প্রয়োজন ছিল, বাংলা থেকে বিদায় নিয়ে ও নামের বালাই আর রাখব না। এবার থেকে তাই ছদ্মনামের ওপর স্ব-নামের বোঝা চাপানই সাব্যস্ত করলাম !)

(৪) ব্রিটিশ রাজত্ব কি ভারতবর্ষকে সুখী করতে পেরেছে ?

ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারী ছাড়া অন্য কোন ভারতবাসীই শোধ হয় এ কথা বলবেন না। তাহ'লেও, মূল প্রশ্ন আলোচনা করবার আগে "সুখী" বলতে কি বোঝায় তা জানা প্রয়োজন। তোমরা কুবেরের পূজারী। তোমাদের সুখ সম্পূর্ণ জাগতীক—তোমাদের সুখ মানে অর্থ, অর্থ মানে সুখ ! তোমাদের মতে সেই দেশ সব চেয়ে বড় যার সীমানা সব চেয়ে সুদূর-প্রসারী—যেখানে ব্যবসার মূলধন সব চেয়ে বেশী, যেখানে প্রচুর রাস্তা, রেলপথ, রেডিও—অর্থ যেখানে অজস্র, অট্টালিকা গগনস্পর্শী, আকাশে বাতাসে যেখানে জাগতীক আনন্দের জোয়ার বইছে ! আমাদের ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত—সে কথা আলোচনা করবার আগে তোমাদের 'সুখের' মাপকাটিতে ভারতবর্ষে তোমাদের মহৎ কাজের হিসেব করা যাক। তোমরা আমাদের "দিয়েছ" রেডিও, রেলপথ, রাস্তা, টেলিফোন—হয়ত' আমরা নিজেরা যেটুকু করতে পারতাম তার চেয়ে তাড়াতাড়ি এবং অনেক বেশী, কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা চলে যে তাতে ইংরেজ বাণীয়ারাই লাভবান হয়েছে বেশী ? প্রয়োজন হ'লে সিনেমার মতন এ সব জিনিষও কি আমরা গড়ে নিতে পারতাম না ? এখন জটিল প্রশ্ন হ'ল, এ সব পেয়েও কি আমরা সুখী ? য়ুরোপের দিকে দৃকপাত করলে আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাবি যে তারা টেলিফোন রেডিও প্রভৃতি পেয়ে সত্যিই কি সুখী ? অবশ্য এটা ঠিক যে আজকাল বন্যায় সাহায্য পেতে সময় লাগেনা, দুর্ভিক্ষের দুর্ভাগ্য থেকে সহজেই পরিত্রাণ মেলে, ডাক্তার তাড়াতাড়ি মেলে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ওপর অল্প সময়ের মধ্যে যবনিকা পড়ে—কিন্তু, যদি বলি যে খাদ্যদ্রব্য চালান দেওয়া সহজ হ'য়েছে বলে, দুর্ভিক্ষ হ'তে সময় লাগেনা, যানবাহনের সুযোগ সুবিধায় রোগের প্রাদুর্ভাব, স্থানীয় হাঙ্গামা বাতাসে ভেসে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পরে অল্প সময়ের মধ্যে—তা'হলে সেটা কি নিতান্তই বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ ? তোমরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছ, অর্থাৎ ভারতীয় ট্যাক্সের টাকায় লর্ড ম্যাকাউলের মতানুযায়ী আমাদের মানুষ করছ। তাঁর মতে আমাদের উচিত ইংরেজি শেখা এবং আরও উচিত তা ইংরেজিতে শেখা। কাজেই, পরিত্রাণ নেই শিখতেই হয়—যদি কোন রকমে এড়িয়ে গিয়ে কোন জাতীয় অনুষ্ঠানে আসন-পিঁড়ি হ'য়ে বসে নিজের ভাষায় নিজেদের ইতিহাস শিখি, যেমন দিল্লীতে ডক্টর জাকীর হোসেনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, সরকার অমনি সে শিক্ষাকে অস্বীকার ক'রে আমাদের ফেলেন অনাহারের বিপাকে—অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করা শক্ত হ'য়ে ওঠে। বাধ্য হ'য়ে সব ছেড়ে আমরা ছুটি সেক্সপীয়ারের নাটকে অভিনয় করতে—মনে মনে অনুভব করি অবাস্তবতা, প্রত্যক্ষ ভাবে সহজ করি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অপমৃত্যু !

তারপর বড় গলায় তোমরা বল "দিয়েছ" আমাদের আইন, শৃঙ্খলা ও একতা। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংগ্রাম করাকে আমরা করি ঘৃণা ! বেনভেন্থটো সেলিনির আত্মজীবনী পড়ে যখন দেখি যে সম্পূর্ণ আইন ও শৃঙ্খলাবিহীন দেশে তিনি জীবনকে কতখানি উপভোগ করে গেছেন, তখন অবাক হ'য়ে ভাবি তোমাদের দেওয়া আইন ও শৃঙ্খলা জীবনকে তার চেয়ে কতটুকু বেশী সুখ ও শান্তি দিতে পেরেছে ? জার্ম্মাণী যদি তোমাদের আইন শৃঙ্খলা ও একতা নিয়ন্ত্রিত করত' তাহ'লে কেমন লাগত তোমাদের ? স্বীকার করবে নিশ্চয় আইন ও শৃঙ্খলার সুনিয়ন্ত্রণে জার্ম্মানী তোমাদের চেয়ে সুনিপুণ ! তাছাড়া তোমাদের ভারতীয় সি আই ডি আর গেষ্টাপোর মধ্যে প্রভেদ কি খুব বেশী ? তারপর তোমাদের দান 'একতা' ভুললে চলবেনা ! তোমরা আমাদের দিয়েছ একটি ভাষা—যা আমাদের মধ্যে অল্প লোকই বোঝে ! (তোমরা বল' Dye ken John Peel, কিম্বা Auld Long Syne—কি বুঝি আমরা ! Loaf ভারতবর্ষে আমরা ব্যবহার করিনা তবু তোমরা বলবে 'Half a loaf is better than no bread !) অথচ, যদি সুযোগ দাও তাহ'লে এই ভাষায় চালাতে হবে আমাদের রাজকার্য্যের গুরু দায়িত্ব ! এখনও কি প্রশ্ন করবে আমরা সুখী কি না ? তাহ'লে আমি প্রশ্ন করব, যদি য়ুরোপে, এবং বৃটেনেও সব কিছু কাজ চালাতে হয় জার্ম্মান ভাষায় তাহ'লে তোমরা কি সুখী হ'তে ?

(৫) নির্ব্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলী কি সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে ভারতবর্ষ শাসন করতে পারবে ?

বলব' 'হ্যাঁ, কিন্তু অস্বীকার করব না প্রশ্নের জটিলতা ! তোমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শাসনপদ্ধতি ভারতবর্ষে অচল। আমি যদি বলতাম সমস্ত য়ুরোপকে একীভূত ক'রে জার্ম্মাণীকে স্থায়ী গুরু দায়িত্ব দেওয়া উচিত, কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহ'লে তোমরা অসন্তুষ্ট হ'তে ! অথচ, তোমরা ভারতবর্ষকে ঠিক সেই করতে চাইছ। এটা গণতান্ত্রিকতার দোষ নয়, দোষ হল, বিভিন্ন জাতী ধর্ম্ম পূর্ণ দেশে তাকে প্রচলিত করার প্রচেষ্টা ! এটা যেমন তোমরা সমষ্টিভূত য়ুরোপে প্রচলিত করতে পারো না, তেমনি পারো না ভারতবর্ষে ! অস্বীকার করব না এই ব্যাপারে আমাদের ভারতবাসীদের মধ্যে মতদ্বৈত আছে। হিন্দুরা, যারা যুদ্ধ ও সংগ্রাম পছন্দ করে না, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে এমন একটা শাসন পদ্ধতি চায় যাতে স্থায়ী আধিপত্য থাকবে (কিম্বা, সাধারণ ভাবে বলা চলে, যাতে চাকরির সুবিধে আছে !) : আবার, এই ধরণের শাসন পদ্ধতির প্রচলন হ'লে মুসলীম সংস্কৃতি, সাহিত্য ও অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পড়বে, এ আশঙ্কাও

অবাস্তব নয়। অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ও অল্প বিস্তর এই আশঙ্কাই পোষণ করে। যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলি শাসনভার পরিচালনা করেছিল, সে দেশে সাধারণতঃ লোকের ধারণা,—ধারণার বেশী আর কিছু আমি বলব' না—যে হিন্দুরাই অধিকাংশ চাকরী পায়, এবং হিন্দু সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এ বিষয়ে দুটো কথা বলা চলে: প্রথমতঃ কবে কোন্ শাসনতন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে? দ্বিতীয়তঃ, একান্নবর্ত্তী পরিবার নিয়ে হয় আমাদের সমস্যা-ব্যাপারটা, স্পষ্ট ক'রে আলোচনা করা প্রয়োজন; আমাদের দেশে অসংখ্য বেকার আছে কিন্তু বেকার ভাতা নেই; কাজেই এ বিষয়ে আমাদের নিজেদেরই ব্যবস্থা করে নেওয়া প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। ধরুন এই রকম যদি হয়: একটি ছেলে স্কুলে লেখা পড়ায় ভাল, অতএব ভবিষ্যৎ তার উজ্জ্বল। পিতামাতার সামর্থ্য নেই, অতএব পরিবারবর্গের কাছ থেকে টাকা তোলা হল। কাকা, মাসী, পিসী, ভাই-পো, ভাগ্নে, বোন ভগ্নীপতী সকলের অর্থ সাহায্যে সে হয়ত' বিলেত গেল, Oxford-এ পড়ল, পাশ করল, ডিগ্রী পেল, হ'য়ে এল সিভিলিয়ান কিম্বা সরকারী মহলে বড় চাকুরে। সমাজে তার সম্মান, অর্থের স্বচ্ছলতা আর সরকারী মহলে তার প্রভূত প্রতিপত্তি। এবার পরিবারবর্গ চাইল তাদের অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে লভ্যাংশ—ফলে হয় সে তার সমস্ত বেকার পরিজনবর্গকে বাড়ীতে স্থান দিল, না হয় নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে দিল চাকরি: এখন ধরা যাক তার পাঁচটি সম্পর্ক-তুতো ভ্রাতা—যারা তার সঙ্গেই কেবল থাকে না, তার ওপর ভার দিয়ে চলে। এখন, তারা যদি দিনের পর দিন কেবল বলে অমুক চাকরি খালি, অমুক জায়গায় লোক নেওয়া হবে, তাহ'লে বিশেষ করে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দীদের চাইতে তারা নিতান্ত দুর্ব্বল না হয়, তা হ'লে সেই সব চাকরিতে তাদের বহাল করার প্রচেষ্টা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না; ইংরেজ নলে, অতএব তারা করাপ্ট (ইংল্যাণ্ডে কি যুক্তরাষ্ট্রে কি করাপ্সান্ একেবারেই নেই?)। একথা নিশ্চয় অস্বীকার করা চলে না যে, বেকার সমস্যা থাকলে এবং জীবন ধারণের অবস্থা নিম্নস্তরের হ'লে, চাকরি ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রতি হিন্দুদের এবং মুসলমানদের প্রতি মুসলমানদের পক্ষপাতিত্বের প্রবৃত্তি অসম্ভব অথবা অসাধারণ নয়, অতএব, কি হিন্দু কি মুসলমান, নিয়োগ কমিটি থাকা সত্ত্বেও যারা চাকরি দিতে সক্ষম হয়, তাদের প্রতি সন্দেহান্বিত হওয়া সহজ: আবার যারা চাকরি পায় না (মনে রাখা দরকার যে ভারতবর্ষে প্রত্যেক চাকরির জন্যে প্রায় এক হাজার আবেদন-পত্র আসে।) তারা নিজেদের অপটুতা অস্বীকার করে বিপক্ষ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকত্বের দোহাই দিয়ে। কাজেই, সহজেই বোঝা গেল যে, যে কোন সম্প্রদায়ের সরকারই হক না কেন, মুসলমান, হিন্দু, ক্রীশ্চিয়ান কিম্বা শিখ এবং তারা যাই করুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব এক স্বার্থপরতার হীনতা সহজেই আরোপিত হবে—ঠিক যেমন বলা যেতে পারে ইংল্যাণ্ডে কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে ধনী-সম্প্রদায়কে উৎপীড়ন এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে দরিদ্র-নিষ্পেষণের দোষারোপ করা হয়। তা' ছাড়া একথাও বিস্মৃত হ'লে চলবে না যে ভারতবর্ষে আমাদের শাসন করতে হয় য়ুরোপের মতন মহাদেশ, এবং আমাদের নির্ব্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলী শুধু বিনা অভিজ্ঞতাই নয়, তোমাদের দুশো বছরের কু-অভ্যাসের বোঝা মাথায় করে দেশ শাসনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওদিকে তোমরা দীর্ঘকাল ধরে তোমাদের মনের মতন এ খেলা খেলছ আর শাসন করছ একটা ছোট্ট প্রদেশ যেটা আমাদের মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ কি বাংলার চেয়ে বড় নয়। এ সব কথা বিচার করলে এ কথা অস্বীকার নিশ্চয় করবে না যে নির্ব্বাচিত ভারতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী বিনা অভিজ্ঞতায় ও সরকারী বহু বাধা-বিপত্তি এবং বাধ্য-বাধকতা সত্ত্বেও অর্দ্ধ নির্ব্বাচিত পরামর্শ সভার চাইতে অনেক ভালো ভাবে দায়িত্ব বহন করেন এবং উত্তরোত্তর উন্নতির পথে পা বাড়ান। পুনর্ব্বার নির্ব্বাচিত হ'লে তারা যে বর্ত্তমান প্রভুত্ববাদী নীতিতে প্রবর্ত্তিত শাসন-তন্ত্রের চাইতে আরও অনেক ভালো ভাবে কাজ করবেন এবং দেশের ও দশের অধিক পরিমাণে সহকারিতা ও সমর্থন দাবী করবেন এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। আপনি যদি বলেন যে তাঁরা স্ব-ইচ্ছায় অথবা কংগ্রেসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মীদের নির্দ্দেশে তাঁদের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেছেন তাহলে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কংগ্রেস-দাবী ও তার উত্তরে ভাইসরয়ের ঘোষণার প্রতি আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং আমি আপনাকে প্রশ্ন করব যে যদি আপনি এ ধরণের দাবী উত্থাপিত করতেন এবং তার এই উত্তর পেতেন তাহ'লে তারপরও কি আপনি রাজ্য শাসন চালিয়ে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করতেন?

৬। কংগ্রেসের চাইতে বড় ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষে কি আর আছে? এবং কংগ্রেস নেতাদের কারারুদ্ধ করা কি ভারতীয় জনমত-সমর্থিত? এবং কংগ্রেস কি মিলিত শক্তির সপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করতেন?

আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে, আমি আপনার প্রশ্নকে একটু পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত করেছি, কারণ আপনার প্রশ্ন ঠিক ন্যায়সঙ্গত ছিল না। কংগ্রেসের আয়তন, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা বিচার করতে গেলে আমাদের আগে বিচার করে দেখতে হবে যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যগুলিকে পৃথক করে। অতএব যুদ্ধকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে আমরা পিছিয়ে যাই ১৯৩৯ সালে। কংগ্রেস এগারটির মধ্যে সাতটি প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে জয়লাভ করে এবং প্রত্যেক প্রদেশের শাসন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহেরু স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ভারতের জীবন্ত প্রতীক। কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সহযোগিতায় তাঁরা ছিলেন ব্রিটিশ রাজত্বের বে-সরকারী বিরুদ্ধ দল। তাঁদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের নিয়মিত পরাজয়ের গ্লানি (পরাজয় সত্ত্বেও ভাইসরয়ের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতায় সংশোধিত—সেও তো বিড়ম্বনা) থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে, সরকারী, বাধ্য হয়ে ছোট ছোট দলকে, বিশেষ ক'রে মিঃ জিন্নার দলকে খোসামোদ করতে বাধ্য হ'ল। সরকারের

এই নীতিকে অনেকেই বলেন, বিভক্তি শাসন পদ্ধতি (Divide and rule)। ব্রিটিশ যে এত' নীচমনা, অন্ততঃ তখন ছিলেন, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের মতন, কিম্বা, বিপজ্জনক বাজী খাবার মতন, কিন্তু, ১৯৩১ সালের ব্রিটিশ জাতীয় সরকারের মতন এটা ছিল সাময়িক উদ্দেশ্য সাধন, কোন স্থিরীকৃত নীতি নয়। যদি ভারতীয় সরকার সাময়িক ব্যয় উপলক্ষে মোটর্‌কারের ওপর কর বাড়ানো প্রয়োজন মনে করে এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিবর্গ এই সাম্রাজ্যবাদী সাময়িক কর অনুমোদন না ক'রে থাকেন, যদি ঠিক এই সময় বড়লাট বাহাদুর নিজের সর্বতোমুখী এবং আইন লঙ্ঘনীয় ক্ষমতা একবার ইতিমধ্যে ব্যবহার করে থাকেন এবং পুনর্ব্বার ব্যবহার করা দৃষ্টিকটু মনে করেন এবং রাজনৈতিক নীতি অনুযায়ী মিঃ জিন্না ও তার দলের সরকারী কার্য্যকারিতার প্রতি সম্মতি ও অনুমোদন সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে—তা সে যেমন ক'রেই হ'ক—পরবর্ত্তী হাই কমিশনারের পদে মুসলমান নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েই হ'ক আর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অধিক সংখ্যক মুসলমান নিয়োগের প্রলোভন দিয়েই হোক, তা' হলে খুব দোষ দেওয়া চলে না। আমি অবশ্য কোন বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদাহরণ দিচ্ছি না, একটা অসম্ভব ঘটনার উল্লেখ করে বুঝাইতে চেষ্টা করেছি কেমন সহজ ভাবে এ হেন অচল অবস্থার গতি করা চলে। সে সময় এ কথা কেউ বলেনি যে, ভারতের জাতীয় আদর্শবাদে কংগ্রেস প্রাণ নয়, এবং সেই সময় কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন অথচ রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে দেশ-নেতা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ কংগ্রেস মনিষী গান্ধী অথবা নেহেরুর সমতুল্য তো দূরের কথা, এঁদের সঙ্গে তুলনা করা চলে, এমনও কেউ ছিল না! এই সময় কংগ্রেস, গভর্ণর, বড়লাট, রক্ষণনীতি অথবা ব্রিটিশ সামরিক শক্ত সত্ত্বেও প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে উঠছিল। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে কেউ অস্বীকার করবে কি-না যে মিলন-মন্ত্রে দীক্ষিত এবং সাম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত একমাত্র কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় ভারতীয় স্বায়ত্ত-শাসন লাভ সম্ভব হতে পারত?

এবার যুদ্ধ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য পরিস্থিতি জুড়ে দেওয়া যাক। যখন ভারতীয় স্বায়ত্ত শাসন, যাতে ব্রিটিশ রাজনীতি এবং জাতীয়তার সমস্ত অংশেই বিরাজমান (যদিও মনে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক রাজনিতিজ্ঞ তিলক গোখলে থেকে আরম্ভ ক'রে গান্ধী-নেহরু প্রভৃতির "পূর্ণ স্বরাজ")—সেই ভারতীয় স্বায়ত্ত-শাসন সম্মুখে—আমাদের আত্ম-মর্য্যাদার নতুন জাগরণ সম্মুখে তখন হঠাৎ পড়ল যবনিকা। যুদ্ধ—না আমি বিগত মহাযুদ্ধের কথা বলছি না, আমি বলছি, "ভারতের হ'য়ে বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ ঘোষণার কথা"—যে ঘোষণার আগে ভারতকে কোন আভাস দেওয়া হয়নি কিম্বা, কোনও একজন জাতীয় নেতার সঙ্গে আলোচনা অথবা পরামর্শও করা হয়নি। এতবড় একটা ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ নেওয়া যে প্রয়োজন, সে কথা কেউ মনেও করেনি—অথচ সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আমরাই হ'লাম শতকরা আশি ভাগ। এক মুহূর্ত্তে তাসের বাড়ীর মতন সব ভেঙে গেল: আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, প্রতিজ্ঞা সব মুহূর্ত্তে মুছে গেল। নিজেদের দাস ব'লে জানলাম, তোমাদের বন্দুকের বারুদ হিসেবে, তোমাদের চিনলাম, তোমাদের চিরপরিচিতরূপে—প্রভুত্বপরায়ণ শাসক রূপে। সে কত আঘাত তোমরা বুঝবে না, আজও বোঝনি, কারণ শাসিত হওয়া যে কি তা' তোমরা জানো না। উদাহরণ দেওয়া সহজ নয়, তবে হয়ত সেই ধরণের আঘাত তোমরা পাও, কন্জার্ভেটিভ যদি হিটলারের সঙ্গে তোমাদের হ'য়ে শান্তিস্থাপন ক'রে তোমাদের পরামর্শ না করে। শান্তির সর্ত্ত যতই ভালো হউক না কেন, তোমরা কেউ কেউ কি তা' অমান্য ক'রে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে না? আমাদেরও হ'ল তাই।

যে কংগ্রেস সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধ'রে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে এসেছে, সে যে সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করত' তাতে কি বিন্দুমাত্র সন্দেহ আছে? কালা আদমি বিদ্বেষী সামরিকতায় অন্ধ হিটলার, আফ্রিকায় ইতালীর চূড়ান্ত পাশবিকতা ভারতীয় মনের অন্ধ ঘৃণা ছাড়া আর কিছু কি পেত'? কিন্তু, আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়নি। আমরা ছিলাম দাস, বিক্রীত-মনুষ্যত্ব ভাড়া করা সৈনিক—তোমাদের সরকারী ইচ্ছা অনিচ্ছার খেলনা—এই ছিল আমাদের স্বায়ত্বশাসনের পরিণতি। ভারতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী কি এই সমস্ত নানান কারণে দায়িত্বভার প্রত্যাখ্যান করবার যথেষ্ট কারণ পান নি? তা সত্ত্বেও তাঁরা অপেক্ষা করেছিলেন, আশা করেছিলেন। তারপর ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) তাঁরা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কাছে সংযুক্তভাবে আবেদন পাঠালেন—যে আবেদনের ভাষা, আমার মনে হয় আপনাদের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের চাইতে কোন অংশে অযৌক্তিক নয়, অথচ সেই অনুপাতে উত্তরটি যুক্তিপূর্ণ অথবা ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল কি না তা আপনি বিচার করলেই বুঝতে পারবেন। বাধ্য হ'য়ে মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ম্মভার ত্যাগ করেন—আজ আপনারা আপনাদের কারাগারে তাঁদের বন্দী করে রেখেছেন, সঙ্গে রেখেছেন গান্ধীকে ও জওহরলালকে, যাঁরা ক্রীপস্ মিশনের বিফলতার পর ১৭ই জুন ঘোষণা করেছিলেন:—

"আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিষ্টনীতি বিশ্বের স্বাধীনতা ও শান্তির অন্তরায়। আমার দেশবাসীকে এ-বিষয়ে আমি বারবার সতর্ক করেছি। এদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতকে বাঁচাবার পথ থেকে স'রে এসে মহাত্মা গান্ধী যা বলেছেন তা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত অসাধারণ। তিনি ভারতবর্ষে বিদেশী সৈনিকের অবস্থানে স্বীকৃত হবেন যদি তারা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন ভারতের বন্ধু হিসেবে। ভারতের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পূর্ণভাবে ভারতের দায়িত্ব এবং স্বাধীন ভারত সে গুরুদায়িত্ব যথাসাধ্য বহন করবে এবং যারা এ-বিষয়ে ভারতবর্ষকে সাহায্য করবে তাদের সঙ্গে ভারত বন্ধুত্ব স্থাপন করবে।"

আমি আপনার দুটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে ইংরেজ হিসেবে আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি: আমাদের জাতীয় নেতাদের—এইসব সজ্জন মানবীদের কেন আপনারা কারারুদ্ধ করছেন?

এমনিভাবে ভারতবাসী উত্তর দেবে। সাধারণতঃ যে এমনি ধারা উত্তরই পাব' এমন কোন কথা নেই; অনেকে হয়ত' সম্পূর্ণ বিভিন্ন উত্তর দেবে। এ-কথাও আমি বলি না যে এই উত্তরগুলো সকলে স্বীকার করে নেবে। অনেকে হয়ত' এই উত্তরগুলোকে মোটে আমলই দেবে না। কিন্তু আমি যদি প্রতিপন্ন করতে পারি যে সব না হ'লেও এই সমস্ত উত্তরের কয়েকটিতে অধিকাংশ ভারতবাসীই বিশ্বাস করে, আমি যদি বিশ্বাস করাতে পারি যে, আপনাদের ধারণা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এই সব অনুভূতিগুলোও পাশাপাশি বিচার করা উচিত তাহ'লে আমার উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হবে। সফল হবে, কারণ গান্ধী কিম্বা নেহেরু, ক্রীপস্ মিশনের বিফলতা কিম্বা বর্ত্তমান অচল অবস্থাকে বুঝতে গেলে কেবল ঘটনা দিয়ে বুঝলে চলবে না, বুঝতে হবে অনুভূতি দিয়ে, বিচার করতে হবে বিশ্বাস দিয়ে। কোন কোন ভারতবাসী হয়ত' মনে করতে পারে ইংলণ্ড সুন্দর দেশ, ক্রীপস্ প্রস্তাব স্বীকার করা উচিত ছিল, অহিংসা নিরর্থক নীতি কিম্বা ভারতবর্ষের উচিত যুদ্ধে যোগদান করা—কিন্তু এর সমস্ত বিশ্বাসই এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হ'য়ে যেতে পারে যখন কোন গর্ব্বিত M.A. SMITH I.C.S সম্প্রাধিকারীর মতন ভারতবর্ষের বুকে পদচারণা করতে করতে উপদেশ দেন কেমন করে ভারতবর্ষ শাসন করতে হবে। পোল কিম্বা চেকো স্লাভের মতন ভারত-বাসীও ভাবতে পারে যে দেশে সহস্রাধিক লোককে গুলী ক'রে মারা হয়েছে, ষাট হাজার লোককে করা হয়েছে বন্দী, সে দেশ সম্পূর্ণ অধিকৃত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ—এবং তাহ'লে নির্দ্দয়তার অনুমান নিয়ে তর্ক করে আমাদের চলে না। ব্রিটিশ যুদ্ধ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্ব্বান্তঃকরণে একমত হয়েও যে মনে করতে পারে ব্রিটেনের ভারত অধিকার ও ভারত শাসন অগ্রানুবর্ত্তীতার পরাকাষ্ঠা ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। এবং এই ধরণের অনুভূতি ও ধারণার তুলনায় সংখ্যানৈতিক হেঁয়ালী কিম্বা ঘটনার তাৎপর্য্য—তা সে যতই ন্যায়, যুক্তিপূর্ণ অথবা তথ্যপূর্ণ হ'ক না কেন, একেবারেই অচল—সাহারা মরুভূমিতে মৃতপ্রায় লোকের কাছে লক্ষটাকার চেকের মতন।

[ক্রমশঃ]

কবিতা ষষ্টক

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

স্বভাব ও সংস্কার

রসালে নির্ম্মূল করি নিম্ববৃক্ষে ঢালো যদি জল
শর্করা নিষিক্ত করি সুস্বাদু কি হবে তবু ফল?

পরিচ্ছদ

পরিচ্ছদ প্রসাধণে আসে মনে সন্তোষ প্রসাদ
কু-বসনে অপ্রসন্ন সর্ব্বজনে রটে পরীবাদ।
পীতাম্বর নারায়ণে রত্নাকর করে কন্যা দান
ভস্মমাখা মহেশ্বর করে শেষে কালকূট পান।

বার্দ্ধক্য ও দারিদ্র্য

বার্দ্ধক্য দুঃখের নয়, দারিদ্র্যও হয় অনেকের—
চক্রবৎ জীবনের দৃশ্য পট পরিবর্ত্তণের
অঙ্কসন্নিবেশ মাত্র।
বার্দ্ধক্যে দারিদ্র্য যদি ঘটে
তাহ'লে জীবন-যাত্রা-পথে চলা সুদুর্ঘট বটে।

মেজাজ

তা'র সুখ স্বতঃসিদ্ধ সহজাত নিঃশ্বাসের মত
যাহার মেজাজ স্নিগ্ধ ভাগ্য মানে ভাগ্যে যাহা পায়
অনুযোগ অভিযোগ না করিয়া যে-জন নিয়ত
আপনার মেজাজেরে-রাজী-করে সর্ব্ব অবস্থায়।

স্বভাব

মন দিয়ে শোনে কথা তীক্ষ্ণ ধী'র প্রশ্ন করে পরে
সুধা স্নিগ্ধ সম্ভাষণ সাধু ভাষা শ্রবে সদুত্তরে,
চুপ করে সহজেই আপনার কথা হ'লে শেষ
তার গুণ অসামান্য স্বভাবে সে সবার সরেস।

স্বত্ব ও শক্তি
(Right Versus Might)

এক মুঠো শক্তি ভালো
এক ধামা দাবী দাওয়া হ'তে
সে যেন মাথার বোঝা!
তার চেয়ে লাঠি ভালো পথে।

অমৃতা

শ্রীনরঞ্জন রায়

—শ্যামলদা' তুমি চলে যাবে, আমার কি হবে? অমৃতার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল প'ড়ল।

শ্যামল বলিল, চোখের জল নিয়েই ঐ গাছের তলায় দাঁড়াও, তোমার ছবিটা তুলে নিই, তারপর বলছি।

ছবি উঠিয়া গেল। শ্যামল বলিল, বারোখানি প্লেট এনেছিলাম; এখানি নিয়ে তোমার এগারো খানি ছবি উঠলো। তুমি আমার মডেল্, জীবনে মডেল্, বাইরে মডেল। এই ছবির সঙ্গে তুমি আমার কাছে থাকবে।

চোখ মুছিতে মুছিতে অমৃতা হাসিয়া উঠিল। শ্যামল তাড়াতাড়ি ক্যামেরা খুলিয়া বলিল, ঠিক হবে এই শেষ ছবিখানা, ঠিক ঐ ভাবে দাঁড়াও ··ঐ রোদ বৃষ্টি · চোখের জলের সঙ্গে তোমার হাসিটি ধরে নিই।

কিশোরী অমৃতা তার চোখ মুছিতে গিয়া আবার হাসিল। ছবি উঠিয়া গেল আর্ট স্কুলের যশস্বী ছাত্র শ্যামলের যন্ত্রে - এক মুহূর্তে।

* * *

থক্-থক্-থক্···থক্-থক্-থক্—হাঁপানিতে মরণোন্মুখ অমৃতার পিতা। তাহার মা'ও এই রোগে মারা গিয়াছেন।

খলে ফেলিয়া একটা কি ঔষধ প্রস্তুত করিতেছে অমৃতা। তার বাবা শয্যাশায়ী হইয়াই ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী বলিয়া দিতেছেন কন্যাকে। তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর

তিনি বলিতেছেন—শেষ হোল না, আজ যে একাদশী তা জানো? · তৈরী হওয়া দেখে যেতে পারলাম না। তিনি আবার কাশিতে লাগিলেন।

অমৃতা। শিগ্‌গীর হবার নয়তো বাবা এ ওষুধ.. এতোগুলো বিষ আড়ানো, এতো মশলা—সহজ নয়।

অমৃতার পিতা বলিলেন, কার জন্য এ ওষুধ জানিস?

অমৃতা। কেন, তোমার।

তার পিতা ম্লান হাসির সঙ্গে বলিলেন, হাঁপেরই ওষুধ বটে। তবে আমার জন্যে নয়।

অমৃতা। তবে?

পিতা। তোর জন্যে। হাঁপে মারা গেছে তোর মা, তোর বাপও মরতে বসেছে সেই হাঁপে, তুইও যাতে না মরিস্ এই রোগে, তাই শিখিয়ে দিচ্ছিলাম তোকে এই বিষবড়ি তৈরি করতে। তুই হবি বিষকন্যা···মৌর্য্য ইতিহাসের সেই বিষকন্যা। অটুট স্বাস্থ্য সম্পদময় সেই বিষকন্যা। মাকে খেয়েছিস, বাপকে খাবি, কত লোককে খাবি - বিষাণী কি-না।

এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলিয়া তিনি দারুণ কাশিতে লাগিলেন—চোখ কপালে উঠিয়া গেল। অমৃতা বাপের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল। ইঙ্গিতে তিনি জানাইলেন, ঔষধটা তাঁর কাছে আনিতে। একটু ঔষধ নিয়া তিনি বটফলের আকারে একটি বড়ি পাকাইতে চেষ্টা করিলেন। অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন—মা-ত্রা—দু'বেলা দুধের স-ঙ্গে। আর কথা বাহির হইল না। অমৃতা চীৎকার করিয়া উঠিল।

*

শহরের বাজার, কতলোক আসিতেছে যাইতেছে। শ্যামবর্ণ একটি তরুণ কিশোর এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি মুটে? সে কোন কথা না বলিয়া ভদ্রলোকটির দিকে তাকাইয়া থাকিল। 'মিলিটারীতে কাজ গেছে অনেক ভদ্রঘরের ছেলের, তারা মুটে হয়েছে। তা' বেশ-বেশ, বেশী দূর নয়, চলো। বলিতে-বলিতে ভদ্রলোক তার ঘাড়ে একটা ঝুড়ি চাপাইয়া দিয়া সঙ্গে নিয়া চলিলেন।

খুব বেশি দূর যাইতে হইল না, তবুও কিশোরটির কপাল বহিয়া স্বেদবিন্দু ঝরিতেছে। জিনিষের ঝুড়িটি লইয়া বাবু উপরে চলিয়া গেলেন। কিশোরটি দরজার এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু পরে পোষাকপরি হিত বাবুটি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া ট্রামে উঠিলেন। কিশোরটি দাঁড়াইয়াই আছে। উপর হইতে নারীকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিল—কে রে ছোঁড়া তখন থেকে দাঁড়িয়ে? কিশোরটি ভয়-চকিত হইয়া উপরের দিকে তাকাইল। এবার আসিল তীব্র ভর্ৎসনা—দূর হ' এখান থেকে··· দূর হ'।

সম্মুখের ফুটপাতে একটি মোদকের দোকান। কিশোরটি ধীরে ধীরে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু পরে দোকানদার জিজ্ঞাসা করিল—কি চাই? ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কিশোরটির তালু শুকাইয়া গিয়াছে। তবুও তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—কাজ। দোকানদার তাকে ভিতরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। জিজ্ঞাসা করিল—কি জাত? সে বলিল—সৎজাত। দোকানদার যেন কিছুটা আনন্দিত হইয়া বলিল—বেশ-বেশ—একটা ছোঁড়া খুঁজছি কতদিন থেকে, আমার ছোঁড়াটা সেই যে যুদ্ধুতে গিছেক, আর লোকটি পাইনে, কিন্তু বাবু কাজতো জান না, এখন

শিক্ষেনবিশী করো; তোমার মতই ছোঁড়াটি খুঁজছিলাম। তা মাসে পাবেক তিনটি টাকা, আর হোটেলে খাবে আমার খরচে। ভিয়েন শিখবে আমার কাছটিতে বসে আর ফাঁকে ফাঁকে যায়ে খদ্দের সামলাবে। মোদ্দা চুরিটি কোরোনি, সেটি আগে কয়ে দিচ্ছি।

সমস্ত দিন এইভাবে যায়, রাত্রি বারোটার আগে বিশ্রাম মেলে না। প্রকাণ্ড কড়াই ভর্ত্তি দুধ জ্বাল দিতে হয় তাকে। একবাটি দুধ রাখিয়া দেয় বৃদ্ধ দোকানদারের জন্য, বাকী দুধটার ছানা কাটা হয়। এক দিন রাত্রে সে বলিল—একটুখানি দুধ ব'দ সে পায়, তার ওষুধ খাওয়া হয়। ছোট একটি মাটির ভাঁড়ে সে তার জন্যও একটু করিয়া দুধ পাইতেছে। বৃদ্ধ দোকানদার একদিন জিজ্ঞাসা করিল—কি ওষুধ খাও হে, মদক-টদক নেশাটি নয় তো? সে বলিল—না, এ বিষবড়ি। খাটের উপর শুইয়া বৃদ্ধ তার মান্ধাতা আমলের জীর্ণ ময়লা মশারীটি গুঁজিতেছিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, ওঠেক্-ওঠেক, কড়াই ছেড়ে, বিষ খায়, বেদে-টেদে কি জাত বটেক্, কোন দিন আমাকেই খাইয়ে দিবেক।—ওঠেক্-ওঠেক্।

কিশোরটিকে তাড়াইয়া দিয়া সজোরে দরজায় খিল্ দিল দোকানদার। ছানার উনানের আগুন নিবাইতে নিবাইতে সে বলিতেছে—জয় লক্ষ্মীনারায়ণ, জয় মা কালীঘাটের কালী, যুদ্ধের বাজারে চেনামুখ সব চলে গেছেক, এ কে রে বাবা, বিষ খায়ে হজমটি করছেক বটে।

কিশোরটি আবার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। পাশের বড়-বড় বাড়ি হইতে নাচগানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। জ্যোৎস্নাময় রাত্রি। উপর হইতে কে তাহাকে ডাকিল—ও ভাই দাঁড়িয়ে কেন, এসোনা ওপরে। কিশোরটি চাহিয়া দেখিল, একটি ত্রিতলের বারান্দা হইতে দুইটি সুবেশিনী রমণী তাহাকে ডাকিতেছে। অপরিচিতাদের দিকে সে চাহিয়া থাকিল, কি বলিবে কথা খুঁজিয়া পায় না। আবার আদর করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। সে উপরে উঠিতে পথ খুঁজিয়া পায় না। উপরে যখন গেল তখন সুবেশিনীগণ বলিল—চিনতে পেরেছি তুমি আমাদেরই একজন, নতুন এ প্রপ্তে পা দিয়েছ, দেশ কোথায়?

রমণীর ছদ্মবেশ ধরা পড়িয়া গেল রমণীর কাছে।

*

তরুণ চিত্রশিল্পী হিসাবে শ্যামল বসুর নাম আজ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁর বারোখানি তৈলচিত্র প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ উপহার পাইল। শহরের প্রধান ছায়াচিত্রের ষ্টুডিওর সহিত তিনি একটি ছবি তুলিবার কাজে চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন—কাগজে কাগজে ইহা সাড়ম্বরে জানানো হইল।

*

কিশোরী রমণীর রূপশ্রী দেখিয়া তার আশ্রয়দাত্রী রমণীরা একদিন বলিল—আমাদের সঙ্গেই কাজ করো, ছবির কাজ, নাচগান তারাই শিখিয়ে নেবে, ভাল কাজই পাবে তুমি।—তা তোমার নামটি কি বলনা সত্যি করে?

—বিষকন্যা বলে বাবা আমায় ডাকতেন।

—ও নাম ছবিঘরে চলবে না ভাই।

—তবে আপনারাই আমার নাম দিন্।

—না, তুমিই বলো তোমার কি নাম হবে।

—বেশ, আজ থেকে আমি হ'লাম বিষাণী।

তার রূপ দেখিয়া কাজ দিতে বিলম্ব করিল না সিনেমার বড়কর্ত্তা। কিন্তু আরম্ভ করিল একেবারে চিত্রলেখার অজস্র-প্রসাধন-বাহিনী করিয়া। তাহার মধুরভঙ্গিমা ও সাবলীল প্রকাশ-নৈপুণ্য তাহাকে প্রজোযকের দৃষ্টিপথে আনিয়া ফেলিল। পরবর্ত্তী চিত্রে তাহাকে শ্রেষ্ঠাংশে তালিম দেওয়া হইতে লাগিল। অশোক বনে সীতা চোখের জলে সিক্ত হইয়াও কিরূপ আত্মসম্ভ্রমশীলা, চেড়ীগণও শ্রদ্ধানত হইতেছে। তাহার অভিনয়ের শালীনতা ও সরসতা সকলকে মুগ্ধ করিতেছে। যে পরিমাণে বাহিরে তার নাম বাহির হইতেছে, সেই পরিমাণে তার আশ্রয়দাত্রীরা ঈর্ষ্যাকাতর হইতেছে। কিন্তু পীড়ন করিবার দোষ খুঁজিয়া পায় না। তাহার গোপন করিবার কিছুই যে নাই, অতি অকপট—অতি সরল সে।

কিন্তু সে একটা জিনিষ গোপন করিত। আঘাত খাইয়াই মানুষের কপটতা আসে, সরল সত্যকেও সে গোপন করে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই গোপন করিবার কোন কারণ থাকে না—তথাপি গোপন করাটা তার অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়। যে অভ্যাস সন্দেহ সৃষ্টি করে, সে অন্যায় করিতেছে বলিয়া সন্দেহ সৃষ্টি করে, স্বচ্ছন্দচারিণী তার বন্ধুগণের সন্দেহ হইল সে নিত্য দুইবেলা দুধ দিয়া গোপনে কি খায়? কোন নেশার জিনিষ নিশ্চয় নয়, তারা তাহা বোঝে। তবে কি?

একদিন তাহারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল—ভাই, গোপনে-গোপনে কি অমৃত তুমি খাও আমাদের লুকিয়ে?

সে হাসিয়া বলিল—ভাই অমৃতই খাই, খাই বিষ, বিষবড়ি খাই, তাইতো আমার বিষের ভয়ে কেউ আমার কাছে আসে না।

আতঙ্কিতা হইয়া পিছাইয়া গেল বিলাসিনীর দল।

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—বিষাণী-বিষাণী, সত্যিই

বিষাণী, সাপুড়েদের মেয়ে। গুণ জানে, গুণ জানে, এই গুণেই হাত করেছে যত বাবুদের!

এইরূপে সে এই পরিচিত আশ্রয় হইতেও বিতাড়িত হইল।

সে আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময়ে একখানি মোটর হইতে নামিলেন একটি বাবু। খোদ সিনেমার সত্ত্বাধিকারী। তিনি বলিলেন—আপনি বোধ-হয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন, আমি তো দরোয়ান দিয়ে খবর দিয়েছি, দুপুরের পরই আপনাকে একবার ষ্টুডিওতে যেতে হবে। ওঃ যে জায়গায় থাকেন, আপনি আজই বাড়ি বদলান, আপনার মর্য্যাদামতো আমি সাজানো বাড়ি আপনাকে দিচ্ছি।

উপর হইতে তার আশ্রয়দাত্রীরা বলিতে লাগিল—নিজে বাবু এসে তুলে নিয়ে গেল, কি গুণিন্ লো কি গুণিন্! আগে থেকে সব সড় ছিলো, সব সড় ছিলো, মানময়ী মানকলি কোরে চলে গেলেন।

যাইতে যাইতে সত্ত্বাধিকারী বলিতে লাগিলেন—ছবি নেবার সময় আপনি একটু অস্বাভাবিক রকম চঞ্চল হয়ে উঠছেন, ফটোআর্টিষ্ট বাবু এই নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, তিনিই এই শহরের মধ্যে উদীয়মান তরুণ আর্টিষ্ট। অনেক খরচ কোরে ছবিখানি তুলছি। আপনাকে মাইকের কাছে একটু সামলে নিতে হবে।

সে মনে-মনে ভাবিতেছে সত্যই সে আলোকচিত্র গৃহীতার কাছে চঞ্চল হইয়া ওঠে, যেন তার পরিচিত মুখ তাকে সে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারে না। কে সে? চার বৎসর দেশ ছাড়িয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ পরিবেশের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা কি সে চাহিয়াছিল?

ষ্টুডিওতে বৈকাল বেলা দাসী আসিয়া তাকে এক পেয়ালা গরম দুধ দিয়া গেল। কয়দিন হইতে রোজই সে এই সময়ে ষ্টুডিওর গাড়িতে করিয়া এখানে আসে। নিকটেই সুন্দর একটি বাড়ি পাইয়াছে। সে তার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া একটি রূপার কৌটা বাহির করিল। তাহার ভিতর হইতে একটি বড় বড়ি সে খাইল। তার পর দুধটুকু খাইতেছে, এমন সময় আলোকচিত্রগ্রহণকারী তার ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। তখনো তার দুধটুকু খাওয়া শেষ হয় নাই। ভদ্রলোকটি কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—ওঃ! অভিনেত্রী বলিল—আসুন, নমস্কার—আমাকে বোধ হয় কিছু বলবেন—না? ভদ্রলোকটি বলিল—আর গোপন রাখা চলে না, গোপন রাখতে গিয়ে তোমার ছবিখানা খারাপ হতে চলেছে। তোমার সন্দেহ ঠিক—আমি শ্যামল, আর তুমি···।

অভিনেত্রীর হাত কাঁপিতেছে, পেয়ালাটি বুঝি পড়িয়া যায়। শ্যামল গিয়া তার হাতখানি চাপিয়া ধরিল। বলিল—কি খাচ্ছিলে?

অমৃতা। বিষ।

শ্যামল। বিষ? তুমি রোজই বিষ খাও।

অমৃতা। হাঁ, বাবা দিয়ে গেছেন এই বিষবড়ি, তাই আমার দেহে দিচ্ছে কমনীয়তা, মনে দিচ্ছে শক্তি। কিন্তু ফুরিয়ে এলো আমার এই অমৃতের বড়ি শ্যামলদা'।

শ্যামল। এই ছবিটা নেওয়া শেষ হয়ে যাক, এই বিষবড়ির সঙ্গে সঙ্গে, ততোদিন তুমি বিষাণী, তারপর—

এমন সময়ে প্রযোজক সেখানে আসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—এইবার আপনাকে তৈরি হ'তে হবে মিস্ বিষাণী, দুবার ঘণ্টা পড়ে গেছে, ফটো আর্টিষ্টমশাই এতক্ষণ আপনাকে আলোকচিত্র সম্বন্ধে সব উপদেশই দিয়েছেন বোধহয়।

শ্যামল এই ইঙ্গিতে কিছু লজ্জিত হইল। সে যে অনেকক্ষণ আসিয়াছে, ছবি তোলার পর্ব্ব চলিয়াছে, এখন তো গোপনে গল্প করিবার সময় নয়! যাইবার সময় সে শুধু বলিয়া গেল—চুক্তি করে' বাঁধা পড়ে আছি তুমি আমি দুজনেই এই ছবিটার জন্যে, কি করবো আইনে বাধা!

ইহার পর আলোকচিত্র লইবার সময় আর কাঁপে নাই অমৃতা। কিন্তু সে ও শ্যামল এই ছবির পরই ষ্টুডিওর সম্পর্ক ত্যাগ করিল।

*

রূপময় ষ্টুডিও খুলিয়াছে—মালিক শ্যামল বসু ও অমৃতা দেবী।

প্রথম নাটক 'বিষকন্যা'তে নাম ভূমিকায় অমৃতা দেবী চিত্ররসিকগণকে অভিবাদন করিবেন। রসিকমহল সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে রূপালী পর্দায় এই শিল্পী-যুগলের আত্মকাহিনী দেখিতে। সেই অমৃতার ফটো লওয়া হইতে মৃত্যুশয্যায় তার পিতাকর্ত্তৃক বিষবড়ি প্রস্তুত করিবার শিক্ষাদান, পিতার মৃত্যুর পর এই চারবৎসরকাল বিষাণী ছদ্মনাম লইয়া অমৃতার আত্মমর্য্যাদা রক্ষা, অমৃতার সেই বারোখানি ছবির তৈলচিত্র প্রকাশ করিবা শ্যামলের চিত্রবিদ্যার খ্যাতি লাভ, শেষ আশ্চর্য্যজনকভাবে উভয়ের ষ্টুডিওতে সাক্ষাৎ ও মিলন—সব কিছু বিষকন্যার চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। গ্রহণ শক্তির গুণে অমৃতা ইহার পূর্ব্বেই একজন শ্রেষ্ঠ তারকা বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে সে এই চিত্রে।

চিত্রনাট্যের শেষ কথা, শ্যামল বলিতেছে—আজ থেকে তুমি আর বিষকন্যা নও, তুমি অমৃতা।

হঠাৎ দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইল। গাঢ় নীলাভ রঙে আকাশ প্রান্তর ঢাকিয়া গিয়াছে, উচ্চশীর্ষ পাহাড়তলে সমুদ্র, সমুদ্র সৈকতে দাঁড়াইয়া আছে শ্যামল ও অমৃতা। সমুদ্র ভেদ করিয়া অমৃতভাণ্ড হস্তে গাহিতে গাহিতে উঠিতেছেন একজন ঋত্বিক—

জীবন—এই তো জীবন—
মরণ-সিন্ধু মথিয়া উঠিল অমৃতভাণ্ড যেমন।
ফণিনীর বিষে হয় যে-বা মৃত্যু—
সেই বিষ তারে করে যে জর্জ্জরিত,
বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয় করে যেই লভে সে
সত্য জীবন—সত্য জীবন—সত্য জীবন।

গায়কের মোহময় সুরঝঙ্কারে আকাশ-বাতাসে যেন জীবনের রণন্ উঠিয়াছে।

সমুদ্র সৈকতে শ্যামল ও অমৃতা নত হইয়া প্রণাম করিল ঐ সত্যজীবনের উদ্গাতার উদ্দেশে।

মানুষের অবতরণ

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

আর্য-গোষ্ঠীর ভাষার মনুষ্য বাচক "মেনস্; মেনোস্, মনুঃ (—মনুস্), মৈনু" প্রভৃতি শব্দ ইজিপ্টিয় "মেনুস" শব্দের সহিত সম্পৃক্ত। এখন এই "মেনুস" শব্দও আদরা original কিনা—প্রশ্ন হইতে পারে। কিন্তু সে প্রশ্নের যে উত্তর নাই তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ধরা যাক্ উক্ত প্রাচীনতম ইজিপ্টিয় "মেনুষ "শব্দ আর্ণশব্দ (loan word)-হিসাবে ইন্দো-য়ুরোপীয় প্রাক্তন-জন সমাজে গৃহিত হইয়াছিল। পরে একই কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন দিকে ঐ একই শব্দ বিকৃত হইতে-হইতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে আর্য্য-ভারতীয় পুরাণকারেরা বলিয়া থাকেন যে মনু হইতে মানুষের জন্ম হইয়াছে। উপরন্তু মনু নাকি সূর্য্যের পুত্র। বৈবস্বত, সাবর্ণি করিয়া মনু সর্ব্ব-সমেত আটজন। এতদ্ব্যতীত "মন্বন্তর" বলিয়াও একটি শব্দ প্রচলিত আছে। তাহার অর্থ—শাসন-বদল, কি, অরাজকতা। সূর্য্য হইতে মনুর অবতরণ ও মানব বংশের প্রসার প্রাচীন ইজিপ্টের কথাই মনে করাইয়া দেয়, যেখানে সূর্য্য হইতে মানবের উদ্ভব হয় বলিয়া ধারণা প্রচলিত ছিল এবং সূর্য্য-পূজা খুব বেশী মাত্রায় প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু, আটজন মনুর নামই সূর্য্যের বিভিন্ন নামের সহিত সম্পৃক্ত। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যগণের "মনু" শব্দটি বিশেষ সন্দেহ যোগ্য।

ইহুদী পুরাণে বলে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ আপনার আত্মরূপে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অস্ট্রিক উপকথাও কিম্বদন্তী অনুযায়ী বহুসংখ্যক বীজ সম্পন্ন লাউ হইতে এককালে বহু মানুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন অনার্য্য জাতি ও উপজাতির মধ্যে আরও কত বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদ যে প্রচলিত আছে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না।

কিন্তু এ সব ত' গেল কল্পলোকের গল্পকথা, আসলে কি হইয়াছিল তাহাই বলি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ ও চিকিৎসা-বিদ্যার্থীগণ—নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া human anatomy বা নরাস্থি বিদ্যার গবেষণা করিতে সুরু করেন। নরকল্প বানরের (anthropoid apes), যেমন বেবুন, শিম্পাঞ্জী, ওরাং-উটান ও গরিলার অস্থির সহিত মানুষের অস্থির সমধিক মাত্রায় মিল দেখিয়া তাঁহারা Comparative Anatomy বা তুলনামূলক অস্থিবিদ্যার প্রবর্ত্তন করিলেন। দৈহিক নৃতত্ত্ব বা Physical Anthropology পঠন ও পাঠনের পক্ষে ইহা কাজে লাগিয়া গেল। সেই হইতে বিজ্ঞান সম্মত নৃ তত্ত্ব চর্চ্চার সূত্রপাত হইল।

এখানে মোটামুটি-ভাবে মানুষের ও লাঙ্গুলহীন বানরের অস্থিগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কথা বলিয়া রাখি। উভয়েরই মেরুদণ্ড আছে; কুড়িটি অঙ্গুলি সমেত হাত ও পা আছে, বক্ষ-পঞ্জর আছে, নাকও আছে। অবশ্য, এই-সকল অংশের অস্থি-খণ্ড সংখ্যায় পার্থক্য

১ মনুর অপত্যার্থক—(বিশেষণীয়রূপ) "মানব"। অল্প বয়স্ক বুঝাইতে "মানবক" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২ ইহুদীদের প্রথম মানুষ "আদম" সং আদমের তুল্য ও প্রথম মানবী "ইভ" সং উভার তুল্যরূপ। হয়ত, অতি প্রাচীনকালে শব্দ দুইটি আর্য্য জন সমাজে আর্ণ শব্দ রূপে গৃহীত হইয়াছিল। সং 'ঈশ" শব্দও অনেকে বলেন, একটি হিব্রু আর্ণ শব্দ।

আছে। আবার তারতম্যও আছে। যেমন, মানুষের নাসাস্থি বানরের চেয়ে ঈষদুন্নত। বানরের বক্ষ মানুষের বক্ষ অপেক্ষা বড়। বানরের জ্রর অস্থি মানুষের চেয়ে উন্নত (profonding)। আবার, বানরের পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি মানুষের চেয়ে ছোট বা অন্য প্রকার। মানুষের স্কন্ধ আছে, বানরের তাহা নাই। এতদ্ব্যতীত মানুষের মাথার অস্থি পূর্ত্তি (Cranial developement) বানরের চেয়ে ঢের উন্নত ও লক্ষণীয়।

এখন, এই লাঙ্গুলহীন বানর-গোষ্ঠির সহিত মানুষের কাঠামোর (Skeleton) এত বেশী মিল থাকায় তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিকদের মনে ধারণা হইল যে মানুষ বানর হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। যদিও এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তথাপি, বহুকাল যথেষ্ট প্রমাণের অভাব বশতঃ মানুষ ও বানরের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রমাণিত হইতে পায় নাই। যাঁহারা বানরকেই মানুষের প্রজনয়িতা বা Progenitor বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন Lamark, Zeremy Darwin, Emest Haeckel তাঁহাদের অন্যতম। ইহারই অল্পকাল পরে Theory of Evolution বা বিবর্ত্তনবাদের ছায়াপাত হইতে থাকে।

বাস্তবিকই তখনকার দিনে বিজ্ঞানীদের চক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ ও পরিচয়ের অভাবে এমন কতকগুলি জটিল সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছিল যে বিবর্ত্তনবাদের প্রত্যাবহন ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা। কেহ কেহ তখনকার দিনে এই মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছিলনা বটে, এবং পরবর্ত্তীকালেও পারে নাই, কিন্তু সত্যকে না মানিলে সত্য যেমন তার অশ্রদ্ধাকারীকে ফেলিয়া যায় তাঁহাদের দুর্দ্দশাও তদ্রূপ হইয়াছিল। বিবর্ত্তনবাদ এমনি একটি জিনিস, যেখানে philosophy of life has been wedded to modern science [—আধুনিক বিজ্ঞানগুলির সহিত জীবন-দর্শনের খাপ খাওয়ান হইয়াছে।]

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শেষভাগের মধ্যে কয়েকজন খাঁটি Natural philosophers (প্রাকৃতিক দর্শনবিৎ) দেখা দিলেন, যেমন, Sir Charls Lyel; St. Hillaire; charls Darwin, Thomas Huxley ইঁহাদের মধ্য হইতে Charls Darwin (Zeremy Darwin এর সন্তান), অকাট্য প্রমাণ ও অনুমান সহযোগে বিবর্ত্তনবাদকে স্থায়ীরূপ দিলেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত Natural selection (যাহা Herbert Spencer-এর পরিকল্পিত আখ্যা অনুযায়ী "Survival of the fittest"; Correlation of growth; acclimatization; struggle for existence; hybridism প্রভৃতি প্রাণিজগতের বিধি-বিধানগুলি একান্ত উপযোগী ও অকাট্য। ওদিকে, আবার মূলতঃ heredity [উত্তরাধিকারিত্ব] বিষয়বস্তু লইয়া Mendel সাহেবের গবেষণা মোটামুটি ভাবে নৃ-তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানকে অনেকটা আগাইয়া দিল।

Darwin ও Mendel এর মতবাদের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ যথেষ্ট থাকিলেও, উভয়ের মতবাদের সঙ্কলনে, যেমন, heredity and environment পুরা-জীব তাত্ত্বিক জ্ঞান বা নৃ-তাত্ত্বিক জ্ঞান যথার্থভাবে পরিপুষ্ট হইবার অবকাশ লাভ করিল। "Origin of species" ও "Descent of man in relation to his other sex" গ্রন্থের গ্রন্থকার Darwin-এর মতে মানুষের অবতরণ হইয়াছিল Catarhynian বা Platyrhinian বানর গোষ্ঠী হইতে এবং মনুষ্য বিবর্ত্তনের ক্ষেত্র খুব সম্ভবতঃ আফ্রিকা মহাদেশ। Mendel-এর মতে চতুর্থ হৈম যুগেই মানুষের অবতরণ ঘটিয়া থাকিতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই সব মতবাদ যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, এমন নহে।

বর্ত্তমানে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে এই সকল ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। common stock এর ধারণা লইয়া গবেষণারত Davidson, Black, Charls Dawson; Osborn, Woodward Smith; George Elliot Smith প্রমুখ বিজ্ঞানীদের খনন ও অনুসন্ধানের ফলে যে সকল প্রমাণ উদ্ভূত হইল, তাহার দ্বারা ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, বানর হইতে মানুষ উদ্ভূত হয় নাই; পরন্তু গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটান প্রভৃতি কপি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞাতি। যে-সমগুণ ও বৈশিষ্ট্য যুক্ত কাঠামো হইতে মানুষের ও কপির বিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছিল, বহু স্থান হইতে সেই কাঠামো বা কঙ্কাল খননের ফলে উদ্ভূত হইল। স্থানের নাম ও অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া কঙ্কালগুলির ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, যেমন, Dryopithecus; Priopithecas; Propliopithecus; Semnopithecus; Cercopithecus; Macacus; Palocopithecus; anthropopithecus; Sivapithecus; Australopithecus ইত্যাদি। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থার প্রমাণ স্বরূপ, একদিকে—Taungs ape ও অন্যদিকে—জাভার Pithecan thropus Erectus বা homo Dawtonii; চীনের Sinanthropus ও ইংলণ্ডের Piltdown man। ইহাদের অস্থি বিশেষ ও কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। তাহার পরবর্ত্তী যুগের প্রমাণ স্বরূপ Wiirtemburg, Swanscombe ও Maner গ্রাম হইতে মানুষের অস্থি-চিহ্ন উদ্ভূত হইল। তাহার পর—Heidelberg ও Rhodesia হইতে মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেল। ক্রমশঃ দেখা যাইতে লাগিল যে, ভূ-স্তরের পার্থক্য অনুযায়ী ওই সকল

মনুষ্য-কঙ্কালের মধ্যে দাঁতের, চিবুকের, হাত ও পায়ের অঙ্গুলির ও করোটির উন্নতি-পরিচায়ক পরিবর্তন ঘটিতেছে। মোটামুটিভাবে এবম্বিধ-লক্ষণীয় যে পরিবর্তনগুলি ঘটিতেছিল, সেগুলি এই যে, (১) brain—এর neo-pallium অংশ বাড়িতেছিল ও old-pallium অংশ কমিতেছিল, ফলে Association area বৃদ্ধি পাইতেছিল; (২) দৃষ্টি ক্রমশঃ binocular vition হইতে monocular ও stereoscopic vition-এ পরিবর্তিত হইতেছিল; (৩) Brow-ridges লুপ্ত হইতেছিল; (৪) চিবুক ও চোয়ালের পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক হিসাবে Thalmus-এর protrut on; (৫) Canine tooth বা শ্ব-দন্তের পরিবর্তন; (৬) করোটির ক্রম-গোলত্ব; (৭) হাত ও পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপযোগী রূপে ক্রমবিকাশ; (৮) কথন-শক্তি; (৯) মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া হাঁটিবার শক্তি ইত্যাদি।

Heidelberg ও Rhodesian প্রাপ্ত প্রমাণের পরবর্তী প্রমাণ হইল Neamdorthal ও cromagnon মানুষের কঙ্কাল। ইহার পর Neo-Anthropic যুগের সূচনা হয়। এই সময়ে মানুষ-গোষ্ঠী humanoild-ape বা man-ape রূপ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া একটি বিশিষ্ট (specialised) রূপ প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, এইখানে আসিয়াই Paloes-Anthropologyর বা Physical Anthropologyর সমূহ গবেষণার সমাধি হইল।

মানুষ ও কপির Common Atockএর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন এতক্ষণে সহজ হইলেও ওই Common Atockএর অবতরণ কোন প্রাচীন স্তন্যপায়ী কুল হইতে ঘটিয়াছিল তাহা জানা গেল না।

মাত্র সম্প্রতি পুরা জীবতত্ত্ববিদেরা (Paloeoutlogists) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, humanoid-ape বা old World-ape সেই Old world tailed-monkey কুল হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, যেমন tailed monkey, tarsoid animal বংশ হইতে এবং tarsoid animals, tree-shrew বা tarsius হইতে ও tarsius বা tree-shrew যেমন Jumping-shrew হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। সুতরাং মানুষের বংশ-লতিকা অনেকট এই-রকম দাঁড়ায়:—

ওরাঙ্-উটান, শিম্পাঞ্জী, গরিলা, বেবুন	আধুনিক বিভিন্ন নৃ-জাতি
HOLOCENE	(১১) Neo-anthropic peoples
	(১০) Cro magnon ও Neandarthal men
	(৯) Heidelberg ও Rhodesian men
	(৮) Würtenborg, Swanscombe ও Maner men
Taungs-ape PLEISTOCENE	(৭) Primitive men, যথা, Eoanthropus; Sinanthropus ও Pithecanthropus
	(৬) Ape man বা বানরকল্প নর।
PLIOCENE	(৫) নরকল্প বানর বা ground apes বা Humanoid apes
	(৪) Old world tailed-monkeys বা সলাঙ্গুল বানর।
MIOCENE	(৩) Tarsoid animals বা Tarsiusএর পূর্ব্ব পুরুষ।
OLIGOCENE	(২) তরুচর বা tree-shrew
	(১)

প্রথম স্তন্যপায়ী Jumping-shrew.

নবযুগ আসে বড় দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না, যদি এর প্রয়োজন না থাকত। অসহ্য বেদনায় আমাদের প্রায়শ্চিত্ত চলচে, এখনও তার শেষ হয় নি। কোনো বাহ্য পদ্ধতিতে পরের কাছে ভিক্ষা ক'রে আমরা স্বাধীনতা পাব না, কোনো সত্যকেই এমন করে পাওয়া যায় না। মানবের যা সত্য বস্তু সেই প্রেমকে আমরা যদি অন্তরে জাগরুক করিতে পারি তবেই আমরা সব দিকে সার্থক হব। প্রেম থেকে যেখানে ভ্রষ্ট হই সেখানেই অশুচিতা; কেননা, সেখান থেকে আমাদের দেবতার তিরোধান। আমাদের শাস্ত্রেও বলছেন, যদি সত্যকে চাও তবে অন্যের মধ্যে নিজেকে স্বীকার কর। সেই সত্যেই পুণ্য এবং সেই সত্যের সাহায্যেই পরাধীনতার বন্ধনও ছিন্ন হবে। মানুষের সম্বন্ধে হৃদয়ের যে সঙ্কোচ তার চেয়ে কঠোর বন্ধন আর নেই।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ

অবতার-তত্ত্ব

অন্ধকার যুগ

শ্রীভুবনমোহন দাশ, কবিশেখর

সৃষ্টির সে আদি তত্ত্ব—
    জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাণী,
অকৃতী কেমনে দিবে
    খনি হ'তে মণি আনি।

অজ্ঞানান্ধ আঁখি খুলে
    জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায়
দিব্য-দৃষ্টি দাও গুরো,
    সে অসাধ্য সাধনায়।

ভরসা ও পদ করি
    হইয়াছি অগ্রসর,
"অবতার-তত্ত্ব" গানে
    কণ্ঠে মোর কর ভর।

সৃষ্টির আদিতে ব্যোম
    নাহি ছিল কিছু আর,
শূন্য—মহাশূন্য শুধু
    নিরাকার—নিরাকার॥

রাজত্ব করিতেছিল
    অন্ধকার ব্যাপি তায়,
একমেব অদ্বিতীয়
    সূচীভেদ্য তমিস্রায়*।

নাহি ছিল চন্দ্র-সূর্য্য—
    না হইত নিশি দিন,
ছিল না পৃথিবী-চিহ্ন
    জলের না ছিল চিন্।

সে ব্যোমে জন্মিয়া পরে
    মাতঙ্গ প্রভঞ্জন
ভীষণ ঝটিকা তুলি
    আঁধারকে দিত রণ॥

শূন্যে—স্তম্ভে—মহাশূন্যে
    সে শব্দ মিশিয়ে যেত
আঁধার রাক্ষস যেন
    মুখ মেলি সব খেত।

কল্পনারো নাহি ছিল
    সেই দেশে অধিকার,
অঙ্কন করিতে দিতে
    তদানীন্তন অবস্থার।

উনপঞ্চাশৎ বায়ু
    বহিত উন্মত্ত ভাবে,
উদ্দণ্ড নৃত্যেতে তার
    ব্যোম পূর্ণ হোতে রাবে,—

ওম্ ওম্ নাদ ব্যোমে
    কেবল উঠিতেছিল,
শব্দবাহী বায়ু তাহা
    আকাশ ভরিয়া দিল।

তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিদের
    'শব্দ-ব্রহ্ম' হ'তে জ্ঞান,
যে আদ্য প্রণব-বীজে
    ঈশ্বরে দেখিতে পান।

অহঙ্কার হ'তে ব্যোম
    আদিতে জনম নিয়া,
ভেদাভেদ-বিবর্জ্জিত
    নিরাকারে ডুবে গিয়া।

তাই আদি 'শব্দ-ব্রহ্ম'
    ব্রহ্ম হ'ন নিরাকার;
†অব্যক্ত—অব্যয়—চিৎ
    গুণাতীত নির্ব্বিকার।

শব্দ গুণ ব্যোমে পেয়ে,
    স্পর্শ পেয়ে বিধাতার,
পরশ-মণিকে ছুঁয়ে
    ‡জগৎপ্রাণও নির্ব্বিকার।

ওম্ বম্ একই বীজ
    নাদে দুই স্বপ্রকাশ,
বম্ বম্ গানে তাই
    মত্ত সদা কৃত্তিবাস§।

জগৎ প্রাণ—মহাপ্রাণ
    হ'য়ে ব্যোমে স্বপ্রকাশ,
কেমনে সৃজিল বিশ্ব
    ঋষি দিলা যে আভাষ,—

সে আকাশ-তত্ত্ব-কথা
    আধুনিক এ বিজ্ঞান,
এখনো পারে নি তার
    করিবারে সমাধান।

---

* তম আসীৎ তমসা গূঢ়-মগ্রে। শ্রুতি।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ মনু

সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্তই নিবিড় অন্ধকারময় ছিল। তখনকার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার মত ছিল না। সে অবস্থা কোন লক্ষণার দ্বারা অনুমেয় নহে। তখন এই বিশ্ব-সংসার তর্ক এবং জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল।

‡ জগৎ প্রাণ—বায়ু। মহাপ্রাণ—বায়ু।

† অব্যক্ত—যাহা কোন কার্য্যব্যতীত কিছুতেই ব্যক্ত হয় না।

§ কৃত্তিবাস—দেবাদিদেব মহাদেব। মহাদেব ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করায় তাঁহার এক নাম কৃত্তিবাস।

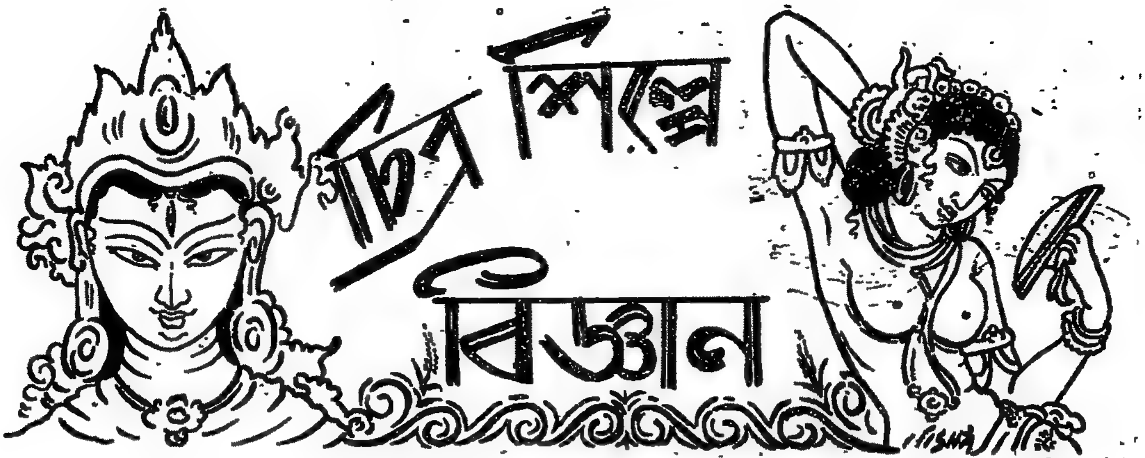

চিত্রশিল্পে বিজ্ঞান

শ্রীনিশানাথ মজুমদার

অনেকের হয়ত' এইরূপ একটা ধারণা আছে যে, শিল্পসৃষ্টির মধ্যে শিল্পীর মনের ভাব ও ভাষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই মাত্র প্রয়োজন; কোনওরূপ বাঁধাধরা নিয়ম বা বিজ্ঞানের আবশ্যক নাই। চিত্রাঙ্কনের সহায়তার জন্য এইরূপ ধারণা ভ্রান্ত। অবশ্য কোন কোন রীতির শিল্পরচনায় হয়ত বাঁধাধরা রীতি-নীতির প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে বটে কিন্তু মাত্র দু একটি প্রথা বাদ দিলে অন্যান্য সকল ভঙ্গির চিত্রেই বিজ্ঞান ও নিয়মমাফিক চলার প্রয়োজন আছেই।

শুক্রনীতিসার, বৃহৎসংহিতা ও বরাহমিহির গ্রন্থে শিল্পের শাস্ত্র বা বিজ্ঞান-সম্পর্কে আলোচনা আছে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও চিত্রের বিভিন্ন রূপভেদের বিচার আছে, যথা—

"রূপভেদ"প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রষড়ঙ্গকম্।

বাৎস্যায়ন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই শ্লোক রচনা করেন। ঠিক সমসাময়িক যুগেই চীন দেশে 'সী—হো' নামক একজন শিল্পবিদ্ পণ্ডিত ব্যক্তি চিত্র অঙ্কনের মূল সূত্র হিসাবে ঠিক একই প্রকারের ছয়টি পদ্ধতির নির্দেশ করিয়া যান। ভারতের সহিত চীনের এই মত-সাদৃশ্য তৎকালে ভারত ও চীনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার ফলপ্রসূ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, চিত্রাঙ্কনের মূলসূত্র স্বরূপ নিম্নলিখিত ছয়টি অঙ্গকে আমরা যথাক্রমে পাইলাম—

১। রূপভেদ, ২। প্রমাণ, ৩। ভাব, ৪। লাবণ্য, ৫। সাদৃশ্য ৬। বর্ণিকাভঙ্গ। বহুপূর্ব্বকালে নগ্নজিৎ নামে জনৈক বিখ্যাত শিল্পী চিত্রলক্ষণম্ ও প্রতিমালক্ষণম্ কিরূপ হইবে—তাহার নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রতিমালক্ষণে প্রতিমা ভঙ্গির ব্যঞ্জনা ভেদে বিভিন্ন লক্ষণ, প্রকাশ ও মূর্ত্তির প্রতিকল্পবিচার হইয়া থাকে। যেমন বিষ্ণুমূর্ত্তি, বুদ্ধমূর্ত্তি ইত্যাদি সমভঙ্গ রীতিতেই অঙ্কন করা বিধেয়। সমভঙ্গ মানে সোজা দাঁড়ানো বা সোজা বসিয়া থাকা রীতি; Symmetrical বা Rigidform.

ভঙ্গ বা Pose চারি প্রকার, যথা—

১। সমভঙ্গ, ২। আভঙ্গ বা দ্বিভঙ্গ, ৩। ত্রিভঙ্গ, ৪। অতিভঙ্গ

সমভঙ্গ লক্ষণের পর দ্বিতীয় প্রকার রীতিতে অর্থাৎ দ্বিভঙ্গ বা আভঙ্গ চিত্রে বা মূর্ত্তিতে প্রতিমা ধনুষাকৃতি হইয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ মাধুর্য্যরস বা করুণরসজ্ঞাপক মূর্ত্তির জন্য পরিকল্পিত; যেমন পূজারিণী, ভিখারিণী ইত্যাদি। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দেবীকল্পনায় মাথা বাম দিকে হেলানো এবং দেব বা পুরুষ মূর্ত্তির কল্পনায় মাথা ডানদিকে হেলানো হইবে। এইরূপ মূর্ত্তিও মাধুর্য্য এবং করুণরসের জ্ঞাপনা করিয়া থাকে, যেমন বৃন্দাবনের মদনমোহন কৃষ্ণমূর্ত্তি ইত্যাদি। ত্রিভঙ্গের পরে আরও একটি অতিরিক্ত ভঙ্গেরও কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা অতিভঙ্গ। ইহা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিরই অতিবিকাশ Exaggereate Pose। সাধারণতঃ রুদ্ররস, অতিব্যাকুলতা প্রভৃতি রসজ্ঞাপক

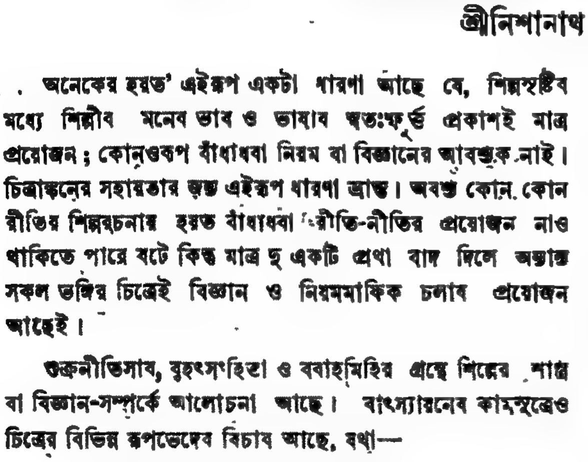

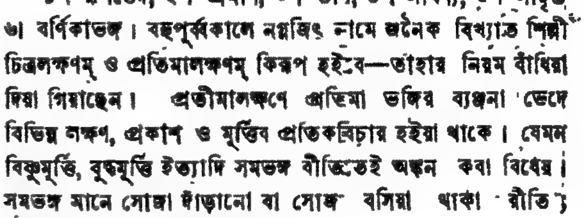

মূর্ত্তিতে ইহার ব্যঞ্জনার প্রয়োজন, যেমন—নটরাজ, মহিষমর্দ্দিনী দুর্গাদেবী ইত্যাদি।

শিল্পের বিভিন্ন রূপভেদ এবং নানা অঙ্গের বিচার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা উপরে লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তালমানের

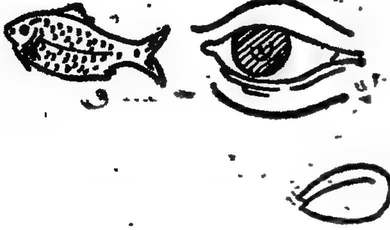

Proportion বিষয়ে এবং চিত্রের প্রতীকবিচার সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা হইল। চিত্রে মানবাকৃতির বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ কিরূপ হওয়া সঙ্গত বরাহমিহির গ্রন্থ হইতে তাহাই স্থূলে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে।

মুখ—১। কুকুটাণ্ড (পৌরাণিক চিত্রের মুখাবয়ব)

২। পানপত্র (মধ্যযুগ, সাধারণতঃ বাংলা, বিহার, তিব্বত ইত্যাদি)

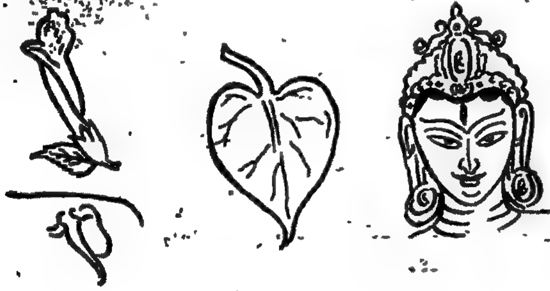

কপাল—ধনুষাকৃতি।

ভ্রূ—১। নিম্বপত্র (পুরুষ)

২। ধনুষাকৃতি (স্ত্রী)

নয়ন—১। পদ্মপলাশ।

২। কমল।

৩। হরিণ (স্ত্রী-লোচন)

৪। খঞ্জন।

৫। পটলচেরা—।

৬। সফরি তুল্য।

কর্ণ—১। গ্রন্থ 'ল' কারবৎ (দাক্ষিণাত্য মূর্ত্তিতেই বেশী দেখা যায়)

২। গৃধিনীবৎ (চলিত রীতি)

নাসিকা—১। তিলপুষ্প (সাধারণতঃ দেবীমূর্ত্তিতে)

২। শুকচঞ্চু (সাধারণতঃ দেবমূর্ত্তিতে)

নাসাপুট—নাকের পাতা বরবটী-বীজের ন্যায়।

ঠোঁট—১। বিম্বফল (পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী)

২। বান্ধুলী (হলুদবাসন্তিফুল)

কণ্ঠ—কম্বুগ্রীব (শঙ্খের ন্যায়)

চিবুক—আম্রবিভা (আমের আঁঠির ন্যায়)

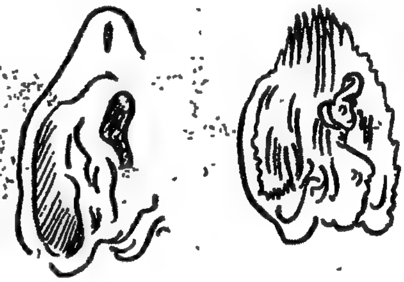

বক্ষ—কপাটবক্ষ।

কটি—সিংহ-কটী (সিংহের কোমরের ন্যায়)

শরীর—১। পুরুষ-গোমুখবৎ (গরুর মুখের ন্যায়)

২। স্ত্রী ডমরুবৎ।

স্কন্ধ—হস্তিশুণ্ডাকৃতি

হস্ত—বালকদলীকাণ্ডম্ (ছোট কলাগাছের ন্যায়)

অঙ্গুলী—মটরশুটী বা সীম।

উরু—১। পূর্ণকদলীকাণ্ডম্

২। হস্তিশুণ্ডাকৃতি।

জঙ্ঘা—হাঁটু হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত মৎস্যাকৃতি;

জানু—কাঁকড়ার খোলার মত।

হাত—কমলের মত (করকমল)

পা—পল্লবের মত (পদপল্লব)

শরীরেন্দ্রিয় বর্গের বিকারবিধায়ক ভেদবিকাশকে ভাব

বলে। এই ভাব খুব সহজে ব্যক্ত হয়—চোখের ভাষার দ্বারা। চোখের ভাষার যে ভাব তাই নিম্নরূপ পঞ্চরূপে বিভক্ত—

"চাপাকারং ভবেন্নেত্রম্—মৎস্যোদরমথাপি বা—
নেত্রমুৎপলপত্রনিভঞ্চ পদ্মপত্রনিভং তথা—
শশাকৃতি মহারাজ পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্।"

১। চাপাকার...ধনুকের ন্যায়, ইহা যোগীর চিত্তের ভাব-বিকাশক।

২। পদ্মপত্রনিভ—পদ্মপাপড়ীর ন্যায় আঁখি—শান্তচিত্তের লক্ষণ।

৩। শশাকৃতি—শশকচক্ষু,—খরগোসের ন্যায় চোখ—ক্রুদ্ধচিত্ত।

৪। মৎস্যোদর—পুঁটী মাছের পেটের মত চোখ—কামী চিত্তের ভাব-ব্যঞ্জক।

৫। উৎপলপত্রনিভ—শালুক ফুলের পাঁপড়ীর ন্যায় চোখ। এইরূপ চোখ নির্ব্বিকার চিত্তের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

"সর্ব্বাস্বেব যৎ চিত্রং
তৎ চিত্রং শুভলক্ষণম্"

এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বনে যে চিত্র অঙ্কিত করা হয় তাহাই শুভলক্ষণযুক্ত চিত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই সব কিছু বিচার করিবার তালমান বুঝিবার যে মাপকাঠি তাহাকেই বলে 'প্রমাতৃ-চৈতন্য'। মনের চৈতন্য দ্বারা পরিমাপ করা ও প্রমাণ বা বিচার করা। মাপের সামান্য এদিক-সেদিক ভুল বা ত্রুটীতে অন্যান্য সকল সৌন্দর্য্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। আবার এই বিচার-শক্তিকে যত বেশী কাজে লাগানো যায় ততই এই শক্তি অধিকতর উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

সাত বছর আগে ও পরে

অধ্যাপক হরিপদ ভারতী

অনেক দিন বাদে প্রশান্তর সঙ্গে দেখা। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবেই দেখাটা হয়ে গেল। প্রথমটা ত' নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারি নি।

কলেজ থেকে ফেরবার মুখে দেখলুম ছোট্ট একটি অনাড়ম্বর ষ্টুডিয়োর সামনে প্রশান্ত দাঁড়িয়ে আছে,;—একমনে পথিকদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে;—আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছে। আমাকে দেখতে পেয়েই ভ্রূজোড়া ওপরের দিকে তুলে একগাল হেসে বলল,—আরে প্রণবেশ যে! এ্যাঁ, কি আশ্চর্য্য! কতকাল পরে দেখা! এস, এস, ভিতরে এস।—হাত ধ'রে এক রকম জোর ক'রেই আমাকে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল। কোন কথা বলার অবকাশ আমি পেলাম না।

হাতলভাঙ্গা নড়বড়ে একটি চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দিল প্রশান্ত;—তারপর, এখানে কি মনে করে?—

উত্তর করলাম—চেয়ে আসবার মত জায়গা এটা নিশ্চয়ই নয়। নিছক চাকরীর খাতিরে ভাই।

—তা' বেশ, তা' বেশ, খাসা কথা। আচ্ছা, এক মিনিট,—আমি আসছি ভাই।—প্রশান্ত ভেতরে চলে গেল।

সঙ্গীহীন আমি বসে বসে ষ্টুডিয়ো দেখতে লাগলাম। ছোট্ট দরিদ্র ষ্টুডিয়ো। আসবাব-পত্রের বালাই নেই। খানকয়েক ভাঙ্গা চেয়ার; ততোধিক ভাঙ্গা একখানা বেঞ্চ, তাও আবার ধূলিধূসরিত। একখানা ছোট্ট উলঙ্গ চারপেয়ে টেবিল,—সারা গায়ে তার কালি-কলমের ক্ষতচিহ্ন; তার ওপর কয়েকখানা কাগজপত্র। দেওয়ালে ছবির প্রাচুর্য্য নেই। কয়েকটা রং-চটা উলঙ্গ নারীমূর্ত্তির ছবি। দু'চারখানা ফটো; তাও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। 'সোকেস্' বলে কোন জিনিষের পাত্তাই পেলাম না। রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ একটী প্রস্তরমূর্ত্তি দেওয়ালে টাঙ্গান আছে;—মূর্ত্তিটী খুবই সুন্দর। সেইটাই বোধ হয় এ-ষ্টুডিয়োর একমাত্র চোখে ঠেকার মত জিনিষ;—চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম।

প্রশান্ত বেরিয়ে এল; একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে মুখোমুখি ব'সে বলল,—অনেকদিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, না?

আমি বললাম,—হ্যাঁ; তা' বছর ছয় সাত পরে বোধ করি।

—কি করছিস আজকাল?—

—করব আর কি,—এই এখানকার কলেজে একটু গুরুগিরী।—

—বেশ, বেশ,—আমার পিঠে দুই থাবা মেরে প্রশান্ত বলল,—তোফা চাকরী বাগিয়েছিস্,—ভাগ্যবান্ পুরুষ। তারপর আছিস্ কেমন? বিয়ে থা করেছিস্?

একটু হেসে তার প্রশ্নের জবাব দিলাম,—তা' করেছি অনেকদিন। ও-বিষয়ে পুরোপুরি সুবোধ ছেলে আমি।

—Good God!—আবার এক থাবা বসাল প্রশান্ত,—ফলাফল?

—"মা ফলেষু কদাচন।"

প্রশান্ত হো হো করে হেসে উঠল,—বেড়ে বলেছে, বেড়ে বলেছো।

খট্-খট্-খট্,—ভেতর থেকে কড়া নড়ে উঠল।

প্রশান্তর টনক নড়ে।—আচ্ছা, তুই একটু বস ভাই, আমি আসছি। দরজা ঠেলে সে ভেতরে চলে যায়।

আমার মনে তখন অনেক কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রশান্তর খবরাখবর কিছুই নেওয়া হয়নি; এতক্ষণ খালি তার প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে গেছি,—তাকে কিছু জিজ্ঞাস্য করবার ফুরসৎ পাইনি। প্রশান্ত কোথায় ছিল এতদিন! কাজকর্ম কি করত! এখানেই বা এসে জুটলো কি ক'রে! বিয়ে করেছে মনে হচ্ছে। খটাখট্,—যে-রকম কড়া নাড়ার ভঙ্গী,—অন্তঃপুর শূন্য নেই নিশ্চয়ই। বয়সও হয়েছে অনেক। সন্দেহ ভঞ্জন করতে হ'বে এবার।

কয়েক মিনিট বাদে প্রশান্ত বেরিয়ে এল। পেছন দিকে সাবধানে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে পরিত্যক্ত চেয়ারটাতে আবার এসে বসল।—তারপর বৌ কোথায়?

—আবার কোথায়? ছায়া কি কায়াকে ছেড়ে থাকতে পারে কোথাও? এখানেই আছে। কিন্তু তোমার কথা ত' কিছু বললে না? কবে এলে এখানে? এদ্দিন ছিলে কোথায়?

—সে-কথা আর বলিস্ কেন ভাই, সাত তাড়াতাড়ি যে ক'রে পালিয়ে এসেছি তা একমাত্র ভগবানই জানেন।—প্রশান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার সে বলতে সুরু করল,—বি-এ, পাশ ক'রে চাকরীর চেষ্টায় কি কম জায়গায় ঘুরেছি ভাই! কিন্তু কি করব, অদৃষ্ট মন্দ, ভগবান্ 'Caste Hindu ক'রে বাংলায় পাঠিয়েছেন' তাই পাঁচ পাঁচটা বছর হন্যে হয়ে ঘুরেও একটা চাকরী জোগাড় করতে পারলাম না। শেষে এই ফটোতোলার কাজেই ভিড়ে গেলাম। জানিস্ ত, বরাবরই ওটায় আমার সখ ছিল। কিন্তু, দেশে থেকে আয় হ'ল না কিছুই,—সবই খাতিরে খদ্দের। তাই ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম এখানে। কোথায় আর যাব বল?

প্রশান্তর কণ্ঠস্বরে এবং ভাষায় তার ব্যক্তিগত জীবনের যে নির্মম অভিজ্ঞতার করুণ অভিব্যক্তি ছিল, তা সহজেই মনকে অভিভূত করে, সহসা তার কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বললাম,—তা বেশ ভাল কথা;—বিদেশে একটা আবাল্য বন্ধুর সঙ্গ মিলে গেল। সস্ত্রীক আছ তা'হ'লে কিছুদিন এখানে?

—সস্ত্রীক!

—হ্যাঁ হে, সস্ত্রীক। ভাবছো কেমন ক'রে জানলাম তুমি বিয়ে করেছো? কেমন? আরে আমি যে গুণতে জানি, সে কথা জান না বুঝি?

— কি বাজে কথা বলছিস্; সত্যি, কি করে জানলি বল ত? প্রশান্ত বোকা বোকা চোখে চেয়ে থাকে। মনে হল, বেচারা বড় ভাবনায় পড়েছে,—কি ক'রে আমি জানলাম তার বিয়ে হয়েছে।

মুচকি হেসে বললাম,—কি ভাবছ, আমার হাত গোনার কথা?

—সত্যি, কি ক'রে—

—আরে পাগল, স্রেফ অনুমান। ভেতর থেকে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে অনুমান করলাম, তুমি বিবাহিত। সব বাড়ীর কড়াই ওইভাবে নড়ে কিনা।

প্রশান্ত এবার প্রাণ খুলে হেসে উঠল,—খাঁটি কথা বলেছ,—খাসা অনুমান তোমারি প্রণবেশ।

—তারপর ফলাফল?—প্রশান্তর কথারই পুনরাবৃত্তি করলাম।

—'ফলেষু বহুবচন'।—শাস্ত্রবাক্য একটু বদলে বলল প্রশান্ত এবং অট্টহাসি ক'রে উঠল। আমিও তার সঙ্গে হাসলাম।

এমন সময় ভেতর থেকে আবার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা যায়। প্রশান্ত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ে। যাবার সময় বলে যায়,—একটু বোস্ ভাই, আমি এক্ষুণি আসছি।

বসে বসে মনটা খারাপ হ'য়ে উঠছিল। অনেক আগে বাসায় ফেরার কথা;—সহধর্ম্মিণী ভাবছেন নিশ্চয়ই খুব। মেজাজটাও তাঁর রুক্ষ হয়ে উঠছে সম্ভবতঃ। না, দেরী ক'রে ভাল কাজ করিনি; এখন উঠে পড়াই উচিত। আবার মনে হ'ল, প্রশান্ত আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। ক্লাস থ্রি থেকে বি, এ, পর্য্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি। কদ্দিন পরে দেখা। খানিকটা সময় তার সঙ্গে গল্প-গুজব করলামই বা। বিদেশে দেশের লোক, তায় আবার বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা, সন্দেহ নেই। মনটা খুশীও হচ্ছিল কথাগুলো ভেবে। টেবিলটায় ঠেস্ দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসলাম।

ক্যাঁচ ক'রে একটা শব্দ হল। চেয়ে দেখলাম প্রশান্ত বাইরে আসছে,—বাঁ হাতে তার এক ডিস্ খাবার, আর ডান হাতে জলের গ্লাস। সেগুলো টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল,—আরম্ভ ক'রে দে ভাই, আমি চা আনছি।

খিদে পেয়েছিল খুব; খাবারের ডিস্ এবং চায়ের

কাপে অরুচি আসবার সময় তখন অবশুই নয়। তবুও জোর জোর মাথা দুলিয়ে চোখ পাকিয়ে বললাম,—এ তোমার ভারী অন্যায় প্রশান্ত। এত সব করতে গেছ কেন বল ত ? এ রকম করলে ত আর আসা চলবে না।

—পয়সা না হয় আজ নেই আমার, কিন্তু অন্তরটাও কি হারিয়েছি ভাই! কতকাল পরে দেখা তোর সঙ্গে, একটু মিষ্টিমুখ না করিয়ে কি ছেড়ে দিতে পারি ?—বড় করুণ ক'রে কথাগুলো বলল প্রশান্ত।

চা খেতে খেতে গল্প চলতে লাগল। হাস্য-কৌতুকে দু'জনের ছোট্ট আসরটা সরগরম হ'য়ে উঠল। অনেকদিন পরে দুই বাল্যবন্ধুতে মিলেছি, সাধারণ সুখদুঃখের কথাও বাদ পড়ল না। কথার ফাঁকে প্রশান্ত হঠাৎ বলে উঠল, —তোর চেহারাটা যা 'ক্যামেরা ফিটিং' প্রণবেশ, কি বলব ভাই, ইচ্ছে করে তোর একটা ফটো তুলে নিই।—

তার কথাটাকে আমল দিলাম না; একটা কথার কথা হিসেবেই ওটাকে ধ'রে নিলাম। একটু হেসে পেয়ালায় ঠোঁট ছোঁয়ালাম। প্রশান্ত আবার সেই কথা বলল,—সত্যি ভাই, তোর একটা ফটো তুলে নিতে ইচ্ছে করছে। আঃ, ফটোটা যা উঠবে,—grand !

এবারও কোন জবাব দিলাম না, আগের মতই হাসলাম একটু। প্রশান্ত কি ভাবল জানি না; বলল, ওরে তোর কাছ থেকে কি আর টাকা নেবো ? তা মনেও ভাবিসনে; কোন ভয় নেই। নে, নে, তৈরী হয়ে নে। এ রকম চেহারার একটা ফটো তোলবার লোভ আমি সামলাতে পারছি নে কিছুতেই। তাকা ত' আমার দিকে চোখ তুলে; আঃ marvellous !

প্রশান্ত উঠে এসে আমার চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরল; নতুন বৌএর মুখ দেখার মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মুখ দেখতে লাগল। পরিশেষে মন্তব্য করল—charming !

নিজেকে একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম। করে কি প্রশান্ত! বলেই বা কি! আমাদের ত' আজ প্রথম সাক্ষাৎ নয়;—ছেলেবেলা থেকেই আমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনি! এতগুলো বাছা বাছা বিশেষণে কখনও ত' অলঙ্কৃত হইনি ইতিপূর্ব্বে। প্রশান্ত কিন্তু ততক্ষণে মনস্থির ক'রে ফেলেছে; আমার আস্তিনটা গুটিয়ে নিয়ে বলল,—চল এসো

অবাক্ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কোথায় ?

—পাশের ঘরে।

—কেন ?

—সে-কথা পরেই জানতে পারবে; এখন গাত্রোত্থান কর ত' মিষ্টার- প্রশান্ত একরকম জোর ক'রেই আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল।

পাশের ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। সামনে কিছু দূরেই একটা ক্যামেরা ফিট্ করাই ছিল। আমাকে বসিয়ে দিয়ে প্রশান্ত ক্যামেরার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। এক টুকরো কালো কাপড়ের ভেতর মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে কি সব করল। তারপর এসে রুমাল দিয়ে আমার মুখটা ভাল ক'রে মুছিয়ে দিল। কাপড়ের কোঁচার আগাটা সামনের দিকে মেঝের ওপর ছড়িয়ে রাখল। মাথাটা বাঁ-দিকে একটু কাত করিয়ে দিয়ে বলল,—ঠিক এই রকম থাকবি, একটুও নড়বি না, বুঝলি ?—

আবার ক্যামেরার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল প্রশান্ত; আচ্ছা, মুখটা একটু হাসিহাসি কর ত,—good ; একটু লাজুক লাজুক চোখে তাকা দিকিনি,—O.K. উঁহুঁ হুঁ, অমন চাওনি নয়, vacant look, vacant look,—quite alright !

আরোও খানিকক্ষণ কি সব ক'রে ক্যামেরার পাশে এসে দাঁড়াল; সামনের একটা গোল চাকতির ওপর হাত রেখে বলল,—Ready,—নো নড়ন চড়ন—one,—two,—three,—ঢাকনিটা খুলে নিয়ে আবার বন্ধ করে দিল প্রশান্ত। পুনরায় কালো কাপড়ের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে কি একটা টেনে বার করল। মুখে বলল,—ফটোটা যা উঠবে,—কি বলব প্রণবেশ,—যাকে বলে exceptionally beautiful !

তা হ'লে এবার আমার ছুটী ?—গম্ভীর-মুখে জিজ্ঞাসা করলাম।

Oh yes, তোমার ঠিকানাটা বলে যাও। কাল ছবিটা নিয়ে যাব;—আর মিসেস্-এরও ওই সঙ্গে একটা তুলে নিয়ে আসব।—প্রশান্ত দাঁত বার ক'রে হাসতে লাগল।

আমি বললাম,—কাল আবার মিসেস্-এর পালা ? তা তাঁর চেহারাটা grand কি charming;—কিছুই ত' তোমার জানা নেই প্রশান্ত ?—কি অজুহাতে তাঁর ফটো তুলবে ?

—অজুহাত!—প্রয়োজনের তাগিদ ভাই।—একটু ম্লান হেসে একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রশান্ত।

বুঝলাম ব্যাপারটা। অনেকটা আন্দাজ অবশ্য করেছিলাম আগেই,—প্রশান্তর পোষাক-পরিচ্ছদ, ভগ্ন দেহ এবং ষ্টুডিয়োর চেহারা দেখেই। প্রশান্তর জন্য মায়া হ'ল—বেচারী! ছেলেবেলাকার বন্ধু! একখানা দশটাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিলাম; বললাম,—জানি না ভাই কত পড়বে, আপাততঃ এই advance দিলাম। আর কাল বিকেলে আমার বাসায় যাবে;—

চায়ের নেমন্তন্ন রইল। যেও কিন্তু অবশ্য অবশ্য। ভাল কথা, ক্যামেরাটা নিয়ে যেতে ভুলো না কিন্তু।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে প্রশান্ত; কিছুই যেন সে বুঝে উঠতে পারছে না। সম্বিত আসল তখন, যখন আমি বললাম,—আচ্ছা, আজ তবে আসি ভাই; কাল আমার বাসায় যাবার কথা ভুলো না যেন।

—নিশ্চয়ই যাবো ভাই:—তুমি নেমন্তন্ন করছ, যাব না।

অনেকটা পথ আমার সঙ্গে চলল প্রশান্ত। পথে যেতে যেতে বলল,—লুকোব না প্রণবেশ, সত্যি ভাই, সংসার চলে না। দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাই। স্ত্রীর পরণে কাপড় নেই, ছেলেমেয়েগুলোর গায়ে জামা নেই—চোখে আর দেখতে পারি না,—কিন্তু কি করব ভাই,—সামর্থ্য যে নেই আমার। তোর সন্ধানে কোন চাকরি-বাকরি আছে প্রণবেশ? একটা জুটিয়ে দে না ভাই, —আর ত এমন ভাবে পারি না।

শুনতে শুনতে সারা অন্তরটা আমার আর্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু বলার মত কোন কথাই আমি খুঁজে পেলাম না। মিথ্যে আশ্বাসও দিতে পারলাম না। কারণ, মিথ্যে আশ্বাস তারাই দিতে পারে এবং দেয় যারা সত্যি আশ্বাস দেবার শক্তি রাখে। আমি শুধু চুপ করে প্রশান্তর কথাগুলোই শুনে যাই। শেষকালে একসময় পুনরায় তাকে আমার বাসায় যাবার অনুরোধ জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিই।

সারাপথ প্রশান্তর কথাই ভাবি। ছেলেমেয়েদের নিয়ে না জানি কি শোচনীয় অবস্থায় পড়েছে বেচারী। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কিই বা আমি করতে পারি। আমার ক্ষমতা কতটুকু। তবু নিছক সান্ত্বনা করবার উদ্দেশ্যেই ফটো তোলবার নেমন্তন্ন করলাম।

সন্ধ্যাবেলা পড়ার ঘরে বসে কত কথাই মনে আসে। প্রশান্তর কথায় অতীতের কত বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি মনের মধ্যে এসে ভীড় করে। মনে পড়ে—ছেলেবেলাকার সহজ সরল জীবনের কথা,—স্কুলের মিষ্টিমধুর দিনগুলো; সহজ আনন্দের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে দিনগুলো কি ভরপুরই ছিল। কলেজী জীবনের সে প্রথম শিহরণ,—তারুণ্যের সে গগনস্পর্শী অভিযান—প্রাণশক্তির সে অভূতপূর্ব স্বচ্ছলতা,—সে সব আজ কোথায়। আমার জীবনের সঙ্গে তাদের যোগসূত্রও হারিয়ে গেছে অনেকদিন,—সে সব আজ স্বপ্ন। নিজের অজ্ঞাতসারেই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে; সে সব দিনগুলো যদি আবার ফিরে পাওয়া যেত!…

পরের দিন যথাসময়ে প্রশান্ত এসে হাজির হ'ল। সঙ্গে একটি ক্যামেরা, জন তিনেক ছেলেমেয়ে; দারিদ্র্যের ছাপ তাদের সর্বাঙ্গে। পোষাক-পরিচ্ছদে ভদ্রতাও রক্ষা হয়নি। দেখলে মায়া হয়। আদর ক'রে তাদের কাছে ডেকে নিলাম।

প্রশান্ত বলল,—কিছুতেই ওরা ছাড়লে না; বায়না ধরল, কাকীমাকে দেখব।

আমি লজ্জিত হয়ে বললাম,—আমি ওদের আলাদা ক'রে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম; ভারী খুশী হয়েছি প্রশান্ত। ওদের দেখলে ওদের কাকীমা নিশ্চয়ই খুব খুশী হ'বে।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলাম; স্ত্রীর কাছে তাদের ছেড়ে দিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'লাম। এতক্ষণ সবাই মিলে যে দৌরাত্ম্য সুরু করেছিল তাতে প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। কোলে চড়বে, গা বেয়ে উঠবে, জামাকাপড় ধ'রে টানাটানি করবে, বোতামের চেন্ নিয়ে খেলা করবে; এসব ঝামেলা কি আমাদের পোষায়। ওদের সামলাতে পারে মেয়েরাই।

জলযোগাদি মিটে গেলে সস্ত্রীক একটা ফটো তোলা-লাম। প্রশান্তর ছেলেমেয়েরাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। প্রশান্ত এক ধমক দিয়ে তাদের সরিয়ে দেয়; আমরাও তাদের ডেকে নিই না। চলে যাবার সময় প্রশান্তকে পারিশ্রমিক হিসেবে যা দেই তা তার ন্যায্য পাওনার চাইতে ঢের বেশী। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ দুটো ছলছল্ করে ওঠে। একদিনের মধ্যে দুটো ফটোই পাঠিয়ে দেবে বলে প্রশান্ত চলে যায়।

এরপর নিয়মিত আসা যাওয়া সুরু হয়। ছেলেমেয়েরা 'কাকীমা' ব'লে রোজই বেড়াতে আসে। যাওয়ার সময় প্রায় প্রতিদিনই সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছু না কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কোনদিন বা সহধর্মিণী উপযাচক হয়ে কিছু দেন; কোনদিন বা তারা নিজেরাই মায়ের নাম করে চেয়ে নেয়। প্রশান্তও আসে যখন তখন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। এটা, ওটা চেয়ে নিয়ে যায়। টাকাও ধার করে মাঝে মাঝে। 'ধার, ব'লে চায়; কিন্তু শোধ দেবে না জেনেই দিই। মাসে অন্ততঃ বার তিনেক তাদের নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াই। স্ত্রী ভীষণ চটে যান। বলেন—রোজ রোজ এ সব কি আরম্ভ করেছ? দানছত্র খুলেছ নাকি? আমি বাপু এত পারব না—তা বলে দিচ্ছি।

প্রশান্ত সত্যই বড্ড বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। আমাকে সে কল্পতরু ভেবেছে নাকি। যখনই হাত পাতবে তখনই পাঁচ দশ টাকা মিলবে। মানুষের একটু চক্ষুলজ্জাও ত' থাকে। পাকে-প্রকারে ঢের সাহায্যই ত করা হয়। ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠি প্রশান্তর ব্যবহারে। কিন্তু মুখ

মুটে কিছু বলতে পারি না; ছেলে বেলাকার বন্ধু, সহপাঠী, তায় আবার দরিদ্র। কড়া কথা বলতে বাধে, মনে কষ্ট পাবে। কিন্তু, আমারই বা আর পথ কৈ। ওর চাহিদা মেটাবার শক্তি ত' আমার নেই। নিজে ত' যথাসাধ্য করছিই, চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ ক'রে পরিচিত বন্ধু-বান্ধব সকলকেই কটো তুলিয়ে ওকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছি। অনেকে ইতিমধ্যে অনুরোধ রক্ষাও করেছেন। তবুও দিনরাত এটা দাও, ওটা দাও। কাঁহাতক মানুষ পারে।

মাস ছয়েক বাদে শেষপর্য্যন্ত একদিন একটু কড়া কথাই প্রশান্তকে শোনাতে হ'ল। মাসের শেষে, খুবই টানাটানি চলছে। প্রশান্তর দৌলতে রোজগারের প্রায় সবটাই মাসের মাঝামাঝি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। শেষের দিকে তাই নেহাৎ প্রয়োজনীয় ব্যয়ও বহন করতে পারছিলাম না। এমন সময় প্রশান্ত এসে হাত পাতল,—পাঁচটা টাকা ধার দে ত' প্রণবেশ।

মেজাজটা রুক্ষ হয়ে উঠল। বললাম পাঁচটাকা ত' দুরের কথা, পাঁচ পয়সাও তোমাকে দিতে পারব না; টাকা আমার নেই।

প্রশান্ত অবাক্ হয়ে যায়। শূন্য দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। পরে বলে—সত্যি ভাই, পাঁচ টাকা এখন না দিলে কিছুতেই চলবে না। টাকা ক'টা দিতেই হ'বে প্রণবেশ।

কোথায় পাব টাকা? টাকা ত' আর গাছের ফল নয়, যে ঝাড়া দিলেই পড়বে। তা ছাড়া রোজ রোজ তোমার এত টাকা লাগে কিসে?

প্রশান্ত কোন উত্তর করে না, মাথা নীচু ক'রে মাটীর দিকে চেয়ে থাকে। মুখখানা তার যারপর নাই করুণ দেখায়। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আমি আবার বলি,— —রোজগার বুঝে ব্যয় করলেই পার, তাহলে ত' আর মাসের মধ্যে তিরিশ দিন লোকের কাছে হাত পাততে হয় না।

এবার প্রশান্ত মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে চেয়ে থেকে বলল—রোজগার বুঝে ব্যয় করলে যে আমার চলে না ভাই। রোজগার কোথায়? তাই বলে কি না খেয়ে মরব, বলতে চাও? আমি পারি ভাই, কিন্তু ক্ষিদের জালায় ছেলে-মেয়েগুলো কাঁদে, বাপ-মার চোখের সামনে কেমন ক'রে দেখি প্রণবেশ? শেষের দিকে কথাগুলো তার ভারী এবং অস্পষ্ট হয়ে আসে; চোখের কোণে কোণে জলের ফোঁটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দ্রুতপদে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যাই। তহবিল এক-রকম শূন্য করেই পাঁচ টাকা নিয়ে আসি। প্রশান্ত তখন রাস্তায় পা দিয়েছে। ডেকে নিয়ে পাঁচ টাকা তার হাতে দিলাম। সে কোন কথা বলল না। কৃতজ্ঞতার চোখে একবার আমার দিকে তাকাল; তারপর কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। শূন্য দৃষ্টিতে আমি তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইলাম। মনটা তখন আমার যারপর নাই আর্দ্র হয়ে উঠেছে। নিরুপায় হয়ে বেচারী টাকা চাইতে এসেছিল; ওরকম কড়াকথা-গুলো তাকে না বললেই পারতাম।

প্রশান্ত আর আসে না। দশ বার দিন অতীত হয়ে গেছে, সে আর এমুখো হয়নি। স্ত্রী যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন, বলেন—উঃ টাকা টাকা ক'রে একেবারে পাগল করে তুলেছিল। বাঁচা গেছে।

আমি কোন মন্তব্য করি না। কথাটা খুব মিথ্যে নয়। প্রশান্তর চাহিদা মেটান আমার পক্ষে সত্যই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তবুও কেন জানি না মনটা খচ্ খচ্ করতে থাকে। কেন সে আর আসে না। কেন এসে যখন তখন টাকা চায় না। প্রশান্তর দিন চলছে কি করে। সে কি আমার ওপর রাগ করেছে। নাঃ, সেদিন অতগুলো কড়াকথা শোনান খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। হাজার হলেও প্রশান্ত আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু।

কলেজ থেকে ফিরতি পথে একদিন প্রশান্তর ওদিকে গেলাম। ষ্টুডিয়োর সামনে ছোট্ট একটা ভীড় দেখে বিস্মিত হ'লাম। ভেতরে ভীষণ চেঁচামেচি শোনা গেল। কে একজন চীৎকার ক'রে বলছে,—জোচ্চুরী করবার আর জায়গা পেলেন না মশাই?

দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়াই। একটু ইতস্ততঃ করি; তার পর ভীড় ঠেলে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ি। লোকটি তখনও চীৎকার করছে—ভদ্দর লোকের এরকম ব্যবহার। একেবারে দিনে দুপুরে ডাকাতি।

প্রশান্ত আমাকে দেখে যেন একটু চমকে উঠল। পরক্ষণে ঘাড় হেঁট করে মাটীর দিকে চেয়ে বসে থাকল। যে লোকটা এতক্ষণ চীৎকার করছিল সে ও একবার আমার দিকে চেয়ে চুপ করে গেল।

ব্যাপার কিছুটা অনুমান করলাম। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে ম'শাই?

লোকটা একেবারে মারমুখো হয়ে উত্তর দিল—হ'বে আবার কি। যত সব চোরের পাল্লায় পড়েছি আর কি। দেখতে ত বেশ ভদ্দর লোকের মতন চেহারা, কি ক'রে জানব মশাই লোকটা একটি পাক্কা জোচ্চোর? বিশ্বাস করে…

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলি,—কিন্তু, ঘটনাটা ত' কিছুই বুঝলাম না ; কি হয়েছে খুলে বলুন ত ?

লোকটা তার অভ্যাসমত অশিষ্ট ভাষায় যা বলে গেল তা বেটেই শ্রুতিসুখকর নয়। সে একটি ফটো তুলিয়েছিল প্রশান্তকে দিয়ে ; মজুরী ঠিক হয়েছিল চার টাকা। খুচরো টাকা না থাকায় দাম দেবার সময় লোকটি একটা দশটাকার নোট দিয়েছিল প্রশান্তর হাতে। কথা ছিল বাকী টাকা পরের দিন এসে নিয়ে যাবে। সে আজ দশদিন আগেকার কথা। কিন্তু টাকাটা সে আজও পায়নি ; প্রশান্ত টাকাটা দিতে পারে নি। এতেই যত গোলমাল।

বুঝলাম সব। প্রশান্তর সাধ্য নেই টাকা ক'টা ফেরত দেয় ; নইলে নিজের বাড়ীতে বসে এ রকম অপমান কেউ নীরবে সহ্য করে না। ব্যাগ খুলে ছটা টাকা লোকটার হাতে দিলাম। সে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। প্রশান্তও একবার মুখ তুলে দেখল ; পরক্ষণেই ঘাড় গুঁজে আগেকার মত বসে রইল।

লোকটা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিলাম ; বললাম,—আপনার টাকা পাওয়া নিয়ে কথা,—পেয়েছেন ত ? আচ্ছা, এখন আসুন। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। লোকটা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর আমাকে ক্ষুদ্র একটা নমস্কার ক'রে রাস্তায় গিয়ে নামল। সামনের ভীড়ও তার-সঙ্গে সঙ্গেই অপসারিত হ'ল।

কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকি। কথা বলতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। প্রশান্ত তেমনিই বসে আছে। একবারও মাথা তোলেনি। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটবার পর আমিই প্রথম কথা বলি,—তারপর, এদ্দিন তোমার টিকিটিও দেখতে পাইনি কেন ? বেমালুম অসহযোগ ক'রে বসলে যে ?

প্রশান্ত কোন উত্তর দেয় না। শুধু একটা বড়রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আবহাওয়াটা কেমন যেন অসহ্য ঠেকছিল। চঞ্চল হয়ে বললাম,—বলি, কথাবার্ত্তা কবে, না কি ?

তবুও ঘাড় গুঁজে বসে থাকে প্রশান্ত। বাধ্য হয়েই উঠে পড়ি। এবার সে মুখ উঁচু করে। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চায়। চোখ ছ'টো তখন তার দস্তুরমত ঝাপসা হয়ে উঠেছে। বুকের ভেতরটা আমার টন্‌টন্ ক'রে ওঠে। কাল একবার আমার ওখানে যেও কিন্তু অবিশ্যি অবিশ্যি,—বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি।

কাল এল ; কিন্তু প্রশান্ত এলো না। খবর পেলাম, সে এখানকার বাসা ছেড়ে চলে গেছে ;—কোথায়, কেউ জানে না। বাড়ীভাড়া বাবদ কিছু আসবাব-পত্র আর একটা ক্যামেরা দিয়ে গেছে বাড়ীওয়ালাকে। মনটা ভারী হয়ে উঠে। প্রশান্তর অভাবটা কেন জানি আজ মস্ত বড় হয়ে দেখা দেয়। তার জন্ম দুঃখ হয়। অকারণে চোখ ছ'টো সজল হয়ে আসে।

তারপর দীর্ঘ সাত বৎসর কেটে গেছে। এই সাত বছরে জগতের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। কত পতন, কত অভ্যুদয়,—কত সৃজন, কত ধ্বংসের ভেতর দিয়ে পৃথিবী এগিয়ে চলেছে। অকস্মাৎ শান্ত পৃথিবীতে উঠেছে ঝড়,—চারিদিক ওলোট-পালোট ক'রে। ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চলেছে তারই পথ অনুসরণ ক'রে। যুদ্ধ চলেছে ;—পৃথিবীব্যাপী মহাসমর। আজ চার বৎসর ধরে যুদ্ধ চলেছে। সারা ইউরোপের ওপর দিয়ে নটরাজের প্রলয়নাচন সুরু হয়। তার কম্পন এসে লাগে এশিয়ায়। এশিয়ায়ও আগুন জ্বলে ওঠে—বিদ্যুত্গতিতে ; দেশের পর দেশ শ্মশান হয়ে যায়। সসাগরা ধরণীর বুকে জাগে তৃষা ; লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়-শোণিতেও তার সে তৃষা মেটে না।

ভারতবর্ষেও দোলা লাগে। বোমা পড়ে ; বাড়ী ঘর ছেড়ে সব পালায়,—হুড়মুড় ক'রে, দলে দলে,—অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না ক'রে। নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়ে ওঠে। সাগরপার থেকে আসে বীরের দল,—ভারতবাসীকে ত্রাণ করতে,—ভীত-ত্রস্ত নরনারীকে সাহস দিতে,—তাঁদের জন্ম লড়তে,—প্রাণ দিতে। লড়াই চলে সমানে,—ভারতের বাইরে, ভারতের দ্বারে, ভারতের মধ্যেও। বেকার সমস্যার সমাধান হয়। অন্ন-সমস্যার-সমাধান হয় না দেশের। সারা বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক মরে না খেয়ে। বনেদী অট্টালিকায় ফাটল ধরে,—ভূমিসাৎ হয়। কুঁড়ে ঘরের ওপর মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায় ধনীর সৌখীন প্রাসাদ। সারা দেশময় অভূতপূর্ব্ব অসাড়ত্ব। একদিকে অভুক্ত, অর্দ্ধভুক্ত নরনারীরা শুকনো মুখ গুঁজে কোনমতে পড়ে থাকে। অন্যদিকে চলে টাকার লুঠ ; চলে বিলাস ব্যসনের হুল্লোড়,—ফ্যাটের প্রদর্শনী, রেশমী শাড়ীর অঞ্চল ওড়ে যেখানে সেখানে। এসেন্স আর সিগারেটের ধোঁয়ায় দেশের বাতাস রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অপূর্ব্ব অভিনব সে সমাজ ! চিরস্মরণীয় সে দিনগুলি !

আমারও পরিবর্ত্তন হয়েছে ঢের,—হবেই তো। আমার পৃথিবী পাল্টেছে, আমিও নিশ্চল হয়ে থাকিনি, থাকতে পারিনি। অনেক জায়গা ঘুরেছি এর মধ্যে। শেষকালে এসে পৌঁছেছি কলকাতায়,—বেসরকারী

অধ্যাপক-জীবনের চরম সার্থকতায়। দিন আজকাল কোন মতে চলছে,—না চলারই সামিল। আশা-নিরাশার দোলায় দুলে, সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে জীবনযাত্রা বেয়ে চলেছি—একরকম টানা-হ্যাঁচড়া ক'রেই। যুদ্ধ চলছে; কবে এর শেষ হ'বে কে জানে! দুঃখ-রাত্রি প্রভাত হবে কিনা জানেন আমার অন্তর্যামী ভগবান্।

পুজোর বন্ধে দেশে ফিরলাম;—বছর দেড়েক পরে। এ কথা সে কথার পর শুনলাম, প্রশান্ত প্রায় বছর খানেক এখানে এসে পাকাপাকিভাবে জুটেছে; এখানকার একটা বড় মিলিটারী কন্‌ট্রাক্টও নিয়েছে। মস্ত বড় লোক নাকি সে হয়েছে আজকাল। এ'দিন কলকাতাতে কন্‌ট্রাক্টারী করত। কু-লোকে বলে, এখনও সেখানে নাকি ওর চোরা কারবার আছে। সেখানে একটা মস্তবড় বাড়ীও করেছে। সেটা এখন মিলিটারীরা ভাড়া নিয়েছে। এখানেও একটা প্রকাণ্ড বাড়ী কেঁদেছে। গাড়ী করেছে। লাখ তিন চার টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছে।—আরও কত কি!

খবরটা শুনে প্রথমতঃ যারপরনাই বিস্মিত হই।—প্রশান্তর আজ লাখ লাখ টাকা! হোমড়া-চোমড়া মিলিটারী কন্‌ট্রাক্‌টার সে! তার মস্তবড় বাড়ী,—গাড়ী! সেই প্রশান্ত, যে অভাবে পড়ে' যখন তখন আমার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিত কয়েক বছর আগে! আনন্দও হলো খুব। বেচারীর অবস্থা ফিরেছে তা হলে! এত দিন পরে ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন তার প্রতি! আগে বড় কষ্টেই প্রশান্তের দিন কাটত; দেখে দুঃখ হ'ত।

একদিন বিকেলে প্রশান্তর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম, খাসা বাড়ী করেছে;—একেবারে ঝকঝকে হাল-ফ্যাসানের বাড়ী। সামনে খানিকটা খোলা মাঠ রেখেছে। নানারকম কন্‌ট্রাক্‌টারী সরঞ্জাম এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। লোকও জমেছে সেখানে অনেকগুলো, নানা শ্রেণীর, নানা জাতের। বারান্দার ওপর জন দশ বার লোক জড় হয়েছে। নিম্নস্বরে কি সব কথাবার্ত্তা যেন বলছে। সিঁড়ির ওপরও কয়েকজন বসে আছে।

বারান্দায় উঠে দেখলাম, প্রশান্ত মাথা নীচু ক'রে একমনে কি লিখছে। অনেকগুলো চেয়ার-বেঞ্চ পাতা আছে। দু-চারজন ভদ্রলোকও বসে আছেন, দেখা গেল। তাদের কাউকেই চিনি না। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে প্রশান্ত একবার আড়চোখে তাকাল,—পলক মাত্র। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল,—এখন হ'বে না, এখন হ'বে না, কাল আসবেন। এখন বড্ড ব্যস্ত আছি।

কথাগুলোর অর্থ বুঝলাম না। কি বলতে চায় প্রশান্ত! অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। উপবিষ্ট ভদ্রলোকেরাও যেন কতকটা করুণার চোখেই আমার দিকে তাকান।

তবুও দাঁড়িয়ে আছেন?—প্রশান্ত বিরক্ত ভাবে মুখ তুলে চায়। পর মুহূর্ত্তেই সুর বদলে বলে,—Hallo, প্রণবেশ, না! My God! আমি ভেবেছিলাম সেই লোকটা! বস,বস। কি আশ্চর্য্য তার পর, কেমন আছ? কবে এসেছো?

বসতে কেন জানি তেমন আগ্রহ আসে না। তবুও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসি। আগেকার মত হাতলভাঙ্গা চেয়ার নয়, হাতলওয়ালা দামি কুশন্ চেয়ার।

প্রশান্ত আবার কি লিখতে সুরু করে। লিখতে লিখতে জিজ্ঞাসা করে, তারপর কেমন আছ আজকাল?

গম্ভীর মুখে জবাব দি,—কোন রকমে টি'কে আছি, আর কি।

How funny! কোন রকমে টি'কে আছি!—বেড়ে বলেছো, খাসা বলেছো, my good old friend প্রণবেশ!—প্রশান্ত বনেদী চালে হাসতে লাগল। কলম তার অবশ্য সমানেই চলছে।

কি করছ আজকাল?—আমার দিকে না চেয়েই সে প্রশ্ন করে।

ছোট্ট সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলাম,—আগে যা করতাম।

প্রশান্ত এবার কলম থামিয়ে আমার দিকে চায়; তারপর চিন্তিত মুখে বলে, আগে যেন কি করতে তুমি? ঠিক মনে আসছে না,—wait, wait,—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মানে প্রফেসারী,—কলেজের মাষ্টারী।—নিজের রসিকতায় সে নিজেই হেসে ওঠে। উপস্থিত ভদ্র লোকেরাও এ হাসিতে যোগ দেন।

আর এক মিনিটও সেখানে বসে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু, কেন জানি না, উঠে আসতেও পারছিলাম না। চেয়ারটা যেন আমায় টেনে ধরেছে, ছেড়ে দিতে চায় না।

লেখাটা শেষ ক'রে পেনটা আঁটতে আঁটতে পুনরায় প্রশান্ত বলে,—ওসব সৌখীন চাকরীর কোন মূল্য নেই প্রণবেশ, পেট চলে না ও-ক'রে।

আমার সামনের ভদ্রলোকটী হাসতে হাসতে তার কথায় সায় দেন,—যা বলেছেন,—ভাত-কাপড়ের সংস্থান ওতে হয় না। ওই তো আমার মাসতুতো ভাই···

তাঁর কথার মাঝখানেই প্রশান্তকে লক্ষ্য ক'রে একটু রুক্ষ গলায় বলি,—হিতোপদেশ শুনতে তোমার কাছে আসিনি প্রশান্ত। তার জন্য অন্য জায়গা আছে।

প্রশান্ত ভ্রূ-জোড়া ওপরে তুলে জিজ্ঞাসা করলে,—তবে কি-জন্য এসেছো, বল?

তাড়াতাড়ি উত্তর দি,—ভাত-কাপড়ের সংস্থান করতে ও আসিনি। অনেকদিন আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, শুনলাম, তুমি এখানে আছ—তাই…

So kind of you.—প্রশান্ত হাত-ঘড়িটার দিকে তাকায়। পরক্ষণেই চীৎকার ক'রে বলে,—শোফার, গাড়ী বার কর।—তারপর যেন আপন মনেই বলে—সাহেবের বাংলোয় একবার যেতে হবে,—engagement রয়েছে; S.D.O.র ওখানেও একটু কাজ আছে…

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। প্রশান্তও উঠে দাঁড়ল,—কি ব্যাপার, চললে নাকি?

হ্যাঁ, চলি এখন, দেখাসাক্ষাত ত' হয়ে গেল —সিঁড়িতে পা দিলাম।

প্রশান্ত ভদ্রতা ক'রে কয়েক পা আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে এল। বলল,— আজ আর তোমার সঙ্গে বসে গল্প করতে পারলাম না, ভাই। I am really sorry for that; কিন্তু কি করব, আজ আর মোটেই অবসর নেই। কাল একবার এসো, কেমন? সন্ধ্যের দিকে আসবে, তখন বিশেষ ভীড় থাকবে না। I am free then।

আমি কোন উত্তর করি না। প্রশান্তর ওপর সারা অন্তরটা কেমন যেন বিমুখ হয়ে উঠেছে। তার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। শেষকালে কোনমতে বললাম—আচ্ছা ত'াহলে আজ আসি।

—হ্যাঁ, তোমাকে আর আটকে রাখব না। আমাকেও এক্ষুণি বেরুতে হ'বে। তা কাল positively এসো কিন্তু মনে করে। হ্যাঁ ভাল কথা, আমি গোড়ায় যা বলেছি তার জন্য কিছু মনে কোরো না; আমি অন্য লোক মনে করেছিলাম। একটা লোক ভাই রোজ রোজ এসে বিরক্ত করে, মানে কিছু help আর কি। how silly। কাঁহাতক এসব পারি বল ত? টাকা কি হরির লুঠ।

মৃদু হেসে বলি—তা ত বটেই। আমার মনের পর্দায় তখন সাত বৎসর আগেকার সেই ছবিগুলো দ্রুত-গতিতে প্রতিফলিত হয় একটার পর একটা। আপনা থেকেই চোখের কোণে কৌতুক নৃত্য ক'রে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি,—আচ্ছা চলি।

প্রশান্ত ডান হাত উঁচু করে আঙ্গুলগুলো নেড়ে বিদায় দেয়—Bye Bye…

মাতৃভূমি

শ্রীপ্রভাত বসু

সুজলা সুফলা মাটির উপরে বহুযুগ-সঞ্চিত
পরাধীনতার আবর্জ্জনার গ্লানি
আজ ভেঙে পড়ে, দেখা জাগে ঐ আলোহাওয়া-বঞ্চিত
মাটিতে তৃণের নবীন আশার বাণী।

জেগে ওঠে দেশ পূর্ব্বাচলের দীপ্ত সূর্য্যালোকে
ছুটে আসে কোটী শিশু যুবা-নরনারী;
জাতীয় পতাকা উড়ায় সকলে নিজ গৃহচূড়া হ'তে
গরম লয়—"হামিশে জায়ুয়ারী!"
তারপর এলো "১৫ই আগষ্ট" বুকের রক্তে বাঙা
মর্ষণের ভয় দূরে গেল চিরতরে—

শত বরষের জীর্ণ শিকল এতদিনে হ'ল ভাঙা,
জেগে ওঠে দেশ আপনার নির্ভরে।
আজাদী সেনার অমর কীর্ত্তি রচে নব ইতিহাস,
শহরের পথে বিজয়ী কিশোর-বীর
ছিন্ন করেছে নবীন ভারতে পরাধীনতার ফাঁস,
ভারতমাতার মুছায়েছে আঁখিনীর।

বন্দি তোমারে আজিকে জননি, হে মোর মাতৃভূমি!
রক্ত-কমল দিনু পদে উপহার;
জীবন-মরণে নিবিড় পুলকে ও পদযুগল চুমি,—
বরাভয় করে জাগো দেবি আরবার॥

যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ছেলেমেয়ে

রঞ্জিত সিংহ (পাটনা)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাহায্য-সংগঠক-সমিতির (U. N. R. R. A.) প্রতিনিধিরা ইউরোপের নানা দেশ থেকে প্রায় দশ হাজার ছেলেমেয়েকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করেছে। দীর্ঘ দিনের কারাবাসের ফলে তাদের ভেতর অনেকেই হয়ে পড়েছে অসহায়, পঙ্গু ও নিঃস্ব। জার্মেনীর অধিকৃত অঞ্চলে যে-সব ছেলেমেয়েরা দিনের পর দিন জার্মান গেষ্টাপোদলের অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে জীবনকে দীপশিখার মত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে, আজ তাদের চোখে আর-সে-দীপ্তি নেই। যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধের সময় ইউরোপের বহু পরিবার দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, ইউরোপে ফ্যাসীবাদের বিজয়-পতাকা যখন জয়ের আনন্দে ছিল আত্মহারা। পোল্যাণ্ড থেকে রুমানিয়া, রুমানিয়া থেকে গ্রীস, গ্রীস থেকে পারস্য এবং পারস্য থেকে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বহু পরিবার পায়ে হেঁটে, দীর্ঘ পথ, মাঠ, বন, গিরি-প্রান্তর পার হয়ে এসে পৌঁছেছিলো। তাদের না ছিল সঙ্গী, না ছিলো পথের পাথেয়। কত ভাইয়ের বোন হারিয়ে গেছে, কত বোনের ভাই হারিয়েছে! কত স্ত্রী স্বামী হারিয়েছে, কত স্বামী তার স্ত্রীকে আর খুঁজে পায়নি। এই রকম অবস্থার ভেতর ইউরোপের সমস্ত দেশ হয়ে উঠলো আতঙ্কের স্থান। সবাই চায় আশ্রয়, সবাই চায় আহার। তারপর দুর্যোগের রাত্রি কেটে যাওয়ার পর এলো জার্মেনীর আত্মসমর্পণ। এখন ইউরোপ যে-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তার প্রথম সমস্যা তার ছেলেমেয়ে।

ইউরোপের দেশে দেশে এখন শান্তির আয়োজন চলেছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এবার শান্তির ও স্বস্তির জয়গান গাইতে হ'বে। তাই দিকে দিকে তার আয়োজন চলেছে। জার্মেনীর মাটির তলা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে এক শহর—সেখান থেকে প্রায় দশ হাজার ছেলেমেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে, এখন তাদের বাঁচাতে হ'বে। অষ্ট্রিয়া, যুগোস্লোভিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশের গ্রামাঞ্চল থেকে আরো অনেক দুস্থ ও অনাথ ছেলেমেয়ে আজ সেই দিকে তাকিয়ে আছে, যাদের হাতে আছে খাদ্য আর যুদ্ধ শেষের সুখ-শান্তির জীয়ন-কাঠি!

সম্প্রতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একজন প্রতিনিধির কাছ থেকে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে একটি বিস্তারিত ডায়েরী পাওয়া গেছে। তাঁর লেখার ভেতর ফুটে উঠেছে একটি করুণ ছবি, যে-ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠলে মনে হয় ইউরোপ যেন মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে, আর হয়ে যাবে-ও।

"...ঘুম ভেঙ্গে গেলো কার পায়ের শব্দে। চেয়ে দেখি এক-ফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার ঘরে, কেমন সোনালি রোদ্দুর! কতদিন যেন এখানে সূর্য্য ওঠেনি। কাঠের জানলার পাশেই একটা ওক্ গাছ, হাওয়ায় তার পাতা দুলছে। ক্যাম্পের চারদিকেই একটা প্রভাতের প্রশান্তি। চেয়ে দেখলুম আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মেয়েটি, কাল যাকে একটি রুটির টুকরো দিয়েছিলাম। অত্যন্ত করুণভাবে চেয়ে আছে আমার দিকে। ছোট্ট মেয়ে, মাথায় সোনালি চুলের গুচ্ছ, চোখে আকাশের তারার মত গভীরতা। তবু আমি জানি ও বাঁচবে না। কাল ওকে পরীক্ষা করে দেখেছি। ওর টাইফাস্ হয়েছে। এক টুকরো রুটি নিয়ে ও চলে গেলো। বোধ হয় কাল আর ওকে দেখতে পাবো না আমার ক্যাম্পে। আমাদের ক্যাম্পে সবাই নিজের নিজের গল্প বলতে ব্যস্ত। নিজের নিজের করুণ কাহিনী। মৃত্যুর কাহিনী। ছুটির দিন ক্যাম্প থেকে শহরের দিকে বেড়াতে যেতাম। সেখানেও নানা রকম দুঃখের কাহিনী শুনতে পেতাম। যেখানে যত বেশি লোকের ভীড়, সেখানে তত বেশি বিচিত্র কাহিনী। বাড়ীর সামনে, দোকানের দরজায়, গির্জ্জায়, ফুটপাতে যেখানে হোক দেখতে পেতাম ছেলেমেয়েরা বসে আছে। আর গল্প করছে। একটি পোলীয় ছেলের সঙ্গে আলাপ হোলো। আমাদের ক্যাম্পেই একদিন ছিলো। তার আগে পোলাণ্ডে ছেলেটি এক অর্কেষ্ট্রা-দলে ছিলো। সমস্ত ইউরোপ ঘুরে এসেছে। ওয়ারস-র যুদ্ধের সময় সেখানে ছিলো। তারপর বন্দী অবস্থায় জার্মেনীর অন্তর্গত বুখানওয়াল্‌ডের কারখানার কাজে নিযুক্ত হয়। তার কিছু দোষ ছিল না। সে বললে। তার ঘরে নাকি এক ইহুদী পরিবার ছিল, আর সে নাকি দেশের জন্য লড়াই করছে, এই তার অপরাধ। এখন সে এখানেই আছে। তার কাছে যুদ্ধের আরো অনেক গল্প শুনতে পেলাম।

কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। বুখানওয়াল্‌ডের ক্যাম্পে কত রকমের লোক দেখলাম! যে-দৃশ্য আমি কোনদিন ভুলব না! হলুদ দৃষ্টি-হারা চোখ, তোবড়ানো চোয়াল। আর রুক্ষ চুল—দেখলে মনে হয় এক একটি জীবন্ত কঙ্কাল। ক্ষুধিত পশুর মত চেহারা—হাজার হাজার ছেলেমেয়ে। ক্যাম্প হাসপাতালে সবাই পড়ে আছে, টাইফাসে ভুগছে। যখন প্রথম দিন এই "বুখানওয়াল্‌ড" ক্যাম্পে এলাম, আমরা মাত্র চারজন ছিলাম। এখন আমরা আছি তিন হাজার—পুরুষ ও মহিলা কর্ম্মী। আর আমাদের ক্যাম্পে আছে আট শত ছেলেমেয়ে।

নদীর ধারে আমাদের ক্যাম্প পড়েছে। ব্যারাকের পর ব্যারাক। একদিকে পাইনের ঘন জঙ্গল আর অন্যদিকে দূরে আল্‌পস পর্ব্বতের শিখর-চূড়া সোনালি রোদে ঝলমল করে। ১৯৩৯ সালের কথা মনে পড়লে কেমন যেন লাগে। তখন এখানে বিভিন্ন দেশের ক্রীতদাসেরা বাস করতো, আর ফ্যাসীবাদের চক্রে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেতো। আর তারা মুক্ত!

আমাদের ক্যাম্পের কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই চলেছে। শহরবাসীরা প্রত্যেক কাজেই আমাদের সাহায্য করছেন। শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপ করলুম। সন্ধান নিয়ে জানলাম যে, তাঁরা বিভিন্ন ইস্কুল খুলেছেন। বিশেষ কিণ্ডারগার্টেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পাইন গাছের ছায়ায় তাদের নিজের নিজের দেশীয় পোষাক পরে যখন নাচ-গান করে, তখন বেশ সুন্দর লাগে। রুশ শ্রমিকরাও আমাদের কাজে নানা ভাবে সাহায্য করছেন।

ক্যাম্পে বিভিন্ন দল তৈরী হয়েছে। প্রত্যেক দেশে আমাদের

কেন্দ্র। প্রত্যেক কেন্দ্রের ছেলেমেয়েরা নাচ-গান অভিনয় করে শহরের লোকদেরে আনন্দ দেয়। রুশাকদের অর্কেষ্ট্রা ও জাতীয় সঙ্গীত খুব সুন্দর। অনেক কেন্দ্রে এমন ছেলেমেয়ে আছে, যাদের আহার ও স্বাস্থ্য অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের জন্য অনেক হাঙ্গেরীয় ডাক্তার রয়েছেন। গ্রামে অনেক কেন্দ্র খোলা হয়েছে, সেখানে আমাকে কাজ করতে হয়। অনেকগুলি কারখানা তৈরি করা হয়েছে, সেখানে মেয়েরা ছেলেমেয়েদের জন্য জামা-কাপড় ও খেলনা পুতুল তৈরি করে। কিন্তু অনেককে নিয়ে আবার বিপদ হয়েছে। ক্যাম্প পুড়িয়ে, আসবাব-পত্র নষ্ট করে আমাদের কাজের অসুবিধা করছে। সব ক্যাম্পেই এই অবস্থা। যেদিন সামরিক বিভাগ থেকে এভাক্যুইশনের আদেশ এলো, মনটা ভারি খারাপ লাগলো। যাদের উপর একটা স্নেহ-ভালোবাসা জন্মেছিলো, তারা চলে যাবে, তাদের যেতে হবে। আমি সেই দিনটির কথা আজো ভুলিনি: পোলীশ ছেলেমেয়েদের আদেশ করা হোলো, তারা যেন এই মুহূর্ত্তে এই ক্যাম্প ছেড়ে চলে যায়। কোথায় আমরা যাব? সবার মুখেই এক প্রশ্ন। যেতে হবে উত্তর দিকে।...তারা চলে যায়। কিন্তু আবার সেই বসন্তকাল না আসা পর্য্যন্ত ওরা বোধ হয় কোন আশ্রয় পাবে না, পথে পথে দিন কাটবে।...তারা চলে যাবার পর শুনলাম যারা আসছে, তারা আশ্রয়হীন ইহুদী ছেলেমেয়ে!

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কখন তারা আসবে? আগষ্ট মাসের শেষে একদিন রাত্রি বেলা গোলমালে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেলো।—তারা এসেছে। কে একজন বললে আমাকে—দলে দলে, হাজারে হাজারে। এসো বাইরে এসে দেখো, কি যেন লোহিত সাগরের স্রোত। ঘুম-ভাঙ্গা চোখ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সত্যিই তারা এসেছে। আমি তাদের দেখলাম: শিশু, কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ মানুষের সুদীর্ঘ এক সারি, পরের পর সার বেঁধে আসছে। বেশির ভাগই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তাদের পিঠে ছোট বড় নানা রকম ঝুলি, হাতে খাবারের জিনিস-পত্র। আমি কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললাম। অন্ধকারে কারো মুখ চেনা যায় না, দেখা যায় না। তবু বেশ বন্ধুভাবেই তারা আলাপ করলে। অত্যন্ত ক্লান্ত তারা। পথের ক্লান্তিতে শ্রান্ত হয়ে জীবনের শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুনলাম ক্রমাগত আটদিন ধরে তারা হাঁটছে। চেকোস্লোভাকিয়ার ভেতর দিয়ে তারা পোলাণ্ড থেকে আসছে। আমরা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে গেলাম। বেদনায় আমার মন টন্‌টন্ করে উঠলো। কারণ আমরা ঠিকমত তাদের সাহায্য ও ব্যবস্থা করতে পারছি না। ক্যাম্প থেকে প্রায়ই চুরি হতে লাগলো। শেষে ইহুদী ছেলে-মেয়েদের ভেতরেই অনেকে লুঠ করা সুরু করলে। তখন ক্যাম্পে দেখা গেলো কোথাও বাতি নেই, বিছানা নেই; কোথাও কম্বল, চেয়ার, টেবিল আর অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না। তবু আমরা সেই গ্রীষ্মের ভেতর তাদের জন্য কফি আর সুপ তৈরি ক'রে দিতাম। কিন্তু শেষে তাদের এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে খাবার জন্যও কোনো তাগিদ নেই তাদের। খালি মেঝের ওপর তারা ঘুমোয়। কোন রকম চিন্তা নেই। যেন জীবনের সব কিছু ফুরিয়ে গেছে।...

আবার এক নূতন দল এলো। তাদের জন্য আলাদা ব্যারাক তৈরি হোলো। ইহুদী ছেলেমেয়েদের জন্য ইস্কুল খোলা হোলো। দেখলাম, তারা খুব আগ্রহভরে লেখাপড়া করছে। অন্যান্য জাতির শিক্ষকরাও তাদের শিক্ষকতা নিয়ে ব্যস্ত। এস্তোনিয়ান শিক্ষক নাচ নিয়ে আছেন, রুশ শিক্ষক, সমবেত সঙ্গীত। আর হাঙ্গেরীয় ডাক্তার ও নার্সরা ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষা নিয়েই ব্যস্ত।

আশ্চর্য্য, এতো ইহুদী ছেলেমেয়ে কোথা থেকে এলো? জার্ম্মানরা তো এদের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলো? এদের কি শেষ করতে পারেনি? এই প্রশ্ন আমার মনে জাগলো। আমি তাদের সেকথা বললাম। তার উত্তরে একটি ছোট্ট মেয়ে কথা বললে, তার নাম লুসিয়া, মাত্র ছয় বছর বয়স হবে। ওয়ারস-তে তখন যুদ্ধ চলেছে। লুসিয়া আর তার মা প্রাণভয়ে এক কনভেন্টে দিনের পর দিন কাটিয়েছে। তার বাবা শেষে আত্মহত্যা করে জীবন থেকে মুক্তি পেলেন। তাঁকে দেখতে ঠিক ইহুদীর মতো ছিলো, মেয়েটি বললে—তাই আমাদের তিনি ভয় পেতেন। কারণ আমরা ইহুদীর মত দেখতে নই। শহরে বোমা পড়তে শুরু করলো যখন, আমরা নান্‌-দের সঙ্গে পালিয়ে এলাম।...

আর একটি ছেলে, বয়স বোধ হয় সতেরো, নাম বললে হ্যান্স। জার্ম্মেনী যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে, তখন সে রাশিয়ায় পালিয়ে যায়। ১৯৪১ সালের কথা। লালফৌজের সঙ্গে সে কাজ করেছে। সেখান থেকে প্যালেষ্টাইনে তার যাবার ইচ্ছে ছিলো,—'সমবায় সমিতি'তে যোগদান করবার জন্য। অনেকেই তার মত শহরে না থেকে গ্রামের চাষীদের সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছে ..

ক্যাম্পে ব'সে আছি। আমাদের ক্যাম্প এখন সমস্ত ইহুদী ছেলেমেয়েদের তীর্থস্থান। ইউরোপের নানা জায়গা থেকে দলে দলে সবাই এখানে আসছে। আমরা আমাদের জাতিগত বিদ্বেষ ভুলতে পেরেছি। বিভিন্ন দেশীয় কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রায়ই আজকাল নাচ-গান-অভিনয় হয়। শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ও নার্সরা সেইসব উৎসবে যোগ দেন। রাশিয়ানদের সঙ্গে মেলামেশায় আমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে। কারণ, আমরা কেউ রুশ ভাষা জানি না। কয়েকটি রুশ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ করলুম ইংরেজিতে। জার্ম্মানদের হাতে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অত্যাচার সহ্য করেছে। কিন্তু তবু এরা বেঁচে আছে। আর বেঁচে থাকবেও। ইউরোপের সমস্ত দেশে দেশে আজ এই সমস্যা। আমরা এদের বাঁচিয়ে তুলব। ...

এখানে আবার কবে বসন্ত আসবে, তারই প্রতীক্ষায় আমরা ব'সে আছি। জানালার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, দূরে দেখতে পাওয়া যায় আলপস্ পর্ব্বতের তুষারের সারি। আর দেওদার আর পাইন বনের ঘন আস্তরণ। শীত এসেছে, মেঘ আর কুয়াসায় আচ্ছন্ন আকাশ। শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে মনটা ভারি হ'য়ে ওঠে। যেন সমগ্র ইউরোপের প্রতীক। ওর বুকে কবে আবার শ্যামল দূর্ব্বাদল জাগবে, কে জানে? যে ছবি চোখে পড়ে, সেটা যেন সেই পোলীশ মেয়েটির মতই করুণ।"

দরদী কথাশিল্পী

আচার্য্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই ত সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য যদি বাস্তবিক মুক্তির ব্যাপার হয় তবে আমাদের সাহিত্য একেবারেই পঙ্গু। আমাদের সাহিত্যে নতুন জিনিষ দেবার যো নেই। ইউরোপের কথা ধরুন। ওদের Church আছে, Navy আছে, Army আছে। ওদের অবাধ মেলামেশা আছে, আনন্দ আছে। আমাদের এদিক যাবার যো নেই, ওদিক যাবার যো নেই, কোন দিকে একটু নড়চড় হয়েছে কি সব গোলমাল হয়ে যাবে! তারই মধ্যে যে একটু পারে সে আমাদের নিত্যকার বৈচিত্র্যহীন সংসার ও সমাজের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

সাহিত্যে স্বাধানতার মানে অরাজকতা, anarchy নয়। এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা ক'রে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি—কথা হয় যেন সব লুকিয়ে লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। 'সিডিশন' (sedition) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক আমাদের দেশে এখন আর জন্মাবে না। রাজনীতিতে, ধর্ম্মে, সামাজিক আচার-ব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত বাঁধা, পা গুটানো আর থাকবে না, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেইদিন আবার সাহিত্যসৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।"

অক্টোপাশে আবদ্ধ বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের কথা চিন্তা করিয়াই আজ হইতে সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, যাহার ট্র্যাডিশন আজও আমাদের চিন্তায়, সাহিত্যে ও শিল্পে একই গতিতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।

২রা মাঘ শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ দিবস। বাঙ্গালীর পক্ষে এই ২রা মাঘ শোক উদ্‌যাপনের দিন। তাঁহার অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমস্ত বাঙ্গালীর সঙ্গে আমরাও শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এক বিচিত্র সঙ্ঘাতময় জীবন শরৎচন্দ্রের। ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ (৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩) হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। প্রথম সন্তানকে বুকে জড়াইয়া পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় সেদিন কি আনন্দেই না স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। ধনীর দুলাল ছিলেন না শরৎচন্দ্র। পরবর্ত্তী কালে নিজের মুখেই তিনি বলিয়াছেন: 'আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হ'তে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার-সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয়-গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম।'

তাঁহার কৈশোর ও প্রথম যৌবন প্রধানতঃ ভাগলপুরে মাতুলালয়েই কাটে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সেই-খানেই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবাসী বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় ইংরেজী স্কুলে প্রবেশ করেন। তৎপর হুগলী ব্রাঞ্চ ইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং পরে পুনরায় ভাগলপুরে ফিরিয়া টি. এন. জুবিলী কলেজিয়েট ইস্কুল হইতে ১৮৯৪ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শরৎচন্দ্রের উদ্যোগেই তখন ক্ষুদ্র একটি সাহিত্যসভা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সভার মুখপত্র ছিল 'ছায়া' নামে ক্ষুদ্র একখানি হাতে লেখা কাগজ। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর শরৎচন্দ্র এফ-এ পড়িবার জন্য টি. এন. জুবিলী কলেজে ভর্ত্তি হ'ন। পরের বৎসর তাঁহার স্নেহময়ী গর্ভধারিণী ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয়। সাংসারিক দারিদ্র্য ও আত্মীয়-পরিজনের সাহায্য প্রভৃতির অভাবে এফ-এ

পরীক্ষা দেওয়া আর তাঁহার পক্ষে ঘটিয়া উঠিল না। বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনে শরৎচন্দ্রের মন দিতে হইল। শ্বশুরপুরে থাকিয়া তিনি কিছুদিন বনেলী ষ্টেটে একটি সামান্য চাকুরীতে ঢোকেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তাহাতে মন বসিল না। চিরকালের বহির্মুখী মন একদিন তাঁহাকে নিরুদ্দেশের পথে টানিয়া আনিল। এখানে সেখানে ঘুরিয়া তিনি মজঃফরপুরে উপস্থিত হ'ন। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ পিতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আবার তাঁহাকে ভাগলপুরে আসিতে হয়। ক্রমে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইলে কিছুদিন তিনি কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে মাতুল লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আসিয়া থাকেন এবং হঠাৎই একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া ভাগ্যান্বেষণে তিনি ব্রহ্মদেশে যাত্রা করেন। তারপর হইতে দীর্ঘকাল তাঁহার ব্রহ্মপ্রবাসে কাটে। সেখানে রেঙ্গুন একাউন্টেন্ট্ জেনারেল আপিসে তিনি কাজ আরম্ভ করেন এবং সেইখানে অবস্থানকালেই বন্ধুবান্ধবদের পীড়াপীড়িতে তিনি নতুন করিয়া সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন সালে তাঁহার বিভিন্ন কাহিনীর প্রকাশ এইরূপ :—

জীবিতকালে—১। বড়দিদি—১৩২০ (৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯১৩); ২। বিরাজ বৌ বৈশাখ, ১৩২১ (১৯১৪) ৩। বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পথ নির্দ্দেশ—শ্রাবণ, ১৩২১ (১৯১৪); ৪। পরিণীতা—১৩২০ (১৯১৪); ৫। পণ্ডিতমশাই—১৩২১ (১৯১৪); ৬। মেজদিদি—১৩২২ (১৯১৫); ৭। পল্লী-সমাজ,—মাঘ, ১৩২২ (১৯১৬) ৮। চন্দ্রনাথ—১৯১৬; ৯। বৈকুণ্ঠের উইল—১৩২৩ (জুন ১৯১৬); ১০। অরক্ষণীয়া—১৩২৩ (১৯১৬); ১১। শ্রীকান্ত (১ম পর্ব্ব)—মাঘ, ১৩২৩ (১৯১৭); ১২। দেবদাস—১৩২৪ (১৯১৭); ১৩। নিষ্কৃতি—১৯১৭; ১৪। কাশীনাথ—১৩২৪ (১৯১৭); ১৫। চরিত্রহীন—১৩২৪ (১৯১৭); ১৬। স্বামী—ফাল্গুন ১৩২৪ (১৯১৮); ১৭। দত্তা—১৩২৫ (১৯১৮); ১৮। শ্রীকান্ত (২য় পর্ব্ব)—১৩২৫ (১৯১৮); ১৯। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (১-৭ খণ্ড)—১৯১৯-১৯৩৫; ২০। ছবি—১৩২৬ (১৯২০); ২১। গৃহদাহ—১৩২৬ (১৯২০); ২২। বামুনের মেয়ে—১৩২৭; ২৩। বারোয়ারি উপন্যাস—১৯২১ (১৩২৮); ২৪। দেনা-পাওনা—১৩৩০ (১৯২৩); ২৫। নারীর মূল্য—১৩৩০; ২৬। নব-বিধান—১৩৩১ (১৯২৪); ২৭। হরিলক্ষ্মী—১৩৩২ (১৯২৬), ২৮। পথের দাবী—১৩৩৩ (১৯২৬); ২৯। শ্রীকান্ত (৩য় পর্ব্ব)—১৩৩৩ (১৯২৭); ৩০। ষোড়শী (নাটক)—১৩৩৪ (১৯২৭); ৩১। রমা (নাটক)—১৩৩৫ (১৯২৮); ৩২। তরুণের বিদ্রোহ—১৯২৯; ৩৩। শেষ প্রশ্ন—১৩৩৮ (১৯৩১); ৩৪। স্বদেশ ও সাহিত্য—১৩৩৯; ৩৫। শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব্ব) ১৩২৯ (১৯৩৩); ৩৬। অনুরাধা, সতী ও পরেশ—১৩৪০ (১৯৩৪); ৩৭। বিরাজ-বৌ—১৩৪১ (১৯৩৪); ৩৮। বিজয়া (নাটক) ১৩৪১ (১৯৩৪); ৩৯। বিপ্রদাস—১৩৪১ (১৯৩৫); ৪০। রসচক্র (বারোয়ারি উপন্যাস)—১৩৪৩। মৃত্যুর পরে—১। শরৎচন্দ্র ও ছাত্র-সমাজ—১৩৪৪; ২। ছেলেবেলার গল্প—১৩৪৫ (১৯৩৮); ৩। শুভদা—১৩৪৫ (১৯৩৮); ৪ শেষের পরিচয়—১৩৪৬ (১৯৩৯)।

এতদ্ব্যতীত শরৎচন্দ্রের চিঠি-পত্র ও পুস্তাকারে অপ্রকাশিত রচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রে এত ছড়াইয়া রহিয়াছে যে, আজও তাহা সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত বা সঙ্কলিত হয় নাই। দেশের জন-সাধারণ এদিকে মন দিলে শরৎচন্দ্রের রত্নমঞ্জুষা চিরকালের জন্য বাংলার হৃদয়ে স্বর্ণ-পাত্রে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ এ সম্বন্ধে বহু সার্থক কাজ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের সমাবর্ত্তন-উৎসবে শরৎচন্দ্রকে 'ডি-লিট্' (ডক্টর অব লিটারেচার) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৩৪৪ সালে (১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮) ২রা মাঘ তাঁহার দেহান্তর ঘটে। স্বাধীনতার বীজ-মন্ত্রে তাঁহার বাণী এখনও আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে :

…'Right এবং Duty' এই দু'টো অনুপূরক শব্দ ত' সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সকল সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা একমুহূর্ত্তও দাঁড়াতে পারে না, এ ত' অবিসম্বাদী সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্বনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমার জন্মস্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্ত্তব্যের দায় নিয়েও ত আমরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটা পাবো, এতবড় অন্যায়, অসঙ্গত দাবী—এতবড় পাগলামী আর তো কিছু হ'তেই পারে না।' …'Non-co-operation বস্তুটা ভিক্ষে চাওয়া নয়, ও একটা কাজ, সুতরাং এ কথা কিছুতেই সত্য নয় যে, Non-co-operation-পন্থী এদেশে অচল, মুক্তির পথ সেদিকে যায়নি। অন্ততঃ এখনো একদল লোক আছে, তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক্, যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে আজও বিশ্বাস করে। এরা কারা জানেন? একদিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশ-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিল, উকীল তার ওকালতী ছেড়ে, শিক্ষক তার শিক্ষকতা ছেড়ে, বিদ্যার্থী তার বিদ্যালয় ছেড়ে, চারিদিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাদের অধিকাংশই আজ কারাগারে, এরা তাদেরই অবশিষ্টাংশ।'

…(১৪ই জুলাই, ১৯২২)

দেশবন্ধু—সুভাষ

ডাঃ শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৯২৭শে নভেম্বর মাসে সুভাবচন্দ্র বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পরে এক বৎসর মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে তাঁহার কাজ করিবার বেশ সুযোগ হইল। ইহার একটী সাইমন কমিসনের ভারতাগমন। দ্বিতীয়, মান্দ্রাজে কংগ্রেস আদর্শ। তৃতীয়, বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন। চতুর্থ, 'বাঙ্গলার কথার' পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পঞ্চম, কলিকাতায় ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশন।

সাইমন কমিসনের ইতিহাস

১৯২৭ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে বড়লাট লর্ড আরুইন এই সংস্কার-কমিসনের নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। ইহার আট নয় বৎসর পূর্ব্বে ১৯১৮ সালে যখন মণ্টেগু-চেম্‌স্ ফোর্ড (মণ্ট ফোর্ড) সংস্কার প্রকাশিত হয়, তখন এ রূপ কথারও ইঙ্গিত ছিল যে, মণ্টফোর্ড সংস্কার কিরূপ কার্য্যকরী হইল, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য দশবৎসর পরে একটী রাজকীয় (Royal) কমিসন গঠিত হইবে। ১৯২১ আর রিফর্ম্মস আইনের ৪৮ ধারায়ও এই কথাই আছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভারতবাসীরা রিফর্ম্মস

চালু করিবার সময়ে কোনরূপ সহযোগিতা করে নাই, দ্বৈত শাসন (উক্ত রিফর্ম্মানুযারী প্রদত্ত ডায়ার্কি) বরং ভাঙ্গিবার জন্যই বরাবর চেষ্টা করিয়াছে। তাঁহারা বরং শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য এক গোলটেবিল বৈঠক বা তদনুরূপ অপর কোন ব্যবস্থার কথাই বলিয়াছেন।

এই সংস্কারের উপর কংগ্রেসের পূর্ব্বাপর মনোভাব পাঠকের জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। মণ্টফোর্ড রিফর্ম্মের কথা সংবাদপত্রে বাহির হইবামাত্র ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাইতে কংগ্রেসের একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। সেবারেই প্রথম মডারেট্‌গণ কংগ্রেসে যোগদান করিতে বিরত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিলনের সুযোগ রাখিবার জন্য সংস্কার সম্বন্ধে কংগ্রেস-প্রস্তাবটা একটু নরম হয়। তবে ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের যে চিরাচরিত অধিবেশন হয়, তাহাতে সংস্কার অসন্তোষপ্রদ ও নৈরাশ্যজনক প্রকাশ করিয়া পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসন যেন অনতিবিলম্বে (১৫ বৎসর মধ্যে) দেওয়া হয়, এরূপ প্রস্তাব পাশ হয়।

১৯১৯ সালে রাউলট আইন বিধিবদ্ধ হয়, মহাত্মাজী 'সত্যাগ্রহ' করেন এবং জালিয়ানওয়ালা বাগে পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসরে দুইটি অনুসন্ধান-কমিটী বসে। একটী সরকারী হাণ্টার কমিটী আর একটি দেশীয় (Punjab Disorders Enquiry Committee)। এই অনুসন্ধান-কমিটীর কাজে দেশবন্ধু পাঞ্জাবে কয়েক মাস ছিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের ব্যবসাগত ক্ষতি ছাড়াও প্রায় নিজ তহবিল হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল।

১৯১৯ সালে অমৃতসরে যে অধিবেশন হয় তাহাতে মহাত্মাজী সংস্কারে সহযোগিতা করিতে পরামর্শ দেন এবং সেইভাবে একটী সংশোধন-প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। দেশবন্ধু চাহেন, সংস্কার চালু হইতে বাধা দিতে। লোকমান্য তিলক তাঁহার দিকে ছিলেন। অবশেষে মহাত্মার সঙ্গে একটী আপোষ হয়। আপোষে স্থির হয়, আবশ্যক মত বাধাও দেওয়া হইবে, আবার প্রয়োজন মত সহযোগিতা করাও হইবে।

১৯১৭, ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান কর্ণধারই ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

কিন্তু ইহার পরে হাণ্টার-কমিটীর রিপোর্টে কার্য্যতঃ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা স্যার মাইকেল ও-ডায়ার এবং সামরিক কর্ম্মকর্ত্তা জেনারেল ডায়ার, কর্ণেল জনসন প্রভৃতি কর্ত্তৃক অমানুষিক অনাচার অনুষ্ঠিত হইলেও তাহাদিগকে প্রশংসা করা হয়। এদিকে আবার জেনারেল ডায়ারকে এদেশ হইতে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রদান করা হয়। ইংরাজ-মহিলারা নাচের মজলিসে অর্থ সংগ্রহ করেন। বিলাতেও পাঞ্জাব-নাট্যক্ষেত্রের প্রধান প্রধান কুশীলবদের প্রতি শ্রদ্ধামূলক স্মৃতিফলক প্রস্তুতের আয়োজন হয়। খিলাফত ব্যাপারেও আবার সরকার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় এবং মুসলমানদের তীর্থস্থানগুলির উপরে খলিফার (তুরস্কের সম্রাটের) অবাধ ক্ষমতা রক্ষা না করায়, মুসলমানদের মন খুব তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠে। প্রধানতঃ এই দুইটি কারণের জন্য (পাঞ্জাব ও খিলাফত) ১৯২০ সালের কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কলিকাতায় লালা লাজপতরায়ের সভাপতিত্বে "অসহযোগ"প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

১৯২০ সালে ব্যবসা ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর মত দেশবন্ধু যে কিরূপে ভারতীয় নব আন্দোলনে মনপ্রাণ সংযোগে যোগদান করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রসিদ্ধ লেখকগণ বলিতেন If Mahatma Gandhi was the brain of the Non Co-operation Movement, Deshabandhu was the heart of it.

১৯২১ সালের সংস্কার আইন—(Government of India Act of 1921) জানুয়ারী হইতে চালু হয়। কংগ্রেসের নির্দ্দেশে ইহা বয়কট হয় এবং যাঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করেন তাঁহারা ছিলেন মডারেট-পন্থী। "একটু পাইলেই খুসী" এইরূপ ছিল তাঁহাদের মত। "Rally the moderates"—মডারেটদের হাতে রাখ, যাঁহারা চাহেন এবং ইংরাজ-মন্ত্রীদের মধ্যে সকলেই চাহিতেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সার্থক হইল।

১৯২১ গেল সম্পূর্ণ সংগ্রামের বৎসর। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু প্রতিরোধ করিবার জন্য 'কাউন্সিল-প্রবেশ' অসহযোগের অন্যতম পন্থা হিসাবে কংগ্রেস হইতে পাশ করাইয়া লন। অতঃপরে দেশবন্ধু হ'ন বাংলার কাউন্সিলের নেতা এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে করিলেন কেন্দ্রীয় পরিষদের নেতা। উভয় পরিষদেই কংগ্রেসান্তর্গত স্বরাজ দলের জয়জয়কার কায়েম হইল। স্বরাজীরা কাউন্সিলে যাইবার পরে, নূতন আইনানুসারে দ্বিতীয় নির্ব্বাচনের পরে ১৯২৪ সালে বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রথমে মন্ত্রী নিযুক্ত হ'ন অনারেবল্ স্বরেন্দ্র নাথ মল্লিক্, এ, কে, গজনবী ও মিঃ ফজলুল হক। কিন্তু মিঃ মল্লিক মিঃ স্বরেন্দ্র নাথ হালদারের সহিত নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে পরাজিত হইয়া সরিয়া পড়েন। অতঃপরে (১৯২৪, ২৪শে মার্চ্চ) কাউন্সিলে সরকার-পক্ষ হইতে মন্ত্রী-বেতন উপস্থিত করা হইলে স্বরাজীরা (৬৩ : ৬২ ভোটে) প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেন। বাজেট আলোচনার সময়েও সরকার পক্ষের দাবী নাকচ্ হয়। কিন্তু গভর্ণর লর্ড লীটন কনভেসন (এই সমস্ত অবস্থায় সর্ব্বত্র আচরিত রীতি) না মানিয়া মন্ত্রীদিগকে পূর্ব্ববৎ রাখিয়া দিলেন। এবং হঠাৎ কাউন্সিলের অধিবেশন বন্ধ (prorogue) করিয়া দেন।

১৯২৪ আগষ্ট মাসের কাউন্সিলে আবার দ্বিতীয়বার মন্ত্রী-বেতনের জন্য প্রস্তাব করা হয়। সে প্রস্তাব এবারেও অগ্রাহ্য হয়। মন্ত্রীদ্বয় পদত্যাগ করেন। ইহার পরে দেশবন্ধুর অনুপস্থিতিতে (অসুখের জন্য) ১৯৪৫ ফেব্রুয়ারী মাসে মন্ত্রীর বেতনের প্রস্তাব গৃহীত হইলেও গভর্ণর লর্ড লীটন, নবাব সৈয়দ নবাবআলি চৌধুরীকে এবং রাজা মন্মথকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু দেশবন্ধু তাড়াতাড়ি আসিয়া আবার মন্ত্রীবেতন অগ্রাহ্য করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং ৬৯ : ৬২ ভোটে জয়লাভ করেন।

দেশবন্ধু জীবদ্দশায় ডায়ারকে ধ্বংসকরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার পরে দুইবৎসর পর্য্যন্ত কোন মন্ত্রী নিযুক্ত হয় নাই। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও দেশবন্ধুর স্থলাভিষিক্ত হইয়া ১৯২৭-এর আগষ্ট মাসে মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও স্যার আবদুল করিম গজনবীর মন্ত্রীত্বের অবসান ঘটান।

বারম্বার চেষ্টা করিয়াও দ্বৈত শাসন স্থায়ী করিতে গবর্ণমেণ্ট কিছুতেই সক্ষম হইলেন না।

কেন্দ্রীয় পরিষদেও উপর্য্যুপরি গবর্ণমেণ্ট হারিয়া যান। লর্ড বার্কেনহেড্ (ভারত-সচিব) বলিতে বাধ্য হ'ন, "স্বরাজ্য দল সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্ট ও সংগঠিত দল। The most highly organized Political Party in India."

মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের যখন এইরূপ পরিণতি, তখন ১৯২৭ সালের ৮ই নভেম্বর বড়লাট বাহাদুর সাইমন কমিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু এ সময়ে গবর্ণমেণ্টের এইরূপ কমিশন নিযুক্ত করিবার কোন কারণই ছিল না। প্রকৃত অবস্থা নিম্নে জ্ঞাপন করিতেছি।

কেন্দ্রীয় পরিষদে উপর্য্যুপরি প্রস্তাবের পর প্রস্তাবে জয়লাভ হওয়ায় স্বরাজ্যদল হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে একটী গোলটেবিল বৈঠকের সহায়তায়ই মণ্টফোর্ড রিপোর্টের কার্য্যকারিতা অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী প্রস্তাব হইয়াছিল। তদনুসারে বড়লাট-কর্ত্তৃক মুডিম্যান কমিটী নিযুক্ত হয়। অনুসন্ধানের পরে মেজরটি ও আইনবিধি কমিটীর রিপোর্ট বাহির হইতে কেন্দ্রীয় পরিষদে পণ্ডিত মতিলাল পার্লামেণ্ট সংস্কারের একটী ঘোষণা করিতে বলেন—যেন সম্পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয় এবং পণ্ডিত মতিলাল সংখ্যাল্পদের স্বার্থে একটী গোলটেবিল বৈঠক চাহেন, অন্ততঃ এমন একটী কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান হইলেও চলিবে, যাহাতে ভারতীয়, ইউরোপীয় এবং এংলো ইণ্ডিয়ার সম্পূর্ণ স্বার্থ দেখিবার লোক থাকেন।*

* This assembly recommends to the Govrnnor General in Council to take steps to have the Government India Act revised with a view to establish full responsible Government in India, and

বলা বাহুল্য ৭২ : ৪৫ ভোটে স্বরাজ্য দলের প্রস্তাবটি ১৯২৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর পাশ হইলেও ইহার পরে এতৎ সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করা হয় না। অতঃপরেই দুই বৎসর পূর্বে এই সাইমন কমিশন নিয়োগ সম্বন্ধে ঘোষণা হয়।

তখন এমন বিশেষ কোন কারণ হয় নাই। এখন রিফর্ম চালু হইবার পরে দশ বৎসর কেন, সাত বৎসরও অতিবাহিত হয় নাই। সরকারের তৎপরতার নিম্নোক্ত কারণটি প্রকৃত বলিয়া মনে হয়।

১৯২৬ সালে বাঙ্গলার যে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কেবল বাঙ্গলায় নয়, ১৯২৭ সালে লাহোর, বেতিয়া ও দানাপুরে (বিহারে) পণাবালিয়ায় (বাঙ্গলা) মুলতানে, যুক্তপ্রদেশ, নাগপুর, সিন্ধুর লরকানা, প্রভৃতি স্থানে বিশেষ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং জন কুড়ি নিহত এবং প্রায় পৌনে তিনশত লোক আহত হয়। তদুপরি "রিসলা বর্ত্তমান" এবং "রঙ্গিলা রসুল" নামে দুইখানি হিন্দু পুস্তিকা পাঠ করিয়া মুসলমানগণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠেন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট 'রসুলের' সম্পাদককে মুক্তিদান দিলেও তাহাদের ক্রোধ নির্ব্বাপিত হয় না। অতঃপরে পুনরায় দুইখানির লেখকেরই শাস্তি হইলে তবে কতকটা শান্ত হন। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মিলন-সমিতি হয় বটে, কিন্তু মেঘ একেবারে কাটিয়া যায় নাই। এমন সময়ে গবর্ণমেণ্ট সাইমন কমিশন প্রদান করিয়া কোপ বুঝিয়া কোপ মারিলেন।

কিন্তু এই কমিশন আবার হিন্দু-মুসলমান মিলনের কারণ হইল। ইংলণ্ডের শ্রমিক দল যদিচ কমিশনকে উভয় আইন-পরিষদের সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কমিশনের কার্য্য পরিচালনা করিতে বলেন, কিন্তু সেরূপ হয় নাই। একদা যিনি ভারতীয়গণের স্বার্থের বিশেষ সমর্থন করিতেন, সেই মিঃ রেমজে ম্যাকডোনাল্ডের বাধাদানেই লেবার পার্টির মিঃ লানসবারী কমিশন হইতে শ্রমিক সভ্যগণকে পদত্যাগ করাইতে পারেন নাই।

এই কমিশনে কোন ভারতবাসী ছিল না। অবশেষে সরকার অনুগ্রহস্বরূপ এই কমিশনের পাশাপাশি একটি ভারতীয় কমিটিও নিযুক্ত করেন। কংগ্রেস এইরূপ ব্যবস্থা জাতির আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর মনে করিয়া কমিশন বর্জ্জন করাই স্থির করেন:—

কংগ্রেস মাদ্রাজের ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনেই কমিশন বর্জ্জন করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব করেন।

"Whereas the British Government have appointed the Statutory Commission in utter disregard of Indias self-determination.—

for the said purpose (a) to summon at an early date a representative Round Table Conference to recommend, with due regard to the protection of rights and interests of important minorities, a scheme of a Constitution for India and (b) after dissolving the Central Legislature to place the said scheme for approval before a newly elected Indian Legislature or its approval and submit the same to the British Parliament to be embodied in a Statute.

This Congress resolves that the only self-respecting course for India is to boycott the Commission at every stage and in every form.

"যেহেতু ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়গণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সমস্ত প্রচেষ্টা অবহেলা করিয়া এই কমিশন নিযুক্ত করিয়াছে, কংগ্রেস প্রত্যেক ব্যাপারে এবং সর্ব্বপ্রকারে ইহা বর্জ্জন করিবে।"

কেবল সহজ বর্জ্জন নয়। যে সমস্ত জায়গায় কমিশন যাইবে, সেই সেই স্থানে জনসঙ্ঘ অসহযোগিতা কার্য্যে প্রকট করিবে। যাহাতে এইভাবে বর্জ্জিত হয়, কাগজপত্র ও সভাসমিতির সহায়তায় তাহার প্রচার হইবে। কাউন্সিলের বে-সরকারী পরিষদগণ যেন কমিশনের সম্মুখে না আসে ও সাক্ষ্য না দেয় বা কেহ যেন কোন সিলেক্ট-কমিটিতে না যায়, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য প্রতিবাদের সহযোগিতায় বয়কট একেবারে পুরোপুরি সাফল্যযুক্ত করিবে।

ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, খিলাফত কমিটি, হিন্দু মহাসভা, লিবারেল ফেডারেশন প্রভৃতিও কমিশন বর্জ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ন।

সুভাষচন্দ্র তখন বাঙ্গলার নেতা হিসাবে এই বয়কট সাফল্যযুক্ত করিবার জন্য বিশেষ বদ্ধপরিকর হইলেন।

দ্বিতীয়তঃ মাদ্রাজ কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের মনোমত আর একটী প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য—

This Congress declares the goal of the Indian people to be complete National Independence.

অর্থাৎ পূর্ণ স্বরাজলাভ যে ভারতবাসীর লক্ষ্য, এই কংগ্রেস তাহা ঘোষণা করিতেছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কিছুদিন ইউরোপে ছিলেন। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া মাদ্রাজে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে কংগ্রেসের সহিত যোগদান করেন। ১৯২৮-এর জানুয়ারী মাসের গোড়ায় একদিন দেশবন্ধু-পার্কে (শ্যামবাজারের) একটী সভা হইতেছিল। সভা কিছুক্ষণ পরে হইবার কথা। সুভাষচন্দ্র গম্ভীরভাবে আয়োজনোপলক্ষে এর তার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। হঠাৎ জওহরলাল আসিলেন। তাঁহাকে খুব প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। মুখখানিতে স্বাধীনতা প্রস্তাবের ভাবী আন্দোলনের রশ্মি বেশ ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সেবার সুভাষচন্দ্র মাদ্রাজ গিয়াছিলেন কি-না ঠিক মনে নাই। তবে পণ্ডিতজী আসিয়াই খুব আনন্দের সহিত যখন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন, সে দৃশ্যটি আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯২৮) "সাইমন্স সাতজন" (Simon Seven) আসিয়া বোম্বাই পদার্পণ করেন। যে-দিন তাঁহারা লাহোরে যান, একটী বিয়োগান্ত দৃশ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ শিহরিয়া উঠে। ষ্টেশনে জাতীয়তাবাদিগণ একটী শোভাযাত্রা করিয়া উপস্থিত ছিলেন। সম্মুখে ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায় এবং পার্শ্বে ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার আলম। মিঃ সাণ্ডার্স ছিলেন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তিনি সদলবলে উপস্থিত ছিলেন এবং লালাজী ভীষণ ভাবে লাঠির দ্বারা প্রহৃত হন। তাঁহার

বুকে, মাথায়, কাঁধে লাঠির আঘাত পড়ে। তাঁহার ফুসফুসে চোট লাগে এবং তিনি ঐ যে শয্যাশায়ী হ'ন, জীবদ্দশায় আর উঠেন না। ১৯২৮এর আগষ্ট মাসে তাঁহার পবিত্রাত্মা নশ্বরদেহ ছাড়িয়া যায়। এইরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা বহু স্থানে হয় এবং কমিসনকে এইজন্য অনেক স্থানে আখ্যা হয় "লাঠি-কমিসন।"

কলিকাতায় সুভাষচন্দ্র যুবক ছাত্র প্রভৃতি লইয়া বহুবার শোভাযাত্রা করেন। শোভাযাত্রা বাহির করিয়া স্থানে স্থানে বলা হইত "সাইমন গো ব্যাক্"—লেখক সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ২১ বার এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছেন।

স্যার জন সাইমনের সঙ্গে আজকালকার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লিও আসিয়াছিলেন। আমাদের একটী বন্ধু কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ১৯২১।২২ সালে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে ছিলেন। তিনি একটু রহস্যপ্রিয় ছিলেন। তিনি সুভাষচন্দ্র কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কমিশন উপলক্ষে ২১ বার বক্তৃতাও দেন। তিনি বলিতেন সাইমন—না ছাইমন। এট্‌লি না আও আট্‌লি। কালিকা বাবু সাতজনেরই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা খুব রসসঞ্চার করিত।

১৯২৮ সালের মার্চ্চ মাসে একদিন সকালে এলগিন রোডের বাড়ীতে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছি। এই সময় দেওঘর ষড়যন্ত্রের মামলা চলিতেছিল। তন্মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ধরানাথ ভট্টাচার্য্য, বিশ্বমোহন সান্যাল, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন আসামী ছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ নামে একটী পাঞ্জাবী ছেলেও আসামীদের মধ্যে ছিল। ধরানাথ ভট্টাচার্য্য কংগ্রেসের হুগলী জিলায় একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী। ধরানাথ বাবুর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। দুইজনে কথাবার্ত্তা বলিতেছি। হঠাৎ একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইঁহার প্রতি সুভাষের তেমন শ্রদ্ধার ভাব দেখিলাম না। তিনি বলিলেন "হেমবাবু, বোধ হয় বেশী দিন বাহিরে থাকিতে দিবে না।"

এই সময়ে সুভাষবাবু বাঙ্গলার কংগ্রেস-কার্য্যে খুবই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মিঃ সেনগুপ্তও ১০।১ এলগিন রোডে থাকিতেন। সুভাষ প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শাদি গ্রহণ করিতেন।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই সুভাষ বুঝিলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন কংগ্রেসের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিতে পারিলে কংগ্রেসের অন্যান্য কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়,এইজন্য ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি মেয়রপদের জন্য প্রার্থী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে সেনগুপ্ত মহাশয় ১৯২৫, ১৯২৬ ও ১৯২৮ ও ১৯২৭ তিনবারই ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সুভাষচন্দ্র যাহাতে মেয়র হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপর দিকে ছিলেন লিবারেল দলের বিজয়কুমার বসু মহাশয় (মিঃ বি, কে, বসু)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই সময়ে হিন্দু-মুসলমান প্রীতিবন্ধন শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস-বিরোধী অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল (Reactionary) ব্যক্তিও ছিলেন। সেনগুপ্ত মহাশয় ব্যক্তিগত মধুর ব্যবহারে এবং কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় সকলেরই হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এবার সংঘর্ষ হইল প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস-নেতার ও প্রতিক্রিয়াশীল দল-মনোনীত ব্যক্তির সহিত। কংগ্রেসের এই পরাজয় কংগ্রেসকে শক্তিশালী ও কার্য্যক্রম করিতে সুভাষচন্দ্রকে আরও উদ্দীপিত করিয়াছিল।

ইহার পাঁচ দিন পরেই বসিরহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী হয়। সেনগুপ্ত মহাশয়ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অভিভাষণে তিনি বাঙ্গলার বলিয়াছিলেন। 'আনন্দমঠ' হইতে তাহার একটী উদ্ধৃত কথা "এ যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে" এখনও মনে আছে। অভিভাষণটি বেশ সরস হইয়াছিল। একস্থানে তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমরা আমাদের শাসনতন্ত্র রচনা করিব এবং আমরা দাবী করিব আমাদের রচিত শাসনতন্ত্রের দ্বারাই ভারতবর্ষ শাসিত হইবে। যদি আমাদের সেই দাবী স্বীকৃত না হয় এবং আয়র্লণ্ডে যাহা আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল, ভারতেরও সে অবস্থার উদ্ভব হয়, তবে তজ্জন্য আমরা দায়ী হইব না।"

"সাইমন কমিসন ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া কি শাসনতন্ত্র রচনা করিবে? আমরাই নিজেরাই আমাদের শাসনতন্ত্র রচনা করিব"—মিঃ সেনগুপ্তের বলার তাহাই উদ্দেশ্য ছিল। আজ গণপরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল যাহা বলিতেছেন, প্রায় বিশ বৎসর আগে, দেশপ্রিয়, সেনগুপ্ত তাহাই বলিয়াছিলেন। বরাবর দেশপ্রিয়কে দেখিয়াছি কংগ্রেসের রাজনীতিমূলক প্রস্তাব দেশবন্ধুর যোগ্য শিষ্য হিসাবে তিনি অক্ষরে অক্ষরে মানিতেন। পাঠকের অবগতির জন্য বলিতেছি, তিনমাস পূর্ব্বে মাদ্রাজ কংগ্রেসে ১৯২৭ ঠিক এইরূপ প্রস্তাবই পাশ হইয়াছিল :—

"Having regard to the general of all political parties in the country to unite together in setting a Swaraj Constitution and having considered the various drafts submitted to it and the various suggestions received in reply to the Working Committees circulers, this Congress authorises the Working Committee, which shall have power to co-opt to confer with similar Committees to be appointed by other organisations political, labour, commercial and commerceil in the country and to draft a Swaraj Constitute for India on the basis of a Declaration of Rights and to place the same for consideration and approval before a special convention to be convened in Delhi not later than March consisting of the All India Congress Committee and the leaders and representatives of the other organisations above mentioned and elected members of the Central and Proviacial Legislatures"

সুভাষচন্দ্রই বিশেষ মনঃসংযোগে কনফারেন্সের কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। তবে তাঁহার নিয়মতান্ত্রিকতায় এবং শৃঙ্খলাপ্রিয়তা কেহ কেহ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তাহার প্রতি কয়েকজনের ভাব অনুধাবন করিয়া ডাক্তার সুরেন্দ্রচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "সুভাষের বিরুদ্ধে একটা দল দেখিলাম।"

এই সময়ে আমরা ১৯ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ানষ্ট্রীটে (ফরওয়ার্ড আফিসে) প্রায়ই বসিয়া কংগ্রেসের কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতাম। সুভাষবাবু, কিরণশঙ্করবাবু ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কর্ম্মীগণ থাকিতেন। মাঝে মাঝে সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতেন। তবে তিনি বেশ সুরসিক ছিলেন। তাঁহার আলাপে রসের ভাগ খুবই থাকিত। তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে কিরণশঙ্করবাবুও বেশ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মধুবাবু (শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ) দুই সতীশচক্রবর্ত্তী (যশোহর ও ময়মনসিংহ) মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, ভূপতি মজুমদার প্রভৃতিও থাকিতেন।

এইখানেই "বাঙ্গলার কথার" পুনঃপ্রকাশের কথা হয়। এই 'বাঙ্গলার কথার' একটু ইতিহাস আছে। তাই এখানে একটু পূর্ব্ব ইতিহাস প্রদান করা উচিত মনে করিতেছি। কে কোন্ সময়ে সম্পাদক ছিলেন, এ বিষয়ে অনেকেই ভুল করেন। বিশেষতঃ কোন কোন বিষয়ে মাস কয়েক আগে কিছু কিছু দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ায় আনন্দবাজার সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে বাঙ্গলার কথার একটা সঠিক ইতিবৃত্ত লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠকের কৌতূহলনিবৃত্তি হইতে পারে।

"বাঙ্গলার কথা"

"বাঙ্গলার কথা" প্রথমে বাহির হয় সাপ্তাহিক ভাবে ১৯২১ নভেম্বর মাসে। তখন অমৃতবাজার, সার্ভেণ্ট, বসুমতী প্রভৃতি কাগজ থাকা সত্ত্বেও দেশবন্ধুর মতবাদ প্রচারের জন্যই স্বল্পায়তন কাগজখানিরও প্রয়োজন হইয়াছিল। তখন হইতেই অনেকে দেশবন্ধুর বিরোধী ছিলেন।

দেশবন্ধু ১৯১৭ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীতে সভাপতিরূপে ভবানীপুরে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, পুস্তকাকারে তাহা "বাঙ্গলার কথা" নামে বাহির হয়। সকলের ইচ্ছাক্রমে এই নামেই এখন কাগজ বাহির হয়। কাগজখানি 'হিতবাদী যন্ত্রে' মুদ্রিত হইত এবং "বাঙ্গলার কথার" প্রথম সম্পাদক দেশবন্ধু * নিজেই হন। তবে লিখিবার ও সম্পাদনা করিবার ভার ছিল শ্রীযুক্ত হেমন্ত সরকারের উপর। প্রিণ্টারও (মুদ্রাকর) ছিলেন হেমন্ত বাবুই। কোনরূপ ডিক্লেরেসন না দিয়াই কাগজ বাহির হয়। বাংলার কথায় রাজনৈতিক সংবাদ ও মতামত ছাড়া সাহিত্যের কথাও কিছু কিছু থাকিত, টীকা-টিপ্পনিও সামান্যভাবে থাকিত। দেশবন্ধুর সম্পাদনাকালে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায় মহাশয়ের একটা প্রবন্ধ বাহির হয়। কিরণ বাবু এবং মুদ্রাকর হিসাবে অরবিন্দ বাবু গ্রেপ্তার হ'ন। হেমন্ত বাবু জেলে যাওয়ার পরে (৭ই ডিসেম্বর ১৯২১) অরবিন্দ বাবুই মুদ্রাকর হ'ন। হাতের লেখা প্রমাণিত না হওয়ায় কিরণ বাবু খালাস পান। কিন্তু অরবিন্দ বাবুর ছয় মাস জেল হয়। কিরণ বাবুর মামলা কেবল মুলতুবি হইত। তাই রহস্যপ্রিয় কিরণ বাবু আমাদের কাছে বলিতেন "গভর্ণমেণ্ট ভাবছে মহাত্মার সঙ্গে আমাকেও দেশান্তরিত (deport) করবে কি না। তবে সৈন্য ও পুলিসদের মধ্যে গোলমাল হ'তে পারে বলেই সাহস পাচ্ছে না।"

হেমন্তবাবু ১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হইলে বাঙ্গলার কথার জন্য দেশবন্ধু চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং ঔপন্যাসিক শরৎবাবুকে কিছু কিছু দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন। দুই একদিন মধ্যে ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধুও গ্রেপ্তার হ'ন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত সুকুমার রঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া কাগজ বাহির করিবার আদেশ দেশবন্ধু দেন। কাগজখানি ৮।১০ মাস চলে এবং এই স্বল্পকাল সুকুমার বাবুই সম্পাদক থাকেন। তিনিই "বাঙ্গলার কথার" দ্বিতীয় সম্পাদক।

বাংলার কথার তৃতীয় সম্পাদক হ'ন সুভাষচন্দ্র। ১৯২২ সালের গয়া-কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বে কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য কাগজখানি দৈনিক করিবার কথা হয়। এই দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় ভার দেওয়া হয় সুভাষচন্দ্রের উপর। এই দৈনিক কাগজখানি বলরাম দে ষ্ট্রীটস্থ মেটকাফ প্রেসে 'ট্রেডল মেসিনে' ছাপা হইত। কাগজের আফিস ছিল রামতনু বসু লেনে। বাঙ্গলার কথার আকার তখন ছোট ছিল, ফুলস্ক্যাপ কাগজের ৪ পৃষ্ঠা। দেশবন্ধু স্বয়ং কাউন্সিল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। কাগজের চাহিদা তখন খুব বেশী ছিল। সুভাষচন্দ্র খুব পরিশ্রম করিতেন এবং নিজেই হকারদের কাছে কাগজ বিলি করিতেন। সারাদিন খাটিবার পরে অনেকদিন আফিস হইতে চীনা-বাদাম খাইতে খাইতে তাঁহাকে বাহির হইতেও দেখা গিয়াছে।

এই কাগজখানি মাত্র কয়েকমাস চলিয়াছিল। বোধহয় মাস ৩।৪ এর বেশী নয়। তারপর ইংরাজী ফরওয়ার্ড কাগজের তোড়-জোড় চলে। তাহা বাহির হয় ১৯২৩ সালের ২৩শে অক্টোবর হইতে। দেশবন্ধুই হ'ন প্রধান সম্পাদক (Editor in Chief), সুভাষচন্দ্র ম্যানেজার, ফরওয়ার্ড পাবলিসিং কোম্পানীর ডিরেক্টার হইয়াছিলেন দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত প্রভুদয়াল হিম্মত সিংহকা ম্যানেজিং ডিরেক্টার প্রথম ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

---

* বাঙ্গলার কথার সম্পাদক সম্বন্ধে যে কবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের "নেতাজী সুভাষ চন্দ্রে" পৃঃ ৬২, ৬৩ যে উক্তি আছে—একখানি সাপ্তাহিক "বাঙ্গলার কথা" সম্পাদক সুভাষচন্দ্র বসু—১৯২১ সালে" এই কথা ভ্রমাত্মক, "বাঙ্গলার কথা"র সমস্ত বিষয় দেশবন্ধুর অন্তরঙ্গ হিসাবে আমি নিজে জানিতাম। তবে সুধীসমাজের নিকট কেবল আমার উক্তির উপর নির্ভর না করিয়া আরও প্রমাণ উপস্থিত করা উচিত। যে হেমন্ত বাবুর কথা সাবিত্রী বাবু লিখিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেই সময়ের রচিত ও প্রকাশিত "বন্দীর ডায়েরী"তে (পৃঃ ১) লিখিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত "বাঙ্গলার কথার" declaration না দিয়া প্রিণ্টার-পাবলিসার হইয়াও জেলে যাওয়ার সুযোগ আসিল না।

"বন্দীর ডায়েরীর" ভূমিকা লিখিয়াছিলেন ১৯২২ সালের ১৫ জুলাই তারিখে সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

নানা কারণে তিনি ছাড়িয়া দেওয়ায় শ্রীযুক্ত শরৎ বসু মহাশয়কে ম্যানেজিং ডিরেক্টার করা হয়। এই পরিবর্ত্তন-সভায় দেশবন্ধুর সহকারী হিসাবে আমরা উপস্থিত ছিলাম। সংবাদপত্র পরিচালন—সম্পাদক হ'ন শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু। শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সীও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সত্যবাবুর লেখা দেশবন্ধু খুব পছন্দ করিতেন। উপেন্দ্র বাবুকেও সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিবার জন্ম দেশবন্ধু ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই ব লয়াছি কাগজ বাহির হইবার পূর্ব্বে তিনি ধরা পড়েন।

এই সময় সুভাষ আর একখানি কাগজেরও ভার লইয়াছিলেন। সেখানি সাপ্তাহিক "আত্মশক্তি"। ইহা বৌবাজার চেরী প্রেস হইতে মুদ্রিত হইত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কাগজখানি পরিচালনা করিতেন। পরে টাকা বাকী পড়ায় বিক্রী করিয়া ফেলেন। সুভাষই ইহা ক্রয় করেন। 'আত্মশক্তি' সম্পাদনা করিতেন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। আত্মশক্তি চলিতেছে এবং ফরওয়ার্ডও বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ১৯২৩ সেপ্টেম্বর মাসে (Regulation III of 1818) এ গ্রেপ্তার হন। মনোমোহন বাবুর উপরই ফরওয়ার্ড পরিচালনার ভার ছিল। ১৯২১ সাল হইতেই তাহার সঙ্গে কথা হইতেছিল। এখন হইতে ভার পড়িল সুভাষচন্দ্রের উপরে। আত্মশক্তিও তিনি চালান। উপেন্দ্রবাবুর কাগজ বলিয়া কাগজখানির উপরে সুভাষের খুব শ্রদ্ধা ছিল। প্রথমে তিনি শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তীকে দিয়া পরে শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় "আত্মশক্তি" চালান। তবে দেখিয়াছি শ্রীযুক্ত গোপাল সান্যালের উপরেই সম্পূর্ণ ভার ছিল। কিছুদিন পরে শচীনবাবু ছাড়িয়া দেন এবং গোপালবাবুই একমাত্র সম্পাদক থাকেন। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল মহাশয়ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুভাষ তাঁহাকেও খুব শ্রদ্ধা করিতেন।

ফরওয়ার্ডের সঙ্গেও আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ব্যক্তিগত হইলেও ইতিহাসের সম্পূর্ণতার জন্ত তাহা দরকার। দেশবন্ধু বোম্বাই হইতে হাজার ত্রিশেক টাকা আনিয়াছিলেন। মাদ্রাজ হইতেও সামান্ত কিছু পাওয়া গিয়াছিল। ইহাই ছিল সম্বল। তার উপরে আবার শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এবং উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ধরিয়া নেওয়ায় তিনি হীনবল হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে টাকার খুবই আবশ্যক। সুভাষচন্দ্র শেয়ার বিক্রীর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ টাকা প্রাপ্তি হয় নাই। একদিন আমি দেশবন্ধুকে বলিলাম—

"আমাকে শেয়ার বিক্রীর ভার দেন। কিন্তু কমিসন বেশী দিতে হইবে।"

তখনও ফরওয়ার্ড-অফিস ছিল ধর্ম্মতলায়। কিন্তু শীঘ্রই ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজের বাড়ীতে যাইবে স্থির হয়। দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত তুলসী গোস্বামীর সহায়তায় তাহা হয়। এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টার শরৎ বাবু সানন্দে আমাকে এই ভার দিয়াছিলেন। তখন আমার টাকা-কড়ির বড় অভাব ছিল, প্রাকটিস ছাড়িয়া দিলে দেশকার্য্যরত উকীলদের একশত দেড়শত টাকা করিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু আমি কোন এলাউন্স নিতাম না। এই সময়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিই, তাহাতে দেশবন্ধুও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। আমারও অর্থাভাব অনেকটা ঘুচিয়া গেল। শরৎ বাবুরও টাকার বিষয়ে চিন্তা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।

শরৎ বাবুর নিকটে ব্যক্তিগত ভাবে আর একটী বিষয়ে আমি ঋণী ছিলাম। আমার ইংরাজী প্রবন্ধ History and Development of the Bengali Stage ফরওয়ার্ডে ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর হইতে প্রতি রবিবার বাহির হইত। শরৎ বাবু একদিন বলেন, "হেমেন্দ্র বাবু, একটা Stage and Screen মঞ্চ ও পর্দ্দার বিভাগ খুলিব, আপনি হইবেন সম্পাদক।" ইহার পর হইতে ফরওয়ার্ডের মত সর্ব্বপ্রধান কাগজের আমিই প্রথম মঞ্চ সম্পাদক হইলাম। ইহাতেও অর্থাভাব লাঘব হওয়ায় দেশবন্ধুর কাজ বিশেষ মনঃসংযোগে করিতে পারিতাম। সেই সময় সুভাষ বাবুও কর্পোরেশনে গিয়াছিলেন। মৃণাল বাবুও আবার অমৃতবাজারে চলিয়া যান। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী বার-এট-ল তাহার স্থানে কাজ করেন। এবং নিউজ এডিটার (বার্ত্তা সম্পাদক) হ'ন ডক্টর আর্থার রায় (A, S. Roy)।

প্রফুল্ল বাবুর সম্পাদকীয় মন্তব্য দেশবন্ধুর খুব ভাল লাগিত। তিনি বলিতেন—

"প্রফুল্লের লেখায় একটা literary flourish বেশ থাকে।"

কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইবার পরে ফরওয়ার্ডের ম্যানেজারের কাজ সুভাষ ছাড়িয়া দেন এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ম্যানেজার হন। ইনি সুভাষ বাবুর মাতুল এবং সুদক্ষ ব্যক্তি।

১৯২৪ সনের অক্টোবর মাসে সুভাষ বাবুর গ্রেপ্তারের পর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের অর্থসাহায্যে গোপাল বাবুই "আত্মশক্তি" চালান।

চেরী প্রেসটি ছিল কুমার অরুণ সিংহ মহাশয়ের, তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন। ১৯২৬-এর প্রারম্ভ হইতেই "আত্মশক্তি" ফরওয়ার্ড আফিস হইতে মুদ্রিত হয় এবং ১৯২৬-এর ২০শে এপ্রিল হইতে ফরওয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষই আত্মশক্তিরও ভার গ্রহণ করেন। উহা এখন হইতে দৈনিক ভাবে চলে এবং শ্রীমান গোপালই সম্পাদক থাকেন। জেল হইতে বাহির হইয়া ১৯২৭-এ সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধু সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ বাহির করেন। তাহা গত ভাদ্র মাসের 'বঙ্গশ্রী'তে বাহির হইয়াছে।

তৃতীয়বারে "বাঙ্গলার কথা" বাহির হয় ফরওয়ার্ড আফিস হইতে। ফরওয়ার্ডের সম্পাদক ছিলেন তখন শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় যে কংগ্রেস হয় তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বে ২০শে ডিসেম্বর হইতে বাঙ্গলার কথা আবার দৈনিকভাবে বাহির হয়। এবার সম্পাদক উপেন বাবু হইবেন, কি শচীন বাবু হইবেন, কি গোপাল সান্যাল হইবেন—এই নিয়া অনেক আলোচনা হয়। পরে সত্যবাবুর সম্পাদনায়ই ফরওয়ার্ডের স্থায় 'বাঙ্গলার কথা'ও বাহির হয়, তবে দেখাশুনা করিতেন গোপাল

বাবু। 'বাঙ্গলার কথা'র একটি প্রবন্ধ রাজদ্রোহমূলক অভিযোগে গভর্ণমেণ্ট সত্যবাবুকে অভিযুক্ত করে এবং বিচারে তাঁহার জেল হয় (১৯২৯), প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন অন্ত একজন এঃ-সম্পাদক। কিন্তু তাড়াতাড়িতে সত্যবাবু ও গোপালবাবু তাহা দেখিয়া দিতে পারেন নাই।

সত্যবাবুর গ্রেপ্তারের পরে গোপাল সান্তালই 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদক থাকিয়া যান।

বেলুড়ে যে ট্রেণ-দুর্ঘটনা হয় সে-সম্বন্ধে ফরওয়ার্ডে যে মন্তব্য বাহির হয়, তাহাতে ফরওয়ার্ড এবং সত্যবাবুকে নিগৃহীত হইতে হয়। এই ঘটনার পরিণতিতেই ফরওয়ার্ড বন্ধ হইয়া যায়। তিনখানি কাগজই নূতন নাম পরিগ্রহ করে। ফরওয়ার্ড হয় নিউ ফরওয়ার্ড, আত্মশক্তি হয় নবশক্তি, বাঙ্গলার কথা হয় বঙ্গবাণী। বঙ্গবাণী নামে পূর্ব্বে একটি মাসিক পত্রিকা ছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ৭৭নং রসারোড হইতে বাহির হইত। ১৯২৩-২৬ পর্য্যন্ত ইহার প্রবন্ধ পড়িয়াছি। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" এই পত্রিকায়ই বাহির হইত। ১৯০৭ সালে নবশক্তি নামে মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের একখানি দৈনিক কাগজ ছিল। যাহা হউক, নিউ ফরওয়ার্ডও দ্বিতীয় দিন হইতে হাইকোর্টের আদেশে বন্ধ হইয়া যায়। উহা লিবার্টি নাম পরিগ্রহ করে। নবশক্তির সম্পাদক হন শচীনবাবু আর বঙ্গবাণীর সম্পাদক গোপালবাবুই থাকেন। এইভাবে চলিবার পরে ১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে ১৮১৮ সনের তিন রেগুলেশনে শরৎবাবু ধরা পড়েন। সুভাষচন্দ্রও ১৯৩২-এর ২রা জানুয়ারী ধৃত হন। ইঁহাদের নিগৃহীত হইবার পরে, তিনখানি কাগজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার—তিনি অসুস্থাবস্থায়ও এক বৎসর চালান। পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত তাঁহার হইয়া কাগজ পরিচালনা করেন। এই সময় সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র জেলে। দেশবন্ধুর মহাপ্রস্থানের পরে শরৎ বাবুই কয় বৎসর ফরওয়ার্ডের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জেলের দুই এক বৎসরের মধ্যেই কাগজের পূর্ব্ব সুনাম প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়, যাহারা খাটিতেন তাঁহাদের মধ্যেও সন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হইত না। ভিতরে কি গোলমাল ছিল ঠিক বলিতে পারিব না, তবে ১৯৩৩ সালের অক্টোবরে ফরওয়ার্ড পাবলিশিং কোম্পানী লিকুইডেশনে চলিয়া যায়। এবং তিনখানি কাগজই বন্ধ হইয়া যায়। লিকুইডেশনে যাওয়ার পরে সরস্বতী প্রেস উহার স্বত্ব কিনিয়া নিয়াছে। সাপ্তাহিক ভাবে শ্রীযুক্ত যতীশ ভৌমিক মহাশয়ের সম্পাদনায় ফরওয়ার্ড চলিতেছে বটে, কিন্তু বাঙ্গলার কথার অস্তিত্ব আর নাই। ইঁহার পরে ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র যে "Forward Bloc" সাপ্তাহিক কাগজখানি বাহির করেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

এই দৈনিক বাঙ্গলার কথা যাহা ১৯২৮, ডিসেম্বরে বাহির হয়, তাহার কাটতি খুব বেশী ছিল। আত্মশক্তি এবং বাঙ্গলার কথা এক আকারের ছিল এবং রোটারী মেসিনে ছাপা হইত।

ইহার পরেই কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন হয়। এবং সুভাষচন্দ্র হ'ন (G. O. C) জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং। বিস্তারিত বিবরণ আগামী বারে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

'ফরওয়ার্ড', 'আত্মশক্তি' ও 'বাঙ্গলার কথা'র পরিবেষণে সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার মধ্যম অগ্রজ শরৎ বাবুর অসাধারণ অবদান অবশ্য স্বীকার্য্য।

মন

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মন দিলে আর দিতে কিবা বাকী রয় ?
সব দিলে তবে মন দেওয়া পুরা হয়।
মাটির এ দেহ মূল্য কি এর,
আধেয়ের চেয়ে দাম আধারের ?
প্রাণ আছে বলি এ দেহ লোভন,
প্রাণের সঙ্গে লয়।

মন দিয়ে যারা প্রতিদান করে আশা
মন দিবে কোথা, মিথ্যা তাদের ভাষা।
দেবার ছলনে তারা নিতে চায়,
দেয় না যেমন, নিজেও না পায় ;
সারাটি জীবন এই ছলনায়
করে যায় অভিনয়।

মন যেবা দেয়, থাকে না কিছুই তার,
দিলেও সে ন'রে নিতে কোন কিছু আর ;
দিয়া যে হ'য়েছে সুখী এ জীবনে
সে কেন চাহিবে আবার ভুবনে ?
দেবার মালিকে মিলাইয়া দিয়া
হ'য়েছে যে তন্ময়।

মন যে দিয়াছে, সে জানে বারেক দিলে
ফিরে কভু আর সে মন নাহিক' মিলে ;
এ যে হুতাহুতি প্রিয়ের পূজায়,
ধূপের গন্ধ আগুন ছোঁয়ায়
সমর্পণেই মন হ'বে মোর
চির-মৃত্যুঞ্জয়।

ঝান্সীর রাণী

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ঝান্সীর রাণী, লক্ষ্মী-বাইয়ের শ্বেত ঘোড়ায়
ঘুরে জ্বলে ঐ লাল আগুন,
সেই আগুনের ফুলকীতে আজ সব পোড়ায়—
ঝান্সীর রাণী চলে গৌরবে,—পথ নিঝুম।

ঝান্সীর রাণী চলে গৌরবে, পথ নিঝুম—
চলে বিদ্যুৎ ঝলকি চালে,
গাছের শাখায় রাতের পাখায় স্বপ্ন-ঘুম,
আগুন লেগেছে অন্ধকারের চক্রবালে!

বেগ শন্ শন্ তড়িৎ গতির কি গর্জ্জন
পাখা ঝাপটিছে শূন্যময়!
—চলে উড়ন্ত ফেন-পুঞ্জিত প্রভঞ্জন,
স্ফুরিত নাসিকা ঢালে নিঃশ্বাস বহ্নিময়।

আঁধারের বুকে বিঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে ধারালো তীর—
শব্দ ভেদীর শাণিত বাণ,
ছিঁড়ে পড়ে তারা, উল্কা হাজার, রাত গভীর,
—মৌন পৃথিবী মহাশঙ্কায় মুহ্যমান।

পক্ষীরাজের ললাটে জ্বলিছে লাল প্রবাল,
গলে গজমতি, হেমচূড়ায়
জ্বলে জ্বল জ্বল উন্নয় তাম্বুর রক্ত-লাল,
– বঙ্কিম গ্রীবা চূর্ণ কেশরে চোখ জুড়ায়।

রোষে ফুটন্ত টগ্ বগ্ ধারা চলন্তিকায়
কল তরঙ্গে যায় গাহি'
"ঝান্সী আমার, ঝান্সী আমার, খুদ্ আমার,
রোখ দুশমন্– হামারা ঝান্সী দেঙ্গে নাহি!"

দেবো না দেবো না আমার ঝান্সী, পিয়ারী মোর—
ভাবিলে নয়নে জল পড়ে।
বেদনা-বাষ্পে ঘনায় আকাশে ঝঞ্ঝা ঘোর,
আকাশের তাজা কলিজা কাটিয়া খুন ঝরে।

ঝরে তাজা খুন দুই কশ বেয়ে শ্বেত ঘোড়ার,
সোনার লাগামে শান পড়ে,
—রণ রঙ্গিণী ঝান্সীর রাণী ঘোড়-সওয়ার
বীর ভঙ্গীতে বল্গা রয়েছে বাম করে।

উড়ে দিকে দিকে কৌমী নিশান-জোর হাওয়ায়—
নাচে ক্ষুরধার লাখ কৃপাণ,
লক্ষ প্রাণের কামনা রাঙানো লাল প্রভায়
মৃত্যু-দেবতা হানিছে কামানে অগ্নিবাণ!

চলে দলে দলে ঝান্সী-বাহিনী, সমরে ধায়,
জ্বলে পথে পথে লাল আগুন,
আগুন ছড়ানো দূরান্তরের লাল-কারায়,
— ঝান্সীর রাণী এলে গৌরবে,—পথ নিঝুম।

বড়দিন

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

এখান থেকে বহু দূরে পূর্ব্ব বাংলার উচ্ছল প্রাণ-ধারার নিভৃত একাংশে সারা আকাশটা মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল একটা প্রচণ্ড স্রোতের বিপুল মন্ত্রে। বর্ষার বারিধারা ঝ'রে প'ড়েছিল শ্রাবণের সঙ্গীতে। চেঙ্গী নদীটা ফুলে উঠেছিল জলে। ওদিকে কর্ণফুলী জীবন-উচ্ছ্বাসে মুখরিত। তীরের মতো স্রোত নেমে এসেছিল ঐ চেঙ্গী থেকেই এই কর্ণফুলীতে। আজ সেই বর্ষা কেটে গেছে, সেই উদ্বেল স্রোতের গতি থেমে গেছে আশ্বিনের গোড়া থেকেই। বিরাট একটা জীবন যেন বিধ্বস্ত অবস্থায় আজ ঝিমিয়ে প'ড়েছে কর্ণফুলীর বুকে। শীতের কুহেলীতে মন্থর আজ প্রকৃতি। এখনও কিছুটা স্রোত বয় চেঙ্গী নদীতে, কিন্তু এ স্রোতে আজ সেই যৌবন নেই। মুমূর্ষু রোগী যেমন ক'রে ধীরে ধীরে শ্বাস টানে, চেঙ্গীর উপলখণ্ডও যেন তেমনি ক'রেই টেনে চ'লেছে তার নিস্তেজ নিরুদ্বেগ তরঙ্গ-কণাগুলিকে। বর্ষার ঢেউ ক্রমেই শিথিল হ'য়ে এসেছে আজ শীতের আবেশে।

এদিকে প্রাণবন্ত নগরী রাঙামাটি। নদী-নালায় পরিকীর্ণ নগরী রাঙামাটি। চারপাশে যতদূর দৃষ্টি প্রসারিত করা যায়, দেখা যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। পাশে পাশে বড় বড় পাহাড়ী গাছের জঙ্গল আর প্রকাণ্ড চত্বর জুড়ে কলাবাগান। বন্য-হাতীরা এসে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে এক একটা গাছ, তারপর দুমড়ে মুচড়ে তাকে নিক্ষেপ করে পায়ের নিচে; বার কতক ক্যাঁচ-ক্যাঁচ ক'রে শব্দ হয়ে ওঠে, শুঁড় দিয়ে হাতীগুলি নরম থোড়-ভাগটাকে টেনে নেয় দুই দাঁতের নিচে প্রকাণ্ড মুখের গহ্বরে। ক্ষুধা মিটলে আবার আপনিই চ'লে যায় তারা দূরে জঙ্গলের আড়ালে। কেবল তাদের মন্থর পায়ের শব্দ আর নাসিকার অদ্ভুত একটা শ-শ ধ্বনি তখনও জেগে থাকে চারপাশে। রাঙামাটির লোকেরা চিরকালের অভ্যস্ত এই শব্দ আর ধ্বনির সাথে।

এইখান থেকেই আমরা নতুন ক'রে নৌকোয় চাপলাম। সামনেই খানিকটা উজানী বাঁক ঘুরে ছোট নদীটা গিয়ে মিশেছে দূরে ঐ চেঙ্গীতেই। কাছে দূরে এপাশে ওপাশে মগ আর চাকমা পল্লী। নিজেদের মধ্যে যখন কথালোচনা করে তারা, অনভ্যস্ত মানুষের পক্ষে বোঝা ভার হ'য়ে ওঠে তাদের সেই ভাষা। ইদানিং কিছুটা আসামী আর অভিজাত চিটাগাঙী ভাষার জোয়ার এসেছে তাদের মধ্যে। রাঙামাটিতে পা দিতেই আলাপ হ'য়ে গেল হীরাসং মগের সাথে। কালো মিশমিশে অদ্ভুত চেহারা, নাকটা সামনের দিকে এসে কিছুটা থুবড়ে গেছে, দু'হাতের পেশীর দিকে নজর দিলে বুঝতে হয়, প্রয়োজন হোলে দু'শো ল্যাঠেলকে সে একাই চক্ষু বুঁজে ঘায়েল ক'রতে পার। অর্থহীন দৃষ্টিতে প্রথমটা চোখ তুলে তাকালাম তার দিকে। বিচিত্র ভঙ্গীতে হাতটা উঁচিয়ে সম্ভবত একটা নমস্কারের ভূমিকা ক'রেই কাছে এগিয়ে এসে প্রথম কথা ব'ললো হীরাসং: 'মাছ লবেন বাবু, শুঁটকি মাছ?'

এই ধরণেরই প্রাথমিক আবেদন ওদের। মগ আর চাকমাদের স্ত্রীপুত্র ছেলেমেয়ে মিলে তরিতরকারী আর শুঁটকি মাছ বিক্রী করে গিয়ে একটু দূরেই বরকল বাজারে। দেখলাম, হীরাসংয়ের পাশেই কী একটা বস্তার মতো বাঁধা, হঠাৎ একটা আল্লুটে গন্ধ নাকে এসে লাগতেই বুঝলাম, শুঁটকি মাছের চাপটি বাঁধা। ব'ললাম, "এখান থেকে ওখানে কেবল ভেসে ভেসে চ'লেছি, নৌকোর মাঝিই বা ভরসা। এখানে শুঁটকি মাছ নিয়ে কি ক'রবো?"

দেখলাম, কেমন যেন একটা ভাবান্তর খেলে গেল হীরাসংয়ের মুখে। অর্থাৎ এ পথ দিয়ে যারাই আসে, তারা সম্ভবত এই শুঁটকি মাছ না নিয়ে আর ফেরে না। তার মধ্যে আমরা যেন অনেকখানি ব্যতিক্রম।

'আমরা' ব'লছি অর্থে আমি আর যোগজীবন। দু'জনেই থাকি ক'লকাতার ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটে। সূত্রধরের কাজ আমার, অর্থাৎ কোনো একটা কার্পেন্টারী থেকে সারা মাসের জীবিকার্জ্জনের অর্থ পাই; পদটা উঁচুই বটে। যোগজীবন আগে ছিল লালবাজার পুলিশে, সম্প্রতি কিছুকাল থেকে সে-কাজে ইস্তফা দিয়ে এসে ঢুকেছে হোয়াইট্‌-ওয়েতে। কিন্তু তাই ব'লে বন্দুকের লাইসেন্সটা এখনও যায়নি। লাইসেন্স আপিসের রেকর্ডে রীতিমত বহাল রেখেছে সে এটাকে। গুণ্ডা-ডাকাতের অভাব নেই, সময়ে অসময়ে কাজে লাগে। এই সূত্রে গত ১৬ই আগষ্টের ঘটনাটা এখনও মনে পড়ে। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হ'য়েছে ক'লকাতায়। বড় বড় দোকান আর বাড়ীগুলি পুড়িয়ে দিচ্ছে গুণ্ডারা। প্রত্যক্ষ জুলুম হিন্দুর উপরে। রাস্তা জুড়ে নর-রক্ত, ইঁট-পাটকেল, কাতারে কাতারে শব আর গুণ্ডা-মিছিল। শ্যামবাজার থেকে ছোট বোনকে নিয়ে বাড়ীর পথে ফিরছিল যোগজীবন। মেছুয়াবাজারের মোড়ে আসতেই আক্রমণ ক'রলে গুণ্ডারা। হয়ত বোনের ইজ্জৎটা এইখানেই চোখের সামনে মাটি ক'রে দিতে হোলো তবে। সেদিনও সঙ্গে ছিল এই বন্দুকটাই। গাদা-বন্দুক। হঠাৎ শক্ত আঙুলে ট্রিগারটা টিপে ধ'রলে যোগজীবন। বার কয়েক আওয়াজ হোলো মাত্র—ঠাস্ ঠাস্ গুরুম্ গুরুম্।

আগুণের মতো গুলি ছুটলো। ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল দুর্ব্বৃত্ত জনতা। গোটা দুই লোক হয়ত সামনে দেখতে না দেখতেই হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেল, চাপা কি রকম একটা গোঙানী শব্দ শোনা গেল মাত্র।—নারীর মর্য্যাদা রক্ষাই ক'রলো বটে গাদা-বন্দুকটা, সেই সাথে যোগজীবনে ও। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সেই দিনটা পেরিয়ে তারপর কয়েকটা মাসই তো একরকম গড়িয়ে গেল ক'লকাতার বুকে। এদিকে নোয়াখালী আর বিহারের ঘটনাটাও কম কি! দু'শো গ্রামেরও বেশী রক্তে লাল হ'য়ে গেছে নোয়াখালীতে। মহাত্মাজী শান্তির বাণী নিয়ে এসে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরছেন। শ্রীরামপুরের শিবিরে রাম-নাম উদ্গীত হ'চ্ছে অহোরাত্রি। এদিকে ক'লকাতায় বড়দিনের ছুটি একরকম আসন্ন হয়েই এলো। এই চেঙ্গীর বুকে শীতের কুহেলীর মতই কুয়াশা নেমে এসেছে ক'লকাতায়। উদ্যোগ ক'রে একসময় বেরিয়ে পড়লাম চিটাগাং মেলে। নোয়াখালীর হামলা চ'লেছে সেই অক্টোবর থেকে। সুচেতা আর রাষ্ট্রপতি বার বার এসে ঘুরে যাচ্ছেন এ-গ্রামে ও-গ্রামে। মহাপুরুষের মহা শান্তির হোম চ'লেছে এই বিংশ-শতাব্দীর অতি সভ্য পাপী মানুষদের কেন্দ্র ক'রে। আসবার পথে বন্দুকটা সাথে আনতে ভুললো না যোগজীবন। গোয়ালন্দ থেকে ষ্টীমার, তারপর পরিক্রমা ক'রলাম নোয়াখালী শ্রীরামপুর-শিবির আর এপথে সে-পথে। জীবন-পণ ক'রে আদর্শকে আঁকড়ে ধ'রে ব'সে আছেন কর্ম্মযোগী ধ্যানী-পুরুষ মহাত্মাজী।—সুখশান্তি হাওয়ায় উড়ে গেছে এ-দেশ থেকে। সামনে নৌকো পেয়ে এগিয়ে চ'ললাম যোগজীবনের হাত ধ'রে। তারপর রাঙামাটি আর মস্ত কালো এই চেঙ্গী। এখনও মানুষের দেহ-নিঙড়ানো রক্ত এসে লাল ক'রে দেয়নি চেঙ্গীর জলকে। ১৬ই আগষ্টের ক'লকাতা আর পরবর্ত্তীকালের এই নোয়াখালী; রাঙামাটির পথে এসে একটু যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম এদিকে।

হঠাৎ যেন নিজের অলক্ষ্যেই খানিকটা আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েছিলাম এতক্ষণ নিজের মধ্যে। চেয়ে দেখলাম, হীরাসং এবই ভাবে চেয়ে আছে মুখের দিকে। যোগজীবনের বন্দুকটার দিকেও যে একবার নজর না গিয়েছিল হীরাসংয়ের, তা নয়। অভিজাত ক্রেতা হিসেবে আমাদের বড়কিছু একটা আন্দাজ ক'রে ওঠা তাই অস্বাভাবিক হয়নি হীরাসংয়ের। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললে, "খাইতাম তো সোয়াদ পাইতেন।" তারপর মাঝির দিকে কেমন একবার নজর দিয়ে বললে, "বলি ও মর্দ্দের-পো, কথা কইছুন্ না যে কিছু, বেগুন বেঁধে দাও না বাবুদের ভাতের সঙ্গে।"

নৌকার মাঝি আমাদের গণি মিয়া; কথা শুনে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালো আমাদের দিকে। হীরাসং ইতিমধ্যেই বুঝে নিয়েছে—এখানে এই জলিয় পরিবেশে একেবারেই নতুন আমরা। বললাম, "মিথ্যে পীড়াপীড়ি করছো হীরাসং, শুঁটকি-মাছে কোনদিন আমরা অভ্যস্ত নই। তার চাইতে কাজ যদি তেমন কিছু না থাকে, তবে আসতে পারো আমাদের নৌকোয়; স্থানীয় লোক তোমরা, পথ-ঘাটগুলো তবু যা হোক চিনিয়ে দিতে পারবে।"

দেখলাম, কথা শুনে যেন বড় বেশী খুসী হোলো না গণি মিয়া। অর্থাৎ, এ তল্লাটটা তার একেবারে নখ-দর্পনে, এবং বিশেষ ক'রে চাকমা কিম্বা মগদের একটু ভয়ই করে ইদানিং গণি মিয়া। সাম্প্রদায়িকতা যেমন ক'রে উগ্র হ'য়ে উঠেছে নোয়াখালীর আকাশে, তাতে শুধু নোয়াখালীই নয়, তার বিষ ছড়িয়ে প'ড়েছে ঐ বরকল এমন কি রাজার ভুঁই আগড়তলা পর্য্যন্ত। কেউ কাউকে আজ আর বিশ্বাস করে না, না হিন্দু—না মুসলমান। মগদের মধ্যেও বর্ণ-স্বাতন্ত্র্য আছে বৈ কি। কাটাকাটিটা তাদের মধ্যেও কম হয় না, কিন্তু হীরাসংকে দেখে খানিকটা যেন তন্ত্রভক্ত ব'লেই মনে হ'য়েছে গণি মিয়ার।—অথচ সে-ভয় নিয়ে আদৌ আমরা নৌকোয় উঠিনি।

রাজী হোলো না হীরাসং। এবেলার মাছের কারবারটা সম্ভবত তবে মাঠে মারাই যাবে তার। ব'ললে: "পিন্নাম হুজুর, যদি পারি তো পরে 'কেরায়া' নিয়ে গিয়ে আপনাগোর নৌকা ধ'রবো।"

ঘাট ছেড়ে যেতে ক্রমেই দেরী হ'য়ে যাচ্ছিল। লগি দিয়ে এবারে পাড়ে একটা জোর খোঁচা দিলে গণি মিয়া। সামনের দিকে এগিয়ে চ'ললো নৌকো। ছইয়ের উপরে ব'সে ছিল যোগজীবন। দেখলাম, তখনও সে জায়গা থেকে নড়েনি হীরাসং, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে যোগজীবনের বন্দুকটার দিকেই।

এ তল্লাটের মাঝি হ'লে কি হবে, ভালো বাংলা জানে গণি মিয়া। কথায় কথায় জানতে পারলুম, ওদিকে 'কুমার' আর বরিশালের পাশ ঘেঁষে 'কীর্ত্তনখোলা' নদীতেও পাঁচ সাত বছর কাটিয়েছে নৌকো নিয়ে। ঘরও বেঁধেছিল ওইদিকে, কিন্তু টেকেনি। বিন্দু বিবি সাংসারিক সামান্য কি একটা ঝগড়ার অছিলা নিয়ে একদিন ঘর ছেড়ে পালালো, পরে শুনলো—মেনাজদ্দী সর্দ্দারের সঙ্গে গিয়ে নাকি সে নিকা বসেছে। মনের দিকটায় আর কিছু ছিল না সেদিন গণি মিয়ার। মনে মনে একবার বললাম, "এ তোমাদের মধ্যেই সম্ভব গণি; আমাদের ঘর হ'লে ঐ ঝগড়ার পরেও নিভৃত আহারে বসিয়ে কাছে ব'সে আঁচল দিয়ে মাছি কিম্বা মশা তাড়াতো স্ত্রী, বাটিভরা দুধ এনে

স্বামীর মুখের সামনে তুলে ধ'রে বল্‌তো, 'এটুকু সব না খাও তো আমার মাথা খাও তুমি।"

প্রকাশ্যে শুধু বল্‌লাম: "জীবনটা বাস্তবিকই তা হ'লে তোমার বড় দুঃখের গণি। তা—ঘর যখন একবার ভেঙেছেই, বাইরের আবহাওয়াটাকেই তখন আপন ক'রে নিয়ে বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দাও। বয়সও তো হোলো!"

অনুমানটা মিথ্যে নয়। পঞ্চাশের কাছাকাছি এসেই ঠেকেছে গণি মিয়া। নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বল্‌লে: "হ কত্তা, আমিও তাই ভাইব্যা লইছি, বাকী জীবনটা এই নৌকার গলুইয়ে বইসাই কাটাইয়া দিম্। ঘর বাঁধা সকলের ক্ষ্যামতায় কুলায় না।"

কতকটা শিল্পরসিক যোগজীবন। দেখ্‌লাম, আমাদের কথার ফাঁকে ছইয়ের উপরে বেশ পা ছড়িয়ে বসেই মৃদু কণ্ঠে সে সুর তুলেছে গলায়:

'কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাবো অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।—'

এইখানটায় এসে পরিবেশটা ঠিক যেন মনঃপূত হ'ল না যোগজীবনের। ক'লকাতা থেকে বেরিয়ে প'ড়বার সময় আমাদের প্রোগ্রাম ছিল অন্যরকম। প্রতি সপ্তাহের কর্ম্ম-ব্যস্ততার ফাঁকে কিছুটা ছুটির অবকাশ যখন হাতেই এলো, নীলবসনা নদী-প্রকৃতির বুকেই খানিকটা এখন ঘুরে আসি না কেন! মনের দিক দিয়ে বড় একটা প্রফুল্লতা তো পাই না কলকাতায়! যাত্রা-পথটা হিসেব ক'রে বেরিয়েছিলাম যোগজীবনের এই গানের সুরেই। পরোক্ষে সম্ভবতঃ সুর দিয়ে তাই একবার মনে করিয়ে দিলো যোগজীবন। বাধা দিয়ে বল্‌লাম: "শুধু দু'জনে থাক্‌লে নৌকো আর কিছু একটা হাওয়ায় চল্‌তে না তায়া। এসব ক্ষেত্রে গণি মিয়াদেরই প্রয়োজন। ফিরে গিয়ে কোনো একটা ছুটিতে চলিস্, রূপনারায়ণে নিয়ে ঘুরে আস্‌বো।"—পকেট থেকে সিগারেটের কৌটো বার ক'রে এগিয়ে ধ'রলাম যোগজীবনের দিকে।

দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে মৃদু একবার হেসে আবার নতুন সঞ্চারি ধরলে যোগজীবন:

'...কুলহারা সেই সমুদ্র মাঝখানে,
শোনাবো গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিনী শুনবে নীরব হেসে।...
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।'

রাঙামাটির ঘাট ছাড়িয়ে এসেছিলাম অনেকক্ষণ। নৌকো তখন আমাদের কেবল চেঙ্গীর মুখে প'ড়েছে। গান হ'লেও রসিকতাটা ধ'রে ফেল্‌লো গণি মিয়া। ব'ল্‌লে: 'দেশ গাঁ কি আর আছে কত্তা! ল'ন্ যাই আর কিছু দূর, হাতী-হাতিনীর পাহাড় ঘুরাইয়া আনি।"

নামটা নতুন শুনে কিছুটা উৎসুক হয়েই উঠ্‌লাম এবারে। দেখ্‌লাম, মাঝগাঙে এসে একটু জোরে জোরেই বৈঠা ফেল্‌ছে গণি মিয়া চেঙ্গীর জলে। শীতের বেলা, মনে হ'চ্ছে যেন—মুহূর্ত্তগুলো দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে সেই বৈঠার তালে তালে। কন্‌কনে শীতে শরীরের মধ্যে শিহরণ হ'চ্ছে মাঝে মাঝে। আকাশের সূর্য্যের দীপ্তিতে তেমন আর জোর নেই, ক্রমে নরম হ'য়ে আস্‌ছে সূর্য্যের তাপ। কালো জলের উপরে দাগ কেটে কেটে গণি মিয়ার বৈঠার জোরে সাম্‌নের পথে এগিয়ে চ'ল্‌লো নৌকো।

এক সময় জিজ্ঞেস্ ক'রলাম: "তুমি কিসে বিশ্বাস করো গণি?"

সহসা বৈঠার গতি কমিয়ে একবার আমার মুখের পানে চাইল গণি মিয়া, তারপর কিছুক্ষণ থেমে কি যেন একটা চিন্তা ক'রে হঠাৎ হেসে ফেল্‌লো, ব'ল্‌লে: "কঠিন প্রশ্ন ক'রলেন কত্তা। দেশ জুড়ে আজ যা ঘট্‌তিছে, তাতে কি আর বিশ্বাস বইলা কিছু আছে 'জান'টা কোনো রকমে টিকাইয়া রাখা মাত্র।"

ব'ললাম: "তা হ'লেও তবু—!"

আবার যেন কি খানিকটা ভেবে নিলো গণি মিয়া, তারপর ব'ল্‌লে: "বিশ্বাস করি দুইটা জিনিষে—আল্লার বিধানে এই বিশ্বসংসার চ'লতিছে আর এই পিরথিমিতে যার যেমন কর্ম্মফল, তার তেমন গতি।"

"কিন্তু মানুষ সুখী জীবন নিয়ে শান্তিতে কাটাতে পারে কি হ'লে বলতে পারো গণি?"

এবারে দেখ্‌লাম, সহসা বৈঠাটা একেবারেই থেমে গেল গণি মিয়ার হাতে, মাথার উপরে চাঁদোয়া কাপড়ের পাল তুলে দিয়েছিল একটু আগেই। বাতাসের বেগে তাতেই নৌকো চ'লতে লাগলো।

গলুইয়ের উপরে খানিকটা মোড় ঘুরে ব'সে গণি মিয়া ব'ললে: "পরের সর্ব্বনাশের মধ্যে যে নাই, পরের উপকারে যে 'জান' কবুল করছে আর নিজেকে যে তার সমস্ত কাজের মধ্যে খোদাতাল্লার পায়ে সমর্থন ক'রতি পারছে—সেই তো খাঁটি সুখী কত্তা।" কেমন একটা আবেগময় দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধ'রে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল গণি মিয়া।

যোগজীবনের সম্ভবত এমন আধ্যাত্মিক আলোচনাটা একেবারেই ভাল লাগছিল না। ছইয়ের উপরে ব'সে

গান শেষ ক'রে কেবলই উস্‌খুস্ ক'রছিল। ফাঁক পেয়ে মাঝখানে ছোট্ট ক'রে একবার ব'ললে: "গোবরেও যদি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ক'রতে চাও, তবে যে ধরে আর প্রাণ থাকে না রে বাবা। সাথে ক'রে নিয়ে এলাম বন্দুকটা, ভাবলাম—পথে ঘাটে শিকার হয়ত দু'একটা পেয়ে যাবো নিশ্চয়ই, 'বাট্ এ্যালাস্'। শাক্ত প্রাণ নিয়ে এসে কী বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেই ফেললে আমাকে। 'ওঃ মাই কাদার।' আমি যে একেবারে 'ব্যাফেল্ড' হ'য়েই গেলুম ভায়া।"—মুক্তার মতো দাঁতগুলো বার ক'রে মিঠিয়ে মিঠিয়ে হাসতে লাগলো যোগজীবন।

আশ্বাস দিয়ে ব'ললাম: "নতুন পরিবেশে এসে পুরোণোকে খানিকটা ছাটাই না ক'রলে কখনো রস আহরণ ক'রে ঘরে ফেরা যায় না। পুরোণোর সঙ্গে সেইখানেই আবার মিলনের আনন্দ। সহ্য ক'রেই যখন আছো, আরও কিছুটা না হয় ধৈর্য্য ধ'রে থাকো, আর না হয় আবার কিছু একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীত ধরো—'যখন প'ড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে…।"

হঠাৎই আবার একরকম থেমে গেল যোগজীবন।

কথাগুলো সম্ভবত ঠিকমতো ধ'রতে পারছিল না গণি মিয়া, তখনও তেমনি ক'রেই সে তাকিয়ে আছে আমার মুখের পানে।

ব'ললাম: "ঠিক ব'লেছ গণি, একেবারে মূল ধ'রে টান দিয়েছ তুমি। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই, জীবনের এমন সুলভ শান্তি ছেড়ে দিয়ে মানুষ পশুর মতো কেন ম'রছে আজ? কাছাকাছি এই নোয়াখালীর ব্যাপারটাই না হয় ধরো। কোথা থেকে কোন্ নেতা কি উস্কানী দিয়েছে আর অমনি একটা ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড, ধ্বংস আর পাশবিকতা। একে কি সত্যিই তুমি সমর্থন ক'রতে পার গণি?"

নিজের কপালে একবার করাঘাত ক'রলো গণি মিয়া, তারপর ব'ললে: "অদেষ্ট কত্তা অদেষ্ট। কি সোনার দেশ ছেল, আর কি হইছে আইজ। কাইজা দাঙ্গা করইরাই মইলো সকলে। ঘেন্না ধইরা গ্যাছে আমার জাতভাইদের উপর কত্তা। পাঁচ ওক্তো নমাজ পইড়া কোরাণ হাতে যারা খোদার আরজ মাগতো, তারা আইজ মুষল লইছে হাতে। কাফের হইয়া গেল দুনিয়াটা, এই শুধু দুঃখু।"

ব'ললাম: "দুঃখটা তোমারই শুধু নয় গণি, সে-দুঃখ আমাদেরও। এই পাপের পথে আজ হিন্দুর আদর্শ আর সভ্যতাও একেবারে ধুলায় মিশে গেল। অথচ এই বৈষম্য এই পাপ তো কোনদিন এদেশে ছিল না। হিন্দু আর মুসলমানে এক-জাতীয়তা ছিল চিরকাল ভারতবর্ষে যেখানে রামের দুঃখে আব্দুলের মা কেঁদেছে, আব্দুলের ব্যথায় ব্যথা বোধ ক'রেছে শ্যাম। সেই একান্ত স্নেহের পিছনে সত্যিই কি আজকের এই নর-রক্ত আর নর-বলি লুকিয়ে ছিল। আমার কালী আর তোমার খোদা তো অভিন্ন ছিলেন না কোনোদিন। আজ তবে আমাদের দেবমন্দিরই বা পুড়ছে কেন, তোমাদের মস্‌জিদের গায়েই বা সাবলের আঘাত লাগছে কেন। এই যে আমরা চেঙ্গীর জল কেটে চ'লেছি, কৈ, তোমার আমার মধ্যে তো এতটুকুও খুন জাগছেনা গণি। এই জলকে সাক্ষী ক'রে আমরা যারা চ'লেছি, তারা হিন্দু বা মুসলমান নই, তারা এই জলের দেশেরই সন্তান; দু'জনের রক্তে এক-দেশেরই প্রাণস্রোত ব'য়ে চ'লেছে। এই সার্থক বোধ-শক্তি আমাদের সমাজে আবার কবে আসবে, ব'লতে পারো গণি?"

দেখলাম, যোগজীবন এতক্ষণে গান ফেলে আবৃত্তি সুরু ক'রে দিয়েছে:

…'নবীন ছাত্র ঝুঁকে আছে এক্‌জামিনের পড়ায়,
মনটা কিন্তু কোথা থেকে কোন্‌দিকে যে গড়ায়।
অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সাম্‌নে আছে খোলা,
কর্ত্তৃজনের ভয়ে কাব্য কুলুঙ্গিতে তোলা।
সেইখানেতে ছেঁড়া ছড়া—এলোমেলোর মেলা,
তারি মধ্যে ওরে চপল, ক'রবি কি তুই খেলা।
গান তা শুনে মৌন মুখে রহে দ্বিধার ভরে,
যাবো-যাবো করে।…'

সত্যিই সেই ছেঁড়া-ছড়া আর এলোমেলোর মেলা ব'সেছে আজ এই বাংলা আর এই বৃহত্তর ভারতবর্ষ জুড়ে। মানুষের সহজ সরল গান আজ তাই প্রাণ ছেড়ে পালাচ্ছে। অপাঙ্গে যোগজীবনের দিকে একবার তাকিয়ে নিলাম।

গণি মিয়া ব'ললে: "খোদার মর্জ্জি বুঝা ভার কত্তা। এই রক্তারক্তিরও হয়ত দরকার ছেল, এই কলঙ্কের উপর আবার আমাদের ভাঙা মনের ভাঙা নৌকাখানি জোড়া লাইগ্যা উঠ্‌বে।"

সত্যিই অনুভূতি আছে বটে গণি মিয়ার মধ্যে। জীবনের বহু তপস্যা, অধ্যবসায় আর বেদনার ভিত্তি ভিন্ন এমন সুষ্ঠু মতবাদের অঙ্কুর কখনও গজাতে পারেনা। বিমুগ্ধ চোখে শুধু গণি মিয়ার চোখের পানে তাকিয়ে রইলাম।

নৌকো আমাদের তখন একটা বিরাট পাহাড়ের কোলে এসে ভিড়েছে।

আঙুলের নির্দ্দেশ ক'রে গণি মিয়া ব'ল্‌লে: "এইটাই হইচে গিয়া হাতী-হাতিনীর পাহাড়।"

তাকিয়ে দেখলাম—প্রকৃতির কি এক প্রাণবন্ত লীলায় পাহাড়ের চূড়া দু'টি পাশাপাশি আর মুখোমুখি দু'টি হাতী আর হাতিনীর রূপ পরিগ্রহ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত

এবং আশ্চর্য্যকর দৃশ্য। বিমুগ্ধ চোখে কতক্ষণ যে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম, ব'ল্‌তে পারিনা।

হঠাৎ ওপাশ থেকে কেমন যেন একটা খশ্ খশ্ শব্দ ভেসে এলো কানে। লক্ষ্য ক'রলাম—ধ্বনিটা আস্‌ছে পাহাড়ের পেছন থেকেই।

ছইয়ের উপর থেকে যোগজীবন হঠাৎই যেন কেমন একবার উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌লো, এবং চোখের পলকেই সাম্‌নে কী একটা লক্ষ্য ক'রে হঠাৎ দু'হাতে বন্দুকটা বাগিয়ে ধ'রলে।

হেসে গণি মিয়া বল্‌লে: "শিকারের কথা কইছিলেন কত্তা, এবার বোধ হয় মিল্যা গেল। হরিণ, হাতী, কখনো বা বিরাট বিরাট বাঘও দেখা যায় পাহাড়ের ঐ পাশে।"

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই যোগজীবনের বন্দুক থেকে গুড়ুম্ ক'রে একবার আওয়াজ হোলো। পাহাড়ের ঐদিকটায় কী একটা পশু সম্ভবত আর্ত্তনাদ ক'রে সেখানেই প'ড়ে গেল। নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে প'ড়তে চাইল যোগজীবন 'হাতী-হাতিনী'র গায়ে।

বাধা দিলে গণি মিয়া: "উঁহু উঁহু, অমন কাজও ক'রবেন না কত্তা। জলদস্যু আছে, অনবরত ঘুইর‍্যা বেড়ায় তারা এই পাহাড়ের চাইরদিকে। লোক পেলি পরে আর কথা নাই।"

প্রসঙ্গক্রমে গণি মিয়া ছোট্ট একটা কাহিনী ব'ল্‌লে। কিছুকাল আগেকার ঘটনা।—কোন্ এক বাঙালী সাহেবকে নিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আস্‌ছিল গণি। নৌকোয় কেবল গাবের রং দেওয়া হ'য়েছিল। মব্-মব্ শব্দে দাড় টেনে চ'ল্‌ছিল গণি। এই দিকটা ছাড়িয়ে আরও কিছুটা আগে গিয়ে সুরু হ'য়েছে সুবলং নদী; তারই 'পরে সাহেবের ডাকবাংলো। হঠাৎ এই 'হাতী-হাতিনী'র পাড়ে আস্‌তেই প'ড়তে হোলো অম্‌নি একটা জলদস্যুদলের খপ্পরে। ডাকাত তারা, হাতে যা পায় লুটেপুটে নিয়ে প্রাণে মেরে রেখে যায় যাত্রীকে। সন্ধ্যা তখন পেরিয়ে গেছে, অমাবস্যার অন্ধকার চারপাশে। হঠাৎ কাছাকাছি কোথা থেকে একবার হৈহৈ ক'রে শব্দ হোলো। অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন। অতর্কিতে দস্যুদলের ছিপ এসে লাগ্‌লো গণি মিয়ার নৌকোর সাথে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবের উপর জবরদস্তি: "কি আছে বার কর্ শালা হারামের বাচ্চা, নইলে এই ছুরী।" দু'পাশ থেকে দু'জন ডাকাত ছোরা বাগিয়ে ধ'রলে সাহেবের বুকের কাছে। ভয়ে তখন সাহেব তো দূরের কথা. গণি মিয়ার হৃৎপিণ্ডটাও যেন দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যায় আর কি! কথা ব'ল্‌তে পারলেন না সাহেব; যা কিছু সঙ্গে ছিল তাঁর, চোখের নিমেষে সব বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেল এবং সাথে সাথেই খচ্ ক'রে একটা ছোরা এসে আমূল বিঁধে গেল সাহেবের বুকে। পাশের দস্যুটা আরও শক্ত ব'লিষ্ঠ। লাসটাকে টেনে ধ'রে ফেলে দিলে জলে। গণি মিয়ার দিকে চোখ পাকিয়ে ব'ল্‌লে, 'নে শালা, তোকে মেরে আর কি হবে, যেদিকে যাবার চট্‌পট্ দাড় টেনে চ'লে যা। পুলিশের কানে কিছু লাগাবি তো তিন রাত্রের মধ্যে তোর 'জান্' যাবে, মনে রাখিস।" উপস্থিত মতো 'জান্'টা বেরিয়ে গেলেও ক্ষতি ছিলনা; অসাড় হ'য়ে এসেছিল হাত দু'টো। বৈঠা বা দাড় ঠান্‌বার শক্তিটা যেন মুহূর্ত্তে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল। ধীরে ধীরে আবার ভাটির পথ ধ'রলে গণি।...

শুন্‌তে শুন্‌তে ভয়ে গা'টা একবার ছম্-ছম্ ক'রে উঠলো। ব'ল্‌লাম: "সেই দারুণ ব্যাপারের পরেও এপথে আবার আস্‌তে তোমার সাহস হোলো গণি? আমাদেরই বা কোন্ ভরসায় নিয়ে এল্‌ এদিকে।"

গণি মিয়া একবার আঙুলের ইঙ্গিত ক'রলে যোগজীবনের বন্দুকটার দিকে। ব'ল্‌লে: "শুধু উরিস্নি ভরসায় কত্তা। শালাদের বন্দুকে বড় ভয়; আর তা ছাড়া দিনে তারা বাইরায় না কোথাও। দিনাদিনি তাই পাড়ি ধরছি, ভাবনা নাই।"

কিন্তু ভাব্‌না যে নেই, কাহিনীটা শুন্‌বার পরে তারই বা আশা পাচ্ছি কোথায়।

ব্যর্থ সুরে যোগজীবন ব'ল্‌লে: "ম্যান্ প্রোপোজেস, বাট্—, গুলিও একটা খরচ ক'রলাম, অথচ হাতের স্থুখটাও তেমন ক'রে পেলাম না। ডাবালে তুমি গণি, যাই বলো।"

কিছু একটা প্রত্যুত্তর ক'রলে না গণি মিয়া; কেমন একরকম অদ্ভুত হেসে চোখ দুটো নামিয়ে নিল শুধু।

ইতিমধ্যে হঠাৎ পেছন দিক থেকে 'কেরায়া' নিয়ে এসে ভিড়লো হীরাসং। আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম অদ্ভুত ওর দিক-দর্শন দেখে। কেমন ক'রে যে ও বুঝতে পারলো এই পথেই এসে থামবো আমরা, চিন্তা ক'রে পেলাম না। জিজ্ঞেস ক'রলাম: "তুমি কি তন্ত্র-মন্ত্র কিছু জানো নাকি হীরাসং?"

প্রশ্ন শুনে বিগলিত হাসিতে সব ক'টা দাঁত বেরিয়ে এলো হীরাসংয়ের: অদ্ভুত রকমের কালো পিঠেলি পড়া দাঁত। ব'ল্‌লে: "মন্তর-টন্তর জানলান্ টাই কি, উদ্দিশে ট্যার পাই আমরা সব।"

—"তবু ভালো।"

যোগজীবন ব'ল্‌লে: "তা টের পাও বেশ করো, এতক্ষণে যা' হোক্ বেশ মোটা মুনাফাই লুটে এসেছ তো

মাছের কারবারে, এবারে দেখি তোমার সাহস; পারবে কিছু আমাদের কাজ উদ্ধার ক'রতে ?"

বড় বড় চোখ দু'টো তুলে ধ'রলে হীরাসং: "কিতান্ কওন চাই ?" (অর্থাৎ কি বলুনই না ?)

দ্বিধা ক'রলে না যোগজীবন, গুলির ব্যাপারটা বেশ ভালো ক'রে বুঝিয়ে দিলে হীরাসংকে। এবং দেখ্তে না দেখ্তেই হীরাসং তিরিক্ ক'রে লাফিয়ে উঠলে। কাঁধের উপরে চাদরের মতো মোটা কি একটা ময়লা কাপড় ঝুল্‌ছিল। নামিয়ে নিয়ে বেশ ক'রে ক'ষে নিলে সেটা কোমরে, তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যেই ছইয়ের পাশ থেকে লগিটা টেনে নিয়ে সোজা চ'লে গেল সে হাতী-হাতিনীর পাহাড়ের ঐদিকটায়। অত্যন্ত স্বভাবগত কাজ যেন এগুলো হীরাসংয়ের, এই-ভাবেই নির্ভিক পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে সাম্‌নে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল সে।

উৎসাহে উদ্দীপনায় যোগজীবন যেন এতক্ষণে একটা নতুন জীবনের আলো দেখ্তে পেলো হঠাৎ। গণি মিয়াকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্‌লে: "উনুন ধরাও গণি, আর দা-বটি যা কিছু থাকে বার করো, এইখানেই আজ আমাদের রাজসূয় ব'সে যাক্।"

"যা আদেশ কত্তার।" ঠোঁঠের ফাঁকে ঈষৎ হাসি চেপে গেল গণি।

হীরাসংয়ের ফিরতে আদৌ দেরী হোলো না। সত্যিই একটা অভাবণীয় আবিষ্কার ক'রে এনেছে সে এরই মধ্যে। হাতের কী তীক্ষ্ণ নিশানা যোগজীবনের! মাঝারী রকমের একটা হরিণই বটে। হীরাসংয়েরও তখন আর হাসি ধরে না মুখে। দীর্ঘকাল হরিণের মাংস যায়নি তার পেটে। শুঁটকি মাছের কারবার ক'রতে ক'রতে মাছের ঐ ভাবলা আঁস্‌টে গন্ধেই অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে সে। কিছু একটা রুচি বদ্‌লাতে পারলে যেন জিভটাকে অনেকখানি আরাম দিতে পারে সে।

যোগজীবনের ইচ্ছে মতো অল্পসময়ের মধ্যেই কার্য্যকরী ব্যবস্থা হ'য়ে গেল।

ব'ল্‌লাম, "আমাদের গণির হাতে খেতে তো তোমার কোনো আপত্তি নেই হীরাসং ?"

হঠাৎ মুখখানি যেন কেমন ভাব হ'য়ে উঠলো হীরাসংয়ের। বুঝতে পারলুম, আমাদের এই ব্যবস্থা তার মনঃপুত হয়নি। বরং রান্নার ব্যাপারটা হীরাসংয়ের হাতে ছেড়ে দিলেই বেশী খুসী হ'তো সে। জাত-বিচারটা এড়িয়ে যেতে পারতো সে তবে।

"কি, কথা বলছো না যে !"

কিছুক্ষণ কতকগুলো কি শব্দ নিয়ে দুই ঠোঁটের ফাঁকে নাড়াচাড়া ক'রলো হীরাসং, তারপর অস্ফুট কণ্ঠে ব'ললে: "জাত দিতি রাজী হইতাম চাইছিন্ না কত্তা।"

অর্থাৎ গণি মিয়ার হাতে খেয়ে জাত খোয়াতে রাজী নয় হীরাসং। হঠাৎই যোগজীবন আবার একটা গানের কলি ভাজ্‌লো গলায়: "জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাতজালিয়াৎ খেলছে জুয়া।"—খাঁটি নজ্‌রুলী ঢংয়ে পাকা সুর। ওস্তাদ বটে যোগজীবন।

পঁচিশে ডিসেম্বরের দীর্ঘ বেলাকে অতিক্রম ক'রে চ'লেছি আমরা। একটু বাদেই চেঙ্গীতে আস্‌বে হিমেলী সন্ধ্যার অন্ধকার।

ব'ললাম: "এই দিনে যাঁর শুভ আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীতে, শ্রেষ্ঠ মানব তিনি যিশু। জাত বিচারের বালাই নিয়ে তিনি কোনোদিন স্বতন্ত্র হ'য়ে থাকেন নি॥ সবার মধ্যে দেখেছিলেন তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে। হজরত মহম্মদই বা কি, আর বুদ্ধ শঙ্করই বা কি, সকলেই ছিলেন সেই এক আদর্শপন্থী। জাত-বিচার নিয়ে ম'রছি শুধু আমরা। যাদের আর কোনো কাজ নেই, জাত ধুয়ে ধুয়েই তারা কলহ ক'রে ম'রলো। কিন্তু এ-ভুল কি এখনো আমাদের ভাঙ্‌বে না হীরাসং ? জাতির নামে বাঙ্গালী ছাড়া আমরা আর কিছুই নই। আমরাই যদি আপত্তি না তুললাম, তুমিই বা অমত ক'রবে কেন হীরাসং ?"

দেখলাম—এবারে যেন অদ্ভুত এক রকমের আভা খেলে গেল হীরাসংয়ের মুখে। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎই একবার যেন খুসীর হাসি টেনে আন্‌লো পুরু পুরু দু'টো ঠোঁটের ফাঁকে। এতক্ষণে এসে আমাদের পরিচয়টা যেন আরও নিবিড় ক'রেই বোধ ক'রলো সে। ব'ললে: "পিন্নাম আপনাগোর পায়ে কত্তা, আঁর আর কওনের নাই কিছু।"

আমাদেরই সমপর্য্যায়ে নেমে এলো হীরাসং। কী যেন একটা নতুন জিনিষ উদ্ধার ক'রে ফেললাম মুহূর্ত্তে, খুসীর আনন্দে সারা মনটা ভ'রে গেল। দেখতে না দেখতেই জামার আস্তিন আর কাপড় গুটিয়ে নিয়ে গণি মিয়ার সাথে অস্ত্রপাতি নিয়ে মাংস ছাড়াতে লেগে গেল যোগজীবন। হীরাসংও আর বড় বেশী নিশ্চেষ্ট রইল না। মাংসাসী মানুষ, মাংসের লোভ সম্বরণ করা কঠিনই বৈ কি তার পক্ষে।

যোগজীবনকে উদ্দেশ ক'রে একসময় ব'ল্‌লাম: "শুনেছি, দু'এক দিন রেখে খেলে নাকি উপাদেয় হয় হরিণের মাংস।"

প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌লো যোগজীবন: "শিকেয় তুলে রাখো তোমার রেখে খাওয়া। পড়নি ওমরখৈয়াম,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতা শূন্য থাক।' এরকম একটা চূড়ান্ত যোগ কি সচরাচর কখনো ভাগ্যে আসে !"

স্বীকার না ক'রে পারলুম না। হেসে ব'ল্লাম : "এইখান থেকেই আজ আমাদের তবে নতুন ক'রে সুরু হোক্ হিন্দু-মুস্লীম-মৈত্রীসাধনা। গ্লোরিয়াস্ আওয়ার খ্রীষ্টমাস। শুধু নোয়াখালী কেন, সারা বাংলায় আমরা এই মিলন-শক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়বো।"

সম্ভবতঃ আনন্দ দিল কথাটা। দেখ্লাম, হীবাসং আর গণি মিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের পানে তাকিয়ে একবার মুচ্‌কী হেসে নিল। এতক্ষণে এসে ভয় দূর হ'য়েছে গণি মিয়ার। কল্যাণ হোক্ যীশুর আত্মার; সার্থক আমাদের এই বড়দিন।

চকিতে একবার মনে প'ড়ে গেল আমাদের ক'ল্কাতার সেই ছোট রাস্তাটাকে : ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট্। তারই পাশে পুরনো মেসবাড়ী। বহু ঘরছাড়া বিবাগীর মতো আমরাও সেখানে দু'টি খণ্ড জীবাণু : যোগজীবন আর আমি। একঘেয়ে জীবনের একটানা স্রোত : সকালে ন'টা না বাজ্‌তেই আপিসের তাড়া, তারপর সন্ধ্যায় ফিরে এসে ছারপোকায় ভরা তক্তাপোষটার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ রক্ষা করা, কখনও কোনো সময় কারো অশ্লীল উক্তিতে কান দেওয়া, কখনও বা দু'হাত তাস পিটানো, ব্যস্—দিন আর রাত্রি মিলে অখণ্ড জীবন-সত্তাকে ছিঁড়ে নিঙড়ে টুকরো টুকরো ক'রে বুঝে নেওয়া। এর বাইরে আর কিছু নেই। কঠিন বিদ্রূপের মতো দুই চোখের সাম্‌নে দিয়ে যেন মুহূর্তে একবার ঘুরে গেল ক'ল্‌কাতার ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীটের সেই মেসবাড়ীটা।—অদ্ভুত এই স্মৃতির দংশন।

নিজের মধ্যেই কেমন যেন নিজেকে সহসা হারিয়ে ফেল্‌তে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নৌকোর নীচে কল্‌কল্ শব্দে মৃদু স্রোতে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো চেঙ্গীর জল।

তাকিয়ে দেখ্লাম, জোয়ার এসেছে চেঙ্গীতে॥

পিতৃ-তর্পণ

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাহি শান্তি নাহি সুখ,
জ্বলিয়া যেতেছে বুক,
কোথায় গিয়াছ পিতা ছাড়িয়া আমায়,
তোমা লাগি' প্রাণ মম কাঁদিছে ব্যথায়।

আসিয়া দাঁড়াও পিতা নয়নের আগে
তোমার চরণে প্রাণ ক্ষমাভিক্ষা মাগে।
যখন ফোটেনি কথা,
বুঝাতে শিখিনি ব্যথা,
তখনো বুঝেছ পিতা বেদনা আমার,
স্নেহদানে মুছায়েছ নয়নের ধার।

যায় কি তোমার কাছে কান্না আমার
এখনো পূর্ব্বের মতো ? বল' একবার।
যা কিছু ক'রেছি দোষ,
জানি, নাহি করি' রোষ
সকলি ক্ষমেছ তুমি—তবু পুনরায়
বল গো করিলে ক্ষমা—ক্ষমিলে আমায়।

তোমারে প্রণমি' কহি প্রার্থনা আমার,
পদ পরশিতে পিতা দাও অধিকার।
মর্ত্ত্যলোকে আছি পড়ে
তবু চাহি—কর-জোড়ে
চরণ করিতে স্পর্শ দাও অধিকার;
অমৃত-পরশ তব যাচি বারে বার।

বাঙ্গলার নারী

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)*

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

ইঁচোড়ে নয়, ফুলেই যখন পাক ধরিয়াছে তখন বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি আর চার্লস গার্ভিসের কয়েকখানি উপন্যাসই আমার সহিত বৃদ্ধজনের রামায়ণ-মহাভারতের অনুরূপ নৈকট্য স্থাপিত করিয়াছিল। বুঝিতাম বা কি আর বোধশক্তিই বা কতটুকু, তথাপি অত্যন্ত দুঃখের সহিত সেই কালের অভাব অনুভব করিতাম, যে-কালে বাঙ্গালীর মেয়ে গোরা পল্টন লিগুলেকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে উৎখাত করিয়া সেই ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিয়া ঘোড়ার পেটে রাঙা পায়ের মলের গোঁত্তা মারিয়া নক্ষত্রবেগে অদৃশ্য হইত। গার্ভিসের গল্প মনে রেখাঙ্কন করিতে পারিত না; তবে তাহার 'রাজার দুলাল' ও 'কৃষক-কুমারী'র প্রেমের আলেখ্যগুলি শরতের শুভ্র লঘু মেঘখণ্ডের মত শোভায় সৌন্দর্য্যে অভিনব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া কিছুক্ষণের জন্য আনমনা করিয়া দিত—তাহাই বা অস্বীকার করিব কেন? আগেই বলিয়াছি, পাক—রঙ ধরিতে সুরু করিয়াছে; মন উড়ু উড়ু করিতে শিখিয়াছে। গার্ভিস যে অধিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইতেন না, তাহার প্রধান কারণ বোধ করি লণ্ডনের ডিউক বা আর্লের পুত্রের আসনে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিবার পক্ষে সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-অবাস্তব, এমন কি কল্পলোকের পক্ষীরাজে আরোহণ করিয়াও, সম্ভাবনা আয়ত্তাধীন করিতে পারিতাম না। বোধ হয়, সেই জন্যই গার্ভিসকে বেশী আস্কারা দিই নাই।

কিন্তু জীবানন্দ হওয়া তেমন কঠিন বলিয়া মনে হইত না। পেরুয়া কারণ, সে ত অনায়াসেই পারি। মঠে বাস? আহা, তেমন ভাগ্য কি আমার হইবে? হরিনাম সংকীর্ত্তন? পিতামহীর আশীর্ব্বাদে শিশুকাল হইতেই সেটা ভাল রকম প্র্যাক্‌টিস্ করিয়া ফেলিয়াছি। আমার—

"বল্ মাধাই মধুর স্বরে
হরিনাম বিনে আর
কি ধন আছে সংসারে।"

গীতের চোটে শীতের ভোরে বাড়ীশুদ্ধ লোক মার্ মার্ শব্দে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিত। জীবানন্দ ঠাকুরের অপরাপর ব্যবসাগুলির প্রতিও অন্তরের কী (এখানেই ঈ ব্যতীত গতি নাই।) গভীর সহানুভূতি বর্ত্তমান; সে আর কি বলিব? বিশেষ করিয়া অর্থচিন্তা একেবারেই নাই। একবার 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' করিয়া বাহির হইলেই হইল। গাড়ী গাড়ী টাকা চালান যাইতেছে, হারে রে রে রবে লাঠি ঘুরাইয়া রক্ষী ক'টাকে কাত করিতে কতক্ষণ?

বৃহৎ ব্যক্তিগণ বৃহৎ চিন্তা করেন এবং সেই সকল চিন্তার সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য প্রবাদ-প্রবচনেও স্বীকৃত। লোকের মুখে ও সংবাদপত্রে জীবানন্দাদি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত স্বদেশী ডাকাতির খবর প্রচারিত হইতে 'দেখা' গেল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়াঙ্কে স্বদেশী ডাকাতির এপিডেমিকের কথা আমার পাঠিকা ও পাঠকগণের জানা না থাকিবার কথা নহে। আমরা সেই সকল লোমহর্ষক, চিত্তচমকপ্রদ কাহিনী শ্রবণ করিতাম আর বুকের একদিকে উল্লাস অন্যদিকে অবসাদ ("শীতও করছে, ঘামও হচ্ছে"—'প্রফুল্ল' নাটক দ্রষ্টব্য।) একেবারে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিত। হতাশাভরে গুণ গুণ স্বরে গাহিতাম—হায় রে! "আমিই শুধু রইনু পড়ে।"

আরও একটা নিদারুণ ক্ষোভ ছিল। বঙ্গদেশে 'আনন্দের' অভাব নাই তাহা ত' অনুমানে ও অনুভবে ভালই বুঝিতেছি; কিন্তু শান্তিদেবী ত কৈ একটিও আবির্ভূতা হইলেন না! আকাশে চাঁদ উঠিলে সরোবরে কুমুদ ফুটে; সাগরে জোয়ার আসিলে নদীতে বান ডাকে; মেঘোদয়ে ময়ূরপুচ্ছ স্বতঃ বিস্ফারিত হয়; ভাগাড়ে গরু পড়িলে শকুনী-গৃধিনীর নিউ ইয়ার্স ডে' প্যারেড সুরু হইয়া যায়; ধনবানের মৃত্যু হইলে পণ্ডিত-বেয়োভাট-অগ্রদানী শাস্ত্র শাণ দিয়া ক্ষুরধার করিতে থাকে; পচা-এঁদো ডোবাও যদি জলে ভরে দাদরী রাজ্যে ডামাডোল পড়িয়া যায় এবং রামের আগমনে সীতার উদ্ভেদ, শিবের সঙ্গে শিবানী, কৃষ্ণের সহিত রাধা তৎসহ মধুবন নিধুবন-কুঞ্জবন সমেত বৃন্দাবন, কালিন্দী, কদম্বতল, হলধর-স্কন্ধে হল, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আসিলে পেচক, গণেশ দাদার বাহন মূষিক—এ সব ত সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মেই সম্ভব হইয়া থাকে; এক্ষেত্রে এমন অনিয়ম কেন? আনন্দ দাদারা হরদম ডাকাতি করিতেছে; কিন্তু শান্তি কৈ?

এই দুঃখ আমার অনেক দিনের। শুধু কি আমারই দুঃখ? নিশ্চয়ই না। সমস্ত বাঙ্গালীর ও সমগ্র বাঙ্গলাদেশের দুঃখ ও দুর্ভাগ্য। আর শ্রাবণ-আকাশের মেঘের মত দুঃখ ও দুর্ভাগ্য আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অনেক সময়ে কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, বঙ্কিম ত' মরিয়াছেনই; তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সাধের বঙ্গদেশকেও সহমরণে লইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলাও মরিয়াছে।

কি সে সৃজনী মহাশক্তি যে, রাজপুতানার রাজ-বংশে নয়, মারাঠার বীর শিবাজীর বংশে নয়, পাঞ্জাবের শিখ-গোষ্ঠিতেও নয়, এই বাঙ্গলাদেশের স্যাঁত-সেতে জন্মভূমিতে, এই সিদ্ধান্নভুক্, অতি দীন-দরিদ্রের কুটীরে, দরিদ্র বাঙ্গালীর ঔরসে ও দীনা-ক্ষীণা বঙ্গনারীর গর্ভে বীরাঙ্গনার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল? কি সে মহিমময়ী কল্পনা-শক্তি, উদরে কদন্ন, পরিধানে শতছিন্ন জীর্ণ চীর, তৈলাভাবে রুক্ষ কেশদামের অভ্যন্তরে আগুন, ছাই-চাপা ছিল; যেদিন বায়ু বহিল, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি সে-দিন দিগ্দাহ করিল। পাপিষ্ঠ টমাস সে-দিনও ধরায় ছিল, আজও আছে এবং ধরিত্রী যতদিন ধরিত্রী থাকিবেন, পিশাচ টমাস নানাবেশে, নানা নামে,

---

* বাঙ্গলার নারী, প্রথম প্রস্তাব, "বঙ্গশ্রী"—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩। বঃ সঃ

নানা ছন্দেই ততদিন থাকিবে। সে-দিন বীর্য্যবান বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, বঙ্কিমের মানস কন্যা শান্তি দেবী জন্মিয়াছিলেন, টমাসের যেমন রোগ, তেমনই দাওয়াই—হাতে হাতে ফল পাইয়াছিল। আর আজ টমাস চর্য্যের পৈশাচিক অত্যাচারের বীভৎসায় বঙ্গদেশের আকাশ-বাতাস জল-স্থল করুণ ক্রন্দনে ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের যদি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে পূর্ব্ববঙ্গের নারীর মত তাহাদের চোখেও অবিরল বারিধারা বহিত। ঋষি বঙ্কিম, বহুদূরদর্শী বঙ্কিম ও ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা বঙ্কিম! সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিচক্ষে অদৃশ্য কি তোমার কিছুই ছিল না? হে মহাভাগ, হে মহাতাপস, হে মহর্ষি, একমাত্র বঙ্গদেশে জন্ম, বাঙ্গালী নামে পরিচয়, তাহা ছাড়া এমন কোনও অধিকারই আমাদের নাই যে তোমার চরণ-রেণুও শিরে ধারণ করিতে পারি।

শান্তি যে স্রষ্টার কি মহান্, বিরাট অথচ কি মধুর সৃষ্টি, তাহা আজ আর একবার গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। মহাভারতের দ্রৌপদীর মত, বঙ্কিমের শান্তি অতুলনীয় ও উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টি এবং তাহার জনক যেভাবে শান্তি-চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন তাহাও একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রেই সম্ভব। বঙ্কিমে সম্ভব এবং বঙ্কিমেই সমাপ্তি, এ কথাটাও নিঃসংশয়ে বলিব। নিমির আহ্বানে শতচ্ছিন্নবাসা শান্তি যখন কুটীরের বাহিরে আসিল, এমন কি, নিমির কারসাজিতে যখন 'সন্তান' জীবানন্দের সহিত তাহার মিলন ঘটিল এবং জীবানন্দকে বেশ একটা উচ্চ-মার্গের বীরত্বগর্ভ বক্তৃতা শুনাইয়া দিল, তখনও কি কেহ ভাবিতে পারিয়াছিল যে এই আবাল্য উপেক্ষিতা, আযৌবন স্বামীসঙ্গসুখ-বঞ্চিতা বঙ্গনারী একদিন অগোচরে, অদূরভবিষ্যতে বিরাট সন্তান-বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিবার শক্তি বা স্পর্দ্ধা রাখে? না! কিন্তু ধাপে ধাপে উঠিতেছে। কলাকুশলী স্রষ্টা শনৈঃ শনৈঃ পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন; বিন্দুমাত্র অসঙ্গতির সম্ভাবনাও থাকিবে না। জীবানন্দ চলিয়া গেলে, শান্তি কি করিল?

যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে হরে মুরারে!

অদ্ভুত রমণী, প্রথমেই বাঁধা ভাতগুলি উনানকে উপহার দিল, বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল, তাহাই ভোজন করিল। তারপর যে একখানি দামী ও সুন্দর শান্তিপুরী কাপড় ছিল, সেই শাড়ীর পাড় বাদ দিয়া গেরি মাটিতে রঙ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিল। শ্রীণ রূপের বর্ণনা আমি দিতে পারিব না, স্থানাভাব, পাঠকের সময়াভাব না থাকিলে, বানাইয়া লইলে যথেষ্ট রস বোধ হইবে। 'রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসীবেশে দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বনদেবীগণ সেই নিশীথে কাননমধ্যে অপূর্ব্ব গীতিধ্বনি শ্রবণ করিলেন।'

বনে বনদেবীগণের বাস, তাঁহারাই সে গান শুনিলেন; শান্তি লোকালয়ে আসে নাই, তাই মনুষ্যগণ শুনিতে পাইল না। কিন্তু গান শুনিয়া মনে শঙ্কা হইতেছে, মনুষ্য (বিশেষ করিয়া পুরুষে) সে গান শুনিলে ছড়ি লাঠি, ঠ্যাঙ্গা, নড়ি লইয়া তাড়া করিত; বনদেবীদের রোষের কোন কারণ নাই। গানটি এই:

রমণীতে নাহি সাধ
রণজয় গাও রে।

সেই কাল কুচকুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি লইয়া গৈরিকধারী সন্ন্যাসী চূড়ামণি শান্তিরাম শর্ম্মা সন্তানধর্ম্মে দীক্ষা লইতে বাস্তু সন্ন্যাসী সত্যানন্দের মঠে হাজির। এখানে শান্তি একটু বেশী দুঃসাহসিকতা করিয়া ফেলিয়াছিল। বুড়া সত্যানন্দ বাম হাতে সেই দাড়ী জড়াইয়া ধরিয়া একটিমাত্র টান দিতেই জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল। তবু কি পোড়ারমুখী শান্তিমণি পাপিষ্ঠার লজ্জা সরমের লেশ আছে? বলে "স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?" সত্যানন্দ ঠাকুরও এখানে একটা ভুল করিলেন! পুরুষোচিত তাচ্ছিল্যভরে কহিলেন, "গোষ্পদে যেমন জল।" বটে! বল পরীক্ষা করেন? পরীক্ষাটা হয় কি ভাবে? সত্যানন্দ এক ইস্পাতের ধনুক আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন, "এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারে গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে। যে গুণ দেয় তাহাকে ছুঁড়িয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে সেই প্রকৃত বলবান।' শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল, জিজ্ঞাসা করিব কি, যে কে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন? সত্যানন্দ বলিলেন, বিশেষ কিছুই নাই, মাত্র চারিজন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জীবানন্দ, ভবানন্দ, জ্ঞানানন্দ ও (বিনয়বশতঃ সর্ব্বশেষে) আমি। শান্তি আর বাক্যব্যয় না করিয়া ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল। সত্যানন্দ বিস্মিত ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "এ কি, তুমি দেবী না মানবী? শান্তি বলিল, "আমি ব্রহ্মচারিণী।"

পরে সত্যানন্দ চিনিলেন; বুঝিলেন, শান্তি জীবানন্দের ঘরণী। প্রীত হইলেন, আবার ভয়ও হইল। বলিলেন, "তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ।"

শান্তি সিংহের সিংহিনী। বলিল, "আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি; আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্যই আসিয়াছি; স্বামিদর্শনের জন্য নয়। বিরহ যন্ত্রণায় আমি কাতর নই। স্বামী যে ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাহার ভাগিনী কেন না হইব? তাই আসিয়াছি।"

সত্যানন্দ দিগ্বিজয়ী ও জিতেন্দ্রীয় সন্তান সম্প্রদায়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইলেও পুরুষ মানুষ, মনের দ্বিধাও কাটে না, ভয়ও ঘুচে না। অথচ যাহা দেখিলেন তাহাও অপূর্ব্ব ও অভিনব। বুড়ার বোধ হয় কবি চাণক্য শ্লোকটাও ঘন ঘন মনে পড়িতেছিল। বলিলেন, "মা ভবানীর মত তোমার ললাটে আগুন আছে, সন্তান সম্প্রদায় কেন দাহ করিবে।"

বুড়া চক্ষুর বিদ্যুতের কথাই বলিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু 'তা কি বুড়াবয়সে ছেলেমানুষকে বলা যায়!' তাই ঐ রকম ঠারে

ঠারে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই; শান্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় করিলেন।

কিন্তু শান্তির বিষম ক্রোধ ; মনে মনে বলিল, "হ বেটা বুড়ো ! আমার কপালে আগুন ! আমি পোড়া কপালী, না তোর মা পোড়া কপালী ?"

শান্তি সত্যানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। তাহার ললাটের অথবা নয়নের কোনও আগুনেই সন্তান সম্প্রদায় দগ্ধ হয় নাই। পরন্তু প্রবল প্রতাপ টমাসকে তাহাদের কোটরে বাঁদর সাজিয়া খাইটে উট্টম জিনিষ কলা ভক্ষণের আমন্ত্রণ দিয়া, ক্লাইভকা মাফিক গ্রেট জেনারেল এডওয়ার্ডসকে সত্য সত্যই কদলী প্রদর্শন করিয়া (এবং লিণ্ডলের কথা আগেই বলিয়াছি, তাহার ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া দিয়া) যুদ্ধজয় করিয়া, হিমালয়ের উপর কুটীর প্রস্তুত করিয়া দুইজনে দেবতার আরাধনা এবং যাহাতে মায়ের (দেশমাতৃকা) মঙ্গল হয় তাহার সাধনা করিবার উদ্দেশ্যে, দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "হায় ! আবার আসিবে কি মা ! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি ?"

আমাদের খেদ আরও বেশী। আমরা বলি—"হায় বঙ্কিম, আবার কি তুমি আসিবে না ? সাহিত্যে প্রেরণা দিতে, মৃতকল্প জাতিকে পুনর্জীবন দান করিতে, মুমূর্ষু বঙ্গের নিঃস্ব, লাঞ্ছনার্দ্দিত ও ভয়ার্ত্ত নরনারীকে অভয় দিতে আজ এই জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আর একবার কি তোমরা আবির্ভাব হইবে না ?"

শান্তির জন্ম, তাহার জীবন, তাহার কর্ম্ম ও ধর্ম্ম দৈবাৎ বা আকস্মিক ঘটনার অভিব্যক্তি বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে; এবং ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সংগঠনী মহাশক্তির প্রতিও অবিচার করা হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জন্মভূমি, মাতৃভূমি সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমিকে সংগঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজাহীন রাজ্যে, শাসকবিহীন দেশে অত্যাচারিত, প্রপীড়িত ও নির্য্যাতীত জন-সমাজে, অন্নহীন, দুর্ভিক্ষ-উৎসাদিত দুর্ব্বল ও মেরুদণ্ডবিহীন লোকালয়ে শক্তির সঞ্জীবনী সুধার উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বলিষ্ঠ সমাজ সংগঠনই তাঁহার লক্ষ্য। বলিষ্ঠ সমাজ সংগঠনে একাকী পুরুষ বলিষ্ঠ হইলেই হইল না, বলিষ্ঠ নারীও প্রয়োজন। তাই শান্তি দেবীর সৃষ্টি।

'আনন্দমঠে' আর একটি নারী চরিত্রের উল্লেখ আছে। শান্তি, শ্মশানে শ্মশান কালী, তাহার কার্য্যকলাপ শ্মশান-কালীর মতই কঠোর ও উগ্র। তুলনায় কল্যাণী অনেক মৃদু, অনেক শান্ত, কল্যাণী শব্দটির মতই কল্যাণময়ী ও স্নিগ্ধ। কিন্তু তাহার জনক তাহাকেও দুর্ব্বলা ও অবলা করিয়া গড়েন নাই। গড়েন নাই না বলিয়া গড়িতে পারেন নাই বলিলেই বোধ হয়, ঠিক বলা হইবে। কল্যাণী মধ্যবিত্ত ভদ্র কায়স্থ ঘরের বধূ, সন্তানের জননী; পতিগতপ্রাণ কল্যাণীও প্রয়োজনকালে বীর নারী। মধুর ভাষিণী, মধুর হাসিনী, মন্থর গামিনী, লজ্জাশীলা সুশীলা রমণীর অন্তরও বীর্য্যযুক্ত; শৌর্য্যে প্রদীপ্ত। তা যদি না হইবে, তাহা হইলে কামান্ধ পুরুষকে নারী হাসিমুখে মরিতে প্রবৃত্তি দিতে পারে কি ? ভবানন্দ যুদ্ধে মরিত না, কল্যাণী তাহাকে মরিতে বলিয়াছিল। তাই মরিল।

সেখানকার কথোপকথন কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা।

ভবানন্দ। * * * প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি। আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে ?

কল্যাণী। তোমারই মুখে শুনিয়াছি যে সন্তান ধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয়পরবশ হয়, তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। এ কথা সত্য কি ?

ভবা। এ কথা সত্য।

কল্যাণী; তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু ?

ভবা। আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

* * *

কল্যাণী। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে ?

ভবা। আগামী যুদ্ধে। * * * আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি ?

কল্যাণী বলিল, রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব। এমন তেজোদৃপ্ত, কঠোর সত্য বীর রমণীই বলিতে পারে।

কিন্তু এই কথাতেই শেষ নহে। কল্যাণীর চারিত্রিক সুসঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে। তাহাদেও স্রষ্টার তীব্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি। বঙ্কিম লিখিলেন, "ভবানন্দ বিদায় হইল, কল্যাণী পুঁথি পড়িতে বসিল।" পাঠিকা ঠাকুরাণী আনন্দমঠ গ্রন্থখানি খুলিলে দেখিবেন, ভবানন্দ যখন বৃন্দে-দূতী গৌরী দেবীর (দেবীই বটে। কিন্তু আলোকের মূল্য নিরূপণ জন্য, অন্ধকারের যেমন প্রয়োজন, দেবীর মাহাত্ম্য অনুধাবন করিতে হইলে দানবীর পরিকল্পনাও তেমনই প্রয়োজন। তবে গৌরী দেবীটি পুরাপুরি দানবী নহে; সামান্য একটু সাজার লোভে পড়িয়া বুড়াবয়সে কুট্টনীবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই মাত্র।) গৃহে উপস্থিত হইলেন তখন" দেবলোকে শাপগ্রস্ত দেবীর পার্শ্বে দুই তিনখানি তুলোটের পুঁথি পড়িয়া আছে।" ইহাতেই অনুমিত হয় যে কল্যাণী পুঁথি পড়িতেছিল এবং ব্রতচ্যুত ইন্দ্রিয়দাস অধর্ম্মী ভবানন্দকে মরিতে পাঠাইয়া আবার সেই পুঁথিতেই মনঃসংযোগ করিল। ভবানন্দের আগমন, কু-প্রস্তাব ও নির্গমন শারদাকাশে উড্ডীয়মান লঘু কৃষ্ণমেঘখণ্ড মাত্র; মেঘাপসরণে বিলম্ব হইল না এবং মেঘমুক্ত আকাশ আবার নীল, নির্ম্মল। 'মেঘ-মনস্তত্ত্ব' বিশ্লেষণ বীরাচরিত ধর্ম্ম নহে, বীরধর্ম্মী বঙ্কিমের লেখনী সে অশুচি স্পর্শ করিবে কেন ?

নোয়াখালী আজ আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দু নারীর নিদারুণ নির্য্যাতনের কাহিনী শুনিতে শুনিতে পাপিষ্ঠের চোখেও জল আসে: রোষে ক্ষোভে ঘৃণায় শীতল শোণিতও উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সত্য; কিন্তু ইহাও আকস্মিক বা দৈব-দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। আধুনিক পাশব-পৈশাচিকতা বর্ব্বরের রাজনীতি প্রসূত বলিয়া কথঞ্চিৎ অভিনবত্ব

আছে তাহা স্বীকার করি বটে; কিন্তু নোয়াখালি-মনোবৃত্তি যে সর্ব্বকালেই বিদ্যমান্ ছিল, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

আমি প্রবন্ধের লেখক, মনশ্চক্ষুতে অদৃশ্য সংস্থিতা আমার পাঠিকা গৃহিণীকে চাক্ষুষ করিতেছি। দিবা দ্বিপ্রহর, স্তব্ধ গৃহ, প্রাত্যহিক 'গৃহ-যুদ্ধের' অবসানে, অবসরকালে চিত্ত-বিনোদন জন্য রূপলাবণ্যশালিনী রাণী গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। উপাধানোপরে সুরভিতঘনভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম এলায়িত; তাম্বুলরসসিক্ত বিম্বাধরে মৃদু মধুর হাস্য, রমিত উপবনে বর্ণবহুল প্রজাপতিটির মত খেলা করিয়া বেড়াইতেছে; ললিতলবঙ্গলতা তনু বেষ্টন করিয়া লাল পাড় চিক্কণ শাড়ীখানি অলক্তকরাগ-রঞ্জিত চরণারবিন্দে আশ্রয় লভিয়া ধন্য হইয়াছে; চম্পকাঙ্গুলিধৃত "বঙ্গশ্রী"তে আমার "বাঙ্গলার নারী" পাঠ করিতেছেন আর মনে মনে মৃদুমন্দ তিরস্কার উচ্চারণ করিয়া ভ্রমর গুঞ্জনবৎ বলিতেছেন, 'সেকাল ধরিয়া কেন আর টানাটানি, বাপু। তুমিও একালের লোক, আমরাও একালের লোক, একালের কথা বলো, বুঝিতে পারি।' কেমন গো ঠাকুরাণি, তাই না?

আমি লেখক, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে অন্য চিন্তায় মগ্ন আছি। তাঁহার পানে চাহিতেছি আর ভাবিতেছি তাঁহার সহিত অর্থাৎ একালের এই কল্যাণীর সহিত সেকালের কল্যাণীর কতটুকু পার্থক্য? গবেষণা অথবা তুলনা মূলক সমালোচনা আমি না হয় নাই করিলাম; আমার চারুহাসিনী পাঠিকাই সে কার্য্য করুন। নিম্নবর্ণিত কথোপকথনের সহিত তাঁহার হৃদয়ের সংযোগ আছে কি-না, তিনিই চিন্তা করিতে থাকুন। আমি মাত্র দর্পণ ধারণ করিলাম।

"মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি পথ হাঁটিতে পারিবে কি? বেহারা ত সব মরিয়া গিয়াছে। গোরু আছে ত গাড়োয়ান নাই, গাড়োয়ান আছে ত গোরু নাই।" অবিকল আজিকার অবস্থা। যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্ত্তী কালে ভারতের কি এই দশাই নহে?

"কল্যাণী। আমি পথ হাঁটিব, তুমি চিন্তা করিওনা। কল্যাণী মনে মনে স্থির করিলেন যে, না-হয় পথে মরিয়া পড়িয়া থাকিব। ইহারা ত দুইজন বাঁচিবে।

"পরদিন প্রভাতে দুইজনে * * রাজধানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মহেন্দ্র বলিলেন, 'পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাতলুঠেরা ফিরিতেছে, শুধু হাতে যাওয়া উচিত নয়।' এই বলিয়া মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া বন্দুক, গুলি, বারুদ লইয়া গেলেন।

"দেখিয়া কল্যাণী বলিলেন, যদি অস্ত্রের কথা মনে করিলে, তবে তুমি একবার সুকুমারীকে ধর। আমিও হাতিয়ার লইয়া আসিব।" এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে মহেন্দ্রের কোলে দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"মহেন্দ্র বলিলেন, তুমি আবার কি হাতিয়ার লইবে?

"কল্যাণী আসিয়া একটি বিষের ক্ষুদ্র কৌটা বস্ত্রমধ্যে লুকাইল। দুঃখের দিনে কপালে কি হয় বলিয়া কল্যাণী পূর্ব্বেই বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসই রচনা করেন নাই। একটা অধঃপতিত দেশ, তাহোধিক অধঃপতিত সমাজকে দেশ ও সংগঠনের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছিলেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রও তাহাই করিয়াছিলেন। আমরা গীতাও বিস্মৃত, বঙ্কিমও আমাদের নিকট অনাদৃত। ধ্বংসের প্রাক্কালে এইরূপই ঘটে বটে।

আগামী সংখ্যায় ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের রচিত সাইমন কমিশন,

১৯২৮ সালের কংগ্রেস, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী,

কমাণ্ডিং জি, ও, সি সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি

বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

প্রকাশিত হইবে।

ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা

...ভারতবর্ষের জমিগুলির উর্ব্বরাশক্তি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে, জলহাওয়া ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে, ভারতীয় মানুষগুলির পরমায়ু ও যৌবন ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। যে জমির প্রতিবিঘায় বর্ত্তমানে ৪মণ ফসল হয়, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেই জমিতে ৭ মণ ফসল হইত; যে গ্রামগুলি আজ ম্যালেরিয়ার জন্ত বাসের অনুপযুক্ত এবং জনশূন্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে সমস্ত গ্রাম একদিন স্বাস্থ্যকর ও বহু অধিবাসী পরিপূর্ণ ছিল; যে সমস্ত পরিবারে এখন আর ৫০ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোক একজনও দেখা যায় না, সেই সমস্ত পরিবারে কিছুদিন আগেও ৭০।৮০ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক একাধিক লোক দেখা যাইত। ভারতবর্ষের গত ২৫০০ হাজার বৎসরের ইতিহাস প্রতি দশ বৎসর এক একটি ভাগে বিভাগ করিয়া লইলে প্রত্যেক পরবর্ত্তী দশ বৎসরে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের তুলনায় তাহার জমি, মানুষ ও জলহাওয়ার অবনতি ঘটিতেছে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ত্তমান ভারতের জমির উর্ব্বরাশক্তি, জলহাওয়ার স্বাস্থ্য, মানুষের পরমায়ু ও কর্ম্মশক্তি যে দ্রুতগতিতে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার অবরোধ অনতিবিলম্বে সংঘটিত না হইলে আগামী ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ বাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িতে পারে। অথচ জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ এখনও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শস্তশালী এবং ভারতের কৃষক অন্যান্য দেশের কৃষকের তুলনায় কম পরমুখাপেক্ষী। পূর্ব্বাপর সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, ভারতে ২৫০০ হাজার বৎসর আগে—অবশ্য কতদিন আগে তাহা সঠিক বলা যায় না—এমন একটী সময় ছিল, যখন মানুষের যাহা কিছু অভীষ্ট তাহা পাওয়া যাইত।

ভারত যে মাত্র ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে তাহা নহে। জগতে অন্যান্য দেশের অধিবাসীবৃন্দও ভারত হইতে তাঁহাদের বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ চিরদিন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। গত ২৫০০হাজার বৎসরের জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবাসী তাহার অন্ন-সংস্থানের জন্ত কোন দেশান্তরে যায় নাই, অথচ যখন যে দেশবাসী ভারতবাসীর সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছেন, তখনই তাঁহারা জগতে তাঁহাদের প্রাধান্ত-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রীকগণের, রোমকগণের এবং আরবগণের প্রাধান্যের সময়ে তাঁহাদের যে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল, তাহা অনুমান করা খুব কষ্টসাধ্য নহে। বর্ত্তমান ইংরাজগণেরও জগতের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে তখনই, যখন তাঁহারা ভারতবর্ষের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ দৃঢ়মূল করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যে দেশ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের অধিবাসী-বৃন্দের প্রয়োজন সংগ্রহ করিতে সক্ষম এবং অধিকন্তু তাহার সহিত সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ জাতিগুলির প্রাধান্য স্থাপনের সহায়তা করিতে সমর্থ, তাহাকে দেশ হিসাবে স্বাধীনতাসম্পন্ন বলা যাইতে পারে। কাজেই ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন ও সম্পূর্ণ ছিল। যে শ্রেণীর স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণতা ভারতবর্ষ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, জগতের অপর কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত সেই শ্রেণীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অর্জ্জন করিতে পারে নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। কারণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও আজও পর্য্যন্ত কোনও জাতি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কোন্ বিদ্যায় সেই স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সমস্ত জগৎ এখনও অপরি-জ্ঞাত। ভারতবাসিগণও সেই বিদ্যা ন্যূনকল্পে চারি হাজার বৎসর আগে বিস্মৃত হইয়াছেন এবং ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ও সম্পূর্ণ ছিল, অথচ অদূর ভবিষ্যতে তাহা বাসোপযোগী থাকিবে কিনা তৎসম্বন্ধে পর্য্যন্ত প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, সুতরাং ভারতবর্ষের সমস্যা যে অতীব গুরুতর তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ইহা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে ইহাকে আর ছোটত্বের অথবা বড়-ত্বের সমস্যা বলা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে ইহা এখন ভারতবাসীর ও ভারতবর্ষের জীবন-মরণের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।...

সচ্চিদানন্দ

পুস্তক ও আলোচনা

Indian National Congress : By Dr. Hemendra Nath Das Gupta. Published by J. K. Das Gupta. 124/5B, Russa Road, Calcutta, Price Rs. 6/- only.

ইতিপূর্ব্বে বাংলা ভাষায় 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়া লেখক রাজনৈতিক সাহিত্য-ক্ষেত্রে আলোড়ন আনিয়াছেন। এবারে ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করিয়া তিনি আরও অধিক কর্ম্মনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও শক্তির পরিচয় দিলেন। আলোচ্য খণ্ডটি উৎসর্গিকৃত হইয়াছে 'বন্দেমাতরমের' অমর ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রকে। চতুর্থ অধ্যায়ে (Chapter Four) বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন, আনন্দমঠ ও সীতারামের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে বঙ্কিমের প্রভাব ও দানের কথা লেখক বিষদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থখানিতে প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে এই অধ্যায়টি। ইহা যোগ্য ব্যক্তির যোগ্য ঋষিপুরুষের প্রতিই অনন্য-শ্রদ্ধা। চৌদ্দটি অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের 'Early Influences of Nationalism' হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশন পর্য্যন্ত লেখক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তথ্যমূলক বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ব্রান্সনিজম্, সুরেন্দ্রনাথের মোকদ্দমা, ধর্ম্মান্দোলন প্রভৃতি ঘটনাগুলি গ্রন্থখানিতে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ভারতীয় গণজাগরণের প্রধান মন্ত্রদাতা বাঙ্গলা। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা দুই একখানি মাত্র কংগ্রেসের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা তাহার সেই বিশিষ্ট স্থান পায় নাই। সেই আঘাতই লেখককে ব্যথা দিয়াছে; তিনি সর্ব্বভারতীয় এই গণ-অভ্যুত্থানের মূলে বাংলার দানের কথা অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করিয়াছেন। শক্তিশালী লেখক ও সমালোচক ডঃ দাশগুপ্ত। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে একদিকে তাঁহার যেমন গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তথ্য-সংগ্রহের ব্যুৎপত্তি ও কৃতিত্বও তাঁহার অসাধারণ। মনোজ্ঞ প্রচ্ছদপট গ্রন্থখানির আরও গৌরব বাড়াইয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির সার্থক প্রচার কামনা করি।

The Racial History of India : By Chandra Chakravorty.

এই জাতীয় একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অভাব আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ বোধ করিয়াছি। বিভিন্ন তথ্য ও তুলনামূলক পাঠের জন্য শিক্ষাব্রতীর পক্ষে গ্রন্থখানি উপকারে আসিবে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে 'Race and Science কি ভাবে পরিণতি ও উন্নতির পথে আসিল, তাহার সঙ্গে 'the make up of India's population' বিষদভাবে লেখক বর্ণনা করিয়াছেন, এবং তৎসহ ভারতীয় কৃষ্টি, শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতিরও একত্রে সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। বোধিসমাজে গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

সন্ধ্যা-মালতী ঃ কাব্যগ্রন্থ। শ্রীআশুতোষ সান্যাল প্রণীত। মূল্য—১৸০ মাত্র।

শ্রীযুক্ত সান্যাল একাধারে কবি, দার্শনিক ও বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার বিভিন্ন পত্রে প্রকাশিত কবিতার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই পরিচিত। এবারে তাঁহার কাব্যসঞ্চয়ন পাঠক-চিত্তকে আরও অধিক আনন্দ দিবে, মনে করি। প্রত্যেকটি কবিতাই সরল, স্বচ্ছন্দ ও জীবন-রসে পূর্ণ। কবির মনোময় প্রকাশভঙ্গীতে কবিতাগুলি আরও অধিক জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যামোদী পাঠকমাত্রেই গ্রন্থখানির সার্থকতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবেন।

শ্রীশ্রীউদ্ধব সংবাদ ঃ—শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের ২৯ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা ; প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আচার্য্য পরিব্রাজকবর ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গত শ্রীশ্রীউদ্ধব সংবাদ গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে সংস্কৃত মূল শ্লোক, শ্রীধর স্বামীপাদের আনুগত্যে অন্বয়, অনুবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থ দর্শিনী টীকা, টীকার বঙ্গানুবাদ এবং তদানুগত্যে সম্পাদকের সারার্থানুদর্শিনী টীকা প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকার বঙ্গানুবাদ সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত হইয়া দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃতসাহিত্যে রচিত ভক্ত প্রবরের সুযুক্তি মূলে দার্শনিক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ শুদ্ধা ভক্তির বিচার সমূহ বঙ্গভাষার পাঠক-গণেরও সুবোধ্য হইয়াছে এবং সম্পাদক কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত অনুদর্শিনী টীকাটিও উপনিষৎ, পুরাণ, ভাগবত, গীতা, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রের তথ্য সমূহের সামঞ্জস্য সহকারে সহজ, সরল প্রাঞ্জল ভাষায় বিষদ ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীমদভাগবতসার শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদ সম্বলিত এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সকলে বিশেষ উপকৃত হইবেন, ইহা নিশ্চিত।

রূপ-লোক

চলচ্চিত্রকে যে সমাজ-গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ ক'রবার একটা অতিবড় প্রয়োজনীয়তা আছে, একথা বহুবার বহু ভাবে আমরা ব'লেছি। কিছু সঙ্গীত, কিছু মনলোভন চিত্র ও সহজভাবের কতকগুলো হৃদয়গ্রাহী কথার সমষ্টি যে কোন একটা বিশেষ স্বাধীন ও শিক্ষিত দেশের পক্ষেও পুরোপুরি উপযোগ, একথা ব'লতে গেলে উপনাসিক ভাবেই ব'লতে হয়। পাকা বুদ্ধির মানুষ আসলে একথা স্বীকার ক'রে নেবে না। আনন্দের সূত্রে জনসাধারণ কিছু একটা খণ্ডকালের জন্য এসে বিশ্রাম নেয় প্রেক্ষাগারে। সেই আনন্দাভিব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে যদি শিক্ষা, আদর্শ এবং জীবন ও দেশের গঠনমূলক কাজের ইঙ্গিত দিতে পারে চলচ্চিত্র, তবেই জাতির পক্ষে তা কল্যাণ। বিশেষ ক'রে আমাদের মতো পরাধীন দেশের পক্ষে এ যে কতবড় প্রয়োজন, তা দেশ ও সমাজসচেতন ব্যক্তিমাত্রেই বুঝবেন। একজন নেতা যেমন তাঁর দলকে গঠন করেন, একজন চিত্র-প্রযোজক বা পরিচালককেও তেমনি গঠন করা উচিত গোটা একটা দেশকে। প্রশ্ন হ'তে পারে যে, তার জন্যে ত' রামমোহন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বড়বড় সামাজিক-কর্ণধার পণ্ডিতগণের কর্ম্ম-সাহিত্য ও বাণীই র'য়ে গেছে! কিন্তু উত্তর হ'চ্ছে—বৃহত্তর সমাজ-কল্যাণের জন্য তাঁদের সেই কর্ম্মসাধনা ও সমাজ-দর্শনের ইঙ্গিত থাকলেও দেশের বৃহত্তর জনসংখ্যা তার মধ্যে নেই। কারণ আজও এদেশের শিক্ষিতের সংখ্যা কার্য্যকরীভাবে একশো ভাগের সাতভাগ পর্য্যন্তও উঠতে পারে নি। তাদের জন্যে সাধারণ লৌকিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সেই শিক্ষা ও গঠনমূলক কাজের প্রচার হওয়া আবশ্যক। আমাদের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ যেমন চিন্তাশীল নেতা দেখতে পাই, চিত্র-জগতে তেমন নেতার একেবারেই অভাব। কিছু কাঁচা পয়সার সদ্ব্যবহারের সুযোগে সৎভাবেই হোক আর অসৎভাবেই হোক কিছু একটা উদগীরণ ক'রতে পেরেই তাঁরা (চিত্র-নেতা) কৃতার্থ ও নিশ্চিন্ত ট্রেড শো'র চেয়ারে থ্রি-ক্যাসলস্ বা সস্তা সিজারের ধোঁয়া ছেড়ে আরামের নিশ্বাস ফেলে তাঁরা ভাবেন—ছবি যা হ'য়েছে, চমৎকার, এক লাখ কেপিটাল নিয়ে নেমে সতের লাখের পাওনা অবধারিত। ধারণাটা ঐ পর্য্যন্তই তাঁদের সীমাবদ্ধ। এ যে দেশ ও জাতির দিক দিয়ে কতবড় দুঃখ, লজ্জা ও অনুশোচনার কথা, তা ব'লবার নয়।

একেই তো জীবনের বহু-বিস্তার এদেশে সম্ভব নয়; অর্থের অভাব, রাজ-দপ্তরের কড়া চাপ—এগুলো তো আছেই, কিন্তু তার উপরেও যখন দেখি, সাধারণ মানুষের তরল বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে আবর্জ্জনার সৃষ্টি হয়, তখন আর দুঃখ ঢাকবার জায়গা থাকে না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র আজও সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ চিত্তবৃত্তির ইপ্সিতানুযায়ী চিত্রগ্রহণে অগ্রসর হয়, বিশেষ চিন্তাধারার দ্বারা জ্ঞানের রুচি অনুযায়ী মানুষের রুচি তৈরী করবার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রতে গিয়ে পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে পিছনে স'রে দাঁড়ায়। এর মূলে ব'লতে হয়, আমাদের দেশের চিত্র-জগতে আজও সমাজ-সচেতন দেশ-দরদী নায়কের আবির্ভাব ঘটে নি—যাদের অকুণ্ঠ ত্যাগ ও মননশীলতা জাতিগঠনের উপযুক্ত কাজে আসতে পারে। দেশকে বড় ক'রে গ'ড়ে তোলা সাহিত্যেরই কাজ, এবং চিত্রের যে কাহিনী, মূলতঃ সেটাও সাহিত্য; অথচ সেই কাজের পরিচয় কোথায়? আজকাল একটা হুতগ্রস্ততার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য ক'রছি। সাধারণ অতি নোংরা কাহিনীর সঙ্গেও অনেক বড় বড় সামাজবোধক ও দেশোদ্দীপক কথার অবতারণা ক'রে প্রযোজক ও পরিচালকগণ ছবি তুলতে উঠে প'ড়ে লেগে গেছেন। মাঝখান থেকে সেটা হ'চ্ছে জোড়াতালি দেওয়া গাঁজা আর আফিমসঞ্জাত একটা কিছু মাদকপর্য্যায়ের ব্যর্থ প্রকরণ। নিজেদের ফাঁকি তাঁদের নিজেদের কাছেই জানা আছে, তাই সাধারণ দর্শকের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ফাঁক-থেকে থোকে বেশ দু'পয়সা (Two Pice !) মুনাফা টেনে নেন; ব্যবসাও বাড়লো, ফ্যান, ফোন, গাড়ী আর বাড়ীও বেশ আরও সম্প্রসারিত হোলো।

কিন্তু এই মনোবৃত্তির দিন অতীত হ'য়েছে। যুগসন্ধিক্ষণ আজ উপস্থিত। আজ সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির নতুন গবেষণার মতো আমাদের দেশের চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলোকেও নতুন গবেষণায় মনোনিবেশ ক'রবার আবশ্যক। দেশে শিক্ষা প্রসারের অতি সহজতম উপায় হ'চ্ছে চলচ্চিত্রের সাহায্য নেওয়া। বিজ্ঞ, সুচিন্তিত ব্যক্তিদের এপথে অগ্রসর হবার আজ অত্যন্ত বেশী প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে। একটা আমূল বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন ভিন্ন এই প্রচলিত গড্ডালিকা-প্রবাহের গতি রুদ্ধ হবার নয়। নইলে দেশে আবর্জ্জনারই শুধু সৃষ্টি হবে, শুধু রাস্তায় রাস্তায় প্রেক্ষাগৃহগুলির চাপে প'ড়ে দেশের নরনারীর জীবনই শুধু বিপন্ন হবে, ঠুনকো সস্তা বেলোয়ারীর আপাত মোহে প'ড়ে দেশের খাঁটি সোনা-মন আর টিকবে না, মেরুদণ্ড শক্ত ক'রে দাঁড়াতে পারবে না সমাজ। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমরা এদিকে দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

সম্পাদকীয়

মণ্ডলী সম্বন্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী

গত ৫ই জানুয়ারী দিল্লীতে যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বৈঠক হইয়া গিয়াছে, তাহার সিদ্ধান্ত অনেক লোককেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। যদিও বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটী পাশ হইয়াছে, তথাপি অনেকে মনে করেন, কংগ্রেস এখন নরমপন্থী দপ্তর প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে, কেহ বলেন লীগের প্রতি তোষণ-নীতি ক্রমেই বাড়িবে, কেহ বলেন, হতভাগ্য আসাম প্রদেশটিকে নিরর্থক বলিদান দেওয়া হইয়াছে। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর দেখিয়া কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাবে দেশের হানিকর কিছুই পাইলাম না। সমস্ত অবস্থা অনুধাবন করিলে দেশবাসীও ধারণা করিতে পারিবেন যে প্রকৃতই চিলে কাণ লইয়া যায় নাই। পাঠকের অবগতির জন্য পূর্ব্বাপর অবস্থা আমরা এখানে বর্ণনা করিতেছি।

কংগ্রেস জুন মাসেই গণপরিষদে যোগদান করিতে ও ১৬ই মের মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী হয়। তবে অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পরে কংগ্রেসের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণকে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হইয়াছিল। প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইবার ৮ দিন পরেই ২৫শে মে তারিখে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স প্রকাশ করিলেন যে, প্রদেশগুলিকে যথাক্রমে ক, খ, গ গ্রুপে (মণ্ডলীতে) যাইতেই হইবে এবং দশবৎসরের পূর্ব্বে কোন প্রদেশ মণ্ডলীর বাহিরে আসিতে পারিবে না। অনেক লেখালেখির পর মন্ত্রিগণই বলেন যে, গ্রুপিংএ যাওয়ার পরে ১৯ ধারানুসার শাসনতন্ত্র রচিত হইবার পরে যে নির্ব্বাচন হইবে তাহার পরে বাহির হইয়া আসিতে (opt out) পারিবে। এই হইল প্রথম দফা।

দশবৎসরের পরে কি প্রথম নির্ব্বাচনের পরই বাহির আসিবে—এই প্রসঙ্গ ছাড়াও মহাত্মাজী প্রথমেই বলিলেন—"কোন প্রদেশ ইচ্ছার বিরুদ্ধে মণ্ডলীতে (Groupএ) যাইবে না।" তিনি ১৫ ধারার যে প্রাদেশিক-স্বাতন্ত্র্য এবং মণ্ডলীতে যাইবার স্বাধীন ইচ্ছার উল্লেখ আছে; তাহার উপর নির্ভর করিয়াই যে ভাষ্য দেন, এপর্য্যন্ত তাহা কেহ খণ্ডাইতে পারে নাই। তবে স্থির হয় যে, এই ক্ষেত্রে ১৫ ধারানুযায়ী প্রাদেশিক স্বাধীনতার ব্যবহার চলিবে কিনা তাহা ফেডারেল কোর্ট ঠিক করিবে। সুতরাং দেখা যায়, কংগ্রেস তখনই ১৯ ধারা মানিয়া লয় এবং ১৫ ধারার স্বাধীনতা ফেডারেল কোর্টের বিচারাধীন রাখে। ফেডারেল কোর্ট (যাহা মন্ত্রিগণেরই অধীন) যদি সিদ্ধান্ত করে যে, ১৫ ধারা এখানে প্রযোজ্য নয়, তবে কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে ১৯ ধারানুসারেই চলিতে হইবে, অর্থাৎ মণ্ডলীতে যাইতে বাধ্য হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে মণ্ডলীতে যাইবার দায় হইতে অব্যাহতির কথা কিছু ছিল না। কিন্তু তথাপি মুসলীম লীগ গণপরিষদে যাইবার প্রস্তাব (Long Term Proposal) অগ্রাহ্য করিবার অজুহাত প্রদান করিল যে "ফেডারেল কোর্টের পক্ষপাতী আমরা নই, এবং একবার ঢুকিলে বাহিরে আসিবার হুমকি যে পণ্ডিত জওহরলাল দিতেছেন, তাহা আমরা স্বীকার করি না।"

এই অবস্থায় মুসলীম লীগ দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা (Long Term প্রস্তাব অর্থাৎ Constitutional Assembly বা গণপরিষদে যাওয়া) গ্রহণ করিল না। কিন্তু কংগ্রেস উহা গ্রহণ করিয়া গণপরিষদ যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হয় তাহা চেষ্টা করিতে লাগিল।

অতঃপরে ৯ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) গণপরিষদের বৈঠকের তারিখ স্থির হইল। ইহার পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী এট্‌লি পণ্ডিত জওহরলালকে ও মিঃ জিন্নাকে ডাকাইয়া শুনাইয়া দিলেন, "মশায়রা—প্রদেশগুলিকে মণ্ডলীতে যাইতেই হইবে। তবে আমাদের ইচ্ছা নয়, কোন প্রদেশের অমতে তাহার ঘাড়ে কোন শাসন-তন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া হয়। মণ্ডলী হইতে বাহিরে আসিতে চাহিলে নূতন শাসনানুযায়ী প্রথম নির্ব্বাচনের পরে আসিবেন। তবে আপনারা যে ফেডারেল কোর্টের কথা বলেন, যাইতে চাহেন শীঘ্র শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেলুন, কিন্তু তাহাদের সিদ্ধান্তে আমরা বাধ্য থাকিব না।"

ইহাই ৬ই ডিসেম্বরের পরিকল্পনা। বিলাতের লোক এবং এদেশেরও অনেকে মনে করেন ইহা গৃহীত হইলে মুসলীম লীগও গণপরিষদে যাইতে পারেন। আর কংগ্রেস যদি ইহা গ্রহণ না করেন, তবে গণপরিষদতরী মাঝখানেই বানচাল হইয়া যাইতে পারে।

এই অবস্থায় কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষেরও বিশেষ চিন্তার কারণ হইল। কথা হইল যে, যে বুদ্ধির খেলায় পার্লেমেন্টের মন্ত্রিগণ জিতিবেন, মুসলীম জিতিবে, আর গণপরিষদ ভাঙ্গিবে ও কংগ্রেস দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে।

গত ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাব সেই বুদ্ধিরই খেলার জয়। যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য গণপরিষদ—দানলব্ধভাবে নয়,—বহু ত্যাগস্বীকারে অর্জ্জন করা হইয়াছে, তাহা কি ব্রিটিশ কূটনীতির জোরে তীরেই বিসর্জ্জিত হইবে? কংগ্রেস তাহা হইতে দেয় নাই। আপনি যাহা বলিতে চান বলুন, কিন্তু আমরা মনে করি এই কূটনীতির লড়াইয়ে কংগ্রেস অসাধারণ ধীশক্তি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে। যদি ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাব গৃহীত না হইত, তবে এখানেই কংগ্রেস বুদ্ধির লড়াইতে আহম্মক বনিয়া যাইত।

এখন প্রশ্ন এই, কংগ্রেস কি তাহার পূর্ব্ব নীতি ও স্বাধীনতার ভাব বিসর্জ্জন দিয়াছে? আমরা বলি মোটেই না। কারণ কংগ্রেস-প্রস্তাবটি এই—

"ভারতের যে সকল বিভিন্ন দল সংশ্লিষ্ট আছেন—যেমন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শী, শিখ—তাহাদের সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা লইয়াই স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচিত হউক, ইহা নিখিলভারত রাষ্ট্রীয়-সমিতির আন্তরিক কামনা। বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রিমিশন স্বকীয় প্রস্তাবের যে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে যে সমস্ত অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সে সকলের কার্য্য পরিচালনা সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই অনুসারে কাজ করিতে নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি নির্দ্দেশ দিতেছেন।"

এই প্রস্তাবটি গ্রহণে কংগ্রেস যেন পুত্তলিকার মত ৬ই ডিসেম্বরের এটলী সাহেবের ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইতেছে, তাহাই বুঝায় এবং এপর্য্যন্ত থাকিলে কংগ্রেসকে আমরা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতাম না। তবে এইটুকু গ্রহণ করায় ইহা স্পষ্ট বুঝায় যে, "আমরা নতি স্বীকার করিয়াও মুসলীম লীগের আসিবার সুবিধা করিয়া দিলাম। আমরা তো ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই গ্রহণ করিলাম। এখন লীগ না আসিলে আমাদের দায়িত্ব নাই।"

মোটকথা ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে এবং লীগকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ কংগ্রেস দিল না। তথাপি আমরা বলিব যে, কেবল এই কথা কয়টি থাকিলে আমরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম না।

কিন্তু ইহার পরে কংগ্রেস যে কয়টি কথা যোগ করিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে তো বটেই, অধিকন্তু কি গণতন্ত্রের দিক দিয়া কি মন্ত্রিগণের নির্দ্দেশ কি সমদর্শিতা কোনদিক দিয়াই কংগ্রেসের কোনরূপ ত্রুটী বা চালবাজী হইয়াছে, কেহ বলিতে পারিবে না। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া বলিতেছি। কংগ্রেসের পরবর্ত্তী নির্দ্দেশ এই—

"ইহা সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দেশের ফলে কোন প্রদেশের উপর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাপাইয়া দেওয়া চলিবে না। যদি কোন ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক কোন নীতি অবলম্বিত হয় তবে কোন প্রদেশ বা উহার অংশবিশেষ তাহার নরনারীর ইচ্ছানুসারে যোগ্যরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে।"

ইহার অর্থ এই যে, মুসলমান বন্ধুগণ তো আমাদের দেশবাসী। তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ যদি সম্ভব হয় তবে এক সঙ্গে থাকিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করাতো সুখের কথা। একসঙ্গে কাজ করিবার জন্যই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট করিয়াছিলেন। আর যদি মুসলমানগণ পাকিস্তানের মতলবে ভোটের জোরে তাহাদের ইচ্ছামত হিন্দু-মুসলমান মিলনের যাহা অন্তরায় এরূপ কাজ করিতে তৎপর হয়, তবে পাঞ্জাবের শিখগণ, বাঙ্গলার হিন্দুগণ বা আসামবাসিগণ ঐ বিভাগ ও মণ্ডলী (সেকসন ও গ্রুপ) হইতে বাহির হইয়া তাহাদের ইচ্ছানুরূপ যোগ্যরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। এই কথাগুলি দেশবাসী যেন খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। ইহাতে কংগ্রেস ১৬ই মের প্রস্তাব এবং ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে মানিলেও, তাহারা এখনও যে ১৫ ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করেন নাই, ইহাই বিশেষ আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়।

মোটকথা, আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ যদি মনে করে ভারতবর্ষ আমাদের দেশ, আমরা ভারতবাসী, ইহার ভাল মন্দের ভার আমাদেরই হাতে, তবে মণ্ডলীবদ্ধ (grouped) হইয়া কাজ করা খুবই ভাল হইবে। আর যদি তাহারা মনে করে, আমরা ভিন্নজাতি, ভারতবর্ষ আমাদের দেশ নয়, পাকিস্তান আমাদের দেশ, তবে এক সঙ্গে কাজ ভয়ানক অসুবিধা ও ঘোর অমঙ্গলজনক বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই অবস্থায় বাহিরে আসিবার সুযোগ কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাবে খুব স্পষ্টভাবে রহিয়াছে। তবে তফাৎ এই, না দেখিয়া শুনিয়া প্রথমেই গ্রুপে যাইব না, কি অবস্থা পরে বুঝিয়া বাহির হইয়া আসিব। আমাদের মনে হয় দেখিয়া শুনিয়া বাহিরে চলিয়া

আসিব, এই ব্যবস্থা থাকাই পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে কারণ ইহার পরে আর কংগ্রেসকে কোনরূপ দোষ দেওয়া যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের প্রস্তাবে সবদিক্ দিয়া লীগের প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাবই প্রকট হইয়াছে এবং গান্ধীজী সত্যই বলিয়াছেন:

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী তাহার দিল্লী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাব মানিয়া লইয়াছে। মুসলীম লীগের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রদর্শনের জন্য কমিটী তাহার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া হস্ত প্রসারণের জন্য শেষ সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।"

এখন মহাত্মাজী যে "আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া" কথাটি বলিয়াছেন, ইহা সকলকে প্রণিধান করিতে অনুরোধ করি। কংগ্রেস যে স্বীয় আদর্শ বর্জ্জন করে নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে, কি কংগ্রেস আদর্শ রক্ষা করিয়া অথচ ৬ই ডিসেম্বরের প্রস্তাব মানিয়া একটি চালবাজী খেলিয়াছে? মোটেই নয়। কারণ মন্ত্রীমিশন এবং প্রধান মন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন "His Mayesty's Government could not contemplate forcing such a constitution upon any unwilling parts of the country."

ইহার অর্থ এই, দেশের কোন অংশবিশেষ যদি অমত করে, তবে উহার প্রতি কোনরূপ শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না। মন্ত্রিমিশন এই কথা স্পষ্টভাবে পণ্ডিত জওহরলালকে ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যায় বলিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আসাম যদি মণ্ডলীতে প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারে যে, লীগপন্থী মুসলমানগণ ভোটের জোরে প্রতিপদে আসামের স্বার্থ হানি করিবে, অথবা বাঙ্গলার হিন্দুগণের এবং পাঞ্জাবের শিখগণের সেই অবস্থা হয়, তবে তাহাদের উপরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুতেই শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। এমতাবস্থায় তাহারা বহির হইয়া আসিলে কংগ্রেসের অনুমোদিত সিদ্ধান্তের বলেই আসিবে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর প্রস্তাবটি খুবই সুচিন্তিত ও ধীশক্তি-প্রসূত, ইহাতে সমদর্শিতা আছে, লীগের প্রতি সহানুভূতি আছে, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য আছে এবং প্রভূত পরিমাণে রাজনৈতিক বুদ্ধির খেলাও আছে। এমতাবস্থায় আমরা দেশবাসীকে সম্পূর্ণভাবে এই প্রস্তাবটি সমর্থন করিতে অনুরোধ করি। ইহার পরেও যদি মুসলীম লীগ গণপরিষদে যোগদান না করে, তবে কংগ্রেস যেন ২০শে তারিখের গণপরিষদের কার্য্যে বিলম্ব না করেন এই বিষয়ে কংগ্রেসকে আমরা অনুরোধ করি। ২০শে তারিখের গণপরিষদের কার্য্য মুলতবী হইলে জনসাধারণের মন যে আরও তিক্ত এবং বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে কংগ্রেসকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

মৌলভী সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমি

আমরা অক্লান্ত কর্ম্মী হিন্দু-মুসলমান মিলনাকাঙ্খী সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমির অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। ১৯২১ হইতে ইনি কংগ্রেসের কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং দেশের কার্য্যে সেই বৎসরেই কারা-বরণ করেন। তিনি উদার রাজনৈতিক এবং কৃষকপ্রজা পার্টির বিশেষ সমর্থক ছিলেন। অনেক লোভ সম্মুখে আসিলেও তিনি মুসলীম লীগে যোগদান করিয়া ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিবার পক্ষপাতী হন নাই। কি কংগ্রেসের কার্য্যে, কি কাউন্সিলে কি কর্পোরেসনে, তাহার কর্ম্মশক্তির বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ইসলাম ধর্ম্মের একজন যোগ্য উপাসক ছিলেন এবং হিন্দু মুসলমানের মিলনেরও তিনি একান্ত অনুরাগী ছিলেন। এই অক্লান্তকর্ম্মী সহৃদয় এবং হিন্দু-মুসলমান-বন্ধু কর্ম্মবীরের অভাবে বাঙ্গলা দেশ যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা শীঘ্র সম্পূরণ হওয়ার সম্ভব নাই। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি ও তৃপ্তি কামনা করি ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি এবং ভরসা করি, বাঙ্গলার অপরাপর যুবকবৃন্দ তাহার স্থান পূর্ণ করিতে তৎপর হইবেন।

(ক) খুচরা চাউলের মূল্য বৃদ্ধি, (খ) বাংলায় ব্রহ্মের চাউল প্রেরণ সম্পর্কে মিঃ উ' স

(ক) ১৯৪৬এর ২৩শে ডিসেম্বর অর্থাৎ ১৫২ নং রেশন সপ্তাহের সুরু হইতে কলিকাতা শিল্পাঞ্চলে চাউলের খুচরা দাম সের প্রতি দুই পয়সা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্দ্ধিতহারে তিন শ্রেণীর চাউলের খুচরা দাম লক্ষ্য করি, যথা:

'এ' গ্রেড্ চাউল— ॥৶১০ (সাড়ে দশ আনা)
'বি' গ্রেড্ চাউল— ।৶১০ (সাড়ে ছয় আনা)
'সি' গ্রেড্ চাউল— ।১০ (সাড়ে চারি আনা)

মাঠ হইতে নতুন ধান কাটার ঋতুতেও চাউলের দাম না কমিয়া ক্রমে পুনরায় বৃদ্ধি পাইল কেন, ইহাই আমাদের প্রশ্ন এবং ইতিপূর্ব্বেও ইহা লইয়া আমরা দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি। বাংলায় বিহারীদের বসত-সংস্থান করিয়া বাংলা গভর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করার উদ্যোগই-কি এই দরবৃদ্ধির কারণ? বাঙালী জনসাধারণ বাংলার লীগ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ইহার প্রকৃত উত্তর দাবী করে।

(খ) সম্প্রতি আমাদের সহযোগী একটি প্রধানতম

দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাছে ব্রহ্মের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ও অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের সদস্য মিঃ উ' ন বলিয়াছেন: 'আমরা ব্রহ্মবাসীরা ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ চাউল পাঠাইতে আশা করিয়াছি এবং আমাদের বিশ্বাস, বাংলা অথবা ভারতবর্ষের কোনো স্থানেই দুর্ভিক্ষ হইবে না।'

(প্রসঙ্গত এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, সরকারী রিপোর্ট হইতেই ইতিমধ্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি, তিন সপ্তাহের অধিক রেশন চালু রাখিবার মত কর্ত্তৃপক্ষের হাতে চাউলের ষ্টক্ নাই)।

মিঃ উ' ন'র আশ্বাসলাভ বাংলা তথা ভারতবর্ষের সৌভাগ্যই বলিতে হইবে। গত দুর্ভিক্ষের সময় আজাদ-হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রহ্ম হইতে বাংলা দেশে চাউল পাঠাইতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অননুমোদন ও অব্যবস্থায় তাহা বাংলায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। প্রথম মহাযুদ্ধেও যখন ভারতে অন্নদুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয়, তখন ব্রহ্মের চাউলই রক্ষা করিয়াছিল ভারতবর্ষকে। এবারে বহু আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও ভারতগভর্ণমেণ্ট, বা বাংলা গভর্ণমেণ্ট পরিমিত চাউল সরবরাহের কিছু একটা সুরাহা ক'রতে পারেন নাই। চাউলের দাম বৃদ্ধি করিয়া এবং অত্যধিক পরিমাণে রেশন কমাইয়াও বাংলা গভর্ণমেণ্ট যে চাউল দিতেছেন, তাহা মনুষ্যখাদ্যের উপযোগী নয়। নোয়াখালীর শ্রীরামপুর হইতে ইহার প্রত্যক্ষদর্শী মহাত্মা গান্ধীও কিছুদিন পূর্ব্বে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। সম্প্রতি মিঃ উ' ন'র আশ্বাসে আমরা অনেকখানি আশ্বস্তবোধই করিতেছি। যথাসম্ভব এই চাউল আসিলেই বাংলার মঙ্গল—যদি না সেই চাউলের উপরে অন্য কোনরূপ চালবাজী সুরু হয়।

সরিষার তৈল সমস্যা

বাংলায় সম্প্রতি সরিষার তৈলের অভাবে যে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে তাহার প্রতি আমরা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রতি দুই-ইউনিট কার্ডে যে আধসের তৈল দিবার ব্যবস্থা ছিল, সম্প্রতি তাহা কমাইয়া গত ৩০শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা রেশন এলাকায় এক পোয়া করা হইয়াছে। এক পোয়া বা আধসের তৈলে যে কাহারও সংসার চলিতে পারে না, এ কথা সম্ভবতঃ গোলদিঘীর ইমারতে বসিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিতে পারেন না। শুধু রন্ধনকার্য্যেই নয়, বাঙালী মাত্রেই সরিষার তৈলকে মাথায় এবং গায়ে মাখিবার জন্যও ব্যবহার করিত। তাহা অনেক পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছে। তাহার বিষময় ফলও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সরিষার তৈলের অভাবে বাজারের লেবেল আঁটা বিভিন্ন তৈল ব্যবহারে মাথার চুল এবং মস্তিষ্কেরও রোগ দেখা দিয়াছে। ইহা যে আলোচনার সম্পূর্ণই গৌণ অংশ, তাহা বলিতে আমরা বাধ্য নহি। খাদ্যহিসাবে ব্যবহারেও ইতিমধ্যে কম বীজাণুর সৃষ্টি হয় নাই। সরিষার তৈলের অভাবে জনসাধারণকে বিবিধ তৈল এবং বাদাম তৈলের আশ্রয় লইতে হইয়াছে, এবং তাহাও ভেজালে ও গাঁদে পূর্ণ। ফলে ইতিমধ্যেই একটি বৃহত্তম সংখ্যাবাচক মানুষকে শোথ, বেরিবেরি, উদরাময় এবং এমন কি ওলাউঠায় পর্য্যন্ত ভুগিতে হইয়াছে। কাহারও কাহারও যে মৃত্যুও না হইয়াছে, এমন নয়। সেই তৈলাভাব আজ আরও বীভৎসরূপে আসিয়া দেখা দিয়াছে। বাজারে ইতিপূর্ব্বে দালদা প্রভৃতি মিলিত, কন্ট্রোলের-বাজারে তাহাও একরকম অদৃশ্য হইয়াছে এবং কচিৎ কোনো ক্ষেত্রে যাহাও বা পাওয়া যায়, তাহাও নিম্নমধ্যবিত্ত বা সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কিনিয়া ব্যবহার করা সম্ভব নয়। গোলদিঘীর কর্ত্তৃপক্ষ বা তাহাদিগকে যাহারা তিনবেলা তৈল দেয় (to oil), তাহাদের পক্ষে সর্ব্বসাধারণের এই চরম অবস্থাটা চিন্তায় আনাই হয়ত বাহুল্য হইবে, কিন্তু বাংলাগভর্ণমেণ্টকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, দেশে এই অচল অবস্থা আর কতকাল চলিবে?

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় অধিকার সম্পর্কে জেনারেল স্মাট্‌সের বিষোদ্গার

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দলন সম্পর্কে দীর্ঘকাল সংগ্রামের ফলে 'ইউ, এন, ও'-তে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত জেনারেল স্মাট্‌সকে পরাভূত করিয়া ভারতীয় অধিকার কায়েম করিতে সক্ষম হইয়া ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামপুরে মহাত্মা গান্ধীকে 'তার' করেন। কিন্তু চিরকালের কূটনীতিজ্ঞ জেনারেল স্মাট্‌স্ তাহাতেও অবদমিত হ'ন নাই। প্রোটোরিয়ায় তাঁহার সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় তিনি পুনরায় বিষোদ্গীরণ করেন। তিনি 'ইউ, এন, ও'র দরবারে এই কথাটাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, ভারতে যেমন দুইটি দল বর্ণস্বতন্ত্র হইয়া পাশাপাশি বাস করিতেছে, অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের সহিত ভারতীয়রাও কতকটা সেইভাবেই থাকিতে পারে। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ অধিকারের কথা প্রশ্নের বাহিরে।

সম্প্রতি জেনারেল স্মাট্‌সের সমালোচনা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী বলেন যে, অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা বর্ণগত সাম্রাজ্যবাদ অনেক বেশী ঘৃণ্য। যতদিন

পৃথিবীতে এই ছুইটির একটিরও অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আচার্য্য কৃপালনী বলেন : 'ফীল্ড মার্শাল স্মাট্‌স্ পরাজয়ের সুতীব্র বেদনায় মুখোস ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সত্যের নগ্নরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। এতদিন বর্ষীয়ান মার্শাল নিজেকে মানুষের অধিকার ও গণতন্ত্রের অনন্যচিত্ত সমর্থক বলিয়া জাহির করিয়াছেন। বস্তুতঃ আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ অশ্বেত অধিবাসীর উপর মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের শোষণ চিরস্থায়ী করার দাবীর তুলনায় ইউরোপের অংশবিশেষের উপর হিট্‌লারের প্রভুত্বস্থাপনের দাবী অনেক নরম। মার্শালের আনুপূর্ব্বিক কার্য্যধারা মানুষের সমানাধিকারের নীতির বিরোধী এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই নীতিই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।' আচার্য্য কৃপালনীর এই যুক্তিপূর্ণ তীক্ষ্ণ শ্লেষ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পৃথিবীর কুত্রাপি পরিপূর্ণ সাম্য বিরাজ না করিলেও তাহাই মানুষের অভীত কাম্য ও তাহাই মঙ্গলের পথ। এই স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধেই মিলনের বাণী লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর প্রথম অভিযান সুরু হইয়াছিল। আজও সে-সমস্যার সমাধান হয় নাই। দুর্ব্বিনীত জেনারেল স্মাট্‌স্ ক্রমেই যে প্রচণ্ড মূর্ত্তি ও উগ্র পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহার শেষ পরিণতির কথা একবার তাঁহাকে ভাবিয়া দেখিতে বলি। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের প্রচেষ্টা ও যুক্তি শেষ পর্যন্ত ইউ, এন্, ও কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত না হইলে বিশ্বের সম্মুখে ইউ, এন্, ও'র একদেশদর্শিতার পরিচয়ই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলও যে খুব সুখকর হইবে, তাহা মনে করিবার কারণ নাই।

নিখিল ভারত ছাত্র-কংগ্রেস অধিবেশন

২৮শে ডিসেম্বর নয়াদিল্লীস্থ গান্ধী ময়দানে নিখিল ভারত ছাত্র-কংগ্রেসের চারিদিনব্যাপী ১০ম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। সৌভ্রাত্রের নিদর্শনস্বরূপ মালয়, ইরাক, ইন্দোচীন, আরব ও চীন হইতে আগত প্রতিনিধিগণও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া প্রসঙ্গতঃ বলেন যে, অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টে সাম্প্রদায়িক বিরুদ্ধবাদিতায় যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ছাত্রবৃন্দ যদি বৈপ্লবিক কার্য্যসূচী গ্রহণপূর্ব্বক স্বাধীনতার সৈনিক হিসাবে মুসলমান জনসাধারণের নিকট যান, তাহা হইলে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, মুসলমান জনসাধারণ তাঁহাদের কথায় সাড়া দিবেন।—স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য ছাত্রদিগকে প্রস্তুত হইবার আহ্বান জানাইয়া তিনি বলেন : 'ইহা ছেলেখেলা হইবে না। তুমুল সংগ্রাম করিতে হইবে। ১৮৫৭ ও ১৯৪২ সালের সংগ্রাম অপেক্ষাও এই সংগ্রাম ঘোরতর হইবে। করিব অথবা মরিব—এই নীতি অনুসরণ করিয়া লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে আত্মদান করিতে হইবে।'

সম্মেলনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অভিভাষণটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। তিনি বলেন : 'আমরা বর্ত্তমানে একটা সংঘর্ষ ও সংগ্রামের মধ্যে কাল কাটাইতেছি। বিদেশীর চোখে ইহা হয়ত খুব স্পষ্ট হইয়া না উঠিতে পারে। একটা দেশ যখন স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার নিকট দুইটি পথ খোলা থাকে ; তাহার একটি হইতেছে হীনভাবে আত্মসমর্পণ করা এবং অপরটি হইতেছে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা। ইহার মধ্যবর্ত্তী কোনো পথ নাই। যে দেশ আত্মসমর্পণ করে, সেই দেশের প্রাণ বলিয়া কিছু থাকে না। সংগ্রামের পথ বহুবিধ হইতে পারে ; কিন্তু মূল কথা হইতেছে এই যে, জনসাধারণকে সদাসর্ব্বদা আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন করিয়া রাখিতে হইবে।—আমরা অবশ্য সুসংবদ্ধ জাতি হিসাবেই কাজ করিব ; তুচ্ছ বিষয়ে কলহ-বিবাদ করিয়া বিচ্ছিন্ন হইব না। ছাত্র-কংগ্রেসের বর্ত্তমান অধিবেশন অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, কারণ আমি জানিতে পারিয়াছি যে, এই সম্মেলন হইতে এমন একটি সম্ভাবনাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হইবে, যাহা নিখিল এশিয়া ছাত্র-সম্মেলনের ভিত্তি স্থাপন করিবে। জগতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিতে যাইতেছে, তাহার মধ্যে একটি হইল—এশিয়ার পুনরুত্থান। এই গণজাগরণের সময় আমরা সর্ব্বপ্রকারের দুঃখকষ্ট ও নির্য্যাতন ভোগ করিতেছি এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। কিন্তু এশিয়ার রাষ্ট্রপুঞ্জ সম্পর্কে আমরা একটি মাত্র মূলবিষয় লক্ষ্য করিতেছি। তাহা হইতেছে—এশিয়ার নবজাগরণের প্রাণবন্ত স্পন্দন। মহাদেশসমূহের মাতৃস্থানীয় অসীম শক্তিশালী এই প্রাচীন মহাদেশ পুনরায় সক্রিয় হইয়াছে।—আমি আশা করি, আমাদের যে সকল বন্ধু বিদেশ হইতে এখানে আসিয়াছেন, আপনারা তাঁহাদের নিকট কেবল এশিয়ার স্বাধীনতার নহে, এশিয়ার একতার বাণীও বহন করিবেন। এশিয়ার সে ঐক্য অন্য কোনো মহাদেশের অথবা রাষ্ট্রের অথবা জাতির বিরুদ্ধে নহে (অবশ্য প্রয়োজন হইলে তাহা আত্মরক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারিবে) সে একতা বন্ধুভাবে শান্তিতে বসবাসের জন্য। এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠাকারী প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত

আধুনিক অগ্রগতির সংশ্লেষণ ও সামঞ্জস্য সাধন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যও সে একতার প্রয়োজন।'

পণ্ডিত নেহেরুর সম্পূর্ণ অভিভাষণটি এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁহার বক্তব্যের প্রধান অংশ-সাম্য ও মৈত্রীর প্রতি আমরাও ছাত্রবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ছাত্র-জীবনের আদর্শ ও ধর্ম্ম ইহারই মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। সাম্য, মৈত্রী, চরিত্রগঠন ও নিয়মানুবর্ত্তিতার শিক্ষাই ছাত্রদের জীবনগঠনের প্রধান সোপান। ইহাতে যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহাদের পক্ষেই সম্ভব বৃহত্তর দেশ ও জাতির মধ্যে মিলনের সূত্র প্রতিষ্ঠা করা। নিখিল এশিয়া ছাত্র-সম্মেলনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন চলিতেছে, তাহার মূলেও সেই জীবনধর্ম্ম এবং সাম্য ও মৈত্রীবোধ থাকিবার আবশ্যক। ভারতবর্ষ নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ণ নয়, সমগ্র বিশ্বকে মিলাইয়া সে অখণ্ড এবং আদর্শপূর্ণ। সমগ্র এশিয়ার মর্ম্মের সঙ্গে ভারতের মর্ম্ম একই তন্ত্রীতে গ্রথিত। পরাধীনতা, মৈত্রী ও শিক্ষার বাধা প্রভৃতিকে জয় করিয়া বিপুল বিক্রমে আজ ছাত্রদিগকে দেশের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পণ্ডিত জওহরলাল ছাত্রদিগকে সেই নির্দ্দেশই দিয়াছেন। এই ক্ষুরধার বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে পারিলে শুধু দেশ ও জাতিরই কল্যাণ নয়; সামগ্রিক কল্যাণ আসিবে ছাত্রসমাজেরও। আমরা ভারতের অখণ্ড ছাত্রসমাজকে সেই সাম্য, মৈত্রী, দৃঢ়চরিত্রতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার পথেই স্বাধীনতার সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে বলি।

চীনের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা

দীর্ঘকাল যাবৎ মহাচীনে কম্যুনিষ্ট ও কুওমিণ্টাং দলের মধ্যে ব্যাপকভাবে সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। জাপ আক্রমণের আশঙ্কায় ১৯৩৭ সালে উভয়দলে সাময়িকভাবে কিছু মিল দেখা গেলেও পুনরায় তাহা আরও প্রবল আকার ধারণ করে। জেনারেল চিয়াংকাইশেক নীতি হিসাবে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যের বিরোধী হইলেও নায়ক হিসাবে সকল দলকে মানাইয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কুওমিণ্টাং দলের বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিয়া চীনের সর্ব্বসাধারণের জন্য সমধিক সংস্কার সাধন করিলেও কম্যুনিষ্টগণকে কিছুতেই শান্ত করা যায় নাই। কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে তুং ও চিয়াং কাইশেকের মধ্যে কোনো প্রকার মিলনেরই সম্ভাবনা দেখা যায় না। দলগত বিদ্বেষ আজ আরও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। পিপিং হইতে প্রচারিত চীনা সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ যে, চীনের কম্যুনিষ্টগণ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে পৃথক নিজেদের একটি গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইয়েনানে অবস্থিত চীনা কম্যুনিষ্ট বাহিনী ইউসিনের উপর আক্রমণ সুরু করিয়াছে। বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা জেনারেল চুলাং দুই রেজিমেণ্ট সৈন্যসহ আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে। কম্যুনিষ্ট নেতা জেনারেল চু এন্ লাই বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের কুওমিণ্টাং দলকে সাহায্য করার স্পষ্ট অভিসন্ধি হইতেছে চীনে গৃহযুদ্ধ অপ্রশমিত রাখিয়া চীনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত করা। ইতিমধ্যেই কম্যুনিষ্টবৃন্দের এই মতবাদ ও আশঙ্কা আরও ব্যাপকভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ এই সব বিপর্য্যয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সম্প্রতি চীনে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ দেখা দিয়াছে। চীনের আদর্শ নেতা ও নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তক ডাঃ সান-ইয়াত্ সেনের নীতিকে অবলম্বন করিয়াই এই সুদীর্ঘকাল জেনারেলিসিমো চিয়াংকাইশেক চীনের শাসন-পরিষদ পরিচালনা করিয়া আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি নানকিং হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, চিয়াং কাইশেক চীনের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া গজদন্ত-নির্ম্মিত তুলিকাদ্বারা এক আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই শাসনতন্ত্র বিগত খৃষ্টপূর্ব্ব দিবসেই গণপরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। নববর্ষভাষণে জেনারেলিসিমো বলেন: 'জাতীয় গভর্ণমেণ্ট বরাবরই চীনে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাসনা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করায় তাঁহাদের এই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইল। গভর্ণমেণ্ট দেশের ঐক্য রক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদের নীতিতে অটুট আছেন।' প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন: 'দরিদ্র লোকেরা প্রত্যহ অনাহারে রাস্তায় মরিলেও রেস্তোঁরা ও নৃত্যের আসরে সাময়িক আনন্দের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় হইতেছে। ইহাতে মানবোচিত সহানুভূতি বোধের অভাব সূচিত হইতেছে এবং জাতির চারিত্রিক দৃঢ়তায় অবনতি ঘটিয়াছে।'

জনসাধারণ চিয়াংকাইশেকের এই ভাষণ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মনোময় অভিব্যক্তি হিসাবেই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল কম্যুনিষ্ট পার্টি গণ-পরিষদ বর্জ্জন করেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত শান্তি-আলোচনা চালাইবার সর্ত্তস্বরূপ পরিষদে গৃহীত শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া দিবার দাবী করিয়াছেন। জেনারেলিসিমো চিয়াং অন্যান্য দলের সদস্যগণকে লইয়া কুওমিণ্টাং গবর্ণমেণ্ট সম্প্রসারিত করিতে প্রস্তুত।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি সংবাদের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষিত

হইতেছে। ইয়েনানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে জেনারেল চু এই অভিযোগ করেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এ পর্য্যন্ত গৃহযুদ্ধ চালাইয়া যাইবার জন্ত চীনা গবর্ণমেণ্টকে ৪০ কোটী ডলার মূল্যের মাল সরবরাহ করিয়াছে। সম্প্রতি সৈন্তসংস্থান ও জাতীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে উভয় দলের সর্ত্ত অনুমোদিত ও অনুসৃত হইলেই চীনা গবর্ণমেণ্ট ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে আপোষ-আলোচনা সুরু হইতে পারে।

প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক চীন মহাদেশ। কোনো পরদেশীয় প্রভাবে এই বিরাট মহাদেশের আদর্শ নষ্ট করা কোনো দলের পক্ষেই কর্ত্তব্য হইবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টি যে আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রাম করিতেছে, চীনা গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক শক্তির সাহায্য গ্রহণের দিক হইতে তাহাকে একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? এ বিষয়ে চিয়াংকাইশেক সুচিন্তার দ্বারা আত্ম-কলহের অবসান করিয়া মহাচীনের সার্ব্বভৌম গণ-তান্ত্রিক শাসনকার্য্যে অগ্রসর হইবেন, ইহাই আশা করি।

সার্ব্বভৌম ভারত সম্পর্কে অধ্যাপক লাস্কি ও মিঃ গ্যাড্‌গিল

সার্ব্বভৌম ভারতীয় শাসনতন্ত্র রচনার প্রতিবন্ধক স্বরূপ মুস্‌লিম লীগ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া অধ্যাপক হ্যারল্ড জে লাস্কি ও গণপরিষদের সদস্য মিঃ এন, ভি, গ্যাড্‌গিল সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে নানা দিক দিয়া তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন: 'সাম্প্রদায়িক দলবিশেষকে সংখ্যাগরিষ্ঠের অগ্রগতিতে বাধা দিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া মিঃ এটলি পূর্ব্বে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পরিহার করিয়াছেন; মিঃ জিন্নাকে তুষ্ট করিবার জন্ত ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতিতে সেই 'সাম্প্রদায়িক 'ভেটো'ই পুনরায় আমদানী করা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট মিঃ জিন্নার ভ্রূকুটির নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছেন। মিঃ জিন্না যদি গণপরিষদে যোগ না দিয়া মিঃ চার্চ্চিল ও তৎসদৃশ ব্যক্তিগণের পরামর্শই আঁকড়াইয়া থাকেন, তবে মিঃ জিন্নাকে 'প্রবঞ্চক'রূপে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া (কারণ ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতির পর তিনি গণপরিষদে যোগদান করিবেন বলিয়া শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন) তাঁহাকে বেমালুম উপেক্ষা করিয়া যাওয়া উচিত।' জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'ও অধ্যাপক লাস্কির এই অভিমত সমর্থন করিয়াছেন বলিয়াই আমরা জানি। এতৎসত্ত্বেও শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের যে দু'মুখী নীতি ভারতীয় রাজনৈতিক আকাশকে কলঙ্কিত ও মসীলিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা পৃথিবীর চোখে আজ যে কতখানি ঘৃণ্য, মিঃ এটলি এখনও সম্ভবতঃ তাহা তলাইয়া দেখিতে যান নাই। একটা সাম্রাজ্যে যখন বহুমুখী ভাঙন আসিয়া দেখা দেয়, তখন এইরূপ বুদ্ধিহীনতা ও যুক্তিহীনতাকে মিলাইয়া ছলনা ও কূটচক্রান্তের প্রকাশ্য অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। মহাভারতের কুরু-রাজত্বেও এই অভিব্যক্তিই আমরা দেখিয়াছিলাম।

দ্বিতীয়তঃ, মিঃ এন, ভি গ্যাড্‌গিলের বিবৃতিটিও বিশেষভাবে এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: 'গণপরিষদ-বিধানাবলীর খসড়া প্রণয়নকারীদের একটা সমাবেশ নয়—ইহার কর্ম্মপদ্ধতি দুই প্রকার। ইহা একদিকে যেমন শাসনতন্ত্রের দিক দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ সাধন করিতেছে, তেমনি অপরদিক দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ ভারতের কাঠামো রচনা করিতেছে। গণপরিষদ যেমন বিধানের পর বিধান রচনা করিয়া যাইবে, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলও তেমনি একটির পর একটি খসিয়া পড়িবে।

গণপরিষদ সাফল্যমণ্ডিত হইবে, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে ইহার সাফল্য ছাড়া আর কোন উপায় নাই।... আমি গৃহযুদ্ধের জন্ত ভীত নহি। কিন্তু মূল নীতি বিসর্জ্জন না দিয়া গৃহযুদ্ধকে এড়াইবার জন্ত আমাদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা উচিত। আমি জানি, মিঃ জিন্না বুঝিয়াছেন, বৃটিশ-সঙ্গীন পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে পারিবে না। কোন রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিবেশীরাই রক্ষা করিতে পারে। অতএব কোনপ্রকার মীমাংসার অভাবে মিঃ জিন্নার পাকিস্তান হয় একটি শক্তিহীন ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসে পরিণত হইবে, কিম্বা ইহা এমন একটি রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, যেখানে বিদ্রোহ-বিপ্লব লাগিয়াই থাকিবে। কংগ্রেসের আদর্শ হইতেছে সমগ্র ভারতের জন্ত একটি কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহার অবিচ্ছেদ্য অংশগুলিকে উন্নতি ও বিকাশের পথে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া।'

অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ অভিব্যক্তিতেই মিঃ গ্যাড্‌গিল তাঁহার বিবৃতি শেষ করিয়াছেন। ইহার পর আর কোন বিশদ আলোচনার আবশ্যক হয় না। অবিচ্ছেদ্য ভারতের পূর্ণ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আশা করি মিঃ জিন্না হৃদয়ের সহজ পথে চলিতেই অগ্রসর হইবেন।

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন

২৮শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে 'কস্তুরবা নগরে' নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিধি সহ প্রায় দশ সহস্র মহিলা সম্মেলনে যোগদান করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাণী সেথু পার্ব্বতী দেবী, ডাঃ মিসেস্ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডী, রাজকুমারী অমৃতকুমারী, শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহেরু, শ্রীযুক্তা রাধাবাঈ সুব্বারায়ণ, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীযুক্তা মৃদুলা সরাভাই প্রভৃতি সম্মেলনের শুভেচ্ছা কামনা করিয়া বাণী পাঠান। বিদায়ী সভানেত্রী শ্রীযুক্তা হংস মেটা, সংলীর রাণী, লেডী রমা রাও, শ্রীযুক্তা অয়্ স্বামীনাথন, মিসেস্ কুলশম সায়ানী প্রভৃতি সভায় উপস্থিত থাকিয়া নারীজাতির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। প্রসঙ্গতঃ লেডী রমা রাও বলেন : 'সম্প্রতি দেশে যে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ দেখা দিয়াছে, তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমরা নারী জাতি এবং শিশুদের উপর অত্যাচার, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিতকরণ এবং বিবাহ ও নরহত্যার কথা শুনিয়াছি। যে প্রচারকার্য্যের ফলে সভ্য-সমাজের জীবনযাত্রা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, আমরা তাহার তীব্র নিন্দা করিতেছি।' তিনি বলেন : 'বিশ্বের প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছে যে, মানুষের উন্নতি-বিধানের জন্য এবং আন্তর্জ্জাতিক ন্যায়, নীতি ও শুভেচ্ছা বজায় রাখিবার জন্য রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহকে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে নারীসমাজের অধিকার যাহাতে স্বীকৃত হয়, তাহার জন্য আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গণপরিষদে উপস্থিত করার জন্য আমরা নারীর অধিকার সম্বন্ধে একটা পরিকল্পনা রচনা করিয়াছি। উহাতে আমরা ভোটাধিকার, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকক্ষেত্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার পাইবার দাবী করিয়াছি।'

পুরুষের সহিত সমান অধিকারের দাবীর কথা ছাড়িয়া দিলেও নারীসমাজের সামনে আজ নানাদিক হইতে যে সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ একটি সম্মেলনের দ্বারা কার্য্যগ্রহণের প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োচিত হইয়াছে। ত্রুটির দিক দিয়া দেখা যাইতেছে, বাংলা হইতে অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ নারী-প্রতিনিধি সম্মেলনে খুব বেশী উপস্থিত হন নাই। অথচ নারী-জীবনের জটিল সমস্যাগুলি আজ বাংলার মাটিতেই বিশেষভাবে এবং বিকৃত রূপে দেখা দিয়াছে। নারীকে আজ আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। শক্তির বিভিন্ন রূপ তাঁহাদের মধ্যে বিরাজমান। সেই শক্তিতে আজ সমগ্র নারীজাতিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দুর্ব্বৃত্তের কঠিন অত্যাচার, সমাজের লাঞ্ছনা সব কিছুই তবে নিঃশেষে তাঁহাদের নিকট হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে। নারী-সমাজে আজ যে প্রগতির ঢেউ আসিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণাংশই যে সুরুচি ও সুবুদ্ধিপ্রসূ, তাহা বলিব না। নারীসমাজের প্রগতি অর্থে বুঝি তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ ও সহনীয় জীবনযাত্রা। সেই জীবন-যাত্রায় ব্যাঘাত জন্মিলেই নারীর অকল্যাণ। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে এইটিই আজ প্রধান সমস্যা তাঁহাদের সামনে। এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে; জ্ঞানে, শিক্ষায়, প্রেমে, আদর্শে মিলাইয়া নারীকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে জীবন-ধর্ম্মে। লেডী রমা রাওয়ের অভিভাষণের মধ্যে এই জীবন-ধর্ম্মের অঙ্কুরই স্পষ্ট ভাবে দেখা দিয়াছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের ৩৪ তম অধিবেশন

বিগত ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্নে নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চতুস্ত্রিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। মূল-সভাপতি নিযুক্ত হন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। বর্ত্তমান অধিবেশনের বিভিন্ন শাখায় যাঁহারা সভাপতিত্ব করেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। গণিত শাস্ত্র—অধ্যাপক ডি, ডি, কোশাম্বি, ডি, এস্, সি, ২। সংখ্যা-শাস্ত্র অধ্যাপক—আর, সি, বসু, এম্-এ, এফ, এন্ আই, ৩। পদার্থ বিজ্ঞান—ডাঃ কেদারেশ্বর ব্যানার্জ্জী, ডি, এস্-সি, এফ, এন্ আই, ৪। রসায়ন শাস্ত্র—ডাঃ পি, কে. বসু, ডি, এস্-সি, এফ, এন্ আই, ৫। ভূতত্ত্ব ও ভূগোল—ডাঃ সি, এস্, পিচামুথু, পি, এইচ্-ডি, এফ. আর. এস্, ই, এফ, জি, এস, এফ, এন্, আই, ৬। উদ্ভিদবিদ্যা—অধ্যাপক এ, সি, যোশী, ডি, এস-সি, এফ, এন্, আই, ৭। প্রাণিবিজ্ঞান—ডাঃ জি, ডি, ভাবেরাও, ডি, এস-সি, পি, এইচ, ডি, ৮। নৃতত্ত্ববিজ্ঞান—ডাঃ (শ্রীমতী) ইরাবতী কার্ভে, এম্-এ, পি, এইচ, ডি, ৯। চিকিৎসা-বিদ্যা ও পশুচিকিৎসা-বিজ্ঞান—ডাঃ গণপতি পাণ্ডা, এম্-বি, ডি, ব্যাক্টো, এফ, এন্, আই, ১০। কৃষি-বিদ্যাবিজ্ঞান—মিঃ এন্. এল্, দত্ত, এম্, এস্,-সি, ১১। জীবতত্ত্ব বিজ্ঞান—অধ্যাপক এস, এ, রহমান, ১২। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও শিক্ষা বিজ্ঞান—মিঃ পি, এস্, নাইডু, এম্, এ, ১৩। পূর্ত্ত ও ধাতুবিদ্যা—মিঃ এইচ, পি, ভৌমিক, বি, এ, সি, এ্যাণ্ড, ই, ই, বি, ই, এম্, আই, ই।

এ বৎসরের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় এই যে, বিদেশ হইতে বিশিষ্ট ১৮ জন বৈজ্ঞানিক আসিয়া এখানে যোগদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন—

যুক্তরাষ্ট্রের—ডাঃ এডমণ্ড নিউটন্ হারভে, ডাঃ

অস্কার রিডল, ডাঃ হারলো সেপ্‌লে, ডাঃ আলবার্ট এফ্‌ ব্লেকস্‌লী, ডাঃ উইলিয়াম এড্‌ওয়ার্ডস্‌ ডেমিং।—

ইংলণ্ডের—স্যার চার্ল্‌স্‌ গল্‌টন ডারউইন, স্যার আর্থার পারসি মরিস্‌ ফ্লোমিং, মিঃ ব্ল্যাকেট্‌ পেট্রিক্‌ মেলিয়ার্ড ষ্টুয়ার্ট, অধ্যাপক হ্যারল্ড্‌ মুনরো ফক্স্‌, স্যার হ্যারল্ড্‌ স্পেন্সার জোন্‌স্‌, অধ্যাপক ফিলিপ ক্রস্‌ হোয়াইট্‌, ডাঃ উইলিয়াম ব্রাউন, অধ্যাপক লুই জোয়েল মারডেল, স্যার ডিয়ার্কি ওয়েন্টওয়ার্থ টমসন,—

ক্যানাডার—ডাঃ রবার্ট উইলিয়াম বয়েল, ডাঃ উইলিয়াম ফিলডিং হ্যানা, ডাঃ টমাস্‌ লেস্‌লি ট্যাব্‌টন, টমাস্‌ রবার্ট রয়াল।

সভাপতির অভিভাষণে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন যে, বিজ্ঞানানুশীলন যে ব্যক্তিবিশেষের সত্যানুসন্ধিৎসা নহে, ইহা অতীব সত্য। সমাজ-সেবার সুমহান ব্রত লইয়া পরিচালিত হইলে ইহার স্থান বহু উর্দ্ধে। তিনি বলেন: 'অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা ইত্যাদি মনুষ্যের জীবন ধারণের অপরিহার্য্য দ্রব্যাদির সংস্থান করাই আজ আমাদের প্রথম ও প্রধান করণীয়। সুতরাং বিজ্ঞানকে আজ ভারতের চল্লিশ-কোটি নরনারীর বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে।···গভর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া বিজ্ঞানকংগ্রেসই স্বেচ্ছায় এই বিরাট দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। একমাত্র জনমতের প্রবল চাপই গভর্ণমেণ্টকে সচেতন করিতে সক্ষম। কাজেই বৈজ্ঞানিকদের নিকট আমার বক্তব্য এই, গভর্ণমেন্ট কি করিবেন, না করিবেন, সেই বিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষ নির্ভরশীল না হওয়াই বিধেয়। গভর্ণমেন্ট-তরফ হইতে সাহায্য পাওয়া তাঁহাদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার। বর্ত্তমান গভর্ণমেন্টের অন্যতম সদস্য হিসাবে এবং খানিকটা সহকর্মীদের তরফ হইতেও আমি জানাইতেছি যে, ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসারের জন্য আমরা বিশেষ আগ্রহশীল এবং এই গবেষণাকার্য্য পরিচালনের জন্য যাবতীয় ক্ষেত্রে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য দান করিব। দেশের সুপ্তপ্রায় বিজ্ঞানী মনীষীদের জাগাইয়া তুলিয়া সমাজসেবায় নিয়োগ করিবার জন্য আমরা বিশেষ সমুৎসুক।'

পণ্ডিত নেহেরুর এই অভিভাষণ নানাদিক দিয়া কার্য্যকরী ও হৃদয়গ্রাহী। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সাম্রাজ্যিক শোষণ ও দৃষ্টিহীনতার ফলেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রাচুর্য্য আজও ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই। অথচ ভারতীয় সম্পদ ও বৈজ্ঞানিকগণের কর্ম্মক্ষমতা বিশ্বে বিরল। পণ্ডিতজীর বাণী অনুযায়ী কার্য্যের দ্বারা আজ তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার সময় উপস্থিত। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণের আজ বিশেষ তৎপর হইবার প্রয়োজন। বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার না করিয়া জনকল্যাণের সেবায় নিয়োগ না করিলে দেশ ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ অসম্ভব।

ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম

সম্প্রতি ইন্দোচীনে ফরাসী ও ভিয়েৎনাম সৈন্যদের মধ্যে সংগ্রাম প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দোচীনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হরণ করিয়া ফরাসী প্রভুত্ব কায়েম করিবার জন্য ফরাসীশক্তি উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিয়া ইন্দোচীনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ইন্দোচীন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভিয়েৎনাম বেতারে অভিযোগ করা হইয়াছে—'ফরাসীগণ ইন্দোচীনে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করিতেছে। মন্দিরের উপর গুলিবর্ষণ করিতেছে এবং বলপ্রয়োগ করিয়া ফরাসী সৈন্যদের যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিতেছে।'

ফরাসী উপনিবেশ-সচিব মঃ মুতেৎ দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন, যুদ্ধের নিষ্পত্তি না হইলে ভিয়েৎনাম জাতীয়তাবাদীদের সহিত আলোচনা চলিতে পারে না। ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট্‌ ডাঃ হো, চি, মিন জেনারেল লেক্‌লার্কের নিকট ফরাসী-গণতন্ত্র ও সৌভ্রাত্রের নামে যে আবেদন জানাইয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাহারও কোনো সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফরাসীদের নির্লজ্জ ও দুর্ব্বিনীত অভিযানে আবার নূতন করিয়া প্রমাণিত হইল যে, সাম্রাজ্যবাদ মরিয়াও মরে না, রক্তবীজের মত সময় এবং সুযোগ পাইলেই বিপুল শক্তিতে মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সমগ্র এশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামেরই একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। সম্প্রতি কংগ্রেস রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হিটলারী শক্তির তুলনা করিয়া ভিয়েৎনামীদের প্রতি ভারতবর্ষের সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুও তরুণদের কাছে অনুরূপ একটি বিবৃতিদ্বারা ভিয়েৎনাম গণতন্ত্রের সাহায্যার্থে একটি সশস্ত্র স্বেচ্ছাবাহিনী প্রেরণ করার প্রস্তাব করিয়াছেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধেও ভারতবর্ষ একসময় সহানুভূতি দেখাইয়াছে; চীনের বিপর্য্যয়ের দিনেও কংগ্রেস-মেডিক্যাল মিশন চীনে গিয়া যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। নৈতিক আদর্শের দিক হইতে শরৎচন্দ্রের এই আবেদনানুযায়ী ভারতীয় তরুণদের আশু কাজ করা প্রয়োজন। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে অবশ্য এশিয়ারই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূত্রপাত সূচিত হইতেছে। আমরা এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি।

"শ্যামলে সবুজে পল্লী আমার ডাকে সারা বাংলারে"

উপরে—'গোচারণ', মধ্যে বামে—'গৃহাঙ্গন'
মধ্যে দক্ষিণে—'বিরক্তি', নীচে—'বাদল সাঁঝে'

ফটো—নিশানাথ মজুমদার
ফটো—কে, বি, ব্যানার্জ্জি

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

চতুর্দ্দশ বর্ষ } ফাল্গুন—১৩৫৩ { ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

বেদে ব্রজলীলা

শ্রীনীরজাকান্ত চৌধুরী দেবশর্ম্মা

তিন

১৩। কেশিবধ (বিষ্ণু। ২৪)।

'ন তা অর্ব্বা রেণুককাটো অশ্নুতে ন সংস্কৃতত্রমুপয়ন্তি তা অভি উরুগায়মভয়ং তস্য তা অনুগাবো মর্ত্তস্য বিচরন্তি যজ্বনঃ।"

(ঋগ্বেদ। ৬।২৮।৪ ; অথর্ব্ব। ৪-২১।৪)

(তাঃ) গা (অর্ব্বা) অশ্বরূপী অসুরঃ রেণু ককটিতি অত্তিশয়েন বর্ষতি তেন বা আবৃণোতি বিশ্বমিতি (রেণুককাটঃ) 'কৃত্রে বর্ষাবরণয়োঃ' ইত্যস্মাৎ মঙ্লুকি যঞ্। (ন অশ্নুতে). ন ব্যাপ্নোতি সংস্কৃতঃ সংস্কারোঃ দাহচ্ছেদৌষধপানাদিস্তেন ত্রায়ত ইতি (সংস্কৃতত্রো) বৈদ্যস্তং প্রত্যপি তাঃ গাবঃ ন (অভ্যুপযন্তি) নির্ব্বাধত্বাৎ যতঃ (তা গাবঃ) (মর্ত্তস্য যজ্বনঃ) নন্দাদেঃ সম্বন্ধিন্যঃ (অভয়মুরুগায়ং) মহাকীর্ত্তিম্ (অনু) লক্ষ্যীকৃত্য (চরন্তি) ইতি মন্ত্রার্থঃ।

অশ্বরূপী ধূলিবর্ষী অসুর সেই গোসকলকে ব্যাপ্ত করিতে পারিল না। বৈদ্য সেই গোসকলকে পান না। তাহারা বাধাহীনভাবে বিচরণ করে, তাহাদিগের রোগ হয় না ? কারণ তাহারা নন্দাদির সম্বন্ধিনী, এবং অভয় মহাকীর্ত্তিকে (কৃষ্ণ) লক্ষ্য করিয়া বিচরণ করে।

১৪। নারদবাক্য-খাণ্ডবদাহ।

'এষ মে কৃষ্ণ সন্দেশঃ শ্রুতিভিঃ খ্যাতিমেষ্যতি।'

(বিষ্ণু। ২৪।৭৩।)

সন্দেশজ্ঞাপকং বাক্যং শ্রুতিভিঃ বেদৈরুক্তমপি ইতঃ প্রভৃতি খ্যাতিমেষ্যতি। শ্রুতয়শ্চ :—

নারদ কেশিবধের পর কৃষ্ণকে বলিলেন, 'আমার এই সন্দেশ-জ্ঞাপক বাক্য বেদোক্ত হইয়া এখন হইতে বিখ্যাত হইবে।' বেদমন্ত্র :—

'অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জ্জুনং চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ বৈশ্বানরো-জায়মানো নরাজাবাতিরজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি' ইত্যাদ্যাঃ।

(ঋগ্বেদ। ৬।৯।১)

(অহঃ) যুদ্ধযজ্ঞঃ (কৃষ্ণম্) অনু একঃ (বিবর্ত্তেতে) বিশেষেণ জায়তে। তথা (অর্জ্জুনম্) অনু অহর্বিবর্ত্ততে একশ্চকারোঽন্বাচয়ে, অপরঃ সমুচ্চয়ে। তেন কৃষ্ণার্জ্জুনাভ্যাং বিভজ্য সমুচ্চিত্য বা ক্রিয়মাণৌ দ্বৌ যুদ্ধযজ্ঞৌ বিবর্ত্তেতে ইত্যর্থঃ। উভে অপ্যহনী (রজসী) রজোগুণকার্য্যে (বেদ্যাভিঃ) স্রক্ষু:যোগ্যাভিঃ শ্রীভি-হেতুভূতাভিঃ লক্ষ্যার্থং যুদ্ধানি জায়ন্ত ইতি। তাভ্যাং চ সহায়াভ্যাং (বৈশ্বানরো) বিশ্বেষাং নৃণাম্ : ইষ্টফলপ্রাপকো ধর্ম্মঃ স্বয়মদৃষ্ট-রূপোঽপি (জায়মানঃ) আবির্ভবন্ ব শব্দ ইবার্থে। (রাজা) জায়মানঃ সন্ (তমাংসি) অধর্ম্মরূপাণি অন্তরায়কারাণি (অবাতি-রৎ) তিরস্কৃতবান্। কেন (অগ্নির্জ্যোতিষা) অগ্নিনা জ্যোতি-ষেত্যর্থঃ। খাণ্ডবদাহে অগ্নিনা যুদ্ধে চক্রগাণ্ডীবে তদ্রূপেণ জ্যোতিষেতি ভাবঃ।

কৃষ্ণের দিকে একটি এবং অর্জ্জুনের দিকে একটি যুদ্ধযজ্ঞ ঘটিতেছিল। উভয় যুদ্ধই রজোগুণমূলক হইলেও লক্ষ্মীলাভের

কারণ হইয়াছিল। তাহাদিগের সাহায্যে বৈশ্বানর (বিশিষ্ট নরগণের ইষ্টফলপ্রাপকধর্ম) অদৃষ্টরূপ হইলেও স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন ও অধর্ম্মরূপে অসুরান্ধকারকে অগ্নির জ্যোতিঃ দ্বারা দূরীভূত করিলেন। খাণ্ডবদাহে অগ্নিদত্ত সুদর্শন-চক্র ও গাণ্ডীব ধনুঃ সেই অগ্নির জ্যোতিঃ।

১৫। অক্রূরাগমন (বিষ্ণু। ২৫)।

'দেবানাং দূতঃ পুরুধঃ প্রসূতো নাগান্নো বোচতু সর্ব্বতাতা।'

(ঋগ্বেদ। ৩।৫৪।১৯)

'সদাসুগঃ—পিতুমানস্তু পন্থাঃ।'

(ঋগ্বেদ। ৩।৫৪।২১)

'উরুক্ষয়ো অশ্যাং সদনং পুরুক্ষোঃ।'

(ঋগ্বেদ। ৩।৫৪।২১)

ইতি বেদে তু অক্রূরস্য মনোরথো বর্ণিতঃ।

(দেবানাং) কংসং হন্তুকামানাং কংসবাগাভিমানিনাগ্যাপী-নামহং (দূতঃ) অস্মি কৃষ্ণং প্রতি গন্তুং প্রস্থিতোঽস্মি (পুরুধঃ) বহুপ্রকারৈঃ (প্রসূতো) নিস্পিষ্টঃ কংসেন (নঃ) অস্মান্ প্রতি (অনাগান্) নিষ্পাপান্ (সর্ব্বতাতা) সর্ব্বস্য বিস্তারকর্ত্তা হরিঃ (বোচতু) বদতু অস্মাভিঃ সহ সম্ভাষণং করোতু।

তথা (পন্থাঃ) অপি (সদাসুগঃ) সুগম্যঃ (পিতুমান্) অন্নবান্ অস্য মার্গেঽপ্যন্তরায়ো মা ভূদিত্যর্থঃ।

(পুরুক্ষোঃ) বহূনাং ক্ষয়ং কর্ত্তুং (সদনং) গৃহম্ (অশ্যাং) ব্যাপ্নুয়াম্ (উরুক্ষয়ো) উৎকটসম্পদঃ।

বেদে অক্রূরের মনোভাব এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে:—

আমি কংসকে বধ করিতে ইচ্ছুক দেবগণের দূত, কৃষ্ণের নিকট যাইতেছি, কংসের দ্বারা বহুপ্রকারে নিপীড়িত নিষ্পাপ আমাদিগের সহিত সকলের বিস্তারকর্ত্তা হরি সম্ভাষণ করুন।

পথও সুগম ও অন্নযুক্ত হউক অর্থাৎ পথে যেন অন্তরায় না হয়। উৎকটসম্পদ্ আমি বহুলোকের ক্ষয় করিবার নিমিত্ত গৃহ ব্যাপ্ত করিব।

১৬। অক্রূরকৃত নাগলোককথন (বিষ্ণু।২৬)

'সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকাশতা দদুঃ যমুনায়ামধিশ্রুত-মুদ্রাধো গব্যং মৃজে নিরাধো অশ্ব্যং মৃজে।'

(ঋগ্বেদ ।৫।৫২।১৭)

মারুতং সূক্তম্ অঘমর্ষণকালে ভগবন্তং দৃষ্ট্বা তদ্দেবতাং মরুতম্ এবং স্তৌতি।

(সপ্ত সপ্ত) একোনপঞ্চাশৎ (শাকিনঃ) শক্নুবন্তি তে ইতি বা শক্নুবন্ত্যৈভিরিতি বা শক্নুনঃ শক্তিমন্তঃ শক্তিপ্রদা বা মরুতঃ (একমেকা) প্রত্যেকং (শতা) শতমৈশ্বর্য্যং ভবতীতি যাস্কঃ। ঐশ্বর্য্যাণি (দদুঃ) যতোঽহং শ্রুতম্ এবাস্য পরমা সম্পদিতি বেদশিরোভ্য আকর্ণিতং (রাধো) ধনং সূক্ষ্মান্তর্য্যামিরূপং (যমুনায়ামধি) মধ্যে (মৃজে) মৃগয়ামি পশ্যামীত্যর্থঃ। তদেব (রাধঃ) (উৎ) ঊর্দ্ধ্বং (গব্যং) গোষু সূর্য্যরশ্মিষু স্থিতং গব্যং (মৃজে) তথা (অশ্ব্যম্) অশ্ববতি রথে স্থিতঃ চ (নিরাধো মৃজে) অধোঽপি ভূলোকে পশ্যামীত্যর্থঃ।

ইহা মারুতসূক্ত—অঘমর্ষণকালে ভগবানকে দেখিয়া অক্রূর মরুদ্দেবতাকে স্তব করিতেছেন।

একোনপঞ্চাশৎ শক্তিমান্ মরুৎগণ এক এক জনকে শত ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন। বেদই ইহাদের পরম সম্পদ্ এইরূপ বেদ হইতে শুনিয়াছি। যমুনার মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্‌কে দেখিতেছি, সেইরূপই ঊর্দ্ধে সূর্য্যরশ্মিতে স্থিত দেখিতেছি। অধঃ ভূলোকে তাহাই অশ্ববাহিত রথে স্থিত দেখিতেছি।

১৭। রজকমাল্যকারকুব্জাসংবাদ (বিষ্ণু।২৭)

'যুবং বস্ত্রাণি পীবসা বসাথে যুবোরচ্ছিদ্রা মন্তবো হ সর্গাঃ।'

(ঋগ্বেদ ।১।১৫২।১)

যুবাং (যুবং পীবসা) বলেন রজকং হত্বেত্যর্থঃ। (বস্ত্রাণি বসাথে যুবোঃ) যুবয়োঃ (মন্তবো) মানয়িতারঃ মালাকারকুব্জা-প্রভৃতয়ঃ (সর্গাঃ) সৃজন্তি মাল্যানুলেপনাদিকং তে সর্গাঃ অচ্ছিদ্রা নীচত্বকুব্জত্বাদিদোষহীনা ভবন্তীতি।

আপনারা উভয়ে রজককে বধ করিয়া বলপূর্ব্বক বস্ত্রসমূহ লইয়াছেন। মালকার কুব্জা প্রভৃতি আপনাদিগকে মান্য দেয় ও মাল্যানুলেপন দেয়। তাহারা নীচত্ব কুব্জত্ব প্রভৃতি দোষহীন হইতেছে।

১৮। কংসচানুর প্রভৃতি বধজন্য আগমন।

'অবাতিরতমনৃতানি বিশ্ব ঋতেন মিত্রাবরুণা সচেথে।'

(ঋগ্বেদ ।১।১৫২।১)

তত্র অযাদবোঽপি কংসো যদূনামাধিপত্যমিচ্ছন্নৃতঃ তেন প্রযুক্তানি মল্লাদীনি (অনৃতানি) (বিশ্ব) সর্ব্বাণি তানি (অবাতিরতং) তিরস্কৃতবন্তৌ (ঋতেন) সত্যেনৈব যাদবত্বেন গোপত্বাচ্ছাদিতত্বা প্রাগপ্রসিদ্ধেন (মিত্রাবরুণৌ) সূর্য্যান্তর্য্যামিনৌ রামকৃষ্ণৌ (সচেথে) সংগচ্ছেথে যুবাম্।

পূর্ব্বে অপ্রসিদ্ধ যাদবস্বরূপ সত্যদ্বারা গোপত্ব আচ্ছাদিত করিয়া অন্তর্য্যামী রামকৃষ্ণ উভয়ে আসিলেন। কংস অযাদব হইয়া (দ্রুমিল পুত্র) যদুদিগের আধিপত্য ইচ্ছা করিয়াছিল। সেও তাহার দ্বারা নিযুক্ত মল্ল প্রভৃতি সকলেই মিথ্যাময়। তাঁহারা দুজনে এই অনৃত পরিভব করিলেন।

বেদ অপৌরুষেয়, কাল অপরিচ্ছিন্ন। বেদমন্ত্র ইতিহাস নহে। যাহা হউক, আধুনিক ঐতিহাসিক মতেও বেদমন্ত্রের আবির্ভাব যখন খৃষ্টের বহুপূর্ব্বে, তখন উল্লিখিত খৃষ্টবিষয়ক মত কোনমতেই দাঁড়াইতে পারে না। যখন বেদে কৃষ্ণের ও ব্রজলীলার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহাও নিশ্চিত যে, ব্রজলীলার কথা প্রবাদ বা কবির কল্পনাবিলাস নহে। তাহা এই জগতে পরব্রহ্মের আবির্ভাবের এক পরম সৌভাগ্যের ইতিহাস।

মহাভারতে ব্রজলীলার উল্লেখ :

এক এক শাস্ত্রগ্রন্থের ও পুরাণের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় বিভিন্ন। অন্য বিষয়ের আভাসমাত্র তাহাতে থাকিতে পারে। এমন কি উল্লেখও না থাকিতে পারে। কিন্তু উল্লেখ না থাকিলেও বিষয়টি যে ভুল বা ছিল না তাহা প্রমাণ হয় না।

ভগবানের বৃন্দাবনলীলার বিশদ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাসপ্রণীত তাহাতে সন্দেহ নাই। কল্যাণ,

ভাগবতাঙ্ক বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতি অন্য গ্রন্থে ব্রজলীলার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থেই শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রে পার্থের সারথ্য প্রভৃতি ঘটনারও উল্লেখ আছে :

মহাভারত বা যে কোনও ইতিহাস-পুরাণ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী এমন কথা কোথাও নাই, যাহাতে মনে হইতে পারে, বৃন্দাবনবিহারী ও কুরুক্ষেত্রের গীতাবক্তা পার্থসারথি এক নহেন।

মহাভারতের মূল আখ্যান কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধ। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার সম্পূর্ণ বিবরণ সেজন্য নাই, তথাপি খিল হরিবংশ—যাহা মহাভারতের পরিশিষ্টস্বরূপ—তাহাতে উহা বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মহাভারতে বৃন্দাবনলীলা নাই একথাও ঠিক নহে।

কিন্তু মূল মহাভারতেও ব্রজলীলার বহু উল্লেখ আছে। নিম্নে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

সুভদ্রাং ত্বরমাণশ্চ রক্তকৌশেয়বাসিনীম্
পার্থঃ প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপালিকাবপুঃ।
(আদি।২২১।১৯

নীলকণ্ঠটীকা : গোপালিকাবপুঃ বল্লবীবেশম্, গোপালঃ কৃষ্ণ তৎসম্বন্ধাৎ। পত্নীমহিষীবেশেন দ্রৌপদ্যাঃ কোপো মা ভূদিতি ভাবঃ

সুভদ্রা গোপীবেশে পাণ্ডবান্তঃপুরে প্রবেশ করেন : কৃষ্ণ গোপবেশ ধরিয়াছিলেন, তাই দ্রৌপদীভয়ে ভীত অর্জ্জুনের এই রহস্য।

সভাপর্ব্বে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব-দেবকীপুত্র, বলরামের কনিষ্ঠ, কংসের ভাগিনেয় ও নিহন্তা, যাদবপতি, জরাসন্ধের আক্রমণে মথুরাত্যাগ করিয়া দ্বারকায় প্রস্থিত।

'কেশবং কেশিহন্তারমপ্রমেয়পরাক্রমম্।'
(সভা। ৩৯।২

সহদেব বলিলেন, 'কেশিনিহন্তা কেশব অমিত পরাক্রমশালী।'

সমাগতানামশ্রৌষং বহূন্ বহুমতান্ সতাম্।
কর্ম্মাণ্যপি চ যান্যস্য জন্মপ্রভৃতি ধীমতঃ॥
(সভা। ৩৮।১৩)

ভীষ্ম কহিলেন, 'ধীমান্ কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কর্ম্ম (পূতনাবধাদি) করিয়াছেন, সমাগত সৎ লোকসমূহের নিকট তাহা এবং বহু গুণের কথা শ্রবণ করিয়াছি।

ইহার উত্তরে শিশুপাল বলিতেছেন,

পূতনাঘাতপূর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যস্য বিশেষতঃ।
ত্বয়া কীর্ত্তয়তাস্মাকং ভূয়ঃ প্রব্যথিতং মনঃ।

*

তমিমং জ্ঞানবৃদ্ধঃ সন গোপং সংস্তোতুমিচ্ছসি।
যদ্যনেন হতা বাল্যে শকুনিশ্চিত্রমত্র কিম্।
তৌ বাশ্ববৃষভৌ ভীষ্ম যৌ ন যুদ্ধবিশারদৌ।
চেতনারহিতং কাষ্ঠং যদ্যনেন নিপাতিতম্।
পাদেন শকটং ভীষ্ম তত্র কিং কৃতমদ্ভুতম্।
বল্মীকমাত্রঃ সপ্তাহং যদ্যনেন ধৃতোঽচলঃ।
তদা গোবর্দ্ধনো ভীষ্ম ন তচ্চিত্রং মতং মম।
ভুক্তমেতেন বহ্বন্নং ক্রীডতা নগমূর্দ্ধনি।
ইতি তে ভীষ্ম শৃণ্বানাঃ পরে বিস্ময়মাগতাঃ।
যস্যচানেন হতঃ কংসঃ ইত্যেতন্ন মহাদ্ভুতম্।

*

গোঘ্নঃ স্ত্রীঘ্নশ্চ সন্ ভীষ্ম ত্বদ্বাক্যাদ্ যদি পূজ্যতে।
(সভা।৪১।৪-১৬)

'হে ভীষ্ম! এই বাসুদেবের পূতনাঘাত প্রভৃতি কর্ম্মসকল কীর্ত্তন করিয়া আমার মনে সমধিক বেদনা প্রদান করিলে। ভাণ্ডারকর এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিলেও উইণ্টারনিজ কৃষ্ণ গোপবংশীয় নিম্নের এই মত পুষ্টির জন্য ইহার উল্লেখ করিয়াছেন মনে হয়। তিনি ইহা প্রক্ষিপ্ত মনে করেন নাই। জ্ঞান বৃদ্ধ হইয়া সেই গোপের স্তুতি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। কৃষ্ণ বাল্যকালে শকুনি এবং যুদ্ধে অনভিজ্ঞ অশ্ব ও বৃষভ বধ করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? চেতনারহিত কাষ্ঠশকট পাদদ্বারা পাতিত করিয়াছিল তাহাই বা কি অদ্ভুত কর্ম্ম? বল্মী-শিশুমাত্র যে গোবর্দ্ধনগিরি সপ্তাহকাল ধারণ করিয়াছিল তাহাও আমার মতে বিচিত্র নয়। পর্ব্বতোপরি ক্রীড়া করিতে করিতে এই কৃষ্ণ বহু অন্ন ভোজন করিয়াছিল তাহা তোমার নিকট শ্রবণ করিয়া অপরে বিস্মিত হইতে পারে, আমি হই নাই। হে ধর্ম্মজ্ঞ, এই কৃষ্ণ যে বলশালী কংসের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাহাকেই সংহার করিয়াছে তাহাই কি মহা অদ্ভুত নয়? * * হে ভীষ্ম, তোমার কথায় কি গো ও স্ত্রীহত্যাকারীকে পূজা করিতে হইবে?'

শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ এই শিশুপালকর্ত্তৃক কৃষ্ণনিন্দাকে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য সহকারে স্তুতিবাদরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলা হয়, কিন্তু হেতু দেখা যায় না।

অন্যত্র বিদুর দুর্য্যোধনকে বলিতেছেন,

অনেন হি হতা বাল্যে পূতনা শকুনিস্তথা।
গোবর্দ্ধনো ধারিতশ্চ গবার্থে ভরতর্ষভ।
অরিষ্টো ধেনুকশ্চৈব চাণূরশ্চ মহাবলঃ।
অশ্বরাজশ্চ নিহতঃ কংসশ্চারিষ্টমাচরন্।
(উদ্যোগ। ১৩১।৪৬-৪৭)

হে ভরতর্ষভ! এই কৃষ্ণ বাল্যকালে পূতনা ও শকুনী বধ করেন। গোগণের রক্ষার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করেন। ইঁহার দ্বারা অরিষ্ট, ধেনুক, অশ্বরাজ (কেশী), মহাবল চাণূর এবং শত্রুতাকারী কংসও নিহত হয়।

ইহাও কি প্রক্ষিপ্ত?

বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদী কৃষ্ণকে আকুল হইয়া স্তব করেন ;

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।

*

হে নাথ! হে রমানাথ! ব্রজনাথার্ত্তিনাশন!
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দ্দন॥ সভা ৬৮।৪১-৪২

হে দ্বারকাবাসী গোবিন্দ! গোপীজনপ্রিয়! হে নাথ! রমানাথ! ব্রজনাথ! আর্ত্তিনাশন! হে জনার্দ্দন, কৌরব-সাগরে নিমজ্জিতা আমাকে উদ্ধার কর।'

এখানে গোপীপ্রেমের ও ব্রজের স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে। আবার বনপর্ব্বে, দুর্ব্বাসাপারণের-সময় বিপন্না দ্রৌপদী—

মনসা চিন্তয়ামাস কৃষ্ণং কংসনিসূদনম্।

*

প্রপন্নপাল গোপাল প্রজাপাল পরাৎপর।

(বন ২৬২।৮—১০)

এখানেও দ্রৌপদী কৃষ্ণকে গোপাল বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে আনুশাসনিক পর্ব্বে কৃষ্ণের স্তুতিতে বলিতেছেন—

'তং গোবার্থে গীর্ভিরিন্দ্রাঃ স্তুবন্তি স চাপীশো ভাবতৈকঃ পশূনাম্।'

অনু ১৫৮।১৮

'হে ভারত। গোবর্দ্ধনোদ্ধরণকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার স্তুতি করিয়াছিলেন। ইনি গবাদি পশুর অধিপতি।'

পরীক্ষিত মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার সময় ভগবান্ স্বয়ং বলেন—

'যথা কংসশ্চ কেশী চ ধর্ম্মেণ নিহতৌ ময়া।
তেন সত্যেন বালোঽয়ং পুনঃ সঞ্জীবতাময়ম্।'

অশ্বমেধ ৬৯।২৩

'আমি কংস ও কেশীকে ধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়াছি। সেই সত্যবলে এই শিশু পুনর্জ্জীবন লাভ করুক।'

উপরে উল্লিখিত সভা ৩৯।২ শ্লোক দ্রষ্টব্য। শ্রীকৃষ্ণ কেশিদৈত্য বধ করিয়া 'কেশব' বলিয়া বিখ্যাত হন। হরিবংশে নারদ তাঁহাকে বলেন,

'যস্মাত্ত্বয়া হতঃ কেশী তস্মান্মচ্ছাসনং শৃণু
কেশবো নাম নাম্না ত্বং খ্যাতো লোকে ভবিষ্যসি।'

হরি। বিষ্ণু ২৪।২৫

মহাভারতে ও গীতায় শ্রীভগবান্ অসংখ্য স্থানে কেশব বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন। কেশিবধ ব্রজলীলার ঘটনা। এইরূপ তাঁহার বহুব্যবহৃত দামোদর নামও ব্রজের।

উপরে যে সকল ব্রজলীলার সমর্থক শ্লোক মহাভারত হইতে উদ্ধৃত হইল সেগুলি সবগুলির বা কোনটিও যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা মনে করিবার সঙ্গত হেতু দেখা যায় না।

কিন্তু যে বিদ্বান্গণ গীতাবক্তা পার্থসারথি বাসুদেব কৃষ্ণ ও ব্রজের গোপাল কৃষ্ণ বিভিন্ন এই মতটির আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় গীতাও ভাল করিয়া আলোচনা করেন নাই। করিলে তাঁহারা এই নিরর্থক বিবাদটি উঠাইতেই পারিতেন না।

শ্রীঅর্জ্জুন মোক্ষযোগে প্রশ্ন করিয়াছেন,

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ। পৃথক্ কেশিনিষূদন।

(গীতা ১৮।১)

গীতার মধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণকে পত্রিকার 'মহাবাহো' (কেশিকে তিনি তাহার মুখের ভিতর বাম বাহু দিয়া তাহা ক্রমশঃ স্ফীত করিয়া বধ করেন—শ্রীধরী টীকা দ্রষ্টব্য) ও 'কেশিনিষূদন' (শুধু কেশব নয়) বলিয়া যখন সম্বোধন করা হইয়াছে, তখন কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের কৃষ্ণ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি এই কল্পনার কি সার্থকতা থাকিতে পারে?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিচিত্র। তিনি যখন বাল্যে জন্ম হইতেই পূতনাবধ ও পরে কালিয়মর্দ্দন, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, পৌগণ্ডের আরম্ভেই কুবলয়াপীড়, চাণূর, কংস বধ প্রভৃতিতে অলোকসামান্য সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তখন তাঁহার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতাপ্রবক্তা পার্থসারথি হইতে যে কি বাধা থাকিতে পারে তাহা বুঝা যায় না। মহাপুরুষদিগের জীবনই ঠিক গতানুগতিক ভাবে হয় না, অবতারদের কথা দূরস্থমের।

কৃষ্ণলীলার বিষয়ে আধুনিক বিদ্বান্গণের এই সকল মত কপোলকল্পিত ও তাঁহার ভগবত্তার বিষয়ে অশ্রদ্ধা আনিবার অপকৌশল মাত্র। উপরের আলোচনা হইতে সেগুলি যে বৃথা, ব্যর্থ ও অমূলক তাহা প্রমাণ হয়।

শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবেদন এই যে তিনি এই ধর্ম্মের গ্লানির সময়ে আমাদিগের বুদ্ধি ও ধীশক্তিকে সৎপথে প্রেরণ করুন এবং ভূভার লাঘব জন্য আবার আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিককে রক্ষা করুন।

'কৃষ্ণাতীরে কোকিলা-কেলিকীরে
গুঞ্জাপুঞ্জে দেবপুষ্পাদিকুঞ্জে।
কম্বুগ্রীবৌ ক্ষিপ্তবাহূ চলন্তৌ
রাধাকৃষ্ণৌ মঙ্গলং মে ভবেতাম্।'

(গর্গসংহিতা। বৃন্দাবন ১।১)

কোকিল ও শুককুলের লীলানিকেতন পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জাতরুযুক্ত যমুনার মন্দারাদি দেবকুসুমকুঞ্জে বাহুহেলনে বিহারকারী কম্বুকণ্ঠ রাধাকৃষ্ণ আমাদের মঙ্গলস্বরূপ হউন।

সমাপ্ত।

তরঙ্গ

শ্রীবিজয়কুমার বসু

গ্রাম ছেড়ে সবাই চলে গিয়েছিল। সহরের ধোঁয়া আর ধুলো, ব্যস্ততা আর প্রতিযোগিতার মধ্যে কি আশ্বাসের ইঙ্গিত পেয়েছিল, তা ওরাই জানে—সরে পড়েছিল সবাই একে একে। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবন কাউকে ধরে রাখতে পারে নি, বাস্তু-দেবতার মোহও নয়। র'য়ে গেল শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন—হরিশ মুখুজ্যে, হারু মিস্তিরি, তুলসী ঘোষ, এমনই আরো দু'একজন। গ্রামের প্রতি অন্ধ মমত্ববোধ নয়, ক্ষীণতম কোন সম্ভাবনা তাদের বিবর্ণ চোখে প্রতিফলিত হয় নি বলেই গ্রাম ছেড়ে না গিয়ে বিপিন হালদারের দোকানের পুরোনো আড্ডাটাকেই তারা আঁকড়ে পড়ে রইল।

বিপিন হালদারের দোকানটা অনেক দিনের—আড্ডাটাও। আড্ডাটা আরো সরস, আকর্ষণটা আরো তীব্র হয়ে উঠেছে বিপিনের তামাকের জন্যে। সদর থেকে নিয়মিত তামাক আনায় বিপিন। আড্ডার সকলেই তামাকের সুখ্যাতি করে। বিপিনের গোপন গর্ব্ব এটা।

আড্ডাটা এখনও বসে, তবে তেমন জমে না। গ্রাম প্রায় খালি হ'য়ে গেছে; দিনটা যদিই বা কেটে যায় সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় চারিদিক থমথম করতে থাকে।

একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে হারু মিস্তিরি বলে, গাঁটা যে একেবারে শ্মশান হ'য়ে গেল! কথাটা হারু মিস্তিরি প্রায় রোজই একবার করে বলে।

তামাক প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, প্রাণপণে টানতে থাকে মুখুজ্যে। একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সেই সাদা ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখুজ্যে কতক্ষণ পরে বলে, হ্যাঃ মাথা খারাপ হয়েছে সকলের। সহরের পথে-ঘাটে যেন পয়সা পড়ে আছে, কুড়িয়ে নিলেই হ'ল আর কি। আরে, সহরে গেলেই যদি বড়লোক হওয়া যেত, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল-না।

বিপিন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার আস্তে আস্তে বললে, তা হ'লে মুখুজ্যে, তোমার ছেলেকে জোর ক'রে সহরে পাঠালে কেন? সবে বিয়ে দিয়েছিলে, গাঁ ছেড়ে যাবার ইচ্ছে ত' ওর মোটেই ছিল না।

ছিল না আবার! আজকালকার ছেলেদের তুমি জান না, হালদার! এতটুকু ব'লে একটু সমর্থনের আশায় বাকী সকলের মুখের দিকে তাকায় মুখুজ্যে। কিন্তু সকলেই তখন পায়ের নখ খুঁটতে ব্যস্ত। শুধু মুখুজ্যের নয়, প্রায় সকলেরই একটু না একটু দৌর্ব্বল্য আছে এখানে। বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না পেয়েও মুখুজ্যে দমল না। তা ছাড়া মুখুজ্যে জানে যে চুপ ক'রে যাওয়ার অর্থই এই অবাঞ্ছিত সত্যি কথাটার স্বীকৃতি। প্রায় খেঁকিয়ে উঠল মুখুজ্যে, তুমি বললেই অমনি ইচ্ছে ছিল না। আর তোমার একটা ছেলে থাকলে তাকে পাঠাতে কি না দেখা যেত।

আকস্মিক এই আঘাতে বিমূঢ় হয়ে মুখুজ্যের মুখের দিকে চেয়ে রইল বিপিন। একটা গোপন গভীর ক্ষত মাড়িয়ে থেঁৎলে দিল মুখুজ্যে। বিপিনের ঠোঁট দু'টো থরথর করে একবার কেঁপে উঠল, হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরাগলায় বললে, হুঁকোটা দাও মুখুজ্যে, আর এক ছিলিম সেজে ফেলি!

হুঁকোটা নিয়ে দোকানের পিছন দিকে চলে গেল বিপিন। বার্লির টিন থেকে খানিকটা তামাক বার করতে করতে তার মনে হ'ল মুখুজ্যেকে কথাটা বলা তার উচিত হয়নি। কে জানত এমন নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নেবে মুখুজ্যে। রমার আর ছেলে-পুলে হবে না, বিপিন তা' জানে। কিন্তু সে-ক্ষোভ একান্তই তার নিজস্ব। টিকেয় ফুঁ দিতে থাকে বিপিন। আশা যখন নেই-ই তখন আর ভেবে কি হবে। তবু হুঁকোটার জল সে রুখতে পারে না—খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়া হুঁকোটার নোনা জলের স্বাদ পেয়ে ধরা টিকেটা অস্পষ্ট একটু শব্দ ক'রে উঠে।

তামাক সেজে বিপিন আবার সকলের মধ্যে এসে বসল। কিন্তু আড্ডাটা সেদিন আর তেমন জমল না।

অকস্মাৎ যেন একদিন জোয়ার এল—হুড়মুড় করে সবাই আবার ফিরে এল গ্রামে। সম্প্রতি যারা গিয়েছিল তারা নয়—ম্যালেরিয়া আর পানাভরা পুকুরের উপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে, সহরের পীচ-বাঁধানো রাস্তা আর গায়ে গায়ে লাগা বাড়ীগুলোর মধ্যে জীবনের সন্ধান পেয়ে যারা বহুপূর্ব্বেই গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল, এল তারাই। আবার ভরে উঠল গ্রাম—মানুষের নিজের রচা মারণাস্ত্র হ'তে নিরাপত্তার জন্যে আবার সকলকে ফিরে আসতে হ'ল অবহেলিত গ্রামে। বোসেদের নিঝুম চণ্ডীমণ্ডপ আবার কলরবে মুখরিত হ'য়ে উঠল, নিমাই দত্তের প'ড়ো ভিটে থেকে রোজ সন্ধ্যায় শাঁখের শব্দ সমস্ত গ্রামটাকে সচকিত করে তুলল। কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন!

বিপিনের দোকানে দু'দিনের তামাক আজকাল একদিনেই খরচ হ'য়ে যায়; নতুন নতুন বিষয়-বস্তু পেয়েছে ওরা, সময় যেন হুহু করে কেটে যায় ওদের। সুরু করে' যুদ্ধ আর বোমা দিয়ে, শেষ করে' বোমাপালানীদের নিয়ে। বোমা পড়ে কোলকাতায় আর পদার্থ বলে কিছু নেই—সহরেদের জন্ত বাজারে মাছ পড়তে পায় না বলে জেলেদের আজকাল গুমোর বেড়েছে—এমনই কত কথা, কত মন্তব্য। বিপিনের কিন্তু এ সব কথা ভাল লাগে না। বোমাপড়া বিধ্বস্ত কোলকাতার বীভৎসতা কল্পনা করতেই তার মনটা শিরশির করে ওঠে। এই সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওখানে থাকলে হয়ত' বাড়ীচাপা পড়েই মরত, সুন্দর সুন্দর মুখগুলো পিষে রক্তাক্ত হ'য়ে চেনবারই উপায় থাকত না—না, বিপিন আর ভাবতে পারে না। তার চেয়ে এই ভাল, হুড়োহুড়ি আর দৌরাত্ম্যে বেশ জমজমে হ'য়ে উঠেছে গ্রাম। আর মুখুজ্যে আগেই বা কি এমন রুইকাৎলা খেত বাজার থেকে কিনে, এটা মুখুজ্যের হিংসা বই আর কিছু ভাবতে পারে না বিপিন। মজা

প্রাণ আবার পেয়েছে প্রাণস্পন্দন, প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে দিচ্ছে বিপিন যেন তাই অনুভব করছে।

একঝাঁক ছোট ছেলের সঙ্গে সতেরো আঠারো বছরের একটি মেয়ে চলে গেল দোকানের সামনে দিয়ে রায়বাড়ীর দিকে। কুণ্ঠা নেই এতটুকু, সপ্রতিভ ভঙ্গী। মুখ তুলে সবাই চেয়ে দেখল তাকে। ছিপছিপে গড়ন, বেশ সুশ্রীই বলা যেতে পারে। খালি পা দুটো রুক্ষ কর্কশ হ'য়ে উঠেছে গ্রামের ধূলি-ধূসর পথের সংস্পর্শে এসে, গৈরিক রঙের শাড়ীটার লাল পাড়টাও কেমন যেন মেটে হ'য়ে এসেছে। কপালে, চিবুকে, গলায় জলে জলে চিকচিকিয়ে উঠছে ঘামের ফোঁটা। শিশুবাহিনীর সঙ্গে এগিয়ে চলল মেয়েটি।

দোকানটা ছাড়াতে না ছাড়াতেই চাপা গলায় গর্জে উঠল মুখুজ্যে: দেখলে হে মিত্তির, সহরে বিবিদের রকম-সকমটা একবার দেখলে! বাপ-জ্যাঠার বয়সী এতগুলো লোক আমরা বসে, একটু সমীহ পর্য্যন্ত নেই—চোখে চোখ রেখে, গটগট করে চলে গেল।

বিজ্ঞের মত হাসে মিত্তির, বলে সহরে কি আর আক্রর বালাই আছে দাদা। কিন্তু তাই বলে আমাদের গাঁয়ের বুকে এ রকমটি হ'তে দোব না। মেয়েটি বোধ হয় হরিদাসের, নয়? আচ্ছাঃ, আসুক একবার হরিদাস। ও সব মিলিটারী কন্ট্রাক্টরের দেমাক এখানে চলবে না, বুঝলে মিত্তির। গাঁয়ে থাকতে গেলে আচার-ব্যবহারটা একটু বুঝে শুনেই করতে হবে—তা' সে তুমি যেই হও না কেন। রাগের মাথায় হুঁকোতে ঘন ঘন টান দিতে থাকে মুখুজ্যে।

সইতে না পেরে বিপিন প্রতিবাদ করে, বয়স যত হচ্ছে, ততই তুমি যেন কেমন ধারা হ'য়ে যাচ্ছ মুখুজ্যে! গাঁয়ের মেয়ে এসেছে গাঁয়ে—এখানেও কি সাতহাত ঘোমটা টেনে চলবে নাকি! আহা, ওরা সব আসবার পর থেকে গাঁয়ের ভোল যেন পাল্টে গেছে—ওদের হাসি আর গানের সাড়ায় সারা গাঁ জেগে উঠেছে।

থাম বিপিন, আর ব'কো না তুমি। ধমক দিয়ে বলে মুখুজ্যে। এ সব হচ্ছে পয়সার গরম—আমি আর বুঝিনে। আজই ত' শনিবার, আজই হরিদাস বাড়ী আসবে—দোব এমন আচ্ছা করে শুনিয়ে যে, ধিঙ্গী মেয়ের বাড়ী থেকে বেরোন বন্ধ হ'য়ে যাবে।

মুখুজ্যের এই অহেতুক উষ্মা অত্যন্ত অন্যায় এবং হীন মনে হয় বিপিনের। তবু সে চুপ করে থাকে, প্রতিবাদ করলেই হয়ত মুখুজ্যে আবার তা'র সন্তানহীনতায় খোঁটা দিয়ে কিছু বলে বসবে। বিপিনের পক্ষে সেটা বড় মর্মান্তিক।

দুপুর হ'য়ে এল,—হারু মিত্তির, মুখুজ্যে আর তুলসী ঘোষ বাড়ীমুখো রওনা হ'লেন। খেতে যাবার জন্যে বিপিনও দোকান বন্ধ করবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় বাঁকের মুখে সেই শিশু-বাহিনীর আবির্ভাব। আর একটু অপেক্ষা করাই স্থির করল বিপিন—আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ওরা। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম—দল থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হ'য়ে মেয়েটি দোকানের কাছে ঘেঁসে এল। মুখুজ্যের মন্তব্যের জবাব দিতে এসেছে নাকি। আনন্দে, ভয়ে, উত্তেজনায় বিপিনের বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল।

বুভুক্ষু কামনার নৈরাশ্য নিয়ে বোবা সজল চোখে সে মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু। রাঙা স্বেদসিক্ত মুখের উপর দু'একটা চুল এসে আটকা পড়েছে; টানা টানা চোখ দু'টাতে কিন্তু ক্লান্তি নেই, আছে আশা, গভীরতা, রহস্য। বিপিনের চোখে জল আসবার উপক্রম হ'ল।

বড় চোখ আরো বড় করে মেয়েটি সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সারা দোকানটা দেখছে—জালা, গামলা, বার্লির টিনে বিপিনের লেখা অস্পষ্ট লেবেলগুলো। শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি, কাসুন্দী নেই তোমার দোকানে? খুব টক্ কাসুন্দী?

কাসুন্দী? কাসুন্দীও কি লোকে কিনে খায় নাকি? বিপিনের বিস্ময়ের অবধি নেই—মেয়েটি কি ঠাট্টা করছে? বিস্ময়ের ঘোর খানখান করে দিয়ে বেজে উঠল মেয়েটির কণ্ঠ,—নেই? কিন্তু আমাদের যে বড্ড দরকার ছিল কাসুন্দীর। উপরের দাঁতগুলো দিয়ে নীচের ঠোঁটটা একটু কামড়ে ধরে মেয়েটি বলল। সেই সুসম্বদ্ধ দাঁতের হাসি দেখবার বাসনা বিপিনের মনে উদ্দাম হয়ে উঠল।

খুবই যদি দরকার হয়, উদ্গ্রীব হয়ে একনিঃশ্বাসে বিপিন বলে গেল, তাহলে' কাল আমি সদর থেকে আনিয়ে দোব। আর যদি দুদিন সবুর করলে হয়, তা' হলে না হয় আমার বাড়ীতে তৈরী করে'—

শেষটুকু শোনবার আগেই মেয়েটি যেন হেসে উঠল—মুখের সে হাসির আভাস সঞ্চারিত হ'য়ে উঠল তার চোখের তারায়। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বিপিনকে থামিয়ে দিয়ে বললে, সদর থেকে তুমি কালই আনিয়ে দিও বাপু। তারপর গলাটা একটু নীচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলে উঠল, মানে আমার বৌদির আবার ছেলে হ'বে—টক্ ছাড়া মুখে আর কিছু রোচে না। অথচ বৌদির আবার ভারী লজ্জা, লোকের বাড়ী থেকে কাসুন্দী চাইতে দেবে না। দেখো, তুমি যেন কাউকে ব'লো না।

এই উষ্ণ অন্তরঙ্গতায় বিপিন বিহ্বল হয়ে ওঠে। মনের গোপন গভীরতম ক্ষতের উপর সূক্ষ্ম এই প্রলেপটুকু সকল পুরাতন বেদনা ও ক্ষোভ মুছে দেয় বিপিনের মন থেকে।

বিপিন লোভ সামলাতে পারে না, জিজ্ঞাসা করে কোথায় গিয়েছিলে এত বেলায়?

সুব্রতদার কাছে। কান নাকের ডগা লাল হয়ে ওঠে মেয়েটির; চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বলে, এই রায়দের বাড়ী।

প্রথম প্রেমের আনন্দ ও লজ্জানত রক্তাভ মুখের দিকে বিপিন চেয়ে থাকে। নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই কয়েকটা মুহূর্ত্ত কেটে গেল, লজ্জাটাকে যেন জোর করে ঝেড়ে ফেলে মেয়েটি হঠাৎ এক সময়ে বললে, আচ্ছা, তোমার দোকানে চকোলেট নেই?

না। নিরাশ করবার অনিচ্ছায় বেশ খানিকটা সময় লাগল বিপিনের এই ছোট্ট কথাটা উচ্চারণ করতে। তবু সে ভাসমান তৃণকে অবলম্বন করে পুনরায় বাঁচতে চাইল। কিন্তু মুড়কী আছে আমার কাছে, খুব ভাল মুড়কী— খেলে আর জীবনে ভুলতে পারবে না। জান তুমি, এ গাঁয়ের অনেক বাড়ীর জামাই পর্য্যন্ত বিপিন হালদারের মুড়কী পুটলী বেঁধে নিয়ে গেছে ঘরে।

সত্যি ? কৌতুকে নেচে উঠল চোখ।

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—নিয়ে যাও আঁচল ভরে। তোমার সুব্রত দাকেও খাইও।

বাঃ! তুমি ভারী অসভ্য! মুখ ফিরিয়ে তিরস্কারে বিপিনকে বিদ্ধ করল মেয়েটি।

সমস্ত উৎসাহ নিভে গেল বিপিনের। মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাবতে লাগল কি এমন কথা সে বলেছে যে মেয়েটির এত অভিমান। ভেবে কূল পায় না বিপিন। শেষ পর্য্যন্ত একটা সূত্র বিপিন আবিষ্কার করল, নিজেকেই তার চড়াতে ইচ্ছা হ'ল। সত্যিই ত কন্যাস্থানীয়ার সঙ্গে এরকম আলগা রসিকতা সত্যিই বড় অন্যায়। কিন্তু হাতের ঢিল আর ফেরানো যায় না, অনেক কিছু হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় বিপিনের মুখ শুক্‌নো হয়ে উঠল।

ওপাশে মুখ ফিরিয়ে রেখেই মেয়েটি এক সময়ে গৈরিক আঁচলটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা দাও দেখি চার পয়সার, দেখি, কেমন তোমার মুড়কী।

মুখে হাসি ফুটিয়ে বিপিন কুনকে ভরে মুড়কী ঢালতে লাগল, এক, দুই—ছয়, ছয়, সাত—ডালাটা খালি করে দিতে পারলে তবে সন্তুষ্ট হয় বিপিন।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়েছে ততক্ষণ, কৌতুকে আর বিস্ময়ে চোখ নাচিয়ে বললে, বাবাঃ, চার পয়সায় এত! ভারী সস্তা তোমাদের গ্রামে। হাঁগো, ধারে কাটাও না ভারে! দেখি একমুঠো খেয়ে। মুঠো ভরে মুড়কী মুখে ফেলল, খানিকক্ষণ চিবোবার পর চোখের পাতা দু'বার নাচিয়ে বললে, নাঃ, সত্যিই ভাল। ভারী সুন্দর তার ত!

গর্ব্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিপিন। মেয়েটি আবার বললে, কিন্তু পয়সা ত' আনিনি সঙ্গে।

তাতে কি হয়েছে, উদারতা দিয়ে বিপিন মেয়েটিকে আরো কাছে টানতে চায়। তারি ত এ ক'টা মুড়কী, কতই বা দাম!

না, না, তা কেন ? আর একমুঠো মুড়কী চিবোতে সুরু করে মেয়েটি বলে ব্যবসা যখন করছ পুরো দাম নেবে বৈকি!

আচ্ছা আচ্ছা পরেই না হয় দিও।

মেয়েটিকে খেতে দেখে নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শিশু-বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব। এগিয়ে আসতে আসতে নাকী সুরে তারাও খাবার দাবী জনাতে লাগল। চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠল মেয়েটি, খবরদার বলছি কাঁদবি না—মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব তা' হলে।

আহা হা, বকছ কেন ওদের! বিপিন শশব্যস্তে বলে। এস এস গো তোমরা এখানে।

একটু একটু করে ভেঙে সবার হাতে দিতে দিতেই বড় এক-খানা পাটালির আধখানা শেষ হয়ে গেল। তা যাক গে, এদের হাতে দেওয়াই কি কম আনন্দ বিপিনের।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে, আর পাটালির দাম কত ?

পাটালির আবার দাম কি। বিপিন গদগদ হয়ে বলে ওদের যে দিলুম, এই আমার আনন্দ।

ঐ ছোট ছোট শিশুর দল, মেয়েটির নিবিড় হয়ে আসা সান্নিধ্যের পরিবেশ, এর বিনিময়ে বিপিন বোধ করি সর্ব্বস্ব দিতে পারে। ওরা যে বিপিনের দোকানের সকল হিসেব-নিকেসের বাইরে।

মেয়েটি চলে যাবার পর ঝাঁপ বন্ধ করে বিপিন বাইরে এসে দাঁড়াল। একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে তার, মেয়েটির নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি। যাক, পরের বার জেনে নিলেই হবে।

দিবানিদ্রা সেরে বেলা প্রায় সাড়ে চারটায় মুখুজ্যে, হারু মিত্তির আর তুলসী ঘোষ বিপিনের দোকানের সামনে এসে দেখলে ঝাঁপ বন্ধ। অবাক্ হ'বারই কথা। আজ মোটে শনিবার, এই গেল বুধবার বিপিন হাটে গিয়েছিল। নিজের খরচায় তামাক খাবার মনঃক্ষুণ্ণতায় তিনজনে বাড়ীর পথ ধরল। বিপিন তখন সদরে একটা মণিহারী দোকানের মধ্যে বসে বলছে, চকলেট আছে তোমার কাছে ? বেশ ভাল হওয়া চাই, ইয়া বড় বড় হওয়া চাই। থাকে ত' দাও শীগগির, সাঁচটার ট্রেণটায় ফিরতে হবে আমাকে। পার্শ্বস্থ কামুন্দীর ছোট্ট হাঁড়িটার দিকে চেয়ে বিপিন আত্মগত ভাবে হাসতে থাকে—সস্নেহে হাঁড়িটার গায়ে হাত বোলায়, ছোট একটা মেয়েকে সে আদর করছে যেন।

চকোলেট, লজেন্স, বিস্কুট আরো কত কি নিয়ে বিপিন উঠল।

সেদিন সন্ধ্যায় আড্ডার প্রধানতম আলোচ্য বিষয় হ'ল ঐ জিনিষগুলো। তীক্ষ্ণ শ্লেষে জর্জ্জরিত হ'তে হ'ল বিপিনকে। সলজ্জ অপরাধী অনোচিত হাসির সঙ্গে মৃদু কৈফিয়ত দেয় বিপিন, —এই মানে ব্যাপার কি জান মুখুজ্যে, আজকালকার ছেলে মেয়েদের মুখে চিঁড়েমুড়ি ত' আর রোচে না, তাই—

বুঝেছি হালদার, সহরে হাওয়া তোমার গায়ে লেগেছে। শেষে তুমিও নতুন ঢেউএ গা ভাসালে!

জবাব না দিয়ে মৃদু-মৃদু হাসে বিপিন।

কথার মোড় ঘুরে আড্ডাটা সবেমাত্র একটু জমকে উঠেছে, এমন সময়ে একটা কঠিন কর্কশ স্বরের ধাক্কায় সচকিত হ'য়ে সবাই সোজা হ'য়ে বসল। ব্যাপারটা কি বোঝবার চেষ্টা করছে সবাই, হরিদাস দোকানের মধ্যে এগিয়ে এল। বিরক্ত আর রাগে জ্বলতে জ্বলতে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, বলি, কথা কইছেন না কেন ? এ মুড়কী আপনার দোকানের নয় ?

মুখুজ্যে ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে। হুঁকোটা মিত্তিরের হাতে গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, নিশ্চয়ই, এ হালদারের মুড়কী বৈকি। হালদারের মুড়কী, বুঝলে বাবাজী, এ তল্লাটে একেবারে বিখ্যাত। তা' তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বাবাজী বস। ভাঙা বেঞ্চিখানা মুখুজ্যে কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে দিল।

হরিদাস কিন্তু বসল না, তেমনি দাম্ভিক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থেকে রূঢ়স্বরে বললে, আপনারা গ্রামের বিচক্ষণ ব্যক্তি থাকতে এ সমস্ত যে কি করে allow করেন, আমি ত' ভেবে পাই না। কোন একটা Cover নেই, চারদিকে মাছি ভন ভন করছে—আর সেই জিনিষ বিক্রী হচ্ছে। নাঃ, কালই আমি সবাইকে ডেকে এর একটা বন্দোবস্ত করব—এ সব জিনিষ খাওয়া মানে ত কলেরায়

য়ে যাওয়া। যত সব বাসি পচা জিনিষ, তা' না হলে আর চার পয়সায় একথামা মুড়কী!

বিপিন একটা কথাও বলতে পারল না। এই সেই হরিদাস! পঁচিশ বছর আগে বিপিন যখন তা'র বাপের কাছে বসে কেনাবেচা শিখত, এই হরিদাস তখন এই দোকানেরই পাশ দিয়ে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে পড়তে যেত। বাবার সময় সার্টের ছোট ছুটো পকেট ভর্ত্তি করে নিয়ে যেত এই দোকানেরই মুড়কী। এমনই সে খেয়েছে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। অভাবে-অনটনে প্রায়ই একই বয়সী বিপিন আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমা পার হ'য়ে এসেছে, অথচ হরিদাসের বলিষ্ঠ দেহে আজ মাত্র যৌবনের সূর্য্যাস্ত। কই কলেরা হ'য়ে মরেনি ত' হরিদাস!

পরের দিন বেলা প্রায় এগারটা হবে,—ওরা তিনজন একরকম বিরক্ত হ'য়েই বিপিনের দোকান ছেড়ে উঠে গেল। কাল রাত্রি থেকে বিপিন মোটেই কথা কয়নি। হরিদাস অপমান করে থাকতে ত' পারেনা। জবাব দিলেই হবে। কিন্তু মুখুজ্যের এমনতর প্রস্তাবের বিপিন রা' কাড়েনি। সেই একই ভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বিপিন।

দোকানের সামনে দিয়ে বছর বাইশের একটি ছেলে দু'বার ঘুরে গেল। বিপিন মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল বটে, কিন্তু কৌতূহল দমন করল। যেই হোক্, তাতে তার কি। অযাচিতভাবে ভালবাসতে গিয়ে যে শিক্ষা সে পেয়েছে, তাই-ই যথেষ্ট। কেন এই আগ্রহের অনধিকার।

ছেলেটি কিন্তু এদিক ওদিক চেয়ে তার দোকানের দিকেই এগিয়ে এল। পকেট থেকে একটা আনি বার করে বললে, এই নাও, কালকের মুড়কীর দাম।

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে উঠল বিপিনের। কটমট করে সে চাইল ছেলেটির দিকে, সেই নীরব ভর্ৎসনার ছেলেটি ম্রিয়মাণ হ'য়ে বললে, লাবণ্য তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। আসলে তা'র কোন দোষ নেই, ওই ছোট ছোট ছেলেরাই সব বলেছে ওর বাবার কাছে।

লাবণ্য! লাবণ্য ঐ মেয়েটার নাম। বিপিনের চোখে স্বপ্নের ঘোর নেমে এল। কি সুন্দর নাম, চেহারার সঙ্গে কি সুন্দর সামঞ্জস্য! সব ভুলে গেল বিপিন—মুখুজ্যের স্নেহ, হরিদাসের রূঢ়তা, সব!

কিন্তু কই, কাসুন্দী কই? এনেছ কাসুন্দী? ছেলেটির গলায় বিপিনের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

কাসুন্দী? এনেছি বৈ কি! তাক থেকে কাসুন্দীর হাঁড়িটা পেড়ে ছেলেটির হাতে দিতে দিতে বিপিন জিজ্ঞাসা করলে, তুমিই বুঝি সুব্রত?

হ্যাঁ, কিন্তু তুমি জানলে কি করে? সুব্রত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে।

জবাব না দিয়ে বিপিন হাসিভরা মুখে সুব্রতর দিকে চেয়ে থাকে। লম্বা, বলিষ্ঠ গড়ন, একমাথা ঘন কোঁকড়া চুলের নীচে মুখখানা যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে পাথরে কাটা মূর্ত্তি, তারই মাঝে সোনার কমলের মত দুটো চোখ—স্বপ্ন আর গঠন, দুইএর বিরল সমন্বয় সেই চোখের তারায়। বিপিন তাকিয়ে রইল। সুব্রত আর লাবণ্য বিপিনের মন জুড়ে শুধু ঐ দুটি নাম, সুব্রত আর লাবণ্য—যেন হরগৌরী, এছাড়া আর কোন তুলনা বিপিনের মনে এল না।

দাও দেখি চার পয়সার মুড়কী, না নিয়ে গেলে রাজরাণীর আবার রাগ হবে, হয়ত' কথাই কবে না। সুব্রত পকেট থেকে একখানা রুমাল বার করে বিপিনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

মহানন্দে বিপিন রুমালে মুড়কী বাঁধিতে লাগিল। না, পয়সা সে কিছুতেই নেবে না। লাবণ্য-সুব্রতর কাছ থেকে—হরগৌরীর কাছ থেকে পয়সা নেবার কথা বিপিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। দীর্ঘ জীবনের পর সে পেয়েছে জীবনের স্বাদ, লাভ-ক্ষতির হিসেব খতিয়ে সেই স্বাদ অনুভব করা অসম্ভব। বিপিনের মন আজ কানায় কানায় ভরে উঠেছে আনন্দে ও তৃপ্তিতে।

এর পর থেকে সুব্রত প্রায়ই আসতে লাগল, রুমালে বেঁধে নিয়ে যেত মুড়কী আর পাটালি, ছোলাভাজা আর বদমা। লাবণ্য মর্জ্জিমাফিক ফরমায়েস দিত, তামিল করত বিপিন কৃতার্থ হয়ে। মাঝে মাঝে সুব্রত আসত না দুতিন দিন ধরে'। ফিরে আসত যখন উৎকণ্ঠিত বিপিন দেখত সুব্রতর চোখ-মুখ-যেন বসে গেছে, জেগে আছে শুধু চোখের সেই বর্ণনাতীত ভাব—স্বপ্নের আর গঠনের। তবে ইদানীং স্বপ্নালুতা যেন সরে যাচ্ছে সুব্রতর চোখ থেকে, একটা হিংস্র কঠিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তা'র চোখে। বিপিন একটু শঙ্কিত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেও জবাব পায় না সুব্রতর কাছ থেকে। বিনিদ্র বিপিন সারারাত ধরে ভাবতে থাকে সর্বত্যাগী শঙ্করের চোখে ধ্বংসের সর্বনাশা আগুন কেন? রাগ হয় সুব্রতর উপর রাজরাজেশ্বরী উমাকে সে ভিখারিণী করতে চায় বলে'। সুব্রত কোন অভিযোগের জবাব দেয় না, মিটমিট করে হেসে শুধু বলে, কাজ ছিল। কি কাজ, তা' শত অনুসন্ধান করে বিপিন আজও পর্য্যন্ত জানতে পারে নি। ক্ষুব্ধ অভিমানে বিপিন মর্ম্মাহত হয়। লাবণ্যর দেখাও পাওয়া যায় না যে, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নেবে বিপিন সুব্রতর কাজের ইতিবৃত্তটা। অবরুদ্ধ অভিমানে বিপিন গুমরে ওঠে।

ক'দিন ধ'রে সুব্রত আসে নি,—চিড়ে, মুড়কী, পাটালি কিছুই পায়নি লাবণ্য। সুব্রতর এমনধারা অনুপস্থিতি নতুন নয়, কিন্তু অকারণেই বিপিনের মেজাজটা বিগড়ে আছে। উপরন্তু, সেদিন সন্ধ্যায় মুখুজ্যে একটা খারাপ খবর নিয়ে এল। সদর ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে কারা নাকি হাতবোমা ফেলেছে, গোরা সৈন্য ছিল সেই গাড়ীতে বোঝাই হ'য়ে। আহত হয়েছে অনেকেই, সাদা চামড়ার রক্তে কালো পুলিশের কর্ত্তাদের আহার-নিদ্রা নেই! তার চলে গেছে চারিদিকে, বদমাইস, ডাকাতদের ধরা চাই-ই। তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। কিন্তু এ কেমনতর ডাকাত, নিজেই ভাবতে লাগল। সোনা নেই, চাল নেই, শুধু মানুষ ভর্ত্তি গাড়ীতে বোমা মেরে লাভ কি তাদের? গোরা সৈন্য হাতিয়ার নিয়ে যাচ্ছে শুধু সীমান্তে, তাদের মারবার চেষ্টা কেন? ভেবে ভেবে বিপিন কূল পায় না।

সুব্রত আসে না, কিন্তু কোথা থেকে নতুন নতুন খবর নিয়ে

আসে মুখুজ্যে। ভাগলপুরের কাছ-বরাবর রেল-লাইন তুলে ফেলায় একখানা চলন্ত গাড়ী একেবারে মাঠের ওপর গড়িয়ে এসে চুরমার হ'য়ে গেছে, গাড়ীখানায় নাকি বন্দুক আর গুলি বোঝাই ছিল। কোথায় নাকি রেলের পুলও ভেঙে দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছিল। সাদ্‌তা ষ্টেশনের কাছে বহুলোক জড় হ'য়ে রেল-লাইনের উপর শুয়ে পড়েছিল,—পুলিশ গুলী চালিয়েছে—অনেক লোকও মরে গেছে।

নতুন ক'রে সুরু করবার আয়োজন ক'রেছিল বিপিন: কিন্তু লাবণ্যকে কাছে পেয়েও সে কাছে টেনে নিতে পারল না—সুব্রত এ-সকল ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রদীপ নিভিয়েই যদি দেবে, তবে সাঁঝে জ্বালাবার প্রয়োজন কি ছিল? পথের দিকে চেয়ে চেয়ে বিপিনের চোখদু'টো জলে ভরে ওঠে, কিন্তু ওরা আসে না।

অনেকদিন পরে সুব্রত একদিন এল; কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত—ভাবে, এমন কল্পনাতিরিক্ত এক অনুরোধ নিয়ে যে, মুহূর্তের জন্যে বিপিনের মনে হ'ল সুব্রতর না আসাই ছিল ভাল। ছ'মাইল দূরে ছোট কাঠের পুলটাকে ওরা ভেঙে দিয়ে এসেছে—সদর থেকে গ্রাম গেছে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে। বিপিনের দোকান অচল হ'য়ে রবে—না, বিপিন কিছুতেই সুব্রতর সঙ্গীদের রাতের আশ্রয় দেবে না। অনুনয়ে সুব্রত একেবারে ভেঙে পড়ল, দিতেই হবে প্রেমাকে আশ্রয়। আমার বাড়ীতে উপায় নেই যে, আমার উপর পুলিশের চোখ রয়েছে সর্বদা। লাবণ্যকেও বলেছিলাম, কিন্তু ওদের বাড়ীতে বেশী লোক—জানাজানি হ'য়ে যেতে পারে। লাবণ্যই পাঠালে তোমার কাছে—

লাবণ্য পাঠিয়েছে? না, বিপিনের কাছে লাবণ্য সকল যুক্তি-তর্কের অতীত, তা' জেনেই সুব্রত কাজ হাসিল করে নিতে চায়? যাই হোক না কেন, মিছে কথাই বলুক না কেন সুব্রত—বিপিন আশ্রয় দেবে।

ওদের পৌঁছে দিয়েই সুব্রত চলে গেল। চিঁড়ে-মুড়কি আর কলা, তাই দিয়ে ফলার করে খেয়ে ওরা শুয়ে পড়ল—খানিক পর ওদের নাক ডাকার আওয়াজও শুনতে পাওয়া গেল। উৎকণ্ঠায় আর অস্বস্তিতে বিপিনের চোখে ঘুম এল না। কে জানত লাবণ্যকে ভালবাসার মূল্য এতখানি! দু'শো বছরের নর্কিয়া খাওয়া ঝিমানো রক্তে বিপিনের জন্ম, ঘুণধরা অস্থির নির্জীবতা তা'র উত্তরাধিকার—লাবণ্যকে ভাল বেসেছে, এই অপরাধে কি সেই রক্তে আর মাংসে আগুন ধরিয়ে পুড়ে মরতে হবে! ওরা আরো জোরে নাক ডাকাচ্ছে! আশ্চর্য্য ওরা, আশ্চর্য্য ওদের প্রকৃতি—ভয় নেই, উদ্বেগ নেই, নির্ব্বিবাদে ঘুমোচ্ছে। যেন এটা ওদেরই বাড়ী। কাল সকালে কাক ডাকতে না ডাকতেই সুরু ত ওরা আবার চলতে শুরু করবে—আবার গড়ে নেবে নিজেদের ঘর। চলার পথেই ওদের সৃষ্টি—বিপিনের মত মনগড়া মানুষই আজ ওদের সৃষ্টির সহায়তা করে।

সকাল থেকে একটা চাপা উত্তেজনায় সমস্ত গ্রাম ভরে উঠল। পুল যারা ভেঙেছে, তারা নাকি কাল রাত্রে এই গ্রামেই লুকিয়ে ছিল। পুলিশ জানতে পেরেছে, সঙীন উঁচিয়ে দল বেঁধে আসছে সকলের বাড়ী খানাতল্লাসী করতে। মুখ সকলেরই শুকনো, আসন্ন অমঙ্গলের ছায়া সকলেরই মুখে। মুখুজ্যের কথায় বিপিনের মন নেই, সে শুধু ভাবছে ওরা এতক্ষণে কতদূর এগোল। যে ঘোরা পথের সন্ধান বিপিন ওদের দিয়েছে, তাতে বারো মাইল লাগবে ওদের ঘাটে পৌঁছাতে, সেখানে ওদের নৌকা বাঁধা। পারবে কি পৌঁছোতে ওরা?

রাত্রির উদ্বেগ আর অস্বস্তি, অনিদ্রা আর দুঃস্বপ্নের আশাতিরিক্ত মূল্য পেল বিপিন। লাবণ্য এসেছে—এসেছে বাবার নিষেধ আর মায়ের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে'। এসেছে বিপিনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে। তড়বড়িয়ে লাবণ্য কত কথাই যে বললে—অমানুষিক অত্যাচার আর অবিচারের কথা এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা, সুব্রত আর লাবণ্যর সর্বস্ব ত্যাগের পণের কথা। আতঙ্কে শিউরে উঠল বিপিন লাবণ্যর কথা শুনে—লাবণ্যর কশাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে বিপিন শুনল যে, নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে না। কাজ করতে হবে বিপিনকে। জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে বিপিন, কিই বা কাজ সে করতে পারে। কিন্তু লাবণ্যর চোখের আগুন সংক্রামিত হয়েছে বিপিনের মনে, অন্তরে দৃঢ়ীভূত হয়েছে বিশ্বাস যে, তার জীবনের সম্ভাবনা এখনও নিঃশেষিত হয়নি। পাঁজর বার-করা দেহের দিকে চেয়ে বিপিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে, ডাকই যদি এল ত' এমন অবেলায় কেন?

কিন্তু না, এই শীর্ণ ভগ্ন জীর্ণ দেহ নিয়েই বিপিনকে যেতে হবে। ঢেউএর পর ঢেউএ নদী ফুলে উঠেছে, তারি মধ্যে পাড়ি দিতে হবে বিপিনকে। একূল ওকূল একাকার হ'য়ে গেছে—শুধু উদ্দামতা আর প্লাবন—কর্ম্ম ও সাহস—এই ভাঙা নৌকো নিয়েই বিপিনকে ওপারে পৌঁছোতে হবে। ওপারে আছে সুব্রত আর লাবণ্যর দল, আগামী কালের কল্পনা। নতুন সভ্যতা, নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র গড়বে সুব্রত আর লাবণ্যই।

দিনকয়েক পর। গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছে বিপিনের দোকানের সামনে। বাড়ী খানাতল্লাসীর পর সুরু করেছে দোকান, দোকানের জিনিষ-পত্র তচনচ করে ভেঙে ছড়িয়ে দিচ্ছে পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর। মুড়কীর জালা থেকে বেরোচ্ছে একরাশ কাগজ, হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে ইনস্পেক্টর বিপিনকে অনবরত খোঁচাচ্ছে আর জিজ্ঞাসা করছে কোন পথ দিয়ে গেছে ওরা, ওরা যারা সদর ষ্টেশনে আগুন ধরাতে গিয়েছিল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বিপিন দাঁড়িয়ে রইল, ব্যগ্র দৃষ্টিতে জনতার মধ্যে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে একখানা গৈরিক রঙের শাড়ী—যার কোলে মেটে লাল পাড়।

এবার যেতে হবে বিপিনকে—সমস্ত জনতা পথ করে দিল। এগিয়ে চলেছে বিপিন—নির্ভীক নিষ্কম্প পদক্ষেপে।

বাঁকের মুখ ঘুরতেই বিপিন সবিস্ময়ে দেখল লাবণ্য দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে একগাছা মালা। চোখ দুটো লাল, মুখটা ফোলা-ফোলা কিন্তু ঠোঁটে জড়িয়ে রয়েছে হাসি—কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের ইঙ্গিত, সাহস আর প্রেরণা। কথা না বলে মালাটা ছুঁড়ে দিল লাবণ্য। হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলে বিপিন।

ফুলের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভরে উঠল। মালাটাকে হাতে চেপে বিপিন এগিয়ে চলল, পিছনে পিছনে সঙীন উঁচিয়ে চলল দু'জন সৈনিক।

মেঘনাদ বধে ট্র্যাজিক পরিকল্পনা

শ্রীসুনীল ঘোষ

ট্র্যাজিডি শব্দের অর্থ মোটামুটি ভাবে জীবনের ব্যর্থতা। জীবন আমাদের নিকট রহস্যময়, এবং ইহার যে ব্যর্থতা তাহাও অনেক সময়-কম রহস্যময় নয়। এই জীবন-প্রবাহের আরম্ভ হইয়াছিল কোথায় জানি না—ইহার শেষই বা হইবে কোথায় তাহাও আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কিন্তু এইটুকু জানি যে, অসংখ্য জীবন-বুদ্বুদ্ সুদূরপ্রসারী জীবন-সমুদ্রে অসংখ্য ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির অতল রহস্যে ডুবিয়া যায়। যে ডুবে তাহাকে আর খুঁজিয়া পাই না। আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ভাবিতে থাকি। এই ভাবনা হইতেই ট্র্যাজিডির জন্ম।

যেইদিন হইতে মানুষ দেখিতে শিখিল যে, সকালের সুন্দর ফুলটি সন্ধ্যাকালে ঝরিয়া পড়িতেছে—যেইদিন হইতে মানুষ বুঝিতে পারিল যে, সে নশ্বর—সে যাহাকে ভালবাসে ইচ্ছা করিলেই তাহাকে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে না—রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু আসিয়া তাহাকে জীর্ণ, দীর্ণ করিয়া ফেলে, প্রকৃতির যে অজস্র দানের মধ্যে সে এতদিন ধরিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেই প্রকৃতিই একদিন কৃপণের মত তাহার নিকট হইতে আপনার সমস্ত সম্পদকে হঠাৎ গুটাইয়া লয়—সেইদিন হইতে তাহার মনে অজানা একটা আশঙ্কার ছায়াপাত হইয়াছে। মরণের এই ভীতির সঙ্গে সঙ্গে বাঁচিবার চেষ্টাও তাহার প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির সঙ্গে সে যুদ্ধ করিয়াছে, বিশ্বের অণুপরমাণুর সহিত সে প্রতিযোগিতা করিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছে, নিজের সুখ-সুবিধাকে সে শতগুণে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে—কিন্তু মৃত্যুকে সে এড়াইতে পারিল কই? জীবনকে ভালবাসিয়া প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে গিয়া তাহার ব্যর্থতাকে শতগুণ বেশী করিয়া সে উপলব্ধি করিয়া বসিল। তাহার শক্তি, তাহার সামর্থ্য, তাহার দৃঢ়তাকে চুরমার করিয়া দিল রহস্যময় এক উপহাস! তখনই মানুষ স্বীকার করিল, বা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল, যে তাহার শক্তি অপরিমিত নহে; তাহার উপরেও অদৃশ্য একটি শক্তি রহিয়াছে। সেই শক্তিকে ভগবানই বলুন আর নিয়তিই বলুন, তাহার নিকট মানুষের সকল প্রেরণা, তাহাকে বুঝিবার মানুষের সকল বুদ্ধি ব্যর্থ হইয়া গেল। জন্মিলে মরিতে হইবে ইহা আমরা জানি; আর নিশ্চিত এই মৃত্যুকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারি না বলিয়াই জীবনের পশ্চাতে কোন তথ্যকেই সুস্থির চিত্তে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। তথাপি জীবনকে আমরা ভাল বাসিয়াছি—তাহাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছি, আর পাঁচটা সৃষ্ট জীবের মত তাহাকে বিধাতার খাম-খেয়ালীর মধ্যে নির্বিবাদে ছাড়িয়া দিই নাই; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুঝিয়াও শেষ পরিণামকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারি না। দুঃখ তো এইখানেই; ট্র্যাজিডি তো এইখানেই।

সুতরাং এই যে যুদ্ধ—ইহা দৃপ্ত মানবীয় শক্তির সহিত অদৃশ্য মায়াশক্তির। 'মেঘনাদবধ' আলোচনা করিলে আমরা ইহাই দেখিতে পাইব।

'মেঘনাদবধে'র যে যুদ্ধ তাহার একদিকে স্বর্গের দেবতা ও তাঁহাদের অনুগৃহীত শক্তি। আর একদিকে রাবণের শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম। রাবণের বিরুদ্ধে যে একটা ভীষণ দৈবী ষড়যন্ত্র ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আর রামের অবতার যে জন্যই হউক, তিনি জন্ম হইতে দেবানুগৃহীত। দুরন্ত রাবণের ভয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল কম্পিত। স্বর্গের দেবতারা রাবণকে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু কে তাহার ভার গ্রহণ করিবে? পুরুষকারের মূর্ত্ত প্রতীক রামচন্দ্র সে ভার গ্রহণ করিলেন। নিয়তি ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া ছিল; রাবণ তাহাতে জড়াইয়া পড়িলেন। শক্তিগর্ব্বে গর্ব্বিত রাবণ সীতা হরণ করিয়া বসিলেন। রাক্ষসদের চিরশত্রু দেবতারা এই সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িলেন না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে রামচন্দ্রকে সাহায্য করিতে তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া বসিলেন। রামচন্দ্রের সম্মুখে যে একটা বিরাট সমস্যা বর্ত্তমান ছিল তাহার অর্দ্ধাংশের উপর সমাধান করিয়া দিলেন দেবতারা। "মেঘনাদবধে"র যে কোন পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, ক্ষুদ্র এই নয়টী সর্গের মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ লইয়া স্বর্গে কি একটা বিরাট কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। যে বিরাট অস্থিরতা আমরা স্বর্গে দেখিতে পাই তাহার অর্দ্ধাংশও কি আমরা লঙ্কায় প্রকৃত যুধ্যমান দুই শত্রুর মধ্যে দেখি? এই নয়টি সর্গ গড়িয়া উঠিয়াছে তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনায়। বীরবাহুর পতন হইল। রাবণ ক্ষোভে ও দুঃখে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় মেঘনাদের আবির্ভাব,—কিন্তু অকস্মাৎ নহে। তাহার পশ্চাতে দেব-দেবীর কৃপা আছে। রাবণের ভক্তি-অন্নপুষ্টা রাজলক্ষ্মী ছদ্মবেশে মেঘনাদের প্রমোদ-উদ্যানে গমন করিয়া তাঁহাকে লঙ্কায় আনিলেন। মেঘনাদের পতন আবশ্যক—ইহাই ভবিতব্য—ইহাই প্রাক্তনের ফল। ঐ একটি রাত্রির কথা ভাবিয়া দেখুন; উহার মত ঘটনাবহুল রজনী 'মেঘনাদবধে' আর একটিও নাই; এবং সেই সকল ঘটনার অধিকাংশ ঘটিয়াছে স্বর্গে। মেঘনাদকে পাঠাইয়া দিয়া রমা ইন্দ্রপুরীতে সংবাদ দিলেন যে, মেঘনাদ সেনাপতি হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করিয়া বসিলেন····· দেবকুল প্রিয়

বাসব, কেমনে তারে রক্ষিবে তা দেখ।

শচীসহ শচীকান্ত কৈলাশে উপস্থিত হইলেন। যেমন করিয়া হউক মেঘনাদকে হত্যা করিতেই হইবে। অম্বিকা মনোমোহিনী বেশ ধারণ করিয়া যোগাসনে তপে-মগ্ন শিবের তপ ভঙ্গ করিয়া ছলে কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে মেঘনাদের মৃত্যু-তথ্য জানিয়া আসিলেন। মায়াদেবী স্বর্গীয় অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিলেন—চিত্ররথের সাহায্যে তাহা লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কেবল তাহাই নহে; নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ ধ্বংস করিতে হইবে; যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে না দিতেই মেঘনাদ হত্যা সমাপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু যে রক্ষঃপুরীতে কীট পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না—সেখানে লক্ষ্মণ প্রবেশ করিবেন কেমন করিয়া? মায়া দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়ার প্রভাবে

লক্ষ্মণ ও বিভীষণ সকলের অলক্ষ্যে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া মেঘনাদকে হত্যা করিলেন। অলক্ষ্য নিয়তি তন্দ্রাচ্ছন্ন লক্ষ্মণকে লইয়া আপনার কার্য্য সমাধা করিয়া আসিল।

দ্বিতীয় দিবসের প্রারম্ভেই মেঘনাদবধ সমাপ্ত হইল। তারপরেই লক্ষ্মণের শক্তিশেল। পুত্রশোকে দুরন্ত রাবণের হস্ত হইতে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য এবারেও দেবতারা দৃশ্য নিয়তির মত আসিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। কিন্তু দুর্ব্বার রক্ষঃশক্তির নিকট এবারে নিয়তির শক্তি ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। লক্ষ্মণকে মরিতে হইল। কিন্তু লক্ষ্মণের মৃতদেহ রাবণ পাইলেন না। দেবতারা পরোক্ষে থাকিয়া তাহা রক্ষা করিলেন।

> ... ... মনোরথগতি
> রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
> বীরভদ্র—"যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
> রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ সমরে?

রাবণ প্রবঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। লক্ষ্মণ বাঁচিয়া উঠিলেন। অসম্ভব সম্ভব হইল। শিবের অনুজ্ঞায় মৃত দশরথ আত্মার সাহায্যে হনুমান্ সূর্য্যকে কুক্ষিদেশে আচ্ছাদিত করিয়া বিরাট গন্ধমাদন লইয়া উপস্থিত হইল। সমস্তই দেবতার অনুগ্রহ। ইহা ব্যতীত রামচন্দ্র যে দেবানুগৃহীত এবং রাবণের প্রতি যে বিধাতা বিরূপ তাহার প্রমাণ "মেঘনাদবধে"র বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন:

> এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে?
> গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরি?
> হায় বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
> আমি!
>
> (২য় সর্গ; চিত্রাঙ্গদার-প্রতি রাবণের উক্তি)

প্রমীলা আসিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত মিশিয়াছে; "বায়ু-সখী" "অগ্নি-শিখা"র সহিত মিলিল। বিজয়া চিন্তান্বিত হইয়াছে—কেমন করিয়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে নিধন করিবেন। ইন্দ্রজিতের বধ সহজ করিতে হইলে প্রমীলাকে নিস্তেজ করিতে হইবে; অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে হইলে বায়ুকে সরাইতে হইবে। তাহার উত্তরে

> ক্ষণকাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী;—
> "মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
> বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তারি আমি। (৩য় সর্গ)

স্বপ্নদেবীর আদেশে লক্ষ্মণ সরোবরকূলে চণ্ডীর দেউলে যাইবার পথে ভূতনাথকে দেখিয়া যখন যুদ্ধে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, তখন ভূতনাথ বলিলেন:

> ... ... কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে?
> প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
> ভাগ্যধর। (৫ম সর্গ)

লক্ষ্মণ মায়াদেবীর পূজা সমাপ্ত করিলেন, মায়াদেবী বলিলেন:

> ... ... সুপ্রসন্ন আজি,
> রে সতী সুমিত্রা সুত, দেব দেবী যত
> তোর প্রতি! ... ...
> ... ... মোর বরে পশিবি দু' জনে
> অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
> মায়াজালে আমি দোঁহে ... ... (৫ম সর্গ)

লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিত-নিধনে পাঠাইতে রামচন্দ্রেরও কাতরতা দেখিয়া লক্ষ্মণ বলিতেছেন:

> কি কারণে রঘুরাজ, সভয় আপনি
> এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
> ডরে সে ত্রিভুবনে? (৬ষ্ঠ সর্গ)

দুরন্ত শক্তিশেলও লক্ষ্মণকে ঘায়েল করিতে পারিল না। লক্ষ্মণ বাঁচিয়া উঠিলে রাবণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন:—

> বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে?
> ... ...
> ... ... হে রাবণ, মম ভাগ্যদোষে
> ভুলিল স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি। (৯ম সর্গ)

অনুসন্ধিৎসু পাঠক এইরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাইবেন। আমি কেবল "মেঘনাদবধ" হইতে আর দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, রাবণের বিরুদ্ধে দৈব ষড়যন্ত্র কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে:

> ... ... হায় দেবি, দেবে কি মানবে
> কার হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?
> (২য় সর্গ;—শিব দুর্গাকে)

এবং, অপহরণকালে সীতা যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, অশোককাননে সরমার নিকট তাহাই তিনি ব্যক্ত করিতেছেন:—

> দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী
> মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
> কহিলা। লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;—
> "বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে পো তোরে
> রক্ষোরাজ; ... ...
> ... ...
> ভবিতব্যদ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে।
> (৪র্থ সর্গ)

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, রাবণ যে সীতা হরণ করিবেন, ইহাই তো বিধির বিধান। সীতাহরণের বহু পূর্ব্ব হইতেই যাহা যাহা প্রকৃতই পরে ঘটিয়াছে, নিয়ত বিধানে তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত হইয়া আছে। রাবণ বিধির সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যে সব ঘটনা রাবণকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছে, তাহাদের জন্য তাঁহাকে দোষী মোটেই করা যায় না। কারণ, তিনি তো নিয়তির হস্তে একটি অসহায় ক্রীড়নক মাত্র। নিয়তির হস্তে মানুষের এই নির্ম্মম অসহায়ত্ব ট্র্যাজিডির বিভীষিকা বাড়াইয়া দেয়, সন্দেহ নাই। গ্রীক ট্র্যাজিডিয়ানরা নিয়তির এই অসম্ভব প্রভুত্ব অনেকটা মানিয়া লইয়াছেন। মানুষ যে কত অসহায় তাহা Cassandra-র কথা হইতেই বেশ বোঝা যায়:

Alas ! the fates of men ! their brightest bloom
A shadow blights ; and, in their evil day,
An oozy sponge blots out their fleeting print,
And they are seen no more. From bad to worse
Our changes run, and with the worst we end.

— (Agamemnon.)

জীবনের আদি-অন্ত যাহারা বুঝিতে চাহে না, জীবনকে যাহারা কেবল অসহায় ক্রীড়নক বলিয়াই মনে করে,—জীবনের যাহারা কোন মূল্যই দিতে চাহে না—জীবন সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ইহার বেশী কি করিয়া হইবে ? ইহাই তো নৈরাশ্যবাদ। মধুসূদন রাবণের উপর পক্ষপাতিত্বের জন্যই বোধ হয় এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। এই ভ্রমে যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা পাইয়াছেন শুধু উপহাস আর হাহাকার ; সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইবার অধিকারী তাঁহারা নহেন, কিন্তু আমরা জানি, রাবণ-চরিত্র এত অসহায় নহে। রাবণের সম্বন্ধে চিত্রাঙ্গদার যে উক্তি,

…হায়, নাথ, নিজকর্ম ফলে
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলে আপনি,

তাহা একেবারে অবাস্তব নহে। পরে আমি এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব। এইখানে শুধু আমি এইটুকুই বলিতে চাই যে, রাবণের বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধ শক্তি সংগঠিত হইয়াছিল, তাহা বিধিরই ইচ্ছায় ; এবং ক্ল্যাসিক্যাল ট্র্যাজিডির মধ্যে যাহাকে আমরা Destiny বলি, তাহাই এখানে নামিয়া আসিয়াছে দৈব-চক্রান্তের বেশে।

এ তো গেল একটা দিক। আরও একটা দিক রহিয়াছে। দৈবী ক্ষমতার ভয়ে রাবণ যদি রামচন্দ্রের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া বসিতেন, তাহা হইলে রাবণবধ হয়তো হইত না। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইত। কিন্তু রাবণ তাহা করেন নাই ; তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছেন, এবং যখন শেষ পরিণামকে সরাইয়া রাখিতে পারেন নাই, তখন বীরের মতই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছেন ; তাই কাব্যটিও একটি ট্র্যাজিডিতে পরিণত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

সেইজন্য এইখানে রাবণ-চরিত্র বিশ্লেষণের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। এই রাবণ রামায়ণের বর্ব্বর রাক্ষস নয়। পৌরাণিক দৃষ্টির বাহিরে আসিয়া আমরা রাবণ চরিত্রে কয়েকটি জিনিষ লক্ষ্য করি। রামায়ণের রাবণ কেবল অত্যাচারী ; "মেঘনাদবধের" রাবণ পুরুষকারের জলন্ত আদর্শ। কৃষ্টি, সাধনা, সংস্কার, শৌর্য্য ও মহিমা সব কয়টায় মিশাইয়া মধুসূদনের রাবণ এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। জগতে শ্রেষ্ঠ হইবার তাঁহার অনেক গুণই ছিল—কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল, একটি মাত্র দোষের জন্য। নারীর প্রতি তাঁহার যে একটা ভীষণ দুর্ব্বলতা ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার নাই। নারীর নগ্ন সৌন্দর্য্য পান করিবার জন্য তিনি পিপাসা লইয়া ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন রাবণের নিকট সীতার সন্ধান আনিয়াছিল মাত্র ; তাহার পর শূর্পণখার কর্ত্তিত নাসিকা ও কর্ণ জুড়িয়া দিলেও সীতাহরণ আটকাইত না। এইখানে ম্যাকবেথের সহিত রাবণের একটু তুলনা করিব। Witches রা ম্যাকবেথকে বলিয়াছিল—তুমি রাজা হইবে। যে দুরাশার বীজ ম্যাকবেথের অন্তরে সশঙ্কভাবে লুক্কায়িত ছিল—Witchদের ভবিষ্যৎবাণীরূপ বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া তাহাই মাথা নাড়া দিয়া উঠিল। ম্যাকবেথ নিজেকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এতক্ষণে একটা অজুহাত পাইয়া বসিলেন—তাইতো তিনি ডানকানকে হত্যা করিবার সাহস পাইলেন। এখানেও অনেকটা সেইরূপ দেখি। সীতাহরণ করিয়া রামের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য শূর্পণখা রাবণকে অনুরোধ করিল। রাবণের মনের মধ্যে যে কামাগ্নি ধিকি ধিকি করিয়া জলিতেছিল—ভগিনীর অনুরোধ তাহাতে ঘৃতাহুতি দিল। রাবণ জগতের নিকট নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার একটা অজুহাত পাইলেন। এবং নিজের দুর্ব্বলতাকে ভগিনীর অপমানরূপ আবরণে ঢাকা দিয়া সীতাহরণ করিয়া বসিলেন। এখানে ভগিনীর অনুরোধটা গৌণ, মুখ্য হইতেছে তাঁহার হৃদয়াবেগ। নইলে ভগিনীর অবমাননার প্রতিশোধ কি অন্য ভাবে লওয়া চলিত না ? না, কোন্ বীর অপমানের প্রতিশোধ লইতে গিয়া অসহায় দুর্ব্বল নারীকে অপহরণ করিয়া বসে ? এইখানেই রাবণ ভুল করিলেন—তাহারই ফলে তাঁহার জীবনে ভীষণ ট্র্যাজিডি আসিয়া উপস্থিত হইল। পুষ্প-মধুলোভী ভ্রমর পুষ্প দেখিলেই দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া যায় ; এবং অন্ধ লোলুপতার জন্যই মাঝে মাঝে সে বিশেষ বিশেষ পুষ্পের পাঁপড়ির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে ; বিশেষ বিশেষ পুষ্প সম্বন্ধে অজ্ঞতাই তাহার কারণ। রাবণও তেমনি আপনার প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতায় নারীতে নারীতে প্রভেদ করেন নাই—চিরদিনই তিনি নারীমাত্রকেই উপভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন ; সেইজন্য বিশেষ কোন রমণী তাঁহার নিকট বিশেষ কোন ভাবের উদ্রেক করিতে পারে নাই ; নারী সম্বন্ধে অজ্ঞতাই তাহার কারণ। সীতাকে হরণ করিয়া রাবণ ভ্রমরের মতই প্রাণত্যাগ করিলেন। তাই মনে হয়, আকাঙ্ক্ষা যাহার যত বেশী—বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনাও তাহার তত বেশী ; আবার দ্রুত সঞ্চরণশীল আকাঙ্ক্ষার সহিত প্রবৃত্তি-সংযমের অভাব যাহার যত বেশী—তাহার পতন তত শীঘ্র এবং ততোধিক ভয়ানক। রাবণের জীবন হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি। ক্ল্যাসিক্যাল ট্র্যাজিডির যাহা Character সীতা-হরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাও কার্য্যকারী হইয়া উঠিল। যে অদৃশ্য নিয়তি এতদিন রাবণের পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—সেই এখন তাঁহার চরিত্রগত দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া তাঁহারই চারিপাশে সুদৃঢ় ঘাঁটি প্রস্তুত করিয়া বসিল।

তথাপি "মেঘনাদবধের" যে রাবণ তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা তাঁহার দৃঢ়তা ও বীরত্ব। দৈবশক্তি যে তাঁহার বিরুদ্ধে ইহা তিনি জানিতেন ; জীবনে ভুল যে তিনি করিয়াছিলেন সে বিষয়েও তাঁহার সন্দেহ ছিল না, সেই ভুলের জন্যই যে তাঁহার সংসার ছারখারে যাইতে বসিয়াছে সেও তিনি অস্বীকার করেন না, আর সীতাকে সসম্মানে ফিরাইয়া দিলেই যে যুদ্ধের পরি-

সমাপ্তি হইবে এইটুকু বুঝিবার মত ক্ষমতাও তাঁহার ছিল। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া সাক্ষাৎ ধ্বংস হইতে তিনি রাজ্য রক্ষা করিলেন না কেন? ইহার উত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহার বীরত্ব—তাঁহার আত্মমর্য্যাদা—তাঁহার চরিত্রগত দৃঢ়তা এই পথে দাঁড়াইল। একে ত তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার জন্ত অনুতপ্ত—তাহার পর প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রামের শরণাপন্ন হওয়া তিনি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিলেন না। শূন্য ঘর পাইয়া ছদ্মবেশে সীতাহরণের নির্লজ্জ কামুকতা ও চরিত্রহীনতা যথেষ্ট ছিল সন্দেহ নাই—কিন্তু যদি ঐ অবস্থায় দিনের পর দিন যখন হারিয়া চলিয়াছেন—মধ্যপথে যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে কি ততোধিক দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা দেখানো হইত না? একমাত্র বিজয়ী রাবণ সীতাকে ফিরাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু সে সম্ভাবনা যখন খুব কম, তখন শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়া দেখিতে হইবে বই কি। কারণ, কোন্ বীর কবে আত্মসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন? রাবণও তাই মরিলেন। তাঁহার চরিত্রগত দৃঢ়তা তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া কলঙ্কময় আত্মগ্লানির মধ্যে নিক্ষেপ করে নাই। তাঁহার পক্ষে ও জগতের পক্ষে সান্ত্বনার বিষয় এইখানেই। ট্র্যাজিক হিরোর এইটিই একটি বিশেষ গুণ যে তাহার দৃঢ়তা জগত সংসারের প্রাণহীন ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া যাইতে দেয় না—তাহার বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহীর মত সে দাঁড়াইয়া থাকে। রাবণের এই গুণ ছিল, তাই রাবণ-চরিত্র এত ট্র্যাজিক।

রাবণ-চরিত্রের এই দৃঢ়তা আমরা 'মেঘনাদবধে'র ১ম সর্গ হইতেই দেখি। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাবণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন—সে অশ্রু নয়—রাবণের হৃদয়-মথিত শোণিত-প্রবাহ। কাহার দোষে অকালে বীরচূড়ামণি বীরবাহু নিহত হইলেন? রাবণের দুঃখ সেইখানেই। যে কালসমরের জন্ত তিনি নিজে দায়ী, তাহার ফল ভোগ করিতেছে লক্ষ লক্ষ প্রাণী। কেন? কারণ, পাপীর সংস্পর্শে যাহারা আসিয়া পড়ে, তাহারাও সেই পাপের অংশ গ্রহণ না করিয়া পারে না। এইজন্তই বোধ হয় বিভীষণ সরিয়া পড়িয়াছিলেন। যাহাই হউক,—এ কালসমরে যে যায় সে আর ফিরে না। এই বিশ্বাস সত্ত্বেও রাবণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন: "অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!" চতুরঙ্গে সেনা সাজিয়া উঠিল। এমন সময় মেঘনাদ উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

> ...থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
> তুমি, এ কলঙ্ক পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।

বীর কখনও বীরের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। মেঘনাদ সেনাপতি হইলেন। ইহার কি পরিণাম হইল, তাহা অনেকেই জানেন। লঙ্কার শেষ আশা, কর্ব্বুরকুলের শেষ গর্ব্ব মেঘনাদের মৃত্যু হইল। রাবণ শোকের প্রথম বেগ সহ্য করিতে পারেন নাই; কিন্তু পরক্ষণেই দৈবী ও মানুষী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সম্মুখে পতিতা পুত্রশোকাতুরা মন্দোদরীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

> ...বাম এবে রক্ষঃকুলেন্দ্রাণি,
> আমা দোঁহা প্রতি বিধি! তবে যে বাচিছি
> এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
> মৃত্যু তার! ... ...
> বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব!
> বৃথা রাজ্য-সুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
> বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
> অহরহঃ;

চিরকাল কাঁদিবার সময় রাবণের ছিল না; —তবে যে সামান্ত কয়টা দিন বাঁচিয়া ছিলেন—তাহা বোধ হয় কাঁদিবার জন্তই। তথাপি জীবিত থাকিতে সীতাকে ফিরাইয়া দিলেন না। রাক্ষস-পুরীর সকলেই যখন মহানিদ্রায় নিদ্রিত, তখন তিনি নিজে বাঁচিয়া থাকিয়া কি করিবেন? কেহ কি কল্পনা করিতে পারেন যে, লঙ্কার মহাশ্মশানের উপর রাবণ রাজা হইয়াছেন? বিভীষণের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে—রাবণের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। রাবণের বাঁচিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি মরিলেন—পদদেশে পরাজয়ের শৃঙ্খলাবদ্ধ রাবণ করিয়া নহে—তিনি মরিলেন নিষ্কোষিত অসিহস্তে উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে—যেখানের চারিদিক জুড়িয়া তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জনের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

তথাপি "মেঘনাদবধে" রাবণের মৃত্যু হয় নাই; বীরবাহুর মৃত্যু দিয়া ইহার আরম্ভ—আর মেঘনাদের মৃত্যু দিয়া ইহার সমাপ্তি। তবুও তাহাদের মধ্য দিয়াই আমরা রাবণের ভবিষ্যৎ দেখিতে পাই। রাবণ-জীবনের যে পরিণতি—যে ব্যর্থতা—যে লাঞ্ছনা তাহার চরম প্রকাশ হইয়াছে মেঘনাদের মৃত্যুতেই। বাকি ছিল কেবল রাবণের শারীরিক মৃত্যুটা। তা ইহা পরে আসিলেও আমাদের ভাবিবার কিছুই নাই। আমরা রাবণ সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। শারীরিক মৃত্যুটা রাবণের নিকটেও খুব ভীষণ নয়—ইহা তাঁহার আবাঙ্ক্ষিত,—প্রিয় বন্ধুর মত ইহা রাবণের হৃদয়-বহ্নিতে শান্তিবারি নিক্ষেপ করিয়াছে।

যাহা হউক, মোটামুটিভাবে আমি এইখানে এই জিনিষটাই বলিতে চাহিয়াছি যে "মেঘনাদ বধের" প্রাণবস্তুটি দুইটি পরস্পর-বিরোধী শক্তির প্রাবল্যে দানা পাকাইয়া উঠিয়াছে: একটি মায়া-শক্তি বা দৈব মায়া, এবং অপরটি রাক্ষসের বা রাবণের বীর্য্য। বৈদেশিক Classical বিশেষ করিয়া Shakespearean tragedyর মধ্যে আমরা দুইটি কথা পাই: Character ও Destiny. Destiny ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকে, Character আসিয়া স্বইচ্ছায় সেখানে ধরা দেয়; Destiny লোভ দেখাইয়া হাতছানি দিয়া ডাকে, Character দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যায়। Destinyর ক্রূর অট্টহাসি দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলিয়া রি রি করিতে থাকে। কিন্তু Character যদি নির্লোভ হয় তাহা হইলে Destiny অনেক সময় তাহাকে বাগে আনিতে পারে না। যেমন ধরুন "Mackbeth" নাটকের Macbeth ও Banquo. Witch রা দুইজনকেই উত্তেজিত করিয়াছিল; কিন্তু Macbeth সহজেই উত্তেজিত হইলেন, আর Banquo (পরে অবশ্য যাহাই হউক) অত সহজে ধরা পড়িলেন না তাহা হইলেই দেখি,

মানুষের জীবনে ট্র্যাজিডি ঘটিতে হইলে এই দুইটি জিনিষেরই প্রয়োজন—একটির অভাব যেখানে সেখানে ট্র্যাজিডির সুযোগ নাই। আমার মনে হয়, মধুসূদন এখানে বৈদেশিক ক্লাসিক্যাল আদর্শই বজায় রাখিতে অনেকটা চেষ্টা করিয়াছেন।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার আছে: Macbeth Duncanকে হত্যা করিয়াছিলেন, রাবণও সীতা হরণ করিয়াছিলেন। মাত্র এই জন্যই কি তাঁহাদের জীবনে ট্র্যাজিডি ঘটিয়া গেল? না; কারণ Duncan হত্যাই Macbeth এর প্রথম নরহত্যা নহে; লক্ষ লক্ষ নরহত্যা Macbeth করিয়াছেন, কারণ তিনি যোদ্ধা। তেমনি সীতাহরণই রাবণের প্রথম নারীহরণ নহে; অসংখ্য নারীহরণ তিনি ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছেন; কারণ তিনি লম্পট। Duncan হত্যার ফলে যে বিশেষ বিশেষ ঘটনার উদ্ভব হয়, তাহাদের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলেই Macbeth এর ট্র্যাজিডি ঘটিয়াছে। রাবণের ক্ষেত্রেও তাই। সীতা অপহরণের ফলে দৈবী ও মানুষী শক্তির সমবায়ে রাবণের বিরুদ্ধে যে ঘটনাবলীর সৃষ্টি করিয়া বসে। রাবণের ট্র্যাজিক-জীবন-নাট্যের তাহাই প্রস্তাবনা। কিন্তু প্রকৃত ট্র্যাজিডি ঘটিয়াছে তাহার অনেক পরে। ইহা তাঁহার শৌর্য্যের ইতিহাস, ইহা তাঁহার বীর্য্যের ইতিহাস, ইহা তাঁহার পরাজয়ের ইতিহাস। রাবণ যদি কাপুরুষ হইতেন তাহা হইলে এ ট্র্যাজিডি ঘটিত না।

এইখানে একটা অবান্তর প্রশ্ন উঠিতে পারে: রাবণ বধ না হইলে যখন সীতার উদ্ধার সম্ভব ছিল না, তখন প্রথমেই রাবণের মৃত্যু হইলে সীতা উদ্ধারও সহজ হইয়া পড়িত—রাক্ষসবংশও ধ্বংস হইত না। রামায়ণকার কি ভাবিয়াছিলেন তাহা ভাবিবার অবসর আমার নাই; হয়তো সমস্ত অনার্য্যদিগকে আর্য্যপদানত করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল, হয়তো লঙ্কার রাক্ষস জীবিত থাকিতে দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের সুযোগ ও সুবিধা ছিল না হয়তো অন্য কিছু। কিন্তু আমার মনে হয়, পূর্ব্বাহ্নেই রাবণবধ সমাধা হইলে ট্র্যাজিক আর্টের দিক দিয়া ইহার মূল্য কিছুই থাকিত না। কারণ, গোটা লঙ্কাকাণ্ডটারই প্রতিচ্ছবি পাই রাবণের অন্তর্লোকে। লঙ্কার বুকের উপর সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র জুড়িয়া যে একটা বিরাট বিভীষিকা সুবৃহৎ মাংসাশী পক্ষীর মত রহস্যময় ডানা বিস্তার করিয়া শ্যেনদৃষ্টিতে লঙ্কার পানে চাহিয়া থাকিত, সেই ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি রাবণের চতুর্দ্দিকে প্রেতাত্মার মতই ঘুরিয়া বেড়াইত। রাবণকে বুঝিতে গেলে তাই লঙ্কাকাণ্ডটি আগাগোড়া পড়িতে হইবে। রাবণের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও রসবোধ মর্ম্মভেদী হাহাকারে পর্য্যবসিত হইয়াছে এইখানে; রাবণের শিক্ষা দীক্ষা, মহিমার চরম বিকাশ এইখানে; রাবণের মনুষ্যত্ব এইখানে; রাবণের বীরত্ব এইখানে; জীবনে জীবনে অশ্রুপাতেরও যে প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা রাবণ প্রথম বুঝিলেন এইখানে। এককথায় রাবণের রাবণত্ব এইখানে। লক্ষ লক্ষ রাজভক্ত সৈন্যেরা যে যুদ্ধে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছে—লক্ষ লক্ষ ঘরে-ঘরে যে আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হইতেছে—তাহাদের ব্যথা ও বেদনা একসঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে রাবণের মধ্যে। কি ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা ও অবসাদ লইয়া রাবণ তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে চলিয়া পড়িলেন। ট্র্যাজিডির বিভীষিকা তো এইখানেই "মেঘনাদবধে" রাবণের মৃত্যু হয় নাই বলিয়াই রাবণ আমাদের এত সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। তা'ছাড়া, জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাসই যদি ট্র্যাজিডির বিশেষত্ব হয়, তাহা হইলে একমাত্র শারীরিক মৃত্যুটাকেই বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। ট্র্যাজিডি ঘটিতে হইলে জীবনে দীর্ঘতা আবশ্যক; জীবনের প্রাণময় অংশের সহিত আমাদের দীর্ঘ পরিচয় না হইলে—জীবনের ব্যর্থতা বুঝিবার অবসর কোথায়? সেইজন্য হঠাৎ—মৃত্যু কোন উচ্চাঙ্গ ট্র্যাজিডির পরিপুষ্টি সাধন করে না। "মেঘনাদবধকে" আমি একটি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিডি বলিয়াই মনে করি, কারণ, ইহা ঐরূপ কোন হঠকারিতার প্রশ্রয় দেয় নাই; দিলে উহা আর্টের দিক দিয়া ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আর একটা কথা: মানুষের মৃত্যুর পূর্ব্বে অশরীরী আত্মারা নাকি হাওয়ার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষের চিরন্তন সংস্কার এই। আমাদের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা অনেক কিছুই দেখিতে পাই না। মাঝে মাঝে সেই অদৃশ্য জগত ক্ষণিকের মতই আমাদের চক্ষে ধরা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। আমাদের শক্তি নাই যে, আমরা তাহাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করি। মাঝে মাঝে মনের বিকৃতির জন্যই হয়তো আমাদের মনে হয়, অদৃশ্য জগতের সুর আমাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে। সে-সুরে মোহ নাই, কিন্তু আকর্ষণ আছে; অস্তিত্ব নাই কিন্তু বিভীষিকা আছে; আশা নাই কিন্তু ব্যাকুলতা আছে। মানুষের চিরন্তন মনোবৃত্তি সে-সুর শুনিয়া মুচড়াইয়া পড়ে! অনাগত একটা বিপদের ছায়াপাত সে-সুরের মধ্যে ধরা পড়ে। আমাদের হাসিকান্নায় ভরা পৃথিবীতে যাহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই কি অদৃশ্য জগতে এই রহস্যময় সুর বাজিয়া উঠে? এ-সুর কি চিরন্তন, না, সাময়িক? এ-সুর কি সার্ব্বজনীন, না, কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য? ঠিক জানি না, তবে এইটুকু জানি যে; ওই সুর সকলের নিকট সব সময়েই ধরা পড়ে না। এ-সুর ধরা পড়ে তাহারই নিকট, যাহার কোন প্রিয়বন্ধু পৃথিবীর দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া পরলোকের দিকে যাত্রা করিয়াছে! হয়তো উহার বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই, হয়তো উহা স্নেহান্ধ মস্তিষ্কের বিকৃত কল্পনা মাত্র। যাহাই হউক, মধুসূদন এইখানে এইরূপ একটি রহস্যময় সুর আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। মেঘনাদ প্রমীলাকে ছাড়িয়া লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন! ইচ্ছা ছিল, রামানুজকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়া প্রিয়তমার মন্দিরে সেই দিনই ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্নেহান্ধ পিতা নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ না করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে দিলেন না। অগত্যা মেঘনাদকে থাকিয়া যাইতে হইল। এইদিকে প্রমীলা আকুল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অদৃষ্ট নিয়তি যে তাহার ভাগ্যে কি লিখিয়া রাখিয়াছে পতিপ্রাণা তাহা জানিত না। কিন্তু অদৃশ্য জগতের রহস্যময় সুর তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সূর্য্যমুখীপুষ্পের দুঃখে দুঃখিত হইয়া দানববালা কাতর স্বরে বলিল:

যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ অস্তাচলে আচ্ছন্ন সে। তিনি।

আর কি পাইব আমি (উষার প্রাসাদে)
পাইবি যেমতি, সতি, তুই প্রাণেশ্বরে ?

নিজের অজ্ঞাতসারে প্রমীলা সত্য কথাই বলিয়া ফেলিল, সত্যই মেঘনাদসূর্য্য জীবনের পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে—সত্যই পৃথিবীতে তাহার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। ইহাই তো tregic ivory তারপর বিরহ-বিধুরা প্রমীলা রক্ষসৈন্য তুচ্ছ করিয়া প্রিয়তমের নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু অব্যক্ত সে-স্বর তাহার কানের কাছে বাজিতে লাগিল। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের মৃত্যু হইল। তখনও সে-সংবাদ প্রমীলার নিকট আসে নাই; কিন্তু প্রমীলার অন্তঃকরণ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। মনে হইল, চারিদিকে যেন কাহারা হায় হায় করিয়া কাঁদিতেছে। একটা বিষন্ন অনুভূতি তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। বাসন্তীকে সম্বোধন করিয়া তাই প্রমীলা বলিল :

……কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার ? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনেছি
রোদন-নিনাদ দূরে হাহাকার ধ্বনি ?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত ;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ ! না জানি, স্বজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে ?

আমি মনে করি না যে, দূরে ঐ সময় রক্ষোবালাদের ক্রন্দনধ্বনি উঠিয়াছিল। আমার মনে হয়, ঐরূপ কোন ক্রন্দনের ভ্রম হইয়াছে প্রমীলার মানসলোকেই। প্রমীলার যে এত বড় একটা ক্ষতি হইয়াছে, এ-সংবাদ প্রমীলার আগে কে জানিবে ? অদৃশ্য রহস্যময় সুর সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, লক্ষ্মণের হস্তে ইন্দ্রজিতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে

……যথায় বসি হৈমসিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুর পতি ; সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি,
সশব্দ লঙ্কেশ পুর স্মরিলা শঙ্করে।
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী (প্রমীলা)
মুছিলা সিন্দুর বিন্দু সুন্দর ললাটে !
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে।

ইন্দ্রজিতের পতনে আর কাহারও তো কিছু হইল না। যাঁহারা ইন্দ্রজিতের প্রিয় বা ইন্দ্রজিত যাঁহাদের প্রিয় তাঁহারাই নিজেদের অজ্ঞাতসারে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কেন এমন হয় জানি না, কিন্তু এইরূপ একটি আবহাওয়ার মাধুর্য্যের আতঙ্ক অনেক বাড়িয়া উঠে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাজিডটির গভীরতা অনেক বাড়িয়া যায়।

অস্বাভাবিক মৃত্যু কোন দিনই মানুষের সমর্থন পায় নাই—এমন কি, প্রকৃতিরও নয়। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদ-হত্যা সমাপ্ত হইল। কিন্তু হত্যা চিরদিনই অস্বাভাবিক। তাই মেঘনাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বময় অস্বাভাবিক ঘটনার আবর্ত্ত ঘটিয়া গেল। বসুন্ধরা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, বিশ্বে এক প্রচণ্ড গর্জ্জনধ্বনি উঠিয়া আকাশে ছড়াইয়া পড়িল; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের অধিবাসীরা সে ধ্বনি শুনিয়া প্রমাদ গণিল; মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুরা কাঁদিয়া উঠিল। বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুব্ধ হইয়া সমস্ত বিশ্বটা যেন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বিশ্বাস নাই, বিশ্বাস নাই, আত্মীয়কে বিশ্বাস নাই, স্বজনকে বিশ্বাস নাই, শত্রুকে বিশ্বাস নাই, মিত্রকে বিশ্বাস নাই, দেবতাকে বিশ্বাস নাই, দানবকে বিশ্বাস নাই। মধুসূদন এইখানে নিজেকে একজন বড় artist বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাই যে তিনি লেখনীর কয়েকটি মাত্র আঁচড়েই এক অস্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করিয়া অস্বাভাবিক হত্যার বিভীষিকাকে কি সুনিপুণ ভাবেই না সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃতির এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা (Nature in the back ground) ট্র্যাজিডির বিভীষিকাকে অনেক বাড়াইয়া দিয়াছে, সন্দেহ নাই।

আর একটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমি এই প্রবন্ধের শেষ করিব। "মেঘনাদবধের" মধ্যে দুইটি পরস্পর-বিরোধী রসের সংমিশ্রণ হইয়াছে। একটি বীররস, আর একটি করুণ রস। যাহার ছন্দে ছন্দে ধনুর্ব্বের টঙ্কার, বজ্রের হুঙ্কার ও অসির ঝঙ্কার শ্রুত হয়—তাহারই মধ্যে মধ্যে কি হৃদয়-বিদারক করুণ রস যত্নের মতই আত্মগোপন করিয়া আছে। আমার মনে হয়, এক এক স্থানে করুণ রস এত বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, তাহা বীর রসকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। রাবণের যে মর্ম্মভেদী হাহাকারের সহিত ইহার সূচনা হইয়াছে—সেই হাহাকার যে শেষ পর্য্যন্ত কত করুণ হইয়াছে, তাহা কোন পাঠককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। পাঠক, একবার শেষদৃশ্যে যাই চলুন। ভারে ভারে চন্দন-কাষ্ঠ চলিয়াছে। ভারে ভারে ঘৃত চলিয়াছে। দক্ষিণদুয়ার খুলিয়া ধীরে ধীরে শবযাত্রীরা সাগরতীরে উপস্থিত হইল। ভূপাতিত কিংশুকপুষ্পসদৃশ সর্ব্বনিহত মেঘনাদকে চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। তাহার পার্শ্বে প্রমীলা—সদ্য বিধবার বেশ। এ সেই প্রমীলা—পূর্ব্বদিন রজনীতে যে রাক্ষসৈন্য তুচ্ছ করিয়া স্বামি সম্ভাষণে আসিয়াছিল, এ সেই প্রমীলা, যাহার বীরাঙ্গনা-মূর্ত্তি দেখিয়া রামচন্দ্রেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল। বিধাতার কি পরিহাস! যে মেঘনাদ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালের বুকের উপর দিয়া নিষ্ঠুর শমনের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেন, নিয়তির এক দুর্বিজ্ঞের ক্রোধাগ্নিতে আজ তিনি ভস্মীভূত। আর ঐ যে নীরব চিত্র-পুত্তলিকার মত নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রাবণ ? ইনি কি সেই রাবণ যিনি ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেন ? না। ইনি কি সেই রাবণ যিনি সীতা হরণ করিয়া চরিত্রহীনতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ? না। ইহার বাহির আজ স্তব্ধ—কারণ ভিতরে অসহ্য জ্বালা টগবগ করিয়া ফুটিয়া চলিয়াছে। ইহার অঙ্গার সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে—বাকি রহিয়াছে শুধু পাকা সোনাটুকু, ট্র্যাজিডির সান্ত্বনা তো এই।

চিতা নির্ব্বাপিতপ্রায়। শেষ রশ্মি বক্ষেরা দুগ্ধ দিয়া নিবাইয়া দিল। কিন্তু রাবণের বুকের মধ্যে যে চিতা জ্বলিয়াছে তাহার শান্তি হইবে কিসে ? জীবনে তাঁহার ব্যথার পরিমাপ করিবে কে ? যাহারা মরিয়া গেল তাহারা তো মরিয়াই খালাস—সান্ত্বনা

তাহাদের একটা আছে; কিন্তু রাবণের সান্ত্বনা কি? বিশ্বে সবাই তাঁহাকে জানিয়া রাখিল পরম অধার্ম্মিক ও লম্পট-শিরোমণি বলিয়া। কিন্তু এই কি রাবণের শেষ পরিচয়? তিলে তিলে তুষের আগুনে পুড়িয়া মরিবার যে বীরত্ব তাহার জন্য বিশ্ব কি তাঁহাকে কোন পুরস্কারই দিবে না? তিনি জীবনে যে ভুল করিয়াছিলেন তাহাই যথেষ্ট হইল; আর যে অদ্ভুত শৌর্য্য, বীর্য, মমতা, হাহাকার ও নিরাশা লইয়া তিনি মৃত্যুর সময়েও এক বিন্দু সান্ত্বনা পাইলেন না—তাহার দাম কি এতই তুচ্ছ? ভুল করে না কে? রাবণও না-হয় একটা ভুল করিয়াছিলেন। মানুষ ভুল করিয়া জীবনের রথচক্র একবার যে পথে চালাইয়া দেয়—সম্মুখে শত বিপদ দেখিলেও কোন কোন সময়ে অনেক শক্ত সারথিও তাহাকে থামাইতে পারে না। চলিতে চলিতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে তাহা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে চলিয়া পড়ে। এক অদৃশ্য উপহাস তাহার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করিয়া দেয়। রাবণেরও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার জন্য রামায়ণকার এতটুকু সহানুভূতি দেখান নাই। মধুসূদন তাহা দেখাইয়াছেন। মানুষ মানুষের ব্যর্থতায় অনেক শিক্ষা লাভ করে। যে পথে একজন প্রাণপাত করে সে পথে মানুষে ভয়ে যাইতে চাহে না। আবার মানুষই মানুষের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করে। এই "Pity" এবং "Fear" classical ট্র্যাজিডির মূলতত্ত্ব বর্ত্তমান রামায়ণকার রাবণ-চরিত্রে "Fear" আনিয়াছেন, সেখানে "Pity"র স্থান নাই; মধুসূদনে তাহা আছে। জগতে অবশ্য poetic justice পাওয়া ভার, কিন্তু মধুসূদন অসামান্য সহানুভূতি দিয়া তাহা পূরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার হৃদয়ের প্রসংসা করি। মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতাভস্ম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাই আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়:—

"বলো শান্তি, বলো শান্তি দেহ-সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই।"

আমি তাহাদের কবি

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

নমি আজ নতশির হে ঈশ্বর স্রষ্টা জগতের
যবে বুঝি স্বর্গ নয় কবিতার এ-মর্ত্ত্য-ভবন,
মিথ্যার আবর্ত্তে ভুলি' দু আঁখিতে জড়ানো স্বপন,—
কল্পনার ইন্দ্রধনু রচনায় মুদিত চোখের
কোন দাম আছে তার?—অনুভূতি ইন্দু-পরশের?
পৃথিবীতে আসিয়াছি—দুরু দুরু পরাণ স্পন্দন—
ক্ষণিক চেতনা-বহ্নি; সঙ্গে ল'য়ে কর্ম্ম অনুক্ষণ
সেবিতে মানবে শুধু—স্নেহ-তীর্থ অলকানন্দের।

শিয়রে মুমূর্ষু জাতি, যারা কাঁদে পথের ধূলায়,
দুঃখে ও দারিদ্র্য-বিষে একে একে বিনিঃশেষ প্রাণ,
তাহাদের কবি আমি,—তাহাদের অশ্রু মোর গান,—
সহস্র বুভুক্ষু শ্বাস ছন্দ হ'য়ে কাঁদে কবিতায়।

সে মৃত্তিকা স্পর্শ করি' রহিলাম লক্ষ নমস্কার
যার বুকে মৃত বহ্নি লক্ষ-পুত্র দেশ-মাতৃকার।

রাবণায়ন

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

বৃদ্ধা মা আর দ্বাদশী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চানন বিশ্বাস ওরফে পাঁচু এসে শিয়ালদায় নামলো। তিনজনেরই মলিন শুকনো চেহারা, পরণে জীর্ণ বস্ত্র। হারাণীর হাতে কাপড় আর কাঁথার একটা পুঁটলি আর পাঁচুর নিজের হাতে ছেঁড়া চট দিয়ে বাঁধা গুটি কয়েক থালা-বাসন। টিকিট তিনটে দিয়ে বৌকে পেছনে নিয়ে মার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এলো পাঁচু।

ভিড়, কত রকমের গাড়ি, বাড়ি আর কোলাহল! এই কলকাতা। ভয়ে বিস্ময়ে প্রভাতের কলকাতার দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা।

দুটো কুলি এসে দাঁড়ালো, এ-এ, কোথা যাবে? মাল দুটো দাও, পৌঁছে দিব।

পাঁচু কিছু না ভেবেই বলে ফেললো, কত নেবে?

লোক চেনে কুলিরা; জবাব দিলে, তোমার থেকে আর কোত্তো লিব। যাও, দেড় টাকা দিও।—বলেই দু'জনে দুটো পুঁটলি ধরে টান দেয়।

পাঁচু গর্জ্জে ওঠে, এই, ছাড়ো পুঁটলি।

লোক দুটো সরে দাঁড়ায়, হারাণীর পুঁটলিটা ধরে যে টান দিয়েছিল সে লোকটা সরে আগে। পাঁচুর দীর্ঘ দেহ আর বিশাল বক্ষপট দেখে ভাবে, শালার আওয়াজ বটে!

ষ্টেশন এলাকার বাইরে এসে ফুটপাথে দাঁড়ালো ওরা। কোথায় যাওয়া যায় এখন? জানাশোনা লোক নেই। সেবার ছিদাম ওরা এসেছিল। এবারও ছিদাম এসেছে তার ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু ওরা কোথায় আছে, কে জানে? সেবার পাঁচু কিছুতেই আসে নি। আট বছরের হারাণী আর বুড়ো মাকে নিয়ে সে কী মুশ্‌কিল। সোনাগড় থেকে সদর হয়ে শান্তিকুটী পর্য্যন্ত পাঁচু ছোটাছুটি করেছিল ক্রমান্বয়ে চার মাস। পিঠের ওপর থেকে মাকে একবার নামিয়ে হারাণীকে নেয়, আবার দু' মাইল গিয়েই হারাণীকে নামিয়ে মাকে নেয়। সেই বীভৎস দিনের বীভৎসতর দৃশ্যগুলোকে মনে ক'রে পাঁচু বহুদিন পরে আর একবার শিউরে ওঠে। ছিদাম কয়েক মাস পরে ফিরেছিল বটে, তবে সঙ্গে তার বাপ ছিল না, খুইয়ে এসেছিল কলকাতার রাস্তায়। সেই কলকাতা।

মা জিজ্ঞেস করলো, যাবি কোথা রে? এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ত চলবে না।

মুড়ি-গুড় পাওয়া যায় না এখানে?—পাঁচুর কানেকানে শুধালো হারাণী, বড় ক্ষিদে পেয়ে গেল।

ট্যাঁক থেকে থলিটা বার করে খুললো পাঁচু—এক টাকা তের পয়সা। এতে—থাক, এখন ত চলবে। ভাবলো পাঁচু।

গাড়িঘোড়ার বিপদ বাঁচিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে হ্যারিসন রোড ধরে চললো ওরা। কিছুদূরে যেতেই বাঁ দিকে পাওয়া গেলো একটা মুদির দোকান। আশ্চর্য্য।

গুড় নেই দোকানে। চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি হাতে নিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলো পাঁচু।

বললে, এই ক'টি? এতে যে একজনেরও পেট ভরবে না। নতুন লোক দেখে ঠকাচ্ছ না ত দোকানী?

ও, কলকাতায় বুঝি এই প্রথম এলে? তা, পোঁটলা-পুঁটলির বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে।—হেসে উঠলো দোকানী।

হারাণী অলক্ষ্যে পাঁচুর হাত ধরে টান দিলে। এগিয়ে চললো ওরা।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে নজর পড়লো ওদের। এখানে ওখানে সবুজ ঘাসের রঙ দেখে পুলকিত হলো ওরা।

বুড়ী বললে, আয় রে, একটু জিরিয়ে নিই।

এর মধ্যেই এলিয়ে পড়লে মা!—মৃদু হাসলো পাঁচু, হারাণীও যোগ দিলে।

না রে বাপু, না। ওই ঘাস দেখে আমাদের সোনাগড়ের কথা মনে পড়লো।

সবুজ, শুধু সবুজ ক্ষেত, মাঠ, গাছপালা, গ্রাম, কুঁড়েঘর, কালী-খাল, একদিন হেঁটে গেলেই সমুদ্রের মোহানা। আর, এখানে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। চারধারে ছোটবড় বাড়ি, ছোটবড় মানুষ, ছোটবড় চালচলন। কিছুটা বোঝে ওরা, কিছুটা বোঝে না। পার্কে বসে দেখে আর দেখে।

রাজার জায়গা কলকাতায় খাবার, চাকরি আর সুখশান্তি সব পাওয়া যায়, সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলে বসে পাঁচু তাই শুনে চিরকাল। কিন্তু সারাদিন ঘুরে ঘুরে সে পেলো না কিছুই বাবুদের কেউ পাঁচুকে কেউ-বা পাঁচু আর তার বৌ চায়। কিন্তু বুড়ীকে কেউ রাখতে চায় না। বুড়ী মুখ ফুটে একজনকে বলছিল, 'আমিও অনেক কাজ পারব বাবু, আপনি দেখুন না কেন।' বাবুটি হয়ত তাঁর গিন্নীই তাকে বারণ করলে, 'না-না তিনজ কোত্থেকে।' গাড়ি চালিয়ে তারা চলে গেলো পয়সা বা ভাত-তরকারী দিতে চেয়েছিল অনেকে, বুকের ছাতির দিকে তাকিয়ে ভেবেছে—সে কি এসেছে? দেশে চাষবাস করে খাবার অন্ততঃ তার না, কুঁড়েঘরও দু'খানা ছিল। আজ অদৃষ্টগতিকে—কে সর্ব্বনাশ আনলে?—কাজের বদলে খাওয়া-পরা চায় পাঁচু, চায় না। কিন্তু—ছিদাম মণ্ডলেরও ত সারাদিনে খোঁজ পা গেলো না। এদিকে পয়সাও—উঃ, একদিনে আট আনা পয়সা খরচ হয়ে গেলো? মা ঠিকই বলেছিল, 'দক্ষিণ সহর বাবা, একেবারে রাক্ষস, খালি গিলছে আর গিলছেই।' হেসে উঠলো পাঁচু।

হাসিস কেন রে পাগলের মত?—ও-পাশ থেকে মা বলে ওঠে।

কী বলেছিলে মা, 'দত্যি শহর ?'

হ্যাঁ, ভাখ্ না, এদিক থেকে হুউস্ করে একটা গাড়ি, ওদিক থেকে হুউস্ করে একটা—

হারাণী যোগ দেয়, লোকেদের চাউনিও তাই। চেয়ে-চেয়ে যেন আর আশ মিটছে না কারু।—খল্‌খল্ করে হেসে ওঠে।

আঃ, হাসিস নি অত জোরে। এক্ষুণি তাড়িয়ে দেবে কেউ।—পাঁচু ধমক দেয়।

কলেজ-স্কোয়ারের পুবদিকের ফুটপাতে এসে একটা গ্যাস-পোষ্টের নীচে বসেছে ওরা। রাত ন'টা। এখনো লোকজনের চলাচল আছে রাস্তায়। ওরা বসে বসে দেখে আর ভাবে। সারাদিন তিন দফা মুড়ি-মুড়কি খেয়েও পেটটার যেন খিদে মিটে যাই। কলকাতার এসে পেটটাও দৈত্য হ'ল নাকি ?

রামায়ণটা বার করে একটু পড়না পাঁচু।—মা বললে।

লোকেরা যাচ্ছে-আসছে, এখন থাক্ মা।—পাঁচু বিড়ি ধরালো, এইটিই শেষ সম্বল ছিল।

আস্তে আস্তে পড়, ভাল লাগবে। দেখবি সব ভুলে যাবি।

কাঁথার পুটলিটা খুলে রামায়ণ বার করলো পাঁচু, পুরণো ময়লা একটা লাল শালু দিয়ে বাঁধা। খুললো। বইটা ততোধিক পুরানো, হয়ত দু'এক পুরুষ আগেকার, মলাট বলে কিছু নেই, কাগজগুলো লাল হ'য়ে গেছে, প্রথম দিকে কয়েকখানার পাতারও অভাব।

সেইখেনটা পড়্, যেখানে মা জানকী ভিক্ষে দিচ্ছেন, রাবণ-রাজা সন্নেসী ভিকিরি সেজে এসেছেন, সেইখেনটা।

না-না, তারও আগে, যেখানে কুঁড়ে বেঁধে—

থাম্ ত' তুই হারাণী, বড় ট্যাকট্যাক করিস্ তুই।—শাশুড়ী ...য় বৌকে।

...ান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে বই খোলে পাঁচু, তারপর ...সুর করে পড়তে আরম্ভ করে—

...নকালে শুনা যায় কুটীর বাহিরে।
...আছ গো, ভিক্ষা দাও এই অতিথিরে।
...মকি-ছুটিয়া আসে জনক-নন্দিনী।
...জিয়া দেখেন, হায়, নহে রঘুমণি।
...ক শুনিয়া তবে তণ্ডুল আনিয়া।
...মস্থতা ভিক্ষা দেন হাত বাড়াইয়া।
...বেশ খুলে ভিক্ষু-চক্ষের নিমেষে।
...তারে টানিয়া লয় নিজ স্কন্ধদেশে।
...মুহুর্ত্তে জানকী সতী হ'ন অচেতন।
অন্তরীক্ষে পলায়ন করে দশানন।

...সে-বসে ত সবাই আয়েস করছ; নজর রেখো, পুলিস মুখপোড়ারা আবার ধরে না নিয়ে যায়।—বলতে বলতে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক ওদের সামনে দিয়ে চলে যায়, পিছনে তিনচারটি উলংগ ছেলেমেয়ের সারি। পাঁচুদের মতই নিঃস্বজাতীয় ওরা।

পাঁচুর মা ডাক দেয়, শোন-না গো, ও মেয়ে।

ওরা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দ্রবা সোনার মত, চোরা বালির মত কলকাতা। যাদুকরী নর্ত্তকীর ছল-মরীচিকা এর সর্বাংগে মাখানো। আশা-নিরাশার সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে পাঁচু। এখানে যত জাঁকজমক যত ধনিত্ব, তত মলিনতা ততই দারিদ্র্য। পাঁচু বোঝবার চেষ্টা করে, ভাববার চেষ্টা করে।

দিনের বেলায় ঘুরে বেড়ায় মা-বৌকে সংগে নিয়ে। কোথাও ছেড়ে যেতে বা রেখে যেতে ভয় হয়, যদিই পুলিশের লরি এসে পড়ে। এ দু'দিন সে ত স্বচক্ষেই দেখেছে দু'তিনটি দলকে ধরে নিয়ে যেতে। মুশকিল হয়েছে মাকে নিয়ে। একেবারে ছুটতে পারে না, দিনদিনই যেন ভেঙে পড়ছে। ধমক দিতেও মায়া হয়, অথচ—হারাণী কিন্তু এখনো বেশ দৌড়াতে পারে।

তিনদিনের দিন এক টাকা তের পয়সা নিঃশেষ হ'ল। মা ঠিকই বলেছে, ভাবে পাঁচু, রাক্ষসী কলকাতাই বটে। আশা নেই, ভিক্ষে বুঝি এবার করতেই হ'ল। সোনাগড় ছেড়ে আসার সময় বুকের ছাতি চাপড়ে মা-বৌকে সে বলেছিল, 'এই শরীরটা যদ্দিন আছে, জানো, তোমরা না খেতে পেয়ে মরবে না।'

কই, কাজ ত এখানে অত সহজে পাওয়া যায় না, টাকা ত এখানে পথেঘাটে ছড়ানো নেই। হঠাৎ মনে পড়লো পাঁচুর, খুশী হলো সে, খুশী, এখনো বাসনগুলো আছে।

মা-বৌ কিছুতেই ছাড়বে না বাসন, পাঁচু ধমক দিলে, ফিরে গিয়ে আবার তোমাদের ঘর-সংসার পেতে দোব, ভয় নেই। দেখব তখন, কত বাসন চাও। এখন ত আগে বাঁচো।

বাসনগুলো বেচে চারটাকা সাড়ে পাঁচ আনা পাওয়া গেলো।

আরও তিনদিন গেলো। নাঃ, আশা নেই। তিনজনকে একসংগে ঠাঁই দিতে চায় না কেউ। এক টাকার মত এখনো কাছে আছে, চলবে আরও এক দিন। কিন্তু তার পরে ? আর ভাবতে পারে না পাঁচু।

মা বলে, রামায়ণটা বার কর পাঁচু।

ওই শিখছ তুমি,—পাঁচু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, রাত হলেই রামায়ণ। রামায়ণ পড়লেই পেট ভরবে!

হাঁ রে বাপু, তাই। রামায়ণ ভগবান্। সংগে সংগে রাখিস, কোন বিপদ হবে না। আমি ত রামায়ণ শুনলে খিদে-তেষ্টা ভুলে যাই।

আর, পড়তে বুঝি কষ্ট হয় না ?—রামায়ণটা খুলতে থাকে পাঁচু।

আহা মরে যাই,—মা বললে, কষ্ট আবার হবে না, সারাদিন —তা, আস্তে আস্তে পড়্।

মৃদুস্বরে পড়তে থাকে পাঁচু—

এতেক শুনিয়া তবে তণ্ডুল আনিয়া।
ভূমিসুতা ভিক্ষা দেন হাত বাড়াইয়া।
ছদ্মবেশ খুলে ভিক্ষু চক্ষের নিমেষে।
সীতারে টানিয়া লয় নিজ স্কন্ধদেশে।
মুহূর্ত্তে জানকী সতী হন অচেতন।
অন্তরীক্ষে পলায়ন—

হঠাৎ জোর একটা আওয়াজ হতেই চমকে উঠে তাকালো পাঁচু। দূরে একটা মোটরের টায়ার ফাটার আওয়াজ হয়েছিল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেও পাঁচু বুঝতে পারলো না ব্যাপারটা।

আবার পড়া শুরু করতে যাবে, এমন সময় তার খেয়াল হলো, হারাণী নেই সেখানে। তাকালো। এদিক-ওদিক চাইতেই তার নজরে পড়লো, দীঘিতে ঢোকবার দরজার কাছে অন্ধকারে ফর্সা কাপড়জামা-পরা একটা লোক হারাণীর হাতে কী একটা দিয়ে চলে গেলো।

পাঁচু লাফিয়ে উঠে হারাণীর কাছে গিয়ে কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলে, কি দিলে, দেখি?

হারাণী ভয়ে মুঠো করে রইলো ডান হাতটা, পাঁচু তার বজ্রমুষ্টির চাপ দিতেই 'উঃ বাবা রে' বলে মুঠোটা খুলে ফেললে হারাণী। একটা আনি!

আনিটা নিয়ে সেই হাতেই হারাণীর চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে পাঁচু বললে, দেখো মা, হারামজাদীর কাণ্ড। ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছে। কেন, আমার কাছে যা আছে এখনো ত—

তোর সাশ্রয় হবে বলেই—আহা, ওরকম করে চুল ধরে—

চুপ করো।—পাঁচু চীৎকার করে উঠলো।

হারাণী বসে বসে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলো।

...কুকুরের ডাকে গভীর রাতে সহসা ঘুম ভেঙে গেলো পাঁচুর। বুকটা ধড়ফড় করতে লাগলো তার। কিছুক্ষণ কেটে গেলো। মনে পড়লো, আজ খবর পেয়েছে একটা দলের কাছ থেকে, সায়েবপাড়ায় হোটেলের সামনে নাকি—ছিঃ, মনটাকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগলো সে। এখানেও চাঁদ আছে আকাশে নজর পড়লো তার। ভাল লাগলো না, এ যেন অন্য একটা চাঁদ, সোনাগড়ের চাঁদ নয়। এ কি, হারাণী কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে তার বুকের কাছে। মার ওপাশেই সে বরাবর শোয়, আজও শুয়েছিল। হারাণীর রুক্ষ চুলগুলোতে হাত বুলোতে বুলোতে তার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো পাঁচু।

ভিক্ষে করারও একটা কৌশল আছে, সুযোগ আর দাতার মন বুঝে উপযুক্ত ভাবভঙ্গি উপযুক্ত ভাষায় আবেদন-নিবেদন করা চাই। এ ব্যাপারে পাঁচুরা রপ্ত হ'তে পারে নি এখনো। তবু মন্দ পাওয়া যায় না। তিনজনে মিলে দিনে এক টাকা দেড় টাকা ত' খুবই। রক্তের স্বাদ পেলো ওরা।

মাটির হাঁড়ি আর গোটা কয়েক পাত্র যোগাড় করলো। পথে ঘাটে পার্কে ইটের ওপর রেঁধে খাওয়া-দাওয়াটা মন্দ চলে না অসুবিধে রাত্রে। নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায় না। কে কখন কোথা থেকে এসে ধরে নিয়ে যাবে, কে জানে। নিরাপদ জায়গা পেলে তবেই ঘুমোনো যায় ভাল করে। নইলে—

অতো খেয়ো না মা, অসুখ হয়ে মরবে নাকি।—বললে পাঁচু

চালডালে মেশানো, তাও পেট ভরে খাব না?

এ রকম করে চলবে না বাপু। হারাণী এক গ্রাস মুখে দিতে দিতে বললে, রান্নায় বড় হাঙ্গাম।

তা ছাড়া, হাঁড়িকুড়ি সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘোরা। বুড়ী বললে।

তবে কি, আস্তাকুঁড় দিয়ে পেট ভরাবে নাকি।—বলে পাঁচু উঠে আঁচাতে গেলো জলের ধারে।

শীতান্ত ধূসর অন্ধকার রাত্রি তখন ঝিমঝিম করছে গঙ্গার ধারের উন্মুক্ত প্রান্তরে।

...কালকের প্রোগ্রামটা মনে মনে একবার ঠিক করে নিয়ে শুয়ে পড়লো পাঁচু। আজ আর তার মনেও পড়ে না, ভিক্ষে করার জন্যে এই সেদিনও হারাণীকে লাঞ্ছনা দিয়েছে সে, তারপর মা-বৌকে ফাঁকি দিয়ে নিজে আরম্ভ করে হাত পাততে, তারপর আস্তে আস্তে নিজেদের অজ্ঞাতসারে তিনজনেই শুরু করে বারোয়ারি ভিক্ষাবৃত্তি।

জায়গাটার নাম আজকাল জেনে গেছে ওরা, গোলদীঘি। বেশ লাগে, এর চারধারে কেমন যেন একটা ভাব মাখানো, অভাবটা ক্যান্সার রোগের মত ক্ষণিকের জন্যে চাপা পড়ে, ভুলে যাওয়া যায়। অস্থাবর সম্পত্তি যা ছিল সবই গেছে। সেদিন তাড়া করেছিল পুলিশে, হাঁড়িকুঁড়ি আর কাঁথা-কাপড়ের পুঁটলিটাকে ফেলে না ছুটলে নিশ্চয়ই ধরা পড়ত ওরা। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখে, হাঁড়িকুঁড়িগুলো ভেঙে পড়ে আছে, পুঁটলিটা নেই। পরের দিন অন্য একটা দলের হাতে পুঁটলিটা দেখতে পেয়েছিল ওরা, তুমুল ঝগড়া করেও আদায় করতে পারে নি। তাতে তিনজনেরই আর একখানা করে কাপড় ছিল, ছেঁড়া হলেও মাঝে মাঝে বদলানো চলত। কিন্তু আর চলে না, এ কাপড় পরা না-পড়া সমান। তা ছাড়া, কালো আর দুর্গন্ধ। শুধু ভালো বলা যায় রামায়ণটাকে, ওদের এখনকার একমাত্র সাথী, যেন সাথী হবার জন্যেই ছোট আর হাল্কা হয়েছিল বইটা। মনে মনে ধন্যবাদ জানায় পাঁচু।

এতেক শুনিয়া তবে তণ্ডুল আনিয়া।
ভূমিসুতা ভিক্ষা দেন হাত বাড়াইয়া॥

লোকেরা চিনে গেছে। ছাড়াছাড়ি হয়ে ভিক্ষে করে তিনজনে। তবু ভিক্ষে দেয় না, সহরে লোক বড্ড চলোক।

ছদ্মবেশ খুলে ভিক্ষু চক্ষের নিমেষে।
সীতারে টানিয়া লয় নিজ স্কন্ধদেশে॥

চাকরি খুঁজতে হবে। এতদিন মনেই ছিল না পাঁচুর। তা, শরীরও আর—

মুহূর্তে জানকী সতী হ'ন অচেতন।...

হঠাৎ একটা কড়মড় শব্দ কানে আসে। ওদিকের ফুটপাথে ডাস্টবিনের সামনে বসে কী একটা চিবোচ্ছে হারাণী। ছুটে যায় পাঁচু। হাড়, হাড় একটা! হারাণীর দু' কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। চিবোবার শক্তি নেই, তবু চেষ্টা করে, চোষে।

পাঁচুকে দেখে আর ভয় পায় না হারাণী, অন্য একটা হাড় তুলে নিয়ে সস্নেহে এগিয়ে দেয়, বলে ক্ষীণস্বরে, চিবিয়ে দেখো, বেশ ভালো।

কিসের হাড়?—স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে পাঁচু।

কে জানে!—উত্তর দেয় হারাণী। যেন মানুষের হাড় হলে আরও ভালো লাগত ওর!

মরবি যে মুখপুড়ী!

তা হলে ত বাঁচি।

হারাণীর বলার সঙ্গে সঙ্গেই টপ করে তার মুখ আর হাত থেকে হাড় দুটো ফেলে দেয় পাঁচু। তার পরেই কোলপাঁজা করে বৌকে তুলে নিয়ে এসে ঘুমন্ত মার পাশে শুইয়ে দেয়, নিজেও শুয়ে পড়ে পাশে। এক সময় টনটন্ করে উঠলো বাঁ হাত। রক্ত! হ্যাঁ. কোলে তুলে নেবার সময় বৌটা কামড়ে ধরেছিল বটে। রক্তটা মুছে ফেললো কাপড়ে।

...রাত তখন ক'টা, কে জানে। পাঁচুর ঘুম ভেঙে গেলো। বৌ মৃদু ধাক্কা দিচ্ছে তাকে।

কি গো? পাঁচু জিজ্ঞেস করলে।

জল, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

স্বর ভেঙে গেছে হারাণীর। চোখ দুটো বসে গেছে কোটরে। এ কি! উঃ, দুর্গন্ধও! চেয়ে দেখলো পাঁচু, চারধারে চালধোয়া জলের মত ধারা।

কতক্ষণ হয়েছে এ রকম?

এই আর একটু আগে থেকে। জল দাও, জল, বড় তেষ্টা।

আঁধার যে বড়, অমাবস্যে বোধ হয়। আচ্ছা এনে দিচ্ছি।

দু' হাতের অঞ্জলি দিয়ে জল এনে বৌকে পান করালো পাঁচু, মা যেমন শিশুকে স্তন পান করায়—ততখানি স্নেহে।

ভালো লাগছে? এবার একটু ঘুমোও। ও কিছু নয়, আপনা-আপনিই সেরে যাবে এখন। পেটটা একটু খারাপ হয়েছে খালি। বৌকে একটু সরিয়ে শুইয়ে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে পাঁচু।

...শেষরাতে খুব জোর একটা আওয়াজে ভেঙে যায় ওদের ঘুম। চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসে পাঁচু আর তার মা। দূরে একটা মোটরের সামনে একটা পুলিশ আর জুটি তিন-চার লোক গোলমাল আরম্ভ করেছে তখন।

নজরে পড়তেই ছুটে যায় পাঁচু আর বুড়ী। ডাষ্টবিনের সামনেই রাস্তার ওপরে পড়ে আছে হারাণীর মৃতদেহ, পেট ফেটে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে। 'মা গো' বলে চীৎকার ক'রে বুড়ী আছড়ে পড়লো মৃতদেহের ওপর। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে পাঁচু ছুটে গেলো মোটরটার কাছে। সুরেশ চালক, পাশে সুরেশের স্ত্রী। পুলিশটা মৃদু হেসে গাড়ির নম্বর টুকে নিলে। পাঁচুর পায়ের সামনে তখন দশটাকার একটা নোট পড়ে।

পুঁজিবাদের যন্ত্রদানব দারিদ্র্যের বুকের ওপর দিয়ে চলে যায়। আনমনে নোটটা তুলে নিয়ে পাঁচু গাড়িটার দিকে ভয়-ভক্তি-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

চারদিকটা কেমন খালিখালি লাগে পাঁচুর। দু' হাতে দুটো শাদা শাঁখা, বাঁ হাতে নোয়া, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আর গলার কাছে সেই তিলটা। আর নেই! দু' বছর ধরে একসঙ্গে ছিল, আজ বুকটা খাঁ খাঁ করে বৈকি। শেষের দিকে কয়েকদিন সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না। একদিন রাস্তার এক জায়গায় অনেক পড়ে ছিল। হারাণী তাই খানিকটা তুলে নিয়ে সিঁথিতে লাগায়। ঠাট্টা করেছিলো পাঁচু, হারাণীর ফ্যাকাশে গাল দুটো একটু লাল হয়ে উঠেছিল। আজ সেই হারাণী নেই। শেষ দিনে মরার কথায় হারাণীর সেই উত্তর 'তা হলে ত বাঁচি' কানে বাজে পাঁচুর। কেন এমন হয়? কোথায় হারালো হারাণী, কেনই-বা হারালো?

আর পারি না রে পেঁচো, মা বললে।

এই ত এসে গেছি সায়েবপাড়া। হোটেলের সামনে কত মাছমাংস ফেলে দেয় ওরা। এ কি ভেতো বাঙালী পেয়েছ।

না রে, আর পারি না।

ওঠো ওঠো,—পাঁচু ধরে ফেলে, এখানে কোথায় বসছ, নর্দমা যে।

আমি তা হলে ফুটপাথের ওই কোণটায় বসি। তুই ঘুরে আয়।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে পাঁচু রওনা হয়।

...ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে দেখে, মা নেই। পাশের পানবিড়ির দোকানে খবর নিয়ে জানলো, সরকারি লরি এসে তুলে নিয়ে গেছে। যাক্, সব চুকলো। হাতের কাগজের মোড়কটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় পাঁচু, মাছমাংসের কাঁটাকুটো আর আধখানা পাঁউরুটি ছড়িয়ে পড়ে। আবার অনির্দ্দেশের পথে পা বাড়ায় সে। বগলের লাল শালুবাঁধা রামায়ণটা তার দিকে চেয়ে হাসছে নাকি?

ভালো লাগে না কিছু। পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে আগে একটা মোহ ছিল। অনেক কিছু দেখা যায়—লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, গানবাজনা—আরও কত কী। কিন্তু দু'একজন সংগী না থাকলে,—কাল একটা মেয়ে কমবয়সী হবে, পিছু নিয়েছিল পাঁচুর। অনেক কষ্টে পাঁচু তাকে এড়াতে পেরেছিল। পথ চলতে চলতে শেষরাতের সেই স্বপ্নটার কথাও মনে পড়লো। তারা ফিরে গেছে গ্রামে, দল বেঁধে দাঁড়িয়েছে, তাদের জমিজায়গা, তাদের ঘরদোর দখল করতে দেবে না কাউকে, তা সে যেই হোক। গোলদীঘির কথা মনে পড়লে। বেশ জায়গাটা। বড় ক্ষিদে পেয়ে গেছে আজ, একটু ঘুরেই আবার গিয়ে বসবে গোলদীঘির পূর্ব্বদিকে সেই গাড়ীবারান্দাটার নীচে।

বড্ড বড় বাড়িটা। ঢুকবে? লোকজন কোথায়?

সাহস করে ঢুকলো। পাশেই বড় বড় সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ডাকলো, দুটি খেতে পাই মা, মা গো।

কে?—নারীকণ্ঠের আওয়াজ এলো।

দুটি ভাত মা, বড় ক্ষিদে।

ভাত পাব কোথায়? দাঁড়াও। একটু পরেই এক মুঠো চাল নিয়ে নেমে এলো একটি মহিলা।

কে? স্মরণ করতে পারছে না পাঁচু। কিন্তু রামায়ণটাকে ভালো করে বগলে চেপে ধরে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে।

আঁচল পাত আঁচল পাত। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? মহিলাটি বলে।

পাঁচুর মনে পড়লো (এই একটু আগেই পড়েছে সে) 'অন্তরীক্ষে পলায়ন করে দশানন।' এই চাপা দিয়েছিল না? চোখের নিমিষে মহিলাটির মুঠো করা হাতটাকে ধরে সজোরে টান দেয় পাঁচু। চীৎকার করে ওঠে মহিলাটি। পলাতে গিয়ে সদর দরজায় হোঁচট খেয়ে ছিটকে ফুটপাথের ওপর পড়ে যায় পাঁচু। তার সর্বাঙ্গ হিমশীতল হয়ে আসে। ভিড় জমেছে।

ঝাঁসীর রাণী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দুই

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে লক্ষ্মীবাই জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীবাইয়ের পিতামহ কৃষ্ণরাও তাম্বে কৃষ্ণা নদীর তীরবর্ত্তী ওয়াঁই নামক গ্রামে বাস করিতেন। পেশবাদের অধীনে তিনি ছিলেন একজন মামলতদার। মামলতদার—বর্ত্তমান কালের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদ তুল্য। কৃষ্ণরাওয়ের পুত্র বলবন্ত রাও পেশবাদের দরবারে একজন সেনানায়কের কাজ করিতেন। বলবন্তরাওয়ের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ মোরোপন্থ পিতার নিকট পুনানগরীতেই থাকিতেন। মোরোপন্থ পেশোয়া বাজিরাওয়ের ভ্রাতা চিমাজী আপ্পার একজন অনুগ্রহভাজন ছিলেন। বাজিরাও বিঠুরে গমন করিলে চিমাজি আপ্পা কাশীধামে গিয়া বাস করেন, মোরোপন্থ তাম্বেও তাঁহার সহিত সপরিবারে কাশীবাসী হ'ন—কাশীতে তিনি চিমাজী আপ্পার দেওয়ান ছিলেন।

লক্ষ্মীবাই এই কাশীধামেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার যখন বয়স মাত্র তিন বৎসর তখন তাঁহার মাতা ভাগীরথী বাইয়ের মৃত্যু হয়। বিপদের সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ আসে—মোরোপন্থের হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক চিমাজি আপ্পাও এ সময়েই পরলোকগমন করেন। নিরুপায় মোরোপন্থ একান্ত অসহায়ভাবে কাশীতে থাকা উচিত মনে করিলেন না, তিনি বিঠুরে আসিয়া বাজিরাওয়ের আশ্রয়ে আসিলেন। পিতা তাঁহাকে নাম দিয়াছিলেন মনুবাই।

মনু পিতার অসামান্য স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন। মাতৃহীনা বালিকা মনুর আদর-আব্দার সবই পিতার কাছে চলিত। মনুর দিব্য লাবণ্যময়ী গৌর কান্তি, সরল ব্যবহার এবং বাক্যালাপে বাজিরাওয়ের অনুচরেরা তাঁহাকে আদর করিয়া নাম দিয়াছিলেন "ছবেলী—ময়না"। পেশবা বাজিরাওয়ের পোষ্যপুত্র নানাসাহেবও ছিলেন মনুর একজন ক্রীড়াসঙ্গী। বাজি রাও যেমন পুত্রকে ঘোড়ায় চড়িতে, অসি চালনা করিতে শিক্ষা দিতেন; মনুকেও সেইরূপ পুরুষোচিত ক্রীড়াকৌতুকে উৎসাহিত করিতেন। একদিকে যেমন শৈশব হইতেই তাঁহার অশ্বচালনা, অসি-চালনা প্রভৃতিতে দক্ষতা লাভ হইয়াছিল, তেমনি বিদ্যাশিক্ষার দিকেও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। নানাসাহেবকে মনু-বাই আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন এবং ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসাহে ভাই-ফোঁটা দিয়া ভোজন ও বসন-ভূষণ দানে আপ্যায়িত করিতেন।

মারাঠাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। মনুভাইয়ের বয়স যখন আট বৎসর হইল, তখন তাঁহার পিতা মোরোপন্থ কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছিল। একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ মোরোপন্থকে এ সংবাদ দেওয়ায় তিনি বাজিরাওয়ের একখানি অনুরোধপত্র সহ সেই জ্যোতিষীকেই ঝাঁসী পাঠাইয়া দিলেন। গঙ্গাধর রাওয়ের একজন অমাত্য আসিয়া কন্যা দেখিয়া গেলেন। সেই অমাত্যের মুখে গঙ্গাধর রাও কন্যার অনুপম রূপ-লাবণ্য গুণ-গরিমার কথা শুনিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন। ১৮৪২ সালের শুভ বৈশাখ মাসে ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের সঙ্গে মনুবাইয়ের মহাসমারোহের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। কথিত আছে যে, গঙ্গাধর রাওয়ের সহিত মনুবাইয়ের বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধনের সময় মনুবাই পুরোহিতকে বলিয়াছিলেন—"দৃঢ়ভাবে গ্রন্থিবন্ধন করুন।"

মনুবাই নববধূরূপে ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদে আসিলেন। মারাঠাদের মধ্যে রীতি আছে যে, নববধূ শ্বশুরগৃহে আসিলে তাঁহার নূতন নামকরণ হয়। ঝাঁসী রাজপরিবারের পুরমহিলারা মনুবাইয়ের অপরূপ লাবণ্য-শ্রীমণ্ডিত মুখখানি দেখিয়া তাঁহার নূতন নামকরণ করিলেন "লক্ষ্মীবাই"। এই লক্ষ্মীবাই নামেই তিনি জগৎ-প্রসিদ্ধ হইয়া আছেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীবাই একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। পুত্রের জন্মলাভে গঙ্গাধর রাও অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে মহা উৎসবের আয়োজন করেন—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পুত্রটি মাত্র তিন মাসকাল জীবিত ছিল। পুত্রের মৃত্যুতে লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত শোকে সন্তপ্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। গঙ্গাধর রাওও শোকে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া গেল, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে ১৮৫৩ সালে তিনি পরলোক গমন করিলেন। সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। গঙ্গাধর রাও মৃত্যুর পূর্ব্বে হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুসারে এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম দামোদর রাও। গঙ্গাধর রাও এই দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড ড্যালহৌসী

তাহা মানিয়া লইলেন না। ঔরসপুত্রের অভাবে সম্পত্তি গভর্ণমেণ্ট অধিকার করিবেন—এই বিধানবলে বিনা গোলযোগে ঝাঁসী ইংরাজ অধিকার করিলেন। গঙ্গাধর রাওয়ের গৃহীত পোষ্যপুত্র দামোদর রাও অস্বীকৃত হইলেন, পতির কোন স্মৃতি থাকিবার ব্যবস্থাই রহিল না—এই অপমানে লক্ষ্মীবাইয়ের হৃদয় শোক-দুঃখে, ক্ষোভে ও রোষে জর্জ্জরিত হইল—তাঁহার হৃদয়ে জলিল প্রতিহিংসার আগুন, সবই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

১৮৫৫ সালের মাঘ মাসে দামোদর রাও সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিবেন, লক্ষ্মীবাই মহাসমারোহের সহিত তাঁহার উপনয়ন সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু রাজতহবিলে উপযুক্ত অর্থ না থাকায় কোম্পানির সরকারে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সে টাকার মধ্য হইতে একলক্ষ টাকা প্রার্থনা করিলেন। গভর্মেণ্ট তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে জানাইলেন যে,—"দামোদর রাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ টাকার দাবী করিলে প্রত্যর্পণ করিবেন—যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন এবং চারিজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে জামিনদার করিতে পারেন, তবে তাঁহাকে টাকা দেওয়া যাইতে পারে।" রাণী বাধ্য হইয়াই এই অপমানজনক সর্ত্তে রাজী হইয়া ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন এবং প্রায় তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া দামোদর রাওয়ের উপনয়নকার্য্য সম্পন্ন করেন।

গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যুর পর প্রায় তিনবৎসর কাল লক্ষ্মীবাই কঠোর ব্রতাচরণ, শিবপূজা ইত্যাদি করিতেন।

লক্ষ্মীবাই ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও ঈশ্বরচিন্তায় আপনার মনের দুঃখ-বেদনা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন। রাত্রি চারিটার সময় তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নান সমাপনপূর্ব্বক পূজা করিতে বসিতেন এবং বেলা আটটার সময় পূজা শেষ করিয়া—তৃণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে কয়েকটি তেজস্বী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ব্যায়াম করিতেন। এইভাবে দানধর্ম্ম, ভোজন, এক শত বার নাম-লিখন, পুরাণ শ্রবণ, দর্শনপ্রার্থীদের দর্শন দান ও আবেদন-নিবেদন শ্রবণ করিয়া রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় শয়ন করিতেন। এইরূপভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্ববিধ শোক-দুঃখ দমন করিয়া রাজকুললক্ষ্মীর ন্যায় বাস করিতেছিলেন। সহসা কোনদিন কোন ব্যাপারেই তিনি উদ্দীপ্ত হইতেন না। ধীর ও শান্তভাবে সব দিক্ বিবেচনা করিয়া কাজ করিতেন। কিন্তু একদিন এই মহীয়সী মহিলার হৃদয়েও জলিয়া উঠিল বিদ্রোহের আগুন।

ঝাঁসীর রাণীকে গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক মাত্র পাঁচ হাজার টাকা-বৃত্তি দান করা হইত। এই অর্থ যে তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহের পক্ষে অত্যন্ত অল্প; সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণই নাই। ঐ অর্থে তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না, তাঁহার নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে ব্যয় সংকুলান করিতেন। ইহাও রাণীর প্রধান ক্ষোভের কারণ ছিল, তারপর দামোদরের উপনয়ন উপলক্ষ্যে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে সাহায্য দান করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে যে অপমান-জনক সর্ত্ত করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অপমান-জনক হইয়াছিল।

ঝাঁসী হিন্দুরাজ্য। গোবধ সেখানে নিষিদ্ধ। ইংরাজ-কর্ত্তৃক গো-হত্যার দরুণও তাঁহার বিরক্তির কারণ ঘটিয়াছিল। রাণীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা এই অন্যায় কার্য্য রহিত করিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন, ঝাঁসীর জনসাধারণ ইংরাজ রাজসরকারের কাছে এই বিষয়ের প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া প্রার্থনা জানাইল, কিন্তু তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল।—ইহার পর গভর্ণমেণ্ট হইতে রাণীকে তাঁহার স্বামী গঙ্গাধর রাও কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণপরিশোধের জন্য আদেশ দেওয়া হইল। রাণী এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে, স্বামীর ঋণের জন্য তাঁহাকে দাবী করা সঙ্গত নহে—তিনি ত' আর ঋণ করেন নাই। ইন্দোরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যার রবার্ট হ্যামিল্টন রাণীর অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া লিখিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোনও প্রতিকার করিলেন না। রাণীর মাসিক বৃত্তি হইতে কিয়দংশ হ্রাস করা হইল। এইরূপ ভাবে ব্রিটিশ রাজের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ অনুদার ব্যবহার পাইয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি রাণীর বিরাগ বাড়িয়া চলিল। একদিন অন্তর্নিহিত বিদ্বেষ-বহ্নি বাহিরে ভীষণ অগ্নিপ্লাবনের সৃষ্টি করিল।

তিন

রাণী লক্ষ্মীবাই ঝাঁসী সহরেই বাস করিতেন। কলিকাতা হইতে ঝাঁসীর দূরত্ব ৭৯৯ মাইল, আর বোম্বাই হইতে ৭০২ মাইল। ঝাঁসী গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলপথের উপর অবস্থিত। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঝাঁসী সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ অধিকারে না আসার দরুণ, ইহার পূর্ব্বতন জনসংখ্যা প্রকৃতভাবে জানার উপায় নাই। তবে ১৮৯১ সালের আদমসুমারির গণনা হইতে জানা যায় যে, সে সময়ে তথায় জনসংখ্যা মাত্র ছিল ৫৩,৭৭৯ জন।

ঝাঁসী সহর ওর্চার রাজা বীরসিংহ দেও প্রথম স্থাপন করেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে বাঁগরা নামক ছোট পাহাড়ের উপর তিনি এক গড়হি বা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তখন ঝাঁসী ছিল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ক্রমশঃ উহার চারিদিকে লোকজনের বসতির সহিত উহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। ঝাঁসী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একদিন ওর্চার রাজা বীর সিংহ দেও এবং জৈতপুরের রাজা এক সঙ্গে বসিয়াছিলেন। বীরসিংহ দেও জৈতপুরের রাজাকে তাঁহার নবনির্ম্মিত দুর্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—আপনি কি এখান হ'তে আমার নূতন দুর্গ দেখতে পাচ্ছেন? জৈতপুরের রাজা উত্তর করিলেন :— ঝাঁসি—মানে ঝাপসা দেখাচ্ছে' সেই ঝাঁসি হতেই নাম হইল ঝাঁসী।

আমরা পূর্ব্বে নরু শঙ্কর রাওয়ের উল্লেখ করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে নরু শঙ্কর ঝাঁসী দুর্গ ও সহরের বিবিধ উন্নতি করেন। তাঁহার পর মাধোজী গোবিন্দ কাতিয়াও অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। ঝাঁসী সহরের চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত। প্রাচীরের দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় সাড়ে তিন মাইল, প্রাচীরবেষ্টিত সহরের পরিমাণ হইবে একবর্গ মাইল পরিমিত স্থান। প্রাচীরের গায়ে নগরে প্রবেশের জন্য দশটি দরজা আছে। সেই সব তোরণ-দ্বারের নাম যথাক্রমে

খাণ্ডেরাও, দাতিয়া, উনাও, ভাণ্ডার, বড়গাঁও, লক্ষ্মী, সগ্গর, ওর্চ সইনর এবং ঝির্ণান দরোজা। এই সকল দরোজার মধ্যে ভাণ্ডার দরোজা, সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ এবং ঝিরমণ দরোজা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত আছে। এখনও ঐ সমুদয় দরোজার কাঠের কপাট ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার আশে-পাশে রহিয়াছে পুলিশের ফাঁড়ি ও থানা।

এই প্রধান দশটি নগরপ্রবেশ-তোরণ ব্যতীত চারিটি খিড়কি দরোজা আছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে গঙ্গাপতগির খিড়কি, অলিঘোলকি খিড়কি, সুজনকি খিড়কি ও সগর খিড়কি। ১৮৫৮ সালে স্যার হিউরোজ তাঁহার তোপশ্রেণী—সৈনিয়ার এবং ভির্ণান দরোজার মধ্যে সজ্জিত করেন। সেই অংশ এখনও সংস্কৃত হয় নাই।

ঝাঁসী দুর্গ এক সময়ে দুর্ভেদ্য ছিল। এখনও তাহার ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত নির্ম্মাণ-কৌশল হইতে তাহা উপলব্ধি হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই দুর্গ একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

চার

রাণী লক্ষ্মীবাই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ অনুদার ব্যবহার পাইয়া অবশেষে ঝাঁসী ত্যাগ করিয়া বারাণসী-ধামে থাকিবার আকাঙ্ক্ষাও জানাইয়াছিলেন—কিন্তু সর্ব্ববিধ বিষয়ে অনুদার ব্যবহারে তাঁহার চিত্ত তিক্ত ও ব্যথিত হইয়াছিল। লক্ষ্মীবাইয়ের মনের কোণে যে ইংরেজ বিদ্বেষবহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা এক সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল।

লক্ষ্মীবাই যেমন বুদ্ধিমতী ছিলেন, সেইরূপ ছিল তাঁহার প্রত্যেকটি কাজ সুনিপুণ ভাবে সম্পন্ন করিবার দক্ষতা। কমিশনার বা গভর্ণরের নিকট বিনা দ্বিধায় কথা বলিতে পারিতেন। তাঁহার কার্য্যকৌশল ও কূটবুদ্ধির পরিচয় ইংরাজ-রাজপুরুষেরা সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন।

লর্ড ড্যালহৌসী ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার পর ভাইকাউণ্ট ক্যানিং বড়লাট হইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। তাঁহার শাসনকালের এক বৎসর না যাইতেই ভারতবর্ষে আবার সিপাহী-বিদ্রোহ আরম্ভ হইল।

লর্ড ক্যানিং যখন ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ বঙ্গদেশে এক ভয়ঙ্কর অশান্তি উপস্থিত হইল। এই সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা অশান্তির ভাবও চলিতেছিল। দেশীয় রাজারা একটি একটি করিয়া তাঁহাদের রাজ্য ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া মনে মনে অসন্তোষের ভাব পোষণ করিতেছিলেন, সকলেরই মনে মনে সর্ব্বদা এইরূপ আশঙ্কা ছিল, বুঝি এইবার আমার পালা আসিল। তারপর ভূমি-জমা সম্বন্ধে নূতনরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় জমিদারদিগের প্রজাদের উপর পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রভুত্ব ছিল না। তারপর রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, সুলভ ডাক-মাশুল, স্কুল, হাসপাতাল এই সকল নূতন নূতন সংস্কার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকেরা তখন অনেকেই ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিল। এই সকল সংস্কারকে জনসাধারণ প্রীতির চক্ষে না দেখিয়া মনে করিত যে, ইংরাজেরা তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্য করিতেছেন। দুষ্ট লোকের দ্বারা এই সকল অসত্য কথা বাঙ্গালা ও অযোধ্যায় সিপাহীদের মধ্যে প্রচারিত হইল। এই সময়ে সৈন্যদিগকে এনফিল্ড রাইফেল নামক নূতন ধরণের এক বন্দুক প্রদান করা হয়। এই বন্দুকে মোম বা চর্ব্বির কার্ত্তুজ বা টোটা ব্যবহৃত হইত। ঐ টোটা বন্দুকে ভরিবার সময় দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত : এইরূপ গুজব রটিয়া গেল যে, এই টোটা হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই জাতি নষ্ট করিবার জন্য ; উহাতে শূকর ও গরুর চর্ব্বি মিশ্রিত হইয়াছে। পরে কিন্তু অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তাহাদের ঐরূপ অনুমান অসত্য ছিল না, ঐ কার্টিজ তৈয়ারী করিতে শূকর ও গরুর চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

সে-সময়ে ১৮৫৭ সালের মে মাসে ঝাঁসীতেও ঐরূপ সংবাদ প্রচারিত হইল—ঐতিহাসিক বলেন,—"During the same month a report was spread in Jhansi, as in many other places in India, that the Government had caused grand bones to Be mixed witn the flour sold in the bazars, that Cow's and Pig's fat had been used in making up the cartridges served out to the trooks, and that two regiments of sepays had been blown away from guns at Calcutta."*

প্রথমেই বাঙ্গলাদেশে কলিকাতার নিকটস্থ ব্যারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু সে বিদ্রোহ সহজেই দমন হইয়াছিল। প্রকৃত বিদ্রোহ আরম্ভ হইল মীরাট এবং লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে; ১৮৫৭ সালের ১০ই মে সেখানকার সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদের ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিল এবং দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইল। দিল্লীর মুসলমানেরা বিদ্রোহী সেনাদের সহিত যোগদান করিয়া দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহ, বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। দেখিতে দেখিতে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড এবং ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। এই সকল বিদ্রোহী সিপাহীরা সব স্থানেই ইংরাজদিগকে হত্যা করিতে লাগিল। জেলের কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া দিল, খাজনাখানা লুঠ করিল এবং দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি এবং ঝাঁসী প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের আরম্ভ হইল। [ক্রমশঃ]

* District Gazeteers of United Provinces Vol. XXIV Compiled & Edited by D. L Drake & Brackman, I C S Page 209.

বারো টাকা তিন আনা

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

রবিবারের দুপুর। রেশনের বাজারেও রসনা এই দিনটির জন্য বিশেষ ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। অন্ততঃ রাত্রি বেলার জন্য। খাওয়া দাওয়া সারিয়া সবেমাত্র দেহ-ভার বিছানায় ঢালিয়া দিয়াছি,—গৃহিণী ঘরে ঢুকিয়া বোমা কপালে ঠেকাইলেন।

—ওগো শুনছ? এদের পাঁটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

চাঞ্চল্যকর খবর, সন্দেহ নাই। পাড়ার মধ্যে অনঙ্গ-মোহিনী ঠাকরুণের প্রভাব-প্রতিপত্তির কথা কে না জানে? পাড়ার কে না আসে এই বাড়ি এটা ওটার জন্য; বুদ্ধি-পরামর্শের জন্য। এবং কে না জানে যে, প্রথমটার বেলায় কসা হইলেও, দ্বিতীয় দফায় তাঁর উদারতার সীমা নাই?

অনঙ্গমোহিনীর "অনঙ্গ" কয়েক বৎসর হয় টাইফয়েডে ভুগিতে ভুগিতে মায়া কাটাইয়াছেন। কিন্তু তারপর সংসার-তরণীর হাল খুব শক্ত করিয়াই অনঙ্গমোহিনী ধরিয়াছিলেন। কন্ট্রোল্‌-রেশনের দিনের অন্তহীন ফ্যাকড়া মিটাইয়া সংসার চালানোর নৈপুণ্য দেখিয়া মনে-মনে ভাবিতাম যে, ঠাকরুণকে দেখিয়া রূপজ মোহ না হোক গুণজ মোহ সঞ্চারের ফলেই বোধ হয় অভিধান উজাড় করিয়া ঐ নামটি পছন্দ করা হইয়াছিল।

কিন্তু চিন্তাস্রোতে বাধা আসিল। বাইরের গোল-মালটা বাড়িতেছিল শনৈঃ-শনৈঃ এবং দোতালা হইতে অনঙ্গমোহিনীর পুত্র-পুত্রী, ছেলে-বউ, নাতি-নাতনীর দল, যে ভাবে হুমদাম্‌ সিড়ি দিয়া নামিতেছিল, তাহাতে নীচ-তালার ভাড়াটিয়া হিসাবে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। কোলাহলটা সামনের রাস্তার দিকে সরিয়া যাইতেই প্রাণ ফিরিলাম। কিন্তু প্রবল প্রতিবাদ করিলেন গৃহিণী, এত বড় বিপদে একি ব্যাভার তোমার। ছিঃ ছিঃ—লোকে কি বলবে?

—বলবে আর কি? মা'-কালী প্রার্থনা শুনে কেনে টেনে নিয়েছেন ঠাকরুণের পাঁটাকে। ও-বাড়ির মুর্গী আর এ-বাড়ির পাঁটা ভোরবেলা কি আর ঘুমুতে দিচ্ছে আমায়। কতবার বলেছি, ঠাকরুণকে একটু বল, ভগবানের জীবকে অমন অনাদর করে নীচতলায় যেন আমাদের সঙ্গে না রাখেন। বলেছিলে?

—লজ্জা করত না বুঝি? তুমিও তো বলতে পারতে ঠাকরুণের বড় ছেলেকে। দু'জনে একত্র হ'লে তো একেবারে সাত জন্মের মিতালী সুরু হয়ে যায় গো।

—এক সঙ্গে তাসটা-পাশাটা খেলি···বুঝতে পারো ত?

—তা' আমরা কি করি? সারা দিনরাত তো মুখোমুখি। দরবারে ঠাঁই না পেয়ে কেবল ঠাসো ভালোমানুষের মেয়েকে। বলিহারি, বিচার তোমার।—কিন্তু তুমি ওঠ।

কথার সুরু ও শেষের তফাৎটা গৃহিণীর অঙ্গভঙ্গিতে আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অগত্যা বারান্দার দিকে প্রস্থান করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করিতে হইল।

* * পথের উপর একটা মহামারী কারবার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বলাইবাবু দক্ষিণের গলি হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন।

কোথাও দেখলাম না, মা'। আমার সাইকেলটা দে' দেখিনি হরিপদ।

—সাইকেল নিয়ে কোথায় যা'বেন আবার? কণ্ঠে অনেকখানি উৎকণ্ঠা ফুটাইয়া তুলিলাম নিশ্চয়ই।

—দম পাচ্ছি না, মশাই ছুটেছি কি কম।

হরিহর প্রায় শূন্যের উপর দিয়াই সাইকেলটাকে রাস্তার উপর উপস্থিত করিল। বলাইবাবু গায়ের কাপড়ের খুঁটটা কোমরে জড়াইয়া লইয়া এক ঠেলাতেই দ্বিচক্রযানে চড়িয়া বসিতে সক্ষম না হইয়া বিড়বিড় করিয়া কি সব উচ্চারণ করিলেন। অনঙ্গমোহিনী একবার কটমট্‌ করিয়া চাহিতেই বলাইবাবুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। দ্বিতীয়বারে কৃতকার্য্য হইয়া তিনি প্রাণপণ ছুটিলেন, যে দিকে দুই চোখ যায় গোছের। কালু উত্তর দিকের বাড়ির ভাঙ্গা দেওয়ালের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল মূর্তিমতী হতাশার মত। অনঙ্গমোহিনীর কাংস্য-কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল—পেলিনে তো?

—না, মা। মহাকবি সেক্সপীয়রের বিয়োগাত্মক নাটকের মধ্যেও এত বেদনা ঝরিয়া পড়িয়াছিল কিনা—ছাত্রজীবনের স্মৃতি ঝাপসা হইয়া ওঠাতে ঠিক মনে করিতে পারিলাম না।

রবিবারের মধ্যাহ্নে সমস্ত পাড়া সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথা হইতে গুপ্তদের অন্ধ ভাগনেটাও তামাসা শুনবার লোভে আসিয়া জুটিল।

ব্যাপারটা তলাইয়া না দেখিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, তুমি এলে কেন এসব খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে? পিছনে অনঙ্গমোহিনী, ঘরে গৃহিণী, সামনে পাড়ার প্রায় সবেরই আকুলতা এবং কর্ত্তব্যবোধ যে-রকম প্রকাশ পাইতেছে,

তা'তে একেবারে চুপ করিয়া থাকাটা বিশেষ নিরাপদ বোধ হইতেছিল না।

হারাধন বলিল, মণিকে কিছু বল্‌ছিলেন নকুল দা'?

বিপদ গুণিলাম। কাঠবিড়ালও শ্রীরামের সেতু-বন্ধনের মত মহাকাণ্ডে সাহায্য করিয়াছিল না কি? আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না, সে কথা নয়। পারে বই-কি, মণিও সাহায্য করতে পারে নিশ্চয়। সবেরই তো কায—পাড়ায় যাকে বলে আমরা মিলে-মিশে রয়েছি। তবে, জানো তো হরিপদ—মণির একটু হয়ে মানে অসুবিধা রয়েছে। শেষে হয়ত ওকেই আমাদের খোঁজাখুজি করতে হ'তে পারে।

কিন্তু হরিপদ বা অন্য কেউ হাসিল না চিন্তিত হইয়া উঠিলাম। পিছনে চোখ না ফিরাইয়াও অনঙ্গমোহিনীর সুপ্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছিলাম। আমার কথাটার প্রকাশ তখনো জটলার ভিতরে মাথা ঢুকিয়া বেড়াইতেছিল নানা?

বনমালী বলিল, মণি আমাদের শুনতে পারে ঠিক! জ্যেঠাইমার পাঁটা তো আর বোবা জীব নয়। আওয়াজ করতে পারে।

আমার চেয়ে এই সত্য পাড়ার আর কেউ এত ভাল করিয়া জানিত কি? সুইজারল্যাণ্ডে তৈরী মস্ত বড় একটা এলার্ম ঘড়ি ওর পেটে আছে—আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি।

মণি এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। এবারে বলিল, বনমালী দা' নয়? চলো দেখে আসি। কাণে না হয়, নাক দিয়েই আমি ছিঁড়ে করে ফেলব।

—সে কিরে। হরিপদ যেন কাঁদিয়া উঠিল আর্ত্ত প্রশ্নের মধ্য দিয়া।

মণি সপ্রতিভভাবে বলিল, ব-ব্বা গন্ধ লুকোতে পারবে না। পাড়ার যেখানেই পিক্‌নিক্ করো না কেন। মণি সেনকে খবরটা না-জানিয়ে ভাল করোনি। দেখতো বনমালী দা' বাতাস বইছে কোন্ দিকে?

—কেন, দক্ষিণ দিক থেকে। বুঝতে পারছিস নে?

—দক্ষিণ থেকে উত্তরে বইছে তো; চলো, চৌমাথা-নিতে। ওখানে গিয়ে টিপ্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকবো। গন্ধ যেই নাকে লাগা—

মণিকে থামিতে হইল। আনন্দমোহিনী হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, তবে রে ড্যাপো ছেলে। আমার পাঁঠার গায়ে গন্ধ, রোজ আমি যত্ন করে সাবান দেই না নাকি? পাড়ায় আর কে এমন পাঁঠার যত্ন করে, শুনি?

বনমালী মণিকে একরকম কাটা ছাগের মত হ্যাচ্‌রাইয়া-টানিয়া বড় রাস্তার দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অনঙ্গমোহিনী গলার স্বর আরো এক পর্দা বাড়াইয়া দিবার উপক্রম করিলেন।

হরিপদ বলিল, ওরা সে-কথা বলছিল না। কেউ হয়ত কেটে-কুটে রান্না চড়িয়ে থাকবে। না-হ'লে পাঁঠাটা যা'বে কোথায়? তারই গন্ধের কথা বলেছিল।

—তুই থাম হরিপদ। তোকে আমায় বুদ্ধি যোগাতে হবে না। এ-সব কথা বলে পাড়ার লোককে মনে করিয়ে দেওয়া বইতো নয়। পাগলকে বুদ্ধি আর দিস্‌নি হরিপদ।

মুগ্ধ হইলাম। বাস্তবিক কত গভীর ভাবে ঠাকরুণ চিন্তা করেন।

আমি মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিলাম। হয়ত দু'এক-মিনিটের মধ্যেই কেহ কোন দিক হইতে পাঁঠাটাকে লইয়া হাজির হইবে: আমি কি এমনই দাঁড়াইয়া থাকিব?' এই গৃহসমস্যার দিনে ভাড়াটের কি কোনই কর্ত্তব্য নাই? পাড়া তো ছোট কথা—অন্ততঃ জনা পঁচিশেক লোক কি চারিদিকে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতেছে না এই মুহূর্ত্তে? ধুতিটাকে জড়াইতে সুরু করিলাম। এ'বারে আর দেরী নয়, কিছু একটা আমাকে করিতেই হইবে।

কিন্তু জানেন তো, অভাগা যে-দিকে চায়, সে-দিকে কি হয়? কানে আসিল প্রতি ভোরে যে-কণ্ঠের অত্যাচারে এপাশ-ওপাশ করিতে করিতে ঘুম চটিয়া যায়—সেই কণ্ঠ ঠাকরুণের পাঁঠা বলাইবাবুর লাথির চোটে অমানুষি চীৎকার করিয়া উঠিল: গলির মোড়ে। এক হাতে এ চেন্-খোলা দ্বিচক্রযান, অপরহাতে বিশেষ-ভাবে কালো-কুচ্‌কুচে একটা পাঁঠা লইয়া বাঙ্গালী বলাই বাবু অগ্রসর হইতেছেন। ব্যাপারটাকে এ একটা রাইফেল্ এবং অপরহাতে একটা বিশল্ বেঙ্গল টাইগারের ল্যাজ ধরিয়া অবলীলাক্রমে লইয়া আসিবার সহিত তুলনা করিলে খুব অপর না বোধ হয়। বলাইবাবু আরো একটা লাি অনঙ্গমোহিনীর বাছা যে ভাবে চীৎকার ক তাহাতে পাষাণও গলিয়া যায়।

ঠাকরুণ বলিলেন, আহা-হা! মারিস নে তা'ও বলি বাপু, রোজ আর কত সয়। আ কালো করে তবে ছাড়ল। আজই কেটে ফেল আর নয়! আজ ওর লাউগাছ, কাল ওর ফুলের পরশু ওর বাগান তছ্‌নছ্, পাড়ার লোকের সঙ্গে কত আ কোন্দল করি? আহা-হা, মারিস্ নে—অবলা জীবকে। তা'র চেয়ে কেটে-কুটে খা তোরা। মারিস নে বলাই—আমিই ছেড়ে দিয়েছিলাম ঘণ্টাটাক আগে। রবিবার—সবাই বাড়ী আছিস—ছেড়ে দিয়েছিলাম তা'ই।

ঠাণ্ডা-সংসারী-কৃপণ মানুষ বলাইবাবু। অনঙ্গ-

মোহিনীর নিষেধ সত্ত্বেও আরো দু'ঘা বসাইয়া দিলেন। তারস্বরে অবলা জীবটি পাড়ার সকলের কাছেই তীব্র প্রতিবাদ জানাইল আরো কয়েকবার। হাপাইতে-হাপাইতে বলাই বাবু বলিলেন, তুমি তো বোঝো না—সারা হপ্তার শেষে একটা রবিবার ? এখানে নয়, ওখানে নয়—শ্রেফ খোঁয়াড়ে গিয়ে জাবর কাটছেন নিরুদ্বেগে। কড়্‌কড়ে তিন গণ্ডা পয়সা গুণে দিয়ে—তবে নিয়ে এলাম।

আরো এক লাথি।

রাগ এবং দুঃখ মিশিয়া ঠাকরুণের মুখের ভাব যে কী দাঁড়াইল তাহা আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঘরের ভিতর দ্বিতীয়বার শয্যাশ্রয় করিতে-করিতে টের পাইলাম যে দোতালায় পারিবারিক গোল-টেবিল বসিয়াছে। যুক্তিতর্কগুলি কামারশালের আগুণ ফুল্‌কির মত মাঝে-মাঝে ছিট্‌কাইয়া আসিতেছিল। মনের কাণে একটা অত্যন্ত সরস আশা যে একেবারেই উঁকি দিল না—তা' জোর করিয়া বলা চলে না। গৃহিণী বলিয়াই ফেলিলেন, কমপক্ষে দু'সের মাংস। ভাগ জুটিবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু হায়, একটু পরেই বোধ হয় গৃহিণীর তাগিদে আবার ধড়মড় করিয়া উঠিলাম: এবারে আবার কি ? ...াংসের ভাগ আনিতে হইবে কি ? কিন্তু গৃহিণীর চোখ ...খিলাম কপালে না-ঠেকাইয়া, মুখে অঙ্গুল ...াইয়াছেন।

...বাহিরে পাড়ার কসাইটার সঙ্গে অনঙ্গমোহিনীর দর- ...হইতেছিল। গৃহিণীর নীরব প্রশ্নের উত্তরে মাথা ...ম।

...ইটা বলিতেছিল, দশ রোজ আগে আমি বলনু ...গারো টাকা। তখন আপনি বোললেন বারো হ'লে দেবেন। পোষাবে না বলে নিতে পারলাম না। আজ ডেকে নিলেম। কিন্তু, দাম ছাড়ছেন না···

লোকটা কেনাকাটা করিয়া খায় এবং ব্যবসায়ী। থাম্‌কা ডাকাতে হয়ত একটু চটিয়াই গিয়াছে—যতটা ওর কথার ধরণে বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু সে জানিত না তখনো যে, ঠাকরুণ ব্যবসায়ীকেও খানিক ব্যবসায় শিখাইতে পারেন।

কানে আসিল: দশ দিন কি একটুখানি সময় নাকি ? এ-দশদিনে আমার পাঁঠা গায়ে-পায়ে বাড়েনি মনে করছ নাকি ? তখন থেকে আট আনা পয়সা বেশী তুমি দেবেনা কেন বাপু ? যেমন ছাড়া-ছুটো থেকেছে, তা'তে আয়সের বেড়েছে নিশ্চয় ওজনে। তুমি দর বলে এই দশ পরে দু'খানা বাগান সাফ করেছে ও-পাড়ার শুক্ত শব্দের পাশের বাড়ীর লাউ কুমড়োর লকলকে ডগা উপর প্রথ্য আমার বাঁধা পড়ে তো থাকে নি। সমুখ

লোকটা হয়ত হাসিয়াই বলিল, থাক্ মা'। আপনি বলছেন—বারো টাকাই দিলাম।

পাঁঠাটা ডাকাডাকি সুরু করিল। বুঝিলাম রশিতে নূতন মালিকের টান পড়িয়াছে। ঘর হইতে কিছুই দেখা যাইতেছিল না।

ঠাকরুণ বলিলেন, দাঁড়াও বাপু। আরো তিন আনা পয়সা দিতে হ'চ্ছে তোমায়।

—তিন আনা আবার কেনো ?

—বাঃ এইমাত্র তো তোমার পাঁটার কল্যাণে বলাই আমার দিয়ে এলো খোঁয়াড়-আলাকে। সে-দণ্ড কি আমি দেব নাকি।

চেহারাটা না-দেখিলেও, কসাইটার মুখের অবস্থা আমি কল্পনা করিতে পারিলাম। জাত-কসাইয়ের মুখেও বোধহয় করুণার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

পরাজয়

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

...রি কোলে সবুজ উপত্যকা।
...বহে যাও, আমি চলি পাশে। পাশাপাশি মোরা চলি:
...া-ঘেরা আর পাখী-ডাকা কোন অজানা উপত্যকা:
চলিতে চলিতে দু'জনে আমরা ইসারায় কথা বলি।

কালো ছায়া নামে উপত্যকার কোলে।
ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আকাশের বুকে থেমে থেমে ভিড় করে:
তোমার বুকেও গাঢ় ছায়া আসে নামি:
তুমি তো থামনা, আমিও না থেমে হেটে চলি পদভরে।

চলার পথেতে আমি যে-থামি হঠাৎ—
তুমি ছোট নদী বহে যাও ঠিক কেটে নিয়ে পথখানি:
ক্লান্ত আমি য চলিতে পারি না আর:
তোমার কাছেতে পরাজয় তাই মানি।

নাগাদের দেশ

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

ব্রহ্মদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব ... যায়। ভারত ও ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী এই অরণ্যপূর্ণ ... প্রদেশে নাগা, কুকী প্রভৃতি আরণ্য ও পার্ব্বত্য ... বাস করে। এই অঞ্চলের জলসিক্ত জঙ্গলগুলি নানা ... জীবজন্তুর লীলাস্থলী। হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশু এবং ... প্রকার সরীসৃপ এখানে দেখা যায়। রাজগোক্ষুর আখ্যায় অভিহিত সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণবিষধর সর্প এই প্রদেশের সলিলসিক্ত সুনিবিড় বনানীবক্ষে প্রায়ই লক্ষিত হয়। তবে হামাদ্রায়াদ বা রাজগোক্ষুর ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত পোপা পর্ব্বতে সর্ব্বাধিক দেখা যায়।

এই প্রদেশে পাতকাই নামক গিরিশ্রেণী বিরাজিত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর উভয় পার্শ্বে নাগারা বাস করে। এই পার্ব্বত্য সম্প্রদায়কে কোনপ্রকার শাসনের বশীভূত করা আদৌ সহজ নহে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষিণে সারামতী নামক অম্বরচুম্বী তুঙ্গশৃঙ্গ গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। পূতাও ব্রহ্মদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবার পূর্ব্বে সারামতীই এই দেশের সর্ব্বোচ্চ শৈলশিখর বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন ইউ-রোপীয় এই শিখরে আরোহণ করে নাই বলিয়া জানা যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে, এই উত্তুঙ্গ শৃঙ্গটিতে উঠিতে সাহসী অতি অল্প লোকই হইয়াছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২হাজার ৫শত ফিট উচ্চ। প্রায় ৭০ মাইল দূরে বিরাজিত মিৎকীনা হইতেও মেঘমুক্ত দিবসে এই সমুন্নত শৈল শিখরটি দৃষ্টি গোচর হয়। নাগাদের মনে এই তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বতমালা একপ্রকার রহস্য-রাজ্য বোধ হওয়া বা ভীতির ভাব জাগ্রত করা বিস্ময়ের বিষয় নয়। শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় বনানীও অভ্রভেদী শৈলশ্রেণী অসভ্য বা স্বল্প-সভ্য সম্প্রদায়গণের নিকট ভীমভৈরব অপ্রাকৃত শক্তি বা উপদেববর্গের বাস-স্থল বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই সকল

নাগাকুলীর দল ভারবহন করিয়া অগ্রসর হইতেছে

শক্তি বা উপদেবতাকে নাগা, কুকী ও কোচিন প্রভৃতি অঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিরা 'নাট' নামে অভিহিত করিয়া থাকে। নাটবাদই

আনুষ্ঠানিক বেশে সজ্জিত প্রবীণ নাগাত্রয়

নাগাদের ধর্ম। বলিপ্রদত্ত প্রাণীর শোণিত ভিন্ন নাটগণকে তুষ্ট করিবার অন্য কোন উপায় নাই।

চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান অসংখ্য শৈলমালার মধ্যে সারামতী যেন রাজার মত বিরাজিত। শীর্ষদেশে রজতরচিত মুকুটের মত শুভ্র তুষাররাশি—অগণিত শৈলসমূহের মধ্যে সারামতীকে দেখিবামাত্র চিনা যায়। কথিত আছে ব্রহ্মদেশের একজন গভর্ণর বা শাসন-কর্ত্তা সারামতীর শীর্ষদেশে চড়িবার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন। পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের অধিবাসীদের অন্তরে বিদ্রোহ বা বিদ্বেষের ভাব বিদ্যমান দেখিয়া এই সঙ্কল্প তিনি শেষ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। নাগা প্রভৃতি সম্প্রদায় সারা-মতীকে দেবনিবাস বলিয়া মনে করে। সুতরাং এইরূপ আরোহণ চেষ্টাকে তাহারা কখন প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। পাতকাই পর্ব্বতশ্রেণী আসাম ও ব্রহ্মকে বিভক্ত করিয়েছে বলা চলে এবং নাগাদের দেশকেও বিভক্ত করিতেছে বলা যায়।

নাগারা সাধারণতঃ খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিকে আদৌ চিত্তাকর্ষক বলা চলে না। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাও প্রভৃতি আরণ্য জাতিদের আকৃতি প্রকৃতিতে যে চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্যটুকু দেখা যায়; ব্রহ্মসীমান্তের অসভ্য আদিবাসী নাগাদের মধ্যে আমরা তাহা দেখিতে পাই না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নাগাদের স্বভাব চতুর্দ্দিকে বিরাজিত ভীমভৈরব পর্ব্বতশ্রেণীর মত রুদ্র-করাল শ্বাপদসঙ্কুল সুনিবিড় অরণ্যাণীর মতই ভয়াবহ রহস্যাবৃত, বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে একপ্রকার জাগৃতি দেখা যাইতেছে, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে যাহারা নাগাদের দেশে গিয়াছেন তাঁহারা দুর্দ্দমনীয় বর্ব্বরতা ও নির্দ্দয়তার পরিচায়ক, আবার অনুষ্ঠানে ইহাদের অবি-চলিত নিষ্ঠা দেখিতে পাইয়াছেন। নাগা, কুকী ও কাচিন—এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নাগারাই অপেক্ষাকৃত অধিক ভৈরব-ভাবাপন্ন। একান্ত গতানুগতিক পন্থায় জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত বা বিকশিত করিবার অবকাশ বা সুযোগ ইহারা খুব কমই পাইয়াছে; অপর সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং আপনাদের মধ্যে দলগত প্রবল রেষারেষি এই সম্প্রদায়কে উন্নতির পথে আগাইতে দেয় নাই বলিলে সত্যই বলা হয়। অবশ্য ইহা সত্য যে সভ্যতাকেন্দ্র শহর

সমূহের সান্নিধ্যে যাহারা বাস করে তাহাদের অসভ্যভাব আজকাল কিয়ৎপরিমাণে অপগত হইয়াছে এবং যাহারা দূরে দুর্গম

এই কুটিরগুলিকে নাগাদের উপাস্য উপদেবতা নাটের মন্দির বলিয়া মনে করা যায়

গিরি-অরণ্যের বক্ষে অবস্থান করে তাহাদের ভিতর আদিম বর্ব্বরতা আজিও বিরাজিত রহিয়াছে।

কটিতটে সংলগ্ন এক খণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্রই নাগাদের প্রধান পরিচ্ছদ। এই বস্ত্রের কিয়দংশ ইহারা সম্মুখে লম্বিত রাখে এবং অপর একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড এই বস্ত্রের ভিতর গুঁজিয়া দেয়। এই কটিবাস ব্যতিরেকে একখানি কার্পাস নির্ম্মিত মোটা চাদর স্কন্ধে বা বক্ষে বিলম্বিত রাখে। নাগাদের দেহের অন্যান্য অবয়ব যেমনই হউক, পদদ্বয় বিশেষ সুদৃঢ় ও সবল। কাচিন, লেপচা প্রভৃতি অন্যান্য পাহাড়ীয়া জাতির পদদ্বয়ের দৃঢ়তাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই দৃঢ়তার জন্য নাগারা ভারবাহী কুলীরূপে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া থাকে। শ্রমিক রূপে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম ইহারা করিতে পারে তাহা আমাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত করা স্বাভাবিক। যে বোঝাগুলি ক্রোশের পর ক্রোশ ইহারা বহিয়া লইয়া যায়, খর্ব্বাকৃতির অনুপাতে উহাদিগকে বিপুল বলা চলে।

মাথায় বোঝা লইয়া অগ্রসর হইবার সময় ক্লান্তি নিবারণের জন্য ইহারা সুর সহকারে এক প্রকার বিচিত্র শব্দ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করে। 'বে-হে-ইঃ-বে-হে' এই শব্দগুলিই সঙ্গীতের মত সুরে বারবার উচ্চারণ করা হয়। মাথায় বিশাল বোঝা বহিয়া তালে তালে পা ফেলিয়া প্রান্তর ও কান্তার কম্পিত করিয়া পার্ব্বত্য প্রকৃতির বুকে প্রতিধ্বনি তুলিয়া এই অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে এই খর্ব্বতনু মানুষের দল যখন ক্রমশঃ আগাইয়া যায় তখন সে দৃশ্যকে অত্যন্ত বিচিত্র বলিয়া মনে হয়। যখন বনানীর নিবিড় নীরবতা ভেদ করিয়া কর্ণকুহরে ভাসিয়া আসে 'বে-হে-ইঃ-বে-হে বে-হে-ইঃ-বে-হে' তখন পথচারীর অন্তরে এক প্রকার ভীতিবিমিশ্রিত অদ্ভুত ভাব সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। এই ভয়াবহ মন্ত্র—এই রুদ্র ছন্দ কখন উচ্চ কখন বা মৃদু-মন্দ হইয়া পড়ে। নাগা কুলীর দল যখন উচ্চ স্থানের উপর দিয়া যায় তখন তাহাদের উচ্চারিত এই বিচিত্র শব্দ উচ্চ হইয়া পড়ে। যখন তাহারা পাহাড়ের অন্তরালে অবস্থান করে তখন ... ক্ষীণ হইয়া যায়। অবশ্য দূর হইতে ... কথাই আমরা কহিতেছি। মোটের ... শুনিবার সময় নাগাকুলীদের কণ্ঠ হইতে ... এই সম্মিলিত শব্দ প্রকৃতির স্তব্ধতার বক্ষে ... শ্রোতার অন্তরতন্ত্রীতে একপ্রকার অপূর্ব্ব সু... ঝঙ্কার তুলিয়া থাকে। সময়ে সময়ে মনে হয়, ভৈরবী পার্ব্বত্য প্রকৃতির কণ্ঠ হইতে এই ভৈরব রব বিনির্গত হইতেছে।

এক পল্লীর সহিত অপর পল্লীর কলহ-বিবাদকে নাগাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার বলা চলে। এই কলহ-বিবাদ প্রায়ই মারামারি কাটাকাটিতে পরিণত হয়। রক্ষাস্ত্ররূপে একখানি ভারি দা ইহারা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে। দা ছাড়া বর্শা এবং ধনুর্ব্বাণ ইহাদের জাতীয় অস্ত্র বলিয়া গণ্য। এই বর্শাগুলিকে তাহারা ছাগলোম নির্ম্মিত একপ্রকার আচ্ছাদনীর দ্বারা মণ্ডিত করে। একরকম বড় ঢালও ইহাদের রণসজ্জার অঙ্গরূপে বিবেচিত। রণসাজে সাজিবার সময় ইহারা একপ্রকার কোণাকৃতি অদ্ভুত শিরঃসজ্জা বা শিরস্ত্রাণ পরিধান করে। এই শিরঃসজ্জাগুলিকে ধনেশ পাখীর সাদা ও কাল পালকে এবং বন্যবরাহের দন্ত ও বক্র শীর্ষ শৃঙ্গের দ্বারা মণ্ডিত করা হয়। শৃঙ্গগুলির গাত্রে লোমগুচ্ছ লম্বিত থাকে, সময়ে সময়ে শত্রুর মস্তকের কেশ এই শৃঙ্গের অঙ্গে সংলগ্ন করা হয়। শত্রু পক্ষীয় স্ত্রীলোকের কেশ এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান জনক ও মূল্যবান ও আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। যে হেতু উহার দ্বারা বুঝাইতেছে যে যুদ্ধজয়ী যোদ্ধাটি বিপক্ষের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের অন্যান্য বন্য ও পার্ব্বত্য জাতিদের ন্যায় নাগারাও কোনও নিয়মিত বা নির্দ্দিষ্ট বিধিতে কৃষিকার্য্যের অনুষ্ঠান করে না। পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ স্থানগুলিকে পরিষ্কার করিয়া তাহারা একপ্রকার অস্থায়ী শস্যক্ষেত্র রচনা করে। ইহারা শীতের সময়ে পাহাড়ের পার্শ্বে প্রসারিত জঙ্গল কাটিয়া ফেলিয়া গাছগুলিকে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করে এবং বর্ষার বারিধারা নামিয়া আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই পরিষ্কৃত স্থানগুলিতে শস্যবীজ বপন করে। ভাতই প্রধান খাদ্য বলিয়া ইহারা সাধারণতঃ ধান্যের চাষই করিয়া থাকে। ইহাদের শস্যের মধ্যে ধান্যের পর ভুট্টার নাম উল্লেখযোগ্য। এই কৃষিকার্য্য ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদিত না হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সমগ্র পল্লীবাসী সম্মিলিত ভাবে পরিশ্রম করিয়া এই সকল ক্ষেত্র কর্ষণপূর্ব্বক বীজবপন করে। পরে শস্য পাকিলে উহা সকলে মিলিয়া কাটিয়া নিজ নিজ পরি-

রণ-নৃত্য-রত যুবকবৃন্দ

বারের প্রয়োজনানুযায়ী ভাগ করিয়া লয়। যে সাম্যমূলক সমাজ-তন্ত্রবাদ সোভিয়েট রুশিয়া দ্বারা আজ বজ্রনির্ঘোষে বিঘোষিত হইতেছে, ভারতসীমান্তের এই সভ্যতাশূন্য সম্প্রদায়গণ সেই সাম্য-মন্ত্রে সেই সমাজতন্ত্রে কোন দূর অতীতে দীক্ষালাভ করিয়াছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে পরিশ্রম করিয়া পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যতগুলি প্রয়োজন সেই পরিমাণই লইয়া থাকে—বলশেভিক বা সোভিয়েট ব্যবস্থার সহিত এই ব্যবস্থার অপূর্ব্ব সাদৃশ্য অস্বীকার করিবে কে?

ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত হুকাং উপত্যকা নাগাদের অন্যতম এবং পশ্চিমতম বাসস্থলী। এই উপত্যকার পশ্চিমে, উত্তরে এবং পূর্ব্বে সমুচ্চ শৈলশ্রেণী। পশ্চিমে আসাম ও ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত পুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে বলা চলে। পূর্ব্বে ইরাবতী ও হিন্দুইন নদের অববাহিকার মধ্যবর্ত্তী শৈলমালা। উত্তরে সেই গিরিশ্রেণী যাহা এই অববাহিকাদ্বয়কে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা হইতে বিভক্ত করিতেছে। এই সকল পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সিঙ্গপো এবং নাগা এই দুইটী দুর্দ্দমনীয় পার্ব্বত্য সম্প্রদায় বাস করে। এই পর্ব্বত-প্রাকার পরিবেষ্টিত অরণ্যানী সমাকীর্ণ দুর্গম উপত্যকার অধিবাসী নাগারা অপেক্ষাকৃত অধিক, ভীষণ স্বভাবের বলিয়া আমাদের মনে হয়। মণিপুর রাজ্যেও বহু নাগা বাস করিতে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের পূর্ব্বে ও উত্তর পূর্ব্বেও ইহারা অবস্থান করে। একা মণিপুরেই ১ লক্ষ নাগা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নাগারা যে-যেখানেই থাকুক, শত্রু মস্তক সংগ্রহ করা, শত্রুপক্ষীয় লোককে নাটের নিকট বলি দেওয়ার প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। তবে দুর্গমতর অঞ্চলের অধিবাসীরা এইরূপ নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান যত সহজে সাধন করিতে পারে, অপেক্ষাকৃত সুগম স্থানের নাগাদের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। হুকাং উপত্যকা প্রায় ৩ হাজার মাইল ব্যাপিয়া বিরাজিত। পূর্ব্বে ইউরোপীয়রা এই পর্ব্বত বেষ্টিত উপত্যকায় পদার্পণ করেন নাই বলিলেই হয়। মিঃ ডবলিউ এ হাজই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বর্ব্বর পার্ব্বত্য-সম্প্রদায়সমূহ অধ্যুষিত রহস্যরাজ্যস্বরূপ এই উপত্যকা পরিভ্রমপূর্ব্বক ইহার লোক সংখ্যা ১৬ হাজার মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই ১৬ হাজারের ভিতর ৪ শত ২৫ জন শান। অবশিষ্ট সকলেই নাগা বলিয়া অনুমান। সংখ্যায় স্বল্প হইলেও হুকাংবাসী নাগারা ভীষণ স্বভাবের পরিচয় প্রদান করে। মণিপুরবাসী নাগারা

অপেক্ষাকৃত শান্তভাবাপন্ন ও যৎসামান্য সভ্যতালোকপ্রাপ্ত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তবে মণিপুর রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তবাসী আঙ্গামী নাগাদের মধ্যে নরবলি প্রদানের প্রথা প্রচলিত থাকার প্রমাণ অনেকেই পাইয়াছেন। মণিপুরের অন্যান্য অংশের অধিবাসী অন্যান্য নাগা সম্প্রদায় অপেক্ষা আঙ্গামীরা বর্ব্বরতর ও অধিকতর ভয়ঙ্কর, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

হুকাঙ্গ উপত্যকার পশ্চিমাংশকে শাসনশূন্য অঞ্চল বলা চলে। এই অশাসিত প্রদেশের দক্ষিণাংশে যে সকল নাগা বাস করে তাহাদের ভিতর শত্রুমস্তক সংগ্রহ করার প্রথা প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলের উত্তরাংশের নাগাদের মধ্যে শত্রুশির আহরণের ঘৃণ্য প্রথা প্রচলিত নাই বটে কিন্তু নাটের নিকট নরবলি দিবার জঘন্য নিয়ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। দক্ষিণাংশের শত্রুশির সংগ্রহকারী সম্প্রদায়গণের নিকট হইতে ইহারা বলিদানের জন্য লোক লইয়া আসে বলিয়া শুনা যায়। অর্থ দিয়া কিনিয়াও আনা হয়। সময়ে সময়ে কোন কোন সম্পন্ন নাগা ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত দিয়া

'লার-ফান' বা পবিত্র প্রস্তরাবলী

বলিদানের জন্য মানুষ স্থানান্তর হইতে আনার কথা জানা যায়। নরবলিদান বলি-প্রথা গৃহীর পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর ও পুণ্যজনক, এইরূপ বিচিত্র বিশ্বাস ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। এ বিষয়ে সভ্যতালোকশূন্য নাগাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সভ্যতাভিমানী সম্প্রদায়রাও এইরূপ বিশ্বাসের দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই পশু বলি দিয়াছে এবং ভারতবর্ষে এখনও দিতেছে। যাহাকে বলিরূপে হত্যা করা হইবে, কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া তাহার অনুভবশক্তি, বোধশক্তি ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া ফেলার নিয়ম নাগাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত আছে। বলিদানের অব্যবহিত পূর্ব্বেও হতভাগ্যকে মদ্যাদি দ্বারা এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলা হয়, যে জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে সঙ্ঘটিত ঘটনা সম্বন্ধে কোন অনুভূতিই তাহার থাকে না। সে পূর্ণরূপে পশুতেই পরিণত হয় বলা চলে।

অনেকের মতে আঙ্গামী নাগারাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর স্বভাবের পরিচয় প্রদান করে। শত্রুশির সংগ্রহকারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ইহাদিগকে প্রধান স্থান প্রদান করিলে ঠিকই করা হয়। আঙ্গামী নাগাদের পরিচ্ছদ অনেকটা উত্তর আসামের অসভ্য আবর নামক সম্প্রদায়ের অনুরূপ। তিব্বতীয় চুপা নামক বস্ত্রের অনুরূপ এক প্রকার বস্ত্রখণ্ড ইহারা পরিয়া থাকে। ইহা এত ছোট যে হাঁটু পর্য্যন্তও আসে না। তবে পূজাপার্ব্বনাদির সময় একজাতীয় বৃহৎ বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। পরিচ্ছদ যাহাই হউক, ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি অতিশয় ভীষণদর্শন। মুখের নির্ম্মম ভাব এবং এই সকল ভয়াবহ অস্ত্র বিপক্ষের বক্ষে শঙ্কা সঞ্চারিত করা স্বাভাবিক। এক প্রকার ক্ষুদ্র, বক্র, শাণিত ছোরা ইহাদের শস্ত্রসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর বলিলে ভুল হয় না। করধৃত সুদীর্ঘ বর্শাও কম শঙ্কাজনক নয়। নাগারা শস্ত্রসমূহে সজ্জিত হইয়া যখন রণ-নৃত্যে মত্ত হয়, তখন সত্য সত্যই রৌদ্র-রসকে মূর্ত্ত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মত্ততার সময় নির্ম্মমতম কার্য্য করিতেও কণামাত্র কুণ্ঠা ইহারা অনুভব করিবে না, এই সত্য সংশয়াতীত। একপ্রকার বংশনির্ম্মিত ধনু ইহারা ব্যবহার করে। ধনুর্গুণও বাঁশ হইতেই প্রস্তুত। তীরের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ ফিট এবং ইহার অগ্রভাগ বিষাক্ত। ধনুর একটি প্রান্তকে লৌহমণ্ডিত করা নিয়ম। এই লৌহমণ্ডিত প্রান্তটিকেও স্বতন্ত্র আক্রমণাস্ত্ররূপে ব্যবহার হইতে দেখা যায়।

প্রত্যেক নাগাপল্লীতে একটি বিলাসী বাবুর দল অবশ্য দেখা যায়। উৎসবের সময় ইহারা জমকাল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া অদ্ভুত দৃশ্য প্রকটিত করে। নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র নানা রঙের মাদুলি, পশুলোম ও পক্ষীর পালকে মণ্ডিত শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিয়া এবং ধনুর্ব্বাণ ও বর্শা হাতে লইয়া যখন ইহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় তখন অত্যন্ত বিচিত্র দৃশ্য দৃষ্ট হয় বলা চলে। বর্শার অগ্রভাগগুলি লাল ও নীল রঙের অশ্বলোমে আচ্ছাদিত। বর্শার ফলকটিতে প্রায় দুই ইঞ্চি দীর্ঘ মনুষ্যলোম বা কেশ ঝুলিতে দেখা যায়। নৃত্য করিবার সময় দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দাঁড়ায় এবং পরস্পর মুখোমুখী হইয়া কেকা বা দামামার তালে তালে উচ্চ ও অনুনাসিক স্বরে এক প্রকার শব্দ করিতে করিতে ইহারা নাচিতে আরম্ভ করে। এই অনুনাসিক শব্দটির ভিতর এক প্রকার বিচিত্র করুণ সুর বিদ্যমান থাকে।

নাট নামক উপদেবতাদিগকে ফল ও দুগ্ধের দ্বারা তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করা হয়। সাধারণতঃ মোরগ বলি দেওয়াই নিয়ম। আমরা সাঁওতাল প্রভৃতি বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের আরণ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যেও মোরগ বলির প্রথাই অধিক প্রচলিত দেখি। প্রত্যেক গ্রামের প্রবেশপথে কতকগুলি পর্ব্বত ও প্রস্তর খণ্ড থাকে। প্রস্তরগুলিকে নাগারা 'লাকফান' আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। এইরূপ প্রস্তর পূজা পূর্ব্বে ইউরোপেও প্রচলিত ছিল। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও এইরূপ প্রস্তর খণ্ডসমূহের অবশেষ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। শত্রু-শির সংগ্রহকারী নাগারা তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত নিষ্ঠুরতম অনুষ্ঠানগুলির অব্যবহিত পরে এই সকল পবিত্র প্রস্তরখণ্ড সমূহের পার্শ্বে আসিয়া তাহাদের সংগৃহীত শত্রু-শিরগুলি তথায় রাখিয়া এক প্রকার প্রতিজ্ঞাবাক্য বা সঙ্কল্পবাণী উচ্চারণ করে। এই সকল প্রস্তরের নিকট বলি বা উপহার প্রদান করার প্রথাও নাগাদের মধ্যে প্রচলিত।

একুল ভাঙে ওকুল গড়ে…

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার ঘোষ

দামী সিগারেট-কেস থেকে একটা বিড়ি বে'র করে বিভূতি কেসটির উপর ঠুকতে থাকে। অভ্যাস হয়ে গেছে। দু'মাস আগে ঠিক এমনি করেই ওটার উপর মূল্যবান সিগারেট ঠুকত। মিলিটারীর চাকরি একটা অকস্মিক ঢেউয়ের মত এসে তাকে উচ্ছ্বসিত ফেন-শীর্ষ পর্য্যন্ত তুলে আবার হঠাৎ ফেলে দিয়ে গেল সেই পুরানো জীবনের তটে। চারটি বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তনই না ঘটে গেল। চারটি বৎসর ধরে পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণের কাহিনী, যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা, এই সব নিয়ে সৈনিক-জীবনের একটা স্মৃতি লিখেছিল সে। আজ তারই উপর শেষ কলম চালাতে বসে চার বছর আগের কথাই তার মনে পড়ছিল।

চারটি বছর আগে শিলচরার কয়জন লোকই বা তাকে চিনত? আর খ্যাতি-অর্থও এমন কিছু ছিল না। তবু প্রতিভা সেদিন তাকে কত ভালই না বাসত। হয়তো তার জন্যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হত না। বিভূতি সেদিন ছিল প্রতিভার অবৈতনিক শিক্ষক, এবং শিক্ষার সঙ্গে প্রতিভাকে সে ভালবাসার দীক্ষাও দিয়েছিল। বিভূতির মনে পড়ে, সে একদিন প্রতিভাকে কৌতুক করে বলেছিল, প্রতিভা, তোমাকে আর বেশী ধরে পড়াব না; আমার ভয় হচ্ছে তুমি হয়তো পাশ করে যেতে পার।

সবিস্ময়ে প্রতিভা বলেছিল, আমি পাশ করে যাব বলে আপনার ভয় হচ্ছে?

সে উত্তর দিয়েছিল, হাঁ, হ'তনা, যদি জানতাম তোমার পাশ করার পর আমার শিক্ষকতার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে না।

প্রতিভাও টিপ্পনি কেটেছিল, শিক্ষকতার উপর বড় আসক্তি দেখছি যে?

বিভূতি বলেছিল, আসক্তি কিসের উপর সে তো বেশ বুঝতেই পারছ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ প্রতিভার হাত দু'খানা চেপে ধরে উচ্ছ্বাস ভরে বলে উঠেছিল, অনেকদিন বলি-বলি করে বলা হয়নি, আজ একটা প্রস্তাব করব, তোমার মতামত ঠিকমত বলবে কি? আপত্তি বা সম্মতি, ঠিক মনের কথাটি জানাবে। বল জানাবে তো? প্রতিভা লজ্জা-রক্তিম মুখে বলে উঠেছিল. আমি কি জানি, দাদুকে বলগে না?

বিভূতি হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, উঃ, ছাত্রী আমার কি বুদ্ধিমতী, প্রস্তাব শুনার আগেই সব বুঝে ফেলেছেন।

লজ্জায় প্রতিভা দু'হাতে আঁচল দিয়ে রক্তিম মুখখানি ঢেকে ফেলেছিল। লাজুক প্রতিভা, মনের কথা মুখে বড় একটা প্রকাশ করে বলত না। কিন্তু অধীর ব্যাকুলতায় সে মনে এবং মুখের কথায় এক হয়ে ধরা দিয়েছিল সেইদিন, যেদিন মিলিটারীতে নাম লিখিয়ে বিভূতি বিদায় নিতে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রতিভার সে কী উচ্ছ্বসিত কান্না। পিতৃমাতৃহারা মাতুলালয়ে প্রতিপালিতা প্রতিভা, এক মাতামহ ছাড়া আর যাকে আপন বলে জানত সে বিভূতি।

তার হাতখানি ধরে শেষ অনুনয় করে প্রতিভা বলেছিল, যুদ্ধে না গেলেই নয়? নাম কাটিয়ে দিলে হয় না?

সান্ত্বনা দিয়ে বিভূতি বলেছিল, সে হয়না—প্রতিভা. কিছু ভেবনা; আমি আবার ফিরে আসব।

বিভূতি যুদ্ধে চলে গেল।

তারপর……?

তারপর এল জ্ঞাতি-বন্ধুর প্রশংসা-নিন্দার ভয়-মুক্ত বেপরোয়া জীবনের আহ্বান। সুদূর প্রবাসে বিভূতি, ওরফে ক্যাপটেন মিটারের বেপরোয়া দিনগুলি হুইস্কির গোলাপী আমেজে রঙিন হয়ে উঠল। প্রতিভার স্মৃতি কর্পূরের মত গেল উবে। প্রতিভা একটি চিঠি দিল তার কাছে—সে চিঠিতে বিরহের মর্ম্মান্তিক বেদনার সঙ্গে আত্ম-সমর্পণের কী সকরুণ সুর! ক্যাপটেন মিটার শ্বেতাঙ্গিনী সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলে শুধু। প্রতিভাকে সে কোমল মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছু ভাবতে পারে না এখন। লজ্জাহীনতার শেষ ধাপে পৌঁছাতে বেশী দিন লাগল না বিভূতির। দু'বছর পরে বিভূতি বাড়ী ফিরল ছুটিতে। সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী। স্থানীয় লোক অনেকে বললে, বিয়ে করে এনেছে, অনেকে বললে, নয়। অনেকে ধিক্কার দিলে, অনেকে বাড়ীতে গিয়ে দেখা করে এল, গায়ে পড়ে। প্রতিভা শুনল, কিন্তু কি ভাবল বা না ভাবল সে কথা চিন্তা করার মত সময় ক্যাপটেন মিটারের ছিল না।

আরও দু'বছর কাটল। মত্ত, উদ্দাম ক্যাপটেন মিটার কোনও শ্বেতাঙ্গিনীর মোহে কঠিন সামরিক নিয়মানুবর্ত্তিতার ব্যাপারে করল মারাত্মক ভুল। চাকরি গেল। সঙ্গে রইল শ্বেতাঙ্গিনী। ফিরে আসতে হ'ল কলকাতায়। স্বপ্নের মত কিছুদিন কেটে গেল। সহসা একদিন তার সহচরিণী বেড়াতে গিয়ে আর ফিরে এল না। ক্যাপ্টেন মিত্র, তার সৈনিক জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থও যথাস্থানে খুঁজে পেল না।

সর্ব্বঃসান্ত বিভূতি দেশে ফিরল ; আবার সেই যুদ্ধ-পূর্ব্ব বৈচিত্র্যহীন জীবন। এ-জীবন তার ভাল লাগে না। এই দেশ, এ-দেশের নরনারী কত পিছনে পড়ে আছে। কোথায় সে চোখ ঝলসানো, প্রাণ-মন বিক্ষুব্ধ-করা বিচিত্রতা। তবু হয়ত তার মনে শান্তি দিতে পারে একমাত্র প্রতিভা। মনে পড়ল প্রতিভার সেই বিদায়-বিধুর চিত্তের কাতরোক্তি, মনে পড়ল তার সজল চোখের শেষ মিনতি। আত্মপ্রত্যয়হীনা পরনির্ভরশীলা প্রতিভা হয়ত তাকে ক্ষমা ক'রে তার হাতে নিজেকে সপে দিতে এখনও পারে।

সৈনিক-জীবনের স্মৃতির পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সে বেরিয়ে পড়ল। সহরের মধ্যে বড় রাস্তাটার দিক থেকে কাদের যেন মিলিত কণ্ঠের জয়ধ্বনি অনেকক্ষণ থেকে তার কাণে আসছিল। কাছাকাছি এসে দেখল, রাস্তার দু'পাশে বিরাট জনতা। সামরিক বেশ পরিহিত একদল স্বেচ্ছাসেবক ব্যাণ্ড বাজিয়ে জনতার মাঝ দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সহস্র সহস্র কণ্ঠের মিলিত জয়ধ্বনি উঠল "ঝাঁসীর রাণীবাহিনী-কী জয়" "প্রতিভা দেবী কী-জয়।" মরিয়া হয়ে ভীড় ঠেলে বিভূতি এগিয়ে যাচ্ছিল। ধাক্কা লাগায় কয়েকজন লোক মারমুখো হয়ে উঠল, আচ্ছা অভদ্র তো, ঠেলছেন কেন ? দু'একজন তাকে জোরে ধাক্কাই দিয়ে দিল। ক্ষণেকের জন্যে তার ক্যাপ্টেনী মেজাজ উদ্ধত হয়ে উঠল। আত্মসম্বরণ করে রুদ্ধ আক্রোশে অপমান সহ্য করেও সে এগিয়ে গেল—দেখল দু'পাশের আনন্দকরতালি আর জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে স্থানীয় ঝাঁসীর রাণীবাহিনী সামরিকবেশে মিলিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। পুরোভাগে অধিনায়িকা প্রতিভা। তার চোখে-মুখে ত্যাগ আর উদাসীনতার সাথে সৌন্দর্য্য-তেজের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। তারপর শোভাযাত্রার কেন্দ্রস্থলে এলেন আজাদ-হিন্দ বাহিনীর গৃহপ্রত্যাগত সৈনিক ; তাঁরই সম্বর্দ্ধনা আজ।

শোভাযাত্রার পিছু পিছু বিভূতিও বৃহৎ ময়দানে বিরাট জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে জাতীয় বাহিনীর পরম সম্মানীয় সৈনিক আসন গ্রহণ করেছেন। প্রতিভা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে নিজের রক্ত দিয়ে তরুণ সৈনিকের ললাটে রক্ততিলক এঁকে দিল। স্বাগত সঙ্গীত আরম্ভ হল।

পাগলের মত বিভূতি জনতা ভেদ করে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপন মনে পথ চলতে লাগল।

অস্তরবির শেষ রশ্মিচ্ছটা তরুশীর্ষে তখনও লেগে আছে। নির্জন নদীতীরে বিভূতি একা বসে। একটা পালতোলা নৌকা চলে গেল,—মাঝির কণ্ঠে সেই পুরাণো গান,—"এ-কূল ভাঙে ও-কূল গড়ে এই তো নদীর খেলা..."

বিভূতি ধীরে ধীরে জলের ধারে নেমে গেল। সৈনিকজীবনের স্মৃতির পাণ্ডুলিপিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিল। নগরের ভিতর থেকে মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ এল "জয়হিন্দ"। বোধ হয় সভা শেষ হল। নদীর শীতল জলে হাতমুখ সিক্ত করে বিভূতি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে লাগল।

সন্ধ্যাকাশে তার চোখের উপর তখন দু'টি তারা দীপ্তি পাচ্ছে।

আমাদের শিক্ষা বিকৃত হইয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষের রাজ্য-পরিচালনার ভার বিদেশীর হস্তে রহিয়াছে। যেদিন আমাদের শিক্ষা যথার্থ হইবে, সেইদিনই আমাদের রাজ্য-পরিচালনার ভার আমাদের হাতে ফিরিয়া আসিবে, কাহারও বাধা দিবার সামর্থ্য থাকিবে না—

বঙ্গশ্রী—পৌষ : ১৩৪২

বেগার মাই নেবার

শ্রীঅলকা মুখোপাধ্যায়

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমার অসংলগ্ন অভ্যাসের মতন এবার কয়েকটি তথ্যের অবতারণা করব। কয়েকটি তথ্য জানা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম ও খুব সাধারণ তথ্য—ভারতবর্ষ একটা অৰ্দ্ধ-মহাদেশ। মধ্য, কারণ অষ্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকার মতন চারিদিকে জলরাশি পরিবেষ্টিত নয়। য়ুরোপও মধ্য মহাদেশ, কারণ য়ুরাল পর্ব্বতের মধ্যে রয়েছে তার এসিয়ার সঙ্গে সংযোগ, যেমন হিমালয় হল ভারত ও এসিয়ার সংযোগ। এসব জানেন? জানলেও আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যে, অনেক ইংরেজ ভারতবর্ষে গিয়েও একথা ঠিক বিশ্বাস করেন না। একটা লাট-প্রাসাদ থেকে অন্য একটাতে যদি যাওয়া যায়, ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরায় নিশ্চিন্তে রাত কাটিয়ে আর অল্প সংখ্যক ইংরেজ কিম্বা তার কোনও অল্প সংখ্যক ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে, তাহ'লে, ভারতবর্ষ জায়গাটা যে নেহাৎ ছোট, এ ধরণের ধারণা হওয়া বিচিত্র নয়। পড়ার বইতে কিম্বা মানচিত্রে যদি ভারতবর্ষকে দেখি ছোট একটা ত্রিভুজের মতন, পাশের পাতার ছোট্ট দ্বীপ উইটের চাইতেও ছোট, তাহ'লে সমস্ত জীবনব্যাপী এ ধরণের বিশ্বাস হওয়া স্বাভাবিক যে, ভারতবর্ষ অত্যন্ত ছোট জায়গা, ছোট অর্থে অত্যন্ত সাধারণ, কালা-আদমির আবাসস্থল, অস্বস্তিকর ও অস্বাস্থ্যকর। কাজেই য়ুরোপের মানচিত্রের ওপর ভারতবর্ষের মানচিত্র বসিয়ে বিচার করে দেখা যাক।

ম্যাপ দেখলেই বোঝা যাবে যে, ভারতের মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব য়ুরোপ আয়ারল্যাণ্ড এবং রুমানিয়া অথবা সুইডেন এবং গ্রিসের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের প্রায় সমান, কিন্তু যা বোঝা যাবে না এবং যা অনেকেই বোঝেন না, তা হল এই যে, এই দূরত্বের অনুপাতে পার্থক্যও ঠিক ততখানিই হ'তে পারে। কিন্তু পার্থক্য বিচার করতে গেলে অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন। আমরা ইংরেজরা যেমন জাপানী ও চিনাম্যানের মধ্যে পার্থক্য দেখলেই বুঝতে পারব' না, কিম্বা বলতে পারব' না, য়ুনানের চিনাম্যান ও মানচুরিয়ার চিনাম্যানের মধ্যে প্রভেদ কতখানি, তেমনি একজন চিনাম্যান কিম্বা ভারতবাসী য়ুরোপীয়দের মধ্যে পার্থক্য বিচার একটা সমস্যা মনে করবে। ভারতীয় কৃষক সব য়ুরোপীয়দের বলে "সাহেব", যেমন আমরা বলি "ভারতবাসী"—পাঞ্জাবী, বাঙালী, মাদ্রাজী, গুজরাটি ইত্যাদির মধ্যে প্রভেদ করিনা, ভুলটা দু'দলেরই 'প্রায়' সমান হ'লেও 'ঠিক' সমান নয়। আমার মনে হয় য়ুরোপের চাইতে ভারতবর্ষ বেশী মিলিত হবার চেষ্টা করেছে! সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে য়ুরোপ যুদ্ধ করেছে, ভাগ হয়েছে এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্যবধান ভারতের চাইতে সুস্পষ্ট ভাবে বজায় রেখেছে। বিভিন্ন রাজত্বে, বিশেষ করে অশোক, আকবর প্রভৃতি রাজন্যবর্গের শাসনাধীনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ মিলিত হবার অনেকখানি কাছে গিয়েছিল। য়ুরোপে তা কখনও হয়নি। 'কেন' অথবা "কেমন করে"—এসব বিচার মুলতুবী রেখে বলা চলে চল্লিশ কোটি ভারতবাসী পঞ্চাশ কোটি য়ুরোপীয়দের চাইতে বেশী "মিলন-প্রয়াসী"। অবশ্য এ কথা বলা চলে না যে, তাদের মধ্যে পার্থক্য খুব কম। ভারতবর্ষে এগারটি প্রদেশ, তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন ভাষা (কোনো কোনো প্রদেশে আবার দুটি!) এবং ৫৬২টি করদ রাজ্য। য়ুরোপে সাতাসটি দেশ (হিটলারের দাবী অস্বীকার করে!) এবং তার মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় প্রদেশ-গুলির চাইতে অল্পায়তন।

এবার ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের ম্যাপ দুটি পাশাপাশি রেখে দেখা যাক।

ম্যাপে ভারতীয় করদ রাজ্যগুলিকে যা' দেখানো হয়, তাহাতে এদের সর্ব্বসমেত আয়তন প্রায় সাতলক্ষ বর্গ-মাইল, ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আয়তন ন' লক্ষ। আয়তনে করদরাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতবর্ষের চাইতে খুব ছোট না হ'লেও, জনসংখ্যায় অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাদের জনসংখ্যা ন' কোটি, ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যা এক'ত্রিশ কোটি। এই জনসংখ্যার তারতম্যের কারণ আমার জানা নেই—হয়ত' ব্রিটিশ ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী অত্যধিক আকর্ষণীয়, কিম্বা এখানকার জীবিকা নির্ব্বাহের পদ্ধতি সহজ অথবা দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনে লোকের অনাস্থা। কিন্তু ভারতবর্ষের এই প্রথম বিভক্তি অপ্রধান নয়। সর্ব্ব সমেত ৫৬২ জন রাজা কিম্বা রাজকীয় ভাবাপন্ন জমিদার আছেন—তাঁদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগে কেউ উন্নত, কোন কোন রাজ্যে বিশিষ্ট শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত, যেমন মাইশোর ও হায়দ্রাবাদে, আবার ছোট ছোট রাজা ও নবাবও আছেন যাঁদের রাজত্বের আয়তন যে কোন ব্রিটিশ কৃষকের জমিদারীর চাইতে বড় নয়। কোন কোন রাজ্যে সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের সূচনা হ'য়েছে অথবা হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে এই রাজ্যগুলি 'প্রভুত্ববাদী', অতএব, সিনেটার ওয়ালেসের (Senator Wallace) সঙ্গে একমত হ'য়ে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, "বর্ত্তমান যুগ সাধারণ মানুষের যুগ", তাদের এদের মেয়াদ

খুবই অল্প। করদ-রাজ্যে বেসামরিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নেহেরুর নেতৃত্বে States peoples Conference এই পরিণতিরই ইঙ্গিত করে যদিও, ব্রিটেন এই সব রাজন্যবর্গের সঙ্গে বহুকাল প্রবর্তিত "স্বাধীনতা-প্রতিশ্রুতি" চুক্তিতে আবদ্ধ। তাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রিটিশ ক্রাউনের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত—অথচ ভারত সরকারের অন্তর্ভুক্ত তাঁরা নন। এ থেকেই বোঝা গেল 'মিলিত' অথবা 'সম্মিলিত' ভারতের পক্ষে এঁরা একটা জটিল প্রশ্ন। হয় ব্রিটেনকে চুক্তি ভঙ্গ করতে হবে, না হয় সম্মিলিত ভারতের মধ্যে এঁদের সংযোজিত করতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যবর্গের সিংহাসন যত টল্‌মল্ করবে, এঁরা ততই সংরক্ষণকারী ক্ষমতাকে আঁকড়ে ধরবেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রভুত্ববাদীতার উচ্ছেদাকাঙ্ক্ষী ক্ষমতা ক্রমেই স্ফীত হ'য়ে উঠবে।

ক্রীপস্ প্রস্তাবে রাজন্যবর্গের বিষয়ে দুটি ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল—

(১) যুদ্ধের পর নব-প্রবর্ত্তিত শাসন প্রণালীতে রাজন্যবর্গ যোগ দিতে ইচ্ছুক হন আর নাই হন, নব-পরিস্থিতি অনুযায়ী পুরাতন চুক্তিপত্রের পুনরালোচনা প্রয়োজন।

(২) ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের মতন করদরাজ্যগুলিকেও জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তাঁদের ওপর ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের মতন দায়িত্বভার অর্পণ করা হবে।

এই প্রস্তাবের প্রত্যুত্তরে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি বলেন: "করদ রাজ্যের ন' কোটি প্রজাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা এবং রাজন্যবর্গের হাতে তাদের পণ্যদ্রব্যের মতন সমর্পণ করা কেবল গণতন্ত্রই নয়, স্বায়ত্ব শাসনেরও প্রতিবন্ধক। শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তন পরিষদে জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হলেও করদ-রাজ্যের প্রজাদের ওপর সেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কোন স্তরেই তাদের পরামর্শ নেওয়া হবেনা। এই সব করদ রাজ্য নানান বিষয়ে ভারতীয় স্বাধীনতার অন্তরায় হয়ে উঠবে, হয়ত' হ'য়ে উঠবে বিদেশী প্রভুত্ববাদীতার সংরক্ষণ-কেন্দ্র এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী অস্ত্র সজ্জিত বিদেশী সৈন্য থাকার দরুণ কেবল স্থানীয় প্রজাদেরই নয়, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতারও প্রতিবন্ধক হ'য়ে উঠবে।"

ভারতের এই করদ-রাজ্য সম্পর্কীয় বিভক্তি স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কারণ এই সমস্যা ভবিষ্যতে আরও জটিল হ'য়ে উঠবে; এবং ক্রীপস্ প্রস্তাব অননুমোদিত হবার অন্যতম কারণ ছিল ভারতরক্ষা সমস্যার জটিলতায় প্রচ্ছন্ন এই সমস্যা।

এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে "ভারতবর্ষ ও গণতন্ত্র" বই-এ গে উইগুের মননশীল রচনা থেকে আমি কিছু অংশ উদ্ধৃত করব:—

"কয়েকাংশে রাজন্যবর্গের ভারতবর্ষ ১৮৬৬ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী জার্ম্মানীর মতন। সেখানেও ছিল অসংখ্য রাজন্যবর্গ, সেখানেও ছিল একনৈতিক অনুভূতি, স্বার্থপরতার আতিশয্যে প্রচলিত অবস্থাকে সুরক্ষিত রাখার প্রচেষ্টা। কিন্তু সেই সঙ্গে ছিল ক্রম বর্দ্ধিষ্ণু অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক সুবিধা এবং মিলনাকাঙ্ক্ষী জাতীয় অনুভূতি; আর ছিল উন্নত পৃথিবীর প্রতীক, উন্নত রাজনৈতিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত পরম শক্তিসম্পন্ন প্রতিবেশীর ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু প্রভাব।"

আমার মতে এইটিই হল ভারতবর্ষের প্রথম বিশিষ্ট বিভাগ। প্রথম, কারণ বর্ত্তমানে এই প্রশ্ন খুব জটিল হ'য়ে না উঠলেও ভবিষ্যতে মিলিত ভারতের শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তনে এই সমস্যা বিশেষ একটি অন্তরায় হ'য়ে উঠবে। বর্ত্তমান ভারত সরকারের মনোভাব, যুদ্ধকালীন অবস্থায় রাজন্যবর্গের "রাজভক্তি" ও বদান্যতা এবং "চুক্তির" প্রতি ব্রিটেনের সম্মান—এই সবের সমন্বয়ে সমস্যার জটিলতা। এই সমস্যা সমাধানে রাজন্যবর্গের উচ্ছেদ যে একমাত্র উপায় তাতে কোন সন্দেহই নেই, কিন্তু তাঁদের অবস্থিতি কতদিন যে সন্তোষজনক ঐক্যতার প্রতিবন্ধক হ'য়ে থাকবে, সে কেবল জনমতের ওপর নির্ভর করেই বলা চলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রধান বিভাগ হল—সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা—বিশেষতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের। এ সমস্যা এত' জটিল, এত' সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় এবং এত সূক্ষ্ম যে এ বিষয়ে আলোচনা করতে আমি দ্বিধান্বিত। যে কোন ইংরেজের পক্ষে এ সমস্যা আলোচনা করা শক্ত কারণ হিন্দু অথবা মুসলমান দু'দলেরই মনোভাব অনুভব করা কঠিন। অথচ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু লেখবারও দুঃসাহস যার আছে, এ প্রশ্ন কোন রকমেই সে এড়িয়ে যেতে পারে না।

অতএব সাধারণ কয়েকটা তথ্য নিয়ে আরম্ভ করা যাক। যতদূর জানা যায় হিন্দু ভারতের আরম্ভ প্রায় তিন হাজার বছর আগে। আক্রমণকারী মুসলমান শক্তি উত্তর দিক থেকে আক্রমণ ক'রে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উত্তর ভারত অধিকারে রাখতে সক্ষম হয়। এ বিষয়ে দুটো জিনিষ মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায় এবং এ দেশকে দেশ ব'লে মেনে নেবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সংস্কৃতিকেও অল্পবিস্তর স্বীকার ক'রে নেয় (মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্রিটেনের অনুরূপ, তারা এদেশে বসবাস স্থাপন করে)। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে পাঁচশো বছর আমাদের সংকীর্ণ ইতিহাসের পাঁচশো বছরের চাইতে অনেক কম। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সুফল সম্রাট ও রাণী এলিজাবেথের সমসাময়িক সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সমগ্র ভারতবর্ষ মুসলমান রাজ্যের অধীনে মিলিত হয়েছিল। প্রবল বিক্রমশালী, উদারচেতা ও আদর্শবাদী আকবর সমগ্র ভারতকে দিতে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রভাষা-উর্দ্দু-তাঁর সৈন্য শিবীরের ভাষা এবং সম্ভবতঃ এক ধর্ম্ম-যার প্রচলন তিনি বহু বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বহুকাল ধরে আলোচনা করেছিলেন এবং নিজের উদ্দেশ্য ও বাসনা সপ্রমাণ করবার জন্যে, চারটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিয়ে করেছিলেন। এ ধরণের সু-প্রচেষ্টার ছায়া পড়ে ইতিহাসে। তাহ'লেও, মুঘল সম্রাটের অধীনে হিন্দুধর্ম্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, বরঞ্চ 'ব্রিটিশ রাজত্বে আরও অধিকতর সংঘবদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল'। মূলতঃ বলা চলে, ঠিক যেমন বিজয়ী মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় ক'রে পরবর্ত্তী বিজেতা ব্রিটিশদের অপছন্দ করে, তেমনি পরাজিত হিন্দুরা নতুন বিজেতাম আগমণে নিজেদের অবস্থা উন্নত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে এ উদাহরণ হয়ত' তেমনি বাহুল্যপূর্ণ যেমন এ কথা বলা যে, পরাজিত ভারতবর্ষের চাইতে বিজেতা ব্রিটিশ জাপানীদের বড় শত্রু। তবু, বাহুল্য হ'লেও খানিকটা সত্যতা এ উদাহরণের মধ্যে আছে। মুসলমান রক্তে আছে বিজয়ীর গর্ব্ব, হিন্দুদের রক্তে পরাজয়ের গ্লানি। ভারতবর্ষে যখন ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন হল, মুসলমানেরা তখন নিজেদের ধর্ম্ম ও শিক্ষাকে বড় ক'রে এই নতুন শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করলো বিদ্রূপ ভরে। হিন্দুরা, অন্যান্য অনেক কিছু স্বীকার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন শিক্ষাকেও স্বীকার করে নিলো এবং ফলে সরকারী দপ্তরে তারা হ'য়ে বসলো কণ্ঠহারের মতন। কাজেই, ব্রিটিশ রাজত্বে মুসলমানেরা পড়ে রইল পেছনে—এবং এ কথা বুঝতে তাদের হল দেরী। এমন সময় এল' গণতন্ত্রের জাগরণ, মুসলমানেরা হ'য়ে উঠলো সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। এমনি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়লো ব্যবধান, মতের অনৈক্য, বিবাদ আর সংগ্রাম। অথচ এ অবস্থার জন্য কোন বিশেষ সম্প্রদায় দায়ী নয়—"বিভক্তি শাসন পদ্ধতির" দায়ে অভিযুক্ত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রও নয়।

ভারতবর্ষে মুসলমান সংখ্যা ন'কোটি, হিন্দুর সংখ্যা তার চাইতে তিনগুণ বেশী। মুসলমানেরা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং থাকবেও তাই। কিন্তু, মুসলমানদের যখন আমরা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলি, তখন আমরা কি ভাষার অপব্যবহার করি না? নিজেদের অবিবেচক প্রতিপন্ন করি না? একটা জটিল সমস্যাকে জটিলতর করে তুলি না?—করি বোধ হয়: কারণ মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটেনের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুন এবং ক্যানাডার চাইতে ন'গুন মিলিত উত্তর আমেরিকা মহাদেশে ক্যানাডা সত্যই লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং মুসলমানদের কথা আলোচনা করতে গেলে এই ধরণের উদাহরণ স্মরণ রাখতে হবে। ক্যানাডা আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা করা অসম্ভব নয়, কারণ এই দুই জাতীর এক ধর্ম্ম, এক ভাষা, প্রায় অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, এক পোষাক, লোকাচার এবং আহার, এদের পূর্ব্বপুরুষ অভিন্ন আন্তর্ব্বিবাহ সু-প্রচলিত—এত মিল থাকা সত্ত্বেও যদি ক্যানাডা মনে করে যে, কেন্দ্রী আমেরিকান শাসনতন্ত্র হলে সেই শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক বারোজন প্রতিনিধির মধ্যে তাদের প্রতিনিধি মাত্র একজন, অতএব সেখানে তারা 'লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়'—তাহলে তারা নিশ্চয় ইতস্তত করবে! তারাও কি মনে করতে পারে না যে, ক্যানাডার সব বড় বড় চাকরি আমেরিকানরা দখল করবে, তারা ক্যানাডার স্বার্থের চাইতে মার্কিনী স্বার্থকে বড় করে দেখবে এবং ক্রমে ক্রমে ক্যানাডার সংস্কৃতিকে তারা মুছে ফেলবে? যে দু'টো সম্প্রদায়ের মধ্যে এত মিল, তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণায় যদি বিন্দুমাত্র সত্যতা থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে কত বড় তা সহজেই অনুমেয়! তাদের মধ্যে দুর্লঙ্ঘনীয় ব্যবধান তাদের ধর্ম্ম সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতবাদ, অন্তর্ব্বিবাহের বাধা-নিষেধ, তাদের বিভিন্ন আচার ব্যবহার, আহার, পোষাক সমাজনীতি এবং ভাষা! কাজেই যে ভবিষ্যতে হিন্দুরা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়, এবং যে ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আধিপত্যে মুসলমান সংস্কৃতি ও ভাষা বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং হয়ত তারা স্বকীয়তা হারিয়ে শ্রেণীপ্রধান হিন্দুদের মধ্যে চিরতরে নিম্ন শ্রেণীর পর্য্যায় পর্য্যবেসিত হ'তে পারে—সেই ভবিষ্যতকে ভয় করা এবং সন্দেহের চক্ষে দেখা মুসলমানদের পক্ষে কি অন্যায়? এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে তৃতীয় দল—ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের আধিপত্য। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে সন্দেহ করে হিন্দু ও মুসলমান অথচ তাদেরই হাতে আছে ন্যায়দণ্ডের গুরুভার এবং তারা অন্ততঃ গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে (মুসলমানদের দ্বারা বিজীত নাহ'লে) হিন্দুরা যতখানি মুসলমান স্বার্থকে সংরক্ষিত রাখবে তার চেয়ে বেশী রাখে অথবা রাখবার ভান করে। যে মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের সংস্কৃতি ও

ইতিহাসকে সম্মান করে এবং নিজেদের স্বকীয়তাকে সু-দৃঢ় রাখতে দৃঢ় সংকল্প, সাধারণ ভাবে এই হল তাদের প্রধান সমস্যা !

শিল্পীর দক্ষতা, নিষ্ঠা, উদ্দেশ্য ও অনুপ্রাণের ওপর ছবি নির্ভর করে। আমি এখন পর্য্যন্ত যে ছবি আঁকলাম তা মলিন ও স্থূল, কিন্তু তাহলেও অনেক মুসলমানই আমার এ মতবাদ ন্যায় ব'লে স্বীকার করবেন। এ সমস্যার আরও একটা দিক আছে, কেবল কংগ্রেস-মতাবলম্বীই নন (তাঁরা যে সুপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস রাজত্ব অতএব হিন্দু প্রভুত্ব চান, এমন সন্দেহ অনেকেই করেন) মিলিত ভারতের পক্ষপাতী অন্যান্য বহু স্বাধীন-চেতা ভারতবাসী আপনাকে হয়ত' বলবেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা কোন সমস্যাই নয়, এটা বৃটিশের সৃষ্টি একটা সম্পূর্ণ মনগড়া বিভাগ (বিভক্তি শাসন প্রণালীর আনুকুল্যে!) এবং কয়েকজন গোঁড়া ও স্বার্থান্ধ মুসলমানদের দ্বারা পরিপুষ্ট! আমি এ-ধরনের কথা প্রায়ই শুনে থাকি, আশা করি যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে, এবং আমার মনে হয়, এ মতবাদ সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারলে সুখী হতাম। তবে একথা ঠিক যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এইদিকেই গণমত এগিয়ে এসেছে। ভারতের নব-জীবনে ধর্ম্ম অনুভূতি আর সংস্কারের ভিত্তি টলে উঠেছে। ভারতের পারিপার্শ্বিক জাতীয়তার আবহাওয়ায় এবং ভীতি প্রদর্শনের শঙ্কটে জাতীয় মিলনের একটা ধারা বইছে; বেতার, যানবাহন, ছায়াচিত্র প্রভৃতির মধ্যস্থতায়, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি, আহার, ভাষা ইত্যাদি প্রায় অধিকাংশই এক হ'য়ে আসছে! একথা যেমন সত্য যে, ভারতের সাত-লক্ষ গ্রামে শতকরা ৮৯ জন ভারতবাসী দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ক্রমেই সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারে, দেরী হ'লেও, একত্রিত হ'য়ে উঠবে, তেমনি একথাও ঠিক যে সহরবাসীদের মধ্যেও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমারোহে আর বানিজ্য বিস্তারে ক্রমেই একটি সম্মিলিত-সংস্কৃতির বিস্তার হবে। একথা যেমন অস্বীকার করা চলে না যে, কংগ্রেসপন্থী গান্ধী, নেহেরু এমন কি আজাদ ও মিসেস নাইডু কেবল জনপ্রিয়ই নন, পাশ্চাত্য সংস্কারাচ্ছন্ন জিন্নার চাইতে তারা ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শে অনেক বেশী উচ্চ স্থানীয়—একথাও তেমনি অস্বীকার করা চলে না যে, অসংখ্য মুসলমানের শ্রদ্ধা ও সম্মান পায় কংগ্রেস কিন্তু জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম-লীগ হিন্দুদের শ্রদ্ধা কোনদিনও পাবে না। এসবের ওপর সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে যে, হিন্দু মুসলমানের ভিন্ন মত ও পৃথক পথ হ'লেও আদর্শ এক—বিদেশী শাসন থেকে ভারতের মুক্তি।

এসব আলোচনার পরেও একটা কথা থেকে যায়। ইংরেজের কাছে সাম্প্রদায়িক ব্যবধান তীব্র করার অপবাদ অথবা ভারতকে নিষ্পেষিত করার অভিযোগ যতই মর্ম্মান্তিক হ'ক না কেন, প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গেলে চলবেনা Joint Select Committee-র অভিভাষণে দেখতে পাই "যুক্ত-রাষ্ট্র সাম্রাজ্য প্রচলিত পরিষদ-শাসন" পদ্ধতির ভিত্তি সংখ্যা গরিষ্ঠের রাজ্যতার পরিচালনা, কিন্তু সাময়িক ভাবে সংখ্যা লঘিষ্ঠরা যদি গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মতামত নির্দ্দেশ স্বীকার করে না নেয়, তাহ'লে 'গরিষ্ঠ স... শাসন পদ্ধতি"র দ্বারা রাজ্যশাসন নীতি অচল হ'য়ে প...

জর্জ সুষ্টারের মতন বিচক্ষণ ও হিসেবী লোকও লিখেছিলেন "স্থূলতঃ বোঝা গেল তাহ'লে যে পরিষদী গণতান্ত্রিকতা (দুই সম্প্রদায় ভিত্তিতে) যা ইংলণ্ডে স্পষ্টও প্রচলিত, তা ভারতীয় পরিস্থিতিতে অচল—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তো নয়ই, প্রাদেশিক পরিষদেও বোধ হয় নয়।" একথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করা চলেনা যে, লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন' কোটি লোক তারা যেই হ'ক এবং যাই হ'ক, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন সাংস্কৃতিক আদর্শ অনুপ্রাণিত ও স্থায়ী সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মতামত অথবা নির্দ্দেশ মেনে নিতে পারেনা। এ ক্ষেত্রে ক্যানাডার উদাহরণ বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। ফরাসী-ভাষী কুইবেক্ প্রদেশের সঙ্গে ইংরেজি ভাষী অণ্টারিও (Ontario) প্রদেশের সম্মিলনে অচল অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছিল। সেই অচল অবস্থার অবসান হল তাদের শাসন পরিষদ ভিন্ন ক'রে পরিষদ সম্মেলন গঠন করবার পর। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাদের ব্যবধান, কিম্বা ভালো কথায় বলা চলে, তাদের স্বাতন্ত্র্য অবিচ্ছিন্ন ছিল। আমার মনে হয়, কংগ্রেসপন্থী কেউ অস্বীকার করবেন যে, মুসলমানেরা, অন্ততঃ সাময়িক ভাবে নিজের ধর্ম্মও সংস্কৃতি বজায় রাখতে চাইবে এবং তাদের তা রাখতে দেওয়া উচিৎ। তাহ'লে আসল সমস্যা দাঁড়াল ভিন্ন ধর্ম্ম ও পৃথক সামাজিক আচার পদ্ধতিপূর্ণ স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে সেই স্বকীয়তা বজায় রাখা কি সম্ভব?

এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব। আমেরিকার সঙ্গে সম্মিলিত হ'লে ক্যানাডার সুবিধা হবে কিনা, কিম্বা রক্ষণশীল গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্থায়ী নেতৃত্বে ব্রিটিশ শ্রমিকরা সুযোগ সুবিধা পাবে কিনা সেকথা বলা অনেক সহজ। এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই সমস্যাকে বিচার করলে দুটো ধারার উদ্ভব হয়। দলীয় নেতৃত্বে শাসন-পদ্ধতি পরিচালনায় অভ্যস্ত হ'লেও আমাদের একথা ভেবে নেওয়ার কোনই কারন নেই যে, স্থায়ী সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় শাষিত প্রজাদের একটা বড় সম্প্রদায়ের ওপর পক্ষপাতিত্ব ক'রে নিজেদের সমস্যাগুলোকে বাড়িয়ে...

তুলবে। অর্থাৎ আমেরিকা সম্ভবতঃ ক্যানাডার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, রক্ষণশীল দল হয়ত' শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার নাও করতে পারে কিন্তু তাহ'লেও ক্যানাডা এবং শ্রমিকরা-মুসলমানদের মতন—সর্ব্বদাই মনে করবে যে, শাসনের গুরুদণ্ড তাদেরই ওপর খড়্গহস্ত! কিন্তু এই অবস্থায় তৃতীয় সম্প্রদায়ের অনুশাসন আসল উদ্দেশ্যকে ধূমায়িত করে সম্মিলন অসম্ভব করে তুলবে! প্রকারান্তে বলা চলে যে, যদি আমেরিকা ও ক্যানাডা রাশিয়ার শাসনাধীনে হত এবং রাশিয়া যদি বলত' যে তাদের সম্মিলনের ব্যবস্থা পাকাপাকি না হওয়া পর্য্যন্ত তারা স্বাধীনতা পাবেনা, তাহ'লে জোর করেই বলা চলে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ক্যানাডার চাইতে আমেরিকার বেশী আস্থা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যকার আসল উদ্দেশ্য হারিয়ে যেত সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও স্বার্থসিদ্ধির ষড়যন্ত্রে। ঠিক তেমনি ভাবে, ভারতের সর্ব-প্রধান গরিষ্ঠ সম্প্রদায় হ'য়ে এবং বেশীর ভাগ লোকের সহানুভূতি পাওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস ভাবে যে, তাদের স্বাধী আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলীম্ লীগের প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অন্তরায়। ওদিকে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সমান উৎসুক মুসলমানেরা ভাবে যে, যে দলিলে দস্তখত করলে ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে তারা পড়বে সমান অথবা অধিকতর অত্যাচারি আধিপত্যের অনুশাসনে, সে দলিল তারা মেনে নেবে কেমন ক'রে?

অতএব তারা ভারতবর্ষের মধ্যে কয়েকটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য দাবী ক'রে পাকিস্থানের সৃষ্টি করলো।

[ক্রমশঃ

মা

শ্রীমতী প্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

নভেম্বরের সন্ধ্যা। সেন্ট ক্যাথারিণ উৎসবের পূর্ব্বদিন। (Auberive) এবেরিভ্ কারাগারের উন্মুক্ত বিরাট লৌহ-ফটকের ফাঁক দিয়া একটি স্ত্রীলোক বাহিরে আসিল। বয়স তাহার প্রায় ত্রিশ হইবে। পশমের জীর্ণ মলিন ঘাঘরা পরণে. মাথায় জেলখানার কয়েদী শ্রেণীর চিহ্ন পাতলা কাপড়ের টুপি রহিয়াছে।

স্ত্রীলোকটি কয়েদি, আজই তাহার মুক্তি হইল। তাহার অপরাধ ছিল শিশুহত্যা। তাই সঙ্গিনীরা পরিহাস করিয়া তাহার নাম দিয়াছিল লা ব্রিটনী। প্রায় ছয়বৎসর পূর্ব্বে সে শিশুহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া সেণ্ট্রাল জেলে আসিয়াছিল। বহু দিবস পরে আজ সহসা সে মুক্তি পাইল। সৎব্যবহারের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হইয়া দণ্ডাদেশ কিছু লাঘব করিয়া দিয়াছেন। ল্যাগ্রেস্ (Langress) যাইবার ছাড়পত্র মিলিয়াছে। বাহিরে আসিলে জেল অফিসের কেরাণী তাহার জেলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে রক্ষিত অর্থ ও পোষাক তাহাকে দিয়া দিল। লা ব্রিটনী এখন মুক্ত। ছয়বৎসর পূর্ব্বে বিচার হইয়া সে এখানে আসিয়াছিল। অপরিচিত স্থান। কিছুই জানা নাই। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ল্যাগ্রেস যাইবার শেষ বাসটিও ছাড়িয়া গিয়াছে। ভীত অসহায় চক্ষে সে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

অদূরে একটি বড় সরাইখানা দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইয়া সে ধীরে ধীরে সেইদিকে অগ্রসর হইল।

জনকোলাহল মুখরিত আলকোজ্জল বৃহৎ সরাইখানা। লা ব্রিটনী কম্পিত কণ্ঠে আশ্রয় প্রার্থনা করিল। কিন্তু অভিজ্ঞা সরাইকর্ত্রী সন্দিগ্ধচক্ষে তাহার জেলফেরত পোষাকের পানে চাহিয়া কহিল, "এখানে জায়গা নাই।" সেইসঙ্গে গ্রামপ্রান্তে যে একটী ক্ষুদ্র সরাইখানা আছে—তাহাতে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিল। তাহার মুখভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় বোঝা গেল যে, সে জেলফেরত আসামীকে আশ্রয় দিতে সম্মত নহে।

লা ব্রিটনী আরো দুই একবার ব্যর্থ অনুনয় করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া অন্য সরাইখানাটির উদ্দেশ্যে চলিল। কে জানে, তথায়ও আশ্রয় মিলিবে কি না? ভীত ত্রস্তপদে যখন সে সেখানে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছে।

সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেটি ঠিক সরাইখানা নহে, তাহা শ্রমিকদের মদের দোকান।

এখানকার কর্ত্তার ব্যবহার আরো রূঢ়। সে একবার মাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অস্ফুট স্বরে কহিল, "discharged", তাহার পর কঠোরকণ্ঠে কহিল, "এখানে থাকিবার জায়গা নাই।"

লা ব্রিটনী তাহার দয়াহীন কঠোর মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় অনুরোধ করিতে সাহস করিল না। মাথা নীচু করিয়া পথে নামিয়া সে চলিতে লাগিল। উপস্থিত পায়ে হাঁটিয়া ল্যাগ্রেসে পৌঁছানো ভিন্ন উপায়

নাই। তাহার মনে হইতেছে। বারে বারে অপমানিত হইয়া তাহার মন সারা সহরের লোকদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আনমনে সে পথ চলিতে লাগিল।

নভেম্বরের শেষ। সন্ধ্যা যেন ত্বরিৎ গতিতে শেষ হইয়া রাত্রি আসিতেছে। ঘন অন্ধকারে দেখা যায় পথ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বনের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ক্রমে শীতরাত্রির শীতল বাতাসে শুষ্ক পত্ররাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তীব্র শীতল বাতাসে ধূলারাশি উড়িয়া যেন শ্বাস রোধ করিতে লাগিল।

বিষণ্ণ মনে চলিতে চলিতে লা ব্রিটনীর মনে হয়, ছয় বৎসর হাঁটায় অনভ্যস্ত পদদ্বয় যেন ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। গাঁটে গাঁটে খিল ধরিয়া যাইতেছে। জুতার ঘর্ষণে ফোস্কা পড়িয়া গেল। অনেকটা হাঁটিয়া অবশেষে সে হতাশ হইয়া রাস্তার ধারে একটি পাথরের স্তূপের পাশে বসিয়া পড়িল। মরিতে হইবে। এখনও পর্য্যন্ত যখন একটিও আশ্রয় মিলিল না, তখন মরিতেই হইবে।

বরফের মত কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপিতে কাঁপিতে সে ভাবিতে লাগিল, এই অন্ধকার রাত্রি, ক্ষুধার্ত্ত ক্লান্ত শরীরে সারারাত্রি এই ঠাণ্ডায় থাকিলে অবশেষে সে জমিয়া যাইবে। মরিয়া যাইবে। হা ভগবান!

নির্জ্জন রাস্তার পাশে হতাশ হৃদয়ে বসিয়া এই সকল ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার কানে গেল কেহ যেন গান করিতেছে? কান পাতিয়া সে শুনিল, না না গান নহে, কেহ যেন একটানা সুরে ছড়া বলিয়া শিশুকে ঘুম পাড়াইতেছে। তাহার নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল, তাহা হইলে সে একাকী নহে? আড়ষ্ট পা দুইটাকে কোনও মতে টানিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, হয়ত আশ্রয় মিলিতে পারে।

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে একটি বাঁক ঘুরিতে চোখে পড়িল, গাছপালার ফাঁকে একটু লাল আলো দেখা যাইতেছে। আরো অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে একটি মৃৎ-কুটিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দরিদ্রের পর্ণকুটীর। জীর্ণ বাতায়নপথে আলোর রেখা উঁকি দিতেছে। জীর্ণ দুয়ার বন্ধ।

লা ব্রিটনী তখন লজ্জা দ্বিধা ত্যাগ করিয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষুধায় পথশ্রমে শরীর তাহার অবসন্ন। দরজায় ধাক্কা দেওয়াই সে স্থির করিল।

দরজায় করাঘাত করিতেই ভিতরে গানের আওয়াজ থামিয়া গেল। এবং একটু পরেই দরজা খুলিয়া গেল। দরজা খুলিয়া দিল একটি স্ত্রীলোক। বয়স তাহার লা ব্রিটনীর সমান হইবে। দেখিলেই মনে হয় সে কৃষক-রমণী। অবিন্যস্ত মলিন কেশ। মলিন পোষাক। দৃঢ় রুক্ষ দেহ শ্রমশীলতার পরিচয় দিতেছে।

কৌতূহলী চক্ষে সে লা ব্রিটনীর শ্রান্ত মুখের পানে চাহিয়া শুভ সন্ধ্যা জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও তুমি?" অস্ফুট স্বরে কোনও মতে লা ব্রিটনী কহিল, "আমি আর হাঁটতে পারছি না।" কণ্ঠস্বর তার কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সে রুদ্ধ স্বরে বলিল, "সহর এখনও অনেকটা দূরে, তুমি যদি রাত্রিটা আমায় একটু আশ্রয় দাও, তা' হলে আমার মস্ত উপকার হয়। আমার কাছে টাকা আছে—তুমি এইটুকু কষ্ট যদি কর? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লা ব্রিটনী তাহার মুখের পানে চাহিল।

"এস এস, ভিতরে এস।" মেয়েটি আহ্বান করিল।

তাহার পর এক মুহূর্ত্ত ইতঃস্তত করিয়া কৌতূহলের সহিত প্রশ্ন করিল, "তুমি তো রাত্রিটা এবেরিভেও কাটালে পারতে?"

"তারা কেউ জায়গা দিল না। কারণ আমি…আমি জেল-ফেরত।" লা ব্রিটনী নতমুখে কহিল।

কৃষক-রমণী মাথাটা নাড়িল. "ওঃ আচ্ছা, তা যাক সে কথা। তুমি ভিতরে এস, আমি এখন আর কিছুই ভয় করি না—এক অসম্ভব কোনও দুঃখ ছাড়া। তা ছাড়া আমার বিবেক বলে যে অতিথিকে দুয়ার থেকে বিমুখ করতে নেই। বিশেষতঃ এই রকম শীতের রাত্রে। এস আমি তোমায় শোবার জায়গা আর কিছু খাবারও দিতে পারব।"

দুইজনে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

গৃহভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গৃহকর্ত্রী সামান্য একটি শয্যা অগ্নিকুণ্ডের পাশে বিছাইয়া দিল।

কৃতজ্ঞ লা ব্রিটনী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তুমি কি একাই থাক?"

"হ্যাঁ। কেবল একটি ছোট সাত বৎসরের ছেলে আমার আছে। আমি এখানেই থাকি ও বনেতে কাজ করি। মেয়েটি উত্তর দিল।

"তোমার স্বামী? সে কি নেই? লা ব্রিটনী জিজ্ঞাসা করিল।

"হ্যাঁ" খুব দ্রুত কৃষক রমণীটি জবাব দিল, যেন ও প্রশ্নটি সে এড়াইয়া যাইতে চায়। "ছেলেটির বাবা নেই, হয়ত ওরই মন্দভাগ্যে" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কথাটি শেষ করিয়া বলিল, "যাকগে ও-কথা।" এবার তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।" বলিয়া মাংসের পাত্র তাহার সম্মুখে দিল।

ঘরটি একটি কাঠের পার্টিশনে বিভক্ত। অপরদিকের অন্ধকার কোণ হইতে শিশুকণ্ঠে ডাক আসিল—"মা"।

কৃষক রমণী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, "আচ্ছা তুমি খেয়ে-নিয়ে শুয়ে পড়ো আমি আলোটা নিয়ে যাই, আমার ছেলে বোধ হয় জেগে উঠে আলো নেই দেখে ভয় পেয়েছে।"

"শুভরাত্রি" বলিয়া আলোটি হাতে লইয়া সে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল।

লা ব্রিটনী আহার সমাপ্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শুইয়া পড়িল। সমস্ত দেহ যেন ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নিরাপদ আশ্রয়, শয্যা, খাদ্য পাইয়াও অপরিচিত স্থানে লা ব্রিটনীর ঘুম আসিতে চাহিল না। অন্ধকার গৃহে একাকী শয্যায় শুইয়া চক্ষু মুদিয়া সে পার্শ্ববর্ত্তী পার্টিশনের অন্তরালে শায়িত মাতাপুত্রের আলাপ শুনিতে লাগিল।

অকস্মাৎ আগন্তুকের আগমনে ও কথাবার্ত্তার আওয়াজে শিশুর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে আর এত শীঘ্র ঘুমাইতে চাহে না।

মাতা তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য মৃদুকণ্ঠে কত কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে।

শিশুর মধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে লা ব্রিটনীর মনটা সহসা যেন কেমন করিতে লাগিল। এত নিকটে ওই শিশুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার সুপ্ত মাতৃত্ব সহসা যেন নাড়া খাইয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার সেই শিশুটি?

বালিকা বয়সের অপরিণত বুদ্ধির ভুলে যাহাকে পৃথিবীর বক্ষ স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ত্রাসে আপন হাতে হত্যা করিয়াছিল সেই শিশুটি?

যদি অমন পঙ্কিল নিন্দাভরা পথ দিয়া সে না আসিত? তবে এতদিনে সেও তো এই শিশুটির মত বড় হইত? মনে মনে লা ব্রিটনী কহিল।

এই চিন্তায় ও ওই শিশুর কণ্ঠস্বরে যেন কিসের একটা প্রবল বেদনার শিহরণে সহসা তাহার অন্তস্থল পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়া উঠিল।

ব্যথিত হৃদয়ের পুরাতন ক্ষতে যেন আঘাত লাগিল। তাহারি সান্ত্বনা স্বরূপে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। অসহায় মাতৃহৃদয়ের করুণ বেদনার সান্ত্বনা এই অশ্রু। আহা যদি সেই শিশুটি থাকিত!

উৎকর্ণ লা ব্রিটনী শুনিল—মাতা বলিতেছে, "শোও, শুয়ে পড় লক্ষ্মীছেলে, তুমি যদি লক্ষ্মী হয়ে কথা শুনে ঘুমোও, তা হ'লে তোমায় কাল সেণ্ট ক্যাথারিনের মেলায় নিয়ে যাব।"

বালকের উৎসুক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ছোট ছেলেদের খাওয়ানোর দিন মা? ছোট ছেলেদের খাওয়ানোর দিন নিয়ে যাবে বলছ?"

মা উত্তর দিল, "হ্যাঁ গো সোনা হ্যাঁ।"

"ছোট ছেলেদের কাছে সেণ্ট ক্যাথারিন খেলনা নিয়ে আসেন, না মা?" বালকের মধুর উৎসুক কণ্ঠ।

"কখনও কখনও আনেন" মাতা জবাব দিল অনুৎসুক কণ্ঠে।

বালকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "তিনি কখনও আমাদের বাড়ীতে খেলনা আনেন না কেন মা?"

"হয়ত আমরা অনেক দূরে থাকি বলে কিম্বা হয়ত আমরা খুব গরীব বলে", মায়ের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

আবার বালকের প্রশ্ন শোনা যায়, "তা হলে তিনি শুধু বড় লোকদের ছেলেদের জন্য খেলনা আনেন? কিন্তু কেন মা? আমিও তো খেলনা পেতে খুব ভালবাসি?"

মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "খুব ভাল কথা। যদি তুমি ভাল ছেলে হও, তাহলে হয়ত তুমিও পেতে পার। এই আজই এমনি যদি তুমি ভাল ছেলে হয়ে ঘুমিয়ে পড় আর কথা না কয়ে।" "আমি এখনি ঘুমোবো মা, তা হলে তিনি কালই তো আমার জন্য খেলনা আনতে পারেন?" বালকের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ প্রকাশ পায়, কিন্তু মায়ের কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না।

তারপর সেই ছোট ছেলেটির কলকাকলী ধীরে ধীরে নীরব হইয়া গেল। তারপর একটানা নীরবতা। তারপর গভীর শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। তারপর তাহাও সহজ হইয়া আসিল। গভীর রাত্রি। ছেলেটি ও তাহার মা ঘুমাইয়া পড়িল।

লা ব্রিটনীর ঘুম আসিল না। বিনিদ্র নয়নে সে ভাবিতে লাগিল। এক মর্ম্মভেদী গ্লানিকর অথচ করুণ চিন্তা তাহার হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল। যাহার কথা সে কোনওদিন ভাবে নাই, আজ সেই শিশুর জন্য তাহার সমগ্র হৃদয় ক্রন্দন করিতে লাগিল। অথচ তাহাকে সে স্বহস্তে হত্যা করিয়াছে। কেন, কেন সে হত্যা করিয়াছিল? দুই চক্ষু বাহিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল—যে পর্য্যন্ত না প্রভাত হইল।

শীতের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন প্রভাত। মাতা পুত্র তখনও নিদ্রা যাইতেছে। লা ব্রিটনী উঠিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া ক্ষণকাল কি যেন ভাবিল, তাহারপর উঠিয়া সেই আধ আলো অন্ধকারের মধ্যে সে দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল এবেরিভের দিকে। যখন, এবেরিভের প্রথম বাড়ি-খানি দেখা গেল, তখন সে তাহার গতিবেগ মন্দ করিল। তখনও সহর জনহীন। জনহীন পথে সে একলা চলিতে চলিতে প্রতিটি দোকান দেখিতে লাগিল, অধিকাংশই তখনও বন্ধ। অবশেষে একটি দোকান তাহার দৃষ্টি

আকর্ষণ করিল। সিল্ক কাপড়ের দোকান, তবে তাহাতে দুই চারিটা মনিহারী জিনিষও রহিয়াছে।

কয়েকটি খেলনা একপাশে সাজানো, অতি সাধারণ খেলনাগুলি, একটি বড় ডলপুতুল, একটা Noah's ark পশমের একটি ভেড়া ইত্যাদি।

দোকানদারকে বিস্মিত করিয়া লা ব্রিটনী সব কয়টি খেলনাই ক্রয় করিল এবং দ্রুতপদে পুনরায় সেই বনের দিকে চলিল সেই কুটিরখানির অভিমুখে।

তখন বেলা হইয়াছে, রাস্তায় জন চলাচল শুরু হইয়াছে। চলিতে চলিতে সহসা সে একজন পুলিশ ইনস্‌পেক্টরের সম্মুখীন হইয়া গেল। তাহার সহিত মুখোমুখী হইতেই লা ব্রিটেনীর মনে হইল, সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীর পক্ষে কারাগারের এত নিকটে ঘোরাফেরা অপেক্ষা নিজের দেশে ফিরিয়া যাওয়াটাই সঙ্গত ছিল, ইহারা সন্দেহ করিবে।

পুলিশ ইন্‌সপেক্টরটি ততক্ষণে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছে, সে নিকটে আসিয়া তাহার কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকি দিল ও বলিল, "এই, তোমার এখানে হতভাগার মত ঘুরে না বেড়িয়ে ল্যাংগ্রেসে এতক্ষণে পৌছানো উচিত ছিল বুঝলে?" "পা চালিয়ে শীঘ্র এখান থেকে দূর হও বুঝলে?' অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ইন্‌সপেক্টরটি কহিল। সে একবার কাল রাত্রের ঘটনাটি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা বৃথা হইল, কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিলনা। ইন্‌সপেক্টরটি এদিক ওদিক চাহিল, সম্মুখে একটি গাড়ী আসিতেছিল, ল্যাংগ্রেস অভিমুখে যাইবে। তাহাকে থামাইয়া লা ব্রিটনীকে তাহাতে উঠাইয়া একটি কনেষ্টবলকে জিম্মা করিয়া আপন কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইল ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল।

ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে। বরফ জমিয়া যাওয়া রাস্তায় গাড়ী বারংবার হোঁচট খাইয়া দুলিতেছে। তাহারি ভিতরে লা ব্রিটনী ভগ্নহৃদয়ে শীতে জমিয়া যাওয়া আড়ষ্ট হাতে খেলনার পুটুলীটি ধরিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়ী ল্যাংগ্রেসের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। লা ব্রিটনী মনে মনে খেলনাগুলি যথাস্থানে পৌছাইবার উপায় খুঁজিতেছিল। রাস্তার বাঁক ঘুরিতেই চোখে পড়িল বনের মধ্যে সেই কুটিরখানিতে পৌছিবার সরু পথটি। ব্যাকুল কণ্ঠে লা বৃটনী সেই পুলিশ ম্যানকে মিনতি করিয়া কহিল, "তুমি যদি একটু অনুগ্রহ কর। এই বনের মধ্যে ফ্লোরিয়েট বলে একটি মেয়ে এগুলি আমায় আনতে বলে ছিল; ওই তার কুটির দেখা যাচ্ছে, যদি এগুলি আমায় পৌছে দিতে দাও, ভগবান তোমার অশেষ মঙ্গল করবেন।"

এত কাতর মিনতির সহিত সে বলিতে লাগিল যে, অবশেষে কনেষ্টবলটি তাহাতে সম্মত হইল।

গাড়ী থামাইয়া ঘোড়া বাঁধিয়া রাখিয়া কনেষ্টবলটি লা ব্রিটনীর সহিত চলিল।

কুটিরে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে বসিয়া লা ফ্লোরিয়েট জ্বালানী কাঠের টুকরাগুলি তাড়া করিয়া বাঁধিতেছিল।

সহসা লা ব্রিটনী ও তাহার সহিত পুলিশম্যানটিকে দেখিয়া সে ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া লা ব্রিটনীকে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

চোখের ইঙ্গিতে কোনও প্রশ্ন করিতে নিষেধ করিয়া লা ব্রিটনী মুখে বলিল, "কিছুই না। তারপর তাহাকে আর জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়া বলিল, "খোকা কোথায়? সে কি এখনও ঘুমোচ্ছে?

লা ফ্লোরিয়েট বলিল, "হ্যাঁ কিন্তু……"

লা ব্রিটনী খেলনাগুলি তাহাকে দেখাইয়া কহিল, "এই খেলনা গুলি তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে রেখে দাও, সে উঠলে তাকে বলো যে, সেণ্টক্যাথারিন এগুলি তারজন্য পাঠাইয়াছেন। আমি ভোরে উঠে এগুলি কিনতে এবেরিভে গিয়েছিলাম। এমনি এদের সঙ্গে ল্যাংগ্রেসে ফিরে যাব। অবশ্য আমার কাল রাত্রেই সেখানে যাওয়া উচিত ছিল।" বিস্মিতা ফ্লোরিয়েট শুধুমাত্র বিস্ময়োক্তি করিল "ওমা সে কি কথা?" করুণ আঁখি দুটি তুলিয়া লা ব্রিটনী কহিল তার আর কি হবে? লা ব্রিটনী অগ্রসর হইয়া দেখিল, কিন্তু শিশু তখনও নিদ্রামগ্ন। সে আপনি তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া খেলনাগুলি তাহার পাশে রাখিল। ডলটির উপরকার ঢাকনা ছিঁড়িয়া ঘুমন্ত শিশুর পাশে শোয়াইয়া দিল, ভেড়াটি দাঁড় করাইয়া দিল। তারপর নিদ্রিত শিশুর মুখপানে স্নেহে চাহিয়া থাকিয়া তাহার শিথিল হস্তটি সযত্নে আপনার দুই মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া নীমিলিত নেত্রে ক্ষণেক স্থির হইয়া রহিল।

তাহারপর তাহার অশ্রুপূর্ণ আঁখি ও হাসিমুখ পুলিশটির দিকে ফিরাইয়া পরিতৃপ্তস্বরে কহিল, এবার চল।" আর একবার শিশুর মুখপানে চাহিয়া আপন জামার হাতায় চক্ষু দুইটি সবলে মুছিয়া ফেলিয়া আপন মনেই কহিল, "বোধহয় চক্ষে বরফ ঢুকে থাকবে? আচ্ছা এবার চল আমার কাজ হয়ে গেছে।"*

---

* ফরাসী লেখক Andre Therlet এর 'La Bretonne' গল্প অবলম্বনে।

রাধামাধবের কাব্যগ্রন্থমালা

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

এক

জগতের সমস্ত সাহিত্যের প্রথম উৎপত্তি হয় কাব্যে; বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গসাহিত্যেরও প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল কাব্যে। প্রাচীন যুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, বাঙ্গলার কাব্যকুঞ্জ যে সকল কোকিল-কবির কুহুতানে মুখরিত হইয়াছিল, যাঁহাদের ছন্দ বিভিন্ন সুরে রূপায়িত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল, যাঁহাদের কাব্যগ্রন্থ বঙ্গদেশে নবজাগরণের সাড়া তুলিয়া বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল; আজ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধীরে ধীরে বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধুনা-বিস্মৃত কবি রাধামাধব মিত্রের কাব্যগ্রন্থমালার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব; বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করিলেও ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গ-সাহিত্যের এক বিশাল অধ্যায় কবি রাধামাধব কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল।

রাধামাধব ১২৩৭ সালের ২৬শে ভাদ্র হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল থানার অধীন জেজুর গ্রামে প্রসিদ্ধ মিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করিয়া তিনি কলিকাতার জেনারেল এসেমব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউসনে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা স্বরূপচন্দ্রের দেহত্যাগ হয় এবং সেই সময় তিনি একটি কার্য্যের চেষ্টা করিতে থাকেন। জেনারেল এসেমব্লীজ ইন্‌ষ্টিটিউসনের অধ্যক্ষ ডক্টর ডাফ এবং অধ্যাপক রেভারেণ্ড ওগিলভি তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন; তিনি কার্য্য করিতে ইচ্ছুক শুনিয়া তাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ে তাঁহাকে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ১২৬২ সাল হইতে ১২৭১ সাল পর্য্যন্ত তিনি তথায় শিক্ষকতা করেন। পরে ১২৭১ সাল হইতে রাধামাধব মতিলাল শীল প্রতিষ্ঠিত "শীলস্ ফ্রি কলেজ"এ শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করেন। এই স্থানে যোগ্যতার সহিত তিনি দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিয়া পরে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন এবং ১৩০৩ সালে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা ৩৫নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ নিজ ভবনে তিনি বাস করিতেন এবং সর্ব্বগুণাকর ও শশীগুণাকর নামক দুই পুত্র রাখিয়া ১৩২৮ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তিনি লোকান্তরিত হন।

তাঁহার স্বলিখিত 'আত্মজীবনী'তে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে তৎকালীন সমাজের বিষয় অনেক কিছু জানা যাইবে।

হিমসাগর—ঘোষপাড়া

"হুগলী জেলার অন্তঃপাতি জেজুর নামে একটী পল্লীগ্রাম আছে, তথায় কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বহু লোক বাস করেন। গ্রামটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। চতুষ্পার্শ্বস্থিত অন্যান্য যে সমস্ত গ্রাম আছে, তন্মধ্যে ইটি প্রধান বলিয়া পরিগণিত। তথায় বৃহৎ বৃহৎ কতিপয় পুষ্করিণীও আছে, ঐ পুষ্করিণীসমূহের জল অতি নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর। তথায় দুইটী-তিনটী উদ্যানও আছে। গ্রীষ্মকালে অপর সময়াপেক্ষা উদ্যানের শোভা একপ্রকার রমণীয় হইয়া থাকে। পুষ্পতরু অপেক্ষা ফলের তরু অধিক; পল্লীগ্রামবাসী লোকেরা ফুলের তরু অপেক্ষা ফলের তরু অধিক ভাল বাসেন, যেহেতু তাহাদের মধ্যে অনেকেই বাবু হইতে ইচ্ছা করেন না। অধুনা অনেকে নগরে বাস করিয়া বাবু হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। বাবুগিরিই দুরবস্থার প্রধান কারণ। বাবুদিগের সহবাসেই বাবুগিরি

শিক্ষা হয় এবং আপনার প্রকৃত অবস্থাকে ভুলাইয়া দেয়। বাবু সহবাসও অনেক পরিমাণে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে; এস্থলে বাবুগিরির বিষয় এই পর্য্যন্ত, পরে প্রয়োজন মতে বলা যাইবে।

আমি পূর্ব্বে যে পল্লীগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়াছি সেই গ্রামেই এই হতভাগ্যের জন্ম হয়। আমি কুলীন কায়স্থ কুলোদ্ভব; আমার পূর্ব্ব পুরুষদিগের যে প্রকার কুলগৌরব ছিল, আমার তাদৃশ নাই। সমাজেতে আর পূর্ব্বমত কুলীনদিগের মর্য্যাদা নাই। অধুনা অর্থের

ডালিম গাছ—ঘোষপাড়া

গৌরব পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়াতে কুলের প্রাদুর্ভাব আর নাই বলিলেই হয়। এক্ষণে যাহার অর্থ আছে, তিনিই কুলীন। আমার পিতার যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গতি ছিল; তাঁহার ভূমি সম্পত্তি এমন ছিল যে, তদ্বারা তিনি সুচারুরূপে ও অক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তাঁহাকে কাহারও উপাসনা করিতে হইত না, কেন করিবেন? সংসার না চলিলেই উপাসনা করিতে হয়। তিনি প্রকৃত ধনবান না হইলেও তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী ছিল, সুতরাং সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিত। তাঁহার সাংসারিক অন্ত কোন কষ্ট ছিল না, কেবল সন্তান হয় নাই বলিয়াই আন্তরিক একটী মহাকষ্ট বোধ করিতেন। সন্তান হইবে এমন প্রত্যাশাও ছিল না; আমার জননী বন্ধ্যা হইলেন, ইহা প্রায় সকলেই স্থির করিয়াছিল। সন্তান হইবে কামনা করিয়া আমার জনক-জননী অনেক যাগ-যজ্ঞ করিতে অন্যথা করেন নাই। ঐ গ্রামে বহু-কালাবধি মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির আছে। সে ঠাকরুণটী জাগ্রতা বলিয়া সকলে জানে, তাঁহার প্রতি গ্রামস্থ লোকের অচলা ভক্তি ছিল।

আমার জননী এক প্রকার বিপদগ্রস্তা, সুতরাং সেই মন্দিরে গমন করিয়া আশু পুত্রবতী হইবেন বলিয়া, মঙ্গলচণ্ডীর নিকট একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করিয়া আসেন। তাঁহার প্রার্থনা করিবার কিছুদিন পরেই, তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেন। তাহা দেখিয়া আমার পিতার আর আনন্দের সীমা রহিল না; নির্ব্বংশ হইবেন না, পিতৃ-পুরুষেরা পিণ্ড ও এক গণ্ডুষ জল পাইবেন, এতদ্দিনে তাহার সূত্রপাত হইল বিবেচনা করিয়া মনে মনে মহাতুষ্টি লাভ করিলেন।

আমার জন্মের পর প্রায় ছয়মাস গত হইলে অন্নপ্রাশনের দিন সমাগত; পঞ্জিকা দেখিয়া কুল-পুরোহিত মহাশয় অন্নপ্রাশনের দিন স্থির করিয়া দিলেন। আমার জন্য কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত হইল। পিতা নান্দীমুখ করিতে বসিলেন। বংশে পুত্রসন্তান জন্মিলে পিতৃপুরুষেরা নাচিয়া উঠেন ও অত্যন্ত আনন্দ করেন। পুরোহিত মন্ত্রের দ্বারা আমার পিতার হস্তে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন।

অনন্তর গ্রামস্থ ও নিকটবর্ত্তী গ্রামস্থ দল ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়া পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আস্তে-ব্যস্তে সভাস্থ হইলেন। পাঁচ ছয় জন টোলের পণ্ডিতও শুভাগমন করিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের কথা উত্থাপন করিয়া তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন, ক্রমে পরস্পর কথা কহিতে কহিতে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল। শাস্ত্রের মীমাংসা যত হউক আর না হউক, উত্তরোত্তর বিবাদ এমনই বৃদ্ধি হইল যে পরিশেষে মুখামুখি হইতে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হইয়া উঠিল। পণ্ডিতের এত রাগ! পণ্ডিতের নম্র স্বভাব হওয়াই ত উচিত। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে দুইজন পণ্ডিত একত্র হইলেই হুলুস্থুল বাধিয়া উঠে, একটা না একটা মহামারী কাণ্ড ঘটে—লঙ্কাকাণ্ডের বাড়া। সভাসীন অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। অধ্যাপক মহাশয়েরা ভোজন করেন না, কেবল সন্দেশের হাঁড়ি লইয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন। ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের ভোজনান্তে কাঙালীরা পাত কুড়াইবেন কি, পিঁপিড়া পর্য্যন্ত কাঁদিয়া গেল!

যে সময় গ্রামে হয় মম অন্নাশন।
আনন্দ উৎসব কত হইল তখন॥
নিমন্ত্রিত কতশত কায়স্থ-ব্রাহ্মণ।
মম পিত্রালয়ে আসি করেন ভোজন॥
লুচী মোণ্ডা গণ্ডা গণ্ডা বাঁধিয়া বসনে।
সন্তোষের সীমা নাই ব্রাহ্মণের মনে॥

বিজাতীয় লোভ বাড়ে, পর দ্রব্য পেয়ে।
অনেকের পেট ফাটে লুচী মোণ্ডা খেয়ে॥
গ্রীষ্মকালে পিপাসায় ছাতি ফেটে যায়।
কেবল নিয়ত লোকে জল খেতে চায়॥”

রাধামাধবের পিতা স্বরূপচন্দ্র ঘোষপাড়ায় কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধু দুলালচন্দ্র পালের ভক্ত ছিলেন বলিয়া বাল্যকালে পিতার নিকট হইতেই তিনি ধর্ম্মাশ্রিত হন। ইঁহার পিতামহ শ্রীহরিও এই সহজ ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। ভক্তগণের নিকট রাধামাধব 'মিত্র-মহাশয়' বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং দুলাল বাবুর পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রাধামাধব পচাত্তর বৎসর কাল এই সহজ ধর্ম্ম যাজন করিয়া ৯৬ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হন। প্রতি শুক্রবার তাঁহার বাড়িতে ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া কীর্ত্তন করিতেন, এবং রাধামাধবের রচিত গীতগুলি উক্ত স্থানে গান করা হইত। তিনি কয়েক সহস্র গীত রচনা করেন, সমস্তই প্রায় অপ্রকাশিত আছে; ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় শশীগুণাকর মিত্র 'ভাবলহরী' নামক পুস্তকে কবির রচিত মাত্র ৮৩টি গীত প্রকাশ করেন।

২৪ পরগণায় ঘোষপাড়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান; কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদের শিষ্য, সাধু রামশরণ পাল এই স্থানের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার জীবদ্দশায় এই সম্প্রদায়ের নাম বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এই স্থানে পাল মহাশয়দিগের উদ্যান মধ্যে একটি ডালিম গাছ আছে এবং কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই ডালিম গাছের মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে মানবের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। অদ্যাপি এই মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার জন্য প্রতি বৎসর দোল ও রাসের সময় শত-সহস্র ভক্ত সমবেত হন। এই উদ্যানের মধ্যেই সাধু রামশরণ পালের সমাধি বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘোষপাড়ায় 'হিমসাগর' নামক একটি পবিত্র জলাশয় আছে; এই জলাশয়ে স্নান করিলে মানবের সমস্ত কামনা সিদ্ধ হয় বলিয়া হিন্দুগণের বিশ্বাস আছে; সেই জন্য প্রতিবৎসর কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত দোল-মহোৎসব ও মেলা উপলক্ষে যখন এই স্থানে বহু ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়, তখন তাঁহারা এই পুণ্য পুষ্করিণীতে সর্ব্বাগ্রে স্নান করিয়া পবিত্র হন। এই দুইটী এই স্থানের বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। রাধামাধব এই স্থানে সদা-সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন এবং উক্ত স্থানের হরিসভার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১২৯২ সালের ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে, তিনি ঘোষপাড়ায় যে বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী কবিতায় পাঠ করেন, তাহা আমি আবিষ্কার করিয়াছি, উহা সুললিত ছন্দে বিরচিত এবং প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে কবির অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তি প্রকটিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে উহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

“হে হরে হে বিশ্বাধার, কৃপা পারাবার।
সর্ব্বপূজ্য সর্ব্বময়, সর্ব্বসারাৎসার॥

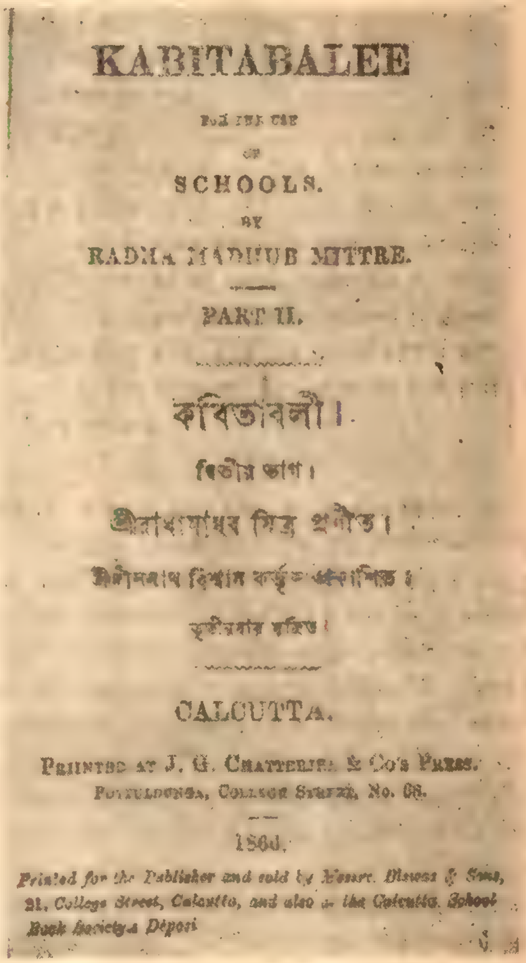
KABITABALEE
FOR THE USE
OF
SCHOOLS.
BY
RADHA MADHUB MITTRE.
PART II.
কবিতাবলী।
দ্বিতীয় ভাগ।
শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত।
শ্রীদীননাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
তৃতীয়বার মুদ্রিত।
CALCUTTA.
PRINTED AT J. G. CHATTERJEE & CO'S PRESS.
POTULDONGA, COLLEGE STREET, No. 68.
1860.
Printed for the Publisher and sold by Messrs. Biswas & Sons, 21, College Street, Calcutta, and also at the Calcutta School Book Society's Depot.

কবিতাবলী দ্বিতীয় ভাগের টাইটেল পেজ

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বমূল, সর্ব্বগুণাকর।
সর্ব্বশিবময় তুমি, সর্ব্বশক্তিধর॥
সর্ব্বাশিব-বিনাশন, সর্ব্বপাপহর।
সর্ব্বদেবারাধ্য বিভো, সর্ব্বলোকেশ্বর॥
সর্ব্বলোক প্রপালক, সর্ব্বচিত্তহারী।
সর্ব্ব জীবাশ্রয় তুমি, সর্ব্বত্র বিহারী॥
সর্ব্বগতি, সর্ব্বপতি, সর্ব্বভক্তপ্রিয়।
সর্ব্ববিশ্বে একমাত্র, তুমি অদ্বিতীয়॥
সর্ব্বজ্ঞাতা, সর্ব্বপাতা, সর্ব্বঅন্তর্যামী।
সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ভূস্বামীর স্বামী॥”

রাধামাধব রচিত 'ভাব-লহরী' হইতে একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

রাগিণী ললিত

(তাল—আড় ঠেকা)

"নিয়ে চল আনন্দময়ী মা তোর আনন্দধামে।
নতুবা কলঙ্ক হবে মা তোর দয়াময়ী নামে ॥
প্রতি বৎসর এই সময় আমাদিগে আনন্দালয়
লইয়ে মা যাওয়া যে হয়; পুরাইতে মনস্কামে ।১।
তুই লয়ে যাস মা যারে, সেই তো তথায় যেতে পারে
নৈলে যাবার সাধ্য ধরে, কে গো জননী ?
তোর কাছে মা যাবার তরে, ব্যাকুল হয়েছি অন্তরে,
যেতে না মা পেলে পরে, ক্ষুব্ধ হব পরিণামে ।২।
যদিও সে ধাম গমনে, যোগ্য নই মা কোন ক্ষণে,
তব কৃপা বিতরণে, লয়ে যে মা যাস
সেই সাহসে সাহসী হই, লয়ে যেতে তাই মা কই,
মিত্র বলে মাগো তুই বই, কে রাখে পায়
এ অধমে ।'৩।"

দুই

রাধামাধব কলিকাতায় জেনারেল এসেম্বীজ ইনষ্টিটিউশনে এবং শীলস্ ফ্রী কলেজে শিক্ষকতা করিতেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শিক্ষকতা কালে তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার সহকারী রূপে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী সংবাদপত্র "সংবাদ প্রভাকর" পরিচালনা করেন। সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১৩২৮ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, তখনকার সেই কবিতার যুগে রাধামাধব কবিতা লিখিয়া গুরুর তুল্যই যশস্বী হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী যুগে এক রাজকৃষ্ণ রায় ব্যতীত তাঁহার ন্যায় দ্রুত, অজস্র ও অক্লান্ত ভাবে কবিতা লিখিতে কেহই সক্ষম ছিলেন না।

এই সম্বন্ধে রাধামাধব উল্লিখিত 'তোমার কথা' নামক অপ্রকাশিত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি :

"তোমার কৃপাতে এসে এ ধরাতে
যখন বালক আমি।
সক্ষম যে নই তথাপিও হই,
রচনার পথগামী ॥
পরে গুপ্ত সনে হঠাৎ মিলনে
অপার উৎসাহ পাই।
পদ্ধতি জানিতে কবিতা শিখিতে
তাঁর কাছে আসি যাই ॥
প্রসন্নতা সহ তিনি অহরহ,
আমাকে দেখান পথ।
আমি বিদ্যালয়ে সময়ে সময়ে
পূর্ণ করি মনোরথ ॥
কবিতা সমরে সভার ভিতরে,
জয়ী হই বহুবার।
রচনার কাজে লোকের সমাজে,
লাভ করি পুরস্কার ॥
সভাসীন গুনী সবে পদ্য শুনি,
করেন উৎসাহ দান।
গেছে সে দিবস সে উৎসাহ রস,
আর কে করিবে পান ॥
কি বলিব আহা মনে হলে তাহা,
বাসনা চালক হই।
তেমনি করিয়া সভায় বসিয়া,
কবিতায় কথা কই ॥

রাধামাধব রচিত 'কবিতাবলী' ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ, ৪র্থ ভাগ এবং ৫ম ভাগ তৎকালীন বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক উক্ত কাব্যগ্রন্থ আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। পাঁচ খণ্ড কবিতাবলী পুস্তকখানির,কয়েক বৎসরের মধ্যে চার-পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমানে উহা দুঃপ্রাপ্য হইয়াছে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রাধামাধবের কোন পুস্তক দৃষ্ট হয় না; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে কবিতাবলী ৫ম ভাগ এক খণ্ড আছে। সম্প্রতি আমি কবিতাবলী ২য় ভাগ, ৩য় ভাগ এবং ৪র্থ ভাগ এক খণ্ড করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি; উক্ত কাব্যগ্রন্থ হইতে কিছু কিছু চয়ন করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

কবিতাবলী ১ম ভাগ কোন বৎসরে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। ২য় ভাগ ১২৬৮ সালের ২৭শে শ্রাবণ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনিটি সংস্করণ হইয়াছিল এবং ছয় হাজার কপি নিঃশেষিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম সংস্করণ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে এক হাজার, দুই হাজার ও তিন হাজার কপি করিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল। মৎসংগৃহীত পুস্তকখানি তৃতীয় সংস্কারণের পুস্তক; উহাতে প্রথম সংস্করণের সময় গ্রন্থকার যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিতীয় ভাগের স্বত্ব শ্রীযুক্ত দীননাথ বিশ্বাসকে বিক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :

বিজ্ঞাপন

কবিতাবলীর দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। যে

৺কবিবর প্রভাকর সম্পাদক মহোদয়ের সাহায্যে সময়ে সময়ে কবিতা রচনা করিতাম, তিনি অকালে মানবলীলা সম্বরণ করাতে আমার এরূপ উৎসাহ ভঙ্গ হইয়াছে যে, এক্ষণে কবিতামালা রচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আর সাহস করা যায় না। কিন্তু অনুগ্রাহক গুণগ্রাহক বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাশয়েরা স্থানে স্থানে স্ব স্ব অধীনস্থ বিদ্যামন্দিরে কবিতাবলীর প্রথম ভাগ ব্যবহার করিয়া মদীয় এতাদৃশ উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত না করিয়া কোন মতে নিরস্ত হইতে পারিলাম না। উক্ত মহাত্মামণ্ডলী এতাদৃশ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কবিতাবলীর প্রথম ভাগ বারত্রয় মুদ্রিত করা হইয়াছে। অধ্যক্ষ মহোদয়গণ প্রথম ভাগের প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং বালক সমগ্র দ্বারা প্রথম ভাগ যেরূপ আগ্রহ সহকারে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবারেও যদি সেইরূপ হয়, তাহা হইলে সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম সফল বিবেচনা করিব এবং তৃতীয় ভাগ অতি শীঘ্রই প্রকটন করিতে সাহসী হইব। পরিশেষে জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনা এই যে, এই গ্রন্থ যেন বালকপুঞ্জের চরিত্র সংশোধক হয়।

আমি শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ বিশ্বাস মহাশয়কে কবিতাবলীর দ্বিতীয় ভাগের স্বত্ব বিক্রয় করিলাম। অতএব ইহাতে নামের সম্বন্ধ ব্যতীত আমার আর অন্য কোন সম্বন্ধ রহিল না।

কলিকাতা
২৭শে শ্রাবণ, ১২৬৮, } শ্রীরাধামধব মিত্র
সাং জেজুর

কবি রাধামাধবের কবিতাবলী দ্বিতীয় ভাগে "বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বিপদ নিবারনার্থ সাবধান হওয়া উচিত" শীর্ষক কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

বিজ্ঞলোকে সতত, থাকেন সাবধান।
বিপদ না ঘটে যাতে, তাতে যত্নবান ॥
যদবধি বিপদে, না পড়ে অজ্ঞচয়।
তদবধি সাবধান, কখন না হয় ॥
কিন্তু বিঘ্ন অতিক্রান্ত, হোলে পরে হায়।
তাহাদিগে সাবধান. হোতে দেখা যায় ॥
বিঘ্ন অতিক্রান্ত আহা! হইবে যখন।
সাবধান, হোলে আর, কি হবে তখন ? ॥
দেখ, একবার দীপ হইলে নির্ব্বান।
নিশ্চয় বিফল হয়, তাতে তৈল দান ॥

উক্ত কাব্যগ্রন্থ হইতে নিম্নোক্ত পাঁচটি কবিতা উদ্ধৃত হইল :

বিদ্বান্ ব্যক্তি মৃত হইয়াও উপকার করেন

মূর্খ হোতে জগতের অপকার বই।
বিবেচনা করি দেখ, উপকার কই ॥
আজীবন পদে পদে, অনিষ্ট ঘটায়।
আপনিও মজে আর, অপরে মজায় ॥
বিদ্বান হইতে হয়, যত উপকার।
সমুদায় বর্নিবারে, হারে বর্ণহরে ॥
জগতে জীবিত থাকি, সুপণ্ডিতগণ।
জগতের উপকার করেন যেমন ॥
কালের করাল গ্রাসে, হোলেও পতিত।
সাধন করেন তাঁরা, সেইরূপ হিত ॥

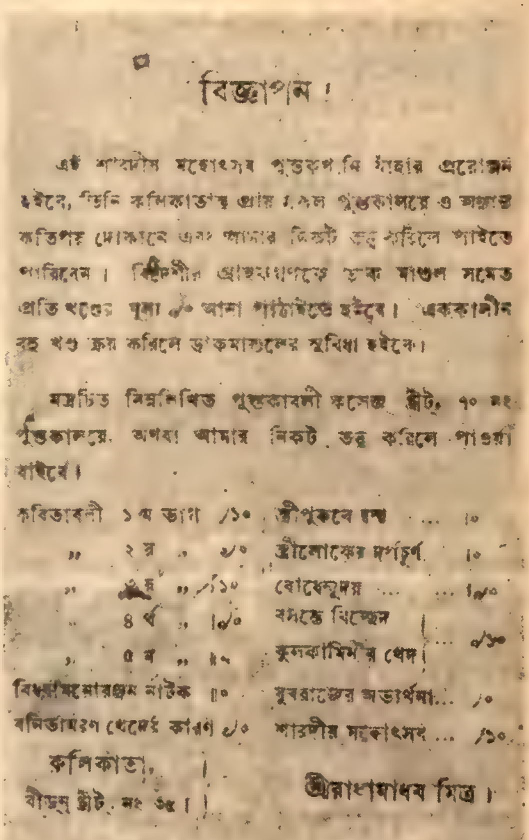
বিজ্ঞাপন।

এই শারদীয় মহোৎসব পুস্তকখানি যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতাস্থ প্রায় সকল পুস্তকালয়ে ও অন্যান্য কতিপয় দোকানে এবং আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। বিদেশীয় গ্রাহকগণকে ডাক মাশুল সমেত প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶০ আনা পাঠাইতে হইবে। এককালীন বহু খণ্ড ক্রয় করিলে ডাকমাশুলের সুবিধা হইবে।

মৎপ্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকাবলী কলেজ স্ট্রীট, ৭০ নং পুস্তকালয়ে, অথবা আমার নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

কবিতাবলী	১ম ভাগ	/১০	স্ত্রীপুরুষে দ্বন্দ্ব ...	।০
,,	২য় ,,	৶০	স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ	।০
,,	৩য় ,,	/১০	বোধেন্দুদয়	।৶০
,,	৪র্থ ,,	।৶০	মদকে বিচ্ছেদ }	... ৶১০
,,	৫ম ,,	।৵	কুলকামিনীর খেদ }	
বিধবাবিষোরঞ্জন নাটক		।০	যুবরাজের অভ্যর্থনা...	/০
বনিতাবিরহ খেদের কারণ		৶০	শারদীয় মহোৎসব ...	/১০

কলিকাতা,
বীডন্ স্ট্রীট. নং ৩৫। } শ্রীরাধামাধব মিত্র।

কবিতাবলীর বিজ্ঞাপন

যে কীর্ত্তি রাখিয়া যান, মরণ সময়।
তাতেও অপার হিত, সম্পাদিত হয় ॥
নিউটন, বেকন প্রভৃতি গুনী যত।
কবে কালকরে তাঁরা, হোয়েছেন হত ॥
অদ্যাপি তাঁদের হোতে শত শত জন।
উপকার লাভ, করিতেছে প্রতিক্ষণ ॥
অতএব যে মানব, হন বিদ্যাযুত।
মরিয়াও না মরেন, এ বড় অদ্ভুত ॥

কুৎসিত ব্যক্তির বিদ্যাই রূপ

কোকিল সুরূপ নয়, স্বর তার রূপ।
পতিভক্তি রমণীর, রূপ অপরূপ॥
প্রজার অতুল রূপ, রাজ-অনুরক্তি।
দাসের সুচারু রূপ, হয় প্রভুভক্তি॥
তাপসগণের রূপ, ক্ষমাগুণ হয়।
কুরূপ জনের রূপ, বিদ্যাই নিশ্চয়॥

আত্মবুদ্ধির দোষেই লোকে নানা ক্লেশ পায়

মাতৃদোষে তনয়ের, জন্মে কুস্বভাব।
কর্ম্মদোষে সকলের, ঘটে ধনাভাব।
বংশ দোষে প্রায় লোক, অদাতা নিশ্চয়।
পিতৃদোষে কেবল, তনয় মূর্খ হয়॥
কর্ত্তার দোষেই কষ্ট, পায় পরিবার।
কর্ত্রীর দোষেই হয় বিনষ্ট সংসার॥
শ্বাশুড়ীর দোষে বধূ, কলহকারিণী॥
পতির দোষেই হয়, পত্নী দ্বিচারিণী॥
গুরুর দোষেই শিষ্য, কুপথেই ধায়।
স্ব-বুদ্ধির দোষে লোক নানা কষ্ট পায়॥

বিদ্যা সর্ব্বত্র ভূষণ স্বরূপ

তারাসমূহের ভূষা, হয় তারাপতি।
কামিনীকুলের ভূষা; নিজ নিজ পতি॥
ধরনীর চারু ভূষা, হয় ধরাপতি॥
সেনাদের বিভূষণ, হয় সেনাপতি॥
দিবসের বিভূষণ, হয় দিবাপতি।
বিদ্যা সর্ব্বত্রের ভূষা, মনোহর, অতি॥

জঘন্য ব্যক্তি পরোক্ষে লোকের নিন্দা করে

পরোক্ষে লোকের নিন্দা, যে মানব করে।
লোকের অনিষ্ট চেষ্টা, করে, করে করে॥
অধম তাহার মত, কেহ নাই আর।
অত্যন্ত জঘন্য হয়, স্বভাব তাহার॥

(আগামীবারে সমাপ্য)

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্ত্যলীলাপীঠ কাশীপুরের উদ্যান বাড়ী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষ লীলা-ভূমি কাশীপুরের উদ্যান বাটি। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন গলার ক্যান্‌সার রোগে আক্রান্ত, তখন এই দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার্থে ভক্তেরা তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রথমে শ্যামপুকুরে পরে কাশীপুরের এই বাগান বাড়ীতে আনিয়া রাখেন। এই বাড়ীর প্রত্যেক ইঁট, কাঠ, ধূলিকণা, প্রতি দৃশ্য, প্রতি বৃক্ষ, প্রতি বস্তু অতি পবিত্র, অতি পুণ্যময়। শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর গম্ভীরালীলার মতই কাশীপুরের এই শেষ লীলা গভীর, করুণ, মধুর। এখানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ক্যান্‌সার রোগের ভীষণ যন্ত্রণার মাঝেও প্রতিটি মুহূর্ত্ত ভক্তগণের তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনা কল্যাণ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্যানেই ঠাকুর অগ্রহায়ণের শেষে আসিয়া ১২৯১ সালের শীত ও বসন্ত-কাল এবং ১২৯২ সালের গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু কাটাইয়া যান। এই দীর্ঘ আটমাস কাল নিদারুণ ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া এই উদ্যান বাটীতেই তিনি তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত করিবার জন্য ভক্ত-সঙ্ঘকে বিশেষ-রূপে শিক্ষা দীক্ষা দান করিয়া তাহাদের গড়িয়া দিয়া যান। নরেন্দ্রনাথ যে উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দরূপে সমগ্র জগতে যুগাবতারের ভাবধারা জলন্ত অগ্নিরাশির মত ব্যাপ্ত করিবেন, তাহারও সুচনা হয় এই কাশীপুরের উদ্যান বাড়ীতে। এই বাড়ীতেই স্বামী বিবেকানন্দের মাঝে আপন সমগ্র শক্তি নিঃশেষে দান করিয়া ভগবান রামকৃষ্ণ সজল নয়নে বলিয়াছিলেন, "এইবার আমি ফকির হ'লাম।" এই বাড়ীতেই তাঁহার দুরন্ত গলরোগের প্রাণঢালা সেবায় মিশিয়া তাঁহার যে ত্যাগী ভক্তেরা একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নাম পৃথিবীময় ধ্বনিত করিবেন, তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হ'ন। এই বাড়ী হইতেই রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, সকল সেবাকার্য্য, সকল ভাবধারার উৎস, প্রথম প্রবাহিত হয়। এই বাড়ীতেই 'কল্পতরুদিবসে' শ্রীরামকৃষ্ণ সমাগত জনমণ্ডলীর বক্ষে হাত দিয়া "তোমাদের চৈতন্য হোক্" এই পরম আশীর্ব্বাণী উচ্চারণের দ্বারা তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরের পাতকরাশি আপন রোগ-দীর্ণ শরীরে আকর্ষণ পূর্ব্বক দেহ রাখিয়াছিলেন। একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গেই বুঝি (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী) যে কল্পতরু দিবসের তুলনা হয়, সে ঘটনাও এই উদ্যান বাড়ীর উদ্যান সংলগ্ন একটি বৃক্ষতলে অনুষ্ঠিত হয়। এই পুণ্যময় শত স্মৃতি বিজড়িত কাশীপুরের বাগান বাড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা কি, তাহা কি সকলে জানেন? গত সাত বৎসর হইতে মিঃ মার্টিন নামে

জনৈক আর্মেনিয়ান এই উত্থান বাটি ব্যবসায়ী ভাড়াটিয়া হিসাবে ভাড়া লইয়া তথায় একটি শূকর মাংসের সরবরাহকারী কারখানা খুলিয়াছেন। যে ভূমি একদা ভগবান রামকৃষ্ণদেবের পূত চরণস্পর্শে তীর্থ স্বরূপ হইয়াছিল, আজ তথায় বাগানের চারিদিকে শূকরমাংসের অস্থি, চর্ব্বি এবং হাড় জমিয়া এমন দুর্গন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, যে কেহ ঢুকিতে পারে না। কালীমিশ্রের আলয় "গম্ভীরা'র মত, শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির সংলগ্ন গরুড় স্তম্ভের মত যে বাড়ী, যে কল্পতরু বৃক্ষ ভক্তগণের হৃদয়ের ধন, সেই বাড়ীতে ঘোর অনাচার; সেই উত্থান সংলগ্ন কল্পতরু বৃক্ষে দিবারাত্র শকুনী বসিয়া তাহাকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে, শকুনী বসার ফলে উত্থানের অন্যান্য বৃক্ষের সমস্ত ডালপালাও শুকাইয়া গেছে। সমস্ত উত্থানটি মৃত পশুর টুকরা টুকরা অস্থি, কঙ্কাল চর্ব্বি এবং হাড়ে আকীর্ণ হইয়া এক বীভৎস জঘন্যতার মধ্যে রহিয়াছে। আজ প্রায় দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেহ রাখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার অশেষ স্মৃতিমণ্ডিত দেবমন্দির সদৃশ এই বাড়ীখানি বেলুড় মঠ কিংবা অপর কোনও হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান ক্রয় করিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতির প্রভাব সংরক্ষিত করিবার সত্যকার চেষ্টা করেন নাই। বেলুড় মঠ এখান হইতে অধিক দূর নয়, এইরূপ অনাচার এই দীর্ঘ দিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এ পথে তাঁহারা সহস্রবার যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয় নাই। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের অবতার। তাঁহার শেষ লীলাস্থল এ যুগের সকলের চেয়ে বড় তীর্থ। এই তীর্থের যথার্থ পবিত্রতা ও মর্য্যাদা যদি না থাকে, তবে তাহা এ যুগের সকল বিশ্ববাসীর পক্ষেই পরম অকল্যাণ। অত্যন্ত পরিতাপের কথা, এতবড় সত্যকে এ যাবৎ আমরা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। শুধু উপেক্ষা করা নয়, এই তীর্থস্থলে মহা অনাচার ঘটিলেও কেহ তাহা লক্ষ্য করেন নাই। উত্থান বাড়ীখানি বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে, যে কেহ তাহা স্বচক্ষে দেখিলে তাহার হৃদয়ে আপনা-আপনি ধ্বনিত হইবে, যুগাবতারের অন্ত্যলীলাপীঠের প্রতি এই কি আমাদের কর্ত্তব্যের নিশানা?

আমাদের বহু দিনের অপরাধের ভার লাঘব করিতে সম্প্রতি অগ্রসর হইয়াছেন সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভক্তবৃন্দেরা। তাঁহারা কাশীপুরের বাটির বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারীর নিকট অশেষবিধ চেষ্টা এবং মহামান্য গভর্ণরের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ প্রভৃতি দ্বারা প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাশীপুরের উত্থান বাটি ক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহারা সকল বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া অমিত অধ্যবসায়ে নিষিদ্ধ মাংস সরবরাহকারীদিগকে এখান হইতে উঠাইয়া স্থানটি যাহাতে প্রকৃত দেবমন্দিরের মতই রক্ষিত হয়, যাহাতে তথায় জনকল্যাণমূলক নানা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, আর শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীর ইহা সাধনক্ষেত্ররূপে একটি জুড়াইবার স্থান হয়, তজ্জন্য প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী কাল বেলুড় মঠ এই উত্থানবাড়ী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন। ইহাকে মঠ বা মিশনের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে কোন চেষ্টাই করেন নাই। এখন বীরভূম সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা ক্রয় করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা জমি দখল আইন অনুযায়ী একটি দরখাস্ত করিয়া উহা নিজ অধিকারে লইতে চাহেনা, তাঁহাদের এই কার্য্যের ফলে উক্ত মাংসের কারখানা বন্ধ হইবার পথে এবং উদ্যানবাটি বিশুদ্ধ পবিত্ররূপে রক্ষিত করিবার পথে বাধা ঘটিয়া উহা বন্ধ হইয়াছে। একই মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত শ্রীরামকৃষ্ণসর্ব্বস্ব একটি প্রতিষ্ঠান, যাহার সেবাকার্য্যের প্রসারতা ইহার মধ্যেই বাঙ্গালা বিহারে বহু স্থানে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, সেই বীরভূম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম যখন এই কাশীপুর বাটি ক্রয় করিয়া লইয়া তাহাতে ভগবান রামকৃষ্ণদেবের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা এবং বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন এই পুণ্যপীঠ হইতে তাঁহাদের বঞ্চিত করিতে বেলুড় মঠের সমগ্র উদ্যম নিয়োগ করার কি কোন সার্থকতা আছে? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ যুগের যুগাবতার। তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষ, কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ এমনকি কোন জাতিবিশেষের জন্যও আসেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন এ যুগের সকলের জন্যে। যাঁহারা যথার্থ ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং প্রাণঢালা অনুরাগের সহিত তাঁহার কাজে নামিবেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত অধিকার এই কাজে। কোন প্রতিষ্ঠান কেবল একটা বিশেষ মার্কা মারা হইলেই যুগাবতারের সকল সাধনা এবং সম্পদের গার্জ্জেন হইবার অসঙ্গত দাবী করিতে পারেন না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদিলীলাপীঠ কামার পুকুরের পল্লীগৃহ আজিও অসংস্কৃত, অবহেলিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যলীলাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর যাহা এককালে কৈলাস সদৃশ ছিল, যাহা এ যুগের শ্রেষ্ঠতীর্থ তাহারাও প্রকৃত যত্ন আমরা করিয়াছি কি? "নহবতের" কথা আজিকার দিনে কে এমন আছে যে জানেনা? যেখানে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী সেই অতিক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে নীরবে কী সংযম এবং কত গভীর তপস্যা ও সেবায় তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ কাটাইয়া গেছেন। তাঁহার নিঃশব্দ সাধনার প্রভাবে, নিগূঢ় সেবার মহিমায় যে নহবতের

প্রতি অণুরেণুও তীর্থরেণু তুল্য সেই পরমাপ্রকৃতির সাক্ষাৎ লীলাস্থলের প্রতি কত অনাদর কত অবহেলা দক্ষিণেশ্বরের সেই ক্ষুদ্র 'নহবত' ঘর আজ আবর্জনার ভারে সমাচ্ছন্ন। গরু ছাগল প্রভৃতি পশুর জন্য তথায় খড়ের গুদাম করা হইয়াছে। মানব অজ্ঞ, সে নিজের কল্যাণ, অকল্যাণ সকল সময় নিজেই বুঝিতে পারেনা। তখন করুণার অবতার স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাহার কল্যাণের উৎস মুক্ত করিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন—মথুরা—দ্বারকা যখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই সব দেবভূমি অনাচারে অবহেলায় অরণ্যে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, তখন শ্রীমন মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনিই আবার আসিয়া ভক্ত-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার দ্বারা সেই সকল লুপ্ত তীর্থ তাঁহার ভক্তগণ দ্বারা উদ্ধার করাইয়াছিলেন। দুঃখহত পৃথিবীতে আবার সেইদিন ফিরিয়া আসিয়াছে, যেদিন তিনি পুনরায় তাঁহার ভক্তগণের দ্বারা তাঁহার লীলাস্থল উদ্ধার করাইয়া জগতবাসীর কল্যাণ করিবেন, তাঁহার এই চেষ্টায় জগতের কোন শক্তি বাধা দিতে পারিবে না।

আত্মা-যন্ত্রটী যে কার্য্যের পরিচালক, সে কার্য্যের সংখ্যা বড় বিরল। আত্মার পরিচালিত কার্য্যের ফলে জগতের প্রত্যেক বস্তুর মূল নিদান এবং নিদানের নিদান সম্বন্ধীয় তত্ত্ব জানা যায়। সে জানা শুধু কথার কাল্পনিক জানা অথবা কবির সুরের ঝঙ্কার নহে। আত্মা-যন্ত্রের পরিচালনায় সক্ষম মানুষ দুনিয়ায় একজন থাকিলে মানুষে মানুষে ভেদ, বিভিন্নতা ও মারামারি এত উৎকট হয় না। যৌবন এত ক্ষণস্থায়ী এবং জীবনের দৈর্ঘ্য এত অল্প হয় না; বর্ত্তমান জগতের বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বলিতে হয়, আত্মা-যন্ত্রের পরিচালনার সক্ষমতার কথা যেন ভারতীয় ঋষিগণের কল্পনা মাত্র। কাযেই, আমরা আত্মার কার্য্যকে এবং আত্মার কার্য্যে সক্ষম মানুষকে কোন শ্রেণীবদ্ধ করি নাই।

কিন্তু আমাদের একজন চিন্তাশীল পাঠক আমাদের বক্তব্যের অঙ্গহানি হইতেছে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন এবং আমরাও আত্মার কার্য্যের ও আত্মার কার্য্যে সক্ষম মানুষের নামকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি।

যে কার্য্যের পরিচালক আত্মা তাহার নাম "আধ্যাত্মিক" কার্য্য এবং যে মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক কার্য্য বেশী তাঁহার নাম "আধ্যাত্মিক" মানুষ বলা হইবে।

এই সমস্তই মানুষের কার্য্যের কথা এবং তাহার কার্য্যের যন্ত্রের কথা।

যদি ভগবানের ভগবত্তার উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে যে, তাঁহার রাজ্য এবং সৃষ্টি শৃঙ্খলাময়; বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা কোথাও নাই। যেখানে আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা, সেইখানেই আমাদের জ্ঞানের অভাব বুঝিতে হইবে। মানুষের কার্য্যের বিষয় এবং রকম অনুসারে নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হয় এবং মানুষ পরিবর্ত্তিত শক্তি-সম্পন্ন হয়। যেখানে মানুষের শক্তির অভাব সেইখানেই বুঝিতে হইবে মনুষের কার্য্যের বিষয়ে এবং রকমে মানুষ কোন না কোন ভুল করিয়াছে। মানুষকে সর্ব্বদা বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, সে তাহার কার্য্যের বিষয় ও রকম বাছিয়া লইতে শিখিলে নিজেকে অসীম শক্তি সম্পন্ন করিতে পারে। কোথায় তাহার শক্তির অভাব তাহার কার্য্যের পরিণতি দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। চেষ্টা করিলে নিজের শক্তি বাড়াইতে পারা যায়, এই হিসাবে আত্মবিশ্বাসী হইতে হইবে, কিন্তু কখনও যেন কোথায় শক্তির অভাব তদ্বিষয়ে মানুষ অন্ধ না হইয়া পড়ে।

—সচ্চিদানন্দ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

"Go on, until you find a woman,
Worth living for and dying with,
For love fills a man's life, while more
Important things can only occupy it."

"সে মায়-মূরতি কি কহিছে বাণী
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি
রহস্যে নিমগন—
এ যে সঙ্গীত কোথা হ'তে উঠে—
এ যে লাবণ্য কোথা হ'তে ফুটে
এ যে ক্রন্দন কোথা হ'তে টুটে
অন্তর-বিদারণ।"
—রবীন্দ্রনাথ।

•

দিন হ'য়ে এল শেষ সূর্য্য ডোবে জলে
সুবর্ণ বিবর্ণ করি জাহ্নবীর তলে
অসকালে স্নানঘাটে পরি নীল সাড়ী—
রচিল মোহন স্বপ্ন চক্ষে তার নারী
চলিল পদাঙ্ক দুত,—ভীরু প্রণয়ের —
সেই বক্ষ দুরু দুরু মহামুহূর্ত্তের—
আঁকিয়া রাখিয়া মনে,—পশ্চাতে সঞ্চরি
লোলুপ তস্কর সম হেরে আঁখি ভরি
কাঞ্চন-টিপি-বক্ষে মাণিক্যের ফুল
থরে থরে অপরূপ মুকুতা দোদুল
দুলিছে দ্রাক্ষার মত; হেন স্বপ্নপুরে
কুরঙ্গ কু-রঙ্গ লোভে বাঁশরীর সুরে
পড়িল ষণ্ডরা জালে।
বিত্তশালী পিতা,
সুব্রত-ই জ্যেষ্ঠপুত্র বহু বন্ধু মিতা
সুব্রতেরে বিবিমতে স্নেহে করুণায়
বুঝাইল বহু তা'রে পরে প্রত্যাশায়
জলাঞ্জলি দিল সবে।
সর্ব্বগুণে গুণী
তথাপি তরুণচিত্ত হেরিয়া তরুণী
নিহত প্রথম শরে।
নাম তা'র স্বর্ণা
কোমল পেলব ওষ্ঠ, কণ্ঠে বাজে বীণা
আনন্দ-চঞ্চল আঁখি চপল চরণে
রজত পঞ্জরগুলি মৃদু গুঞ্জরণে
গাহে আগমনী তার।

কহে তারে যুবা
"তোমার ভিখারী আমি জীবনে নতুবা
ফুরাইবে সব সাধ তব সাধনায়—
আমার সর্ব্বস্ব ধরি দিব তব পায়
না হ'লে ফিরিয়া যাবো গৃহে নহে দূরে
ফিরায়ো না, হে সুন্দরি! আগ্রহ-বিধুরে
গ্রহণ করিতে দাও ওই দুটি কর—
নয়ন রাখিতে দাও নয়নের পর—
আয়ত কাজল টানা চঞ্চল শফরী
ফিরায়োনা আঁখি হ'তে হে স্বপ্ন সুন্দরি!
রাখো এ মিনতি রাখো, লো লুব্ধক বালা
লাবণ্য বিজলীলতা এই তো নিরালা
সৌন্দর্য্যপূজার তীর্থ; পরিব্রাজকেরে
করি দয়া পূজা লহ; প্রাবৃট্ মেঘেরে
ধন্য করি লহ তা'র হর্ষ বরষণ
মুগ্ধ আঁখি অধরোষ্ঠে আনন্দ বন্দন
আপাদ মস্তকে তব চন্দনের মত
লেপিয়া সকল অঙ্গে রহিব বিতত—
শারদ কৌমুদী সম কুমুদের গায়
জলে শিহরণ তুলি পাতায় পাতায়

ঢালি অনুরাগ মোর তুলিয়া হিল্লোল
সলিল শয়নে তব ধীরে দিব দোল
বৃন্তে ধরি।
ওগো নব প্রফুল্ল কহ্লার !
বল তুমি প্রিয়তমে ! হইবে আমার,—
করিয়ে আমায়ে তব মুগ্ধ মধুকর
সানন্দ-গুঞ্জন-বাণী শুনি নিরন্তর
মকরন্দ দানে।
অর্থ যদি নাহি চাহ
পরমার্থ দিব করে ওগো বারিবাহ !
নবাভ্রে অমৃতবিন্দু তৃষার্ত্ত অধরে
গর্ব্বিত চাতককণ্ঠে পড়ে যেন ঝ'রে
কৃতার্থ সেচনে।
সুব্রত আমার নাম
তুমিই আমার ব্রত লোচন-ললাম
অনর্পিত অনুরাগ ধর্ম্ম অর্থ কাম
আপনা কৃতার্থ মানি পদে রাখিলাম,
লবে কি সুন্দরি !"
ধরিল যুবার কর
পল্বলের প্রতিবিম্বে হেরি শশধর—
বরিল কহ্লার-বালা।
ক্রমে দিন যায়—
খণার আতিথ্য লভি উৎসাহে তথায়
এক সাথে পূজা করে কমলা ভারতী
সুব্রত সার্থক ব্রত নিশার আরতি
নয়নে প্রদীপ জ্বালি খণামুখ চাহি
ভারতীর সমর্চ্চনে ক্লান্তি তার নাহি
নিত্য রাত্রি জাগরণে সাহিত্যের সেবা
সে যদি না সিদ্ধি লভে তবে আর কেবা
গীতিকাব্য-পয়োনিধি করিয়া মন্থন
আকণ্ঠ অমৃতপান করি রোমন্থন—
সে যদি না শ্রেষ্ঠ হয় ভাষা-ভঙ্গিমায়
তা'র চেয়ে আর কেবা করেছে নিষ্ঠায়
বাণীপূজা ?
মহা সারস্বত বিদ্যালয়ে
ছন্দঃশাস্ত্রে অলঙ্কারে শীর্ষস্থান লয়ে
আসিল খণার কাছে, কহিল তাহারে—
"খণা, এ করুণা তব অর্পিনু তোমারে।
প্রসন্ন পূজায় তব কাব্য-সরস্বতী
ফুটে লেখনীর মুখে ভাষা-ভাগীরথী
প্রবাহ ব'হয়া চলে কূলে উপকূলে
পীযূষের মন্দাকিনী বিলাইয়া বুলে
অপার্থিব পরিমল।
যবে মন্দ লোকে
কহে মন্দ পঙ্কজেরে প্রস্ফুট পুলকে
স্মরে সে পঙ্কের কথা ; ওলো মৃণালিনী
তোমার কলঙ্কে খণা আমি চিরঋণী
বিক্রীত ধিকৃত মানি অভ্যস্ত বিস্তায়
ইঙ্গিতে সঙ্গীত-উৎস চক্ষের ভাষায়
বক্ষে মোর উৎসারিত ; আনন্দ নির্ঝর
ঝরাও ওষ্ঠের ভাষে ; তাই অতঃপর
দর্শন বিজ্ঞান ত্যজি ভজি কাব্যকলা
একান্ত দর্শনে মজি।
অচ্ছেদ্য মেখলা
আবদ্ধ প্রতিভা পক্ষী অপ্রতিভ নহে
নহে বাঁধা নাহি বাধা বদ্ধ তবু রহে
আগ্রীব মজ্জিত প্রেমে চিত্তে নাহি গ্লানি
সুন্দরে ও সুমধুরে সুপবিত্র মানি
দ্বিধাহীন মনে
বারনারী নহ তুমি
বরনারী বর্ণনার রঙ্গলীলা-ভূমি
কাব্য-কলা কল্পনার বিচিত্র রঞ্জনে
আমার-উর্ব্বশী তুমি ধরার নন্দনে
সুপ্রসন্ন বরাননা অধরে অমৃত
অলকানন্দার ধারা প্রেমে অপ্রাকৃত
স্বার্থ-সুখলেশহীন।"
দিন যায় ক্রমে
পূর্ণিমা শশাঙ্কে যেন অবলীলা ক্রমে
গলাধঃকরণ করে শর্ব্বরীর রাহু
গ্রাসিবারে চায় আরো প্রসারিয়া বাহু
সুব্রতের প্রেমক্ষুধা তবু যেন বাড়ে
খণার সর্ব্বস্ব গ্রাসি।
ব্যর্থ বারে বারে
আত্মীয় স্বজন তবু ছাড়িতে না পারে
সুব্রতের হিতাকাঙ্ক্ষা।
বন্ধু একজন
তীর্থপতি নাম তা'র একান্ত গোপন
নির্ব্বাচিয়া অবসর তার কাছে গিয়া
খণারে চাহিল ভিক্ষা :—
"ওগো পরকীয়া
বন্ধুর বান্ধবী প্রিয়া রূপোপজীবিনী-
ক্ষমা কর অবাঞ্ছিতে, ওগো পসারিণি
কে দিবে তোমার মূল্য কোন্ ধন দিয়া
বিকাইল বন্ধু মোর আপনা অর্পিয়া
একান্ত অনর্ঘ মানি।
আসিয়াছি তাই
তাহার গৃহের লাগি তা'রে ভিক্ষা চাই
দিবে কি প্রসন্ন মনে ?

কহ সুবদনে !
গৃহে বর্ষীয়সী মাতা পিতা দিন গণে
প্রতিদিন লালনের পালনের পরে
সন্তান স্নেহের ঋণ অস্বীকার করে
তবে কহ ঋণা, কি আশায় কি বিশ্বাসে
বিশ্বাসিবে তারে ?
নিদ্রাহীন দীর্ঘশ্বাসে
সুব্রতের ভাবনায় একান্ত অধীর
স্তন্যদাত্রী জননীর চক্ষে বহে নীর
জনকের অধোমুখ তাঁ'র মুখ চাহি
এই কুলপাংশু যুবা কৃতজ্ঞতা নাহি
তাঁহাদের দুঃখ-সুখ অধম তনয়ে
যদি নাহি অনুভবে বয়ঃপ্রাপ্ত হ'য়ে
বল দেবি ! ক্ষমা তা'রে কেমনে করিবে
কোন্ গুণে আপনারে অর্ঘ্য করি দিবে
নিষ্ঠুর চরণে তার আশ্লেষ পীড়নে
হস্তিপদতলে যেন দর্পিত দলনে
নিষ্পিষ্ট ব্রততী সম ?
ভালোবাসো জানি
সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্নেহাশ্রয় দানি
সুচতুর পরভৃতে পালিছ নিভৃতে
কোন্ সুখ লাগি ?
ভাগ্য-কুজ্ঝটিকাবৃতে
কোন্ চন্দ্রে চাহি তুমি হে মুগ্ধ চকোর
ভবিষ্যের মুখে ভস্ম, হে বান্ধবি মোর
আপনি লেপিছ বসি ?
কিবা ফল তাহে ?
জল বিন্দু নাহি যাহে হেন বারিবাহে
সেবিছ উপল-বজ্র-বিজলীর লাগি !
বিসর্জ্জন কর তারে।
হে ভ্রান্ত অভাগি !
আশৈশব কৈশোরের সখ্য বিনিময়ে
আমি ভালো চিনি তা'রে।
আজি তা'র হ'য়ে
যে কথা তোমারে বলি তারো কাছে তাই
হিতার্থি হৃদয়ে বলি ; আজি আসি নাই
ভাঙিতে তোমার মন।
আমি শুধু চাই
জরাতুর পিতামাতা,—আহা ! কেহ নাই
তাহাদের বার্দ্ধক্যের আশ্রয় আশ্বাস
ভালো যদি বাসো তবে ছাড়ো তা'র আশ।
জানি ভালোবাসো তারে, জানি ব্যথা পাবে
তোমার সুখের স্বর্গ চূর্ণ হয়ে যাবে
কিন্তু দেবি ! আরো জানি যদি শক্তি থাকে
তাহার কল্যাণ লাগি দিতে আপনাকে
আপন সর্ব্বস্ব সহ সর্ব্ব সুখ বলি
সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম দৃষ্টি মেলি কৌতূহলী
পৃথ্বী চেয়ে রবে।
সাবিত্রী-স্বর্গের দ্বার
তোমা তরে মুক্ত দেবি ! হ'বে পুনর্ব্বার
অসামান্য প্রেমে তব।"
ঋণা কহে তারে
"তীর্থপতি নাম তব, তীর্থ করিবারে
উদার আহ্বান তব।
আমার লাগিয়া
যে অসীম স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধা মিশাইয়া
সম্বোধিলে দেবী বলে হে মোর দেবর !
সে দৃষ্টি কোথায় পেলে পামরীর পর ?
ধরিত্রীর পাপপথে মোরা প্রতিহারী
আগমের পথ জানি নির্গম-ভিখারী
কোনো দয়া নাহি হায় ! নির্ম্মম হৃদয়ে
নিজেরো নিষ্কৃতি নাই গুটিপোকা হয়ে
আপানার নাল-জালে বন্দী হৈনু নিজে
এ মোর উষর ভূমি অশ্রুজলে ভিজে
কেন যে মজিল প্রেমে !
কিন্তু কিবা করি ?
আমি যদি করি ত্যাগ সে আমারে ধরি
পড়িয়া থাকিতে চায় আমার নিরয়ে
আমি মুগ্ধা অভাগিনী দাসী তার হ'য়ে
কেমনে ফিরাই তারে ?
ফিরিবে সে কেন ?
আমি তার কাঙালিনী তবু যদি হেন
নিষ্ঠুরা হইতে পারি তার সুখ লাগি
হে বন্ধু ! তুমি তো জান মোর অনুরাগী
অন্ধ হ'ল পুষ্পে মোর মকরন্দব্রত
ভাগ্যহত ভৃঙ্গ মোর !
অনুনয়ে কত
কত না বুঝানু তারে, বুঝাতে নারিনু
আমি শুধু তার প্রেমে পঞ্জর জারিনু
কহিনু মিনতি ক'রে মোরে ত্যাগ করি
যাইতে আপন গৃহে।
মাতৃপদে ধরি
মাগিতে পিতার ক্ষমা।

সে শোনে না কিছু
ভৎর্সনায় পাংশু মুখ লাজে মাথা নীচু
আমি কি দেখিতে পারি ?
সেই মোর সব
সর্ব্বস্ব তাহারে দিয়া একান্ত নীরব
তাই তো তাহারে সেবি।
মোরে কহ ‘দেবী !’
সুব্রতের ব্রত ভঙ্গ করি অপদেবী
আমার পদবী হ’ল।
মোরে ভষ্ম করি
এ পূর্ণ যৌবনে অঙ্গ অঙ্গারকে ধরি
দিতে পারি দগ্ধ করি ; প্রায়শ্চিত্ত নহে
যে কষ্ট আমার বক্ষে পূর্ণ স্রোতে বহে
সেই মিটাইবে তৃষা,—না না মিটিবে না
সে তৃষা মিটিলে প্রাণ মুহূর্ত্ত রবে না
রবে কি আশায় বল ?
তাহার সর্ব্বস্ব আমি
সর্ব্বস্ব আমার সেও । সেই মোর স্বামী।
যেদিন চেয়েছে মোরে অশ্ববিনিময়ে
সেদিন হয়েছি তারি। তাহার বিজয়ে
বিজয়িনী রূপজীবা স্বরূপ চিনেছে
রূপের মৃত্তিকা হ’তে চির মুক্তি দেছে
নারীর আত্মারে তা’র।”
কহে তীর্থপতি—
“একমাত্র পন্থা কহি, হে অনন্তমতি।
তুমি কি পারিবে তাহা—ব্যথা দিতে তা’রে ?
বিস্ফোটকে অস্ত্রাঘাত বিনা কি সে সারে ?
তাহারে করিলে দয়া ফুৎকারে চুম্বনে
আহা! উহু! দীর্ঘশ্বাস হানি ক্ষণে ক্ষণে
প্রশ্রয়ে বেদনা বাড়ে।
কর অস্ত্রাঘাত
তারে অবহেলা কর মোরে পক্ষপাত
প্রণয়ের অভিনয়ে হিংসাদিগ্ধ মনে
তবে যদি তা’র মন কোনো ক্ষীণ ক্ষণে
তোমারে বিমুখ হয়, নহে সাধ্য তা’র
নাহিক ফিরাতে মুখ ; ফিরায়ে কাহার
চাহিবে মুখের পানে ?
কেন বা চাহিবে ?
পূর্ণিমা-শশীরে ত্যজি কেবা নিরখিবে
মৃন্ময় প্রদীপপানে ?
কেন আঁখি ঝরে
সন্দেহের তুষানলে দহিবার তরে
এই অকল্যাণ প্রেমে ? দাও পূর্ণাহুতি
আপনারে।”
খণা কহে করিয়া কাকুতি
“দিয়েছি সখ্যের স্নেহ প্রেয়সীর প্রেম
দাসীর সেবার চর্য্যা মণি-মুক্তা-হেম
পার্থিব সম্পদ্ যত সে লহেনি কিছু
আমারে লয়েছে শুধু।
মোর পিছু পিছু
ফিরিয়াছে শিশু যেন মুগ্ধ খেলনায়
খেলাঘরে খেলা করি চিত্ত যাহা চায়
নিত্য দুই জনে।
সামান্য রমণী আমি
নহি আর আপনার, নহি কামকামী
দগ্ধ আমি শুদ্ধ আমি কাঞ্চনের চেয়ে
কে বলে পবিত্র নয় এ মানবী মেয়ে
অগোত্রসম্ভবা ?”
শুনি তীর্থপতি কহে :—
“মর্ত্ত্য-বিদ্যাধরী তুমি কণ্ঠ হ’তে বহে
সঙ্গীত-নির্ঝর যেন উলসি উচ্ছ্বসি
সপ্তস্বরা বীণাখানি পরশি পরশি
পুরূরবা সভাতলে উর্ব্বশী মেনকা
তুমিও ধরার মেয়ে হীরক-কনকা-
-ভরণ ভূষিত অঙ্গ দোদুল-কুন্তলা
অলকা-বলিত মুখ শিঞ্জিত মেখলা
মঞ্জীর গুঞ্জিত পদে মনোমুগ্ধ করি
স্বর্গের আস্বাদ দিয়া ধরার প্রহরী
ধরার সন্তানে বাঁধি মাটির বাঁধনে
লাবণ্য যৌবনে পূর্ণ হিঙ্গুল বরণে
বুলাও ভাস্বর তুলী।
প্রেম-পূজারতা
রাজেন্দ্র-সোহাগ ত্যজি তুমি সেবাব্রতা
সৌন্দর্য্যসম্ভারে তব সুব্রতেরে সেবি
মোর চক্ষে দেবী তুমি তাই কহি ‘দেবী’।
দিব্য ভাব ফুটে মুখে ধ্যাননেত্রে চাহি
স্বপ্নে যেন কহে খণা বাহ্যজ্ঞান নাহি :—
“ভক্ত মোরে পূজা দিল সেই পূজা লয়ে
বহু বল্লভের প্রেম-আপ্লুত হৃদয়ে
একের চরণে ঢালি বহু পুষ্প সম
অন্তরের দেবতারে বলি—‘প্রভু মম
চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার রসনার রস
নিঙাড়ি সর্ব্বাঙ্গ মোর চন্দন পরশ

অলক্ত চরণ তুলে রাখ আপনার
দেহের দেউলে এই আরতি আমার
নয়নে বচনে মনে।'

এ সৌধ-শিখরে
নিত্য প্রভাতের আলো পড়ে ঝ'রে ঝ'রে
নয়নে অঞ্জলি ভরি সে-আলোক-রাশি
তাহার নয়নে ঢালি বড় ভালবাসি
প্রসাধন করি তায় প্রেম-সাধনায়
উষায় মধ্যাহ্ন দিনে গোধূলি বেলায়
গভীর নিশীথে।

মোর হৃদয়ের ফুল
ফুটাইয়া সপ্তবর্ণে আশায় দোদুল
বাসনার রাগরক্ত তৃপ্তিহীন চোখে
জ্বালিয়া তৃষিত শিখা লোকোত্তর লোকে
তাহারে বরণ করি।

প্রত্যহ সন্ধ্যায়
রাত্রি আসে দিন যায় দিন চলে যায়
আলেয়ার ক্ষণপ্রভা।

দেখিতে দেখিতে
দেখার আভাস মাত্র নাহি পারে দিতে
দেখিয়া তৃপ্তির সুখ সেই তার মুখ
সে মোরে ফিরাবে দেখি?

তাই মানি সুখ
সুখেরে বিদায় দিব তা'র সুখ লাগি
আমারে করিবে মনে অন্তে অনুরাগী
তা'তে তা'র হবে ভালো?

তুমি ভাল জানো
ভাল যদি হয় মোর শিরে বজ্র হানো
আনন্দে সহিব আমি তা'রে ভালবাসি;
কিন্তু, তুমি কোন সাধে বিষাদবিলাসী
আমার প্রেমের ভান অভিনয় করি
সুব্রতের প্রিয়ব্রত হিংসা লবে বরি
আপনার পরে,—এত ভালবাস তা'রে?
আমারে বেসো না যেন মিনতি তোমারে
নিতান্ত বিনয়ে বলি।

ঠাঁই নাই নাই
তাহাতে হারায়ে গিয়ে খুঁজে নাহি পাই
আপন সত্তারে।

ভয় নাই কুণ্ঠা নাই
উদ্বেগের অণুমাত্র নাই মনে তাই
অনুমোদনের হর্ষে পুলকিত আমি
এ মৃত্যু দুর্গত তম তবু তাহা কামি
সুব্রতের শুভতরে।

তুমি তীর্থপতি
প্রবঞ্চনা অভিনয়ে, হে মোর সারথি!
চলিব তোমার সাথে তীর্থ-সহচরী
সাধ্বী আজি বারাঙ্গনা অভিনয় করি
তোমারে বাসিব ভালো, তাহারে উপেখি
সে মোরে করিবে ঘৃণা নিজ চক্ষে দেখি;
দগ্ধ হ'ব তিলে তিলে, তুষানল জ্বালি,
সবার সন্দেহদিগ্ধ নয়নে দেয়ালি
বিদ্রূপের হলাহলে উপহাসানলে—
আমারে করিব দগ্ধ, কহিবে সকলে
এই তো বেশ্যার প্রেম!

ফিরিবে সুব্রত
কেতকী-কণ্টক ত্যজি সে তাহার ব্রত
লভিবে রজনীগন্ধা কল্যাণী প্রেয়সী
আমি তার পথ চেয়ে পরকালে বসি
গণিব মুহূর্ত-মালা, ক্রত চাহি না
তাহার সুখের স্বর্গ কল্যাণ কামনা
করিব তপস্যা মোর।

কুমুদিনী সম
সুদূর গগনে হেরি মোর প্রিয়তম
রজনীর আলিঙ্গনে মুগ্ধ কুতূহলী
প্রসারি কাঙাল করে তৃষিত অঞ্জলি
কারো কৃপা নাহি পাবো সবাকার ঘৃণা
সকলে কহিবে ছি ছি! বারাঙ্গনা ঘৃণ্য
পয়ঃপ্রণালীর কীট! কুঙ্কুম চন্দনে
চাহে কি মক্ষিকা কভু? লাঞ্ছিত জীবনে
তুমি মোর সাক্ষী রবে।

মুদিলে পঙ্কজ
সুরভি-সৌন্দর্য্যহীন তব পদরজ
হে বন্ধু! মাথায় দিও।

দগ্ধ নাহি করি
এই প্রেমদগ্ধ দেহ সমাধিতে ধরি
ভূগর্ভে প্রোথিত কোরো মৃত্তিকার কাঁটে
এই দেহে শান্ত পাবে।

শিলা পাদপীঠে
লিখিও এ প্রেমকথা এই প্রবঞ্চনা
ঘৃণ্য সুব্রতের প্রিয়া তাই এ লাঞ্ছনা
সহিল তাহার তরে।

বোঝে তারে পরে
শান্ত কোরো অভিমান ছুটি করে ধরে
অবসান হ'লে মোর তারে নাম করে

বোল তারে অভাগীর কথা, গৃহশান্তি তরে
দূর হ'ল এ দুর্গ্রহ প্রসন্ন অন্তরে।
যদি সে ফিরায় মুখ অভিমানভরে
ক্ষমা করিবারে বোলো অক্ষমার দোষ
অবলার অক্ষমতা, নাহি ক'রে রোষ
তাহার খনার পরে।
ব্যথা পায় যদি
দূরে গেলে অভিমান; হে মোর দরদী!
এ প্রত্যঙ্গ তিলে তিলে তুষানল জ্বালা
তবু প্রেম-সুশীতল এ মন্দারমালা
পরাইও কণ্ঠে তার মোর কণ্ঠহার
স্মরণের মাধবিকা অভাগী খনার
গ্রথিত নয়নজলে।
হতভাগিনীর
স্মরণে নয়নে যদি ঝরে তার নীর
বুঝাইও, প্রবোধিও তার ঋণে খনা
তাহারি প্রণয়-প্রীতি-মুখর এ বীণা
আমরণ পরপারে আঁখি নিদ্রাহীনা
চিরদিন চেয়ে রবে ধ্যান-নিমীলিনা
বিরহিনী খনা।
না। না। তাতে কাজ নাই
তাহার সুখের গ্রাসে কেন দিবে ছাই?
এ বিস্মৃত স্মৃতি মোর তুমি রেখো মনে
আর কোনো ভাবগ্রাহী কবি জনার্দ্দনে
বোলো কানে কানে, যেন ছন্দে কবিতায়
ছদ্মনাম বিরচনে ইঙ্গিতে জানায়
তাহারে আমার কথা।
দুঃখ নাহি দিও
আমি মরি নাই দুঃখে এ কথা বলিও
মরেছি তাহার লাগি তারি প্রয়োজনে
পিতা মাতা বিবাহের সমাজ-বন্ধনে
সবার সুখের গ্রন্থি অটুট রাখিয়া
এ শিথিল শেফালিকা আনন্দে ঝরিয়া
পড়িল ধরণীতলে; প্রভাত-শিশির
প্রসাধন করিয়াছে উদয়-রবির
অরুণ করুণালোকে।
দিন গত হয়
খনা-তীর্থপতি প্রেম করে অভিনয়
কুশল কৌশলে ছলে।
নৃত্য গীত চলে
চরণে নূপুর বাজি রুণু-ঝুনু বলে
ছন্দের হিল্লোলে দোলে সর্পিণীর মত
সর্ব্বাঙ্গে সঙ্গীতভঙ্গী ফুটাইতে রত

নিশীথে বেহাগ্ রাগ, প্রভাতে প্রভাতী
এই নাট্য অভিনয়ে প্রভাতিয়া রাতি
খনা তীর্থপতি সনে।
আসিলে সুব্রত
বক্রোষ্ঠে বিরক্তি তার ফুটে বিধিমত
অকপটে সে কাপট্য চলে পরিপাটি
অপরূপ রূপে মিথ্যা হয় সত্য খাঁটি
সুচতুর অভিনয়ে।
সুব্রতের মন
আশীবিষ বিষ-দগ্ধ সহজে তখন
ফিরিল সংসারপথে নিজগৃহাঙ্গনে
গৃহপারাবতসম বিবাহ-বন্ধনে
আবদ্ধ অচ্ছেদ্য জালে।
কিছু দিন যায়
মনের বিষের কাঁটা শক্তিশেল প্রায়
মর্ম্মে রহে গাঁথা।
খনার আলয়ে আসি
বিচারক নিজ হাতে জল্লাদের ফাঁসি
দিতে চায় দণ্ডিতেরে।
আসি কহে, 'খনা—
দোষ কর নাই তুমি, স্বভাব-কুলীনা
অভ্যস্ত কুৎসিত পথে, পণ্য-বনিতার
আজন্ম সংস্কারলব্ধ জন্ম, পতিতার
নিতান্ত নিরয়-গর্ভে।
আমি বুঝিয়াছি,
প্রেম লোভে আসি নাই, আজি আসিয়াছি—
বিলাস-লালসালুব্ধ বারাঙ্গণা-ঘরে
বারুণীর এক পাত্র পান করি পরে
তোমার শেষের গান শুনে যাবো আজ
এই লহ মূল্য তার। আছে বহু কাজ।
আর এক কথা খনা, খেদ কেন রহে
আজ শুধু গান নহে ও কালিয়দহে
কামনার কালকূট রূপ-দর্পিতার
রূপের রৌপ্যের মূল্যে বর্দ্ধিত স্পর্দ্ধার
রৌপ্য দিয়া করি ক্রয় আক্রোশে আমার
আশ্লেষ চুম্বন করি, করি কিছু পান
নিয়ে যাবো সে আস্বাদ শেষাস্বাদ দান
আমিও করিব কিছু।
তোর বিষ ঢালা
আমার দশন-দংশ তোরে দিবে জ্বালা
যাবৎ জীবন রবে।

এই অভিশাপ—
জীবনে যে-সব কিছু করেছিস্ পাপ
বিষবৃক্ষে যেন তার প্রতিফল ফলে
একান্ত অর্পিত প্রেম দুই পায়ে দ'লে
ভেবেছ কুশলে রবে ?
লম্পটের মত
আজি আসিয়াছি তাই নিতান্ত সঙ্গত
কিছু প্রতিশোধ নিতে।
কর কর গান
মদিরার পাত্র সহ দেহ কর দান
বিপণির পণ্য রূপ এত দর্প তার
আমার সাধের স্বপ্ন করি ছারখার
গড়িলে আপন স্বর্গ !
আসিয়াছি তাই
তোমারে বাসিতে ভালো আজি আসি নাই
মূল্য দিয়া ক্রয় করি তীর্থের প্রসাদ
অগ্রিম দক্ষিণা লহ মিটাইতে সাধ
মজুরী তোমার।"
অপমান কশাহত
লইল সে স্বর্ণমুদ্রা করি যথামত
তাহার একান্ত প্রেমে অতিথি-সৎকার
পরিহাসে অবিচল আনন্দ-সম্ভার
ঢালিল পীযূষকণ্ঠে।
ক্ষয়ক্ষীণ দেহ
হেরিয়া তাহার মনে ক্ষণিক সন্দেহ
হইল ঈষৎ মনে। (হইবে না কেন
নিখাদ সুবর্ণে হেরি স্বর্ণকারে হেন
হয় কি পিত্তল ভ্রম।) তবু গেল চলে
প্রতিশোধ লইল সে, স্বর্ণমুদ্রাবলে
ক্ষতচিত্ত সম্পূরণে।
কালক্রমে ক্ষীণা
কুটিল-রসনা-দষ্ট দিন দিন ক্ষীণা
মলিন বিবর্ণ তনু লাবণ্যের নদী
নিঃস্নেহে নিঃশ্বাসে শুষ্ক দগ্ধ নিরবধি
শুইল সমাধিতলে।
তীর্থপতি তার-
লিখে নিত্য দিনচর্য্যা প্রতিদিনকার
সুব্রতের স্মৃতিপূজা যোগিনীর মত
গৃহের শৃঙ্খলা নাই সংসারে বিরত
কেশে প্রসাধন নাই, বেশে নাই শোভা
অপাঙ্গে বিজলী নাই মুনিমনোলোভা
প্রশান্ত বিষাদ মুখে সাধ নাই সাধে
ব্যঞ্জন লবণ-হীন, কবরী না বাঁধে
প্রতি অঙ্গে অবহেলা রুক্ষ বাস পরে।
বর্জ্জিত তাম্বূলরাগ পাণ্ডুর অধরে
বিরহ বৈরাগ যোগে ঊর্দ্ধে চাহে আঁখি
উড়ে গেছে সেই পথে যেন প্রাণপাখী
বন্ধুর সন্ধান মাগি কুশল সন্দেশ
কোন লোকোত্তর লোকে হল নিরুদ্দেশ
হসিত নয়ন দুটী।
আসন্ন শয্যায়
কভু শুষ্ক কভু সিক্ত নেত্রতারকায়
কভু স্নেহ কভু প্রেম উদ্দেশে প্রকাশি
উন্নিদ্র প্রতীক্ষা-পথে চাহিয়া উদাসী
আলিঙ্গিয়া উপাধান কভু তন্দ্রাভরে
স্বপনের নিরীক্ষণ ক্ষণিকের তরে—
বহু রাত্রি প্রতীক্ষার পরে।
তারপর
ছিন্নতন্ত্রী বিপঞ্চিকা ধূলায় ধূসর
শেষ ক্ষীণ কণ্ঠে ফুটে বিদায়ের স্বর,
—তা'র শেষ নিমেষের দৃষ্টি স্বয়ম্বর—
সুব্রতের চিত্রপটে সমর্পিয়া মালা
মুদিল নয়নপদ্ম চিরতরে বালা।
'যথা-অভিমত ধ্যানে'—ঋষি পতঞ্জলি
যেমন কহিল যোগে, চোখের অঞ্জলি
অর্পিল প্রিয়ের পরে বিয়োগ-যোগিনী
সমাধি লভিল যোগে, প্রিয়-বিরহিণী
মিলিল প্রিয়ের সাথে।
যে যেমন মতি
যেমন প্রপন্ন হয় প্রভু, ভর্ত্তা, গতি
তেমনি তাহারে লয় আপনার হাতে
আপনি চরণে রাখে জ্যোতির্ম্ময় প্রাতে
প্রেমের সহস্রদলে।
শেষ যবনিকা
জীবনের রঙ্গমঞ্চে বিয়োগ-নাটিকা
সমাপিল তীর্থপতি।
লিখিল সুব্রতে
পঞ্চবিংশ বর্ষ পরে চলে তীর্থপথে
জানাইয়া আখ্যায়িকা, সুব্রতের পরে
অনাদৃতা নিদ্রিতারে সমর্পণ ক'রে
সমাধি-মন্দিরপূজা পুষ্প দীপমালা
যেমন সে দিত নিত্য সে তীর্থে নিরালা।

* * *

কতদিন পরে এক পান্থ পথ বাহি
চলিতে কণ্ঠের স্বরে ফিরে দেখে চাহি
সমাধিবেদীর তলে ধ্যাননেত্র বসি-

বৃদ্ধ এক সমাহিত দুয়ার্ত্তীতে পশি'
কহে আত্মগত :—

"আজিকে ঘুমাও তুমি
জাগিয়া মার্জ্জনা করি এ পবিত্র-ভূমি
গলদশ্রুজলে মোর", (স্মরণের আলো
নিষ্কম্প আরতি-শিখা চক্ষে জ্বলে ভালো,
দূর দুরাশার বাতি সুপ্রগাঢ় স্নেহে
মিটি মিটি করি জ্বলে জরাজীর্ণ দেহে
পরলোক পানে চাহি)।

"উপভোগ্য ভ্রমে
এ মূঢ় গোময়-কীট, অয়ি মনোরমে
তোমার প্রভাতপদ্মে পশি' আপনার
রসনা দশন দিয়া ক'রেছিল তা'র
উচ্ছিষ্ট স্বর্গের অর্ঘ্য।

চক্ষু কর্ণ দিয়া
প্রত্যক্ষ-দেবীরে হেরি সঙ্গীত শুনিয়া
বৈজয়ন্ত হ'তে হেথা, সর্ব্বেন্দ্রিয় দিয়া
অলভ্যে করিয়া লাভ অলঙ্ঘ্য লঙ্ঘিয়া
ডুবাইয়া আপনারে কামনার বশে
অন্তর নিষিক্ত করি স্বাদ-গন্ধ-রসে
করেছিল আবিষ্কার শোনো বন্ধু শোনো
অঙ্গার-খনির-গর্ভে স্পর্শমণি কোনো।

ঝ'রে-পড়া শেফালিকা-বকুলের পারা
আকাশের বক্ষ হ'তে কক্ষচ্যুত তারা
পৃথিবীর গর্ভে পশি মৃত্তিকার মেয়ে
জ্বালিয়া আকাশ-দীপ ফেলেছিল ছেয়ে
রূপ দিয়া রশ্মি দিয়া, শোনো বন্ধু শোনো
সে নহেকো শুচিস্মিতা সে পতিতা কোনো।

লতা-কস্তুরীর মত তা'র শুক মূলে
তুলিয়া নির্ম্মূল করি মুহূর্ত্তের ভুলে
মাটীর পুতলী ভাঙি সে মোর মৃন্ময়ী
মাটীতে মিশিয়া গিয়া আজি মৃত্যুঞ্জয়ী,
অবিস্মরণীয় গাথা! শোনো বন্ধু শোনো
ছায়াহীন রূপ-শিখা চিন্তামণি কোনো।

অনন্ত-যৌবনা নহে আকাশের পরী
এই মৃত্তিকার মেয়ে নর্ম্ম-সহচরী
আমার মর্ম্মের স্বর্গে মূর্ত্তিমতী মায়া
সৌম্যা হ'তে সৌম্যতরা প্রেমে নিল কায়া
অনতিরঞ্জিত সত্য শোনো বন্ধু শোনো
এ নহে কবির কাব্য কল্পনায় কোনো।

সেই হ'তে যেই পথ সে গিয়েছে ধ'রে
সৈকতে সঙ্কেত-রেখা রাখি মোর তরে
আবার পদাঙ্কদূত চলে সেই পথে
আমার মানস-হংস মুক্ত মনোরথে।
একে একে সংখ্যাহীন মুহূর্ত্তের মালা
জপি আমি হেথা বসে এ তীর্থে নিরালা।
কামনার কাম-বহ্নি হ'তে মূর্ত্তি ধরি
উঠিল সে যাজ্ঞসেনী মোর চিত্ত ভরি।
মণি নহে স্পর্শমণি নহে চিন্তামণি
তাহারি স্মরণে চিত্ত সুবর্ণের খনি
তা'র নাম ঘৃণা নহে শোনো বন্ধু শোনো
চির-ঋণী মোর নাম অকৃতজ্ঞ কোনো।
আপনার হৃৎপদ্ম উপাড়িয়া মরি।
যে দিল একান্ত প্রেমে মোর পায়ে ধরি
আপনার পাদ-শুল্ফে সেই বক্ষ তা'র
নিষ্পেষিয়া নিষ্করুণ ছি ছি। কি ধিক্কার।
তাহার শেষের গান অশ্রুজলে ভিজে
শুনিয়া-না শুনিলাম শোনালাম কি যে।
অনলের আঁখিধারা বক্ষ দ্রব করি
অনলে অনল বাড়ে নিভে নাকো মরি।
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাস বাড়ে শোনো বন্ধু শোনো
তিলে তিলে পুড়ে মরে হতভাগ্য কোনো।
শোনো দেবি। শোনো সাধ্বী। প্রেম কল্পলতা
এ মানব-দানবের প্রেম-পূজারতা
স্বপন ফুরায়ে গেছে ফুরায়েছে আশা
অনির্ব্বাণ নরকাগ্নি পোড়ে ভালবাসা।
সাক্ষী রহ অপরোক্ষ পরলোকে বসি
নরলোক পানে চাহি, অকলঙ্ক শশী।
এ কলঙ্ক মুছিতে না পারে অশ্রুজল
উগারে আগ্নেয়-গিরি তরল অনল।
জ্বালা মুখে, জ্বালা বুকে, জ্বালা অস্থিচয়ে
সন্দেহ গন্ধকানলে ভস্মীভূত হ'য়ে
তবুও কঠিন প্রাণ গেল নাক তা'র
হায় রে। তাসের ঘরে পাতিনু সংসার।
অনুতাপ-চিতানলে অসৎকার করি
এ পামর প্রাণ মোর মরে নাকো মরি।
প্রাণদণ্ড দণ্ড নহে সান্ত্বনা যে চাই
আতঙ্কে শিহরি হায়। প্রায়শ্চিত্ত নাই।
পূর্ণচ্ছেদ জীবনের শেষ করিবারে—
এ মুখে টানিতে চাই গাঢ় অন্ধকারে—
মরণের যবনিকা, শোনো বন্ধু শোনো
হতাশে মুহূর্ত্ত গণে হতভাগ্য কোনো।

দেশবন্ধু—সুভাষ

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সাইমন কমিসন এবং "বাঙ্গলার কথা" সম্বন্ধে গত মাসে আপনাদিগের কাছে নিবেদন করিয়াছি। এইবারে ১৯২৮ সালের কলিকাতায় কংগ্রেসের কথা উল্লেখ করিব।

১৯২৮ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনের ন্যায় এত বিরাট অধিবেশন ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই। পার্কসার্কাসে বিরাট এক মণ্ডপ তৈয়ারী করা হয়। নিকটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে প্রদর্শনী খোলা হয় এবং সমস্ত স্থানটির নাম দেওয়া হয় "দেশবন্ধু নগর"।

'সর্ব্বদল সম্মিলনে" (All Parties' Conference) নেহরু রিপোর্ট আলোচিত হয় এবং তাহাতেও ২২শে ডিসেম্বর হইতে নানাদিকের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যোগদান করেন।

১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস—(পতাকা উত্তোলনের সময়ে ২৮শে ডিসেম্বর)
বাম হইতে দক্ষিণে—জি, ও, সি সুভাষচন্দ্র, সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, সভাপতির পশ্চাতে—লেখক (অভ্যর্থনা সমিতির ভারপ্রাপ্ত সেবক)

এইবারের স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব কেন পরিবর্ত্তিত হয় এবং সুভাষচন্দ্র কি কারণে স্বাধীনতা প্রস্তাব আঁকড়াইয়া ধরেন তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

তৃতীয়তঃ, এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এমন সামরিক কায়দায় তৈরী হইয়াছিল যে, তাহাদের চলাফেরা কার্য্যকলাপে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল। আর সেই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক—জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং (জি, ও, সি,) হইয়াছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্রই। নিখিলভারত যুবসম্মিলনীও দেশবন্ধু নগরেই হয়। সুভাষ হন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। অতঃপরে ভবিষ্যতে যে সকল বিষয়ে সুভাষ নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রারম্ভই দেশবন্ধু নগরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে যে সাজসজ্জা, চলনবলন ও পোষাক পরিচ্ছদ প্রথমে বিদেশীয় অনুকরণ মনে হইয়াছিল। কার্য্যতঃ তাহাই হয় তাঁহার জীবনের বিরাটত্বের অধ্যায়ের প্রারম্ভ—আজাদ, হিন্দের সতেজ অঙ্কুর। প্রবীণ এবং নবীনের সংগ্রামে অভিযান এই সঙ্গেই সুরু হয়। এখন হইতেই তিনি বাক্যে ও কার্য্যে প্রাচীনকে সরাইয়া নিয়া নবীনের জন্য স্থান করিয়া দিতেই যেন ইঙ্গিত করেন এবং নবীনকেও দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে সতর্ক করিয়া দেন।

যে সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন হয়, সুভাষচন্দ্র ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি। সুতরাং একহিসাবে তাঁহার নির্দ্দেশেই কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন হয়। তবে শীঘ্রই ভারত-সভাগৃহে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের অধিবেশনে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত হন সভাপতি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধান চন্দ্র রায় জেনারেল সেক্রেটারী এবং শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার শিল্পপ্রদর্শনীর সম্পাদক। আর সুভাসচন্দ্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে মনোনীত হন্ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক। কেহ কেহ নলিনী বাবু সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হয়। সেনগুপ্ত মহাশয় সম্বন্ধেও কাহারও কাহারও আপত্তি ছিল, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জোর সমর্থন থাকায় তাহাও অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। বলা বাহুল্য, সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক মধুর ব্যবহারে এবং কর্ম্মক্ষমতায় নিজ পদের গৌরব সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র সমস্ত কর্ম্মিগণকে আহ্বান করিয়া ভলাণ্টিয়ার শ্রেণী-ভূক্ত করেন। তাহারা সামরিক পোষাকে এবং সামরিক পদবীতে ভূষিত হইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। এইরূপ সামরিক আয়োজন সুভাসচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ইতিহাসে এই প্রথম।

এই ত্রিচত্বারিংশৎ (৪৩তম) অধিবেশনে সভাপতি হন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। সাধারণ অভ্যর্থনার কথা প্রস্তাব করা হইলে তিনি পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পরে

অবিধেয় মনে করিয়া উহা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সেনগুপ্ত মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে তাঁহাকে স্বীকৃত হইতে হয়। পণ্ডিতজী হাওড়া ষ্টেশনে ২১শে ডিসেম্বর পৌঁছেন্নে যেরূপ মহাসমারোহে বিপুল অভ্যর্থনা হয়, ইতিপূর্ব্বে কোন কংগ্রেস সভাপতির ভাগ্যে সেরূপ অভ্যর্থনা হয় নাই। ভলাণ্টিয়ারগণের শোভা, চারিদিকে আশাপ্রতীক্ষায় সতৃষ্ণ-অগণিত জনসঙ্ঘ এবং তাহাদের চক্ষে প্রদীপ্ত উৎসাহ ও আগ্রহ! ষ্টেশন হইতে সমগ্র হ্যারিসন রোড জনতায় ভরিয়া ছিল। লোকজন চলাচলের শৃঙ্খলা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। আর সুভাষচন্দ্র ছিলেন হ্যারিসন রোডের মোড়ে ফিল্ড মার্শালের টুপী ও পোষাকে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া। সেই বিরাট শোভাযাত্রা অগনিত সুশোভিত তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া, সুরম্য হর্ম্ম্য পার হইয়া হ্যারিসন রোড্, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলি ষ্ট্রিট, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, লোয়ার সারকুলার রোড্ এবং পার্ক সার্কাস হইয়া যখন মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইল, সেই সেই আশাপ্রদীপ্ত জনসঙ্ঘের সমস্ত নরনারীর উৎসাহ আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। সেই শোভাযাত্রার অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন অশ্বারূঢ় সুভাষচন্দ্র। এবং তৎপরে চৌত্রিশটি অশ্বযোজিত রথচক্রে উপবিষ্ট সভাপতি আর তাঁহার বামপার্শ্বে ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন। আর মুহুর্মুহু-বন্দেমাতরম ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হয়।

কংগ্রেস পতাকা-উত্তোলন উৎসব হয় ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতে ৯া০ ঘটিকায়। প্রায় কুড়ি পঁচিশ হাজার লোক সমবেত হইয়া এই উৎসবে যোগদান করেন। এই উপলক্ষে এখানে মঙ্গলাচরণ হয়, এবং পরে শঙ্খবাদক, ভেরীবাদক, অশ্বারোহী সৈন্য, পদাতিক সৈন্য, মোটর সাইকেলবাহী, সাইকেলবাহীগণের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ যাতায়াত। বালকগণের ও পরে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকাগণের পুরুষসেবকগণের এবং পরে এম্বুলেন্স বাহিনীর শোভাযাত্রার মনোরম দৃশ্য সমস্ত দর্শকগণকে একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র অশ্বপৃষ্ঠে সেই শোভাযাত্রা নির্দ্দেশ করিতে ছিলেন আর বারবার তাঁহার কথা শুনা যাইতেছিল।

"Bengal Volunteers fall in.

অতঃপরে সুভাষচন্দ্র পণ্ডিতজী মতিলালকে পতাকা উত্তোলন করিতে অনুরোধ করিলে পণ্ডিত ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত করিয়া নিম্নলিখিত কয়টি কথা বলেন—

"ঐ যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইল, তাহা উড্ডীয়মান রাখিতে আমাদের সঙ্কল্প দৃঢ়তম হোক। জাতীয় সংগ্রামে চাই ঐকান্তিক দেশপ্রীতি, অদম্য সাহস, সর্ব্বপ্রকার সহনশীলতা, সর্ব্বশক্তি এবং সর্ব্বপ্রকারের ত্যাগ—

"The National Conflict demands of you all patriotism all courage, all endurance, all energy and all sacrifice you are capable of.

"March forward with all the courage and with all eagerness that you can command and let me assure you that glorious victories will be yours."

জনসঙ্ঘের কর্ণকুহরে কথাগুলি অমৃতবর্ষণ করে।

কংগ্রেসের মণ্ডপটি এতবড় হয় যে, প্রায় পঞ্চাশহাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রতিনিধি ছিলেন প্রায় দশহাজার, দর্শক কুড়ি হাজার এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য, বিশেষ সম্মানিত দর্শক এবং বিশেষ নেতৃবৃন্দের বসিবার স্থান যেখানে হইয়াছিল তাহাতে চারি হাজার লোকের সঙ্কুলান হইয়াছিল। এই চারিহাজার লোকের তত্ত্বাবধানের ভার মণ্ডপ-সম্পাদক মহাশয় আমার উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন মণ্ডপ-সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, রন্ধন তত্ত্বাবধানে অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অন্যান্য সম্পাদক ছিলেন। সেক্রেটারীরাও সকলেই সাফল্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। পতাকা উৎসবের ব্যাপারে শোভাযাত্রা শেষ হইলে পরিচ্ছদ ছাড়িবার পরে সুভাষচন্দ্র আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—এই দৃশ্যটি আমার কাছে কিরকম লাগিল! সৈন্যশ্রেণীভূক্ত হইবার সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও সেই অনুকরণে দৃশ্যাদির অবতারণা আমার ভাল না লাগিলেও আমি সুভাষচন্দ্রেরও প্রতি কোনরূপ নিরুৎসাহ ভাব প্রদর্শন করি নাই। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, তিনি যে পরে বিশাল সমর প্রাঙ্গনে সর্ব্বাধিনায়ক হইয়াছিলেন ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

স্বেচ্ছাসেবিকাগণ পরিচালিত হইয়াছিলেন শ্রীযুক্তা লতিকা বসুর নেতৃত্বে এবং তাঁহার সহকর্ম্মিনী ছিলেন শ্রীযুক্তা অরু সেন। তাহাদের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

যে নিখিল ভারত যুব-সম্মিলনীর কথা বলিয়াছি, তাহার সভাপতি হন শ্রীযুক্ত কে, এফ, নরীম্যান। ইনি বড় সুন্দর বক্তৃতা দেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন সুভাষচন্দ্র। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক কর্ম্ম পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যুবকগণকে বলিতেছেন—

"তরুণ তরুণীদের যে কোন সমিতিকেই যুবক সমিতি আখ্যা দেওয়া যায় না। সমাজ সংস্কারের জন্য যদি কোন সঙ্ঘ হয় বা দুর্ভিক্ষ কি মড়ক নিবারণকল্পে যদি সাহায্য সমিতি হয়, যুবকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও সেগুলিকে ঠিক ঠিক যুবক সমিতি বলা যায় না। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এবং তদনুযায়ী কাজ করিবার প্রয়াসই যুবসমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। যুবকগণকে নূতন ভারত গড়িতে হইবে এবং তাহাদিগকেই ভারতবর্ষ যাহাতে স্বাধীন ও শক্তিশালী হয় তাহা করিতে হইবে। আর যুবকগণকেই প্রাচীন জরাজীর্ণ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে সমাজে উন্নতি করিবার স্বপ্ন, দর্শন করিতে হইবে এবং স্বপ্নদর্শন কার্য্যের ফলাফল দর্শনবাদে পরিণত করিতে হইবে।"

অতঃপরে তিনি যুবকগণকে নানা কথার পরে বলেন—

"Will you Bardolise India or Adopt the Philosophy of Activism.

তিনি বলেন—

"আমি আজ দেশের মধ্যে দুইটা আন্দোলন বা দুইটা দেশের চিন্তাধারার প্রাধান্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই বিষয়ে আমি স্পষ্টভাবে ও নির্ভয়ে আমার মত প্রকাশ করিব। আমি যে

দুইটী চিন্তাধারার উল্লেখ করিলাম, তাহার একটী সবরমতী ও অপরটী পণ্ডিচারী হইতে উদ্ভূত।

"সবরমতি হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এরূপ মনোভাব সৃষ্টিকরা যে, আধুনিক যাহা কিছু মন্দ অনেক পরিমাণে তাহা উৎপাদন করা অত্যন্ত অশুভ-জনক। অভাব ও জীবিকা নির্ব্বাহে পণ্ডিচারী হইতে উদ্ভূত চিন্তাধারার আন্দোলনের বাস্তবিক উদ্দেশ্য দেশের মধ্যে এরূপ মনোভাব সৃষ্টিরূপ যে, শান্তভাবে সাধনা অপেক্ষা আর কিছুই মহৎ নাই। যোগের অর্থ প্রাণায়াম ও ধ্যান। অনেক সৎকার্য্য থাকিলেও ঐরূপ যোগকরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই আন্দোলনের ফলে অনেকে ভুলিয়া গিয়াছে যে, নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কার্য্যাত্তরাই মাত্র বর্ত্তমান অবস্থার আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব; প্রকৃতিকে জয়-করিতে হইলে, তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে এবং চারিদিক হইতে আমরা যেরূপ ভাবে বিপদ জালে জড়িত, তাহাতে সাধনার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা দুর্ব্বলতা মাত্র। এই চিন্তাধারার নিক্রিয়তারই আমি প্রতিবাদ করিতেছি। আমাদের এই দেশে যোগী ঋষি বা আশ্রমের প্রবর্ত্তন একটা নূতন ব্যাপার নহে। আমাদের দেশে যোগীঋষিদের আদর চিরকালই থাকে, কিন্তু আমরা যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করিতে চাই, আমরা এখন তাহা হইলে চাই প্রবল কর্ম্মবাদ। আমাদিগকে ভবিষ্যতের উজ্জল আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে এবং আধুনিক যুগের সহিত মেলামেশা করিয়া বাঁচিতে হইবে। আমরা আর এখন পৃথিবীর একপ্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে পারিবনা। যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে তখন তাহাকে তাহার আধুনিক শত্রুর সহিত আধুনিক উপায়ে সংগ্রাম করিতে হইবে—রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয়দিকেই ইহা সমান ভাবে প্রযোজ্য। গোয়ালের দিনও চলিয়া গিয়াছে এবং তাহা আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। আমি ভারতের অতীতকে মুছিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী নহি। ভারতের নিজস্ব বিশিষ্ট পথে তাহাকে তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। দর্শন সাহিত্য কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানে পৃথিবীকে আমাদের শিখাইবার অনেক বিষয় আছে। এক কথায় আমাদের প্রাচীন আদর্শ ও আধুনিক বিজ্ঞানের বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে আমাদিগকে একটা সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। আমাদিগকে একদিকে যেমন "বৈদিক যুগে ফিরিয়া যাও" চীৎকারে বাধা দিতে হইবে, তেমনি অপর দিকে আধুনিক ইউরোপের অনুকরণে অর্থশূণ্য পরিবর্ত্তনের বিরোধিতাও করিতে হইবে।"

কলিকাতায় একটী সর্ব্বদল সম্মেলনের (All parties Convention) কথা যে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে নেহরু রচিত শাসনতন্ত্র (Nehru report on constitution) বিবেচিত হয়। ইহার একটু ইতিহাস আছে। দেশবন্ধুর জীবদ্দশায় ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেডের সঙ্গে অনেক বোঝা-পড় হইয়াছিল এবং জীবদ্দশায় দেশবন্ধু আশাও করিয়াছিলেন, এবার আমরা নিশ্চয়ই ভালরকমের কিছু পাইব (we are for something very big this time) কিন্তু দুরন্ত কাল শীঘ্রই তাঁহাকে হরণ করিয়া ফেলিল। তাঁহার মহাপ্রস্থানের পরে (জুন, ১৯২৫) লর্ড বার্কেনহেড অভিজাত (লর্ড) সভার ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই ঐ সমস্ত পূর্ব্বের কথা যেন উড়াইয়া দিয়াই বলেন:

"আমরা তোমাদিগকে যেরূপ শাসন দিতে চাহিতেছি, তাহা যদি তোমাদের মনোনীত না হয়, তোমরা কিরূপ শাসন চাও বল। তোমরা ভারতের সকল জাতিধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং সকল রাজনীতিক দল মিলিয়া একটী শাসনযন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়া দাও, আমরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিব।"

ভারত সচিব মনে করিয়াছিলেন যে এরূপ শাসনতন্ত্র রচনা কিছুতেই সম্ভব হইবে না। নেহরু রচিত 'খসড়া' তাহার উক্তিরই প্রত্যুত্তর।

অতঃপর ১৯২৭ সালের কংগ্রেসে মান্দ্রাজ কংগ্রেস অধি-বেশনে একটী স্বরাজ শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া তিন মাসের মধ্যে একটী বিশেষ সম্মেলনে উপস্থিত করিতে কংগ্রেস যে, নির্দ্দেশ দেন, তাহা গত মাসের বঙ্গশ্রীতে ১৫৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। আর এই সম্মেলনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভ্য ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সভ্যগণের উপস্থিতিও প্রয়োজনীয় মনে করা হয়।

প্রথমতঃ সর্ব্বদলের সম্মেলন হয় দিল্লীতে, ফেব্রুয়ারীর শেষ-ভাগে এবং মার্চ্চ মাসের প্রথমে। সকলেই একমত হন, পূর্ণ দায়িত্বমূলক শাসন প্রথার উপর ভিত্তি করিয়া শাসনতন্ত্র রচিত হৌক্। দ্বিতীয় সমস্যা ছিল সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক এবং কি অনুপাতে, কোন্ সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে সেই বিষয়ে। এই সম্পর্কে প্রায় ২৫টি বৈঠক হয় এবং অধিকাংশ প্রশ্নেরই আপোষে রফা হয়। অতঃপরে ১৯শে মে তারিখে ডাক্তার আনসারির সভাপতিত্বে একটি প্রস্তাবে শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি করা হয়। এবং এই কমিটী যেন ১৯২৮ সালের ১লা জুলাই তারিখের মধ্যে তেন শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়া দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রচার করে, সেইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

ইহার পরে লক্ষ্ণৌতে সর্ব্বদল সম্মিলনীর বৈঠক হয় ১৯২৮ সালের ২৮, ২৯, ৩০ আগষ্ট তারিখে। স্যার শঙ্করণ নায়ার, ডাঃ তেজবাহাদুর সপ্রু, স্যার আলিম ইমাম, মামুদাবাদের মহারাজা ও রাজা রামপাল সিং প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সকলেই নেহরু কমিটীর রিপোর্ট সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য মনে করিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের উপযোগী শাসনতন্ত্রই রচনা করেন। এবং স্থির হয় যে, যাঁহারা পূর্ণ স্বরাজ (Complete Independence)এর পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোন কর্ম্মই ব্যাহত করা হইবে না। পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতিগণও একটী বিবৃতিতে বলেন, "বেশ, আমাদের পন্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা আছে, তবে এই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের প্রস্তাব সমর্থন করিব না, এবং আমরা সর্ব্বদল সম্মিলনীর কার্য্যে বাধাও দিব না।

এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে কোন মতামত প্রকাশ করিব না বা কোন সংশোধন প্রস্তাব আনিব না।" লক্ষ্ণৌর এই সর্ব্বদল সম্মেলনে একটী অপ্রীতিকর ঘটনা হয়। মামুদাবাদের মহারাজা (তিনি একজন প্রধান জাতীয়তাবাদী মুসলমান) এবং রাজা রামপাল সিং সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, "এই সকল তালুকদারদের সমাজে কোনরূপ আবশ্যকতা নাই।" ভূম্যধিকারিগণ মাত্রেই ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হন, এবং অতঃপরে তাহাদের পদবীর সমর্থনে একটি প্রস্তাবও পাশ হয়।

অতঃপর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে (৪।৫ নভেম্বর তারিখে) নেহরু কমিটির রিপো, বিচার ও আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাশ হয়:

"This meeting of the A. I. C. C. adheres to the decision of the Madras Congress declaring Complete Independence to be the goal of Indian people and is of opinion that there can be no true freedom till the British connection is severed.

"This committee accepts the recommendations of the Nehru committee as agreed to by the Lucknow All Parties Conference for the settlement of communal differences. This Committee cordially congratulates the Nehru Committee for their labours patriotism and farsightness and without prejudice to the resolution of the congress relating to complete independance, is of opinion that the recommendations of the Nehru committee are a great step towards political advance and without committing itself to every detail, generally approves of them.

অর্থাৎ মান্দ্রাজ কংগ্রেস নির্দ্দেশিত কংগ্রেসের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ইংরাজের সংশ্রব না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বাধীনতা আসিতে পারে না, তবে নেহরু কমিটির প্রস্তাবে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি এবং সেইগুলি সাধারণভাবে অনুমোদন করি। তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে যে সুপারিশ আছে, সেগুলি আমরা সমর্থন করি।"

একদিকে মান্দ্রাজ কংগ্রেসের নির্দ্দেশিত পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য, অন্যদিকে নেহরু কমিটির সুপারিশ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন—এই দুইটি বিষয়ের সংঘর্ষ কলিকাতা কংগ্রেসে বিশেষ বিক্ষোভ সঞ্চার করিয়াছিল এবং সুভাষ এ বিষয়ে লক্ষ্য সম্বন্ধে কতটা সচেতন ছিলেন, এইখানে তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক।

২২শে ডিসেম্বর হইতে দেশবন্ধু-নগরে সর্ব্বদল সম্মেলনে নেহরু কমিটির রিপোর্ট বিবেচিত হইতে আরম্ভ হয়। আটটি বৈঠক হয়, অনেক আলোচনা হয়। ইতিমধ্যে ২৭শে ডিসেম্বর কংগ্রেস বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় মহাত্মা-উপস্থাপিত একটি প্রস্তাব পাশ হয়। সুতরাং প্রায় সকল দলেরই অভিমত হয় যে, এমন একটি শাসনতন্ত্র হৌক, যাহাতে অন্যান্য ডোমিনিয়ন অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন মূলক দেশসমূহ যেমন শাসনের উপকারিতা লাভ করিয়াছে, ভারতই অচিরে তাহাই অর্জ্জন করুক—

"The united demand of all parties represented at the Convention is for immediate establishment of a constitution which will give India the same status in the community of nations known as the British Empire, as the Dominions at present enjoy."

সর্ব্বদা সম্মেলনের মাঝে একটু-আধটু যে উষ্ণতার সঞ্চার হয়, সে সম্বন্ধে পরে উল্লেখ করিব।

এখন এই 'ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস' প্রসঙ্গ লইয়া কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় এবং মূল অধিবেশনে যে বাদানুবাদ তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। লক্ষ্ণৌতেও স্বাধীনতাবাদীদের কার্য্যের স্বাধীনতা রক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর নভেম্বর মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিই স্থির করিয়াছে যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই লক্ষ্য এবং ব্রিটিশ সম্পর্কচ্যুত না হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি ফিরিয়া আসিতে পারে না।

এদিকে পণ্ডিত মতিলাল সর্ব্বদলের গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন, এই খসড়ানুযায়ী বিধি গৃহীত হইলে অন্যান্য উপনিবেশগুলি যেরূপ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে, তাহাই আমাদের অর্জ্জিত হইবে। সুতরাং ভারতের ভাগ্যাকাশে সেরূপ শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত যাহাতে হইতে পারে, তজ্জন্য পণ্ডিতজী মনেপ্রাণে চিন্তা ও চেষ্টা করিতেছেন। এতদূর আসিয়া ইহাও যদি বাণচাল হইয়া যায় তবে নিতান্তই পরিতাপের বিষয়, তাই পণ্ডিতজী মহাত্মাজীকে পীড়াপীড়ি করিয়া কংগ্রেসে লইয়া আসেন। মহাত্মাজী এই ৩।৪ বৎসরে কংগ্রেসের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। যদিও ১৯২৫এ কাণপুরে ১৯২৬-এ গৌহাটিতে এবং ১৯২৭এ মান্দ্রাজে উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু বিশেষ কোন বিষয়ে যোগদান করেন নাই। এবার পণ্ডিতজীর পীড়াপীড়িতে তিনি আবার আসিয়া ভবিষ্যৎ আপদাশঙ্কা করিলেও বিশেষভাবে যোগদান করেন। তিনি ২৩শে ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিয়া পৌছেন।

২৪শে ডিসেম্বর কংগ্রেস কার্য্যকরী সভায় (Working Committeeতে) মহাত্মাজী একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহাতে মিসেস্ ডক্টর আনি বেশান্ত, পণ্ডিত মতিলাল, ডাঃ আনসারী, পণ্ডিত মালবীয়, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সকলে মহাত্মাজীর প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার দিল্লি-প্রস্তাবানুযায়ী (৫ই নভেম্বর) প্রস্তাব করিতে বলেন। অনেক উষ্ণতামূলক তর্ক-বিতর্কের পরে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার কংগ্রেসকে নরমপন্থী প্রতিষ্ঠান মনে করিয়া বাহির হইয়া যান। ইহার পূর্ব্বের দিন সর্ব্বদল সম্মিলনীতেও তিনি নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন—

"We shall neither move amendment nor vote on it (Dominion Status). We propose to carry on in the Congress and in the country such activity as we consider proper and necessary in favour of complete independance but as we are deeply interested in the communal settlement recommended by the Nehru Committee and by the Lucknow All Parties Conference, we shall not abstain from taking part in the discussion or

voting on those questions. We desire to add that the Independence of India League wholly supports this view."

এই শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার Indepence of India League এর সভাপতি হিসাবে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার উক্ত ২৩শে ডিসেম্বরের বিবৃতি (বৃহদাকারে) সর্ব্বদল-সম্মিলনীতে একটী লিপিতে দেন। এই লিপিতে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি সহি করেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার ব্যতীত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, যমুনাদাস মেহতা, মিঃ শম্বামূর্ত্তী, সত্যমূর্ত্তী, শরৎচন্দ্র বসু, কুমুদ শঙ্কর রায়, স্বামী করুণানন্দ, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আবদুল বারী, প্রতুল গাঙ্গুলী, সত্যরঞ্জন বকসী, সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমি, সুরেশচন্দ্র দাস, শ্রীপ্রকাশ, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, জে-এম্, দাসগুপ্ত, লালা শঙ্করলাল, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, মাখনলাল সেন, অর্জ্জুনলাল সেথি প্রভৃতির স্বাক্ষর ছিল।

যাহাহউক ২৩শে সর্ব্বদল-সম্মিলন এবং ২৪শে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভার পরে, স্বাধীনতা এবং ডোমিনিয়ন প্রসঙ্গ বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে আলোচিত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে মহাত্মাজী উপস্থিত করিবেন। অতঃপর ভারত কংগ্রেস কমিটি সভাপতি হিসাবে ডাঃ আনসারীর কাজ করিয়া বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় পণ্ডিত-জীকে তিনি ছাড়িয়া দেন। পণ্ডিতজী নেহরু রিপোর্টের প্রধান স্রষ্টা, কিন্তু এবিষয়ে তাহার সুস্পষ্ট মত তিনি সভাপতির আসন হইতে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে (২৯শে ডিসেম্বর) নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"আমাদের যে পূর্ণ স্বাধীনতা, এবিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সর্ব্বসম্প্রদায় ও দল যেহেতু ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস সম্বন্ধে এক মত, তখন আমাদের তাহা গ্রহণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। আমরাই সব দলকে আহ্বান করিয়াছি। আমাদের উদ্দেশ্য জানিয়াই তাঁহারা আসিয়া শাসনতন্ত্ররচনায় সহায়তা করিয়াছেন। আমাদের স্বাধীনতা-উদ্দেশ্য জানিয়াই তাঁহারা আসিয়াছেন, এমতাবস্থায় সর্ব্বদল সম্মিলনে সকলের এক-মততার সহিত রচিত শাসনতন্ত্র আমরা উপেক্ষা ভরে কেন দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিব?

তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রদর্শিত পথ স্মরণ করাইয়া বলেন—

"The position is this. Here is a constitution agreed upon by various parties, invited by the

পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

Congress to frame it. These parties know that the goal of the Congress is complete independence. They donot ask the Congress to change its goal but present to it the result of their labour such as it is and say they are prepared to go thus far and no further at present. They offer their co-operation and demand that of the Cong-

ress, to enable both to reach the point upto which they are prepared to go. After that point is reached they reserve liberty to themselves and to the Congress to consider the next step. Is the Congress going to refuse them this co-operation and this liberty ? Is the Congress after bringing them together going to send them back to the wilderness in isolated groups, each to shift for itself, and leave the Congress to wrangle over the respective merits of complete independence and Dominion Status to the end of time ? If the Congress will do that, it will abdicate its proper function to guide the nation on its forward march. My advice to you is to accept the offer.

Begin at the point at which the All Parties Conference have now arrived and push forward with them so far as they would go, then pause and take stock of your equipment and **finally throw the strength of your whole being into one great effort to reach the goal.**

নেহরু রিপোর্টের স্রষ্টার এই মনোভাব। ইনডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতির ও সভ্যগণের মনোভাবও ইতি পূর্ব্বেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। দিল্লীর প্রস্তাবের (A. I. C. C. ৫ই নভেম্বরের) মর্ম্মও অবগত করাইয়াছি। তখন বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় এবং মূল অধিবেশনে এই পরস্পর বিরোধী ভাবের সামঞ্জস্য কি ভাবে হয়, তাহা দেখিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

২৬শে ডিসেম্বর মহাত্মাজী স্বরচিত ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে (A. I. C. C.তে) উপস্থিত করেন। তাহাতে মাদ্রাজ কংগ্রেস নির্দ্দেশিত স্বাধীনতা যে লক্ষ্য তাহার কথা আছে, তবে সকলের এক মতানুযায়ী লক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত, তাহারও স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। আবার যদি ১৯৩০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে এই শাসনতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত না হয় তবে—

"তবে নিরস্ত্র অসহযোগ পুনর্জ্জীবিত হইবে এবং জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে কোনরূপ সহযোগিতা না দিয়া খাজনা দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিবে।

"এই প্রস্তাবের একটি নকল গভর্ণর জেনারেলের কাছে প্রেরিত হইবার কথা আছে। তিনি এই বিষয়ে আবশ্যক বোধ করেন।

"তবে নেহরু রচিত শাসন-তন্ত্র গ্রহণেও যাহারা স্বাধীনতার জন্য কার্য্য করিবেন, যদি তাহা উপরোক্ত শাসন তন্ত্রের বিরোধী না হয়, তাহাতে কোন বাধা উপস্থিত করা হইবেনা।

এইখানে সকলের বুঝবার জন্য প্রস্তাবটি উদ্ধৃত করিলাম :

1. This Congress having considered the constitution recommended by the All Parties Committee Report welcomes it as a great contribution towards the solution of India's political and communal problems and congratulates the Committee on the virtual unanimity of its recommendation and while adhering to the resolution relating to complete Independence passed at the Madras Congress approves of the constitution drawn up by the committee as a great step in political advance specially as it represents the largest measure of agreement attained among the important parties in the country

2 Provided however that the Congress shall not be bound by the constitution if it is not accepted on or before the 31st Dec. 1930 and provided further that in the event of non-acceptance before 31st Dec. 1930 and provided further that in the event of non-acceptance by the British Parliament of the constitution by that date the Congress will revive non-violent non-Co-operation, by advising the country to refuse taxation and every aid to Government.

3. The President is hereby authorised to send the text of this resolution together with a copy of the said report to His Excellency, the Viceroy for such active as he may please to take.

4. Nothing in this resolution shall interfere with the propaganda for familiarising the people with the goal of Independence, in so far as it does not conflict with the prosecution of the campaign for the adoption of the said Report.

২৬ ডিসেম্বরের বিষয় নির্ব্বাচনী সভায় এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে অনেকেই বক্তৃতা করেন। পণ্ডিত জওহরলাল একটী সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বলেন :

"আমরা ডোমিনিয়ন শাসন চাহিনা, আমরা ব্রিটিশ সম্পর্ক উচ্ছেদ করিতে চাহি। মিটমাট আপোষ খুব ভাল কথা ; কিন্তু ভাবের আপোষ সম্ভব নয় (I have not heard of Compromises about ideas) ডোমিনিয়ন শাসন গ্রহণ করা মূর্খের কথা (It is foolish to accept Dominion Status). ভাইসরয় একটু হুমকি দিয়াছেন আর আমরা আমাদের স্বাধীনতার পতাকা অবনমিত করিব ? আমি ডোমিনিয়নের জন্য আমার সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিতে চাই না। যদি গান্ধীজীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তবে ব্রিটিস সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্দেশ্যই সাধিত করা হইবে (By this resolution of Gandhiji you are declaring that you are prepared to allow India to be exploited by British Imperilalists— আর ভাইসরয়ের কাছে নেহেরু রিপোর্ট উপস্থিত করা সাইমন কমিসনের কাছে উপস্থিত করারই নামান্তর মাত্র। অথচ আমরা সাইমন-কমিশন বর্জ্জন করিয়াছি।

পণ্ডিত জওহরলালের প্রস্তাবটি এই —

(i) This Congress adheres to the decision of the Madras Congress declaring complete Independence, to the goal of the Indian people and is of opinion that there can be no true freedom till the British connection is severed.

(ii) The Congress accepts the recommendations of the Committee as agreed to by the

Lucknow All Parties Conference for the settlement of communal differences.

(iii) The Congress cordially congratulates the Nehru Committee for their labours, patriotism and forestightedness and without prejudice to the resolution of the Congress relating to complete Independence is of opinion that the recommendation of the Nehru Committee is a great step towards political advance and without committing itself to every detail generally approves of that.

যমুনাদাস মেহতা প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের দিল্লীর প্রস্তাব পুনঃসমর্থনের জন্য উপস্থিত করার কথা ছিল, কিন্তু দুই দলের কোনদিক হইতেই ইহার পোষকতার নিদর্শন না পাইয়া তিনি আর উহা উপস্থিত করেন নাই। মহাত্মাজী প্রত্যুত্তরে বলেন—

"Madras Resolution gives you the goal of the Congress. It tells you that Independence shall be the goal but it has not declared Independence, Congress creed is a creed of Independence you are not now working for Independence. Two years after you will declare Independence—I donot want to wash down that goal in any way but I want you to sustain the goal. Crawling we shall never do. We have buried that at Amritsar. If Viceroy asks me to discuss things I would go there bare-foot and post haste and will defeud N. C. O. not as beggars but as on agreement between two high contracting parties as South Africa sent General Smarts and General Botha. We are suffering from psycho-analysis of inferiority complex. If impatient men want me to share the credit or discradit of starbing non-co-opertion, what does it matter ?

এইদিনে অনেক আলোচনা হয়। রাত্রিতেও অনেক কথা-বার্ত্তা হয়। ইতিমধ্যে ইনডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতির সঙ্গেও কথাবার্ত্তা হয়। এবং তিনি তাঁহার দলের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটী Compromise Resolutionএ মত দেন। বহু ভোটাধিক্যে ক্রমে সেই আপোষ প্রস্তাবটী গৃহীত হয় (১১৮ : ৪৫)। প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন মহাত্মাজী এবং সমর্থন করেন স্বাধীনতালীগের সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। মালব্যজী বলেন, প্রস্তাবটী মতিলাল নেহরু, মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই আনা হইয়াছে। যাহা হউক, প্রস্তাবটিতে বাঙ্গালার ডেলিগেটদের মধ্যে অনেকে ভোট দেন নাই।

মহাত্মাজী প্রথমে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন, সেই প্রস্তাবের চারিটি প্যারার প্রথমটি অবিকল রাখিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্যারা নিম্নলিখিত ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় :

2. Subject to the exigencies of the political situation, this Congress will adopt the censtitution if it is accepted in its entirely by the British Parliament on or before the 31st Dec. 1929, but in the event of its non-acceptance by that date or its earlier rejection, the Congrers will organise a campaign of Non-violent Non-co-operation by advising the country to refuse taxation and in such other manner as may be decided upon.

N, B, ভাইসরয়ের পাঠাইবার কথা উঠিয়া দেওয়া হয়।

3. Consistently with the above nothing in this resolution shall interfere with the carrying on in the name of the Congress of the propaganda for complete Independence.

যাহা হউক, আপোষে সব স্থির হইয়া গেলেও, ইহার পরে যে পরিস্থিতি হয়, তাহাতে নেতৃবৃন্দের বিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়।

আপোষ প্রস্তাবের পরে বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ডোমিনিয়ন প্রস্তাবের কিছুতেই পক্ষপাতী হন না। তাহারা সুভাষচন্দ্রকে প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বাধীনতা প্রস্তাব উপস্থিত করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় কংগ্রেস অধিবেশন হইবে, তিনি বাঙ্গালার কংগ্রেসের সভাপতি, তাঁহার সমস্যাও বুঝা দরকার। তিনি ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিত মতিলালকে নেহেরু রিপোর্টের সমর্থন করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেও কথাবার্ত্তায় এই সম্বন্ধে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। স্বাধীনতা সঙ্ঘের (Independence League) সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারও যখন আপোষ প্রস্তাব সমর্থন করেন, সুভাষ প্রমুখ অন্যান্য সভ্যের মতানুসারেই করিয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার সহযোগিগণ সকলেই আপোষে সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা স্বাধীনতা প্রস্তাব কিছুতেই ছাড়িবেন না। তাহার নিজের মনোগত ইচ্ছাও স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষপাতী, কেবল ভদ্রতার খাতিরেই আপোষ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন। এই সমস্যায় তিনি স্পষ্ট বলেন—

"আমি সভাপতি পণ্ডিত নেহেরুকে এবং মহাত্মাজীকে কথা দিয়াছি। আমি কিছুতেই স্বাধীনতা প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে পারিব না।"

বন্ধুগণ—বেশ, দেখি আমরাও এই প্রস্তাব আনিতে পারি কি না ?

অতঃপর তাহারা শ্রীযুক্ত শরৎ বসু মহাশয়কে কংগ্রেস অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবটি উপস্থিত করিতে অনুরোধ করেন। যাহা হউক, অতঃপর সুভাষচন্দ্রই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এদিকে স্বাধীনতালীগে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি প্রভৃতি সভাপতি মিঃ শ্রীবাস আয়েঙ্গারের উপরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হন। তাহারাও ৮৯ : ৫ ভোটে নিজের বৈঠকে স্থির করিয়া প্রকাশ্য অধিবেশনে স্বাধীনতার সংশোধন প্রস্তাব আনিবার প্রস্তাব পাশ করেন।

উক্ত বৈঠকে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি বলেন—

"গান্ধী এবং আয়েঙ্গারের মধ্যে কোন আপোষে আমরা বাধ্য নহি।

আয়েঙ্গার—আমিতো আপনাদের মতানুসারেই আপোষ করিয়াছি !

সত্যমূর্ত্তি—তামিল নাড়ু আপনাকে নেতৃপদে বরণ করিয়াছে, কিন্তু জানেন, তারা আপনাকে পদচ্যুতও করিতে পারে ?

আয়েঙ্গার—তামিল নাদইতো আমাকে ফাদে ফেলিয়াছে !

It was Tamil Nadu who put me in this Hole.

শ্রীপ্রকাশ—দেখুন আপোষে মত দিয়া সভাপতি মহাশয় কি করিয়া তাহা বাতিল করিবেন ?

পট্যভি সীতারামীয়া—আপনারা কথা দিয়াছেন, ইহার পরে অন্তরূপ ব্যবহার উচিত নয় !

শরৎবসু—আয়েঙ্গার একাই ইহার জন্ত দায়ী নহেন।

অতঃপরে সে কথাবার্ত্তা হয়, তাহার পরে আয়েঙ্গার প্রকাশ্ত অধিবেশনে আর মহাত্মা গান্ধী উপস্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। তবে তিনি স্বাধীনতা লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেস অধিবেশনে বিষয় নির্ব্বাচনী সভা গৃহীত প্রস্তাব মহাত্মাজী উপস্থিত করেন।

The Congress adheres to the decision Madras Congress declaring comple'e Independence to the goal of the Indian people and is of opinion that there can be no true freedom till Br. connection is severed.

This Congress accepts its recommendation the Nehru Committee as agreed to by the Lucknow All Parties Conference for settlement of communal differences.

This Congress congratulates the Nehru Committee on their patriotic labours and while it does not accept Dominion Status as the basis of the recommended constitution is of opinion that of the recomendation contained in the report constitute a great step towards political advance and without committing itself to every detail generally approves of them."

এই সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সুভাষ ইংরাজীতে বলেন—

"I am sory I have to rise to make an amendment to a resolution moved by Mahatma Gandhi and which has the support of same, if not many of our elder leaders. The fact I raise today to move the amendment is a clear indication of a cleanage between the older scheme and the new scheme of thought in Congress.

I have been asked by my friends as to why I being a signatory to Nehru Report have stood up to speak for Independence. I not only refer to the statement made in the body of the report where it is said that the principles of the constitution while we have submitted in the report can be applied in all its entirety to a constitution of Indepedennce I dont think that in moving the amendment my action can be construed as in any way unconsistent.

In private conversation I said I donot disire to stand in the way of elder leaders. The reason why I did so was that at that time I did not feel prepared to accept the responsibilty of the consequences of a division in this house in case our amendment was accepted. Certain things itervened which have made me somewhat alter my previous views. In the meantime the Bengal delegates assembled and resolved to have this amendment moved on their behalf and they were prepared to accept the vote of the house whatever the consequence might be.

আমি না দাঁড়ালেও আর কেউ দাঁড়াত। Even if I did not stand to move, others would have moved.

Secondly the decision of the Independence for India League by an overwhelming majority" has also stirred me to move the amendment.

The question is, do we want Independence or Dominion Status ?" I have told our leaders after death of Lala Lajpatrai and happening at Lucknow and Cownpur and the speech of the Viceroy we would expect the Congress to take up a bold attitude in self-respect. We are not prepared to lower the flag of Independence. Myself and Jawharlal are moderates among extremists. If the elder members are not prepared to compromise with us monerates, breach is invitable. A new consciousness has dawned upon the youth of the country. They no longer prepared to follow blindfold. They have realised that they are the heirs of the futute, that it is for them to make India free and with this new consciousness they are preparing themselves for the arduous task that awaits them.

International situation also appeals to me more. After Madras Resolution India has got a new status in international problems. I am afraid if this resolution was passed we shall lose a part of the prestige acquired.

After 12 months is there any reasonable chance to get Dominion States, Pandit Matilal does not believe so. Then why do you lower Flag ! We lost last vestige of faith in Br. Govt. Let us take a bold stand.

We develop a new mentality and shall bring up new generation, Work it out according to the best of our ability so that there is no danger that our resolution will be thrown in to waste paper basket. Settlement of Versalies Treaty has not satisfied national aspiration not satisfied Italy Balkan Russia Australia Hungary....
We have Asia, we had combination of capitalist countries against Russia. There factors tend to world war. This talk of disarmament is huge farce. If India is to be on the alert we must create a new mentality that will say "We want complete Independence." This can only be done in clear unequvocal manner. Bengal since the dawn of National movement

Dominian Status does not make slightest appeal to uur country- men.

Respect for love for leaders is one thing and respect for principle is considerable. Accept my resolution and inspire younger generation with a new consciousness.

সুভাষচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় আশা করিয়াছিলে, এই বিষয়ে কংগ্রেস সাহস করিয়া একটী সুনির্দ্দিষ্ট পন্থার সন্ধান দিবে। নতুবা খুব কর্ম্মপ্রবণ যুবকবৃন্দের উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া পড়িবে এবং কংগ্রেস ইংলণ্ডের উদারনীতিক দলের মতই একটী নির্জীব সঙ্ঘে পরিণত হইবে।

I hope the Congress will give a bold lead to the country. If it does, I am afraid other organisation would draw into themselves the most enthusiastic and visile of the workers and the Congress would go the same way as the Liberal Party in Great Britain.

সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেন শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি, পণ্ডিত জওহরলাল, শিবপ্রসাদ গুপ্ত যোগলেকার ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু। শরৎ বাবু যখন বক্তৃতা দেন, নানাদিক হইতে ধ্বনিত হয়—"আপনি কি প্রাক্‌টিস ছাড়িতে রাজী আছেন ?"

জওহরলাল বলেন—

"To demand for Dominion Status was nothing but to be beggars at the door of the British Government. Issue before them was a grave one. Not only the countrymen outside but the whole world at large were waiting for thei: verdict—Let them give a verdict in a balanced mind and in a balanced judgment.

প্রায় পাঁচ ঘণ্টা তর্ক বিতর্ক হয়। তার পরে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি থাকে, পরে ৮॥ সময়ে মহাত্মাজী তাঁহার শেষ বক্তৃতা দেন ও গণনা আরম্ভ হয়! এই সময়ে কোন দর্শক বা প্রতিনিধি ভিন্ন অন্য কাহাকেও মণ্ডপে আসিতে দেওয়া হয় না। বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ, অন্ধ্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশের ভোট আলাদা আলাদা লওয়া হয়! আজমীরের প্রতিনিধিগণের নির্ব্বাচনবিধি সঙ্গত ভাবে হয় নাই বলিয়া সেখানতার প্রায় দেড়শত প্রতিনিধিকে নাকচ করা হয়। মহাত্মাজীর প্রস্তাবের পক্ষে হয় ১৩৫০ ভোট এবং সুভাষচন্দ্রের সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে হয় ৯৭৩ ভোট! যদিচ সুভাষের পক্ষ হারিয়া যান, কিন্তু এই অত্যধিক ভোটে দেশবাসীর মন যে স্বাধীনতার দিকেই উন্মুখ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। জওহরলাল সংশোধন প্রস্তাব সমর্থন করিলেও কোন দিকে ভোট দেন নাই।

একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার যেরূপভাবে নীতির জন্য প্রথমে সংগ্রাম করেন এবং আপোষে সম্মতি দিবার পরেও পূর্ব্বাপর তাঁহার ব্যবহার ছিল খুব সম্ভ্রমানুযায়ী, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে পণ্ডিত জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্রের পক্ষে প্রকাশ্য অধিবেশনে সংশোধন প্রস্তাব আনা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। এই বিষয়ে মহাত্মাজী খুবই মর্ম্মাহত হন। তিনি বক্তৃতায় বলেন—

১৯২৮ সনে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভায় কলিকাতা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন, বাসন্তী দেবী ও কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল

"আমি শুনিয়াছি, অন্যায় এবং অধর্ম্মোচিত কার্য্য অবলীলাক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে! ডেলিগেটের এক টাকার টিকেট ১৫৲ টাকায় বিক্রী হইয়াছে। আপনারা কি এই ভাবে স্বাধীনতা পাইবেন ; আপনারা নিজের পায়ে শিকল পড়িতেছেন ;

"You cannot get independence by these methods. You are forging your own shackles for which there will be no escape because it is of your own Free Will."

এই কথাগুলি সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়, কিন্তু পরের কথাগুলি সুভাষচন্দ্র এবং জওহরলালের উদ্দেশে মহাত্মাজী প্রয়োগ করেন :—

"স্বাধীনতা কেবল 'রামকৃষ্ণ' বুলির মত কথা আওড়াইলেই উহা হাতে আসিয়া পড়ে না। কথার মূল্য থাকা চাই, ন্যায়ের

প্রতি প্রগাঢ় মর্য্যাদা রাখা আবশ্যক, বাগাড়ম্বরে বড় কাজ হয় না"—

"If you are not prepared to stand by your own words, where will Independence be? Independence is a thing, after all, made of sterner stuff. It is not made by the juglery of words."

ভোট গণনা করেন ডাঃ আনসারী, মিঃ সেনগুপ্ত, জওহরলাল, লালা গিরিধারীলাল এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজ, ১৩৫০ জন প্রতিনিধি মহাত্মার পক্ষে ভোটদেন। ৯৭৩ জন সংশোধিত প্রস্তাবে ভোটগণার সময় যতীন্দ্রমোহন এবং বাঙ্গলার প্রতিনিধিগণের তিনভাগের একভাগ মহাত্মার প্রস্তাবের পক্ষে। ঐ সময়ে বাঙ্গালী প্রতিনিধিদের মধ্যে বিশেষ গোলযোগ হয়। গণনার সময় পণ্ডিত জওহরলাল আপত্তি করেন! সুভাষচন্দ্র এই আপত্তির প্রতিবাদ করিলে পণ্ডিত জওহরলাল একটু উষ্ণভাবে উত্তর দেন—

'I have personally heard supporters of the Resolution being called Traiters and Betrayors."

একটি কথা এইখানে বলা আবশ্যক। নিখিলভারত যুব সম্মিলনীতে এবং কংগ্রেস অধিবেশনের বক্তৃতায় মহাত্মাগান্ধী প্রমুখ প্রবীণ নেতাদের প্রতি সুভাষচন্দ্রের কটাক্ষ ছিল। প্রবীণ নবীনের সংঘর্ষে সুভাষচন্দ্রের নবীনের প্রতিনিধি হিসাবে নিজ মত ব্যক্ত করিবার অধিকার ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রবীণগণের অবসর গ্রহণের সময়াগত এরূপ কটাক্ষ সমীচীন হয় নাই। ইহা উন্নত অভিজ্ঞতারও বিরোধী। নবীন ও প্রবীণের পরিচয় বয়সে হয় না,—হয় সজীবতায়। এই কংগ্রেসের পরেও মহাত্মাজীই সত্যরক্ষা কল্পে লবণের যে সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে বুরোক্রেসীও ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। সেদিনের ভারতবর্জন মহাত্মাজীর মস্তিষ্ক প্রসূতই! অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের পক্ষে নোয়াখালি অভিযান অদ্ভূত হইতেও অদ্ভূত! সেদিনকার সুভাষ-সহচর উগ্রপন্থিগণ আজ মহাত্মারই একান্ত সুবোধ শিষ্য। সভাপতি পণ্ডিত মতিলালও ছিলেন খুবই বিচক্ষণ ও পক্কবুদ্ধি। যাহা হউক, এই কংগ্রেস হইতেই প্রবীণের প্রতি সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধা অনেকটা শিথিল হইয়া আসে। সেই শিথিলতা ইতার ৯।১০ বৎসর পরে সাময়িকভাবে অপসারিত হইলেও শেষ পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের চিত্তে বদ্ধমূল ছিল এবং বরাবর সেই অপর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি লড়াই করিয়াই গিয়াছেন।

২১শে তারিখে পণ্ডিত মতিলাল কলিকাতায় আসেন এবং ১লা জানুয়ারী কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়। এত দীর্ঘকাল ব্যাপী উৎসব ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। ২২শে হইতে সর্ব্বদলীয় সম্মিলনী বৈঠক বসে। ২৭শে তারিখে বিষয় নির্ব্বাচন সভায় মহাত্মার Compromise (আপোষ) প্রস্তাব পাশ হয়। ২৮শে তারিখে পতাকা উৎসব হয়। ২৯শে তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রায় ২০০ মেয়ে সরলা দেবীচৌধুরাণীর নেতৃত্বে বন্দেমাতরম সঙ্গীত গান করে। তার পরে যতীন্দ্রমোহন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহাতে জাতিভেদ, অনুন্নত জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি অনেক কথা থাকে। অতঃপর পণ্ডিত মতিলাল তাঁহার অভিভাষণ বিশেষ তেজস্বিতার সহিত পাঠ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি লর্ড উইলিয়াম সাহেব (বোধ হয় সস্ত্রীক) উপস্থিত ছিলেন। বিলাতের আর দুইজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন—মিঃ ব্রাডলি ও মিঃ রায়ান। মিঃ ব্রাডলি শ্রমজীবিগণের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন, আর মিঃ রায়ান (Pan Pacific Labour Secretary) বিশিষ্ট অভ্যাগত হিসাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিন একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা হয়। প্রায় ৩০০০০ (লিলুয়া, বাউড়িয়া, হাওড়া ও নিকটবর্ত্তী স্থানের) কিরণচন্দ্র, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, নিম্বকার প্রভৃতির নেতৃত্বে—

সুভাষচন্দ্র ফিল্ড মার্সাল হিসাবে তাঁহাদিগকে আসিতে বাধা দেন। ধস্তাধস্তিতে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আহত হয়। সুভাষচন্দ্র বলেন—

একবিন্দু রক্ত থাকিতে ইহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিব না।

কিরণ—আপনার একবিন্দু রক্তও যাইবে না, আমরাও প্রবেশ করিব।

পণ্ডিত জওহরলালও অশ্বপৃষ্ঠে সকলকে থামাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনিও সামান্যভাবে আহত হন। অবিলম্বে যতীন্দ্রমোহন আসিয়া পড়েন। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল, সাধারণ সম্পাদক, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি আসিয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ একটী পরামর্শ বৈঠক হয়। সুভাষচন্দ্র বলেন, "এত লোকের সমাবেশ আমি ব্যবস্থা করিতে পারিব না।"

পণ্ডিত মতিলাল—ইহাদিগকে ভিতরে আসিতে না দিলে ভয়ানক অনর্থ ঘটিবে!

অতঃপর এক ঘণ্টার জন্য তাহাদিগকে আসিতে দেওয়া হয়। তাহাদের নেতাগণ আসিয়া এমন বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিল, কিছুতেই আর যাইতে চাহিল না, এক ঘণ্টার স্থানে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইল, তথাপিও নড়ে না, তাহারা মহাত্মাজীর কথা শুনিতে চাহিল। অতঃপর মহাত্মাজী বলিলেন, "তোমরা বাহিরে চল, আমি সেখানে তোমাদিগকে দুই একটা কথা বলিব।" তিনি ডুলিতে বাহিত হইয়া বাহিরে গেলেন, তাহারাও মণ্ডপ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। অতঃপর দুই কি আড়াই ঘণ্টা বাদে কংগ্রেসের কাজ আরম্ভ হইল।

তৃতীয় দিনে মহাত্মার আপোষ প্রস্তাব আলোচিত হয়। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার পরে ভোট গণনা আরম্ভ হয়। শেষ হইতে প্রায় সাড়ে বারোটা একটা হইয়া যায়। অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ১লা জানুয়ারীতে প্রস্তাবটি পাশ হয়।

প্রস্তাব পাশ হইবার পরে মহাত্মা, পণ্ডিত মতিলাল এবং দেশপ্রিয় প্রভৃতি একস্থানে ছিলেন। পণ্ডিতজী মহাত্মার কাছে সংশোধন প্রস্তাব পক্ষীয়গণের অসৌজন্যের কথা ক্ষুণ্ণমনে বিবৃত করেন। দেশপ্রিয়ের প্রতি যে সমস্ত উক্তি হয় তাহাও তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়।

এই অধিবেশনে অ্যানি বেসান্ত উপস্থিত ছিলেন এবং বিশেষ উৎসাহও প্রদর্শন করেন। ডাক্তার বেসান্ত মাদ্রাজ কংগ্রেসেও উপস্থিত থাকিয়া কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শের অনুমোদন করেন। ১৯১২ সাল হইতে ২৬শ সাল পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত না থাকিলেও ভারতের হিতসাধন তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। ১৯২৫ সালে তিনি Common Wealth Bill of India লইয়া দেশবন্ধুর সঙ্গে দার্জ্জিলিং-এও দেখা করিয়াছিলেন এবং সেই বিলের আদর্শ এবং কার্য্যপন্থা এক সত্যাগ্রহ ব্যতীত দেশবন্ধুর আদর্শের বিরোধও ছিল না। তিনি এবার কংগ্রেস, বিষয় নির্ব্বাচনী সভা ও ওয়ার্কিং কমিটীতে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"Deshbandhu Das at Faridpur held the idea of Federation rather than Indian isolation for Independence was attractive, but it was nothing but isolation. Federation of free nations was a higher ideal than isolated independence. Deshbandhu took a step which was along the line of evolution."

একজন প্রতিনিধি কি একটা অসঙ্গোক্তি করাতে মিসেস বেসান্ত খুব জোরের সহিত উত্তর করেন—

"My record in connection with the boycott movement is a sufficient answer."

১লা জানুয়ারী মহাত্মাজী সর্ব্বদল সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া ইহার কার্য্য অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটি পাশ হয়। প্রথমে মহাত্মাজী বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী আবার আহ্বান করিলে সর্ব্বদল সম্মেলন বসিবে। ইহাতে মিসেস বেসান্ত আপত্তি করেন। তিনি কংগ্রেসকে সর্ব্বদল সম্মেলনের উপরে স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন, বিশেষতঃ পূর্ব্বদিন (৩১শে ডিসেম্বর) যে প্রস্তাব পাশ করিয়াছে, তাহা তাহার মনঃপূত হয় নাই। অতঃপর মহাত্মাজীর পরিবর্ত্তিত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, আর কংগ্রেসের কোন নামগন্ধ থাকে না।

সর্ব্বদল সম্মেলনে স্যার আলিম ইমাম এবং মহারাজা অব মামুদাবাদ খুব খাটিয়াছিলেন। নিখিলভারত খিলাফত কমিটী এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস লীগ তখন দুইটী মুসলমান প্রতিষ্ঠান। প্রথমটীর উপর আলি ভ্রাতাদের খুব প্রভাব ছিল। দ্বিতীয়টির (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) সভাপতি ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তর্কবিতর্কের পরে মৌলানা মহম্মদ আলি সম্মেলন হইতে বাহির হইয়া যান। মুসলীম লীগ কুড়ি জন প্রতিনিধি সর্ব্বদল সম্মেলনে পাঠাইয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে কিছু মতভেদ হইলে মিঃ জিন্না মুসলিম লীগের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। তবে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ সম্বন্ধে সকল প্রতিষ্ঠানেরই সম্মতি ছিল। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল বার্দ্দোলীতে খাজনা দেওয়া সম্বন্ধে যে সত্যাগ্রহ করিয়া বিজয়ী হন্, কংগ্রেসের একটী প্রস্তাবে তাঁহাকে প্রশংসা করা হয়।

কলিকাতায় প্রদর্শনীও হয় অত্যন্ত অদ্ভুত। সমগ্র দেশের ভাল ভাল জিনিষ সব সাজাইয়া রাখা হয়। তাহাতে লোহার নানা প্রকার যন্ত্রাদিও ছিল, আবার দেশের পাঁচটী শাখা প্রভৃতিও ছিল। নানা প্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন ("লাঠি, তরবারি খেলা) ও আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত থাকিত। বক্তৃতা ইত্যাদিও হইত। এখানে কালিকাবাবুর বক্তৃতায় সাইমন্—ছাইমন্, এট্‌লি—আট্‌লি প্রভৃতি কথা শুনি।

অতঃপরে মহাত্মাজী ২রা জানুয়ারী তারিখে "চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে" নূতন তৈয়ারী বাটীটার কার্য্যবিভাগ উদ্বোধন করেন। দেশবন্ধুর পুরাতন হর্ম্মোর ঠিক দক্ষিণ-দিকে ইহা নূতন তৈয়ারী হয়। উদ্বোধন কালে মহাত্মাজী যে কয়টী মর্ম্মস্পর্শী কথা বলেন, তাহা এখনও মনে আছে। কথা কয়টি এই—

স্যার বং বাঙ্গলা দেশ মে আজ দেশবন্ধুকা অদর্শন মুঝকো পীড়া দেতা হ্যায়। আউর মেরে দিল্‌মে এহি প্রশ্ন উঠতা হ্যায় কা দেশবন্ধুকা বাঙ্গলা কেইসা থা, আউর আজ কা বাঙ্গলা ক্যা হুয়া; দেশবন্ধু আপ্‌না জিন্দিগীকে যেইসা খুব আউর কর্ম্মপ্রবণতা দেখ্‌লায়া থা, উমহান থা, আমংখো বাঙ্গলা মুলুক্ উস্‌কা মহান ত্যাগ কা বাত কভি নেহি বিস্মরণ হো সাকতা। স্যার নীলরতন, ডাক্তার বিধান রায় আউর আওর ট্রাষ্টকা সভ্য এহি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌কা ওয়াস্তে যো কোশিশ কর রহে হ্যায়, ওহিতে অদ্বিতীয় কর্ম্মযোগী দেশবন্ধুকা স্মৃতি পাক্কা রহেগা।

Whenever he comes to Bengal, he feels absence of Deshbandhu and thinks within himself what was Deshbandhu's Bengal and what is today's Bengal? 'The enthusiasim which he had seen during his lifetime was unique and Bengal would ever remember the great sacrifice which their leader did for their good and for the good of Bengal. Mahatmaji thanked Dr. Bidhan Roy, Sir Nilratan Sorker and other members of the trust who had worked hard so long for the property of the Institution which would be the living memory of Deshbandhu Chittaranjon the 'Karmoyogi" of Bengal.

'আমি যখনই বাঙ্গলা দেশে আসি, দেশবন্ধুর অদর্শন ও অনুপস্থিতি আমাকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। আমি কেবল ভাবি দেশবন্ধুর বাঙ্গলা দেশ ছিল কত বড়, আর আজ উহা কিসে পরিণত হইয়াছে। তিনি জীবদ্দশায় যে শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই, এবং তিনি বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলা দেশের মঙ্গলের জন্য যে মহান আত্মত্যাগের আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাদেশ কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না। আজ দেশবন্ধু ট্রাষ্টের প্রতিনিধি স্যার নীলরতন, ডাক্তার বিধান রায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতেই আদর্শ কর্ম্মযোগী দেশবন্ধুর জীবন্ত স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।'

মানসী

শ্রীযতীশ বেদজ্ঞ

১৬১২ সাল। ডিসেম্বর মাসের এক শীতের সকাল। প্যারী সহরের প্রান্ত অগাস্তিন সড়কের পরে দেখা গেল একটি যুবককে। পরণে তার পাতলা ফিন্‌ফিনে পোষাক। একটি তোরণের সামনে পায়চারী করছে। কেমন যেন সংকোচ বোধ করছে ও। ঠিক যেমন বোধ করে থাকে প্রেমিক তার প্রথম প্রিয়ার সম্মুখীন হতে,—যদিও বাধা কিছুই নেই। অনেকগুলি কুণ্ঠিত-মুহূর্ত। অবশেষে উঠোন পেরিয়ে ও এগিয়ে গেল ভিতরের দিকে। নীচের একটা বড় ঘর ঝাড় দিচ্ছে এক বুড়ী। যুবক খোঁজ নিল মাষ্টার পরবি ভিতরে আছেন কি না। সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে ও উপরে উঠতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে। যেন কোন নূতন আগন্তুক চলেছে রাজ-দরবারে। জানে না, রাজা তার উপস্থিতি কি ভাবে গ্রহণ করবেন। উপরে এসে আবার তাকে থামতে হ'ল। ষ্টুডিওর অপরূপ হাতলে হাত দিতে ওর সংকোচ হচ্ছে। ভিতরে রয়েছেন রাজা চতুর্থ হেনরীর সভাশিল্পী আচার্য্য পরবিউ।

যুবক চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। কি এক গভীর অনুভূতি ওর হৃদয়ে জাগাচ্ছে শিহরণ। প্রত্যেক শিল্পীর জীবনেই আসে এই অনুভূতি। যৌবনের প্রারম্ভে প্রীতির অর্ঘ্য নিয়ে যেদিন তাঁরা সর্ব্বপ্রথম কোন মহান্ শিল্পী অথবা তাঁর সৃষ্টির সম্মুখীন হন সেদিন তাঁরা প্রত্যেকেই অনুভব করেন এই চাঞ্চল্য, এই শিহরণ। প্রত্যেকটী মানুষিক অনুভূতিরই দিন আসে মুকুলিত হবার। অনুরাগ-রাঙা এই দিনটি ক্রমে আসে ফিকে হয়ে। শেষে শুধু স্মৃতিটুকু ছাড়া আর সব কিছুই যায় মিলিয়ে। সে-দিনের সেই পরিপূর্ণ আনন্দ হয়ে দাঁড়ায় কল্পনার বস্তু। এই সব সূক্ষ্ম ও মায়াময় অনুভূতির সাথে অনেকখানি সাদৃশ্য আছে ভালবাসার। প্রশংসা ও লাঞ্ছনা—ক্ষীণ আশা ও নিদারুণ ব্যর্থতা—এই তো শিল্পী আর প্রেমিকের জীবন।

যে-সব শিল্পী, তাদের প্রতিভার উষালোকে কোন শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সম্মুখীন হয়ে নিজেদের হৃৎস্পন্দন অনুভব করেন নি, তাঁদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে এমন একটা তার রয়ে গেছে—যা কখনও ধ্বনিত হয় নি। আর তাঁদের সৃষ্টির ভিতর রয়ে যায় এমন একটা অনির্দ্দেশ্য গুণের অভাব—তুলিকার এমন একটী রেখা—এমন একটি রহস্যময় উপাদান—যাকে আমরা বলে থাকি কবিতা। অন্তঃসারশূন্য অহংবাদীরা নিজেদের সফলতা সম্বন্ধে বড্ড বেশী তাড়াতাড়ি নিশ্চিত হয়ে উঠে। অনভিজ্ঞ ছাড়া আর কেউই তাদের গুণী বলবে না। যৌবনসুলভ বিনয় নবীন প্রতিভারই নির্দ্দেশক। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে সিঁড়ির পরের যুবকের ভিতর যে কিছু প্রতিভা রয়েছে এ-কথা বলা যেতে পারে। ওর ভিতরে রয়েছে সেই রহস্যময় আত্ম-সংশয়—শৈশবোচিত বিনম্রতা—পরবর্ত্তী কালের মহান্ কার্য্যক্ষেত্রে যা প্রত্যেক শিল্পীই হারিয়ে ফেলেন। যেমন হারিয়ে ফেলে প্রেম-বিলাসিনীরা তাদের প্রথম প্রেমালাপের সলাজ নম্রতা। বিজয় অভিযানের পথে মিলিয়ে যায় সব আত্মসন্দেহ।

বেচারা শিক্ষানবীশ। আপন অধিকার ও তুচ্ছতাবোধ যেন ওকে একেবারে জয় করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে ও যেন ঢুকতেই পারবে না ষ্টুডিওর মধ্যে। কিন্তু অদৃষ্ট শুভ। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলেন এক বৃদ্ধ। অদ্ভুত তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ। চমৎকার জরির কাজকরা গলবন্ধ। অঙ্গভঙ্গীতে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য। যুবক ভাবে নিশ্চয়ই সভাশিল্পীর কোন পৃষ্ঠ-পোষক বা বন্ধু। সসঙ্কোচে আগন্তুকের পথ থেকে ও সরে দাঁড়ায়। কৌতূহলী মন নিয়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে। আশা ক'রে হয়তো দেখবে একজন শিল্পীর সরল প্রকৃতি অথবা ফুটবে কোন সৌখীন শিল্পানুরাগীর সহাস্যতা। কিন্তু পরিবর্ত্তে চোখে পরে এমন একখানা মুখ—যাকে প্রায় কুৎসিতই বলা যেতে পারে। আর সে মুখে আছে রহস্যময় এমন একটা কিছু যা প্রত্যেক শিল্পীমনকেই আকর্ষণ করে অনিবার্য্যরূপে মসৃণ সু-উচ্চ কপাল, এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো ও ঝুলে পড়া একজোড়া ভ্রূ, ছোট্ট চ্যাপ্‌টা নাকের ডগাটা উল্টানো, বিদ্রূপাত্মক মুখকে ঘিরে অসংখ্য গভীর রেখা। ধূসর রংয়ের ছুঁচলো দাড়িতে ঢাকা ছোট্ট চিবুক। সাগরের মত সবুজ দু'টি চোখ বয়সের জন্য ঈষৎ নিষ্প্রভ। কিন্তু চারিপাশের বর্ণচ্ছটা ও গোলাপী আভা দেখে মনে হয় ছাইচাপা আগুন। যে কোন মুহূর্ত্তে জ্বলে উঠতে পারে ধক্ ক'রে। বয়সের ক্লান্তিতে মুখখানা অস্বাভাবিক শীর্ণ। কিন্তু কি-সব গভীর চিন্তা যেন আরও জীর্ণ ক'রে ফেলেছে তাঁর দেহ ও মনকে। লোমহীন গভীর চোখ দুটির উপর থেকে বাঁকানো রেখা গিয়েছে ভ্রূ একদম মিলিয়ে।

শীর্ণ এবং দুর্ব্বল দেহটাকে ঘিরে রয়েছে চমৎকার কাজকরা একটা জরির পোষাক। কালো রংয়ের জ্যাকেটের পকেটে দেখা যাচ্ছে একগাছা মোটা সোনার চেন। সব মিলিয়ে কেমন যেন অদ্ভুত। ম্লান অন্ধকারে তাঁকে লাগছে আরও রহস্যময়। যেন রেমব্রেণ্টের আঁকা একটি ছবি ফ্রেম থেকে নেমে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই আবছা অন্ধকারে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার যুবকের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ দরজায় ঘা দিলেন ঠক্-ঠক্-ঠক্। দরজা খুলে সসম্মানে অভিবাদন জানালেন পরবিউ—"সুপ্রভাত গুরুদেব"। বৃদ্ধের সাথে যুবকও ঢুকে পরলো ষ্টুডিওর মধ্যে। পরবিউ তাকে তাঁর অতিথিরই কোন সহচর মনে করেছেন।

বেচারা শিক্ষানবীশ! ভিতরে ঢুকেও স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম ও একটা সত্যিকারের ষ্টুডিও দেখছে। এইখানেই তো শিল্প বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। ও অনুভব করছে আশ্চর্য্য এক প্রভাব। প্রথম ষ্টুডিওর ভিতরে দাঁড়িয়ে যা প্রত্যেক শিল্পীমনই অনুভব করে থাকে।

ছাদের শার্শি দিয়ে আলো এসে পড়েছে একখানা রংয়ের

থালার পরে। তাতেই ঘর আলো হয়েছে। এক পাশে রয়েছে একখানা ক্যানভাস্। দু'চারটা নক্সা ছাড়া প্রায় অব্যবহৃত। প্রকাণ্ড ঘরের কোণগুলিতে আলো এসে এখনও পৌঁছায় নি। সে জায়গাগুলো এখনও রাত্রির মত অন্ধকার।

ঘরের চারিদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব প্লাষ্টারের মূর্ত্তি। তাক, টেবিল প্রভৃতির পরে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ সব নিদর্শন। পৌরাণিক দেবদেবীদের অঙ্গহীন প্রতিমূর্ত্তি। ক্ষয় পেয়ে পেয়ে মসৃণ হয়ে গেছে। যেন বিগত শতাব্দীগুলি তাদের পরে রেখে গেছে তাদের প্রেম-চুম্বনের চিহ্ন। কাঠকয়লা, লাল খড়ি, আর কালির অসংখ্য নক্সায় মেঝ থেকে ছাদ পর্য্যন্ত দেওয়ালগুলো সব ভর্ত্তি। রংয়ের বাক্স, উল্টানো টুল, তেল আর এসেন্সের বোতলের জঞ্জাল। এ সবের ভিতর দিয়ে একফালি রাস্তা গিয়ে শেষ হয়েছে একটি বৃত্তাকারের জায়গায়। সেখানে রয়েছে রংয়ের থালা। ছাদের শার্শি দিয়ে আলো এসে পড়েছে পরবিউর পাণ্ডুর মুখে আর সেই অদ্ভুত আগন্তুকটির শুভ্র মসৃণ কপালের পরে। যুবক কিন্তু একদৃষ্টে দেখছিল একখানি ছবি। রাজনৈতিক ও ধর্ম্মবিপ্লবের ঝঞ্ঝাপূর্ণ দিনেও ছবিখানি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই দুর্দ্দিনেও যে কয়জন শিল্পসাধক তাদের সাধনার শিখা ম্লান হতে দেন নি তাঁরাও আসেন এই ছবিটি দেখতে—তাঁদের ভক্ত হৃদয়ের অর্ঘ্যাঞ্জলি দিতে। এই ছবিটি—মিশরীয় তাপসী মেরীর। পায়ের কড়ি মিটিয়ে দিচ্ছেন তিনি। ছবিখানি আঁকা হয়েছিল রাজার প্রণয়িনী মেরী-ডি মেডিসির জন্য।

"তোমার ঐ তাপসী মূর্ত্তিটা আমার ভাল লেগেছে,"—পরবির্ত্তকে উদ্দেশ করে বৃদ্ধ বললেন, "রাণী তোমায় ওর জন্য যা দিচ্ছেন আমি তার চেয়ে দশ টাকা বেশী দিতে রাজী...কিন্তু—জাহান্নমে যাক্।" বিরক্তি প্রকাশ করে বৃদ্ধ চুপ করলেন।

"এটা তা'হলে ভালই হয়েছে?" সসংকোচে জিজ্ঞেস করলেন পরবিউ।

"হাঁ—হাঁ—" অন্যমনস্কভাবে বৃদ্ধ বললেন।

পরক্ষণেই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সুনির্দ্দিষ্ট কণ্ঠে বলে চললেন "কি বলছো? ভাল হয়েছে বলছো? হাঁ, এবং না। তোমার এই ভাল মেয়েমানুষটা ভালই আঁকা হয়েছে। কিন্তু জীবন্ত হয়নি। তোমরা শিল্পীরা মনে করো যখন একটা মূর্ত্তি ঠিক ভাবে আঁকা হলো—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি নির্দ্দিষ্ট রীতি অনুসারে ঠিক্ ঠিক্ সব সাজানো হলো, তখন আর কিছুই করবার রইলো না। শরীরের রং কি হবে তাও তোমরা আগে থেকেই রংদানির পরে ঠিক করে রাখো। তার পর ঠিক যেমনটা নিয়ম সেই ভাবে তোমরা নক্সাগুলোকে পূর্ণ করে তোল। আর যেহেতু আঁকবার সময় মঞ্চের পরের নগ্ন স্ত্রীলোকটার দিকে বার কয়েক তাকাও অমনি বোকারামের মত কল্পনা কর যে, তোমরা প্রকৃতিকে অনুকরণ করে ফেলেছ। রাতারাতি সব শিল্পী বনে যাও। এমন কি, বিশ্বাস করে বসো স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্য ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছ। ফুঃ! পদবিন্যাসের রীতি তোমার পুরাপুরিই জানা থাকতে পারে; ব্যাকরণেও হয়তো ভুল হবে না। কিন্তু সত্যিকারের একজন কবি হ'তে হলে এ ছাড়াও আরো কিছু দরকার। তোমার তাপসীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে দেখ পরবিউ, প্রথম দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় বলেই মনে হবে। কিন্তু আবার তাকাও দেখবে ওকে যেন ক্যানভাসের সাথে এঁটে দেওয়া হয়েছে। ওর চারদিক দিয়ে তুমি চলাফেরা করতে পার না। ও যেন একটা ছায়া—প্রত্যেক দর্শককেই দেখতে হবে ওর মুখের শুধু একটা দিক, ওর না আছে চলাফেরা করবার শক্তি—আর না আছে পাশ বদলাবার ক্ষমতা। আমার মনে হচ্ছে, যেন ওর ঐ হাতখানা আর পটভূমির মাঝে কোন ব্যবধানই নেই। স্থান অথবা দূরত্বের কোন পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে না তোমার—ঐ ক্যানভাসের মধ্যে। আঁকবার কায়দা বেশ নিখুঁতই বলতে হবে। বর্ণের ঔজ্জ্বল্যও দূরত্ব অনুযায়ী বেশ ঠিকমতই কমানো হয়েছে। এ সমস্ত প্রশংসনীয় গুণ থাকা সত্ত্বেও আমি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনা যে ঐ সুন্দর শরীরটার ভিতর উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে। কোথায় সেই জীবনের লক্ষণ? আমার তো মনে হচ্ছে ওর ঐ সুগঠিত গ্রীবাদেশে হাত দিলে মার্ব্বেলের শৈত্য ছাড়া আর কিছুই অনুভূত হবে না। না হে বন্ধু। ঐ শুভ্র ত্বকের নীচে কোন রক্ত-চাঞ্চল্যই নেই। ঐ স্ফটিকস্বচ্ছ ভ্রূ ও বক্ষের-লোহিত শিরা উপশিরাগুলির ভিতর জীবনপ্রবাহের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। এখানে দেখা যাচ্ছে জীবন-চাঞ্চল্য ওখানে আবার নির্জ্জীবতা। প্রত্যেক জায়গায়ই দেখেছি জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্ব। কোথাও দেখছি একটা জীবন্ত স্ত্রীলোক, কোথাও বা একটা মূর্ত্তি, কোথাও বা আবার শুধুই একটা শবদেহ। না-হে বন্ধু, সৃষ্টি তোমার অসম্পূর্ণ। তোমার এই প্রিয় প্রচেষ্টার মধ্যে তোমার আত্মার শুধু একটু অংশ প্রকাশ পেয়েছে। তোমার হাতের জীবন-প্রদীপ বার বার গিয়েছে নিভে। ছবির অনেক জায়গায়ই ছোঁয়া লাগেনি সে পরশমণির।"

কষ্ট হচ্ছে যুবকের নিজেকে সংযত রাখতে। ওর ইচ্ছে করছে ঐ নিন্দুক সমালোচককে আঘাত করতে।

বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন পরবিউ—"কিন্তু গুরুদেব, তা কেন হলো"?

"তা বলা আর এমন কঠিন কি," বৃদ্ধ আবার সুরু করলেন, "হলো এইজন্য—তুমি ইতস্ততঃ করেছ দুটো রীতির মধ্যে। অঙ্কন আর বর্ণবিন্যাসের মধ্যে তোমার এসেছে দ্বিধা। একদিকে জার্ম্মাণ শিল্পাচার্য্যদের খুঁটিনাটির প্রতি অনুরাগের সুনির্দ্দিষ্ট রীতি, অপর দিকে ইতালীয় শিল্পীদের বর্ণচ্ছটা—জীবনোচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য্য। এই দুয়ের মাঝে তোমার এসেছে সন্দেহ শুধু একখানি ছবির মধ্যে তুমি চেষ্টা করেছ—একসঙ্গে হ্যান্স, হল্‌বিন্, টাইটান, আলব্রেখ্‌ট্, ডয়েরার আর পাল ভারোনিজের অনুকরণ করতে। উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ সন্দেহ নাই। কিন্তু ফল কি হলো? তোমার ছবিতে না আছে নিষ্ঠুর ঘাতকের রুক্ষ সৌন্দর্য্য, না আছে ইতালীয় যাদুকরের অপূর্ব্ব রংয়ের মায়াজাল। আলব্রেখ্‌ট ডয়েরের কাঠামোর ভিতর তুমি গেছ টাইটানের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার স্থান করতে। ফল হয়েছে কাঠামোটা গেছে ভেঙ্গে। কোন কোন জায়গায় কাঠামোটা ঠিকই রয়েছে কিন্তু ভেনিসিয় অত্যুজ্জ্বল বর্ণস্রোতকে আটকে রেখে তাকে করে তুলছে অস্পষ্ট।

মুখটাও ঠিক আঁকা হয়নি। বর্ণবিন্যাসও নির্ভুল নয়। সব জায়গায়ই প্রকাশ পাচ্ছে কুণ্ঠা। নিজের প্রতিভার আলোতে দুটো বিপরীত রীতির সামঞ্জস্য বিধানের যথেষ্ট শক্তি সম্বন্ধে যতক্ষণ না তুমি নিঃসন্দেহ হচ্ছো, তোমার উচিত সাহস করে ওদের যে কোন একটার সাথে তোমার অদৃষ্টকে জড়িয়ে ফেলা। আর তাতেই সম্ভব হবে সেই সমতা যা হচ্ছে জীবনের নিজস্ব একটা ধর্ম। তোমার ছবির ঠিক আছে শুধু মাত্র জায়গাটা। বাইরের রেখাগুলি হয়েছে বাজে। ওর থেকে কিছুই কল্পনা করা যায় না। ওর পেছনের কোন কিছু সম্বন্ধে কোন সংকেতই ওতে নেই। বুকের দিকটা মোটামুটি একরকম হয়েছে। কিন্তু ঐ গলাটার সমস্তটাই বাজে। খুটিনাটির কথা আর বলে লাভ নেই, তুমি হতাশ হয়ে পড়বে।

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বৃদ্ধ একটা টুলের পরে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

নীরবতা ভঙ্গ করে বিনীতভাবে পরবিউ বললেন "তবুও দেখুন গুরুদেব, ওটা আমি জীবন্ত আদর্শ থেকেই পরিকল্পনা করেছি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃই সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, বাস্তব প্রকৃতিও পর্দার পরে কেমন যেন বেমানান হয়ে পড়ে।"

"শিল্পকলার উদ্দেশ্য নয় প্রকৃতির অনুকরণ করা; প্রকৃতিকে প্রকাশ করাই তার ধর্ম।"—অসহিষ্ণুভাবে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, "তুমি তো একজন সাধারণ নকল-নবীশ নও। তুমি একজন কবি। তা না হলে একজন ভাস্কর তো অনায়াসে প্লাষ্টার দিয়ে একজন স্ত্রীলোকের ছাঁচ তৈরী করে নিলেই পারতো, তার সব পরিশ্রম বেঁচে যেত। মনে কর, প্লাষ্টার দিয়ে তুমি তোমার প্রিয়ার হাতের একটা ছাঁচ বানালে। কি দেখবে তুমি? দেখবে অস্বাভাবিক জড়পিণ্ড। জীবন্ত হাতের সাথে থাকবে না তার কোনও সাদৃশ্য। তুমি বাধ্য হবে ভাস্করের বাটুলির সাহায্য নিতে যা প্রকৃতির অন্ধ অনুকরণ না করেই হাতখানাকে করে তুলবে প্রাণময়, গতিশীল। বস্তু এবং জীবের বাইরের আবরণ ভেদ করে খুঁজে বের করতে হবে তাদের প্রাণকে—তাদের আত্মাকে। আত্মাই তো তাদের সত্যিকারের রূপ। আর এই রূপকে প্রকাশ করাই হচ্ছে আমাদের শিল্পীদের সত্যিকারের কাজ। তারপর চেহারার কথা যদি বলো—আমি বলবো ও টা একটা আকস্মিক ঘটনা। ওটা কখনও সত্যিকারের জীবন নয়। এই যেমন হাতের কথা বলছিলাম। হাতখানাকে শুধু শরীরের একটা বিশেষ অংশ বলে মনে করলেই চলবে না। মনে রাখতে হবে ওর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে একটা বিশেষ ভাব। আমাদের কাজ হচ্ছে ঐ বিশেষ ভাবটীকে আয়ত্ত করে নিখুত-ভাবে ফুটিয়ে তোলা, চিত্রকর, কবি, অথবা ভাস্কর কারো পক্ষেই সম্ভব নয় এই দেহ এবং আত্মা, রূপ এবং ভাবকে পৃথক্ করা। কেননা ওর একটা রয়েছে অপরটার সাথে মিশে। ওদের পৃথক্ করবার উপায় নেই।

এইখানেই সুরু হয় সত্যিকারের দ্বন্দ্ব। এমন অনেক শিল্পী আছেন শিল্পকলার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয়তো যাঁদের নেই। অথচ আপনা থেকেই তাঁরা সফলতা লাভ করেন। এ যেন অনেকটা চোখ বুজে আঁকার মত। এভাবে কিন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে তার রহস্য আদায় করে নেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষকের ষ্টুডিওতে বসে যে আদর্শটী নকল করতে যন্ত্রের মত তাকেই আবার চিত্রিত করছ। গঠন-রহস্যের গোপনতম তথ্যের সন্ধানে তোমার চেষ্টা নেই। গঠনকে আয়ত্ত করতে হলে যে গভীর অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তা তোমার নেই। তাই বারে বারে সে তোমাকে ব্যর্থ করেছে। রূপ হচ্ছে দুরধিগম্য। মোটেই সহজ নয় তার কাছে যাওয়া। দুর্ব্বলচেতা প্রেমিকের পক্ষে তাকে পাওয়া অসম্ভব। তোমাকে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে তার আসার পথে। হঠাৎ চমকে দিয়ে টেনে নিতে হবে কাছে। তার পর কঠোর আলিঙ্গনে বেঁধে তাকে বাধ্য করতে হবে বশ্যতা স্বীকার করতে। পুরাণের প্রোতিয়াসের চেয়েও বড় বহুরূপী আর তার চেয়েও বেশী অতীন্দ্রিয় হচ্ছে গঠন। বহু চেষ্টার পর সে বাধ্য হয় তার সত্যিকারের রূপ প্রকাশ করতে। তোমাদের অনেকেই তার প্রথম রূপ অথবা দ্বিতীয় কি তৃতীয় রূপ দেখেই খুসী হয়ে যাও। বিজয়ীরা কিন্তু ওভাবে লড়াই করেন না। অপরাজেয় শিল্পীরা ঐ সব মিথ্যা ছলনায় প্রতারিত না হয়ে ধৈর্য্য সহকারে তাঁদের লড়াই চালিয়ে যান। যতক্ষণ না প্রকৃতি দেবী বাধ্য হ'ন তাঁর সত্তা প্রকাশ করতে তাদের নগ্ন দৃষ্টির সামনে। এই ভাবে কাজ করতেন র‍্যাফেল—শিল্পী সম্রাটের উদ্দেশ্যে টুপি তুলে বৃদ্ধ বলে চললেন, "তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার মূল উৎস ছিল এই জ্ঞান যা তাঁর ছবির বহির্গঠন ভেদ করে উপচে পড়তে চাইছে। তাঁর ছবিগুলির বাইরের রূপ হচ্ছে শুধু এক একটা প্রতীক্। সূক্ষ্ম অনুভূতি, ভাবসম্পদ্ আর কবি-মনের বিশাল কল্পনারাশিকে প্রকাশ করবার উপায় মাত্র। প্রত্যেকটী মুখ হচ্ছে এক একটী সম্পূর্ণ জগৎ। মানস-দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তাঁর চোখে ধরা দিত প্রত্যেকটী চিত্রের বিষয়-বস্তু।

সুন্দর মাংসের আবরণে তোমরা তোমাদের সুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তিগুলিকে সাজিয়ে তোল। কমনীয় কেশাবগুণ্ঠনে তাদেরকে করে তোল শ্রীসম্পন্ন। কিন্তু সমস্ত চাঞ্চল্য ও প্রশান্তির মূল উৎস প্রত্যেকটী রূপসৃষ্টির মূল কারণ যে রক্ত, কোথায় সেই রক্ত? সত্যি বলতে কি পরবিউ, তোমার বাদামী রংয়ের ঐ মিশরসুন্দরীটি একটী বর্ণহীন জীব। যে মূর্ত্তিগুলি আমাদের সামনে রেখেছ ওর সবগুলিই রক্তহীন অপচ্ছায়া। আর একেই কিনা তোমরা বল চিত্রবিদ্যা। যে হেতু তোমাদের ছবিগুলি একটা বাড়ী না হয়ে অনেকটা স্ত্রীলোকের মত দেখতে হয়েছে, অমনি তোমরা ভেবে বস চরম লক্ষ্য তোমাদের হাতের মধ্যে পৌঁছে গেছে। পুরাণো আমলের চিত্রকরদের মত নীচে নাম লিখে ছবির বিষয়-বস্তু বুঝাতে হয়নি এতেই তোমরা খুসী। কল্পনা করে বসো অদ্ভুত কিছু একটা করে ফেলেছ। না হে এখনও আরো কিছু শিখতে হবে। আর তা শিখতে হলে আরও অনেক খড়ি ঘসতে হবে তোমাকে পর্দার পরে।"—একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—'হাঁ, বাস্তবিকই ঠিক এমনি হয়ে থাকে মেয়েদের গ্রীবাভঙ্গী, শান্ত স্নিগ্ধতায় ঠিক এমনি ভাবালু হয়ে ওঠে তার চোখ দুটি, ঠিক

এমনি করেই কম্পিত আঁখিপল্লবের ছায়া কাঁপতে থাকে তার সুকোমল কপোলের পরে। সবই ঠিক আছে। অথচ কিছুই ঠিক হয় নি। কিসের অভাব? কিছুই না। কিন্তু এই "কিছুই নাই হচ্ছে সব কিছু।"—ছবিটির বুকের দিকে লক্ষ্য ক'রে আবার বলে চললেন"—হাঁ, ঐ জায়গাটায় প্রাণের কিছু সাদৃশ্য আছে বটে। কিন্তু তার পরিপূর্ণ প্রাচুর্য্য প্রকাশ পায় নি। এমন একটা অতীন্দ্রিয় কোন কিছুর অভাব রয়েছে যা শরীরের বাইরের রেখাগুলিকে ঘিরে থাকে কুয়াসার মত। হয় তো বা আত্মাই হবে। এক কথায় টাইটান আর র‍্যাফেলের সম্মিলিত উপলব্ধি। তাকে তো কই প্রকাশ করতে পারনি? তোমার আপ্রাণ প্রচেষ্টা এ পর্য্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দেছে শুধু প্রারম্ভের মুখে। এখন হয় তো তুমি চমৎকার কিছু আরম্ভ করতে পারবে। কিন্তু বড্ড তাড়াতাড়ি তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়। জনসাধারণ তোমাকে বাহবা দেয়। কিন্তু যারা জানে তারা হাসে মুচকি হাসি। তা সে যাই হোক না কেন, আমি বলবো তোমার এই ছবিখানি ঐ পাজী করেন্সটার সবগুলি ছবি থেকেই বেশী মূল্যবান্। ও ব্যাটার আছে শুধু ফ্লেমিসীয় মাংসের স্তূপ। সিঁদুরের ধ্যাবধ্যাবানি, লাল চুলের ছড়াছড়ি আর রংয়ের মাতলামি। তোমার অন্ততঃ রং, অনুভূতি আর অঙ্কন এ তিনটা ঠিক আছে। আর এই তিনটেই হচ্ছে রূপসৃষ্টির মূল উপাদান।"

গভীর চিন্তা থেকে জেগে উঠলো যুবক। উত্তেজিত ভাবে বলে বসলো "সে কি, মশাই, এই তাপসীর মূর্ত্তিটা তো বেশ চমৎকারই হয়েছে। তাপসী মেরী আর মাঝির মধ্যে রয়েছে এমন একটা সূক্ষ্ম কল্পনা, যা ইতালীয় আচার্য্যদের মধ্যেও দুর্ল্লভ। আমি তো তাঁদের এমন একজনকেও জানিনা—যিনি মাঝির ঐ কুণ্ঠিত ভাবটি কল্পনা করতে পারেন।"

"এই কচকে ছোকরা কি আপনার সাথে এসেছে?" জুদ্ধ পরবিউ জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধকে।

"আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন"—আরক্তমুখে যুবক বললো,—"আমি একজন শিক্ষানবীশ। এই সবে প্যারীতে এসেছি।

"আঁকো দেখি, কেমন আঁকনেওয়ালা।" একটুকরো কাগজ আর লাল খড়ি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে পরবিউ বললেন। খুব কম সময়ের মধ্যেই যুবক মিশরকুমারীর মূর্ত্তিটি হুবহু এঁকে ফেললো।

"বাঃ।"—বিস্মিত-কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে উঠলো, "তোমার নাম?"

"নিকলাস পুসীন্", রেখাচিত্রটার নীচে লিখে যুবক নিজের নাম জানালো।

"আরম্ভের পক্ষে ওটা মন্দ হয়নি"—মন্তব্য করলেন সেই অদ্ভুত বৃদ্ধ। একটু থেমে আবার বললেন, "তোমার সামনে শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। পরবিউর তপসীটির প্রশংসা করবার জন্ত তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। দুনিয়ার সবার চোখেই ওটা সুন্দর বলে মনে হবে, চিত্রবিদ্যার গভীরতম রহস্যের মধ্যে যাঁরা ঢুকতে পেরেছেন শুধু তাঁরাই ওর ত্রুটি ধরতে পারবেন। তোমাকে উপদেশ দেওয়া যেতে পারে। তোমার বুঝবার শক্তি আছে। কত সামান্যতে এই ছবিটি সম্পূর্ণ হতে পারে তা তোমাকে দেখাচ্ছি। সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর গভীর একাগ্রতা নিয়ে তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে। সমস্ত জীবনে হয়তো শিখবার এমন সুযোগ আর তোমার আসবে না। পরবিউ, তোমার রংয়ের থালা?"

ব্যস্তভাবে পরবিউ আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে এলেন। অধীর উত্তেজনায় আস্তিনা গুটাইলেন বৃদ্ধ। আঁকড়িয়ে ধরলেন পরবিউর নানা রং-বোঝাই থালাখানা। ক্ষিপ্রতার সাথে তুলে নিলেন নানা আকারের একমুঠো তুলি। হঠাৎই যেন কণ্টকিত হয়ে উঠলো তাঁর ছুচলো দাড়ি। চলন-ভঙ্গীতে প্রকাশ পেল প্রেমিকের ভাবাবেগ। তুলিতে রং নিয়ে গজ গজ করে বলে উঠলেন, "এই রংগুলি আর যে ব্যাটা এগুলি মিশিয়েছে—দুটোকেই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা উচিত। না হয়েছে এগুলোকে ভাল করে গুঁড়ো করা, না হয়েছে মেশানো। এ দিয়ে কি আর ছবি আঁকা চলে।" অধীর আগ্রহে থালাখানা কয়েকবার ঘুরিয়ে নানা রংয়ে ডুবিয়ে নিলেন তুলির ডগাটাকে, পর্দার দুইপাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন পরবিউ আর পুসিন। গভীর আগ্রহ তাঁদের চোখে।

"তাকিয়ে দেখ যুবক,"—আঁকতে আঁকতে বলে চললো বৃদ্ধ, "কেমন করে একটুখানেক ফিকে নীলের আভা আর দু'চারটে তুলির টানে মুক্তবাতাস এসে খেলা করছে মিশরী সুন্দরীর মাথার চার পাশে। বেচারা, গুমোট আবহাওয়ায় নিশ্চয়ই দম বন্ধ হয়ে আসছিল ওর এতক্ষণ। দেখ, কেমন করে ওর পোষাক হাওয়ায় উড়ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে হাওয়ায় ওর পোষাক ফুলে উঠেছে। এই একটু আগেও ওগুলি যেন ঝুলে ছিল ভারী বোঝার মত। দেখছো, ওর বুকের এই হাল্কা রং কেমন সুন্দর ফুটিয়ে তুললো নবীনা তরুণীর ত্বকের রেশমি নম্রতা। আর এই কটা লাল আর গৈরিকের সংমিশ্রণ এনে দিল কেমন উত্তাপ, একটু আগের ধূসর ছায়াস্তূপের মধ্যে। পূর্ব্বে রক্ত ছিল জমাট বেঁধে। শিরা-উপশিরার ভিতরের প্রবাহ গিয়েছিল থেমে। বুঝলে হে যুবক, অন্য কোন শিক্ষকই তোমাকে এমনটা শিখাতে পারত না—যেমনটি আমি তোমার সামনে দেখাচ্ছি। একমাত্র ম্যাবুই জানতেন কেমন ক'রে মূর্ত্তিগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ম্যাবুর ছিল কেবল একটা শিষ্য। সে হচ্ছি এই আমি।

আর আমিও হয়ে গেছি বুড়ো। যে কয়টা ইঙ্গিত তোমাকে দিচ্ছি তা থেকে বাকীটা কল্পনা করে নেবার মত বুদ্ধি তোমার আছে।" কথা বলার সাথে সাথে বৃদ্ধ এখানে ওখানে তুলির আঁচড় দিয়ে যাচ্ছিলেন। কোথাও বা একটা কোথাও বা দুটো। কিন্তু প্রত্যেকটাই চমৎকার অর্থপূর্ণ। সামান্য সময়ের মধ্যেই সমস্ত ছবিটিই যেন হয়ে গেল রূপান্তরিত। অজস্র আলোর বন্যায় মূর্ত্তিটি করে উঠলো ঝলমল্। অধীর আগ্রহে বৃদ্ধ তুলি বুলিয়ে যাচ্ছেন। উন্মুক্ত কপালে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পুসিনের মনে হ'ল যেন কোন অশরীরী এই অদ্ভুত লোকটির ভিতর থেকে তাঁকে দিয়ে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। তাঁর চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি, অধীর অঙ্গভঙ্গী—সব কিছুই যেন পুসিনের এই ধারণা সত্য বলে প্রমাণ করছে। যুবক-মনের কল্পনাকে আন্দোলিত করবার পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

[ক্রমশঃ

ভারতের জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যনীতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের নবপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় শাসনতন্ত্রের শিল্প-বাণিজ্যনীতি কিরূপ হইবে, তাঁহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, ঐ শাসনতন্ত্রের সহকারী সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সম্প্রদায়ের বাণিজ্য-সমিতিগুলির সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের গত বার্ষিক অধিবেশনে সুদৃঢ়ভাবে প্রদান করিয়াছেন। এই নীতি ভূতপূর্ব্ব আমলাতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর শোষণ নীতি হইতে বিভিন্ন হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এই নীতির প্রকৃতি সম্যক্ রূপে জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হইলে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত শ্বেতাঙ্গ বণিক্গণের স্বার্থের কিরূপ প্রতিকূল হইবে, অথবা কি পরিমাণে অক্ষুণ্ণ হইবে,—তাহাই ছিল শ্বেতাঙ্গ বণিক্‌সমিতিসঙ্ঘের গত অধিবেশনের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। এই সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে অনুষ্ঠিত হয়; এবং ভারত শাসনযন্ত্রের প্রধান কর্ণধার বড় লাট বাহাদুর ইহার উদ্বোধন-ক্রিয়া সমাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে বড়লাট বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণে প্রায়শঃই গুরু-গম্ভীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ঘোষণা করিতেন। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের সাম্প্রতিক পরিবর্ত্তনে, বর্ত্তমান বর্ষে, এই প্রথার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। বড়লাটের পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান জাতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধানতম পুরুষ, পুরুষ-সিংহ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। এতাবৎকাল রাজনীতি ও অর্থনীতি উভয় ক্ষেত্রেই শ্বেতাঙ্গ বণিক্গণ বিশিষ্ট এবং অযাচিত সুযোগ-সুবিধা এবং প্রশ্রয় ও অধিকার প্রবল ও প্রচণ্ডভাবে উপভোগ করিতেছিলেন। জাতীয় শাসনতন্ত্রের তত্ত্বাবধানে এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটিবে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে শ্বেতাঙ্গ-স্বার্থ-সংরক্ষণ কল্পে যে রক্ষাকবচ (Safeguards) লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইবে। প্রভুত্ব ও বিশিষ্ট অধিকারের অন্যায় ও অসঙ্গত পথ পরিত্যাগ করিয়া, ভারতবাসীর সহিত সম-পর্য্যায়ে সমবস্থিত হইয়া সহযোগিতা সহকারে শিল্প-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে হইবে। জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, কিংবা ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতিকূল কোন সুযোগ-সুবিধা কিংবা অসঙ্গত অধিকার কোন বিদেশবাসীকেই দেওয়া হইবে না। জাতীয় শাসনতন্ত্রের ইহাই মূল ও মুখ্য নীতি। স্বাধীন অথবা স্বায়ত্তশাসনশীল দেশ মাত্রেই এই নীতি অবলম্বিত হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও অকুণ্ঠিত ভাষায় তাহারই অভিব্যক্তি করিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গ বণিক্-সমিতিসঙ্ঘের গত বার্ষিক অধিবেশনে।

রাজনৈতিক সম্পর্ক ব্যতীত, অর্থনীতি-ক্ষেত্রে ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ এতাবৎকাল ছিল, ঔপনিবেশিক দেশের সহিত শিল্পনিষ্ঠ দেশের শোষণ-সংযোগ। পণ্ডিতজী এই শোষণের আখ্যা দিয়াছেন,—ঔপনিবেশিক অর্থনীতি (Conocial economy)। ভারতবর্ষ এই নীতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। শিল্পনিষ্ঠ ইংল্যাণ্ড, প্রভূত পরিমাণে কাঁচামাল উৎপাদনকারী ভারতবর্ষ হইতে, স্বল্পমূল্যে প্রচুর পরিমাণে সর্ব্ববিধ কাঁচা মাল ক্রয় করিয়া, স্বদেশের শ্রম-শিল্প সাহায্যে, তাহাদিগকে পরিণত পণ্যে রূপান্তরিত করিয়া, স্বীয় আয়ত্তাধীন ভারতবর্ষের সংরক্ষিত বিক্রয়ক্ষেত্রে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া প্রভূত পরিমাণে লাভবান্ হইতেছিল। কালের কুটিল পরিবর্ত্তনে এবং পঞ্চবিংশতি বর্ষের ব্যবধানে দুইটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অভিঘাতে, নিখিল জগতের সর্ব্বক্ষেত্রে বিষম পরিবর্ত্তনের ফলে, এই অর্থনৈতিক শোষণ-নীতিরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনুন্নত দেশের জাগরণের প্রভাবে, যথা-সম্ভব স্বদেশের একচেটিয়া সমৃদ্ধি সংরক্ষণার্থ, বহু বৃটিশ শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তি এই দেশে বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া প্রভূত শিল্প-বাণিজ্য পরিচালন করিতেছে। রক্ষাকবচের অন্তরালে এই সকল দৃঢ়প্রতিষ্ঠ পরদেশী শিল্প-স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত। এই সকল রক্ষাকবচ (Safeguards) পক্ষপাতমূলক সুযোগ-সুবিধা (Discriminations) ব্যতীত, অন্য কিছুই নহে। স্বীয় শাসনাধীন দেশে এরূপ শিল্প-প্রচেষ্টা সহজসাধ্য। ভারতে বৃটিশ স্বার্থ ও শিল্প সংরক্ষণের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। স্বদেশের এবং স্বদেশ-বাসীর এই শিল্প-প্রচেষ্টাকে সর্ব্ব প্রকারে সফল করিবার নিমিত্ত বৃটিশ শাসক-সম্প্রদায় ভারতবাসীর আকুল আগ্রহ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সর্ব্বপ্রকারে খর্ব্ব করিয়া, ভারতের স্বদেশী শিল্প ও শিল্পীকে যথাসম্ভব অবনত এবং অনুন্নত রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। যখন জগতের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র জাতীয় শিল্পকে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করিতে সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছিল, ভারতে বৃটিশ সরকার তখন অবজ্ঞা এবং অবহেলা-নীতি (Leisser-faire) দ্বারা সর্ব্ববিধ স্বদেশী-প্রচেষ্টাকে অবনমিত রাখিতে প্রযত্নশীল ছিলেন। জনমতের প্রবল চাপে, মধ্যে মধ্যে কোন কোন ক্ষুদ্র অথবা মধ্যম শ্রেণীর শিল্পকে যৎকিঞ্চিৎ সুযোগ-সুবিধা কিংবা সাহায্য প্রদান করিয়া তাঁহারা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। কোন কোন স্থানে ভারতের সহিত কার-কারবারের সুযোগ-সুবিধার নিমিত্ত ব্যবসায় আমীন (Trade Commissioners) নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ভারতীয় বণিক্-সম্প্রদায় বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে পারে নাই। ঐ সকল আমীনের বার্ষিক বিবরণী প্রায়শঃই বিদ্যালয়ের ছাত্রপাঠ্য পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে কোন প্রকারে কার্য্যকরী হইত না। পক্ষান্তরে, সাম্রাজ্যিক শুল্ক-প্রশমন-নীতির (Imperial Preference) প্রভাবে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রবাহকে বিকৃত পথে পরিচালিত করিয়া তাহার সম্যক্ ও স্বাভাবিক উন্নয়নকে প্রতিহত করিত। গত ভাদ্র মাসের মধ্যভাগে, কেন্দ্রে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, ভারতের কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ভূতপূর্ব্ব আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের অবজ্ঞা ও অবহেলা-মূলক নীতি পরিহার করিয়া, সতেজ ও সক্রিয় সমুন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে, আগামী নববর্ষে, মার্কিণে একটি নিখিল জগতের আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বৈঠক বসিবে। এই

বৈঠক বসিবার পূর্ব্বে বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রান্তর্গত দেশসমূহের একটি ঘরোয়া বৈঠক বসিয়াছিল লণ্ডনে এবং অল্পকাল মধ্যে তথায় সম্মিলিত-জাতি-সমুচ্চয়ের একটি কর্ম্মসূচী-প্রস্তুতকারী বৈঠক বসিয়াছিল। এই বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ উদ্দেশ্যে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার নয়া-দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি লইয়া একটি ব্যবসায়-নীতি-নির্দ্ধারণ-সমিতি আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সমিতির অধিবেশনের উদ্বোধনে জাতীয় শাসনতন্ত্রের প্রথম সুযোগ্য বাণিজ্য-সচিব মিঃ সি, এইচ, ভাবা অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত নূতন নীতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমাদের স্বাভাবিক বিক্রয়-ক্ষেত্র, এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশদ্বয়ে, ভারতীয় শিল্পজাত পরিণত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি ও শুল্ক প্রবর্ত্তন এবং সরাসরি অর্থসাহায্যের দ্বারা আমদানী-শাসন ইহার মূল নীতি হইবে। আমাদের স্বল্প আয় হইতে অনাবশ্যক অকিঞ্চিৎকর বিদেশী পণ্যের আমদানী হ্রাস করিয়া, যাহাতে স্বদেশজাত বহুবিধ কাঁচা মালের সদ্ব্যবহার দ্বারা আমাদের দেশেই নূতন নূতন জাতীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা, এবং চলতি শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে, তাহাই জাতীয়-শাসনতন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার স্থির করিয়াছেন যে, অন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে আমরা এরূপ পরিকল্পনার সমর্থন করিব,—যাহাতে শিল্পে ও ধনসম্পদে অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন দ্বারা, ঐ সকল দেশবাসীর দরিদ্র জন-সাধারণের

জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। মাত্র কতিপয় শিল্পে সমুন্নত দেশের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হেতু নিখিল জগতে নিরঙ্কুশ অবাধ বাণিজ্যের প্রসারে সমগ্র জগতের যথার্থ উপকার ঘটিবে না। অনুন্নতের উন্নয়ন ব্যতীত উন্নতের উন্নতি দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। ব্যবসায়-বৃদ্ধি হেতু মাত্র কতিপয় জাতির ব্যবসা-বৃদ্ধি কখনও মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। যাহাতে নিখিল জগতের সমগ্র জাতির,—বিশেষতঃ শিল্প ও ধনসম্পদে অনুন্নত জাতিগুলির আর্থিক উন্নতি ঘটে এবং তত্রত্য নিঃস্ব জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি হয় এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা ও কর্ম্মসংস্থান (Employment) বৃদ্ধিপরিকল্পনায় ভারত সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিবে। যে সকল অনুন্নত দেশ ও জাতি সমুন্নত দেশ ও জাতিগুলির প্রতি এখনও অসহায় ভাবে নির্ভরশীল, তাহাদিগকে সমুন্নত করিয়া যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার ইহাই মূল মন্ত্র ও মুখ্য উদ্দেশ্য। শিল্পে সমুন্নত জাতির ইহাতে বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক সচ্ছলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিলে, এবং তত্রত্য জন-সাধারণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইলে, স্বদেশজাত দ্রব্যসামগ্রী ব্যতীত, স্বদেশে উৎপন্ন হয় না এমন বহু পণ্য তাহারা শিল্পসমুন্নত দেশসমূহ হইতে স্বেচ্ছায় ক্রয় করিবে, এবং স্ব স্ব দেশে নূতন ও পুরাতন শিল্পের প্রবর্ত্তন ও প্রবর্দ্ধন হেতু শিল্প-সমুন্নত দেশ হইতে বিশেষজ্ঞ শিল্পী কারিগর প্রভৃতিকে সাদরে বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে ফলে নিখিল জগতের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিশ্চিত বিস্তার এবং কর্ম্মসংস্থানের প্রভূত প্রসার ঘটিবে।

বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ-পূর্ব্ব হইতে এবং যুদ্ধ সময়ে প্রবর্ত্তিত, আভ্যন্তরীণ শিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ উপলক্ষ্যে নির্দ্ধারিত বিধি-নিষেধগুলিকে অপসৃত করিয়া, অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্ত্তনই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা-বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই বৈঠকের প্রধান উদ্যোক্তা যুক্তরাষ্ট্র স্বীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করিবার নিমিত্ত কিছুদিন হইতে এই প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছে। কিন্তু শিল্পে ও ধন সম্পদে অনুন্নত দেশের পক্ষে এই নীতি অবলম্বন করা অসম্ভব। আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নতি-প্রচেষ্টার প্রত্যেকটির উপর এইরূপ বিধি-নিষেধ-বিদূরণের কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাহা নিরূপণপূর্ব্বক, ধীরে ধীরে পর্য্যায়ক্রমে এই সকল বিধি-নিষেধ বিদূরিত করিতে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের আপত্তি নাই। কিন্তু যেখানে কোন দেশ-বিশেষের আভ্যন্তরীণ কোন শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন দ্বারা দেশবাসীর কর্ম্ম-সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি-হেতু বিধি-নিষেধের প্রয়োজন ও প্রবর্ত্তন, সেখানে সেগুলিকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে, নতুবা ঐ দেশের অত্যাবশ্যক অর্থ-নৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইবে। যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ কতকগুলি পুরাতন শিল্পের পুষ্টি সাধন, কয়েকটি নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন এবং আরও কয়েকটি নূতন শিল্পের সূচনা করিয়াছিল—যাহাতে চির-দরিদ্র দেশবাসীর যথোপযুক্ত কর্ম্ম-সংস্থান এবং অন্ন-সংস্থান ঘটে; এবং তাহাদের ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধির সহিত তাহাদের জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি ঘটে। এই উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত বিধি-নিষেধ ভারতবর্ষ কোন ক্রমে পরিহার করিতে পারে না; কারণ তাহা হইলে, প্রবল পরাক্রান্ত বৈদেশিক প্রতি-যোগিতার পেষণে তাহার পূর্ব্ব-প্রবর্ত্তিত এবং নব-প্রতিষ্ঠিত দুর্ব্বল শিল্পগুলি অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। বৈদেশিক প্রতি-যোগিতাকে প্রতিরোধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইলে, ভারতের পক্ষে আমদানি-বাণিজ্যকে যথাসঙ্গত ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিরুদ্ধ করিতে হইবে; এবং উৎপাদনের কৌশল এবং প্রক্রিয়াকে উন্নত এবং আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত করিতে হইবে। নিখিল জগতের অর্থ-নৈতিক সম্পদের যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার দ্বারা জন সাধারণের আর্থিক অবস্থাকে উন্নততম করিতে হইলে, সর্ব্বদেশেই যোগ্যতম শিল্পের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এবং এই শিল্পগুলিকে যুক্তি-সঙ্গত সময়ের মধ্যে এরূপ দৃঢ় ও শক্তিশালী করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা অবলীলা ক্রমে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যকর জাতীয়তার সহিত আন্তর্জ্জাতীয়তার কোন বিরোধ ঘটিবে না।

যথাসম্ভব দ্রুত এবং সর্ব্বসমঞ্জস অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হেতু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার সাধারণ শিল্পনীতির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য-নীতির সুসঙ্গত সংযোগ স্থাপন করিবেন। তাঁহারা এরূপ ভাবে আমদানী-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিবেন, যাহাতে আমাদের প্রাপ্য বৈদেশিক বিনিময়ের সম্যক্ কার্য্যকরী সদ্ব্যবহার ঘটে, অথচ আভ্যন্তরীণ শিল্প-গুলির প্রচুর এবং সম্পূর্ণ ফলপ্রদ সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হয়। পক্ষান্তরে তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের বহির্ভূত উদ্বৃত্ত কাঁচামাল এবং পরিণত-পণ্যের নূতন-নূতন বিক্রয়-ক্ষেত্রের অধিকার এবং পুরাতনের প্রসার করিতে প্রয়াস পাইবেন।

বস্তুতঃ; আমদানী ও রপ্তানী—উভয়বিধ ব্যবসায়ের সুনিয়ন্ত্রণই হইবে জাতীয় শাসনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়-নীতি, ভারতীয় শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ বহুদিন হইতে ভূতপূর্ব্ব আমলাতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীকে ভারতের আভ্যন্তরীণ আর্থিক উন্নতির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আবেদন-নিবেদন এবং অনুরোধ-উপরোধ করিয়া যে-সকল শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত অবশ্য প্রতিপাল্য মৌলিক নিয়ম ও নীতির অনুষ্ঠান করিতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার শাসনভার গ্রহণ করিয়াই তাহার আশু প্রবর্ত্তনে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছেন। জাতীয় ও পরদেশী স্বার্থপর শাসনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য এইখানে। এই নীতির সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি হইবে,—একটি সুযোগ্য স্থায়ী ও নিরপেক্ষ শুল্কনির্দ্ধারণ-মণ্ডলী (Tariff Board)। ভূতপূর্ব্ব আমলাতান্ত্রিক সরকার তিন বৎসরের জন্য একটি শুল্কনির্দ্ধারণ-মণ্ডলী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরতি হইতে শান্তি-সংস্থাপন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল কালে যে-সকল শিল্প যুদ্ধকালীন প্রয়াস হইতে স্বাভাবিক শান্তিকালীন উদ্যমে পর্য্যবসিত হইতে বিঘ্ন-বিপত্তির সংঘর্ষে আসিতে পারে, তাহাদিগকে রক্ষণ-শুল্ক কিংবা সরকারী অর্থসাহায্য দ্বারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত করিয়া, সক্রিয় রাখাই এই মণ্ডলী নিয়োগের প্রধান কারণ। এই পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা কতদিন প্রবল থাকিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, স্যার সমুখীন চেটীর নেতৃত্বে এই মণ্ডলী অনেকগুলি শিল্পের পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছেন। এই মণ্ডলী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের অভিঘাতে নিযুক্ত শুল্ক-সংক্রান্ত রাজকীয় তদন্ত-সমিতির (Fiscal commission) নির্দ্দেশ অনুযায়ী শিল্পগুলির পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সাহায্য ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু এই তদন্ত-সমিতি যখন অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার পর পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে; সুতরাং তদানীন্তন অবস্থারও বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উক্ত তদন্ত-সমিতি যে তিনটি মূলনীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন; এখন তাহার বিশেষ উদার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। কিন্তু সে আলোচনার স্থান এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। সংক্ষেপতঃ এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, কোন শিল্পের যুক্তি-সঙ্গত দৃঢ়-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা, যথাশীঘ্র সম্ভব তাহার পক্ষে আত্মনির্ভরশীল হওয়া, এবং ঐ শিল্প জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ অথবা নিরাপত্তার নিমিত্ত সরকারী অর্থ-সাহায্য কিম্বা রক্ষণ-শুল্ক সহায়ে দীর্ঘ দিন পরিচালনা করা কর্ত্তব্য কি-না,—এই তিনটি বিষয়ে অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত আমলাতান্ত্রিক ও জাতীয় শাসনতন্ত্রের দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য।

এই প্রশ্নের সহিত যুদ্ধকালে প্রবর্ত্তিত "শাসন"-বিধির (War-time controls) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যুদ্ধ-পরিচালন সময়ে সামরিক ও অ-সামরিক প্রয়োজনে কোন-কোন শিল্পের উৎপাদন, কোন কোন পণ্যের সর্ব্বোচ্চ অথবা সর্ব্ব-নিম্ন মূল্য-নির্দ্ধারণ, এবং কোন কোন পণ্যের আমদানী কিম্বা রপ্তানী-নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি কয়েকটি "শাসন"-নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে চাহিদা ও যোগানের বৈষম্যে দ্রব্য-মূল্যের ইতর-বিশেষ, এবং বহু ক্ষেত্রে মহার্ঘতা ঘটিয়াছিল এবং অবাধ ব্যবসায়ের কঠোর সঙ্কোচ ঘটিয়াছিল। যুদ্ধের অবসানে, এই-গুলিকে নিরাকৃত করিলে, ব্যবসায়ীর সুবিধা ঘটিত, কিন্তু ক্রেতা ও ভোক্তার (Consumers) পক্ষে বিষম অসুবিধা ঘটিতে পারিত। সর্ব্বসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ইহাদের অনেকগুলিকে যথাসম্ভব শিথিল ও উদার করা হইয়াছে. কিন্তু দ্রুত শিল্প ও ব্যবসায় পরিবর্দ্ধিত করিতে হইলে এখনও ইহাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। পক্ষান্তরে, এই শাসনবিধি-গুলি সুসঙ্গত এবং সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে, প্রভূত অনর্থের সম্ভাবনা। তথাপি শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি প্রসারহেতু ইহাদের কতকগুলিকে স্থায়ী করিতে হইবে। ভারতীয় বণিক্-সমিতির অধিকাংশই এই শাসন-বিধি প্রত্যাহার করিয়া উৎপাদন এবং বিতরণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির নিমিত্ত সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পণ্যদ্রব্যের অভাব-অনটন দূর করিবার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, উভয়-বিধ সরকারের কর্ত্তব্য,—যত শীঘ্র সম্ভব এই বিধি-নিষেধ পরিহার করিয়া যাহাতে দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটে তাহার, ব্যবস্থা করা। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার অবশ্য এই অনুকূল নীতিই অবলম্বন করিবেন।

স্বদেশজাত প্রভূত কাঁচামালকে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত শ্রমশিল্প-পরিণত-পণ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া, ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অংশকে বিদেশে রপ্তানী করিয়া, বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসারবৃদ্ধি,—অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সাধু উদ্দেশ্য। এই অতি সমীচীন সঙ্কল্প সাধনার্থ সাগরপারে বিভিন্ন বিক্রয় ও বিনিময়কেন্দ্রে বাণিজ্য-আমীন (Trader Commissions) নিযুক্ত করিতেছেন। কোন্ কোন ক্ষেত্রে বাণিজ্য-দূত (Trader Missions) প্রেরিত হইতেছে। এইরূপে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য-যোগসূত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের ব্যবসায়-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক প্রচেষ্টা চলিতেছে। বহু সাগরপারের শিল্প-বাণিজ্য-কেন্দ্রে আমাদের সুদক্ষ বাণিজ্য-আমীনের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে মাত্র কয়েকটি কেন্দ্রে এইরূপ আমীন নিযুক্ত হইয়াছে। আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের শৈথিল্যই এ বিষয়ে প্রধানতঃ দায়ী। বাণিজ্য ব্যাপারে অভিজ্ঞ, উপযুক্ত উদ্যমশীল, কর্ম্মপটু আমীন নিযুক্ত হইলে, আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে, এবং আমাদের দেশের শিল্পী, শ্রমিক ও বণিক্ সমিতি প্রচুর পরিমাণে উপকৃত হইবে। সুতরাং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সহিত এইরূপ সুদক্ষ আমীন নিযুক্ত করিতে হইবে। এই বহির্ব্বাণিজ্যের প্রসঙ্গে আমাদের নিজস্ব একটি বাণিজ্য-নৌ-বহর এবং দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত পোতনির্ম্মাণ-শিল্পের আশু প্রয়োজন। বহুদিন পূর্ব্বে অন্ততঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই দুইটি বিষয়ে আমাদের বিশেষ অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের কর্তৃপক্ষের বৃটিশ নৌ-শিল্প ও নৌ-বাণিজ্য স্বার্থের প্রতি তীক্ষ্ণ কৃপাদৃষ্টি হেতু ভারতীয় পোতশিল্প ও পোতবাণিজ্যে প্রযত্নশীল শিল্পী, বণিক ও জনসাধারণের আপ্রাণ

প্রচেষ্টা এবং পুনঃ পুনঃ আবেদন-নিবেদন ও আলোচনা-আন্দোলন নির্ম্মমভাবে নিপীড়িত ও ব্যাহত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, সে পক্ষপাত-দুষ্ট শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান জাতীয় ও অন্তর্ব্বর্ত্তী শাসনতন্ত্র স্বভাবতঃই অন্যান্য বিবিধ ক্ষুদ্র, মধ্যম ও বৃহৎ শিল্পের ন্যায় পোতশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রবৃদ্ধির প্রতি আশু দৃঢ় মনোযোগ প্রদান করিবেন। সম্প্রতি একটি সুবিখ্যাত বৃটিশ পোতনির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানের সহৃদয় সহযোগিতায় ভারতে পোতনির্ম্মাণ প্রাঙ্গণ (Shipyards) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর বিশাখা পত্তনের পোতশিল্প প্রতিষ্ঠানের বিড়ম্বনা সর্ব্বজন-বিদিত। অনন্যমুখী একনিষ্ঠ দৃঢ় অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহারা কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পোতশিল্প-প্রয়াসী বহু শিল্প ও বণিক্ এখন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের আন্তরিক সমর্থন ও সাহায্য লাভ করিবেন। আমাদের বাণিজ্য-নৌবহরের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করা অতীব প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত উপকূল-বাণিজ্যে বিদেশী পোত-বণিকদিগের দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত স্বার্থের বিরুদ্ধে স্বদেশী পোত-বণিক্‌দিগের সম্যক্ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের প্রথম বাণিজ্য-সচিব এ-বিষয়ে বিশেষ আশা ও আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যদি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অতুল ধনসম্পদ্-সম্পন্ন শক্তিশালী দেশের পোত-শিল্প ও পোত-বাণিজ্যের এখনও রাষ্ট্রকর্ত্তৃক সংরক্ষণ ও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভারতের ন্যায় দরিদ্র ও পরাধীন দেশের পক্ষে সে প্রয়োজন কত অধিক,—তাহা সকলেরই বোধগম্য। সুতরাং ভারতের জাতীয় কেন্দ্রীয় সরকারেরও সর্ব্বতোভাবে ভারতীয় পোতশিল্প ও বাণিজ্য সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ অবশ্য কর্ত্তব্য। সম্প্রতি আমেরিকার ওয়াসিংটন নগরে সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয়ের একটি সামুদ্রিক (Maritime) বৈঠক বসিয়াছিল। ঐ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল, একটি বিশিষ্ট পোত সংক্রান্ত গোমস্তা-দপ্তরের প্রতিষ্ঠা এই গোমস্তা দপ্তর (Agency) অবশ্য যথাসময়ে সম্মিলিত জাতি-সমুচ্চয় সংগঠনের শাসনান্তর্গত হইবে। সকলেই জানেন যে, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি শক্তিশালী দেশ সকল সবান্ধব রাষ্ট্র-সাহায্যে এবং শতাধিক বর্ষেরও অধিক কাল নানাবিধ পার্থক্য ও পক্ষপাত-মূলক বিধি-নিষেধ দ্বারা স্ব স্ব নৌ-বহর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এখনও এইরূপ পার্থক্য ও পক্ষপাত-মূলক উপায় এবং রাষ্ট্র-সাহায্যদ্বারা সে গুলি পুষ্ট হইতেছে। এখন শক্তিমান দেশ-সমূহ ধূয়া তুলিয়াছে যে, এইরূপ পার্থক্য ও পক্ষপাত-মূলক উপায় তিরোহিত করিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে নিখিল জগতের বাণিজ্য অবাধে প্রয়োজনমত জাহাজে মাল বহন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বৃটিশ নৌবহরের কঠোর সংগ্রাম অযথা জাহাজের মাশুল কমাইয়া বৃটিশ পোত-প্রতিষ্ঠানগুলি কিরূপে দুর্ব্বল ভারতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলির কণ্ঠরোধ করিয়াছিল সে ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত। ভবিষ্যতে যদি এইরূপ অযথা মাশুল হ্রাস করিবার নিমিত্ত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে দুর্ব্বল ও নূতন ভারতীয় পোত-প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষজ্ঞ গোমস্তা-দপ্তরের নিরপেক্ষতার অজুহাতে কোন প্রকার প্রতিকূলতার প্রতিকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। এইরূপ প্রশ্ন তাহাদের বিচার-বিবেচনা বহির্ভূত হইবে। সুতরাং ভারতের ন্যায় পোত-শিল্প ও পোত-বাণিজ্যে অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে অবাধ-বাণিজ্য ও পার্থক্যমূলক উপায় বর্জ্জনের নীতি আত্মঘাতী হইবে। সর্ব্বজাতি কর্ত্তৃক স্বীকৃত এই নীতির দোহাই দিয়া পোত-শিল্পে ও পোত-বাণিজ্যে অনুন্নত ও নিগৃহীত দেশগুলিকে সংরক্ষণ সাহায্য দিতে অস্বীকার করিবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া ভারত তাহার ভবিষ্যৎ পোত-শিল্প ও পোত-বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসারের প্রয়াস-প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিয়া জাতীয় অর্থনীতি ও নিরাপত্তা বিপন্ন করিতে পারে না। ভারতকে এখন প্রচণ্ড উদ্যমে তাহার বাণিজ্য ও রণ পোত-বহরকে পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিতে হইবে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা দূরে থাকুক, উপকূল বাণিজ্যেও ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অংশ অতি অল্প। ভারতের পোত-সম্পদের বর্ত্তমান মাত্রা লক্ষ টন মাত্র। অথচ সাত বৎসর পূর্ব্বে পোত-সংক্রান্ত নীতি-নির্দ্ধারক সমিতি ভারতের আশু লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন কুড়ি লক্ষ টনে নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া এবং যে সকল দেশ বিক্রয় করিতে পারে তাহাদের নিকট হইতে বাণিজ্য-জাহাজ ক্রয় করিয়া এই সমষ্টি পরিপূরণ করিতে হইবে। সম্প্রতি মার্কিন হইতে এগারখানি জাহাজ ক্রয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং পোতসংক্রান্ত ব্যাপারে অবাধ বাণিজ্য কখনও ভারতের অবধারিত নীতি হইতে পারে না। এক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতিই প্রতিপাল্য।

আত্মশক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি ব্যতীত আত্মসংরক্ষণ অসম্ভব এবং আত্মসংরক্ষণ ব্যতীত, আন্তর্জ্জাতিক মহলে প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অসম্ভব। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ; কিন্তু একমাত্র কৃষির উৎকর্ষ দ্বারা কোন দেশের সম্পদ্-সমৃদ্ধি স্থায়ী ভাবে বৃদ্ধি করা যায় না। এই নিমিত্ত কৃষির উন্নতির সহিত সর্ব্বপ্রকার দেশ ও কাঁচা মালকে স্বদেশী-শিল্পে পরিণতপণ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। তাহা হইলে দেশের শ্রমিক, শিল্পী ও বণিক্ এবং তাহাদের মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়া, তাহাদের দীন-হীন জীবন-যাত্রার ধারা ও মান উন্নতি লাভ করে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বাগ্রে প্রতি দেশের আভ্যন্তরীণ কৃষি-শিল্প ও ব্যবসায়বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধি করিতে হয়। শিল্পে অনুন্নত দেশ-মাত্রের পক্ষেই এই নীতি অবলম্বন অপরিহার্য্য। অন্যান্য শিল্পে-সমুন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারত কৃষি-শিল্পে অত্যন্ত অবনত। সুতরাং ভারতের আভ্যন্তরীণ কৃষি-শিল্পের উৎকর্ষ সাধন সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন এবং সেজন্য সংরক্ষণ-শুল্ক-নীতির অবশ্য প্রয়োজন। তাই বলিয়া আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারত সর্ব্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন কূপমণ্ডূক-বৃত্তি অবলম্বনের আদৌ পক্ষপাতী নহে, কিংবা এরূপ কোন নীতি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহে, যাহাতে অন্য কোন জাতি বা দেশের বিরোধিতা ঘটিতে পারে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ক্ষেত্রে ভারত কখনই একাভিমুখীন গতি অবলম্বন করিতে পারে না। ভারত বহুপক্ষীয় ব্যবসায়ে (Multileteral Trading) দৃঢ়রূপে আস্থাবান্; এবং যে-সকল জাতি বা দেশ ন্যায় ও নীতি-সঙ্গত

ভাবে তাহার সহিত কার-কারবার চালাইতে সমুৎসুক. তাহাও তাহাদের সহিত যুক্তিযুক্ত ভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু আগামী দশ বিশ বৎসর ভারতকে একনিষ্ঠ ভাবে আভ্যন্তরীণ আর্থিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিহেতু তাহার দেশাভ্যন্তরস্থ সর্ব্বপ্রকার সম্ভব ও সম্ভাব্য কৃষিশিল্পের বৃদ্ধি ও বিস্তার সাধন করিতে হইবে এবং এই নিমিত্ত তাহার শুল্ক-নীতি রাজস্ব-মূলক না হইয়া, সংরক্ষণমূলক হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ভারতের বহির্বাণিজ্য যথাসম্ভব রাষ্ট্রশাসনে থাকাই শ্রেয়ঃ। আমদানী-রপ্তানী-লাইসেন্স প্রথারও এই নিমিত্ত প্রয়োজন আছে। এই কারণে বৈদেশিক বিনিময় প্রকরণের উপরও রাষ্ট্রের অক্ষুণ্ণ প্রভাব বাঞ্ছনীয়। অমুদ্রিত স্বর্ণরৌপ্য-পিণ্ডের মূল্য-নিয়ন্ত্রণও রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য; কারণ, ভারত স্বর্ণরৌপ্যের একটা বড় ক্রেতা; এবং এই হেতু এই দুইটি মূল্যবান্ ধাতুর মূল্যমানের উপর তাহার প্রভাব প্রচুর।

বহির্বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের অক্ষুণ্ণ প্রভাব বাঞ্ছনীয় হইলেও, কিন্তু তাই বলিয়া জাতীয়করণের নামে, ভারতের সমগ্র অর্থ-নীতিকে রাষ্ট্রপরিচালনাধীন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। ভারতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সর্ব্বসাধারণের সহযোগিতামূলক এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ও পরিচালনার বিচারসঙ্গত সংমিশ্রণই প্রকৃষ্ট পন্থা। কতিপয় শিল্পের দ্রুত জাতীয়করণ সর্ব্বতোভাবে কাম্য, কিন্তু আমাদের দেশে এখনও প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ পারদর্শী লোকের অভাব। অধিকন্তু বর্ত্তমান ধারায় ভারতের সমগ্র অর্থনীতিকে আমলা-তন্ত্রীকরণও (Bureaucratisation) সঙ্গত নহে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে আহার্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভারের উৎপাদন দ্রুত প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করা অতীব প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতি পরিবর্ত্তনের এই সন্ধি-সঙ্কট কালে, সমগ্র অর্থ-নৈতিক সংগঠনের আমূল পরিবর্ত্তন, কিংবা পুনর্গঠন, যুক্তিসহ নহে। রাজনীতিক্ষেত্রে রাষ্ট্র সর্ব্বে-সর্ব্বা—সন্দেহ নাই; কিন্তু অর্থ-নীতি ক্ষেত্রে সেরূপ একাধিপত্য ক্ষেমঙ্কর নহে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজির অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনার উল্লেখ অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার অছিগিরির অর্থনৈতিক বিজ্ঞান (Economiphilosophy of trusteeship) সমর্থনযোগ্য। কিন্তু প্রয়োজন, কার্য্যসম্পাদন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী পুরস্কারের ভিত্তিতে সংগঠিত প্রণালী বন্টনেরও দোষ-ত্রুটি অনেক। আধুনিক অঙ্গিক (Technique) অনুযায়ী ধনপতি শাসিত প্রণালীতে উৎপাদন-নৈপুণ্যের সুযোগ-সুবিধার সহিত সাম্যবাদ-নীতির বিধিবিধান সম্মত উপযুক্ত সেবা-প্রদানের সমঞ্জস সংযোজনা অসম্ভব নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্ম-সামর্থ্যের সীমা অনুযায়ী তাহার সম্ভবযোগ্য উন্নতির সুযোগ-সুবিধা প্রদান-রীতি প্রবর্ত্তিত করিলে, এমন একটি সামাজিক শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করা যায়, যাহা সম্পূর্ণরূপে ন্যায় ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। বহির্জ্জগতের রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের সহিত ভারতের জাতীয় ভাবধারা এবং নিজস্ব সম্পদ-সামর্থ্যের সমঞ্জস সম্মিলন সহায়ে, আমাদিগকে দৃঢ় অনুশীলন ও অধ্যবসায়-সহকারে জাতীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া আন্তর্জ্জাতিক বৈচিত্র্যের অনুসরণ করিতে হইবে। পরস্ব ভাবধারা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও আদর্শ-আকাঙ্ক্ষার অন্ধ অনুকরণ কোন দেশ বা জাতির আচরণীয় নহে। জাতীয় ঐতিহ্য ও সম্পদ সামর্থ্যের এবং স্বদেশের মাটি ও আবহাওয়ার অনুকূল উত্তম ও উন্নতি সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র বাঞ্ছনীয়। মার্কিনের রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান যথার্থই বলিয়াছেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা সশস্ত্র সৈন্যের প্রতি ততটা নির্ভর করে না, যতটা নির্ভর করে অটুট-অর্থনীতি, উন্নতিশীল কৃষি; সন্তুষ্ট এবং উৎপাদনক্ষম শ্রমিক এবং শিল্পপ্রচেষ্টার সমাসঞ্জনের উপর। আধুনিক জগতে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার স্থান নাই। জাতীয় স্বার্থের অনুকূল, আন্তর্জ্জাতিক পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানবমণ্ডলীর কল্যাণসাধনোপযোগী কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের সংসৃষ্টি ও সম্প্রসারণ লক্ষ্যে রাখিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আত্মসামর্থ্যে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, আন্তর্জ্জাতিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব অসম্ভব।

আহ্বান

শ্রীসুনীতিকুমার বসু

ওরে ও তরুণদল,
উড়িয়ে গগনে মুক্তি-নিশান
চল্ রে এগিয়ে চল্।
তোরাই দেশের প্রাণ,
তোরাই ফিরিয়ে আনবি যে ফের
দেশের লুপ্ত মান।
ছুট্‌বি তোরা সূর্য্যালোতে
ভাসবি সবে প্রাণের স্রোতে

গাইবি তোরা গান
ঘুম ভাঙানী গান
রুদ্ধ কপাট ভাঙ্‌বে তবেই
জাগ্‌বে দেশের প্রাণ।
ওরে ও তরুণদল,
দেশের সেবায় আপ্‌নাকে আজ
বিলিয়ে দিয়ে চল্,
চল্ রে এগিয়ে চল্।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম-এ, বার-এট-ল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'হুঁ' বলে শুধালাম "পিসিমা কোথায় ?"

যমুনা বোধ হয় ভয় পেয়ে গেল। শুধাল "কেন ভাই ?"

সে-কথার কোনও জবাব না দিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। পিসিমা সামনে উঠানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। যমুনাও আমার পিছনে নেমে এল আমার সঙ্গে, কিন্তু যমুনার দিকে না চাইলেও বুঝতে পারছিলাম যে ভয়ে তার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে।

বেশ চেঁচিয়ে বললাম "পিসিমা যমুনার বরাত সত্যিই খুব ভাল। পাত্রটীর সঙ্গে দাদার আলাপ হয়েছে। দাদা বলেন—চমৎকার লোক, বিয়ের পরে আহ্লাদে যমুনার মাটীতে পা পড়বে না। এখন দেরী না ক'রে যত শীঘ্র পার, বিয়েটার ব্যবস্থা করে ফেল।"

সেইদিনই রাত্রে দাদা আমাকে ডেকে শুধালেন, "যমুনার বিয়ে কবে ?"

বললাম, "ফাল্গুন মাসে না হয় বৈশাখ মাসে নিশ্চয়ই। আজ সকালে পিসিমাকে গিয়ে তাড়া দিয়ে এসেছি।"

দাদা একটু হেসে বললেন, "তোর মত যে একেবারে ঘুরে গেল ?"

বললাম "তা ভেবে দেখতে গেলে এর চেয়ে ভাল হয়ত যমুনার হ'ত না।"

দাদা বললেন, "বয়স যে চল্লিশের কাছাকাছি।"

বললাম, "তা তুমিই ত' বললে যে, তা'সত্ত্বেও সুখী হ'তে পারে। আমি ত কিছুতেই বুঝতে পারি না।"

দাদা বললেন, "তুই কিছুতে বুঝতে পারবি না তা জানি। তুই হলে, এ-বিয়ে ভেঙ্গেই দিতাম।"

দাদার চোখে-মুখে সমস্ত ক্ষণ একটা চাপা হাসি মাখান ছিল।

যমুনার বিয়ে আগেই হয়ে গেছে—ক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেল। পরীক্ষা সামনে, তাই যমুনার বিয়েতে প্রাণ ভরে আনন্দ করা হয়ে ওঠেনি। মনের ভিতরেই আমার ছিল বাধা। সেই সময়টা পরীক্ষার দরুণ মনটা আমার সব সময়ই এত ভারি হয়ে থাকত যে তাকে নিয়ে হালকা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠা আমার পক্ষে তখন অসম্ভব। যাই হোক, তবুও বিয়ের কোনও অনুষ্ঠানেই যোগ দিতে ত্রুটী করিনি।

দাদা যাই বলুন, যমুনার বরকে দেখে আমার কিন্তু ভাল লাগেনি। চেহারাটা যে খুব খারাপ তা' নয় এবং দাদা এদিক দিয়ে ঠিকই বলেছিলেন। যদিও কালো, তবুও মুখের মধ্যে একটা বুদ্ধির দীপ্তিতে মুখখানার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে এবং দেখলে ভালই লাগে। বয়সটা যে একটু বেশী সেটাও যে চেহারা দেখলে মনকে খুব পীড়া দেয় তা নয়। কথাবার্ত্তা কমই বলেন এবং যা বলেন তার মধ্যেও একটা ভার আছে এ-কথাও মানি। কিন্তু সেই পর্য্যন্ত। আর ত' কিছু পেলাম না। আর যে কি চাই, সে বিষয় আমার ধারণা যে খুব সুস্পষ্ট তা বলতে পারি না, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার দরুণ এদিক দিয়ে মনকে যাচাই করে দেখবার ফুরসুৎও ছিল না তখন আমার। যাই হোক, এক কথায় ভাল লাগেনি এবং যমুনার যেন এর চেয়ে ভাল বর হওয়াই উচিত ছিল।

যমুনাকে কিন্তু ফুলশয্যার পরের দিন সকাল বেলা দেখেই মনে হ'ল যে, তার আনন্দ যেন আর ধরে না। আমাকে একটু নিরিবিলি পেয়েই আমার গায়ে চলে পড়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "খাসা মানুষটী—না ভাই ?"

বললাম "তোর ভাল লাগলেই ভাল।"

একটু যেন অবাক হয়ে শুধাল "কেন, তোর ভাল লাগেনি ?"

বললাম, "আমার ভাল লাগাটা কি খুব বড় ক'রে জাহির করা উচিত—বিশেষতঃ তোর কাছে ?"

হেসে বললে, "জানি, তোরও ভাল লাগবে। কি মধুর কথাবার্ত্তা। কেমন মিষ্টি করে--"

বললাম, "কি হঠাৎ চুপ করলি যে ?"

সলজ্জ ভাবে বললে, "বাঃ। তোর সঙ্গে অ'র বাজে বকতে পারি না।"

একটু হেসে বললাম, "তোর কাজের কথা যে তোলা আছে রাত্রের জন্য তা জানি। আমার সঙ্গে এখন না হয় বাজে কথাই একটু বল।"

বললে, "কি শুনতে চাস ?"

বললাম, "ঐ-যে; কেমন মিষ্টি করে—তারপর ?"

বললে, "আহা! যেন বুঝতে পারেন নি ?"

বললাম, "কি করে বুঝব বল। এখনও ত তোর মতন মিষ্টি মানুষ নিয়ে ঘর করিনি।"

"ওঃ! হিংসে হচ্ছে বুঝি"—এই বলে যমুনা নিজের আনন্দেই হেসে গড়িয়ে গেল। যমুনার এত খানি আনন্দে মনটা যে আমার বিশেষ খুসী হয়ে উঠল তা বলতে পারি না। এত অল্পেই এত উৎফুল্ল হওয়াটার মধ্যে কেমন যেন একটা দৈন্য আছে—আমার ভাল লাগেনি।

যাই হোক প্রবেশিকা পরীক্ষা সামনে, যমুনার বিষয় দিনকয়েক প্রায় ভুলেই গেলাম। প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে যখন যমুনার বিষয় বিশেষ করে মনে হ'ল ত'ন যমুনা শ্বশুর-বাড়ী। তার মার কাছে শুনলাম যমুনা বাপের বাড়ী খুব কমই আসে এবং শীঘ্র আসার কোনও সম্ভাবনাই নাই।

তিনি বললেন, "নিজের রাজধানীতে রাজরাণী হয়ে সুখে শান্তিতে থাকুক, সেই ভাল—নাই বা এলো বাপের বাড়ী। সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নেই।"

কিন্তু আমার মনের দিক দিয়ে যমুনাকে এখন প্রয়োজন। প্রবেশিকা পরীক্ষার দরুণ মনের উপর যে একটা ভার দিনরাত বহন করে নিয়ে বেড়িয়েছি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভার হঠাৎ গেল নেমে। শুধু তাই নয়, মনটা সহসা এত হালকা হয়ে উঠল যে, তাকে স্থির করে ধরে রাখা যেন অসম্ভব—সুস্থহয়ে কোথাও দুদণ্ড বসি না। সকাল থেকে উঠে এঘর ওঘর করে বেড়াই—যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছি। পরীক্ষার পড়াশুনার সেই নিদারুণ চাপের পর দায়িত্বহীন কিছু না করার নেশা আমাকে যেন পেয়ে বসেছে—সেই নেশায় মশগুল হয়ে খাসা আনন্দে আছি। সন্ধ্যার পরে দাদার ঘরে গিয়ে বসি, খানিকক্ষণ দাদাকে পাওয়া যায়—নানান কথাবার্ত্তায় সময়টা বেশ কাটে—যা করি তাই যেন ভাল লাগে।

মেজ বৌদি'কে পাওয়া যায় রাত্রে শোবার সময়, হালকা মন নিয়ে এ কথায় ও কথায় শোয়াটা মধুর হয়ে ওঠে। থেকে থেকে মেজবৌদির বাচ্চাটাকে নিয়ে অকারণ আদর করি। বড়বৌদি অবশ্য আছেন এ বাড়ীতে কিন্তু তাঁর বা তাঁর মেয়েদের সঙ্গে আমার যোগ বিশেষ নেই। বড়বৌদির বড় মেয়েটা, নাম হৈমন্তী—দাদা হিমু বলে ডাকেন—বছর পাঁচ বয়স হ'ল, দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে। তাকে মাঝে মাঝে আদর করবার চেষ্টা করি, কিন্তু মেয়েটার কেমন স্বভাব, কাছে আসা ত' দূরের কথা আমাকে দেখলেই ছুটে পালায়—যেন আমি তাকে ধরে খেয়েই ফেলব। যাই হোক তাতে আমার বিশেষ কিছু এসে যায় না। তবে যমুনাটা এ সময় থাকলে আমার এই বন্ধনহীন আনন্দে যেন ষোল কলা পূর্ণ হ'ত।

একদিন দাদাকে বললাম, "দাদা, চলনা একদিন যমুনার শ্বশুরবাড়ী বেড়াতে যাই।"

দাদা বললেন, "পটলডাঙ্গায়—না ?"

বললাম, "হ্যাঁ, চল না আমাকে নিয়ে। দেখে আসি যমুনা কেমন ঘরকন্না করছে।"

বললেন, "বেশ ত। এই রবিবার দিন বিকেল বেলা যাওয়া যাবে।"

রবিবার বিকেলে কিন্তু যাওয়া হ'ল না। কেন, সে ব্যাপারটা এবার বলি।

* * *

বাবা ইদানীং অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এখনও অবশ্য হেঁটে বেড়াতে পারেন না, কিন্তু ধরে বালিশ সাজিয়ে বিছানায় বসিয়ে দিলে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারেন, কোনও কষ্ট হয় না। বেশীর ভাগ ইদানীং সেই ভাবেই বসে থাকেন। মুখের চেহারাও এখন অনেকটা ভাল।

কিন্তু বাবার মনের দিক দিয়ে একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে—কোনও উত্তেজনা বা অস্থিরতা একেবারে সইতে পারেন না, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ভীষণ খারাপ হয়ে ওঠে। এই কিছুদিন আগে বৌদির বড় মেয়েটা হঠাৎ একদিন সকাল বেলা ভেদ-বমি করে অজ্ঞানের মত হয়ে গেল। বেশীক্ষণ অবশ্য সে অবস্থা ছিল না, ডাক্তার আসার আগেই সুস্থ হয়ে উঠল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বাবাকে নিয়ে বাড়ীতে হুলুস্থুল। বাবার সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগলো এবং মুখের চেহারা দেখে কারুরই বুঝতে দেরী হ'ল না যে তিনি একটা বিশেষ কষ্ট অনুভব করছেন। যে ডাক্তারটীকে দাদার বড় মেয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল, তিনি বাবাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং প্রায় ঘণ্টা দুই বাবার ঐ অবস্থা ছিল। অনেক পরিচর্য্যার পর

বাবা একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়লে সবাই নিশ্চিন্ত হ'ল। ডাক্তারের কড়া হুকুমে তিন দিন বাবাকে একেবারে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, উঠে বসতে দেওয়া হয়নি। তারপর থেকে বাবার মনে কোনও রকম উত্তেজনা বা অস্থিরতা একেবারে না হয়, সেদিকে বাড়ীর সকলেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলে।

যে রবিবার দিন বিকেলে যমুনাদের বাড়ীতে যাওয়ার কথা, সেইদিন বেলা ৩টার সময় আমি বাবার ঘরের পিছনের বারান্দায় মেজেয় বসে মেজবৌদির বাচ্চাটাকে ঝিনুক বাটীতে দুধ খাওয়াচ্ছিলাম। বাচ্চাটা দুধ খাওয়াবার সময় ভারি গোলমাল করে এবং এ বাড়ীতে একমাত্র আমিই তাকে সামলে দুধ খাওয়াতে পারি—আর কেউ পারে না। কেন জানি না, আমার কোলে শুয়ে দুধ খেতে তার বিশেষ আপত্তি নেই, কারণ বোধ হয়, নানান ছড়ায় কথায় তাকে ভুলিয়ে রাখার ক্ষমতা তার মার চেয়েও আমার বেশী! এমনও হয়েছে যে দাসুর মা, এমন কি তার মাও তাকে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করলে, শেষ পর্য্যন্ত হাত-পা ছুঁড়ে কেঁদে 'পিছি' 'পিছি' ডাকতে সুরু করে। আমার কোলে শুয়ে দুধ খেতে তার কেবল একটা মাত্র সর্ত্ত—দুধ খাওয়াবার সময় কোনও একজনকে তার পা দুটো ধরে থাকতে হবে। আমি দুধ খাওয়াবার সময় সাধারণতঃ এ কাজটা দাসুর মাই করে।

দাদার সঙ্গে ঠিক হয়েছিল যে, আমরা বেলা চারটে সাড়ে চারটের সময় যমুনাকে দেখতে পটলডাঙ্গায় রওনা হ'ব। বাচ্চাটাকে দুধ খাইয়ে তার মার কাছে দিয়ে আমি চারটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নেব—এই আমার ঠিক। দুধ খাওয়াচ্ছি এমন সময় আমাদের দরোয়ান দু'খানা চিঠি নিয়ে উপরে উঠে এল। চিঠি দুখানা দরোয়ানের হাত থেকে নিয়ে দেখলাম দু'খানাই বাবার—দরোয়ান বাবার ঘরে নিয়ে গেল।

দুধ খাওয়ান শেষ করে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় বাবা ডাকলেন "বুলা"।

বাবার গলা শুনেই বুঝতে পারলাম কিছু একটা যেন ঘটেছে. কেননা, বাবার গলাটা একটু ভারি বলে মনে হল। তাড়াতাড়ি বাবার ঘরে গিয়ে শুধালাম, "কি বাবা?"

বললেন, "বিনু বাড়ীতে আছে? তাকে এখুনিই একবার ডেকে পাঠাও।"

বললাম "দাদা বাড়ীতেই আছেন। কেন বাবা শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে না ত?"

বললেন, "না বিনুকে দু' একটা কথা বলব।"

বাচ্চাটাকে দাসুর মার কোলে দিয়ে নিজে ছুটে নীচে গেলাম দাদাকে ডাকতে। দাদাকে নিয়ে উপরে এসে ঢুকলাম বাবার ঘরে।

বাবা বললেন, "বস।"

তারপর দাদার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, "পড়ে দেখ।"

দাদা চিঠিখানা পড়ে বাবার দিকে চেয়ে বললেন, "মুকুন্দ দাদা মারা গেলেন।"

একটু চুপ করে থেকে বাবা ধীরে ধীরে বললেন, "হ্যাঁ। মুকুন্দখুড়ো আর ইহ জগতে নেই। এত কালের একটা লোক চলে গেলেন।"

দাদা বললেন, "তা, বয়স ত যথেষ্ট হয়েছিল—বোধ হয় আশীর উপর।"

বাবা শুধু একটা 'হ্যাঁ' বলে চুপ করে রইলেন।

দাদা বললেন, "শরীর কিন্তু ভালই ছিল। হঠাৎ কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে মারা গেলেন—হার্ট নিশ্চয়ই খারাপ ছিল।"

বাবা বললেন, "অত বয়সে ত হার্টের জোর কমেই যায়। যাওয়ার সময় হয়েছিল, তাই গেলেন।"

দাদা শুধালেন, "তা আমাদের ত অশৌচ হল—না?"

বাবা বললেন, "তোমাদের ইচ্ছে হয় পালন করতে পার, এমন কিছু বাধ্য-বাধকতা নেই।"

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। বাবার মুকুন্দ খুড়োকে সেই একবার দাদার বিয়ের সময় দেখেছিলাম আর কখনও দেখিনি। তাই তাঁর মৃত্যুটা আমার মনের দিক দিয়ে এমন কিছু একটা বড় ব্যাপার নয়। যমুনাদের বাড়ী যাওয়ার জন্য মন তখন আমার উৎসুক—ভাবলাম এইবার দাদা উঠে পড়লেই হয়। দাদার গা টিপে চুপি চুপি ইসারায় বললাম, "দাদা—চল।"

বাবা সে ইসারা দেখতে পেয়েছিলেন কিনা জানি না—দাদাকে শুধালেন, "তুমি কি কোথাও বেরুবে না কি?"

দাদা যদি—"হ্যাঁ" বলে উঠে দাঁড়ান, তাহলেই সব সোজা হয়ে যায়। দাদা কিন্তু "হ্যাঁ" বলা দূরের কথা, গম্ভীর ভাবে বললেন "না"।

অবাক্ হ'লাম। মনে মনে বোধহয় দাদার উপর একটু রাগও হল। সোজা শুধালাম, "তুমি আজ যমুনাদের বাড়ী যাবে না দাদা?"

দাদা বললেন, "আজ থাক। আর একদিন যাওয়া যাবে।"

দাদার মতলব কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

একটু পরে বাবা বললেন, "তোমার সঙ্গে কতকগুলো কথা ছিল।"

কৌতূহল হ'ল। দাদার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। বাবা একটু চুপ ক'রে আছেন, দাদা শুধালেন, "বুলাকে এখান থেকে যেতে বলব?"

বাবা বললেন, "না, থাক না। বলছিলাম এইবার ত জমিদারীর দিকে একটু নজর দেওয়ার দরকার, নইলে ত অবস্থা ক্রমেই অচল হয়ে উঠবে।"

দাদা চুপ করে বসে আছেন, বাবাই বলে যেতে লাগলেন, মুকুন্দখুড়ো বেঁচে ছিলেন, তা সত্ত্বেও আমাদের পাওনা টাকা সব ঠিক পেতাম না। যা পাওয়া যেত তাও তিনি বেঁচেছিলেন বলে, এবং—তাঁরই চেষ্টায়—তাঁর একটা আন্তরিক টান ছিল আমাদের প্রতি। এবার ত' শশাঙ্কর কাছ থেকে আর কিছুই সহজে আদায় হবে না। কি করে চলবে সংসার?"

শশাঙ্ক মুকুন্দ দাদার ছেলে, গ্রামে থেকে সেই জমিদারী দেখে এবং আমাদের পাওনা টাকা-কড়ি পাঠাতে সে বাকি চিরদিন নানা গোলমাল করে, মুকুন্দদাদার জন্যই ঠিক পেরে ওঠে না—এ সব কথা আমি আগেই শুনেছি। একটু চুপ করে থেকে আবার বাবা বললেন, "এই ত' সেদিনও মুকুন্দখুড়োকে চিঠি লিখে তাগাদা দিতে হয়েছে। শশাঙ্কর কাছে চিঠি লিখে ত কোনও লাভ নেই—নানান ছুঁতো দিয়ে লম্বা জবাব দেবে—ফল কিছুই হবে না।"

একটু চুপ করে থেকে দাদা বললেন, "তা দেখে-শুনে একজন ভাল ম্যানেজার রাখা যাক—সেই আমাদের দিকটা দেখবে।

বাবা বললেন, "শশাঙ্ক যে রকম চতুর লোক, নতুন ম্যানেজার গিয়ে সহজে যে কিছু করে উঠতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস নয়। শুনেছি যে রকম একটার পর একটা মহল শশাঙ্ক হাত করে ফেলেছে—নতুন ম্যানেজার গেলে হয় তার কথা অনুসারে তার পদানত হয়ে চলতে হবে, নতুবা কোনও আমলই পাবে না।"

দাদা বললেন, "তা ওদের সঙ্গে ত আমাদের মহল এক নয়, সবই ত আলাদা।"

বাবা বললেন, "তা হোক, কিন্তু শশাঙ্কই ত আমাদের পক্ষ থেকে বরাবর দেখা-শুনা করে এসেছে।"

দাদা বললেন, "সেইটেই ভুল হয়েছে। শশাঙ্ক-খুড়োর ভাবটা ত অনেকদিন আগে থেকেই বুঝতে পারা গেছে।—তাঁর হাত থেকে আমাদের জমিদারীর তত্ত্বাবধান অনেকদিন আগেই তুলে নেওয়া উচিত ছিল।"

একটু চুপ করে থেকে বাবা বললেন, "আমার শরীর ত চিরদিনই খারাপ। তাই কিছুই করে উঠতে পারিনি। আমি নিজে গিয়ে গ্রামে বসে জমিদারী দেখা-শুনা করতে পারতাম—তাহলে অবশ্য সর্ব্বদিকই রক্ষা হ'ত। শশাঙ্কর উপর নতুন ম্যানেজার বসিয়ে দিলে কোনও সুফল হ'বে বলে আমার বিশ্বাস নয়। আর মুকুন্দখুড়ো বেঁচে থাকতে শশাঙ্কর সঙ্গে একটা বিবাদ করে মুকুন্দখুড়োর মনে কোনও কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছাও আমার আদৌ ছিল না।"

দাদা শুধালেন, "এখন তা'হলে কি করা উচিত?"

আমি চুপ করে বসে সব কথাই শুনছিলাম। জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে এর আগেও দাদার সঙ্গে বাবার অনেকবার কথাবার্ত্তা হয়েছে এবং আমি উপস্থিত থাকলে বেশ মনোযোগের সঙ্গেই শুনেছি—কখনও সেখান থেকে উঠে যাইনি। কেন জানি না, এসব কথা শুনতে আমার বরাবরই ভাল লাগে—দু'একটা কথা বলতেও যে ইচ্ছে না করে, তা নয়।

দাদার প্রশ্নের উত্তরে বাবা যখন চুপ করে আছেন, তখন আমি বললাম, "তা দাদা, তুমিত গ্রামে গিয়ে মাঝে মাঝে জমিদারী দেখাশুনা করতে পার।"

দাদা একটু হেসে, আমার দিকে চাইলেন। যেন সে হাসির অর্থ হচ্ছে—"আসল কথাটা এইবার তুইই বলে ফেললি।"

পরে বললেন, "তা আমি কি শশাঙ্কখুড়োর সঙ্গে এ-সব ব্যাপারে পেরে উঠব?"

বাবা বললেন, "পেরে ওঠা-উঠির কথা ঠিক নয়। এবং শশাঙ্কর সঙ্গে একটা স্পষ্টাপষ্টি বিবাদ হয়—এও আমার ইচ্ছে নয়; আমাদের ন্যায্য অধিকার আমরা নিজেরা গিয়ে যদি দাবী করি, শশাঙ্ক বাধা দিবে কেমন করে? অবশ্য প্রথমে গিয়ে নিজেদের জমিদারীর অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নিতে হবে।"

দাদা বললেন, "তা তুমি কি করতে বল?"

একটু চুপ করে থেকে বাবা বললেন, "চিঠিতে ত দেখেছ মুকুন্দখুড়োর শ্রাদ্ধে যাওয়ার জন্য শশাঙ্ক আমাদের বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছে। আমার মনে হয়, এই উপলক্ষ্যে তোমায় গ্রামে গিয়ে দিনকতক থাকা উচিত। জমিদারীর অবস্থাটা সদরে যতটা পার বুঝে নিয়ে যদি প্রয়োজন হয় বজরার বন্দোবস্ত ক'রে মহল-গুলোয়ও একবার ঘুরে আসবে। আমরাই যে আসল মালিক এ-কথাটা আমলা, কর্ম্মচারী ও প্রজারা বোধ হয় এতদিনে ভুলেই গেছে।"

দাদা বললেন, "এসব করতে গেলেই ত শশাঙ্কখুড়ো অসন্তুষ্ট হবেন।"

বাবা বললেন, "মনে মনে যদি অসন্তুষ্ট হয়, তার আর উপায় কি। তুমি যদি কিছুদিন থেকে, দেখে-শুনে, শশাঙ্কর সঙ্গেই একটা ব্যবস্থা করে এস এবং এটাও যদি শশাঙ্ককে বুঝিয়ে দিয়ে আস যে, তুমি মাঝে মাঝে এসে জমিদারী দেখাশুনা করবে—তা'হলেই

টাকাকড়ি পাঠাতে শশাঙ্ক আর বিশেষ কোন গোলমাল করবে বলে মনে হয় না। শশাঙ্ককে অবশ্য একটু বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তার কর্ত্তৃত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা তোমার উদ্দেশ্য নয়, তবে তুমিও জমিদারীর কাজ-কর্ম্মের উপর নজর রেখে শিখে নিতে চাও।"

দাদা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। একটু পরে আমি বললাম, "এ ত বেশ ভাল কথা দাদা। আমারও পরীক্ষা হয়ে গেছে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। নদীতে নদীতে বজরায় বেড়ান, সে ত চমৎকার।"

একটু পরে দাদা বললেন, "কিন্তু বাবা, তোমার শরীরের ত এই অবস্থা, তোমাকে ফেলে আমার এ সময়টা চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? বিশেষতঃ বিকাশ পর্যন্ত এ সময় নেই।"

তাও ত বটে; এ দিকটা ত ভেবে দেখিনি।

বাবা বললেন, "তুমি যদি ঐ দিকটার ভার নাও, আমার মন অনেকটা সুস্থ হয়। আমাকে দেখাশুনার জন্য দিনকতক না হয় গ্রাম থেকে মহেশ ঘোষালকে কলকাতায় আনিয়ে রাখ। মহেশ ঘোষাল লোকটী শুধু বিশ্বাসী নয়, কার্য্যক্ষমও বটে।"

দাদা বললেন, "আমি যতদূর খবর রাখি, আমাদের সদর সেরেস্তায় মহেশ ঘোষালই একমাত্র লোক—যে আন্তরিক ভাবে আমাদের দিকটা টেনে চলে এবং লোকটী বুদ্ধিমান, তাই তার সব অবস্থা জানাও আছে। আমি যদি গ্রামে যাই, ত' তাকে যে আমার সর্ব্বক্ষণ প্রয়োজন হবে।"

মহেশ ঘোষাল লোকটীকে আমি দেখেছি। দু-চারবার কলকাতায় এসে বাবা এবং দাদার সঙ্গে বোধ হয় জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে কথাবার্ত্তা বলে গেছেন। লোকটী প্রৌঢ়, গম্ভীর, কিন্তু মিষ্টভাষী। লম্বা মোটেই নয়, স্থূল দেহ এবং মুখের দিকে চাইলেই সব চেয়ে আগে নজরে পড়ে প্রকাণ্ড একজোড়া কাঁচা পাকা গোঁফ এবং মাথায় পরিষ্কার একটি টাক। শুনেছিলাম তার বাবা, নাম ভৈরব ঘোষাল আমাদের খুব বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন।

বাবা বললেন "মহেশ ঘোষাল না হয়, সদরে ত' অনেক কর্ম্মচারী আছে, দেখে শুনে একজনকে আনালেই হবে।"

দাদা বললেন, "মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের লোক—কলকাতায় এসে তাদের মধ্যে কেউ কি তোমার বিশেষ কিছু কাজে লাগবে?"

আমি বললাম, "দাদা, তুমি সেদিক দিয়ে ভেব না। যেই আসুক, আমি ঠিক চালিয়ে নেব। আমি বরং কলকাতায়ই থাকব, তোমার সঙ্গে যাব না।"

দাদা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা। কথাটা একটু ভেবে দেখি।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, ভেবে দেখ। তোমার গ্রামে যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছে নেই, তা আমি জানি এবং সে দিক দিয়ে তোমাকে দোষও দিতে পারি না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন "সবই আমাদের অদৃষ্ট। নইলে এমন সোনার জমিদারীর আজ এই অবস্থা হয়।"

বাবার শেষের কথাগুলোর তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে পারলাম না। বাবা এই ধরণের কথা মাঝে মাঝে বলেন, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামাবার বিশেষ কিছু আছে বলেও মনে হ'ল না।

[ক্রমশঃ

ভারতবাসী ঘুমাইয়া রহিয়াছে বলিয়া বহু সহস্র বৎসর হইতে তাহার জমীগুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবাসী তাহা বুঝিতে পারে নাই। পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতবাসীর মোট প্রয়োজনীয় শস্যের প্রায় দ্বিগুণ ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত। আজ যে জমীর প্রতি বিঘায় কিঞ্চিদূর্দ্ধ তিন মণ ফসল ফলিতেছে, পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেও ঐ জমী হইতে গড়ে ৭ মণের উপর ফসল পাওয়া যাইত এবং ৭০ বৎসর আগে উহা গড়ে ১২ মণ ফসল প্রদান করিত। গবর্ণমেণ্টের বিবরণসমূহ হইতেই এই উক্তি প্রমাণিত হইবে। গত তিন বৎসর হইতে প্রতি বিঘায় ফসলের পরিমাণ যেরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে এখন আর উদ্বৃত্ত হওয়া দূরের কথা, ভারতবর্ষে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় শস্যও উৎপন্ন হইতেছে না। তাই এখন আর বৈদেশিক কোন জাতির ভারতীয় বাণিজ্য লাভজনক হইতেছে না।... বঙ্গশ্রী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩]

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

শ্রীকুমুদনাথ দাস

[৩]

এলোমেলো ভাবে খেয়াল মত যা' তা' যখন আমরা পড়ি—তখন আমরা কেবল পাঠক। পাঠের মধ্যে যখন আমরা শৃঙ্খলা আনি, তখন আমরা কেবল ছাত্র' (হাডসন)। দুই প্রকার পাঠের মধ্যে কি পার্থক্য, তৎসম্বন্ধে ব্ল্যাকি বলিয়াছেন—'Reading, in the case of mere miscellaneous readers, is like the racing of some little dcg about the moo:, snuffing everything and catching nothing, but a reader of the right sort finds his phrototype in jacob, who wrestled with an angle all night, and counted himse f the better for the bout, though the sinced of his thigh shrank in consequence:'

এ যুগে পাঠক অতিরিক্ত জিনিষ পড়ে। সেই জন্য তাহার সেরূপ উপকার হয় না। গোটে বলিয়াছেন, "we read for tco many things, thus losing time and gaining nothing. We should read only what we admire" এ সম্বন্ধে বেকনের পরামর্শ সকলের গ্রহণীয়—"some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested,"

কোন গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় হাডসন গ্রন্থকারের প্রতি অন্ততঃ সাময়িক সহানুভূতিসম্পন্ন হইতে বলিয়াছেন। বঙ্কিমের মতে এই সহৃদয়তা না থাকিলে গ্রন্থকারের উক্তির তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

সেক্সপীয়র পড়িতে সেক্সপীয়র হইতে হইবে (অর্থাৎ তাঁহার মন লইয়া চিন্তা করিতে হইবে)।

'গ্রন্থকার কি ভাব হইতে লিখিয়াছেন, তাহা না বুঝিলে কোন গ্রন্থ ঠিক পড়া হয় না। (কার্লাইল)।

পাঠকের সৌভাগ্য যেমন ভাল লেখক পাওয়া, তেমনি লেখকের সৌভাগ্য ভাল পাঠক পাওয়া।*

ইক্ষুর রস পাইতে হইলে যেমন তাহা ভাল করিয়া চিবাইতে হয়, তেমনি রচনার রস উপভোগ করিতে হইলে তাহা ভাবিয়া পড়া উচিত—'Read, mark, learn and inwardly degest,' না ভাবিয়া পড়াকে বার্ক হজম না করিয়া খাওয়ার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এ যুগে পল্লবগ্রাহী পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কাব্যামৃতরসাস্বাদ তাহাদের জন্য নহে

রাস্কিন স্বর্ণখনকের সহিত পাঠকের তুলনা করিয়াছেন বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ লেখকগণের গ্রন্থাবলীতে লিখিত রত্নরাজির সন্ধান পাইতে হইলে স্বর্ণখনির মজুরের মতই কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। এই সব লেখক সহজে তাঁহাদের ভাব ধরা দেন না—অনেক পরিশ্রম করিয়া তাহা ধরিতে হয় এবং তখন যে রত্নের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা সত্যই 'more golden than gold'।

অধিকসংখ্যক গুণগ্রাহী পাঠক থাকায় এবং সমালোচনা-সাহিত্য বিশেষ পুষ্ট হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশে ছোট ছোট কবি ও সাহিত্যিকের যে আদর ও সম্মান, এ-দেশে তদ্বিপরীত কারণে বড় বড় কবি ও সাহিত্যিকের তত আদর ও সম্মান নাই।

'Literature is a very bad crutch, but a very good walking stick'—ল্যাম্ব (১৭৭৫—১৮২৪) যখন ইহা লিখেন, তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সাহিত্য-রচনা সখের জিনিষই ছিল, জীবিকার্জ্জনের পথ ছিল না। নাটক লিখিয়া সেক্সপীয়রের বিশেষ আয় হয় নাই। Paradise Lost লিখিয়া মিল্টন দশ পাউণ্ড মাত্র পাইয়াছিলেন। গোল্ডস্মিথের দারিদ্র্যের করুণ ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত। বঙ্গভূমি তাঁহার 'কবিকুলেশ্বর'কে ভিক্ষুকের বেশে বিদায় দিয়াছেন। হেমচন্দ্র ও কান্তকবিকে শেষ জীবনে অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বড়ই দুঃখে হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে-জন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে?'

ফ্রুড সত্যই বলিয়াছেন, 'Literature happens to be the only occupation in which wages are not given in proportion to the goodness of work done.'

অবশ্য এখন ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক সাহিত্যিকের পুস্তকলব্ধ আয় হইতে সুখস্বচ্ছন্দে দিন চলে (কাহারও কাহারও বাৎসরিক আয় লক্ষ লক্ষ টাকা)। কিন্তু বঙ্গদেশে? নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পূর্ব্বে সাহিত্য রচনা হইতে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আয় হইত না···এখন কিছু হইতেছে। কিন্তু তাহা তাঁহার মত প্রতিভাশালী লেখকের পক্ষে তুচ্ছ। ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার চেয়ে অনেক ছোট লেখকের আয় অনেক বেশী। বাংলা পুস্তক হইতে জীবৎকালে শরৎচন্দ্রই বোধ হয় বেশী টাকা পাইয়াছিলেন। শুধু সাহিত্য-রচনা করিয়া আর কোন বাঙ্গালী লেখকের বোধ হয় দিন চলে না। দেশের রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে এবং আরও ব্যাপকভাবে শিক্ষাবিস্তার ও জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর পঠন-স্পৃহা-সৃষ্টি এবং স্বল্পমূল্যে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নমালা প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না।

[ক্রমশঃ]

* cf. "There are three difficulties in authorship to write anything worth the publishing, to find honest men to publish it, and to get sensible men to read it."—Colton

ফাঁদ

শ্রীভবেশ দত্ত

কথাটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো রাতারাতি।

আশপাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামের লোক ঘটি-কলসী নিয়ে পিল পিল করে এসে জড়ো হোল কদমখালীর বড় অশ্বত্থ গাছটার তলায়। সামনের ইঁদারা থেকে উঠতে লাগলো ঘড়া ঘড়া জল। ইঁদারাটা বহুদিনের পুরাণো—আশপাশে ফাটল ধরেছে, ফাটলের মাঝে উঠেছে ছোট ছোট গাছ-গাছড়া। কত দিন এই পথ দিয়ে কত লোক চলে গিয়েছে এই ইঁদারার পাশ দিয়ে, কেউ একবার ভুলেও ইঁদারার দিকে তাকায়নি।

ইঁদারার চারপাশের জঙ্গল আজ মানুষের পায়ের চাপে মাটিতে মিশে গেছে। লোকের আর বিরাম নেই, একদল আসে, জল তোলে, চলে যায়, আবার একদল আসে। সকাল থেকে যেন লোকের ভীড়ে আশপাশ গুলজার হয়ে আছে। অশ্বত্থ গাছটার এক পাশে সারি সারি গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

কদমখালীর অবহেলিত এক ইঁদারা আজ মানুষের তীর্থক্ষেত্র হয়েছে।

পীরসাহেবের আদেশ—

এই ইঁদারার জল খেলে সমস্ত রোগ সেরে যাবে।

আদেশ পেয়েছে কদমখালীর তুরাব আলীর অম্লশূল রোগগ্রস্তা বৌ রেবেকা বিবি। আদেশ পাওয়ার দিন রেবেকা বিবি নাকি চুপিসারে ব্যথার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু পীরসাহেব তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

রেবেকা নাকি আদেশ পেয়ে ছুটতে ছুটতে সেই ইঁদারা থেকে জল তুলে পেট পুরে খেয়েছে—তারপর থেকেই নাকি সে সাধারণ মানুষ। কোনদিন যে তার ঐ নিদারুণ রোগ ছিল, তা আজ আর বোঝবার উপায় নেই।

সকাল থেকেই ভীড় চলেছে—

মানুষ গোণা যায় না, শুধু কিলবিল করে পোকার মত অজস্র মাথা।

ইঁদারার একপাশে তুরাব আলী একখানা থালা পেতে একমনে কাচের মালা ঘুরিয়ে চলেছে।

পীরসাহেবের প্রণামী জমা হচ্ছে এই থালায়।

যার যা খুশী সে তাই দিয়ে চলেছে—

পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকিতে থালাটা ভরে গিয়েছে।

তুরাব আলী মালা ঘোরায় আর মাঝে মাঝে থালার দিকে তাকায়।

আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে।

আশে পাশে জল্পনা-কল্পনা চলে—

তুরাব আলীর মত ভাগ্য ক'টা লোকের আছে। পয়গম্বর না হলে পীরসাহেবের এমন দয়া ক'টা মানুষের ওপর হয়।

তুরাব আলী বসে আছে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত। কোন সময়ে হাসে, কোন সময়ে কাঁদে, কোন সময়ে আল্লা বলে চীৎকার করে ওঠে।

ইঁদারার ধারে কাদায় কাদাময় হয়ে গেছে, একজন বৃদ্ধ সেই কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে বলতে লাগলো—পীরসাহেব রোগের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারি না, এ থেকে আমাকে অব্যাহতি দাও।

কদমখালীতে আজ জাত নেই, শিক্ষা নেই, ধনী নেই, গরীব নেই, সব মিশে গিয়েছে।

তুরাব আলীর খিদে নেই, তৃষ্ণা নেই। আজ সব কিছু সে ভুলে গিয়েছে। পয়সার থালার দিকে চাইছে, আর তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব কোথায় যেন চলে যাচ্ছে।

যে তুরাব আলী খিদের জ্বালায় ছটফট ক'রে এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে বেড়িয়েছে, সেই তুরাব আলী আজ আর নড়ে না। একমনে কাচের মালা ঘুরিয়ে চলেছে, তপস্যায় বসেছে তুরাব আলী—

খোদাতালাকে ডাকলে পাওয়া যায় না কে বলে! কারা বলে দেবতা নেই, কারা বলে তাঁর অস্তিত্ব এ পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়েছে।

তারা অবিশ্বাসী, তারা অমানুষ।

সন্ধ্যা হওয়ার আর দেরী নেই।

চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—

কদমখালীর অশ্বত্থ গাছটায় রাজ্যের পাখী এসে কিচির মিচির শব্দে জাগিয়ে তুলেছে। লোকের ভীড় যেন আর কমে না—সন্ধ্যার আগেও অনেককে আসতে দেখা যায়।

তুরাব আলী কি এবার উঠবে!

কিন্তু লোক আসার তো বিরাম নেই। আরও কিছুক্ষণ থাকলে হয়তো কিছু পাওয়া যাবে। পেটে হুতাশন জ্বলছে তার, কাচের মালা ঘোরাতে ঘোরাতে হাতও তার ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যা হোল—

চারপাশে অন্ধকার থম থম করছে।

দু'চারটে শিয়াল রাস্তা পার হয়ে চলে গেলো, গরুর গাড়ীর ভিতর টিম টিম করে আলো জ্বলছে।

তুরাব আলী উঠলো—

থালা থেকে সমস্ত পয়সা-কড়িগুলো সে একটা থলির ভেতর ঢাললো। এ কি! ভারী হোয়েছে তো বেশ, সে নিয়ে যাবে কি করে।

কাঁচামাটির পথ দিয়ে সে হন হন করে চলেছে—সারাদিন উপবাসে তার শরীর আর বইছে না।

মাঝে মাঝে তার ভয় হয়, টের পেয়ে যদি কেউ কেড়ে নেয়।

যদি!

পীরসাহেব—হ্যা ,পীরসাহেব।

সে পীরসাহেবকে কোন দিন দেখেনি, তবুও সে খানিকটা অনুমান ক'রে আপাদমস্তক আলখাল্লা পরা, একমুখ দাড়ি, হাতে কোরাণ কিংবা আর কিছু, গলায় কাচের মালা, চোখে মুখে উজ্জ্বল দীপ্তি।

কোনমতে কাঁপতে কাঁপতে সে বাড়ী ঢোকে।

রেবেকা কাঁচা মাটির মেঝেতে শুয়ে আছে।

মাথার কাছে টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে একটা মাটির প্রদীপ। তুরাব আলী ডাকে :—রেবেকা।

অনেক কষ্টে সে উত্তর দেয় :—উঃ।

—কি ব্যথাটা আবার বেড়েছে নাকি?

—না, একটু আগে উঠেছিল এখন আর নেই।

তুরাব আলী ঝাঁপির দোরটা বন্ধ করে দিয়ে বললে—ওঠ। সে সমস্ত পয়সাগুলো মেঝের উপর ঢাললো।

প্রদীপের আলোতে সিকি দুয়ানিগুলো চক্ চক্ করে উঠলো। রেবেকা চোখ দুটো বড় বড় কোরে বললে—এত পয়সা—তুরাব আলী হেসে বললে হা।

আর কিছু না বলে সে সমস্ত পয়সাগুলো গুণে গুণে হাঁড়িতে রাখতে লাগল।

রেবেকা বললে :—ব্যথা যখন উঠেছিল, সেই সময় সাধু মণ্ডলের বৌ এসেছিল।

তুরাব আলী পয়সা গোণা বন্ধ করে…তার মুখের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বললে—তুমি কি করলে তখন সে কি বললে?

সে কি তবে পাহাড় থেকে প'ড়ে যাবে এক নিমেষে সবাই জানে রেবেকা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। আর এখন যদি কেউ জানতে পারে, তা' হ'লে সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।

রেবেকা বললে—তার দিকে এমন করে তাকালাম—সে ভয় পেয়ে গেল—উপস্থিত বুদ্ধি এসে গেল চোখ দুটো বড় বড় করে বললাম।

যা, যা, ইঁদারার জল পেট পুরে খেয়ে নিগে—সব সেরে যাবে।

তুরাব আলী খুসী হয়ে বললে—খুব বাঁচিয়েছ, ভাগ্যিস ধ'রে ফেলেনি। সে আবার পয়সা গুণতে লাগলো।

রেবেকা বললে—এ পয়সাতে কি আমার রোগ সারবে?

ও-কথা কেন বলছ রেবেকা।

একটু চুপ করে বোললে—এটা কি পাপ নয়, লোকের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে…।

তুরাব আলী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—পাপ! এটাকে তুমি পাপ বলো? বড় লোকে যখন জোর করে মানুষকে ঠকায়, তখন সেটা পাপ হয় না—যারা ফাঁকি দিয়ে গরীবের পয়সা দিন-রাত লুটে নিচ্ছে—যারা জমিদার, তারা যখন জোর করে গোলা থেকে ধান কেড়ে নিয়ে যায়, তখন সেটা পাপ হয় না, আর আমার বেলায় যত পাপ। আমি তো কারও কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিচ্ছি না।

কিন্তু পীর সাহেব—

তুরাব আলীর মুখ যেন শুকিয়ে যায়।

রেবেকা বোললে—ও কি তোমার মুখ অমন হয়ে গেলো কেন।

তুরাব আলী কথা ঘুরিয়ে বলে—না, না, ও-সব কিছু নয়—

একটু চুপ করে থেকে বললে—পীর সাহেব।

পীর সাহেব, পীর সাহেব, করছ কেন—

:—হ্যাঁ, কোথায় তারা, মন্দির, মসজিদ আজ সব ফাঁকা, কেউ নেই, তাদের অস্তিত্ব থাকলে মানুষ আর পশু হ'ত না, মানুষ চোর হ'ত না, মানুষ মানুষের গলায় ছুরি বসাত না।

রাত কত কে জানে—

চারপাশ নিঝুম; শুধু মাঝে মাঝে রাস্তা দিয়ে দু'একখানা গরু বা মোষের গাড়ী যেতে দেখা যায়। গাড়ীর ভেতর কথা শোনা যায়।

কে যেন বলে :—আর একটু দূর, ঐ তো দূরে অশ্বত্থ গাছের পাশেই ইঁদারা. আর একজন বলে :—ভাল হ'লেই বাঁচি।

:—ভালো হবে না কি বলছ—এ-যে পীর সাহেবের আদেশ, এ-কি মিথ্যে হবার।

গরুর গাড়ী চলে যায়।

তুরাব আলী শোনে।

পয়সার হাঁড়িটা ভালো ক'রে রেখে জল-দেওয়া ভাত

খেয়ে শুয়ে পড়ে, তুরাব আলী ঘুমোতে পারে না—তার সমস্ত মন পড়ে থাকে হাঁদারার ধারে। ঝমঝম্ করে কৃষ্ণকালো রাত।

তার চোখের সামনে পয়সা আনী দু'আনীগুলো যেন নাচতে থাকে। সে ঘুমিয়ে পড়ে।

রেবেকার ঘুম আসে না। ব্যথাটা যেন আবার উঠেছে।

মেঝের ওপর শুয়ে সে ছট্‌ফট্ ক'রতে থাকে।

তুরাব আলীর ঘুম ভেঙে যায়, ডাকে :– কি আবার ব্যথা উঠ্‌ল না কি?

রেবেকা কথা ব'লতে পারে না।

তার সমস্ত দেহে যেন ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে।

কোনমতে সে বলে উঠে :—আমি বাঁচব না, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না, এ-রোগ সারাবার ক্ষমতা কারও নেই।

রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ী যাচ্ছে।

তুরাব আলী ব্যস্ত হ'য়ে বলে :—ও-রকম কোর না, বাইরে লোক যাচ্ছে, শুনে ফেলবে, তুমি একটু চুপ ক'রে থাকো।

রেবেকা কেঁদে ওঠে :—আমি চুপ ক'রে থাকবো? প্রাণটা না বেরোন পর্য্যন্ত আমি আর চুপ ক'রতে পারবো না। ঘরে পাপ ঢুকেছে।

রেবেকা হাঁপাতে থাকে।

তুরাব আলীর ভয় হয়।

পয়সা সবে আসতে সুরু হ'য়েছে আর এর মধ্যে সব যদি জানাজানি হয়ে যায়, তাহ'লে আর গাঁয়ে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না, তার ভয়ানক বিপদ হবে।

সে অনেক অনুনয় ক'রে বলে :—রেবেকা একটু চুপ করো, তুমি ভালো হ'য়ে যাবেই, আমি কালই সকালে ভালো ডাক্তার নিয়ে আসবো।

রেবেকা রাগ করে বোলে ওঠে :—তোমার সব মিথ্যে, পয়সার থালা নিয়ে কে বসবে?

তুরাব আলী লজ্জিত হ'য়ে বলে না আর কিছুই।

সাম্‌নে মাটির প্রদীপটা মুমুর্ষু রোগীর মত টিমটিম্ ক'রে জলছে, ঠিক রেবেকা বিবির মত।

রাত হয় তো অনেক।

অন্ধকার এখনও সরে যায় নি।

কোথায় কতদূরে কি একটা পাখী বিকট সুরে যেন চীৎকার ক'রছে।

তুরাব আলী রেবেকার পাশে সরে আসে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে অন্ধকার দেখা যায়।

মনে হয় কার যেন দুটো চোখ পিট পিট ক'রে জলছে।

পীর সাহেব—

রেবেকা :

তুরাব আলী ডাকে।

রেবেকা ব'লে ওঠে :—এ-মরণ আমি সহ্য ক'রতে পারব না। তোমার আর কি—পয়সাই তোমার সব, আমি তোমার কেউ নয়।

রেবেকা :

তুরাব আলী তার চোখের দিকে তাকায়।

রেবেকার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তুমি কাঁদছো!

হ্যাঁ। ও পয়সা তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এসো, আর সবাইকে ব'লে দাও এ-সব মিথ্যে।

তুরাব আলী হাঁড়ির দিকে তাকায়।

পয়সার কি কান আছে, সে কি শুনতে পায়?

তুরাব আলী একদৃষ্টে হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে।

না, না, সে কারও কথা শুনবে না, সে কাউকে ভয় করে না, মানুষ তাকে বড কষ্ট দিয়েছে, সে প্রতিশোধ চায়, এমনি ক'রে সে সবায়ের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেবে। নরক—সে আবার কোথায়। সেখানে যেতেও সে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু রেবেকা।

তার জন্য সে তো কিছুই ক'রতে পারে নি। দীর্ঘদিন ধ'রে রোগে ভুগে ভুগে সে শেষ হ'তে চলেছে। সে কি তার কাছে কিছু আশা করে নি? হ্যাঁ, রেবেকার মনেও অনেক আশা ছিল।

কিন্তু।

রেবেকা আবার গোঙাতে সুরু ক'রল। তুরাব আলী তার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

রাত শেষ হয়।

চারিদিক আস্তে আস্তে ফরসা হ'য়ে আসে। গাছে গাছে পাখী ডাকে। তুরাব আলী কান পেতে শোনে।

রেবেকা যেন অনেকটা সুস্থ মনে করে। দু'একজন লোক রেবেকাকে দেখতে আসে। তাদের ভারী কৌতুহল রেবেকাকে দেখবার জন্য। যে মানুষ রোগের যন্ত্রণায় দু'দিন আগে ছটফট ক'রত সেই মানুষ রোগ নিরাময়ে কেমন হ'তে পারে, তাই দেখবার জন্য এরা আসে।

—রেবেকা তাদের দেখে একটু হাসে।

ভারী করুণ হাসি।

তুরাব আলী বাইরে এসে তাদের দেখে বলে :— সবই পীরসাহেবের দয়া, মানুষ কি ক'রতে পারে।

রেবেকার মুখ শুকিয়ে যায়, কি যেন ব'লতে যায়, কিন্তু পারে না।

তুরাব আলী বাধা দিয়ে বলে :—ব'ল রেবেকা, ওঁরা শুনতে এসেছেন তোমার মুখের দু'টো কথা।

রেবেকা কথা বলে না—

তুরাব আলী সকলের দিকে চেয়ে বলে :—দিনরাত কথা ব'লে ব'লে ভারী ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, তাই কথা ব'লতে পারছে না।

লোকগুলো চলে যায়।

রেবেকার চোখ দিয়ে জল পড়ে, বলে :—তুমি কি আমাকে বাঁচতে দেবে না।

তুরাব আলী কোন কথা না ব'লে চলে যায়।

কদমখালীতে লোক যেন আজ দ্বিগুণভাবে এসে জড়ো হ'য়েছে। ইঁদারার ধারে মানুষের সোরগোল প'ড়ে গেছে। সবাই আগে জল নিতে চায়।

তুরাব আলী ইঁদারার কাছে যেতেই সবাই সরে যায়

সে নিঃশব্দে গিয়ে থালাটা সামনে রেখে বসে পড়ে কাঁচের মালা অবিরাম ঘুরে চলে।

থালার ওপর পয়সার পুষ্পবৃষ্টি হ'তে থাকে। ঝনঝন শব্দ লেগেই আছে। কি মধুর শব্দ। ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্। তুরাব আলীর মন যেন পয়সার শব্দে নাচে। ইঁদারার ও-পাশ দিয়ে সারি সারি বসেছে নানান রকম দোকান।

হাঁড়ী-কলসীর দোকান বসেছে বোধ হয় চার পাঁচখানা। দু'আনার কলসী আজ দশ আনায় বিকিয়ে যাচ্ছে।

রীতিমত একটা মেলা বসে গেছে কদমখালীর অশ্বত্থ-তলায়।

তুরাব আলীর মাঝে মাঝে শঙ্কা হয়—যে ভাবে জল উঠছে, যদি ইঁদারার জল শুকিয়ে যায়।

ঝুন্-ঝুন্-ঝুন্।

তুরাব আলীর সমস্ত চিন্তা ডুব হ'য়ে যায়।

এই শব্দে ডুবে যায় রেবেকা বিবি। ডুবে যায় সব কিছু।

আজ লোক এসেছে অনেক দূর থেকে। কত রকম রোগী, কারও হাঁপানী, কারও কালাজ্বর, কারও ক্ষয়রোগ, কারও অম্লশূল। কেউ বসেছে, কেউ গোঁ গোঁ ক'রছে, কেউ ধুঁকছে, প্রাণ বুঝি তার বেরিয়ে যায়। হাঁপের রোগীটি ক্রমাগত কাশছে, শ্বাস তার বইছে না বোধ হয়—চোখ লাল হ'য়ে গেছে।

তুরাব আলী চোখ খুলে একবার তাকায়।

কে একটা লোক চক্ চক্ ক'রে জল খাচ্ছেই শুধু—জল অপরিষ্কার, তবুও চক্ চক্ ক'রে খেয়েই চলছে।

এত বিশ্বাসী মানুষ।

লোকের অনুগ্রাহে পয়সা আজ বেশী পড়েছে।

কাঁচা টাকা ও নোট কিছু কিছু পড়েছে।

তুরাব আলী মাঝে মাঝে রেবেকার কথা ভাবে—সে এখন কেমন আছে।

—কে জানে—হয় তো ভাল আছে, আর না হয় রোগের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রছে।

আজ তুরাব আলীর যেতে একটু দেরী হল। আজও রাত এসেছে অন্ধকার হ'য়ে, টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে—একটু একটু হাওয়াও বইছে।

—সে উঠলো—

আজ যেন ঝুলিটা আরও বেশী ভারী হ'য়েছে।

ছিটে ফোঁটা বৃষ্টিতে পথও একটু পেছল হ'য়েছে। সে পা টিপে টিপে চলেছে। বাড়ীর কাছে আসতেই সেই পাখীটা একটা বিকট শব্দ ক'রে উঠল। তুরাব আলী যেন একটু ভয় পেল।

ঘরের দোরের কাছে এসে সে কোনরকম সাড়া পেল না। ভাবল, রেবেকা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

জ্বলন্ত প্রদীপটা সে ঘরে ঢুকতেই নিভে গেল।

তুরাব আলী পকেট থেকে দেশলাই বের করতে করতে বললে :—রেবেকা এত তাড়াতাড়ি আজ ঘুমিয়ে পড়লে—ওঠ দেখো আজ কত টাকা এনেছি।

প্রদীপটা জেলে সে রেবেকাকে আবার ডাকলে, কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ নেই।

তুরাব আলী জানে অভিমানি রেবেকাকে…

তাই কোন কথা না বলেই হাঁড়িটা পাড়তে গিয়ে সেটা উল্টে রেবেকার মুখের ওপর সমস্ত পয়সাগুলো ছড়িয়ে পড়লো। তুরাব আলী অতগুলো মুখ সরিয়ে রেবেকার মুখ দেখে আঁতকে উঠলো।

এ-কি রেবেকা কি তাকে সত্যি সত্যিই ফাঁকি দিলে।

চারপাশে ছড়িয়ে আছে শুধু মুখ।

এতগুলো মুখের মাঝখানে রেবেকার ম্লান মুখখানা পড়ে আছে, তুরাব আলীর আশপাশে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে শুধু মুখ। কোন মুখই কথা বলে না, সব নিশ্চল, নিথর, এ-সব মুখ যেন আর কোনদিন হাসবে না।

তুরাব আলী নিজের মুখও ঢাকলো।

পরদিন সারা গ্রামে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল, রেবেকা বিবিকে পীরসাহেব কোলে তুলে নিয়েছেন।

তার পর থেকে তুরাব আলীর মুখও আর কেউ দেখেনি কদমখালীতে।

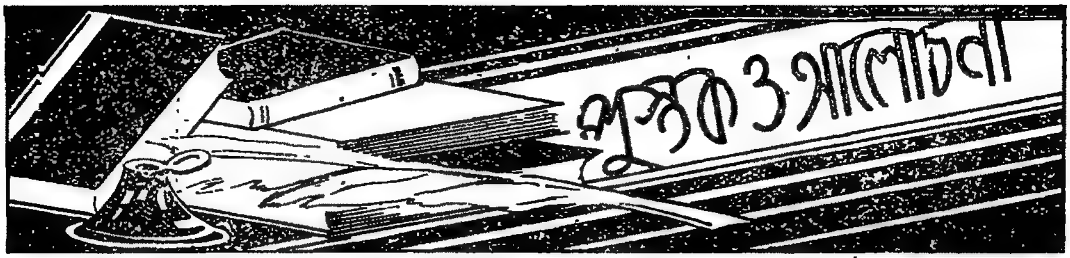

তীর ও তরঙ্গ :—উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণ : শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। পুস্তকালয় : ২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে 'অন্ত্যেষ্টি', 'তথাপি', 'কথাপ্রসঙ্গে' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া লেখক বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। 'তীর ও তরঙ্গ' লেখকের পরিণত বয়সের সার্থক রচনা। বাংলার শ্যামল প্রকৃতি ও মানুষের সাধারণ মনই লেখকের সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান প্রেরণা। আলোচ্য গ্রন্থের ব্রজনাথ রায়, মন্দাকিনী, সুনীল, নমিতা, অমিতা প্রভৃতি চরিত্র আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবনের সেই সাধারণ মনের মানুষ সব। রোমান্টিক কাহিনীকে যুক্তিমূলক করিয়া প্রকাশ করা শক্তির প্রয়োজন। লেখকের সেই শক্তিতে আমাদের বিশ্বাস আছে। সামাজিক বিশৃঙ্খলার সাম্প্রতিক পরিবেশে গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে পাঠক-মনকে আনন্দ দিবে।

প্রান্তিক : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। দি ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস—২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম ৩।০ টাকা মাত্র।

'প্রান্তিক' তারাশঙ্কর বাবুর তৃতীয় গ্রন্থ। ইনি 'ধাত্রী দেবতা' বা 'কালিন্দি'র প্রখ্যাত তারাশঙ্কর ন'ন। তবু বাংলা সাহিত্যের দুর্গম পথে এই দ্বিতীয় তারাশঙ্কর যথেষ্ট শক্তি নিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছেন। 'প্রান্তিক'-এর কাহিনী আমাদের পারিপার্শ্বিক সাধারণ জীবনের সজ্ঞাতময় ঘটনাবলীরই একটা বিশেষ রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যময় ভাষা ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর সুষমায় গ্রন্থের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠক-মন আপনিই নিমজ্জিত হইয়া থাকে। চরিত্র-বিশ্লেষণের দিক হইতে রাজশেখর, তপতী, আত্রেয়ী, শর্মিলা, সুহৃদ প্রভৃতির চরিত্র বিশেষ মনন-প্রধান লেখকের বর্ণনাচাতুর্য্য ও সংলাপ পাঠকমনকে অভিভূত করে। লেখকের রচনার সার্থকতা এইখানেই।

আগমনী : শ্রীসুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত পূজা-বার্ষিকী কিশোর সাহিত্যসঙ্কলন। চয়নিকা পাবলিশিং হাউস, ৫২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২৲ টাকা মাত্র।

কিশোর সম্পাদক সুজিতকুমার 'আগমনী' প্রকাশ করিয়া যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ। নানা শিক্ষণীয় প্রবন্ধ, গল্প, নাটক ও কবিতায় সঙ্কলনটি পূর্ণ। বাংলাদেশের প্রখ্যাত অখ্যাত বহু লেখকের একত্র সম্মেলনে তরুণ কিশোর-সম্পাদকের সাধনলব্ধ এই সংখ্যাখানি যে বাংলার প্রত্যেকটি কিশোর-মনকেই আকর্ষণ করিবে, তাহা অকুণ্ঠচিত্তে বলা যায়।

কল-কল্লোল : কাব্যগ্রন্থ। শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ টাকা মাত্র।

লেখক বাংলা-সাহিত্যে নতুন হইলেও রচনায় ধার আছে। অত্যাধুনিক কবিতার দুর্ব্বোধ্য মায়াজাল যখন পাঠক-চিত্তকে পরিকীর্ণ ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে, সেই সময় এমন একটি ছন্দোময় কাব্য-সঙ্কলন বাস্তবিকই পাঠকবে আনন্দ দিবে। কিন্তু তবু বলিতে হয়, আত্মস্বকীয়তায় কবিতাগুলি এখনও পূর্ণতা পায় নাই। রবীন্দ্রপ্রভাব লেখকের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। লেখক সাধনার পথে ক্রমে জয়যুক্ত হইবেন, ইহাই আশা করি।

শ্রীমতিচ্ছন্ন শিশুরাজ মহেন্দ্র চরিত : জীবনী। ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু দাস। শ্রীশ্রীজগবন্ধু হরিলীলামৃত কার্য্যালয়, ৪১ সি, শাঁখারীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্রজী আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের মধ্যে প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের আরাধনা করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রপূত শিষ্য ছিলেন তিনি জগদ্বন্ধুর। তাঁহার জীবনেতিহাসও বহু বিচিত্র ও সংঘাতময়। সেই সমস্ত জীবন্ত ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ব্রহ্মচারী পরিমলবন্ধু মহেন্দ্রজীর যে জীবনী রচনা করিয়াছেন, তাহা মরমী প্রকাশভঙ্গী ও দরদী ভাষায় মিশাইয়া অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরিমলবন্ধু বিশেষ পণ্ডিতব্যক্তি। লেখকের আনুষঙ্গিক তথ্যসংগ্রহের দিক দিয়াও এই ৪১২ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থখানি জনসাধারণের বহুলাংশে কাজে আসিবে।

রূপ-লোক

সাম্প্রদায়িক গোলযোগে আগষ্ট মাস হইতে থিয়েটারগুলির যেরূপ ক্ষতি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে গত অগ্রহায়ণ মাসে আমরা বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করিয়াছি। গত পূজার দিনের পূর্ব্ব হইতেই থিয়েটারের অবস্থা আবার ভাল হওয়াতে আমরা বিশেষরূপে উৎফুল্ল হইয়াছি। আজকাল সাধারণ লোকে উহা আমোদ মনে করিয়া উহাতে ভিড় করিতে পারে বটে, কিন্তু আমরা থিয়েটারকে লোকশিক্ষার বিশিষ্ট কেন্দ্র বলিয়াই মনে করি। নাটক, উপন্যাস এবং গল্পের মধ্য দিয়া যত জাতীয়তা প্রচার করা যায়, কেবল নিছক উপদেশ দানে তাহা হয় না। তাই থিয়েটারগুলির ক্ষতিতে লোকশিক্ষার একটা প্রধান উপাদানই অচল হইয়া পড়ে। থিয়েটারের অবস্থা দিন দিন ভাল হইলেই আমাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না

ষ্টার থিয়েটারে দেখিলাম, বেশ ভিড়। আর উহার প্রধান আকর্ষণই সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয়। সম্প্রতি নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ই উপন্যাসখানিকে নাটকে রূপান্তরিত করিয়া নিজেই উহা প্রযোজনা করিয়াছেন।

মোটের উপর অভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। দৃশ্য, গান এবং কথোপকথন ভালই হইয়াছে। সমুদ্রতীরে সূর্য্যোদয়, বালিয়াড়ী, মেদিনীপুরের রাস্তা, চটি, কালী-মন্দির প্রভৃতি দৃশ্য বড়ই মনোরম। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত দিয়া আরম্ভ করায় খুব বুদ্ধির কাজ হইয়াছে।

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সঙ্গীতটি চিত্তাকর্ষক। মহেন্দ্রবাবু মাইক্রোফোনে গ্রন্থের পূর্ব্ব কাহিনীটুকু বিবৃত করায় নাটক বুঝা সহজ হইয়াছে। অন্যান্য ব্যবস্থাও ভালই

যাঁহারা রূপদান করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিনগুপ্তের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে তিনি ষ্টার থিয়েটারে—নন্দকুমারে মিরকাশিম, দেবী-চৌধুরাণীতে ভবানীপাঠক এবং টিপুসুলতানে টিপুসুলতান বেশ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। পরে একটী বোম্বাইয়ের টকিতে যোগদান করেন। দুই বৎসর পরে ষ্টারে ফিরিয়া আসায় থিয়েটার ও তাঁহার—উভয়েরই বেশ সুবিধা হইয়াছে। ইনি কাপালিকের কণ্ঠস্বরের অধিকারী এবং অভিনয়ও ভালই করিয়াছেন। পূর্ব্বে এ ভূমিকায় স্বর্গীয় মতিলাল সুর, অঘোরনাথ পাঠক এবং চুনীলাল দেব মহোদয় অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রকাশ করিতেন। বিপিনবাবুর অভিনয় সেরূপ না হইলেও বর্ত্তমানে বাঙ্গালা থিয়েটারে যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজনের বেশী যে অপরে এরূপ করিতে পারেন না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে নবকুমারের অভিনয় আমাদিগকে নিরাশ করিয়াছে। অভিনেতার দোষ নাই। ইনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যে ভূমিকায় স্বর্গীয় অমর দত্ত মহাশয়ের অসামান্য পারদর্শিতা—চেহারা ও কণ্ঠস্বর এখনও নবকুমারের চরিত্র পরিস্ফুট করাইবার স্মৃতি বহু দর্শকের মন হইতে লুপ্ত করিতে পারে নাই, তাঁহার ভূমিকায় একজন উপযুক্ত ব্যক্তি দিলেই কাপালিকের সঙ্গে খাপ খাইত। যাহা হউক, নবীন অভিনেতা ইহাতে নিরুৎসাহ হইবেন না বলিয়াই আশা করি। অপর্ণার মতিবিবি সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, চেহারা মানানসই, অভিনয় সাধারণ পর্য্যায়ে ফেলা যায়। কপালকুণ্ডলার অভিনয় করিয়াছেন পূর্ণিমা। প্রকৃতি পালিতা, দুরন্ত কাপালিক সেবিতা ? সমুদ্রতীরবাসিনী কপালকুণ্ডলা না হইলেও এবং অভিনয়ে আধুনিক শিক্ষিতা স্ত্রীর প্রভাব থাকিলেও এই অভিনেত্রীটির ভবিষ্যৎ ভাল বলিয়াই আশা হয়। জয়নারায়ণ বাবুর কুলীন জামাতা বেশ রস সৃষ্টি করিয়াছে। ভূমেন রায়ের জাহাঙ্গীর ও গোপালবাবুর বৈরাগী উল্লেখযোগ্য, আর অধিকারীর স্বচ্ছন্দ, সাবলীল অভিনয়টি দর্শককে বড় তৃপ্তি দিয়াছে। ষ্টার থিয়েটার সাহিত্য-সম্রাটের এই অপূর্ব্ব আখ্যানের পুনরাবৃত্তি করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

মিনার্ভা থিয়েটার অনেকদিন বন্ধ ছিল। এখন সাজাহান, চন্দ্রশেখর, মিশরকুমারী প্রভৃতি অভিনীত হয়। অহীন্দ্রবাবু, নির্ম্মলেন্দুবাবু, রবীন্দ্রবাবু, জহরবাবু, সন্তোষবাবু এবং ছবি বাবু প্রভৃতি অভিনেতার এখানে সমাবেশ হইয়াছে, আর আছেন সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী সরযূবালা। ইনিই জাহানারা, শৈবলিনী এবং নাকরিণের ভূমিকায় তাঁহার উপযোগী অভিনয় করেন। শান্তি গুপ্তাও এখানে পিয়ারা শৈবলিনী এবং বুলা প্রভৃতির ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। পরে কয়েকদিন না আসায় মুকুলজ্যোতি ঐ সব ভূমিকায় নামেন। ভরসা করি, মিনার্ভা থিয়েটারে নূতন এবং জাতির কল্যাণকর নাটক অভিনয় করিয়া নিজের ঐতিহ্য রক্ষা করিবেন। শ্রীযুক্ত নরেশ গুপ্ত এবং চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিনার্ভা থিয়েটারটিকে লোকশিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত করিতে পারিলে ইহার প্রতিষ্ঠাতা নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের আত্মা তৃপ্ত হইবে বলিয়া মনে করি।

মিনার্ভা থিয়েটারে 'গিরিশ পরিষদ' মাঝে মাঝে যে "বলিদান', 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি অভিনয় করিয়া নাট্য-সম্রাটের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিত, স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মিত্রের পরলোকপ্রাপ্তির পরে আর উহার সাড়াশব্দ পাইতেছি না।

ভরসা করি ইহার অনুষ্ঠাতাগণ উহা সজীব রাখিতে যত্নের ত্রুটি করিবেন না।

শ্রীরঙ্গমে এখন শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ী মহাশয়ের 'দুঃখীর ইমান' গত ১২ই ডিসেম্বর হইতে অভিনীত হইতেছে। নাটকের বিষয়-বস্তুটি খুব ভাল হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের প্রথমভাগে একদিকে ট্যাক্সের জ্বালায় অপর দিকে লোভী হৃদয়হীন ব্যবসায়িগণের স্বার্থপরতা-মূলক অনাচারে—অন্নহীন, বস্ত্রহীন, কপর্দ্দকহীন মধ্যবিত্তগণ ও চাষাদের দুঃখের মাত্রা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তুলসী বাবু নিপুণভাবে চিত্রটি উপস্থিত করিয়াছেন। পেটের জ্বালায় অভাবগ্রস্ত লোক চুরি করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু চুরি করা তাহাদের পেশা নয়, প্রবৃত্তিও নয়। গরীব ধর্ম্মদাসের ভূমিকায় নবীন অভিনেতা কালীপদ সরকার বড় সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্কুল মাষ্টারের ভূমিকায় স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছেন এবং ইনস্পেক্টার আদিত্য ঘোষ এবং জমিদার নীতীশ মুখার্জ্জিও উল্লেখযোগ্য বটে, তবে জামালুদ্দিনের ছোট্ট ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বড় সুন্দর স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় করিয়াছেন। বিলাতীর ভূমিকায় লীলাবতী চলনসই। জ্ঞানোর ভূমিকায় সরলার গান ভাল হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী প্রভাকে ক্ষীরোদার ভূমিকা না দিয়া অন্য কাহাকেও দিলে ভাল হইত। আখ্যানবস্তু ভাল হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অভিনয় নীরস হইয়াছে, সম্ভবতঃ নাটক বা প্রযোজনার দরুণ। বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট ও প্রয়োগাচার্য্য শিশির বাবুর প্রযোজনায় খুব বেশী হাত থাকিলে এটুকু থাকিত না বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, এরূপ বিষয়বস্তুসম্পন্ন নাটক এখন যত বেশী হয়, ততই ভাল।

"বাঁশ ঝাড়ের মাঝে থাকে ক্ষীরোদা বৈষ্টমী" গানটি বাজে, কিন্তু সরলার "শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজবিহারী, হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে; হেরি" গানটি ভাল হইয়াছে।"

এবার কালিকা থিয়েটারের 'রামপ্রসাদ'ই থিয়েটার-জগতের বিশিষ্ট আকর্ষণ। আজকাল যেমন প্রেমের কাহিনী ও অস্বাভাবিক থিয়েটার ও বায়স্কোপকে বিষাক্ত আবহাওয়ায় পরিণত করিয়াছে, তাহাতে 'রামপ্রসাদের' ন্যায় একখানি সে-কেলে শ্যামা বিষয়ক নাটক যেরূপ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, থিয়েটারগুলি গত ২০।২২ বৎসর যাবত জাতীয়তামূলক নাটকের অভিনয় না করিয়া জাতির কি অহিত সাধন করিয়াছে শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরী ও ডাঃ শৈলেন সিংহ পরিচালিত কালিকা থিয়েটার রামপ্রসাদ ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্ম, জাতীয়তা, সমাজহিতৈষণা প্রভৃতি বাঙ্গলার নিজস্ব জিনিষগুলি বাঙ্গালী ভোলে নাই, ভুলিতে পারে না। আমাদের মতে রামপ্রসাদ কেবল ধর্ম্মমূলক নাটক নয়, জাতিয়তামূলক নাটকও। ধর্ম্মহীনতা জাতীয়তার পরিপন্থী এবং হিন্দুর ধর্ম্মই তাহার প্রধান জাতীয়তা। ধর্ম্মহীনের স্বদেশপ্রেম কথার কথা মাত্র। আজ ধর্ম্ম ছাড়িয়া আমরা ইতঃ ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট হইয়াছি। ঈশ্বরই সব, তাকে মা-ই বলি আর বাবাই বলি। তাই রামপ্রসাদ বলিতেছেন—

হব মা তোমার কোলের ছেলে,
তুমি যাবে কোথায় আমায় ফেলে,
ভজন সাধন নাহি জানি মা
সবই মা তোর চরণ তলে।

রামপ্রসাদের ভূমিকায় বিনয় গোস্বামীর অভিনয় কোন রকমেই নিন্দনীয় বলা যায় না। গানও মোটের উপর ভালই হইয়াছে। যদিও মা-গতপ্রাণ রামপ্রসাদ পাওয়া সহজ নয়, তথাপি অভিনয় ও গান আমাদিগকে তৃপ্তি দিয়াছে। সকলের সমবেত অভিনয়ও ভালই হইয়াছে। জমিদার অনন্তপ্রসাদের ভূমিকায় নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্রের অভিনয় ভাল হইয়াছে। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ অবস্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অত্যাচারের জন্য অনুতপ্তাবস্থা তিনি বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ইন্দু মুখার্জ্জী এবং বিদ্যাধরের ভূমিকায় ফনী রায় ভাল অভিনয় করিয়াছেন। গোপাল ভাঁড়ের ভূমিকায় রঞ্জিত রায় বেশ রসসৃষ্টি করিয়াছেন। কমলের ভূমিকায় মাষ্টার মীন্টু ভালই করিয়াছে। গঙ্গাধরের ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্য্য এবং সিরাজের ভূমিকায় ভুপেন চক্রবর্ত্তী এবং গোকুল মিত্র মন্দ হয় নাই। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে অন্যান্য ভূমিকা চলনসই। তবে বিদ্যাধরের পঞ্চম পক্ষের স্ত্রী মোক্ষদার ভূমিকায় রমা বেশ রস-সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়। 'ভাখনা' বলিয়া মুখ ঝামটা বেশ ভাল হইয়াছে। দৃশ্যগুলিও বেশ ভাল হইয়াছে। কালীর স্থানে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে কালী, কালীর বেড়ার বাঁধ দেওয়া এবং নদী-তীরের দৃশ্য বেশ ভাল হইয়াছে। কুমারহট্যবাসী অন্ধ গায়কের ভূমিকায় কৃষ্ণচন্দ্র দে'র অভিনয় এবং গান ভাল হইয়াছে। তবে তাহার শেষ সঙ্গীতটি—

"জাগ্রত কর দলিত মানবে মোহের তিমির নাশিয়ে"

—সমগ্র অভিনেতা, অভিনেত্রীর সহায়তায় হইলে আরও জমিত বলিয়া মনে হয়।

এবার এ্যামেচার অভিনয় কয়টি হইয়াছে। তন্মধ্যে হারাধন রায়ের "আগন্তুক" সুঅভিনীত হইয়াছে। হীরালাল কুণ্ডু, অনিল মিত্র ও মিঃ ব্যানার্জ্জী ভাল অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয়ে প্রকৃতভাবে লোকশিক্ষা ও রস-সৃষ্টি হইলেই অভিনয় সার্থক হইবে। থিয়েটার জাতির উপকারে আসিলেই আনন্দের বিষয়।

সম্পাদকীয়

গণ-পরিষদ ও মুসলিম-লীগ

গত ৫ই জানুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে মন্ত্রিমিসনের প্রস্তাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট ৬ই ডিসেম্বরের প্রধান-মন্ত্রী এট্‌লির ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা মাঘ সংখ্যায় পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। এখন আমরা আশা করিতেছিলাম যে, অতঃপর মুসলিম লীগ নিশ্চয়ই গণপরিষদে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ-কল্পে একসঙ্গে কংগ্রেসের সহিত কাজ করিবে। কিন্তু লীগ এখনও স্থাণুর ন্যায় অটল। গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে করাচীতে মুসলীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটীর যে বৈঠক হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে গণপরিষদে যোগদান তো করিবেই না, বরং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছে যে, তাঁহারা যেন একপক্ষের বৈঠক বলিয়া গণ-পরিষদটি ভাঙ্গিয়া দেন। মুসলীম-লীগ বলে :

"কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ৬ই ডিসেম্বরের ভাষ্য সমর্থন নহে, বরং উহার বিরোধী, সুতরাং ১৬ই মের মন্ত্রিমিসনের প্রস্তাবগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে ভারতের দুইটি প্রধান রাজনৈতিক দলের যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রয়োজন হইয়াছিল, কংগ্রেসের দোষেই সেই সহযোগিতা ও সম্প্রীতি ঘটিতে পারে নাই। কংগ্রেস যদি লীগের সুবিধানুযায়ী ব্যাখ্যায় ৬ই ডিসেম্বরের প্রচারিত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার বিবৃতি মানিয়া লইত, তাহা হইলেই লীগ বুঝিতে পারিত যে, কংগ্রেস সত্যকার সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু স্বার্থপর কংগ্রেস তাহা করে নাই। যে শাসনতন্ত্র রচনায় (Constitution making) দেশের কোন বৃহত্তর অংশ-বিশেষের সম্মতি থাকিবে না, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই আইন-অনুশাসন মানিয়া লইতে পারে না। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক ৬ই ডিসেম্বরে ব্যক্ত এই সুযোগপূর্ণ উক্তির ব্যাখ্যা কংগ্রেস করিয়াছে বিকৃত ভাবে। এই উক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ এবং আসামকে বি ও সি সেক্‌সনের কার্য্যবিধি হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইবার ইঙ্গিতপূর্ণ নির্দ্দেশ দিয়াছে। লীগের ভাব এই যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যে বীজ মন্ত্রিমিসনের প্রস্তাবে নিহিত ছিল, কংগ্রেসের চক্রান্তে তাহা ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় লীগ অতঃপরে আর গণপরিষদে যোগদান করিয়া কি ফল লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং না যাওয়ার সিদ্ধান্তই তাহারা করিয়াছে।"

কংগ্রেস ও জাতীয়বাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গি এক, মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র। পূর্ব্বপক্ষ চায় অখণ্ড ভারত, যাহা অন্ততঃ দুইশত বৎসর হইতে ভারতে সমভাবে চলিয়াছে, অপরপক্ষ চায় দ্বিখণ্ডিত ভারত। অথচ গত ৬২ বৎসর হইতে ভারতের সমস্ত প্রদেশ নিজ নিজ স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া সমগ্র ভারতের উন্নতিকল্পে সাধনা-নিরত রহিয়াছে। আর যে ভারতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শি বহুশতাব্দী হইতে পরস্পর পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্যবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতেছেন, লীগ চায় আজ তাহাদিগকে পৃথক করিতে। সুতরাং উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র বিধায়, মুসলীম লীগের সিদ্ধান্তে আমরা বিস্মিত হই নাই। তবে উহার অভিযোগগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

মুসলীম লীগের অভিযোগ যে, গণপরিষদ মাত্র এক-পক্ষের বৈঠক—ইহা নিতান্ত অমূলক ও ভিত্তিহীন। কারণ আমরা জানি, একমাত্র লীগ মনোনীত সদস্য ব্যতীত গণ-পরিষদে এখন হিন্দু, শিখ, তপশীল সম্প্রদায়, ভারতীয় খৃষ্টান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, আদিবাসী, এমন কি চারিজন মুসলমান সমেত ব্রিটিশ ভারতের সকল সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক পক্ষই যোগদান করিয়াছেন এবং তাঁহারা সকল রকম বাধা ও প্রতিরোধের মুখেই ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য বদ্ধপরিকর। ইহাতে প্রত্যেকটি মানবের ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকিবে এবং তাহাতে তাহার ধর্ম্মমতে কাহারও হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত দেশীয় নৃপতিবৃন্দও গণপরিষদে যোগদানের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন এবং কয়েকটি প্রাথমিক প্রতিবন্ধক বিদূরীত হওয়ায়, তাঁহারা গণপরিষদে যোগদান করিবেন, তাহারা একথাও ঘোষণা করিয়াছেন। অতঃপর এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া গণপরিষদ কেবল এক পক্ষের বৈঠকে পর্য্যবসিত

হইয়াছে—এই অভিযোগ নিতান্তই যে অমূলক, বিচারশীল ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা বুঝিতে একটুও দেরী হইবে না।

লীগের দ্বিতীয় এবং প্রধান অভিযোগ, কংগ্রেস আকাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা এবং সম্প্রীতি প্রকাশে বিরত রহিয়াছে। এই অভিযোগও নিতান্ত কল্পিত ও ভিত্তিহীন। কংগ্রেস দেশের বহু জনমত এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মের প্রস্তাব ও ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহন করিয়াছেন। এবং ইহা করিয়াছেন কেবল লীগের এবং অন্যান্য সকল দলের সহোযোগিতা লাভের জন্যই। আর পাঞ্জাবের শিখ ও আসাম অধিবাসীদের জন্য কংগ্রেস যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা কেবল গণতন্ত্রের অধিকার সম্মত নয়, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশানুযায়ীও। কারণ তাঁহারা স্পষ্ট বলিয়াছেন, "কোন শাসনতন্ত্রই অনিচ্ছুক কোন প্রদেশ বা খণ্ডপ্রদেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে না।"

লীগের রাগের আসল কারণ, তাহারা যে কোন প্রকারে (ছলে বলে কৌশলে) পাকিস্তান চায়, কিন্তু কংগ্রেস তাহাতে সহায়তা প্রদান করিতেছে না। লীগ যদি অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়, কংগ্রেসের সহযোগিতা পাইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু লীগ পাকিস্তান চায়, হয় লড়কে লেংগে নতুবা কেবল লীগ পন্থিগণের ভোটের জোরে। লড়কে লেংগে—বিফল হওয়ায়,এখন বাঙ্গলা ও আসামের ৩৬টি লীগপন্থী মুসলমানের ভোটের জোরে অমুসলমান গরিষ্ঠ আসামের উপর এবং অমুসলমান বাঙ্গালীর উপরে জোর করিয়া শাসনতন্ত্র প্রয়োগ করিতে চায়। এখন আসামবাসিগণ এবং অমুসলমান বাঙ্গালিগণ তাহাতে ভয় পায়। যদি লীগপন্থী মুসলমানগণ বলিত, 'আমরা বাঙ্গালা এবং আসামের গণতন্ত্রানুযায়ী এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতামূলক এমন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে চাই, যাহাতে কাহারও ধর্ম্ম, জাতি, সমাজ ও শিক্ষার উন্নতিতে বাধা হইবে না', তবে কংগ্রেস নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিত। কিন্তু তাহারা তাহা বলিতেছে না, সুতরাং আসাম, পাঞ্জাবের শিখ এবং বাঙ্গালী অমুসলমান সত্যই ভয় পাইতেছে এবং এমতাবস্থায় কংগ্রেস যে বিধান দিয়াছেন, তাহা যেমন মন্ত্রিমিসনের ব্যবস্থার অনুকূলে, অপরদিকে তেমনি গণতন্ত্র-অনুযায়ী। সুতরাং লীগের অভিযোগ কেবল আত্মপক্ষস্থিত ও স্বার্থমূলক নয়, অপরপক্ষের স্বার্থের বিরোধীও। তাই মুসলীম লীগ নিজ উদ্দেশ্য সাধিত না হওয়ায়ই তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না এবং বিনাকারণে কংগ্রেসের প্রতি দোষারোপ করিতেছে। বিশুদ্ধ ও খোলা মন নিয়া গণপরিষদে যোগদান করিতে স্বীকৃত না হইয়া মুসলীম-লীগই সকল সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। নিজেদের আন্তরিক চেষ্টায় ঘরের যে বিবাদ অবাধে মিটিয়া যাইতে পারিত, সেই আন্তরিক প্রচেষ্টার পথে না গিয়া লীগপন্থীরা বরাবরই পরের মুখাপেক্ষী হইয়াছেন। জিন্না-চার্চ্চিল মৈত্রী প্রকৃত হোক কি না-হোক, কিন্তু আমরা বিস্মিত হই, জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যা কি ভারতে এতই কম যে তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে, আমরা যাহা করিব নিজেরা আপোষেই করিব নতুবা তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ কেবল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি এবং স্বাধীনতার পথে বাধাই জন্মাইবে এবং ভারতের হিন্দু-মুসলমান যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই থাকিবে।

গণপরিষদ ও অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার

মুসলীম লীগ গণপরিষদে যোগদান করিতে বিরত হওয়ায় এখন দুইটি প্রশ্ন প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কি গণপরিষদ বন্ধ করিয়া দিবেন? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গণপরিষদে সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সদস্য থাকাতে এবং গণ পরিষদ যেরূপ সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে গণপরিষদ বন্ধ করিয়া দেওয়ার কোন কারণ নাই। ইহা সত্ত্বেও যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করে, তবে বুঝা যাইবে, প্রকৃতভাবে গণপরিষদে শাসনতন্ত্র রচিত হোক, ইহা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চাহেন না। কিন্তু এখনও কোন কোন বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইলেও,তাহারা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া গণপরিষদের বৈঠকে মত দেয় নাই, এরূপ সিদ্ধান্তে আমরা নিঃসন্দেহ ভাবে উপনীত হইতে পারি নাই। তাই লণ্ডনের টাইমস্ (Times of London) এর সঙ্গে আমরা একমত যে গণপরিষদ চলিবেই এবং মুসলীম লীগের করাচী প্রস্তাব একেবারেই সমীচীন হয় নাই। কারণ যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এখন বলিতেছে, অসম্মত কোন প্রদেশের উপরে শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া হইবে না, তাহারই কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের জেদাজেদিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের উন্নতির পথ ব্যাহত হইবে না। সুতরাং আমাদের মনে হয় গণপরিষদের কার্য্য অক্ষুন্ন ভাবে চলিবে এবং মুসলীম লীগের অসম্মতিমূলক প্রস্তাবে এখন আর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—এই অসম্মতির পরে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে (Interim Government) মুসলীম লীগের সভ্যগণের কি স্থান আছে? আমরা মনে করি, যদি মুসলীমলীগের সদস্যগণ সহযোগিতার মনোভাব লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে

যোগদান করিত, তবে এরূপ প্রশ্নের কারণ উদ্ভব হইত না। কিন্তু তাহারা অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিবার পর হইতেই স্বাধীনতার পথে অগ্রগামী অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারকে তাহারা তাঁবেদারী গভর্ণমেণ্টে পরিণত করিতে চাহিতেছে। সুতরাং এখন তাহাদের অবস্থান একটা সমস্তামূলক প্রশ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরন্তু তাঁহারা অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যেন নূতন একটা দল গঠন করিয়াছেন, এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত সহযোগিতা করিতে তাঁহারা নিতান্তই নারাজ। এমন কি বাজেট (আয় ব্যয় সংক্রান্ত) বিষয়েও অর্থসচিব মিঃ লিয়াকত আলী খাঁ, প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল প্রমুখ অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত তাঁহারা সহযোগিতা করিতে একেবারেই রাজী নহেন। এমন কি হাজারা জিলায় আততায়ীগণের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে জামিন প্রভৃতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদ আলোচনা প্রসঙ্গে অন্যতম মন্ত্রী আবদুর রব্ নিস্তার এবং মিঃ গজনফর আলী প্রভৃতি পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের (অর্থাৎ পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতির) বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন। ফলে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। আরও একটা বিষয় বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। করাচীতে এক অভিনন্দন সভায় মিঃ গজনফর আলী 'ভারতে—বিদেশাগত মুসলমান আক্রমণের' আভাষ দেওয়ায়ও একটা জটিল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাপার বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট প্রধানমন্ত্রী (Premier) শ্রীযুক্ত জওহরলাল জানাইয়া বিশেষতঃ গণপরিষদ বর্জ্জন করার জন্য বড়লাটের স্বীকৃতি অনুযায়ী লীগ সদস্যগণকে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার হইতে সরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। বড়লাট বাহাদুর আবার মিঃ লিয়াকত আলীকে সেই চিঠিখানি দেখাইয়া এবং তাঁহার বক্তব্য সংগ্রহ করিয়া দুইখানি পত্রই বিলাতে পাঠাইয়াছেন। বিলাতের গভর্ণমেণ্ট এখন কি উত্তর দেন এবং অতঃপরে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা দেখিবার জন্য দেশবাসী বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া রহিয়াছে। তবে মিঃ আসফ আলী এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব বেভিনের বক্তৃতায় মনে হয়, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এত সহজে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিবেন না। পরন্তু তিনি মিঃ জিন্নার পাকিস্থানি প্রসঙ্গ এককথায় উড়াইয়া দিয়াই দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন যে, উত্তর হইতে অগ্রসরনিরত রাশিয়ার ক্রমবর্দ্ধনশীল প্রভাবহেতু এবং আমেরিকার সর্ব্বগ্রাসী অর্থপ্রাবাল্যসূচক সাম্রাজ্যনীতির দরুণ ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করা বৃটেনের স্বার্থের পক্ষে একান্ত অনুকূল।

যাহা হউক, কি সিদ্ধান্ত হইবে, ইহার উপরে অনুমান বা কল্পনা না করিয়া আমরা স্পষ্টভাবে বলিতেছি যে, লর্ড ওয়াভেল স্থির সিদ্ধান্তে না আসিয়া বিষয়টি যে বিলাতে পাঠাইয়া কালক্ষেপণ করিতেছেন, তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। যে সময়ে মুসলীম লীগের অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদানের কথা হয়, তখন লর্ড ওয়াভেল স্বীকৃত হন যে, তাহারা মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবে এবং ২৯শে জুন তারিখে গণপরিষদে যোগদানে বিরত হইবার প্রস্তাবটি নাকচ করিবে। এখন গণপরিষদে যোগদানে বিরত থাকিবার সঙ্কল্পে মুসলীম লীগ যখন দৃঢ়মনোরথ, তখন তাহাদের স্থান অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে কিছুতেই থাকিতে পারে না, ইহা সাধারণ বুদ্ধিতেও বুঝা যায়।

কিন্তু মিঃ জিন্না বলিতেছেন, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিবার সময় ২৯শে জুনের প্রস্তাব নাকচ করিবেন, বড় লাটকে এরূপ আশ্বাস তিনি দেন নাই। লর্ড ওয়াভেলের এখন সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত যে, মুসলীম-লীগ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই এবং তদনুযায়ী অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে লীগ মন্ত্রিগণের স্থান নাই। তাহা হইলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিশ্চয়ই পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ জাতীয়বাদী মন্ত্রিগণ করিবেন।

লর্ড ওয়াভেলকে আর একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। জুন মাসে যে সময়ে কংগ্রেস গণ-পরিষদে যোগদান করিবে সিদ্ধান্ত করায় মন্ত্রীমিশন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার পরে গঠন করিবার অভিলাস করেন বলিয়া বিলাতে রওয়ানা হইবার উপক্রম করেন, তখন মিঃ জিন্না লর্ড ওয়াভেলকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য দোষারোপ করিয়াছিলেন। স্মরণ থাকিতে পারে, তখন পর্য্যন্ত গণপরিষদ এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিবেন, এইরূপ লীগের সিদ্ধান্ত বলবৎ ছিল। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল তখন স্পষ্টভাবে ২৫শে জুন তারিখে উত্তর দেন :—

"মহাশয়, আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি নাই। যাহারা গণ-পরিষদে যোগ দিবে, তাহাদের লইয়াই অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠিত হইবে, এবং তাহা নিশ্চয়ই কিছুদিন মধ্যে করিব।"

গণ-পরিষদে যোগদানকারীদের মধ্য হইতেই অথবা অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত লর্ড ওয়াভেল যখন বার বার করিয়াছেন, তখন গণ-পরিষদে যোগদান না করায় ওয়াভেলের কথায়ই অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে স্থান যে মুসলীম লীগের নাই, এ-বিষয়ে নিশ্চয়ই তিনি জানেন। তবে যে কেন তিনি মুসলীম লীগকে এত তোষণ করিতেছেন, তাহার কারণও অনুধাবনযোগ্য। ১৬ই আগষ্টের পরেও লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীকে সমভাবে তিনি গদিতে বসিবার অধিকার দিয়াছেন, অন্যথা তিনি মোচড় দিলে বাঙ্গলার গভর্ণর কিছুতেই প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্ট মন্ত্রীমণ্ডলী বাঙ্গলার মসনদে রাখিতেন না। নোয়াখালীতে হত্যা, লুণ্ঠন, বলাৎকার, নারী অপহরণ, বলপূর্ব্বক বিবাহের প্রাবল্য দেখিয়াও সামান্যভাবেও তিনি অঙ্গুলীহেলন করেন নাই, এমন কি সেখানে একবার যাওয়াও উচিত বিবেচনা করেন নাই। এখন আবার প্রতিশ্রুতি মত কার্য্য না করিয়া অতিরিক্তভাবে লীগ তোষণনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। উদারমনোভাবসম্পন্ন বলিয়া লর্ড ওয়াভেলকে পূর্ব্বে যেরূপ আমরা অনুমান করিয়াছিলাম, বারবার তিনি নিজেই আমাদের সেই বিশ্বাসে প্রচণ্ড কুঠারাঘাত করিতেছেন। অন্ততঃ ভারতসাম্রাজ্যের শাসন ব্যাপারে তিনি যেরূপ অসঙ্গত দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার আর মুহূর্ত্ত মাত্রও এই শাসনতন্ত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা উচিত নয়। শুনিতেছি, ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব (১৯৩০) শ্রমিক প্রতিনিধি কর্ণেল ওয়েজউড বেন (বর্ত্তমানের লর্ড ষ্টানগেট্) ভারতে বড়লাট হইয়া

আসিবেন। বর্ত্তমানে এই সংবাদ জনরব মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ যদি ইহা কার্য্যে পরিণত হয়, তবে লর্ড ওয়াভেলের ন্যায় দুর্ব্বল শাসন-কর্ত্তার ভারতত্যাগে আমরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইব না।

যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পণ্ডিত নেহেরুর অনুরোধের সদুত্তর না দেন এবং সেই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসদল যদি অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার পরিত্যাগ করে, তবে, নিরপেক্ষ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশনের মিঃ ফ্রাঙ্ক এণ্টনি যে বলিতেছেন, "একপ ব্যাপার হইলে এক বৃহৎ বিপর্য্যয় হইবে, এবং দেশব্যাপী গুরুতর আশঙ্কার আশঙ্কা রহিয়াছে" তাহা প্রণিধানযোগ্য। ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তাগণ ভারতের এই অবস্থা হইতে ভারতকে রক্ষা করিয়া কংগ্রেসকে কি শান্তিপূর্ণ ভাবে গঠনমূলককার্য্যের প্রসার করিতে অবসর দিবেন না?

পঞ্চনদে ব্যক্তি-স্বাধীনতা

পঞ্চনদে সম্মিলিত মন্ত্রিমণ্ডলী পাব্‌লিক সেফ্‌টি অর্ডিন্যান্সের সহায়তায়, দুইটী প্রতিষ্ঠানকে বে আইনী ঘোষিত করায়, সমগ্র ভারতে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের একটী হিন্দু প্রতিষ্ঠান স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, আর একটী মুসলমান প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট অজুহাত দেন, সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইবার আশঙ্কায় এই দুইটী দলকে বে-আইনী (unlawful assembly) সঙ্ঘ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ঘোষণার পরে উভয় প্রতিষ্ঠানের অফিসে খানাতল্লাস হয়। হিন্দু প্রতিষ্ঠানটি কোনরূপ বাধা দেয় না, কিন্তু মুসলমান প্রতিষ্ঠানটি বাধা দেয় এবং ইহার ফলে স্যার (এখন মিঃ) ফিরোজ খাঁ নুন, বেগম শা নওয়াজ প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ধৃত হন। খানাতল্লাসে অসংখ্য লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং তদনুরূপ পোষাক পরিচ্ছদ ও কিছু কিছু সাজসরঞ্জাম পাওয়া গিয়াছে অবশ্য উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অতঃপরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অতঃপরে লীগের মুসলমানগণ সমগ্র প্রদেশে আইন অমান্য করে। অনেক ব্যক্তি ধৃত হয়, বহু লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কাহারও কাহারও বিচারও হয়। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী স্যার খিজির হায়াৎ খান তেওয়ানা উভয় সঙ্ঘের প্রতি নিষেধাজ্ঞাই প্রত্যাহৃত করেন। তবে ১৪৪ ধারার প্রয়োগ ও অন্যান্য শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎই বলবৎ রাখেন।

সম্প্রতি পঞ্চনদে আইন অমান্য আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু মুসলীম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্না বিগত করাচী অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটী হইতে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষাকল্পে এই সমস্ত বিধি-নিষেধ উঠাইয়া দিবার জন্য ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল এবং পাঞ্জাব প্রদেশের গবর্ণরকে অনুরোধ করিয়াছেন।

পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের বিধান যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি অনুচিত হইয়াছে, সমস্ত বিষয় অবগত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সে বিষয়ে বিশেষ মন্তব্য করিতে চাহি না। তবে মুসলীম লীগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্যই যে গবর্ণমেণ্ট এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমরা সেরূপ কিছু দেখিতে পাই না। বরং সাম্প্রদায়িক গোলমাল বন্ধ করিবার জন্যই ঐ সমস্ত পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। সাম্প্রদায়িক শান্তি বিধানমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে মুসলমান সংখ্যাধিক্য প্রদেশ পাঞ্জাব এবং বাঙ্গলার অবস্থা তুলনা করিলে পাঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডলীকে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিধানের জন্য বিশেষভাবে সাধুবাদ প্রদান না করিয়া পারা যায় না।

তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার ব্যগ্রতা দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব—কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না। কয়মাস হইতে বাঙ্গলায় যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে, তিনি কি তাহার জন্য সামান্য ভাবেও অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়াছেন? বাঙ্গালায় সভা-সমিতি হইতে পারিতেছে না, পাঁচজন লোক একত্র হইলে বে-আইনী হয়। সংবাদ-পত্রের কণ্ঠ নির্দ্দয়ভাবে রোধ করা হইয়াছে। অর্ডিন্যান্স (জরুরী আইন) ও নূতন নূতন আইনে বাঙ্গলা জর্জ্জরিত। বাঙ্গলার অমুসলমান সংখ্যায়, অর্ডিন্যান্সের জ্বালায় একান্ত মুহ্যমান। পাঞ্জাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট এবং মিঃ জিন্নাই মুসলমানদের হইয়া বলিতেছেন। মিঃ জিন্না-কল্পিত পাকিস্তানে অমুসলমানদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইবে বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। তবে বাঙ্গলার অমুসলমানদের ব্যক্তি স্বাধীনতা অপহৃত হইলেও এবং এই বিষয়ে বাঙ্গালী অমুসলমানগণ বার বার নিবেদন জানাইয়া গবর্ণর এবং মন্ত্রিমণ্ডলী হইতে কোনরূপ ফললাভে অসমর্থ হইলেও বাঙ্গলা সম্বন্ধে মিঃ জিন্না নীরব কেন? অতঃপরে ইহাই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত নয় যে—মিঃ জিন্নার প্রস্তাবিত পাকিস্তানে অমুসলমানদের স্বার্থ-সংরক্ষণ বিষয়ে আশ্বাস নিতান্ত ভুয়া ও মূল্যহীন?

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ

সম্প্রতি একদল লোকের মাথায় কি এক খেয়াল চাপিয়াছে যে, বাঙ্গালী হিন্দুদের রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা বাঙ্গালা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। আশু একটু সুবিধার প্রলোভনে তাঁহারা যে বাঙ্গালা দেশের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুর কতদূর সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম। উপরন্তু এই আত্মঘাতী আন্দোলনের স্বপক্ষে কয়েকজন নামকরা ব্যক্তি থাকায় ইহা আরও উত্তেজনপূর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, পূর্ব্ব বাঙ্গালা মুসলমান-দিগের সম্পূর্ণ আয়ত্বে দিয়া হিন্দুদের জন্য পশ্চিম বাঙ্গালা

রাখিলেই সব সমস্যার মীমাংসা হইবে। ইঁহারা ভাবেন, কলিকাতা সমেত পশ্চিমবঙ্গ থাকিলেই বাঙ্গালার সংস্কৃতি থাকিবে এবং জিতপায়া, তাহাদেরই হইবে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ইঁহারা যে নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিতে কিরূপে নিজেদের স্কন্ধে শানিত অস্ত্র প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা এইখানে আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

মুসলীম লীগ কি চান, তাহা দেখিতে হইবে। তাঁহারা চান পাকিস্তান। এবং পাকিস্তান তাঁহারা চান কেবল বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য নয়, ভারতের সমগ্র মুসলমানদের জন্য। আর পূর্ব্ব-পাকিস্থানে তাঁহারা বাঙ্গলা ও আসাম চাহিতেছেন। কিন্তু আসাম বাঁকিয়া বসিয়াছে, কিছুতেই সে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের প্রাধান্য দিবে না; এদিকে উদার বাঙ্গলা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সুবিধার জন্য অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত, কেননা "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" গৌড়াধিপতি যেমন সপ্তদশজন অশ্বারোহীর আগমনে খিড়কীর দরজা দিয়া নৌকায় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন, এখনও অর্দ্ধেক দিয়া কৃষ্টি রক্ষার জন্য এরূপ নিকর্ম্মা ব্যক্তিগণ শান্তির প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু গৌড়াধিপতির পলায়নেও যেমন পূর্ব্ববঙ্গ রক্ষা পায় নাই, অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বাঙ্গলা ও আসাম এক্ষেত্রে পলায়নেও কিছুতেই সংরক্ষিত হইতে পারিবে না, সে কথা সুনিশ্চিত। বাঙ্গালাদেশে তিনকোটি ত্রিশলক্ষ মুসলমান এবং ২ কোটি ৭৩ লক্ষ অ-মুসলমান। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য কেবল ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী বিভাগ দিলেই শেষ হইবে না। বেশ, ধরিলাম, এই তিনটী বিভাগ পাইয়াই মুসলমানগণ কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ইহার পরে বেহারের মুসলমান যদি বর্দ্ধমান বিভাগে ক্রমাগত আসিতে থাকে, আর ঢাকা বিভাগের মুসলমানগণ যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে প্রেসিডেন্সি বিভাগে আসে,—তবে ব্যক্তি-স্বাধীনতার খাতিরে তাহাদিগকে বাধা দিবে কে একটা স্থান - পূর্ব্ব-বঙ্গ তো তাহাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তে রহিলই, সেখানেতো হিন্দুর স্থান নাই-ই, আবার দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় ক্রমে লোকসংখ্যা এইসব স্থানে বৃদ্ধি করিয়া ক্রমে সেইসব স্থানেও মুসলমানের প্রাধান্য করা সহজ হইবে। কারণ দেশ হইতে পলাতক হিন্দুদিগকে পশ্চিমবঙ্গেও অতঃপরে পরাভূত বা আয়ত্ত করা খুবই সহজ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ক্রমে এই মুসলমানের বলবৃদ্ধি দেখিয়া পলাতক হিন্দুরা আরও একটু পশ্চিমে সরিয়া কতকটা শান্তি-সোয়াস্তির জন্য, কতকটা কাশীবাস প্রভৃতি ধর্ম্মস্থানে বাসের অছিলায় চলিয়া যাইবে এবং এদিকে যশোহর, খুলনা, নদীয়া এবং আসানসোলের মুসলমানদের সহায়তায় মুসলীম লীগ বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগও নিজ করায়ত্ত করিয়া ফেলিবে। ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালাদেশই পাকিস্তানে পরিণত করিয়া মুসলমানরা আজ যাহা চাহিতেছে, সেই পাকিস্তান দুই চারি দশ, উর্দ্ধসংখ্যা ২৫ বৎসরের মধ্যেই একেবারে কায়েম করিয়া নিবে। সেই অবস্থায় আর বেচারা আসাম কি করিবে? একে পূর্ব্ববাঙ্গালা সম্পূর্ণ মুসলমান করায়ত্ত, আসামের সিলেট, কাছাড়ও তাহাদের। সেই অবস্থায় আসামের পক্ষে আর প্রবাসী বিতাড়ন তেমন সহজ হইবে না। পূর্ব্ব বাঙ্গালা করতলগত করিয়া মুসলমানগণ সে স্থান হইতেই যদি অসংখ্য মুসলমান কার্য্যব্যপদেশে আসাম পাঠাইতে থাকে, আসামের করিবার কি থাকিবে? বাধা দেওয়ারই বা তাহার শক্তি কোথায় থাকিবে? সুতরাং আস্তে আস্তে আসামও তাহাদের হাতে পড়িয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান একেবারে সহজ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। মুসলমানরা আজ যাহা পাইতেছে না, দয়ালু বাঙ্গালী হিন্দু যদি সহজ করিয়া তাহা তাহাদের মুখে ফেলিয়া দেয়, সে অবস্থায় এমন দাঁও কেউ ছাড়ে?

সহজে পূর্ব্ব পাকিস্থান লাভ হইল। পশ্চিম পাকিস্থানতো একরকম হইয়াই আছে। সুতরাং কংগ্রেস ধস্তাধস্তি করিয়া যাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে, কতকগুলি মস্তিষ্ক-বিহীন আত্মসর্ব্বস্ব স্বচ্ছন্দগতি বাঙ্গালী হিন্দুর চেষ্টায় তাহা যে সহজলব্ধ হইবে, তাহা ভাবিয়াও যদি সমগ্র বাঙ্গালী এইরূপ হীন ও ঘৃণিত পথে যাইবার সঙ্কল্প নির্ম্মূলিত না করে তবে তাহাদের বাঁচিয়া থাকায় কাহারও সামান্য হিতও হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান ভ্রাতাগণকে সমানাধিকারের সত্যতা না বুঝাইয়া লোভ দেখাইতে যাওয়া চরম মূর্খতা। সর্ব্বত্যাগী মহাপ্রাণ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার হিতের জন্য যে হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম ছিল স্বরাজ লাভে নিজেদের বোঝাপড়া হওয়া এবং প্যাক্ট অনুযায়ী লাভ হইবার কথা ছিল স্বরাজ লাভের পরে। কিন্তু প্যাক্টের পরেই মুসলমানরা প্যাক্টের সমস্ত সর্ত্ত যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তজ্জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দেশবন্ধুর সমগ্র মিলন-চেষ্টা উল্টাপথে প্রধাবিত করিয়া সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্য ঘোরতর কলহে পরিণত করা হইল। কেবল মুসলমানের কথাই বা বলি কেন, ইতিহাসই সাক্ষ্য দিতেছে যে, ঘুষ দিয়া কেহ কখনও কোনও জাতকে থামাইতে পারে নাই। পরলোকগত অষ্টিন চেম্বারলেন ঘুষ দিয়া হিট্‌লারকে প্রতিহত করিতে পারেন নাই, নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ চৌথ দিয়াও বর্গীর আক্রমণ হইতে বাঙ্গলাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইংরাজ এথেলরেড ডেনদিগকে ঘুষ দিয়াও ইংলণ্ড

আক্রমণে বাধা দিতে পারেন নাই। তাই কোনরূপ ঘুষে মুসলমানকে থামাইতে পারা যাইবে না। পূর্ব্ব পাকিস্তান অচিরে তাহাদের হস্তগত হইবেই।

তবে প্রশ্ন এই যে, বাঙ্গালা দেশের কৃষ্টি কিরূপে রক্ষা পাইবে? রক্ষা পাইবে বাঙ্গলাদেশের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসায়, পলায়নে নয়।

আজ ভ্রান্ত পথে চলিয়া বুঝিতে না পারিলেও, একথা ঠিক যে, হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালার সন্তান, মিলনই স্বাভাবিক, দ্বন্দ্ব অস্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও বাঙ্গালা দেশে হিন্দু-মুসলমান ভাই চাচার মত বাস করিয়াছে এবং কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও গাজীপীরের সিন্নি করিয়াই একত্র দিন গুজরান করিয়াছে। এই ভাবই ছিল স্বাভাবিক। গত আগষ্টের দ্বন্দ্ব বা নোয়াখালী বিহারের ঘটনাই অস্বাভাবিক। আজ মহাত্মা গান্ধী এবং সীমান্ত গান্ধীর দৃষ্টান্তে হিন্দু-মুসলমান বুঝিতেছে, আমরা পৃথক হইব না—শত্রু যতই চেষ্টা করুক না কেন। তাহারা বুঝিয়াছে, বাঙ্গলার কৃষ্টিই বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি। হিন্দু-কৃষ্টি বা মুসলমান-কৃষ্টি বাঙ্গালার নিজস্ব কৃষ্টির অনেক নীচে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে উচিত যে, এই কৃষ্টিতেই সমস্ত বাঙ্গালী সেবকগণ আর্ত্তকে সাহস দিবেন। একদিকে যেমন আততায়ীর আক্রমণ হইতে শরণাগতকে বা দুর্ব্বল ও ভয়ার্ত্তকে রক্ষা করিতে সমস্ত সাহস ও শক্তির ব্যবহার করিতে হইবে, আবার সহজাবস্থায় সমগ্র বাঙ্গালীর, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের মিলনের জন্য প্রেম, নিঃস্বার্থভাব এবং ত্যাগ স্বীকারের ত্রুটী না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। এই মিলনের জন্যই মহাত্মা গান্ধী প্রাণপাত করিতেছেন, সস্ত্রীক রাষ্ট্রপতি অক্লান্ত সেবা ও তৎপরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এই মিলনের জন্যই সহস্র সহস্র আত্ম-ভোলা সেবী আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ভাইসব একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যে, সেই মিলনের দিকে যাইবে, না কতিপয় স্বার্থান্বেষী বিলাসসুখপ্রিয় নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তির—যাহারা কখনও নিপীড়িত স্থানে একবার ঘুরিয়া আসাও উচিত মনে করে নাই—তাহাদের কথায় নিজেদের মাতৃচ্ছেদনের পথ সুগম করিয়া দিবে?

সম্প্রতি আবার দেখিতেছি, হিন্দু মহাসভা এই বিষয়টি পাকা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় পাবনায় বক্তৃতা কালে যে কথাটি বলিয়াছেন, দেশবাসীকে আমরা তাহা প্রণিধান করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। তিনি বলিয়াছেন "বাঙ্গলা দেশ যাহারা বিভক্ত করিতে চাহে, তাহারা দেশের ঘোরতর শত্রু"। আমরা শরৎ বসুকে সমর্থন করিয়া এই কথাটিই দেশবাসীকে কেবল বুঝিতে বলি যে, মধ্যবিত্তগণ যাঁহারা পূর্ব্বেই বাড়ীঘর ছাড়িয়া আসিয়াছেন বা পলায়নোন্মুখ, তাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষা তিলি, সাহা প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ, নিপীড়িত জাতি, কৈবর্ত্ত, ভূঁইমালী, মালাকার, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লোক যাহারা পূর্ব্ব-বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা, তাহাদের অবস্থাই একবার ভাবিয়া দেখুন। যদি এই সমস্ত নিরুপায় লোকদিগকে মুসলীম লীগের কবলে ফেলিয়া আমরা বাঙ্গলার কৃষ্টি, শিক্ষা বা সংস্কৃতির দোহাই দেই, তবে হৃদয়ের বা জাতীয়তার দিক্ ছাড়িয়া দিলেও, কৃষ্টির দিক্ হইতেও ইহার শ্রাদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা সমস্ত বাঙ্গালীকে স্থির মস্তিষ্কে ভাবিতে বলি, তাঁহারা মতিচ্ছন্ন হইয়া যেন মুসলীম লীগের ঈপ্সিত জিনিষটি বিনায়াসে তাহাদিগের করায়ত্ত করাইয়া না দেন।

একমাত্র তখনই বিষয়টি বিবেচনাধীন হইতে পারে, যখন সি সেকসন (গ-বিভাগ) মণ্ডলীতে গিয়া একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিবে, এবং সেই শাসনতন্ত্রে ৩৬ জন মুসলীম সভ্য ৩৪ জন অমুসলমান অপেক্ষা প্রধান হইয়া আসামকে এবং বাঙ্গালী হিন্দুকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে। কেবল সেই অবস্থায়ই এবং সেই সময় পশ্চিম বাঙ্গলা বলিতে পারে—এই শাসনতন্ত্র আমাদের উপরে চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, আমরা 'ক' সেকসনে চলিয়া যাইব। যদি এইরূপ অবস্থা হয়, অর্থাৎ মুসলীম লীগ যদি গণপরিষদে যোগদান করে এবং তাহাদের ৩৬ জনের ভোটে যদি বাঙ্গালী হিন্দুর এবং আসামের কৃষ্টি সভ্যতা, শিক্ষা ধর্ম্ম বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবেই এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে। তখন মুসলীম লীগ পূর্ব্ব বাঙ্গলায় কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া অমুসলমানদের সহিত সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইবেই। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সে অবস্থা না উপস্থিত হইবে, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপনই দেশদ্রোহিতা এবং বাতুলতা।

আমরা অর্থনীতি, জাতীয়তা, ধর্ম্ম, সংস্কৃতি এবং বহির্বাণিজ্যের দিক হইতে এই বিষয়টি আগামী বারে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করি।

পরিশেষে আমরা বাঙ্গলার কংগ্রেসকে আরও প্রাণবন্ত ও কর্ম্মশীল হইতে অনুরোধ করি। বাঙ্গলার কংগ্রেস শৃঙ্খলার দিক্ হইতে উৎকৃষ্ট সেনাবাহিনীর ন্যায় কাজ করিলেও, বাঙ্গলার প্রাণ বুঝিয়া ইহার ব্যবস্থা যে ইহারা করিতেছেন না—ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। ভরসা করি, বাঙ্গলার কংগ্রেস-কমিটী বঙ্গভঙ্গরূপ প্রলাপোক্তির যাহাতে প্রসার না হয়, তজ্জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ঐ যে কটিবস্ত্র-পরিহিত, অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব বাঙ্গালীকে বাঙ্গলার

মান-ইজ্জত রক্ষা করিতে সাধনারত হইয়া অবশিষ্ট জীবন বাঙ্গলার দুঃস্থ পল্লীতেই কাটাইবেন বলিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, বঙ্গবাসিগণ কি তাহাতে ঔদাসীন্য দেখাইয়া কতিপয় অপরিণামদর্শী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গলাকে রসাতলে দিবেন? বাঙ্গালী কি এতই নির্জীব ও মৃত যে তাহার সুবুদ্ধি হইবে না?

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী, ২৭শে মাঘ কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে অস্থায়ী চীফ একজিকিউটিভ অফিসার মিঃ এস্, এম্, ইয়াকুব কর্পোরেশনের বাজেট পেশ করেন। তদনুযায়ী ১৯৪৬-৪৭ ও ১৯৪৭-৪৮ সালের রেভিনিউ একাউন্টের আয়-ব্যয় এইরূপ দেখা যায়:

বৎসর	আয়	ব্যয়	ঘাট্তি
১৯৪৬-৪৭	৩,৬৮,৬৩,০০০	৪,৩৬,৯৬,০০০	৬৮,৩৩,০০০
১৯৪৭-৪৮	৩,৭২,৮৭,০০০	৪,২১,৩৪,০০০	৪৮,৪৭,০০০

১৯৪৬-৪৭ সালে ৬৮লক্ষ ৩৩হাজার টাকা ঘাট্তি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হয় এবং আগামী বৎসরের ঘাট্তির পরিমাণ আনুমানিক ৪৮লক্ষ ৪৭হাজার টাকা। এই-দুই-বৎসর মিলিয়া মোট অনুমিত ঘাট্তি লক্ষ্য করা যায় ১কোটি ১৬লক্ষ ৮০হাজার টাকা। পেশ করা বাজেটে চল্‌তি বৎসরে বিপুল ঘাট্তি পড়িবার কারণ স্বরূপ দেখানো হয় এই যে—গত বৎসর বাজেট পেশ করিবার সময় অনুমিত হইয়াছিল, ৩ কোটি ৭০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা আয়, এবং ৬কোটি ৮৬লক্ষ ৪৭হাজার টাকা ব্যয়,—সুতরাং মোট ১৫লক্ষ ৫৯হাজার টাকা ঘাট্তি হইবে। কিন্তু সারা বৎসর যেভাবে আয় ও ব্যয় হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমানে অনুমান করা যাইতেছে যে, এই-বৎসর মোট ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার বেশী আয় হইবে না, এদিকে ব্যয়ও দাঁড়াইবে ৪ কোটি ৩৬লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা। সুতরাং চল্‌তি বৎসরে মোট ৬৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে।

গত বৎসর বাজেট পেশ করার সময় ধরা হইয়াছিল যে, ঐ-বৎসর ১লা এপ্রিল রেভিনিউ একাউন্টে হাতে ৩৫লক্ষ ৩২হাজার টাকা থাকিবে, কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালের মধ্যে দাদনী ৬,২০,০০০— টাকা আদায় হয় নাই; ফলে ১৯৪৬ সালের ১লা এপ্রিল হাতে ছিল ২৯লক্ষ ১২হাজার টাকা। তাহাতে এই দাঁড়াইয়াছে যে, চল্‌তি বৎসরের শেষে রেভিনিউ একাউন্টে তো হাতে কিছু থাকিবেই না, বরং ৩৯লক্ষ ২১হাজার টাকা ধার করিয়া কাজ চালাইতে হইবে। আবার আগামী বৎসর যে ঘাটতি পড়িবে তাহা ধরিলে আগামী বৎসরের শেষেও হাতে কিছু থাকিবে না; বরং আগামী বৎসরের শেষে রেভিনিউ একাউন্টে ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা।

অস্থায়ী চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন; তন্মধ্যে একটি হইতেছে—বাড়ীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া শতকরা ২২৲ টাকা হারে ট্যাক্স ধার্য্য করা। ফাইন্যান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যেসব কর্পোরেশনের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিবর্গের এক ডেপুটেশন লইয়া কর্পোরেশনের আর্থিক সমস্যা আলোচনার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাত করিবেন।

১৯৪৭-৪৮ সালে বিভিন্ন খাতে নিম্নরূপ আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে:

বাড়ীর ট্যাক্স বাবদ ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; মোটর গাড়ীর লাইসেন্স সংক্রান্ত আয় গভর্ণমেণ্টের হাতে যাওয়ার ক্ষতিপূরণ বাবদ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; বিভিন্ন মার্কেট, কশাইখানা ও ধুপীখানা ১৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫ শত টাকা; ট্রামওয়েজ ও ইলেকট্রিক্ কোম্পানী ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা; জমি ও জমির উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী ১৩ লক্ষ ৪ হাজার টাকা; গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য ৫৫ লক্ষ ৭২ হাজার ৬ শত টাকা; জল বিক্রী ৯ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা; উদ্বৃত্ত নগত টাকার সুদ ২ লক্ষ টাকা; বিভিন্ন খাতে আয় ১০ লক্ষ ২৮ হাজার ৬ শত টাকা = মোট আয় ৩ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা।

১৯৪৭-৪৮ সালে বিভিন্ন খাতে অনুমিত ব্যয় হইবে নিম্নরূপ: বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন ১ কোটি ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ২ শত টাকা; ঋণ পরিশোধ ১৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা; ফায়ার ব্রিগেডের গুদাম ঘরের দরুণ ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৩ শত টাকা; ফ্রী লাইব্রেরী ৪০ হাজার টাকা; প্রাইমারী ও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৯৪ হাজার টাকা; প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিবিধান ১৪ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা; হাসপাতাল, ইণ্ডিয়ান রেড্‌ক্রশ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা; পেন্সন, গ্রাচুইটি ও প্রাইভেট ফণ্ড ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ১ শত টাকা; মোটর গাড়ী প্রভৃতির মূল্য ৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা; গার্ডেনরীচ্ মিউনিসিপালিটী ২৷০ লক্ষ টাকা, হরিজন্ কর্ম্মচারীদের চাকুরীর উন্নতিসাধন ১৫ হাজার টাকা, কর্ম্মচারীদের জন্য দুর্ম্মূল্য ভাতা—৬৩ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা; সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা; অন্যান্য বিভিন্ন খাতে ৫২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬ শত টাকা — মোট ৪ কোটি ২১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা।

অস্থায়ী চীফ্ একজিকিউটিভ অফিসার তাঁহার বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর এবং গভর্ণমেণ্ট-সাহায্য ব্যতীত অবস্থার প্রতিকার করা দুরূহ। স্বাভাবিক ভাবে কর্পোরেশন যাহা সংগ্রহ করিবেন, তাহা ছাড়া অবিলম্বে ৭৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইয়াছে। এই টাকা যদি এখনই তাঁহারা না পান, তাহা হইলে তাঁহার আশঙ্কা হয় যে, হয়ত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকিবে না।

এ সমস্যা এ বৎসরের নতুন নয়।

এ-সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বাপর বৎসরে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছি। আজ এই মুমূর্ষু অবস্থায় কর্পোরেশনকে দাঁড়াইতে হইয়াছে কেন, তাহা কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষই হয়ত ভালো জানেন। গভর্ণমেণ্টের হাতে কর্পোরেশনকে তুলিয়া দিবার মত দুঃস্বপ্ন যদি মনে জাগিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে—সেই মন স্বাধীনতা সংগ্রামমুখী স্বদেশী মন নয়, প্রেত-মন। এই প্রেতমুখীতার পঙ্কিল হইতে জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে যে ভাবেই হউক রক্ষা করিতে

"কুসুমের সনে চুপে চুপে আমি
হাসি আর কথা বলি,
গাগরি আমার ওঠে যে গো উচ্ছলি'।"

[ফটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ]

"এই যে আমি হারিয়ে গেছি বসন্তেরি বনে
নাই বা তোরা রাখ্‌লি আমায় মনে।"

[ফটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ]

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

চতুর্দ্দশ বর্ষ } চৈত্র—১৩৫৩ { ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

অমিতাভ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংরাজীতে কথা আছে যে, যেমন প্রাতঃকাল দেখিয়া সমস্ত দিনের সম্ভাবনা বুঝা যায়, তেমনি শৈশব দেখিয়া বালকের ভবিষ্যৎ জানা যায়; সে কথা নবীনচন্দ্রের জীবনে খাটে না। যে বালক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে 'wicked the great' নামে খ্যাত হইয়া, পরবর্ত্তী জীবনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিয়া, গভর্ণমেণ্টের বিচার-বিভাগে কার্য্য করিয়া আপনার জীবন গঠন করিয়াছিলেন এবং যিনি কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভাব-সঞ্জীবনী যুগের অন্যতম মহাকবি, আদর্শ-প্রবর্ত্তক ও প্রচারক হিসাবে কালজয়ী গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আছেন, তাঁহার জীবন যে বাল্যে ঐরূপ ছিল, ইহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যিনি অমরতা লাভ করিবেন তাঁহার মনীষা কোনদিনই নষ্ট হইতে পারে না। সে ঠিকই আপনার পথ খুঁজিয়া লয়। তাই নবীনচন্দ্রের মনীষা বিনষ্ট হয় নাই।

নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ মহাকবি। তিনি 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিয়া বিখ্যাত হ'ন। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে নবীনচন্দ্র 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ'কে দেশপ্রেমিকতার কার্য্যে লাগাইয়াছেন। ইউরোপীয় স্বাতন্ত্র্যবাদকে ভারতীয় দেশপ্রেমিকতায় রূপান্তরিত করিয়া ইনি তদানীন্তন সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কুরুক্ষেত্র, প্রভাস ও রৈবতক-এ তাঁহার পাশ্চাত্ত্য ভাব-ধারাকে ভারতীয় ছাঁচে গড়িবার প্রয়াস দৃষ্ট হয়, তবে তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেবচন্দ্র সে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র মহাকবি, ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। বর্ত্তমানে আমরা নবীনচন্দ্রের যে মহিমময় গ্রন্থখানি লইয়া আলোচনা করিব তাহার মধ্যে তাঁহার প্রচারক ও ব্যাখ্যাতৃ-জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অপরের যে ধারণাই থাকুক, নবীনচন্দ্রের মতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তিনি বলিয়াছেন—"বুদ্ধমত সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের একটী মত মাত্র। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধ মতে অনুপ্রাণিত। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বৌদ্ধধর্ম্ম অনুপ্রবিষ্ট ও নিবিষ্ট।......স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবের উদ্ধারের জন্য তিনটী মহৎ পথে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার গীতায় দেখাইয়া দেন—জ্ঞানপথ, কর্ম্মপথ ও ভক্তিপথ। তিনি তিনেরই সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন করিয়া যান। কিন্তু দুর্ব্বল মানব শ্রীভগবানের প্রতিভা কোথায় পাইবে? তাঁহার শিক্ষা কেমন করিয়া ধারণ করিবে? এ কারণে কালে সকল ধর্ম্মশিক্ষকের ধর্ম্মশিক্ষা মানব-চরিত্রের বিকৃতি

অনুসারে বিকৃত হইয়া পড়ে। ক্রমে ভারতে সেই কৃষ্ণ-শিক্ষার অবনতি ঘটিয়া ধর্ম্ম কেবল আবার জীবঘাতী যাগযজ্ঞে পরিণত হইল। তখন শ্রীবুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মপথ সম্প্রসারণ করিয়া যান। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার নীরবতানিবন্ধন, কালে তাঁহার পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-যাজকগণ সে পথে ঘোরতর নিরীশ্বরত্ব ও জড়ত্ব উপস্থিত করিলে, শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানপথের সম্প্রসারণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের জড়ত্ব ঘুরাইয়া উহাকে তাহার সার্ব্বভৌম জ্ঞানবাদে বিলীন করেন। কালে তাঁহার শিক্ষাও মায়াবাদের কাষ্ঠবৎ কঠোরতায় পরিণত হইলে, শ্রীচৈতন্ত দেব অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপথ সম্প্রসারিত করিয়া প্রেমে সেই কঠোরতা ভাসাইয়া দেন। গীতামূলক সম্প্রসারিত এই তিন মতের সম্মিলনেই প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্ম।" নবীনচন্দ্রের এই মতে সমালোচকগণের কি বক্তব্য থাকিতে পারে তাহা আমরা জানি না। আমরা এখানে নবীনচন্দ্রের মতবাদের আলোচনা করিব না, আমরা তাঁহার 'অমিতাভ' কাব্যের আলোচনা করিব। মতবাদের সমালোচনার অন্তরালে তাঁহার কাব্যের ও কবিপ্রতিভার আলোচনাকে হারাইব না। 'অমিতাভ' বুদ্ধদেবের জীবনকাব্য। যে সন্ন্যাসী, গৃহত্যাগী রাজ-দুলালের নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম প্রচারে জীবঘাতী হিন্দুধর্ম্মের প্রবাহ রুদ্ধ হইয়াছিল, সেই জীবনদিদৃক্ষু মুমুক্ষু তাপসের অতুলনীয় অনাসক্তি ও সংযমের প্রতি একজন প্রচারক ও ভক্ত ব্যাখ্যাতার অনুরাগ হওয়াই স্বাভাবিক। ইহা ব্যতীত—নবীনচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু ও চৈতন্যদেবকে লীলাময় শ্রীভগবানের চতুর্ব্বিধ ধর্ম্ম-সংস্থাপক রূপ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন এবং ভক্ত কবি এই লীলাময়ের লীলা কাব্যে রূপায়িত করিয়া আপনার জীবন সার্থক করিয়াছেন। উপরোক্ত চারিজন অবতার যে মূলতঃ এক—ইহা জানিয়া লইয়া কবি নরনারীকে ইঁহাদের লীলা দেখাইয়াছেন।

সত্য কথা বলিতে কি, অবতারগুলির মধ্যে বুদ্ধদেবের জীবনী আলোচনা করিলে, তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীতি হয়। রাজপুত্র হইয়া বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত থাকিয়া কী অপূর্ব্ব সাধনা ও সংযম, অনাসক্তি ও বিরাগের বলে তিনি সাংসারিক দৃঢ় বন্ধন ও পুত্রের মায়ারজ্জু ছেদন করিয়া নির্ব্বাণলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা ভাবিলে এই বস্তুতান্ত্রিক ভোগাত্মবাদী জগত তাঁহার পদমূলে মস্তক শ্রদ্ধায় না লুটাইয়া থাকিতে পারে না। আপনার জীবনের কী দৃঢ়বন্ধন অপরূপ বৈরাগ্যের শাণিত অস্ত্রে ছেদন করিয়া জগতের সম্মুখে উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের বিরাট বন্ধনের মুক্তিপ্রচেষ্টা উপলব্ধি করিয়া সাধারণ মানবসন্তান তাহার ক্ষুদ্র বন্ধন ছেদন করিতে যত্ন করিতে পারে।

'অমিতাভ' কাব্যের ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, "যাঁহার অমিত আভায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর কালবক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে এবং এখনও ইউরোপ, আমেরিকা পর্য্যন্ত যাঁহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে—সেই বুদ্ধদেব শাক্যসিংহকে আমি নমস্কার করি।"

অতএব এই যে 'অমিতাভ'—যাঁহার পুণ্য, পবিত্র ও আলোকময় জীবনের নির্ব্বাণ-কিরণচ্ছটায় পৃথিবীর নরনারী আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই দ্যুতিময় জীবনের বর্ণনা নিশ্চয়ই অপার্থিব আলোকে ও স্বর্গীয় সৌরভে আলোকিত ও সুরভিত হওয়া চাই। সত্য কথা বলিতে কি, 'অমিতাভ' কাব্যে ইহার ত্রুটী ঘটে নাই। কবির ভক্ত-প্রাণের সংবেদনময়তা, রচনাশৈলী, পদলালিত্য, ভাব-গাম্ভীর্য্য ও সর্ব্বোপরি কবির আপন মনের মাধুরী-সমন্বিত নাটকীয় সকরুণ আলোকসম্পাত অতীব মনোহারী হইয়াছে। কবির বুদ্ধের জীবনী রচনা সার্থক হইয়াছে। বয়সের সঙ্গে কবির কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় নাই, বরং দৈবী অনুপ্রেরণায় তাহা আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সত্যই 'অমিতাভ' অতি মর্ম্মস্পর্শী ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবসম্মিলনযুগের শেষ মহাকবি নবীনচন্দ্র এখন প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ডিগ্রী পরীক্ষায় তাঁহার স্থান হয় নাই; ইহা বাঙালীর লজ্জাকর কলঙ্ক—সন্দেহ নাই। যদি আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী সুধিগণ নবীনচন্দ্রের শুধু 'অমিতাভ'খানির আলোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, নবীনচন্দ্রের কবিত্ব শাশ্বত ও চিরন্তন। 'অমিতাভ' রচনায় কবির যে মাধুর্য্য-মণ্ডিত কল্পনাশক্তি ও দার্শনিক মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাই তাঁহাকে তাঁহার কাব্যগ্রন্থের সহিত অমর করিয়া রাখিবে। 'অমিতাভ', কাহিনী সংক্ষেপে এই—হিমালয়ের পাদদেশে 'রোহিণী' নদীর কূলে কপিলবস্তু নগর অবস্থিত। রাজা শুদ্ধোদন ইহার রাজা। তাঁহার দুই মহিষী—মহামায়া ও প্রভাবতী। শুদ্ধোদনের রাজ্যে ঐশ্বর্য্য ও শান্তি বিরাজমান। কিন্তু রাজার মনে শান্তি নাই। কেননা, তাঁহার উত্তরাধিকারী নাই, মহামায়া ও প্রভাবতী এই দুই জনের কাহারও সন্তান হয় নাই। কপিলবস্তু নগরে বসন্তোৎসব আসিল। নাগরিকগণ বসন্তোৎসবে মাতিল। রাজপ্রাসাদ হইতে কুটীর পর্য্যন্ত ঋতুরাজের আগমনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছয় দিনব্যাপী এই উৎসব চলিল। সপ্তমদিনে পূর্ণিমা প্রভাতে মায়াবতী স্বপ্ন দেখিলেন—যেন স্বর্গ হইতে চারিজন দূত আসিয়া

তাঁহার পালঙ্কখানি বহিয়া হিমালয়ের সুবিস্তৃত শালবনে নামাইল। নামাইবার পর মায়াদেবীকে স্বর্গের অঙ্গনাগণ এক অমৃতময় সাগরে স্নান করাইলেন। তারপর তিনি রজতগিরির শিখরদেশে অবস্থিত প্রাসাদে পুষ্পশয্যায় শয়ন করিলেন। দেখিলেন—এক শ্বেত হস্তী শুণ্ডে শ্বেত-পদ্ম লইয়া তাঁহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া দক্ষিণ দেশ বিদীর্ণ করিয়া তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিল। মায়াদেবী স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত রাজার গোচরে আনিলেন। শুদ্ধোদন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিলেন—

"মহারাজ! হইলেন পুণ্যবতী
মহারাণী—কি শুভ স্বপন!
থাকি গৃহাশ্রমে পুত্র   হবে রাজচক্রবর্ত্তী
একছত্র করিবে ভুবন।
যায় যদি ধর্ম্মাশ্রমে   দুঃখপূর্ণ জগতের
পাপভার করিবে মোচন।

এইরূপে পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষে মায়াদেবী সন্তানসম্ভবা হইলেন। তারপর দিন পূর্ণ হইলে লুম্বিনী বনে মায়া-দেবী রাজকুমার প্রসব করিলেন। প্রসবের ৭ দিন পরে নবজাত সন্তানকে রাখিয়া মায়াদেবী পৃথিবী হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করেন।

শুদ্ধোদনের পুত্র জন্মিয়াছে—ইহা ধ্যানে জানিতে পারিয়া অসিত ঋষি শুদ্ধোদনের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—

"নরপতি! আসিয়াছি আমি
তব নবজাত শিশু করিতে দর্শন;
পুরাও বাসনা মম।"

কুমারকে দেখাইলে ঋষি 'অদ্ভুত অদ্ভুত' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—

"এ বুদ্ধ পুরুষোত্তম পুত্ররূপে তব
হইলেন অবতীর্ণ।"

অসিত ঋষি রাজাকে কহিলেন, পুত্রের নাম হইবে সিদ্ধার্থ, কারণ জগতের মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। বিমাতা গৌতমী ইহাকে পালন করিবে বলিয়া ইহার নাম হইবে গৌতম। শাক্যকুলে জন্ম বলিয়া ইহার নাম হইবে শাক্যমুনি। আর যথাকালে মানবের দুঃখভার হরণ করিতে কুমারের জন্ম হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম হইবে 'তথাগত'। ঋষি আরও বলিলেন যে, এই শিশু মহাজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ নাম গ্রহণ করিবে। অতঃপর আটজন দৈবজ্ঞকে ডাকিয়া পাঠান হইল। তাহাদের মধ্যে সাতজন কুমারের বুদ্ধত্ব লাভের কথা বলিল। সর্ব্বকনিষ্ঠ কৌণ্ডিন্য বলিল, যেদিন কুমার জরাজীর্ণ মানব, রুগ্ন, মৃত ও ভিক্ষুক দেখিবে, সেই দিনই কুমার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। এই কথা শুনিয়া রাজা প্রহরী নিযুক্ত করিলেন,—যাহাতে কুমার উক্ত চারি প্রকারের মানব না দেখে।

কুমার বড় হইতে লাগিলেন। সমস্ত রাজকীয় বিদ্যার অধ্যয়ন অল্পকালেই শেষ করিলেন। বাল্যকাল হইতে জীবে দয়ার প্রতি লক্ষ্য আকৃষ্ট হইল। সঙ্গে সঙ্গে নিভৃত চিন্তাও বিকাশ প্রাপ্ত হইল। রাজ্যে হলোৎসবের দিন অসংখ্য পতঙ্গের অকাল ধ্বংস দেখিয়া কুমার ব্যথিত হইয়া এক জম্বুবৃক্ষতলে চিন্তায় আত্মহারা হইলেন। ইহা দেখিয়া অমাত্যগণের পরামর্শে রাজা কুমারের বিবাহ দিতে উদ্যত হইলেন। সিদ্ধার্থকে বিবাহে সম্মতি আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি অনেক চিন্তার পর বিবাহে সম্মতি দিলেন।

অশোকভাণ্ড উৎসবে দণ্ডপাণিসুতা গোপার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। সিদ্ধার্থের সংসারে আসক্তি দেখিয়া রাজা শান্তি পাইলেন।

একদিন প্রমোদকাননে যাইবার পথে সিদ্ধার্থের এক ভিক্ষুক, মৃত, জরাজীর্ণ ও এক শ্রমণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মানবের পরিণাম দেখিয়া এবং সন্ন্যাসীর শান্তি উপলব্ধি করিয়া কুমার গৃহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেইদিন দিনশেষে নিশীথরাত্রে সদ্যঃপ্রসূত শিশুসন্তান রাহুল, পতিব্রতা গোপা, স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী গৌতমী ও বিশাল সাম্রাজ্য পিছনে ফেলিয়া সিদ্ধার্থ ভৃত্য ছন্দককে সঙ্গে করিয়া প্রিয় অশ্ব 'কণ্টক'-এর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চন্দ্রালোকিত পথে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রোড্যদেশ, মল্লদেশ পার হইয়া রজনীপ্রভাতে অনামার তীরে বেণু-বনে অবতরণ করিলেন এবং এক ব্যাধের সহিত আপনার আভরণ বদলাইয়া এবং স্বীয় তরবারির দ্বারা আপনার মস্তক মুণ্ডন করিয়া ছন্দককে বিদায় দিলেন।

সিদ্ধার্থ পূর্ব্বদক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিলেন। পথে শাকী, পদ্মা, রৈবত ঋষির আশ্রমে আশ্রয় লইয়া বৈশালী নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় আরাড়কালাম ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি হইতে নির্ব্বাণের পথ দেখাইতে দর্শনের সাধ্য নাই দেখিয়া সেখান হইতে যাত্রা করিয়া রাজগৃহে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবশৈলে আরোহণ করিয়া অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ধ্যানস্থ হইলেন। প্রভাতে ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন। সিদ্ধার্থের অপরূপ দেহশ্রী দেখিয়া নাগরিকগণ মুগ্ধ হইয়া গেল।

রাজা বিম্বিসার প্রাসাদশিখর হইতে সিদ্ধার্থকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিয়া ভ্রম করিলেন। অপরাহ্নে সিদ্ধার্থের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস ত্যাগ করিতে বলিয়া রাজ-

সুখ ভোগ করিবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ তাঁহাকে তাঁহার অমৃতময়ী বাণীতে জগতের নশ্বরতা, মানবদেহের পরিণাম ও কামনা-বাসনার শ্রেষ গতি বুঝাইয়া দিলেন। বিম্বিসার চৈতন্ত লাভ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

রাজগৃহ হইতে মহামারীপীড়িত বৈশালী নগরে গমন করিয়া তথাকার মহামারী শান্ত করিলেন। পুনরায় পাণ্ডবশৈলে আগমন করিয়া রামপুত্র রুদ্রকের কাছে নৈবসংজ্ঞান ও অসংজ্ঞায়তন নামে দুই সমাধি লাভ করিলেন। ইহাতেও নির্ব্বাণ লাভ হইল না। পাঁচজন শিষ্য সহ গয়াধামে নির্ব্বাণ আশায় যাত্রা করিলেন।

গয়াধামে উপস্থিত হইয়া ভোগক্ষম ইন্দ্রিয়নিচয়ের ধ্বংস চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নৈরঞ্জনাতীরে এক অশ্বত্থবৃক্ষের তলে যোগমগ্ন হইলেন। ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেল। শিষ্যগণ সিদ্ধার্থের অসাফল্যে পলাইয়া গেল। ধ্যানে নির্ব্বাণের পথ পাইলেন না। পরন্তু জানিলেন—মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিবে। এতদিন তিনি দেহকে উপেক্ষা করিতেছিলেন। ইন্দ্রের কথায় জানিতে পারিলেন যে, যোগসাধন করিলেও দেহকে সঞ্জীবিত রাখিতে হইবে।

সুদীর্ঘ ছয় বৎসর পরে সিদ্ধার্থ জাগিলেন। জাগিয়া নৈরঞ্জনা-সলিলে স্নান করিলেন। দেখিলেন, ভিক্ষায় যাইবার আর সামর্থ্য নাই। শরীর নিরতিশয় শীর্ণ। এইরূপ যখন ভাবিতেছেন, তখন নাস্তিকপতির কন্যা সুজাতা পায়সান্ন রাঁধিয়া বনদেবতাকে দিতে আসিতেছিলেন; বৃক্ষমূলে সিদ্ধার্থকে দেখিয়া বনদেবতা মনে করিয়া তাঁহাকেই সেই পায়সান্ন নিবেদন করিলেন। এমনি করিয়া সুজাতার অন্নে কিছুদিনের মধ্যে সিদ্ধার্থ যোগক্ষম হইলেন। পূর্ব্ব অশ্বত্থবৃক্ষকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার তলে ধ্যানস্থ হইলেন। প্রতিজ্ঞা এবারে ভীষণ—

"শরীর হউক শুষ্ক, অস্থি-মাংস লয়
যাবৎ নির্ব্বাণ-জ্ঞান না হয় উদয়
এ শরীর এ আসনে রহিবে নিশ্চয়।"

এবার ধ্যান বিফলে যাইল না। যোগী নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। তিনি জানিলেন—

"দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ
কর্ম্মফল, কর্ম্মফল উপজে চেষ্টায়
শারীরিক মানসিক; চেষ্টার কারণ
সুখতৃষ্ণা, বুঝিলেন সুখ-দুঃখবোধ
তৃষ্ণার কারণ, সুখ দুঃখ অনুভব
জন্মায় ইন্দ্রিয়গণ, তাহার কারণ
জগতের সহ মন-ইন্দ্রিয় সংযোগ;
জগতের রূপ-রস-গন্ধ মনোহর
এই সংযোগের হেতু। গন্ধ রূপ রস;—
সমস্ত জগত—সূক্ষ্ম পরমাণুজাত,
করে প্রকটিত নানারূপে এক জ্ঞান।
বুঝিলেন সংস্কার এ জ্ঞানের মূল,
সংস্কার ভ্রমজ্ঞান অবিদ্যাসম্ভূত।"

সাত দিন সাত রাত সেই অশ্বত্থতলে অবস্থান করিলেন। ইহার পর বোধি জ্ঞানপ্রচারে ইচ্ছা করিলেন। ধ্যানে জানিলেন, রুদ্রক ও আরাড়কালাম মৃত। পঞ্চ শিষ্য বারাণসীধামে অবস্থান করিতেছে। বারাণসী ধামে উপস্থিত হইয়া পঞ্চ শিষ্যের সন্ধান করিলেন। পঞ্চ শিষ্য দীক্ষিত হইল। অসংখ্য নরনারী দীক্ষিত হইল। এখান হইতে মগধ যাত্রা করিলেন। গন্ধহস্তিপর্ব্বতে অগ্নিহোত্রী কাশ্যপ পণ্ডিতকে দীক্ষা দান করিলেন। কাশ্যপের নিকট শুনিয়া বিম্বিসার বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে কপিলনগরে আগমন করিয়া মাতাপিতা, গোপা, রাহুল প্রভৃতিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। রাজগৃহে আসিয়া বিম্বিসার-মহিষী ক্ষেমারাণীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন।

বুদ্ধদেব এখন অশীতিবর্ষ। নির্ব্বাণ লাভের উদ্যোগ করিলেন। কাশ্যপকে সঙ্ঘের কার্য্যভার অর্পণ করিয়া কুশীনগরে শালবনে অন্তিম শয়নে শায়িত হইলেন। বসন্তের পৌর্ণমাসী রজনীতে জগতের পরিত্রাতা তথাগত ভগবান্ বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিলেন।

নবীনচন্দ্র কবি। প্রকৃত কবি হইতেছেন তিনি, যিনি কবিতায় আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া চিত্র, সঙ্গীত ও ভাবের অবতারণা করিতে পারেন।

নবীনচন্দ্রের কবিতা এই গুণাবলী হইতে বঞ্চিত নহে। আমরা 'অমিতাভ' কাব্যের স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ইহা দেখাইতে পারি।

পাণ্ডবশৈলে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার নির্জ্জনতা ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে ছাইয়া পড়িতেছে। সিদ্ধার্থ ধ্যানে বসিতেছেন।

"অস্তমিত দিনমণি, দেখিলা কুমার
নীরব, নির্জ্জন, স্থির শান্ত প্রকৃতির
শ্যামবক্ষে সন্ধ্যা ধীরে মাখিতেছে ছায়া
শান্তিময়ী সুগভীরা সুকোমল করে।
নীরব নির্জ্জন, স্থির বিশ্বচরাচরে
নীরব নির্জ্জন স্থির শৈলের শেখরে,
সিদ্ধার্থ একক সান্ধ্য গগনের তলে।
সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে শান্তি সুশীতল,
হইলা—সিদ্ধার্থ ধীরে ধ্যানে নিমজ্জিত।"

আবার অশোকোৎসবের বর্ণনায়—

সজ্জিত অশোক কক্ষ বিচিত্র বাসনে
বিচিত্র কুসুমদামে, বিচিত্র ভূষণে
বিচিত্র পুষ্পের বেদী, পুষ্পিত কুমার
নবীন যৌবন-পুষ্পে ; দীর্ঘ পুষ্পহার
চারু নব যৌবনের শাক্য কুমারীর
বহিতে লাগিল ধীরে, যেন জাহ্নবীর
সলিলে কুসুমদাম চলেছে ভাসিয়া,
পূর্তি কোনো দেবপদ তরঙ্গে নাচিয়া।
কুমার সজ্জিত পুষ্পে, সজ্জিতা কুমারী,
সজ্জিত অশোকতাও পুষ্পে সারি সারি

*   *   *

একে একে ভাগুশিরে গেল বালাগণ
গেল চন্দ্র-কিরীটিনী যামিনী যেমন।

নবীনচন্দ্রের উপমাগুলি বেশ চিত্তাকর্ষক। সন্তানহীনা মায়াবতী ও প্রজাবতীকে কবি পুষ্পহীন পুষ্পপাত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

পুত্রহীন শুদ্ধোদন মায়াময়ী মহামায়া
পুণ্যবতী প্রজাবতী তথা—
উভয়ের শূন্য অঙ্ক পুষ্পহীন পুষ্পপাত্র
সুধাহীন সুধাকর যথা।

আবার সিদ্ধার্থকে সন্ন্যাস হইতে বিরত রাখিবার জন্য শুদ্ধোদনের অকিঞ্চিৎকর চেষ্টাকে উপহাস করিয়া বলিতেছেন—

করে জলধিরে যদি চন্দ্র আকর্ষণ
পারে কি রাখিতে আহা! বালির বন্ধন।

অন্যত্র সিদ্ধার্থের দাম্পত্য-প্রণয় দেখিয়া আশ্বস্ত শুদ্ধোদনের প্রতি—

নবীন বৈরাগ্য-মেঘ, গোপার প্রণয়ালোকে
হইল অদৃশ্য আলোকিত ;
আশ্বস্ত হইল রাজা হতভাগ্য শুদ্ধোদন
বিদ্যুতে হইলা প্রতারিত।

আবার গোপাকে নিরাভরণ, অনবগুণ্ঠিতা, লজ্জাহীনা দেখিয়া তাহার এক সখী হাসিলে গোপা বলিয়াছিলেন—

"নারী-আভরণ ধর্ম্ম, নারীর সৌন্দর্য্য ধর্ম্ম
ধর্ম্ম অবগুণ্ঠন তাহার—
সুসলিলা দীর্ঘিকার আছে কি অবগুণ্ঠন ?
কি অবগুণ্ঠন চন্দ্রিকার ?

কবি নবীনচন্দ্রের জীবনকে দেখিবার, বিরাট পৃথিবীর প্রাকৃতিক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এই পৃথিবীর আনন্দ, হাসি, উৎসব,—এ সবের মধ্যে শ্মশানের কী বিরাট হাহাকার লুকান আছে—তাহা আপাতরম্য জীবন ও প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের অন্তরালে মানবের লক্ষ্যই পড়ে না। অথচ কবির সেই সন্ধানী দৃষ্টি থাকায় 'অমিতাভ' কাব্যের মূল সুর আরও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

হলোৎসবের দিন অসংখ্য কীটপতঙ্গকে পক্ষিগণের দ্বারা ভক্ষিত হইতে দেখিয়া সিদ্ধার্থ ভাবিলেন—

এইরূপে জীবে জীবে হিংসিতেছে নিরন্তর—
চারিদিকে কি ভীষণ জীবন-সংগ্রাম!
আনন্দের আবরণে আবরি প্রকৃতি দেবী
রেখেছেন কী অনন্ত ভীষণ শ্মশান!

এ কবিরই চিন্তা—সিদ্ধার্থের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন মাত্র।

নবীনচন্দ্র দেখিয়াছিলেন এইখানেই ট্রেজিডি যে, আমাদের মনীষিগণ, শাস্ত্রবেত্তাগণ সংসার দুঃখের দেখিয়াও, দুঃখের জানিয়াও সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া, সংসারে থাকিয়া সেই জ্ঞানিবৃন্দ ক্ষুদ্র মানবগণকে সংসারাসক্ত করিয়া গিয়াছেন। ট্রেজিডি এইখানেই যে, তাঁহারা মানবাতীত অনুপ্রেরণায় দিয়া গিয়াছেন সংসারে অনাসক্তি, আবার মানবিক দৌর্ব্বল্যে সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া, দুঃখ ভোগ করিয়া সংসারে দিয়া গিয়াছেন আসক্তি। তাই নবীনচন্দ্র সিদ্ধার্থের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন

"ব্যাধিভোগ্য দেহে ধিক্! অনিত্য জীবনে ধিক্!
ধিক্ ভোগরত জ্ঞানিগণ!"

কবি নবীনচন্দ্রের মধ্যে নাটকীয় রসবোধ ছিল। 'অমিতাভ' কাব্যে তিনি এমন নাটকোচিত ঘটনা-পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছেন, সিদ্ধার্থের মনে নাটক-নায়কোচিত যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কবি হইতে বেশী করিয়া নাট্যকার বলিতে ইচ্ছা করে। সিদ্ধার্থের বিবাহে সম্মতি-দানকালে সন্ন্যাসজীবন ও গার্হস্থ্য-জীবন, এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ বিবেচনায় তাঁহার যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আমরা দেখিয়াছি তাহা নাটকোচিত-বীরের পক্ষে প্রযোজ্য। সিদ্ধার্থ একবার বলিতেছেন—

"করিয়া বিবাহ, ভোগ-বিলাস সম্বল"
পরিবে সে শৃঙ্খলের উপরে শৃঙ্খল ?

আবার—

"না-না হইতেছে ভুল, যদি এ সংসার—
ছাড়ে সবে গৃহাশ্রমে রহিবে না আর!

*   *   *

অনাসক্ত অগ্নিদেব যেমতি অঙ্গারে—
থাকিব সংসারে, সেই দয়ার নির্ঝরে
সুশীতল মম প্রাণ।

আবার অশোকোৎসবে সিদ্ধার্থের অশোকভাণ্ড ফুরাইয়া যাওয়ায়, গোপাকে আপনার অঙ্গুরীয় প্রদানের

দৃশ্যটী অতি চমৎকার। কবির প্রশংসা করিতে পাঠকের স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা আসে।

যুবরাজ! করিয়াছি কোন্ অপরাধ ?
করিলে বঞ্চিত, নাহি দিলে উপহার,
কেন হইলাম আমি ঘৃণার আধার ?
'নহে ঘৃণা'—লজ্জাপূর্ণ কহিলা কুমার—
"নিঃশেষ অশোকভাণ্ড,—কিবা উপহার
দিব ভাবিতেছি মনে।" করিয়া মোচন
অঙ্গুরী গোপার করে করিলা অর্পণ।

আবার সন্ন্যাস গ্রহণে উন্মত্ত হইয়া সিদ্ধার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব—

না-না, সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়া তিনজন
বৃদ্ধ পিতা, মাতা ওই আর—
তাঁহার প্রাণের গোপা তাঁহার প্রেমের গোপা
কিবা তিন মূর্ত্তি করুণার—!
হায়; ইহাদের ঠেলি' ভূমে বজ্রাহত ফেলি'
যাইবেন সিদ্ধার্থ কেমনে ?
দুই ধারা দর দর— বহিতে লাগিল ধীরে—
সিদ্ধার্থের যুগল নয়নে।
তাদের পশ্চাতে হায় কিন্তু ও কি দেখা যায়
নর-নারী অনন্ত অপার—
জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-করে করিতেছে হাহাকার
মাগিতেছে করুণা তাঁহার।

আবার যখন সদ্যঃপ্রসূত তনয় ও প্রসূতা গোপাকে ফেলিয়া চলিতেছেন—

বিসর্জ্জি জলন্তানলে গোপা-স্বর্ণলতা
সদ্য মুকুলিত এই কুসুম-কোরক
ত্যজিবেন গৃহ। হায় পশুর অধিক
এই ঘোর নৃশংসতা!

পিতার নিকট হইতে সিদ্ধার্থের বিদায়-দৃশ্যটী করুণ-রসনিষিক্ত হইয়া পাঠকের মনকে যেরূপে অভিষিক্ত করে, তাহার আর্দ্রতা বুঝি কোনদিন শুষ্ক হইবার নহে।

প্রণত; পাদপদ্মে করপল্লব
কুমারের; করপদ্ম পুত্রের মস্তকে
জনকের, কুমারের চক্ষু ছলছল,
জনকের অশ্রুধারা বহিছে ধারায়
বাতায়ন-পথে চাহি আকাশের পানে
বিভাসিত চন্দ্রকরে শান্ত-সুশীতল।
কি চিত্র মহিমাময়! ভূতলে ত্রিদিব!
কি মুহূর্ত্ত!—কিবা যোগ—কি প্রেম মহান্!
কি মুহূর্ত্ত! কি বিয়োগ! আত্মবলিদান!

*

চলিলা সিদ্ধার্থ পুত্র পড়িলা শয্যায়
সিদ্ধার্থ-জনক বৃদ্ধ বজ্রাহতপ্রায়।

আবার নিদ্রিতা গোপাকে শেষ দেখা দেখিয়া সিদ্ধার্থের বিদায়গ্রহণ-দৃশ্যটী আরও করুণ—

*

আলুলায়িত-কুন্তলা স্খলিত-রসনা—
নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সদ্যশিশু
—সোণার প্রতিমা বক্ষে সোণার কুসুম
লইয়া আদরে যেন;—জিনি দীপদাম
করিয়াছে আলোকিত গৃহ দুইজন।
এবার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর
কেবল দুইটী বিন্দু অশ্রু দু'নয়নে
আসিল, ভাসিল ধীরে,—মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার।

সিদ্ধার্থের রাজপুরী হইতে বিদায়-দৃশ্যে, সন্ন্যাস-জীবনের নির্য্যাতন ভোগে, সন্ন্যাসী বেশে মাতাপিতা ও স্ত্রীর নিকট আগমনে, জনক-জননীর বিলাপে, কবির লেখনীস্পর্শে করুণরস অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যামোদী পাঠক-পাঠিকা 'অমিতাভ' কাব্যের রস-বৈচিত্র্যে আনন্দ পাইবে সন্দেহ নাই।

আজ শিক্ষিত বাঙালী-সমাজ—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ মহাকবি নবীনচন্দ্রকে ভুলিতে বসিয়াছে। যদি নবীনচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার স্থায়ী ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহা যে শিক্ষিত বাঙালী-সমাজের হৃদয়হীনতার কলঙ্ক—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চাঁদের তরী

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কৃষ্ণাতিথির নিশি-নিশুতির
চাঁদ গো !
জোছনা-উজোড় ওই তরী তোর
এ আঘাটে মোর বাঁধ গো।
না পোহাতে রাতি শয়ন ত্যজিয়ে
ছেড়ে এনু ঘর দুয়ার ভেজিয়ে,
অকূলে চাহিয়ে দাঁড়ানু যে আজি,—
সে বুঝি তোমারি লাগি';

যে তরণী 'পরে বিদায়ী রাত্রি
পার করে তার তারার যাত্রী,
সে তব তরীতে মরণ তরিতে
শরণ তোমার মাগি।

শুক্লা রাতির চাঁদেরই খাতির
ক'রেছি জীবন ভোর,
তাহারি আলোকে চাঁদ-চাওয়া চোখে
অশ্রুর নাহি ওর।
অসীম আলসে ঘুমের লালসে
কখনো দেখিনি চেয়ে,
কালো রজনীর ও-কূল আলোকি'
চলে যে এমন নেয়ে
সবাই ঘুমালে তুমি ওঠ জেগে,
ঘুমাও সবার জাগরণ লেগে,
ক্ষয়-ক্ষতিভরা রাতের পশরা
নামাও দিনের কূলে;
পূর্ণিমাহারা অমাপ্রত্যাশী
কি যে অপরূপ ও-মুখের হাসি।
ধ্রুব ধরা হাল, জোছনার পাল
পূব গাঙে তরী দুলে।
কত ঘাটে কত পাষাণের ঘায়
সারা গায় ক্ষতচিহ্ন;
ভেঙে গেছে বুক, তবু চাঁদমুখ
সুধা-হাসি-উদ্ভিন্ন।
জাগে পূবে জাগরণের জোয়ারি,
হে কর্ণধার, রহ হুঁশিয়ারি,—
সকল ক্ষয়ের পরম খেয়ারী
কৃষ্ণাতিথির চাঁদ গো।
প্রভাতী তারার একতারা হাতে
দাঁড়ায়েছি কূলে তোরি ভরসাতে,
নির্ভীক নেয়ে, এসে আঘাটে এ
বারেক তরণী বাঁধ গো

পুরাতন পুঁথি

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

প্রায় দশ বৎসর পরে দেশে আসিলেন সুরেশ্বর রায়। বি, এ পাশ করিয়াই সেই যে বোম্বাই গিয়া সরকারী চাকুরীতে ঢুকিয়াছিলেন—তাহার পর মাত্র দুই চারি বার দেশে আসিয়াছেন—অতিথির মতো। সাবেক কালের জমিদারী ছিল এই রায় বংশের—কত কালের জমিদারী ঠিক কেহ জানে না—তবে নানা শরিকের নানা অংশে বিভক্ত হইয়া যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আজ আর কাহারও চলে না। অন্য শরিকের কেহ কেহ চাকুরী করেন—কেহ কেহ দেশে থাকিয়া জমিদারীর সামান্য আয় এবং তার সঙ্গে আরও অন্যভাবে কিছু কিছু সংস্থান করিয়া সংসার চালান। সুরেশ্বর রায়ের নিজ অংশে একজন গোমস্তা আছে—তিনি অবশ্য জমিদারীর আয়ের প্রত্যাশী নহেন—নিজে যে টাকা উপার্জ্জন করেন তাহাতেই একরূপ সুখে-স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইয়াও ব্যাঙ্কে একটা মোটা অঙ্ক জমিয়া উঠিয়াছে কিন্তু এবার জমিদারীতে এমন কয়েকটা গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে যে—তাঁহাকে বোম্বাই হইতে মাস খানেকের জন্য বাড়ীতে আসিতে হইয়াছে। সেকালের একটা কাঠের সিন্দুক খুলিয়া—পুরাতন দলিল-পত্র খুঁজিতে-ছিলেন সুরেশ্বর রায়। সম্মুখে গাদা গাদা কাগজ-পত্র স্তুপীকৃত হইয়া ছিল। এমন সময় বাহির হইতে ঘরে ঢুকিয়া বীরেশ্বর বলিল—এ সব কি দেখছো বাবা? সুরেশ্বর কাগজ-পত্র হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের আমলের সব দলিল-পত্র। আমার একটু দেরী হবে, তুই খেয়ে নিস্ খোকা।

বীরেশ্বর পিতার সহিত এবার এখানে আসিয়াছে গত বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর সে কলিকাতা আসিয়া কোন এক মিশনারী কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে পড়াশুনায় বীরেশ্বর অত্যন্ত ভালছেলে—ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় সে খুব ভাল ফল করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিল। ভবিষ্যতে ছাত্রজীবনের এই সুনামটা যাহাতে চাকুরী-ক্ষেত্রে কাজে লাগান যায়—সেই জন্য গত বৎসর হইতে তাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পাঠাইয়াছেন সুরেশ্বর রায়। তা' না হইলে ছেলেকে তাঁহার চোখের আড়াল করিবার ইচ্ছা ছিল না। আজকাল দিনকাল বড় খারাপ। সর্ব্বত্র হাঙ্গাম হুজুগ্ লাগিয়াই আছে—বিশেষতঃ ইস্কুল-কলেজের ছেলেরাই এই সবে মাতিয়াছে বেশী করিয়া। ছাত্রদের ভিতরেও আজকাল কত দল—কেউ স্বদেশী, কেউ কমিউনিষ্ট, কেউ সমাজতন্ত্রী—এমনি কত নাম। ইহাদের কাউকেই দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না সুরেশ্বর। নিজের ছেলেকে এই সব ছোঁয়াচ হইতে বাঁচাইয়া একেবারে নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মতো চাকুরীক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিতে চাহেন। একবার চাকুরীর ঘানিতে আনিয়া জুড়িয়া দিতে পারিলে—তারপর আর কোন ভয় নাই—একেবারে পেন্সনের সময় পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে তাহারই চারি পাশে চক্ষু বুঁজিয়া ঘুরিয়া যাইবে—তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তাই কলিকাতায় আনিয়াও এত কলেজ থাকিতে একটা একেবারে খাঁটী মিশনারী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন বীরেশ্বরকে। পিতার পাশে বসিয়া কাগজ-পত্র নাড়িতে নাড়িতে একখানা বহু পুরাতন পুঁথি বাহির করিয়া বীরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল—এখানা কি বাবা? সুরেশ্বর একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিলেন—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ইতিহাস ওখানা। বীরেশ্বর বিশেষ কৌতুহলী হইয়া উঠিল,—তাই নাকি—দেখতে হচ্ছে তো তা' হ'লে। পুঁথিখানা হাতে করিয়া সে সোজা তাহার শয়ন-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দুই

বেলা বারটার সময় বীরেশ্বরের ঘরে ঢুকিয়া সুরেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন—এ কি রে খোকা, তুই এখনও যে খেতে যাস্ নি? বীরেশ্বর বিছানার উপরে পুঁথিখানি খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া কত কী ভাবিতেছিল। তাহার মন একেবারে তিন শতাব্দীর অতীতকালের ইতিহাসের ঘটনার মাঝে ডুব মারিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল—তুমি পড়েছো বাবা পুঁথিখানা? সুরেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—হাঁ, কেন বল তো।

—আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ—সেই ত্রিলোচন রায়ের ইতিহাস—কি চমৎকার বাবা! কিন্তু ইতিহাসে তো—রাজা সীতারামের সেনাপতি আর নামকরা সৈনিক বলতে—মেনাহাতী, ফকিরচাঁদ—খাবার দালান, যোচড়া সিং এদের কথাই লেখে—কই ত্রিলোচন রায়ের নাম তো কোথাও দেখিনি বাবা। সুরেশ্বর বলিলেন—সব কথা কি আর ইতিহাসে লেখা থাকে? আমাদের দেশের ইতিহাস তো আর লোকে লিখে রাখে নি—শিলালিপি—তাম্র-শাসন আর কিম্বদন্তীই মাত্র আমাদের ইতিহাসের অবলম্বন।

—ত্রিলোচন রায় সীতারামের পাশে দাঁড়িয়ে—শেষ পর্য্যন্ত যশোরের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন বাবা। মোগল-সেনাপতি বক্স আলী খাঁর সৈন্যগণ যখন মধুমতী নদীর ভিতরে তাঁর দুর্গের চারিপাশ একেবারে ঘিরে

ধরেছিল—তখনও তিনি অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই—শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করেই প্রাণ দিলেন।

দু এক জায়গা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে বাবা।

ডাক দিয়া দয়ারাম বলে ত্রিলোচনে।
বৃথা কেন প্রাণ দেবে ক্ষান্ত দাও রণে॥
শুনি কহে ত্রিলোচন ঘৃণিতলোচন।
স্বদেশের তরে প্রাণ করিব অর্পণ।
অধমের কাজ কর ব্রাহ্মণ হইয়া।
বিদেশী মোগলে ভান পথ দেখাইয়া॥

সুরেশ্বর বলিলেন—ঢের বেলা হ'লো—চল্ এখন স্নান করতে যাবি। বীরেশ্বর অতি যত্ন করিয়া পুঁথিখানি মুড়িয়া রাখিয়া পিতার সহিত স্নান করিতে বাহির হইয়া গেল।

বিকাল বেলা বীরেশ্বর পুনরায় পিতাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা বাবা আমরা এমন ছোট হয়ে গেলাম কেমন ক'রে?

—ছোট কি রে?

—ছোটই তো। ত্রিলোচন রায়ের চেহারার বর্ণনা পড় নাই—তিনি ছিলেন পুরো পাঁচ হাত লম্বা অর্থাৎ সাত ফিট্ ছয় ইঞ্চি, বুকের ছাতি ছিল নাকি মস্ত চওড়া। যে তরবারিখানা নিয়ে তিনি যুদ্ধ করতেন—সেখানার ওজন ছিল নাকি দশ সের। আমি কতটুকু লম্বা জান বাবা—মোটে পাঁচ ফিট্ চার ইঞ্চি। সত্যি বল না বাবা বাঙ্গালী জাত এমন দুর্ব্বল হ'য়ে গেল কিজন্য?

সুরেশ্বর কি জবাব দিবেন—ইতস্ততঃ ক'রতেছিলেন।

বীরেশ্বর বলিল—সেদিন একখানা কাগজে পড়েছিলাম—এই দেড় শ' বৎসরের বিদেশী শাসনই নাকি এর মূলে। এই দেড় শ' বছরে দেশের স্বাস্থ্যের প্রতি, খাদ্যের প্রতি এতটুকু নজর দেওয়া হয় নাই—তাই এই অবস্থা।

সুরেশ্বর খানিকটা অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন—ও সব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কি খোকা—চল একটু বেড়িয়ে আসি।

তিন

ইহার পর কয়েকদিন ধরিয়া ত্রিলোচন রায় বীরেশ্বরের চিত্ত একেবারে অধিকার করিয়া রহিল। সুরেশ্বরের এক জ্ঞাতি ভাইয়ের ছেলের নাম শ্যামলাল। পাশেই তাহাদের বাড়ী। বীরেশ্বর এখানে আসবার পর শ্যামলাল ফাঁক পাইলেই তাহার সহিত আসিয়া মিলিত হয়। কয়েক দিন হইল শ্যামলাল মাইল দুই দূরে তাহার মামার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। সেদিন সকাল বেলা বীরেশ্বর নিজের ঘরে বসিয়া কি যেন করিতেছিল—এমন সময় শ্যামলাল আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল, কেমন আছেন বড় দা'।

বীরেশ্বর তাহার দিকে ফিরিয়া বসিল—এস শ্যামলাল কিন্তু মাথায় ও টুপি কেন?

শ্যামলাল হাসিয়া বলিল—গান্ধীটুপি বড় দা'। আমি স্বেচ্ছাসেবক হয়েছি। এ কয়দিনের কাগজ বুঝি দেখেন নি। বোম্বাইয়ে কংগ্রেসনেতাগণের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষ একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে দেশকে দিয়ে গিয়েছেন দুটী বাণী—"কুইট ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ইংরেজ ভারত ছাড়—আর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'—করবো অথবা মরবো। বীরেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কিছু তো জানি না ভাই। কাগজ এখানে পাব কোথায়?

শ্যামলাল বলিল—আমাদের লাইব্রেরীতে আসে—আজ আপনাকে এ কয়দিনের কাগজ এনে দেবো। জানেন বড় দা'—এই হলো গিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের চরম সংগ্রাম—এবার ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতেই হ'বে। বোম্বাইতে গুলী চলেছে—পাটনায়—দিল্লীতে, আরও কত কত জায়গায়—মানুষ এবার ভয় ভেঙে জেগে উঠেছে—পণ করেছে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'।

এবারকার প্রোগ্রাম কি জানেন—ও হিংসা-অহিংসার বাছবিচার আর নাই—যেখানে যেমনি হয় তেমনি করে আন্দোলন করতে হ'বে—রেল-লাইন তুলতে হ'বে—টেলিগ্রামের তার কাটতে হ'বে, ট্রেজারী লুট করতে হ'বে—থানা দখল করতে হবে। বীরেশ্বর বাধা দিয়া বলিল—অন্য জায়গার মতো এখানেও পুলিশে গুলী ছুঁড়বে নিশ্চয়, ভয় করবে না তো?

ভয়?—ভয় করলে তো এবার আর আন্দোলনে নামা চলবে না দাদা!

শ্যামলালের বয়স এই ষোল সতেরো—তাহার স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল দেহ—প্রাণ-চঞ্চল ভঙ্গিমা বড় ভাল লাগিতেছিল বীরেশ্বরের।

বীরেশ্বর বলিল—তোমার বাবা যদি নিষেধ করেন তা' হ'লে কি করবে শ্যামলাল?

ভাল কাজে যদি গুরুজন নিষেধ করেন সে নিষেধ অমান্য করলে অন্যায় হয় না। আমি কারু বাধা মানবো না দাদা।

বীরেশ্বর বলিল—আজ সন্ধ্যা বেলা এসো শ্যামলাল—তোমাকে বড় চমৎকার একটা জিনিষ পড়ে শুনাব—আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস—ত্রিলোচন রায়ের কথা।

সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া ত্রিলোচন রায়ের ইতিহাস শুনিয়া শ্যামলাল একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল—আমাদের বংশে এমন মহাপুরুষও জন্মগ্রহণ করেছেন

দাদা। এ তো কম বিস্ময় নয়। এ পুঁথিখানার কোন সন্ধানই তো এতদিন জানতাম না। সেই ত্রিলোচন রায়ের রক্তই তো আমাদের ধমনীতে বয়ে যাচ্ছে, তা হলে আমরাই বা পারবো না কেন? দয়ারামের কথা শুনে যদি তিনি সীতারামের পক্ষ পরিত্যাগ করতেন তা হলে মোগলের অধীনে কত বড় জমিদারীই না পেতেন কিন্তু তিনি তো তা চান নি—তিনি চেয়েছিলেন নিজের জাতির সম্মান, নিজের দেশের স্বাধীনতা। আসুন না দাদা, আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়ি এই সংগ্রামে।

কিন্তু বীরেশ্বর একটা কথাও না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

কি অমনি চুপ করে আছেন যে দাদা?

আমি যে কিছুই ভেবে পাচ্ছিনে ভাই—কি বল্‌বো?

লেখাপড়ার কথা ভাবছেন বুঝি? থাক্‌না একটা বছর নষ্ট হ'য়ে। আমি আর ইস্কুলে যাচ্ছিনে, একেবারে স্বাধীন দেশের স্বাধীন ইস্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হ'ব। মোটে একটা বছর বই তো নয়। একটা বছরের ভিতরেই এবার দেশ স্বাধীন হ'বে দেখবেন।

বীরেশ্বর বলিল—লেখাপড়ার কথা আমিও ভাবছিনে ভাই—ভাবছি বাবার কথা, তিনি মনে অত্যন্ত দুঃখ পাবেন।

শ্যামলাল হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিল—কয়টা বাজে দেখুন তো দাদা।

বীরেশ্বর ঘড়ি দেখিয়া বলিল—নয়টা।

আর তো দেরী করতে পারবো না—আমাকে এখনি যেতে হ'বে।

কোথায়?

বেলডাঙ্গায়—আজ রাত্রি দশটার পরে আমাদের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকদের এক গোপন বৈঠক হ'বে।

এই অন্ধকার রাত্রে একা একা যাবে?

না গিয়ে তো উপায় নাই দাদা।

শেষ রাত্রির দিকে বীরেশ্বরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, নানা এলোমেলো চিন্তা তাহার মাথায় আসিয়া মন উতলা করিয়া তুলিয়াছিল। হঠাৎ বহুদূর হইতে কাহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বুঝিতে পারা গেল লোকটী গাহিতে গাহিতে এদিকেই আগাইয়া আসিতেছে। বীরেশ্বর অতি সন্তর্পণে দরজা খুলিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল; এবার স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল—

"মায়ের নাম নিয়ে ভাসান তরী
এ তরী কি ডোবেরে ভবে
—এ তরী কি ডোবে।"

এ তো শ্যামলালের কণ্ঠস্বর—বীরেশ্বর বুঝিতে পারিল—সেই এই শেষরাত্রে বেলডাঙ্গা হইতে সভা করিয়া একা একা ফিরিতেছে। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া শ্যামলাল চুপ করিয়া গেল। বীরেশ্বরের মাত্র হাত ত্রিশেক দূরের পথ দিয়া শ্যামলাল তাহার বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল—বীরেশ্বর তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। সে পুনরায় ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় আসিয়া শয়ন করিল—হঠাৎ কেন যেন তাহার বারে বারে মনে হইতে লাগিল—তাহার যৌবন—তাহার কলেজের এমন "কেরিয়ার", ভাল স্বাস্থ্য ও চেহারা সব বৃথা।

ওই শ্যামলালের জীবন তাহা অপেক্ষা অনেক সার্থক—আজিকার দিনে তাহার মূল্য বীরেশ্বরের অপেক্ষা অনেক বেশী।

ইহার কয়েক দিন পরে পুলিশ ভোর হইতে শ্যামলালদের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় বীরেশ্বরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া শ্যামলাল বলিয়াছিল—আমি এবার ফাঁকি দিয়ে বেঁচে গেলাম দাদা—না খেলাম গুলী, না পড়লো মাথায় পুলিশের লাঠি।

চার

সুরেশ্বরের ছুটি শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু বীরেশ্বরকে লইয়া এবার তাঁহার চিন্তার অন্ত নাই—দেশব্যাপী এই উত্তেজনার ভিতরে তাহাকে নিজের চোখের আড়ালে রাখিয়া যাইতে মন চাহিতেছিল না। কলিকাতা আসিয়া দেখিলেন—সেখানেও প্রবল উত্তেজনা চলিতেছে—ট্রামগাড়ী পুড়িতেছে—মিলিটারী লরী দেখিলে জনতা আক্রমণ করিতেছে, পুলিশও স্থানে স্থানে নির্ব্বিচারে গুলী ছুঁড়িতেছে। অগত্যা কলিকাতায় তাঁহার এক আত্মীয়ের উপরে বীরেশ্বরের দেখা-শুনার ভার দিয়া—বীরেশ্বরকেও নানা উপদেশ দিয়া তিনি বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন।

দিন সাতেক পরে—সেদিন সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের একটা বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইবার কথা ছিল। বিকালবেলা তাহাদের হোষ্টেল হইতে প্রায় ৪০।৫০ জন ছাত্র একটি শোভাযাত্রা করিয়া মূল শোভাযাত্রায় গিয়া যোগ দিবে স্থির হইল। সকলে যখন দল বাঁধিয়া হোষ্টেল হইতে বাহির হইতেছিল—তখন বীরেশ্বরের "রুমমেট্" সনৎ ডাকিল, যাবি না বীরেশ্বর? বীরেশ্বর কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিল। বাহির হইতে অজয় বলিল, সব্বাই যাচ্ছে, তুই যাবি না কি রে?

আর একটী ছেলে পাশ দিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "কাউয়ার্ড"

এইমাত্র মিনিট পাঁচেক হইল হোষ্টেল খালি করিয়া সকলেই বাহির হইয়া গিয়াছে।

বীরেশ্বর তখনও একা একা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া মাথায় একটা গান্ধী টুপি পরিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া চাকরকে ডাকিয়া চাবি দিল।

চাকরটী জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবেন বাবু?

বীরেশ্বর বলিল, প্রসেশানে।

—কখন ফিরবেন?

—জানি না।

কয়েক মিনিট দৌড়াইয়া বীরেশ্বর সকলকে ধরিয়া ফেলিল—সনৎ মুখ ফিরাইয়া বলিল, কি রে এলি যে।

বীরেশ্বর ম্লান হাসিয়া বলিল, অমনি।

যে-স্থান হইতে মূল শোভাযাত্রা বাহির হইবার কথা ছিল, বীরেশ্বরেরা তাহার কাছাকাছি পৌঁছিয়া জানিতে পারিল, ইতিমধ্যে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। দলে দলে ছাত্রেরা শোভাযাত্রা করিয়া সেই স্থানটিতে আসিয়া মিলিতেছিল—এই কিছুক্ষণ পূর্বে পুলিশ তাহাদের উপরে বে-পরোয়া লাঠি চার্জ্জ করায় সমগ্র ছাত্রগণ এবং জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া কয়েকখানা ট্রামগাড়ী পোড়াইয়া দিয়াছে, মিলিটারী লরীর উপরে ইট-পাটকেল ছুড়িয়াছে—একটা পোষ্টাফিসে ঢুকিয়া তাহার খানিকটা জ্বালাইয়া দিয়াছে। লরী বোঝাই করিয়া সশস্ত্র সৈন্য আসিয়া টহল দিতেছে—তাহাদের গুলীর আঘাতে কয়েকজন ইতিমধ্যে হতাহত হইয়াছে। বীরেশ্বরের দল আরও কিছুটা অগ্রসর হইতেই হঠাৎ পিছন হইতে গোরা সৈন্য বোঝাই একখানা লরী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া থামিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য লরী হইতে নামিয়া তাহাদের দলের উপরে বেটন দিয়া আক্রমণ চালাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ এলোপাথারী বেটন চালাইবার ফলে ছাত্রেরা পাশের গলির ভিতরে যে যেখানে পারিল আত্মগোপন করিল। যে ছেলেটী জাতীয় পতাকাটী ধরিয়া ছিল—তাহার হাত হইতে একটী সৈন্য জাতীয় পতাকাটী ছিনাইয়া লইল। ছেলেটী পতাকা ছাড়িয়া সেই পাশের গলির দিকে ছুট দিল। সকলের পিছনে ছিল বীরেশ্বর হঠাৎ অতর্কিতে সে গোরা সৈন্যটির উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। জাতীয় পতাকাটী কাড়িয়া লইয়া দুই হাতের মুঠায় শক্ত করিয়া ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোরা সৈন্যটী পতাকাটী পুনরায় আকর্ষণ করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—ছোড় দেও। বীরেশ্বর দৃঢ়স্বরে জবাব দিল—নেহি ছোড়েঙ্গে। অন্য একটি সৈনিক তাহার মাথার গান্ধী টুপিটী দেখাইয়া আদেশ করিল—উতারো।

বীরেশ্বর এবারও তেমনি করিয়া জবাব দিল—কভি নেহি।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথার উপরে সজোরে একটি বেটনের ঘা আসিয়া পড়িল—বীরেশ্বরের মাথা ফাটিয়া দুই পাশ গড়াইয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। এমন সময় লরীর উপর হইতে তাহাদিগকে যেন কি সঙ্কেত করা হইল—সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চটপট লরীতে গিয়া উঠিয়া পড়িল। বীরেশ্বর তেমনি করিয়া সেখানেই ছিল দাঁড়াইয়া। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ফট ফট করিয়া কয়েকবার মেশিন গানের শব্দ হইল—সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা সমেত বীরেশ্বর রাস্তার উপরে লুটাইয়া পড়িল। লরীখানি গর্জ্জন করিয়া সম্মুখের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পরের দিন বিকাল বেলা সুরেশ্বর বোম্বাইতে যখন তার পাইলেন—তখন বীরেশ্বরের দেহকে শোভাযাত্রা করিয়া কেওড়াতলা শ্মশানে আনিয়া নামান হইয়াছে। সারাদেহ তাহার জাতীয় পতাকায় ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে—শবাধারের উপরে ফুলের গাদা হইয়া উঠিয়াছে। মুখে কপালে ঘন করিয়া চন্দন লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাশেই চিতা প্রস্তুত হইয়া আছে—এখন ধরাইয়া দেওয়া বাকী।

দোলের দোল

শ্রীমন্মথনাথ সরকার

কোকিলের মত সব কালি মেখে ফাগুনে ফাগুন সাজাব—
কালোর গরবে আলোর রাগিণী জীবনে জীবনে বাজাব॥
দাঁড়াতে না পারি মাতালের মত ধুলায় শয়ন পাতিব।
চরণের তলে ধরণীর মত সবারে গো ভাল বাসিব॥

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

শ্রীকুমুদনাথ দাস

[৪]

রাস্কিন ধারকরা বই পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন।* কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ রীতি—একজন বই কিনে, দশজন তাঁহার নিকট চাহিয়া পড়ে। তারপর ইংরেজী ভাষার মোহ এমনভাবে দেশের লোকের চিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়া আছে যে, অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী বইও কিনিতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর বাংলা বই কিনিতে রাজী ন'ন। ফলে বাংলা বইয়ের চাহিদা খুব কম; বাঙ্গালী লেখকগণকে নাইটিঙ্গেলের মত কাঁটার উপর বুক রাখিয়া গাহিতে হইবে—

'বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বনিতা লতাঃ'। প্রাচীন সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অন্বেষণ করিলে সাহিত্যের পিছনে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

উৎসাহের অভাবে সাহিত্যিকেরা লেখনী বন্ধ করিলে তাঁহাদের চেয়ে আমাদের ক্ষতিই বেশী। "The result to individual Men of Letters is not momentous one; they are but individual the insignificant fraction of a great body; they can struggle on, and live or die, as they have been wont. But it concerns the whole society whether it will set its light on high places, to walk erect thereby; or trample it under fort, and scatter it in all ways of wild waste (not without conflagration) as heretofore' †

"সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফল 'অবকাশে'র ক্ষেত্রে ফলেছে।" কিন্তু বাঙ্গালীর জীবন-সংগ্রাম দিন দিন যেরূপ কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে, তাহাতে অবকাশের ঠাঁই কোথায়? সাহিত্য-বিজ্ঞান ললিতকলায় যাঁহাদের নূতন কিছু অবদান করিবার শক্তি আছে, উদর-সংস্থানের চিন্তাতেই যদি তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়, তাঁহাদের নিকট জাতি কি আশা করিতে পারে? 'অন্নচিন্তা চমৎকারা কাতরে কবিতা কুতঃ'। মধুসূদনের জীবনচরিতকার লিখিয়াছেন, "য়ুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর মধুসূদন ছয় বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্য বিশেষ কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। অর্থ উপার্জ্জনের চিন্তাতেই তাঁহার দিন শেষ হইত; বাগ্দেবীর সেবার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না।"

বাংলা দেশে দুঃস্থ সাহিত্যিকের সাহায্যের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা পেন্সনের ব্যবস্থা আছে। ২৫৲ টাকায় কোন ভদ্রলোকের চলে না। ইংলণ্ডে কাউপার জনসন প্রভৃতি লেখক রাজ-তহবিল হইতে বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ড (বা ৪৫০০৲) পেন্সন পাইয়াছিলেন (এবং এখনও বোধ হয় ইংলণ্ডে সেইরূপ পেন্সনের ব্যবস্থা আছে)। ইংলণ্ডের তুলনায় বাংলাদেশ গরীব, কিন্তু তাই বলিয়া বাংলার সরকারী তহবিল হইতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণকে মাসিক ১০০৲ এবং তন্নিম্নের সাহিত্যিকগণকে মাসিক ৫০৲ পেন্সন দেওয়া যাইতে না পারে—এমন নয়। সরকারী তহবিলের টাকা কত ভাবে ব্যয়িত হইতেছে। যাঁহারা দেশের লোকের মনের খোরাক যোগাইবেন, তাঁহাদিগকে অভাবের ঊর্দ্ধে রাখা কি দেশের কর্ত্তব্য নয়? মধু হেম কান্তকবি শেষ বয়সে যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা জানিয়াও কি বাঙ্গালীর কিছু শিখিবার নাই? মধুসূদনের শোচনীয় মৃত্যুতে যে জাতীয় কলঙ্ক হইয়াছে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, ত্রিস্রোতা, মহানন্দা, কর্ণফুলী, সুবর্ণরেখার সমস্ত জল ঢালিলেও তাহা কোনদিন লুপ্ত হইবে না। এই বিষয়টি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গ্রহণ করা উচিত এবং একটা মোটা টাকা Literary Penson বাবদ মঞ্জুর করিয়া সাহিত্যপরিষদের (অথবা কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাহিত্যপরিষদের) অনুমোদন অনুযায়ী বিতরণের ব্যবস্থা করা উচিত।

সাহিত্য রক্ষার জন্য চাই—একদল গুণী লেখক, একদল কৃতী নিরপেক্ষ সমালোচক এবং একদল উৎসুক গুণগ্রাহী পাঠক*। এই তিনটির যে কোনটির যে সাহিত্যে অভাব, সে-সাহিত্যের উন্নতি সুদূরপরাহত।

জাতীয় সাহিত্যের পতনের সঙ্গে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

বিগত ও বর্ত্তমান শতকের বৈশিষ্ট্য স্বাধীন চিন্তা ও পরমত সহিষ্ণুতা।

যখন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকে ভগবান্ জগতে পাঠান, সকলকে সাবধান হইতে এমার্সন বলিয়াছেন।

'কোন খাঁটি প্রতিভার আবির্ভাব হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে মূর্খেরা দলবদ্ধ হইয়া থাকে—তাঁহাকে চিনিবার এই উপায়।'—সুইফ্‌ট

এক যুগের চিন্তার ধারা পরবর্ত্তী যুগে 'বাসি' হইয়া যায়।

লেখক সমালোচক সৃষ্টি করে। সমালোচক লেখক ও পাঠকের মধ্যে থাকিয়া উভয়কে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে।

পাঠক সহজে মিলে না, লেখককে পাঠক সৃষ্টি করিতে হয়।

কীট্‌স তাঁহার স্মৃতিফলকে লিখিয়াছেন, 'Here lies one whose name was writ in water'। সুখের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরেই তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ে লিখিত হইয়াছে। মেথু আর্ণল্ড্ তাঁহার আসন সেক্সপীয়রের পাশেই দিয়াছেন। সেক্সপীয়র ও মিল্টন নিজেদের স্মৃতিসম্বন্ধে কি ধারণা লইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন বুঝা যায় না, তবে মধুসূদন তাঁহাকে বঙ্গবাসীর ভুলিবার অধিকার নাই—এই ভাব লইয়াই অমরধামে গিয়াছেন—তা' ভিন্ন তিনি স্মৃতিফলকে লিখিতেন না,

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল......

---

* "Never read borrowed books. To be without books of your own is the abyss of penury. Don't endure it. And when you have to buy them, you will think whether they are worth reading which you had better, on all accounts.'
—Ruskin to a young lady.

† কার্লাইল।

* 'সমাজের অনাদরে মানুষের চিত্তসম্পদ্ প্রভূত পরিমাণে অবলুপ্ত হ'য়ে থাকে।'—রবীন্দ্রনাথ।

[ক্রমশঃ

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীহেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায

আজ আপনাদের কাছে এমন একজন মনীষীর কথা বলিব, যিনি ভারতের ইতিহাসে চিরদিনের মত অমর হইয়া আছেন। তিনি পানিহাটী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই গ্রামকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পূর্ণচন্দ্রের পিতা ৺কালিদাস মুখোপাধ্যায় বালির ভট্টাচার্য্য-বংশের শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ১৮৪০ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিবাহবৎসরেই সমাধা হইয়াছিল, ছেলেবেলা হইতেই কালিদাস নিরহঙ্কার, সদালাপী ও অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তৎকালীন কলিকাতার ট্যাঁকশালে কর্ম্ম করিতেন এবং একজন বিশিষ্ট হিসাবী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। কন্যাটি নাম হবার পূর্ব্বেই মারা যায়। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথম পুত্র কুমার নাথ শৈশবে বাড়ী হইতে নিরুদ্দিষ্ট হ'ন এবং পরে জানিতে পারা যায় যে তিনি কলেরা রোগে মারা গিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র।

কলিকাতা নগরীর সাত মাইল উত্তরে পানিহাটী গ্রামে ইংরাজি ১৮৪৯ বাংলা ৩রা আষাঢ় সকাল সাতটার সময় পূর্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশব হইতেই পূর্ণচন্দ্র তীক্ষ্ণ মেধাবী ও সাহসী ছিলেন। তিনি বড় দুরন্ত ছিলেন। সর্ব্বদাই খেলাধূলায় মত্ত থাকিতেন। লেখাপড়ার দিকে তাঁহার মন যাইত না। কিন্তু যখন যে দিকে তাঁহার ঝোঁক পড়িত, সে কাজ তিনি শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে ইতিহাস, ভূগোল ও মানচিত্রে তাঁহাকে কোন ছাত্রই পরাস্ত করিয়া উঠিতে পারিত না, —এমন কি যীশুখৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকেও তিনি একবার পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র প্রথম পাঠ আরম্ভ করেন আগড়পাড়ার বিবিধ খৃষ্টীয় বিদ্যালয়ে। তিনি কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিতেন না, সেই জন্য বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অতিপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। আগড়পাড়া স্কুলে পড়িবার সময় একটি ঘটনা—একদিন স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় পথে দুই জন বালকের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয় এবং ক্রমশ: অবস্থা চরমে গিয়া দাঁড়ায় ও উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি আরম্ভ হইয়া যায়। বালক পূর্ণচন্দ্র প্রথমে উভয়কে থামাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, পরে উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উভয়কে মারামারি হইতে নিবৃত্ত করেন। কিন্তু উভয়ের কিল-চড় খাইয়া তাঁহার মাথা ফাটিয়া যায় এবং দর দর ধারে রক্ত গড়াইয়া পড়ে। একজন ভদ্রলোক দূর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি পূর্ণচন্দ্রের কাছে আসিয়া বলিলেন—"মারামারির মধ্যে কখনও যাইতে নাই, দেখ দেখিনি তোমার মাথা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতেছে।" হাসিয়া বালক পূর্ণচন্দ্র উত্তর দিলেন "ওদের যে মারামারি বন্ধ করিতে পারিয়াছি তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" তার পরে ডানহাত মাথায় দিয়া রক্তটা একবার দেখিয়া বলিলেন "ও কিছু নয়" ভদ্রলোক অবাক্ হইয়া পূর্ণচন্দ্রের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চলিয়া গেলেন। পূর্ণচন্দ্রও সঙ্গীদ্বয়ের সহিত গল্প করিতে করিতে বাড়ীর পথে চলিয়া গেলেন।

পিতার উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বালক পূর্ণচন্দ্র প্রতিবৎসরই ক্লাসের পর ক্লাসে উঠিতে লাগিলেন এবং আত্মীয়স্বজনও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা (Entrance) শ্রেণীতে না উঠাইয়া দেওয়ায় পিতামাতার অজ্ঞাতসারে তিনি সোদপুর ইংরাজি বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি যদিও ভাল বিদ্যার্থী ছিলেন না—এবং শিক্ষক মহাশয়রা তাহার প্রতি যত্ন নিতেন না, তথাপি তিনি সকল বালককে পশ্চাতে রাখিয়া একক প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময় উক্ত স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন—কালিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

তৎপরবৎসর অর্থাৎ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মেডিকেল-কলেজে ডাক্তারী পড়িতে যান কিন্তু তাঁহার পিতাঠাকুরের দুঃসময় হওয়াতে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে হইয়াছিল। ঐ বৎসরের শেষ-ভাগে ছোট-জাগুলিয়া নিবাসী ৺হরমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী রক্ষাকালীদেবীকে বিবাহ করেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর যে সময় তিনি বসিয়াছিলেন সেই সময় নিজের চেষ্টায় তিনি বংলা ভাষা আরম্ভ করেন

এবং পদ্য রচনা করিতে শিক্ষা করেন। ক্রমে ক্রমে গদ্য-পদ্যে নাটকাদিও লিখিতে আরম্ভ করেন।

পরবৎসর তিনি লক্ষ্ণৌয়ে যান এবং ক্যানিংকলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মন (Epie poem এ) অর্থাৎ বীর-কাব্যে অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল ; এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি ওজস্বী বীরকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম সর্গ ছাপানও হইয়াছিল, এবং দ্বিতীয় সর্গ কতকটা লেখা হইবার পর তৎকালীন বঙ্গীয় সম্পাদক মহাশয়েরা তাঁহার এই নূতন সৃষ্টি দেখিয়া এরূপ কড়া সমালোচনা আরম্ভ করেন যে, তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয় (প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ-বাবুকে লিখিত এক পত্রে তিনি একথাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ভয় পাইয়া একাজ করেন নাই)—ইহার পর ১৮৭৩ সালে তিনি বি-এ পরীক্ষায় সফল-কাম হইতে পারেন নাই। এবং পিতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল বলিয়া তিনি আর কলেজে পড়েন নাই। তাঁহার জীবনের স্রোত অন্যদিকে বহিয়া চলিল।

এইবারে তাঁহার দৃষ্টি লক্ষ্ণৌয়ের নবাবী বা বাদশাহী মহলে আকৃষ্ট হইল। কারণ, তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, আমাদের দেশের শিল্পকার্য্য একেবারে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে এবং লক্ষ্ণৌয়ের পুরাতন অট্টালিকার অধিকাংশ সে সময় ধ্বংস পাইতেছিল। এই সময় তিনি Pictorial Lucknow History People and Architecture লেখেন এই জন্তে তাঁহাকে চিত্র আঁকিতে শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সময় এক সাহেব তাঁহাকে আউধরোহিল খণ্ড রেলওয়েতে একটি চাকরী যোগাড় করিয়া দেন। তিনি মাত্র ছয়মাস এই চাকরী করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ সাল। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে তাঁহার চাকরী হয়।

উক্ত স্থানে কার্য্য করিতে করিতে গভর্ণমেণ্ট খরচা দিয়া তাঁহাকে বম্বে স্কুল অফ্ আর্টে শিক্ষা করিতে পাঠাইয়া দেন। দুইবৎসর শিক্ষা লাভ করিবার পর পুনরায় লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামের কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

১৮৮২ বা ৮৩ সালে তখনকার ছোটলাট-সাহেব সার্ আলফ্রেড লায়েল তাঁহাকে Goverment Archaeologist অর্থাৎ সরকারী পুরাতত্ত্বানুসন্ধাতা করেন। সেই সময় হইতে তিনি ভারতবর্ষীয় পুরাতত্ত্বে আকৃষ্ট হ'ন। পূর্ণচন্দ্রের কার্য্য দেখিয়া উক্ত ছোট লাট সাহেব বিশেষ খুসী হইয়াছিলেন।

এদিকে কনিংহাম সাহেব রাজকার্য্য হইতে অবসর লওয়াতে ১৮৮৫ সালে পুরাতত্ত্ববিভাগের পুনর্গঠন হয়। তখন ছোট লাট সাহেব পূর্ণচন্দ্রের একটি বড় চাকরীর জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু যে সাহেব (ডাক্তার ফুহরার) তাঁহার প্রাপ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং যাঁহার সহকারী হইলেন পূর্ণচন্দ্র, সেই সাহেবই তাঁহাকে চাকরীচ্যুত করিতে চেষ্টা করিলেন সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া P. W.Department এ (পূর্ত্তবিভাগে) ফিরিয়া গেলেন। তখন তিনি ঝান্সীতে যান এবং ললিতপুর, মুরদাবাদ, আগ্রা, মথুরা, এলাহাবাদ, কাল্পি, সম্ভল প্রভৃতি স্থানে অনুসন্ধান ও খননকার্য্য দ্বারা পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তাহার ফল পূর্ণবাবুর সম্পাদনায় এক বৃহৎ Report and Port folio of drawings, Sir A. P, Macdonell-এর আদেশে ১৮৯৯ সনে গবর্ণমেণ্ট মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

পুনরায় উক্ত ডাক্তার ফুহরারের পরামর্শে তাঁহার চাকরী যায়। তখন সার চার্লস এলিয়ট বঙ্গের ছোটলাট পূর্ণচন্দ্রকে কলিকাতায় আনেন এবং বঙ্গীয় পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ করেন। এই সময় তিনি মগধ, মিথিলা এবং উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। তাঁহার কার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা হয়, তিনি Archaological College of the Imperial Museum আকারে দ্বিগুণ করেন অর্থাৎ আয়তন যাহা ছিল তাহার দ্বিগুণ আয়তন করেন।

ইহার পর বিহার ও উড়িষ্যার Drawing ও Report ছাপা না হ'তেই আবার তাঁহার চাকরী যায়।

১৮৮৬ সালে P. W. D. Secretariat-এ পুনরায় চাকরী পাইলে তিনি বুন্দেলখণ্ডে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। তখন ঝান্সীতে ওয়ার্ড (ward) সাহেব কমিশনার ছিলেন। তিনি এ-দেশীয়দিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি বুন্দেলখণ্ডীয় রাজাদের অট্টালিকার গঠন দেখিয়া তদনুকরণে স্থানীয় বিদ্যালয় গৃহের Design করিতে বলেন এবং তাঁহার নক্সা দেখিয়া খুব খুসী হইয়াছিলেন। আর হার্ডি সাহেব, তথাকার কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে দিয়া ঝান্সী হাসপাতালের নক্সা করান।

১৮৮৭-৮ সালে তিনি বুন্দেলখণ্ডে চান্দেলীয় পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ছবি সহ দুইটি বড় রিপোর্ট লেখেন। তাহা ১৮৯১ সালে সার আণ্টনী ম্যাক্ডনেলের আদেশে সরকারের খরচায় ছাপা হয়। এর পর এখানকার চাকরী যায়—তিনি আগ্রায় চলিয়া যান।

তখন সার চার্লস এলিয়ট বাঙ্গলার লাট সাহেব, তিনি পূর্ণচন্দ্রকে কলিকাতায় আনাইয়া যাদুঘরে (Museum-এ) পুরাতত্ত্বাধ্যক্ষ করেন। এই সময় ১৮৯০ সালে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী রক্ষাকালী দেবী ঝান্সিতে দেহরক্ষা করেন। ১৮৯১ সালে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন টিটাগড় তালপুকুর নিবাসী ৺কীর্ত্তি-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী নলীনী দেবীকে।

১৮৯১-৪ পর্য্যন্ত বিহার ও উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব সন্ধান করেন। পরে ১৮৯৭-৮ সালে পাটনায় গিয়া প্রাচীন পাটলীপুত্র অনুসন্ধানে বহু খনন করিয়া আবিষ্কার করেন। পাটলীপুত্র রিপোর্টও গবর্ণমেণ্টের খরচায় ছাপা হয়।

পরে ডাক্তার ফুহরার কর্ম্মচ্যুত হইলে তাঁহার জায়গায় পূর্ণচন্দ্রকে লওয়া হয় ১৮৯৯ সালে। ঐ সময় তাঁহাকে কপিলাবস্তু ও লুম্বিনী নগরী আবিষ্কারের জন্য নেপাল তরাইয়ে পাঠান হয়। গোরক্ষপুরের উত্তরে তলিবার উত্তরে তিলরাকোটে তিনি কপিলাবস্তুর স্থির নির্ণয় করেন। পরে লুম্বিনী আধুনিক নাম রুমেনদেই নামক স্থানে তিনি বুদ্ধদেবের জন্মস্থানের অনুসন্ধান পান। পর বৎসর তাঁহার নেপাল-রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের খরচায় ছাপা হয়, ইহাতে জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

১৮৯৯ সালের শেষ ভাগ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত তিনি

মথুরা নগরের নিকট কঙ্কালিটিলায় অনুসন্ধান ও খননকার্য্য শেষ করেন। এই স্থানে জৈনদের একটি বড় তীর্থস্থান ছিল।

কপিলাবস্তু ও পাটলীপুত্র নগরী আবিষ্কার করিতে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল—তিনি নিজ অনুসন্ধান দ্বারা এই দুই বিখ্যাত নগরীর অবস্থিতির স্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। কতক হিউয়ানসাং ও কতক ফাহিয়ানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে অনুমান করিয়া কতক নিজ অনুমান দ্বারা তিনি এই দুঃসাধ্য কার্য্য সমাধা করেন।

পুরাতন পাটলীপুত্রনগরী গঙ্গা ও শোণনদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে বহু পশ্চিমে প্রায় তিরিশ চল্লিশ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে।

১৯০১ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত সার জন মার্শালের সহিত তক্ষশীলা ও পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থান অনুসন্ধান ও সার্ভে করেন।

১৯০৩ সালে তিনি কলিকাতা মিউজিয়ামে পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গবেষণা করিতে যান এবং উক্ত কার্য্য করিতে করিতে আমাশয়-পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট রাত্রি তিন ঘটিকার সময় মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে কর্ম্মবীর পূর্ণচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম পুত্র চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টার এখনও জীবিত রহিয়াছেন। কনিষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র, কন্যা সুনীতি দেবী ও মদীয় ৺মাতাঠাকুরাণী তারকদাসী দেবী এবং অপর কন্যাদ্বয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। সুনীতি দেবীর প্রথম পুত্র বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাণিহাটী স্কুলের হেড মাষ্টার ও all fine teacher Association-র সভ্য ছিলেন।

১৮৯৬ হইতে ১৮৯৮ অবধি পাটলীপুত্রের খননকার্য্যে যে সকল বহু পুরাতন দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছিল, পরে তাহাই উপর ভিত্তি করিয়া পাটনা মিউজিয়াম স্থাপিত হয়।

পূর্ণচন্দ্র চারিখানি বিখ্যাত পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। যথা Pictorial Lucknow History, people Architeture.—নিজের খরচায়।

—কপিলাবস্তু রিপোর্ট, পাটলিপুত্র রিপোর্ট ও ললিতপুর রিপোর্ট —সরকার বাহাদুরের খরচায়।

দেশ-বিদেশের এই সার্ভে ও খননকার্য্যে তাঁহাকে অনেক বিপদ্‌-আপদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। একবার অনুসন্ধানকার্য্যে নিযুক্ত থাকার সময় আসামের জঙ্গলপথের মধ্য দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন এবং পিছনে পিছনে তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য মশাইকরিও ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল। এমন সময় একদল বন্যহস্তী তাঁহাদের তাড়া করে, আরও কয়েকটি হস্তী সম্মুখ আগুলিয়া দাঁড়ায় ইহাতে পূর্ণচন্দ্রের ঘোড়াটি ভয় পাইয়া লাফাইয়া ওঠে ও তিনি সামলাইতে না পারিয়া পিঠ হইতে পড়িয়া যান। হাতীর দল প্রায় তাঁহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে আর কি—এমন সময় বিদ্যুৎবেগে তাঁহার চাকর মশাই লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া পুনরায় ঘোড়ায় উঠিয়া তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দেয়। ইহাতে সেবারকার মত তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। সেইজন্য পূর্ণচন্দ্র মশাইকরিকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন এবং হাজার অপরাধ করিলেও কখনও কটু কথা বলিতেন না।

শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুকে লিখিত পত্রের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন "পাটলিপুত্র-রিপোর্ট লিখিবার সময়ে অশোক-সম্রাট বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তদ্দ্বারায় জানিলাম যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ যে, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা মহা ভুল। অশোকের সময় ২৭০ বৎসর খৃষ্টপূর্ব্বে নহে—তাহা ৩২৫ বৎসর এবং মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকদের Sandracottus নহে, অশোকই Sandracottus ছিলেন।" এ-বিষয়ে তিনি এক পুস্তক লক্ষ্ণৌয়ে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রীস্‌ ডেভিডস্‌ তাঁহার মৌলিক গবেষণার খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র অতি সাদাসিদে দীর্ঘশিখাধারী খর্ব্বকায়, এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে শুষ্ক ও শীর্ণ ছিল। তিনি খুব ঝাঁঝাল স্বভাবের ও স্বাধীনচেতা লোক ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, বিধাতা তাঁহাকে চাকরীর জন্য গড়েন নাই। তিনি অন্তরে খুব সুরসিক ও সরস প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন খুব—সময় সময় প্রায়ই তাঁহার মুখে আস্তে আস্তে সঙ্গীত-আলাপ শোনা যাইত। লক্ষ্ণৌয়ে থাকা কালীন তিনি একখানি অতি সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছিলেন ঐ পুস্তকখানি ছাপা হয় নাই। উহার পাণ্ডুলিপি এখনও বর্ত্তমান আছে। উহাতে এমন বিস্তর তথ্য আছে যাহা অন্য পুস্তকে নাই; এরূপ অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আছে, যাহা সাধারণের অপরিজ্ঞাত, এমন কি সরকারী কাগজপত্রের অনেক বিষয় উহাতে আছে।

তিনি তরুণ বয়সে যে বীরকাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম "ভারতীয়ম্" উহা ১৮৭৫ সালে ছাপা হয়। উহা সংস্কৃত কবিতার মত লঘুগুরু উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয়।

পূর্ণবাবু অনেক প্রাচীন মুদ্রা, অলঙ্কার, মৃন্ময় ও প্রস্তর মূর্ত্তি প্রভৃতি নানাবিধ পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়াছেন—পুরাতন সামগ্রী চিনিয়া সংগ্রহ করিবার তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। ১৩০৯ সালে এলাহাবাদে থাকাতে তিনি কেবলমাত্র কয়েকদিনের জন্য প্রাচীন কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষে গিয়া বিস্তর অতি প্রাচীন তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা, স্ফটিকের মালা ও অলঙ্কার, মৃন্ময় ও প্রস্তরমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার প্রস্তরে খোদিত ছাঁচ প্রভৃতি লইয়া আসেন। তিনি তেজস্বিতা ও স্বাধীনচিত্ততার জন্য পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াও বার বার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার অসামান্য যোগ্যতা ও কর্ম্মিষ্ঠতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পূর্ণবাবু তাঁহার সমসাময়িক ভারতবাসী পুরাতত্ত্বানুসন্ধাতাদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্র জীবনে কখনও মাছ-মাংস খাইতেন না, এমন কি, বাড়ীতে পর্য্যন্ত উহা ঢুকিত না। তাঁহার কোন নেশাই ছিল

না, পান পর্য্যন্ত তিনি খাইতেন না। তিনি খুব ধার্ম্মিক ছিলেন —কর্ম্মের মাঝে সামান্যমাত্র অবসর পাইলেই ধর্ম্মচর্চ্চায় মগ্ন অতিবাহিত করিতেন। তিনি থিয়োজফিষ্ট (ব্রহ্মবাদী) ছিলেন।

পূর্ণচন্দ্রের অদৃষ্টের আর একটি গল্প বলিয়া আপনাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে চাই—একবার তিনি আলমোড়ায়—ঘোড়ার মোড়ায় বসিয়া রিসার্চের খসড়া লিখিতেছিলেন—এমন সময় একটা বন্যহস্তী তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসে; তিনি ভয় পাইয়া ছুটিয়া পলাইয়া যান। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পান, হাতীটি মাটিতে পড়িয়া গেল—তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পান জন্তুটি মরিয়া গিয়াছে এবং একটি বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণের কাঁকড়া-বিছা উক্ত হাতীটির শুণ্ড কামড়াইয়া বসিয়া আছে। তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন। এত বড় একটি প্রাণী সামান্য একটি বিছার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া দেহত্যাগ করিল—অনুসন্ধানে জানিলেন, কাঁকড়া বিছার বিষ হাতীর পক্ষে ভয়ানক মারাত্মক জিনিষ।

পূর্ণচন্দ্রের প্রত্যেকটি রিপোর্ট মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাতত্ত্বের যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য জিনিষ জনসাধারণের ঘরে ছিল, পূর্ব্বে বহির্জ্জগতের বিভিন্ন দেশ হইতে বহু পর্য্যটক ভারতবর্ষে আসিয়া সামান্য মুদ্রা দিয়া উহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেন,—তাহার তীব্র প্রতিবাদ ছিল। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পরবৎসর অর্থাৎ ১৯০৪ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের এক বিশেষ আইনজারির ফলে উহা রহিত হইয়া যায়।

পূর্ণচন্দ্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতের বহু অংশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগে থাকিয়া অনুসন্ধান ও খনন-দ্বারা বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সমুদায় ধ্বংসাবশেষ ও লুপ্ত নগরী এবং তৎকালীন সভ্যতা আবিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান জগতের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন, জগতে তাহার দান অতুলনীয়। কিন্তু আমি আজ অতি দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আজ পর্য্যন্ত এত বড় একটা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্মরণযোগ্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। আজ যে জগতের প্রত্যেক জাতি ভারতবর্ষীয় অতীত আর্টকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন—ইহা উক্ত মনীষীরই কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় সাধিত হইয়াছে।

মূকের ভাষা

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল

গত রজনীতে একা,
আমি ছিনু জেগে আর ছিল জেগে
শারদ-চন্দ্রলেখা।
নিবিড়-নিদ্রামগন ভুবন
হেরিতেছিল কী সুখের স্বপন,—
পুলকাঙ্কিত অধরে তাহার
মেদুর হাস্যরেখা!

শুনেছি শুক্ল যামি'—
নীরব নিশীথে মূক প্রকৃতির
গোপন মর্ম্মবাণী!
সুরহীন গান, ভাষাহীন কথা,
শত ইঙ্গিত, শত আকুলতা
এ জগৎ হ'তে কোন্ মায়ালোকে
নিয়েছিলমোরে টানি'।

কাল-ই রাতে নিরজনে—
শুনেছি চাঁদিমা যে কথাটি কয়
মত্ত চকোর সনে।
তারায় তারায় যত কানাকানি
শুনেছি হৃদয়ে বিস্ময় মানি,
দেখেছি পবন দেয় হাতছানি
রজনীগন্ধা বনে!

তরু ও লতার কথা—
মৌন নিশীথে শুনিয়াছি আমি;—
চারিধারে স্তব্ধতা।
ললিতপেলব বাহুডোর দিয়া
বিটপীরে লতা ছিল জড়াইয়া,
আমি দেখিয়াছি সে নীরব প্রেম—
বাণীহীন ব্যাকুলতা!

কাল-ই দেখেছিনু চাহি;—
বহুর মাঝারে একের প্রকাশ,
জড় ও চেতন নাহি।
যারে ভেবেছিনু প্রাণহীন মূক
কাল-ই রাতে তার খুলেছিল মুখ,
কানে কানে মোর ক'য়েছিল কথা—
উঠেছিল গান গাহি'!

মানসী*

যতীন্দ্র বেদজ্ঞ

দুই

বৃদ্ধ কাজ করতে করতে বলে চললেন, "হুপ, হুপ, দেখ যুবক, কেমন করে রং ফোটাতে হয়। শুধু একটু করে ছোঁয়া—ব্যাস্। কোথা থেকে ঐ তুহারশীতল স্থানগুলিতে চলে এল জীবনের উত্তাপ। এখানেও ঠিক ঐ ভাবে—ব্যাস্—ব্যাস্। নিপুণ হাতের পরশ পেয়ে প্রাণহীন স্থানগুলিও উঠলো জীবনের বর্ণবৈচিত্র্যে রঙিন হয়ে। শুধু কয়েকটা স্পষ্ট রঙিন রেখা সমস্ত ছবিটির ভিতরে এনে দিল প্রয়োজনীয় বর্ণসামঞ্জস্য। ফুটিয়ে তুললো জীবনের আভা মিশর-কুমারীর সর্ব্ব দেহে। প্রকৃতির সমস্ত অসামঞ্জস্য কোথায় গেল মিলিয়ে।

"তাকিয়ে দেখ ছোকরা, এই শেষের রেখাগুলিই ছবিখানিতে এনে দিয়েছে সম্পূর্ণতা। অথচ আমার প্রত্যেকটা রেখার জায়গায় পরবিউর লেগেছে অন্ততঃ একশ'টা।"

অবশেষে বৃদ্ধ থামলেন। আস্তে আস্তে মুখের পরে ভেসে ওঠলো পূর্ব্বেকার সেই ক্লান্ত প্রশান্তি। একটু আগের উদ্দাম স্ফূর্তি চাঞ্চল্য গেল মিলিয়ে। বিস্মিত পরবিউ ও পুসিনের দিকে ফিরে বসে বললেন, "খুব একটা কিছু এটা হয় নি। তাহ'লেও এটার নীচে নিজের নাম লেখা যেতে পারে......হ্যাঁ, এর নীচে আমি আমার নাম লিখতে রাজি আছি।" বলতে বলতে উঠে গিয়ে একটা বড় আয়নার সামনে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ তার ভিতর দিয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎই বলে উঠলেন, "চল হে, প্রাতর্ভোজনটা আজ আমার ওখানেই সেরে নেবে তোমরা কিছু মদ আর শুকনো মাংস আমার কাছে আছে।—হ্যাঁ,—সময় খুব খারাপ পড়েছে সন্দেহ নেই।—তা'হলেও কিছুক্ষণ শিল্পচর্চ্চা করা যেতে পারে,—কি বল হে? এই ছেলেটার যোগ্যতা আছে।" শেষের কথাটা তিনি পুসিনের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন।

এতক্ষণে তাঁর লক্ষ্য পড়লো পুসিনের পোষাকের জীর্ণতার দিকে। কোমর থেকে ব্যাগ বের করে দু'টো স্বর্ণমুদ্রা পুসিনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তোমার নক্সাটা আমি কিনবো।" চমকিয়ে উঠলো পুসিন্। তার মুখ হ'য়ে উঠলো আরক্তিম। সে দরিদ্র হ'তে পারে কিন্তু আত্মমর্য্যাদাবোধ তার ত' কম নয়। তাড়াতাড়ি পরবিউ বলে উঠলো, "আমি অনুরোধ করছি তুমি নাও। এতে তোমার অসম্মান হবে না। ওঁর যা আছে তাতে দু'চারটে রাজাকে কেনা যেতে পারে।

তিনজনে ষ্টুডিও থেকে নীচে নেমে এলেন। চলতে চলতে তাঁরা আলোচনা করছিলেন শিল্প সম্বন্ধে। অবশেষে তাঁরা এসে পৌছলেন সেন্ট মাইকেল রাস্তার সুন্দর একখানা কাঠের বাড়ীর সামনে। পুসিন এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইলো বাড়ীটির কারুকার্য্যের দিকে। দরজার হাতল, জানালার ফ্রেম, এখানে সেখানে অদ্ভুত সব নক্সা তাকে অবাক্ ক'রে দিল। পরমুহূর্ত্তে সে ঢুকে পড়ল নীচু ছাদওয়ালা একটা বড় ঘরে। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটা বড় টেবিল। তার পরে সাজানো রয়েছে নানাবিধ লোভনীয় সব খাদ্যসামগ্রী। তা' ছাড়া—দু' দু'জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অমায়িক সান্নিধ্য। পুসিনের সত্যই আজ বরাত খুলে গেছে। পুসিন্ কিন্তু তাকিয়ে রইলো একটা ছবির দিকে। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অপরিসীম বিস্ময়! লক্ষ্য ক'রে পরবিউ বললো, "অতক্ষণ ধ'রে ওর দিকে তাকিয়ে থেকো না হে, শেষে হতাশ হ'য়ে পড়বে।"

ছবিখানি আদমের। ম্যাবুর আঁকা। কারাগার থেকে মুক্তি ক্রয় করবার জন্য ওখানা তিনি এঁকেছিলেন। পাওনাদারদের কৃপায় বহুদিন তাঁকে জেলে কাটাতে হয়েছিল। সত্য সত্যই ছবিখানি হয়েছিল অপূর্ব্ব। এতক্ষণে পুসিন্ যেন বুঝতে সুরু করেছে বৃদ্ধের কথাগুলোর সত্যিকারের তাৎপর্য্য। বৃদ্ধ নিজেও তাকিয়ে ছিলো ছবিটার দিকে। তাঁর চোখে আগ্রহ-মিশ্রিত ঔদাসীন্য—যেন আপন মনেই বলছিলেন—"এর চেয়েও ভাল আমি এঁকেছি।"

"এর ভিতর প্রাণ রয়েছে," বৃদ্ধ বলতে—শুরু করলেন, "সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার হতভাগ্য অচার্য্যের প্রচেষ্টা এই ছবিখানির মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু পটভূমির দিক থেকে বলতে হয় সত্যের কিছু অভাব রয়েছে! মূর্ত্তিটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। ও-যেন উঠে দাঁড়াচ্ছে, যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসবে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক? উন্মুক্ত আকাশ, বায়ুমণ্ডল? মলয়-সমীরণ? তাকিয়ে দেখ—এ সবের অভাব বুঝতে পারবে। সেগুলি কিন্তু নেই এর ভিতর। তার পর মূর্ত্তিটার কথাই ধরো না কেন। শুধুই একটা সাধারণ মানুষ। হাঁ, সত্যই তাই। কিন্তু স্বর্গরাজ্য হতে যে লোকটা সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীতে এলো তার ভিতর নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু ছিল, যাকে স্বর্গীয় বলা যেতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে তার কিছুই নেই। মাতাল না হলে ম্যাবু্য নিজেই স্বীকার করতেন এ কথা।"

অশান্ত-কৌতূহলে পুসিন একবার বক্তার আবার পরবিউর মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। তাদের নিমন্ত্রণকারীর নামটা জানবার জন্য সে উসখুস করতে লাগলো। কিন্তু পরবিউ রহস্য-ময়-ভাবে তাকে নিষেধ করলেন সঙ্কেত করে। যুবকের কৌতূহল গেল আরও বেড়ে। কিন্তু আপাততঃ তাকে নীরবই থাকতে হলো ভবিষ্যতের আশায়।

প্রকাণ্ড ঘরটার প্রায় সর্ব্বত্রই চমৎকার সব শিল্প-সম্ভারের ছড়াছড়ি। ভালো ওক-কাঠের দেওয়ালে ঝুলছে এক অপরূপ রূপসীর ছবি। পুসিনের দৃষ্টি পড়তেই অপরিসীম বিস্ময়ে সে চীৎকার করে উঠলো, "বাঃ, কি অপূর্ব্ব এই ছবিটি!"

"না হে ওটা আমার কাঁচা হাতের একটা..."

গৃহস্বামী আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে ভাবপ্রবণ পুসিন বলে উঠলো—"হায় ভগবান্, মনে হচ্ছে আমি যেন স্বয়ং শিল্পদেবতার মন্দিরে প্রবেশ করেছি!"

---

* বল্জাকের "The Unknown Masterpiece" হইতে অনূদিত।

বৃদ্ধের মুখে ফুটে উঠলো মৃদু হাসি। এ সব প্রশংসা তাঁর কাছে নূতন নয়।

"মাষ্টার ফ্রেনোফার," কথার মোড় ঘুরিয়ে পরবিউ বললেন, "আপনার চমৎকার রাইনদেশীয় মদের খানিকটা আমাকে পাঠাবার সুবিধা হবে কি?"

"খুব হবে", বৃদ্ধ উত্তর করলেন—'দু' পিপে। এক পিপে তোমার পাপিষ্ঠা মিশর-সুন্দরীর নজরানা—আর এক পিপে বন্ধুর কাছ থেকে উপহার।"

"হায়, আমার স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকতো", পরবিউ বললেন, "আর আপনি যদি আপনার সৌন্দর্য্যের রাণীকে একটীবার দেখতে দিতেন তবে হয়তো সত্য সত্যই আমি ভাল একটা কিছু আঁকতে পারতাম। তার ভিতর থাকতো একাধারে বিস্তৃতি আর গভীরতা। মূর্ত্তিগুলোও হতো সব পূর্ণায়তন।"

"তোমাকে আমার ছবি দেখাব!" বিচলিত ভাবে বৃদ্ধ বলে উঠলেন, "না, না—সে এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এখনও আমাকে অনেক কিছু করতে হবে।" একটু থেমে আবার বললেন, "কাল সন্ধ্যে বেলা মনে হলো আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমার সাধনা সফল হয়েছে। মনে হলো যেন ওর চোখ দুটী সজল হয়ে উঠেছে। দেহে জেগেছে শিহরণ। কি যেন কিসে আন্দোলিত হচ্ছে ওর কেশগুচ্ছ। ও যেন নিঃশ্বাস ফেলছে। কিন্তু ক্যান্‌ভাসের সমতল পৃষ্ঠে প্রকৃতির সুডৌল আকারকে রূপায়িত করতে সক্ষম হওয়া সত্বেও আজ ভোরে দিনের আলোয় আমি বুঝতে পেরেছি এখনও আমার চেষ্টা সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এইটুকু ফল পেতে কি পরিশ্রমটাই না আমাকে করতে হয়েছে। প্রায় সমস্ত শিল্পাচার্য্যদের সৃষ্টিগুলি নিয়ে গবেষণা করেছি দিনের পর দিন রংয়ের যাদুকর টাইটানের ক্যান্‌ভাসগুলির পর্দার পর পর্দা টেনে তুলে পরীক্ষা করতে হয়েছে তাঁর রংয়ের উপাদান। শিল্পী সম্রাটের মত আমিও প্রথমে আরম্ভ করেছিলাম মুখ থেকে—হাল্কা রং আর খানিকটা নরম চর্ব্বি দিয়ে। ছায়া তো শুধু একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। তারপর আবার আমি নূতন করে সুরু করলাম। আবছা রংয়ের পরে হাল্কা প্রলেপ দিয়ে আভাগুলোকে ক্রমশঃ করে তুললাম গভীর। সাধারণ চিত্রকররা তাদের ছায়াগুলোকে রূপায়িত করে আলোর ঠিক বিপরীত কিছু দিয়ে। ফলে সেগুলো হয়ে দাঁড়ায় প্রাণহীন। জীবন্ত ছায়ার সাথে তার থাকে না কোথাও কোন সাদৃশ্য। মনে হয় যেন মূর্ত্তিগুলো সরে দাঁড়ালেও তাদের ছায়াগুলো নড়বে না। ছবির ঐ অংশগুলি কখনও আলোয় ঝল্‌মল্ করে উঠবে না।

"একটা ভুলের হাত থেকে আমি কিন্তু রেহাই পেয়েছি অনেক বিখ্যাত শিল্পীও সে ভুল করে থাকেন। আমার ক্যানভাসের গাঢ়তম ছায়ার ভিতর দিয়েও ফুটে বেরুচ্ছে শুভ্র আভা। আঙ্গিক খুঁটিনাটির মধ্যে আমি বন্দী করে রাখিনি আমার মূর্ত্তিকে। মানুষের দেহ শুধু কতকগুলো রেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এদিক দিয়ে ভাস্কররা আমাদের চিত্রকরদের চেয়ে সত্যের অনেক কাছাকাছি পৌছতে পারেন। প্রকৃতির রীতিই হচ্ছে কতকগুলো জটিল বাঁকা রেখার সমন্বয়। সঠিকভাবে বলতে গেলে চিত্রাঙ্কন বলে কোন বস্তুই নেই। হেঁসো না যুবক, এখন এ-কথা তোমার অদ্ভুত বলে মনে হবে। কিন্তু একদিন এর সত্যতা বুঝতে পারবে।

"রেখা হচ্ছে আলোক" প্রতিফলনকে প্রকাশ করবার একটা উপায় মাত্র। প্রকৃতিতে কিন্তু কোন রেখারই অস্তিত্ব নেই। সব কিছুই অবিভাজ্য। আমরা এঁকে থাকি ছাঁচমাফিক। অর্থাৎ বস্তুকে তার পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে। কেবলমাত্র আলোকবিচ্ছুরণই এনে দেয় কোন বস্তুকে নিজস্ব রূপ—যা দেখে আমরা তাকে চিনতে পারি। কাজেই আমি কোন রেখাই না এঁকে তাদের ছড়িয়ে দিয়েছি কতকগুলো আবছা রংয়ের মধ্যে। কোথাও গাঢ়, কোথাও বা হাল্কা। বুঝবার যো নেই কোথায় আকারগুলো তাদের পটভূমির সাথে মিশেছে। কাছে থেকে দেখলে ছবিখানিকে মনে হবে অন্ধকার। কিন্তু দু'পা পিছিয়ে যাও, দেখবে সমস্তটাই হয়ে উঠবে স্পষ্ট এবং অবিভাজ্য। দেহ পাবে তার রূপ। সুডৌল গঠন উঠবে প্রাণবন্ত হয়ে। মনে হবে যেন একে ঘিরে অকাশ-বাতাস উঠেছে মাতাল হয়ে। কিন্তু তবুও আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি, এখনও আমার সন্দেহ আছে।

একটু থেমে আবার তিনি বলতে লাগলেন, "হয় তো একটা রেখাও আঁকা উচিত নয়। হয় তো বা মুখের সব চেয়ে উঁচু জায়গাগুলো থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ বিভিন্ন ছায়াস্তরের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে গাঢ় স্থানগুলোতে অগ্রসর হলেই ঠিক হতো। স্বর্গীয় চিত্রকর সূর্য্যেরও তো সেই রীতি। হায় প্রকৃতি, চির-পলাতকা প্রকৃতি, কে কবে তোমায় আয়ত্ত করতে পেরেছে? কিন্তু অত্যধিক জ্ঞান অজ্ঞানতার মতই আমাদেরকে পৌছে দেয় শূন্যতার মাঝে—এ-কথাও খুব সত্য। আমার সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার এসেছে সন্দেহ।" কিছুক্ষণ নীরবতার পর বৃদ্ধ আবার বলে চললেন, "পুরো দশটি বছর ধ'রে আমি এই নিয়ে এঁকে যাচ্ছি, বুঝলে যুবক। কিন্তু প্রকৃতির সাথে দ্বন্দ্বে সামান্য দশটি বছর আর কতটুকু সময়। জান, স্যার পিগমিলিয়নকে শুধু একখানি ছবি জীবন্ত ক'রে তুলতে কতদিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল?" বৃদ্ধ গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তাঁর শূন্য দৃষ্টির সামনে সব কিছু গেল মিলিয়ে। নিজের অজ্ঞাতেই তিনি খেলা করতে লাগলেন তাঁর হাতের ছুরিখানা নিয়ে।

"দেখ, বৃদ্ধ তাঁর মানসীর সাথে কথা কইছেন"—পরবিউ ফিস্ ফিস্ করে বললেন।

নিকোলাস্ পুসিনের শিল্পী মনের ঔৎসুক্য গেল হাজার গুণ বেড়ে। অসংখ্য অস্পষ্ট অনুভূতিতে আলোড়িত হয়ে উঠলো তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থল। মনের মোহময় এইসব অনুভূতির বর্ণনা করা চলে না। এ-যেন সেই ফেলে আসা দিনের সঙ্গীত যা নির্ব্বাসিতকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার গৃহের কথা; উদ্দাম আকাঙ্ক্ষায় মনকে করে তোলে ব্যাকুল।

পুসিনের মনে জাগে বিখ্যাত ছবিগুলোর প্রতি বৃদ্ধের সেই অবজ্ঞা, তাঁর সুবিপুল সম্পদ্, অদ্ভুত ব্যবহার, সর্ব্বোপরি তাঁর সেই রহস্যময় ছবির কথা। তাঁর দীর্ঘকালের প্রয়াসের ফল সেই

ছবিখানির মধ্যে যে শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে—এ-বিষয়ে তো কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

এমন কি ম্যাব্যুর "আদম"-এর পাশেও তাঁর একটা ছবিকে পুসিন বাধ্য হয়েছে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রশংসা করতে। তাঁর সে ছবির প্রতিরেখায় প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীসম্রাটের রাজকীয় মহিমা। সব কিছু মিলে পুসিনের রাঙন মনের কল্পনায় বৃদ্ধ হয়ে উঠলো একজন অতিমানব। তাঁর ভিতর সে আবিষ্কার করলো শিল্পমনের সম্পূর্ণতা। এমন একটী আত্মা—যা একাধারে সদয় এবং বিদ্রূপাত্মক, উর্বর এবং ফলবান্। অসীম শক্তির অপব্যবহার করে স্থৈর্য্য হারিয়ে যা হয়ে ওঠে প্রমত্ত কখনও বা বিলাসী। আপন মনে চলতে চলতে কখনও হয় তো নিজেকেই হারিয়ে ফেলে শুষ্ক মরুপথে, যেখানে সব সৌন্দর্য্যই যায় হারিয়ে। অথচ খেয়ালী শিল্পপ্রকৃতি সেখানেই আবিষ্কার করে বসে মহাকাব্যের রাজপ্রাসাদ। পুসিনের অনুরাগরাঙা মনের আভায় বৃদ্ধ হয়ে উঠলো মূর্ত্তিমান্ শিল্প—যাঁর ভিতর লুকিয়ে রয়েছে শিল্প-জগতের যাবতীয় রহস্য, উদ্দাম আবেগ আর অফুরন্ত কল্পনারাশি।

"হ্যাঁ প্রিয়, পরবিউ", ফ্রেনোফের বলতে লাগলেন, "আজও আমি খুঁজে পেলাম না সেই নিখুঁত সুন্দরীকে, যার শরীরের প্রতিটি রেখায় প্রকাশ পাবে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। হায়, কোথায় সেই সৌন্দর্য্যের রাণী!" অসীম বেদনায় অতি কষ্টে বলে চললেন বৃদ্ধ, "কোথায় সেই শিল্পজীবনের চিরআরাধ্যা বিশ্বমাধুর্য্যের উৎস ভীনাস দেবী! আমার শত আরাধনায়ও তো তাঁর কৃপা হল না। তাঁর অফুরন্ত রূপৈশ্বর্য্যের শুধু এক আধটি রেখাই ছড়ানো দেখেছি এখানে সেখানে। হায়, প্রকৃতির সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যকে শুধু একটিবার, শুধু এক মুহূর্ত্ত পরিপূর্ণভাবে দেখার বিনিময়ে আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। হে মোর মানস-সুন্দরি! তোমার সন্ধানে যদি মৃত্যুর পরপারেও যেতে হয়, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হব না। অরফিয়াসের মত আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো তোমায় প্রেতলোকের সেই ছায়ান্ধকার থেকে।"

"আমরা এখন যেতে পারি", ইসারায় পরবিউ পুসিনকে জানালেন, "ওঁর এখন কোন জ্ঞানই নেই।"

"চলুন, আমরা ওঁর ষ্টুডিওতে ঢুকে পড়ি"—আশ্চর্য্যের ভাব কেটে গেলে পুসিন বললো।

"না হে, তা' হবার যো নেই। কেউ যাতে সেখানে না ঢুকতে পারে সেদিকে বুড়ো শেয়ালের কড়া নজর। জোর করে ওঁর রহস্য ভেদ করবার কথা তোমার আগেই আমি ভেবেছি।"

"তা'হলে সত্য সত্যই একটা কিছু রহস্য আছে?"

"তা'তে আর সন্দেহ কি? বৃদ্ধ ফ্রেনোফেরই হচ্ছেন এক মাত্র লোক, যাকে ম্যাব্যু শিষ্য করেছিলেন। আর তিনিই ছিলেন সেই বৃদ্ধ শিল্পীর একাধারে শিষ্য, বন্ধু, উদ্ধারকর্ত্তা। ম্যাব্যুর উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের ব্যয়ভার বহন করতে গিয়ে ফ্রেনোফের তাঁর সম্পদের অধিকাংশ নষ্ট করেছেন। আর প্রতিদানে ম্যাবিউ তাঁকে দিয়েছেন চিত্রসন্নিবেশের রহস্য—যে শক্তি মূর্ত্তিগুলিতে এনে দেয় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ, শিল্পীজীবনের চির আরাধনার ধন সেই প্রাণপুষ্প। এই রহস্য সম্বন্ধে ম্যাব্যুর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। আর তাঁর সেই জ্ঞানের একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়েছেন ফ্রেনোফের। ফলে শিল্পী হিসাবে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি গেছে আর সকলকে ছাড়িয়ে। রং সম্বন্ধে তিনি করেছেন গভীর গবেষণা। তাঁর প্রগাঢ় শিল্পানুরাগের কাছে রেখার সবটুকু সত্যই পড়েছে ধরা। কিন্তু অত্যধিক গবেষণা তাঁর বিষয়বস্তু সম্বন্ধেই তাঁর মনে এনে দিয়েছে সন্দেহ। হতাশ মুহূর্ত্তে তিনি বলে বসেন, "চিত্রাঙ্কন বলে কোন জিনিষই নেই।" এটা অবশ্য বাড়াবাড়ি। কেন না, কেবল রেখা আর ছায়াই হচ্ছে আমাদের মূর্ত্তিসৃষ্টির প্রধান সম্বল। রং না হলেও চলতে পারে। এতে ঠিক এই প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতির মত আমাদের শিল্পও অসংখ্য উপাদানে গঠিত। রেখা হচ্ছে কঙ্কাল অর্থাৎ দেহের কাঠামো। আর রং তাকে করে তোলে প্রাণবন্ত। জীবনহীন কঙ্কালের চেয়ে কঙ্কালহীন জীবন আরও অসম্পূর্ণ আরও অসম্ভব।

কিন্তু তা হলেও কিছু সত্য আছে। শিল্পীজীবনে আভাস এবং মনোযোগই হচ্ছে সব কিছু। তুলির সঙ্গে কবিকল্পনার যে দ্বন্দ্ব, সন্দেহই হচ্ছে তার চরম পরিণতি—যেমন ঘটেছে আমাদের এই সহৃদয় বন্ধুর বেলায়। অর্দ্ধোন্মাদ আর অর্দ্ধ শিল্পী ছাড়া আর কই বা ওঁকে বলা চলে! একটা বিরাট প্রতিভা, কিন্তু ওঁর দুর্ভাগ্য-বশতঃ জন্মেছেন অতুল ঐশ্বর্য্যের ভিতর। কাজেই কল্পনা-বিলাসের প্রচুর অবকাশ ওঁর আছে। কিন্তু তুমি যেন ওঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কোর না। কাজ করে যাও। শিল্পীজীবনে তুলি ছাড়া চিন্তার অবকাশ নেই।"

"বুড়োর ষ্টুডিওতে ঢুকবার একটা উপায় আমাদের করতেই হবে", দৃঢ়ভাবে পুসিন্ বললো। কোন কথাই সে শোনে নি। মুচকি হেসে পরবিউ বিদায় নিলেন—"আচ্ছা, আবার দেখা হবে!"

দুই

হাপি রোডের পরে দোতলা একটা বাড়ী। সরু সিঁড়ি ঠিক রাস্তার পর থেকে উপরে উঠে গেছে। ছোট্ট ছোট্ট ঘরগুলোর পরে উঁচু ছাদ। যথেষ্ট আলো-বাতাস আসে। এরই একটি ঘরে ছোট্ট জানলার পাশে বসেছিল একটা মেয়ে। উৎকণ্ঠিত ভাবে সে চেয়ে ছিল বাইরের দিকে। দরজার কাছে শব্দ হতেই ও ব্যগ্র ভাবে উঠে দাঁড়ালো। ও চিনতে পেরেছে ওর প্রিয়তমের পায়ের শব্দ। দরজা খুলতেই ভিতরে ঢুকলো পুসিন্। তার মুখের দিকে তাকিয়েই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি, "কি হয়েছে তোমার!"

"কি হয়েছে!" টেনে টেনে পুসিন বললো, "দেখ জিলেট, এতদিনে আমি বুঝতে পেরেছি আমি সত্যই একজন শিল্পী। আজ পর্য্যন্তও আমার মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু এখন আমার নিজের 'পরে বিশ্বাস এসেছে? বড় হবার মত জিনিস আমার ভিতরে আছে। আর ভয় নেই জিলেট, এবার আমরা বড় লোক হবো, আমাদের সকল দুঃখ ঘুচবে। তুলির আঁচড়েও পয়সা আসে।" হঠাৎ সে থেমে গেল। তার প্রতিভাদীপ্ত মুখ থেকে সমস্ত আনন্দই গেল এক নিমেষে মিলিয়ে। বিশাল উচ্চাকাঙ্ক্ষার তুলনায় তার সম্বলের তুচ্ছতার কথা চিন্তা করে সে হয়ে উঠলো

শঙ্কিত। সাধারণ কাগজের পরে খড়ি দিয়ে আঁকা অসংখ্য নক্সা ঝুলছে দেয়ালগুলোর গায়। সমস্ত ঘরের মধ্যে মাত্র চারখানি ক্যানভাস্। থালাটা প্রায় খালি। রংয়ের দাম গেছে বেড়ে। কিন্তু এই দারিদ্র্যের মধ্যে সে বেশ ভাল করেই জান তার অফুরন্ত হৃদয়সম্পদের কথা, তার সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভার কথা—যা তার পথের সমস্ত বাধা, সমস্ত অসুবিধাই জয় করতে সক্ষম

সম্ভ্রান্ত এক বন্ধুর উৎসাহে সে প্যারীতে এসেছে। এখানে এসে সে পেয়েছে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চমনা এক বান্ধবী। সাধারণ মেয়েদের সাথে তার পার্থক্য অনেক। অতুলনীয় তার রূপসম্পদ। বিলাসের জীবন যাপনের পথে বাধা তার কিছুই ছিল না। কিন্তু অন্যান্য মেয়েদের মত ঐশ্বর্য্যের বোঝা আর অজ্ঞতার আড়ম্বর দেখিয়ে বেড়ানোকেই সে জীবনের সার বলে মেনে নিতে পারে নি। তার বদলে একজন সত্যিকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তার সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করাকেই সে অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলে গ্রহণ করেছে। সে ভালবেসেছে পুসিনকে। তার ভিতর সে দেখেছে প্রতিভার উন্মেষ। তাই নিঃশঙ্ক চিত্তে সে স্বীকার করে নিয়েছে তার দারিদ্র্যকে। আপন প্রেমের মাধুর্য্যে সে দূর করে দেয় পুসিনের সব ক্লান্তি। হতাশ মুহূর্ত্তে তাকে উৎসাহিত করে তার আদর্শের পথে এগিয়ে যেতে। পুসিনের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে ও যেন এককালি সোনালি রোদ। পুসিনও ওকে ভালবাসে তার শিল্পী মনের সমস্ত অনুরাগ দিয়ে।

"এই জিলেটি শোন", পুসিন ওকে কাছে ডাকলো। খুশী মনেই ও এসে বসলো তার কোল ঘেঁসে। বসন্তের মতই মনোরম ওর পরিপূর্ণ রূপ-লাবণ্য। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহ আর উজ্জ্বল মুখশ্রীকে ঘিরে রয়েছে একটা প্রশান্ত মহিমা।

"আমার সাহস হয় না ওকে বলতে" আপন মনেই পুসিন বলে।

"বারে! আমার কাছে লুকানো হচ্ছে। বলো শিগগির. কি হয়েছে?" শাসনের ভঙ্গীতে জিলেট বললো।

চিন্তাচ্ছন্ন পুসিনের কানে কিন্তু কথাটা ঢুকলো না।

"লক্ষ্মীটী, বলো আমায়।" আবার আব্দার জানালে জিলেট

"জিলেট···বেচারা···না ও শুধু জানে আমায় ভালবাসতে।"

"ওঃ! তুমি বুঝি আমাকেই কিছু বলতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু সেদিনের মত যদি আমায় সামনে বসিয়ে আঁকতে চাও, আমি কিন্তু কখখনো রাজি হবো না···হ্যাঁ·· সে আমি আগেই বলে দিচ্ছি। বাব্বাঃ কি ভয়ই আমি পেয়েছিলুম। হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, অথচ আমায় যেন দেখতেই পাচ্ছেন না।"

"তুমি কি চাও আমি অন্য কাউকে দেখে আঁকি?"

"হয়তো তাই···অবশ্য যদি সে খুব কুৎসিত হয়।"

"আচ্ছা ধরো যদি আমার যশের জন্য আমাকে একজন বড় শিল্পী করবার জন্য তোমাকে অন্য কারো সামনে বসতে হয়?

"ওঃ, আবার আমায় পরীক্ষা করা হচ্ছে। সে তুমি বেশই জানো তা আমি পারবো না।"

আস্তে আস্তে পুসিনের মাথা নুয়ে পড়লো জিলেটের বুকের পরে। কি যেন এক অসহনীয় দুঃখে অথবা আনন্দে সে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

"শোন নিক্," গভীর সহানুভূতির সঙ্গে পুসিনের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিলেট বললো—"ভালবাসার জন্য প্রাণ দেয়া সে এমন একটা কঠিন কিছু নয় কিন্তু আমার সেই ভালবাসাকেই ত্যাগ করতে তুমি আমায় বলো না, লক্ষ্মীটি।"

"সে কথা কেন বলছো?" চম্‌কিয়ে উঠলো পুসিন।

"যেদিন আমি আমার এই শরীরটাকে তুলে ধরবো অন্যের দৃষ্টির সামনে সেদিন থেকে আর তুমি আমায় ভালবাসবে না। আর তা ছাড়া আমি নিজেই নিজেকে মনে করবো তোমার অনুপযুক্ত। অশুচি মন নিয়ে কি দেবতার পূজো করা চলে? তোমার ইচ্ছা পূরণ করাতেই আমার আনন্দ, গর্ব্ব। তাই বলে অন্য কারো জন্য? না--না সে আমি পারবো না। সে শাস্তি তুমি আমায় দিও না।" ব্যথাতুর কণ্ঠে জিলেট বললো।

"আমায় ক্ষমা করো জিলেট"—জিলেটের বুকে মুখ লুকিয়ে পুসিন বললে, "দরকার নেই আমার যশে, তোমার ভালবাসাই আমার স্বর্গ। সমস্ত সফলতা সমস্ত সম্মানের চেয়েও তুমি সুন্দর। জাহান্নামে যাক্ আমার পেন্সিল আর নক্সা। আমার ভুল হয়েছে। এখন আমি বুঝেছি আমি প্রেমিক, শিল্পী নই। চুলোয় যাক শিল্প আর তার রহস্য।" আনন্দে আত্মহারা হয়ে জিলেট তাকিয়ে রইলো তার দিকে। বুঝলো প্রেমিকের কাছে শিল্পীর ঘটেছে পরাজয়।

"লোকটা কিন্তু একেবারে বুড়ো" একটু পরে পুসিন আবার বলতে সুরু করলো, "সে তোমায় একটা মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই মনে করবে না।"

"আমি জানি, এতে আমার সর্ব্বনাশ হবে," চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হয়ে জিলেট বললো, "কিন্তু আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসি। সেই হবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা। তুমি কিন্তু আমায় ভুলে যাবে। হায়, কোথা থেকে এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার এলো।"

"ভুলে যেও না জিলেট, আমিও তোমায় ভালবাসি। কিন্তু তবুও এ চিন্তা আমার মনে এসেছে। সত্যিই কি আমি এত নীচ? ...আর্ত্তকণ্ঠে পুসিন বললো।

"চলো আমরা হারবুসের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করি।"

"না-না, এ শুধু আমাদের দুজনের মধ্যেই গোপন থাক।" তড়োতাড়ি আপত্তি জানালো পুসিন।

"বেশ, তাই হোক. আমি রাজি। কিন্তু তুমি সেখানে থাকতে পাবে না। তুমি ছোরা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করবে। যদি আমি ডাকি তখনই ঘরে ঢুকে বুড়োকে হত্যা করবে।"

পুসিন সব ভুলে গেল। নিবিড় আলিঙ্গনে জিলেটকে সে বুকের ভিতর টেনে নিল।

"ও আর আমায় ভালবাসে না" নিজেকে একা পেয়ে জিলেট ভাবলো। ইতিমধ্যেই সে তার সঙ্কল্পের জন্য অনুতপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আশঙ্কার সাথে জুটলো আর এক তীক্ষ্ণতর বেদনা। তার মনে হলো তার ভালবাসা ইতিমধ্যেই অনেক কমে গেছে,

পুসিনও যেন বেশ খানিকটা ছোট হয়ে গেছে তার চোখে। একটা আবছা সন্দেহ তার মনকে পীড়া দিতে লাগলো।

পরবিউর সঙ্গে পুসিনের সাক্ষাতের পর তিন মাস কেটে গেছে। পরবিউ এলো মাষ্টার ফ্রেনোফের সাথে দেখা করতে। বাড়ীর বিপদে ডুবে রয়েছেন বৃদ্ধ। মাঝে মাঝে তাঁর এ রকম হয়ে থাকে। ডাক্তারদের মতে অজীর্ণ, পেট ফাঁপা, জ্বর অথবা প্লীহাবৃদ্ধিই এর কারণ। আধ্যাত্মবাদীরা অবশ্য অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে নৈতিক প্রকৃতির কোন অসম্পূর্ণতাই এর জন্য দায়ী। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—বৃদ্ধ তাঁর রহস্যময় ছবিটা সম্পূর্ণ করতে গিয়ে অত্যধিক পরিশ্রম করে বসেছেন। ওক্ কাঠের মস্ত বড় একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বৃদ্ধ বসেছিলেন। পরবিউর আগমনে কোন পরিবর্ত্তনই হলো না তাঁর সমাহিত ভঙ্গীর। শুধু একবার বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলে তাকালেন তাঁর দিকে।

"কি হয়েছে গুরুজি? রুশ থেকে আনা নীল রংটা কি পছন্দমত হয় নি? নূতন সাদা রংটা গুঁড়ো করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে বুঝি? তেলগুলো স্রেফ বাজে? না তুলিগুলো বিদ্রোহ করেছে।" এক নিঃশ্বাসে পরবিউ বলে গেলেন।

"হায়" মূর্ত্তিমান বিপদের মত বৃদ্ধ বলে উঠলেন; "ক্ষণিকের জন্য আমি ভেবেছিলাম—আমার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু এখন ঠিক বুঝেছি কতকগুলো খুঁটিনাটিতে আমি ভুল করে বসেছি। যতক্ষণ না আমার সন্দেহ দূর হয় ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। আমি ভ্রমণে বেরোবার কথা ভাবছি। একটা মডেলের খোঁজে আমাকে তুরস্ক, গ্রীস অথবা এসিয়ায় যেতে হবে। আমি চাই বিভিন্ন দেশের জীবন্ত মূর্ত্তিগুলোর সাথে আমার ছবির তুলনা করে দেখতে। হয়তো স্বয়ং প্রকৃতি দেবীকেই আমি আটক করেছি ঐ উপরের ঘরে।" বৃদ্ধের মুখে ফুটে উঠলো ক্ষীণ সন্তোষের হাসি।

"এক এক সময় আমার মনে হয়, হয়তো আমার নিঃশ্বাসের শব্দে সে জেগে উঠে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে।" বলতে বলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যেন এখনই তাঁকে রওনা হতে হবে।

"তা' হলে দেখছি আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। আপনার আর ভ্রমণের কষ্ট এবং ব্যয় স্বীকার করতে হলো না।" পরবিউ বলে উঠলেন।

"তা কি করে হবে?

"পুসিনকে একটা মেয়ে ভালবাসে। অতুলনীয় আর নিখুঁত তার সৌন্দর্য্য। কিন্তু প্রিয় মাষ্টার, যদি পুসিন তাকে আপনার কাছে পাঠাতে রাজি হয়, আপনাকেও অন্ততঃ আপনার ছবিখানি আমাদের দেখাতে হবে।"

বৃদ্ধ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি যেন একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন।

"কি বলছো তুমি!" করুণকণ্ঠে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, "আমার নিজস্ব সৃষ্টি, আমার মানস-সুন্দরীকে তোমাদের দেখাতে হবে! যে আবরণ এতদিন ধরে আমার আনন্দের পবিত্রতা রক্ষা করেছে তাকে খুলে ধরতে হবে? সে তো জঘন্য অশ্লীলতা। সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে আমি বসবাস করছি তার সাথে; সে শুধু সম্পূর্ণভাবে আমার। সে শুধু আমাকেই ভালবাসে। আমার তুলির প্রতিটি স্পর্শে তার সর্ব্ব শরীরে জেগেছে আনন্দের শিহরণ। তারও একটা আত্মা আছে। আর সে আত্মা আমিই তাকে দিয়েছি। আমি ছাড়া অন্য কারো সামনে সে তো লজ্জায় চাইতেই পারবে না মুখ তুলে। তাকেই নিয়ে দাঁড় করাতে বলছো দর্শকনের চোখের সামনে! কোন স্বামী অথবা কোন প্রেমিকই তার প্রণয়িনীর এরকম অসম্মান করতে পারে না। রাজ-সভার জন্য তোমরা যে ছবি আঁকো তার ভিতর তোমাদের সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ থাকে না। সভাসদের কাছে যে ছবি বিক্রী করো, সেগুলো তো বাজে কতকগুলো রঙীন মূর্ত্তি

"আমার ছবি তো শুধু ছবি নয়। সে হচ্ছে একটা অনুভূতি—আমার মানসপ্রিয়া। আমার ষ্টুডিওর ভিতরই তার জন্ম, আর সেখানেই তাকে কাটাতে হবে তার নিঃসঙ্গ কুমারী-জীবন। কবিতা আর প্রেয়সী, এরা শুধু তাদের প্রণয়ীদের সামনেই শেষ আবরণ খুলে দেয়। র‍্যাফেলের মডেল, এ্যারিয়ষ্টর এঞ্জেলিকা, দান্তের বেটরাইসকে কি আমরা দেখতে পেয়েছি? না, আমরা শুধু দেখেছি তাদের আকার আর অনুকৃতি। কিন্তু আমার তালা-বদ্ধ ষ্টুডিওতে যে ছবিখানি রয়েছে তাকে এর ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। সে শুধু একখানা পর্দা নয়। সে হচ্ছে একটা জীবন্ত স্ত্রীলোক। আমি তার সাথে কথা বলি, তার সমস্ত চিন্তা, হাসি অশ্রুর অংশ নি। একাধারে আমিই তার পিতা প্রণয়ী এবং স্রষ্টা। তোমরা কি চাও, আমি এক মুহূর্ত্তে সে সব ভুলে যাই! সে তো শুধুই একটা মেয়ে নয়। সে হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ সৃষ্টি।" একটু থেমে অনুনয়ের সুরে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, "তুমি তোমার সেই যুবক-শিল্পীকে বুঝিয়ে বলো। আমি তাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দোব, হ্যাঁ আমার করিজিও, মাইকেল এঞ্জেলো, টাইটান সবই। তার পায়ে ধরতেও আমি আপত্তি করবো না। কিন্তু তাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী করে নেওয়া! ধিক্ আমাকে। সে আমি পারবো না। আগে আমার প্রেম, তার পর আমার শিল্প। হ্যাঁ আমার শেষ নিঃশ্বাসের সময়ও আমার মানস-প্রতিমাকে পুড়িয়ে ফেলবার শক্তি আমার থাকবে। কিন্তু তাকে একজন অপরিচিতের দৃষ্টির সম্মুখীন হতে বাধ্য করা? তাতে সে আবার যুবক এবং চিত্রকর। না—কখনো না। যে তাকে মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতেও কলুষিত করবে। তাকে আমি নিশ্চয়ই পরদিন হত্যা করবো।" অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে পরবিউর দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "না, তুমিও না। হলেই বা তুমি আমার বন্ধু! যদি তুমি নতজানু হয়ে তাকে সম্মান না দেখাও সেই মুহূর্ত্তে নিজের হাতে আমি তোমায় হত্যা করবো। সত্যি বল তো তুমি কি চাও আমি আমার মানসীকে ঐ সব নির্লজ্জ মূর্খদের দৃষ্টির সামনে এনে তাদের অর্থহীন সমালোচনার বস্তু করে তুলি? বুঝলে বন্ধু, প্রেম হচ্ছে একটা রহস্য, যা শুধু হৃদয়ের গভীর গহনে লুকিয়ে থেকেই বাঁচতে পারে। এমন কি, যদি নিজের বন্ধুর কাছেও একবার মুখ ফুটে বলো, 'দেখ হে ঐ ওকে আমি ভালবাসি', তখনই হবে তোমার সেই প্রেমের পরিসমাপ্তি।"

বৃদ্ধ যেন আবার তাঁর যৌবন ফিরে পেয়েছেন। তাঁর চোখে দেখা দিয়েছে জীবনের জ্যোতি, বিবর্ণ মুখে কোথা থেকে এসেছে রক্তিম আভা। তাঁর হাত দুটী উত্তেজনায় কাঁপছে। তাঁর উদ্দাম উন্মাদনাময় কথাবার্তা শুনে পরবিউ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি খুঁজে পেলেন না এই প্রগাঢ় হৃদয়াবেগের উত্তরে কি বলবেন। ফ্রেনোফের কি পাগল হয়ে গেলেন? না—শিল্পী মনের কোন খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে এই সব কথা বলছেন? কিন্তু সে যাই হোক না কেন, এই অস্বাভাবিক ভাবপ্রবণ লোকটীর সাথে কোন মীমাংসা কি সম্ভব হবে?

নানা চিন্তায় বিব্রত হয়ে পরবিউ বলে উঠলেন, "এ কি ঠিক প্রেয়সীর বদলে প্রেয়সী হচ্ছে না? পুসিনও তো তার প্রণয়িনীকে আপনার দৃষ্টির সামনে আনছে।"

"সে তো তুচ্ছ এক প্রণয়িনী" বৃদ্ধ উত্তর করলেন, "যে আজ না হোক কাল তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কিন্তু আমার মানসপ্রিয়া চিরকালই আমার বিশ্বস্ত থাকবে।"

"বেশ বেশ, তাই হলো। এ নিয়ে আর আমরা কথা বলবো না। কিন্তু এরকম নিখুঁত সৌন্দর্য্য আপনি এসিয়াতেও পাবেন না। আর যদিও বা পাওয়া সম্ভব হয়, হয়তো তাকে খুঁজে বের করবার আগেই আপনি মারা যাবেন। তখন কিন্তু আপনার ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

"না হে, ছবি আমার শেষ হয়ে গেছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার মনে হবে যেন কোন জীবন্ত প্রতিমা পর্দার আড়ালে ভেলভেটের কৌচের পরে শুয়ে রয়েছে। পাশের সোনালি রংয়ের টিপয়ে সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে। তোমার লোভ হবে আবরণটা সরিয়ে দিতে। মনে হবে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাথে তার বুক ওঠা নামা করছে। তোমার মনে ভেসে উঠবে লাস্যময়ী ক্যাথারিণ লেসকন্টের জীবন্ত মূর্ত্তি। সেই ক্যাথারিণ লেসকন্ট—যাকে লোকে বলতো 'সৌন্দর্য্যের রাণী'। কিন্তু তবুও—হায় যদি আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম।"

"তা হলে দেখছি আপনাকে এসিয়াতেই যেতে হবে।" বৃদ্ধের মুখে অনিশ্চয়তার চিহ্ন দেখে তীক্ষ্ণবুদ্ধি পরবিউ তাঁর শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে জিলেটকে সঙ্গে নিয়ে পুসিনও এসে পৌঁছেছে ফ্রেনোফারের বাড়ীতে। উঠোনের মধ্যে ঢুকে জিলেট পুসিনের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। কি যেন এক বিপদের আশঙ্কায় তার মন বিচলিত হয়ে উঠেছে।

"উঃ! কেন আমায় এখানে নিয়ে এলে?" পুসিনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে সে বললো।

"জিলেট, স্থির করবার ভার তোমার পরই দিয়েছি।" আমি তোমার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত। আমার বিবেক বলো, যশ বলো সবই তুমি। বাড়ী ফিরে যাও। হয়তো তাতেই আমি বেশী খুসী হব।"

"যখন তুমি ঐ ভাবে আমায় বলো তখন কি আমার কোন বিচারশক্তি থাকে? না না, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ছেলে-মানুষ হয়ে যাচ্ছি। তুমি এসো।"

একটু থেমে প্রাণের সবটুকু দরদ ঢেলে দিয়ে জিলেট বললো, "দেখ, যদি আমাদের ভালবাসার মৃত্যুই ঘটে, দুঃসহ বেদনা নিয়েই যদি সমস্ত জীবন কাটাতে হয়, তবু তোমার যশই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আমি বেঁচে রইবো তোমার রংয়ের ধারার মধ্য দিয়ে তোমার স্মৃতিতে। চলো, আমরা ভিতরে যাই।"

দরজার কাছে যেতেই তাদের সঙ্গে দেখা হ'ল পরবিউর। জিলেটের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা; মুগ্ধ পরবিউ আর অপেক্ষা করলেন না। তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে গেলেন বৃদ্ধ শিল্পীর সম্মুখে। জিলেটের আপাদ মস্তক তখন কাঁপছে।

"দেখুন," পরবিউ চীৎকার করে বললেন, "পৃথিবীর সবগুলো বাছাই করা ছবি দিয়েও কি এর মূল্য হয়।

ফ্রেনোফের কেঁপে উঠলেন। তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিলেট। মুখে তার সারল্যের দীপ্তি। চোখে ফুটে উঠেছে ভীরু হরিণ-শিশুর কাতরতা। যেন একটী নিষ্পাপ কুমারীকে ধরে এনেছে দস্যুরা দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রী করতে। ক্রমে মুখের পরে ফুটে উঠলো লাজারুণ আভা, চোখ দুটী হ'ল আনত, হাত দুটী পড়লো দুপাশে ঝুলে; যেন তার সমস্ত শক্তি গেছে নিঃশেষিত হয়ে। শুধু চোখের জল দিয়ে সে প্রতিবাদ জানাচ্ছে এই নির্ম্মম অত্যাচারের। বারবার ধিক্কার দিল পুসিন নিজেকে। প্রেমিকের কাছে শিল্পীর আবার ঘটলো পরাজয়। অসংখ্য আশঙ্কায় পুসিনের হৃদয় হয়ে উঠলো উদ্বেল। তার পর ঐ বৃদ্ধ। ওর চোখে যেন নেমে আসছে যৌবনের দীপ্তি। ও দেখছে জিলেটকে। শিল্পীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে ও যেন পরীক্ষা করে দেখছে তরুণীর পোষাকের নীচের প্রত্যেকটী রেখা। জেগে উঠলো প্রেমিকের বক্ষ ঈর্ষ্যা। চীৎকার করে উঠলো পুসিন, "জিলেট, চলে এসো।"

জিলেট ফিরে দাঁড়ালো। বারেকের জন্য চোখ তুলে তাকালো তার চোখের পানে। পরমুহূর্ত্তে সে আশ্রয় নিল পুসিনের সবল বাহুর মধ্যে।

"ওঃ তা হ'লে এখনো তুমি আমায় ভালবাসো। সত্যই ভালবাসো।" পুসিনের কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগলো।

শত দুঃখেও সে ধৈর্য্য হারায় নি। কিন্তু আনন্দ লুকোবার শক্তি সে হারিয়ে ফেললো।

"ওকে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার কাছে রেখে যাও, বৃদ্ধ শিল্পী বলে উঠলো, "আমি কথা দিচ্ছি তোমরা আমার ক্যাথারিণকে দেখবার অধিকার পাবে। হ্যাঁ, আমি রাজি হচ্ছি।" ফ্রেনোফারের কথাগুলো শোনালো প্রেমিকের আক্ষেপোক্তির মত। যেন তাঁর নিজের আঁকা নারীত্বের অনুকৃতির কথা ভেবেই তাঁর আত্মাভিমান। তাঁর ধারণা হয়েছে, তাঁর আপন সৃষ্টির সৌন্দর্য্যই জয় লাভ করবে এই জীবন্ত বালিকার সৌন্দর্য্যের উপর।

"ওঁকে আর মত বদলাবার অবসর দিও না" পুসিনের কাঁধে

ঠেলা দিয়ে পরবিউ বললেন, "ভালবাসার ফুল দু'দিনে যায় শুকিয়ে ; শিল্প থাকে অক্ষয় অমর হয়ে।"

"এখন তা'হ'লে আমি শুধুই একজন স্ত্রীলোক ?" জিজ্ঞাসা করলো জিলেট। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করছিলো পুসিন এবং পরবিউকে।

গর্বিতভাবে সে মাথা তুলে দাঁড়ালো। ভাল করে একবার দেখে নিল ফ্রেনোফারকে। পুসিন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে একটি মেয়ের ছবির দিকে। জ্বলে উঠলো জিলেটের চোখ। ও তো আমার দিকে কখনও অমন মুগ্ধ হয়ে তাকায় না। পরক্ষণেই সে ফ্রেনোফারকে লক্ষ্য করে পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, "চলুন আপনার ষ্টুডিওতে।"

তার কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে আনলো পুসিনকে তার কল্পনা-রাজ্য থেকে। ফ্রেনোফারকে সম্বোধন করে সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো, "শোন বৃদ্ধ, দেখছো এই ছোরাখানা ? এই তরুণীর প্রথম চীৎকারের সাথে সাথে এ আমি বসিয়ে দোব তোমার বুকে, তোমার ঘরে দোব আগুন ধরিয়ে। একটী প্রাণীও এখান থেকে জীবন্তে বেরুতে পারবে না। বুঝলে ?"

পুসিনের মুখে ভ্রূকুটি তার প্রত্যেকটি কথা হয়ে উঠেছে ভীষণ। জিলেট কথঞ্চিৎ শান্তি পেলো তার সেই মূর্তি দেখে। যদিও শিল্পীর খেয়ালে আর ভবিষ্যৎ যশের বেদীমূলে সে তাকে বলি দিতে যাচ্ছে, তবু জিলেট তাকে প্রায় ক্ষমা করলো।

দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন পরবিউ আর পুসিন। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁরা অপেক্ষা করে রইলেন অনিশ্চিত কোন্ কিছুর আশঙ্কায়। চাপা উত্তেজনার সাথে পরবিউ বলে চললেন, "হ্যাঁ, তিনি ওর পোষাক খুলে ফেলেছেন...আলোর কাছে এগিয়ে আসতে বলছেন ওকে...তুলনা করছেন দু'জনকে।" হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন। পুসিনের মুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ উৎকণ্ঠা। কপালে দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দৃঢ় মুষ্টিতে ছোরাখানা ধ'রে সে কান পেতে রয়েছে দরজায়। ছায়ান্ধকারে তাদের দু'জনকে মনে হচ্ছিল যেন দু'জন বড়যন্ত্রকারী কোন অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার সময়ের অপেক্ষা করছে।

"ভিতরে এসো, ভিতরে এসো," ষ্টুডিওর মধ্য থেকে ফ্রেনোফার বলে উঠলেন, "আমার ছবি সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আমি গর্বের সাথেই তা দেখাতে পারি। কোন শিল্পীই সক্ষম হবে না আমার রঙ্গবিলাসিনী ক্যাথারিনের প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করতে।"

দুরন্ত আগ্রহে পরবিউ আর পুসিন ঢুকে পড়লো ষ্টুডিওর মধ্যে। সমস্ত কিছুই অগোছাল আর ধূলিমলিন। এখানে সেখানে কয়েকখানা ছবি ঝুলছে। প্রথমেই তা'দের দৃষ্টি পড়লো একটী পূর্ণাবয়ব অর্দ্ধাবরিত স্ত্রীমূর্তির পরে। তা'দের চোখে ফুটে উঠলো সপ্রশংস দৃষ্টি।

"ও কিছু নয়...একটা বিশেষ ভঙ্গী পরীক্ষা করিবার জন্য ওটা করেছিলাম...স্রেফ বাজে।" ফ্রেনোফার বলে উঠলেন, "ঐগুলি আমার ব্যর্থতার সাক্ষী।—দেওয়ালে টাঙ্গানো কয়েকখানা অপরূপ ছবিকে নির্দ্দেশ ক'রে তিনি বললেন। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন পরবিউ আর পুসিন। বৃদ্ধ কি পাগল ? ওর প্রত্যেকখানা ছবির মধ্যেই যে প্রকাশ পেয়েছে চিত্রশিল্পের চরম উৎকর্ষ। বিভ্রান্তভাবে তাঁরা তাকাতে লাগলেন বৃদ্ধের সেই রহস্যময় ছবির খোঁজে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না।

"এ-দিকে তাকাও," বৃদ্ধ বলে উঠলো। তাঁর চুলগুলো বিশৃঙ্খল, মুখে অভিমানবীয় উল্লাসের দীপ্তি. প্রেমোন্মত্ত যুবকের মত চোখ দুটী করছে চক্ চক্, শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে অত্যন্ত দ্রুত।

"কেমন চমৎকার নয় কি ? নিশ্চয়ই তোমরা আশা কর নি এমনটি দেখবার। তোমরা দেখতে এসেছো একখানা ছবি অথচ দেখছো একখানি প্রাণময়ী প্রতিমা। এমনি গভীরতা ঐ পর্দার। ওর চার পাশে বায়ুমণ্ডল হয়ে উঠেছে এমন বাস্তব যে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের সাথে তার পার্থক্য গেছে মিলিয়ে। ভাবছো কোথায় ছবি ? ছবি গেছে অদৃশ্য হয়ে। তোমাদের সামনে রয়েছে শুধু একটী জীবন্ত রূপসী। জীবনের বর্ণসম্ভার, প্রতিটী জীবন্ত রেখার ভাব এ সবই ধরা পড়েছে আমার ছবিতে। দেখছো পটভূমির পরে কেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মূর্তিটী। নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে—তুমি অনায়াসে ওর কাঁধের পরে হাত রাখতে পার ? হবে না কেন ? সাত সাতটী বছর ধরে আমাকে লক্ষ্য করতে হয়েছে, গবেষণা করতে হয়েছে কেমন করে আলো বস্তুর সাথে আপনাকে মিলিয়ে দেয়। তারপর দেখ ওর চুলগুলি। অজস্র আলো এসে পড়েছে ওদের পরে। কেমন তাই নয় কি ? ঐ দেখ ও নিশ্বাস ফেললো। নিশ্চয় আমি দেখেছি ওকে নিঃশ্বাস ফেলতে। ঐ ওর বুক। বাঃ বাঃ চমৎকার। দেখ! দেখ! কে না ওর সামনে নতজানু হবে ? ওর সমস্ত শিরা ও উপশিরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অপেক্ষা করো, দেখবে এখনই ও উঠে দাঁড়াবে।"

"আপনি কিছু দেখছেন কি ?" পুসিন জিজ্ঞাসা করলো পরবিউকে।

"কই না তো...তুমি ?"

"আমি তো কিছুই দেখছি না।"

বৃদ্ধকে তাঁর নিজের উল্লাসের ভিতর রেখে ওঁরা দু'জনে একটু সরে দাঁড়ালেন। পরিপূর্ণ আলো এসে পড়েছে ক্যানভাসের পরে। হয় তো সে জন্যই সব কিছু লাগছে আবছা। একবার ছবিটির বাঁ দিকে আবার ডান দিকে ওঁরা সরে এলেন। তারপর আবার এসে দাঁড়ালেন সামনে। কখনও নীচু হয়ে কখনও বা উঁচু হয়ে ওঁরা পরীক্ষা করতে লাগলেন ছবিটিকে।

"হাঁ হে, দেখছো কি ? সত্যিকারের ক্যানভাস। ফ্রেনোফার তাঁদের সূক্ষ্ম পরীক্ষার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বললেন। "ঐ দেখ ষ্ট্রেচার যার পর ক্যানভাস খাটানো হয়েছে। ঐ হচ্ছে থালা, এই রং, আর এই তুলি"—একটা তুলি তুলে নিয়ে তিনি তাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। তাদের চিন্তা সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ নেই।

"ঐ বুড়ো শালিক আমাদের উপহাস করছে" আবার সেই কল্পিত ছবির দিকে এগিয়ে গিয়ে পুসিন বললো, "আমি তো বিশৃঙ্খল রঙের স্তূপ আর অসংখ্য অদ্ভুত সব রেখার প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।"

"আমাদের ভুল হয়েছে, দেখ," পরবিউ বললেন।

দু'জনেই আরো এগিয়ে গেলেন। ক্যানভাসের এক কোণে তাঁরা আবিষ্কার করলেন একখানি অনাবৃত পা। রংয়ের বিন্দুগুলো কোথাও স্পষ্ট...কোথাও বা অর্দ্ধ স্পষ্ট সব ছায়া মিলে সৃষ্টি হয়েছে একখানা আকারবিহীন কুয়াসার জাল। তারই ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে পা-খানি। কি অদ্ভুত প্রাণময় আর সুষমাময় সৌন্দর্য্য। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁদের মনে হ'ল যেন কোন বিধ্বস্ত নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে সৌন্দর্য্যের দেবী ভেনাস বেরিয়ে আসছেন আস্তে আস্তে।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের খোঁজে বৃদ্ধ শিল্পী ঢেকে ফেলেছেন তাঁর সৃষ্টিকে অসংখ্য রংয়ের পর্দ্দা দিয়ে। সেই দিকে পুসিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরবিউ আবেগের সাথে বললেন, "ওর নীচে রয়েছে সেই রহস্যময়ী সৌন্দর্য্যের রাণী।"

দু'জন শিল্পীই এক সঙ্গে ফিরে দাঁড়ালো ফ্রেনোফারের দিকে। এতক্ষণে যেন তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন বৃদ্ধের উল্লাসের কারণ।

"সবল মনেই বৃদ্ধ এ কথা বিশ্বাস করেন," পরবিউ বললেন।

"হ্যাঁ বন্ধু" বৃদ্ধ বলে উঠলেন, "এর জন্য চাই বিশ্বাস...নিজের পরে প্রগাঢ় বিশ্বাস। বহু বছরের সাধনাতেই শুধু এ-রকম সৃষ্টি সম্ভব। ওর এক একটা ছায়া সৃষ্টি করতে কি কষ্টটাই না আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখ। ওর চোখের নীচে গালের পরে একটা আবছা ছায়া দেখা যাচ্ছে। মানুষের মুখের ঐ ছায়াকে রংয়ের সাহায্যে রূপায়িত করবার কথা তোমরা কল্পনাই করতে পার না। শুধু তাই নয় পরবিউ, আরও ভাল ক'রে ছবিটি লক্ষ্য করলেই আদর্শ ও রেখা সম্বন্ধে আমার কথাগুলো পরিষ্কার বুঝতে পারবে। ওর বুকের পরে ঐ উজ্জ্বল আলোর দিকে তাকাও। দেখবে রংয়ের প্রলেপ দিয়ে ওর উপরিভাগকে কেমন উঁচু করে তুলেছি। ফলে আলো এসে ঠিকরে পড়েছে ওর পরে—আর ওকে করে তুলেছে ঠিক আলোর মতই উজ্জ্বল আর শুভ্র। ঠিক ওরই উল্টো উপায়ে রংয়ের উপরিভাগকে সমতল করে দিয়ে তুলির সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে লুপ্ত করে আমার মূর্ত্তিটির সীমারেখাগুলোকে করে তুলেছি আবছা। তারপর তাকে অস্পষ্ট আবরণে ঢেকে দিয়েছি এমন করে যে রেখাগুলোর সমস্ত ভাব, চিত্রসৃষ্টির সমস্ত উপায় গেছে মিলিয়ে। ফলে ছবিটি হয়ে উঠেছে সুডৌল আর স্বাভাবিক। আরও কাছে এগিয়ে এসো। আঁকবার রীতি আরও ভাল করে বুঝতে পারবে। একটু দূর হলেই কিন্তু আর দেখতে পাবে না। ঐখানে ...হ্যাঁ ঠিক ঐখান থেকেই পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে," তুলির ডগা দিয়ে একটা সাদা রংয়ের স্তূপ দেখিয়ে তিনি বললেন।

বৃদ্ধ শিল্পীর কাঁধে একখানা হাত রেখে পুসিনের দিকে তাকিয়ে পরবিউ বললেন, "বুঝতে পাচ্ছ কি যুবক, ইনি হচ্ছেন একজন শিল্পী সম্রাট্।"

"যতটা না চিত্রকর তার চেয়েও বেশী কবি," গম্ভীরভাবে পুসিন উত্তর করলো।

"ওর ভিতর রয়েছে আমাদের পার্থিব শিল্পের চরম পরিণতি," ক্যানভাসখানি স্পর্শ করে পরবিউ বললেন।

"ওর উঁচুতে উঠতে গেলে সবই যাবে শূন্যে বিলীন হয়ে," পুসিন অভিমত জানালো।

বৃদ্ধ আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁর মানস-প্রতিমার দিকে। কোন কথাই তিনি শুনছেন না।

"কিন্তু আজই হোক আর কালই হোক, উনি বুঝতে পারবেন —ওঁর ক্যানভাসের পরে কিছুই নেই," পুসিন আবার বললো।

"কিছুই নেই! একবার পুসিনের দিকে আবার তাঁর ছবির দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ চীৎকার করে উঠলেন।

"এ কি করলে! পুসিনের দিকে ফিরে পরবিউ চাপা আর্ত্তনাদ করে উঠলেন।

বৃদ্ধ সবলে পুসিনের বাহু চেপে ধরে বলে উঠলেন, "কি বললি? কিছুই দেখছিস না তুই? মূর্খ, বিধর্ম্মী, পাজি, ছুঁচো! কেন এসেছিস তুই আমার ষ্টুডিওতে? পরবিউ, বন্ধু, তুমিও কি আমায় বোকা বানাচ্ছো? উত্তর দাও। আমি তোমার বন্ধু। সত্যি করে বলো, শেষ পর্য্যন্ত কি আমি আমার ছবিখানাকে নষ্ট করেছি?"

কুণ্ঠিত পরবিউর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুল না। অসহ্য উদ্বেগে বৃদ্ধের মুখ সাদা হয়ে গেছে। অগত্যা পরবিউ ক্যানভাসের দিকে আঙুল দিয়ে বললেন, "দেখুন।" ফ্রেনোফার ছবির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। এক মুহূর্ত্ত। পরক্ষণেই তিনি মাতালের মত টলতে টলতে পিছনে সরে এলেন। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল করুণ আর্ত্তনাদ "কিছুই নেই!...দশ বছর পরিশ্রমের পর... কিছুই নেই।" মাটীতে বসে অদম্য ক্রন্দনে ভেঙ্গে পড়লেন তিনি। বার বার ধিক্কার দিলেন নিজেকে, "আমার ভীমরতি হয়েছে ...আস্ত একটা পাগল আমি...কোন প্রতিভাই আমার নেই... শুধুই বড় লোক···কোন উদ্ভিই আমার হয় নি···শুধু অলস কল্পনায় দিন কাটিয়েছি।" কাঁদতে কাঁদতে আবার তিনি ফিরে তাকালেন তাঁর ছবির দিকে। হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়ালেন। গর্ব্বিতভাবে এগিয়ে গেলেন শিল্পী দু'জনের সামনে।

"তাইতো, এতক্ষণ আমি বুঝতে পারি নি। ভগবানের দিব্যি করে বলতে পারি তোমাদের হিংসে হয়েছে," রাগে ফেটে পড়লেন তিনি। তাঁর চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। "আমার ছবিখানা ব্যর্থ হয়েছে এই বুঝিয়ে তোমরা ওকে চুরি করতে চাও। ঐ তো আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। ঐ তো সে দাঁড়িয়ে আছে। বাঃ কি চমৎকার।" কল্পিত ছবির সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়ে বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন।

কে যেন কাঁদছে। পুসিন চমকে উঠলো। মাথা নীচু করে এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিলেট। এতক্ষণ কেউই তাকে দেখে নি। তাড়াতাড়ি পুসিন এগিয়ে গেল তার দিকে। "লক্ষীটি কেঁদো না। কি হয়েছে?" অপরাধীর মত পুসিন জিজ্ঞেস করলো।

"আমায় তুমি মেরে ফেল," ফেটে পড়লো জিলেট। "এর পরও যদি আমি তোমায় ভালবাসি সে হবে আমার নীচতা। আমি তোমায় ঘৃণা করি...হ্যাঁ ঘৃণা করি··· তবু যেন কেন ভাল না বেসে পারি না।" পুসিনের কাঁধে মাথা রেখে অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগে সে কাঁপতে লাগল।

আস্তে আস্তে ফ্রেনোফার তাঁর ক্যাথারিণকে ঢেকে দিলেন একটা সবুজ সার্জ্জের কাপড় দিয়ে। তাঁর গম্ভীর মুখে ফুটে উঠেছে অদ্ভুত দৃঢ়তা। একবার তাকালেন পরবিউ আর পুসিনের দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে গভীর সন্দেহ আর অবজ্ঞা। কোন কথা

না বলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তিনি তাদের পৌঁছে দিলেন ষ্টুডিওর বাইরে। উঠোনের কাছ থেকে তিনি তাদের বিদায় জানালেন, "বিদায় যুবক বন্ধুগণ!" তাঁর কণ্ঠস্বরে দু'জনেই চমকে উঠলেন। অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাঁদের বুক উঠলো কেঁপে।

গভীর উদ্বেগে পরবর্তী রাত্রি কাটলো। ভোর হতেই তিনি ছুটলেন ক্রনোকারকে দেখতে। কিন্তু গিয়ে শুনলেন গত রাত্রেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। মরবার পূর্ব্বে তাঁর সবগুলো ছবিই পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।

রাধামাধবের কাব্যগ্রন্থমালা

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র

তিন

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর বঙ্গভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র; প্রথমে ইহা (১৬ই মাঘ ১২৩৭) স্বর্গীয় যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সাহায্যে সাপ্তাহিক পত্র-রূপে প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রভাকর সেকালের একখানি উচ্চশ্রেণীর সংবাদপত্র হইলেও, ইহাতে ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা থাকিত এবং সেকালের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, রামকমল সেন, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীলরতন হালদার, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির রচনা সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত হইত। এই সময় রাধামাধব মিত্রের শত শত কবিতা সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত হইত এবং তাহার প্রত্যেক রচনার নিম্নে "সাং জেজুর" এই কথাটি লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

সংবাদ-প্রভাকরের * সম্পূর্ণ ফাইল দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। যে সংখ্যাগুলি দেখিয়াছি, তাহা হইতে রাধামাধব রচিত 'কলির প্রাদুর্ভাব' 'ধার্ম্মিকা গুণবতী কুল-কামিনী' 'হায়রে আঁব' 'কন তবু' 'নবীন উদাসীনের বিলাপ', 'পতিব্রতা নারী' 'রথযাত্রা' 'পেটের দায়,' 'কৃতান্ত ও কামিনী,' 'রজনীযাপন ও কলিকাতার অবস্থা বর্ণন' এবং কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুতে 'বিলাপ' (Elegy) প্রভৃতি হৃদয়গ্রাহী কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে 'সংবাদ-প্রভাকর' হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল:

পেটের দায়

ধরাতলে যত কর্ম্ম করে যতজন।
কেবল পেটের দায় তাহার কারণ।
কোন কার্য্য থাকে যদি অন্য অভিপ্রায়।
গোড়ায় পেটের দায় প্রায় আছে তায়।
পেটের দায়ের তরে সমাজ বজায়।
পরস্পর পরস্পরে সহকার পায়।
আ-মরি পেটের দায় না থাকিলে পরে।
কোন কর্ম্ম করিত কি নারী আর নরে।
মহীতে হইত তবে সবাই সমান।
আপনা আপনি সব হইত প্রধান।
এই তো পেটের দায়ে সাধে কারো হিত।
আবার সাধন করে কাহারে অহিত।
ন্যূনাধিক হিতাহিত নিয়ত ঘটায়।
পেটের দায়ের মত আর নাহি দায়।
কি দায় পেটের দায় হায় করে কায়।
সকল দায়ের চেয়ে বড় এই দায়।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে রাধামাধব "রসার্ণব" নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অদ্যাপি উক্ত পত্রখানি আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে "১২৬০সালের মাঘ মাসের ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ" যাহা সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"মাঘ—১২৬০। বাবু রাধামাধব মিত্র কর্ত্তৃক রসার্ণব নামে /০ মূল্যে এক মাসিক পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়।" (১লা ফাল্গুন ১২৬০)

১২৬০ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'সংবাদ-প্রভাকরের' একটি মাসিক সংস্করণ বাহির হয়। এই মাসিক প্রভাকর-পত্রে "সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের—মহিমা বর্ণনা, নীতি কাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য-পদ্য-পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষে—মাসের সমুদায় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সার মর্ম্ম প্রকটিত" হইত। উক্ত পত্রে বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের বহু অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি ঈশ্বরগুপ্ত এইগুলি প্রকাশ করিয়া বহু প্রাচীন কবির রচনা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ১০ই মাঘ ১২৬৫ সালে কবি ঈশ্বর গুপ্ত পরলোক গমন করিলে, তাঁহার প্রিয় শিষ্য কবি রাধামাধব মাসিক প্রভাকরের সম্পাদক নিযুক্ত হন। রাধামাধব গুরুর ধারা বজায় রাখিয়া এরূপ দক্ষতার সহিত আট বৎসর যাবৎ উক্ত পত্র সম্পাদন করেন যে, গুপ্ত কবির পরলোকগমনেও প্রভাকর পূর্ব্ব গৌরব পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এই সম্বন্ধে কবি রাধামাধব

* সংবাদ-প্রভাকরের সম্পূর্ণ ফাইল বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য; এই পত্রের যে সংখ্যাগুলি আমি দেখিয়াছি, সেই সংখ্যা হইতে সাহিত্যবিষয়ক কোন না কোন রচনা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে, ফলে তাহার অপর দিকের রচনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের প্রভাকরেরও এই দুরবস্থা।—লেখক

তৎসম্পাদিত "সুজন-রঞ্জন" * নামক মাসিক পত্রে (১লা বৈশাখ ১৩০১) যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :—

"শোকের সাগরে আহা, করিয়া মগন।
গুরু কবি পরলোকে গেলেন যখন॥
তাঁহার মাসিক পত্র সম্পাদন তরে।
ভ্রাতা তাঁর দেন ভার, আমার উপরে॥
অগত্যা লইতে ভার, হইল তখন।
কয় বর্ষ করিলাম পত্র সম্পাদন॥
হয়নি তাঁহার মত, আসরের জাঁক।
ঢাকের বদলে মাত্র, বাজায়েছি শাঁক॥
প্রভাকর পাঠকেরা, সুধীর সুজন।
তথাপিও করিলেন কৃপা প্রদর্শন॥—
তাঁদের উৎসাহ আর গুরুর প্রসাদে।
মাসিক যে প্রভাকর, লিখি নির্ব্বিবাদে॥"

বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা তৎকালে সংবাদ-প্রভাকরে প্রকাশিত হইত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১২৬৬ সালের ১লা মাঘ তারিখে সংবাদ-প্রভাকরে বহরমপুরের প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রামদাস সেন মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; নিম্নে উক্ত পত্রখানি প্রকাশিত হইল। আলোচ্য পত্রখানি হইতে লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্তকে প্রধান কবি বলায় যে বাদানুবাদ হইয়াছিল, তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

"ইতিপূর্ব্বে প্রভাকরে আমি কতিপয় গ্রন্থের সমালোচনায়, রচনা বিষয়ে বঙ্গ-কবিগণের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সর্ব্ব-প্রধান বলায় প্রভাকরের কোন পত্রপ্রেরক মহাশয় আমার সমালোচনা পক্ষপাতদোষে দূষিত হইয়াছে বলিয়াছেন কিন্তু তিনি মেঘনাদবধ-কাব্য মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে বোধ হয় কখন আমার প্রস্তাবে দোষারোপ করিবেন না। আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা বিচক্ষণবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেক মহাশয়গণ ইতিপূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিলেন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ললিত, মনোহর ও বালক-বালিকা, যুবা, বৃদ্ধ, সকলেরই মনোরঞ্জক এবং তাঁহার নিকট পদ্য লিখনের ধারা শিক্ষা করিয়াই শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়মাধব বসু প্রভৃতি অনেক মহোদয়গণ অধুনা কবিশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন—তাহা আমি মুক্ত কণ্ঠে সহস্রবার স্বীকার করি; বিশেষতঃ তাঁহার হাস্য ও শৃঙ্গার-রস বর্ণন বিষয়ে একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তিনি বীর ও করুণ রস ও স্বভাবের শোভা বর্ণন বিষয়ে তাদৃশ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন নাই এই সকল বিষয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাতিশয় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আহা, তাহার রচনা যে স্থলে পাঠ করা যায় সেই স্থলেই এককালে মোহিত হইতে হয়।

হোমর, ভার্জ্জিল, মিলটন, সেক্স্পিয়ার, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবিগণ অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রস্তাব সকল রচনা করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে মাইকেলও বঙ্গভাষায় সেই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং" লিখিত হইয়াছে। তখন দত্ত কবি কবিতাসকল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে দোষী করা উচিত নহে, বিশেষতঃ মিত্রাক্ষর অপেক্ষা অমিত্রাক্ষরে কবি স্বীয় মনের ভাব অতি উত্তমরূপে প্রকাশ করিতে পারেন।..."

রাধামাধবের পদ্য রচনার নিদর্শন, তাঁহার সম্পাদকতা-কালীন সংবাদ-প্রভাকর হইতে উল্লিখিত হইল।

বঙ্গদেশের মধ্যে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একজন প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বাবু রাধাগোবিন্দ সিংহ তাঁহার সহোদর, তিনি বাবু প্রাণকৃষ্ণ সিংহকে দত্তক-পুত্র গ্রহণ করেন। বাবু কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু) উক্ত প্রাণকৃষ্ণ বাবুর উত্তরাধিকারী। রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর লালা বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাণী কাত্যায়নীর ভ্রাতুষ্পুত্র অথবা তাঁহার পুত্র বাবু শ্রীনারায়ণ সিংহের (রাজাবাবুর) দত্তক পুত্র। এই সম্ভ্রান্ত বংশের বদান্যতার বিষয় দেশব্যাপ্ত আছে। (৯ই শ্রাবণ ১২৭৩)

আমাদিগের দ্বিতীয় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষ ইংলণ্ড হইতে বোম্বাইয়ে আগমন করিয়া আহম্মদাবাদে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের নিকট অবস্থিত করিতেছেন। এই মাসের শেষে অথবা নবেম্বরের প্রথমে কলিকাতায় আসিবেন। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। (২৬শে আশ্বিন ১২৭৩)

১২৭৭ সালে রেভারেণ্ড জে, ভন নামক এক খৃষ্টান পাদ্রীর চক্রান্তে পড়িয়া গণেশ-সুন্দরী নামক এক হিন্দু মহিলা বিধবা হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে কবি রাধামাধব সংবাদ প্রভাকরে লেখেন—

"গণেশসুন্দরী ধনি বল শুনি সুলোচনি।
কেমন করিয়া জননী ত্যাজিয়া হোলে বিপথগামিনী॥
ভাল বিদ্যা শিখেছিলে, কুলেতে কলঙ্ক দিলে।
হায় হায় হায়, ভুলে ছলনায় ভাল লীলে প্রকাশিলে॥
হবে সুখ ভোগ নানা, টেবিলে খাইবে খানা।
গির্জ্জায় যাবে, যা খাওনি খাবে, কিছুতে রবে না মানা॥"

গণেশসুন্দরীর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ উপলক্ষে তৎকালীন হিন্দু-সমাজে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল; তিনি পুনরায় খৃষ্টধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন, এই সময় রাধামাধব পুনরায় লেখেন—

"খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিহরি, গণেশ-সুন্দরী।
ফিরিয়া এসেছে পুন, অনুতাপ করি॥
কুহকে ভুলিয়া গিয়া, শেষ না ভাবিয়া।
কত কাণ্ড করা হোলো, কুলে কালি দিয়া॥
পাদরীর মায়া কিছু না বুঝিয়া ধনী।
একেবারে আপনারে মজালে আপনি॥

১২৬৮ সালে মথুরানাথ শর্ম্মার পরিচালনায় 'সুধাকর' নামে একটি পাক্ষিক পত্র প্রকাশিত হয়; কয়েক বৎসর চলিবার পর

* কবি রাধামাধব মিত্র সম্পাদিত "সুজন-রঞ্জন" মাসিক পত্র সম্বন্ধে, আশ্বিন (১৩৫৩) মাসের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। লেখক।

উহা বন্ধ হইয়া যায়। ১২৭৭ সালে কবি রাধামাধব মিত্রের সম্পাদনায় উক্ত পত্র পুনঃ প্রকাশিত হয়; পত্রিকাখানি পদ্যে প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে আমি 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' (১২ই শ্রাবণ ১৩৫৩) এবং শ্রাবণ—১৩৫৩ সালের 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া উহার সম্বন্ধে আর এই স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

রাধামাধব 'বঙ্গ-রঙ্গ' নামে আর একখানি মাসিক পত্র সম্পাদনা করেন; কিন্তু ইহা কোন্ বর্ষে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল বা কত দিন চলিয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। আমি 'বঙ্গ-রঙ্গের' ১ম সংখ্যা একখানি প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু উহাতে কোন সাল লেখা নাই; উহা হইতে পত্রিকাখানি ৫১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে "সিটি প্রিণ্টিং এণ্ড এনগ্রেভিন ওয়ার্কসের" শ্রীকন্দর্পকুমার চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত হইত লিখিত আছে। পত্রিকাখানি আগাগোড়া কবিতায় "নবরঙ্গিণী ছন্দে" রচিত। পত্রিকায় নূতন ছন্দে রাধামাধবের রচনার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল:

"আহা কি সর্ব্বনেশে,
ঝড় এসে, উদয় হলো দেশে।
জলের জাহাজ স্থলে উঠলো, আপনাআপনি ভেসে
সবাই পড়ে সম ক্লেশে।
কতলোক প্রাণে মলো,
—হায় কি হলো, বলতে হলো তবে।
ন্যূনাধিক ক্ষতিগ্রস্ত, সে সময় সবে
এমন কে দেখেছে কবে?
অগণন তরুর মরণ,
ঘটলো তখন, ভগ্ন সকল ঘর।
দাঁড়াবার স্থল হীন, প্রায় সর্ব্ব নর
ভাবে শিরে দিয়া কর।"

এতদ্ব্যতীত রাধামাধব ১লা বৈশাখ ১৩০১ সাল হইতে 'সুজনরঞ্জন' নামে আর একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন, এই সম্বন্ধে ১৩৫৩ সালের আশ্বিন মাসের 'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। সংবাদ-প্রভাকর কার্য্যালয় হইতে ১২৬৬ সালের ৪ঠা আশ্বিন হইতে 'সংবাদ-দ্বিজরাজ' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র স্বর্গীয় গোঁসাইদাস গুপ্তের সম্পাদনায় বাহির হয়। পরে রাধামাধব এই পত্র সম্পাদনা করেন। এই পত্রের পঞ্চম বর্ষের কয়েক সংখ্যা মাত্র বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে। পত্রিকাখানি কত বৎসর চলিয়াছিল, তাহা এখনও জানা যায় নাই। যাহা হউক, রাধামাধব এই সমস্ত পত্রপত্রিকায় অজস্র কবিতাবৃষ্টি করিয়া পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিয়া গিয়াছেন।

চারি

রাধামাধবের 'কবিতাবলী'র পাঁচটি খণ্ড ব্যতীত নিম্নলিখিত

কবিতার পুস্তকগুলিও প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। (১) বনিতা মরণ খেদের কারণ, (২) স্ত্রীপুরুষে দ্বন্দ্ব, (৩) স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ, (৪) বসন্তে বিচ্ছেদ কুলকামিনীর খেদ, (৫) শারদীয় মহোৎসব, (৬) বোধেন্দূদয়, (৭) যুবরাজের অভ্যর্থনা, (৮) সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা, (৯) ভাব-লহরী। এই কবিতাগ্রন্থগুলি ব্যতীত "বিধবা-মনোরঞ্জন নাটক" নামক তাঁহার একখানি সামাজিক নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল। "মণিবালা বা কলির সাবিত্রী" নামক তল্লিখিত একখানি সামাজিক নাটক আমি সংগ্রহ করিয়াছি, এই সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিব।

রাধামাধবের কবিতাবলী দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; এইবার তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মৎসংগৃহীত তৃতীয় ভাগের আখ্যা-পত্র ও প্রথম চারখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ইহা কোন বৎসরে প্রথম প্রকাশিত বা মৎসংগৃহীত গ্রন্থখানি কোন সংস্করণের পুস্তক, তাহা বলিতে পারা যাইবে না। দ্বিতীয় ভাগ ১২৬৮ সালে এবং চতুর্থ ভাগ ১২৭৪ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং তৃতীয় ভাগ ইহার মধ্যবর্ত্তী কোন বৎসরে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থে কোন ব্যক্তি এক কবিকে দেখিয়া, তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করায়, তাঁহার এক বন্ধু দ্বিতীয় ব্যক্তি, কবিদিগের দ্বারা পৃথিবীতে কি উপকার সাধিত হয় তাহা প্রশ্নোত্তর

ছলে প্রথমেই লিখিত আছে। নিম্নে উক্ত কবিতা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইল :

কবি যদি না থাকিত, কি হোত না জানি।
ভবভাব ব্যক্ত না হইত অনুমানি।
দিবাকর, নিশাকর, নিশা আর দিবা।
অগণন তারাগণ, অপরূপ কিবা।
নদ-নদী জলনিধি, ভূধর, কানন।
আকাশ অনিলানল, ধরণী জীবন।
জলজ স্থলজ রম্য নানাবর্ণ ফুল।
নানাজাতি পশু আর, বিহঙ্গম কুল।
এ-সকল বিলোকন, করি অনিবার।
বর্ণন করিত কেবা, যে গুণ যাহার ?
একের সহিত করি, অন্যের তুলনা।
কে বা উপদেশ দান, করিত বল না।
কে করিত এইরূপ কল্যাণ সাধন।
উপকারী কই আর, কবির মতন।
কবিকে যতন কর, বলিয়া রতন।
কবি করে মানবের মানস রঞ্জন।
সত্য কবি হলে হয়, উদার স্বভাব।
মানসে না থাকে তার ভাবের অভাব।
যে ফুলেতে মধু নাই, অনুমান হয়।
সে ফুলের মধু আনে মৌমাছি-নিচয়।
সেইরূপ যে বিষয়ে রস নাই বলি।
কবি তাতে রস পেয়ে, হয় কুতূহলী।
কোথা হতে কি প্রকারে কি ভাব জুটায়।
শুনে জ্ঞানলাভ আর, মন ভুলে যায়।
সাংসারিক চিন্তানলে, দগ্ধ নয় মন।
পরহিত অনুষ্ঠানে, ব্যস্ত অনুক্ষণ।
মরিয়াও উপকার, করে কবিগণ।
উপকারী কই আর, কবির মতন।

কবিগণ মানবসমাজের কি কি উপকার করেন, তাহা বলিতে বলিতে, লেখকের নিজ গুরু, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে এই কাব্যে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও এইস্থলে উল্লিখিত হইল।

কবিকৃত উপকার, করিতে বর্ণন।
গুপ্ত কবিবরে মনে, হইল স্মরণ।
বহু দিন গত হোল, হেরি নাই তাঁরে।
মনোদুঃখ মনে আছে, বলি আর কারে।
পঁয়ষট্টির মাঘ মাসে, দশম দিবসে।
শনিবারে পরলোক, যান কালবশে।
কবিতা-কুসুম তাঁর, আজো আছে ফুটে।
সুখমধু আসে আজো, মন অলি ছুটে।
বুক ফাটে হলে যাঁর মরণ স্মরণ।
কেমনে তাঁহার গুণ করিব বর্ণন।
লেখনী করিলে করে, নানাজ্বালা ঘটে।
স্বাভাবিক বুদ্ধি আর, নাহি থাকে ঘটে।
অনিবার শতধার দু'নয়নে বয়।
বর্ণচয় দৃষ্ট নয়, সব শূন্যময়।
মিত্রভাবে মিত্রের, করেছ হিত কত।
কেবল যাতনা বাড়ে, মনে পড়ে যত।
তব ছাত্র বলি গুরু, দিতে পরিচয়।
লোকের সমাজে বড় লাজ পেতে হয়।
শিখায়েছ হাতে ধরি, কিছু শিখি নাই।
কেমনে লিখিব আমি, ভাবিতেছি তাই।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে, লেখক যেভাবে দ্বাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। বাঙ্গলার প্রাচীন ও নবীন কবিদিগের যোগসূত্র ছিলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত ; তাঁহার হাস্যরসাত্মক কবিতা-গুচ্ছকে বাঙ্গলায় জীবন্ত সাহিত্য বলিলেও বেশী বলা হয় না। সেই জন্যই তাঁহার সেই কশাঘাত সহ্য করিয়াও বঙ্গবাসী ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পাঠ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। ঈশ্বর গুপ্তের প্রধান কীর্ত্তি 'লেখক-সজ্ঞ' গঠন করা ; বস্তুতঃ তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই "প্রভাকর-গ্রহমণ্ডল" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে 'ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবীসদের একটা কীর্ত্তি আছে ; দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবীস ছিলেন।' কবি রাধামাধব মিত্র সেই শিক্ষানবীসদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত যুবকবৃন্দকে লিখিবার জন্য সর্ব্বসময়ে উৎসাহ দান করিতেন এবং বলিতেন—

"গদ্য হয় পদ্য হয় যাহা লয় মনে।
পরম প্রবন্ধ লেখ বিশেষ যতনে।
আপনি লিখিতে শেখ পার যে প্রকারে।
লেখাও শেখাও সবে সত্য অনুসারে।"

সুতরাং তাঁহার ছাত্র রাধামাধব, গুরুর সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বর গুপ্তের 'জীবনীর' অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি।

উক্ত কবিতাবলী তৃতীয় ভাগে, লেখক কৃপণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

কৃপণ! করিছ তুমি অর্থের সঞ্চয়।
শুনিলে ব্যয়ের কথা, হৃৎকম্প হয়।
একেবারে হও তুমি পাষাণ অন্তর।
শুনিলে পরের দুঃখ, না হও কাতর।
পরিবার হাহাকার করিছে সদাই।
নিজ ক্লেশে পর ক্লেশে, ক্লেশবোধ নাই।
কার তরে খেটে মর' ভূতের বেগার।
এ দিন তো চিরদিন রবে না তোমার।

কবিতাবলী চতুর্থভাগ ১২৭৪ সালের ২৫শে পৌষ প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি যে গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়াছি, উহা তৃতীয় সংস্করণের মুদ্রিত পুস্তক ; প্রথম সংস্করণ এক-হাজার, দ্বিতীয় সংস্করণ একহাজার এবং তৃতীয় সংস্করণ দুইহাজার মুদ্রিত

হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থে লিখিত আছে। আখ্যা-পত্রে "for the use of school" বলিয়া লিখিত আছে—আখ্যা-পত্রের প্রতিলিপি এই স্থলে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থমধ্যে লেখক যে ভূমিকা 'বিজ্ঞাপন' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিম্নে উল্লিখিত হইল :

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহদাতা বিদ্যাবিশারদ গুণগ্রাহক বিদ্যালয়াধ্যক্ষ মহাশয়েরা স্থানে স্থানে স্ব স্ব অধীনস্থ বিদ্যামন্দিরে মদ্রচিত কবিতাবলীর প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ ব্যবহার করিয়া আমার এতাধিক উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন যে, কবিতাবলীর তৃতীয়ভাগ প্রচারিত হইবা মাত্রেই আমাকে চতুর্থভাগ প্রকাশ করিতে হইল। ইহা সামান্ত আহ্লাদের বিষয় নহে, শিক্ষক মহাশয়েরা মাদৃশ সামান্ত ব্যক্তির বিরচিত গ্রন্থাবলী স্ব স্ব করে ধারণপূর্ব্বক বালক-পুঞ্জকে শিক্ষা দিবেন, আমি স্বপ্নেও এরূপ প্রত্যাশা করি নাই এবং ইহা আমার পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত সৌভাগ্য—তাহা বলা যায় না।

আমার কোন রচনা যদি সজ্জনগণদ্বারা সমাদৃত হয় তাহাতে আমার কিছুমাত্র গৌরব বৃদ্ধি না হইয়া কেবল আমার জ্ঞানগুরু কবিবর প্রভাকর-জন্মদাতা ৺ ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের গৌরবোন্নতি হইতে থাকে, যে হেতু কবিতা রচনা বিষয়ে তিনিই আমার একমাত্র গুরু ছিলেন। অধুনা যাঁহারা বিশেষ অনুকম্পা বিতরণ পূর্ব্বক আমাকে যত উৎসাহ প্রদান করিতেছেন, আমি তাঁহাদের নিকটে কৃতজ্ঞতাঋণে ততই বদ্ধ হইতেছি। পরিশেষে জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই যে, আমি যেন এবারেও পূর্ব্বমত উৎসাহ প্রাপ্ত হই এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্চম ভাগ প্রচার করিয়া কবিতাবলীর রচনা কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারি।

কলিকাতা ২৫ পৌষ ১২৭৪।	}	শ্রীরাধামাধব মিত্র সাং জেজুর।

আলোচ্য পুস্তকখানি ডবল-ক্রাউন ষোল পেজী ৯৬পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; রূপক, কৃপণ মানবের সকলি অপরূপ, গৃহস্থাশ্রমে সুখ কি? নবীনের উক্তি, বৃদ্ধের উক্তি। রূপকে রজনীবর্ণনাচ্ছলে বঙ্গভাষার সমালোচনা এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন, লার্ড কেনিং বাহাদুরের মৃত্যুতে শোক-সূচক কবিতা, শবদর্শনে তত্ত্বজ্ঞান পঞ্চভূত, মানবদেহে ঈশ্বরের অপরূপ কার্য্য-কৌশল, বিবেক, মন, আত্মা এবং মৃত্যুকাল গোপন থাকাতে মানব-সমাজের বিশেষ উপকার-শীর্ষক কবিতায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে।

নিম্নে কবিতাবলী চতুর্থভাগ হইতে "কৃপণ মানবের সকলি অপরূপ" শীর্ষক কবিতাটি চয়ন করিয়া পাঠকগণের অবগতির জন্ত উদ্ধৃত হইল :—

হায় কি কৌতুক কর, কৃপণের কথা।
কৃপণের গুণরাশি, ব্যক্ত যথা তথা।
ধরাতলে কৃপণের জীবন চরিত।
আহা কিবা অপরূপ, স্বরূপ রহিত।
দেখিতে অদ্ভুত জন্তু, ইচ্ছা যার আছে।
আত সে যাউক তবে, কৃপণের কাছে।
অপরূপ গুণ তার, অপরূপ বেশ।
অপরূপ তনু তার, অপরূপ দ্বেষ।
অপরূপ ইচ্ছা তার, অপরূপ ভাব।
অপরূপ ভঙ্গি তার অপরূপ লাভ।

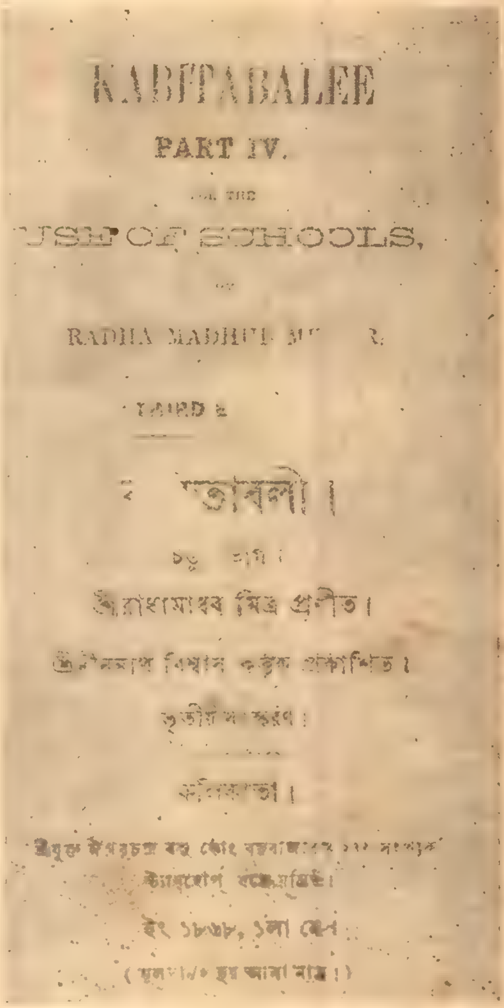
KABITABALEE
PART IV.
USE OF SCHOOLS,
কবিতাবলী।
শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত।

অপরূপ ধ্যান তার, অপরূপ মন।
অপরূপ ব্যয় তার, অপরূপ ধন।
অপরূপ খাদ্য তার অপরূপ শ্রম।
অপরূপ ভক্তি তার অপরূপ ভ্রম।
অপরূপ বিদ্যা তার, অপরূপ যুক্তি।
অপরূপ বিবেচনা, অপরূপ উক্তি।
অপরূপ যশ তার, অপরূপ মান।
অপরূপ জ্ঞান তার, অপরূপ দান।
অপরূপ দয়া তার, অপরূপ ধর্ম্ম।
অপরূপ অভিপ্রায়, অপরূপ কর্ম্ম।

অপরূপ গুরু তার, অপরূপ চেলা।
অপরূপ কৃপণের মত লীলা খেলা।
অপরূপ পণ তার, অপরূপ ভয়।
এমন কি আছে তার অপরূপ নয়?

বঙ্গভাষার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া, বঙ্গবাণীর কখনও প্রফুল্ল বদন, কখনও বা বিরস বদন হইয়াছিল; কবি তাহা বহু উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছেন। সম্পাদকগণের আচরণে আমাদের ভাষাজননী যে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পঙক্তি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। তৎকালীন কয়েকখানি সাময়িক পত্রের বিষয়ও কবিতামধ্যে লিখিত আছে।

নগরে নগরে দেখ সম্পাদকগণ।
নানা যত্নে করে মম উন্নতিসাধন।
এখন সকলে লয়ে, মম সৎকার।
কত মত সমাচার করিছে প্রচার।
প্রতিদিন করিতেছে উপদেশ দান।
মলিনতা নাশে, দিয়া লেখনী-কৃপাণ।
মম ভক্ত হোতে সবে, যুক্তি দান করে।
কত প্রীতি রাখে তারা আমার উপরে।
হরণ করিয়া তারা সপত্নীভূষণ।
আমার শরীরে করে নিয়ত অর্পণ।
বাড়িছে আমার রূপ চন্দ্রকলা ন্যায়।
অবহেলা কেহ আর করে না আমায়।
ক্রমশঃ পেতেছি আমি কলেবরে বল।
এতদিনে আশা মম হোতেছে সফল॥
এখন না ধরি আমি, আর শবাকার।
প্রফুল্ল বদন তাই হোতেছে আমার।
প্রভাকর-যন্ত্র রূপ, উদয় ভূধরে।
প্রভাকরোদয় হোয়ে, কত প্রভা করে।
আমার সুখের দিন করে সুপ্রকাশ।
আমার দুঃখের তম নিত্য করে নাশ।
দিন দিন মম প্রভা, করে উদ্দীপন।
দেখ দীপ্তিময়ী আমি, হতেছি কেমন।
সোমপ্রকাশের গুণ কব আর কত।
এখন সে হইয়াছে মম মনোমত।
প্রকাশিত হোয়ে 'সোম' প্রতি সোমবারে।
অনুপম প্রভা সেই দিতেছে আমারে।
পূর্ণচন্দ্রোদয় আদি, চন্দ্রিকা ভাস্কর।
তারাও আমার পক্ষে কত হিতকর।
যথাসাধ্য করে সবে শুভ সম্পাদন।
ক্রমাগত করে মম মালিন্য হরণ।
সবাই সুসার করে আমার আশার।
প্রফুল্ল বদন তাই হোতেছে আমার॥

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ রূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তাঁহাকে কলিকাতায় অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি রাজকীয় অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়। কবি রাধামাধব সেই সময় উক্ত অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং "যুবরাজের অভ্যর্থনা" শীর্ষক একখানি কবিতার পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকখানির আখ্যাপত্র (Title page) এইরূপ :

যুবরাজের অভ্যর্থনা।

A
LOYAL WELCOME
To
HIS ROYAL HIGHNESS
THE
PRINCE OF WALES

৺ কবীশ্বর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ছাত্র ও
শীলস্ ফ্রি কালেজের দ্বিতীয় শিক্ষক
জেজুর নিবাসী
শ্রীরাধামাধব মিত্র প্রণীত।
কলিকাতা
সুশ্রুত যন্ত্রালয়।
শ্রী জানকী নাথ রায় দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৮২ সাল

কলিকাতা তৎকালে ভারতের রাজধানী ছিল এবং যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য ভারতের যে সমস্ত রাজন্যবর্গ এই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন, তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। উক্ত পুস্তক হইতে নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল :

ভাবি নাই বঙ্গের এমন দিন হবে।
এককালে এত ভূপ সমাগত হবে॥
দেখ দেখ যুবরাজ, তোমার কারণ।
বঙ্গের অতিথি হন, মহীপালগণ॥
কাস্মির অধীশ্বর হয়ে সুসজ্জিত।
হয়েছেন সদলে এ দেশে উপস্থিত।
ঝরণাপারনাধীপ, মহামূল্য সাজে।
বিরাজিত হয়েছেন, কলিকাতা মাঝে।
পাটিয়ালা অধিপতি সহ অনুচর।
রাজ্য ত্যজি এসেছেন বঙ্গের ভিতর।
ঝিন্দাধীপ সঙ্গে লয়ে পারিষদ-চয়ে।
করিছেন অবস্থিতি বঙ্গের হৃদয়ে।
বিজ্ঞবর কাশীশ্বর ধরিয়া সুবেশ।
করেছেন মহানন্দে এদেশে প্রবেশ।
নেপালের ভূপালের যোগ্য প্রতিনিধি।
এসেছেন আড়ম্বর করি যথাবিধি।
ভিজয়াগ্রামের ভূপ সমারোহ করি।
এসেছেন এ দেশেতে রম্য বেশ ধরি।
ব্রহ্মদেশ-অধীপের প্রতিনিধি যিনি।
রাখিতে সম্মান তব এসেছেন তিনি।

হর্ষচিত্তে আড়ম্বর করি অপরূপ।
সমাগত হয়েছেন জয়পুরভূপ।
ভূবাঙ্কুর অধিপতি মনোহর বেশে।
সমাগত হয়েছেন এই বঙ্গ দেশে॥
দারভাঙ্গা রাজেশ্বর সহিত স্বগণ।
এসেছেন তোমাকে করিতে সম্ভাষণ॥
রত্নরাজী শোভা করে, অঙ্গে সবাকার।
গলদেশে সুশোভিত নানা রত্নহার॥
তব সমাদর তরে এত আয়োজন।
অমূল্য রতন তুমি, অমূল্য রতন॥

এতভিন্ন ১৯০৬ ও ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যখন যুবরাজ ও সম্রাট হিসাবে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও কবি রাধামাধব দুইখানি কবিতাপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ৩৫নং বিডন ষ্ট্রিট হইতে, তাঁহার পুত্র শ্রী সর্ব্বগুণাকর মিত্র (ইঞ্জিনিয়ার) কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা" নামক কবিতাপুস্তক কবির শেষ মুদ্রিত গ্রন্থ। ইহার মধ্যে ইংরাজী ভাষায় কবি একটি ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে উক্ত ভূমিকাটি উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে কবির সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যাইবে।

"On this occasion of universal rejoicings at the advent of their most Gracious Imperial majesties the king Emperor George the Fifth and the Queen Empress, I consider it to be my duty, as a loyal subect of their Imperial majesties, to join in the rejoicings, and with a view to record my sincere feelings, in rhymes as I did on the occasion of the arrival in India of the late King Emperor Edward the Seventh and the present King Emperor as the Princes of Wales, I have composed the following few verses.

"I am now a very old man of 80 years, but I still retain tho mental capacity of an extempore versifier, and with the training I had the honor of receiveng from the late distinguished poet Iswar Chandra Gupta I record, in verse the arrival ceremony at Bombay, the Welcome, the Durbar, and the Reception ceremonies performed both at Deihi and in Calcutta, while praying for long life and prosperity of their Imperial Majesties.'

ভারত-সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমনে কবি রাধামাধব শোক-সূচক, ৩২ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কবির হস্তলিখিত খাতাখানি আমি সংগ্রহ করিয়াছি; ইহার মধ্যে কবিতাগুলি এরূপ হৃদয়-গ্রাহী, যে পাঠ করিলে শতমুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। দুঃখের বিষয়, এইরূপ দীর্ঘ বত্রিশ পাতার কবিতা উদ্ধৃত করিবার স্থানাভাব বলিয়া, মাত্র কয়েক পঙক্তি চয়ন করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

"শ্রী—মতি ভারতেশ্বরী মহারাণী যিনি।
রা—জ্য ভার পরিহার করিলেন তিনি।
ধা—মে উপযুক্ত তাঁর, করেন গমন।
মা—তার মতন করি, প্রজার পালন।
ধ—ন প্রাণ আদি করি, যত কিছু আছে।
ব—লিব কি সমর্পিত, ছিল তাঁর কাছে।
মি—লাইয়া দেখি মনে, আচার বিচার।
ত্র—তা যুগে রামরাজ্যে, ছিল যে প্রকার।

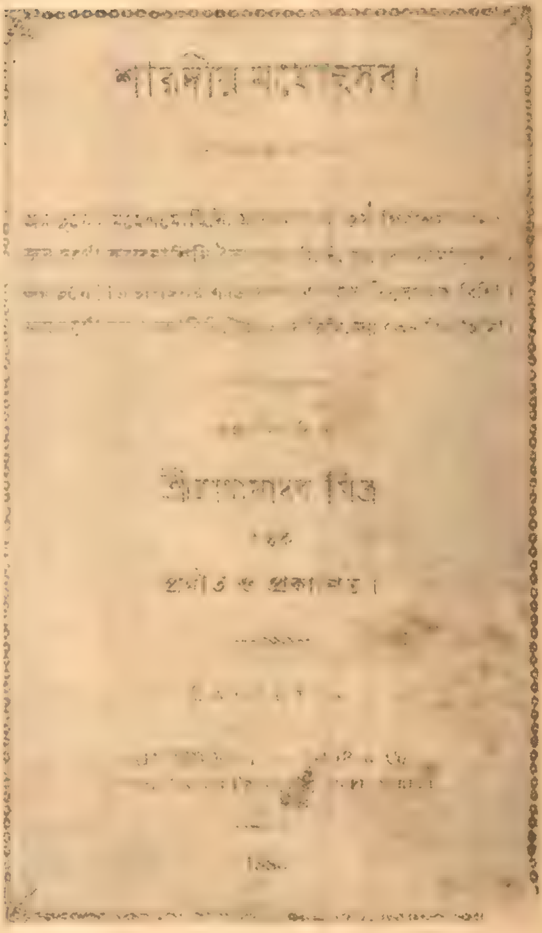

শো—চনীয় এ ব্যাপার, কিবা কব আর।
কা—তর হইয়া সবে করে হাহাকার।
তু—ষিতে প্রজাকে তিনি, না করেন ত্রুটি।
র—য় নি কখন আর দুষ্টের ভ্রুকুটি।
অ—সম ঐশ্বর্য্য হেন, অসম প্রতাপ।
তি—রোহিত হইল যে, ইকি পরিতাপ।
চি—স্তা করি পরমেশে, সজ্ঞানাবস্থায়।
ত্র—স্ত ভাবে সম্বরেন, মানবলীলায়।"

কবিতার প্রতি লাইনের আদ্যাক্ষরগুলি একত্রে, দুই লাইনের নিম্নরূপ একটি কবিতা হয়:

শ্রী রাধা মাধব মিত্র।
শোকাতুর অতি চিত্র॥

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কবির 'শারদীয় মহোৎসব' নামক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি "মহিমান্বিতা দয়াবতী শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী"কে উৎসর্গীকৃত বলিয়া লিখিত আছে। পুস্তকখানির পত্রসংখ্যা ৪৮ এবং শেষে একখানি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল; ইহা হইতে শারদীয় মহোৎসবের পূর্ব্বে কবির অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। কবি স্বয়ং এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তকখানির আখ্যাপত্রে দেবী দুর্গার একটি স্তব প্রকাশিত হইয়াছিল; আখ্যাপত্রটির প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইল।

শারদীয় মহোৎসবে প্রার্থনা, সহৃদয় পাঠকপুঞ্জের প্রতি নিবেদন, গিরিরাজের প্রতি মেনকার খেদোক্তি, মেনকার প্রতি গিরিরাজের উক্তি এবং হিমালয়ালয়ে পার্ব্বতীর শুভাগমন, এই ছয়টি কবিতা গ্রথিত আছে। প্রত্যেকটি কবিতাই সুলিখিত; নিম্নে একটি কবিতা হইতে কয়েক লাইন, রচনার নিদর্শনার্থে উল্লিখিত হইল:

কালে কালে হইয়াছে, সব বিনিময়।
রীতি নীতি দেশাচার, সে রূপ না রয়।
অপরূপ ভাব ধরে, নব্য সম্প্রদায়।
বিমোহিত নাহি হয়, সেকেলে প্রথায়।
পূর্ব্বকার পুঁথী আর ভাল নাহি লাগে।
মাতিয়াছে নব রঙ্গে নব অনুরাগে।
না করিয়া দোষ আর গুণের বিচার।
নূতন প্রথায় তুষ্ট মন সবাকার।
চলিতে ইংরাজী চালে, কেবল যতন।
মনে ভাবে ড্যাম্ সব প্রথা পুরাতন।

কবির মাতৃভক্তিও এই স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; তাঁহার স্ব-লিখিত জীবনীতে তিনি একস্থানে লিখিয়াছিলেন যে, "সহস্র উপকার হইলেও, মাকে অসন্তুষ্ট করা উচিত নয়।" এই 'শারদীয় মহোৎসব' কাব্যেও, কবির সেই মাতৃভক্তি অবিচলিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েক লাইন উদ্ধৃত হইল:

"বসি মা-গো তব কোলে ডেকে মা-গো মা মা বোলে,
একবার জুড়াই জীবন।
জননী না থাকে যার হতভাগ্য কেবা আর
ধরাতলে তাহার মতন।
বসিলে মায়ের পাশে স্বর্গ যেন হাতে আসে
মনোদুঃখ সব দূরে যায়।
দুঃখের সময়ে হায় যদি কেহ হেরে মায়
অমনি সে সুখনীরে নায়।
মেদিনীতে 'মা' কথাটী কি মধুর পরিপাটী,
'মা' কথার আহা কিবা গুণ।
মা যদি না বেঁচে থাকে লোকে তবু মাকে ডাকে
নিবাইতে মনের আগুন।
মার স্নেহ যে প্রকার অবিদিত আছে কার,
বাপের তেমন কভু নয়।
হও তুমি অবিকল তাহার দৃষ্টান্তস্থল
পাষাণ বলিয়া হেন হয়।"

কবি রাধামাধব দুই দারপরিগ্রহ করেন। প্রথম বিবাহের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই; দ্বিতীয় বিবাহ কলিকাতা ঝামাপুকুরের মজুমদার বাটীতে সুসম্পন্ন হয়। ইহার গর্ভে পাঁচ পুত্র এবং তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদের নাম সর্ব্বগুণাকর, রস গুণাকর, সত্য গুণাকর, গুরু গুণাকর, ও শশী গুণাকর; কিন্তু একমাত্র জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ তাঁহার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বগুণাকর মিত্র ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইনি ইঞ্জিনিয়ার হন ও স্বাধীনভাবে নিজে ব্যবসাদি করিতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব গুণাকর ১১৫নং বকুলবাগান রোডস্থ স্বর্গীয় হীরালাল ঘোষের কন্যা তরুলতা দেবীকে বিবাহ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ইনি সহপাঠী ছিলেন এবং কলিকাতা 'নর্থ ক্লাবের' সম্পাদক, মার্টিন এণ্ড কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার, ও হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্য ছিলেন। ইহার মধ্যম ভ্রাতা রসগুণাকর মিত্রও বহু বৎসর 'নর্থ ক্লাবের' সম্পাদক ছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু ইহাদের মাতুল হইতেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর সর্ব্ব গুণাকর পাঁচ পুত্র রাখিয়া গতাসু হন।

কবির কনিষ্ঠ পুত্র শশী গুণাকর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে স্বগ্রাম জেজুরে পরলোকগমন করেন। হরিপালের প্রসিদ্ধ রায়বংশে ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি কবির 'ভাবলহরী' নামক অপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের ১ম খণ্ড প্রকাশ করেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীসুশীল গুণাকর মিত্রের নিকট হইতেই কবির দুষ্প্রাপ্য কাব্যগ্রন্থগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। কবির পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র রসগুণাকর পিতার কবিত্বশক্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আনন্দ-বাসর বা দুর্গোৎসব নামক তাঁহার একটি কবিতা-পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়। মৌলিক রচনা না হইলেও ছন্দের অবাধ সরল গতি এবং অনাবিল ভাবের প্রবাহ দেখিয়া, অল্প বয়সে পরলোকগমন না করিলে, তিনিও পরবর্তী কালে যে একজন প্রসিদ্ধ কবি হইতে পারিতেন—তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

বিশ্রাম [ফটো—শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে, এ ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য্য এ নয় যে, এ-দেশে হিন্দুই বড় হইবে বা আর কেহ বড় হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে;—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।

বিরাট রচনার সহিত যে খণ্ড সামগ্রী কোনখণ্ডেই মিল খাইবে না, যে বলিবে—আমিই টিকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। ভারতবর্ষের যে অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যে কোনো একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জ্জন করিবেন। —রবীন্দ্রনাথ

গুরু-দক্ষিণা

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

—এক—

ঘরের দরজা ঘেঁসিয়া বসিয়া শুভা বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষ-বৃক্ষ" পড়িতেছিল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল। বড় জা রাজলক্ষ্মী উপরে উঠিয়া শুভাকে দেখিতে পাইল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার 'বাজখাই' গলা বাজিয়া উঠিল—যত সব অলুক্ষণে কাণ্ড, দেখ না! ভর সন্ধ্যেবেলায় দোরমুখে বসে কেতাব পড়া হচ্ছেন—নবাব-নন্দিনীর!

জায়ের কথা শুনিয়া শুভা হাতের বই রাখিয়া উঠিয়া পড়িল এবং আগাইয়া গিয়া জাকে হাসিয়া বলিল—দিদি, আমার বাপ-দাদার গুষ্টিতে কেউ নবাবও ছিল না, বাদশাও ছিল না, আমি নবাব-নন্দিনী হব কিসে? বরং রাজকুলে পড়েছি বলে বলতে পারেন—আমরা এক একজনা রাজ-লক্ষ্মী, না, রাজমহিষী।

বহু পূর্ব্বে জমিদারী সম্পর্কে, পল্লীগ্রামের লোকেরা শুভার শ্বশুরবাড়ীকে রাজবাড়ী বলিত। উহার মূলে যেমন কোন রাজার অস্তিত্ব ছিল না, তেমনি পূর্ব্বপুরুষের জমিদারী ও পল্লীগ্রামের বাস্তভিটার চিহ্নমাত্রও এখন নাই। লোকের মুখে মুখে তার শ্বশুরালয়ের যে খ্যাতি প্রচলিত ছিল তাহারই সম্পর্কে শুভা শ্বশুরকুলকে রাজকুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল এবং সেই কথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিতে গিয়া রাজলক্ষ্মী, না, রাজমহিষী বলিয়াছিল।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া চট করিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল রাজলক্ষ্মী তাহার বড় জায়ের নাম। সেই নামটা ঐ ভাবে উল্লেখ করায় সে লজ্জিত হইয়া জিভ কাটিল।

শুভার কথা রাজলক্ষ্মী স্পষ্টই শুনিতে পাইল। নিজের নামের সঙ্গে রাজমহিষীর উল্লেখ শুনিয়া তাহার মনে কি সন্দেহ হইল। তাহার মেয়ে পুঁটি তাহার সঙ্গে আসিয়া-ছিল। রাজলক্ষ্মী হাতের একটা আঙুল দ্বারা তাহার পিঠে ঠেলা দিয়া বলিল—শুনলি, পুঁটি, শুনলি কি বল্লে?

পুঁটি বলল—শুনলুম তো, বলল রাজলক্ষ্মী না রাজমহিষী।

রাজমহিষী অর্থ?

পুঁটি ইস্কুলে পড়িত। বাংলা ব্যাকরণের সঙ্গে সম্প্রতি তাহার পরিচয়ও ঘটিয়াছে। সে মাকে রাজমহিষীর অর্থ একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিল—রাজহংস-রাজহংসী, রাজমহিষ-রাজমহিষী,—অর্থটা নিজেই বোঝ।

কি, রাজমহিষ-রাজমহিষী? মহিষ আর মহিষী? তোর বাবা মহিষ আর আমি হলুম মহিষী? বটে বটে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ঝেঁটিয়ে ঐ মুখ ভোঁতা করে দেব না! হারামজাদী, ছোটলোকের মেয়ে—ইত্যাকার ভাষায় শুভার উদ্দেশে রাজলক্ষ্মীর তর্জ্জন-গর্জ্জন চলিতে লাগিল।

শুভার স্বামী হিরণ্ময় এই সময় আফিস হইতে বাড়ীতে আসিল। সদরে পা দিয়াই সে বধূঠাকুরাণীর গলার ঝঙ্কার শুনিতে পাইয়াছিল। উপরে উঠিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে, কি হয়েছে?

রাজলক্ষ্মী হাত উল্টাইয়া বলিয়া উঠিল—হবে আর কি! তোমার বিদ্যাধরী বউয়ের কথা শোন—তোমার দাদা মহিষ আর আমি মহিষী!

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া হিরণ্ময় শুভার নিকটে গিয়া ঘটনাটা শুনিতে পাইল। তখন সে হাসিতে হাসিতে বধূঠাকুরাণীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বউদি, তোমার ভুল হয়েছে, রাজমহিষী মানে রাজরাণী।

রাজলক্ষ্মী ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিল—আরে যাও যাও। তোমার আর ওকালতী করতে হবে না। যেমন যাদুমণি তেমনি তার রুক্মিণী! নাই দিয়ে দিয়ে বউকে মাথায় তুলে রেখেছ, সে যা বলে তাই-ই বেদবাক্যি! লেখা-পড়া জানে, হারমোনী বাজিয়ে গান গায়, স্বদেশী মিটিম না কিসের নাম শুনলে মাথার কাপড় ফেলে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে যায়, তার উপর সোয়ামীর হাত ধরাধরি করে হাওয়া খেতে যাওয়া হয়,—এমন মেম সাহেবের কথায় কি কোন দোষ থাকে? যত ভুল আমাদেরই। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ কিনা, কাজেই রাজমহিষীর মানে বুঝব কেন? কিন্তু এই পুঁটিও তো শুনেছে। বল দেখি পুঁটি, তোর কাকীমা মহিষী বলেছে কি না।

পুঁটি কাকার নিকটে ব্যাকরণের বিদ্যার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পাইয়া পূর্ব্বেরই মত বলিয়া উঠিল—রাজহংস-রাজহংসী, রাজমহিষ-রাজমহিষী।

রাজলক্ষ্মী হিরণ্ময়কে বলিল—শোনো, ওর মুখেই শোনো, আমার ভুল হয়েছে নাকি। অতটুকু মেয়ে, ওতো আর মিছে কথা বলছে না। তুমি যেমন ভেঁড়ো, তেমনি বউয়ের হয়ে আবার ওকালতী করতে এসেছো। মারি ঝাড়ু অমন বউয়ের মুখে!—রাজলক্ষ্মী ঝঙ্কার দিতে দিতে নীচে নামিয়া গেল।

বধূঠাকুরাণীকে আর কিছু বলা নিষ্ফল বুঝিয়া হিরণ্ময় ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

দুই

রাজলক্ষ্মী ব্যঙ্গস্বরে শুভার সম্বন্ধে যাহাই বলুক না কেন, উহার মূলে কিছু সত্যও ছিল। শুভা সত্যসত্যই শিক্ষিতা মেয়ে, গানবাজনায় নিপুণ এবং দেশের সভা-সমিতিতে যোগ দেওয়াও তাহার অভ্যাস। তাহার জন্ম হইয়াছিল রেঙ্গুন-প্রবাসী এক বাঙ্গালী পরিবারে। তাহার স্বামী হিরণ্ময় রেঙ্গুনে চাকুরী করিত। বিবাহের পরও বহুদিন সে স্বামীর সঙ্গে সেই দেশে কাটাইয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মদেশের স্বাধীন আচার-ব্যবহার তাহার মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল; তাই কোনো কিছুতেই তাহার দ্বিধা কিংবা অনাবশ্যক সংকোচ বিন্দুমাত্র দেখা যাইত না। জাপানী বোমার উৎপাতে পিতামাতা ও স্বামীর সঙ্গে তাহাকে রেঙ্গুন ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। শুভার পিতামাতা চন্দননগরে বাড়ীভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং হিরণ্ময় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইল। ভাগ্যক্রমে কলিকাতায় তাহার একটা চাকুরীও জুটিয়া গেল।

ইহার কিছুদিন পরে কলিকাতায়ও জাপানী বোমার উপদ্রব আরম্ভ হইল। তখন দলে দলে লোকজন কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। হিরণ্ময়দের পল্লী-গ্রামের ভিটার চিহ্নমাত্রও ছিল না, কাজেই তাহাদের কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়ার উপায় হইল না।

কলিকাতায় একটি ছোট গলির শেষপ্রান্তে হিরণ্ময়দের পৈতৃক বাড়ী। উহারই একাংশ বিভক্ত করিয়া, পৃথক সিঁড়ি তুলিয়া, পাশাপাশি অন্য একটি ছোট গলির মুখে সদর দরজা ঘুরাইয়া নিয়া, বাড়ীর সেই অংশ ভাড়া দেওয়া হইয়াছে।

এই ভাড়াটে বাড়ীর বাসিন্দা সমরেশ। সে সপরিবারে সেখানে থাকে। সে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও ঔপন্যাসিক। হিরণ্ময় রেঙ্গুন-প্রত্যাগত শুনিয়া সে তাহার নিকট হইতে জাপানী বোমার কাহিনী শুনিবার জন্য উৎসুক হইল এবং সেই সূত্রে অল্পদিনের মধ্যেই হিরণ্ময়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিল।

পাশাপাশি দুইটি গলির শেষপ্রান্তে একই বাড়ীর বিভক্ত এই দুইটি স্বতন্ত্র অংশ। দুইটি খাঁচা যেন বিপরীত দিকে মুখ করিয়া পিঠাপিঠি হইয়া রহিয়াছে। উভয় বাড়ীর দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি দুইদিক হইতে আসিয়া একস্থানে মিলিত হইয়াছে এবং একটি অনুচ্চ রেইলিং দ্বারা সিঁড়ির চাতালকে দুইভাগ করিয়া বাড়ী-দুইখানির পার্থক্য বজায় রাখা হইয়াছে। মেয়েদের এ বাড়ী হইতে ও বাড়ীতে যাতায়াতের পথ ও এই স্থান দিয়া। পল্লীগ্রামে সমরেশের পৈতৃক বাড়ী।

বোমার ভয়ে অনেকেই যখন দেশের দিকে ছুটল, তখন সমরেশ ছেলেপিলে ও স্ত্রীকে কলিকাতায় রাখিতে সাহস করিল না, পল্লীগ্রামের বাড়ীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। তাহার বড় মেয়েটীর বিবাহের বয়স হইয়াছিল। কিছুদিন পরিবার দেশে রাখিলে মেয়েটীর সম্বন্ধ খুঁজিবারও সুযোগ হইবে—ইহা মনে করিয়া সে সকলকে দেশের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। তাহার সঙ্গে রহিল তাহার এক বৃদ্ধা পিসী। গঙ্গাতীর ছাড়িয়া এই বয়সে অন্যত্র যাইতে তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। পুরাতন ভৃত্য মহিমও মনিবের সঙ্গে রহিয়া গেল।

সমরেশের স্ত্রী দেশে যাওয়ার পূর্ব্বে শুভা কলিকাতায় আসিয়াছিল। অবিলম্বে উভয়ের আলাপ-পরিচয় হইল। সমরেশের নাম ও লেখার সহিত পূর্ব্বেই শুভার পরিচয় ছিল। সেই বিখ্যাত শিল্পী ও লেখক তাহাদেরই প্রতিবেশী তাহা জানিতে পারিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিল। স্ত্রীর মুখে শুভার আচার-আচরণের বিশেষত্বের কথা শুনিয়া সমরেশও তাহার পরিচয় লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে সমরেশের পরিবার দেশে চলিয়া যাওয়ায় কোন পক্ষেরই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার সুযোগ হইল না।

তিন

একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়া সমরেশ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিল, এমন সময় দেখিতে পাইল অপর দিকের সিঁড়ির মাথায় হিরণ্ময় দাঁড়াইয়া আছে।

হিরণ্ময় সমরেশকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—Good evening, Sir! আমি আপনারই প্রতীক্ষায় আছি।

সমরেশ প্রত্যভিবাদন জানাইয়া স্মিতমুখে প্রশ্ন করিল—আমার এ সৌভাগ্যের হেতু?

হিরণ্ময় উত্তর করিল—হেতুটা আত্মনেপদী, সৌভাগ্য-টাও পরস্মৈপদী নয়। আপনার সঙ্গে একটি কলাসুন্দরীর পরিচয় ক'রে দিতে চাই।

সমরেশ বিস্মিত দৃষ্টিতে হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকাইল, হিরণ্ময় পেছনে দৃষ্টি দিয়া বলিল—ওগো, এসো না!

বারান্দার দেওয়ালের পাশ হইতে এক নারী আসিয়া হিরণ্ময়ের পাশে দাঁড়াইল এবং যুক্তকর কপালে ছোঁয়াইয়া সমরেশের দিকে চাহিয়া বলিল—নমস্কার।

হিরণ্ময় সেই নারীকে দেখাইয়া সমরেশকে বলিল—ইনি আমার সহধর্ম্মিণী শুভা। যাবতীয় শিল্পকলার পক্ষপাতিনী, তাই কলাসুন্দরী। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও লেখক সমরেশবাবুর সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান।

সমরেশ মৃদু হাসিয়া শুভার দিকে চাহিয়া প্রতিনমস্কার জানাইল। শুভাকে দেখিয়া তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল স্বপ্নজগতের একটি মূর্ত্তি—মাথার কাপড় সিঁথি পর্য্যন্ত ঢাকা, কপালে দূরাকাশের নক্ষত্রটির মতো ছোট্ট একটি সিন্দুরের টিপ, আয়ত চক্ষু দুটি নীলকান্ত মণির ন্যায় উজ্জ্বল, গোলাপী রংয়ের কানের লতিকায় সবুজবর্ণ স্ফটিকের দুটি দুল, নিটোল গালে পাকা ডালিমের দানার রং, রাজহংসের পালকের ন্যায় শুভ্র দন্তপংক্তিতে পাতলা দুটি ঠোঁটের স্নিগ্ধ হাসি যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আশমানী রংয়ের একখানি শাড়ী—যেন কচিপাতায় ঢাকা একটি বেতসীলতা! সমরেশ শুভার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইল।

শুভা বলিল—আপনার লেখা অনেক পড়েছি, ছবিও দেখেছি। আপনাকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হবে—তা কখনও মনে করতে পারি নি। সেই শুভাদৃষ্ট যখন অনায়াসেই হ'ল তখন আপনার করুণার দাবী করতে পারি কি?

শুভা কি বলিতে চাহিতেছে, বুঝিতে না পারিয়া সমরেশ তাহার দিকে চাহিয়াই রহিল।

শুভা আঁচলের তলা হইতে একখানি খাতা বাহির করিয়া হিরণ্ময়ের হাতে দিল এবং সমরেশকে বলিল—আমার একটা পাগলামী আছে। তার একটা নমুনা আপনাকে দেখাবার সাধ হয়েছে। আপনি সময়মত্রে যদি এতে একটু দৃষ্টি দিয়ে দেন, তা হলে বড় উপকার হয়।

শুভার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময় খাতাখানি সমরেশের হাতে দিল। সমরেশ খাতার প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিল উহাতে একটি গল্প লেখা। সে শুভাকে জিজ্ঞাসা করিল—এটা কি আপনার লেখা?

শুভা হাসিয়া বলিল—বলেছিই তো, এ আমার একটা পাগলামী। বাতিকটা আছেও অনেকদিন ধরে। আপনাকে নিকটে পেয়েছি, আপনি যদি কষ্ট করে এ খাতাটায় একটু চোখ বুলিয়ে দেন, তাহলে বুঝতে পারি—আমি সাগরকূলে সুক্তি কুড়োচ্ছি না শম্বুক কুড়িয়ে মরছি।

সমরেশ বলিল—আচ্ছা, আমি আপনার লেখাটা পড়ে দেখব, আর আমার মতামত আপনাকে জানাব।

শুভা বলিল—আপনি সুযোগমতো পড়ে রাখবেন। আমিই নয় আপনার মতামতটা জেনে আসব।

চার

ঘরে গিয়াই সমরেশ শুভার লেখাটা পড়িতে লাগিল। চমৎকার হাতের লেখা, ভাষার বাঁধুনীও বেশ। দুই এক পৃষ্ঠা পড়িয়াই লেখাটা শেষ করিবার জন্য তার আগ্রহ হইল। আরম্ভটা মন্দ হয় নাই কিন্তু শেষের দিকে টেকনিকের ত্রুটিতে কতকটা মুন্সীয়ানার অভাব ঘটিয়াছে। পড়া শেষ করিয়া সমরেশ বুঝিল—সাধনা করিলে কালে এই লেখিকা যশ লাভ করিতে পারিবেন। সে মনে করিল সময়মত তাহার মতামত শুভাকে জানাইবে।

সমরেশের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়া শুভা আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মত লেখক শুভার গল্প পড়িয়া দেখিবেন বলিয়া আশ্বাস দেওয়ায় সে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল। এই উপলক্ষে তাহার সহিত আলাপ-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনায় তাহার মনে অভিনব শিহরণ জাগিয়া উঠিল!

সমরেশ শুভার দুই একটি কথাবার্ত্তা শুনিয়াই তাহাকে পরিচিত সাধারণ নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহার লেখায় তাহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। শুভার লেখাটির সম্বন্ধে তাহার মতামত জানাইবার জন্য তাহার মনও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া হিরণ্ময় কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল। সমরেশ দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া পাশের বাড়ীর দিকে চাহিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না। শুভাকে ডাকিয়া কিছু বলা অশোভন হইবে মনে করিয়া সে হিরণ্ময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বেলা দশটার সময় হিরণ্ময়ের গলার সাড়া পাইয়া সে সিঁড়ির কাছে আগাইয়া যাইতেই দেখিল আফিসের পোষাক পরিয়া হিরণ্ময় সিঁড়ির দিকে আসিতেছে এবং শুভাও তাহার পশ্চাতে আছে। সিঁড়ির কাছে আসিয়া হিরণ্ময় সমরেশের বাসার দিকে দৃষ্টি দিতেই তাহাকে দেখিতে পাইল, তখন সে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া বলিল, Good morning Sir! কলাসুন্দরী সাগরতীরের সুক্তি না শামুক কুড়িয়েছে দেখেছেন কি?

স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া শুভা সমরেশকে নমস্কার করিল এবং স্বামীর প্রশ্নের জবাব শুনিবার প্রত্যাশায় উৎসুক দৃষ্টিতে সমরেশের মুখের পানে তাকাইল।

সমরেশ হাসিয়া বলিল, আপনার অন্দরে সুক্তিই জমা হচ্ছে। তাতে মুক্তো ফলাবার জন্য স্বাতী-নক্ষত্রের সামান্য কিছু জল ছিটাবার দরকার।

তার মানে?

মানেটা যিনি সুক্তি এনে জমা করেছেন তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন, অর্থাৎ কাঠামো ঠিকই আছে, প্রতিমাও তৈরী, একটু রংয়ের তুলি বুলোবার দরকার।

হিরণ্ময়ের আফিসের বেলা হইয়াছিল, সে শুভার দিকে চাহিয়া বলিল, দেখো, আমি হলুম ভগ্নদূত, এবার

আমার রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়নের পালা। তোমার মুক্তির খবর আরো কিছু জানার থাকে তো নিজেই জেনে এসো। তারপর সে সমরেশকে বলল,—কি বলেন, এতে কি আপনার কোনো আপত্তি আছে? বলতে গেলে একই বাড়ী, আর আপনিও তো এর দাদারই মতো। ইহা বলিয়া হিরণ্ময় আফিসে চলিয়া গেল।

শুভা সমরেশকে বলিল,—শুনলেন তো ওঁর কথা? আপনি তো বিরক্ত হবেন না?

সমরেশ বলিল,—না, না, সেকি কথা!

ইহার পর শুভা সমরেশকে পুনরায় নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

পাঁচ

বৈকালে দোতলার বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া সমরেশ পেন্সিল দ্বারা একটা ডিজাইনের স্কেচ করিতেছিল, এমন সময় শুভা আসিয়া তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। সমরেশ তাহাকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবং পিসীমাকে ডাকিয়া আনিয়া আদর-যত্ন করিয়া তাহাকে বসাইল।

এইরূপ সাক্ষাৎ করার পর কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতে উভয়েরই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। সে সঙ্কোচের আড়ষ্টতা কাটাইয়া শুভাই প্রথমে কথা বলিল—আপনাকে একবার কষ্ট দিয়েছি, আবার কষ্ট দিতে এলুম। আমার পাগলামীর নমুনাটী কেমন দেখলেন বলুন।

সমরেশ বলিল,—আপনি নিজে এসেছেন ভালোই হলো। কোনো লেখার গুণাগুণ বিচার করতে গেলে লেখক-লেখিকার সঙ্গে আলোচনা করার অনেক সুফল আছে।

আমার লেখায় আপনি গুণ না অগুণ বেশী পেলেন, অকপটে আমাকে বলুন।

সমরেশ শুভার লেখার গুণের অনেক প্রশংসা করিল। তারপর লেখাটি আগাগোড়া পড়িতে পড়িতে কোথায় কি ত্রুটী ঘটিয়াছে তাহার সমালোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিল। এই সমালোচনার মধ্যে শুভা উৎসাহের বাণীও শুনিতে পাইল। সমরেশ বলিল,...আপনি সাধনা করতে থাকুন, আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ দৈববাণী আমি করতে পারি।

সমরেশের কথা আশীর্ব্বাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়া শুভা মাথা নোয়াইয়া তাহাকে প্রণাম করিল এবং ধীরে ধীরে বলিল,—আমাকে আপনার শিষ্যা হওয়ার ভরসা দিন তো, আমি সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারি।

সমরেশ হাসিয়া বলিল,—বেশ বেশ, আমাকে আপনি যে সাহায্য করতে বলেন, আমি তাই করতে রাজী আছি।

শুভা বলিল,—আমি মাঝে মাঝে এসে আপনাকে জ্বালাতন করব। আপনি আমাকে আপনার শিষ্যা হওয়ার উপযুক্ত করে নিন।

এ প্রস্তাবে সমরেশের কোনই আপত্তি ছিল না। তবু সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—হিরণ্ময় বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ের পরামর্শ করে নিলে ভালো হয় না?

ওঃ, বুঝেছি! শুভার শুভ্র দন্তপংক্তিতে পেলব ওষ্ঠাধরে যে হাসি ঠিকরাইয়া পড়িতে সমরেশ পূর্ব্বে দেখিয়াছিল, সেই হাসি যেন পরিস্ফুর্ত হইয়া শুভার সমগ্র মুখমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে সে বলিল—ওঁর কথা বলছেন? তাঁর মনে অবিশ্বাস নেই, চিত্তে দুর্ব্বলতা নেই, আপনি নিঃসংশয় হ'য়ে ভরসা দেন।

ইহার পর আর কোনো কথা চলে না। সমরেশ প্রফুল্লচিত্তে শুভার প্রস্তাব গ্রহণ করিল। স্থির হইল, সুযোগমত শুভা আসিয়া সমরেশের কাছে সাহিত্য সাধনা করিবে।

দিন দিন শুভার সাহিত্যসাধনা চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে লেখা আনিয়া সে সমরেশকে দেয়। সমরেশ তাহার গুণাগুণ বিচার করিয়া তাহাকে মতামত জানায়।

এইভাবে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। শুভার দু তিনটি লেখা ইতিমধ্যে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা যে সমরেশের শিক্ষার ফল, শুভা কৃতজ্ঞচিত্তে তাহাই মনে করিল।

সমরেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে হিরণ্ময়ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল—আপনি মশাই, যাদুকর। শামুকের মধ্যে মুক্তা ফলাতে জানেন।

ছয়

পাঁচছয় মাস পরে একদিন একটা লেখা দেখাইয়া লইয়া যাওয়ার সময় শুভা সমরেশকে বলিল—আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই। কয়েকমাস মায়ের কাছে গিয়ে কাটিয়ে আসব মনে করছি। এর মধ্যে হয়ত আপনার কাছে আসার সুযোগ হবে না। আমি যা লিখে রাখব, সব এনে পরে এক সময় আপনাকে দেখাব।

দুই-তিন দিন পরে শুভা চন্দননগরে পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। এতদিনের ঘনিষ্ঠতায় শুভার প্রতি স্নেহে সমরেশের অন্তর ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। পাশের বাড়ীর দিকে চাহিতে গেলেই শুভার অদর্শনের ব্যথা হৃদয়ে খচ্ করিয়া বিঁধে।

কলিকাতায় তখনও বোমার ভয় দূর হয় নাই। সমরেশের পরিবার দেশেই রহিয়া গিয়াছে। কয়েকমাস পরে সমরেশ স্ত্রীর অসুখের সংবাদ পাইয়া দেশে চলিয়া গেল। এবার পিসীমাও না গিয়া পারিলেন না।

মহিমও সঙ্গী হইল। সমরেশ হিরণ্ময়কে তাহার বাসার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গেল। দুইমাস রোগে ভুগিয়া সমরেশের স্ত্রী সুস্থ হইলেন। তারপর বড় মেয়ের বিবাহের চেষ্টায় সমরেশকে কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরিতে হইল। বড় মেয়ের বিবাহ দিয়া চারমাস পরে সমরেশ একাকী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। ব্যবস্থা হইল, আরো কিছুদিন পরে তাহার পরিবার ফিরিয়া আসিবে এবং এই কয়েটি দিন কোনো রকমে সে নিজের খাওয়াটা চালাইয়া লইবে।

সাত

ইতিমধ্যে শুভা পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সমরেশ কলিকাতায় নাই, স্বামীর নিকট সে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। তবু সমরেশের বাড়ীর দিকে চাহিয়া তাহার আগমন-প্রত্যাশায় সে উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

সমরেশ রাত্রে কলিকাতায় ফিরিয়াছে। পরদিন সকালে হাত-মুখ ধুইয়া সে উপরে উঠিবার সময় দেখিল শুভা একটি শিশুকে কোলে লইয়া সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া আছে। সমরেশ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—এই যে আপনি! কবে এলেন?

শুভা আগে সমরেশকে দেখিতে পায় নাই। ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া যে হাত দিয়া শিশুকে কোলে ধরিয়া রাখিয়াছিল তাহা একটু উপরে তুলিয়া অপর হাতখানির সহিত যুক্ত করিয়া সমরেশকে নমস্কার জানাইল এবং হাসিয়া বলিল—আপনি কবে এলেন? ভাল আছেন তো?

শুভার প্রশ্নের উত্তর দিয়া সমরেশ শিশুটিকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এটি কে? একে পেলেন কোত্থেকে?

মাতৃত্বের গৌরবে শুভার মুখমণ্ডলে রক্তিমাভা খেলিয়া গেল। সমরেশের কথার উত্তর মুখে দিতে পারিল না। চক্ষু নত করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিল।

সমরেশ বুঝিতে পারিল—শুভা পিত্রালয়ে কেন গিয়াছিল এবং তাহার শরীর কেন ভাল ছিল না।

শিশুটি মুখে একটি আঙ্গুল পুরিয়া চুষিতেছিল, তাহার মুখ দিয়া লালা পড়িয়া তাহার চিবুক ভাসাইয়া দিতেছিল। সে সমরেশকে দেখিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল। তারপর মায়ের কোলের উপরই নাচের ভঙ্গি করিয়া সমরেশের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

তাহা দেখিয়া সমরেশ শিশুটিকে বলিল—আমার কোলে আসবে? এস এস। সে হাত বাড়াইয়া শিশুটিকে নিজের কোলে টানিয়া আনিল এবং তাহার তুলতুলে গাল দুইটিতে চুমা দিতে লাগিল।

শুভা হাসিয়া বলিল—দেখলেন খোকার কাণ্ডটা! আর কেউ কোলে নিতে চাইলে ও চেঁচিয়ে অস্থির হয়, কিন্তু আপনার কোলে নিজেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল—যেন কতকালের আপনার জন।

সমরেশ খোকাকে আদর করিতে করিতে বলিল—কিহে খোকা, আমাকে চিনেছ? আমি তোমার কত কালের আপনার জন?—এ জন্মের, না, না পূর্ব্ব জন্মের? খোকার মুখে আঙ্গুল চোষার চুকচুক্ করিয়া শব্দ হইল। উহার দ্বারা যে কি উত্তর করিল কে জানে?

সমরেশ শুভাকে বলিল—দিব্যি সুন্দর খোকাটি তো পেয়েছেন, নামটি কি রাখলেন?

শুভা হাসিয়া বলিল—আপনাকেই ও বেশী আপন বলে চিনেছে, আপনিই নামটা ঠিক করে দিন না?

সমরেশ দু'একটা আধুনিক নাম বলিল। শুভা তাহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিল—আমি ও-সব আধুনিকতার পক্ষপাতী নই। বলবো একটা কথা? আপনার নামটা আমার বড়ই ভালো লাগে, ওর সঙ্গে মিল রেখে এর নাম করতে চাই অমরেশ—আধুনিকের সঙ্গে পৌরাণিকেরও মিশ্রণ হবে।

সমরেশ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে শুভার কথা সমর্থন করিল। বলল—বেশ বেশ! অমরেশ একেবারে দেবাদিদেব মহাদেব,—সকলের ওপরে। খোকার গালটি টিপিয়া তাহাকেও বলিল—কেমন খোকা, নামের মতো সকলের ওপরে উঠতে পারবে তো?

এই কথাবার্ত্তার সময় পুঁটি কখন আসিয়া কাকীমার পেছনে বারান্দার দেওয়াল ঘেষিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব্বে তাহার দিকে কাহারও চক্ষু পড়ে নাই, সমরেশের কোল হইতে খোকাকে ফিরাইয়া লইয়া ঘরে যাইবার সময় শুভা তাহাকে দেখিতে পাইল। ফিক্ করিয়া হাসিয়া পুঁটি মায়ের ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

আট

রাজলক্ষ্মী পুঁটির নিকট কি শুনিল, কে জানে? তক্ষুণি তাহার ঝঙ্কার শুনা গেল—তাই বল, পুঁটি, আপনার জন চিনেছে! কথায় বলে—

জ্যেঠা খুড়ো গেল ভেসে।
আপন হোলো মেধো এসে॥

—এও তো দেখছি তাই। আপনার জন চিনেছে। নামটাও হবে মিল রেখে! রাজলক্ষ্মীর উচ্চহাস্য শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে আবার বলিয়া উঠিল—ভাগ্যিস, পুঁটি, তুই শুনেছিলি। আমিও তো ভাবছিলুম—বিশ বছর গেল, পঁচিশ গেল, তিরিশ বছর বয়সে ষষ্ঠীতলায়

াঁখ বেজে উঠল কেন? ন্যাখাপড়া হচ্ছিল গো, ন্যাখা-পড়া হচ্ছিল, আর সেই সময়েই মা ষষ্ঠীর দয়া হলো, কথায় বলে—ডুবে ডুবে জল খায়, একাদশীর বাপেও জানে না। ভাগ্যিস, পুঁটি, তুই শুনেছিলি। ঝঁ্যাটা মারি অমন মা-ব্যাটার মুখে।

বড় জায়ের কুৎসিত ইঙ্গিতটা তপ্তশলাকার ন্যায় শুভার কর্ণরন্ধ্র ভেদ করিল। সে স্তম্ভিত হইয়া খোকাকে কোলে করিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজলক্ষ্মীর বাজখাঁই-গলার কখনও মৃদু আওয়াজ বাহির হইত না। তার উপর যাহা সে বলিতেছিল তাহা পাড়ায় ঘোষণা করিতে পারিলেই সে সুখী হয়; তাই গলনালী যথাসম্ভব স্ফীত করিয়াই সে শুভার উদ্দেশে তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।

ঘর হইতে সমরেশও রাজলক্ষ্মীর কথা শুনিতে পাইল। তখন লজ্জায় ও বিরক্তিতে তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল।

কিন্তু একবার ঝঙ্কার করিয়াই রাজলক্ষ্মী নিরস্ত হইবার মানুষ নহে। বৈকালে গৃহকার্য্য করিতে করিতে আর এক দফা শ্লেষ-ইঙ্গিতে সে বাড়ী সরগরম করিয়া তুলিল। শুভার ছেলেকে অন্য কেহ কোলে নিতে চাইলে কেন যে সে কাঁদিয়া উঠে, জ্যোঠিমার নিকট সে রহস্য এখন উদ্-ঘাটিত হইল। সন্ধ্যার আগে সে আর একবার ধুঁয়া ধরিল—ভাগ্যিস পুঁটি, তুই শুনেছিলি! ঐ যে কথায় বলে না—

জ্যেঠা খুড়ো গেল ভেসে।
আপন হোলো মেধো এসে॥

মুখরোচক কথাটি পাড়ার দশজনকে না শোনাইলে মনের সাধই বা মিটিবে কেন? খাওয়া-দাওয়ার পর রাজলক্ষ্মী এক এক দিন এক একজন পড়শীকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খোকার ও তাহার মায়ের উদ্দেশে কুৎসিত ইঙ্গিত করিতে লাগিল।

হাসিয়া হাসিয়া পাড়া-পড়শীরাও মহানন্দে যেন এক তামাসা উপভোগ করিতে লাগিল। সমরেশের নামটা রাজলক্ষ্মী মুখে উচ্চারণ করিল না বটে, কিন্তু ন্যাখা পড়ার অর্থে তাহার কথা সকলেই বুঝিতে পারিল।

দিনের পর দিন এই কটূক্তি শুভার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। সমরেশও প্রত্যহ তাহা শুনিতে পাইত।

সমস্ত কথা হিরণ্ময়কে শুনাইবার জন্য শুভার একান্ত বাসনা হইতেছিল। কিন্তু দারুণ সঙ্কোচে ও বেদনায় সে নিজে মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। দুই তিন দিন পরে একদিন রাত্রে হিরণ্ময় রাজলক্ষ্মীর ঝঙ্কার শুনিয়া ব্যাপারটা জানিতে পারিল। সে শুভাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—তুমি দুঃখ করো না। সতী-সাধ্বী সীতারও অপবাদ ঘটেছিল। আমি, জানি তুমি সাধ্বী। ওপরে ভগবান্ আছেন, তাঁর দিকে চেয়ে এ সব ঘৃণিত কথা তুচ্ছ কোরো।

সমরেশকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেহই ছিল না। শুভা বুঝিতে পারিয়াছিল—বড়-জায়ের কথা তাহারও কান এড়ায় নাই। তাহাকে কি করিয়া সে মুখ দেখাইবে; তাহা ভাবিয়াও তাহার লজ্জার অবধি রহিল না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাহার অধিক দুঃখ হইল—কোলের খোকার জন্য। এই নিষ্পাপ শিশু যখন সব বুঝিতে পারিবে, তখন এই মিথ্যা কলঙ্ক-কাহিনী শুনিতে পাইলে তাহার অবস্থা কি হইবে? খোকার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভাবিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। বড় জায়ের গলা শুনিলেই সে শিহরিয়া উঠে। শুভা ভাবিল, এইভাবে আরো কিছুদিন থাকিলে হয়ত সে পাগল হইয়া যাইবে।

স্বামীর সান্ত্বনা-বাক্য শোনার পর নিজের জন্য তাহার বিশেষ দুর্ভাবনা ছিল না কিন্তু খোকাকে অপবিত্র আবেষ্টনী হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য তাহার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। মাতার কলঙ্কে পিতারও কলঙ্ক, ইহা মনে করিয়া সে তাহার স্বামীকেও অপমান হইতে বাঁচাইতে চাহিল। কিন্তু সে ভাবিয়া পাইতেছিল না—এই বিপদে তাহার খোকার আশ্রয়স্থল কোথায়?

কয়েকদিন চিন্তার পর তাহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। এই কয়েকদিনের মধ্যে লজ্জায় সে সমরেশের বাড়ীর দিকেও তাকাইতে পারে নাই। আজ দুপুরে খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া সে ধীরে ধীরে সমরেশের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল।

সমরেশ ঘরের ভিতরে বসিয়া কি লিখিতেছিল। শুভা ঘরের ভিতরে গিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। সমরেশ চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাইতেই তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন ঝরণা-ধারার ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শুভা সমরেশের পায়ের গোড়ায় মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রন্দনের আবেগে শুভার মাথার কাপড় সরিয়া পড়িয়াছিল। সমরেশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদুস্বরে বলিল—আমি সব শুনেছি। উচ্ছ্বাসের প্রথমবেগে শুভার মুখে কথা ফুটিতেছিল না। সমরেশের সামান্য দুটি কথা—আমি সব শুনেছি—শুনিয়া উহার মধ্যে সে যেন সহানুভূতিপূর্ণ পরম আশ্রয়ের সন্ধান পাইল। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত চোখ দুইটি তুলিয়া সমরেশের মুখের পানে চাহিয়া সে বলিল—আপনি আমার গুরু—জ্ঞানে গুরু, বয়সে গুরু, ধর্ম্মে গুরু, কর্ম্মে গুরু—আপনি আমাকে বিপদ হ'তে রক্ষা করুন।

আপার চরণতলে বসে এতদিন অনেক শিক্ষা পেয়েছি, আজ শিক্ষা দিন, আমার নিরপরাধ খোকাকে কি করে রক্ষা করব।

মনের কথা বুঝাইবার জন্য সে স্পষ্ট করিয়াই বলিতে লাগিল—খোকা এখন ছোট আছে, হয়ত কিছুই বুঝবে না। কিন্তু একদিন সে তো বড় হয়ে উঠবে, তখন মায়ের অপমান সে কি করে সহ্য করবে? আমিই বা ছেলেকে মুখ দেখাব কেমন করে? কলঙ্কের দূষিত বায়ুমণ্ডল হতে আমি তাকে দূরে রাখতে চাই। এ ভার আপনি গ্রহণ করুন।

সমরেশ শুভার বক্তব্য ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া শুভা পুনরায় বলিল—আপনাকে আমি আমার খোকাকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাই। আমার এ দক্ষিণা গ্রহণ ক'রে আপনি নিষ্কলঙ্ক শিশুকে রক্ষা করুন।

সমরেশ এবার শুভার কথা বুঝিতে পারিল। সে বলিল—খোকাকে আপনি আমাকে দিতে চান? আপনার স্বামীরও কি সেই মত? আর তাকে আমি নিলে আপনার বাড়ীর লোক-জনেরা কি আপনাকে অপমান হতে রেহাই দেবে?

শুভা বলিল—আমার স্বামীর জন্য আমার ভয় নেই। তিনি সদাশিব, আমাকে তিনি অবিশ্বাস করেন না, খোকার মঙ্গলের জন্য আমার কথা ঠেলবেনও না। সে সব ব্যবস্থা আমি করবো। তারপর বাড়ীর লোকজনের কথা? তাঁরা যে অপমান করতে চাইবেন, তা যাতে কাউকে স্পর্শ না করতে পারে—তার ব্যবস্থাও করবো। আপনি শুধু কথা দিন, আমার গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করলেন।

শুভার উদ্দেশ্য সম্যক বুঝিতে না পারিয়াও সমরেশ তাহাকে আশ্বাস দিল, তার অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না।

শুভা দুই হাতে সমরেশের পায়ের ধূলা নিয়া তাহার মুখের দিকে সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া গাত্রোত্থান করিল। তারপর ধীরপদে সেস্থান হইতে নিজের গৃহে চলিয়া গেল।

নয়

সমরেশ সেদিন আর বাড়ীর বাহির হইল না, ঘরে বসিয়া শুভার কথাই ভাবিতে লাগিল। সে লক্ষ্য করিয়াছিল—এই কয়েকদিনে শুভার মুখখানি যেন চুপসিয়া গিয়াছে; চোখের কোলে যেন কালি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। শুভার জন্য তাহার বড়ই দুশ্চিন্তা হইল। তাহার মনে বারংবার এক অজ্ঞাত আশঙ্কাও যেন জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সে একবার ভাবিল, কলিকাতায় আসিবার জন্য তাহার স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করিয়া দেয়। সে কাছে থাকিলে হয় তো তাহার নিজের মনেও বল পাইবে। কিন্তু তখন রাত্রি হইয়া পড়িয়াছে। টেলিগ্রামের ব্যবস্থা পরদিন করিবে মনে করিয়া সে শুইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে শুনিতে পাইল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া সমরেশ সিঁড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, শুভার শোবার ঘরে তাহার বাড়ীর সমস্তলোক জড়ো হইয়া কাঁদিতেছে, আর হিরণ্ময় পাগলের মতো এক একবার উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিতেছে।

ভব্যতা ও সংকোচের সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিয়া সমরেশ দ্রুতপদে শুভার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখে শুভার দেহ মেঝের উপর লম্বমান হইয়া আছে—সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার মৃতদেহ নীচে নামাইয়া বাড়ীর সকলে তাহাকে ঘিরিয়া রোদন করিতেছে।

খোকার দিকে কেহই দৃষ্টি দিতেছিল না। গোলমালে সে জাগিয়া উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছিল। সমরেশ শুভার মুখের দিকে একবার অপলক দৃষ্টি দিয়া বিছানার উপর হইতে খোকাকে তুলিয়া লইল। তারপর সে আর সেখানে থাকিতে পারিল না। সিড়ির কাছে আসিয়া খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুভার গুরু-দক্ষিণার কথা বারবার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িয়া খোকার মাথা ভিজিয়া গেল।

দশ

স্বামী ও বাড়ীর লোকজনের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করার কথা শুভা সমরেশকে বলিয়াছিল তাহা সময়মতোই সে করিয়া রাখিয়াছিল। হিরণ্ময় ও রাজলক্ষ্মীর নামে দুই-খানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। তাহাতে সমস্ত কথাই সে খুলিয়া লিখিয়াছিল; আর, তাহার শেষ অনুরোধ জনাইয়াছিল—সে যে গুরুদক্ষিণা দিয়া গেল তাহাতে যেন কেউ বাধা না জন্মায়।

হিরণ্ময় পত্নীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করিল। শুভার আত্মহত্যার ফলে হয়তো রাজলক্ষ্মীরও চোখ ফুটিয়াছিল। সেই হইতে তাহার উচ্চস্বরও আর কখনও শুনা যাইত না।

সমরেশ শুভার স্মৃতি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। যে বাড়ীতে এতদিন সে কাটাইয়াছে সেখানে থাকিলে অহরহঃ তাহার চিত্তে তুষানল জ্বলিতে থাকে। সেইজন্য সেই বাসা ছাড়িয়া দূরে নূতন এক বাসায় উঠিয়া গেল।

তার পরদিনই সমরেশ টেলিগ্রাম করিয়া পরিবার কলিকাতায় আনাইল এবং খোকাকে স্ত্রীর কোলে দিয়া বলিল—মৃত মাতার পাশে শিশুটী পড়িয়া ছিল, সে পথে পাইয়া কুড়াইয়া আনিয়াছে।

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

দেশবন্ধু—সুভাষ

ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৯২৮ সালে কলিকাতায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার পরই সুভাষচন্দ্র অগ্রগামীদলের অবিসম্বাদী নেতা হইয়া পড়িলেন। ইহার অল্প দিন মধ্যেই তিনি পাবনা সহরে যুব সম্মিলনীর সভাপতি হন। সম্মিলনীর অধিবেশন হয় ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯, ২৭ সালে এই সময়ে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতেই তাঁহার অগ্রগতিসূচক মনোভাব প্রকটিত হয় এবং তদনুযায়ী কর্ম্মপন্থাও তিনি নির্দ্ধারিত করেন। সুভাষচন্দ্রের মনোভাব জ্ঞাপক অভিভাষণের কথাগুলি পাঠকের অবগতির জন্য এইখানে হুবহু উঠাইয়া দিলাম—

"কর্ম্মসংগ্রামে আত্মবলিদান"

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

মাননীয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও মহিলাগণ, পাবনা জেলার যুব-সম্মেলনীর সভাপতিপদ প্রদান করিয়া আমাকে যে সম্মান দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনাদের এই প্রসিদ্ধ নগরীতে আসিবার সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আমার কখন হয় নাই; যদিও এখানে আসার বাসনা বহুদিন হইতে মনের মধ্যে ছিল। আজ এই বাসনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে জটিল সমস্যা যখনই উপস্থিত হইয়াছে এবং মতানৈক্য যখন মনোমালিন্যে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে,এইরূপ সময়ে একাধিকবার এই প্রসিদ্ধ নগরীতে মীমাংসা ঘটিয়াছে। আজ দেশের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমি আশা করি যে, জাতীয় সমস্যার সমাধানে প্রবীণ ও বিচক্ষণ পাবনা জিলাবাসী যাবতীয় দেশহিতকর কর্ম্মপ্রচেষ্টায় অগ্রণী হইয়া পথ-প্রদর্শকের কাজ করিবেন।

চারিদিকে জীবনের স্পন্দন

যখন চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেশ বিদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন কি দেখিতে পাই?—দেখিতে পাই চারিদিকে জীবনের স্পন্দন, জাগরণের সমুদয় লক্ষণ ও নবসৃষ্টির উন্মেষ। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে। দুর্ব্বলতা, অবিশ্বাস ও ক্লৈব্য পরিহার করিয়া সে আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতেছে। ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী যাহারা সেই তরুণ সম্প্রদায় আজ নিশ্চেষ্ট নয়। তাহারা আজ অধিকার লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছে। তরুণের এই নব জাগরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন ঘটনা নয়; ইহাকে পাশ্চাত্য বস্তুজ্ঞান করিলে আমরা অন্যায় করিব। সকল দেশে ও সকল যুগে ধ্বংস ও সৃষ্টির আবশ্যকতা যখনই ঘটিয়াছে তখনই তরুণের প্রাণ জাগিয়াছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন বজ্রনির্ঘোষে বলিয়াছিলেন—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ," তখন তাঁহার ভিতর দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ-শক্তির বাণী প্রকট হইয়াছিল। তাই গত বৎসর নাগপুরে তরুণদের সভায় আমি একদিন বলিয়াছিলাম, "The voice of Krishna was the voice of immortal youth"। ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুন ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন; ক্ষণেকের জন্য তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে ধ্বংস বিনা সৃষ্টি হইতে পারে না; তাই শ্রীমদ্‌ভগবৎ গীতার সাহায্যে তাঁহাকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে, কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানের উপরই ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

তরুণের আদর্শ

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে—তরুণের আদর্শ কি? তরুণের আদর্শ—বর্ত্তমানের সকল প্রকার বন্ধন, অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ ও নূতন জাতি সৃষ্টি করা। প্রাচীনের ও বর্ত্তমানের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সুদূরের সন্ধান পাইবার জন্য মানবের দৃষ্টি অতি আদিম কাল হইতে উৎসুক আছে। শুধু তাই নয়, সুদূরের স্বপ্নকে বাস্তবের মধ্যে মূর্ত্ত করিবার চেষ্টা মানবজাতি বারবার করিয়াছে। এই প্রেরণার ফলে অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এবং প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটীশ, প্লেটো প্রভৃতি মণীষিবৃন্দের অভ্যুদয় হয়।

তরুণ প্রাণের লক্ষণ

আমরা মনে করিতে পারি যে, তরুণদের রচিত যে কোন প্রতিষ্ঠান—যেমন সেবাসমিতি—যুবক সমিতি বা তরুণসঙ্ঘ আখ্যা পাইবার যোগ্য, কিন্তু এ ধারণ ভ্রান্ত। যে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের মূলে স্বাধীন চিন্তা ও নূতন প্রেরণা নাই, সে প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন তরুণের প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন অভিহিত হইতে পারে না। তরুণ প্রাণের লক্ষণ কি?—লক্ষণ এই যে, সে বর্ত্তমানকে বা বাস্তবকে অখণ্ডসত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, সে বন্ধনের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে চায় এবং সে চায় আনিতে ধ্বংসের মহাশ্মশানের বুকে সৃষ্টির অবিরাম তাণ্ডবনৃত্য। ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলার মধ্যে যে আত্মহারা হইতে পারে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই তরুণ। তারুণ্য যার আছে সে ধ্বংস ও সংগ্রামের ছায়া দর্শনে ভীত হয় না অথবা নব সৃষ্টিরূপ কার্য্যে অপারগ হয় না। বৃদ্ধ হইয়াও মানুষ তরুণ হইতে পারে যদি তার সবুজ প্রাণ থাকে আর তরুণ হইয়াও মানুষ বৃদ্ধ হইতে পারে যদি তার অবস্থা হয় "বৃদ্ধত্বম্ জরসা বিনা।"

আত্মবিস্মৃত তরুণ শক্তি

বহুদিন যাবৎ তরুণশক্তি আত্মবিস্মৃত ছিল, তাই কলুর বলদের মত সে পরের কশাঘাত খাইয়া পরের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছে—এবং দায়িত্বভার অপরের হাতে তুলিয়া দিয়া অন্ধের মত কাজ করিয়া আসিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত এরূপ অবস্থায় সমাজের ও জাতির ক্রমিক উন্নতি ঘটিয়াছে, ততদিন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন গোলমাল সৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু যে দেশে বা যে যুগে নেতৃবর্গের অযোগ্যতার জন্য সমাজের ও জাতির দুর্গতি ঘটিয়াছে সেখানে তরুণ সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়াছে; সুলতানের হাতে সমস্ত শক্তি ও কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়া তুর্কি জাতি যখন ক্রমশঃ অধোগতির মুখে চলিতে লাগিল, তখন বিদ্রোহী তুর্কি-তরুণেরা নব্য তুর্কিদলের প্রতিষ্ঠা করে। সম্রাট কাইজার ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ যখন সেনাপতিকুলের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া দিল, তরুণ জার্ম্মাণী তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না—বিশেষ করিয়া যখন তরুণ জার্ম্মাণেরা দেখিল যে, তাহাদের নেতৃত্বের ফলে মহাযুদ্ধের সমগ্র জার্ম্মাণ জাতিকে পরাজয়ের লাঞ্ছনা ও দৈন্য বরণ করিতে হইল তখন জার্ম্মাণীতে তরুণের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল। মাঞ্চুরাজ-বংশকে স্বীয় ভাগ্যনিয়ন্তা করিবার ফলে সমগ্র চীন জাতি যখন শৌর্য্য, বীর্য্য, স্বাধীনতা ও সম্পদ হারাইতে লাগিল, তখন চীন দেশে তরুণের জাগরণ আরম্ভ হইল। যে পরিমাণে তরুণ সম্প্রদায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া পাইয়াছে এবং দায়িত্বজ্ঞান-প্রণোদিত হইয়া ও সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল হইয়া স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, সেই পরিমাণে তরুণ আন্দোলনের প্রসার হইয়াছে। আজও যে আমরা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তরুণের জাগরণ দেখিতেছি, তাহার অর্থ—এই ভারতের তরুণশক্তি আত্মবিশ্বাসী হইয়াছে, স্বীয় জাতির উদ্ধার সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছে এবং আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রনীতি ও যুব-আন্দোলন

কেহ কেহ অজ্ঞতা বশতঃ মনে করিয়া থাকেন যে, যুব আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের নামান্তর মাত্র—কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। ফুল যখন ফোটে তখন প্রত্যেক পাপ্‌ড়ির মধ্যে তার সুষমা ও সৌরভ আত্মপ্রকাশ লাভ করে। বহুদিন শয্যাশায়ী থাকার পর মানুষ যখন পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়, তখন শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের ভিতর দিয়া শক্তি, তেজ ও প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠে। শৈশব ও কৈশোর পার হইয়া আমরা যখন যৌবন রাজ্যে অভিষিক্ত হই, তখন প্রকৃতিদেবী সকল সম্পদে আমাদিগকে ভূষিত করেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক তেজ, নৈতিক বল, শৌর্য্য, বীর্য্য—সব দিক দিয়া আমরা মানুষ হইয়া উঠি। ব্যক্তির জীবনে যতগুলি দিক আছে এবং জাতির জীবনে যতগুলি দিক আছে—ততগুলি দিক আছে যুব-আন্দোলনের। এই বিচিত্র আন্দোলনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে কোনও রূপের সমষ্টিতে যে অভিনব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় তাহাই যুবক মাত্রেরই কাম্য ও সাধ্য। যুব-আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন নয়, কিন্তু তা বলিয়া non-political নয়; রাজনীতি বর্জ্জন করা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এই আন্দোলনে রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে, যেমন জাতীয় আন্দোলনেও রাষ্ট্রনীতির স্থান আছে। কিন্তু তার জন্য আমরা বলিতে পারি না যে, জাতীয় আন্দোলন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন মাত্র।

জাতীয় জীবন-বিকাশ

কাব্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যায়াম ক্রীড়া, সমাজ ও রাষ্ট্র এই সবের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সবের ভিতর দিয়া তরুণের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। অন্তরের প্রাণ যখন জাগে, তখন সুপ্তোত্থিত প্রাণধারা শতমুখী হইয়া নিজেকে প্রকট করে। কোন্ মন্ত্রবলে সুপ্তশক্তির বোধন হইতে পারে, তাহাই অনুসন্ধানের বিষয়।

বিভিন্ন মতবাদ

অনেকের ধারণা যে, জনসাধারণকে বা তরুণসমাজকে জাগাইতে হইলে রাষ্ট্র বা সমাজ সম্পর্কীয় কোনও মতবাদ প্রচার করিতেই হইবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের আদর্শ কি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে আজকাল অনেক প্রকার মতবাদ (বা "Ism") প্রচলিত আছে—যথা Anarchism, Socialism, Communism, Bolshevism, Syndicalism, Republicanism, Constitutional monarchy, Fascism ইত্যাদি। এক একটী "Ism"এর গোঁড়া ভক্তেরা মনে করেন যে, ঐ মতে প্রতিষ্ঠা হইলে পৃথিবীর সকল দুঃখ দূর হইবে। আজকাল তাই কোনও কোনও দেশে "ism"এর লড়াই খুব ঘনাইয়া উঠিয়াছে। আমার নিজের কিন্তু মনে হয় যে, কোনও ism এর বা মতবাদের দ্বারা মানব জাতির উদ্ধার হইতে পারে না যদি সর্ব্বাগ্রে আমরা মানুষোচিত চরিত্রবল লাভ না করিতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন—man-making is my mission—মানুষ তৈরী করা আমার জীবনের

উদ্দেশ্য। জাতিগঠনের এবং "ism" প্রতিষ্ঠার ভিত্তি—খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে সব দিক দিয়া তাহার বিকাশ হওয়া চাই। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, যুব আন্দোলনের সহিত Socialism বা সমাজতন্ত্রবাদের অভেদ প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়, সব "ism"-এর মূলে যে সমস্যা—সেই সমস্যার সমাধান করা যুব আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ।

আন্দোলনের দুইটি দিক

তরুণ-আন্দোলনের দুইটী দিক আছে—আন্তর্জ্জাতিকতার দিক ও জাতীয়তার দিক। আন্তর্জ্জাতিকতার দিক হইতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য—বিশ্বমানবকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা। দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে মানুষে মানুষে যে ভাইএর সম্বন্ধ—এই ভাব তরুণ-আন্দোলনের দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক যুব-সম্মেলনের অধিবেশন এই ভাব সঞ্চারের সহায়তা করিয়া থাকে। আজ আমরা তরুণ-জাতি অনুভব করিয়াছে যে, সব দেশে ও সব যুগে তরুণের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও অনুভূতি মূলতঃ একই। বিশ্বের তরুণ-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আত্মীয়তা ও অভেদাত্ম-ভাব ঘনীভূত হইলে ইহার প্রভাব যে কতদূর পৌছিবে, তাহা চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপন

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ-বহ্নি এখনও প্রজ্বলিত আছে, তাহা যদি নির্ব্বাপিত করিতে হয়, তাহা হইলে দেশে দেশে যুব-আন্দোলনের প্রসার হওয়া উচিত। বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহ না হয় এবং পৃথিবীতে যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয়, এই উদ্দেশ্যে অনেক দেশের তরুণেরা সংঘবদ্ধ হইতেছে। তরুণেরা এতদিন পরে বুঝিতে পারিয়াছে যে, কূটরাজনীতিবিৎদের হাতে তাঁহারা ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত। কামান বন্দুকের সম্মুখে তাহাদিগকেই বারে বারে অগ্রসর হইয়া আত্ম-বলিদান করিতে হইবে—অথচ এমন অনেক যুদ্ধ হয়—যাহা শুধু কূটচক্রান্তের ফল এবং তাহার দ্বারা কোনও জাতির প্রকৃত কল্যাণ হয় না। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা এখন ব্যর্থ হইবেই হইবে; কারণ আজ অনেক জাতি শৃঙ্খলিত ও পরপদদলিত। যে পর্য্যন্ত তাহারা সকলে মুক্ত না হইতেছে—সে পর্য্যন্ত শান্তির অর্থ—দাসত্ব ও পরাধীনতা। তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি কোনও দিন পৃথিবীতে শান্তি সংস্থাপিত হয়—তবে বিশ্বের তরুণ সমাজই তাহা স্থাপনা করিবে।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ

শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা ব্যতীত অন্যান্য অনেক বিষয়ে দেশ বিদেশের তরুণেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে শিখিবে। মানুষের স্বভাব—সব দেশেই মোটের উপর একই রকম এবং মানব-জীবনের সমস্যাগুলি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বযুগে প্রায় একই প্রকার। এ অবস্থায় বিভিন্ন দেশের তরুণ সমাজ আন্তর্জ্জাতিকতার সূত্রে আবদ্ধ হইলে যে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারে, একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

নূতন জাতি গঠন

জাতীয়তার দিক হইতে যুব-আন্দোলনের উদ্দেশ্য নূতন আদর্শে নূতন জাতি গড়িয়া তোলা। নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে হইলে জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতনের নিয়ম বা কারণ প্রথমে আবিষ্কার করিতে হইবে। আমরা মনে করিতে পারি যে, প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতির যে অভ্যুত্থান ও পতন দেখা যাইতেছে, ইহার পশ্চাতে বিধির কোন বিধান নাই। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বহু চিন্তা ও গবেষণা হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই অভ্যুত্থান ও পতনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করিনা। তাঁহাদের গবেষণার সার মর্ম্ম এই যে, ব্যক্তির জীবনে যেরূপ জন্ম, মৃত্যু ও বিকাশ আছে—জাতির জীবনেও তদ্রূপ জন্ম, উন্নতি ও মৃত্যু আছে। জীবনী শক্তি হ্রাস পাইলে ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জাতিও তদ্রূপ মুমূর্ষু হইয়া পড়ে—কখনও জাতিবিশেষ ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মাত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। কখনও বা জাতিবিশেষ একেবারে বিলুপ্ত না হইয়া নররূপ পশুর মত কোন প্রকারে জীবন ধারন করিতে থাকে। যে জাতি নিতান্ত ভাগ্যবান, সে জাতি মৃত্যুর দ্বারদেশে উপনীত হইয়াও আবার পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। কিরূপ অবস্থায় জাতির পুনর্জ্জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহাও কোন কোন বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিভিন্ন জাতীয় রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এবং বিভিন্ন শিক্ষার (culture) সংস্পর্শের ফলে জাতির এবং জাতীয় সভ্যতার পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের বাণী আমরা গ্রহণ করি—আর না করি—একথা বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির আগমনের ফলে এই ভারতভূমি বিভিন্ন শিক্ষা-ধারার মঙ্গলস্থলে পরিণত হইয়াছে। হয়ত, এই সংমিশ্রণের দরুণই ভারতীয় জাতি ও ভারতীয় সভ্যতা বারবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছে এবং তাহারই ফলে এই প্রাচীন জাতি অমর হইয়া পৃথিবীর বক্ষে বাস করিতেছে।

চিন্তাজগতে বিপ্লব

বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে রক্ত সংমিশ্রণের পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের মত যাহা হউক না কেন, এ কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে, বিভিন্ন সভ্যতার ও শিক্ষার (culture) সংঘর্ষের দরুণ চিন্তাজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবই জাতির চৈতন্যের লক্ষণ। ইংরাজ এদেশে আসার পর আমাদের চিন্তাজগতে একটি বড়রকমের ওলট-পালট হইয়াছিল। ইহাই বর্ত্তমান জাগরণের সূত্রপাত। তারপর আমরা অন্তর্দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়াছি। নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার সহিত একদিকে আমাদের প্রাচীন অবস্থা তুলনা করিয়াছি এবং অপর দিকে স্বাধীন উন্নত জাতির অবস্থা তুলনা করিয়াছি। নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থার হানিতা ও লাঞ্ছনার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা গৌরবময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে শিখিয়াছি, তাহা আমাদের

গৌরবময় অতীত হইতেও অধিক গরিমাময়। এই মত বা আদর্শবাদের মধ্যে সৃষ্টির বীজ লুক্কায়িত। জাতিকে যদি জাগাইতে হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানের প্রতি প্রবল অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এক উচ্চ আদর্শের ধ্যান করিতে শিখাইতে হইবে। তাই আমাদের যুব-আন্দোলনের এক দিকে আছে—অসন্তোষ আর এক দিকে আছে—আদর্শের আকর্ষণ।

মূল আদর্শ

কোন মতবাদকে ভিত্তি করিয়া আমরা নূতন সমাজ গড়িবার চেষ্টা করিব এবিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। আমি এ ক্ষেত্রে এ আলোচনায় প্রবেশ করিব না ; আমি শুধু মূল আদর্শের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যে মতবাদ বা ism আপনি গ্রহণ করুন না কেন, তাহা যদি সার্থক করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে অতীত ইতিহাসের ধারা, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চারিদিকের আবহাওয়া স্মরণ করিয়া কাজ করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমি বলিতে চাই যে, কার্লমার্ক্সের নীতি কাজে পরিণত করিবার সময় বর্ত্তমান রুশ জাতি বা বলশেভিকগণ এমন পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যাহা প্রকৃত পক্ষে কার্ল মার্কসের মূল নীতির বিরোধী। অনেকের শঙ্কা আছে যে, Socialism অথবা Republicanism বুঝি বা পাশ্চাত্ত্য সামগ্রী, কিন্তু এধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। Socialism ও Republicanism প্রাচীন ভারতে অবিদিত ছিল না, এমন কি বর্ত্তমান যুগে ভারতের কোন কোন নিভৃত প্রান্তে তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিশ্বমানবের মতবাদ

এই সব মতবাদ বা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যও নয় অথবা পাশ্চাত্ত্যও নয়—ইহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি। ভারত আজ যদি কায়মনোবাক্যে Socialism গ্রহণ করিতে সংকল্প করে; তাহা হইলেই যে ভারত বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে, সে আশঙ্কা আমি করি না ; কিন্তু যে ism বা মতবাদ আমরা গ্রহণ করি না কেন, ইতিহাসের ধারা ও বর্ত্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা করিলে আমাদের সৃষ্টিকার্য্য কখনও সার্থক বা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে না।

ভারতের অবনতির কারণ

আজ ভারতের এই অবস্থা কেন? আছে তো সবই—প্রকৃতি, সৌন্দর্য্য, শারীরিক বল, শিক্ষা, দীক্ষা, শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধি—এর কোনটীর তো অভাব নাই ; এইসব উপাদান লইয়া আমরা এক নিখুঁত মূর্ত্তি রচনা করিতে পারি, কিন্তু প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথায়? প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দিন—যেদিন সমগ্র জাতির মধ্যে মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইবে। কোথায় সে পুরোহিত যে মৃত্যু সঞ্জীবনী সুধা আহরণ করিয়া মুমূর্ষু জাতির দেহ-পিঞ্জরের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? যে ব্যক্তি মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য এবং জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অপরকে পাগল করিতে পারে এবং সেই ব্যক্তিই জাতীয় যজ্ঞের পুরোহিত হইবার যোগ্য। আমাদের এই যুব আন্দোলন এইরূপ শত সহস্র পুরোহিত সৃষ্টি করুক।

আত্ম-বলিদান চাই

আমাদের আছে সবই, নাই শুধু এক বস্তু—নিঃশেষে আত্ম-বলিদান—সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাবতীয় বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া একই আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অনুধাবনের ক্ষমতা এই ক্ষমতা, এই tenacity of purpose আমাদের নাই, ইংরাজের আছে—তাই ইংরাজেরা এত বড় আর আমরা এত হীন। আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসি না, তাই আমরা করি গৃহবিবাদ, তাই আমাদের জন্মায় মিরজাফর ও উমিচাঁদ ; মিরজাফর ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই—এখনও তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি, তাহা হইতে আত্ম-বলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা—tenacity of purpose, আসিবে এই দুইটী বল—tenacity of purpose বা moral stamina, কোথায় পাইব? বনে জঙ্গলে যুগ-যুগান্তর তপস্যা করিলেও পাইব না। পাইব নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্যে জীবন ঢালিয়া দিলে—অবিরাম সংসারে লিপ্ত হইলে। ঘরের কোণে বসিয়া উপাসনা করিলেই বা সংসার সমাজ ত্যাগ করিলে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে—সাধনা বা শক্তি সঞ্চয় হয় না।

"শক্তিপূজা কথার কথা না,
যদি কথার কথা হ'ত,
তবে চিরদিন ভারতও
শক্তিপূজে শক্তিহীন কভু হ'ত না।"

সাধনার স্বরূপ তাই স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এইভাবে, "পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়, তাহা না ডরাক তোমা,—চূর্ণ হোক স্বার্থ, সাধ, মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।" এই কর্ম্ম-সংগ্রামে অবিরতভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে শক্তিলাভ হইবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই পৃথিবীর স্বাধীন জাতিরা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের তরুণ সমাজ এই পথে চলুক তাহা হইলে আমরা ফিরিয়া পাইব আমাদের লুপ্ত গৌরব, ফিরিয়া পাইব আমাদের প্রাচীন বৈভব, ফিরিয়া পাইব আমাদের স্বাধীনতার ঐশ্বর্য্য আর বিশ্বের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে আবার শির উন্নত করিয়া মানুষের মত চলিতে শিখিব।

বন্দেমাতরম্

(২)

বাঙ্গলার কথা

গত মাঘ মাসের 'দেশবন্ধু-সুভাষ' প্রসঙ্গে বাঙ্গলার কথা সম্বন্ধে একটী বিস্তারিত ইতিহাস লিখিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে অনেক বিষয় অযুক্ত ছিল এবং দুই একটী ভ্রমাত্মক কথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ইতিহাসের মৌলিকতার জন্য এবারে সেইগুলি সংশোধন করিয়া লিখিতেছি।

'বাঙ্গলার কথা' প্রথমে বাহির হয় ১৪ই আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে (১৯২১) সালে। প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতার নিম্নলিখিত কথাগুলি লিপিবদ্ধ ছিল—

"মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন সংখ্যা"

বাঙ্গলার নবযুগের সাপ্তাহিক মুখপত্র

"বাঙ্গলার কথা

সম্পাদক—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

সহকারী সম্পাদক—শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার

প্রথম ভাগ : কলিকাতা ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৪ই আশ্বিন

১৩২৮ প্রথম সংখ্যা

বিষয় সূচী— ১। বাঙ্গলার কথা—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ
২। স্বরাজ সাধনা— „
৩। বস্ত্র যজ্ঞ— „
৪। শিক্ষার বিরোধ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুতরাং দেখা যায়, এই কাগজখানিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের লেখা খুব বেশী থাকিত। 'বাঙ্গলার কথা' প্রবন্ধটি মৌলিক নহে। দেশবন্ধু ভবানীপুর সম্মিলনীতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যে সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই কতকাংশ। এই প্রথম প্রবন্ধটির শেষ কথাগুলি ছিল—"বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী—বাঙ্গালী, বল আল্লা, বল নারায়ণ, বল বন্দেমাতরম।"

সেই বৎসরটি স্বরাজ বৎসর বলিয়াই আমরা জানিতাম, সেই সম্বন্ধে দেশবন্ধু "স্বরাজ সাধনা" প্রবন্ধে কর্ম্মপন্থা দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে কলিকাতায় দেশবন্ধুর বাড়ীতে ছিলেন। তখন 'বিদেশী বস্ত্র-বর্জ্জন' খুব প্রচণ্ড ভাবে চলিতেছিল। স্মরণ আছে, তখন এক একটী সভায় মহাত্মা উপস্থিত থাকিতেন, আর দেশবন্ধু উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে মহাত্মার সম্মানার্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার জন্য বস্ত্র চাহিতেন, আর চতুর্দ্দিক হইতে বস্ত্র বর্ষণ হইত। "বস্ত্র-যজ্ঞ" প্রবন্ধটি এই বস্ত্র বর্জ্জন উপলক্ষ করিয়া লিখিত হয়।

"শিক্ষার বিরোধ" সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত। রবীন্দ্রনাথ একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—"শিক্ষার মিলন"। "শিক্ষার বিরোধ" এই প্রবন্ধেরই প্রত্যুত্তর। রবীন্দ্রনাথের মত ছিল ইউরোপের সহিত সহযোগিতা করা; দেশবন্ধু বলিতেন—"আগে আমরা নিজে মানুষ হই, তারপরে সহযোগিতা করিব"। শরৎচন্দ্র তখন কংগ্রেসে যোগদান করিয়া দেশবন্ধুর নির্দ্দেশে কাজ করিতে তৎপর হইয়াছিলেন।

"বাঙ্গলার কথা" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত মেটকাফ প্রেস হইতে। মুদ্রাকরও হেমন্তবাবুই ছিলেন। উহা ৭৯ নম্বর বলরাম দে ষ্ট্রীটে ছিল, তবে বাঙ্গলার কথার আফিস ছিল ৭নং ভবানী দত্ত লেনে (হেয়ার স্কুলের উত্তর দিকে), এইখানে "নারায়ণের" আফিস ছিল। নারায়ণেরও সম্পাদক ছিলেন চিত্তরঞ্জন।

বিজ্ঞাপনের হার ছিল এক পৃষ্ঠা ২৪ টাকা, কিন্তু জাতীয় উন্নতির সহায়ক বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বিজ্ঞাপন লওয়া হইত না। প্রবন্ধগুলিও জাতীয় নব জাগরণের আন্দোলন-মূলকই হইত।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার অভিযোগে দেশবন্ধু ১০ই ডিসেম্বর ধৃত হন। কিন্তু তথাপি ১৬ই ডিসেম্বরের কাগজেও (একাদশ সংখ্যায়) সম্পাদক হিসাবে তাঁহার নামই ছিল। দেশবন্ধুর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধুর সহোদরা ঊর্ম্মিলা দেবী ও অন্যতমা মহিলা সুনীতি দেবী সহ ৮ই ডিসেম্বর ধৃত হইয়া জেলে যাইবার সময় নিম্নলিখিত নিবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন—

"আমরা বন্দী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বাহির হইয়াছিলাম। যখন আমাদের তরুণ বয়স্ক বালকেরা সানন্দে ও সসম্মানে কারাবাস বরণ করিয়া লইতেছে, তখন তাহাদের জননী হইয়া গৃহে বসিয়া থাকা আমাদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। যে কাজ এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে, আমাদের ভগিনিগণ তাহাই গ্রহণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তাহারা যেন ভুলিয়া না যান, কারারুদ্ধ ভ্রাতাভগিনীগণের নিকটই তাহাদের যোগ্য স্থান। তাহারা এই কথাই হৃদয়ঙ্গম করুন যে তাঁহারা এক বৃহত্তর কারাগারেই বাস করিতেছেন। দাসভূমির কলুষিত বায়ু নিশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে গ্রহণ করা অপেক্ষা প্রকৃত কারাগারে বাস করা অনেক সম্মানজনক। গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রদিগের নিকট আমাদের এই নিবেদন—তোমরা দলে দলে কলেজের বাহির হইয়া পড় এবং স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগদান কর। এই মহাসমরে হয় আমাদের জয় না হয় মৃত্যু। দাসজীবন অপেক্ষা উভয় পক্ষই মহত্তর। পুলিশ কর্ম্মচারীকে আমরা অনুরোধ করি—তোমরা কর্ম্মত্যাগ কর, তোমরা বোঝ এই ঘৃণিত কর্ম্ম করা অপেক্ষা অনশনে মৃত্যু শ্রেয়ঃ।"

বাঙ্গলাদেশে তথা ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া বাসন্তীদেবী প্রমুখ মহিলারাই প্রথমে কারাবরণ করেন।

অবশ্য সেই রাত্রিতেই তাহাদিগকে জেল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

'বাঙ্গলার কথা'র দ্বাদশ সংখ্যা হইতে (২৩শে ডিসেম্বর ৮ই পৌষ) উহার সম্পাদিকা হন শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে আমি যে লিখিয়াছিলাম বাঙ্গলার কথার দ্বিতীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুকুমার রঞ্জন দাশগুপ্ত, তাহা ভ্রমাত্মক। বাঙ্গলার

"তোমরা কর সুখের গর্ব্ব
আমরা করি দুঃখের বড়াই।"

দেশবন্ধুর বোঠান বিমলা দাশেরও একটা প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য নাম 'পরবাস'।

তবে এই সময় দেশবন্ধু সম্পাদিত "নারায়ণ" যে বাহির হইত, তাহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন সুকুমার বাবু।

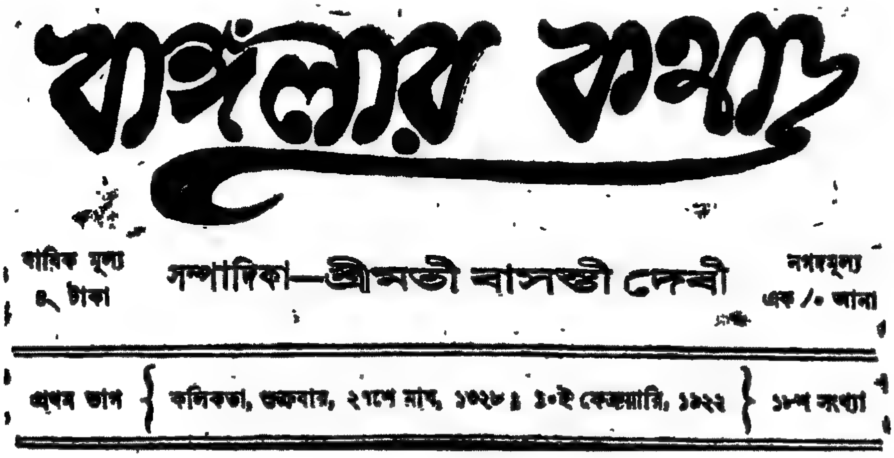
বাঙ্গলার কথা

বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা | সম্পাদিকা—শ্রীমতী বাসন্তী দেবী | নগদমূল্য এক /০ আনা

প্রথম ভাগ { কলিকাতা, শুক্রবার, ২৭শে মাঘ, ১৩২৮ ; ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২ } ১৮শ সংখ্যা

১৯২২ সালে চট্টগ্রামে যে প্রাদেশিক সম্মিলনীতে বাসন্তী দেবী সভানেত্রী হন, তাঁহার সেই অভিভাষণ বাঙ্গলার কথার ২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি কবি নজরুলের "অভয়মন্ত্রের" কয়েক চরণ দিয়া অভিভাষণ শেষ করেন—

বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়,
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ,
জয় সত্যের জয়।

কথার প্রথম সম্পাদক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, তারপরে ছিলেন বাসন্তী দেবী উহার সম্পাদিকা। তবে নামে না হইলেও সুকুমারবাবু বাঙ্গলার কথার কাজকর্ম্ম দেখা শুনা করিতেন এবং বাসন্তী দেবী সম্পাদিত প্রথম সংখ্যায় সুকুমার বাবুর একটী প্রবন্ধ ছিল। উহার নাম—

"বাঙ্গলার কথার" দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরচিত নিম্ন- লিখিত প্রবন্ধ কয়টা উল্লেখযোগ্য—

১। স্বরাজ সাধনা ২। বস্ত্রযজ্ঞ ৩। ভারতের লক্ষ্য ৪। স্বরাজের পথে ৫। অবিশ্বাসীর স্বরাজলাভ ৬। এক বৎসরের স্বরাজ ৭। জেল ভর্ত্তি ৮। বৃহত্তর কারাগার। ৯। দেশবাসী।

☞ "দেশবন্ধু-স্মভাব" পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে, আগামী সংখ্যা হইতে এই প্রবন্ধের স্থলে "ভারতের জাতীয় কংগ্রেস"-এর ১৯২০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটনাবলী বাহির হইবে।

* সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয় আমার মাঘ মাসের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া খাঁটি ইতিহাস রাখিবার জন্ত আমাকে চুঁচুড়ায় আহ্বান করিয়াছিলেন ; তাঁহার নিকট সযত্নে রক্ষিত 'বাঙ্গলার কথা' হইতে আমি 'বাঙ্গলার কথা'র খাঁটি ইতিহাস বিবৃত করিলাম ; তাঁহার এই সহৃদয়তায় আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত সাহিত্যিকের এইরূপ সৌজন্য বিশেষ হৃদয়স্পর্শী।

গান্ধীজী—নেতাজী

শ্রীহিমা চক্রবর্ত্তী

শতধা বিচ্ছিন্ন এই দুর্ভাগা ভারতে—
চেয়েছ তোমরা দোঁহে যতনে গাঁথিতে
একটি প্রেমের মাল্যে। অতীত দিনের—
তপঃক্লিষ্ট ঋষি সম তুমি ভারতের—
পুণ্য পিতা হে মহাত্মা। গৌতমের বাণী
নব ছন্দে রূপায়িত তব কণ্ঠে আনি।
তোমারি আলোকে বুঝি জ্যোতিস্নাত হয়ে
আর এক পুরুষ আজি এলো বাহিরিয়ে

। । ।

দেশের নেতাজী রূপে। ভাঙিতে শৃঙ্খল—
করিলে মরণপণ —নিষ্কম্প উজ্জ্বল
দীপশিখা সম দোঁহে। নাহি দ্বন্দ্ব, বুঝি
মুক্তির সাধনা করো এক সত্যে' পূজি।
সে সত্য সবার মিলন। লহ বারবার—
হে সাধক বীর দোঁহে প্রণতি আমার।

মুক্তি

ঝরাপাতা

মেঘ-মেদুর আকাশ। বর্ষণ ক্লান্ত ধরণীর গায়ে আরো কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ঝরে পড়ল দুরন্ত দমকা বাতাসে। জীর্ণ খোড়ো চালের ফাঁকা দিয়ে হু হু শব্দে বাইরের শীতল জলো হাওয়া ভিতরে ঢুকে, ভিতরের মানুষকে রীতিমত কাঁপিয়ে তুলেছে।

শতচ্ছিন্ন মলিন কন্থাখানি ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নেয় নিমাই।...সারা আকাশখানা কালো-মেঘে ছেয়ে রয়েছে—এখুনি হয়ত আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে। রাস্তায় হাঁটু সমান জল আর কাদা—অলস-শ্রান্তদিন—নিমাই ভাবে—তার পিছনে-পড়ে-থাকা দিনগুলোর কথা—জীবনের কুসুমিত শাখা থেকে একে একে সব মুকুলগুলিই ঝরে গেল নিতান্ত অপ্রত্যাশিতে—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একে একে সমস্ত কুঁড়িগুলিই চ্যুত হয়ে গেল তার জীবনের বৃন্ত থেকে সে এক দুঃখে ভরা ইতিহাস। সে ব্যথার বেদনা একদিন কাঁটার মতই বিঁধেছিল তার বুকে—কিন্তু আজ? আর কোন ক্ষোভ নেই তার, দুঃখ নেই তাদের জন্য। আজ ভাল মন্দ চাওয়া-না-পাওয়া, হাসি-কান্না সব এক হয়ে গেছে নিমাইয়ের কাছে। মরা সোঁতার ক্ষীণ উৎসের মতো এ-দুঃখের সংসারের হাল ধরে থাকতে বেঁচে রয়েছেন শুধু পিসীমা। নিদারুণ দারিদ্র্যের সাথে যুঝতে তাঁর শরীরও অস্থিচর্ম্ম-সার—নিমাইএর শরীরও খুব যে সবল পুষ্ট তা নয়, তবু তার জন্য দুঃখ নেই নিমাইএর, দুঃখ কিসের? কিসের আক্ষেপ? দুঃখে যাদের জীবন গড়া—এইত তাদের চরম পাওয়া। এ-সমাজে জন্ম নিয়ে এর বেশী যে মানুষ পেতে পারে—নিমাই এ ধারণার বাইরে—এইত তাদের জীবন, নিত্যদিনের এক-মুষ্টি অন্নের জন্য "অন্ন অন্ন" বলে চীৎকার করে ফুটপাতের ধারে ডাষ্টবিনের মধ্যে থেকে কুকুরের সাথে বোঝাপড়া করে একমুষ্টি অন্নের সংস্থান—দারিদ্র্যের লেলিহান অগ্নির তলে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ক্ষতি কি? নির্ব্বাপিত অগ্নির ওই ভস্মরাশিটুকুই ত' ওদের কামনার ধন—ওদের নিত্যদিনের জীবিকানির্ব্বাহের শাশ্বত পাওয়া। ওর মধ্যে ভুল নেই এতটুকু—ভ্রান্তি নেই কোথাও—তাইতো নিমাইএর দুঃখ হয় না, দীর্ঘশ্বাস পড়ে না এসব বেদনামিশ্রিত জীবনের বৈচিত্র্য দেখে—এ-যে নিত্যকালের।

নিমাই মাঝে মাঝে ভাবে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে তাকে যখন মুক্তিই দিয়ে গেছে, তখন সংসারের প্রতি মিথ্যা কেন এ মায়া, এ মোহ—একমুষ্টি অন্নের জন্য কেন এ হা-হুতাশ!—ভাবে—"বিবাগী হয়ে যাই, যেদিকে দু'চোখ চলে সেদিক বলে চলে যাই।" পারেনা শুধু পিসীমার জন্য—মাঝে মাঝে রাগ হয়, তাই পিসীমার ওপর—অজান্তে অভিশাপ দিয়ে ফেলে পিসীমাকে—"যেমন করে মা-বাবা আর সবাই আমায় ছেড়ে চলে গেল, তেমনি করে তুমিও ত' আমায় ছেড়ে চলে গেলে পারতে পিসীমা, তবে আমাকে ত' আর এমনি করে ভাবতে হতো না"—মনে মনে ভাবে—চিন্তা-করে মুখ ফুটে কিছুই বলে না নিমাই পিসীমাকে।

—পিসীমাকে নিমাই ভালবাসে—ভক্তি করে, ভাবতে ভাবতে যখন অতিরিক্ত উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে, তখনই ওই সব আবোল-তাবোল বকতে থাকে আপন মনে—

—কারখানায় কাজ করে নিমাই—দিনান্তের দিনমজুর, এই তার সবটুকু পরিচয়। ভোরের আলো ঝাপসা আবহাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে একটুখানি আলোর মতন জাগায়—কারখানার বাঁশী বেজে ওঠে—কাজে ছোটে নিমাই—সারাদিন কাজ করে কারখানায়। সায়াহ্নের ম্লান আলোছায়া মিলিয়ে গিয়ে নেমে আসে ধূসর কালিমা ধরণীর বুকে—নিমাই ঘরে ফেরে—এই তার নিত্যদিনের চলার গতানুগতিক নিয়মানুবর্ত্তিতা—এর এতটুকু নড়চড় নেই কোথাও।

কারখানায় কাজ ক'রে নিমাই যেন আর মানুষ নেই—কারখানার যন্ত্রগুলোর সাথে ওর হৃদয়টাও অমনি কঠিন হ'য়ে গেছে, ওর অন্তরের অনুভূত তন্ত্রীগুলো যেন যন্ত্র হ'য়ে বিরাট কারখানার মতই ওর দেহাভ্যন্তরে শুধু আপন আপন কাজ করে চলেছে।—

—আজ কদিন ধরে লাগা বৃষ্টি চলেছে। নিমাই তবু কাজে যায়। কদিন থেকে অনেক মজুরই লাগা থাকে কাজে—শুধু গড়হাজির হয় না নিমাই...এজন্য বড়বাবু একটু আলাদা চোখে দেখেন নিমাইকে—ভালবাসেন ওর কাজের প্রতি একাগ্রতা দেখে—বিস্মিত হ'ন ওর দক্ষহস্তের অসাধারণ কর্ম্মপটুতায়—দিনমজুরদের মধ্যে এক নিমাইএরই মাস মাইনে ত্রিশ টাকা—আর আর সকলে কেউ পায় বিশ টাকা, কেউ পায় পনের, কেউ পায় দশ।—

—আজ বৃষ্টিতে ভিজে কাজে গেছে নিমাই—কাজ করেছে অক্লান্ত। দারিদ্র্যের উল্লসিত হিংস্রতায় ওর রুগ্ন শিথিল অঙ্গগুলো বিবশ হয়ে পড়ে নিদারুণ কায়িক পরিশ্রমে। তবু জোর ক'রে কাজ ক'রে চলে নিমাই, ওর আত্ম ইচ্ছাশক্তির বিরুদ্ধে।—

—বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আজ কদিন ধরেই নিমাইএর

শরীরটা খারাপ যাচ্ছিল। তার ওপর আবার আজকের এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। দোষ কি ওদের ?? দারিদ্র্যের নির্ম্মমতায় নিষ্পিষ্ট ওদের জন্য 'রোগ' দূরে আড়ালে বসে একটুখানি সুযোগ খোঁজে—সুযোগ পেলে আর কথা নেই—। ওই শরীর খারাপ নিয়েই আজ কাজে গিয়েছিল—পিসীমার শত মানা উপেক্ষা করে,···কারখানাতেই জ্বর এসেছিল—বড়বাবু রাজের তদারকিতে এসে দেখেন, নিমাই বেহুঁশ হ'য়ে পড়ে রয়েছে ঘরের মেঝেয়—তাড়াতাড়ি একখানা গরুর গাড়ী ডেকে বড়বাবুই পাঠিয়ে দিয়েছেন ওকে বাড়ীতে।

—বাসায় এসে দু'জনে মিলে ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেছে নিমাইকে—পিসীমা ত' কেঁদেই আকুল। জীবনের একমাত্র সঞ্চয় ওই নিমাই; হঠাৎ একটা দমকা বাতাসে বহুদিনের অতীতের জীর্ণ পাতাখানা উল্টে যায়—পিসীমার মনে পড়ে যায় অনেক কথা—তাঁরও জীবনে একদিন সব ছিল। পরিপূর্ণ সুখের সংসার—তাই এতবড় সুখ বুঝি বিধাতার সইল না। দামোদর রাক্ষসী—রক্তপিপাসী দামোদর বাঁধ ভেঙ্গে গ্রামে এসে ঢুকলো—ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব, কেমন করে একটুখানি অবলম্বন পেয়ে বেঁচেছিলেন তিনি—আর বেঁচেছিল তিন বছরের দুধের শিশু এই নিমাই—সেদিনের সে ইতিকথা আজো বিভীষিকা জাগায় পিসীমার মনে—সব হারিয়ে—সব খুইয়ে—শেষ সম্বল এই শিশুটিকে হৃদয়ের সিঞ্চিত স্নেহদিয়ে আঁকড়ে ধরলেন, বিদগ্ধ মনের হা-হুতাশ তবু নিভলো না—তবু ভুলে থাকার মতো একটুখানি সম্বল পেলেন। "নিমাই, নিমাই" তাঁর নিমাই—তাঁর মনের মণিকোঠার হারান-রত্ন—তার অসুখ—পাগলের মতো কাঁদতে থাকেন পিসীমা। কিন্তু নীরব অশ্রুবিসর্জনে কি হবে ? এ যে সত্যিকার জগতের নিদারুণ সংঘাত। একে জয় করতে হবে। নিজের শক্তি দিয়ে পরাভূত করে দূরে সরিয়ে দিতে হবে এর ঔদ্ধত্যকে—

কিন্তু উপায় কি ? এখন যে মাসের শেষ—টাকা-টাকা না হলে যে কিছুই করবার উপায় নেই—সত্যিকার বাস্তবে একমাত্র ওই যে শাশ্বত, আর যা কিছু সব—সবই ত' অনিত্য, অলীক।—

সভ্যতার শালীনতা দূরে ঠেলে পিসীমা যান বড়বাবুর কাছে—মিনতি করে বলেন, এ বিপদে তাঁকে কিছু সাহায্য করতে। নতুবা—নতুবা আর ভাবতে পারেন না পিসীমা, দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারে জল ঝরতে থাকে। 'বড়বাবু' মানুষটি ভাল, মায়া হয়, দরদ হয়—নিমাইএর প্রতি পিসীমার উদ্বেলিত ভাব দেখে—দশটা টাকা এনে দেন পিসীমার হাতে—বৃদ্ধা পিসীমা আশীর্ব্বাদ ক'রে জীর্ণ অঞ্চলের প্রান্ত দিয়ে উদগত চোখের জল মুছে নিয়ে পথে নেমে আসেন অগুণ্তি লোকের ভীড়ে।—

—ডাক্তার দেখানো—ঔষধপত্র খাওয়ানো, সেবা-শুশ্রূষা যতদূর সম্ভব-আপ্রাণ চেষ্টায় করে চলেন পিসীমা—বুভুক্ষু রোগের তবু ক্ষুধা মেটে না, উন্মত্ত রোগরূপী দানবের সাথে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ঘুণধরা জীবনের অলস তন্ত্রীগুলো শিথিল হয়ে পড়ে—না—না—না—শক্তি তাঁকে সঞ্চয় করতেই হবে। তাঁর নিমাই—তাঁর 'জীবন'—তাকে বাঁচাতেই হবে। বিধাতার এতবড় অভিশাপ তিনি কিছুতেই নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে পারবেন না। আজ সাতদিন হলো তবু জ্বরের কম নেই।—

—আজ সকাল থেকে নিমাই প্রলাপ বকতে থাকে। পিসীমা বুঝতে পারেন—'জীবন-মৃত্যুর' সন্ধিসূত্রের ওপর রেখা দিয়ে ধীরে অতিধীরে নিমাই এগিয়ে চলেছে সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে।—এ দুর্নিবার গতির বেগ রুদ্ধ করার মতো শক্তি কি তাঁর আছে ? এ যে নিমাইএর অন্তর্দেবতার অনিরুদ্ধ চলা। পিসীমা নিজেকে বড়ো অসহায়া মনে করেন। মনে পড়ে সেই সাঁতরাগাছি থাকার সময় তিনিও একবার এমনি অসুখেই পড়েছিলেন। "এখন-তখন" অবস্থা, শুধু নিমাইএর ঐকান্তিক আর অমানুষিক যত্নই তাঁকে সুনিশ্চিত মৃত্যুর উদ্ধত গ্রাস থেকে কেড়ে আনতে পেরেছিল। আর আজ সেই নিমাইএরই অসুখ। পিসীমা আর ভাবতে পারেন না। পাড়ার একজন ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে দেন বড়বাবুর কাছে।—

নিমাইএর অসুখ—'জীবন-মরণ' অবস্থা, কথাটা ধীরে ধীরে কারখানার ম্যানেজার বাবুর কানে যায়—নিমাই—তাঁর কারখানার একমাত্র বিশ্বস্ত শ্রমিক নিমাই—তার অসুখ !!

ম্যানেজার মোহনলাল রায় ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে আসেন নিমাইকে দেখবার জন্য। সঙ্গে আসেন মিঃ রায়ের শিক্ষিতা স্ত্রী মিসেস্ শ্বেতা রায়।

—শ্রমিক দিনমজুর নিমাই···ওদের আবাস সহরতলীর নোংরা বস্তী, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করে ওরা, ওদের ওতে কষ্ট হয় না, ওটাইত' ওদের মজ্জাগত—দোর খুলে দিতেই একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ উৎকট হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মিঃ ও মিসেস্ রায় তাড়াতাড়ি নাকে রুমাল চাপা দেন।—

মিসেস্ রায় অনুচ্চস্বরে বলেন, "এইনাকি কারখানার শ্রমিকদের থাকবার ঘর ? আর এঘরও নাকি দেওয়া হয় কারখানা থেকেই ?"—সৌখিন ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়ে হলেও মিসেস্ শ্বেতা রায়ের মনটি শ্বেত কমলের

মতই কোমল। মনে মনে ভাবেন—এরাও মানুষ, এদের দেহও রক্ত-মাংসে গড়া, ওদের দেহের অনুভূত তন্ত্রীগুলোও কাজ করে ওদের অন্তরে। তবে? তবে কি করে মানুষ এমন মনুষ্যত্বহীন পশু-পরিবেশের মধ্যে বাস করে?" কথাগুলো মিসেস্ রায়ের সারা অন্তরে তীব্র জ্বালার মাতন জাগায়। আপাততঃ তবু চুপ করে থাকেন।—

—মিঃ রায়ের তত্ত্বাবধানে যথোচিত চিকিৎসা হয় নিমাইএর, পিসীমা আকুল হ'ন আনন্দে—আশীর্বাদ করেন এঁদের মতো বড়মানুষের উদারতা দেখে।—

—বাসায় ফিরে অনুযোগ করেন মিসেস্ রায় মিঃ রায়ের কাছে। বলেন, "কারখানার শ্রমিকদের যে ঘর দেওয়া হয়, তা ত' কোম্পানী থেকেই দেওয়া হয়, তবে কেন এমন আলো-বাতাসবিহীন ছোট ছোট ঘর এদের থাকবার জন্য দেওয়া হয়? তোমরা বিশেষ করে যারা অর্থের প্রাচুর্য্যে স্ফীত, তারা এমনি করেই ভুলে যাও, ওরাও মানুষ, ভাল-মন্দ, দুঃখ-ব্যথা পাওয়ার মতো বোধশক্তি তোমাদের মতো ওদেরও আছে। এদেশের ধনী সম্প্রদায় জানে শুধু জোঁকের মতো গরীবের রক্ত চুষে লাল হ'তে, যাক্, তুমি যতো শীঘ্র পার ওদের বস্তির সংস্কার করো ওরা যদি এমনি করে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে তবে তোমাদেরই ক্ষতি,—কারখানারই লোকসান।

এক নিমাইএর অসুখ দেখতে গিয়ে দারিদ্র্যের একটা নগ্নরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্বেতার কাছে।

ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় ধীরে ধীরে ভাল হ'য়ে ওঠে নিমাই—রোগ সেরে যায়। পরাভবের গ্লানি নিয়ে রোগ দূরে সরে গেলেও বিজিতের সারা অঙ্গে রেখে যায় তার সুস্পষ্ট কালিমা। দুর্ব্বল···অতিরিক্ত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে নিমাই। হাঁটতে পারে না, কোনরকমে উপাধানে ঠেস্ দিয়ে বসে থাকতে পারে মাত্র। এ দুর্ব্বলতা কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় লাগে নিমাইএর।

এদিকে প্রগতিশীলা মিসেস্ রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বস্তির ছোট ছোট অন্ধকূপগুলোর আমূল পরিবর্ত্তন হয়, তৈরী হয় পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে সব নূতন বড় বড় ঘর।

আজ ক'দিন থেকে একটু একটু করে হেঁটে চলতে পারে নিমাই। আরো দিন পনের পরে কাজে যায় নিমাই। পিসীমা বারণ করেন, বলেন "নিমু—এই ত এতবড় অসুখটা থেকে উঠলি, আর ক'টা দিন না হয় যেতেই দে, তার পরেই না হয় যাস। দুর্ব্বল রোগা শরীর, তার ওপর কি কারখানার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সইবে। আবার একটা যদি কিছু হ'য়ে পড়ে। যাস না আর কাজে।" নিমাই শোনে না পিসীমার কথা, বলে—"তুমি বোঝ না পিসীমা, এই একটা মাস বিছানায় পড়ে রইলাম, এতেই ত খরচ হয়ে গেল, তখন অসুখে পড়েছিলাম, দয়া করে তাই তখন সবাই সাহায্য করত, এখন তারা ত' আর কেউ সাহায্য করবে না, অথচ উপোস দিয়েও ত আর থাকা যাবে না, তাছাড়া আমার শরীরও ত এখন বেশ ভাল হ'য়ে গেছে। তুমি আশীর্ব্বাদ করো পিসীমা আমার কিছু হবে না।"—হাসতে হাসতে কাজে বেরিয়ে যায় নিমাই। "তুমি আশীর্ব্বাদ করো পিসীমা আমার কিছু হবে না"—কথাগুলো পিসীমার মনের প্রান্তে কোথায় যেন হঠাৎ গিয়ে ঘা দেয়।

অতিরিক্ত দুর্ব্বলতায় কলঘরের মেসিনগুলো বড় ভারী ঠেকে নিমাইএর কাছে। জোর করে প্রাণপণ শক্তিতে কল চালিয়ে যায় নিমাই। অতিরিক্ত গরমে, ঝাঁঝালো হাওয়ার মধ্যে নিমাইয়ের মাথার মধ্যে যেন কেমন করতে থাকে। অবশ হয়ে খুলে যায় ওর শিথিল হাত থেকে মেশিনের হাতলটা। টাল সামলাতে পারে না হঠাৎ একটা তীব্র ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় নিমাই। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে থাকে। মেসিনটা হঠাৎ একটা বিশ্রী আওয়াজ ক'রে খানিকক্ষণ আপন মনে চলে বন্ধ হয়ে যায়। কলঘরের আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি ছুটে আসেন ম্যানেজার মিঃ রায় ও বড়বাবু। দেখেন—নিমাইয়ের নিস্পন্দ দেহটা পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর, মুখের কাছে পড়ে রয়েছে খানিকটা তাজা রক্ত। মিঃ রায় ও বড়বাবু দু'জনেই ঝুঁকে পড়েন নিমাইয়ের প্রাণহীন দেহটার ওপর।

ব্যথাহত মন নিয়ে সেদিন কাজ থেকে ফিরে আসেন মিঃ রায়। সংবাদটা শ্বেতাকে জানাতে তাঁর বাধে—ভাবেন ওরই আপ্রাণ চেষ্টায় ত শ্রমিকদের বস্তির সংস্কার হলো, আর তারও মুখ্য কারণ ওই নিমাইয়ের অসুখ পরিদর্শন। মিঃ রায়কে ব্যথাকুল দেখে শ্বেতাই নিজে জিজ্ঞেস করে তাঁর ব্যথার কারণ? অধোমুখে উত্তর দেন মিঃ রায় "সেদিন যে শ্রমিকটীর অসুখ-সংবাদে তুমি তাকে দেখতে গিয়েছিলে, সেই নিমাই আজ কাজে এসে মারা গেছে কলঘরের অ্যাক্সিডেন্টে"। "মারা গেছে?"—হতাশ হয়ে বসে পড়েন মিসেস্ রায়, এ দুর্গত শঠতার দেশে এতবড় বিশ্বাসী আত্মোৎসর্গী কর্ম্মী বুঝি আর দুটি হয় না।

ঝাঁসীর রাণী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পাঁচ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের কথা। সে সময়ে দেশে দেখা দিল এক ভয়ানক বিদ্রোহ ও বিপ্লব।

লর্ড ক্যানিং সে সময়ে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল, কিন্তু হঠাৎ বঙ্গদেশ হইতে এক ভয়ঙ্কর অশান্তি উপস্থিত হইল। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভার তর সর্ব্বত্র ইংরাজের বিরুদ্ধে একটা অশান্তির ভাব চলিতেছিল। দেশীয় রাজারা একটি একটি করিয়া তাহাদের রাজ্য ইংরাজ-গভর্মেণ্টের হাতে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অসন্তোষের ভাব পোষণ করিতেছিলেন, সকলেরই মনে মনে সর্ব্বদা এই আশঙ্কা ছিল যে—এই বুঝি আমার পালা আসিল। তারপর জমি-জমা সম্বন্ধে নূতনরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় জমিদারদিগের প্রজাদের উপর পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রভুত্ব ছিল না। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, সুলভ ডাকমাশুল, স্কুল, হাসপাতাল এ সমুদয় নূতন নূতন সংস্কার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ অমঙ্গল আশঙ্কায় দেশের লোকেরা তখন অনেকেই ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছিল। এই সকল উন্নতি ও সংস্কারকে তাহারা প্রীতির চক্ষে না দেখিয়া মনে করিত যে, ইংরাজেরা তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। দুষ্ট লোকের দ্বারা এই সকল অসত্য কথা বাঙ্গলা ও অযোধ্যায় সিপাহীদের মধ্যে প্রচারিত হইল। এই সময়েই সৈন্যদিগকে এন্‌ফিল্ড রাইফেল নামক নূতনধরণের এক বন্দুক প্রদান করা হয়। এই বন্দুকে মোম বা চর্ব্বির কার্ত্তুজ বা টোটা ব্যবহৃত হইত। ঐ টোটা বন্দুকে ভরিবার সময় দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। এইরূপ গুজব রটিয়া গেল যে, এই টোটা হিন্দু ও মুসলমান উভয়জাতিরই জাতি নষ্ট করিবার জন্য। উহাতে শূকর ও গোরুর চর্ব্বি মিশ্রিত হইয়াছে। পরে কিন্তু অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, তাহাদের ঐরূপ অনুমান অসত্য ছিল না, ঐ কার্ত্তুজ তৈয়ারী করিতে শূকর ও গোরুর চর্ব্বি ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রথমেই বাঙ্গালাদেশে কলিকাতার নিকটস্থ বারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। কোন কোন অবিবেচক ইংরাজ সৈন্য-কর্ম্মচারীদের অদূরদর্শিতার ফলে তাহা ক্রমেই বিস্তার লাভ করিল। প্রকৃত বিদ্রোহ আরম্ভ হইল মীরাট এবং লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে। ক্রমশঃ বিদ্রোহের আগুন দিল্লী, কানপুর, মধ্যভারত ঝাঁসী প্রভৃতি স্থানে এবং দেশের সুদূর প্রান্তেও এই বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের একটি প্রধান আড্ডা হইল কাল্পি (Kalpi)। ইংরাজ শাসনকর্ত্তারা নিজ নিজ শাসনভুক্ত নগর ও জেলায় শাসন সংরক্ষণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে অরাজকতা, পৈশাচিক অত্যাচার-উৎপীড়ন, দীন প্রজাগণের অসহায় অবস্থা এবং দলে দলে নগরবাসীরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় পাইবার জন্য ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তাত্তিয়াযোগী বিদ্রোহের আগুন ভারতের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিবার জন্য নানা দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা সত্ত্বেও বহুকাল পর্য্যন্ত ঝাঁসীতে বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হয় নাই। রাজ্যের কি সেনা, কি প্রজা, কেহই বিদ্রোহী দলে যোগদান করিতে অগ্রসর হয় নাই। মহারাণী লক্ষ্মী বাইয়ের বয়স তখন বাইশ তেইশ মাত্র—কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী দূরদর্শিনী, উদার এবং কর্ত্তব্যপরায়ণা। তাঁহার মনে হইল এই বিদ্রোহের পরিণাম অবশেষে অতি ভীষণ আকার ধারণ করিবে। এজন্য তিনি এই বিদ্রোহ হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত অতি দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। এ সময়ে ঝাঁসীতে দ্বাদশসংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের একাংশ, ১৪ সংখ্যক অনিয়মিত অশ্বারোহিগণের একাংশ এবং কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক অবস্থান করিতেছিল। ইহাদের অধিনায়ক ছিলেন কাপ্তেন ডানলপ্ (Captain Dunlap)। যেদিন ঝাঁসী ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত সংযোজিত হয়, সেদিন হইতেই কাপ্তেন স্কিন্ কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের মনে কোন দিন এমন আশঙ্কা হয় নাই যে ঝাঁসীতেও বিদ্রোহের আগুন প্রধূমিত হইতে পারে।

ঝাঁসীর দুর্গ একদিকে যেমন স্বাভাবিক ভাবেই সুরক্ষিত ছিল, তেমনি স্থাপত্য-বিদ্যার কৌশলে এবং দুর্গ-পরিখাও নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যগুণে সে সময়ে ঝাঁসী দুর্গ উত্তর-ভারতে দুর্ভেদ্য দুর্গরূপে পরিচিত ছিল। একটী উচ্চ পর্ব্বতোপরি দুর্গটি অবস্থিত ছিল। দুর্গের উপর হইতে সহর ও চারিদিকের পল্লী ও জনপদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার পক্ষে ঝাঁসী দুর্গ ছিল সর্ব্বপ্রকারে সুবিধাজনক। দুর্গের প্রাচীর স্থানে স্থানে ১৬ ফিট ও কুড়ি ফিট দৃঢ় প্রস্তরের গাঁথুনি দ্বারা গঠিত ছিল। বাহিরের দিকেও দুর্গ বেষ্টন করিয়া প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের গায়ে ও বাহিরের নগরপ্রাচীরে গোলাগুলি নিঃক্ষেপের রন্ধ্র ছিল। কয়েকটা উচ্চ বুরুজ ছিল; সেই উচ্চ স্তম্ভের উপরও কামান সজ্জিত থাকিত। দুর্গের চারিদিক বেড়িয়া ছিল ঝাঁসী সহর—শুধু পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের কিয়দংশ

ছাড়া, সহরের চারিদিকে আঠারো হইতে ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। দুর্গের পশ্চিমদিক দুরারোহ শিলাকীর্ণ পর্ব্বত-বেষ্টিত থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই সুরক্ষিত ছিল। দুর্গ যেমন ছিল দুর্ভেদ্য—সহরটিও তেমনি ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুরক্ষিত। দুর্গের দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকের কিয়দংশ ব্যতীত আর সবদিকেই ঝাঁসীনগরী প্রসারিত ছিল।

ঝাঁসীর ন্যায় নিরাপদ স্থানে অবস্থান করিয়া এবং ঝাঁসীর রাণীর ব্যবহারে কোনরূপ সন্দেহের কারণ দেখিতে না পাইয়া কাপ্তেন স্কীণের নিশ্চিন্ত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ঝাঁসী দুর্গের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইবে না। কিংবা বাহিরের লোকেরা আসিয়া সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না।

কাপ্তেন স্কীন্ ১৮ই মে তারিখ আগ্রাতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেও জানাইয়াছিলেন যে, ঝাঁসীতে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না। বরং এই দুর্গের সিপাহীরা মীরাট ও দিল্লীর সিপাহীগণের বিদ্রোহের কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। বিশেষ, এখানে কাপ্তেন ডানলপের ন্যায় উপযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ রহিয়াছেন।" কিন্তু তাঁহার এই বিশ্বাস ও নির্ভরতা সত্যে পরিণত হইল না। ৪ঠা জুন ঝাঁসীর সেনাদের মধ্যেই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। ৫ই জুন সৈনিক-নিবাসের কয়েকখানি বাঙ্গালো পুড়িয়া গেল, বন্দুকের ধ্বনিতে দুর্গের চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নগরের অধিবাসীরা নিজ নিজ পরিবার ও ধন-সম্পত্তি লইয়া দুর্গের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। সিপাহীদের অধিনায়কগণ সেনা-নিবাসেই রহিলেন এবং তাহাদিগকে শান্ত রাখিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন—কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্রোহীরা ডানলপ সাহেবকে হত্যা করিল এবং ছাউনীর অর্থভাণ্ডার ও গোলাবারুদ অধিকার করিয়া ফেলিল। ইউরোপীয় অধিনায়ক ও অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই উন্মত্ত সিপাহীদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। কেবল একজন সৈন্যাধ্যক্ষ কোনরূপে অশ্বারোহণ করিয়া দুর্গে যাইতে পারিয়াছিলেন।—এদিকে বিদ্রোহী সিপাহীগণ কারাগার হইতে কয়েদীদিগকে মুক্ত করিয়া দিল, সরকারি কাছারিঘর পোড়াইয়া ফেলিল। তখন কারামুক্ত কয়েদীর দল, সরকারি প্রহরীগণ সকলে মিলিত হইয়া—ঝাঁসীর দুর্গ অবরোধ করিল।

ছয়

কমিশনার কাপ্তেন স্কীন্ এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া সাহায্যের জন্য একে সহরের বিশ্বস্ত সর্দ্দারদের নিকট পত্র লিখিলেন এবং দুর্গ হইতে নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইবার জন্য লক্ষ্মী বাইয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া গুপ্তপথে কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে রাজ-প্রাসাদে পাঠাইয়া দিলেন। রাণী, স্কিন্ ও গর্ডন্ সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করিলেন এবং তাঁহাদের ও দুর্গের অধিবাসিগণের জন্য তিন মণ আটার রুটি এবং ডাল-শাক ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া গুপ্ত ভাবে প্রতিদিন দুর্গের ভিতরে পৌছাইয়া দিতে লাগিলেন। রাণীর অবস্থাও এ সময়ে অত্যন্ত সঙ্কটজনক, তাঁহার নিকট তখন মাত্র একশত সৈনিক ছিল। তাহাদেরও মহানুভবা রাণী ইংরেজদের সাহায্যের জন্য দুর্গ মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন।

এ বিষয়ে কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা বলেন ৭ই জুন প্রত্যূষে যখন কাপ্তেন স্কীন্ দুর্গ হইতে নিরাপদে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য লক্ষ্মী বাইয়ের নিকট কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করেন, তখন তাহারা পথের মধ্যে শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া রাণীর নিকট নীত হইলে তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দানের পরিবর্ত্তে উত্তেজিত সিপাহীদের হাতে সমর্পণ করেন। ফলে, সিপাহীদের হাতে তাহাদের প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। নিরুপায় স্কীন্ ও গর্ডন সাহেব ঐ দিন বার বার সংবাদ পাঠাইয়া ও পত্র প্রেরণ করিয়াও রাণীর নিকট হইতে কোনও প্রতিকার পাইলেন না, কথা হইতেছে রাণীর নিকট তাঁহাদের লিখিত পত্র পৌছিয়াছিল কি না তাহাই যে ছিল সন্দেহজনক। অনেকে বলেন, রাণী কাপ্তেন স্কীন্ ও গর্ডনের প্রেরিত লোকদিগকে বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে মিথ্যা অপবাদ রাণীর সম্বন্ধে চলিয়া আসিয়াছে সে বিষয়ে কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। দুই একজন ইংরাজ লেখক ব্যতীত লক্ষ্মী বাইয়ের দেশীয় জীবনী-লেখকেরা কেহই এরূপ অলীক অপবাদের উল্লেখ করেন নাই। এজন্য সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, রাণী লক্ষ্মী বাইয়ে উপর আরোপিত এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

৮ই জুন এক ভীষণ দিন। এই দিন প্রাতঃকালে সীপাহীরা পরম উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত দুর্গ আক্রমণ করিল। ৭ই জুন বেলা দুই ঘটিকার সময় হইতেই এই আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। সে সময় হইতেই দুর্গমধ্যস্থিত ইউরোপীয়গণ একান্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন,—কি ভাবে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন।

৮ই জুন তারিখে দলের পর দল বিদ্রোহী সৈনিকেরা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইংরাজদের বিনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ও দিকে দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত

বিদ্রোহী দলের সহকারিগণ—বিদ্রোহীরা যাহাতে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে সে জন্য দুর্গদ্বার খুলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু দুর্গমধ্যস্থিত সৈন্যাধ্যক্ষগণের সতর্ক দৃষ্টির ফলে তাহা কিছুকালের জন্য সম্ভবপর না হইলেও আক্রমণকারিগণ গোলার পর গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাপ্তেন গর্ডন আক্রমণকারীদের গতি প্রতিরোধ করিতে গিয়া নিজে শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ইউরোপীয়দের মধ্যে দারুণ ত্রাসের সঞ্চার হইল। ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত ভীষণ রবে চারিদিকে ভীতি উৎপাদন করিয়া দলে দলে বিদ্রোহীরা আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। দুর্গমধ্যে খাদ্য-সামগ্রী নাই, গোলাগুলি নাই—কি ভাবে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়। তখন দুর্গমধ্যস্থিত ইউরোপীয়েরা বিদ্রোহীদের নিকট আত্মসমর্পণ করাই স্থির করিলেন। কাপ্তেন স্কীন সন্ধিপ্রার্থী হইয়া দুর্গের উপর শ্বেত পতাকা উড়াইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ)

পারমার্থিক

শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্বের জন্য নিঃস্ব হওয়া, সেই ত পরম ধর্ম।
নিঃস্বের জন্য বিশ্ব ত' নয়,—স্বি মানেই নিঃস্ব-শোষণ কর্ম।
আধ্যাত্মিক মোক্ষমার্গে এদেশের সবাই ব'সে বৈতরণী তরুক,
মানবতা'র ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্ত দিক আর মরুক,
—ক'জন পারে করতে এমন ত্রিখিল-মানব-মিলন-মঙ্গল চর্চা ?
উদ্দেশ্য যার মহৎ আর কর্ম নিষ্কাম, তার আবার কি খরচা ?

খাওয়ার জন্যই ত বাঁচা নয়,—বাঁচার জন্যই খাওয়া।
যে পদার্থে অমৃত নেই, কি কর্ব তা দিয়ে ? যাদের জন্যই ত পাওয়ার
ভূমার জন্যই এ জীবন।—আর এই দেহ-বন্ধনের বাঁচা
মৃত্যুর জন্যই যখন, দরকার হ'লে ত্যাগ করতে হবে বাঁচা।
—"নায়ে সুখমস্তি" কে না জানে ? অন্ন নিয়ে যারা থাকতে চায়
—আসুরিক যারা জড়বাদী আর বর্বর, বোঝে না হায়
এই পশু-শক্তির নেই কোন দাম।—আমাদের ইনাম্ তাই বিশ্বে দরবারে
স্বীকৃত হয়েছে আধ্যাত্মিক আত্মত্যাগ আর খয়রাতি কারবারে।

'মোক্ষমূলর' থেকে চট্‌কলের সাহেব প্রশংসা করেছে আমাদের ধর্মের;
বিশ্বের দরবারে জয়ঢাক বেজে উঠেছে ভিক্ষুক ভারতবর্ষের ভিক্ষুধর্ম মর্মের।
—চলছে প্রবচন আর প্রবঞ্চনার সপ্রেম অভিনয়।—
পৃথ্বীর আদর্শের কুজ্ঝটিকায় সংসারটাই যখন সত্য নয়,
সত্য কেবল পরম ব্রহ্ম, নিত্য সনাতন, তখন আর কি ?
আসমুদ্র উজাড় ক'রে পরের পাতে ঢালতে হবে ঘি।
মিলবে প্রশংসা আর 'প্রপাগাণ্ডা' প্রাচ্য দেশের অদ্ভুত প্রাণশক্তির
—নিজের সর্বস্ব দিয়ে পরিচয় দিতে হবে সেই গভীর আত্মভক্তির।
তার জন্য পাবো তামার মেডেল আর অফুরন্ত করতালি;
পর'নে নাই বা জুটুক ত্যাকড়া আর উদরটা থাকুক না খালি।

এত বড় সভ্যতা আর কৃষ্টি নিয়ে শেষে কিনা পশুধর্মী উদরের চিন্তা
যীশুখৃষ্ট বা জ্ঞানী বুদ্ধ কভু কি বলেছেন কোনদিন তা ?
আমাদের তরে আছে অক্ষয় স্বর্গ, নাই বা থাকলো অন্ন এবং পানীয়
নিজেরা উপবাসী আর উলঙ্গ থেকে যুগে যুগে বিশ্বের তরে তাই আনিও।

"পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ"—শাস্ত্রকথা না যদি শোন কানে,
সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না, আন্তর্জাতিক দস্যুরা তা জানে।
গির্জার গহ্বরে আছে অজ্ঞানের বিজ্ঞানী মারণাস্ত্র
তান্ত্রিক মারণ আর উচাটন প্রয়োগের অপেক্ষাটুকু মাত্র।
—মুহূর্তে পারে তা মিষ্টি কথায় গলা ভিজিয়ে হাড়িকাঠে ফেলতে;
ভাল কথায় রাজী না হও বশীকরণ পারবে কি আর ঠেলতে ?

লোকোত্তর পুরুষ সচ্চিদানন্দের কর্ম্মবহুল জীবনের প্রতিভাদীপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১২৯৬ সালের ৭ই কার্ত্তিক (ইংরেজি ১৮৮৯, ২৩শে অক্টোবর) বুধবার ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ার হরিণাহাটি গ্রামে সচ্চিদানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন পাশ্চাত্য বৈদিক-বংশীয় শ্রীপুর কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় পণ্ডিতপ্রবর ৺প্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, মাতা ৺বসন্তকুমারী দেবী।

হরিণাহাটির পাঠশালায় শিক্ষা-অন্তে সচ্চিদানন্দ সরিষা এইচ, ই, স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং এই স্কুল হইতেই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। তৎপর তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িতে আরম্ভ করেন। বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়া এই সময় তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হয়। গৃহশিক্ষকতা প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা তাঁহাকে জীবিকার্জ্জন ও পুস্তক সংগ্রহ করিতে হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে উজিরপুর কাশ্যপগোত্রীয় গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবীর সহিত সচ্চিদানন্দের বিবাহ হয়। ১৯১০ সালে তিনি রেলের চাকুরী গ্রহণ করেন, কিন্তু বেশীদিন তাহাতে নিযুক্ত থাকেন না। পরে ইঞ্জিনিয়ার্স, বিল্ডার্স এবং কনট্রাক্টার্স ব্যবসায় আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে ভট্টাচার্য্য কোম্পানী যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার প্রথম সাফল্য সুরু হয় ঐ সময় হইতেই। ইম্পিরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক্‌স্ নামে একটি কাঠের গোলাও তিনি স্থাপন করেন এবং বুল লিমিটেড নামীয় একটি ইট তৈয়ারী ফার্ম্মের ম্যানেজিং এজেন্সী নিয়াও ১৯২৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি গভীর উদ্যমে পরিচালনা করেন। ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে কমার্শিয়াল ক্যারিং কোম্পানীর (পাণ্ডু, গৌহাটি, শিলং মোটর সার্ভিস) অংশীদার হন। (রায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর মহাশয়ের সহিত সচ্চিদানন্দের মণিকাঞ্চন-যোগের এই প্রথম প্রত্যক্ষ সূচনা)।

অতঃপর তাঁহার কর্ম্মজীবনের সাফল্যের পথে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ :—

১৯২৭—বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ লিমিটেডের পুনরুদ্ধার। (রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্যের মিলিত প্রয়াস।)
দি বেঙ্গল টেক্সটাইল এজেন্সী লিমিটেড স্থাপন।

১৯২৮—বঙ্গলক্ষ্মী বস্ত্রাগার স্থাপন (সম্প্রতি তাঁহারই পুনর্গঠিত ক্যালকাটা ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটির সহিত সংশ্লিষ্ট)।

১৯৩০—বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্ (স্বদেশী যুগের ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী নামক প্রতিষ্ঠানটি পুনরুজ্জীবিত করণ)।
দি মেট্রোপলিটন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড।

১৯৩১—মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এ্যাণ্ড পাবলিসিং হাউস লিমিটেড।

১৯৩৪—দি ইউনাইটেড মোটর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী লিমিটেড।

১৯৩৭—কমার্শিয়াল ক্যারিয়িং কোম্পানী—ই, বি, রেলওয়ের শিয়ালদহ ষ্টেশনের ষ্ট্রীট ডেলিভারী ও চীৎপুর সার্ভিস আরম্ভ।
বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্ব্বেদ ওয়ার্ক্‌স্ প্রতিষ্ঠা।

১৯৪০-৪১—ইউনাইডেট মোটর ট্রান্সপোর্ট কোং লিমিটেড (শিলং শ্রীহট্ট মোটর সার্ভিস)

১৯৪২—বঙ্গলক্ষ্মী কেমিকেল ওয়ার্ক্‌স্।

১৯৪৩—ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড।

১৯৪৪—বঙ্গলক্ষ্মী অয়েল মিল।

১৯৪৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১৩৫১, ৭ই ফাল্গুন) লোকোত্তর পুরুষ সচ্চিদানন্দের দেহাবসান ঘটে।

বঙ্গশ্রীর গোড়াপত্তন হইতে শুরু করিয়া আমরণ ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য তিনি কিভাবে চিন্তা ও কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহারই রচিত প্রবন্ধাবলীতে। মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব, দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর হইয়া কি ভাবে পরম স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎকর্ষের মধ্য দিয়া পরম শান্তিতে জীবন অতিবাহিত হইতে পারে—এই চিন্তাই ছিল তাঁহার জীবনের সমস্ত চিন্তার বড়।

বড় ব্যবসায়ী হয়ত ভারতে একাধিক ব্যক্তি আছেন, কিন্তু সেই ব্যবসায়ী মনের সঙ্গে সংস্কৃত মনের মিশ্রণে যে অমূল্য ভাবধারার পরিচয় সচ্চিদানন্দ দিয়া গিয়াছেন, তাহা একান্ত দুর্লভ। ভারতের বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধার কল্পে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "সংস্কৃত গ্রন্থমালা" ভারতীয় বিদগ্ধ-সমাজে যে কত বড় আদর্শে আজ আদৃত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে—(ক) ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়, (খ) ভারতীয় বেদ, উপনিষদ ও দর্শন, (গ) পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা ও ভারতবাসীর দায়িত্ব, (ঘ) মানুষের দুঃখ দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষির কয়েকটি মোটা কথা, (ঙ) শ্রীদুর্গাপূজার প্রয়োজনীয়তা, (চ) মানব-সমাজের বর্ত্তমান সমস্যা পূরণে মানুষের পশুত্বের বিকাশ নিবারণ করিয়া মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন করিবার প্রয়োজনীয়তা, (ছ) বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজের সমস্যার নাম এবং তাহা সমাধানের সঙ্কেতের নাম, (জ) মানুষের ব্যক্তিগত অভাব ও দারিদ্র্যের কারণ—প্রভৃতি রচনা মানবসমাজের সর্ব্ববিধ কল্যাণের দিক হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গতঃ তাঁহার দানশীলতার কথা সবার উপরে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কত অনাথ, কত শিক্ষার্থী কতভাবে যে তাঁহার দানশীলতায় বাঁচিয়াছেন ও উপকৃত হইয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। তাঁহার এই লোকোত্তর প্রতিভা ও পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধানতি নিবেদন করি।

মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার

যে মহা-মহীরুহতুল্য অতিমানবের স্নেহশীতল ছায়ায় অগণিত সংসার-আতপ-দগ্ধ নর-নারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিত, যে সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ কঠোর সাধনাবলে বেদাদি-শাস্ত্র মন্থন করিয়া জগতের সর্ব্বপ্রকার অনাচার ও তজ্জনিত দুঃখ ও অভাবের নিরসনের অমৃতের সন্ধান লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং অমৃতময়ী ভাষায় সেই পরম সত্য সাধারণের বোধগম্য করিবার ক্লান্তিহীন চেষ্টায় আপনার অমূল্য জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া অকালে তিরোহিত হইলেন—আজ তাঁহার দ্বিতীয় সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ। আজ তিনি তাঁহার স্বর্গবাসের তৃতীয় প্রভাতে পুত্র দেবেন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক শ্রদ্ধায় উৎসর্গীকৃত অন্ন-জল আশীষ বর্ষণপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার অভাব আজ বহু মানব-সন্তানকে শোকভারাক্রান্ত চিত্তে তাঁহার লোকোত্তর চরিত্রের সখেদ আলোচনায় ব্যাপৃত রাখিয়াছে। আজিকার দিনে শ্রদ্ধায় প্রদত্ত কোন কিছুই তাঁহার গ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত হইবে না—এই ভরসায় তাঁহার সরিষায় অতিবাহিত সুখময় বাল্যে সংঘটিত যে ঘটনাবলীর স্মৃতি তাঁহার বিরাট মানসপটে চিরদিন অমলিন ছিল—যেগুলির আলোচনা তাৎকালিক বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইলেই করিতে ভালবাসিতেন—তাহারই মধ্য হইতে দু'একটি কাহিনী আজ তাঁহারই পদে নিবেদন করিতেছি।

গভীর জঙ্গলে আমাদের কমিটী বসিয়াছে। দারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সভ্যেরা যে যাহার চিহ্নিত ইষ্টকোপরি সমাসীন, সচ্চিদানন্দ দাঁড়াইয়া সাধুভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন—"বন্ধুগণ, চন্দর বাগ্দীর খেজুর-রসে ধুতুরা মিশান নিতান্ত বর্ব্বরোচিত কার্য্য হইয়াছে। তাহার মত হৃদয়হীন ও বিশ্বাসঘাতক লোকের শিউলি হইবার কোনও অধিকার নাই। আমি প্রস্তাব করি যে, একাদিক্রমে তিনদিন তাহার সমস্ত ভাঁড় ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার অপকার্য্যের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হউক।" সকলে—"উপযুক্ত বিচারই হইয়াছে।" সচ্চিদানন্দ—"আপনাদের অভিমতে সুখী হইলাম কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্য-পন্থা সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ আপনারা দিতে পারেন কি?" সকলে—"না, পারি না, নির্দ্দেশ আপনিই দিন।"

"জানি, আপনাদের মস্তকে গোময় ছাড়া অন্য কোন পদার্থ-ই নাই, আপনারা এখনও অপোগণ্ড শিশু, (সভ্যগণের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য) বালক নামের অযোগ্য।"

তার পরে—"তোদের বড় গাছে চড়বার সামর্থ্য নাই, অথচ রস গেলবার আঠারো আনা লোভ আছে একটুও মাথা ঘামাবি না। আমি কি তোদের জন্যে বুদ্ধি খরচ ক'রতে ক'রতে শেষে দেউলে হয়ে যাব?"

"আরে দেউলে হবি কেন—'যতই করিবি দান তত যাবে বেড়ে'—বিদ্যে-বুদ্ধি খরচ না ক'রলে শুকিয়ে যায়।"

"যেমন তোদের গেছে, কি বলিস? যাক, বুদ্ধি আমিই খরচ করি, তোরা আপাততঃ একটু গতর খরচ কর। একজন ইন্দুকে খুঁজে আন, একজন জলে নেমে খুব বড় বড় গোটাকতক পাৎলার ডাঁটা নিয়ে আয়, আর একজন খুব মোটা দেখে কতকগুলা রাঙচিত্রের ডাল নিয়ে আয়—দেখি বুদ্ধি খরচ করে কোন সুরাহা করতে পারি কি না।"

ইন্দুদাদাকে লইয়া ফিরিয়া দেখি, চার-পাঁচটা পাতলার ডাঁটা ফাঁপা রাঙচিত্রের ডালের সাহায্যে জুড়িয়া ৩০।৩৫ হাত লম্বা এক একটী নল তৈয়ারী হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"ভাই ইন্দু, এবার তুমি দয়া করলেই আমার মাথা ঘামান সার্থক হয়। "কি রকম?" "তুমি ওই যে বড় গাছটায় ঝারার কলসী দেখছ, ওই গাছটায় একটা নল নিয়ে উঠে কলসীর রসে সেটাকে ডুবিয়ে ধর, আমি নীচ থেকে টান মেরে দেখি রস আসে কিনা। যদি আসে তা হলে আজ হতে আর তোমাকে কলসী নামাতেও হবে না, আবার রস খাবার পরে গাছে উঠে বাঁধবার কষ্ট স্বীকার করতেও হবে না।"

"বহুৎ আচ্ছা, দে তোর নল।" ইন্দুদা তড়্‌তড়্ করিয়া গাছে উঠিয়া নলটা কলসীর ভিতর ডুবাইলেন, সচ্চিদানন্দ জোরে টানিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্পক্ষণ পর কোঁৎ কোঁৎ শব্দ করিয়া প্রচুর রস পান করিতে লাগিলেন। "ওরে দুপুরের রস বেশী খাস্‌নি, অসুখ করবে, আমাদের একটু টানতে দে।" "এই নেঃ" বলিয়া বিজয়ী সচ্চিদানন্দ সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সকলের কিছু কিছু রস খাওয়া হইলে বুক ফুলাইয়া গলাটা খুব কর্কশ ও গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"কিরে, বুদ্ধির দৌড়টা দেখলি? তোরা পারতিস?" "নাঃ, কখনই না।" "এখন আমার বক্‌শিস্?" —ইন্দুদাদা বলিলেন—"চল্ তিনকড়িদার দোকানে, যত পারিস্ জিলিপি খাওয়াব।"

নিমাইদার বাড়ীর পিছনের একটা আধা জঙ্গলে অনেকগুলো বড় খেজুরগাছ ছিল। কেউটে সাপের ভয়ে সন্ধ্যার পরে কেহ সেদিক মাড়াইত না। সচ্চিদানন্দের আবিষ্ক্রিয়ার কথা তাঁহারই পরামর্শে আমরা চাউর করি নাই। জিরেন কাটের দিনে আমরা ইন্দুদাদাকে লইয়া সেই জঙ্গলে সমবেত হইতাম এবং আট দশটা গাছের রস খাইয়া যথাসময়ে বাড়ী ফিরিতাম—বেশী রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে থাকা নিষিদ্ধ ছিল। একদিন সন্ধ্যার পরে সকলে নিবিষ্ট চিত্তে রস খাইতেছি হঠাৎ অতি নিকটে জুতার শব্দ পাইলাম। সকলে একযোগে ফিরিয়া দেখি স্বয়ং নিমাইদা। পালাইবার চেষ্টা বৃথা। সকলে অধোবদন হইলাম, বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

"তোরা এখানে কি করছিস্।" "আজ্ঞে একটা পরখ করছিলাম।" "কিসের পরখ?" "আজ্ঞে পাতলার নলের ভিতর দিয়া রস মুখে পড়ে কি না"। "ওঃ! আজ কি পরখের প্রথম দিন?" "আজ্ঞে না।" "দ্বিতীয়?" "আজ্ঞে তাও ঠিক বলা চলে না।" "তা হলে বহুদিনই পরখ চলছে, বুঝলাম। এখন চল, যাতে আর কোন দিন পরখ না করতে পার তার ব্যবস্থা করি। গাছের উপর কে রে!" "আজ্ঞে আমি।" "ইঁদে? নেমে আয়। বাবাঃ! আমরাও তো এককালে ছেলেমানুষ ছিলুম—চুরি করে রসও যে না খেতুম তা নয়, কিন্তু এত কায়দা-কানুন জানতুম না। তোরা পরে ডাকাত হবি। এখন চল্ পণ্ডিত ম'শায়ের ওখানে, দেখি তিনি তোদের বুদ্ধির কি রকম তারিফ করেন।" আমাদের তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা যায় না, অনুমান করা চলে। পিঠে চন্দর বাগ্দীর রস চুরির শাস্তির দাগ তখনও শুকায় নাই, তার উপরে আবার এই—হা ভগবান্!

চলিয়াছি, নিমাইদা পিছনে, সামনে আমরা। হঠাৎ সচ্চিদানন্দ ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন—হাতজোড় করিয়া বলিলেন "দাদা একটা নিবেদন আছে।" নিমাই জোড়হাত নামাইয়া দিয়া বলিলেন—"ছিঃ, বামুনের ছেলে জোড়হাত করে আমাকে কেন পাপে ডুবাও। কি বলবে বল।"

"আপনার খুব রাগ হয়েছে নিশ্চয়। আচ্ছা, একটা কাজ করুন না কেন—আপনি আমাদের আচ্ছা করে খুব ঘা-কতক এখানেই দিয়ে দিন, আপনার রাগ পড়ে যাবে—খুড়া ম'শায়ের কাছে আর নালিশ করবেন না। এই সেদিন অনেকটা একই কারণে বেদম মার খেয়েছি, আমাদের পিঠে হাত বুলিয়ে দেখুন, এখনও ঘা শুকায়নি।" নিমাইদা একেবারে গলিয়া গেলেন, বলিলেন, "ও বাবা! একেবারে দাগী আসামী! যাক্ আর কখন কিন্তু এমন কাজটি কোরো না—যাও, বাড়ী যাও।" নিমাইদা ফিরিয়া গেলেন—সচ্চিদানন্দ আবার কর্কশ-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"কি রে রাস্কেলগুলো, বুদ্ধির দৌড়টা দেখলি? শোনে, কাল হাটবার, তিনকড়িদার দোকানে সিঙ্গাড়া ভাজা হবে। তুই কাল দু' সের সিঙ্গাড়া আর সের দুই পান্তুয়া খাওয়াবি, বুঝলি?" "যো হুকুম, খোদাবন্দ্।"

লর্ড কর্জ্জনের (আমরা বলিতাম 'ক্রূরজন্') বঙ্গ-বিচ্ছেদে সারা বাঙ্গলা বিক্ষুব্ধ। ভাবপ্রবণ বাঙালী স্বদেশী-গ্রহণের এবং বিলাতী বর্জ্জনের পণ গ্রহণ করিয়াছে। সভা-সমিতির বন্যা আসিয়াছে। আমাদের গ্রাম কলিকাতার নিকটে, আমরাও মাতিয়া উঠিয়াছি। সচ্চিদানন্দ সর্ব্ব বিষয়েই অগ্রণী—সরিষার হাটে মিটিং করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু কোমর বাঁধিলেই কার্য্য হয় না, অনেক সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। আমরা অর্থহীন বালক—আমাদের অভিভাবকগণ আমাদিগকে অখণ্ড মনোযোগ সহকারে পাঠে রত দেখাটাই পছন্দ করেন; আমরা মিটিং লইয়া মাতি—ইহা তাঁহাদের মনঃপূত ত' ছিলই না,উপরন্তু যথেষ্ট ক্রোধের বিষয় ছিল। কাজেই অতি সঙ্গোপনে পরামর্শাদি চলিতে লাগিল—কিন্তু অর্থাভাবে সবই শেয়ালের যুক্তিতে পরিণতি লাভ করিতে লাগিল। সচ্চিদানন্দ দমিবার পাত্র নহেন, স্কুলের ছাত্রদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করা স্থির করিলেন। চাঁদার পরিমাণ এক পয়সা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত। প্রায় এক মাসের চেষ্টায় পনের টাকা সংগ্রহ হইল। দু'জনে কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। প্রথমে সঞ্জীবনী-সম্পাদক ৺কৃষ্ণকুমার মিত্রের নিকটে গেলাম। তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলা হইল। তিনি একখানা ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া আমাদিগকে অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তির নিকটে লইয়া গেলেন। ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও ৺গীষ্পতি কাব্যতীর্থ সানন্দে সম্মত হইলেন। পথখরচ তাঁহারা নিজেরাই বহন করিলেন। আমরা কিছু ফল ও মিষ্টান্নাদি লইয়া তাঁহাদের সহিত মোটরে সরিষায় আসিলাম। প্রকাণ্ড মিটিং হইল, বক্তারা বক্তৃতায় তাঁহাদের সুনাম বজায় রাখিলেন। তার পরে সব ঠাণ্ডা।

"হ্যারে, বক্তৃতা তো করান গেল, কিন্তু স্বদেশী গ্রহণের তো কিছুই করা হ'ল না লোকের ইচ্ছা থাকলেও স্বদেশী কাপড় কিনতে পায় না।" হাটে গিয়া সব দোকানদারকেই স্বদেশী কাপড় রাখিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। কিন্তু কেবল মাত্র একজন ১০০ জোড়া ধুতি আনিতে রাজী হইলেন। কাপড় আসিল—বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড়, একটাকা সাত আনায় এক জোড়া দশ হাত। কিন্তু ক্রেতা নাই। পিকেটিং আরম্ভ হইল। ফল হইল বিপরীত। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কয়েকজন তাড়ীয়াল আমাদিগকে মারিবার জন্য তাড়া করিল—কিন্তু আমাদের কাছে ক্ষিপ্রতায় পরাজিত হইয়া শাসাইল—পরে দেখিয়া লইবে। দোকানদার তখন সেই সমস্ত স্বদেশী কাপড় আমাদিগকে বেচিয়া দিতে বলিলেন—আমরা "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই"—গান গাহিতে গাহিতে সেই কাপড় মাথায় করিয়া দ্বারে দ্বারে ফেরি করিয়া বেচিতে লাগিলাম। তখন কে জানিত—যে-মিলের কাপড়ের মোট দুর্দ্দিনে একদিন মাথায় তুলিয়াছিলেন, তাহারই ভার তাঁহাকেই স্কন্ধে লইতে হইবে?

অজানার আহ্বানে

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

ফাগুন হাওয়া দোল দিল আজ মোর মনে,
মোর মনে আজ, মোর বনে;
আর কত দিন রইব বল এমনি করে কাল গুণে।

আকাশ আজি পুলক-পাগল,
ভ্রমর যেমন মধু-মাতল
কোন্ দখিনার গান শুনে!
আর কতদিন রইব বল সোনার শিকল বন্ধনে!

অন্তরে মোর ঢেউ লেগেছে,
তীরের তরী আজ দুলেছে
কোন অজানার আহ্বানে, কোন্ বাঁশরীর তান শুনে!

ঘর ছাড়ানোর ডাক এসেছে,
রুদ্র বিষাণ আজ বেজেছে,
থাকনা পড়ে তীরের মায়া ফাগুন আজি মোর মনে।

কালিগঞ্জের কালিমুদ্দি

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

গ্রামের যদু ঘোষের জমি আমরা করি চাষ,
ওদের ধানেই—ওদের দানেই মোদের মেটে আশ।
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে তারাও ডাকে 'চাচা'!
সে ডাক বিনা একটা দিনও যায় না মোদের বাঁচা।

তোমার কথায় তাদের বুকে আজকে মেরে ছুরি
জাহান্নামের রাস্তা আমি নিজের হাতেই খুঁড়ি?
বৈমাত্র নয়—সোদর ভ্রাতা হিন্দু-মুসলমান,
একই বাংলা-মায়ের ছেলে—একই ভগবান্।
তোমার কথা শুনলে শেষে পেতে হবে ধোঁকা,
কালিগঞ্জের কালিমুদ্দি নয়কো এত বোকা।
আমার হিন্দু ভাইয়ের দেহে যে খুন বয়ে' যায়—
তাহাই রহে—তাহাই বহে আমার সারা গায়!

ভারতের ষ্টার্লিং সংস্থিতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃটেনের যুদ্ধবিজয়ী দিগ্বিজয়ী ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী—ভারতের চির "অকৃত্রিম" বন্ধু উইনষ্টন্ চার্চ্চিল সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্ট মহা-সভায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভারতের ন্যায্য প্রাপ্য ষ্টার্লিং সংস্থিতির বিরুদ্ধে একটি প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড মোটা দাবীর হুমকি দিয়াছেন। অজুহাত এই যে, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতীচ্যে ও মধ্যপ্রাচ্যে, দীর্ঘ ষড়্বর্ষব্যাপী যুদ্ধ-পরিচালনার ফলে, ভারতকে তাঁহারা বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে-পরিমাণে বৃটেনের নিরাপত্তার নিমিত্ত, সেই পরিমাণে ভারতের নিমিত্তও পরিচালিত হইয়াছিল। অতএব যুদ্ধ-ব্যয়ের কিয়দংশ ভারতের বহন করা কর্ত্তব্য! অসাধারণ চতুর চার্চ্চিল তাঁহার যুদ্ধকালীন প্রধান মন্ত্রিত্ব সময়ে ভারতকে তাঁহার এই অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন; কিন্তু ন্যায় ও নীতিবিরুদ্ধ এই প্রস্তাব কেহ সমর্থন করিতে পারে নাই। অধুনা একদল রক্ষণশীল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় রীতিমত একটি পাল্‌টা দাবীর প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। যথাসময়ে ইহার আলোচনা হইবে। বৃটেনের সর্ব্বপ্রধান অপ্রতিহত-প্রভাব সংবাদ-পত্র "টাইম্‌স্"ও সেই সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়াছে যে, "এই ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, প্রধানতঃ ভারতের নিরাপত্তা হেতু! এবং ইহার প্রায় সমগ্র অংশ "স্ফীত" মূল্যে ভারতীয় দ্রব্যজাত এবং ভারতবর্ষীয় কর্ম্মিবৃন্দের বেতন বাবদ ব্যয়িত হইয়াছিল! দুইটি কারণে এই ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে অন্ততঃ অস্থায়ী ভাবে একটি ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। ভারতের প্রাপ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ, তাহার নিজস্ব প্রয়োজনে, প্রচলিত-মুদ্রাসংস্থান (Currency Reserves) এবং সাধারণ কর্ম্ম পরিচালন তহবিল (Ordinary working balances) রূপে স্থায়ী ভাবে বৃটেনে রাখিতে হইতে পারে। শতকরা আট আনা সুদে ইহার অপর অর্দ্ধাংশ, এই শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বে পরিশোধ করিতে হইলে, প্রতিবর্ষে বৃটেনের সাগরপারের অর্জ্জিত অর্থের পঞ্চাশ মিলিয়ন ষ্টার্লিং পাউণ্ড, অর্থাৎ ৬৭ কোটী টাকা নির্গত হইয়া যাইবে এবং ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে মার্কিণ ও ক্যানাডার ঋণ সহিত পরিশোধ করিতে হইলে, প্রতিবর্ষে শত মিলিয়ন ষ্টার্লিং পাউণ্ড, অর্থাৎ ১৩৪ কোটী টাকা নিঃশেষ হইয়া যাইবে!" বৃটেনের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঋণের পরিমাণ অতি বিপুল, সন্দেহ নাই। মার্কিণ যদি ইজারা ঋণ প্রক্রিয়া দ্বারা বহুল পরিমাণ অর্থ মকুব না করিত, তাহা হইলে, অবস্থা আরও সঙ্কটজনক হইত। কিন্তু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটেনের বিপদ্ যেরূপ গুরুতর ছিল, তাহার দায়-দায়িত্বও তদনুযায়ী হইয়াছে। ইহাতে বিস্ময়ের অবকাশ নাই। সম্প্রতি বৃটেন হইতে যুক্তরাজ্যের তরফে একদল ঝুনা অর্থনীতিবিদ্ প্রতিনিধি এই সম্পর্কে ভারত-সরকারের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার নিমিত্ত ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্যক্ পরিচয় দৈনিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ দ্বারা এই প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর অপরিসীম দুঃখ, ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকারের ফলে, ভারতবর্ষ বিলাতে যে প্রভূত ষ্টার্লিং সংস্থিতির অধিকারী হইয়াছে, তাহাই ভারতের ভবিষ্যৎ আর্থিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির একমাত্র নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। নিয়মিত দৈনিক সংবাদ-পত্র পাঠকের নিমিত্ত এই পরিস্থিতির পরিচয় অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের এমন অনেক পাঠক আছেন, যাঁহারা নানা কারণে এই সংস্থিতির সংগ্রহ ও সঞ্চয় বৃত্তান্তের সহিত সম্যক্ পরিচিত নহেন। আমাদের বক্তব্য বিষয় তাঁহাদের সকলের নিকট সহজবোধ্য করিবার নিমিত্ত, আমরা সংক্ষেপে এই সংস্থিতির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পর্কিত ইতিবৃত্তের আলোচনা করিব। প্রথমে পাশ্চাত্ত্য এবং পরে প্রাচ্য রণাঙ্গনে কয়েক বৎসর যুদ্ধের নিমিত্ত বৃটিশ সরকার এবং মিত্রশক্তিগুলিকে ভারতবর্ষ হইতে বহু যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধোপকরণের মূল্য বৃটিশ সরকার বিলাতে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে-হিসাব আছে, তাহাতে ষ্টার্লিং, অর্থাৎ বিলাতের স্বর্ণমুদ্রায় জমা দিতেন। এই ক্রম-বর্দ্ধমান সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে ভারত-সরকার, ভারতে মুদ্রা প্রস্তুতকারী ধাতুর অভাবে, কাগজের নোট মুদ্রিত করিয়া যুদ্ধোপকরণ সরবরাহকারী ভারতীয় শিল্পী-ব্যবসায়ীদের পণ্যের মূল্য প্রদান করিতেন।

সকলেই জানেন যে, আন্তর্জ্জাতিক কারবারে অর্থাৎ বহির্বাণিজ্যে, কোন দেশের আমদানীর তুলনায় রপ্তানী অধিক হইলে—আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য জমা-খরচে আমদানী-পণ্যের মূল্য পরিশোধ করিয়া রপ্তানী-পণ্যের নিমিত্ত অধিকতর মূল্যপ্রাপ্তি-হেতু জমার ঘরে উদ্বৃত্ত অঙ্ক জমে। ইহাকে "অনুকূল উদ্বৃত্ত-বাণিজ্য-জমার অঙ্ক" (Favourable Trade Balance) বলে। ভারতের পক্ষে যুদ্ধস্থিতিকালে এইরূপ উদ্বৃত্ত-জমা দুইটি ক্ষেত্রে সঞ্চিত হইয়াছিল। প্রথম ষ্টার্লিং এলাকা (Sterling Area) অর্থাৎ ষ্টার্লিং মুদ্রার সহিত সংশ্লিষ্ট বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রাগত দেশসমূহের নিকট; এবং দ্বিতীয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবান্তর্গত ডলার-মুদ্রাশাসিত দেশ-সমূহের নিকট। বৃটিশ সরকারের ভারতে নির্ব্বাহিত যুদ্ধব্যয়ের নিমিত্ত, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত, ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে, উভয় সরকারের স্ব স্ব প্রয়োজনে ব্যয়িত অর্থের বণ্টন বিষয়ে যে আর্থিক চুক্তি হইয়াছিল, তদনুযায়ী ভারতের যে উদ্বৃত্ত প্রাপ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য মিত্রশক্তির প্রয়োজনে ভারতে নির্ব্বাহিত ব্যয়ের নিমিত্ত প্রাপ্য অর্থও এই ষ্টার্লিং সংস্থিতির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। এই উদ্বৃত্ত প্রাপ্য অর্থের বলে ও ফলে, ভারতবর্ষ তাহার চির অধমর্ণ পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে, উত্তমর্ণের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। এই অর্থ সঞ্চয় করিতে যুদ্ধস্থিতিকালে ভারতবাসীকে অপরিসীম দুঃখ, ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধ প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ-প্রস্তুতির ফলে ভারতের অসামরিক জনসাধারণের আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের অপরিসীম অভাব-অনটন ঘটিয়াছিল। অথচ, যুদ্ধোপকরণ বিক্রয় করিয়া কোন কোন শ্রেণীর ভারতবাসীর প্রচুর

অর্থাগম ঘটিতেছিল। ফলে, বাজারে প্রচুর অর্থের আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক আহার্য্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব ও অপ্রচুরতা-হেতু, দ্রব্য-মূল্য দ্রুত অসীম পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছিল। ফলে, দরিদ্রের মুখের গ্রাস স্বল্প-পরিমিত ধনীর কবলিত হইয়া, সহস্র সহস্র দীন-দরিদ্রকে মৃত্যুর হিম শীতল অঙ্কে চিরনিদ্রায় অভিভূত করিতেছিল। এই মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যস্ফীতির (Inflation) অবশ্যম্ভাবী ফলে, ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, তাহার চিরসহচরী মহামারীকে লইয়া সোণার বাঙ্গলাকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। শুধু বাঙ্গলায় নহে; এই অপরিসীম মুদ্রা ও মূল্যস্ফীতি জনসাধারণের নিত্য-নৈমিত্তিক অপরিহার্য্য আহার্য্য-ব্যবহার্য্যের অভাব অনটন সমগ্র ভারতকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহার সমাজ ও শৃঙ্খলাকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধের কয়েক বৎসরে, বিলাতে ভারতের প্রাপ্য যে প্রভূত ষ্টার্লিং সংস্থিতি সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ লক্ষ দীন-দরিদ্র ভারতবাসীর অনশন, মৃত্যু এবং রক্তের বিনিময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই অর্থ আমাদের ভবিষ্যৎ অত্যাবশ্যক কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি ও প্রসার সাধনের নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়। ইহার এক কপর্দ্দকও আমরা পরিহার করিতে পারি না। ইহার সম্যক্ সদ্ব্যবহারের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ গতি-বৃদ্ধি, সুখ-শান্তি, সম্পদ-সমৃদ্ধি এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই অর্থসমষ্টি আমাদের জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন। ইহার অপচয়ে আমাদের মৃত্যু এবং সম্যক্ সদ্ব্যবহারে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি। অথচ বিলাতে [illegible] লঘু করিবার প্রচেষ্টার অন্ত নাই। যুদ্ধের ছয়টি বৎসরে, আমাদের অশ্রু ও রক্তের বিনিময়ে, ভারতের বে-সরকারী আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে, আমাদের বৃটিশ-সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কারবারে, এবং সর্ব্বদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যে মোট উদ্বৃত্ত জমা কিরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

[আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের ধনরাশি ও ঋণরাশি]

আর্থিক বৎসর	বৃটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশসমূহ [ক্রোর]	যুক্তরাষ্ট্র [ক্রোর]	সর্ব্বদেশের একুন [ক্রোর]
১৯৪০-১	২৬.৭০	—১.১১	৫৩.৫৭
১৯৪১-২	৪৩.২০	+১১.৯৮	৮১.৭৩
১৯৪২-৩	৬৪.২৫	+৪.৬৩	৮৯.৭৩
১৯৪৩-৪	৭১.৫০	+২১.৮৯	৯৬.৮৩
১৯৪৪-৫	৫৯.৩৫	—৭.৭৪	২৮.৭৩
১৯৪৫-৬	৩১.৮০	—৫.৭৭	২৯.৭১

১৯৪০ খৃষ্টাব্দের আর্থিক বন্দোবস্ত অনুযায়ী ভারত-সরকার বৃটিশ সরকারের সংরক্ষণ-ব্যয়ের নিমিত্ত যুদ্ধের কয়েক বৎসর যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল :—

[ভারত সরকার কর্ত্তৃক ভারতে নির্ব্বাহিত বৃটিশ সংরক্ষণ-ব্যয়]

আর্থিক বৎসর	[ক্রোর]
১৯৩৯-৪০	৩
১৯৪০-৪১	৪০
১৯৪১-৪২	১৯৫
১৯৪২-৪৩	৩২৬
১৯৪৩-৪৪	৩৮৫
১৯৪৪-৪৫	৪১১
১৯৪৫-৪৬	৩৭৬
	১,৭৩৬

ভারতসরকার অতি সুলভ মূল্যে ভারতে যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিয়া অত্যন্ত মিতব্যয়িতার সহিত এই ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। বৃটিশ মহাসভা যুদ্ধকালে জাতীয় ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে যে নির্দ্ধারণ-সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিল, তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া তাহাদের বিবৃতিতে এইরূপ দৃঢ় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং, এই ব্যয়ের ঋণ সম্পূর্ণরূপে ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্ম-সম্মত; এবং ইহাকে অস্বীকার করিলে, কিংবা অন্যায়রূপে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিলে, নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার কার্য্য হইবে। যাহা হউক, এই ষ্টার্লিং সংস্থিতির উৎপত্তি ও বৃদ্ধির নিদান নির্দ্দেশ করিয়া আমরা যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ইহার ক্রম-বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নে প্রদান করিলাম।—

[যুদ্ধের কয়েক বৎসরে ভারতের ক্রম-বর্দ্ধমান ষ্টার্লিং সংস্থিতি]

বৎসর	পরিমাণ [ক্রোর]
১৯৪১ খৃঃ ২৪শে অক্টোবর	২১৬
১৯৪২ ,, ২৩শে ,,	৪১৩
১৯৪৩ ,, ২৯শে ,,	৮১৫
১৯৪৪ ,, ২৭শে ,,	১,১৬৯
১৯৪৫ ,, ২৬শে ,,	১,৫৮২
১৯৪৬ ,, ২৫শে ,,	১,৬৩১
১৯৪৬ ,, ২০শে ডিসেম্বর	১,৬২২

যুদ্ধের কয়েক বৎসর প্রতি মাসে এই সংস্থিতির কিরূপ দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা সহজেই উপলব্ধ হইবে।

মাস	১৯৪০ ক্রোর	১৯৪১ ক্রোর	১৯৪২ ক্রোর	১৯৪৩ ক্রোর	১৯৪৪ ক্রোর	১৯৪৫ ক্রোর	১৯৪৬ ক্রোর
জানুয়ারী	১১৯	১৯৪	২৯১	৪৩৫	৮৭৪	১,২৭৯	১,৬৭৪
ফেব্রুয়ারী	১৩১	২০৬	৩০৫	৪৬৫	৮৮৬	১,৩০৯	১,৬৮৮
মার্চ্চ	১৩৯	১৯৯	২৪৮	৪৮৯	৯৩৩	১,৩৫০	১,৭২০
এপ্রিল	১৪১	১৩৯	২৮১	৫৬১	৯৫৮	১,৩৮৫	১,৭৩১
মে	১৪১	১৪৭	৩০৮	৬০৪	৯৮২	১,৪০২	১,৭২৪
জুন	১৪৯	১৫৬	৩২১	৬৩২	৯৯৯	১,৪১৮	১,৭০৯
জুলাই	১৫১	১৬৫	৩৫৩	৬৬৩	১,০১৮	১,৪৪৩	১,৬৯৮

অগষ্ট	১৫৬	১৭৭	৩৮১	৭০২	১,০৬৫	১,৪৮৯	১,৩০০
সেপ্টেম্বর	১৬৪	১৮৯	৪০৭	৭৩৭	১,১১৪	১,৫২৮	১,৩৬৯
অক্টোবর	১৬৯	২১৬	৪১৬	৭৮৪	১,১৫৫	১,৫৬৭	১,৩৪১
নবেম্বর	১৭৬	২৩৬	৪৩৭	৮৩৬	১,১৯৩	১,৬১৫	১,৩২৪
ডিসেম্বর	১৮৬	২৬৯	৪৬৫	৮৪৭	১,২৩৩	১,৬৫২	১,৩২২

ভারতের প্রাপ্য এই ষ্টার্লিং আরও অধিক ছিল, কিন্তু এই অর্থ হইতে আমরা প্রায় চারিশত কোটী টাকার সরকারী ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিয়াছি। বৃটিশ-অধিকৃত এবং বৃটিশ মূলধন ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কারকারবারও আমরা কিছু-কিছু মূল্য বিনিময়ে অধিকার করিয়াছি; এবং ভারতের বৃটিশ কর্মচারীদের অবসর-বৃত্তি (Pension) এবং অন্যান্য প্রাপ্য অর্থের নিমিত্ত এই সংস্থিতি হইতে কিছু অগ্রিম টাকাও দিতে হইয়াছে। নূতন জাতীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে, সরাসরি ভারত-সচিব-কর্ত্তৃক নিযুক্ত যে সকল বিদেশী ও স্বদেশী কর্মচারী কর্ম হইতে অচিরে অবসর গ্রহণ করিবেন, অকালে কর্ম্মহানির নিমিত্ত তাঁহাদিগের যথাযোগ্য প্রাপ্য অবসর-বৃত্তি এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রায় দেড়শত কোটী টাকাও এই সংস্থিতি হইতে দিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত আমরা নিম্নলিখিত ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিয়াছি।

[পরিশোধিত ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ]

খৃষ্টাব্দ	ঋণের পরিমাণ [ক্রোর]
১৯৩৯—৪০	২২
১৯৪০—৪১	৮৯
১৯৪১—৪২	১১০
১৯৪২—৪৩	১৬২
১৯৪৩—৪৪	১৬
১৯৪৪—৪৫	১
মোট	৪০০

১৯৪৪—৪৫ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি অসম্পন্ন (Non-effective charges, দায়ের নিমিত্ত আমরা বৃটিশ সরকারকে এককালীন কুড়ি কোটী টাকা প্রদান করিয়াছি। তাহাদের যুদ্ধব্যয় নির্ব্বাহার্থ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণ বিক্রয় করিয়াছিল। সেই স্বর্ণ ক্রয় করিতেও এই সংস্থিতি হইতে আমাদের কিছু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। নিম্নে ক্রীত স্বর্ণের পরিমাণ দেওয়া হইল।

খৃষ্টাব্দ	স্বর্ণের পরিমাণ
১৯৪৩—৪৪	৩·৪ মিলিয়ন ফাইন্ আউন্স
১৯৪৪—৪৫	৩·২ ,, ,, ,,
১৯৪৫—৪৬	·৯ ,, ,, ,,

উল্লিখিত দায়-দেনার ব্যবস্থা করিয়া, বর্ত্তমানে আমাদের ষ্টার্লিং সংস্থিতির পরিমাণ, ষোলশত কোটীতে অবনমিত হইয়াছে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত এবং প্রচুর পরিমাণে ঋণগ্রস্ত বৃটেনের পক্ষে এই যথার্থ ন্যায্য ঋণের পরিমাণ, তাহার সাধ্যাতীত না হইলেও, কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সংস্থিতি দুঃস্থ ভারতেরও একমাত্র চরম অবলম্বন। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে ভারত প্রায় দেড়শত কোটী পরিমাণ ষ্টার্লিং সংস্থিতি ঋণ হইতে বৃটেনকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছিল কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের যে বিপুল ধনহানি, প্রাণহানি এবং দুঃখ-ক্লেশ ও ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সুতরাং ভারতের পক্ষে ইহার এক কপর্দ্দকও পরিত্যাগ অসম্ভব। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই ঋণ যথাশীঘ্র-সম্ভব পরিশোধ করিবার উপায় চিন্তা না করিয়া, যুদ্ধ-বিরতির পূর্ব্ব হইতেই বিলাতের এক সম্প্রদায়ের লোক এবং কয়েকটি অর্থনৈতিক সংবাদ-পত্র ইহাকে খর্ব্ব, এবং এমন কি অস্বীকার করিবার প্রস্তাব, নিতান্ত নির্লজ্জভাবে আলোচনা করিয়া, একটি অবাঞ্ছিত আন্দোলনের; এবং ভারতবাসীর মনে, ইহার ন্যায়সঙ্গত পরিশোধ সম্পর্কে, গভীর অবিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয়, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে। এই উপলক্ষে তদানীন্তন অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইস্‌ম্যান ঐ বৎসরের শেষভাগে বিলাতে যাইয়া বৃটিশ সরকারের খাজাঞ্চীখানার কর্মচারীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের বাজেট বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, "এই সমস্যা বিচার-বিবেচনা করিবার উপযুক্ত তত্ত্ব ও তথ্যের অসম্পূর্ণতা এবং অনিশ্চয়তা, এবং যুদ্ধান্তে বৃটেন কি পরিমাণে কি প্রকার রপ্তানী পণ্য ভারতে পাঠাইতে পারিবে, এবং ভারতবর্ষেরই বা কি পরিমাণে কি প্রকার পণ্যের প্রয়োজন হইবে, তাহার নির্ভরযোগ্য পূর্ব্বাভাসের অভাবে তাঁহার আলাপ-আলোচনা মাত্র ভবিষ্যৎ আলোচনার ধারা এবং তাহার উপযুক্ত সময়ের নির্দ্ধারণে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধ শেষ না হইলে, কোন পক্ষই স্ব স্ব কর্ত্তব্য ও কর্মপন্থা [illegible] করিতে পারিবে না। সুতরাং এই অপরিহার্য্য বিলম্বে ভারতের স্বার্থের কোন ক্ষতি হইবে না।" কিন্তু সংশয়বাদী ভারতবাসী এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইতে পারে নাই। তাহারা যথাশীঘ্র-সম্ভব এই প্রশ্নের সমাধানের নিমিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল; কারণ এই বিপুল ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে, বিলাতের কোন কোন সম্প্রদায়ের মতি-গতি ও সততা সম্বন্ধে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। আশঙ্কার সঙ্গত কারণও ছিল।

বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি প্রথমে নিখিল জগতে গণতন্ত্র সংরক্ষণ-সঙ্কল্পে যুদ্ধার্থ বৃটেনের বিপুল ত্যাগ স্বীকারের উল্লেখ করিয়া, ভারতের দাবীকে খর্ব্ব করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। দ্বিতীয় স্তরে, অপেক্ষাকৃত স্থিরবুদ্ধি সরকারের মুখপাত্রগণ সংযতভাবে বৃটেনের পরহিতৈষণা-প্রবৃত্তি কীর্ত্তন করিয়া, অন্যান্য ধনী উত্তমর্ণ-দেশের দৃষ্টান্তানুযায়ী ভারতকেও ঋণ প্রশমন সম্পর্কে উদারতা প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়াছিলেন। প্রথম মনোভাব হইতে এই দ্বিতীয় মনোভাব মোলায়েম ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে ভারতবাসীর আশঙ্কা দূরীভূত হওয়া দূরে থাকুক, বরং এই ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে, বৃটেনের সততা সম্বন্ধে, সন্দেহ গভীরতর হইয়াছিল। তৃতীয় স্তরে, ভারত, মিশর, এবং অন্যান্য দেশের নিকট তাহার ঋণ সম্পর্কে, আন্তর্জ্জাতিক অর্থক্ষেত্রে তাহার মর্য্যাদা সংরক্ষণ সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তর কয়েক বর্ষে বৃটেনের আর্থিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত

যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে সহস্র-ক্রোরেরও কিঞ্চিৎ অধিক ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সর্ত্তগুলিও এরূপ ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, বৃটেন তাহার অন্যান্য উত্তমর্ণ দেশগুলির সহিত তাহাদের প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ ও প্রশমনের বিলক্ষণ সুযোগ-সুবিধা পায়। ঐ সকল দেশের সহিত ঋণ-পরিশোধ আলাপ-আলোচনায় ইঙ্গ-মার্কিণ ঋণ-চুক্তি দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্তরাজ্যের অন্যান্য দেশকে প্রদেয় ষ্টার্লিং ঋণ-রাশিকে (Sterling balance) তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) চলতি কার-কারবারের নিমিত্ত যে ষ্টার্লিং ঋণাংশকে অচিরাৎ অন্যান্য দেশের মুদ্রাপ্রকরণে পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত মুক্তি দিতে হইবে; (২) ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে যে ঋণ রাশিকে কিস্তী হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে; এবং (৩) যে ঋণাবশিষ্টকে যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর ঋণ পরিশোধ-কল্পে এবং ঋণ পরিশোধ বন্দোবস্তের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি যে-উপকার লাভ করিবে তাহার স্বীকৃতি-সূচক সাহায্য-স্বরূপে, আপোষে বন্ধ করিতে হইবে। এই তৃতীয় দফার ইঙ্গিত—ভারতের প্রাপ্য অর্থের কিঞ্চিৎ কাট-ছাঁট,—ভারত দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দফার সম্পর্কে ভারতের অভিমত এই যে, আমাদের প্রাপ্য ষ্টার্লিং সংস্থিতিকে সমগ্র ভাবে বিবেচনা করিতে হইবে এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে যথাসম্ভব অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে পরিশোধ করিতে হইবে, এবং প্রতি কিস্তী প্রদানের পর অবশিষ্ট অংশের নিমিত্ত অন্ততঃ শত করা দুই টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যুদ্ধকালে ভারতবর্ষ বৃটেন ও মিত্রশক্তিগণকে যুদ্ধোপকরণ যোগাইয়া এবং অন্যান্য ভাবে যে সাহায্য করিয়াছে, তাহারই মূল্যবাবদ বৃটেনের নিকট ভারতের ১৬০০ কোটি টাকা প্রাপ্য হইয়াছে। সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জমা-খরচের ফলে ভারতের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত অর্থ, যুদ্ধ প্রয়োজনে ভারতের নিকট হইতে ক্রীত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাবদ প্রাপ্য অর্থ এবং ভারতের সহিত ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক চুক্তি অনুযায়ী ভারতের সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্ত দেয় অর্থ—প্রধানতঃ এই তিনের সম্মিলিত সমষ্টি ষ্টার্লিং-সংস্থিতিতে পরিণত হইয়াছে। ইহা যুদ্ধ-ঋণ নহে। ইহা যথার্থই বাণিজ্যিক ঋণ। দুঃখের ও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বিলাতের রক্ষণশীল দল কতকগুলি অদ্ভুত অজুহাত দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, এই অর্থ পাইবার ভারতের কোন নীতি-সঙ্গত অধিকার নাই। ভারতবিদ্বেষী চার্চ্চিলের প্রধান মন্ত্রিত্বকালে বৃটিশ অর্থসচিব বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা স্যারজন এণ্ডারসন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতের নিকট বৃটেনের যে ঋণ জমিয়াছে, তাহা সাধারণ ঋণ নহে বস্তুতঃ যুদ্ধ-ঋণ; যেহেতু বৃটেন শুধু নিজের স্বার্থের জন্য নহে, পরন্তু সর্ব্ব দেশের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার জন্য এই ঋণের দায়ে পড়িয়াছে। ইহার ফলে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষও বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সুতরাং ভারতের এই ঋণ পরিশোধ করিবার নৈতিক দায়িত্ব বৃটেনের নহে। স্বয়ং চার্চ্চিল এবং ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব আমেরীও কয়েকবার পার্লামেণ্টে মহাসভায় এইরূপ অদ্ভুত উক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু এক-তরফা সমগ্র ঋণকে যুদ্ধজনিত ঋণ বলিয়া এই ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব এড়ান বিশ্বস্ততার কার্য্য নহে। যথার্থই সামরিক কারণে বৃটেন ভারতের নিকট হইতে যে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে তৎসম্পর্কেও বৃটিশ রক্ষণশীল দলের কূটনৈতিক যুক্তি অশ্রদ্ধেয়। প্রথমতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও ভারতের কোন স্বার্থ লইয়া সংঘটিত হয় নাই। বৃটেন তাহার সাম্রাজ্যিক এবং অর্থ-নৈতিক স্বার্থ রক্ষার তাড়নায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্বশাসনা-ধীন ভারতকে সেই-ই জোর করিয়া, ভারতবাসীর বিনা সম্মতিতেই যুদ্ধে লিপ্ত করিয়াছিল। সুতরাং, এই বাস্তব ঐতিহাসিক পট-ভূমিতে বৃটেনের যুদ্ধের খরচ যোগাইবার দায়িত্ব ভারতের নহে।

আর একদল কূটনৈতিক অর্থনীতিবিদ্ মধ্যপন্থীরা উপর্যুক্ত যুক্তিবাদের অসারতা উপলব্ধি করিয়া বিধান দিয়াছেন যে, যুদ্ধ কালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বৃটেন ভারতবর্ষ হইতে যে যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিয়াছিল তাহার পুরা দাম কখনও ভারতের প্রাপ্য হইতে পারে না, সুতরাং এই ঋণের কিছুটা অংশ কাটিয়া ছাঁটিয়া যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করাই সঙ্গত। দুঃখের বিষয় যে, মহাসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত জাতীয় ব্যয়বরাদ্দ নির্দ্ধারণ-সমিতি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন যে, "যুদ্ধকালে বৃটেন ভারতবর্ষ হইতে যে মালপত্র ক্রয় করিয়াছিল তাহা অধিক মূল্যে ক্রয় করা দূরে থাকুক, বরং ভারতবর্ষ সঙ্গত মূল্য অপেক্ষাও যথেষ্ট কম দরে বৃটেনকে দ্রব্যসামগ্রী যোগাইয়াছে।" সুতরাং এই অজুহাতেও ভারতের প্রাপ্য হ্রাস করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ভরসার কথা এই যে, যখন ব্রেটন উড্সের আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক বৈঠকে ভারতের প্রতিনিধিগণ তাহার প্রাপ্য ষ্টার্লিং সংস্থিতি পরিশোধ-প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তখন বৃটিশ প্রতিনিধিবর্গের নায়ক সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কীনেস্ মুক্তকণ্ঠে ভারতের অকুণ্ঠিত সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, "ভারত সততা এবং সহৃদয়তার সহিত যাহা দিয়াছিল, বৃটেন তাহা সততার সহিত পরিশোধ করিবে, তবে এই পরিশোধ-পরিকল্পনার সহিত আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকের কোন সংশ্রব নাই; ইহা সংশ্লিষ্ট-দেশ দুইটির ঘরোয়া নিষ্পত্তির বিষয়।" আমলাতান্ত্রিক শাসন-তন্ত্রের শেষ অর্থসচিব স্যার আর্কিবল্ড রাউল্যাণ্ডস্ও তাহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, "বৃটেন ও ভারতের মধ্যে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনার সময় ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পরিশোধ-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে, এবং ঋণ হ্রাস সম্পর্কে ভারত কোন সম্মতি কিংবা স্বীকৃতি প্রদান, অথবা দায়দায়িত্ব অঙ্গীকার করে নাই।" . . .

ভারতের এই ষ্টার্লিং সংস্থিতি পরিশোধের প্রশ্ন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, বৃটেনের সহিত মার্কিনের ঋণ-চুক্তিতেও ইহার বিশিষ্ট উল্লেখ আছে। এই চুক্তিতে ভারতবর্ষ, মিশর, ইরাক প্রভৃতি দেশের নিকট বৃটেনের যে ষ্টার্লিং ঋণ আছে, তাহার কয়েকটি বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার নিজের প্রদত্ত ঋণের নিরাপত্তা ও নির্ব্বিঘ্ন পরিশোধ-হেতু উত্তমর্ণ মার্কিনের পক্ষে এইরূপ সর্ত্ত সন্নিবেশ স্বাভাবিক। মার্কিনের সহিত চুক্তি অনুযায়ী বৃটেনকে

তাহার সমস্ত ষ্টার্লিং ঋণ ঐ চুক্তি সম্পাদনের এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে, পরিশোধ করিবার বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। ত্রিবিধ উপায়ে এই ষ্টার্লিং ঋণ খালাসের বিধান ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তিতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম এক অংশকে আশু পরিশোধ করিতে হইবে, যাহাতে এই অংশ ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা প্রকরণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। দ্বিতীয় অংশকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে এবং তৃতীয় অংশটি অধমর্ণকে ঋণ-মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে উত্তমর্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। আমাদের প্রাপ্য ষ্টার্লিং সংস্থিতির একটি প্রকৃষ্ট অংশকে জাতীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের মুদ্রাপ্রকরণে পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার অবশ্য একটি সুমহান্ লাভ; কিন্তু ইহার আর একটি অংশকে পরিহার করিবার প্রস্তাব কখনও ন্যায় ও নীতি-সম্মত হইতে পারে না। বৃটেনের সহিত মার্কিনের যে ঋণ-চুক্তি হইয়াছে তাহার একটি সর্ত্ত এই যে, বৃটেন মার্কিনের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঋণ হইতে তাহার কোন ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তি ঐ দুইটি দেশের ঘরোয়া-ব্যাপার। তাহাতে ভারতের কিংবা অন্যান্য দেশের কোন অংশ বা সংস্রব ছিল না। সুতরাং ভারত, কিংবা মিশর, এই চুক্তির বশ্য নহে। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের বর্ত্তমান অর্থ-সচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খান কেন্দ্রীয় পরিষদে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য ঋণের কোন অংশই ভারত মকুব করিতে বাধ্য নহে। বৃটেন কৌশলে এই ঋণ পরিশোধের প্রশ্ন আন্তর্জ্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বিধান বহির্ভূত করিয়াছে এবং ইঙ্গ-মার্কিন ঋণ-চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী আর্জ্জেন্টাইনের সহিত তাহার প্রাপ্য ষ্টার্লিং সংস্থিতির পরিশোধ ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু আর্জ্জেন্টাইনের সহিত ভারতের কোন সাদৃশ্য নাই, এবং ভারতের তুলনায় আর্জ্জেন্টাইনের প্রাপ্যও অতি সামান্য।

এই ঋণ পরিশোধ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় বিশেষ বিবেচ্য। ভারত অতি দরিদ্র এবং আর্থিক এবং অর্থনৈতিক হিসাবে অতি অনুন্নত দেশ। অতি কষ্টে ভারত এই অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে, এবং ইহার পরিমাণ যেমন বিপুল ভারতের প্রয়োজনও তেমনি বিপুল। ইহার প্রকৃষ্টাংশ নগদ ভারতের হাতে না আসিলে, তাহার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব হইবে। অথচ, অনতিবিলম্বে ভারত যদি তাহার যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি সার্থক ও সফল করিয়া তুলিতে না পারে তাহা হইলে আসন্ন বৈদেশিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার যুগে তাহার পুনরুত্থান চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। যখন ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ শেষ হয়, তখন বৃটেনের নিকট তাহার প্রাপ্য ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ ছিল ১৪৮৯ কোটি টাকা। বর্ত্তমানে তাহা ১৬০০ কোটিতে উন্নীত হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধান্তে যে ঋণ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা "যুদ্ধ-ঋণ" নহে। এই অর্থ অবিলম্বে প্রদান করা কর্ত্তব্য। যুদ্ধে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন বৃটেনের পক্ষে এই বিপুল অর্থ নগদ পরিশোধ করা অসম্ভব, কিন্তু এই সমগ্র অর্থ যদি মালপত্র ও কলকব্জা লইয়া পরিশোধ করিতে হয়, তাহা হইলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সর্ব্ব প্রকার পণ্য লইয়া এই ঋণ আদায় করিতে হইলে, ভারতে শিল্পোন্নয়ন অসম্ভব। আমরা প্রচুর পরিমাণে কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি লইতে প্রস্তুত। কিন্তু বৃটেনের উৎপাদন-সামর্থ্য বিলক্ষণ হ্রাস পাইয়াছে। পরন্তু, বৃটিশ কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির মূল্যের তুলনায়, অনেক কম মূল্যে, আমরা ঐ সকল প্রয়োজনের অধিকাংশ অন্যান্য দেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব। সুতরাং এই ঋণের একটি প্রকৃষ্ট অংশ নগদ প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশকে তিন ভাগ করিয়া তাহার এক অংশের বিনিময়ে ভারতে বৃটিশ অধিকৃত খনি এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বত্ব ভারতবাসীকে হস্তান্তর করিতে হইবে; আর এক অংশকে কলকব্জা ইত্যাদির সাহায্যে আদায় দিতে হইবে, এবং বাকী অংশকে যুক্তি সঙ্গত সুদের হারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের কোনটিই অসঙ্গত নহে। যেরূপ অপরিসীম দুঃখ-ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রতা এবং অন্ন ও প্রাণের বিনিময়ে ভারত বৃটেনকে এই ঋণ দিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে, এই সর্ত্তগুলি অত্যন্ত উদার বলিয়াই প্রতীত হইবে; এবং অতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বৃটেনের এইগুলি অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য।

যুক্তরাজ্য হইতে সমাগত প্রতিনিধি দলের সহিত এই ঋণ পরিশোধ আলাপ-আলোচনায় ভারতীয় প্রতিনিধি-দল প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই ষোলশত কোটি টাকার অর্দ্ধেকের কিঞ্চিৎ অধিক অর্থাৎ ৮৫০ কোটি টাকা, ১৯৪৭ হইতে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। ২৫০ কোটি টাকা থাকিবে প্রচলিত মুদ্রা-সংস্থান স্বরূপে, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ত্তে, ২৫০ কোটি টাকা দ্বারা কল-কব্জা যন্ত্রপাতি এবং জন সাধারণের আহার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে হইবে; ২৫০ কোটি দ্বারা ভারতে প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যক সম্পদ-সম্পত্তিগুলি ক্রয় করিতে হইবে; ষাট কোটি টাকা লাগিবে যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানা এবং ভাণ্ডারাদি দখল করিতে এবং ৪০ কোটি টাকা হাতে থাকিবে, শেষোক্ত দুইটি দফায় ঘাটতি পূরণ করিবার নিমিত্ত। বাকী ৭৫০ কোটি টাকা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতিবর্ষে ৭৫ কোটি পরিমাণে পরিশোধ করিতে হইবে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। ইতিমধ্যে এই টাকার জন্য অন্ততঃ শতকরা ২টাকা হিসাবে সুদ দিতে হইবে। বার্ষিক ১২.৭৫ কোটি টাকা হিসাবে এই অংশের সুদের মোট পরিমাণ হইবে ১২৭.৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিবর্ষে ভারতের প্রাপ্য হইবে ৮৭.৭৫ কোটি টাকা। আমাদের কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি ও প্রসারের ফলে আমরা এই অর্থের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারিব কিন্তু এই সম্পর্কে আমাদের শাসক ও শোষক অধমর্ণের গূঢ় অভিপ্রায় কি তাহা পরে প্রকাশ্য। আলাপ-আলোচনায় প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়াছে; দ্বিতীয় পর্ব্বের এখনও বিলম্ব আছে।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম-এ, বার-এট-ল

সন্ধ্যার পর দাদার বাইরের ঘরে গিয়ে বসলাম। দাদা ইজিচেয়ারে শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন, আমাকে দেখে একটু হেসে বললেন—

"কি ? আজ আর যমুনাদের বাড়ী যাওয়া হল না।"

বললাম "তুমিই ত সব মাটি করলে ; বাবা যখন জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কোথাও বেরুবে নাকি—বললেই হ'ত—হ্যাঁ। কথাগুলো না হয় কালই হ'ত।"

বললেন "কথাগুলো অবশ্য কাল হ'লে কিছু দোষ ছিল না। কিন্তু মুকুন্দদাদার মৃত্যুর খবরে বাবার মনের দিকে চেয়ে আজ না বেরুনোই ঠিক হয়েছে। বিশেষতঃ বুঝতে পারছিলাম, বাবা আমাকে কতকগুলো কথা আজই বলতে চান—বললেই যেন তাঁর মন হালকা হয়।"

শুধালাম "তা যমুনাদের বাড়ী যাবে কবে ?"

বললেন "সামনের শনিবার কি রবিবার যাওয়া যাবে।"

শুধালাম "তা তুমি এর মধ্যেই গ্রামে রওয়ানা হয়ে যাবে না ত ?"

বললেন "আরে না, যদি যাইও, তার এখনও দেরী আছে। গ্রাম থেকে একজন কাজের লোক আনিয়ে রেখে তবে ত আমি যেতে পারব।"

বললাম "তোমার সঙ্গে এই সময় বেড়িয়ে এলে বেশ হ'ত। গ্রাম ত আমি কখনও দেখিনি। কিন্তু বাবাকে ফেলে দু'জনারই চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না—না ?"

দাদা সংক্ষেপে বললেন "আগে আমার যাওয়াই ঠিক হোক।"

বললাম "তা তোমাকে ত' যেতেই হবে দাদা। বাবা যা বললেন—তুমি না গেলে ত উপায়ই নাই।"

দাদা একটু হেসে বললেন "দেখি ভেবে, উপায় আছে কি না।"

শুধালাম "তা তোমার গ্রামে যেতে এত আপত্তি কেন ? বিশেষতঃ বাবা এত করে বলছেন।"

দাদা বললেন "আপত্তির কথা ঠিক নয়। তবে গ্রামে যেতে আমার মন সায় দিচ্ছে না।"

শুধালাম "কেন ? বজরায় করে নদীতে নদীতে রাজার মতন বেড়াবে—আমার মন ত ভাবতে নেচে ওঠে।"

কেমন একটু মলিন হেসে দাদা বললেন "আমাদের গ্রামে, আমাদের জমিদারীতে অশান্তির বিষ ছড়ান আছে—বড় হলে হয়ত কোনও দিন বুঝতে পারবি। আমার শক্তি যে অল্প—সে বিষ সইতেও পারব না, তাড়াতেও পারব না।"

•

মেজবৌদির সঙ্গে কথা হল রাত্রে বিছানায় শুয়ে। দাদার কথাটা নিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছি—কিছুই বুঝতে পারিনি। দাদাকে দু'একটা প্রশ্ন করায় কথাটা উড়িয়ে দিয়েছেন, আর কিছুই বলেন নি। বিকেল বেলায়, বাবার শেষের দিকের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম, দাদার কথা নিয়ে ভাবতে ভাবতে সে কথাটাও মনে পড়ে গেল—'সবই আমাদের অদৃষ্ট, নইলে এমন সোনার জমিদারীর এই অবস্থা হয়।' এসব কথার মানে কি ? এর পিছনে নিশ্চয়ই কিছু আছে—আমি জানি না। দাদা স্পষ্টই বললেন—'বড় হলে হয়ত কোনও দিন বুঝতে পারবি।' কিন্তু এখন যে কেন বুঝতে পারব না—কিছুতেই ভেবে পেলাম না। ভাবতে ভাবতে ক্রমে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম—যেন আমার পরিচিত জগতের একটা দিকের দরজা বন্ধ, মাথা খুঁড়েও খোলা যাচ্ছে না। অথচ খুলতেই হ'বে আমাকে।

কথাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে রাত্রে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ মনে হ'ল—মেজবৌদি হয়ত কিছু জানেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল—মেজবৌদি ত সেদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছেন, কি করেই বা জানবেন। মেজদার যা স্বভাব, মেজদা যে মেজবৌদিকে কোনও দিন বিস্তারিত কিছু

বলেছেন—এটা কেমন বিশ্বাস হ'ল না কিংবা মেজদাও হয় ত কিছু জানেন না। মেজবৌদিই প্রথম কথা কইলেন। বললেন "মুকুন্দ দা শেষ পর্য্যন্ত গেলেন।"

মেজবৌদির মুখে কথাটা শুনে একটু অবাক্ হ'লাম। মুকুন্দদাদা আমাদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজন - এই ত আমি জানি। তাঁর মৃত্যুর বিষয় নিয়ে মেজবৌদির কথাটার মধ্যে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের আভাষ ছিল—আমার মোটেই ভাল লাগলো না। মেজবৌদির কাছ থেকে ওরকম ধরণের কথা মোটেই আশা করিনি—কেমন বেমানান মনে হ'ল।

একটু জোরের সঙ্গে বললাম "মুকুন্দদাদার মৃত্যু আমাদের সংসারের পক্ষে একটা মস্তবড় দুর্ঘটনা।"

মেজবৌদি একটু যেন অবাক্ হয়ে শুধালেন "কেন?"

বললাম "এবার আমাদের জমিদারী রক্ষা করবে কে? বাবার ত ঐরকম শরীরের অবস্থা। মুকুন্দদাদাই ত আমাদের পক্ষ হয়ে আন্তরিক ভাবে সব দেখাশুনা করতেন, তাই ত সবদিক বজায় ছিল। শশাঙ্কখুড়ো ত' শুনেছি লোক সুবিধের নয়।"

একটু চুপ করে থেকে মেজবৌদি বললেন "দাদার উচিত মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে জমিদারী দেখাশুনা করা।"

আবার অবাক্ হ'লাম। এবারও কথাগুলো মেজবৌদির মুখে বেমানান হ'ল। এ রকম ভাবে জোর করে কোনও মতামত প্রকাশ করা, বিশেষতঃ দাদার সম্বন্ধে—এও যেন মেজবৌদির মুখে নতুন।—

বললাম "মাঝে মাঝে গেলে ত হবে না, গ্রামে ফিরে থাকতে হয়—ওকালতী ছেড়ে দাদার পক্ষে ত তা সম্ভব নয়।"

মেজবৌদি আর কোনও কথা কইলেন না। চুপ করে গেলেন।—কিন্তু কথাটা নিয়ে মেজবৌদির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করার প্রবল ইচ্ছা হ'ল। মেজবৌদির দু একটা কথার মধ্য দিয়ে এ টুকু বুঝতে আমার দেরী হয়নি যে মেজবৌদি জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে উদাসীন ত নন্‌ই, বরং তাঁর একটা সুস্পষ্ট মতামত আছে। একটু চুপ করে থেকে মিষ্টি করে মেজবৌদিকে শুধালাম—

"মেজবৌদি বলনা ভাই, এখন কি হ'বে?" শুধালেন "কিসের কি হ'বে?"

বললাম "জমিদারীর কি হবে। আজকে বাবার সঙ্গে দাদার কথা হচ্ছিল—আমি ছিলাম।—বাবা বিশেষ চিন্তিত হয়েছেন।"

মেজবৌদি বললেন "সে যা হয় ওঁরাই ব্যবস্থা করবেন।"

বললাম "ওঁরা ত কিছু ভেবে পাচ্ছেন না।"

মেজবৌদি বললেন "তা হ'লে এতদিন যে ভাবে চলছিল, সেই ভাবেই চলবে—আর উপায় কি?"

মেজবৌদির কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা চাপা উদাসীনতার ভাব—যেন তাঁর মতামতের সঙ্গে বাড়ীর কারোর মতামত ত মিলবেই না, অতএব বৃথা আলোচনা করে কি লাভ। বিশেষ আগ্রহ নিয়ে মেজবৌদির সঙ্গে আলোচনা করতে চাই, অথচ মেজবৌদির এ রকম একটা ধরণে একটু যেন রাগ হ'ল। একটু উত্তেজিত ভাবে বললাম—

"এখন যে আর মুকুন্দদাদা নেই—সে কথাটা যে তুমি ভুলে যাচ্ছ।"

মেজবৌদিও বেশ জোরের সঙ্গে বললেন—

"তা তিনিও যে একটা খুব আদর্শ ভাল লোক ছিলেন —তাও ত নয়। তাঁর জন্যই ত আজ এই অবস্থা।"

আশ্চর্য্য হ'লাম। মুকুন্দদাদা ভাল লোক ছিলেন না, তাঁর জন্যই আজ জমিদারীর এই অবস্থা, এবং মেজবৌদির কথার ভাবে সুস্পষ্ট বোঝা গেল যে, তাঁর এ বিষয় এতটুকুও সন্দেহ নেই—এ যে আবার নতুন কথা, সবই কেমন রহস্যময় বলে মনে হ'ল। মনে পড়ে গেল দাদার কথা—'জমিদারীতে বিষ ছড়ানো আছে।' বাবার কথাগুলোও মনে পড়ল। কি ব্যাপার? সবাই কি এরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে—আমার চোখের সামনে একটা কালো পর্দ্দা টেনে রাখতে চায়।

এতক্ষণ শুয়ে শুয়েই কথা হচ্ছিল। বিছানায় উঠে বসলাম। মেজবৌদির কাছে সরে গিয়ে শুধালাম "মেজবৌদি! তোমাকে বলতেই হ'বে সব আমাকে।"

বললেন "কি বলতে হবে?"

আবার শুধালাম "জমিদারীতে কি হয়েছিল? কেন তুমি বললে—মুকুন্দদাদা ভাল লোক ছিলেন না।"

একটু চুপ করে থেকে মেজবৌদি বললেন "সত্যি ভাই, আমি বিশেষ কিছু জানি না। তবে আমার দাদামশাই ত এই জমিদারীতেই চিরদিন কাজ করে গেছেন, তাই তাঁর কাছে কিছু কিছু শুনেছি।"

শুধালাম "কি শুনেছ বল।"

গম্ভীর ভাবে বললেন "শুনেছি—তোমাদের এই মুকুন্দদাদা তোমার দাদুর সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত করেছিলেনও।"

তাড়াতাড়ি শুধালাম "কি? কি? কি করেছিলেন তিনি?"

মেজবৌদির কাছ থেকে আর বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। বাকী কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললেন—তিনি বিস্তারিত কিছু জানেন না।

*

পরের দিন দাদার কাছে গিয়ে সোজা প্রশ্ন করলাম "দাদা! মুকুন্দদাদা লোক কি রকম ছিলেন?" দাদা একটু অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিয়ে চেয়ে শুধালেন "কেন?"

বললাম "শুনলাম নাকি তিনি লোক ভাল ছিলেন না, আমাদের দাদুর সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন।"

অবাক্ হয়ে দাদা শুধালেন "কে বলেছে?"

সোজা বললাম "মেজবৌদি।"

দাদা একটু চুপ করে রইলেন। হঠাৎ মনে হ'ল মেজবৌদির নাম করাটা দাদার কাছে বোধ হয় ঠিক হ'ল না—হয়ত মেজবৌদিকে দাদার কাছে খেলো করাই হ'ল তাড়াতাড়ি বললাম—

"মেজবৌদির অবশ্য সব শোনা কথা। তিনি নিজে ত আর জানেন না কিছু।"

গম্ভীরভাবে দাদা বললেন, "মেজবৌমা ভুল শুনেছেন। মুকুন্দদাদা না থাকলে আমাদের জমিদারী অনেক আগেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে শেষ হয়ে যেত আমাদের প্রতি তাঁর একটা আন্তরিকতা ছিল বলেই আজও আমাদের জমিদারী টিঁকে আছে।"

বললাম, "তা তোমারও ত শোনা কথা।"

বললেন, "হ্যাঁ, তবে আমি শুনেছি ঠাকু'মার কাছে তাঁর চেয়ে ত আর বেশী কেউ জানতেন না।"

তাও ত বটে। ঠাকু'মার চেয়ে আর কেই বা বেশী জানে—তা হলে দাদার কথাই ঠিক। মেজবৌদিই ভুল শুনেছেন।

কিন্তু দাদাই ত বলেছেন—জমিদারীতে বিষ ছড়ানো আছে—তবে? আবার সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল।

*

কিছুই মীমাংসা হ'ল না এবং দু' চারদিন এই নিয়ে দিনরাত ভেবেও কিছুই যখন বোঝা গেল না এবং বোঝবার উপাও যখন কোনও দিকে কিছুই খুঁজে পেলাম না তখন মন আপনা থেকেই অবসন্ন হয়ে ক্রমে কথাটাকে ভাসিয়ে রাখার শক্তি হারাল—কথাটা মনের গভীর তলদেশে গেল তলিয়ে। কথাটা কিন্তু আমি ভুলিনি এবং কোন কাজে বা কথায় কোনও ব্যাপারে যদি ঐ দিককার কোনও ইঙ্গিতও পেতাম অমনি কথাটা মনের উপরে ভেসে উঠে মনটাকে তোলপাড় করে দিয়ে আমাকে কিছুক্ষণের জন্য ভাবিয়ে তুলত—এর প্রমাণ জীবনে বার বার পেয়েছি বহুদিন।

দাদার সঙ্গে কথা হওয়ার দিন তিনেক পরে একদিন সকালবেলা দাদা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসতেই বারান্দায় আমার সঙ্গে দেখা হ'ল।

দাদা শুধালেন, "বাবা কি করছেন রে?"

বললাম, "বাবা বিছানায় বসে খবরের কাজ পড়ছেন। কেন?"

বললেন, "একটু দরকার আছে।" বলে বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কৌতূহল হ'ল। আমিও পিছন পিছন গিয়ে ঢুকলাম বাবার ঘরে। বাবা দাদাকে দেখে বললেন "বস"।

দাদা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "মেজবৌমা কবে বাপের বাড়ী যাবেন, তোকে কিছু বলেছেন?"

বাবা যেন একটু আশ্চর্য্য হয়ে শুধালেন, "কেন?"

দাদা বললেন, "এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। অনেক দিন ত যান নি, বুলার পরীক্ষা শেষ হলে যাওয়ার কথা ছিল। এই সময় ত ঘুরে এলেই ভাল হয়।"

বাবা বললেন, "কিন্তু—"

কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন—চেপে নিলেন। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, দাদা কিন্তু ঠিক বুঝেই জবাব দিলেন, "আমি যদি দেশে যাই ও মেজবৌমা ঘুরে এলে না হয় যাব। মুকুন্দ দাদার শ্রাদ্ধের সময় যাওয়ার আমার ঠিক ইচ্ছে নেই।

বাবা শুধালেন, "কেন?"

দাদা বললেন, "ও-সময় ওঁদের বাড়ী আত্মীয়-স্বজনে থাকবে ভরা, সবাই থাকবে বিশেষ ব্যস্ত—তার মধ্যে আমি ঠিক খাপ খাওয়াতে পারব না।"

একটু চুপ করে থেকে বাবা শুধালেন, "ভেবে কিছু ঠিক করলে কি?"

দাদা বললেন, "কথাটা নিয়ে আমি ভেবেছি। একান্ত প্রয়োজন যদি হয়, আমি অবশ্য যাব। কিন্তু আমার মনে হয় আমার এখন দেশে না গিয়ে প্রথম অন্য ব্যবস্থা করলেই ভাল হয়।"

বাবা শুধালেন, "কি ব্যবস্থা?"

দাদা বললেন, "আমি ত' জমিদারীর কিছুই জানিও না বা বুঝিও না। হঠাৎ এ-সময় দেশে গিয়ে দাঁড়ালে, আমি কি কিছু করে উঠতে পারব? বরং সকলের চক্ষে আমার অক্ষমতা প্রমাণ হয়ে গেলে চিরদিনের জন্য জমিদারীতে আমার মর্য্যাদা হারিয়েই ফিরব।"

বাবা শুধালেন, "তা—কি করতে চাও?"

দাদা বললেন, "জমিদারীর ব্যাপারে নির্ভর করা যায় এমন একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারীকে কলকাতায় ডেকে

পাঠাই। তার কাছ থেকে বিস্তারিত অবস্থাটা এবং জমিদারীর কাজকর্ম্ম আগে বুঝে নি।"

বাবা বললেন, "সেটা ত' গ্রামে গিয়ে করলেই সর্ব্বদিক দিয়ে ভাল হয়।"

দাদা বললেন, "এ কাজে ত' কিছুদিন সময় লাগবে। ততদিন গ্রামে গিয়ে বসে থাকা—"

বাবা শুধালেন, "কিন্তু ইতিমধ্যে উপায় কি?"

দাদা বললেন, "সে-কথাটাও আমি ভেবেছি।"

দাদা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "এক কাজ করলে কিরকম হয়? খুলনার রায়বাহাদুর দাদুর আমল থেকে আমাদের বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। তিনি অবশ্য অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন —তাঁর কাছ থেকে আর কিছু আশা করা যায় না। কিন্তু তাঁর ছেলে যোগেশ বাবুও খুলনার একজন গণ্যমান্য বিশিষ্ট উকিল। তাঁকে ট্রাষ্টী ক'রে তাঁর উপর আমাদের জমিদারী দেখা-শুনার ভার দিলে কি রকম হয়। মা-পুর খুলনা থেকে ত বেশী দূর নয়।"

খুলনার রায়বাহাদুর হরিশ সেনের নাম আমি আগেই শুনেছি। তিনি চিরদিনই আমাদের বংশের বিশেষ দরদী বন্ধু—এ-কথাও আমার অবিদিত ছিল না। এবং বাবা যে মাঝে মাঝে প্রয়োজনে তাঁর কাছে চিঠি-পত্র লেখেন—সে খবরও আমি জানতাম। বিশেষ বৃদ্ধ হওয়ার দরুণ ইদানীং বহুদিন তিনি আর বড় একটা কলকাতায় আসেন না। তবে আগে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন এবং এলেই বাবার সঙ্গে এসে দেখা করে যেতেন—এ কথা ছেলেবেলার স্মৃতির মধ্যে আমার মনেও পড়ে।

তা দাদা ত' এ কথাটা বলেছেন মন্দ না—তাই ত, তাঁদের উপর জমিদারী দেখাশুনার ভার দিলেই ত হয়।

বাবা কিন্তু বললেন, "তিনি এ ভার নেবেন কেন?"

দাদা বললেন, "তাঁকে অনুরোধ ক'রে রাজী করাতে হ'বে এবং রায়বাহাদুরকে আমি যতদূর জানি তাঁকে জোর করে ধরলে তিনি হয়ত ছেলেকে এ-ভার নিতে বলবেন। আর একটা কথা—আমরা যোগেশবাবুর উপর ত বৃথাই এ ভার চাপাব না, তিনি তাঁর উপযুক্ত পারিশ্রমিক নেবেন। আমাদের জমিদারীর আয় ত কম নয়, বছরে বিশ হাজার টাকারও বেশী। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে অন্ততঃ বারো চৌদ্দ হাজার টাকা আমাদের নীট পাওনা। যোগেশবাবু না হয় বছরে হাজার দেড়েক বা হাজার দুই টাকা নেবেন। কিংবা যোগেশবাবুর সঙ্গে এরকম বন্দোবস্ত করে নিলেও হয় যে, বছরে যা আদায় হ'বে তিনি তার উপর শতকরা একটা কিছু পাবেন।"

বাবা চুপ করে রইলেন।

দাদা আবার বললেন—"যোগেশবাবুর মতন লোক যদি জমিদারীর ভার নিয়ে জমিদারীতে গিয়ে দাঁড়ান, তা হলে শশাঙ্কখুড়ো তাঁর সঙ্গে লাগতে কিছুতেই ভরসা করবেন না। আর আমাদের জমিদারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ত যথেষ্ট আছে—খুলনায় আমাদের ষ্টেটের মামলা-মোকদ্দমা ত সব তাঁরই হাতে।"

বাবা বললেন, "দেখ, যদি রাজী করাতে পার। তা এ ব্যবস্থা করতেও ত তোমাকে খুলনা যেতে হয়। এবং সেদিক দিয়ে দেরী না করাই ভাল।"

দাদা বললেন "এ কাজের জন্য খুলনা আমি এখুনিই যেতে রাজী। তবে আমার মনে হয়, আমার যাওয়ার আগে, তুমি রায়বাহাদুরকে একখানা চিঠি লেখ। চিঠিতে যেমন সব কথা গুছিয়ে লিখে বিশেষ ক'রে অনুরোধ করা যায়, মুখে সেরকম ঠিক পারা যায় না। চিঠির জবাব এলেই আমি খুলনায় যাব।"

এমন সময় দরজার পাশে চুড়ির ঠুনঠুনি শব্দ শুনে চেয়ে দেখি মেজবৌদি দরজার পাশে বারান্দায় দাদার চোখের আড়ালে দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে একাগ্র মনে সব কথাগুলো শুনছেন। ঘরের বাহিরে গিয়ে মেজবৌদিকে চাপা গলায় বললাম, "মেজবৌদি! তুমি আড়ি পেতে সব শুনছ?"

একটু হেসে মেজবৌদি বললেন "বাবার যে দুধ খাবার সময় হয়ে গেল—নিয়ে আসব?"

বললাম "তা নিয়ে এসনা। কথাবার্ত্তার মধ্যে দুধ খেতে আর বাধাটা কি?"

মেজবৌদি বললেন "বাবাকে জিজ্ঞেস করো ভাই—দুধের সঙ্গে পাকা পেঁপে কেটে দেব কি এখন।"

এমন সময় দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মেজবৌদি ঘোমটা টেনে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি দাদাকে শুধালাম—

"শেষ পর্য্যন্ত কি ঠিক হ'ল দাদা?"

দাদা একটু হেসে বললেন "তোর যে ভয়ানক আগ্রহ দেখছি। বাবা আজই রায়বাহাদুরকে চিঠি লিখবেন।"

[ক্রমশঃ

পুরানো কথা

শ্রীসুবোধ রায়

সমসাময়িক সাহিত্যের মত সমাজ-দর্পণ অতীব বিরল। সুদক্ষ শিল্পীর হাতের ছবির উৎকর্ষ ও ঔজ্জ্বল্য যেমন কালান্তরেও ম্লান হয় না—সুসম্পাদিত ও সুপরিচালিত সাময়িক পত্রিকাতে অঙ্কিত তৎকালীন সমাজ-চিত্রও তেমনি বহুদিন অম্লান থাকে। এই দিক হইতে বিচার করিলে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "সাধারণী"র মূল্য খুবই বেশি। এই প্রবন্ধে তৃতীয় বর্ষের "সাধারণী" হইতে কয়েকটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করিব।

যুবরাজের ভারত-আগমন

উনবিংশ শতকের তৃতীয় পাদের শেষে ও চতুর্থ পাদের প্রথমে (১৮৭৫-৭৬)—ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে—ইংরাজ-সরকারের সর্ব্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিরাট ও সার্থক চালবাজী—তৎকালীন যুবরাজকে (পরে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতে প্রেরণ। সিপাহী বিদ্রোহের পর সারা ভারত-আলোড়নকারী এরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ ঘটনা আর ঘটে নাই। সিপাহী-বিদ্রোহের পর তখন অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে ভারতের শক্তিমান্ ও ধনবান্‌দের টানিয়া আনিয়া কায়েমী স্বার্থের বেশ একটি সুপুষ্ট দল ততদিনে গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। শিকল-দেবীর এই পুরোহিতের দল ভাবগদগদ কণ্ঠে রাজভক্তির মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যে ভাবে সেদিন ভারতের গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তখনকার সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে মসীলিপ্ত হইয়া আছে। রাজভক্তি তথা যুবরাজ-প্রীতিকে আত্মোন্নতির পাদপীঠরূপে ব্যবহার করিবার জন্য পাগল মানুষ শিক্ষাদীক্ষা, আত্মমর্য্যাদা ও হিতাহিত-জ্ঞান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ, ভবানীপুরের জগদানন্দ মুখুজ্জে মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার কুলবধূগণের দ্বারা যুবরাজবরণ উল্লেখ যোগ্য। এই প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের "বাজীমাৎ" স্মরণীয়—

> বেঁচে থাকো মুখুয্যের-পো খেল্‌লে ভালো চোটে
> তোমার খেলায় রাঙ রূপো হয়, গোবরে শালুক ফোটে।
> "ফিক্র"দানে একতাড়াতে ক'রলে বাজীমাৎ
> মাছ-কাতুরে ভেকো হোলো, কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ।
>
> ... ...
>
> পুণ্যদিন বিশে পৌষ বাঙ্গালার মাঝে
> পর্দ্দা ফেলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে।
>
> ... ...
>
> স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হ'তে পারে,
> বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কি লো তারে?
>
> ... ...

এই লোকের দাসমনোবৃত্তি প্রবাহের প্রতিরোধে এবং লক্ষ লক্ষ টাকা এই উপলক্ষ্যে অপব্যয়ের প্রতিবাদে যাঁহারা সেদিন দৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহাদের অন্যতম। ১২৮১-৮২ সালের "সাধারণী" খুলিলেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই সম্পর্কে তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ সাহসিক সমালোচনা চোখে পড়িবে। এই তথাকথিত রাজভক্তদলকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, তৃতীয় বর্ষের "সাধারণী"র ১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত (২৩ ফাল্গুন ১২৮২) সংবাদ শীর্ষক মন্তব্য হইতে বুঝা যাইবে:

"যুবরাজের কল্যাণে চুয়াডাঙ্গার বারোয়ারি পূজার বড় ধুম। জমীদারগণ দু'শ এক'শ টাকা করিয়া চাঁদা দিতেছেন। মহা গণ্ডগোল পড়িয়াছে। আমাদের কোনো বিদেশীয় বন্ধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, তাঁহার দেশে একটি রাজভক্তি-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা রায়বাহাদুরগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। তাহাতে দশ পনেরো হাজার শুকপক্ষী ক্রয় করিবেন ও সেইগুলিকে ক্রমাগত "জয় যুবরাজের জয়" "জয় যুবরাজের জয়" এই বুলি পড়াইবেন। সেগুলি সুশিক্ষিত হইলে, সিলেক্ট কমিটীর পরামর্শ লইয়া দেশের স্থানে স্থানে ছাড়িয়া দিবেন; সেগুলি অনবরত বলিবে—"জয় যুবরাজের জয়, জয় যুবরাজের জয়।" এরূপ করিলে দেশের মধ্যে কস্মিন কালে আর রাজদ্রোহিতা থাকিবে না।"

যাঁহারা এই বিরোধী দলে ছিলেন, তখনকার রাজশক্তি তথা পুলিসের হাতে তাঁহাদিগকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। এই প্রসঙ্গে "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটক অভিনয়ের জের উল্লেখযোগ্য। ঐ বৎসরের ২০ সংখ্যা "সাধারণী"র সম্পাদকীয় (৩০ ফাল্গুন ১২৮২) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:

"যুবরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বাহাদুর জগদানন্দ সমাজে যে বাহবা লইয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। কলিকাতাস্থ ন্যাসানেল থিয়েটার কোম্পানী সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া আপনাদের রঙ্গ-ভূমিতে একটি প্রহসন অভিনয় করেন। জগদানন্দ বাবু সহজেই তাহাতে রাগান্বিত হন এবং যাহাতে সেই প্রহসনের পুনরভিনয় না হয়, তজ্জন্য সরকার বাহাদুরকে জানান। সরকার বাহাদুর তৎক্ষণাৎ কায়মনোবাক্যে জগদানন্দের সাহায্যার্থে সুসজ্জিত হইলেন। অতিরিক্ত ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মের এক আদেশ প্রচারিত হইল

যে, যে রঙ্গভূমিতে অশ্লীল বা কোন ব্যক্তির গ্লানিকারক কোনো অভিনয় অভিনীত হইবে, অথবা যে রঙ্গভূমি অভিনয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় অভিনেতৃগণের চরিত্র ক্রমে কলুষিত হইবার সম্ভাবনা, সে রঙ্গভূমির অভিনয় গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। তৎপরেই যে রাত্রে প্রাগুক্ত রঙ্গভূমিতে উল্লিখিত প্রহসন অভিনীত হইতেছিল, সেই রাত্রে পুলিস গিয়া অভিনয় বন্ধ করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু যে কারণেই হউক বন্ধ করিতে পারে নাই। সেই পর্য্যন্ত ঐ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ উপেন্দ্রবাবু সরকার বাহাদুরের বিলনয়নে পড়েন। উপেন্দ্র বাবু মস্তকোপরি তীক্ষ্ণধার খড়্গ রোদুল্যমান না জানিয়া যেমন অভিনয় কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন, সেইরূপ করিতে থাকেন। পরে হঠাৎ এক রাত্রে পুলিস আসিয়া তাঁহাকে এবং অভিনয়লিপ্ত আর কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের এক এক মাস কয়েদ হইয়া গিয়াছে। অপরাধ এই যে, "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" নাটক যাহা ন্যাসানেল রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইতেছিল, তাহা অশ্লীল।"

এই দুইজন হইতেছেন গ্রেট ন্যাসানেল থিয়েটারের ডাইরেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস ও অধ্যক্ষ বাবু অমৃতলাল বসু। অতঃপর হাইকোর্টে আপীল করিলে এই দুইজনই মুক্তি পান। এই সম্পর্কে ২২ সংখ্যা "সাধারণী"র (১৪ই চৈত্র ১২৮২) সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে :

"গত সোমবারে জষ্টিস্ ফিয়ার ও মার্কবি মহোদয় দ্বয় 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী নাটকে কিছুই অশ্লীল নাই এবং অভিনয়কালে কোনরূপ অশ্লীলতা প্রদর্শিত হয় নাই, এইরূপ স্থির করিয়া বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস ও বাবু অমৃতলাল বসুকে নির্দোষী বলিয়া মুক্তিদান করিয়াছেন। তবে যে পোলিস বিনা কারণে দুইজন ভদ্রলোকের নামে গ্লানিজনক অভিযোগ করিল. তবে যে ম্যাজিষ্ট্রেট কোনো প্রমাণ না পাইয়াও অবাধে দুইজন সম্ভ্রান্ত লোককে কারাকক্ষে নিঃক্ষেপ করিতেছিলেন, এ সকল কথার মীমাংসা করিতে আমাদের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন-কানুনের সৃষ্টি হয় নাই।"

... ...

যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্য বাঙ্গলা সরকার যে কতকগুলি কৌতুককর আদেশ জারী করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে: (তৃতীয় বর্ষ "সাধারণী" ৮ম সংখ্যা, ৫ই পৌষ, ১২৮২—সংবাদ)

"কলিকাতার বাড়ীওয়ালাদের বিপদ—অন্ততঃ রাজপথের ধারে বাটীর সম্মুখভাগটি সুধারঞ্জিত করিতে হইবে। গাড়ীওয়ালার বিপদ—সকল গাড়ীরই রঙ করিতে হইবে; গাড়ীওয়ালারা এখন আগামী খরচ কোথায় পায়। আরোহীর বিপদ—গবর্ণমেণ্ট প্রায় তিন হাজার গাড়ী আপনারা ভাড়া করিবেন। ষ্টীমার সকল টিকিট বেচিতেছে; লোকে সেইখান হইতে যুবরাজের পদার্পণ সুন্দর লক্ষিত হইবে বলিয়া দশ টাকা দিয়া টিকিট লইতেছে, যখন ষ্টীমারকে বলিবে 'তফাৎ' তখন লোক অর্থব্যয়ের বিফলতা উপলব্ধি করিয়া বিপদ বুঝিবে। গুরুতর বিপদ, কলিকাতার ভিক্ষুকগণের—বিশেষ অন্ধ, খঞ্জ, আতুরের। পোলিশের কনেষ্টবেলেরা এই সকল নিরুপায় নিঃস্ব লোককে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহা তাহারাই জানে আর হগ সাহেব জানেন, আর ভগবান জানেন। এ সকল কথা যুবরাজের কাণে উঠিলে, তিনি কি বলিবেন বলিতে পারি না। আমাদের শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে।" *

[স্বনামখ্যাত কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত সুবোধ রায় মহাশয় "সাধারণী" হইতে যে কয়টী পুরাতন সংবাদ প্রকাশ করিতেছেন, পাঠকগণের মনোরঞ্জনার্থ তাহা বঙ্গশ্রীতে পরিবেশন করা হইল। সুবোধ বাবু এইরূপ পুরাতন কথা লিখিলে সাধারণের যথেষ্ট উপকার হইবে।

যে প্রহসন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়, তাহার নাম ছিল "গজদানন্দ"—তাহার মধ্যে একটী গানের দুই একটী কথা ছিল যেমন—

ওরে গজ হতে চাও
গজ গিরিধন···

এই প্রহসনটি গভর্ণমেণ্ট জরুরী আইনে বন্ধ করিয়া দেন। পরে উহা হনুমান চরিত্র নামে অভিনীত হয়। সেটিও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পরে অন্য নামে হয় "Police of Pig and Sheep"—কারণ পুলিস কমিসনার ছিলেন-স্যার ষ্টুটি হগ এবং আসিষ্টাণ্ট ছিলেন মিঃ ল্যাম্ব। অতঃপরে "সুরেন্দ্র বিনোদিনী" অশ্লীল অজুহাত দিয়া উপেন্দ্র বাবু ও অমৃত বাবুকে নির্য্যাতন করা হয়। হাইকোর্টের জজ মিষ্টার জাষ্টিস ফিয়ার ছাড়িয়া দিয়াও তিনিও ত্রাণ পান নাই। তাঁহাকেও অবসর গ্রহণের বহু পূর্ব্বে ছুটি নিয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে হইয়াছিল। পরে আর তিনি আসেন নাই।

রাজকুমার (প্রিন্স অব ওয়লেস্) আসেন ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী ডিস্‌রেলির প্রধান মন্ত্রিত্বের সময়ে। লর্ড নর্থব্রুকও অল্পদিন মধ্যে ছাড়িয়া দেন এবং ডিসরেলির শিষ্য লর্ড লীটন ভারতের বড় লাট হইয়া আসেন।]

বঃ সঃ

আনন্দমঠের বাস্তব রূপ

শ্রীনমিতা ঘোষ

ঋষি বঙ্কিম ‘আনন্দমঠ’ কল্পনায় গড়িয়া তুলিয়াছিলেন. তাহার বাস্তব রূপ দান করিয়াছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র দুইজনের ভিতর সময়ের অনেক ব্যবধান। সত্যানন্দের সময়ে ইংরাজের উষাকাল, মুসলমান-রাজ্যের অরাজকতার ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মুসলমান আমলের অরাজকতার দিনে শান্তিপূর্ণ রাজ্য সকলেরই কাম্য ছিল, বহির্বিষয়ক জ্ঞান ও লোকশিক্ষায় ইংরাজকে পটু দেখিয়া তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ ইংরাজদের কিঞ্চিৎ অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যত দিন যাইতেছে আর আমরা এই সম্রাজ্যবাদীদের সহ্য করিতে রাজী নহি। তৎকালীন হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল—মুসমান বাংলার রাজ্যশাসন ত্যাগ কর,’ আজিকার দিনেও ভারতবাসীরা এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, “ইংরাজ ভারত ত্যাগ কর”।

আনন্দমঠের সপ্তম পরিচ্ছেদে যখন শান্তি ও জীবানন্দ হাত ধরাধরি করিয়া ‘যুদ্ধশেষে জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে’ অন্তর্হিত হইল তখন বঙ্কিমচন্দ্র নিদারুণ আক্ষেপে বলিয়াছেন—“হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের মত পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?”

বঙ্কিমচন্দ্রের সে কামনা সফল হইয়াছিল বীর সুভাষের আবির্ভাবে। বাঙ্গালীজাতিকে সকলে ভাবপ্রবণ,ভীরু প্রভৃতি অপবাদে ভূষিত করেন। বীর সুভাষ এ সমস্ত অপবাদই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র দেখাইয়াছেন—বাঙ্গালী ভীরু নয়, তাহারা শুধু মসী ধরিতেই পটু নয়, অসি ধারণেও কম যায় না। দেশ-দেশান্তর মাঝে বনে জঙ্গলে নির্ভীক সুভাষ তাঁহার বাহিনী লইয়া বিচরণ করিয়াছেন। প্রমাণ করিয়াছেন বাঙ্গালী ভীরু নয়, বাঙ্গালী সাহসী, যাহার ভয়ে বিশাল ইংরাজ-সাম্রাজ্য সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সত্যানন্দকে সন্তানদল বিষ্ণুর অবতার-স্বরূপ মনে করিত। তাহাদের নিকট সত্যানন্দ গুরুর গুরু পরমগুরু ছিলেন। সত্যানন্দ প্রভু অনন্ত জ্ঞানবান্, শুদ্ধাচারী লোকহিতৈষী ও দেশহিতৈষী ছিলেন। নেতাজী সম্বন্ধে আর কি বলিব, তাঁহাকে আজাদ হিন্দের সৈনিকদল যে কি ভাবিত বলিতে পারা যায় না, তাহারা মৃত্যুকালে দেবতার নাম উচ্চারণ না করিয়া নেতাজীর নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অনন্তধামে প্রস্থান করিত। শুধু সৈনিক দল বলিলে ভুল হয়,সারা ভারতবাসী, এশিয়াবাসী তাঁহাকে দেবতার মত মনে করে। এমন কি একজন জাপ অফিসার বলিয়াছেন—

He is a greatman, I can die thousand times, I can shake hand with him.

যাঁহাকে বিদেশী এতখানি শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তাঁহাকে ভারতবাসী যে দেবতা ভাবিবে এ আর তেমন বড় কথা নয়।

সত্যানন্দ ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই অতিশয় নির্ভীক প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। সত্যানন্দ সম্বন্ধে ভবানন্দ বলিয়াছেন “তাঁহাকে আটক রাখে এমন মুসলমান বাঙ্গালায় নাই।”—সুভাষচন্দ্রকেও ইংরাজ আটক করিয়া রাখিতে পারে নাই। সত্যানন্দ যেমন এক “বন্দেমাতরম্” মন্ত্রে তাহার সন্তানদলকে একসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রও তাহার হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সৈনিকদলকে ‘জয়হিন্দ’ মন্ত্রে এক সূত্রে বন্ধন করিয়াছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও সত্যানন্দ উভয়েই চিরকুমার ছিলেন। দুইজনেই দেশের স্বাধীনতার জন্য এক বিরাট স্বাধীনতাকামী সৈনিকদল গঠিত করিয়াছিলেন। তাহাদের যুদ্ধসামগ্রীও বেশী ছিল না,অপরদিকে তাহাদের শত্রুদলের বিরাটযুদ্ধের উপকরণ ছিল। দেশের জন্য সুভাষচন্দ্র ও সত্যানন্দ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সত্যানন্দ দীক্ষা-দানকালে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতেন যে, তাহাদের জাতি-ত্যাগ করিতে হইবে। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই। সুভাষচন্দ্রের ‘আজাদ্-হিন্দ’ ফৌজ দলেরও এই মূলমন্ত্র ছিল—সেখানে সব একজাতি, একপ্রাণ। কোনরূপ জাতিভেদ ছিল না। যতদিন না দেশমাতার উদ্ধার হয় ততদিন তাঁহার উদ্ধারের জন্য সন্তানদলকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। এজন্য তাহাদের গৃহধর্মও পরিত্যাগ করিতে হইবে। আজাদ হিন্দের সৈনিকদলও আঙুলের রক্তদ্বারা নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং যতদিন তাঁহারা জীবিত থাকিবেন ততদিন দেশমাতার সেবা করিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এ ভারতভূমিতে শান্তি, কল্যাণীর মত কন্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে নিরাশ করেন নাই। আমাদের এ ভারতভূমিতে শান্তি ও কল্যাণীর মত কন্যার দেখা মিলিয়াছিল। কল্যাণীর মত আজাদ হিন্দ ফৌজে অনেক মেয়ে স্বামীকে এ মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং নিজের সমস্ত অলঙ্কার ও সম্পত্তি দেশের স্বাধীনতাকামী ফৌজদলকে দান করিয়াছিলেন। কর্ণেল লক্ষ্মী স্বামীনাথন, রেবা সেন, শিপ্রা সেন প্রমাণ করিয়াছেন ভারতললনা অবলা নয়। তাঁহাদের স্ত্রীবাহুতে বল আছে। শান্তির মত তাঁহারাও

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছেন। আনন্দমঠ পড়িয়া যে আমরা ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম, আমাদের নিৰ্জ্জীব রক্ত গরম হইয়া উঠিত, ভাবিতাম– হায় এমন দিন কি বাস্তবে আসিবে, এ শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনায় রঙ ফলাইয়াছেন। কিন্তু নেতাজীর 'ঝাঁসী রেজিমেণ্ট' দেখাইয়াছেন কল্পনাও সত্য হয়। ভারত-ললনারা রাইফেল কাঁধে 'কদম কদম বাড়ায়ে' রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আজাদ হিন্দের নারী-বাহিনী শাস্তির কথার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, বঙ্কিম যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই তাঁহারা দেখাইয়াছেন, তাহারা দেখাইয়াছেন যে, নারী কেবল গৃহধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী নয়, বীরধর্ম্মেও তাহাদের সহযোগিতা একান্ত দরকার।

যুদ্ধক্ষেত্রে সন্তানদল "বন্দে মাতরম্! সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং!" সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে নূতন উদ্যমে যুদ্ধ করিতেন। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে তাঁহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বল সঞ্চার হইত। সেইরূপ আজাদহিন্দ ফৌজদলও 'কদম কদম বাড়ায়ে যাও,' গানের তালে তালে দিল্লীর পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। সত্যানন্দ ও সুভাষচন্দ্র উভয়েই তাঁহার সৈনিকদের সন্তানতুল্য স্নেহ করিতেন। তাহাদের বিয়োগে তাঁহারা অতিশয় কষ্ট পাইতেন।

আনন্দমঠে সত্যানন্দ গভীর ক্ষোভের সহিত বলিয়াছেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না —আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না," মনে হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রও সত্যানন্দের ন্যায় খেদোক্তি করিয়া এ ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কল্পনায় সত্যানন্দ যেমন মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস করিয়া বাংলাদেশকে অরাজকতা ও আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, বাস্তবে সুভাষচন্দ্রও ভারতভূমিকে স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত করাইয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সগর বংশ-ধ্বংসের ওই দেশ
ভস্মের রাশি শান্তির জলে ধোয়া।
গঙ্গার কাজ ওইখানে এসে শেষ
গর্জ্জে ব্রহ্মপুত্র ও করতোয়া।

উদিতের দেশ অস্তের কেহ নয়,
লুকাইয়া আছে হোথা কপিলের রোষ।
সাগরের সাথে হিমালয় কথা কয়,
ওইখানে মহামুক্তির নির্ঘোষ।

ও দেশ স্ফটিক-স্তম্ভ এ বঙ্গের,
গ্রাহ্য করে না বাড়বানলের তাপ।
ভাবিয়ো না কথা বিভাগ কি ভঙ্গের
নর-সিংহের ঘটাবে আবির্ভাব।

নূতনের দিক, ওই দিক চেতনার,
প্রথম জাগায় রবি নিজে কর হানি,
অমৃতের দেশ ওই দেশ বেদনার,
মুখেতে উহার সদা জাগৃহি-বাণী।

প্রেতিনীর প্রেম

ডাঃ হৃষীকেশ হালদার

আলোচনা সুরু হয়েছিলো ইলিশ মাছের দুর্মূল্যতা নিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত তা' পর্য্যবসিত হলো প্রেততত্ত্বে।

সান্ধ্য মজলিসে যেমন মধু মিস্ত্রী লেনের গ্রাজুয়েট মুদী থেকে আরম্ভ ক'রে রোগিহীন ডাক্তার, মক্কেলহীন উকীল, খদ্দরে আত্মাবান্ আদ্দির পাঞ্জাবী-পরা স্বদেশী তরুণ পর্য্যন্ত সকলের গতিবিধি অবাধ—আলোচনাও তেমনি প্রবাহিত হতো নানা খাতে। হিটলার, মুসোলিনী, আমসত্ত্ব, সোনার দর, আর ম্যালেরিয়া-জ্বর, জগদম্বা, নেত্যকালী, ভূত এবং ভগবান পর্য্যন্ত সমালোচনার স্রোতে ভেসে যেতো। সভা যখন ভাঙতো কারো স্মরণ থাকতো না—কী নিয়ে সুরু হয়েছিলো।

রমেশ বললো: এই বাদলার দিনে খিচুড়ী আর ইলিশ মাছ ভাজা, বুঝলে খুড়ো—প্রিয়ার চেয়ে মধুর, শীতের দিনে লেপের চেয়েও মনোরম।

নীরেন বললো: ঝোলে খাও, ঝালে খাও, অম্বলে খাও, ভেজে নাও—সবেতেই উনি আছেন সর্ব্বঘটে কাঁঠালী কলার মতো। মুনি-ঋষিরা ওঁর প্রশস্তি লিখে গেছেন 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলে। আহা, কিবে রৌপ্যবরণ, কিবে গন্ধ। সাধে কী আর ইলিসগন্ধী মৎস্যগন্ধাকে নিয়ে মহাভারতে অত বড় কাণ্ডটা ঘটেছিলো। সৌম্যেন, তুমি ইলিস-প্রশস্তি লিখে ফেল তোমার গদ্য কবিতার খাতায়।

তার কী উপায় আছে রে ভাই, সৌম্যেন হতাশস্বরে বললো: ঈশ্বর গুপ্ত ঈশ্বরপ্রাপ্ত হলেও তাঁর ইলিস-কাব্য যে এখনো বেঁচে রয়েছে পোড়া দেশে। নইলে...

আর বাবাজী, হরিখুড়ো বললেন: ইলিশ মাছে এ বছর কী হাত দেবার উপায় আছে। যা দর, বাপস্। সে দিনকালও নেই, সে ইলিস মাছও নেই। এক-একটা ইলিস হতো ইয়া লম্বা, ই-য়া চওড়া এক হাত, দেড়হাত। দামও তেমনি সস্তা পয়সা জোড়া দরে বাজারে হাঁকতো। আর তার গন্ধে মানুষ তো মানুষ, ভূত-প্রেত পর্য্যন্ত মোহিত হয়ে যেতো।

ভূত-প্রেত! জয়ন্ত ব্যঙ্গ করে বললো: মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! যত্তো সব কুসংস্কার।

ভূত-প্রেত নেই মানে? খুড়ো প্রশ্ন করলেন: তাহ'লে আমি-তুমিও নেই?

আমি-তুমি এ সব হচ্ছে প্রত্যক্ষীভূত বাস্তব, আর ভূত হচ্ছে——

বাতাস অপ্রত্যক্ষ। একে তুমি অস্বীকার করতে চাও? খুড়ো আবার প্রশ্ন করলেন।

বাতাস আমাদের অনুভূতির মধ্যে—কিন্তু ভূত-প্রেত নয়। জয়ন্ত বেশ জোরের সঙ্গে বললো: ভূত জিনিষটা নিছক ঠাকুর্দ্দার আমলের পচা কুসংস্কার—অলস মনের ভীরু কল্পনা।

খুড়ো অসহায়ভাবে সুরঞ্জনের দিকে চাইলেন। জয়ন্তর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত তর্কযুদ্ধে টিকিতে পারে একমাত্র সে-ই।

সুরঞ্জন দেখলো খুড়ো পরাজিত, সুতরাং একবার কাসলো। তর্ক সুরু করবার এই তার রীতি। তারপর বললো: তুমি ভূত মানো না, অতএব ভগবানও মানো না। কারণ ভূতের মতো ভগবানও অপ্রত্যক্ষ।

তুমি কী ভূত আর ভগবানকে এক পর্য্যায়ে ফেলতে চাও নাকি? বললো মধুসূদন চাকলাদার।

জয়ন্ত হেসে বললো: আচ্ছা ধরো আমি ভূত-প্রেত মানি না। এমন কী ভগবানও না। তুমি কী করে প্রমাণ করবে এ দুয়ের অস্তিত্ব? তুমি বেদ-পুরাণ আওড়াবে, আমি বলবো ওসব গল্প-কথা। কালে হয়তো শরৎ চাটুয্যের চরিত্রহীন একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ হয়ে উঠতে পারে। লোকে স্বর্গলাভের আশায় ওখানা পড়তে সুরু করবে—যেমন পড়ছে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাসলীলা, সাবিত্রী রাধার মতো নমস্যা, আর উপেন, সতীশ কেষ্ট-বলরামের মতো মহাত্ম্যবান্ হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়।

সুরঞ্জন আওড়ালো: দেয়ার আর মেনি থিংস—— —

খুড়ো বললেন: থামো বাপজান, ওই অকালপক্ক জয়ন্তর সঙ্গে তর্ক করার চেয়ে পাথরে কামড় দেওয়া ভালো। এই নাস্তিকতাতেই দেশটা উচ্ছন্নে গেলো। আরে বাপু—তোর বাপ-ঠাকুর্দ্দা ভূত মেনে গেছে, আর তুই মানবি না! কিন্তু আমি বলছি, ভূত-পেত্নী শুধু যে আছে তাই নয়, তারা প্রেম পর্য্যন্ত করে। কোর্টসিপ, সিভিল ম্যারেজ পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

অতঃপর আর কথা চলে না। সে দিনকার মতো তর্কযুদ্ধ এইখানেই শেষ হলো। কিন্তু অলক্ষ্যে বসে হাসলেন বিধাতা—আর হাসলো একজন, সে সুরঞ্জন সেন, এম-বি।

দিন পাঁচেক পরের কথা। দিব্যেন্দুর বিবাহ উপলক্ষে সবাই বরযাত্রী চললো বেগমপুরে। বেগমপুর ষ্টেশনটী যেমন ছোট্ট, কেরোসিন ল্যাম্পের স্বল্প আলোয় তেমনি অনুজ্জ্বল প্ল্যাটফরমটি। সন্ধ্যা থেকেই টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি সুরু হয়েছিলো,—ষ্টেশনে যখন গাড়ী পৌঁছলো, তখন চলেছে মুষলধারে বর্ষণ। বর নিয়ে বরকর্ত্তা আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, বরযাত্রীর দল ঠেসাঠেসি ঘেঁসা-ঘেঁসি করে টিনের প্ল্যাটফরমের তলায় কোন রকমে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

খুড়ো বললেন: জল না থামা পর্য্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করা যাক্, কী বলো বাবাজী?

রমেশ বললো: আমারও সেই মত খুড়ো। এই বৃষ্টির মধ্যে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি।'

বৃষ্টি থামলো রাত দশটায়। কন্যাপক্ষ থেকে যে লোকটি নিতে এসেছিলো, তাকে প্রশ্ন করে জানা গেলো—বিয়ে বাড়ী 'পো'টাক পথ হবে। অতঃপর কর্দ্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ দিয়ে কলকাতার একবিংশতি-সংখ্যক বীরের বরযাত্রী রূপে যাত্রা সুরু হলো। ধানজমির পাশ দিয়ে, জলা আর পুকুরপাড় পিছনে ফেলে, সরু বাঁধ আর বন্ধুর পথের ওপর দিয়ে নীরন্ধ্র অন্ধকারে যাত্রা। অগ্রগামী পথপ্রদর্শকটীর হাতের মিটমিটে হ্যারিকেনের

আলোয় পথের অন্ধকার যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে। ঝিঁঝির অবিশ্রান্ত ডাক, ভেকের কলরব, ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ—সব কিছু মিলে গড়ে তুলেছে এক অপূর্ব্ব পরিবেশ। মাঝে মাঝে এক-একটা বাঁশঝাড় দু' একখানা কুঁড়ে ঘর, এক-আধটা মান্ধাতার আমলের পুরোনো বট-অশথ গাছ—তার গা দিয়ে নেমেছে হাজার হাজার শিকড়—তপস্বীর জটার মতো।

'পোঁটাক পথ আর ফুরোয় না। লোকটিকে প্রশ্ন করলে বলে: এই যে, এসে গেছি! রাত দশটায় যাত্রা সুরু করে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা বাজলো—তবু বাঞ্ছিত স্থানের উদ্দেশ নেই।

সুরঞ্জন বিরক্তভাবে বললো: কী হে বাপু, 'পোঁটাক পথ যে সেয়টাক ছাড়িয়ে মণখানিকে দাঁড়ালো।

সৌম্যেন আওড়ালো: আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি...

লোকটি সপ্রতিভ ভাবে বললো: আজ্ঞে, দেশ-গাঁ! গাড়ী-ঘোড়া তো পাওয়া যায় না।

—গাড়ী-ঘোড়া তো পাওয়া যায় না! হরি খুড়ো খিঁচিয়ে উঠে বললেন: কেতাথ করলে আর কী!! এদিকে যে পেটে হুতাশন জ্বলছে সে খবর রাখো?

বার পঁচিশেক আছাড় খেয়ে, গা হাত কাদায় সুরঞ্জিত করে বরযাত্রী দল রাত বারোটায় পৌছলো বিয়ে-বাড়ী। আহারাদি শেষ হতে প্রায় রাত দেড়টা বেজে গেলো। তারপর বাইরের ঘরে সকলেই ফরাসের ওপর গা ঢাললো। পথ চলার ক্লান্তিতে সকলের চোখ জুড়ে আসতে দেরী হলো না। খুড়োর নাসিকা-ধ্বনি বিয়ে-বাড়ীর সানাইকেও ছাপিয়ে বেজে চললো খটোংকট রাগিনীতে। সুরঞ্জন আর রমেশ শুধু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উঠে গেলো বিয়ে-বাড়ীর ভেতরে।

রাত তিনটে।

ঘরের আলোটা কখন বাতাসের ঝাপটায় নিভে গেছে। জয়ন্ত অনুভব করলো, কে যেন তার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে—তার গরম নিঃশ্বাস লাগছে গায়ে। জয়ন্ত ঘুমের ঘোরে প্রথমে মনে করলো—বোধ হয় বিড়াল, মুখে একটা শব্দ করলো: হুস্!

কিন্তু সুড়সুড়ি দেওয়া বন্ধ হলো না।

জয়ন্ত আবার শব্দ করলো 'হ্যাঃ'!

ফল পূর্ব্ববৎ। বিরক্ত হয়ে সে উঠে বসলো।

অন্ধকারে আবছা মনে হলো কে যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বিস্মিতভাবে জয়ন্ত সৌম্যেনকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলো: সৌম্যেন ও সৌম্যেন!

সৌম্যেন তখন স্বপ্ন দেখছিলো তার নব-পরিণীতার। যেন সে সৌম্যেনের গলায় একগাছা মালা পরিয়ে দিয়ে বলছে: হে কবি, অনাগত যুগ তোমার কাব্যে ধন্য হবে—যেমন ধন্য হয়েছি আমি তোমায় পেয়ে। এমন সময় জয়ন্তর ধাক্কায় সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো: কী হয়েছে মল্লিকা?

—বেহদ্দ বেহায়া বাওয়া, জয়ন্ত ভেংচি কেটে বলল: পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি লম্বা এমন খোট্টাই চেহারাটাকে বলে কী না মল্লিক!

সৌম্যেন হতাশভাবে বললো: ওঃ তুমি এঁচোড়পক্ক। তা' হঠাৎ এমন ডাকাতপড়া কাণ্ড কেন? এমন মজার স্বপ্নটাই মাটী করলে বাবা।

—বেরিয়ে দেখো তো কে এসেছিলো, জয়ন্ত বললো: আমার কর্ম্ম নয় ভাই! পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলো—শাড়ী পরা তরুণী বলেই মনে হলো।

—বলো কী? তরুণী? সৌম্যেন যেন আকাশ থেকে পড়লো: স্বপ্ন-টপ্ন দেখোনি তো।

—না হে, দিব্যি জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি। বললুম 'হুস'—থামলো না, বললুম 'হ্যাঃ'—গেলো না। যেই উঠে মারতে গেছি বেড়াল ভেবে, অমনি চলে গেল।

কথাটা তো ভালো নয়, সৌম্যেন বললো: একে অপরিচিত জায়গা, তার ওপর তরুণী। শেষ পর্য্যন্ত একটা কেলেঙ্কারিয়াস সিচুয়েশন না দাঁড়ায়। খুড়ো, ও খুড়ো——

উপর্যুপরি ডাকে শুধু হরিখুড়ো নয়, আরো অনেকেই উঠে বসলো। খুড়ো সব বৃত্তান্ত শুনে বললেন: বলো কী বাপজান! বিছানায় ছারপোকা নয়, ইঁদুর কী আরশোলা, মশা কী ছুঁচো নয়—এ্যাকেবারে আস্ত জলজ্যান্ত এক তরুণী! বাড়ী থেকে বেরুবার সময় নেশাটেশা করনিতো?

জয়ন্ত গম্ভীর ভাবে বললো: ঠাট্টার কথা নয় খুড়ো, ব্যাপারটা গুরুতর। হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

কেন? ল্যভ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট নাকি? মন্তব্য করলো নীরেন। সহসা বাইরে একটা সানুনাসিক সঙ্গীত শোনা গেল। কী দারুণ বুকের ব্যাথা।—

খুড়ো জয়ন্তর পাশে সরে এসে বললেন; বাপজান। গতিক বড়ো ভালো বুঝছি না। এত রাতে খোলা গলায় চণ্ডীদাস আওড়ায় কে? ঘরের আলোটাও তাই নিভে গেছে।

সৌম্যেন দিয়াশলাই বার করে পর পর কয়েকটা কাঠী জ্বাললো, কিন্তু ঘরে যে আলোটি ছিলো তার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেলো না। খুড়ো বিচলিত ভাবে বললেন: তাই তো, ব্যাপারটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম জয়ন্তর ভেঁপোমি, কিন্তু আলোটার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে মনে হচ্ছে—

রেখে দাও তোমার মনে হওয়া, বললো নীরেন: এই অজ পাড়াগাঁয়ে চেঁচামেচি করে সহরের নাম হাসিও না।

কিন্তু সেই তরুণী, বললো জয়ন্ত।

আর আলোটা——যোগ করলো সৌম্যেন।

'এই নাকী সুরে গান?' প্রশ্ন করলেন হরিখুড়ো।

কাজের বাড়ী, বললো নীরেন—আলোটা দরকার হওয়ার হয়তো কোন ঝি-টি নিয়ে গেছে। জয়ন্তর দেখা তরুণী বোধ হয় সেই-ই। আর ঐ গান? স্রেফ বাসর-ঘরের ইয়ারকী—হয়তো আমাদের দিব্যেন্দুই গাইছে।

বেঁচে থাকো বাবা মক্কেলহীন উকীল, খুড়ো নীরেনের পিঠ চাপড়ে বললেন: তোমার আরগুমেণ্টে মনে বল পেলাম। বাড়-বাড়ন্ত হোক তোমার।

বাইরে তখন সেই আনুনাসিক সঙ্গীত থেমে গেছে, ঘরে জ্বলছে অনেকগুলি সিগারেট।

হরি নুঁকুঞ্জো! জানলার দিকে শব্দ হলো: এই যে জয়ন্তও দেখছি।

খুড়ো আঙুলে পৈতে জড়িয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন জয়ন্ত চমকে উঠে জড়িয়ে ধরলো নীরেনের গলা। আর সকলের অবস্থাও তথৈবচ। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, এ ওর ভার সামলাতে না পেরে শুয়ে পড়ে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড শুরু করলো দু'একজন প্রবেশ করলো তক্তাপোষের তলায়। সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী ইঁদুর আর ছুচুন্দরেরা এই অনধিকার প্রবেশ-কারীদের দেখে লম্ফঝম্ফ আর ছুটোছুটি করে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলো।

নীরেনের বুকের ভিতরটাও কেমন করছিলো, তবু সাহসে ভর করে অস্পষ্ট স্বরে সে বললো: কে বাবা রসিক পঞ্চানন, রাতবিরেতে এমন প্রাণান্তকর ইয়ার্কি জুড়েছো?

মুহূর্তের মধ্যে জানলার ধারে দু'টী মূর্তির আবির্ভাব হলো, দু'জনের মুখই অবগুণ্ঠনে ঢাকা। অন্ধকারে আবছা দেখা গেল একজন সাদা থান, আর অপরটী লালপাড় শাড়ী পরিহিতা।

নীরেনের অবশিষ্ট সাহসটুকুও লুপ্ত হলো, সে শিউরে উঠে জড়িয়ে ধরলো খুড়োকে,—খুড়ো সবলে দু'টী পা দিয়ে জয়ন্তর কোমর আর দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরলেন—একেবারে ধৃতরাষ্ট্রের প্রেমালিঙ্গন। জয়ন্তর বাহুবন্ধনে নীরেনের গলা থেকে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ উঠলো। সৌমেন চোখ বুজে উপুড় হয়ে পড়লো তক্তার ওপর।

—মঁস্না পিসী, ছেঁলেটাঁ বেঁশ রঁসিক তোঁ। শাড়ী পরিহিতা বললো: এঁকে আঁমার বেঁশ পঁছন্দ হঁয়েছে। শেঁওড়া গাঁছের উপর্যুক্ত মাঁমদো হবে। মঁটকাঁবো ঘাঁড়টা...?

থান পরিহিতা বললো: আঁর ওঁই হরি মুঁকুর্যেঁ আঁর জয়ন্ত,—নিঁমগাঁছ আঁর বেঁলগাঁছে থাঁকবে আঁমি দুঁটোকেই বিয়ে করবো।

জয়ন্তর সংজ্ঞা লুপ্তপ্রায়, খুড়ো 'গিন্নি গেলুম' বলে মূর্চ্ছিত। নীরেন আর সৌমেনের দাঁতে দাঁত লেগে গোঁ গোঁ শব্দ বেরুতে লাগলো। বাসরঘর থেকে ছুটে এলো দিব্যেন্দু আর বাড়ীশুদ্ধ লোকজন। সকলের প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আসতে আরো ঘন্টাখানেক লাগলো।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, শহরের বীরবৃন্দের সাহসও এসেছে ফিরে। খুড়ো খিচিয়ে উঠে বললেন: করলে তো একটা কেলেঙ্কারী বিদেশ-বিভূঁয়ে এসে। হতো সব......!! একটু খোনা আওয়াজ শুনেই অমনি দাঁতী লেগে গেলো।

—খুড়ো বুঝি পরিহাস করে আমার পিঠে চেপে মূর্চ্ছা গেছলে? হেসে উঠে বললো জয়ন্ত।

এমন সময় সেই শাড়ী আর থান পরা অবগুণ্ঠিতাদ্বয় এসে বসলো খুড়োর দু'পাশে। খুড়ো ঘোমটা তুলে ধরতেই অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে একজোড়া বাটার ফ্লাই গুম্ফশোভিত মুখ ফিক্ করে হেসে উঠলো।

খুড়ো স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন: এ আমি তখনি বুঝতে পেরেছিলাম। সুরঞ্জন আর রমেশ নইলে এতোবড়ো বুকের পাটা কার যে আমাকে আর জয়াকে নিয়ে করতে চাইবে!

সান্ধ্য মজলিসে এখন ভূতের প্রবেশ নিষেধ। কেউ ভৌতিক কাহিনীর গোড়াপত্তন করতে গেলেই খুড়ো বাধা দিয়ে বলেন: বাদ দাও বাপজান, বাদ দাও। খোদ পেত্নীই আমার প্রেমে পড়েছিলো, ভূতের কথা কী শোনাবে আর আমাকে?

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

অলকে তোমার দিই যদি ফুল
অলস ফাগুন রাতে;
ওগো প্রিয় মোর সরমে তাহারে
ফিরায়ে দিও না হাতে॥
নয়নে লুকানো যত কথা আছে;
মিনতি ভরিয়া কহি তব কাছে;
ভীরু প্রণয়ের বাঁধন টুটিয়া
বাঁধা রহি দু'জনাতে॥

পৃথিবী ঘুমায় চাঁদ জেগে রয়
বকুল-সুরভি ঝরে,
দূর বনতলে কোন পাখী হায়
কাঁদিছে প্রিয়ার তরে।
রাতের ক্লান্ত বাঁশী থেমে গেলে
এই স্মৃতি কিগো দেবে মুছে ফেলে?
এ মধু মিলন ক'র নাক ম্লান
আঁখিজলে বেদনাতে॥

বাঙ্গলার নারী

(তৃতীয় প্রস্তাব)

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

বাঙ্গলার নারীর গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী জাতির জ্ঞানভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত। সে কাহিনী আজ ইতিহাসের অঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। ইতিহাসের বন্দনা, দেবার্চ্চনার মত দেশের ও জাতির সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। ইতিহাস পূজার উপচার ও উপকরণ কালভেদে ও লোকভেদে ভিন্ন হইলেও, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সর্ব্বলোক-কর্ত্তৃক শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। যাহারা দেবার্চ্চনার ধার ধারে না, দীক্ষা গ্রহণ করে নাই, মন্ত্র জানে না, ইতিহাসের পূজারতিতে তাহাদেরও আন্তরিক এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই যদি না হইবে, তাহা হইলে অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত মনুষ্যশ্রেণী বিশ্বময় অগণিত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে কেন? তীর্থ ত ইতিহাসেরই নামান্তর ও রূপান্তর। কাশী, মক্কা নোত্রে দাম—সকলেরই ভিত্তি ইতিহাস। বাল্যকালে, লেখক মাতামহী-কণ্ডাক্টেড টুর করিয়াছিলেন। পর্য্যায়ক্রমে কালিন্দীকূলে, 'মধুর মধুর বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন' ধামে উপস্থিত! বৃন্দাবনে নাতিবৃহৎ টিলা বা ঢিপি দেখাইয়া ব্রজবাসী বিজ্ঞাপিত করিল, এই সেই গিরি গোবর্দ্ধন, জলদেবতা বরুণদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণ এই গিরি-তনয়টিকে শূন্যে ধারণ করতঃ বৃন্দাবন ও ব্রজবাসীকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আভূমি প্রণতি, মস্তকে ব্রজরেণু ধারণ ও প্রণামী প্রদানের কি সে ধূম, সে আজও ভুলি নাই। এই অলীক, অসম্ভব ও অবাস্তব কথাও যে ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইটাই বিস্ময়; বন্দনায় বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই।

বলা নিতান্তই বাহুল্য, ব্রজবাসীর এই মনগড়া ইতিহাস অসত্য এবং অবাস্তব। গিরিশিশু যত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হৌক না কেন, উৎপাটন ও উত্তোলন এবং ছাতি রূপে শিরে ধারণ পিতামহীর উপকথায় সম্ভব হইলেও বাস্তবে অসম্ভব। তথাপি দেখিতেছি পূজারীর অভাব নাই। অনুমান করিতে ইচ্ছা হয় যে ইতিহাস-অর্চ্চনার জন্য মানুষের অন্তরলোকে এক বা একাধিক স্বতন্ত্র চেম্বার বা কুটুরী আছে এবং ইতিহাসের উল্লেখমাত্র, রক্তে পিস্তসঞ্চালনবৎ ভক্তিরস নিঃসরণ হইতে থাকে। আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের একাংশে, উত্তরবঙ্গে নাটোর নামে একটি জনপদ আছে। একদা এই নাটোর পুণ্যশ্লোক রাণী ভবানীর বাসস্থান ছিল। বেঙ্গল আসাম রেলের নাটোর ষ্টেশন অতিক্রম করিবার কালে হিন্দু নরনারীর অন্তর যুক্তকরে সেই ইতিহাসের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে অনেকগুলি নারীর আলেখ্য অঙ্কিত আছে। সেদিক দিয়া চন্দ্রমণ্ডল অথবা চাঁদের হাটবাজারও বলা যায়। দেবী নিঃসন্দেহে কৌমুদী—একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি। চন্দ্রমণ্ডলের অন্যান্য জ্যোতিষ্কগুলি যে অল্প উজ্জ্বল অথবা স্বল্প প্রভাময়, এমন নহে। তাহাদের আলোকচ্ছটায় দিগন্ত প্রভাসিত হইতে পারে। প্রত্যেকটিকেই আমরা বাঙ্গলার নারী ও বর-নারীরূপে সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রস্তুত আছি। ইতিহাসের প্রাপ্য পূজারতিতেও কুণ্ঠিত নহি।

সর্ব্ব প্রথমে, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক, সাগর বৌ'টির কথাই ধরা যাক্। সাগর নামটা মস্ত, সাগর শব্দটা অতল, বিশাল, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সাগরকেই স্মরণ করাইয়া দেয় সত্য; কিন্তু কবি বঙ্কিমচন্দ্র বিশাল নভোমণ্ডলে ক্ষুদ্র নক্ষত্র করিয়াই সাগরকে সৃষ্টি করিলেন। সাগর ধনবানের একমাত্র সন্তান, আদরের ও আনন্দের ধন। সাগরের পিতার বিষম ভারী সিন্দুকটির পানে শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই পারও হয়বল্লভ সাগরকে পুত্র ব্রজেশ্বরের নামের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া লইয়াছে; কিন্তু স্ত্রী, সহধর্ম্মিণী অথবা ঘরণী গৃহিণীর আসন তাহাকে দেয় নাই। সাগর আসন পায় নাই, তাই যোগ্যতাও অর্জ্জিত হয় নাই। সাঁতার শিখিতে সেই পারে, জলে নামিবার অবসর যাহার হইয়াছে। সাগরের অদৃষ্ট (সাগরের ভাষাতেই বলি) 'মাটির আমের মত তাকে তোলা থাকব—দেবতার ভোগে কখনও লাগব না'। তাহার বাপের সঙ্গে শ্বশুরের বনিবনাও হয় না; তাই সাগর এখানে (শ্বশুরালয়ে) কখনও থাকে না; কাজে-কর্ম্মে আসে, দু'চার দিন থাকে, তারপর চলিয়া যায়। ইহাই অবস্থা ও ব্যবস্থা।

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সংসারে সাগর নগণ্য জীব মাত্র। পিত্রালয়ে যে যতই আহ্লাদিনী ও গরবিণী ধনী হৌক না কেন, নারীর কর্ম্মক্ষেত্র শ্বশুরগৃহে যাহার বিশিষ্ট স্থান নাই, তাহাকে নগণ্য বলিব না ত কি বলিব? কিন্তু এই নগণ্য সাগরেরও কি অসামান্য দাপট! শ্রীমতী পাঠিকা ঠাকুরাণি, 'শ্বশুরালয়ে ব্রজেশ্বর' দৃশ্যটি অবলোকন করুন। ব্রজেশ্বরকে আর একটি দিন বেশী থাকিবার—ওভার ষ্টে?—জন্য সাগর ব্রজেশ্বরের পায়ে পড়িতেছিল (ওভারষ্টেতে প্রবৃত্তি দিবার সুন্দরীর অভাব আজও হয় ত হয় নাই, তবে প্রকরণটি বোধ করি লুপ্ত হইয়াছে। আমি মাত্র অনুমান করিতে পারি; সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণ-ভার আমার পাঠিকা রাজ্ঞীর!), অর্থ অপ্রাপ্তি—অনর্থ বশতঃ ব্রজেশ্বর তখন রোষে বেলুন-ফোলা ফুলিতেছিল, রোষভরে পা টানিয়া লইল। "পা একটু জোরে সাগরের পায়ে লাগিল। সাগর কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, কি, আমায় লাথি মারিলে? ব্রজেশ্বর বলিল, যদি মরিয়াই থাকি? তুমিও পাল্‌টে লাথি মারিবে নাকি? সাগর বলিল, আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা 'কোলে' লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।"

এইখানে একটু তর্কের কথা আছে। 'তুমি আমার পা" এই পর্য্যন্ত সাগর একটানে বলিয়াছিল, এমন সময়ে, রঙ্গমঞ্চের পার্শ্ব নাব (উইংস?) পাশ হইতে কে স্মারকতা (প্রম্পটিং?) করিয়া শব্দ সংযোজন-স্বরূপ শেষাংশটুকু বলিয়া দিল, সাগর তাহাই পুনরুক্তি করিল। আমার সুবুদ্ধিমতী পাঠিকার মনে

কৌতূহল জাগে কি-না জানি না, আমার কিন্তু কৌতূহলের অন্ত নাই, অন্ত কোন্ কথা সাগর বলিতে চাহিয়াছিল অথবা বলিত? সাগর বলিতে পারিত, (আমার পা) 'ধরিয়া সাধিবে'। শব্দ-সংযোজক নেপথ্য হইতে কথা যোগাইয়া দিল, (আমার পা) 'কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে।' পার্থক্য বা তারতম্য অবশ্য খুবই কম। যার নাম চাল ভাজা, তারই নাম মুড়ী। 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'ও যা, চরণসংবাহনও তাহাই। নিরপেক্ষ-ভাবে বলিতে পারা যায় যে, স্থানবিশেষে এবং কালবিশেষে কোনটাই অকরণীয় নহে। তবে এ কথাও আমি বলিতে বাধ্য যে, অকরণীয় না হইলেও হাঁক ডাক ও হুকুম জুলুম করিয়া করণীয় বলিয়া জাহির করাও শোভন ও সঙ্গত হইতে পারে না। 'মাথাটা ব্যথা করছে, একটু টিপে দেবে গা?' স্ত্রীর মুখ দিয়া এ কথা যত সহজে উচ্চারিত হইতে পারে, 'পা-দুটো টিপে দাও না গো?' তত সহজে (?) উচ্চারিত হয় না: আদৌ ব্যক্ত হয় কি-না তাহাও বলা কঠিন। ব্রজেশ্বর সত্য সত্যই লাথি মারে নাই, সেই কথা বলিলেই মিটিয়া যাইত; তাহা না বলিয়া সে এড়ো তর্কে প্রবৃত্ত হইল, যদি মারিয়াই থাকি? কাজেই সাগরের পক্ষে তখন আর 'মেরেছ কলসীর কানা তাই ব'লে কি প্রেম দিব না?' করা বা বলা সম্ভব হয় না। নারীজন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়া পড়িয়া পড়িয়া লাথি ঝেঁটা খাইবে, এই সহন-শীলতা আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। নারীর স্বাধীন-সত্তা যে অতি আধুনিক কালে নারীর নবার্জিত ধন নহে, সাগরের এই উক্তি (আংশিক হইলেও) তাহাই প্রমাণিত করিতেছে। ভ্রমরের কথা পরে হইবে; প্রবন্ধান্তরে তাহাও বলিব।

সাগর ভাল কাজ, মস্ত কাজ বা ভারি গৌরবের কাজ করিয়াছিল—এমন কথা আমি একবারও বলিতেছি না; কিম্বা স্বামীর পা কোনগতিকে স্ত্রীর অঙ্গে 'আঘাত হানিলে' পতি পরম গুরুর জাতি ও গোত্রাকর্ষণ করতঃ সাগরের ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে ইহাও, দোহাই সুন্দরী, সুবেশিনী, পাঠিকারাণিগণ, আমার বক্তব্য অথবা পরামর্শ হইতে পারে না। আমি বলিতে চাহিয়াছি, বাঙ্গলার নারী পুরুষের জুতার সুখ-তলাবৎ সামগ্রী কস্মিন্‌কালেও ছিলেন না; এখনও নাই—নিশ্চয়ই নাই। আত্মীয় অযথা অত্যাচার করিয়া অবহেলে চলিয়া যাইবে, আর নারীর নয়ন-সলিলে ধরণী তিতাওল মাত্র, তেমন ধাতুতে নারী গঠিত নহেন।

সাগর যেমন ক্ষুদ্র, উদাহরণটিও তেমনই তুচ্ছ; তথাপি জিজ্ঞাসা করি, এই কাণা-কড়ি মূল্যের সাগরের সাহসের পরিচয় কি শ্লাঘনীয় নহে? স্বীকার করি যে, নেপথ্যচারিণী (প্রম্পট্-কারিণী) দেবী রাণীকে সাগর চিনিয়াছিল। তবু যতই চিনিতে পারিয়া থাক, দেবী তখন আর তাহার সতীন প্রফুল্ল নহে; সে তখন দেবী চৌধুরাণী। দেবীর সাক্ষাৎ ভগবতীর মত রূপবতী ও তেজস্বিনী মূর্ত্তি দেখিয়া 'পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝন্ ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল।' শুধু তাহাই নহে। 'তাহার কাঁকালের কাপড় খসিয়া পড়িল।' কারণ, 'যে নাম তাহাদের কাণে প্রবেশ করিয়াছিল, সে নাম অতি ভয়ানক।' এই ভয়ানক নামের অধিকারিণীর সহিত নিঃশব্দে পলায়ন, অল্প সাহস অথবা সামান্য অ্যাডভেঞ্চারাস্ স্পিরিটের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু আছে কি? যদি একটা দিগ্বিজয়ের ব্যাপারও হইত, তাহা হইলেও না হয় পলায়নের অর্থগ্রহণ হইতে পারিত। সাগর নিজেই বলিয়াছে, সে কয়েদী নহে, তাহাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই, সাগর ইচ্ছাক্রমে দেবী রাণীর সাহায্য লইয়াছে এবং তাহাকে (ব্রজেশ্বরকে) দিয়া তাহার পা টিপাইবে বলিয়া দেবী রাণীর রাজ্যে বাস করিতেছে। বড় লোকের দুলালী সাগর গৌরাব-গোবিন্দ বিশেষ ইহাও যেমন স্বীকার্য, সাগরের সাহস ও তেজও যে অসামান্য তাহাও তেমনই অবশ্য স্বীকার্য্য।

সাগর যে সদ্‌ব্রাহ্মণের মেয়ে তাহাতে কোনই সন্দেহ আর রহিল না; কারণ তাহার পণ রক্ষিত হইয়াছে। দেবী রাণীর সুসজ্জিত বজরার ভিতরে। রেশমী রুমালে আবৃত-আনন সুন্দরী রমণীটিকে পরনারীবোধে পরম আহ্লাদের সহিত পা টিপিয়া দিতেছিল, কিন্তু বাপের বাড়ীতে সাগরের আলতা পরা টুকটুকে পা দু'খানির উল্লেখমাত্র ব্রজেশ্বর রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছিল। পোড়ারমুখী সাগরের ভারি আনন্দ, তাহার সদ্‌ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিয়াছে। আরও আনন্দ যে ছলে হৌক, বলে হৌক, কৌশলে হৌক, নারীর নিকট নরকে পরাস্ত হইতে হইয়াছে।

কিন্তু যাহার জন্য এই 'অসাধ্য সাধন' সম্ভব হইল, তাহার কথাটাই আসল কথা। দেবী রাণীই মূলাধার। দেবী রাণীকে বঙ্কিমচন্দ্র নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টে অথবা নেলসনের তুল্য রণ-বিশারদ করিয়া লিখিয়াছেন। দেবীর ষ্ট্রাটেজি নির্ভুল ও নির্দোষ। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে আসিয়া যে দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-জাতি (?) বঙ্গদেশে (ভারতবর্ষে) রাজত্ব বিস্তারে যত্নবান্, বাঙ্গলার নারী —দেবী চৌধুরাণীর সম্মুখে তাহার বিদ্যা অবিদ্যা, বুদ্ধি ভোঁতা ও চক্ষু ছানাবড়া হইয়া গিয়াছিল। ষোড়শোপচারে সাজসজ্জা করিয়া দেবীকে ধরিতে আসিয়া, দেবীর কৌশলে মার্জ্জার ইন্দুর-কলে বন্দী হইল। দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের শেষ তাহাতেও হয় নাই। ব্রজেশ্বরের হাতের বিরাশী সিক্কা দরের চপেটাঘাত ভক্ষণ করিয়া ঘুঁসির প্রত্যুত্তরে ঘুঁসি হাতে লইয়া দেবী রাণীর ষ্ট্রাটেজির গুণে কুমড়া গড়াগড়ি। 'হাতের ঘুঁসি রইলো হাতে জবাব দেওয়া আর গেল না।' বৃটিশ মহাসাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাম্রাজ্যবাহিনীর এক অংশ বাঙ্গলার নারীর নিকট পরাভূত হইল।

প্রফুল্লর ধনসম্পদ প্রাপ্তি দৈবাধীন বটে; কিন্তু দেবীর জীবনের অন্য কোন অংশ দৈব, অসম্ভব অথবা অস্বাভাবিক নহে। ধন-প্রাপ্তিও পুরাপুরি দৈব কি-না তাহাও সংশয়স্থল। প্রফুল্লের জীবনে দৈব অপেক্ষা দুর্দ্দৈবের প্রাধান্যই দেখি! দৈব প্রভাবের চেয়ে দৈব-বিড়ম্বনাই বলবান্। শ্বশুর-গৃহচ্যুতা, স্বামিসঙ্গসুখবঞ্চিতা, অনশনক্লিষ্টা শতকরা নব্বইটি বঙ্গনারীর একটি। চরকায় সূতা কাটিয়া, পৈতা তুলিয়া মাতা ও কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন চলে। এই চলা যে কেমন চলা,

তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। এই প্রফুল্লই দেবী চৌধুরাণী হইতে পারিয়াছিল। টাকার ধার ও টাকার ভার বড় ধার ও বড় ভার, তাহা অস্বীকার করে হেন সাধ্য কাহার ? কিন্তু টাকা বাদ দিলেও দেবীকে দেবীরূপে না দেখিয়া উপায় নাই। প্রফুল্লর শ্বশুর পাষণ্ড হরবল্লভ বিনাপরাধে পুত্রবধূকে গৃহনিষ্কাসিত করিবার কালে চুরি-ডাকাতি করিয়া জীবন ধারণের পরামর্শ দিয়াছিল বটে, কিন্তু দৈবানুগ্রহে তাহাকে চুরি-ডাকাতি না করিতে হইলেও দশচক্রে ভগবানের ভূতত্বপ্রাপ্তির মত দেবীরও নামজাদা ডাকাইতের খ্যাতি (অখ্যাতি ?) অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। তখন তাহার যত বা সুনাম, তত বা দুর্নাম ; যত বা যশঃ তত বা অপযশঃ। তবে তখন সে রাজ্যেশ্বরী, সমতলভূমি ও জনসাধারণ হইতে অনেক ঊর্দ্ধে তাহার স্থান। তাই সে সময়ের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। দেবীর রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বের এবং রাজ্য-চ্যুতির পরের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হৌক।

প্রফুল্লর মা না খাইতে পারিয়া মরিয়া গেল ; ত্রিভুবনে প্রফুল্ল একা। ফুলমণি নাপিতানীকে নিশীথের সঙ্গিনী নির্ব্বাচিত করিল। ফুলমণির মন্দ চরিত্র-কথা অনবগত না থাকিয়াও প্রফুল্ল তাহাকে আপন কুটীরে আপনার শয্যার পার্শ্বে আশ্রয় দিয়াছিল এই ভাবিয়া যে, 'সে মন্দ হোক, আমি না মন্দ হইলে আমাকে কে মন্দ করিবে ?' কথা ঠিক কিন্তু কাল সাপ পোষণের ফল মন্দ হইতে বাধ্য। ফুলমণির যোগসাজসেই 'কৃতাভিসারা, তাম্বুলরাগরঞ্জিতা, রাঙাপেড়ে শাড়ী পরা, হাসিতে মুখভরা' দুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সুলভ হইয়া প্রফুল্লকে মুখ বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া পরাণবাবু জমিদারের বিহার-মন্দিরে লইয়া চলিল। মুখ বাঁধা, শব্দ করিবার উপায় নাই; প্রফুল্ল নিঃশব্দে পাল্কীতে উঠিল। পাল্কীতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল, তথাপি প্রফুল্ল নিঃশব্দ। 'রাত্রি দুই প্রহরে চীৎকার করিয়া কি হইবে বলিয়া চীৎকার করে নাই। চীৎকার শুনিতে পাইলেই বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে ? প্রথমে প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল বটে ('কে না হয় ?) কিন্তু পরে স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোন উপায় নাই। প্রফুল্ল যখন বুঝিল বাটপাড়ের ভয়ে ডাকাইতরা পালাইয়াছে এবং বাটপাররাও হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, তখন পাল্কী হইতে বাহির হইল ; নিবিড় জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করিল। বনের ভিতর বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিল, এক জায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা নাই, আবার ডাকাইতে ধরিবে ? বনে বাঘ-ভাল্লুকে খায়, খাক্ ; সে-ও ভাল। ডাকাইতের হাতে পড়িতে বাসনা নাই।

কথায় বলে, জ্বরের জন্ত দেশ ছাড়িলাম, হা রে তেঁতুলতলায় বাসা। যে ডাকাইতের ভয়ে প্রফুল্ল গৃহে ফিরিল না, পড়বি ত' পড়, একেবারে ডাকাইত-সর্দ্দারের হাতে। এমন জানিলে না হয় না খাইয়া শুকাইয়া (মাতালয়ে মায়ের সঙ্গে প্র্যাকটিস ত' করাই ছিল !) মরিয়া পড়িয়া থাকিত, চাল, ডাল, নুন, তেল, কাঠ আনিতে না-ই যাইত ! মোহরের মূল্য সে কি জানে ? পয়সা টাকা মোহর অজ্ঞ ও অজ্ঞানের নিকট একই বস্তু বই ত নয়। পয়সা যদি ভাঙ্গানো যায়, টাকা ভাঙ্গানো যদি সম্ভব হয়, তবে মোহর-ভাঙ্গাতেই বা বিপত্তি হইবে কেন ? একখানা মোহর লইয়া চাল, ডাল, নুণ তেল কিনিতে গেল। কিন্তু 'দোকানদার'টি লোক ভাল নহে। তাহাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বোধে সম্ভ্রম ও বিশ্বাস জাগিয়াছিল ; কিন্তু সে যখন একখানা পয়সার জন্ত ক্রেতার বাড়ী চিনিয়া আসিতে চাহিল, তখনই লোকটাকে ভাল লাগা কমিল। তারপর যখন তাহার মুখ দিয়া বিপুল বিস্ময় প্রকাশ পাইল—বাড়ীতেও সবই মোহর ? তখন মন একেবারে বিমুখ। তারও পরে 'দোকানদার' যখন তর্ক তুলল, 'আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কি প্রকারে' তখনই 'সর্ব্বনাশ, প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।' আবার তখনই ভূমিকম্প। দোকানী আত্মপরিচয় দিল। "তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না। আমাকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মনে কর আর যাই কর আমি ডাকাইতের সর্দ্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।" "প্রফুল্ল স্পন্দহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।"

কিন্তু এই যে নিস্পন্দ, নির্ব্বাক ও নিশ্চল ভাব, কতক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল ? দণ্ড হিসাবে, পল অনুপল বিপল অথবা ঘণ্টামিনিট হিসাবে কতক্ষণ তাহা বলিতে পারিব না বটে, তবে পরমুহূর্ত্তেই দেখিলাম প্রফুল্ল সেই ভীষণ ভবানী পাঠকের 'দোকান' হইতে চাল, ডাল, নুণ লকড়ি তুলিয়া লইয়া, ভয়ঙ্কর ভবানী পাঠককে সঙ্গে করিয়া সেই যক্ষালয়ে, অর্থাৎ কৃষ্ণগোবিন্দাশ্রমে আসিয়া সমগ্র বরেন্দ্রভূমি-বিকম্পনকারী দস্যু সর্দ্দারের সহিত প্রচণ্ড তর্ক-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভবানী পাঠক নবেলের নায়ক বা অভিসারের নাগর নহেন আর প্রফুল্লও ডমিংরুমাধিষ্ঠাত্রী মিসি বাবা অথবা মেম সাহেবও নহেন যে হাই-কো-লজির হাই ও পাঁশকে কেন্দ্র করিয়াই তর্কের উত্তাল স্রোত আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে এবং নলিয়ান রস ঘন হইতে হইতে গুড় এবং গুড় হইতে পাটালি গঠিত হইবে।

তর্কটা কিরূপ ? শুনুন, কিরূপ ?

"প্রফুল্ল বলিল, যদি বলি পাপই করিব ?"

ভবানী বলিলেন, আমি তাহা হইলে লোক দিয়া তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এ বনের বাহির করিয়া দিব। এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে যে, তোমার এই ধনের লোভে তোমার সহিত পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে।

প্রফুল্ল বলিল, লোক দিয়া আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কি ?

"ভবানী। রাখিতে পারিবে কি ? তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, যদিও ডাকাতের হাতে উদ্ধার পাও—কিন্তু রূপ-যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না। পাপের লালসা না ফুরাইতে ফুরাইতে ধন ফুরাইবে। তারপর নরকের পথ সাফ। লালসা আছে কিন্তু লালসার পরিতৃপ্তির উপায় নাই। পুণ্যসঞ্চয় করিবে ?"

প্রফুল্ল বলিল, বাবা, আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনও পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব ? এ-ধন তুমি সব নাও—

আমি নিষ্পাপে খাতে এক মুঠো অন্ন পাই, তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।...আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমাকে শিখাইয়া দিন ধন লইয়া কি করিব ?

ভবানী বলিলেন, শিখাইতে পাঁচ সাত বৎসর লাগিবে।...প্রথমে লেখা পড়া শিখাইব।

প্রফুল্ল সম্মত হইল এবং এ অরণ্যমধ্যে একজন সহায় পাইয়া সে আহ্লাদিত হইল। বাঙ্গলার মেয়ে, প্রখর বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা, অসীম অধ্যবসায়, কষ্ট স্বীকারেও ক্লেশ নাই, কৃচ্ছ্রসাধনেও ক্লান্তি বা অরুচি নাই। ঐকান্তিক যত্ন ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে প্রফুল্ল অত্যল্পকালমধ্যেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভবানী পাঠককেও বিস্মিত করিয়া দিল।

প্রথম পর্য্যায় প্রফুল্ল অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইল; কিন্তু পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে বিষম গণ্ডগোল বাধিল। দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে।

বাঙ্গলার মেয়ে, বাঙ্গলার নারী, ভবানী পাঠকের অদ্ভুত কথা শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল; চক্ষু কপালে উঠিল। উঠিবারই কথা, না উঠিলে আমরাই বিস্মিত হইতাম; 'প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল; শেষে বলিল, ঠাকুর, আর যা বলেন, তা শিখিব, এটি পারিব না।'

ভবানী বলিলেন, 'এটি নহিলে নয়।'

এমন অবস্থায় বাঙ্গালীর মেয়ের মুখে যে-উত্তর সহজ ও স্বাভাবিক, প্রফুল্ল তাহাই বলিল। বলিল, 'সে কি ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কি করিবে?'

ভবানী বলিলেন, 'ইন্দ্রিয় জয়ের জন্য। দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয় জয় নাই।'

হায়! বাঙ্গলা দেশে আজ আর এ কথা কেহ বলে না। বাঙ্গলা দেশ হইতে এ কথা আজ একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয় জয়ের কথা আজ কেহ উচ্চারণ করে না। আজ ইন্দ্রিয়-চর্চ্চারই বিজয়-বৈজয়ন্তী। বাঙ্গালীর জীবন আজ ইন্দ্রিয়তন্ত্রকেই সার বুঝিয়াছে। বাঙ্গলার সাহিত্য আজ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মী। বাঙ্গলার সঙ্গীত আজ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মী। সিনেমা-রাজ্যের ত কথাই নাই; সে ত' ইন্দ্রিয়েরই অশ্বমেধযজ্ঞ। অথচ আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে এমন একটি দিন ছিল, যেদিন রাজ্যশাসনের অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-শাসনের গুরুত্ব অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহার ইন্দ্রিয় জয় ছিল না, সমাজে তাহার স্থান ছিল না।

ভবানী যে যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, তাহা খণ্ডন করিবার উপায় নাই; তাহার বিরুদ্ধে কথা বলাও চলে না। অবনত-মস্তকে তাহা শিরোধার্য্য করিয়াও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, ইহাই একমাত্র কারণ নহে। ইন্দ্রিয় জয়ের প্রয়োজন খুবই আছে তাহা মানি; কিন্তু দুর্বৃত্ত শাসনও বড় প্রয়োজন। অবশ্য ইহাও নিশ্চিত যে, প্রথমটা আয়ত্ত হইলে, অপরটি স্বতঃই সম্ভব হইবে।

আজ—বিশেষ করিয়া আজ, এই মুহূর্ত্তে ইহার যে কত প্রয়োজন তাহাও কি আবার বলিতে হইবে? আজ কি পুরুষ, কি নারী তাহাদের সম্মুখে কত যে কঠোর সমস্যা, তাহা গুণিয়া—ভাবিয়া শেষ করা যায় না। অভাব রাক্ষসী করাল-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বদনব্যাদান করিয়া রহিয়াছে; প্রতি মুহূর্ত্তে বলি দাবী করিতেছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে বলি গ্রহণ করিতেছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই, বিত্ত নাই, বৃত্তি নাই, স্বাস্থ্য নাই, শিক্ষা নাই—সব ঠিক; সবই স্বীকার করি। কিন্তু মানুষ না খাইয়া, চীর ধারণ করিয়া, বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া, রোগে ভুগিয়া নিরক্ষর অবস্থায় মরিতেও রাজী আছে, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত দস্যু ও পিশাচের কবলে পতিত হইয়া মর্ম্ম ও ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়া মর্ম্মান্তিক ও মরণাধিক গ্লানি সহ্য করিয়া মরমে মরিয়া বলিতেছে, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। ইহার প্রতিকার কি এবং কোথায়? দুঃখ তাহার চিরসাথী, দারিদ্র্যে সে চিরাভ্যস্ত, রোগ-শোকও তাহার গা-সহা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার ভয়ও নাই, অরুচিও নাই। তাহার অপরিম্লান নারীত্ব, তাহার নিষ্কলুষ সতীত্ব ও জন্মজন্মাচরিত ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মরিতে পারাই বাঙ্গলার নারীর সৌভাগ্যের মহোচ্চ শিখর। আজ সেই সমুচ্চ শিখরেই বাজ পড়িয়াছে। তাই আজ বড় দুঃখে আর বড় আশায় ভবানী পাঠকের কথাগুলি বঙ্গনারীর মনস-পটে লিখিয়া দিবার আকিঞ্চন। সে কি অকিঞ্চনের আকিঞ্চন হইয়াই থাকিয়া যাইবে?

প্রফুল্ল আর যাহাই হৌক, বাঙ্গলার নারী ত, সঙ্কোচ কিছুতেই ঘুচে না। বলিল, 'কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে? পুরুষ মানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না।'

সঙ্কোচ যদি বা ঘুচিল, অন্য সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিল। নারী সব পারে, লজ্জা ছাড়িতে পারে না।

ভবানী বলিলেন, 'নিশি শিখাইবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক-বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না। তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল।'***

ভবানী আরও বলিলেন, আমি এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়াই নিশিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছি।'

'প্রফুল্ল চার বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল। বলা বাহুল্য যে, ভালই শিখিল। নতুবা এ কথা লিখিত হইত না যে, 'চতুর্থ বৎসরে, ভবানী নিজ অনুচরদিগের সঙ্গে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন, প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত।'

এ সকলই উদ্যোগ-পর্ব্বের কথা। তার পরই যুদ্ধ-পর্ব্ব। "দেবী চৌধুরাণীর যুদ্ধপর্ব্ব পাঠ করিবার মত; স্মরণ করিয়া রাখিবার মত। যে সুনিপুণ স্রষ্টা রাণা রাজসিংহের যুদ্ধকৌশল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার নারীর রণনৈপুণ্যও তিনিই রচনা করিলেন। যুদ্ধ মেবারের রাণাগণের বংশানুক্রমিক বৃত্তি, সহজাত সহজ ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; বঙ্গনারীর পক্ষে সে কথা খাটে না। কিন্তু কৃতিচাতুর্য্য এমনই যে, বঙ্গনারীর বীর্য্য ও শৌর্য্য এবং যুদ্ধ-কৌশল সেই কুলুকুলু নাদিনী মন্দগামিনী স্রোতস্বিনী ত্রিস্রোতার মতই সহজ, সরল ও সাবলীল এবং মনোমদ হইয়া বাঙ্গলার নর-নারীকে বিপুল আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতেছে। হায়,—ইহা যদি বৃথা সৃষ্টির তরঙ্গভুক্ত হইয়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার অদৃষ্টের লিখন।

তারপর প্রফুল্ল যখন রাণীগিরির দোকান গুটাইল এবং রাণীজীর মিলিটারী সেক্রেটারী নিশি ঠাকুরাণী রাণীজীর বজরাখানিকে চেলা কাঠে রূপান্তরিত করিয়া দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া ভাত ডাল তরকারী রাঁধিল, প্রফুল্ল তখন ভূতনাথে শ্বশুরালয়ে ব্রজেশ্বরের ঘর করিতেছে। সাগর ত ভাবিয়াই সারা। দেবী রাণী ঘর-সংসার করিতে পারিবে?

"এখন গৃহস্থালিতে কি মন টিকিবে? রাজার সিংহাসনে বসিয়া হীরার মুকুট পরিয়া রাণীগিরির পর বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া কি ভাল লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কি ব্রহ্মঠাকুরাণীর রূপকথা ভাল লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত, এখন 'হারির মা, পারির মা'র খবরদারি কি তার ভাল লাগিবে?"—সাগরের মহা দুর্ভাবনা। দুর্ভাবনা তাহারই হইবার কথা। কারণ দেবী রাণীর রাজ-ঐশ্বর্য্য সাগর দেখিয়াছে; বজরায় বসবাস করিয়াছে। তাই জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, গৃহস্থালিতে কি মন টিকিবে?

প্রফুল্ল বলিল, ভাল লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কাহারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।"

ইচ্ছা করে, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রাচীরে প্রাচীরে প্রান্তরে প্রান্তরে বড় বড় অক্ষরে প্রফুল্লের এই কথাগুলি লিখিয়া দিই—"আমি এই সন্ন্যাস করিব।"

ভারতের ঐতিহ্য নরনারীকে শিখাইয়াছে, রাজ্যলাভ অথবা বনবাস সমান—সুখের নিদান। ভারতের পুরাণ বল, ইতিহাস বল, ঐ মূল শিক্ষার উপরই তাহার প্রাসাদ গড়িয়াছে। আমি হরিশ্চন্দ্রের কথা ধরি না, যুধিষ্ঠিরের কথাও বলি না, শাক্যসিংহের কথাও বলি না; নারী-সমাজের কথা বলিতেছি, নারী-চরিত্রই আলোচনা করিব। সীতার কথা বলিব; দময়ন্তীর কথা বলিব; দ্রৌপদীর উদাহরণ দিব। বলিব যে জনকনন্দিনী সীতার নিকট অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ ও গোদাবরী তীরবর্ত্তী পঞ্চবটী অরণ্য সমান সুখের আগার ছিল; বিদর্ভের সিংহাসনে নলের বামপার্শ্বে আসন লাভ করিয়া দময়ন্তীর যে সুখ, নিবিড় অরণ্যবাসে রাজ্যহারা গৃহহারা নলের ছায়াসমবিহারিণী দময়ন্তীরও সেই সুখ; পাণ্ডবের প্রধানা মহিষী দ্রৌপদীর সুখের সহিত যুগযুগান্ত বনবাসিনী দ্রৌপদীর সুখের কোনই পার্থক্য নাই।

দেবী চৌধুরাণী ভারতের ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারিণী; তাই সাগর-বৌ দুশ্চিন্তা কবলিত হইয়া সমস্যা ভঞ্জনার্থ প্রফুল্লের সন্ধানে বাহির হইয়া প্রফুল্লকে পাইল খিড়কীর পুকুরধারে। প্রফুল্ল পুকুরঘাটে ওধারে ফিরিয়া বাসন মাজিতেছিল।

প্রফুল্ল বলিল, আমি এই সন্ন্যাস করিব।

সাগর বলিল, তাহা হইলে আমি তোমার চেলা হইব।

আমার মনে হয়, শুধু সাগর নহে, বাঙ্গলার নারীমাত্রেই সাগরের মুখ দিয়া অন্তরের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন।

দেশীয় রাজ্য বনাম গণপরিষদ

শ্রীঅতুল্যভূষণ সেন

ভারত-সচিব লর্ড প্যাথিক লরেন্সের নেতৃত্বে বৃটিশ মন্ত্রীসভা ভারতে যে মন্ত্রিমিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদের সহিত দীর্ঘ আলোচনার পর ভারত সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়, তদনুসারে গঠিত গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ইতিমধ্যে দুইটী অধিবেশনে সমবেত হইয়াছে। বড়লাটের শাসন পরিষদের রূপও বদলাইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহা মধ্যবর্ত্তী সরকার নামে অভিহিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের দুইটী প্রধান দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধি মধ্যবর্ত্তী সরকারে আসন লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রচেষ্টা এখনও সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বলা যায় না।

গণপরিষদের মধ্যদিয়া ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টির পথে দেশীয় রাজ্যগুলি অন্তরায় হিসাবে দেখা দিয়াছে। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবে ভারতের ছোট বড় মোট ৫৬২টী দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের জন্য যে রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, গণপরিষদের কার্য্যকারীতার যুক্তি-যুক্ততা সম্পর্কে কতকগুলি বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইবে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে প্রধান বৈরী হিসাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লালিত পালিত দেশীয় রাজ্যগুলি, তাহাদের চিরাচরিত মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্ত্তী অধ্যায় গণ-পরিষদে যোগদান করিয়া সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবে এমন আশা করা যায় না।

ভারতের ৫৬২টী দেশীয় রাজ্যের মোট আয়তন সমগ্র ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইবে। অধিবাসী সংখ্যা ৯ কোটী ৩০ লক্ষ—অর্থাৎ ভারতের মোট অধিবাসী সংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ। দেশীয় রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশই ২৪টী বৃহত্তর রাজ্যের অধিবাসী। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর

হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তরে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর এই ভাবে দেশীয় রাজ্যগুলি সমগ্র ভারতে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। তবে, উহার অধিকাংশই মধ্য ভারত ও রাজপুতনার অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর অঞ্চলে অবস্থিত। ত্রিবাঙ্কুর ও কাথিওয়ারের দেশীয় রাজ্যগুলি ছাড়া অন্যান্য রাজ্যগুলির সমুদ্রপথে নির্গমনের নিজস্ব কোন পথ নাই। বৃহত্তর রাজ্যগুলির মধ্যে বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলি ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবে বিচ্ছিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া যদি কোন 'রাজস্থান' গঠিত হয়, তাহা হইলে উহা ভারতের মানচিত্রে একটী ক্রুশের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে।

বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে ভাষাগত, জাতিগত বা ধর্ম্মগত কোন পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু বৃটিশ রাজ্যের সহিত উভয় দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্কের বিরাট প্রভেদ রহিয়াছে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যকে সামন্ত রাজ্যের যে মর্য্যাদা দিয়াছে তাহাই স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সামন্ত রাজের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। সামন্ত রাজগণ সম্পর্কে এডওয়ার্ড টমসন বলিয়াছিলেন, "দেশীয় নৃপতিদের উদ্ধার করিয়া বৃটিশ সরকারই তাহাদিগকে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছে। দেশীয় রাজ্যগুলিকে অসহায় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া এমন কতকগুলি অঞ্চলের কর্তৃত্ব দেওয়া হইল, যাহার সহিত তাহাদের আদিতে কোন সংশ্রবই ছিল না; আবার কেহ বা এত বৃহৎ রাজ্য লাভ করিল যে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের কেহও কোন দিন অত বড় রাজ্য ভোগ করে নাই। এইভাবে দেশীয় নৃপতিবর্গ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া ক্ষমতা লাভ করে। এই চুক্তির বলে দেশীয় নৃপতিদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা রহিল না। উপরন্তু তাহাদের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইল যে, তাহারা সৈন্য দিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবে এবং তাহাদের রাজ্যের মধ্য দিয়া বৃটিশ সৈন্যের অবাধ গতিবিধির অধিকার থাকিবে। বৃটিশ পক্ষ হইতে দেশীয় রাজ্যগুলিকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তাহাদের রাজ্যে যদি বহিরাক্রমণের বা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয়-তাহা হইলে তাহাদের রক্ষা করা হইবে। ভারতে বৃটিশ শাসন কায়েম রাখার পক্ষে দেশীয় রাজ্যগুলিই হস্তপুত্তলিকারূপে ব্যবহারের একমাত্র অস্ত্র, এই সত্য বুঝিতে পারিয়া বৃটিশ রাজ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর এক রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত দায় নিজেদের হাতে গ্রহণ করে।

উপরিউক্তরূপে চুক্তি ছাড়াও সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারবলে বৃটিশরাজ দেশীয় নৃপতিদের উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখে। দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বৃটিশরাজের সার্ব্বভৌম অধিকার বলিতে কি বুঝায় তাহা ঘোষণাতে কখনও বিশ্লেষিত হয় নাই। দেশীয় নৃপতিগণ বহুবার সার্ব্বভৌম চুক্তির নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া সার্ব্বভৌমত্বের অধিকার সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু প্রতিবারই তাহারা বিফল-মনোরথ হইয়াছে। ১৯২৬ সালে বেরারের সীমানা নির্দ্ধারণ লইয়া যে বিতণ্ডা আরম্ভ হইয়াছিল তৎসম্পর্কে হায়দ্রাবাদের নিজামের নিকট লর্ড রিডিং যে পত্র দিয়াছিলেন তাহাতে সার্ব্বভৌমত্বের প্রশ্ন সম্পর্কে বৃটিশ মনোভাবের আভাষ পাওয়া যায়। উক্ত পত্রে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। পত্রে বলা হইয়াছিল, ভারতে বৃটিশ রাজের ক্ষমতা সার্ব্বভৌম, কাজেই ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের কোন নৃপতি সম-মর্য্যাদায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইবার অধিকার ন্যায়সঙ্গত ভাবে দাবী করিতে পারে না।

আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে দেশীয় নৃপতিগণ যে পূর্ণ স্বৈরাচারী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন রাজ্যে সম্প্রতি আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহার কোন কোনটীতে আংশিক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে আইন-সভাগুলির আইন প্রণয়নের কোন অধিকার নাই। যে সমস্ত আইন-সভার অধিকাংশ সদস্য ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সংখ্যা এত সীমাবদ্ধ যে, রাজ্যের মোট জনসংখ্যার সামান্য অংশমাত্র ভোট দানের অধিকারী হইয়া থাকে।

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদ ও কাশ্মীর আয়তনে খুবই বড় বটে, কিন্তু রাজনৈতিক দিক হইতে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ত্রিবাঙ্কুরের রাজনৈতিক অবস্থা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেকটা উন্নত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তথায় সময় সময় সামরিক আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। নৃপতিদের হাতেই প্রজাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে। প্রপীড়িত প্রজাদের নিকট হইতে জোর পূর্ব্বক নানাপ্রকার কর আদায় করা হয়। দেশীয় নৃপতিদের এইরূপ জবরদস্তি আচরণ সমগ্র ভারতে তীব্রভাবে নিন্দিত হইয়াছে। কঠোর নির্য্যাতন সত্ত্বেও প্রজাগণ দলে দলে দেশীয় রাজ্য-প্রজা-সম্মেলনে যোগ দিতেছে। নৃপতিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং প্রজাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবীর জন্য ১৯২৭ সালে দেশীয় রাজ্য-প্রজা-সম্মিলন সংগঠিত হয়।

বর্ত্তমানে এই সম্মিলনী একটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতৃবর্গ উহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

রাজন্যবর্গ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উভয়েই এই গণ-আন্দোলন দমনের জন্য সচেষ্ট। প্রকৃত শাসন সংস্কারের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কখনও দেশীয় রাজ্যগুলির উপর চাপ দেয় না। পরন্ত ইন্দোরের মহারাজা তাঁহার প্রজাদের কিছুটা গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দানের জন্য উদ্যোগী হইলে বৃটিশ কূটনৈতিক বিভাগ তাঁহাকে গদিচ্যুত করে। দেশীয় নৃপতিদের সম্পর্কে যাহাতে কোন প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা না যায় এবং তাহাদের কার্য্যাবলী সাধারণ্যে প্রকাশ না পায় তজ্জন্য ১৯২২ সালে সতর্কতা-মূলক একটী আইন প্রবর্ত্তিত হয়। ভারতীয় আইন-পরিষদের অধিকাংশের সমর্থন ব্যতীতই উক্ত আইন কার্য্যকরী করা হয়। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের নৃপতি বা সামন্তের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা অসন্তোষ উদ্রেক করিতে পারে এমন কোন সংবাদ পুস্তকে, সংবাদপত্রে বা নথিপত্রদ্বারা প্রচার উক্ত আইনবলে নিষিদ্ধ করা হয়।

দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসন-পদ্ধতি রেসিডেণ্ট বা পলিটীক্যাল এজেণ্টের মারফৎ বৃটিশের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা-বলে স্থির হইয়া থাকে। অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ সামরিক বা বেসামরিক অফিসারদের সাধারণতঃ দেশীয় রাজ্যগুলির দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়, কাজেই দেশীয় রাজ্যে যদি বৃটিশ অধিকার সম্পর্কিত কোন সমস্যা দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহারা যে, বৃটিশের অনুকূলে থাকিবার চেষ্টা করিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ১৮৬০ সালে লর্ড ক্যানিং যে ঘোষণা করেন তাহা হইতেই দেশীয় রাজ্যগুলিকে জিয়াইয়া রাখা সম্পর্কে বৃটিশ মনোভাব বুঝা যায়। তিনি বলেন—স্যরজন ম্যালকম বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, আমরা যদি সমগ্র ভারতকে কতকগুলি জিলাতে বিভক্ত করি তাহা হইলে আমাদের সাম্রাজ্য মাত্র ৫০ বৎসর টিকিবে, কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা না দিয়া ভারতকে যদি কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে বিভক্ত করা যায় তাহা হইলে যতদিন সমুদ্রপথে আমাদের আধিপত্য থাকিবে ততদিন আমরা ভারতে থাকিতে পারিব।

দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত বৃটেনের বর্ত্তমান সম্পর্ক বিবেচনা করিলে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক ঘোষণার মধ্যে কতটা আন্তরিকতা আছে তাহা বুঝা যাইবে। বৃটেনের কার্য্যাবলী হইতে যদি ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাহারা দেশীয় নৃপতিদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক, তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতা দানে তাহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণায় দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে সামান্যই আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু ঘোষণায় যেখানে বৃটিশ ভারতের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। গণপরিষদে বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের কার্য্যাবলী কি হইবে তাহাও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতের প্রদেশগুলির ন্যায় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির কোন বাধ্য-বাধ্যকতা নাই। বিভিন্ন গ্রুপের অন্তর্গত প্রদেশগুলি তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের পর যুক্তভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য যখন পুনরায় গণ-পরিষদের মিলিত হইবে তখনই কেবল দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ গণপরিষদে যোগ দিবেন। মধ্যবর্ত্তী কালে দেশীয় রাজ্যগুলির সার্ব্বভৌম ক্ষমতা বৃটিশ রাজ পরিচালনা করিবেন বলিয়া তাঁহারা গণপরিষদে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট রূপে যোগ দিতেছেন বলা যাইতে পারে। কাজেই দেশীয় রাজ্য হইতে নির্ব্বাচিত মোট ৯৩ জন সদস্য বৃটিশ রাজের স্বার্থহানিকর কোন ব্যবস্থায় ভোট দিবে বলিয়া আশা করা দুরাশা মাত্র। নৃপতিবর্গের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হিসাবে বলা হইয়াছে যে, প্রতিনিধিগণ পরামর্শ-ক্রমে স্থির হইবে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেস ব্যাখ্যা চাহিলে ২৫শে মে তারিখের বিবৃতিতে জানান হয় যে, এই বিষয় দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত পরামর্শক্রমে স্থির হইবে। মিশনের ব্যাখ্যায় আরও বলা হয় যে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত দলের সহিত আলোচনান্তে গঠিত দেশীয় রাজ্য-আলোচনা-কমিটী মধ্যবর্ত্তী সরকারের সহিত পরামর্শ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় স্থির করিবে। এই স্থানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে, দেশীয় রাজ্য-প্রজাসম্মিলনের সহিত পরামর্শ না করিয়াই আলোচনা কমিটী গঠিত হইয়াছে। ৯ জন সদস্য লইয়া গঠিত আলোচনা-কমিটীতে কেবল মাত্র মহা-রাজা ও দেওয়ানগণই স্থান পাইয়াছে—দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মিলনের কোন প্রতিনিধিকে এই আলোচনা-কমিটীতে গ্রহণ করা হয় নাই।

উভয় দলের সাধারণ সমস্যাগুলি আলোচনার জন্য মধ্যবর্ত্তী কালের উভয় দলের প্রতিনিধি লইয়া একটী সমন্বয় কমিটী গঠনের প্রস্তাবও মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনায় করা হইয়াছে। প্রস্তাবানুসারে সমন্বয়-কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটী সাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বিবেচনা এবং যুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্র গঠিত হইলে দেশীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক হইবে তাহা স্থির করিবে। মধ্যবর্ত্তী সরকারের কোন সদস্য যাহাতে এই কমিটীর

অধিবেশনে সভাপতিত্ব না করিতে পারেন তজ্জন্য দেশীয় নৃপতিগণ জিদ করিয়াছেন। কমিটীর অধিবেশনে বড়লাট সভাপতিত্ব করুন—ইহাই তাহারা চাহে।

সার্ব্বভৌমত্বের প্রশ্ন সম্পর্কে রাজন্য পরিষদের চ্যান্সেলারের নিকট ১৯৪৬ সালের ২২শে মে তারিখে লিখিত স্মারক পত্রে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন কালে বা কোন অবস্থাতেই দেশীয় রাজ্যের উপর তাহাদের যে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহা হস্তান্তর করিবে না। ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সৈন্য নিয়োগ করিবে না। দেশীয় নৃপতিদের সমর্থনে বৃটিশ সৈন্য নিয়োগ করা হইবে কি না তদ্বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টকে অনুরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত স্মারক পত্রে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন শাসনতন্ত্র লাভ করিবে, তখন বৃটিশ রাজের সহিত সম্পর্কের ফলে দেশীয় রাজ্য গুলির উপর যে অধিকার বৃটিশ রাজের রহিয়াছে তাহা আর থাকিবে না—সার্ব্বভৌম ক্ষমতার হস্তে দেশীয় রাজ্যগুলি যে সমস্ত অধিকার সমর্পণ করিয়াছিল, তৎসমুদয় পুনরায় তাহারা লাভ করিবে। কাজেই দেশীয় রাজ্যগুলি সার্ব্বভৌম ক্ষমতা লাভ করিবে এবং তখন যুক্তভারতে যোগদান করা না করা তাহাদের উপর নির্ভর করিবে। বৃটিশ রাজ্য ও দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে যে সমস্ত চুক্তি রহিয়াছে তাহার মৌলিক অধিকার রক্ষণ সম্পর্কেও উপরিউক্তি ব্যবস্থায় অপর একটী সমস্যা দেখা দিবে। চুক্তির অন্যতম সর্ত্তে বলা হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যের ভিতরে বা বাহিরে যদি গোলযোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যগুলিকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা হইবে। শ্বেতপত্রে এই চুক্তির বিষয় এড়াইয়া যাওয়া হইয়াছে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মধ্যবর্ত্তীকালেও নৃপতিবর্গ যাহাতে বৃটিশ রাজের একান্ত অনুগত ভৃত্যের মর্য্যাদা বজায় রাখিতে পারে এবং যুক্তভারতীয় রাজ্যে তাহারা যোগদান করুক বা না করুক নিজেদের রাজ্যে যাহাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা রাখিতে পারে, মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে তাহার ব্যবস্থা ও অশ্বাস রহিয়াছে। (অসম্পূর্ণ

ফাগুন ভ'রেছে আজ

প্রভাকর মিত্র

সর্ব্বরূপে ছিন্ন করি' সর্ব্বানন্দ হ'তে
হে শীত, ওহে সংযমী, সবার অজ্ঞাতে
হোমের আহুতি ধূমে দিগন্ত বিস্তারি'
কোন যজ্ঞে ছিলে ব্যস্ত। অঞ্চলে আবরি'
আপন আননখানি, অন্তর নিভৃতে
ধ্যানমগ্ন ছিলে। অরুণ কিরণ প্রান্তে
ফিরিয়া গিয়াছ দ্বারে করিয়া আঘাত—
সমস্ত নিখিল শুধু স্তব্ধ দিন রাত
চেয়েছিল বাতায়নে। কাননে বিহঙ্গ
তপভঙ্গ ভয় ত্রস্ত নীরব নিঃসঙ্গ
ফিরেছিল নিরানন্দ বনে। ফুলকুল
মুঞ্জরিয়া বৃন্তপ্রান্তে অফুল্লমুকুল
থমকি' দাঁড়ায়ে ছিল—পারেনি ফুটিতে।
সহসা শিহরি' এক ফাগুন প্রভাতে
চেয়ে দেখি তুমি নাই, আছে আর সব ;
অদৃশ্য যজ্ঞের ধূম ; আনন্দোৎসব
লেগে গেছে বনে বনে। সিদ্ধিলাভ করি'
চলিয়া গিয়াছ ঋষি প্রসাদ বিতরি'
বসন্তের হাতে—
তব হোমাগ্নি-পরশে
ফাগুন ভ'রেছে আজ গন্ধে, রূপে, রসে।

চতুর্দশপদী

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

বলাকা-চঞ্চল-পক্ষ পলাতকা দিন…।
মনের খামারে আজো ভিড় করে আসে
কথার ময়ূর—। জানি স্মৃতির সে ঋণ
উড়ায়ে দিয়েছ তুমি নতুন বাতাসে।

কি দিয়েছি কি পেলাম জমার খাতায়—
কি নীরে হ'লোনা ভরা মোর কুম্ভ আজ,
সে খেদে কাঁপেনা ঝড় আমার নীলায়
সে খেদে ঝরেনা সখী মোর গন্ধরাজ।

আমিতো দেবতা আজ ধূলির ধরায়—
আমারে ক'রেছে হেম তব প্রেমশিখা।
অনন্ত-সুন্দর মোরে ডাক দিয়ে যায়
শ্যামলে শ্যামলে হেরি তোমারি লিপিকা।

কস্তুরী মৃগের মত প্রাণে মোর দ্রাণ—
তাই ল'য়ে ব'য়ে যাবো রচে' যাবো গান।

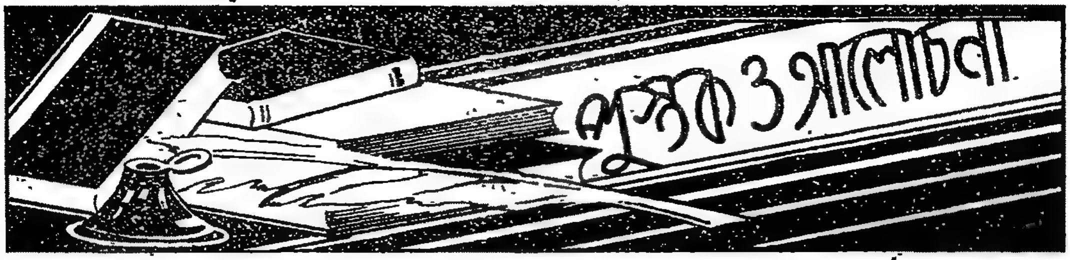

দ্বীপপুঞ্জ : উপন্যাস : শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। পুস্তকালয় : ২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য ৩॥০ মাত্র।

'দ্বীপপুঞ্জ' সর্ব্বপ্রথম যখন 'হরিবংশ' নামে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখনই ইহার কাহিনী ও প্রকাশ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সেই রচনাকে বহুতর সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়া লেখকের এই 'দ্বীপপুঞ্জ'-প্রকাশ বর্ত্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা লইয়া আজ বাংলা কথা-সাহিত্যে যে পরীক্ষা-মূলক কাজ চলিয়াছে, নরেন্দ্রবাবুর স্থান তাহার মধ্যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে মনের ভাব-সম্পদের সংমিশ্রণ না ঘটিলে শিল্পীর সৃষ্টি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। সেই সংমিশ্রণগুণই দ্বীপপুঞ্জকে সার্থকতা দান করিয়াছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ-স্নেহ-প্রণয়-জরা-ব্যাধি ও কামনার সংঘাতময় ঘটনাপঞ্জীতেই প্রধানতঃ নরেন্দ্রবাবুর প্রায় সব রচনাই পরিপুষ্ট। দ্বীপপুঞ্জেও আমরা সেই পরিপুষ্টি লক্ষ্য করি। গ্রাম্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নবদ্বীপ, হবল, মুরলী, মঙ্গলা, মনোরমা, সৌদামিনী প্রত্যেকেই যেন স্ব-স্ব চরিত্রে এক একটি খণ্ড খণ্ড দ্বীপ : এক একটি রহস্যঘন দ্বীপপ্রাণ মানুষ প্রত্যেকে। লেখকের চরিত্র-বিশ্লেষণ ও সংলাপ কাহিনীর মধ্য দিয়া পাঠক-মনকে যথার্থ-ই একটি বাস্তব ঘটনার সম্মুখীন করাইয়া চিন্তিত করিয়া তোলে। কাহিনীকে আরও মনোময় রূপ দিয়াছে পল্লী-সংস্কৃতির অনুষ্ঠানগুলি, যেমন শীতলা রক্ষাচণ্ডী পূজা, কুলা নামানো ইত্যাদি। নরেন্দ্রবাবুর প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'দ্বীপপুঞ্জ' সার্থক সৃষ্টি এবং আত্ম-স্বকীয়তায় বলিষ্ঠ ও জীবন্ত।

জীবন ও যুদ্ধ : উপন্যাস। শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

অশ্বিনীবাবু প্রধানতঃ কবি। 'জীবন ও যুদ্ধ' তাঁহার প্রথম উপন্যাস। রচনার প্রায় প্রতি ছত্রেই তাঁহার সেই কাব্য-সৌন্দর্য্যপূর্ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের প্রধান নায়ক সমরেন্দ্র; পাশাপাশি চরিত্রের মধ্যে সিন্ধু বৌদি, মুক্তা প্রভৃতি। জাপানী আক্রমণের পূর্ব্বের ও পরের ব্রহ্ম দেশের পটভূমিতে রচিত কাহিনীতেই 'জীবন ও যুদ্ধ' পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে ভাষার তীক্ষ্ণতা ও আলঙ্কারিক গুণ মনকে মুগ্ধ করে। কিন্তু সিন্ধু বৌদির সঙ্গে সজলের সংলাপালোচনা শিল্পের দিক হইতে খুব উঁচু স্তরে উঠিতে পারে নাই। মুক্তার শিশু-সারল্য সুন্দর ফুটিয়াছে। বইখানি বাঙ্গালী গল্প-পাঠকদের ভাল লাগিবে।

তোমার পতাকা যারে দাও : উপন্যাস। শ্রীশৈলেন মজুমদার। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স : ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

লেখক বাংলা সাহিত্যে নবাগত। লোক-চক্ষুর অন্তরালে এমন অনেক ফুল ফোটে, সৌরভের মাধুর্য্যের দিক দিয়া যাহার মূল্য দৃশ্য কুসুমগুচ্ছের চাইতে একেবারেই কম নয়। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। বাংলার বিভিন্ন সাময়িক-পত্র মারফৎ পাঠকসমাজের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত না হইলেও রচনায় তিনি যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছেন, তাহা প্রসংশার্হ। অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনীতে গ্রন্থের আঙ্গীক গঠিত। বলিষ্ঠ ভাষা ও সুন্দর প্রকাশ-ভঙ্গীর জন্য কোথাও পাঠের গতি ব্যাহত হয় না। লেখককে কোথাও কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ, কেতকী, পূর্ণ কুমার, বরেন, মলয়া, কিঙ্কর প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে লেখকের দরদী প্রাণঃশীলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য-সৃষ্টির প্রতি আরও অনেকখানি বাস্তবধর্ম্মী দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে পারিলে অদূর ভবিষ্যতে লেখক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া নিতে পারিবেন।

অভিযাত্রী : শ্রীকিশোরী-মোহন ঘোষাল প্রণীত কবিতা সঞ্চয়ন। বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ মাত্র।

শ্রীযুক্ত ঘোষাল প্রখ্যাত কবি না হইলেও মনে-প্রাণে খাঁটি কবি তিনি। অব্যক্ত রূপ হইতে ব্যক্ত স্বরূপের মধ্যে মানব-জীবনের যে নিরন্তর যাত্রা—তাহাকেই গদ্য-কবিতার (Prosaic Verse) ছন্দে কবি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষার বলিষ্ঠতা ও অনুভূতির সূক্ষ্মতায় গ্রন্থের প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ পূর্ণ।

সম্পাদকীয়

সচ্চিদানন্দ-স্মরণে

দেখিতে দেখিতে সচ্চিদানন্দ-মহাপ্রয়াণের পরে দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। মানুষ যায়, কেহই চিরকাল থাকে না, তাহার অভাবে সংসারও যেমন চলিবার, প্রায় সেই ভাবেই চলে। কিন্তু তথাপি কাহারও কাহারও অভাব কোন কোন লোকের কাছে বরাবরই অপূর্ণ থাকে। ব্যবসা ক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দ যে বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাও আজ পূর্ব্ববৎই চলিতেছে, কিন্তু আমার কাছে তাহার অভাব চিরকালই অপূরণীয় থাকিবে।

চল্লিশ বৎসরের অধিক হইল, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটস্থ পল্লী সড়িষায় উচ্চ বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টারী করিতে গিয়া সেই অপরিচিত স্থানে একটি রত্ন লাভ করি—সেই অমূল্যনিধিই এই সচ্চিদানন্দ। বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত তাহার খুল্লতাত স্বর্গত রামচন্দ্র কাব্যতীর্থের অভিভাবকত্বে থাকিয়া সে তথায় অধ্যয়ন করিতেছিল। তখন প্রথম শ্রেণীতে পড়িত। ক্লাসে গিয়াই তাহার সৌম্য চেহারা, কর্ম্মপ্রবণতা ও হৃদয়বত্তা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে মুখের ভাব সড়িষা হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার বহুদিন পরেও মনে পড়িত। বর্ত্তমানে শুনিতে পাই, ছেলে বয়সে নাকি সে দুরন্ত ছিল। সঙ্গীদের সঙ্গে নাকি আমোদের মাত্রা প্রায়ই বাড়াইয়া ত। কিন্তু আমি যে কয়মাস সড়িষায় ছিলাম, তাহার কোনরূপ অসঙ্গত আচরণ আমার চক্ষে পড়ে নাই বা শ্রুতিগোচরও হয় নাই। বিশেষতঃ ছাত্রের পরিচয় সাহচর্য্যের গুণে। আমার দুইটি মাসতুত ভাই পরেশ ভূপেশ সে সময়ে আমার সঙ্গে থাকিয়া তাহার সহপাঠি ছিল। ইহারা বড় সুবোধ ও মনোযোগী ছাত্র ছিল। সচ্চিদানন্দকে তাহাদের সঙ্গেই অধিক সময় কাটাইতে দেখিতাম। বৈকালে সড়িষার রাস্তায় কখনও একাকী, কখনও সেই সঙ্গে নগ্নপদে ভ্রমণ করিতেও দেখিয়াছি, কখনও বা আমার বাসায় আসিয়া শিক্ষা, সমাজ ও স্বদেশী-মূলক বিষয়েও আলোচনায় নিরত দেখিয়াছি। বাহিরের বিষয় জানিবার আগ্রহ বরাবরই তাহার হৃদয়ে প্রবল ছিল।

সচ্চিদানন্দের খুল্লতাত পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক—নিয়ত কর্ম্মশীল, প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ়, স্নেহে মৃদু, সহৃদয়তায় বান্ধব ও শাসনে কঠোর। ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ব্যবসাক্ষেত্রেও তাহার দক্ষতা ছিল। খুল্লতাতের অনেক গুণ সচ্চিদানন্দে বর্ত্তিয়াছে—ইহা আমি বরাবর লক্ষ্য করিতাম।

সড়িষা ছাড়িয়া আসিবার পরে ত্রিশ বৎসরের অধিকও আর সাক্ষাত হয় নাই। কিন্তু বহুদিনের শিক্ষকতায় কত ছাত্র পড়াইয়াছি, কি অজানিতসূত্রে সেই মুখখানি প্রায়ই মনে পড়িত, তাহা মানববুদ্ধির অতীত।

বহুদিন পরে—ষোল বৎসরের কথা—আমি আলিপুরে ওকালতি করিতাম, একদিন আমার জনৈক বন্ধুর কাছে আমার পরিচয় পাইয়া গাড়ী করিয়া আমাকে কার্য্যস্থলে লইয়া যান। তখন ব্যবসায়ে তাহার অসাধারণ খ্যাতি, ধূলি ধরিলেও সোনা হইত, যশ ও অর্থ উভয়ই প্রচুর সম্ভারে তাহাকে উপচার দিত। কিন্তু কি ব্যবহারে—কি পরিচ্ছদে—কি আলাপালোচনায়, তাহার বিনয় ও সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল।

অল্পদিন মধ্যেই তিনি তাহার কাজে আমাকে টানিয়া নিলেন। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চলিয়া আসিলাম। ইহাতেও মঙ্গলময়ের হস্তই নিহিত দেখিতে পাই। এমন আপন জন না পাইলে কি সাহিত্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ সম্ভব হইত? আমার রচিত সাহিত্যে জাতির যদি কখনও কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে যশ সচ্চিদানন্দের।

পনের বৎসরের সাহচর্য্যে দেখিয়াছি, অসংখ্য ব্যবসা চালাইয়াও অবসর সময় তিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমগ্র মানব মণ্ডলীর হিতচিন্তায়ই ব্যয় করিতেন। এরূপ সাধনা আমি ব্যবসায়ী কেন, খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখিয়াছি। অধ্যয়ন, ধ্যানধারণা এবং তর্ক বিচারের পরে যে সমস্ত অমূল্যতত্ত্ব রচনা করিয়া 'বঙ্গশ্রী'র কলেবরে মাসের পর মাস তাপসের ন্যায় তিনি পরিবেশন করিয়া যাইতেন, তাহা গভীর চিন্তাপ্রসূত এবং কঠোর গবেষণামূলক। সাহিত্যক্ষেত্রে যদিচ এই সমস্ত প্রবন্ধাদির মূল্য একমাত্র কালই নিরূপণ করিবে, কিন্তু এ কথা বারবার লক্ষ্য করিয়াছি, ঐ সমস্ত রচনার মূলেই ছিল—বিরাট মানবতা, মানবের দুঃখে সমবেদনা এবং মানব সমাজের ঐক্যবন্ধনে প্রবলাগ্রহ ও অনুরাগ।

সচ্চিদানন্দের হৃদয়বত্তা কেবল রচনায়ই নিবদ্ধ ছিল না। আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব গ্রামবাসী, দীনদুঃখী অভাব জানাইলে বা কোন দেশনায়ক সহানুভূতি চাহিলে কেহই রিক্তহস্তে ফিরিতেন না। বাল্যকালের বন্ধু বা সহপাঠিগণের প্রতি কখনও বান্ধবতার অভাব হয় নাই, ভ্রাতাভগিনী জ্ঞাতিবন্ধু বান্ধবের প্রতিও স্নেহের কখনও অভাব দৃষ্ট হয় নাই।

তাহার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মিগণকে তিনি সর্ব্বদাই এক পরিবারের অন্তর্গত মনে করিতেন—যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায় সকলকে এক শৃঙ্খলে গ্রথিত করিবার শক্তি ছিল তাহার অসাধারণ। একটা বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অনেকে সময় সময় স্বমত ব্যক্ত করিবার সাহস না করিলেও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভাবে সকলের মনস্তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা তিনি রাখিতেন। দোষ করিয়া ত্রুটি স্বীকার করিলে কেহই ক্ষমালাভ করিতে কখনও বিরত হইত না। ঐক্য বন্ধনের সূত্র হস্তগত ছিল বলিয়াই তাহার সৃষ্ট ব্যবসার গতি ছিল বরাবরই অপ্রতিহত। তাঁহার বুদ্ধিও ছিল যেমন প্রখর, কার্য্য সিদ্ধান্তও ছিল তেমনি দ্রুত ও স্পষ্ট।

সামাজিকতায়ও এরূপ মুক্ত প্রাণ মানুষ খুব কমই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তাহার বিশাল ভবন ছিল অবসরকালের বিশ্রামাগার—পূজা-পাঠে, কীর্ত্তন-যাত্রায় হাসি-গল্পে সর্ব্বদাই তাহা মুখরিত হইত। আর সর্ব্বদাই ছিল—দীয়তাং ভুজ্যতাং ভাব।

সচ্চিদানন্দ অল্প দিন মাত্র ভুগিয়া অকালে দেহরক্ষা করিয়াছেন। আরও পরিতাপের বিষয়, আমাকেই সেই সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। যতদিন চৈতন্য থাকিবে, সেই শোকাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে না।

তাহার অকাল বিয়োগে বন্ধুবান্ধবগণের হৃদয় বিষাদগ্রস্ত থাকিলেও, তাহার পুত্রগণের দ্বারা তাহার স্থান পূর্ণ হইবার সম্পূর্ণ আশা করা যায়। তাহার পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ যেরূপ দক্ষতা, সমদর্শিতা ও নিরপেক্ষাচরণে সমগ্র ব্যবসাগুলিই বিশেষ যোগ্যতার সহিত রক্ষা করিতে সমর্থন হইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, অন্তরাল হইতেও তাহার অদৃশ্য হস্ত তাহার অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যই যেন পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। আজ এই ফাল্গুনের পবিত্র পূর্ণিমা তিথিতে আমি মানব-বন্ধু ও আমার একান্ত আপন জন সচ্চিদানন্দের পবিত্রস্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তাহার কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি শুভেচ্ছা বর্ষণ করিতেছি। ভগবান তাহার আত্মার শান্তি বিধান করুন।

ফাল্গুনের পূর্ণিমা, ১৩৫০। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গভঙ্গ লইয়া দেশে আন্দোলন ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। আমরা এ সম্বন্ধে গত ফাল্গুন মাসের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, অখিলচন্দ্র দত্ত, কামিনী কুমার দত্ত, সতীন্দ্র নাথ সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র দাস, হেমেন্দ্রনাথ দত্ত, নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার, যতীশচন্দ্র মৈত্র, অমিয় বসু প্রভৃতি বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে মত প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা ইহার পক্ষে মত প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঞ্জা, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত সরকার, কর্ণেল এ,সি, চাটার্জ্জি, নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায় ও কতিপয় ব্যারিষ্টার অন্যতম। দুই দিকেই দেশের প্রধান প্রধান লোক রহিয়াছেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীও বঙ্গভঙ্গকে স্বপ্নের অতীত বলিয়াই মনে করেন। তিনি মনে করেন, ইহাতে বাঙ্গালা দেশেও অন্যান্য 'স্থান' হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং ভারতে প্রকৃত ঐক্য অন্তর্হিত হইবে। যাহা হউক, আমরা বিষয়টি বাঙ্গলার সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের দিক হইতে আলোচনা করিতে চাই।

সম্প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্তে অনেকে উৎফুল্ল হইয়া মত প্রকাশ করিতেছেন যে, জাতীয় কংগ্রেসও 'বঙ্গভঙ্গে' সম্মতি দিয়াছে। কিন্তু ইহারাই আবার, শ্রীরাজাগোপালাচারী যখন কিছু দিন পূর্ব্বে অনুরূপ একটী ব্যবস্থার কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাকে বিশেষ ভাবে নিন্দা করিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত বঙ্গ ভঙ্গ নয়, আবশ্যক মত ভয়ার্ত্ত লোককে আশ্বাস প্রদান এবং তাহা খুবই ন্যায় সঙ্গত। এ কথা ঠিক যে বর্ত্তমান মুসলিম লীগের মন্ত্রিত্বাবস্থায় হিন্দুগণের স্বার্থ নানাভাবে বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। মুসলীম লীগ-মন্ত্রিগণ একটানে নিজেদেরই হিত সাধন করিয়া লইতেছেন। তাঁহাদের হাতে এতগুলি লোকের শাসনভার ন্যস্ত থাকিলেও তাঁহারা কর্ত্তব্য তো করিতেছেনই না, পরন্তু এই সমস্ত নিরীহ ব্যক্তিগণ নানাভাবে পীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। এই অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটীর সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ মন্ত্রিগণের সিদ্ধান্তানুযায়ীই হইয়াছে। কারণ প্রধান মন্ত্রী স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "শাসনতন্ত্র দেশের অনিচ্ছুক অংশের উপরে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইবে না।" এমতাবস্থায় মুসলীম লীগ যদি মণ্ডলী গঠনে যোগদান করে, তবে (গ) বিভাগের রচিত শাসনতন্ত্র স্বার্থ বিরোধী হইলে আসামের [illegible] উহা পরিহার করিবার অধিকার আছে [illegible] যে সমস্ত স্থানের অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর বা অ-মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তাহাদেরও পরিহার করিবার সমান অধিকার আছে। আর বাঙ্গলায় বর্ত্তমান শাসনপ্রথা চলিলে, হিন্দু প্রধান স্থানসমূহের উপর এই অন্যায় শাসন কিছুতেই চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ন্যায়ানুসারে ওয়ার্কিং কমিটী খুব উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। এবং ইতিপূর্ব্বে বহু ব্যক্তি কংগ্রেসকে এই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে উদাসীন দেখিয়া কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে যে আক্রমণ করিতেন, তাহাদের সেই পথ এখন প্রকৃত ভাবে বন্ধ হইল। কিন্তু দেখিতে হইবে, কংগ্রেস বাঙ্গলা দেশের হিন্দু প্রধান স্থান সমূহকে সহায়তা করিতে অনিচ্ছুক না হইলেও প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গলার এই দ্বিখণ্ডিত ব্যবচ্ছেদে যাবতীয় বাঙ্গালীর তথা হিন্দুগণের সুবিধা অসুবিধা কতটা হইল, আমরা কেবল তাহাই আলোচনা করিব।

প্রথমে হিন্দুদের কথাই ধরি। পূর্ব্বদিক হইতে চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং রাজসাহী বিভাগের হিন্দুসংখ্যা যথাক্রমে ২০'৭, ২১'৭ ও ২৭'৮। সুতরাং মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশী থাকায় এই তিনটি বিভাগ মুসলীম লীগের অংশে যাইবে। অপর পক্ষও (বঙ্গ ভঙ্গের পক্ষভুক্তরাও) তাহা দিয়া পাকিস্তান করিতে চাহেন। এই বিষয়ে তাহারা একেবারে মুক্তহস্ত ও মুক্তপ্রাণ। এখানে একটী বিষয়ে উল্লেখ আবশ্যক। রাজসাহী বিভাগে জলপাইগুড়িতে হিন্দু শত করা ৫০ জন, বাকী মুসলমান এবং পাহাড়ীয়া জাতি ? দার্জ্জিলিংএও মুসলমানের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু এই দুইটি জিলা বহুদূরস্থ কলিকাতা এবং বর্দ্ধমান, হুগলী প্রভৃতি স্থানের কোন সুবিধায় আসিবে না। বিশেষতঃ কলিকাতা হইতে কোন লোককে তথায় যাইতে হইলে পাকিস্তানী নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর হইয়া যাইতে হইবে এবং সে যাওয়া সহজ হইবে না। সুতরাং জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং কার্য্যতঃ আর খাস বাঙ্গলার মধ্যে থাকিবে না। এখন প্রেসিডেন্সী বিভাগই ধরা যাউক্। যদি রাজা গোপালাচারী মহাশয়ের যুক্তি ধরা যায়, তবে কোন জিলা সম্বন্ধেই আমরা নিশ্চিত নই, কারণ তিনি মাথা গন্‌তি ভোট (Plebiscite) নিতে বলিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান লীগ গভর্ণমেণ্টের আওতায়ই এরূপ গন্‌তিতে ভয়ে বা লোভপ্রদর্শনে বেশী হিন্দু বিশেষতঃ তপশীল সম্প্রদায়ের ব্যক্তি ভোট দিতে আসিবে না কি ভাবে ভোট হইবে এবং কিরূপে জিলার বিচার হইবে ওয়ার্কিং কমিটী তাহা বলে নাই। হয়তো বা রাজাগোপালাচারীর মত ও [illegible] করিতে পারে। এবং তাহা হইলে অতি অল্প [illegible] ভাবে হিন্দুদের থাকিবে।

যদি সেরূপ না হয় এবং পূর্ব্ব আদমসুমারীর (সেনসাসের) উপরে নির্ভর করা যায়, তবে আমরা দেখিতে পাই, প্রেসিডেন্সী বিভাগে (যাহা ডিভিসনাল কমিশনারের অধীন) চব্বিশ পরগণায় হিন্দু শতকরা ৬৪ জন। ইহা ছাড়া প্রায় সব জিলায়ই মুসলমানের সংখ্যা বেশী। যেমন নদীয়ায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৬১.২৬ জন, যশোহরে ৬০½ জন, মুর্শিদাবাদে ৫৬½ জন। সুতরাং এই সমস্ত জিলার মুসলমানরা যদি পূর্ব্বোক্ত তিন (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী) বিভাগের অন্তর্গত থাকিতে চায় তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বা গণপরিষদের কিছুই বলিবার থাকিবে না। খুলনা জিলায় হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৫০.৩১, এখানেও যে খুলনায় মাথার দিক কে ধরিবে এবং পায়ের দিক্ কে ধরিবে তাহাও সমস্যার বিষয়। আর সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগেই যদি ধরা যায়, তবে সেখানে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৫৩.৯০ থাকায় আগামী চৌদ্দমাসে মুসলীম লীগ লোক সংখ্যা বাড়াইয়া যে সংখ্যাগরিষ্ঠ করিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে না, এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই। বরং বিপরীত দিকে ভাবিবার পক্ষে কয়েকটি লক্ষণও দেখা যাইতেছে। শুনিতে পাই, সহরতলীর চারিপার্শ্বস্থ জমি গভর্ণমেণ্ট হাতে নিয়া তাহা বিলি করিয়া কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। মুসলীম লীগ মন্ত্রিত্বকালে এই জমি কাহার হাতে কতটা যাইবে তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, একটি পতিত জমি (Waste Land Bill) শীঘ্রই পাশ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইহা এখন আইন সভার বিচারাধীন। ইহা আইনে পরিণত হইলে যাহারা অন্য প্রদেশ হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। এই সমস্ত জমি বর্দ্ধমান জিলায়ই বেশী। ইহাও বেহারের দুর্গত মুসলমানদের দেওয়া হইবে, বুঝা যাইতেছে। ইতিমধ্যেই মন্ত্রিদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন, বেহার হইতে আগত দুর্গতদের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তৃতীয়তঃ, ঢাকার মিঃ হলাও উক্ত বিভাগের কমিশনার ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বদনাম আছে যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হিন্দুরা ন্যায়ানুমোদিত আচরণ পায় নাই। তিনি এখন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান। তিনিও যে যুদ্ধকালীন গভর্ণমেণ্ট-অধিকৃত কলিকাতা সহরের বাড়ীগুলিকে ও অন্যান্য জায়গার কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন, তাহাও শীঘ্রই বুঝা যাইবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর প্রস্তাবে উষ্মা প্রকাশ করিয়া অন্তর্ব্বর্তী সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ চুন্দ্রীগড় একটী বিবৃতিতে সমগ্র বাঙ্গলায় তাহাদিগকে পাকিস্তান ক[illegible] ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গলার মুসলিমলীগ মন্ত্রিমণ্ডলী সমগ্র বাঙ্গলা দেশকে ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসনতন্ত্র হস্তান্তরের পূর্ব্বেই (কারণ ক্ষমতা) হস্তান্তর পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহাদের হাতেই থাকিবে, নানা প্রকার উপায়ে পাকিস্তানোপযোগী করিয়া নিবেনা, সেরূপ আশা করিবার কোন কারণই নাই। আর সেই সময়ে যে খুলনা, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানও পাইবার জন্য তাহারা বলপ্রয়োগ করিতেও দ্বিধা করিবেনা, এরূপ না ভাবিবারও কারণ নাই। সেদিনও হিন্দুপ্রধান বর্দ্ধমান জিলায়ও ৪০০ শত বেহারী মুসলমান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থানা আক্রমণ করিয়াছে। এমতাবস্থায় এখন হইতে অসহায় বালকের ন্যায় আমরা যত বঙ্গবিভাগের জন্য বিবৃতি দিব ও কল্পনা জল্পনা করিব, এদিকে পাকিস্তানোপযোগী সব মাল মশলা তৈয়ার হইয়া অচিরেই তাহাদের পাকিস্তানী সৌধ গঠনে আমরা সহায় হইব। কারন তিনটী বিভাগ যে মুহূর্ত্তে ছাড়িব বলিয়া ঘোষিত হইবে, হিন্দুগণ নিতান্ত অসুবিধা না থাকিলেই ছাড়িয়া আসিবে, আর যাহারা থাকিবে নিঃসহায় অবস্থায়, হয় ধর্ম্মান্তরিত হইয়া, না হয় মুসলমানের নিতান্ত আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। এদিকে মুসলমানরা নির্ব্বিবাদে তিনটী বিভাগ পাইয়া, বাড়ীঘর ঠিক ভাবে কায়েম করিয়া কলিকাতা, বর্দ্ধমান বিভাগ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে কতক নবপ্রাপ্ত পতিতজমিতে গিয়া এমন ভাবে বাসস্থান করিয়া ফেলিবে যে, যে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে মুক্তিলাভের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া হইবে, সেই বিবাদ ঝগড়া বৃদ্ধি ছাড়া কিছুতেই হ্রাস পাইবেনা। বর্দ্ধমানের নমুনা দেখিয়া তাহাই মনে হয়। সুতরাং বাঙ্গলা দেশকে স্বেচ্ছায় পাকিস্তান করিয়া দিয়া বাঙ্গালীর আর—বৃদ্ধদের কাশী, পুরী বৃন্দাবনে—এবং যুবক প্রৌঢ়দের বিহারে পলায়ন ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকিবেনা। এই যে ভীষণ অবস্থা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহাই গভীর ভাবে চিন্তা করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি। পূর্ব্ববাঙ্গলার কয়েকজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তি যাহারা বাড়ীঘর করিয়াছে, তাহারা ছাড়া সাধারণ লোকে বাড়ীঘরই বা কোথায় পাইবে? পশ্চিম বঙ্গে বিলি করিবার মত স্থান কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ভাষা এবং সংস্কৃতি এক। যে সমস্ত মুসলমান এখন বাঙ্গলায় বিশেষতঃ পূর্ব্ববাঙ্গলায় বাস করিতেছে, তাহারাও পূর্ব্বে হিন্দুই ছিল। বাঙ্গালী জাতি এক ও অখণ্ড, এবং এই ভাবই বাঙ্গলার [illegible]। বাঙ্গলার অখণ্ডত্ব রক্ষা করিবার জন্যই ১৯০৫ [illegible] সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দৃঢ়পণ করিয়া-

ছিলেন। এবং সেই হইতেই বাঙ্গলার জাগরণ আরম্ভ হয়। ক্রমে সেই স্পন্দনে সমগ্র ভারত উদ্বোধিত হয়, আর এই উদ্বোধনের ফলেই আজ সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা লাভের সূচনা হইয়াছে। সেই সময়কার পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গবাসীদের সমবেত চেষ্টার ফলেই স্বাধীনতা করলব্ধ হইবার উপক্রমও হইয়াছে। কিন্তু আজ এক ভাই আর এক ভাইকে ছাড়িয়া দিয়া নিজের সুবিধা খুঁজিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের স্বর্গত অম্বিকা মজুমদার, কৃষ্ণকুমার, মনোরঞ্জন, যাত্রামোহন, অশ্বিনী দত্ত, আনন্দ রায়, অনাথবন্ধু গুহ, অখিল দত্ত প্রভৃতি ১৯০৫ সাল হইতে সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন—১৯২০ সাল হইতে পূর্ব্ববঙ্গের চিত্তরঞ্জন যতীন্দ্রমোহন নৃপেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির ঐকান্তিক সাধনায়ই স্বরাজলাভ সম্ভব হইয়াছে। যদি অর্দ্ধেক পাইলেও অর্দ্ধেক ছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে বা সমীচীনই হইত, কিন্তু—রক্ষা করা যে সম্ভব হইবে না, তা একটু সূক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুগণ ছাড়িয়া দিতেছে ভয়ে। এই ভয়ার্ত্ত ও পলায়নোন্মুখ ব্যক্তিদিগকে দাবাইয়া রাখা সব অবস্থায়ই সম্ভব। এই ভয়ে পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকে ছাড়িয়া বাঙ্গলার সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে সামান্য দূরদৃষ্টিও নিহিত আছে?

পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের সম্বন্ধে সাধুবাদ ভাবপ্রবণতা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবতার দিক হইতে যে কথাটি বলিব তাহাপেক্ষা বোধ হয় অধিকতর সত্য কিছুই নাই। মুসলমান প্রধান স্থানসমূহে যে প্রায় এক কোটি হিন্দুর বাস আছে, বর্ণহিন্দুদের ইচ্ছায় পাকিস্তান হইয়া গেলে, এই কোটী হিন্দুর অবস্থা কিরূপ হইবে? আজ বর্ণহিন্দুর লোকেরা হালে পাণি না পাইয়া রাতারাতি তপশীল সম্প্রদায়ের বান্ধব সাজিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই ঠেকায় পড়িয়া, আন্তরিকতা ইহাতে মোটেই নাই। আন্তরিকতা থাকিলে আবার সুবিধার সম্ভাবনায় কেহই তপশীলদের ছাড়িয়া যাইত না।

যে সময়ে এইরূপ ভাগাভাগি প্রায় কার্য্যে পরিণত হইবার অবস্থা হইয়া আসিবে, বর্ণহিন্দুরা (যাহারা এখনও [illegible] নাই) কলিকাতার দিকে রওনা দিবে, আর জমির [illegible] যাহাদের সম্পর্ক নাই, কৃষকমণ্ডলী সেখানে থাকিতেই বাধ্য হইবে। আর ব্যবসায়ীকুল, তিলি, সাহা, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, নমঃশূদ্র, জেলে, মুচি, ভুইমালী প্রভৃতি সেখানে তোস্ত অসহায় অবস্থায়ই থাকিবে। বাক্যবাগীশ বাবুরা ছাড়িয়া আসায় এই সব কৃষক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা নিজদিগকে নিতান্ত সহায়হীন মনে করিবে এবং কার্য্যতঃ মুসলমানদের তাঁবেদার হইয়া পড়িবে এবং অনেকে আচারে বা ধর্ম্মে মুসলমানের ন্যায়ই হইয়া পড়িবে। অনেকে মনে করেন, হিন্দুপ্রধান বাঙ্গলা তাহাদিগকে সহায়তা করিবে। সহায়তা করিবে কিরূপে, তাহাদিগকে সেই পূর্ব্ব পাকিস্তানে যাইতে অধিকার কে দিবে? আর তাহাদিগকে সাহায্য করিবার কথা—শিশু ভুলাইতে উপকথা মাত্র! অশীতিবর্ষ বৃদ্ধ জগতের শ্রেষ্ঠ মানব সেখানে দূর হইতে আশ্বাস দিতে গত দুরন্ত শীতের মধ্যে নানা কষ্ট সহ্য করিয়াও রহিয়াছেন আর বাক্যবাগীশ বাবুরা সেখানে ত যানই নাই, বরং মহাত্মাজীর সেবাকার্য্যের তীব্র নিন্দা করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। আর এই সব তপশীল সম্প্রদায়ের এবং স্থানীয় বাসিন্দাগণ কোন মুখে এই বাবুদের সহায়তাই বা প্রত্যাশা করিবেন? যে প্রকারেই হউক, ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়িতে হইলেও মুসলমানদের সঙ্গে ভাব করিয়াই থাকিবে। কারণ জলে বাস করিতে হইলে কুমীরের সঙ্গে কে ঝগড়া করিতে চায়? পশ্চিম বাঙ্গলা ছাড়িয়া বেহারের লোক নোয়াখালীর লোকদের জন্য কাতর হইয়াছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যাহারা বাস করিতেছেন, মুষ্টিমেয় লোক ব্যতীত তাহাদের মধ্যে কোনরূপ চিন্তার ভাবই পরিলক্ষিত হয় নাই। সুতরাং এই এক কোটী নিঃসহায় বাঙ্গলার লোককে বিসর্জ্জন দিয়া বাঘের মুখে ফেলিয়া দিয়া বাঙ্গলার কৃষ্টি যে কি প্রকারে রক্ষা হইবে, তাহা বুদ্ধির অতীত।

কিন্তু তবে কি আমরা বসিয়া বসিয়া কেবল মারই খাইব? রক্ষার কি কোন উপায়ই নাই? নিশ্চয়ই উপায় আছে। এ কথা নিশ্চিত বলিয়া ধরা যায় যে, যে ব্রিটিশ জাতি আর চৌদ্দ মাসের মধ্যে ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তাহারা বাঙ্গলা সম্বন্ধে যদিই বা অন্যায় কিছু করিয়া রাতারাতি চলিয়া যায়, তখন সেই অন্যায়ে যদি জাতির আশা আকাঙ্খা ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বার্থ লাভ সবই পর্য্যুদস্ত হয়, তবে বাঙ্গালী তখন তাহা মূকভাবে কেন সহ্য করিবে? তাহাকে প্রকৃত বীরের ন্যায়ই যথাবিহিত কার্য্য করিতে হইবে। এই ন্যায় ও ধর্ম্মের খাতিরে যুক্ত ভারত গভর্ণমেণ্টও বাঙ্গালাকে নিশ্চয়ই সহায়তা করিবে। চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশ ও রাজ্যসমূহও—আসাম, উড়িষ্যা, বেহার, নাগপুর, নেপাল, ভুটান প্রভৃতির সহায়তা হইতেও বঞ্চিত হইবে না। বাঙ্গলার মুসলীম লীগ কি তখনও অন্যায় করিতে সাহস করিবে? পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সম্বন্ধের নৈতিক সহায়তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ যদি এক হইয়া দাঁড়ায়, তবে বাঙ্গলার মুসলীম লীগের অন্যায় অবিচার সহায়তা করিবার জন্য কি পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ সেই দূর হইতে বিমানে চড়িয়া সহায়তা করিতে আসিবে? বাঙ্গালার এই যে আন্তঃপ্রাদেশিক সুবিধা, সেই সুবিধা, সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের হিন্দুদের হইবে না।

সুতরাং এই সুবিধা থাকিতেও তরঙ্গ দেখিয়া তীরে নৌকাখানি নিমজ্জিত করা বুদ্ধিমানের কার্য্য মোটেই নয়।

কিন্তু ইহা তো ভবিষ্যতের কথা। এই অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা প্রতিপদে কি এতদিন লাঞ্ছিতই হইব? লাঞ্ছিত হইবার কোন কারণ নাই যদি বঙ্গবাসী হিন্দু সব বিভিন্ন দলভুক্ত না হইয়া একদলভুক্ত হয়। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হইতে দিতেছে না। হয়তো কেহ কেহ বলিবে, একতাবদ্ধ হইয়াও পাঞ্জাবী হারিয়া যাইতে পারে, কিন্তু পরিষদের সভ্যগণ এই বিষয়ে মুখর কই? দেশবাসীও তো সব অত্যাচারই গাছ পাথরের মতই সহ্য করিতেছে। আজকাল বাঙ্গালী এত ভীরুতাসুলভ মনোভাব সম্পন্ন হইল কিরূপে? যে বাঙ্গালী বঙ্গভূমির বিচ্ছেদ পণ্ড করিয়া 'ইতিহাস' সৃষ্টি করিয়াছে, সেই বাঙ্গালীই আজ পাকিস্তান মুসলমানের হাতে দিয়া ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চায়। বাঙ্গালী কি নিজ সর্ব্বনাশ চক্ষে দেখিতেছে না? মুসলীম লীগের সঙ্গে হাতে হাত দিয়া পাকিস্তানী হইয়া পড়িয়াছে?

আর বিভাগ চাহিলেই পাইবে কিরূপে? কৌশলে বা চালাকিতে বাঙ্গালী জাতি রক্ষা পাইবে না। মেটিয়া-বুরুজে উড়িষ্যাবাসী বহু ব্যক্তি "কৌশল ক'রে বাঁচিচু" বলিয়া যেমন সবই নিহত হইয়াছে," বাঙ্গালীও কৌশল করিয়া বাঁচিতে পারিবে না। একেবারে পাকিস্তান হাতে তুলিয়া দিয়া ইতঃ ভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট হইবে। আমাদের নিকট নিম্ন উপায়টিই সমীচীন মনে হইতেছে।

যদি মুসলীম লীগ গণপরিষদ ও মণ্ডলীতে যোগদান করে আর বাঙ্গলা ও আসামের অনুমান ৩৪ জন সভ্য যদি মুসলমান ৩৬ জন সভ্যের সঙ্গে ন্যায়; নীতি ও সত্যের দিক হইতে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে না পারে, তবে ৩৬ জনের ভোটের বলে রচিত শাসনতন্ত্র উপেক্ষা করিবার অধিকার আসামের এবং বাঙ্গলার হিন্দুগণের যে আছে এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় আসাম যোগদান না করিলে একা বাঙ্গালী হিন্দুরও বর্ত্তমান এক-দেশদর্শী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিবার আছে। বস্তুতঃ যদি মুসলমানগণ গণপরিষদে যোগদান না করে, তবে বাঙ্গালী অমুসলমানের যুক্তনির্ব্বাচনমূলক সকলের স্বার্থ সংরক্ষিত এবং পক্ষপাতশূন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া গণপরিষদে পাঠাইয়া দিউক এবং গণপরিষদ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে বাঙ্গলার অহিন্দুগণ কাউন্সিলের ভিতরে এই অনুযায়ী শাসনের দাবী করুক। প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির যেন একটি ভোট থাকেই। গণপরিষদের অনুমোদিত সেই দাবী উপেক্ষা করা সহজ নয়। সেই দাবী রক্ষার জন্য যদি সর্ব্বত্র আন্দোলন উপস্থিত করা যায় এবং যেপর্য্যন্ত পক্ষপাতশূন্য শাসন না প্রবর্ত্তিত হয়, আমরা কিছুতেই নিরস্ত হইব না, এই সঙ্কল্প থাকে, তবে লীগের মন্ত্রিগণের সাধ্য নাই পক্ষপাত ও অনাচারমূলক শাসন চালাইতে সক্ষম হইতে পারে। আর সেরূপ সাহস বা সামর্থ্য যদি হিন্দুগণের না থাকে, পাকিস্তান সমর্থকের যে পরিণতি হওয়া সম্ভব, বাঙ্গালী হিন্দুরও তাহাই হইবে।

কিন্তু বীর ব্যতীত কেউ সাহস দেখাইতে পারে না। সেই ১৯০৫ সালের বীর বঙ্গ-যুবক কই? বাঙ্গালা কি সত্যই বীরশূন্য হইয়াছে? গত কয়েক বৎসরের ঘটনা পরম্পরায় কিন্তু তাহা মনে হয় না। তবে কেন তাহারা জড় ও নিশ্চল থাকিবে?

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের একত্র সম্মিলন ও সাহচর্য্যই বাঙ্গালীকে জগতের সম্মুখে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য দিবে। পূর্ব্ববঙ্গের সাহস ও নির্ভীকতা পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধি ও বিচারপরায়ণতা পূর্ব্ববঙ্গের বেপরোয়াভাব পশ্চিমবঙ্গের সম্পদ পূর্ব্ববঙ্গের কবিত্বশক্তি পশ্চিমবঙ্গের সৃজনশীলতা একের বিজ্ঞান অন্যের সাহিত্য উভয়ের সমাবেশেই বাঙ্গালী জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি। পূর্ব্ববঙ্গের নদী খাল বিল, পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চভূমি, পূর্ব্ববঙ্গের পাট ধান, পশ্চিমবঙ্গের কাঠ চাল উভয়ের সমাবেশেই বাঙ্গালার বন মাঠ হাট ঘাট পূর্ণ হইত। একের সহিত অপরের সম্মেলনেই বাঙ্গলা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইলে বাঙ্গলার শক্তি পরাভূত করে জগতে কাহারও সাধ্য নাই।

পূর্ব্ববাঙ্গলায় চট্টগ্রাম বিভাগে একটি বন্দর আছে এবং সেইখান হইতে বা স্থলপথে পূর্ব্বদিক হইতে বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ যদি পূর্ব্ববাঙ্গলার মুসলমানদের সহায়তা পায়, তবে পশ্চিমবাঙ্গলারও ভয় থাকিবে। এদিক হইতেও বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। আর মুসল-মানগণ যে বরাবরই এইরূপ বিরোধী মনোভাবাপন্ন হইয়া থাকিবে, তাহাও প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কিন্তু যদি সেই-রূপই থাকে, তবে একমাত্র উপায় অহিংস আন্দোলন। আর যদি বাঙ্গালী বাঙ্গালীর ভাই, এই ভাব লইয়া আসে তবে উভয়ে একত্র হইয়া বাঙ্গলার হিত করিবে, বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠস্থান সর্ব্বত্রই কায়েম থাকিবে। সর্ব্বাবস্থায়ই একতাবদ্ধ হইবার একান্ত প্রয়োজনীতা।

এতক্ষণ আমরা অমুসলমানগণ সম্বন্ধেই বলিতেছিলাম, কিন্তু এখন মুসলমান ভ্রাতাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, পক্ষপাতপূর্ণ শাসনে তাহারা শেষা-শেষি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী অবস্থারই একটী না একটী তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে:

(১) খুব বেশী পাইলে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রানুযায়ী বাঙ্গলাদেশ তাহাদের হাতে থাকিবে।

এই অবস্থায় সমগ্র হিন্দুজাতি অসন্তুষ্টাবস্থায় থাকিবে এবং অসন্তুষ্ট চিত্ত প্রতিবেশীকে লইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বদাই বিব্রত থাকিতে হইবে। কারণ হিন্দুরাও বরাবরই মৃত বা ক্লীবাবস্থায় থাকিবে ইহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী আসাম, উড়িষ্যা, নেপাল, ভুটান, কুচবেহার ও ত্রিপুরার সহায়তা সর্ব্বদাই হিন্দুরা পাইবে।

(২) পদ্মানদীর দক্ষিণ দিক যদি মুসলীম লীগকে দেওয়া হয়,

(৩) অথবা যদি কেবল ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ দেওয়া হয়, তবেও কোণঠাসা হইয়া থাকিতে হইবে এবং কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত সুবিধা হইতে মুসলীম লীগ বঞ্চিত হইবে।

(৪) যদি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বাঙ্গলা দেশ থাকে, তবেতো মুসলমানগণের অবস্থা তাহাদের মতানুসারে তাহারা কিছুতেই ভাল মনে করিবে না।

এই চারিটীর কোনটি তাহাদের হইবে, তাহা সুদূর পরাহত। কিন্তু কোনটি হিন্দুর সহিত বিরোধ করিয়া তাহাদের পক্ষে শুভ হইবে না।

সুতরাং মুসলীম লীগ যে মনে করিতেছে, খুবই ভাল হইল, তাহারা একেবারে পাকিস্তান পাইয়া গেল, ইহা নিতান্ত দুরাশার কথা। এমতাবস্থায় পাকিস্তানরূপী মাকাল ফল ভুলিয়া আত্মঘাতী নীতি ছাড়িয়া হিন্দুর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়া একত্র থাকাই তো সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ। কিন্তু তাহারা এ পথে কি চলিবে? চলিলে ভাল, না চলিলে কাহারও পক্ষে ভাল নয়।

সকল দিক হইতেই এই দুঃসময়ে মনে হয় বঙ্গমাতা যেন আহ্বান করিয়া আমাদের দেশবাসীকে নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, আপনি কংগ্রেস হউন, হিন্দু-মহাসভার সভ্য হউন, ফরওয়ার্ড ব্লক হউন, আজাদ হিন্দের সভ্য হউন, কমিউনিষ্ট হউন বা জাতীয়তাবাদী মুসলমান হউন, বা মুসলীম লীগের সভ্য হউন, বাঙ্গালী বাঙ্গালী, ভাই আজ সকলে সমস্বরে বলুন, আমরা পাকিস্তান চাই না, অখণ্ড ভারত চাই। পক্ষপাত-দুষ্ট মন্ত্রি চাহি না, পক্ষপাত শূন্য উদারমনোভাবসম্পন্ন মন্ত্রিগণের সমাবেশ চাই, আমরা বাঙ্গলার একত্ব ও মিলন সংরক্ষণ করিতে চাই, কারণ বাঙ্গালী মরিলে কে বাঁচিবে? আর বাঙ্গালী বাঁচিলে কে মরিবে? বাঙ্গালী সকলে স্বামীজীর বাণী স্মরণ করুন "উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত" সকলে যেন আমরা [illegible] বলিতে পারি—

"সপ্তকোটি কলকণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈ ধৃত খরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে?"

প্রধান মন্ত্রীর ফেব্রুয়ারী-ভাষণ

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রি মিঃ এ্যাটলির নাটকীয় বিবৃতির পর ভারতের রাজনৈতিক জল্পনার ক্ষেত্রে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে—একথা নির্ভয়েই বলা চলে। সম্প্রতি ভারতে আগত জনৈক মার্কিন-প্রবাসী ভারতবাসী এই নব-পরিস্থিতির বর্ণনা করিতে গিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'বিশে ফেব্রুয়ারীর পর ভারতের গতানুগতিক চিন্তাধারায় এক ওলট-পালট সুরু হইয়াছে। অন্যায় ভাবে যাঁহারা এতাবৎ স্ব স্ব অধিকার-বহির্ভূত বস্তুনিচয়ের দাবী করিতেছিলেন, তাঁহারা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন—দেশীয় রাজন্যবর্গ দিল্লীতে জময়েত হইয়াছেন, তাঁহাদের গতিবিধি বিহ্বল; ভারতের সিভিলিয়ান চাকুরেরা বিহ্বল; মুসলীম লীগ দিশেহারা।' বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই, পাঠমাত্রেই বুঝা যায়, উপরোক্ত মার্কিন-প্রবাসী ভদ্রলোকের বিবৃতিটি সন্তোষের সুরে পরিপূর্ণ। বিস্ময়ের বিষয় হইলেও এই সন্তোষের সুর বহু জাতীয়তাবাদী কণ্ঠেও ধ্বনিত হইয়াছে। এই সন্তোষের সুরে আমরা ছা-পোষা ভারতবাসীরাও সুর মিলাইতে পারি কি না, সে সম্বন্ধে চরম মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে মিঃ এ্যাটলি-প্রদত্ত বিশে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিটি আমাদের মোটামুটি আর একবার যাচাই করিয়া দেখা প্রয়োজন।

মিঃ এ্যাটলির বিবৃতির সর্ব্বপ্রধান বিষয় যেটি এবং যে বিষয়টি তিনি সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, সেটি হইল এই যে, ইতিমধ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, বৃটেন আগামী ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতের জমিদারী গুটাইয়া তল্পিতল্পা সহ স্বদেশে ফিরিয়া আসিবেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রির বিবৃতি-পাঠে যাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তোষের কারণ সম্ভবতঃ বিবৃতির এই অংশটুকু মাত্র। অবশ্য ইহা অনস্বীকার্য্য যে, কেবলমাত্র এই একটি বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকিলে, বিবৃতিটি প্রকৃতই সন্তোষজনক হইত, কারণ, ইহা প্রকারান্তরে কংগ্রেসের কুইট ইণ্ডিয়া দাবীরই স্বীকৃতি। কিন্তু মুস্কিল হইল যে, মাত্র এইটুকুই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রির বিবৃতির সর্ব্বাংশ নয়, এই স্বীকৃতির সহিত অনেকগুলি বড় বড় 'কিন্তু' সংযুক্ত আছে, এবং এটুকু বিচার করিয়া দেখিলেই মনে সন্দেহ জাগে, এই 'কিন্তু'গুলি উক্ত ভারত ত্যাগের সাধু সংকল্পকে অনায়াসেই বিফল করিয়া দিতে সক্ষম হইবে।

অনেক নৈরাশ্যবাদী 'সিনিক' এই সন্দেহ সরাসরি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াও ফেলিয়াছেন।

এখন এই কিন্তুগুলি সংক্ষেপে একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্ :

ব্রিটিশ শক্তি ভারত ছাড়িলেই সর্ব্বপ্রথমে প্রশ্ন ওঠে, অতঃপর ভারতের শাসনকার্য্যের ভার কাহার হস্তে ন্যস্ত থাকিবে? মিঃ এ্যাট্‌লি এই প্রশ্নের জবাবে এক অতি বিভ্রান্তকারী বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন: তিনি বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা নিজেরা নিজেরা পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারিলে ভালই—ব্রিটিশ-ভারতের শাসনভার (লক্ষ্য করিবেন, মিঃ এ্যাটলি বলিয়াছেন 'ব্রিটিশ ভারতের' অর্থাৎ রাজন্য ভারতের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হইবে।) একটি অবিসম্বাদী কেন্দ্রেই ন্যস্ত থাকিবে, কিন্তু (এইটাই প্রথম 'কিন্তু') তাহা যদি সম্ভব না হয় তবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের দায়িত্বেই শাসনভার অর্পণ করিয়া যাইবেন। অর্থাৎ ভারতকে বিভক্ত করা হইবে। প্রকাশ, এই 'কিন্তু'র ব্যাখ্যায় মুসলিম লীগ নাকি অতিরিক্ত উল্লসিত হইয়াছেন। সদাশয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট লীগের দাবী মানিয়া লইয়াছেন, এবার আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ঠেকায় কে? কিন্তু লীগের উল্লসিত হইবার কারণ সত্যই কি কিছু ঘটিয়াছে? এই সম্পর্কে আমরা সিন্ধু প্রদেশের মিঃ জি, এম, সৈয়দের দলের মন্তব্য স্মরণ করিতে পারি। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, প্রচলিত ব্রিটিশ সরকার বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে কতক কতক কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া দিলেও মুসলীম লীগ সেই কর্ত্তৃত্ব কেবলমাত্র পাইবে সিন্ধু আর বাঙলায়। সৈয়দের দল ইতিপূর্ব্বে পাঞ্জাবকেও লীগের হাতের মুঠার বাহিরের প্রদেশ হিসাবেই গণ্য করিয়াছিলেন।

এক্ষণে অবশ্য অবস্থার ভিন্নরূপ অভিব্যক্তিতে পাঞ্জাবের শাসনভার ইউনিয়নিষ্ট কোয়ালিশনের হস্তচ্যুত হইয়াছে তথাপি পাঞ্জাবের ব্যবস্থা-পরিষদের বিভিন্ন দলীয় শক্তি বিবেচনা করিয়া স্থির ভাবে এ সিদ্ধান্তও করা চলে না যে, পাঞ্জাবে মুসলীম লীগের মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবেই কাজেই শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, লীগের নিশ্চিন্ত অধিকারের মধ্যে আছে শুধু সিন্ধু আর বাঙলা দেশ মাত্র। এই দুইটি প্রদেশ নিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইবে কি? এতদ্ব্যতীত গত ৬ই ডিসেম্বর বৃটিশ মন্ত্রিসভা তাঁহাদের ঘোষণায় যে বলিয়াছিলেন, 'দেশের কোন উল্লেখযোগ্য অংশ যদি অন্য পক্ষের শাসন মানিয়া না লয় তবে ব্রিটীশ কর্ত্তৃপক্ষ সেই শাসন-ব্যবস্থা মঞ্জুর করিতে সক্ষম হইবে না', সেই ঘোষণাও প্রত্যাহৃত হয় নাই। সুতরাং অধুনা বাঙ্গালাকে দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করিবার যে আন্দোলন কোন কোন অমুসলমান তরফ হইতে সুরু হইয়াছে—সেই আন্দোলন যদি অবস্থার বৈগুণ্যে প্রবলতর আকার ধারণ করে তবে তো 'পাকিস্তান রাজ্য' বসাইতে হইবে কেবলমাত্র বঙ্গদেশের অর্দ্ধাংশের উপরই। সে ক্ষেত্রেই বা লীগের উল্লসিত হইবার এমন কি জোরালো কারণ থাকিতে পারিবে?" আর সমগ্র বাংলা দেশ যে যুক্ত ভারতের মধ্যে থাকিবে না—এরূপ কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু স্মরণ করিতে হইবে, লীগের উল্লসিত হইবার কারণের অনুপস্থিতিতে, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতিতে কংগ্রেসেরও উল্লসিত হইবার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ বিবৃতির গূঢ়ার্থে যাহা আছে তাহাতে বুদ্ধিমান্ কংগ্রেস-পন্থীর বিমর্ষ হইবারই কথা। কারণ, মিঃ এ্যাটলির বিবৃতিতে ভারতকে শুধু এই কয়েকটি অংশেই বিভক্ত করিবার শুধু পরিকল্পনা নাই, দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গে এই পরিকল্পনা আরও বেশী ব্যাপক আকৃতি ধারণ করিয়াছে। দেশীয় নৃপতিদের উপর বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব ও সম্বন্ধ ঐতিহাসিক, সেই হেতু অতি পবিত্র। এই পবিত্র দায়িত্ব তাঁহারা হেলা-ফেলা করিয়া যার তার হাতে সঁপিয়া দিয়া যাইতে পারিবেন না; দেশীয় নৃপতিগণের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাঁহারা রাজন্য ভারতের সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়া যাইবেন। অর্থাৎ ভারতকে আরও বেশী বিভিন্ন অংশে ভাগ করা যাইবে। ইহার পরই মিঃ এ্যাটলি ভারতের প্রতিষ্ঠিত বৃটীশ বাণিজ্য-স্বার্থের প্রসঙ্গ বিবৃত করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট এ কথা বিশ্বাস করেন যে, অতঃপর নূতন পরিস্থিতিতেও ভারতস্থ বৃটীশ শিল্প ও বাণিজ্যস্বার্থ সুদিনের অপেক্ষায় কালাতিপাত করিতে পারিবে। ভারত ও ইউনাইটেড কিংডমের বাণিজ্য-সম্পর্ক বহু দিন হইতেই মিত্রতামূলক, ভবিষ্যতে এই সম্পর্ক নিশ্চয়ই ব্যাহত হইবে না। কেন ব্যাহত হইবে না—ইহার কারণ মিঃ এ্যাটলি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু এ দেশের সন্দিগ্ধ সিনিক মহল মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই ভাবে বিভক্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন বিবদমান অংশের সালিশ হিসাবেই বৃটেন তাহার বাণিজ্য-স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান জাগতিক পরিস্থিতিতে এত বড় একটা সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব পৃথিবীবাসীর প্রত্যক্ষে চালানো সম্ভব নয় বলিয়াই বৃটেন ভারতের উন্নতির কুগ্রহরূপে অ-উপায়ে ও অন্তর্বেশে ভারতে অবস্থান করিবে।

এই গেল মিঃ এ্যাটলির বিবৃতির ব্যক্ত অংশ।

ছাড়া তাঁহার বিবৃতির যে সব উহ্য অংশ ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক গগনকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, সে বিষয়েও কিয়ৎপরিমাণে আলোচনার অবকাশ আছে। ভারতে আগত মন্ত্রি-মিশন প্রদত্ত গত ১৬ই মের যে ঘোষণার ফলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমানে অন্তর্ব্বর্ত্তী কালীন গভর্ণমেণ্ট ও গণ-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই দুইটি শাসন-যন্ত্র এক্ষণে মুসলীম লীগের অসহযোগের ফলে একরূপ অচল হইয়া পড়িয়াছে। গণপরিষদের বৈঠক স্থগিত রহিয়াছে, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারেও লীগ-সদস্যগণ কংগ্রেসী সদস্যদের সঙ্গে আশানুরূপ সহযোগিতা করিতেছেন না। সুষ্ঠু শাসনকার্য্যের পক্ষে এই অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে—এই কারণে পণ্ডিত নেহরু বৃটীশ প্রধান মন্ত্রীর নিকটে এই সম্পর্কে খোলাখুলি জবাব দাবী করিয়াছিলেন যে, হয়, লীগকে গণপরিষদে যোগদান করিতে বাধ্য করা হোক, নয়, লীগকে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার হইতে সরাইয়া লওয়া হোক্; কারণ মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মের বিবৃতিতে এই সর্ত্ত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত ছিল যে, উক্ত শাসন-যন্ত্রদ্বয়ের গ্রহণ ও বর্জ্জন অবিচ্ছেদ্য—গ্রহণ করিতে হইলে পুরাপুরি উভয়কেই গ্রহণ করিতে হইবে, বর্জ্জন করিতে হইলেও পুরাপুরি দুটিকেই বর্জ্জন করিতে হইবে—একটিকে বর্জ্জন করিয়া অপরটিকে গ্রহণ করা চলিবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ মুসলীম লীগ এই সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়াই অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে আসীন রহিয়াছে। মিঃ এ্যাটলি পণ্ডিত নেহেরুর জবানটাও এড়াইয়া গিয়াছেন, গণপরিষদ বৈধ থাকিবে কি না—এই প্রশ্নেও নিরুত্তর রহিয়াছেন। অর্থাৎ লীগ ও কংগ্রেসের মতানৈক্য আরও সুদৃঢ় হইবার অবকাশ দিয়াছেন। মোটামুটি শেষ পর্য্যন্ত আমরা ছা-পোষা ভারতবাসী বুঝিতে পারিতেছি যে, মিঃ এ্যাটলির সাম্প্রতিক ঘোষণায় আশান্বিত হইবার মত কিছুই নাই। আমাদের দিকে ভাগ্যের কাঁটা ঝুলিয়াছে অথবা বৃটিশ সরকার আমাদের দাবীই গ্রাহ্য করিয়াছেন—এই বলিয়াও কোন পক্ষের উল্লসিত হইবার যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। ব্রিটিশ সরকার মূলতঃ গ্রাহ্য করিয়াছেন তাঁহাদের স্বকীয় স্বার্থের দাবীকেই। জয়ও যদি কাহারও হইয়া থাকে, তা সে ব্রিটিশ কূটনীতিরই হইয়াছে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ শুধু পরস্পরের সহিত মথা ঠোকাঠুকি করিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

আরো একটা বিষয় আলোচ্য হিসাবে না হইলেও সংবাদ হিসাবে উল্লেখ করিবার আছে। সেটি ভারতের ভাইসরয় বদলের বিষয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুসারে ভারতের বর্ত্তমান ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেলের পরিবর্ত্তে বৃটিশ রাজপরিবারভুক্ত এবং ভূতপূর্ব্ব দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া কমাণ্ডের সর্ব্বাধিনায়ক লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন ভারতের শেষ বড়লাট হইয়া ভারতে আসিতেছেন। প্রকাশ, বৃটেনের বর্ত্তমান সোস্তালিষ্ট (?) মন্ত্রিসভার মতানুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হন নাই বলিয়াই নাকি লর্ড ওয়েভেলকে সরাইয়া লওয়া হইতেছে। স্বদেশে ও বিদেশে এই ভাইসরয় বদলের বিষয়টির নানারূপ রহস্যের প্রলেপ দিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, সাধারণ ভারতীয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচারে এই রহস্য জটিলতম হইলেও মূল্যহীন। কারণ, সাম্রাজ্য চালাইবার ব্যাপারে ব্রিটেনস্থ সকল রাজনৈতিক অভিমতের সমাধান একই ভাবে সমাধা হইয়া থাকে—নরম, গরম, রক্ষণশীল, প্রগতিশীল—যে পক্ষই হোক্ না কেন, সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে তাহারা একই রাষ্ট্রনীতি দর্শন করিয়া অনুসরণ করিয়া থাকেন—'What we have, we have must hold in this or that pretext' তবে এই পরিবর্ত্তনে স্বতঃই মনে হইতেছে, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যুক্ত দায়িত্ব-প্রথা হইবে এবং গণপরিষদে যোগদানকারী দলের প্রতিনিধিরাই উহাতে থাকিবার অধিকার পাইবেন। লর্ড ওয়াভেল চক্ষুলজ্জায় এই ভাবে কাজ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি অপসারিত হইলেন।

সব দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের মধ্যে ইংরাজ যে এদেশ হইতে চলিয়া যাইবে তাহা নিশ্চিত। তবে যুক্ত এবং অখণ্ড ভারত যাহাতে রক্ষিত হয়—এসম্বন্ধে জাতীয় কংগ্রেসের যে দায়িত্ব আছে, তাহা হইতে যেন ইহা বিচ্যুত না হয়, তাহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। ভারত কোন অংশে খণ্ডিত হইলে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না।

ইতিপূর্ব্বেই মুসলীম লীগের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স গণপরিষদ যে প্রতিনিধিমূলক তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

পাঞ্জাব-পরিস্থিতি

মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ ফল শেষ পর্য্যন্ত পাঞ্জাবেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; সুতরাং আশা করা যায়, এখন কিছুদিন অন্ততঃ দৈনিক সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠাগুলি গরম সংবাদে পূর্ণ থাকিবে।

পাঞ্জাবের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম গতানুগতিক পথে আবির্ভূত হয় নাই। ইহার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। আপাততঃ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলাফলের কথা বাদ দিয়া আমরা সেই ইতিহাসেরই আলোচনা করিব। বঙ্গশ্রীর পাঠকগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে, পাঞ্জাব আদম-সুমারির গণনা অনুযায়ী মুসলিম-প্রধান প্রদেশ এবং পাঞ্জাবী মুসলমানগণ অধিকাংশই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে (লীগের অহিংসা-প্রভাবের ফলে ?) লীগের সমর্থক, কিন্তু তত্রাচ গত নির্ব্বাচনের সময় মুসলিমলীগ-সদস্যগণ পরিষদে একক

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নির্ব্বাচিত হওয়া সত্বেও মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সুযোগ আসে ইউনিয়নিষ্ট দলের উপর। ইহার কারণ, পরিষদের দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুইটি কংগ্রেস ও আকালী দলের প্রতি লীগের পাকিস্তান-বিরোধীয় মনোভাব। কংগ্রেস ও আকালী দল লীগের সহিত সম্মানজনক সর্ত্তে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে রাজি থাকিতেও লীগের চরম বাসনা ছিল পাঞ্জাবে অপ্রতিহত লীগ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার। অতএব লীগের সাম্প্রদায়িক শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায় কংগ্রেস ও আকালীদল শেষপর্য্যন্ত ১৩জন সদস্যপদের অধিকারী ইউনিয়নিষ্ট দলের সহিতই আপোষ স্থাপন করে এবং পঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট-প্রধান কোয়ালিশন দলের মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ন্যায়তঃ এই কোয়ালিশন সমর্থন-যোগ্য ছিল না বটে, কিন্তু অবস্থার বৈগুণ্যে কংগ্রেস ও আকালী দলের পক্ষেও যে উহা ভিন্ন গত্যন্তরও কিছু ছিল না, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইউনিয়নিষ্ট দল স্যার ফাজিল হোসেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পাঞ্জাবে সর্ব্ব-দলের মন্ত্রিত্ব-স্থাপন না হইলে সাম্প্রদায়িক কলহ তিরোহিত হইবে না,—এই উদ্দেশ্যেই ইহা গঠিত হয়। সুতরাং কংগ্রেস ও আকালী দল সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণকল্পে এই দলের সহিত যোগদানে অত্যন্ত তৎপর হয়।

অতঃপর পাঞ্জাবের লীগ-সমর্থকদের একমাত্র চেষ্টা রূপ নেয় যে-কোন উপায়ে এই মন্ত্রিসভার স্কন্ধে যে-কোন প্রকার কলঙ্ক আরোপ করিবার। বিভিন্ন প্রদেশের লীগ-নেতাগণ বিভিন্ন সময়ে এই কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাঞ্জাবের লীগ-সমর্থকগণ ইউনিয়নিষ্ট ও কংগ্রেস-আকালী কোয়ালিশন মানিয়া লইবে না; তাহারা যে-কোন উপায়ে হোক এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইবেই—কিন্তু কার্য্যতঃ পতন ঘটানো দূরে থাক্, উক্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবারই মত তেমন বুৎসই সুযোগ লীগের হাতে আসে নাই। শেষপর্য্যন্ত সুযোগ মিলে গত মাসের প্রথম দিকে। দৈনিক সংবাদ-পত্রের নিয়মিত পাঠকদের কাছে সেই সুযোগের বিশদ বর্ণনাদান বাহুল্য মাত্র। লীগের সমর্থকগণ কোন অজুহাতে মৌলিক নাগরিক স্বাধীনতা-রক্ষার্থে পাঞ্জাবের প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আইন-অমান্য আন্দোলনে (আন্দোলনটি কংগ্রেস-গন্ধী মনে হইতেছে না ?) নিযুক্ত হইয়াছিল সে-কথাও এখানে বিশদ ভাবে ব্যক্ত করিবার কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। উল্লেখ-যোগ্য বিষয় যেটুকু সেটুকু হইল ইউনিয়নিষ্ট দলের নেতা মালিক স্যার খিজির হায়াৎ খান কর্ত্তৃক অকস্মাৎ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ। লীগের অজুহাতী আন্দোলন দমিত করিয়াও কেন যে তিনি লীগের খপ্পরেই আত্ম-সমর্পণ করিলেন, তাহা আজিও অনাবিষ্কৃত রহস্যই রহিয়া গিয়াছে। কেবল তাই নহে, কংগ্রেস ও আকালী দলের মতামতের অপেক্ষা না করিয়াই যে তিনি কোন্ ন্যায়নীতি অনুযায়ী এই কাজে অগ্রসর হইতে পারিলেন, তাহাও রীতিমত দুর্ব্বোধ ও জটিল বিষয়। অতঃপর পাঞ্জাবে লীগেরই মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং এই সম্ভাবনা অনুযায়ী পাঞ্জাবের গভর্ণর কর্ত্তৃক পাঞ্জাব পরিষদের লীগ-সদস্যদলের নেতা মামোদতের খান সাহেব আহূতও হইয়াছিলেন; কিন্তু শেষ অবধি সেই সম্ভাবনাও আপাততঃ দূরীভূত হইয়াছে। পাঞ্জাবের কংগ্রেস ও আকালী দলের সমর্থকরা লীগের একচ্ছত্র প্রভূত্ব মানিয়া লইবে না বলিয়া ঘোষণা করায় পাঞ্জাবে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং তথায় গভর্ণরের ৯৩ ধারার শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পাঞ্জাবের মন্ত্রি-বিপর্য্যয়ে লর্ড ওয়াভেল ও পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার ইভান্স জেঙ্কিংএর ষড়্যন্ত্র আছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহারাই স্যার খিজির হায়াত খাঁকে মন্ত্রী-পদ ছাড়াইয়া লীগকে আসিবার সুযোগ দিতে রাজী করিয়াছিলেন। প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কেবল অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রীর দুর্ব্বলতা ভিন্ন তাঁহার বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু পাই নাই, তবে এ সম্বন্ধে সমস্ত রহস্য শীঘ্রই উদ্‌ঘাটিত হইবে।

আগামী বার আমরা পাঞ্জাব পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও বিশদভাবে আলোচনা করিতে পারিব বলিয়া আশা রাখি।

গণ-পরিষদ ও দেশীয় রাজ্য

গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ কি ভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন—এই সম্পর্কে কিছুদিন ধরিয়া গণ-পরিষদ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। এই আলোচনা চালাইবার জন্য উভয় পক্ষই একটি করিয়া তদ্বির-কমিটি মনোনীত করিয়াছিলেন এবং আলাপ-আলোচনা এই দুই কমিটির মধ্যস্থতায়ই হইতেছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়—এই আলাপ-আলোচনায় দেশীয় রাজ্যের জনগণের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান ষ্টেটস্ পিপলস্ কনফারেন্সের কোন সদস্যই যোগদান করেন নাই। সে যাহা হোক, সম্প্রতি জানা গেল যে, উক্ত তদ্বির-কমিটি দুইটি গণ-পরিষদের দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিনির্ব্বাচন ব্যাপারে একটা আপোষে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন। আপোষের সর্ত্তে প্রকাশ যে, গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের অর্দ্ধেকাংশকে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ সরাসরি মনোনীত

করিবেন, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশ দেশীয় রাজ্যগুলির ব্যবস্থা-সদস্যদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

আপাত-দৃষ্টিতে এই আপোষের সর্ত্ত বিচার করিলে মনে হইতে পারে—যাক, তাহা হইলে শেষ অবধি অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ জন জনসাধারণের প্রতিনিধি তো দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে গণ-পরিষদে প্রেরিত হইবেন! কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, এই সম্পর্কে এইভাবে নিশ্চিন্ত হওয়া চলে শুধু বিষয়টাকে আপাতদৃষ্টিতে বিচার করিয়া। একটু তলাইয়া বিচার করিলেই আর এই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের অবকাশ থাকিবে না; কারণ, দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যবস্থা-পরিষদ নামীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে আপাতবিচারে গণ-তান্ত্রিক বলিয়া ভুল হয়, সেগুলি আসলে গণতন্ত্রের তামাসা মাত্র। এইজাতীয় অধিকাংশ পরিষদেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা জনসাধারণের মধ্যে অবিশ্বাস্য ভাবে সীমাবদ্ধ। তদুপরি জনসাধারণ যাহাদের নির্ব্বাচিত করিবার অধিকারী, তাহাদের সংখ্যাও মোট সদস্য-সংখ্যার ক্ষীণ ভগ্নাংশ মাত্র! ইহা ছাড়া নির্ব্বাচনী কর্ত্তৃপক্ষের লগুড়াঘাত তো আছেই। এই সম্পর্কে আমরা কাশ্মীরের ব্যবস্থা-পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যাপারটা স্মরণ করিতে পারি। এখানে প্রথমে স্থানীয় গণ-প্রতিষ্ঠান জাতীয় কন্ফারেন্স নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যখন দেখা গেল যে, জনসাধারণ কর্ত্তৃপক্ষের বাঞ্ছিত ব্যক্তিদেরই ভোট দিতে বাধ্য হইতেছে, তখন জাতীয় পরিষদ্ সভয়ে তাঁহাদের সাধু সঙ্কল্প হইতে সরিয়া দাঁড়ান। হায়দ্রাবাদেও এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। সেখানে জনসাধারণের মধ্যে শতকরা মাত্র একজনের উপর ভোটাধিকার ন্যস্ত—এবং এই একজন আবার কর্ত্তৃপক্ষের হিটলারি গণতন্ত্র-বুদ্ধির মাহাত্ম্যে স্বমতানুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অক্ষম। প্রজামণ্ডল হায়দ্রাবাদেও নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন নাই। মহীশূরের অবস্থা ইহাপেক্ষাও কৌতূহলোদ্দীপক। সেখানে দুইটি পরিষদ-গৃহের একটিতে প্রজামণ্ডল মোট সদস্য-সংখ্যার শতকরা মাত্র ৪১ জনকে নির্ব্বাচিত করিবার অধিকারী, অন্য পরিষদ-গৃহটির মোট সদস্য-সংখ্যার মাত্র এক চতুর্থাংশ প্রজাসাধারণ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য। ত্রিবাঙ্কুরের চিত্র আরও নৈরাশ্যজনক—সেখানে ভোটদানের অধিকার শতকরা একজনেরও নাই। আর প্রজামণ্ডল-কর্ত্তৃক যে সদস্যগণ নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য, তাহাদের সংখ্যাও মোট সদস্য-সংখ্যার শতকরা ১৫ এবং ১৪ জন। গণতন্ত্রের এই চিত্রকে অবশ্যই আশাজনক বলা চলে না।

ভারতীয় জনসাধারণের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার জনসাধারণের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে, এই দাবী নিয়াই বৃটিশ ভারতের সকল স্বাধীনতা-আন্দোলন উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। জগতের নূতন পরিস্থিতিতে মনে হয়, বৃটীশ ভারতের জনসাধারণের সেই দীর্ঘকাল-পোষিত দাবী হয়তো কার্য্যে কিছুটা পরিণত হইবে, কিন্তু রাজন্য-ভারতের গণ-আকাঙ্ক্ষা সেই আগের মতই অপূর্ণ থাকিবে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সাধ মিটাইতে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ গণ-পরিষদে তাঁহাদের বাঞ্ছিত প্রতিনিধিদের অর্দ্ধেককে পাঠাইবেন সামনের দরজা দিয়া, বাকী অর্দ্ধেককে পাঠাইবেন নেপথ্য-বিধানের সহায়তায়।

ইউ, এন, ও' যাত্রী প্যালেষ্টাইন

কিছুদিন যাবৎ লণ্ডনে ইহুদি-আরব প্রতিনিধি এবং বৃটেনের মধ্যে প্যালেষ্টাইনের সমস্যা সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছিল, ১৯শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদপত্র পাঠে জানিলাম, সেই আলোচনাও ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে। গত ১৯১৭ সালের ব্যালফোর ঘোষণার পর হইতে যাঁহারা প্যালেষ্টাইনের রাজনীতির সহিত সামান্য পরিমাণে পরিচিত আছেন, তাঁহাদের কাছে এ-সংবাদ কিছু বিস্ময়কর বা আশাতীত বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। কারণ তাঁহারা এই তথ্য অতি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে প্যালেষ্টাইনের ইহুদি এবং আরব অধিবাসীদের বিবাদ প্রকৃত কারণযুক্ত হইলেও বৃটেনের উস্কানিতে এই বিবাদ আরও বিষময় হইয়াছে। আজ এই পক্ষ এবং পরদিন ঐ পক্ষের দাবী সমর্থন করিয়া বৃটেন আরব-ইহুদিদের মধ্যে একটা আপোষ-আলোচনার সত্যকার সুযোগ কোন দিনই দেয় নাই। ১৯১৭ সালে বৃটেন ব্যালফোর ঘোষণায় ইহুদীদের দাবী সমর্থন করিয়াছিল—এবং প্যালেষ্টাইনে বিদেশী ইহুদী আমদানী এবং প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদের জাতীয় ভূমিতে পরিণত করিবার দাবী মানিয়া লইয়াছিল। তারপর ১৯৩৭ সালের পিল কমিশনের ভাষণ—এই কমিশনের ভিত্তিতেই ১৯৩৯এর হোয়াইট পেপার রচিত হইয়াছিল। এই কমিশনের ভাষণে বৃটেন প্যালেষ্টাইনের আরববাসীদের পক্ষ সমর্থন করে। তারপর গত যুদ্ধের মধ্যে ও পরে প্যালেষ্টাইনের রাজনীতিতে আমেরিকার আগমন। আমেরিকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জায়নিষ্টদের প্রভাব প্রবল। আমেরিকার অনুগ্রহপুষ্ট বৃটেন এই জায়নিষ্টদের চটাইতে নারাজ, অথচ আবার প্যালেষ্টাইনের ভৌগোলিক সামরিক প্রয়োজনীয়তাও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না—এই উভয় সঙ্কটের দায় হইতে মুক্ত হইতে গিয়া বৃটেন প্যালেষ্টাইনের সমস্যাকে আরও ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু

কমন্স-সভায় প্যালেষ্টাইন-আলোচনার বিফলতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার সময় পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন এই সব ঐতিহাসিক তথ্যের ধার দিয়াও যান নাই। বৃটীশোচিত বাক্‌চাতুরীর দ্বারা তিনি প্যালেষ্টাইন-সমস্যার সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়াছেন আরব ও ইহুদীদের স্কন্ধে এবং পরে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনের সমস্যার সমাধানের জন্য প্যালেষ্টাইন-প্রশ্ন ইউ-এন্‌-ও'র দরবারেই উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। আমাদের মতে এ-ব্যবস্থা তবু মন্দের ভাল। মার্কিন জায়নিষ্টদের প্রভাবযুক্ত হইলেও আন্তর্জাতিক অভিমতের খাতিরে হয়তো অতঃপর প্যালেষ্টাইন সমস্যার একটা সন্তোষজনক মীমাংসাও হইয়া যাইতে পারে। শান্তিকামী বিশ্ববাসী ঐ সুদিনের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

বৃটীশ পার্লেমেন্টে ভারত সম্পর্কে বিতর্ক

শুষ্ক রাজনীতির-ক্ষেত্রেও আমরা কদাচিৎ বিশুদ্ধ নাটকীয় রসের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারি। শুধু রসই বা কেন, বিশুদ্ধ নাটকের বচন, অভিব্যক্তি এবং অভিনয়েরও পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এই সব বিশিষ্ট ক্ষেত্রে। বৃটেনের কমন্স সভা হইল এমনি এক রাজনৈতিক নাটকীয় ক্ষেত্র। বৃটেনের রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত সব ব্যাপারেরই উপরে গভর্ণমেণ্ট ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বিতর্কের মধ্যে এখানে মাঝে মাঝে একটা অতি চমৎকার নাটকাভিনয় হইয়া যায়। ইহার মধ্যে আবার ভারত সম্পর্কে কোন আলোচনা উত্থাপিত হইলে, অভিনয়টা জমে সব চেয়ে বেশী। সরকারী ও বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ পরস্পরের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বাক্য-আয়ুধ নিক্ষেপ করিয়া ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য হর্ষ, বিষাদ ও সহানুভূতির প্রকাশে চমৎকার উপভোগ্য হইয়া ওঠেন। গত বিশে ফেব্রুয়ারীর এ্যাটিলি ভাষণের উপরেও যে বিতর্ক সম্প্রতি হইয়া গেল, সেটিতেও এমনিতর অভিনয়ের ব্যতিক্রম হয় নাই। অভিনয়টি প্রকৃতই সুঅনুষ্ঠিত হইয়াছে। সবচেয়ে ভাল জমিয়াছিল ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের ভূমিকাটি। ভারতের মাইনরিটি সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস কুম্ভীরাশ্রু কংগ্রেস এবং বিশেষ করিয়া পণ্ডিত নেহরুর প্রতি তাঁহার ম্যাৎসর্য্য-পূর্ণ বীররস, বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য তাঁহার প্রবল আকুলতা যথার্থই বিশ্ববাসীকে অভিভূত করিবার যোগ্য। কিন্তু আমরা ছাপোষা ভারতবাসীরা শুধু হাসিয়াছি, তাঁহার গলিত নখ-দন্তের আস্ফালন আমাদের অভিভূত করিতে পারে নাই।

এই বিতর্কে মিঃ চার্চ্চিল ভিন্ন আরও অনেকেই অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, অংশ গ্রাহকদের মধ্যে মিঃ এ, ভি আলেকজাণ্ডার, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস, মিঃ রেজিনাল্ড সোরেন সেন, স্যার এ্যাণ্ডারসন প্রভৃতি সব স্বনামধন্য ব্যক্তিরাও ছিলেন। তাঁহাদেরও সকলেরই বক্তৃতা ও অভিনয় বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্যে নূতন করিয়া উল্লেখ করিবার মত কিছু ছিল না। বঙ্গশ্রীর পৃষ্ঠায় তাহাদের মূল বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা ইতিপূর্ব্বে বহুবারই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সেই সবের আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়া আমরা পুনরুক্তির দোষে পড়িতে চাই না। কেবল একটা বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। সেটি হইল স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস কর্তৃক বৃটেনের ভারত ত্যাগের উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা। এই সম্বন্ধে স্যার ষ্টাফোর্ড এক স্থানে বলেন: One thing that was quite obviously impossible was to decide to continue our responsibility indefinitely and indeed against our own wishes, into a period when we had not the power to carry it out.........Even if we had been prepared to make available the extra troops that would be required to deal with the opposition by the Indian people, it is certain that the people in this country—*short as we are of man power*—would not have consented to prolonged stationing of large bodies of British troops in India—অর্থাৎ বৃটেন যে ভারত ত্যাগ করিতেছে (ভারতের শাসন ভূমি হইতে, ভারতে বৃটিশ স্বার্থক্ষেত্র হইতে নয়) সেটার মূলে কোন শুভ বুদ্ধি নাই, আছে শুধু প্রয়োজনের তাগিদ।

ভারত সম্পর্কে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের শুভবুদ্ধির সম্বন্ধে স্বদেশে ও বিদেশে যাহারা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ গদগদ ছিলেন, আশা করি স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের এবম্বিধ স্বীকারোক্তির পর তাহাদের বাস্তব ছাপ কিছুটা উন্মীলিত হইবে। আর সম্প্রতি ভারতসচিব লর্ড পেথিক-লরেন্স যে বলিয়াছেন—ভারতকে আস্তে আস্তে ডোমিনিয়নে পরিণত করিতে হইবে, বর্ত্তমান শাসনসংস্কার বলবৎ থাকিলেও অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ক্ষমতা যুক্তদায়িত্বমূলক হইবে এবং বড়লাট বাহাদুর দৈনন্দিন কার্য্যে ইহার কোন সিদ্ধান্তের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহাতেও শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্যই প্রমাণিত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বাজেট

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের অর্থ সচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খান ভারত সরকারের বাজেট পেশ করেন। বাজেটে ৪৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখান হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব এবং বর্ত্তমানে যেরূপ করের হার ধার্য্য আছে, তাহার হিসাবে ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট বরাদ্দ এইরূপ:

(কোটি হিসাবে)	১৯৪৬-৪৭	১৯৪৭-৪৮
আয়	৩৩৬·১৯	২৭৯·৪২
ব্যয়	৩৮১·৪৭	৩২৭·৮৮
ঘাটতি	৪৫·২৮	৪৮·৪৬

ভারত সরকার বাজেটে উন্নয়নখাতে ৪৫ কোটি টাকা এবং প্রদেশসমূহকে ৩২ কোটি টাকা ঋণ বাবদ বরাদ্দ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দেখা যায়: কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাজপথ নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক দায় গ্রহণ করিয়াছেন। (১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই ব্যবস্থা চালু হইবে)।

অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় লবণ কর রহিত করা হইল বলিয়াও ঘোষনা করেন। ইহার ফলে ক্ষতির পরিমান দেখা যায় প্রায় ৮ কোটি টাকা, এবং ইহার ফলে ঘাট্‌তির পরিমান বাড়িয়া দাঁড়ায় ৫৬ কোটি ৭১লক্ষ টাকা। বর্ত্তমানে ২০০০্ টাকার অধিক আয়ের উপর আয়কর ধার্য্যের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অতঃপর ২৫০০্ টাকার অধিক আয়ের উপর ধার্য্য হইবে। যে সকল ব্যবসায়ে একলক্ষ টাকার অধিক মুনাফা হইবে, তাহার উপর শতকরা ২৫্ টাকা হিসাবে কর ধার্য্য হইবে, এবং কর্পোরেশন ট্যাক্সের হার একআনা হইতে বাড়াইয়া দুই আনা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রতি পাউণ্ড চায়ের উপর রপ্তানীশুল্ক দুই আনা হইতে বাড়াইয়া চারি আনা করা হইবে বলিয়াও ঘোষনা করা হয়। এইসব বাবদ কর ধার্য্যের ফলে ভারত সরকারের ৩৯কোটি ৭৭লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। ফলে শেষপর্য্যন্ত ১৬ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়াইবে। সুগার ট্যাক্স এখন হইতে অনুপার্জ্জিত ১·২ লক্ষ এবং উপার্জ্জিত ১·৫ লক্ষ টাকার উপর বসিবে। পূর্ব্বে এই টাকার হার যথাক্রমে সাড়ে ৩ লক্ষ ও ৫ লক্ষ টাকা ছিল। এই সূত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণের সিদ্ধান্তও করা হয়।

এই শুল্ক পরিবর্ত্তনের ফলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বণিক মহল হইতে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে। এ সম্পর্কে অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলী খান এবং পরে অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেন্টের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল বিভিন্ন কালীন বিবৃতি দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপরে অতিরিক্ত কর চাপানো বিষয়ে পরিষ্কারভাবে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া দেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন: "ভারতের বণিক সম্প্রদায় যেন ভারতীয় সমস্যাগুলিকে আজ বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে না দেখিয়া উদার দৃষ্টির সহিত দেখেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। শিল্পের প্রসারের বিশেষ করিয়া মৌলিক শিল্পের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদানই ভারতসরকারের নীতি।" ভারতীয় বণিক ও শিল্পজাত সমিতি সঙ্ঘের অধিবেশনে উদ্বোধন বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলেন: "আপনারা বাজেটের প্রস্তাবগুলি দেখিয়া উত্তেজিত হইয়াছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া বাস্তবের সম্মুখীন হইতে আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের সম্মুখে এক বিরাট ঘাট্‌তি। কিন্তু আমাদের নিকট দেশবাসীর দাবী অনেক। আমরা কি করিয়া তাহা মিটাইব?...ভাবী বংশধরদের জন্য আমরা তাহা ফেলিয়া রাখিতে পারি; কিন্তু তাহা করিলে আমরা ভীরুতারই পরিচয় দিব। বরঞ্চ এখনই ইহার সম্মুখীন হওয়া ভাল।"

বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই পণ্ডিত নেহেরুর এই বিবৃতির সারবত্তা উপলব্ধি করিবেন মনে করি। দরিদ্র জনসাধারণের উপরে এই সুদীর্ঘকাল যে কর চাপাইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাতে মৃত্যুর মুখেই ক্রমে আগাইয়া গিয়াছে জনসাধারণ। পুনরায় সেই দরিদ্র জনসাধারণের উপরেই কর ধার্য্য না করিয়া শিল্পপতিদের উপরে নিয়োগ করিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার যে অত্যন্ত চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু এতদসত্বেও ঘাট্‌তি পূরণের জন্য অন্যান্য পথও অবলম্বন করিবার রহিল। সরকার হইতে সহযোগিতার কথাও ঐ বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন—'দেশের শিল্পোন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করাই আমাদের অভিপ্রায়। কারিগরী, বৈজ্ঞানিক এবং বিদ্যুৎশক্তি ও অন্যান্য সর্ব্বোপায়ে দেশের শিল্প প্রচেষ্টার অগ্রগতির জন্য সুযোগ সুবিধা দান করিতে আমরা চাই।'

দেশের উন্নতিকল্পে এই চাওয়া যে কতখানি কল্যাণের চাওয়া, তাহা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করি। বৃহত্তম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এজন্য অন্ততঃ ন্যায়ানুতম ত্যাগ স্বীকার না করিলে দেশের ভাগ্যলক্ষী সুপ্রসন্ন হইবেন কেন?—আশা করি, নতুন পরিকল্পনা দ্বারা শীঘ্রই ভারতের কার্য্যকরী সম্পদ সৃষ্টির উদ্যম দেখিতে পাইব।

রেলভাড়া বৃদ্ধি

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের যানবাহনসচিব ডাঃ জন্ মাথাই ১৭ই ফেব্রুয়ারী অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের প্রথম রেলওয়ে বাজেট উপস্থিত করিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব দাখিল করেন। এই বাজেটের দুইটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইয়াছে এই যে, ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ্চ হইতে রেলযাত্রীদের ভাড়া টাকাপ্রতি এক আনা বৃদ্ধি করা হইবে, এবং কয়েকপ্রকার মালের এক ষ্টেশন হইতে অন্য ষ্টেশনে পাঠাইবার মাশুল সামান্য বৃদ্ধি করা হইবে। ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট অনুযায়ী রেলওয়ের আয়ের উদ্বৃত্ত হইবে প্রায় ৭ কোটি টাকা।

এ-সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা আমরা আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

বাংলা গভর্ণমেন্টের চল্‌তি ও আগামী বৎসরের বাজেট

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাংলা সরকারের ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেট আলোচিত হয়। অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ আলী এই বাজেট প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে যাইয়া ১৪ কোটি টাকা ঘাটতি

দেখান। তিনি বলেন যে, ঘাটতির দরুন উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানানো হইয়াছে। এবং তাঁহার বক্তব্যে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, দাঙ্গায় হতাহত ও আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য বর্ত্তমান ও আগামী বৎসরে ৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে; উহার মধ্যে বিহার আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

আয় সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায়—'আগামী বৎসর রাজস্বখাতে মোট ৪৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে; উহার মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রাজস্বখাতে মোট আয়ের পরিমাণ ৩৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা হইবে। ১৯৪৬-৪৭ সালের চল্‌তি বৎসরে সংশোধিত হিসাবে উহার পরিমাণ ৩১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। এরূপ অবস্থায় আগামী বৎসর সাড়ে তিন কোটি টাকা অধিক রাজস্ব আয় হইবে।'...তেমনি ব্যয় সম্পর্কে দেখা যায়—'আগামী বৎসর ৫৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার হিসাব দেখানো হইয়াছে; উহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্য ১২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। সুতরাং ১৯৪৭-৪৮ সালে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। চল্‌তি বৎসরে সংশোধিত হিসাবে উহার পরিমাণ ৪৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ আগামী বৎসর সাড়ে তিন কোটি টাকা কম ব্যয় হইবে।'

প্রসঙ্গতঃ অর্থসচিব এইরূপ আশ্বাস দেন যে, সরকারী আয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট বিক্রয়-কর আইন কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করিতে ইচ্ছুক; এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে জমিদারী সংশ্লিষ্ট স্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে মন্ত্রিসভা যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তজ্জন্য ৮২ কোটি টাকা ব্যয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে; ইহার অধিকাংশ অর্থই জমিদারের ক্ষতিপূরণ বাবদ ব্যয় হইবে।

ভারত সরকারের বাজেটে এবারে ৪৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে বলিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদে আলোচনা হইয়াছে। এমতাবস্থায় তাহারই বা সাধ্য কি বাংলা গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার? অনাবশ্যক ও বাহুল্য ব্যয়ের প্রতি কঠোর হইয়া কার্য্যকরী পথে সতর্ক হইয়া চলিলে বাংলা গভর্ণমেণ্ট বহু পূর্ব্ব হইতেই যে নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পারিতেন, তাহাতে কোনোরকম সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা গভর্ণমেণ্ট সত্যিই কি তাহা করিয়াছেন?—আজ বিক্রয় করের প্রতি কড়া নজরকে আরও কড়া করিয়া তাঁহারা যে মনুষ্যত্বহীনতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। দরিদ্র বাঙ্গালী জনসাধারণের পক্ষে ইহা প্রকাণ্ড একটি অভিশাপ ও পীড়ন স্বরূপ। অতএব বাংলা গভর্ণমেণ্টকে আমরা বলি, তাঁহারা যদি এখনও জনসাধারণের সুখ সুবিধার দিকে চাহিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে লক্ষ্য না দেন, তবে তাহার ফল তাঁহারা যাহাই ভোগ করুন না কেন, বাংলার পক্ষে অত্যন্ত বিষময় হইবে।

পরলোকে প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিগত ২৮শে মাঘ মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় সাড়ে চারি ঘটিকায় তাঁহার স্বগ্রাম গোবরডাঙ্গাস্থ বাসভবনে প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। সাংবাদিকরূপে

তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। বঙ্গবাসী, হিতবাদী, দি বেঙ্গলী, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি দীর্ঘকাল 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত তাঁহার অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী যাঁহারা গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা অবিদিত নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহার অধিকাংশ রচনা বিশেষভাবে বঙ্গশ্রীতেই প্রকাশিত হইত।

আমরা তাঁহার পবিত্র আত্মার কল্যাণ কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

Bimal Roy

“জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”

চতুর্দ্দশ বর্ষ } বৈশাখ—১৩৫৪ { ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসের উদ্ভব

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
রামতনু অধ্যাপক (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

১৮৬২ সালে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' কাল হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) প্রায় সমসাময়িক। কিন্তু ঔপন্যাসিক আদর্শ ও সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। এই যুগে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রবর্ত্তন ও সামাজিক উপন্যাসের উচ্চতম আর্টের পদবীতে উন্নয়ন। ১৩৪৯ সনের বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কনক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বাংলা ভাষায় ইতিহাস-ঘটিত কাহিনীর প্রথম দৃষ্টান্ত এবং ইহার রচয়িতা, বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ্রুতকীর্ত্তি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রথম প্রবর্ত্তনের কৃতিত্ব লাভের অধিকারী। এই গ্রন্থের মধ্যে 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়'—এই দুইটি আখ্যায়িকা অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রথমটি অতি ক্ষুদ্রায়তন—ইহাতে সম্রাট আলক্তগীনের কন্যা জেহিরার সহিত তাঁহার ক্রীতদাস ও মন্ত্রী সুবক্তগীনের প্রণয়সঞ্চারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আখ্যায়িকা শিবাজীর সহিত আওরঙ্গজেবের দুহিতা রোসিনারার প্রণয়বিষয়ক—ইহাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশেষ মর্য্যাদা ও কলাকৌশল সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইয়াছে। ইহার ইতিহাস-ঘটিত অংশ ও অন্তররহস্য-বিশ্লেষণ—এই উভ[illegible] আলোচনায় উচ্চাঙ্গের কৃতিত্বের নিদর্শন মিলে। [illegible] নারার শিবাজীর প্রতি প্রেম, তাহার অন্ত[illegible] স্পদের কল্যাণকামনায় মিলনাকাঙ্ক্ষার [illegible] ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব[illegible] চরিত্র ইতিহাসানুযায়ী হইয়াছে—দিল্লী [illegible] ঐশ্বর্য্য-সমারোহ ও যুদ্ধ-ব্যবস্থাও নিপুণভাবে [illegible] হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐতি[illegible] উপন্যাসের আদর্শ ও আলোচনা-বৈশিষ্ট্য উভয় দিক [illegible] ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রথম পথপ্রদর্শক। [illegible] রোসি-

কিন্তু তথাপি ইহার রূপের স্থিরীকরণ [illegible], ও প্রণয়া- সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের নামই অবিচ্ছেদ্যভাবে [illegible] বিসর্জ্জন সুন্দর পর পর কয়েকখানি প্রথম শ্রেণীর ঐ[illegible] ও শিবাজীর রচনা করিয়া ইহার আকার-নির্দ্দে[illegible] ও মহারাষ্ট্রের হইতে বিষয়-নির্ব্বাচনের ও ইহাকে রসসমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার বিশেষ কৌশল, ইতিহাসের বৃহৎ সংঘটনের সহিত পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্রসীমাবদ্ধ সুখ-দুঃখের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক-স্থাপন, অতীত যুগের সাধারণ রূপ ও বীরত্বপূর্ণ বিকাশগুলিকে ফুটাইয়া তোলার নিপুণতা প্রভৃতি উৎকর্ষ-

লক্ষণগুলি চিরন্তনভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে মৌলিক নহেন—ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কট তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পথপ্রদর্শক। তথাপি স্কটের মূলসূত্রগুলি তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত ভারত-ইতিহাসের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির পটভূমিকায় প্রয়োগ করিয়াছেন, ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞতার অভাব কল্পনাসমৃদ্ধির দ্বারা পূরণ করিয়াছেন, তাহা উচ্চাঙ্গের প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাস যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা মোটামুটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইতে পারে। (১) ইহার সংঘটন-কাল কোনো অতীত যুগ—নিকট কিম্বা দূর, যাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কতকটা পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত, স্মৃতি কল্পনায় মেশা, অস্পষ্ট। (২) কোনো বৃহৎ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা ইহার পটভূমিকা—তাহারই ছায়াতলে ইহার বর্ণিতব্য দৃশ্যগুলি অভিনীত হইবে। (৩) ঐতিহাসিক আন্দোলনের সহিত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের সংমিশ্রণই ইহার প্রধান উপাদান। ইতিহাসের বেগবান্ তরঙ্গ কেমন করিয়া ব্যক্তির জীবনে তীব্র বিক্ষোভ ও বিপর্য্যয় আনে, ক্ষুদ্র পারিবারিক সমস্যা ইতিহাস-সংস্পর্শে কেমন করিয়া বিস্তৃতি ও জটিলতা লাভ করে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমরা মুখ্যতঃ তাহারই ছবি পাই। (৪) আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া বর্ণিত যুগের বিশেষ সত্তা, তাহার নাড়ীর বিশেষ স্পন্দন তাহার আদর্শ, চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রণালীর রূপ-বৈশিষ্ট্যটি [illegible]দের নিকট দর্পণে প্রতিফলিতবৎ সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। [illegible] শ্রেণীর উপন্যাসে সাধারণতঃ বীরত্বপূর্ণ, উচ্চ-[illegible]ত জীবনযাত্রাই বর্ণিত হয়—উচ্ছ্বসিত, [illegible]রী দেশানুরাগ, দুর্দ্ধর্ষ, অনমনীয় [illegible]ত্র জাতি বা ধর্ম্ম-বিরোধ, মৃত্যুস্পর্দ্ধা, [illegible] বিস্ময়কর স্ফুরণ প্রভৃতি এই জীবনের [illegible]রণ গতিবেগ সূচিত করে। (৬) ইহাতে মোটের [illegible] চরিত্রাভিব্যক্তি অপেক্ষা ঘটনার রোমাঞ্চকর [illegible]সাধারণত্বই প্রবল হইয়া উঠে। ব্যক্তিত্ব ঘটনার চাপে সঙ্কুচিত হইয়া ঘটনাপ্রবাহকেই অনুসরণ করে। (৭) এখানে আমরা কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর চরিত্রেরই সাক্ষাৎ পাই—মহিমান্বিত বা যথেচ্ছাচারী সম্রাট্, রাজনীতিবিশারদ কূটকৌশলী বা ধূর্ত্ত, বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, দৃপ্ত ক্ষাত্রতেজের প্রতিমূর্ত্তি তরুণ প্রেমপ্রবণ রাজপুত্র, রাজভক্ত বা রাজবিরোধী অভিজাত-সম্প্রদায়, উচ্চাভিলাষ-গর্ব্বিতা দাম্ভিকা বা আদর্শপত্নী রাজমহিষী ও প্রেমস্বপ্নবিভোর, কোমল-হৃদয় রাজকন্যা। এই আড়ম্বরপূর্ণ রাজসভা ও উগ্রকোলাহলমুখর রণক্ষেত্রে ইতর জনসাধারণের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ পরিচয় মিলে না। চরিত্রাঙ্কনের গৌণত্ব, বাস্তব-চিত্রণে আকস্মিকতার প্রাদুর্ভাব ও স্থূল বর্ণবিন্যাস-প্রবণতা, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রধান দুর্ব্বলতা। আধুনিক যুগে বাস্তবতাবাদের যে উচ্চ আদর্শ ও সূক্ষ্ম, নিখুঁত কারুকার্য্যের মানদণ্ড প্রচলিত, তাহার পরিমাপে ইহার কাঁচা কাজের ত্রুটিগুলি আরও বেশি করিয়া চোখে পড়ে।

দুই

অবশ্য, বঙ্কিমচন্দ্রকে যে বিশেষ অসুবিধার মধ্যে কার্য্য করিতে হইয়াছে, তাহাতে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সমস্ত সর্ত্তগুলি পূরণ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ যে ইহার সাহায্যে কোন অতীত যুগের জীবনযাত্রার পুনর্গঠন সম্ভব নহে। অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কেবল কয়েকজন রাজা, রাজকর্ম্ম-চারী, সেনাপতির চরিত্র ও কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ-নৈতিক বিপ্লবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সমস্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও বৃহৎ সংঘটনের অন্তরালে প্রজাসাধারণের প্রাত্যহিক জীবন, নবাগত তুর্কীবিজেতাদের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে আমরা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞ। অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত শতাব্দীগুলি সারি সারি এক নীরব-গম্ভীর শোভাযাত্রায় গ্রথিত হইয়া আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন রাজা ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত সংস্রবই তাহাদের একমাত্র পরিচয়, নতুবা এক শতাব্দী হইতে আর একটিকে পৃথক্ করার অন্য কোনো উপায় নাই। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অতীতের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে একটা বিরাট শূন্যতা সহজেই অনুভূত হয়। প্রতিবেশের গাঁথুনি অত্যন্ত শিথিল ও ইহার মধ্যেকার ফাঁকগুলি কল্পনার সাহায্যে পূর্ণ করা হইয়াছে। স্কটের উপন্যাসে আমরা যেমন সমসাময়িক-জীবনযাত্রার সহিত প্রত্যক্ষ গভীর পরিচয়ের নিদর্শন পাই, যুগ-বৈশিষ্ট্যটি আমাদের কাছে যেমন সুস্পষ্ট হয়, বঙ্কিমচন্দ্রে প্রতিবেশের সেরূপ তথ্যবহুল, সাধারণ মানুষের অন্তর-লোকের চিহ্নাঙ্কিত বর্ণনা মিলে না। মোটের উপর বলা যায় যে, সুদূর অতীত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা অস্পষ্ট ও কল্পনাপ্রধান। আধুনিক যুগের তিনি যতই নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, ততই পরিচয়ের প্রসার ও গভীরতা বাড়িয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে 'মৃণালিনীতে' মুসলমান-কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের যে বিবরণ আছে, তাহাতে এরূপ একটা রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রতি সাধারণ লোকের মনোভাব মোটেই ফোটে নাই। কি আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতায় বঙ্গদেশ এত

যুদ্ধে বৈদেশিক শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিল তাহার কোনো ব্যাখ্যা মিলে না। পক্ষান্তরে 'চন্দ্রশেখর' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে ইংরেজ আমলের প্রথম অবস্থা মোটামুটি পর্য্যাপ্ত তথ্যসন্নিবেশে অনেকটা সুস্পষ্ট হইয়াছে। তবে বঙ্কিমের প্রতিভা সময় সময় একরূপ অভ্রান্ত সংস্কার-বশে অজ্ঞাত সুদূর অতীতের উপর ঐতিহাসিক কল্পনার বিদ্যুৎশিখা ফেলিয়া যুগের অন্ধকারকে মুহূর্তের জন্য উদ্ভাসিত করিয়াছে। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সহজ-সাধ্যতার পিছনে যে দেশদ্রোহিতার কল্পনা অনিবার্য্য, বঙ্কিম তাহাকে পশুপতি-চরিত্রে মূর্ত্ত করিয়াছেন। প্রতাপের রুদ্ধগৃহদ্বারে জনসন-গলষ্টনের সদর্প পদাঘাত ভারতবিজয়ী ইংরেজের মদগর্ব্বিত আত্মপ্রত্যয়ের খাঁটি অভিব্যক্তি। এইরূপে প্রতিভা কল্পনার নীলাকাশে পক্ষবিস্তারের দ্বারা তথ্যাভাবের মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, আর একটি কারণের উপর ঐতিহাসিক উপন্যাসের উৎকর্ষের তারতম্য নির্ভর করে। ঐতিহাসিক প্রতিবেশের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সম্বন্ধ কোথাও বা নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ, কোথাও বা ভাসাভাসা রকমের। ইতিহাস কোথাও বা গার্হস্থ্য জীবনের সহিত গাঢ় আলিঙ্গনা-বদ্ধ, কোথাও বা সুদূর দিক্‌চক্রবালের মত ইহার উপর উদাসীনভাবে নত হইয়া ইহাকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়াছে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকার বিন্যাস ও সাধারণ দৈনিক জীবনের সহিত ইহার সংযোগের স্বাভাবিকতাও ভিন্ন ভিন্ন উপন্যাসে আপেক্ষিক উৎকর্ষ-অপকর্ষের হেতু হয়। ইতিহাস ও গার্হস্থ্য জীবনের সম্পূর্ণ সমন্বয়ের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধেও অনেক পাশ্চাত্য সমালোচক সন্দিহান। তাঁহারা মনে করেন যে, সোনার পাথরবাটির মত ঐতিহাসিক উপন্যাস অসম্ভব ও অবাস্তব—ইহা বিকৃত কাল্পনিক ইতিহাস ও পরতন্ত্র, অপরিণত উপন্যাসের একরূপ জগা-খিচুড়ি। এই চরম মতবাদ স্বীকার না করিলেও ইহা ঠিক যে, পরস্পরবিরোধী উপাদান ও দাবির সমন্বয়-সাধনে খুব নিপুণ কলাকৌশলের প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই বিপদের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি সেইজন্য তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে কেবল 'রাজসিংহ'কেই খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া দাবি করিয়াছেন। এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, 'রাজসিংহে'ই বঙ্কিম অবিকৃত ইতিহাসকে প্রায় আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করিয়াছেন। তা ছাড়া, এখানে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিই উপন্যাসের প্রধান পাত্র-পাত্রী ও ইতিহাসের সংঘটনই উপন্যাস-বর্ণিত বিষয়ের প্রধান অংশ। জেবউন্নিসা ও দরিয়ার সহিত মবারকের মৃত্যু-গহন প্রেমসম্পর্কটিই লেখকের একমাত্র কল্পনাপ্রসূত সংযোজনা। এমন কি এই ব্যক্তিগত সমস্যাও এখানে রাজনৈতিক জটিলতার দুশ্ছেদ্য পাকে জড়িত—রাজনৈতিক চক্রঘর্ষণে সঞ্জাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মানব-হৃদয়ে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এখানেও চরিত্র-পরিকল্পনায় ও যুদ্ধনীতি-বর্ণনায় বঙ্কিম বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক সত্যপরায়ণতার আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর আছে। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এই উভয় দিকেই বঙ্কিমের পরিকল্পনাকে প্রমাদযুক্ত বলিয়া মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষসমর্থনে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেবের চরিত্র ও তাঁহার রাজপুত যুদ্ধকৌশল সম্বন্ধে তিনি প্রচলিত মতবাদগুলির মধ্যে নিজ যুক্তি ও বিশ্বাস অনুযায়ী একটিকে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অনিবার্য্য মতভেদের বিষয়গুলিতে চূড়ান্ত সত্যনির্দ্ধারণ ঔপন্যাসিকের কথা দূরে থাকুক, ঐতিহাসিকের পক্ষেও অসম্ভব। মানুষের মনের অন্তরতম রহস্য "দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ"—কাজেই ঔপন্যাসিকের উপর আওরঙ্গজেব বা শিবাজীর মত জটিল-প্রকৃতি রাজার চূড়ান্ত রহস্যোদ্ভেদের দায়িত্ব অর্পণ করিলে উপন্যাস লেখা অচল, এমন কি ইতিহাস লেখাও দুরূহ। ঔপন্যাসিক যে মত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যুক্তিসংগত ও স্ববিরোধশূন্য, সুপরিজ্ঞাত তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হইলে এবং বিদ্বেষ বা পক্ষপাতের দ্বারা স্বেচ্ছাবিকৃত না হইলে, তিনি দোষমুক্ত। এই আদর্শে বিচার করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কর্তব্যচ্যুতির অভিযোগ আনা যায় না।

তিন

বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহে' ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে যে কঠোর আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন, কার্য্যতঃ তাহার প্রয়োগে অনেকটা শৈথিল্য—বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। উপন্যাসে ইতিহাস অপ্রধান ও কতকটা কল্পনা দ্বারা রূপান্তরিত হইলেও তাহার ঐতিহাসিক অভিধান স্বীকার্য্য। ইতিহাসের কঠিন বস্তুপুঞ্জকে গলাইয়া সেই দ্রবীভূত নির্য্যাসকে নিজ উদ্দেশ্য বা আদর্শের ছাঁচে ঢালিবার স্বাধীনতা ঔপন্যাসিকের আছে। ইতিহাসের মর্ম্মগত সত্য বিকৃত না হইলে, অপ্রধান বহির্ঘটনার দুই একটিকে পরিবর্ত্তন করিলে বা নিঃসম্পর্ক ঘটনাবলীর মধ্যে আর্টের খাতিরে যোগসূত্র রচনা করিলে চণ্ডী অশুদ্ধ হয় না। এই শিথিলতর আদর্শে বিচার করিলে, বঙ্কিমের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও, তাঁহার আরও কয়েকটি উপন্যাস ঐতিহাসিকপদ-বাচ্য। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে মোগল-পাঠানে যুদ্ধ ও এই যুদ্ধের আবর্ত্তে পড়িয়া ছোট-খাট ভূম্যধিকারীদের পক্ষাবলম্বনে বিচার-বিভ্রম ঐতিহাসিক সত্য। আবার যুদ্ধের দ্রুত-পরিবর্ত্তনশীল, উত্তেজনার বৈদ্যুতীভর

আকাশ-বাতাসে প্রেমের আকস্মিক উদ্ভবও মনস্তাত্ত্বিক সত্য। সুতরাং তিলোত্তমা-আয়েষার প্রেম ও ইহাদের সংশয়-সন্দেহ-নৈরাশ্যের স্তরগুলি ঐতিহাসিক প্রতিবেশের সহিত বেশ স্বাভাবিক সম্পর্কান্বিত। কতলু খাঁ, ওসমান ও জগৎসিংহ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, যদিও শেষোক্ত নায়ক সুরাসক্ত বিলাসী হইতে আদর্শ ক্ষত্রবীরে রূপান্তরিত হইয়াছে। এখানে ইতিহাস ও উপন্যাস দৃঢ় বন্ধনে গ্রথিত। কিন্তু 'মৃণালিনী'তে ইহাদের সম্বন্ধ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও আলগা ধরণের। মৃণালিনী-হেমচন্দ্র ও পশুপতি-মনোরমার হৃদয়-বিক্ষোভের সহিত বঙ্গদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের বিশেষ কোনো সংযোগ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ সূক্ষ্ম অনুভূতিবলে ইহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই, প্রথম সংস্করণের, হেমচন্দ্রকর্ত্তৃক বখ্‌তিয়ার খিলিজির হস্তিপদ দলন হইতে উদ্ধারবিষয়ক অধ্যায়—যাহা গ্রন্থের ঐতিহাসিক মুখবন্ধ বিবেচিত হইতে পারে—পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। হেমচন্দ্র পাঠান-অভিযানের নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র; পশুপতির রাজ-নীতি ও তাহার প্রেম এক বৃন্তের ফুল নহে। ইতিহাসের এই উদাসীন স্তব্ধতা ভঙ্গের জন্যই গিরিজায়া-দিগ্বিজয় প্রভৃতি প্রাকৃতজনের মুখরতা এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা'তে ইতিহাসের বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই—একমাত্র মতিবিবির কলুষিত পূর্ব্বজীবনের সহিত তাহার ভোগবতী-ধারার ন্যায় অকস্মাৎ উদ্বেলিত পতি-প্রেমের বৈপরীত্য-সূচনার জন্য ইহার প্রবর্ত্তন। কপালকুণ্ডলার জীবনে বিপদের যে কৃষ্ণমেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে তাহার একটা নগণ্য অংশ মাত্র রাজ-নীতির ক্রূর বিদ্যুৎশিখার ভ্রূকুটী-কুটিল। সুতরাং 'কপালকুণ্ডলা'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না।

'সীতা-রামে'র ঘটনার কাল সপ্তদশ শতকের শেষ বা অষ্টাদশের প্রথম। ধ্বংসোন্মুখ মোগল-সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া একজন অখ্যাত জমিদারের স্বাধীনতা-ঘোষণা ও স্বল্পদিনস্থায়ী রাজ্যপ্রতিষ্ঠা—ঘটনার দিক দিয়া সত্য, কিন্তু এতই অকিঞ্চিৎকর যে, ইহাতে ইতিহাসের গুরুত্ব আরোপ করা চলে না। উপন্যাসের প্রধান বিষয় সীতারামের অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ, শ্রীর প্রতি অতৃপ্ত রূপমোহে তাহার মহনীয় চরিত্রের অধঃপতন ও চরম বিপদের মুহূর্ত্তে তাহার নৈতিক মহিমার পুনরুদ্ধার। ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহার গৌরব ও পতনের কাহিনী আরও মহিমান্বিত হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাসের সহিত সংস্রবশূন্য হইলেও তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিত। ঐতিহাসিক উপাদানের স্বল্পতার জন্যই 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা সঙ্গত নহে। 'চন্দ্রশেখর' পলাশীর যুদ্ধের অল্পদিন পরের ঘটনা বিবৃত করিয়াছে। এখানে ইতিহাস কেবল পশ্চাৎপট মাত্র নহে, আখ্যায়িকার মধ্যে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট। রাজনৈতিক বিপ্লব দরিদ্র ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখর ও বাঙ্গলার নবাব মীর-কাশেমের অদৃষ্টকে সমভাবে অভিভূত করিয়াছে, শৈবলিনী ও দলনীকে নিয়তির একই দুশ্ছেদ্য নাগপাশে জড়াইয়াছে। ইতিহাসের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের বাহন ইংরেজ উভয়েরই দুর্গতির হেতু। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে দলনীর আত্মোৎসর্গ ও বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের গৌরবময়, ব্যর্থ প্রচেষ্টা একই সুরে বাঁধা। 'চন্দ্রশেখরে' ইতিহাসের সহিত ব্যক্তিগত জীবনের সন্তোষজনক সমন্বয় হইয়াছে বলিয়া ইহা মোটামুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সর্ত্ত পূরণ করে।

মীরকাশেমের রাজ্যচ্যুতির কয়েক বৎসরের মধ্যেই এবং অনেকটা ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ আসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তখন ইংরেজ প্রজাপালনের ভার লয় নাই, কর-সংগ্রাহক মাত্র। দুর্ভিক্ষ এই অরাজকতারই একটা অর্থনৈতিক-বিপর্য্যয়মূলক অভিব্যক্তি। কাজেই 'আনন্দমঠে' ইতিহাস প্রবেশ করিয়াছে কোনো ঐতি-হাসিক চরিত্র, রাজা বা শাসনকর্ত্তার মধ্যবর্ত্তিতায় নহে, সমাজবিধ্বংসী, এমন কি মানবপ্রকৃতির উন্মূলনকারী দুর্ভিক্ষের প্রেতমূর্ত্তিতে। গ্রন্থমধ্যে একটি অধ্যায়ে মাত্র এই দুর্ভিক্ষদানবের কঙ্কাল দংষ্ট্রা-বিকাশের ছবি উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তারপর দস্যুহস্ত হইতে পলায়িত কল্যাণীর অনুসরণ করিয়া আমরা যে গভীর বনে প্রবেশ করিলাম, তাহা সমসাময়িক ইতিহাসের গণ্ডী ছাড়াইয়া মহান্ দেশ-প্রেমের কল্পনায় অনুরঞ্জিত এক অনাগত, সুদূর ভবিষ্যতের কল্পলোকে প্রয়াণ করিয়াছে। ইতিহাস এখানে আখ্যা-য়িকাকে নিজ দৃঢ়বদ্ধ কাঠামোর মধ্যে ধরিয়া রাখে নাই—ইহার বিঘূর্ণিত চক্র, ব্যাধনিক্ষিপ্ত বাঁটুলের ন্যায়, উপন্যাসকে বর্ত্তমান বাস্তবতা হইতে অতি দূরে, এক গৌরবময়, অনায়ত্ত পরিকল্পনার ভাস্বর বাষ্পলোকে সবেগে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছে। ইতিহাস এখানে দাঁড়াইবার স্থান দেয় নাই, উড়িবার প্রেরণা দিয়াছে; যাহা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বাঁধে নাই, যাহা ঘটিতে পারে তাহার অসীম সম্ভাবনার মধ্যে মুক্তি দিয়াছে। অঙ্কুরের মধ্যে মহীরুহ-দর্শী দিব্যদৃষ্টি ইতিহাসকে মুহূর্ত্তের জন্য স্পর্শ করিয়া ইহা হইতে বিরাট, নক্ষত্রদীপ্ত ব্যোমপথে উধাও হইবার গতিবেগ আহরণ করিয়াছে।

'দেবীচৌধুরাণী' 'আনন্দমঠের' ঠিক পরবর্ত্তী দশকের কাহিনী ও ইতিহাস ও কল্পনার সংমিশ্রণে অনেকটা 'আনন্দমঠের' সমধর্ম্মী। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের শোচনীয় অভিজ্ঞতার পর ইংরেজ এখন স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলাকে এখনও আয়ত্তে আনিতে পারে নাই। এখনও দস্যুবৃত্তির স্পর্দ্ধিত, প্রায়

কাণ্ড প্রাদুর্ভাব রাজশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই বাস্তব, অর্ধ-অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে একটু আদর্শ-বাদের সুর মিশাইয়া বস্তুপ্রধান উপন্যাসকে রোমান্সের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। দস্যুদলপতি আদর্শ শিক্ষক ও দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারে না হউক, সমাজ-জীবনের নির্বিঘ্নতারক্ষাকার্য্যে ব্রতী। দেবীচৌধুরাণী এই খেলাঘরের রাজ্যস্থাপনে নিষ্কামধর্মে দীক্ষিতা আদর্শ রাণীর অভিনয় করিয়াছে। বঙ্কিমের আসল উদ্দেশ্য এখানে রাজনৈতিক নহে, ধর্মনৈতিক। দেবীকে সত্যকার রাণী সাজাইবার তাঁহার তত আগ্রহ নাই; তাঁহার প্রকৃত আগ্রহ তাহাকে রাজ-সিংহাসন হইতে গার্হস্থ্যজীবনে স্থানান্তরিত করিয়া এই অনভ্যস্ত প্রতিবেশেও তাহার সহজ কৃতিত্ব প্রদর্শন। এই সাফল্যের জন্য প্রশংসা প্রাপ্য অবশ্য তাহার শিক্ষা-প্রণালীর। সুতরাং শেষ পর্যন্ত জয়ঘোষণা হইয়াছে নিষ্কামধর্মের। এই উপন্যাসে সামাজিক জীবন হইতে স্বতন্ত্র কোনো ইতিহাসের অস্তিত্ব নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদের সহিত আধুনিক কালের বঙ্গসমাজের কোনো গুরুত পার্থক্য নাই। কাজেই হরবল্লভ,ব্রজেশ্বর, নয়ান-বৌ, সাগর-বৌ, ব্রহ্মঠাকুরাণী আমাদের নিতান্ত ঘরোয়া জগতের বাসী। ইহাদের সঙ্গে তুলনায় বিমলা-আসমানির, গিরিজায়া-দিগ্বিজয়ের, নন্দা-রমা-শ্রী-জয়ন্তীর, এমন কি শৈবলিনী-সুন্দরী ও দেবীচৌধুরাণীর দিবা-নিশার মধ্যে ভিন্ন দেশ না হউক, ভিন্ন কালের কিছু স্পর্শ আছে। একমাত্র দেবীকে নীতিশিক্ষার ও রাজনৈতিক সংস্রবের উচ্চমঞ্চে দাঁড় করাইয়া ঐতিহাসিক গৌরব অর্পণের কিছু চেষ্টা লক্ষিত হয়। কিন্তু সেও এই কৃত্রিম উচ্চাসন হইতে স্খলিত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক জীবনের সমতল-ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছে। আমাদের অতিপরিচিত বাস্তবজীবনে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা যে একটিমাত্র সুড়ঙ্গপথ রচনা করিয়াছে, বঙ্কিম বর্ত্তমান উপন্যাসে অতি সুকৌশলে তাহারই সুযোগ লইয়া ঘরোয়া কাহিনীর মধ্যে আদর্শবাদ ও রোমান্সের অসাধারণত্বের সঞ্চার করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস-সম্পর্কিত উপন্যাসাবলীর মধ্যে কোন্‌গুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় তাহার নির্দ্ধারণের চেষ্টা করা গেল। মোটের উপর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহকে' এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমাদের দেশে ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব ও ইতিহাসজ্ঞানের স্বল্পতা বশতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাফল্যলাভ যে কিরূপ দুরূহ তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বঙ্কিম নিজ প্রতিভাবলে এক্ষেত্রে প্রায় অসাধ্যসাধন করিয়াছেন। সমসাময়িক অন্যান্য ঔপন্যাসিকের সহিত তাঁহার তুলনা করিলেই তাঁহার কলাকুশলতার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইবে। বেঙ্গল লাইব্রেরির গ্রন্থতালিকায় ১৮৭৫ হইতে ১৮৮২-৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রকাশিত কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম উল্লিখিত আছে। তাহাদের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার হইতে তাহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি কত দুর্ব্বল, কল্পনা-প্রধান ও বাস্তবজীবনের সহিত সম্পর্করহিত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বিনোদবিহারী গোস্বামীর 'পূর্ণশশী' (১৮৭৫) কাশ্মীরের রাজপুত্রের সহিত উদাসিনী রাজ-কন্যার বিবাহের আখ্যান; হারাণচন্দ্র রাহার 'রণচণ্ডী' (১৮৭৬) নবদ্বীপরাজ কর্তৃক কাছাড় আক্রমণের বিবরণ; কেদারনাথ চক্রবর্ত্তীর 'চন্দ্রকেতু' (১৮৭৭) বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয় ও লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যচ্যুতির পর গোরাচাঁদ নামক একজন ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির কর্ত্তৃক প্রদেশের কিয়ৎ অংশের পুনরুদ্ধারের কথা; রাখালদাস গাঙ্গুলির 'পাষাণময়ী' (১৮৭৯) আলিবর্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে বর্গী আক্রমণের সহিত সংযুক্ত প্রেম-কাহিনী; আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'রাজকুমারী' (১৮৮০) বিক্রমপুরের হিন্দুরাজার সহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরবাসী অনার্য্য রাজার যুদ্ধের বিবরণ; হেমচন্দ্র বসুর 'মিলনকানন' (১৮৮২) সম্রাট জাহাঙ্গীরের একটি প্রেমাভিনয়ের বর্ণনা; তারকনাথ বিশ্বাসের 'সুহাসিনী' (১৮৮২) পারিবারিক জীবনে প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলার হস্তক্ষেপের উপাখ্যান। এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

মৈনাক

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

চীৎকারের কোন ভাষা নেই, মূককণ্ঠের তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ আকাশবাতাস ভরে তোলে। হাতটা নেড়ে দেখায় শূন্যপ্রায় আখ ক্ষেতটার দিকে। আলিপথের ধারেই ক্ষেত, পাশ দিয়ে চলাপথটা চলে গেছে সামনের গ্রামখানার দিকে একে বেঁকে, জমিটার মধ্যে আশেপাশে ছড়ান পড়ে রয়েছে আখের ডগলাগুলো, লকলকে গাছের ডগাটা রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে। পথের ধারে আখক্ষেত, মায়া বোধ হয় কোন পথিকই ছাড়তে পারেনি, দু-এক গাছ ভেঙ্গে নিয়ে চিবুতে চিবুতে চলে গেছে। ক্ষেতটা প্রায় শেষ হয়েই গেছে তাদের অত্যাচারে।

জমির পাশে কোদাল চালাচ্ছিল নারাণঠাকুর, এগিয়ে এসে কোদালটা শূন্যে তুলে শাসায়, যে আখ ভেঙ্গেছে কাঁধে বা মাথায় মেবে একেবারে শেষ করে দোব না, দেখিয়ে দেয় পায়ে মারলে সারাজীবন খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলতে হবে, তা হলেই মনে থাকবে পাপ কাযটাকে; অব্যক্ত ভাষায় খানিকটা কি চীৎকার করে চলে।

বোবা ঠাকুরকে চেনে না এমন কেউই নাই এ অঞ্চলে। গত দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ প্রতিটি দিন সকাল সন্ধ্যা মুনিষের সঙ্গে সমানে খেটে এসেছে মাঠে।

বোবা—বাক্ বা বাক্য তার চিরতরে রুদ্ধ, তবুও মনের চোখের সামনের জগৎ দিনই প্রসারিত হয়েছে তীব্র ব্যর্থতার দিকেই, পৃথিবীতে পায়নি কিছুই,পেয়েছে কেবল দুঃখ, অভাব আর অনটনের তীব্র জ্বালা। কোনদিনই কোন ক্ষণিকের অবসরে ওর মনের প্রাঙ্গণ শ্যামল হয়ে ওঠেনি! কোনদিনই ভরে দেয়নি নিষ্ঠুর বিধাতা ওর মনের বিন্দুমাত্র রিক্ততাকে সাফল্যের প্রাচুর্য্যে।

বড় ভাই চোখের সামনে মরে গেল। ফকীরের শেষদিন আজও চোখে ভাসে। ক্যানসার হয়ে বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে মারা গেল। মরবার আগে সেও কথা বলতে পারেনি, অব্যক্ত ভাষায় আর্ত্তনাদ করে বিদায় নিল পৃথিবী থেকে। পিছনে পড়ে রইল বোবা ভাই আর অসহায় স্ত্রী-পুত্র, এক একটা করে জমি বিক্রী হয়ে গেল, টিকে রইল মাত্র কয়েক বিঘে ধানজমি। ভাইপো সোনা তখন এতটুকু।

সে সব দিনগুলো নারাণের মনের দুয়ারে ঘা দেয় আজও। ভাষা নাই—জানাবার পন্থাও চিরতরে বন্ধ। অব্যক্ত আর্ত্তনাদ ক'রে চোখের কোল ছাপিয়ে বার হয়ে আসে অশ্রু অঝোরে, কান্নায় ভিজে যায় ওর আর্ত্তনাদ। বুক ফেটে আসবার উপক্রম—কারুর সঙ্গে মিশে না। মুনিষের সঙ্গে সমানে মাঠে কোদাল চালিয়ে যায়।

বর্ষণমুখর দিনের সঙ্গে সুরু হয় নারাণের কায, কাছা পরে ধানের জমিতে পুরানো কৃষাণের মতই বীজধান টানতে বসে। পা দিয়ে পাখনা দেওয়া জমি টিপে দেখে নেয় লাঙ্গল দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না। মতিলাল হাসে—"ঠিক হয়েছে ঠাকুর।"

থামবার পাত্র নয় নারাণ, প্রতিবাদ করে হাত নেড়ে। বাধ্য হয়ে মতিলাল আবার লাঙল নামায় জমিতে।

সোনা মুড়ির পুটুলিটা মাথায় করে আলপথে আনতে থাকে মাঠের দিকে। চাষের সময়-মাঠেই মুড়ি আনার ব্যবস্থা। লাঙল, মুনিষ কামাই হলে চলবে কেন?

ছিন্নপ্রায় গামছাটায় বাঁধা মুড়িগুলো মতিলাল আর তার বৌকে দিয়ে নিজের আঁচলে এক মুঠো নিয়ে এগিয়ে যায় নারাণ ভট্চায পুকুরের কাঁকুরে পাড়টার দিকে। মিয়োন মুড়ি ক'টা চিবোতে থাকে অলসভাবে!

পিছনে কার পায়ের শব্দ পেয়েই ফিরে চায়, রূপসী—মতিলালের বৌ। রূপসী অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে নারাণ ঠাকুরের পানে। বলিষ্ঠ দেহ, সামান্য চাট্টি মুড়ি গামছার খুঁটে, তাই চিবিয়ে কোন রকমে কোঁক কোঁক করে খানিকটা ঘোলাটে জল পেটে পুরে উঠে আসে। সরে যায় রূপসী, মনে মনে ঠাকুরের উপর কেমন যেন একটা মায়া আসে। আহা বেচারা—টানাটানির সংসার, খেটে-খুটে পেটে দুটো খেতেও পায় না।

নারাণ ঠাকুর আবার বীজ টানতে বসেছে। সোনা ওদিকে আলের কাছে অল্প জলে ছোট ছোট দুধ কাঁকড়া কয়েকটা তুলে ধরে পলাশপাতায় পুরবার চেষ্টা করে। কোনরকমে তাই আজ তরকারীর সাৎ।

একটামাত্র মুনিষ—একটা কামিন আর নারায়ণ ঠাকুর একা; কোনরকমে বাছুরের মত ড্যালা পাকান দুটো গরুর লেজ টেনে টুনে এবারকার মত চাষ যখন সারল—তখন আর কারুর শিঙে তেল হতে বাকী নাই।—সকলের চাষ শেষ হয়ে গেছে তার অনেক আগে। বর্ষার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বিশ্রাম এইবার সেই ধান কাটা পর্য্যন্ত—অবশ্য ততদিন যদি দেবতা পালে।

নারাণ ঠাকুরের কোন বিশ্রাম নাই। সকালবেলা গামছা প'রে সরু শালের ঠ্যাঙাখানা হাতে নিয়ে বার হয় মাঠ খেতার করতে; রোদ বর্ষা-মানামানি নাই। কোন মাঠে জলের দরকার, কোথায় বা জল বেশী হয়ে গেছে, ধান হেজে যাবে, নানা কায তার।

চলেছে পলাশতলীর মাঠ দিয়ে—লকলকে সবুজ

..নের চারা সকালের সোনালী রোদে মাথা নাড়ে; আলটা ঢেকে গেছে ঘাসের চাপে। গোছা গোছা ধানের দল কালো জলের বুকে ঝলমল করে; নারাণের বুক ভরে আসে : ওদেরই মুখে আসবে ধানের শিষ—আশার বাণী! অব্যক্ত ভাষায় আবেগে বুকটা ভরে ওঠে : সোনা মানুষ হবে বড় হবে : দখিমুখার স্কুলের পড়া শেষ করে যাবে পলাশডাঙ্গার বড় স্কুলে—একটা ছুটো পাশ করবে—এর এক একটি দানা এগিয়ে দেবে তাকে এক এক ধাপ আগে। নারাণ ঠাকুর স্বপ্ন দেখে অব্যক্ত ভাষায় অনন্দ ধ্বনি করে—উদীয়মান সূর্য্যের পানে চায় : আশার আলোয় ঝলমল করে ওঠে ওর ছোট্ট পৃথিবী—সারা জগৎ।

রূপসী অদূরের আলে ঘাস কাটছিল, নারাণের চীৎকার শুনে চেয়ে থাকে তার দিকে। আহা! বোবা ঠাকুর—এগিয়ে আসে ক্রমশঃ রূপসী : নারাণ এমন অবস্থায় রূপসীকে সামনে দেখে কেমন যেন একটু অপ্রস্তত হয়ে যায়! বুকের আনন্দের জোয়ার তখনও সমানে চলেছে : হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় সকলকে ধানের চারাগুলোর দিকে।

রূপসী আঁচল থেকে বার করে কতকগুলো চ্যাঙ-গড়ুই মাছ : কোথাও ধরেছে বোধ হয় : খেজুরের একটা শিকে ক'রে ছালি গাঁথা : নারাণ ঠাকুর কিছুতেই নেবে না, কিন্তু রূপসীর কথা এড়াতে পারে না : বিশ্বাসই করতে পারে না এত কষ্টে ধরা অতগুলো মাছ অম্লানবদনে কি করে তাকে দিতে পারে : অনেককষ্টে রাজী করিয়ে রূপসী নারাণ ঠাকুরকে বাড়ীর পথ ধরালো ; ষষ্ঠীতলার মাঠ থেকে তার গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে—কেন জানে না—বড্ড মায়া হয় ওর : ভগবানের বিচার জানে না—দেখা হলেই ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করত তাকে।

মানুষই যদি করে দিলে ভগমান, তবে মুখের ভাষাই কেন হরে নিয়েছ!

মতিলাল ছেঁড়া তালাইখানাতে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে ঝাঁকড়া বটতলায় : ঘাস মাথায় করে রূপসীকে আসতে দেখে ফিরে চায় : চোখ বুজেই আবার হুকুম চালায়—লিয়ে আয়, চোপ্পদিন ফারাকেই থাকবি, তুর মতলব ভাল নয় : সেই কখন মাঠ থেকে আড়া ঝেড়ে দিলাম তুকে—চটক করে আসবি, তা কুথায়—স্রে—লিয়ে আয় :

মতিলাল আজ খাটতে যায় নি। গা-গতরে যুৎ নাই মাছের আড়া থেকে মাছগুলো রূপসীকে দিয়েই ঘরে এসেছে। আজ টুকচেন নেশা না করলেই নয়।

খানিকক্ষণ পর মতিলালের চীৎকার শোনা যায় দূর থেকে : সামনের পাথরে আছাড় দিয়ে বাখর সমেত সমস্ত চালা মদের হাঁড়িটা আছড়ে ফাটিয়ে দিয়ে রূপসীর চুলের মুঠিটা ধরে চীৎকার করতে থাকে—

এতগুলো মাছ একটাও নাই : লাফ দিয়ে পড়ে গেছে জলে : ন্যাকা পেয়েছিস্! ছিনেল মাগি কোথাকার! দোব খুন করেই একেবারে—

রাগ হ'বারই কথা। মাছপোড়ার চাট করবে বলেই এত কষ্টে মাঠে গিয়েছিল সব কোন দিক কি হয়ে গেল! উপর্য্যুপরি কয়েকটা কিল পিঠে পড়তে রূপসী চাপা আর্ত্তনাদ করে উঠে। পাড়ার কয়েকজনকে আসতে দেখে ছেড়ে দেয় রূপসীকে, অদূরে দাঁড়িয়ে গজরায় মতিলাল; —'ছিনেলী কুথাকার!

বাগ্দীপাড়ায় সন্ধ্যার মজলিস বসেছে। কলকের আগুনটা অন্ধকারের মাঝে জল জল করে, আর করে নির্ধূম আকাশের তারার দল! বহুড়া গাছের মাথায় সপ্তর্ষির ম্লান আভা, গ্রামের প্রান্তে নোতুন পুকুরের পদ্মবনে দোল দেয় শারদরাত্রির মলিন জ্যোৎস্নামাখা বাতাস। শিউরে ওঠে আবেশে নিদ্রিত ডাহুক-দম্পতী। দূর আকাশকোল থেকে ভেসে আসে কোন দূরদূরান্তরের গ্রামের আরতির শব্দ. অস্পষ্ট ধ্বনি, ধানক্ষেতের বুক বেয়ে বাতাসে ভেসে আসে, মনে আনে কোন এক অজানা কল্পনার হালকা তুলির স্পর্শমাখানো সোনার দেশের ইসারা। শরৎ এসেছে—আবার এসেছে পূজার সমারোহ! মন্মথ কাজ করে বড় বাবুর ঘরে। মুনিব দিয়েছে নোতুন ধুতি আর গামছা, জহুরের গুলিন ঠাকুরণ কাপড় যা দিয়েছে প্রায় এক ইঞ্চি কস্তা ধুতি, আবও সকলেই বলে চলে তাদের নিজের নিজের কথা, কল্কেটায় সোঁ টান দিয়ে কাশতে কাশতে বলে ওঠে মতিলাল—শালা বোবার ঘরে আসছে বছর থেকেই ছেড়ে দুব খুড়ো, উর আবার চাষ, তার আবার কথা! দেখে লিক গো—শালা ঠাকুর!

কেউ সায় দেয় না, আবহাওয়াটা কেমন যেন গুমোট। নিরুপায় হয়ে মতিলাল আবার কল্কেটায় মুখ লাগায়। সারা রাগটা যেন ওর উপরই ঝাড়তে চায়! পূজো গেল এমনিই, মুনিববাড়ী থেকে একটা গামছা পর্য্যন্ত পায় নি! রাগে গাটা গর গর করে।

সোনার কান্না থামে না, বিধবা না খুঁজে পায় না কি করে ছেলেকে থামান যায়! ছেলে মানুষ—পূজোর দিন, সকলের নোতুন কাপড়-চোপড় দেখে সেও চুপ করতে রাজী নয়! সুর ধরেছে! ঘরে ধানও নাই যে দু'চার সের বিক্রী করে কিনে দেবে! নানা কথায় ভোলাবার চেষ্টা করে! আজ রোরুদ্যমান ছেলের দিকে চেয়ে বার বার মনে পড়ে স্বামীর কথা! পূজোর দিনে আসত তাদের গৃহাঙ্গণে খুসির জোয়ার, ছোট্ট গৃহাঙ্গণ ভ'রে যেত!

কোথায় সে আজ জানে না। যে দেশ থেকে কেউ কোন দিন ফিরে আসে নি—আজ সেই দেশের পথযাত্রী তার স্বামী। সারা সংসারের নির্ভর মাত্র কয়েক টুকরো জমি আর ওই ভাষাহীন মূক নারাণের উপর!

বোবা চুপ করে বসে থাকে। মনের সামনে ভেসে ওঠে তার স্বপ্নমাখা দিন, বড় ভাই-এর কথা। বুক বন্ধ হয়ে মরেছিল: সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল: কোথায় গেল সে ধানের মরাই—কোথায় গেল সে চালের পুঁড়ো।

চাঁদনী রাত্রে আজ সোনার কান্নায় বোবা যেন কি ভাষা খুঁজে পাবার চেষ্টা করে! বড় বৌ ছেলেটাকে নিয়ে বার হয়ে গেল, নারাণের সামনে ওকে কাঁদতে দেবে না। কাঁদতে দিতে রাজী নয়। জানতে দেবে না ওকে তার সংসারের অভাবের রুদ্ররূপ। উঠানের আমগাছের ফাঁক দিয়ে নীচে লুটিয়ে পড়ে এক ঝলক চাঁদের আলো—রচনা করে আলোছায়ার মায়াজাল। নারাণের চোখের জলে সব যেন কেমন ঝিকিমিকি হয়ে যায়, সামনে কাকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ায়। রূপসী সোনাকে খুঁজতে এসেছে। বাড়ী নাই দেখে আঁচলের মধ্যে থেকে সন্তর্পণে কি একটা জিনিষ বার করে, লাল ফুল পাড় একখানা ধুতি—একটা রঙ্গীণ পিরাণ।

অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে নারাণ। ঘাড় নাড়ে, কিছুতেই সে নেবে না।

রূপসী ছাড়বার পাত্রী নয়। ছেলের জন্য এনেছে, সে কি ফেরৎ নিয়ে যাবে আবার। হঠাৎ কাকে আসতে দেখেই দুজনে অবাক্ হয়ে যায়! তাড়াতাড়ি করে কাপড়-জামাটা ঘরের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই রূপসী ওপাশের দরজাটা দিয়ে বার হয়ে গেল! এগিয়ে আসে পিছনের লোকটা—চিনতে পারে নারাণ, মতিলালের চেহারাটা বদলে গেছে, চোখ দু'টো লাল করমচার মত। কি একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ, চীৎকার করে ওঠে সে—'এই তুমার ধম্মো ঠাকুর'?

নারাণ চেয়ে থাকে তার দিকে। মতিলাল দাঁড়ান না, তীর বেগে ছুটে যায় রূপসীর গতিপথের দিকে। তার যেন মাথায় রক্তচড়ে গেছে। খামারের পাশে পড়ে ছিল একটা কোদালের পাশা, তাই নিয়েই এগিয়ে যায় মতিলাল। রোজ রোজ এমনি করে অপমান, আর সে সহ্য করবে না। যা থাকে তার অদৃষ্টে আজ এর একটা বোঝাপড়া সে করবেই।

পিছনদিক থেকে কিসের আঘাত পেয়েই চীৎকার করে ওঠে রূপসী। আছড়ে পড়ে তার অচেতন দেহখানা। মতিলাল তখনও গর্জ্জাচ্ছে—"নষ্টা-মাগী কোথাকার, খুনই করে ফেলাব, যা থাকে বরাতে!"

বরাতে ছিল না কিছুই। এমন ভুগোলের সীমারেখার বাইরে গ্রামপ্রান্তে দু'একটা খুন-জখমের হিসেব কেউ রাখে না। কে কার সর্ব্বনাশ করল তার খবর পৌঁছে না সভ্য জগতে। ওদের বেলায় ইতিহাস, ভূগোল, সংবাদপত্র মূক এবং মৌন।

রূপসীর শেষাবশেষ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গাঁয়ের কাঁদরের ধারে মরা অশথগাছের নীচে, রাতের শেষে কালপেঁচার ডাকে শিউরে উঠল রাতের জ্যোৎস্নালোক, রূপসীকে কেউ জানল না, চিনল না—তার জন্য চোখের জলও কারু কি ঝরেছিল?

বোবা নারাণ ঠাকুর খড়-বিছান মেজেতে আজ আর ঘুমুতে পারে না। সারারাত্রি কেটে যায়, আকাশের লাখো তারার রোশনী—আজ যেন ছল ছল করে। বোবা চেয়ে থাকে মাথা তুলে! সব যেন কেমন ঘুলিয়ে যায়, চোখের সামনে আজ ভাসে একজনার করুণ কাতর মুখচ্ছবি—জীবনে কেউ এমন ক'রে তার দিকে চায় নি। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল রূপসী—টুকচেন পায়ের ধুলো দাও ঠাকুর!

কথাটা কানে যায়নি, আভাসে ইঙ্গিতে কাছে সরে গিয়েছিল বোবা।

হাঁটুভোর ধানক্ষেত ভেদ করে চলেছে নারাণ। ঝুলুর—কার্ত্তিক-কলমা ধানের শিষগুলো শরতের শিশিরে মাথা নাড়ে, হেমন্ত ধানের লকলকে চারাগুলো গর্ভবতী রমণীর মত ভোরের আলোয় স্বপ্ন দেখে নোতুন জগতের। ঘাসের ডগায় সর সর করছে ভোরের শিশির। এগিয়ে চলে নারাণ।

শ্মশানের নিরন্ত চিতাগ্নির পাশে কখন এসে দাঁড়িয়েছিল জানে না বোবা, কি যেন খুঁজে চলছে। পশ্চিম গগনে শুকতারা ঢলে পড়েছে দূর কাঁটাবাধের শ্যামল গ্রামরেখায়—পূর্ব্বদিক ফরসা হয়ে যায়। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত। দিনের জাগরণী সুরের রেশ ছড়িয়ে পড়ে, সপ্তাশ্বের বিজয়-রথের পূর্ব্ব ঘোষণা নিয়ে। রাত্রির সিংহদ্বারে দিনের রথ আজ পথ খুঁজে পেয়েছে।

বুক চিরে বার হয়ে আসে দীর্ঘশ্বাস। মাথা নামিয়ে পথ ধরে খড়কেরসোলের কি ধানক্ষেতের দিকে। কেউ হয়ত দেখলে কি ভাববে।

"কিন্তু সেটা আর বাকী নাই", গ্রামের চত্বরে ষোল আনার লোক জমায়েত হয়েছে। বিচার হবে বোবার। সে নাকি ছিল ওই রূপসীর সঙ্গে।

বোবা চুপ করে বসে থাকে। পাচু ভটচায্ হাতের আঙুলের ইসারায় দেখিয়ে দেয়—পাঁচকুড়ি টাকা দণ্ড দিতে হবে ষোলআনায়—না হ'লে জাতে পতিত করা

বে। কে যেন আবার টিপ্পনী কাটে—বোবার রস আছে যা হোক।

সওয়াল জবাব এর হয় না। একতরফাই রায় হয়ে গেল। দোষী নারাণ ঠাকুর, তার বলবার যত কিছু ছিল ভাষাহীন অব্যক্ত আর্ত্তনাদে গুমরে ফেরে আশপাশ বাতাসে, ওরা বোঝে না সে ভাষা—বুঝতে চায় না। না বুঝুক, নারাণের বিচার তার করেছে—করবেও।

বড় বৌ দুধেল গাইটাকে বিক্রী করে সেবার প্রধানদের দণ্ড দিলে। বোবার নির্ব্বাক চোখের কোল বয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। কপালে করাঘাত করে আর্ত্তনাদ করে, আঁ···আঁ—ওঃ। অব্যক্ত ভাষাহীন আর্ত্তনাদ ছাড়িয়ে পড়ে দূর নভস্তলে।

কাঁদবার সময় নাই। ধান কাটার মরসুম। নারাণ কোমরে গামছা বেঁধে লেগে যায় ষষ্ঠীতলার মাঠে; গাঁয়ে কারুর সঙ্গে আর মেশে না। কাউকে দেখলেই কেমন যেন তার একটা ভয় আসে। আজ গাঁয়ের সবাই—পৃথিবীর সবাই যেন ওর শত্রু।

সে দিনগুলো দীর্ঘকালের ব্যবধানেও ভুলতে পারেনি নারাণ। অসুস্থ শরীরে আলের ধারে রোদে বসে বসে সেই দিনগুলোই মনে আসে। সে দিনের কথাগুলো আজ নারাণের অবচেতন মনের দরজায় গুমরে ফেরে। বিগতদিনের কথা, তবু সে ভোলেনি। ভাষা দিতে পারে না। নির্ব্বাক মৈনাকের মত বসে থাকে। বুকে তার বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি, অন্তরে কালবৈশাখীর দুর্ব্বার অতৃপ্তি, ব্যর্থতার হাহাকার। জীবনে যে পেলো না কিছুই—শুধু লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অভাব-অভিযোগ আর নিষ্ঠুর বিধাতার নির্ম্মম পরিহাস, এ ছাড়া তার অন্তরে কি থাকবে—প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা?

এ তার কাছে পরিহাস, তাই মনের কোনে রূপসীর কথা উঠলেই কেমন যেন হয়ে যায় সে। সব আকাশটা কেমন ভোবা কাটা, জোড়ের ধারে অর্জ্জুনগাছের শুভ্র বল্কল-বাস জীর্ণ হয়ে গেছে। কালো জলে দলবাঁধা চ্যাংমাছের আনাগোনা। ঘাড়চাঁছা খেজুর গাছটার বুকে কলসীটার কথা মনে আনে কোন ভরাযৌবনা নারীর দেহশ্রী।

দীর্ঘ দশ বৎসর ব্যবধানে বোবা আজও ভুলতে পারেনি তাকে! ক্ষণিকের বরিষণ যদি মরুভূমির ঊষর বুক কোনদিন ভরিয়ে তোলে—শুষ্ক মরু তাকে কোনদিন কি ভুলতে পারে? কাঠবনের কাঁটালগাছে একটি পথভোলা কাঠমল্লিকাও পথিকভ্রমরের মন ভরিয়ে তোলে।

রাশি রাশি ধান-বোঝাই গাড়ী সেই আগেকার মতই আবার চলে গ্রামের দিকে। সবই আছে, নাই কেবল সে দিন। সোনা আজ বড় স্কুলে পড়তে গেছে, ছোট্ট এতটুকু ছেলে সনাতন। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেও বেড়ে গেছে। বোবা চেয়ে থাকে তার দিকে। হ্যাঁ, ঠিক বড় দাদার মতই চেহারা হয়েছে। কেমন আছ কাকা?

সোনাকে আসতে দেখে বোবা উঠে পড়ে। অসুস্থ শরীর নিয়েই মাঠে এসেছিল; হাজার হোক মাটির মায়া কাটাতে সে পারে না। পর মুনিষের হাতে কায—সামনে না থাকলেই হয় ফাঁকি দেবে, না হয় চুরি করবে। শীর্ণ মুখখানা নারাণের আনন্দে ভরে ওঠে। ভাইপো মানুষ হ'বে—পাশ করবে—চাকরী করবে, দুঃখ তাদের চিরকাল থাকবে না। ভাবতেই পারে না বোবা।

সোনা দাঁড়ায় না, কাকাকে একবার দেখেই চলতে থাকে মাঠের দিকে। অন্যান্য চাষী—মুনিষ যারা ছিল তারা মাঠের কায ছেড়ে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, কি সব বলে চলেছে সোনা।

পর পর ক'দিন জ্বরে ভুগে বোবা শীর্ণ হয়ে গেছে। পা'দুটো টলছে, দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ার হাত থেকে সেও রেহাই পায়নি। মুনিষ মতিলাল বলে ওঠে—

ঘর যাও কেনে ঠাকুর। কেবল সব তোমার চুরি করে লেবে বিবাক, কষ্ট'রছ জ্বরে. তবু লড়বা নাই।

গাঁয়ের দিকে পা বাড়ায় বোবা। ভাইপো এসেছে ভট্‌চাযের তরকারীবাড়ীর দিকে, যদি কিছু তরকারী পাওয়া যায় দেখতে হবে। তার আবার বড়ি-পোস্ত আর কলাইএর ডাল খাওয়া অভ্যাস নাই।

বেলা বেড়ে যায়। সোনার দেখা নাই। ছেলেটা কোথায় গেছে কে জানে। আজকাল তার নানা কায, মা বকে চলে, বোবা অসুস্থ শরীরে তখনও খায় নি। বার বার অনুরোধ করেও পারা যায় না তাকে। একসঙ্গেই খাবে। হঠাৎ বাইরে একটা গোলমাল শুনে বড় বৌ বাইরে যায়—পিছু পিছু বোবাও। অদূরে সামনের চাতরে কারা যেন এসে জমেছে। কাতারে কাতারে চাষী-বাউরী, বাগ্দী ইতর, ভদ্র অনেকেই মজা দেখবার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কৃষাণ-সভার মিটিং—অনেকেই চীৎকার করে চলেছে চোঙা মুখে দিয়ে।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর। লাঙল যার জমি তার। ইত্যাদি অনেক কথা। আরও নানা ধ্বনি। ভিড়টার সামনে বাঁকুড়া থেকে কয়েকজন লোক—মেয়েছেলেও এসেছে—কলকাতারও কে একজন পাণ্ডা মটরে করে এসেছেন—কি যেন জোর বক্তৃতা দিয়েছেন তাঁরা। যাদের হাতে আজ জমি আছে, সব ছিনিয়ে নিতে হবে,

কেড়ে নিতে হবে। নিজেরাই চাষ করবে তার। এ-সবই তাদের, আর মুখ বুজে অত্যাচার সইবে না।

সমাজতন্ত্রদলের অন্যতম পাণ্ডা। একটা লাল-নিশানের কাছে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে কি সব বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। ঘন ঘন হাততালি আর কোলাহল থামে না।

বোবা—আর সব লোকই অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে

এতদিন দেখেছে তারা তেরঙ্গা নিশান, গাঁয়ের কত ছেলে দলে দলে জেলে গেল; সেবারই ত নুণ তৈরী করার অপরাধে। এই ত আগষ্ট-বিপ্লবের মায়ের চোখের জল—আজও মোছেনি। গোলা পোড়ান থানার পাশে তৈরী করে ছিল তাদেরই গাঁয়ের ছেলেরা খড়ো ঘরের নতুন চৌকী: আরও কত কি।

আজ আবার নতুন কারা এসে কি নতুন কথা শোনাতে চায়। গাঁয়ের সবাই আজও মুক্তি পায়নি জেল থেকে। কেউ রয়েছে মেদিনীপুর সদরে—কেউ বা দমদম, না হয়ত আলিপুর—না হয় অন্যকোথায়ও রয়েছে। এত-দিন তারা তা হ'লে ভুল পথেই এসেছিল?

বোবার এ সব কথা মনে ঝড়ই তোলে: বিপিন মুখুজ্জেকে কি বোঝাবার চেষ্টা করে আর্ত্তনাদ করে, হাত নেড়ে কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না, ওদের চীৎকারে ওঠে জয়ধ্বনি আজ তাদের নির্ব্বাক ভাষাহীন কণ্ঠকে ডুবিয়ে দিতে চায়।

বোবা বাড়ী গিয়ে সনাতনকে বোঝাবার চেষ্টা করে। হাত দিয়ে দেখায় কতটুকু থেকে কি করে মানুষ করেছে। আজ সে কি চায়, যে দেশে মুনিব-মুনিব জমির ধানের আধাআধি বখরা পায়—যেখানে পালে পার্ব্বণে বাড়ীর লোকের মতই তারা সমান আনন্দ করে—সেই বাংলার পল্লী-গৃহাঙ্গণেও নতুন করে কি সাম্যবাদের শিক্ষা তারা দেবে—জানে না।

কৃষাণ-সভার কায থামে না, তা'দিকে এতদিন ঠকিয়ে এসেছে ওরা, আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। তাই প্রতি-রাত্রি নাইট্‌স্কুলে পড়াবার ছলনা মেই এই উত্তেজনার বিষ একটু একটু করে তাদি'কে গেলান হ'তে থাকে।

বুড়ী-মা হ্যারিকেনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বসে থাকে। ওঘরে বোবার জ্বর—বেহুঁস হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। সেই যে বার হয়ে গেছে সোনা দেশোদ্ধারের নতুন মন্ত্র নিয়ে—এখনও সে ফেরেনি। মায়ের চোখ আজ ছলছলিয়ে আসে—বোবার জন্য সত্যই কষ্ট হয়।

ক'মাস পরেই নতুন বছরের চাষ সুরু হবার আগেই সুরু হয় তাদের বিক্ষোভ, অল্প মজুরীতে চাষ করবে না তারা। হয় মজুরী বাড়াও—না হয় জমি ছেড়ে দাও: মতিলাল সজোরেই কথাটা বলে ওঠে—

সহরের দাদাবাবু দিদিমণিরা আজ তোমাদের চেয়ে আমাদের আপনার লোক ঠাকুর। চোপ্পদিন খাটিয়ে নিয়ে দেবা মোটে চার সের ধান—অত সস্তা আর লয়—: তার চেয়ে টিনকুঠিতে না হয় কয়লাখাদে খাটতে যাব: কায কি গাঁয়ের টংরা মাটি কামড়ে পড়ে থেকে।

অবাক্ হয়ে যায় প্রধানরা। এতদিন এ কথা শোনেনি, ওরা কি চলেই যাবে। হয় ত বা যেতেও পারে, সারা গাঁয়ের মাঠ পড়ে থাকবে বন্ধ্যা হয়ে—এই ত আমোদ-পুরেই হয়েছে নাকি—সবাই চলে গেছে আসন সহরের কলে কায করতে,—মাঠের ফসল আর দিনের আলোর মুখ দেখে না। সারামাঠ খাঁ খাঁ করছে তপ্ত রোদে।

তাই কি হবে ওদেরও। সজল বর্ষার কালো মেঘ-স্তরের নীচে পড়ে থাকবে তার ফলপ্রসূ মৃত্তিকা বন্ধ্যা হয়েই, শরতের শীর্ণ ভেলায় শুভ্র মেঘের লুকোচুরির দিনেও কি মৃত্তিকা, মায়ের বুক ভরে উঠবে না প্রাচুর্য্যের সংবাদে। কাদের এ ক্ষতি? কাদের উপর এ প্রতিশোধ?

মনে পড়ে সনাতনের কথা: আজকের এ সর্ব্বনাশের মূলে সেও আছে। সে কি বোঝেনি—যে আগুন তারা জ্বালাতে চায় কেমন করে তা বাংলার লাখো লাখো শান্ত গৃহাঙ্গণ পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। এই কি জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের উপায়? আমাদের দেশের চাষী—তাদের এক বিঘে জমিতে পনেরটা সরিকের আল দিয়ে ভাগ করা—সেই এক চিলতে জমিতে এতটুকু লাঙেলর ফলা দিয়ে দিনান্ত পরিশ্রম করে যে ফসলটুকু জন্মায়, দু'একজন সাহায্যকারী মুনিষের মাইনে দিয়ে সে কি কোন দিন মজুতদার হ'তে পাবে? না কোথাও কোন ছুতানাতার অজুহাতে তাকে পুঁজিবাদী মনোবৃত্তির জোতদার বলা যেতে পারে? আর সেই নিরপরাধ-অসহায় দিনমজুরের ঈষৎ ভদ্রতর সংস্করণকে সমূলে উচ্ছেদ করাই কি সাম্য-বাদের পরিচয়? এ রাজনীতি দেশনীতি নয়। দেশের সমাজ-জীবনের ক্ষীণতম যোগসূত্রটুকু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেশের মধ্যে ঘরের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বালাইবারই প্রয়াস এবং বৃহত্তর জীবনের অগ্রগতির পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেবারই একমাত্র ষড়্‌যন্ত্র।

আজ সোনা দেশের শত্রু—সমাজের শত্রু। বোবা মর্ম্মে মর্ম্মে এই কথাটাই অনুভব করে।

বৈকুণ্ঠ মুখুজ্জে, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব চন্দ সকলেই মালপোতার বন থেকে সাঁওতাল আনিয়েছেন। টাকাকড়ি দিয়ে ঘর তৈরী করে দিয়েছেন তাঁদের গাঁয়ের বাইরের ডাঙ্গায় বসবাস করবার জন্য। গাঁয়ের মুনিষ মাহিন্দাররা কায করবে না,—তারা দেখতে চায় সহরের বাবুদের

সেই ইংরাজী বইএর কথা কত দূর সত্যি হয়। শেষ দেখবে তারা।

চাষ দেবার সময় পার হয়ে গেল। বৈশাখের প্রারম্ভে শূন্য দিগন্ত ভরে ছেয়ে উঠল কালো মেঘের দীর্ঘশ্বাস। সঘন রাত্রির তীব্র অমানিশার বুক ভেদ করে ঝরে পড়ল মাটির 'পরে শতধারার বৃষ্টির রেখা। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধে সারাটা বুক ভরে ওঠে। ঘুম আসে না।

পায়চারী করে বোবা, আজ সে ঘুমুতে পারে নি। পয়সা নাই, সারা জমিটা সব পড়ে আছে—একবার চাষ দিয়েও আদ্দা ভাঙ্গাবার সামর্থ্য তার নাই। সারগুলো ক্ষেতের পাশে জমা করাই রয়েছে। ছিটোন পর্য্যন্ত হয় নি। ওর জমি কি এমনিই পড়ে থাকবে।

রিক্ততার হাহাকারে ওর বুক কি নিদাঘ-তপ্ত ঊষর দিনের মেলায় চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে। তার বুক ভরিয়ে কি নবাঙ্কুর ধানশিশুর দল দেখা দেবে না?

মুনিষরা কেউ আসবে না। ওরা স্বপ্ন দেখছে নতুন দিনের, যেদিন ওরাই হবে ওই জমির মালিক। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বোবার শুকনো ক্ষেতের চৌকাট কাটলগুলো। ওরা একদিন বুক ভরে এনে দিয়েছে ধরিত্রীর আশীর্ব্বাদ সোনার ধানের মঞ্জরীতে। পূব দিগন্তের দোল খাওয়া বাতাসে বন্দনা জানিয়েছে ফলন্ত ধানের দল আকাশের দেবতাকে। আজ কি তারা হয়ে থাকবে মৌন, মূক। তার মাটির বুকে আসবে না কি নতুন ফসলের ইঙ্গিত—ভরে উঠবে না কি শীর্ণ মুখ সাফল্যের সংবাদে। উদার পৃথিবীর সোনার ধানের ভাগ থেকে সে কি বঞ্চিত হয়ে থাকবে? কি তার অপরাধ?

না আসুক কেউ! সেই পারবে একাই। হ্যাঁ—পারবে ওই মৌন-মূক মাটির বুক ভরিয়ে তুলতে সোনার ধানের অমলিন হাসিতে। দীর্ঘদিন জরভোগের পরও শিথিল হাতের মুঠো দুটো শক্ত হয়ে আসে। পারবে সে এখনও। ক্ষমতা একেবারে হারায় নি।

মাঠের লোক পরদিন অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। বোবা একাই কাযে লেগেছে। পাকী তিন পৌন্ড পোয়া কোদালখানা অবলীলাক্রমে চালিয়ে চলেছে জমা করা সারের গাদাটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে সারা জমিতে। আলের মাথাগুলোতে নতুন মাটি চাপিয়ে পাকি দিতে থাকে। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। মাঠের সাঁওতালগুলোও এসে জুটেছে তার কায করা দেখে। সকলেই অবাক্ আজ ওর ওই জরশীর্ণ দেহে অসুরের মত কার্য্যক্ষমতা দেখে। কেউ বা হেঁকে ওঠে এই ঠাকুর—শুন রে!

বোবা শুনতেই পায় না। কথাও কইতে পারে না। সময় তার নাই।

সূর্য্য মাথায় উঠে গেছে। সারা মাঠের লোকজন আর নাই। তির্য্যক্‌রেখায় ছড়িয়ে পড়ে সূর্য্যের খর রোদ। ঠিকরে পড়ে সদ্যকর্ষিত জমির নরম এঁসো মাটির মাঝে। বুক ভরে টেনে নেয় বোবা মিষ্টি সোঁদা গন্ধ। আর মিষ্টি। মাতাল ক'রে তোলে সারা মন। এরই মাঝে কেটেছে তার জীবনের ছায়া-আলো মাখা দিনগুলো। চোখের সামনে ভেসে ওঠে সোনামুখী মেঘের নীচে সোনালী শিষের স্বপ্ন। থর থর কম্পিত তীব্র রোদ আজ ওর চোখের সামনে কোন্ পরশমণির স্পর্শে সোনা হয়ে গেছে, দু'চোখে তার ধানের নেশা। না আসুক মতিলাল—না আসুক সোনা। কাউকে চায় না। এই মাটির মায়াই তাকে সব ভুলিয়ে রাখবে। সোনা ফসলের জমি দীর্ঘ বিশ বছর তার নির্ব্বান্ধব জীবনের একমাত্র সাথী। এই ওর বন্ধু, ওর সহচর—মনসঙ্গী। কেটেছে কত সুখ-দুঃখের অশ্রু-হাসিমাখা দিন ওদের বুকে।

রোদের তাপে ঝাঁ ঝাঁ করে আসে মাথাটা; একা মাঠে বোবা কেমন যেন হয়ে যায়। মাথাটা ঝিমঝিম করে। দীর্ঘ দিন রোগশয্যার ক্লান্তি যেন তাকে পেয়ে বসে। হাতটা পাষাণ হয়ে গেছে। গলার কাছে জিবটা কেমন যেন আটকে যায়। চোখের সামনে শাদা-কালো অসংখ্য ফুটকি। কেমন যেন সব ঘুলিয়ে যায়, দীর্ঘ ধানের সোনালী শিষগুলো লকলক করছে। ডাক দেয় যেন দু'হাতে তাকে। সরস ধানের ক্ষেতে কিসের মায়া! সোনালী থলো থলো শিষ—সব তারই। তারই বুকের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা। না না। কাউকে সে চায় না। সব যাক, মাটির সোনালী স্বপ্নই তাকে সব দুঃখকষ্ট ভুলিয়ে দেবে। কেমন সব যেন একাকার হয়ে যায়। চোখের সামনে রঙীণ নেশা, আনন্দে চীৎকার করে ওঠে। কণ্ঠস্বর বার হয় না। জিবটা আটকে যায়—চোখ দুটোর সামনে অস্পষ্ট কালো যবনিকা। দু'হাত দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরতে যায় ফলন্ত শিষের গোছা!

মুখ থুবড়ে পড়ে যায় আলের মাথায়। কণ্ঠদেশ থেকে বার হয় অস্পষ্ট গোঙানির আওয়াজ।

বিকাল বেলায় মুনিষরা মাঠে এসে অবাক্ হয়ে যায়, খবরটা ছড়িয়ে পড়ল ক্রমশঃ। সোনা কতদিন বাইরে রয়েছে কেউ জানে না।

আজ বড় বৌএর দু'চোখ বেয়ে বার হয়ে আসে তপ্ত অশ্রু-রেখা। সারা জীবন ধরে সে পরিশ্রম করে গেল,

যাদের জন্ত—যাদের মায়ায়,তারা কেউ দেখল না। বাবার অচেতন দেহটা মলিন কাঁথাখানায় পড়ে রয়েছে।

ধানের পুঁজিটুকুও বিক্রি করে কিছু হ'ল না। একা বিধবা মানুষ কোনদিক সামলাবার পথ পায় না। সোনাও ফেরে নি। সে নাকি কলকাতায় গেছে। কবে ফিরবে কেউ জানেও না। এখন তার নানা কাজ সেখানে।

বড় বৌ বোবার অচেতন দেহটা দেখে অশ্রু রোধ করতে পারে না। মনে হয় এর জন্ত সেই দায়ী। কি দরকার ছিল, নারাণের এমনি করে খাটবার—এমনি করে প্রাণপাত পরিশ্রম করার। জানে না, কোন নেশার ঘোরে সে নিজেকে এমনি করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। সে মৃত্তিকার মোহে, ধরণীর ভালবাসায়।

একটু একটু করে জমিগুলো বৈকুণ্ঠ মুখুজ্জের দখলেই গেল। যাক, ক্ষতি নাই, ও আবার সেরে উঠুক, ভাল হোক। কিছুই চায় না বড় বৌ।

রমণ ডাক্তারের পানে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে চেয়ে থাকে বড় বৌ। বলিষ্ঠ পেশীগুলো বোবার কোন দিকে মিশিয়ে গেছে। চোখের কোনে কাল কালির গভীর দাগ। আর চেনা যায় না তাকে।

দীর্ঘ একমাস পরে বোবা চোখ মেলে যেদিন চাইল পৃথিবীতে, সেদিন তার রূপ বদলে গেছে। আকাশে বর্ষণ-মেঘের ঘনঘটা। কাজল কালো মেঘও কাঁসরের জলরেখার ধারে কেতকীবনশীর্ষে হেলে পড়েছে। নারাণ-বাটির উঁচু পাড় থেকে চেয়ে থাকে বোবা নীচু স্তরপ্রসারী জমিগুলোর দিকে। আজ ওতে তার কোন দাবী নাই। সব বিক্রী হয়ে আবার জমিদারের হাতেই চলে গেছে কায়েমীভাবে।

সারা মনটা হাহাকার করে ওঠে। ও জমিগুলো সব পাখনা দেওয়া হয়ে গেছে। বীজতলার শ্যামল দোহারা ধানগুলো জলো বাতাসে কাঁপতে থাকে। আবার এসেছে সেই বর্ষণমেঘের উদ্দাম লাস্য। সকলেই ব্যস্ত। কাম নাই বোবার। লাঠিখানা ধরে বসে থাকে চুপ করে। দীর্ঘ তিন বিঘে বাকুড়ীখানা, তাও আজ নাই। নতুন ধানের শ্যামল গোছাগুলো তাকে যেন পরিহাস করে।

আগত শীতের প্রারম্ভে আবার আসবে তারই চোখের সামনে তেমনি সোনা ফসলের দিন, থেলো থেলো সোনা ধানের মঞ্জরী তারই চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মুখুজ্জের খামারে। তার আপন বলতে আজ কিছুই নাই।

বর্ষণক্লান্ত আকাশের নীচে বসে সর্ব্বহারা বোবার চোখ দুটো সজল হয়ে আসে; কান্না ঠেলে আসে বুকের ভেতর। আর্ত্তনাদ করে ওঠে শিশুর মত অব্যক্ত ভাষায়।

বোবার আর্ত্তনাদে অনেকেই তার দিকে চায়। গোঙানির মত অব্যক্ত ভাষায় আর্ত্তনাদ বাতাস ভরিয়ে তুলেছে। আবার তারা কাযে মন দেয়, ও তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। বোবা কাঁদে—।

নববর্ষ

শ্রীমতী নমিতা দত্ত

সারাটি বছর ঘুরিয়া আবার
এসেছে রে বৈশাখ;
বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে তোরা
বাজা মঙ্গল শাঁখ।
সহিয়াছে কত দুখের যাতনা,
কত কাঙ্গালের মর্ম্মবেদনা,
সবাকার দুখ লয়ে নিজসাথে
এসেছে আবার আজ,
সব দুঃখ শোক মুছায়ে সবারে
পরাবে নূতন সাজ।

বাংলার বুকে কত নরনারী
কপালে করিয়া খাত,
দিবানিশি শুধু দহিয়া দহিয়া
করিছে অশ্রুপাত।
মুছাইয়ে দিয়ে সে ব্যথার বারি,
আনো আনো ফিরে বঙ্গের শ্রী
হারানো দিনের সেই সুখ-স্মৃতি
রেখো রেখো সাথে সাথ।
হে নববর্ষ, হে চির নবীন
লহ লহ প্রণিপাত॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর *

(১৮১৭-১৯০৫)

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

১৭৭৪-১৮৩৩ পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ের দিব্যালোকে বঙ্গদেশ সমুজ্জ্বল ছিল। তাঁর তিরোভাবসময়ে মহর্ষির বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র। মহর্ষির পিতৃদেব দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং পিতৃবন্ধু হিসাবে রাজা রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকে স্বীয় অমূল্য উপদেশাবলী বিতরণ করেন। অতি বাল্যবয়সে দেবেন্দ্রনাথ একবার কুলপ্রথানুসারে বাৎসরিক পূজানিমন্ত্রণ করতে গিয়ে রামমোহনের প্রশ্নে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। ফলতঃ, রামমোহনের আদর্শেই দেবেন্দ্রনাথ উদ্বুদ্ধ হ'ন এবং তাঁর মতাবলীই নিজের জীবনপটে প্রতিবিম্বিত এবং দেশবাসীর হৃদয়-মুকুরে প্রতিফলিত করেন। এ হিসাবে রামমোহনই দেবেন্দ্রনাথের গুরু, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থ প্রনয়ন ও প্রচার এবং ব্রাহ্মধর্ম-সঙ্ঘ সঙ্ঘটনের দ্বারা রামমোহনের উপদিষ্ট পন্থা অনুসরণপূর্বক তাঁরই আন্তরিক বাসনার পরিপূর্তি সাধন করেন। কর্মবীর রামমোহনের ধর্মপ্রাণতা দেবেন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণার মাধ্যমিকতায় জগতে বিশিষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ধর্মবীর ; ফলতঃ ধর্মকর্মই তাঁর কর্মপঞ্জীতে সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করেছে। তা হলেও জাগতিক কর্মও দেবেন্দ্রনাথ কোনও দিন উপেক্ষা করেন নি। তিনি পারিবারিক ক্রিয়া-কলাপ সুচারুরূপে সম্পাদন করতেন। কাজের শৃঙ্খলার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। যখন তিনি পারিবারিক কোনও কাজে উপস্থিত থাকতে পারতেন না, তখনও তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পাদিত হত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দ্বিজেন্দ্রনাথের কন্যার বিবাহে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে না পারলেও পত্রাদিতে তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, তাতেই তাঁর অসাধারণ কর্মনিপুণতা, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা এবং অশেষ পরিবার-হিতৈষণার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথের স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণকামনা কেবল পরিবারের হিতসাধনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দেশবাসীর কল্যাণ সাধনও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনে প্রাণে স্বদেশী ছিলেন। বঙ্গজননীর ম্লান মুখে হাসি ফোটাবার জন্য তিনি ভগবানের কাছে নিরন্তর কীদৃশ প্রার্থনা জ্ঞাপন করতেন, নিম্নে তার একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করছি —

"হে পরমাত্মন্! আমাদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এই সকল দুর্বল সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই, ইহা নানা ক্লেশ নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত হইতেছে—দিনরাত্রি ইহার ক্রন্দন-ধ্বনি হইতেছে। তুমি এদেশকে উদ্ধার কর। পরমাত্মন্! ধর্মকে প্রেরণ করিয়া ইহার সকল সন্তাপ হরণ কর। তোমার করুণাবারি প্রতি আত্মাতে প্রেরণ কর—পিতামাতার মত তুমি আপনাকে প্রকাশ কর ; আর আমরা সকলে তোমার আরাধনা করি। এমন দিন কবে উপস্থিত হইবে যে, বঙ্গভূমির সকল সন্তানেরা এক আত্মা হইয়া তোমার উপাসনা করিতে থাকিবে। আমাদের ক্ষুদ্র যত্নে ইহার কিছুই সিদ্ধ হয় না। হে সিদ্ধিদাতা! তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।"

ফলতঃ দেশজননীর এই একনিষ্ঠ সেবক প্রকারান্তরে স্বদেশী আন্দোলনের জন্মদাতা। দেশীয় সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মপালন, আচার-অনুষ্ঠান, এমন কি—বেশভূষা পর্যন্ত তাঁর নিত্য-নূতন দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। কোনওদিন দেশজননীর মর্যাদা তিনি ক্ষুণ্ণ করেন নি। একশত, সওয়া শত বৎসর পূর্বে দেশের লোকেরা যখন সাহেবভক্তির সামান্য নিদর্শন প্রদর্শনেও যাদৃশ লাভবান্ হতেন, তা' সুবিদিত ; কিন্তু বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ সেবক দেবেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাপূর্বক ইউরোপীয়দের সঙ্গ পরিহার করতেন। এমনি কি, Miss Mary carpenter-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে তিনি কুষ্টিয়ায় চলে যান। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল Lobb সাহেব তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—This proud old man does not condescend to accept the prais of Europeans," এই উক্তির কারণও তাঁর চরিত্রে সুস্পষ্ট। ভারতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। দেশপ্রীতি ও ভাগবতপ্রীতিই মহর্ষির অপূর্ব কর্মচোদনার মূল উৎস ছিল। তাঁর হৃদয় সেঁচা দেশপ্রীতি ভাগবতপ্রীতিতে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করে, অথবা একটীকে আর একটীর রূপান্তর মাত্র বলা যেতে পারে। এ-মহামানব ভাগবতপ্রেমসাধনেই দেশপ্রেমের, ফলতঃ, মানবপ্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গেছেন, সন্দেহ নাই। ভারতের বহু বড় বড় মনীষী উত্তর জীবনে স্বকীয় পূর্বকৃত অযথা সময়ক্ষেপের নিমিত্ত আক্ষেপ করে গিয়েছেন ; বিদ্যাপতি বলেছেন,—

"আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন্ বেলা"।

মহাকবি ভর্তৃহরি সত্যই বলেছেন—

আয়ুর্বর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্ধং গতং
তস্যার্ধস্য পরস্য চার্ধমপরং বালত্ববৃদ্ধত্বয়োঃ।
শেষং ব্যাধিবিয়োগদুঃখসহিতং সেবাদিভির্নীয়তে
জীবে বারিতরঙ্গবুদ্বুদসমে সৌখ্যং কুতঃ প্রাণিনাম্।

কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কবির এ সত্যভণিতিকেও যেন মিথ্যা

* ১৩৫৩ সালের ৬ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী, ১৯৪৭) ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরে মহর্ষির মৃত্যু-শতবার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

প্রমাণিত করে দিয়েছেন। তিনি ধ্যানধারণায় অতন্দ্রিত ছিলেন; তাঁর বালত্ব ও বৃদ্ধত্ব উভয়ই যেন সমভাবে ধর্মপর ছিল। রাজ-সেবাদিতেও বৃথা সময়ক্ষেপ তিনি করেন নি। অসীম সমুদ্র ছিলেন তিনি জ্ঞানে, গাম্ভীর্যে ও অনুকম্পায়; তাঁর জীবন সর্ব্বথা বুদ্‌বুদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাঁর জীবনসমুদ্রের ঊর্মিমালা দিগ্‌দিগন্ত বিকম্পিত করত। তাঁর জীবন ছিল ঊর্মি-পরিবৃত; "বুদ্‌বুদসম" ছিল না কখনও। সুদীর্ঘ অষ্টাশী বৎসরের বহুলাংশ তিনি ভাগবতপ্রীতি সাধনেই ব্যাপৃত ছিলেন, অবশিষ্টাংশ মানব-হিত সাধন করেছেন নিরন্তর। জীবনের এক অনুপল বিপলও তিনি বৃথা ক্ষেপণ করেন নি।

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম পরিগ্রহ করলেও মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ বৈদিক সাধনার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন, ঔপনিষদীয় সত্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। অতি বাল্যকাল থেকেই তিনি উপনিষদের সত্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং তদনুরূপ আদর্শেই জীবন গড়ে তুলেছিলেন। উপনিষদের বাণী তাঁর মন প্রাণ, জীবন দিব্যা-নন্দে ভরপুর করে রেখেছিল। ধ্যান-সমাহিত হয়ে যে যে সত্যের তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তার সুস্পষ্ট রূপ তিনি উপনিষদের বাণীতে দেখতে পান। তাই উপনিষদের বাণীতেই, উপনিষদের ভাষাতেই তিনি যোগজ ও ভাগবত জ্ঞান জগদ্বাসীকে বিতরণ করে গেছেন। তাঁর আত্মজীবনী (পৃঃ ১৭৬) থেকে দেখতে পাই যে ১৮৪৮ সালে অর্থাৎ মাত্র ৩১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ঔপনিষদিক সত্যের যাথার্থ্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেন এবং তিন ঘণ্টার মধ্যেই তিনি "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থের সমগ্র উপনিষদংশ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করেন। ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি তাৎপর্যা-দির দ্বারা গ্রন্থের উপযোগিতা বৃদ্ধি করেন। কাজেই ইহা সুস্পষ্ট যে, ১৩ বৎসর কাল তিনি এ কঠোর কার্যে পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। কি অসাধারণ নিষ্ঠা, ভাগবতকরুণা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এর পশ্চাতে ছিল—তা' সহজেই অনুমেয়।

শঙ্করমতে ঈশ্বর ও জীব এবং উপাস্য ও উপাসক এক, তাই প্রথম জীবনে মায়াবাদ দেবেন্দ্রনাথের মোটেই মনঃপূত হয় নি। আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ তাঁর উত্তর জীবনের মত কথঞ্চিৎ শঙ্কর-ঘেঁসা হলেও তাঁর মতবাদ মায়াবাদ থেকে পৃথক্; বিশেষতঃ মায়া-বাদের "একমেবাদ্বিতং" বাদই তিনি প্রচার করে গেছেন। তা হ'লেও "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্" এ-বীজমন্ত্রে অন্তর্নিহিত পরমাত্মা ও জীবাত্মার উপাস্য-উপাসকভাবও তিনি কোনও দিন ভুলতে পারেন নি। অথচ তিনি সম্পূর্ণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীও নন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তজ্জন্য তৎপ্রচারিত ধর্মমত সম্পূর্ণ উপনিষমূলক নয়। অবশ্য ইহা সত্য যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বিশাল মহাসমুদ্র। এ মহা-সমুদ্রে এমন লুক্কায়িত বহু বহু রত্ন রয়েছে, যা পাশ্চাত্ত্য মনীষিবৃন্দের এখনও দর্শনপথে আসে নি; অন্যদিকে, তাঁদের দর্শনপথে এমন অত্যাশ্চর্য সত্য প্রকটিত হয়েছে, তা' এতে পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের সত্যোৎপত্তি সন্ধানের নিমিত্ত আমাদের পরমুখাপেক্ষী হওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই। এ সব অসাধারণ বাক্যাবলী মহর্ষির কাছে ধ্যানবলে প্রতিভাত হতো, যার বীজ, অঙ্কুর বা ফলোদ্গম বা তৎসমুদয় আমাদের ভা[illegible] ভূমিতে উপ্ত, বর্দ্ধিত বা পরিণত অথবা আজন্ম পরিপুষ্ট হয়ে[illegible] এ হিসাবে মহর্ষিকে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের কাছেই প্রায় সম্[illegible] ঋণী বলা যেতে পারে। ইহা বলা বাহুল্য যে, তিনি উপনিষ[illegible] গ্রন্থনিচয়ের কাছেই সমধিক ঋণী এবং তৎপ্রচারিত সত্য বৈদিক সত্য। মহর্ষি অবতারবাদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শনবাদ মাত্রেই অবতারবাদের সমর্থন করে না। অন্যদিকে কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ পরস্পর সুসংশ্লিষ্ট বটে, এবং মহর্ষি জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, এমনও মনে হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইহা কর্ত্তব্য যে, অনেক বড় বড় মীমাংসকেরাও কর্ম্মবাদ থেকে জন্মবাদের পরিণতি স্বীকার করেন না। ভর্তৃমিত্র প্রভৃতি মীমাংকেরা বলেছেন কর্মবাদ থেকে জন্মবাদের যাথার্থ্যের কোনও মীমাংসা হয় না। মহর্ষি গুরুবাদেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু ভারতীয় ধর্মমাত্রেই গুরুবাদের অপেক্ষা রাখে না। "গুরোঃ গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ" প্রভৃতি বাক্যের থেকে শিক্ষানিমিত্তক গুরু-স্বীকার, ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার্য। সুতরাং ভারতীয় দর্শন ও ধর্মমত মহর্ষির যোগজ ও ধর্ম ও দর্শনের সম্পূর্ণ অনুকূল। কালক্রমে যে মহাসত্যের প্রতি ভারতীয়দের অনাস্থা আধ্যাত্মিক জীবনে প্রকটিত হচ্ছিল, রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় অপূর্ব্ব কর্ম ও ধর্ম সাধনবলে তা দূরীভূত করেন; ভাগবত কৃপায় যে ভারতীয় মহাসত্য অতীতের বুকে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করে সমস্ত জগৎ থেকে অন্ধকার বিদূরিত করেছিল, খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে অসীম ভাগবত কৃপায় এই দুই মহাত্মার অপূর্ব্ব সাধনবলে সেই মহাসত্য দেশবাসীর পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বৈদিক ঋষি; বশিষ্ঠ বিশ্বমিত্র প্রভৃতিরই মত মহর্ষি জ্ঞানোদ্দীপ্ত ভাগবতসুধাপায়ী যুগযুগান্ত-সংযোজনকারী যুগপ্রবর্ত্তক ঊনবিংশ শতাব্দীর ধন্যতম মহর্ষি।

উপনিষদে পাই—"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।" বহিঃ ও অন্তঃশত্রু দমনে এবং ভাগবত মিলনে তৃপ্ত মহর্ষি তিতিক্ষু ও ধ্যান-সমাহিত হয়েই স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে ভগবান্ দেখেছিলেন; তাঁর প্রত্যেকটী "ব্যাখ্যান" নিঃসন্দেহে এ মহাসত্য প্রমাণিত করে।

মহর্ষির ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনাকালে তাঁর অগণিত লোকোত্তর গুণাবলী স্বতঃই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। স্বল্প সময়ে বহুল বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব; মহর্ষির আত্মসংযম বিষয়ে একটি মাত্র উদাহরণ দিই। মহর্ষির সহধর্মিণী শারদা দেবী যেন মহর্ষির সন্দর্শন-লালসায় কোনও মতে এতদিন দেহে প্রাণ রক্ষা ক[illegible] ছিলেন। মহর্ষি যেদিন সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাগত হন, তার [illegible] দিনই শারদা দেবী মৃত্যুর ক্রোড়দেশ আলিঙ্গন করেন। মহ[illegible] সতীসাধ্বী উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কোপম সন্ততির পুণ্যশ্লোকা জন[illegible] পরিণত স্নেহসারের আধার সহধর্মিণী চিরতরে ইহলোক পরিত্য[illegible] করে গেলেন তাঁর চোখের সামনেই। ধ্যানসমাহিত মহর্ষি কেবল এ কয়টী কথা উচ্চারণ করলেন, "তোমায় পাঁচ বৎসর বয়সে এনেছিলাম, আজ ছেড়ে দিলাম।" এত বড় প্রচণ্ড শোকেও তাঁর

থেকে আর কোনও বাক্য নিঃসৃত হলো না। কি অপূর্ব্ব ...ম।

মহর্ষির আর এক মহাগুণ—আত্মগোপনপ্রচেষ্টা। এতবড় মহাগ্রন্থ "ব্রাহ্মধর্ম" বিরচনের পর তিনি তার রচনার নিমিত্ত কোনও কৃতিত্বের দাবী জগদ্বাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করলেন না। ...যোপজ্ঞ সত্য উপনিষদের গুহাদেশ থেকে মন্দাকিনীধারায় পৃথিবীতে সঞ্চারিত হলো যাঁর হৃদয়দেশ আশ্রয় করে, তাঁর এবিষয়ে চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। আরও দেখুন—পাছে ভাস্করোপম পুত্র রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে পিতৃভস্ম নিয়ে গিয়ে এইস্থানকে দেবেন্দ্রতীর্থে পরিগণিত করেন, মহর্ষি পূর্ব থেকেই পুত্রকে তদ্বিষয়ে সাবধান করে দিলেন। "আত্মজীবনী" রচনা করে তিনি যখন প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে তার মুদ্রণের ভার অর্পণ করেন, তখন তিনি বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছিলেন যেন তাঁর জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ মুদ্রিত বা প্রচারিত না হয়। কি অপূর্ব আত্মগোপনপ্রচেষ্টা। ধন্য মহর্ষি। তোমার জন্মপরিপূত দেশে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি।

আর একটি বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপের আজ প্রয়োজন। মহর্ষি যেমন আমাদের সভ্যতা, ধ্যান-ধারণা সব কিছু স্বকীয় প্রেরণা ও সাধনাবলে সমুন্নত, সুসমৃদ্ধ করে গেছেন, আমাদের ভাষা-জননীকেও তিনি অভিনব অপরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত করে গেছেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতারা মহর্ষির প্রতি সমীচীন বিচার করেন নি। মহর্ষি বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উৎকৃষ্ট রচনারীতির একাধারে প্রবর্ত্তক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। ইহা সুবিদিত যে তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি তৎকালীন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদেরও বাংলা পরিমার্জ্জিত করে দিতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্ববিদ্যা-গ্রন্থও তিনি সংশোধন করে দেন। স্বকীয় রচনা-পদ্ধতিতে মহর্ষি "শবপোড়া মড়াদাহ দলের" অগ্রদূত ছিলেন। তিনি অক্ষয়চন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও ট্যাকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ এই বিরুদ্ধদলের সংযোজকস্থল ছিলেন। তাঁর (১) আত্ম-তত্ত্ববিদ্যা, (২) ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস; (৩) ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান; (৪) জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি; বিশেষতঃ (৫) আত্মজীবনী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মহর্ষির ভাষার ভিতরে বঙ্গদেশের সনাতনী গুণ অনুপ্রাসের দোলানির গুণ অব্যাহত আছে; তা কোনও জায়গায় অন্তর্নিহিত, আর কোনও জায়গায় সুপ্রকট। দু'হাজার বছর ধরে বঙ্গদেশ এগুণে সমগ্র জগতের সম্মান অর্জন করে এসেছে। কবি-সম্রাট রাজশেখর "গৌড়াদ্যাঃ সংস্কৃতস্থাঃ পরিচিতরুচয়ঃ" এ বাণী যে যে কারণে করেছিলেন, তন্মধ্যে অনুপ্রাসের স্থান ন্যূন ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে এ গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে জয়দেবের "গীতগোবিন্দে", জয়দেব বাঙ্গালী। মহর্ষির রচনায় দেখতে পাই—"যেমন আমার উপরে তাঁহার চক্ষু সেইরূপ সর্বত্রই তাঁহার চক্ষু, সর্বত্রই তাঁহার হস্ত,—বৃক্ষের পত্রে, পক্ষীর পতত্রে; সমুদ্রের গাম্ভীর্যে, পর্বতের উচ্চতায়।" এ লেখার মধ্যে—জয়দেবের "পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে"র যে ধ্বনি রয়েছে ইহা অবশ্য স্বীকার্য। এবং অদ্যকার বঙ্গভাষা-উন্নয়নের দিনে ইহা অতি অবশ্য স্বীকার্য যে ক্রম-অভিব্যক্তি (Evolution), আপেক্ষিক সত্য (relative truth) প্রভৃতি বাংলা পরিভাষার স্রষ্টা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

মহর্ষির চরিত্রের সুরমার খোঁজ আরো ব্যাপক ভাবে আমরা পাই তাঁর বন্ধুপ্রীতিতে। ইহা সুবিদিত যে, তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মবিষয়ক মতদ্বৈধ ঘটে। তথাপি কেশবচন্দ্রের প্রতি তিনি কোনও রোষকষায়িত কটাক্ষপাত করেন নি, বা তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাব তিলমাত্র পোষণ করেন নি। বরং তিনি বলেছেন—"যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা"। মহর্ষির উত্তর জীবনের শ্রেষ্ঠ সখ্যসম্পদ ছিলেন রায়পুরের শ্রীকণ্ঠ সিংহ, যাঁকে তিনি শান্তিনিকেতনের বুলবুল বলতেন।

উপসংহার

মহর্ষির জীবন অন্তর্গূঢ়; সাধকের জীবন জগতের বহিরালোকে সহজে ধরা পড়ে না। তবে ইহা সর্বজনস্বীকার্য যে, মহর্ষির ধ্যানের পূতধারা আমাদের দেশ বিপ্লাবিত করেছে এবং তৎপ্রভাবে দিকে-দিকে নব জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে। তাঁর তপস্যার প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি স্বনামখ্যাত নেতৃবৃন্দ দেশের পরমকল্যাণ সাধনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কি সমাজে, কি পরিবারে; মহর্ষি সর্বত্রই স্বকীয় অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মহর্ষির বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি পুত্রকন্যাগণ তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাবে ঈদৃশ বরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষা-দীক্ষা, বেশ-ভূষা, আচার ব্যবহার সর্ববিষয়েই বর্তমান বঙ্গদেশ দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের অনুবর্তী, ফলতঃ, তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ঋণী। বর্তমান বঙ্গদেশ তাঁর আদর্শে গড়া। অদ্যকার স্মৃতি-বাসরে আমরা বারংবার এ চিরস্মরণীয় মহাত্মা ও তাঁর পার্ষদবৃন্দের চরণে অর্ঘ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

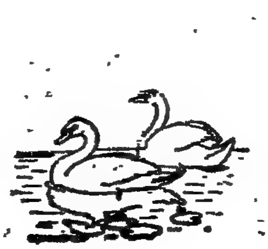

দুর্বোধ্য

শ্রীবীরেন রায়

মুক্তোকেশী শশীবাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় পেয়ে গেল। মুক্তোর দুর্দশার কাহিনী শশীবাবুর স্ত্রীকে বিচলিত না করলেও বর্ত্তমান ঝি-সমস্যার হাত থেকে অতি সহজে নিষ্কৃতি পাওয়ার আগ্রহে মুক্তোকে আশ্রয় দিতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করলেন না। উপরন্তু স্বামীর অহেতুক উৎপীড়নের প্রতিবাদে ঘর ছেড়ে চলে আসার উৎসাহিতই করলেন মুক্তোকে।

'ভালই করেছিস মুক্তো। মুখ বুঁজে সহ্য করলে ওরা আরও বেড়ে যায়। তোর কোন চিন্তা নেই—আমার এখানে থাকলে তোর কোন অসুবিধা হবে না। আমরা দু'টি মাত্র প্রাণী, তুই আমাদের আপনার লোকের মত থাকবি।' কথায় সহানুভূতির সুর পেয়ে মুক্তোও সবিস্তারে বর্ণনা ক'রতে থাকে তার দুঃখের কাহিনী।

'অর জন্ম কি আমি কম কষ্ট সহ্য করছি মা। অসুখ কইরা যখন বাড়ীতে পইরা রইল, তখন আমি ঝি গিরি কইরা, লোকের বাড়ী গতর খাটাইয়া অরে খাওয়াইছি। নিজে না খাইয়া অর জন্য ফল কিনা আনছি। আর আইজ ও আমার ঘাড়ে ধইরা বাড়ীর থিকা বাইর কইরা দেয়।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল মুক্তো। কোটরাগত চোখ ছাপিয়ে কয়েক ফোঁটা জল তার শীর্ণ গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে।

'কাঁদিস নি মুক্তো, কাঁদলে কি হ'বে বল।'

'কান্দি কি সাধে মা। বড় দুঃখে কান্দি, আইজ চাইর মাস ধইরা একটা পয়সা রোজগার করে না। খালি বইসা বইসা খায়, আর কথায় কথায় আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, আবার কিছু কইতে গেলে রাইগা ওঠে, কয়—তোরে যে এতকাল আমি খাওয়াইছি, সেইটা বুঝি কিছু না?'

'স্বামী স্ত্রীকে খাওয়াবে না তো খাওয়াবে কি বাইরের লোকে?' বিস্ময় প্রকাশ করেন শশীবাবুর স্ত্রী।

'সেই কথা বোঝলে তো। বেশী কিছু কইতে গেলে চুল ধইরা মাইর দিয়া দিল, আমি মুখ বুইজা সব সহ্য করি মা। ভর্ত্তির রোগে ভুইগা ভুইগা লোকটার মাথায় ঠিক নাই। কয়দিন জিরাইলেই আবার ভাল হইয়া যাইবে,' মুক্তোর গলার স্বরে কেমন যেন দরদের আভাষ পাওয়া যায়।

'তোর স্বামী কিছু নেশা টেশা করে নাকি রে?' ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন শশীবাবুর স্ত্রী।

হঠাৎ এই প্রশ্নে কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ে মুক্তো। সলজ্জ ভঙ্গীতে আঁচল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে উত্তর দেয়—নেশা একটু আধটু করে, তবে একেবারে নেশাখোর কওয়া যায় না মা। অনেকে যে একেবারে মদ ভাঙ্গ খাইয়া হৈ চৈ করে; এই তো আমাগ পাড়ার মল্লিকা, সোহাগী, অগো সোয়ামীরা তো প্রত্যেক রাত্তিরেই চেচামেচি কইরা একটা কাণ্ড বাধায়। সেইয়ার ধার দিয়াও যায় না। যা একটু করে মাঝে মাঝে সে ঐ শুকনা নেশা।'

শুকনা নেশার তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে শশীবাবুর স্ত্রী একটু ঠাট্টার সুরে বলেন—'শুকনো নেশা? সে আবার কি বস্তু রে?

তাঁর কথার ভঙ্গীতে আহত হয় মুক্তো। স্বামী তার এত ফেলনা নয় যে, তাকে নিয়ে যে কেউ ঠাট্টা-তামাসা করবে। হলই বা সে একটু নেশাখোর। কিন্তু অনেকের স্বামীর চাইতে সে শতগুণে ভাল। উত্তর দেবার সময় স্বামীকে সমর্থন করবার একটু চেষ্টাও করে মুক্তো, বলে—বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পইড়া মাঝে মাঝে একটু গাঞ্জা খায় মা। তাও দেইখা বোঝবার উপায় নাই।'

মুক্তোর স্বামী শুকনো নেশাই করুক আর ভিজে নেশাই করুক তাতে শশীবাবুর স্ত্রীর কিছু এসে যায় না। তাঁর সম্পর্ক মুক্তোকে নিয়ে। তাকে আশ্রয় দিয়ে যেমন একদিকে ঝি-সমস্যার সমাধান হয়, তেমনি একজন দুস্থকে সাহায্যদানের পুণ্যও সঞ্চয় করা চলে। তাই কথার আর জের না টেনে মুক্তোকে নিয়ে তার কাজকর্ম্ম দেখিয়ে দেন।

মুক্তো কিন্তু শশীবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় পেয়ে খুব খুসী। এইবার নেমকহারাম বেটা খুব জব্দ হবে। এতদিন ভাবত দিনভোর যেখানেই কাজকর্ম্ম করুক রাত্রে ওর বাড়ীতে আসতেই হবে। এখন বুঝতে পারবে ঐ ভাঙা খোলার ঘর ছাড়াও তার থাকবার জায়গা আছে। আর কেই বা আদর করে সকাল-সন্ধ্যা ভাত বেড়ে দেয় দেখা যাবে। এসে পায়ে ধরে কেঁদে পড়লেও মুক্তো যাবে না। মুক্তো কাজ করতে করতে এইসব ভেবে স্বামীকে জব্দ করবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে।

এতদিন মুক্তো নির্বিবাদে স্বামীর সমস্ত উপদ্রব সহ্য করেছে। আঘাত পেয়ে প্রত্যাঘাতের কল্পনাও কোনদিন করে নি। কত দিন মার খেয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে। গায়ের ব্যথায় সারা রাত জেগে কাটিয়েছে তবুও স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে 'উঃ আঃ' শব্দ পর্য্যন্ত করতে সাহস পাইনি। মুক্তোর জীবনে আজকের ঘটনা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অভূতপূর্ব্ব।

পরাণ যখন নেশার পয়সা না পাওয়ায় মুক্তোকে মেরে বাড়ীর বার করে দিয়েছিল তখন কোথায় যাবে কিছু ঠিক না করেই মুক্তো সহরের জনসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছিল। রাগে, দুঃখে চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল মুক্তোর। অসহায়ের মত ঘুরতে ঘুরতে তার হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল শশীবাবুর কথা। অনেক দিন আগে তখনও মুক্তোর বিয়ে হয়নি, একবার পিসীমার সঙ্গে গঙ্গাস্নান ক'রতে এসে উঠেছিল শশীবাবুদের বাড়ীতে। রাস্তাটার নামটা মনে ছিল, কিন্তু ঠিকানাটা ভুলে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে বাড়ীটা খুঁজে বের করেছে। শশীবাবুর স্ত্রীর কাছে নিজেকে পরিচিত ক'রতেও কম বেগ পেতে হয়নি মুক্তোর।

শশীবাবু কাছারি থেকে ফিরে এসে পরিচয় নিয়ে জানলেন ও তাঁদেরই গ্রামের মেয়ে, আর ওর ঊর্দ্ধতন পুরুষরা নাকি শশীবাবুদের কৃপায়ই মানুষ। সুতরাং ওরও বংশগত দাবী রয়ে গেছে শশীবাবুর কৃপার উপর। শশীবাবুও তা অস্বীকার ক'রতে চান না, বরং মনে মনে খুসী হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে, তাঁর পূর্ব্বপুরুষের দারিদ্র্য পালনের সামর্থ্য তাঁরও আছে।

মুক্তো শশীবাবুর আশ্বাস পেয়ে আর একবার সজল নেত্রে তার দুঃখের কাহিনী আদ্যোপান্ত শোনাবার উপক্রম করে।

সারাদিন মক্কেলের পক্ষে সত্যমিথ্যা বকে বকে শশীবাবুর আর ধৈর্য্য থাকে না মুক্তোর ইতিহাস শোনবার, তাই মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন—'তোর ঘাবড়াবার কিছু নেই। যতদিন তোর স্বামী তার ভুল বুঝতে পেরে তোকে ফিরিয়ে নিয়ে না-যায়, ততদিন তুই আমার এইখানেই থাকবি।'

—'ইস্, নিয়া যাবে? নিতে আইলেই আমি গ্যালাম কি না।' এক কথায় নাকচ করে দিতে চায় শশীবাবুর প্রত্যাশাকে।

'সে কি রে? তোর স্বামী নিতে এলে তুই যাবি না?'

'যামু না আরো কিছু! এতদিন লাথি ঝাটা দিছে, এইবার বুঝুক ঠ্যালা। আবার আদর কইরা কয় মুক্তার রান্ধা ছাড়া গলায় রোচে না। দেখা যাবে কোন মুক্তা এখন মুক্তা রাইন্ধা দেয়।'

'কিন্তু তোর স্বামী যদি পুলিশ নিয়ে এসে তোকে জোর ক'রে নিয়ে যায়?'—শশীবাবু উকিল মানুষ, তাঁর মনে আইন আদালতের প্রশ্ন উঁকি মারে।

গ্রাম্য অশিক্ষিতা মুক্তো কিন্তু অতশত বোঝে না। সে সহজ সমাধান করে ফেলে বলে—'আপনে আমার ধর্ম্মবাপ। বাপের কাছের থিকা কি পুলিশে মাইয়া কাইড়া নিতে পারে?'

শশীবাবু মুক্তোর জবাব শুনে হেসে ফেলেন। 'আচ্ছা আচ্ছা, পুলিশ এলে তুই তাই বলিস?'

মুক্তো হঠাৎ শশীবাবুকে গড় হয়ে প্রণাম করে ঘর থেকে চলে যায়। শশীবাবু এই বিনা কারণে ভক্তির আতিশয্যের কোন অর্থ বুঝতে পারেন না।

শশীবাবুর বাড়ীতে মুক্তো আজকাল আধিপত্য বিস্তার করেছে যথেষ্ট। শশীবাবুর স্ত্রী ওকে হুকুম করবে কি মুক্তোই তাঁকে কাজের নির্দ্দেশ দেয়। শশীবাবুর স্ত্রী তাতে অসন্তুষ্ট হ'ন না। তাঁর নিঃসন্তান জীবনের কোথায় যেন অলক্ষিতে মুক্তো এসে যায়গা করে নিয়েছে।

মুক্তো কাজ করে অবিশ্রান্ত, আর কথা বলে অনর্গল। তার বেশীর ভাগই ওর স্বামীর কথা। সে কি কি খেতে ভালবাসে, কবে কোন কথা বলেছিল, কবে তার অসুখ করেছিল। কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে ওকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিল তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ। হঠাৎ কোমল নিখাদ থেকে সপ্তমে চড়ে যায় গলা। শাপান্ত করতে থাকে তার স্বামীকে।

পাড়ার সবাই মুক্তোকে চেনে আর না দেখলেও ওর স্বামীর জীবনযাত্রার নিখুঁত চিত্র তাদের জানা। এত জেনেও কিন্তু তারা তার নাম জানতে পারেনি। পাশের বাড়ীর গিন্নি একদিন মুক্তোকে স্বামীর নাম জিজ্ঞেস ক'রতেই মুক্তো জিব কেটে উত্তর দিয়েছিল—'ও-মা, কি ঘেন্না! সোয়ামীর নাম কি নিতে আছে। তাতে যে তার অকল্যাণ হয়।'

ইদানীং মুক্তো কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেছে। আজকাল কথাবার্ত্তাও বলে কম, সাংসারিক কাজেও তেমন আর উৎসাহ পায় না। সময় পেলেই সদর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। চুপচাপ বসে বসে কি ভাবে ওই জানে। সেই প্রগল্‌ভতা আর নেই, এখন মুক্তোকে দেখলে মনে হয় শান্ত, স্তব্ধ।

একদিন কিন্তু মুক্তোর এই ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। শশীবাবু বারান্দায় বসে তেল মাখছিলেন। মুক্তো বাজার থেকে ফিরেই একগাল হেসে শশীবাবুকে বললে—'বাবা, আপনার জামাই আইছে।'

শশীবাবু হাঁ করে মুক্তোর দিকে তাকিয়ে থাকেন। স্মৃতিসাগর মন্থন করেও জামাইরূপ কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব খুঁজে না পেয়ে শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে অর্দ্ধস্বগত উক্তি—'জামাই'!

'বাবার যেন কি! নিজের মাইয়ার জামাই আইছে তা...'

শশীবাবু এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। তিনি এতটা তলিয়ে দেখেন নি! পাতান সম্পর্কের সূত্র ধরে যে কোনদিন জামাইও এসে আত্মীয়তার দাবী করতে পারে তা এতদিন ভেবে দেখেন নি শশীবাবু। তাই তাড়াতাড়ি মুক্তোর কথা শেষ না হ'তেই বলে ফেলেন—'ও-তোর স্বামী, তাই বল, তা কোথায় রে?'

'কি জানি কোথায়। দেখা হইছিল আমার সঙ্গে বাজারের পথে। পাছে পাছে আইতেছিল। আমি কইয়া দিছি, যামু না।'

'না বাবু 'যামু না' কয় নাই। আপনার কাছে কইয়া নিয়া যাইতে কইছে।' স্বয়ং জামাইয়ের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। লম্বা ছিপছিপে, রোগা-পটকা চেহারা। সদর দরজার কাছে বিনয়ে ঈষৎ বক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শশীবাবু এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মুক্তোর দিকে তাকিয়ে দেখেন সে ইত্যবসরে ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়িয়েছে। অগত্যা জামাইকে নিজেই ডেকে দাওয়ার উপর বসান।

'তোমার বউকে নিতে এসেছো? তা বেশ, নিয়ে যাও। আর ঝগড়াঝাঁটি ক'র না বুঝলে।'

'আজ্ঞা না, ঝগড়া করুম ক্যান। রাগের মাথায় সেইদিন একটা ভুল হইয়া গেছিল। সংসারে অভাব থাকলে কি মাথার ঠিক থাকে বাবু।' মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে।

'ওকে নিয়ে গেলে অভাব তো তোমার আরো বেড়ে যাবে। তুমি চাকরি বাকরি কিছুই কর না।'

'না বাবু, চাকরি একটা যোগাড় করছি।' ও রাগ কইরা চইলা আইল পর মনডা বড় খারাপ লাগতে লাগল। ভাবলাম কামডা ভাল হইল না। রাগ হইল নিজেরই ওপর। রোজগার পাতি নাই বইলা সে না এই অবস্থা। তাই আগে একটা চাকরি যোগাড় কইরা তারপর অরে খোঁজতে বাইর হইছি।

শশীবাবুর কাছারির বেলা হয়ে যায় দেখে স্ত্রীকে ডেকে বলে দিলেন যে, মুক্তোর স্বামী ওকে নিতে এসেছে। ওরা যেন খেয়ে দেয়ে যায়। তারপর মুক্তোকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেই মুক্তো সলজ্জ ভঙ্গিতে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা বলে না।

মুক্তোকে নিরুত্তর দেখে পরাণ অধৈর্য্য হয়ে বলে ওঠে—'আপনে অরে একটু কইয়া দেন বাবু। আপনে না কইলে ও যাবে না।'

ঘোমটার ভেতর থেকেই মুক্তো উত্তর দেয়—ক্যান, যাববার

সময় মনে ছিল না।' কণ্ঠে রাগের চাইতে অভিমানের সুরই বেশী।

'আমি বুঝি তোরে দিন ভইরা খালি মারিই। আমার মাইরডাই তুই দেখলি।' পরাণ কাঁদ-কাঁদ হয়ে যায়।

মুক্তো তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে—'আমি কি তাই কইলাম না কি? তুমি খামাখা-মন খারাপ কর ক্যান।

অবশেষে মুক্তোর যাওয়াই ঠিক হ'ল। যাবার সময় শশীবাবুর স্ত্রী জোর করে ওর আঁচলে একখানা দশ টাকার নোট বেঁধে দিয়েছেন। মুক্তো কেঁদেছে খুব, দেখলে মনে হয় মেয়ে এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী চ'লল, শশীবাবুর স্ত্রীও আঁচল দিয়ে চোখ না মুছে পারেন নি।

মুক্তোর-যাবার পর অনেক দিন হয়ে গেছে। কিছুদিন আগে মুক্তো একদিন বেড়াতে এসেছিল একখানা ডোরাকাটা শাড়ী পরে। তার স্বামী কিনে দিয়েছিল।

মুক্তোর কথা একরকম ভুলতেই বসেছিল সবাই। হঠাৎ একদিন তাদের সচকিত করে আবির্ভাব হ'ল মুক্তোর। এখান থেকে যাবার-সময় ছিল নম্র, লাজুক নববধূর বেশ, আর এল রুক্ষকেশ, রক্তাক্ত বাসে। কাণের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ে কাপড় লাল হয়ে গেছে। শশীবাবুর স্ত্রী ওকে এই অবস্থায় দেখে চমকে উঠলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে গিয়ে অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন।

কথা বলে প্রথম মুক্তোই। দাওয়ার উপর বসে হাঁপাতে হাঁপাতে-যা বললে তার মর্মকথা হচ্ছে এই:—এতদিন তারা স্বামী স্ত্রীতে সুখে, সচ্ছন্দেই ঘরকন্না করছিল। ঝগড়াঝাটি একরকম হ'ত-না বললেই চলে। কিন্তু কয়েকদিন হ'ল কোন এক জুয়ার আড্ডায় নাকি তার স্বামী যাতায়াত আরম্ভ করেছে। সেই কথা নিয়েই ঝগড়ার সূত্রপাত-এবং রাগ সামলাতে না পেরে মুক্তোর স্বামী তাকে মেরে বসেছে চেলাকাঠের-এক ঘা। শুধু তাই নয়, আবার এও নাকি বলেছে:—তোর এখানে যায়গা হবে না, যা তোর সেই বাবার কাছে।

মুক্তো শশীবাবুর স্ত্রীর পা জড়িয়ে ধরে বলেছে—'মা তোমরা আমারে আর যাইতে দিও না মা। আমি আবার ঐ গুণ্ডার কাছে গেলে আমারে একেবারে মাইরা ফেলাবে।'

শশীবাবু ব্যাপারটা শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। অন্য কারো ব্যাপার হ'লে হয় ত এই ঝামেলা ঘাড়ে নিতেন না; কিন্তু মুক্তোর প্রতি কেমন যেন একটুকু দুর্বলতা অনুভব করেন শশীবাবু, পাতান সম্পর্কের ভেতর দিয়েই তাঁর পিতৃস্নেহ সাড়া দিয়ে ওঠে। নিজের হোমিওপ্যাথিক বাক্স খুলে এক ডোজ আর্নিকা খাইয়ে দেন মুক্তোকে।

পরের দিন মুক্তোর জ্বর আসে। শশীবাবুর স্ত্রী সযত্নে মাথা-ধুইয়ে দেন। বার্লি খাইয়ে শিয়রে বসে পাখার বাতাস করেন।

বিকেলে মুক্তোর ঘুম ভাঙতেই শোনে বাইরে কিসের গণ্ডগোল, সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় সদর দরজার দিকে। গিয়ে দেখে তার স্বামীকে ঘিরে অনেক লোক। কাছারির পোষাকেই শশীবাবু কিছু দূরে দাঁড়িয়ে। পরাণ শশীবাবুর দিকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলছে—'আমি দেইখা নিমু কেমন কইরা আমার বিয়া করা বউ আটকাইয়া রাখে, মগের মুল্লুক পাইয়া বইছে না। আমি আদালত করুম, ওরে আমি জেল খাটামু।

শশীবাবু পরাণকে ধমক দিয়ে বললেন—'মোকর্দমা ক'রতে হয় কোর্টে যাও, এখানে কি? এখানে ঝামেলা করলে ঘাড় ধরে পাড়ার বের করে দেব।'

পরাণ—দমবার পাত্র নয়। কণ্ঠ উচ্চতর করে জবাব দেয়—'ঘাড়ে ধরা অত সোজা কিনা। দেহ না ঘাড়ে ধইরা কেমুন লাগে।' মুক্তোর দিকে দৃষ্টি পড়তেই পরাণের উৎসাহ যেন আরো বেড়ে যায়—'ঐ যে শালী, বাপের বাড়ী আইছেন। ওরে আমার চৌদ্দপুরুষের বাবারে। বাইর হইয়া আয় হারামজাদী।'

মুক্তো এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পরাণের কথা শুনে রাগে ফেটে পড়ে—'মুখ সামলাইয়া কথা কইস, না হইলে পিছা দিয়া বাইরাইয়া নামাইয়া দিমু। ও আইছে আমারে জোর কইরা নিতে।'

পরাণ গলার স্বর একপর্দা নামিয়ে বলে—'তুই যাবি না? এখনও ভাল চাস তো চল, না হইলে কিন্তু মইরা যাবি।

'আমি মরুম ক্যানরে, তুই মর তুই মর। তুই মরলে আমার হাড় জুড়ায়। ভগবান যেন তোর আইজ মরণ দেয়। ঘুমের থিকা উইঠা যেন লোকে দেখে তুই মইরা রইছস।' উত্তেজনায় আধিক্যে মুক্তো কাঁপতে থাকে। একে দুর্বল শরীর, তার উপর চিৎকার করে মুক্তো আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, দরজার গোড়ায়ই অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে। শশীবাবুর স্ত্রী দৌড়ে এসে ওকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে যান।

পাড়ার ছেলেরা এদিকে পরাণকে বেশ-কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে পাড়ার বার করে দেয়। শশীবাবু একটু বিরক্ত হয়েই বাড়ীর ভেতর ঢোকেন। মুক্তো চুপ করে বসেছিল। শশীবাবুকে দেখে ভীতকণ্ঠে বলে—'বাবা কি হবে?'

শশীবাবুর বিরক্তি এক নিমেষেই উবে যায়, সস্নেহে বলেন—'আমি থাকতে তোর ভয় কি। আমি যতদিন আছি তোর কোন চিন্তা নেই।'

শশীবাবুর স্ত্রী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন—'হ্যাপাচলে গেছে?'

—এমনি কি আর গেছে, পাড়ার ছেলেরা দু'চার ঘা দিতেই সরে পড়েছে।'

শশীবাবুর অলক্ষ্যে একবার তার দিকে তাকিয়েই মুক্তো উঠে যায়। তাকে সদর দরজার দিকে এগোতে দেখে শশীবাবু জিজ্ঞেস করলেন মুক্তো কোথায় চললি?' মুক্তো সংক্ষেপে জবাব দেয়—এই এইখানে;

রাত হয়ে যায়, তবু মুক্তো আসে না দেখে শশীবাবু চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী এই অযথা উদ্বেগের কোন কারণ খুঁজে পান না, বলেন—'যাবে আর কোথায়। হয়ত পাড়ায় কারো বাড়ী বসে গল্প করছে। আসবে এক্ষুণি। তুমি উপরে চল, এলে দরজা খুলে দেওয়া যাবে।'

শশীবাবু বললেন—'না, তুমি যাও। আমার নীচে 'কাজ

আছে। সদর দরজা খোলাই থাক। আমি তো বৈঠকখানায় রইলাম।'

রাত ক্রমে বাড়তেই থাকে। আস্তে আস্তে রাস্তায় লোকজন চলাচলও কমে আসে। শশীবাবু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই দেখেন মুক্তোর ঘরে আলো জ্বলছে। যাক্, মুক্তো তা' হ'লে ফিরে এসেছে। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন শশীবাবু।

মুক্তোকে ডাকতে যাবেন এমনি সময় কানে এল পুরুষের কণ্ঠস্বর। মুক্তোর ঘরে পুরুষ মানুষ এল কে ? আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে এগিয়ে স্নান ঘরের দিকে।

জানালা দিয়ে দেখেন মুক্তোর কোলে মাথা রেখে মুক্তোর স্বামী শুয়ে আছে, মুক্তো তার পিঠে তেল মেখে দিচ্ছে।

—'ইস্। মাইরা একেবারে ফুলাইয়া দেছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাইর খাইলা ক্যান, দৌড়াইতে পারলা না।' মুক্তো পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে।

পরাণ একটু গর্বিত হয়েই উত্তর দেয়—'আমি পুরুষ মানুষ না, দৌড়ামু ক্যান ?'

—'এমন মাইর খাইতে খাইতেই তুমি মরবা।' বলতে বলতে কান্নায় ভরে ওঠে মুক্তোর গলার স্বর।

পরাণ ওর একটা হাত টেনে নিয়ে বলে—'এই দেখ, আবার কান্দে। শোন, কাইলকা তোরে এইখান থিকা নিয়া যামু। তুই আবার না করবি না তো।' শেষের দিকে কথায় বোঝা যায় পরাণ অভিমান করেছে।

মুক্তো হেসে ওঠে—'না করুম ক্যান। তোমার কাছে যাইতে কি আমার অনিচ্ছা না কি। পাগলটা এইটাও বোঝে না, একেবারে পাগল।' মুক্তো আদর করে পরাণের মাথাটা নিজের কোলের ভেতর নিবিড়ভাবে টেনে নেয়।

শশীবাবু যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দে ফিরে চলে যান।

রিক্তা

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

আমি বনের ফুল—
বিশাল বিশ্ব বিরচনে একটা ফোঁটা ভুল।
ধরায় এলাম না জানি সে কোন অশুভ ক্ষণে,
স্তব্ধ বিজন আঁধার বনের কোণে
নেয়নি কেহ আদর করে, দেয়নি কোন দাম,
রাখেনি কেউ আমার কোনও নাম।

যূথীর পানে মলয় যবে আকুল হয়ে ধায়
আংরাখাবই প্রান্তটী তার আমায় ছুঁয়ে যায়;
পুলকে মোর শিউরে ওঠে দেহ
নয়ন খুলে দেখি আমার নেইরে পাশে কেহ।
ভোরের তারা আমার পানে চেয়ে—
করুণ চোখে বলে শুধু—'হায়রে বনের মেয়ে।'

নেই তো আমার কলাবতীর রং—
আমার রূপে উজ্জ্বল নহে—উচ্ছল নহে বন।
প্রিয়তমের সোহাগ মাখা পরাগটুকুর আশে
বক্ষ হলে উদ্বেলিত, আপন দীর্ঘশ্বাসে
সঙ্কুচিয়া জর্জরিয়া যায়
প্রজাপতির চরণ-পরশ এ কুরূপা ভুলেও নাহি পায়।

ভ্রমরগুলি ঘুরছে কেবল স্থল-কমলের পাশে—
মুগ্ধ হয়ে মিষ্টি মধুর বাসে।
নেইরে আমার নেই যে সংস্থান—
গুণগুণিয়ে গায় না কেহ আমারই জয়গান
প্রণয়মাখা সুরে,
মত্তচপল মুখর-চারণ আমার থেকে বেড়ায় দূরে দূরে।

পীত করবীর পাত্রভরা মধুর উপচার
হাত ছানি দেয় মৌমাছিরে—মোহন রূপে যার
আকুল হ'ল অভাগিনীর মন,
আমার গেহে নাইরে সুধা কি নিয়ে হায় করব আমন্ত্রণ
তাহার লীলা-কেলি
ওদের সাথে—হাসনাহানা, সূর্য্যমুখী, বেলী।

চয়ন ক'রে আমায় কোনও বালা
ভোরের বেলা ভরে না তার পূজার প্রসূন-ডালা,
বাসরঘরে ফুলের মালা গুচ্ছ-কুসুম মাঝে
টগর, বকুল, সন্ধ্যামণি কানাইবাঁশী রাজে;
নেই রে শুধু নেইরে আমার ঠাঁই,
রাতের শেষে আপনি ফুটে, দিনের শেষে ধরার ধূলায়
আপনি টুটে যাই।

নাট্যকার গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির দান অবিস্মরণীয়। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি একাধারে ছিলেন নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, ছোট্ গল্প লেখক ও বঙ্গরচনা বা ব্যঙ্গরচনাকারক। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি নাট্যকাররূপেই সব-চেয়ে বেশী পরিচিত। যদিও তাঁহার 'Forsyte saga' উপন্যাস-সাহিত্যে এক অমর কীর্ত্তি। Forsyte saga সুবৃহৎ এপিক উপন্যাস—যাহার বিষয়বস্তু একটি ইংরাজ পরিবারের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের নিখুঁত ও জীবন্ত কাহিনী এবং যাহা পরবর্ত্তীকালীন 'John Christoph', 'Budden Brook', 'Ulyssess' প্রভৃতির সহিত তুলনীয় ও তাহাদের সমপর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু উপন্যাসের কথা যাক; গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির নাট্যপ্রতিভাই আমাদের আলোচ্য।

বিষয়টি আলোচনা কালে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে যে, ইংরেজী-সাহিত্য জগতে যখন গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির আবির্ভাব হয়, তখন কি সে দেশে আর কোনও প্রতিভাশালী নাট্যকার ছিলেন না? যদি ধরা যায় যে ছিলেন, তাহা হইলে আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠে যে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির নাটকাবলীতে এমন কোন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা তিনি ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যে তথা বিশ্বনাট্য-সাহিত্যে আজও স্থায়ী আসন দখল করিয়া আছেন।

প্রথমেই বলি, একথা মনে করিলে বিষম ভুল হইবে যে, গল্‌স্‌-ওয়ার্দ্দির নাট্যপ্রতিভা যখন বিকাশলাভ করে, তখন তাঁহার সমকক্ষ আর একজন নাট্যকারও বর্ত্তমান ছিলেন না। বরং সে যুগে ইংরেজী-সাহিত্যে অনেক শক্তিশালী লেখক দেখা দিয়াছিলেন—যেমন বার্ণার্ড শ', গ্রাণভি। বার্কার, এইচ, এইচ ডেভিস প্রভৃতি। ইঁহাদের অতিক্রম করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সহজ-সাধ্য নয়। তথাপি সুখের বিষয় এই যে, গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি তাঁহার স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও অসামান্য-সৃজনী-প্রতিভার বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হইয়াও তিনি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে-লেখক পাঠক সাধারণের চিত্তবিনোদনকারী লঘু ও চপলতাপূর্ণ সাহিত্য পরি-বেশন করিবেন, তিনি ততই জনপ্রিয় বলিয়া আদৃত হইবেন। তাই আধুনিক যুগের প্রারম্ভকালীন অন্যতম সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি এই বিষয়ে ব্যর্থ। কারণ তাঁহার নাটকের কোনও অংশে লঘুতা বা বিলাসব্যাসনের সামান্য পরিচয়ও পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ তাঁহার সমস্ত নাটকই এমন এক সুমধুর গাম্ভীর্য্যে শক্তিমান্ যে, উহা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য না হইলেও সত্যকার সাহিত্যানুরাগী রসিকচিত্তকে আনন্দ বিতরণ করিতে পারে। সেই জন্য তিনি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন না করিলেও উচ্চ রুচিসম্পন্ন পাঠককে প্রিয়জনরূপে পাইয়াছেন।

গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির নাট্যপ্রতিভার মূলে ছিল তাঁহার রূপ ও শিল্প-বোধ। জীবন তাঁহার নিকট যেন স্থির চিত্রশালা এবং নিজে সে সময় একজন নিপুণ শিল্পীর দৃষ্টিতে জগত ও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে তার রস আহরণ করিয়া পাঠককে পরিবেশন করিয়াছেন। মানুষের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাকে একত্রিত করিয়া পরিণতিপূর্ণ রূপ দান করার নাম নাট্যকরণ। নাটক জীবনের প্রতিরূপ, অর্থাৎ জীবন-দর্পন হইতেই নাটকের উদ্ভব। নাটক রচনাকার্য্যে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দির শিল্পচাতুর্য্য সর্ব্বদা একটি মধ্য-পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। অর্থাৎ নিছক শিক্ষা দান করিবার উদ্দেশ্যে বা সর্ব্বসাধারণকে প্রণোদিত করিবার জন্য তাঁহার নাটক রচিত হয় নাই। এখানেই বার্কার, ডেভিস ইত্যাদির সহিত তাঁহার প্রভেদ বিদ্যমান। বার্ণার্ড শ' যেমন কেবলমাত্র বিশেষ তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচারের জন্য নাটক রচনা করিয়াছেন এবং তীক্ষ্ণ ভাবে বলিয়াছেন—'But for arts' sake I would not write a single line.' গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি নিজেকে সেরূপ কোন প্রতিভায় আবদ্ধ করেন নাই। যদিও তাঁহার নাটকে তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচারের অবকাশ আছে, তথাপি তাহা মুখ্য নয়, কারণ সর্ব্ব প্রথমে তিনি শিল্পী। শিল্পীর নিকট ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্ত্তমানেরই মূল্য অধিক; কেননা, তাহার সত্য প্রত্যক্ষ ও নিশ্চয়। গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি তাঁহার নাটকের অবস্থান (situation) সম্বন্ধে সম্যক্ ভাবে সচেতন ছিলেন। নাটকের অন্তর্নিহিত সামাজিক ও নৈতিক সমস্যাই তাঁহার নাটকের প্রধান অবস্থান। এই অবস্থানের দ্বারাই তি আপনার মতবাদ প্রচার করেন এবং সেই জন্য সমাজের উপর তিনি মোটেই আস্থাবান ন'ন। প্রথমে অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া তিনি দুইটি বিপরীতধর্ম্মী দল বা শ্রেণীদ্বারা তাহার ভারসাম্য রক্ষা করেন। ফলে তাঁহার নাটকীয় কুশীলবগণ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হইতে মুক্ত হইয়া টাইপ বা রূপচরিত্রের কোঠায় উন্নীত হয়। এখানেই নাটকের সার্থকতা এবং এখানেই নাট্যকার গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

এবার আমরা তাঁহার কতকগুলি নাটক হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ

করিয়া উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিব।

গলস্‌ওয়ার্দির নাটকের মধ্যে 'The Silver Bon' এবং 'Strife' সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই দুইটী নাটকেই তাঁহার নাটকীয় আঙ্গিকের বিশেষত্ব সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রধান অবস্থান (central situation), শ্রেণী-সংঘর্ষ এবং রূপ-চরিত্রের নিপুণ সমাবেশে এই দুইটী নাটক অনবদ্য। "The Silver Bon"এ 'Jack Bartuwick ও Jones' এবং "Strife"এ 'Roberts old Anthony' শ্রেণী-সংঘর্ষের মূর্ত্ত প্রতীক। সামাজিক সমস্যামূলক নাটকের মধ্যে 'Justice' অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। মানুষের গড়া সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে মানুষ যখন দলিত, খণ্ডিত ও পিষ্ট হয়, তখন তাহাকে আর কিছু বলা না যাক, সুবিচার বলা চলে না। এই নাটকে কারাজীবনের অমোঘ-ফলরূপ দেখিতে পাই যে, স্বল্প বেতনভোগী কেরাণী 'Falder' লঘু অপরাধে গুরুতর দণ্ডলাভ করিয়া দুর্ব্বিষহ জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া অবশেষে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়। সত্য এবং বাস্তবের এরূপ রূঢ় প্রকাশ গলস্‌ওয়ার্দির আর কোনও নাটকে দেখা যায় না। আর কোনও নাটকে তিনি এরূপ উচ্চাঙ্গের কলাকুশলতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত এই নাটকের আবেদন যেমন গভীর তেমনি বসঘন। কোথাও চটুল এবং শিথিল সংলাপ দ্বারা নাটকের সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিকে অব্যাহত করা হয় নাই। ইহার প্রতিটি দৃশ্য নূতন সম্ভাবনার প্রাচুর্য্যে প্রাণবান্ এবং ইহার চরিত্র-গুলি রক্তমাংসের মানুষের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এই নাটকের আর একটী উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই যে, সাধারণতঃ গলস্‌ওয়ার্দির নাটকগুলি হর্ষবিষাদাত্মক (Melo-dramatic) কিন্তু 'Justice' তাঁহার একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক বা ট্রাজেডী।

'Justice' ও 'Strife' এই দুই নাটকেই আধুনিক সমাজের বৃহত্তর সমস্যাকে—অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক—রূপায়িত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে 'Joy' 'The Mob' 'A bit of lore' ইত্যাদি ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের জন্য অর্থাৎ সামাজিক সমস্যা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক আদান-প্রদানের জন্য রচিত হইয়াছে। 'The Silver Bon' ও 'The Eldest Son'এ আইনের চক্ষে ধনী ও দরিদ্রের আচরণ-বৈষম্য এবং নৈতিক পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। 'The Silver Bon'এ ধনী Berthwick-এর পুত্র Jack এবং দরিদ্র Char-woman-এর স্বামী Jones একই চুরির অপরাধে ধৃত হইলেও আদালতের বিচারে দরিদ্র Jones-ই দোষী সাব্যস্ত হয়। সমাজের নিকট ধনী ও দরিদ্রের এই ভিন্ন নৈতিক মান সত্যই বিসদৃশ। তাই প্রকাশ্য আদালতে Jones-এর শেষ কথা—"E took the Purse – 'e took the purse but' (in a muffled shout) it is his money got 'in off-Justice !" জলন্ত সত্য। 'Mob' নাটকের বিষয়বস্তু অভিনব। কিরূপে সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী ও ক্ষমতালোভী তথাকথিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমগ্র জনসাধারণকে স্তোকবাক্যের দ্বারা ধ্বংসের মুখে আগাইয়া দেয়, ইহাতে তাহার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া যায়। 'Strife'এর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, 'Strfe' একটী এমন নাটক যাহা আখ্যায়িকা, দৃশ্যসংস্থান, সুন্দর সংলাপ ইত্যাদিতে উচ্চাঙ্গের শিল্প-সৃষ্টির পরিচায়ক। ইহাতে ধনী ও দরিদ্র অথবা নিয়োগকর্ত্তা ও কর্ম্মচারীর চিরন্তন দ্বন্দ্বকে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। কিন্তু Mobএর সহিত ইহার সাদৃশ্য এই যে, শ্রমিক ও মালিকদের বিরোধে যে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আত্মস্বার্থসর্ব্বস্ব তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে অসাফল্য ও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল। তাই Roberts যখন জীবনের সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও এমন কি নিজের স্ত্রীর মৃত্যুশোক উপেক্ষা করিয়া শ্রমিক-দের দাবী জানাইবার জন্য মালিকদের সহিত আপোষরফা করিয়াছে, তখন সে যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়া বলিল—'Ye have gone back on me ? I stood by ye to the death, ye waited for that to throw me over' !

'Loyalty' একটী অনিন্দ্যসুন্দর নাটক। ইহাতে আধুনিক কালের একটী জটিল সমস্যার ইঙ্গিত দেখা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নাৎসী জার্ম্মানীর অধিনায়কদের ইহুদী উৎপীড়নের রোম-হর্ষক কাহিনী সমগ্র জগতবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মানী যে এই অবস্থ কার্য্যের অগ্রণী নয়, এরূপ ইহুদিবিদ্বেষ বহুপূর্ব্বেই যে অতিশয় সভ্যতাভিমানী ইংলণ্ডের মধ্যে প্রশ্রয় পাইত, সে কথা মনে করিলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। 'Loyalty' ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'Dancy' কর্ত্তৃক 'De Levies'এর অর্থ অপহৃত হইয়াছে জানিয়াও সমাজ দোষীকে সহানুভূতি দেখাইতে এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে দ্বিধা বোধ করে না—কেন না সমাজের চক্ষে 'De Levies' একজন ঘৃণ্য ইহুদী ভিন্ন আর কিছু নয়। 'Window's নাটকের মূলকথা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। যাঁরা দেশের সমাজসংস্কারক বলিয়া নিজেদের দাবী করেন, তাঁদের প্রধান কর্ত্তব্য মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক্‌ভাবে অবগত হওয়া। মনুষ্যচরিত্রের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া ও বাস্তবকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া কেবল মাত্র আদর্শবাদ বা ভাবাদর্শ প্রচার করিলে সংস্কারকের সকল প্রচেষ্টা অফলপ্রসূ হয়। সেইজন্য 'Windows নাটকের Bely বলিতেছে—'what's the use of all these lofty ideas that you can't live upto ? Liberty, Fraternity, Equality, Democracy,—See what comes of fight is, for en ! 'Ere we are—wiping out the lot; We thought they were fixed stars, they were only concets—hot air. No, trust human nature, I say, and follow your instructa."

উপসংহারে শুধু এইটুকু বলিব যে, গল্‌স্‌ওয়ার্দি তাঁহার নাটকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কোথাও তিনি তাহাদের সমাধানের ইঙ্গিত করেন নাই, কারণ তিনি কখনও নিজেকে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত করিবার কল্পনা করেন নাই। ইহাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ধর্ম্ম। রচনার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে, তাহাই পাঠককে ক্রমে সমাধানের সুচিন্তিত পথে আগাইয়া নিয়া যায়।

অজয়ের বান

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী

সমস্ত দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। মেঘাবৃত আকাশের অশ্রুবর্ষণের যেন শেষ নাই। অন্ধকার আকাশের সঙ্গে বৃষ্টির ধারা যেন মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। মাঠ, পুকুর, নদী জলে থৈ থৈ করিতেছে। বর্ষণমুখর ধরিত্রী যেন স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। মেঘ কখন বা ফিকা হইয়া আসে, কখন বা লঘুছন্দে চঞ্চল হইয়া বেড়ায়; আবার তখনই সেই ফিকার মধ্যে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া চারিদিকের মেঘ আসিয়া দল বাঁধে, সংঘর্ষ বাধায়, শেষে শতধারে ভাঙ্গিয়া মাটির বুকে জমা হইতে থাকে। সূর্য্যের দেখা নাই। বর্ষার ধারা তীর হানিয়া নামিয়াছে। চিক্ চিক্ করিয়া উঠে মাঝে মাঝে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়াইয়া। বিন্দু বিন্দু আকারে জলের উপর পড়িয়া মিশিয়া যায়। বড় বড় ফোঁটা পড়িয়া জলকে উছলাইয়া দেয়। ছোট, বড়, লম্বা রেখা টানিয়া বুদ্‌বুদের সৃষ্টি করে। কখনও বা উপর হইতে বৃষ্টির ধারা তির্যকভাবে নীচে পড়িতে থাকে। গাছের ফাঁক দিয়া পাতার আড়াল দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া পড়ে। টীনের ছাদ হইতে ঝম্‌ঝম্ শব্দে নীচে নামে। খড়ের ঘরের চাল বহিয়া শম্ শম্ শব্দ তোলে। পাকা ঘরের নালি দিয়া হু হু শব্দে সেই বৃষ্টির ধারা নামিয়া রাস্তা বাহিয়া পাশের জমি বা পুকুরে গিয়া পড়ে। বৃষ্টির যেন শেষ নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নানারূপে, নানা ভঙ্গিতে নামিতেছে। কখন বা লুকোচুরি খেলে, কখন বা তাল ঠুকিয়া নামে। দিক্‌চক্রবালের মায়াবৃত মাধুর্য্য রচনা করিয়া শতধারে আবার ভাঙ্গিয়াও পড়ে। আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, গাছ, মানুষ, জীবজন্তুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া গিয়াছে। ব্যস্তব্যাকুল ভাবকে যেন বঞ্চিত করিয়া রাখিতে চায়। উপরে জল, নীচে জল আশেপাশে যে দিকেই তাকান যায় জল ছাড়া আর কিছুই নাই। জল যেন সকলকেই ডুবাইয়া মারিতে চায়। মানুষ তবু মরিয়া হইয়া উঠে নাই, জীবজন্তুর সাড়া তখনও জাগে নাই।

কিন্তু হটাৎ অজয় গেল ক্ষেপিয়া। সমস্ত দিন সে ফুলিয়া ফুলিয়া নিজের ব্যর্থ আক্রোশ জানাইতেছিল। হটাৎ সে ক্ষেপিয়া গেল। বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে ছিটকাইয়া উথলিয়া উঠিল। বাঁধের নীচে জমি। সবুজ ফসলের কানন রচিয়া মাঠ যেন এলায়িত ছিল। স্তিমিত আবেশে নদীর মাতন দেখিতেছিল।

হঠাৎ অজয় ক্ষেপিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ধানের শিষগুলি মাথা চাড়া দিয়া জাগিয়া উঠিল। নীচের পাতাগুলি আর্ত্তনাদ করিয়া জলে এলাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত মাঠ জলে ভরিয়া উঠিল। তার পর উঠিল তরঙ্গ। সেই তরঙ্গই এখন আসিতেছে সহর মুখে। অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে কাটোয়া। তাহারই দিকে হু হু শব্দে বান আগাইয়া আসিতেছে।

অজয়ের উপর ব্রিজ হইয়াছে। নূতন রেললাইন তাহার উপর দিয়া চলিয়াছে। সদ্য তৈরী ব্রিজকে আয়ত্তে আনিবার জন্য নদীর দুই ধারে দুটি ছোট ষ্টেশন হইয়াছে—অজয় নর্থ, অজয় সাউথ। দুইধারে দুইজনের উপর ভার দিয়া রেল কোম্পানী তাহার তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করিয়াছে। বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে এধারে। ব্রিজ হইতে তাহা বেশী দূরে নয়। ষ্টেশন-ষ্টাফ ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। অজয়ের বান ডাকিয়াছে। ওদিকে দূরে দূরে গ্রামগুলি আগেই জলে ভাসিতেছিল। এদিকে লাইনঘেরা অঞ্চলগুলি নিরাপদেই ছিল। কিন্তু তাহা আর ভাগ্যে টিকিল না। প্রমত্ত অজয় হু হু শব্দে আগাইয়া আসিতেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া রেল কোম্পানীর লোক অজয়কে পরীক্ষা করিয়া যাইতেছিল, আর কর্ত্তৃপক্ষকে ক্রমাগত সংবাদ জানাইতেছিল। এবার জানাইল, অজয়ের বান ডাকিয়াছে। আর রক্ষার উপায় নাই। কাটোয়া ষ্টেশনে খবর আসার সঙ্গে সঙ্গে সহরে সংবাদটী ছড়াইয়া পড়িল। সহরবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু রাত্রে আর কিছু করা সম্ভব হইল না।

সকালে আর কাহাকেও উঠিতে হইল না। ঘরে বসিয়াই যাহা দেখিল তাহা বিস্ময়কর। অজয়ের বান দেখা দিয়াছে। ওদিকে গঙ্গা ফুলিয়া উঠিয়াছে। অজয়ের জল টানিবার সামর্থ্য নাই। উল্টা অজয়ের বুকে বুক মিলাইয়া দিয়াছে, দু'কূল ভাসাইয়া এবার গ্রাস করিতে আসিয়াছে। সমস্ত সহর জলময়। রাস্তা দিয়া স্রোতের মত জল চলিতেছে। একদিক দিয়া বাহির হইয়া অন্য রাস্তায় পড়িতেছে। পুকুরগুলি জলে ভরিয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে, উঠানে, বারান্দায় জল থৈ থৈ করিতেছে।

ওদিকে ষ্টেশনের অবস্থা শোচনীয়। ও-অঞ্চলের সমস্ত লোক লটবহর, ছাগল, গরু, ভেড়া লইয়া ষ্টেশনে আশ্রয় লইয়াছে। চারিদিকের জলরেখা ষ্টেশনকে দ্বীপ বানাইয়াছে। ষ্টেশনে উঠিবার লম্বা লাল সড়কের গা বাহিয়া জলস্রোত চলিতেছে দুর্ব্বার গতিতে। ত্রস্ত, ভীত যাত্রীকুল একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছে। রাস্তা দিয়া গাড়ী-ঘোড়া চলিতেছে কচিৎ। ঝপ ঝপ শব্দ করিতে করিতে ঘোড়া গাড়ী টানিয়া চলে। লোকে হাঁটুর

পড় তুলিয়া ছপাৎ ছপাৎ করিয়া যায়। কুকুরগুলি অসহায় অবস্থায় জলের উপর সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া চলে। সকাল হইতে মেঘ কাটিয়া আসিলেও বৃষ্টির যবনিকা পড়ে নাই। ট্রেণের যাতায়াত চলিতেছে—তবে মন্থর গতিতে ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে। ষ্টেশনের অদূরে অজয়ের ব্রিজ। সেখানে শঙ্কাকুল অবস্থায় ষ্টাফ সময় কাটাইতেছে। ঘন ঘন তার করিতেছে, আর অজয়ের নাচন দেখিতেছে।

অজয় বড় নদী নয়। বর্ষার রূপ দেখিয়া অবাক্ হইলেও বেশী দিন তাহার সে তেজ থাকে না। বালুর চড়ার ভিতর জলের রেখা মিলাইয়া যায়। ঘোলাজল দেখিতে দেখিতে গঙ্গায় ঢালিয়া নিঃশেষ হইয়া পড়ে। স্রোতের গতি রুদ্ধ হইয়া যায়। চড়ার কোলে চিক্ চিক্ করিয়া সরু জলের ধারা বহিয়া চলে। রাখাল বালকেরা তাহার উপর মাতন সুরু করিয়া দেয়। বালির বুকে দাগ কাটিয়া রচনার জাল বুনিয়া তোলে। গোরু মহিষের দল ভিজা বালির উপর আছাড় খাইয়া জলের ধারা টানিয়া আনিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বর্ষার অজয়, গ্রীষ্মের অজয় শীতের অজয়। ঋতুচক্রের আবেষ্টনীতে অজয় নব নব রূপে দেখা দেয়। অজয়ের রূপ-মাধুরীর অন্ত নাই। তখনই দেখা যায় বেলাভূমির উপর পদচিহ্নের সমারোহ। ক্ষীণ জলরেখার ধারে ধারে ছোট ছোট পাখী সরু সরু পায়ের রেখা ফেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। রাখাল বালকেরা ছুটিয়া ছুটিয়া নদীর বুকে কলকোলাহল তোলে। পারাপারের যাত্রীরা ব্যস্তভরে নদী পার হইয়া চলে বালির উপর পদাঘাত করিয়া। সেই চিহ্নগুলি আবার নদীর বুকে মালার মত ফুটিয়া উঠে। কোথায় বা দেখা যায় ছোট ছোট বাঁশ পুতিয়া মাছ ধরার আয়োজন করা আছে। স্বচ্ছ নীল জলের ভিতর দিয়া ছোট ছোট মাছগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া খেলা করিতেছে, জালে পড়িতেছে, পলাইয়া যাইতেছে। প্রখর তেজে সূর্য্য যখন মাথার উপরে থাকিয়া বালির উপর চাকচিক্য বিস্তারে ব্যস্ত, কালো ছায়া ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া পড়িয়া বালির উপর তাহার মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া চলে। আলোছায়ার খেলা অজয়ের বুকে দুলিয়া দুলিয়া উঠে; আবার দেখা যায় ফেনপুঞ্জ, লাল জলস্রোত গলিত লাভাস্রোতের মত দূর পশ্চিম হইতে ভাসিয়া আসে। দুকূলের সীমারেখা টানিয়া বেলাবালুর উপর আছাড়িয়া আছাড়িয়া তাহার মত্ত নাচনের খেলা সুরু করিয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে দু'কূল প্লাবিত করিয়া লালজল অজয়ের বুকের উপর নাচিয়া চলে শত আবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া। সে তরঙ্গে অজয় যে নূতন রূপে ফুলিয়া উঠে। রাঙা অধরে প্রকৃতির সঙ্গে রসিকতা করিতে চায়। প্রকৃতিকে কুটিল কটাক্ষে ব্যঙ্গ করিতে সে যেন উন্মুখ। তখনই দেখা যায় মত্ত মাতঙ্গের রূপ। কালো মেঘের সঙ্গে নাচিয়া উঠে। নবারুণের বর্ণচ্ছটা অজয়ের লাল জলে এক হইয়া মিলিয়া যায়। আবার দেখা যায় জ্যোৎস্নাম্নাত অজয়ের বালুবেলা. চাঁদের ছটায় যেন হাসিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে। বালির বুকে বুকে তাহারই আভা ছড়াইয়া আছে। লক্ষ জোনাকি যেন বালির উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে।

বিকালের দিকে মেঘ কাটিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার। বানের জল গতিবেগ কমাইয়াছে। তবু শান্ত হয় নাই। পাকা সড়কের উপর হাঁটুপ্রমাণ জল। তাহারই উপর দিয়া যাওয়া-আশা তখনও অচল হয় নাই। ওদিকে অজয়ের ভাঙ্গা বাঁধের ধারে রেল কোম্পানীর লোক সভয়ে দাঁড়াইয়া আছে। রাত্রে বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে। সকালের মধ্যেই সমস্ত মাঠ, সহর ডুবাইয়া একাকার করিয়াছে। সহরের বুকে বুকে বড় বাড়ীর ছাদে, গাছের নীচে দলে দলে গিয়া সব আশ্রয় লইয়াছে। সব জায়গায় স্ত্রী-পুরুষে ছেলে মেয়েতে গরুবাছুর ও লটবহরে একাকার। ষ্টেশনেও বিরাট সমাবেশ। স্বহু বিচিত্র কোলাহলে ষ্টেশন মুখরিত। মধ্যে মধ্যে ট্রেণ যায় আসে। যাত্রী নামে ওঠে। কোলাহলের মধ্য দিয়া এক এক দৃশ্যপট দেখা যায়।

ষ্টেশন-ষ্টাফ তৈরী। যে কোন মুহূর্ত্তে সংবাদ পাওয়া মাত্র সপরিবারে সকলকে অন্ত ষ্টেশনে সরাইয়া দিবে। ত্রস্তব্যাকুলতার। সহর হইতে লোক আসিলে ষ্টেশনের লোকেরা তাহাদের খবর জানিয়া লন। সহর হইতে বিচ্ছিন্ন এই অংশটি নিরাপদ হইলেও অসহায় অবস্থায় যেন আছে। আশ্রয় একটা মিলিয়াছে সত্য, কিন্তু আহার্য্য নাই, আবেষ্টনীও বহুবিচিত্র। সহর হইতে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলের একমাত্র আশ্রয়স্থল ষ্টেশন ছাড়া আর কিছুই নাই। তাহাদের ঘর-বাড়ী, দোকান, বাজার জলে ডুবিয়া রহিয়াছে। চালা ঘরগুলি খড়-খোলার স্তূপ লইয়া বুকজলে দাঁড়াইয়া আছে। পাশের পাকা ঘরগুলির দুই একখানি অসহায়ভাবে তাহাদের অধিবাসীকে লইয়া বিব্রত। নীচে নামিবার উপায় নাই। অধিবাসীরা দোতালায় ঘোড়াফেরা করিতেছে। দূর আকাশের দিকে তাকাইতেছে আর পাশের চালা ঘরগুলির ধ্বসিয়া পড়ার অবস্থার কথা ভাবিতেছে।

সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। সকাল হইতে বানের জল সরিতে লাগিল। উঁচু রাস্তাগুলি হইতে জল সরিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। উঁচু ঘরের জল তুলিয়া কেহ কেহ বাহিরে ফেলিতেছে। অবস্থা কতক ভাল। সকাল হইতেই বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে।

গাছের পাতাগুলি হইতে জলঝরা বন্ধ হইয়াছে। রাস্তায় লোক চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। দুইদিন অব্যবহার্য্য রাস্তায় যেখানে সেখানে জল জমিয়া গর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই ধারে ধারে জমিয়াছে আবর্জ্জনা-রাশি। সকাল হইতে সহরময় লোকজনের চলাচল সুরু হইয়াছে। একে অন্যের খোঁজ-খবর লইতে ব্যস্ত। গঙ্গার ধারে যাহারা বাস করে তাহারা আসিয়াছে কোর্টের পাড়ায়। অন্য পাড়ার লোকেরা সহরের অবস্থা দেখিতে চলিয়াছে। সকলের মনের ত্রস্ত ও ভীতচকিত ভাব কতকটা কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু কৌতূহল উৎসাহের অন্ত নাই।

বৈকালের মধ্যে রাস্তা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তখন চলিয়াছে আলোচনা পাড়ায় পাড়ায়। কোথায় বসিয়াছে ছেলের দল। বলে:

—বস্তিগুলোর অবস্থা বড়ই খারাপ। অনেক বাড়ী পড়ে গিয়েছে। ঠেকা দিয়েও আট্‌কাতে পারছে না ধ্বসে পড়া, গোড়া এলানো মাটির দেয়ালগুলো।

—ওপাড়ার বস্তি দেখে এলাম। একটা গরু চাপা পড়ে আছে। পাড়ার ভলান্টিয়াররা সেগুলো সরাচ্ছে। লোকও একটা মরেছে সেখানে।

—মুখুজ্জেদের বৌয়ের কোমরে বেশ চোট লেগেছে। উঠতে পারছে না। বাঁচবে না বোধ হয়।

—তার ওপর মাঝিপাড়ায় একটা লোককে কাল সাপে কামড়িয়েছে—খুব ঝাড়-ফোঁক চলছে। মাঝিরা সাপের ওঝা। হয় তো লোকটা বেঁচে যাবে।

—ও-পাড়ায় গিয়ে দেখলাম, সাপের দল সব যেন বড় আম গাছটায় উঠেছে। তার নীচে এখনও জল জমে আছে। আর সাপগুলো গাছের ডালে পাতায় জড়িয়ে নড়ে বেড়াচ্ছে।

—বানে যা করেছে, তা আর বলা যায় না। পিছনের ধানজমিতে যে তুফান তুলেছে। পুকুরের মত দেখতে হয়েছে।

—বাবা, বাবা, কত দিনে যে জল যাবে ভাবছি। চল, দলে দলে ভলান্টিয়ারে যোগ দিয়ে সহর পরিষ্কার করতে হবেই, নইলে সব পচে দুর্গন্ধ হবে, সহরে বাস করা দায় হবে।

বাজারে বৈকালের দিকে কিছু লোক জড় হইয়াছে; কেহ বাজার করিতে, কেহ তাহার দোকান-ঘর পরিষ্কার করিতে। হেটোরা মোটেই আসে নাই। সেখানে বসিয়াছে জটলা। বলে:

—কি বান রে বাবা, তরি-তরকারী মোটেই নাই। পোস্ত আর ডাল কিনে যা হোক রাত্রের আহারের জোগাড় করতে হবে তো?

—মুদির দোকান সব খোলেনি যে। যে বা খুলেছে, সে তার দোকান-ঘর পরিষ্কার করতে, ভেজা জিনিসপত্র শুকোতে ব্যস্ত। জিনিষ আর কি দেবে। লোকসান হয়েছে কত!

—তরকারীর দর এবার চড়লো, মাঠ, জমি সব ডুবে গিয়েছে। ফসলের দফা শেষ!

—মাছ কিন্তু হবে বেশ!

কোর্টের পাড়ায় লোক নাই। কাছারি বন্ধ। তবু দুই একটা উকিল, মোক্তার, আমলা শুষ্ক মুখে ঘোরাফেরা করিতেছে। পাশেই রোয়াকে জনকয়েক বসিয়া আছে। বলাবলি করিতেছে:

—মামলার দফা শেষ। আবার যে কবে দিন পড়বে জানি না। মামলা করতে এসে প্রাণান্ত।

—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে হয় ভালয় ভালয়, অজয়ের বানে সব শেষ। কাছারী খুলতে বেশ দু'চারদিন দেরী হবে।

—তা আর নয়। মামলা করতে আসবে কে?

দ্বীপময় ষ্টেশনটি ওদিকে সরগরম। সহরের লোক দলে দলে পলাইয়া যাইতেছে। যাহারা সহরে আসিয়াছে তাহারা এবং যাহারা সহরে থাকে তাহারাও। সেখানে কলরোলের সীমা নাই। দলে দলে লোক ছুটিতেছে ষ্টেশনের দিকে। সকলের মুখে এক কথা—পালাও! পালাও!

কোথায় জটলা বসিয়াছে:

—প্রাণ গেল রে বাবা, ট্রেণ এলে হয়।

বাড়ীঘর সব থাক্‌ল অম্‌নি অবস্থায়। বাঁচি তো ফিরে এসে দেখা যাবে।

তা আর নয়; সহরে বাস করা দায় হবে। কত যে সব মরে পড়ে আছে—দুর্গন্ধে টেঁকা দায়। এবার কলেরা হবে নির্ঘাত। চল, চল।

হু-হু শব্দে যথারীতি ট্রেণ আসে। যাত্রী লইয়া সরিয়া পড়ে। ভীড় কিন্তু ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিতেছে। ষ্টেশন-ষ্টাফ পরিবার-পরিজন পাঠাইবার জন্য আর ব্যস্ত নয়। ব্রিজের অবস্থা ভাল। ট্রেণ বন্ধ হইবার আর কোন আশঙ্কা নাই।

ষ্টেশন-তলীতে দোকানের ঝাঁপ খোলে নাই। একটি বাড়ী হইতে কান্নার শব্দ আসিতেছে। ঘর চাপা পড়িয়া দোকানীরা প্রায় সকলেই মরিয়াছে। বিধবা মা'টি রাত্রে অন্য বাড়ীতে ছিল বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। সেই কাঁদিতেছে।

অজয়ের ধারে গ্রামখানির অবস্থা অতি শোচনীয় গ্রামখানি একরূপ জলে ডুবিয়া আছে। বানের প্রথম তোড় তাহাদের উপর দিয়া গিয়াছে। রিলিফের ব্যবস্থা বিকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বড় একটি গাছের তলার উঁচু যায়গায় গ্রামের লোকেরা আসিয়াছে সাহায্য লইবার জন্য। মুড়ি, গুড়, কাপড় বিলি হইতেছে। তাহাদের অবস্থা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। বুভুক্ষু হৃদয় ও মন লইয়া সকাতরে করুণাভিক্ষা চাহিতেছে।

অজয়ের বান তাহার স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া আর বসিয়া নাই। দাপট তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। মাসখানেকের মধ্যেই তাহার রূপ বদলাইয়া লইয়াছে; এখন দেখিলে মনে হয় না তাহার পূর্ব্বকৃত্যের কথা। সহর গ্রাম মাঠ ঘাট একাকার করিয়া মানুষ গোরু ছাগল সাপ ব্যাঙের মিলনের মহাক্ষেত্র রচনা করিয়া যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে এখন তাহার অবস্থা দেখিলে আদৌ সে কথা মনে হয় না। সেদিনের সেই অজয় আজ অন্যরূপ লইয়া ভাল মানুষটি সাজিয়া যেন বসিয়া আছে। সেই উচ্ছৃঙ্খলতার কথা যেন মনেই জাগে না। তাহার স্রোতও নাই, তেজও নাই। মানুষ গোরু অবলীলাক্রমে তাহার বুকের উপর দিয়া হাটিয়া যায়।

অজয়ের কোলে কোলে পলি মাটির উপর তরি-তরকারীর চারা গজাইয়াছে। গ্রামের চাষীরা মাটি খুঁড়িয়া গাছগুলিকে পরিপাটি করার চেষ্টায় আছে। বানের জল যে জমিগুলির তাজা বড় বড় ধানগাছের আয়ু শেষ করিয়া দিয়াছে, তাহার উপর আবার সবুজ করে ছোট ছোট ধান গাছের রেখা দেখা যাইতেছে। পলি মাটির উর্ব্বরতায় কচি কচি গাছগুলি পরিপূর্ণরূপে ফুলিয়া উঠিতেছে। সমস্ত ধারটাই সবুজ ক্ষেতে ভরিয়া উঠিয়াছে। ক্ষীণ জলস্রোতের গা পর্য্যন্ত ক্ষেতের রেখা পড়িয়াছে। অজয় গ্রামকে ডুবাইয়া, গ্রামবাসীদের পথে বসাইয়াছিল, এখন সেই গ্রামের চাষীরাই নদীর বুকে পিঠে কোদাল চালাইয়া ফসল ফলাইতে ব্যস্ত। অজয়ের আঘাত সহিয়াও তাহারা তাহা স্মরণে রাখে নাই। অথবা অজয় তাহাদিগকে গৃহহারা ছন্নছাড়া করিয়া আবার তাহাদিগ-কেই বুকে টানিয়া লইয়া আশ্রয় দিয়াছে। পরস্পরের দুঃখবেদনা বোধ যেন নিবিড় হইয়া আছে। অজয় আঘাত দিতেও জানে, ভালবাসিতেও জানে। অজয়কে দেখিলে তাই বিস্ময় লাগে।

দেখিতে দেখিতে বানের ক্ষীণ রেখাগুলি মিলাইয়া গেল। ভাঙ্গা গাছগুলি লোকেরা সরাইয়া লইয়া গিয়াছে। ভাঙ্গা দেওয়ালগুলি নূতন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাঙ্গা ঘরগুলির কতক ফেলিয়া দিয়াছে, কতক মেরামত করিয়া লইয়াছে। রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার। জমিতে আবার নূতন করিয়া ধানের সবুজচাড়া গজাইয়াছে। সহর ইতিমধ্যেই সংস্কার লাভ করিয়াছে। রাস্তায় লোক চলাচল পূর্ব্বের মত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; সহর দেখিলে আর বুঝিবার জো নাই। সারা মাঠ নূতন রূপে সাজিতে বসিয়াছে। পুকুর, খানার জল কানায় কানায় থাকিলেও তাহার ঘোলাভাব আর নাই। জল পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বানের স্মৃতি ক্রমে ক্রমে মানুষের মন ও মাটির বুক হইতে সরিয়া যাইতেছে।

গঙ্গার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ার ভাব আর অজয়ের নাই। শান্ত ছেলের মত গঙ্গার কোলে গিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। দুরন্তপনার কোন চিহ্নই তাহাতে দেখা যায় না।

অজয়ের বুকের উপর দিয়া যে বাঁধ রচনা করিয়াছে রেল কোম্পানী, তাহার দৃঢ়-বন্ধন শ্লথ হয় নাই। ট্রেণ চলিয়াছে দম্ দম্ শব্দে নদী কাঁপাইয়া, বেলাভূমি মাতাইয়া, দিকচক্রবালে ধূম্ররাশি ছড়াইয়া। উপর হইতে দেখা যায় ক্ষীণস্রোত বহিয়া চলিতেছে। পাথর ফেলিলে নদীর বুকে পড়িয়া শব্দ তোলে না, জল ছিটকাইয়া ফেলে না, বুদবুদ ওঠে না। প্রমত্ত অজয়ের যেন শেষ দিন আসিয়াছে। প্রায়শ্চিত্তের কথা স্মরণ করিতেছে বা!

দলে দলে লোক ফিরিতেছে। গৃহহারা অনাথের দল একে একে গ্রামে ঢুকিতেছে। সহরে গাড়ী-ঘোড়ার আনা-গোনা বাড়িয়াছে। যাহারা ফিরিতেছে তাহাদের মনে উৎকণ্ঠার শেষ নাই। আফিস, কাছারি, স্কুল, দোকান, বাজারে যথারীতি কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ভীত-চকিত ভাব আর কাহারও মনে নাই। শুধু স্মৃতির রেখা চকিতে কটাক্ষ হানে।

কয়দিন ধরিয়া খবরের কাগজে বড় বড় হেডিং দিয়া খবর বাহির হইয়াছে—অজয়ের বান। গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন প্রায়। সহর জলময়। শত শত গৃহহারা ষ্টেশনে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে। পুরাতন কাগজে আর মানুষের মনে এ সংবাদ কৌতূহল আনে না। কাগজগুলি পড়িয়া আবার সরাইয়া রাখে। দিনান্তের কর্ম্মক্লান্ত অবসরের ফাঁকে বানের কথায় আর তেমন ভয় জাগে না। সবই সহিয়া যায়। অজয়ের বান বহুবার আসিয়াছে, আসিবেও। তাহাকে কিছুতেই আটকান যায় না। দুর্দ্দান্ত বালকের মত মধ্যে মধ্যে সে ঝাঁপাইয়া আসে। অজয়কে তবু তাহারা ভালবাসে। ভাল না বাসিবার উপায়ও নাই।

ঝাঁসীর রাণী

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(সাত)

সিপাহীদের পরিচালকগণ দুর্গের উপর শ্বেত পতাকা উড়িতে দেখিয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কাপ্তেন স্কীন সন্ধি স্থাপনের জন্য যে তিনি সম্মত তাহা দৃঢ়তার সহিত শপথ করিয়া প্রকাশ করিলেন। তখন বিদ্রোহীদলের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন দেশীয় ডাক্তার, ডাক্তার সালে মুহম্মদ কাপ্তেন স্কীন্‌কে বলিলেন, যদি ইউরোপীয়েরা অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের নিকট দুর্গ সমর্পণ করেন, তবে তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা হইবে না। এ প্রস্তাব মানিয়া লইয়া—দুর্গবাসিগণ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বিদ্রোহীরা তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিল না। দুর্গবাসিগণ আত্মসমর্পণ করিয়া এবং অস্ত্র ত্যাগ করিয়া দুর্গ দ্বার পথে নিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রক্তলোলুপ সশস্ত্র বিদ্রোহী সিপাহীরা আসিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিল।

বন্দী করিয়াই কি তাহারা ক্ষান্ত রহিল? তাহা নহে, তাহাদিগকে ঝাঁসীর প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া নগরের বাহিরে বৃক্ষশ্রেণীর নিকট শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রাখা হইল। তাহার পর সহরের বাহিরে লইয়া গিয়া জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিশ্বস্ত জেল দারোগা—যাঁহার প্রতি ইউরোপীয়দের ছিল অগাধ বিশ্বাস এবং যে কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে বলিয়া সন্দেহ করা হয় নাই, সেই ব্যক্তিই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত হইল। দারোগা সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পূর্ব্বতন মণিবের প্রাণ সংহার করিল। মহিলাদিগকে শিশু ও বালক বালিকাদিগকে পুরুষদের নিকট স্বতন্ত্রভাবে রাখা হইল। ইঁহাদের সকলেই ঘাতকদিগের হস্তে প্রাণ হারাইল। হতভাগ্য নরনারীগণের মৃতদেহ তিন দিন পর্য্যন্ত সাধারণ রাজপথে ফেলিয়া রাখা হইল। এইরূপে প্রায় পঞ্চাশ, ষাট জন নিরপরাধ খৃষ্টিয়ানের শোণিতে ঝাঁসী কলঙ্কিত হইল; দুইটি অগভীর কবর খুঁড়িয়া তাহার একটিতে পুরুষদের এবং অন্য একটিতে স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদের কোন প্রকারে কবর দেওয়া হইয়াছিল। ঝাঁসী পুনরায় ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইলে পর—প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী পাদ্রী ধর্ম্মযাজক মিঃ শবে (Mr Schawabe) এবং স্যার হিউ রোজের সৈন্যদলভুক্ত রোমান্ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মিঃ ষ্ট্রিক্‌ল্যাণ্ড (Mr. Strickland) মৃতদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সহিত রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের কোনরূপ ষড়যন্ত্র ছিল কি না পরিষ্কারভাবে সে-বিষয়ে কিছুই জানা যায় নাই। কে সাহেব বলেন, "আমি বেশ বিশ্বস্তসূত্রেই জানিতে পারিয়াছি যে, এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে রাণীর কোন ভৃত্যই উপস্থিত ছিল না। আমার মনে হয়, প্রধানতঃ আমাদের পুরাতন ভৃত্যদের দ্বারাই এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল। অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্যদল কর্ত্তৃক এই অতিশয় নৃশংস হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল এবং আমাদের জেল দারোগাই ছিলেন এ-কার্য্যের অগ্রণী। এখানে কে সাহেবের লিখিত বিবরণী উদ্ধৃত করিতেছি—

"They then filed down, captors and captives, to a place near which was a cluster of trees. The Gaol-Darogha, who had been in the confidence of the superintendent and was never suspected of treachery, was at the head of the Party. But presently a halt was ordered. The murderous work commenced. The Daroga cut down his old master. Then a general massacre ensued. The women and children were separated from the men; but they shared the same sad fate. Not one of those who left the Town-Fort—man, woman, or child—was spared. The great crime accomplished, the bodies of some three score of our Christian people were left for three days on the road to rot. Then the men were cast into one gravel pit, the women into another, and lightly covered over. Long afterwards, when we again triumphed at Jhansi, the burial service was read over their remains by a Protestant minister, Mr. Schawabe, and Mr Strickland, the Roman Catholic priest, attached to Sir Hugh Rose's army."

"Thus the curtain fell upon the dismal tragedy which was the antetype, of the massacre of compare whether the Ranee instigated this atrocity, or to what extent she was implicated in it, can never be clearly known. I have been informed, on good authority, that none of the Ranee's servants were present on the occassion of the massacre. It seems to have been mainly the work of our own old followers. The irregular Cavalry issued the bloody mandate and our Gaol-Darogha was foremost in the butchery."

[Keye's Sepay war, Vol. III Page 369].

অস্ত্রহীন শরণাগত ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহীরা যে নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিল তাহার দরুণ—ঝাঁসীর রাণীর নামেও অযথা কলঙ্কের আরোপ করিতে কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে রাণী এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন এবং তাঁহার অজ্ঞাতেই ঐরূপ শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। "History of the Indian Mutiny" (1857-1858) প্রণেতা Colonel G.B. Malleson C. S. I.—ও তাঁহার গ্রন্থে রাণী এই হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট

ছিলেন এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—"The captives were pitilessly hewn down. Not a man, woman, or child, survived that afternoon's butchery.

Such was the massacre of Jhansi. A doubt has been raised as to the complicity of the Rani in the atrocious deed. But it must be remembered that not only was it that Rani who had instigated the slaughter of the three envoys sent by Captain Skene the morning after the investment, but it was she who profited by the slaughter. She wished to be rid of the English that she might seize the principality which she considered to be rightfully her own, and she hesitated not at the means by which they were moved from her path. [Page 190 Vol. I.] মেলিসন সাহেবের লক্ষ্মীবাইয়ের প্রতি এইরূপ কলঙ্ক আরোপ করা যে সঙ্গত নহে, কে সাহেবের লিখিত বিবরণী উদ্ধৃত করিয়া আমরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি।

মেলিসন্ সাহেব এ-বিষয়ে লিখিয়াছেন, ঝাঁসীর এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে রাণীর কতটা হাত ছিল তৎসম্পর্কে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। কাপ্তেন স্কীনের প্রেরিত তিনজন কর্মচারীকে যে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহাও রাণীর ষড়যন্ত্রেই হইয়াছিল, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কেন না রাণীর ইহাদ্বারা লাভবান হইবারই ছিল অধিক সম্ভাবনা। ইংরাজদের হাত হইতে মুক্তিলাভ এবং স্বাধীনভাবে ঝাঁসীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করাই ছিল তাঁহার একান্ত কাম্য। বুদ্ধিমতী রাণী সিপাহীদিগকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিয়া—রাণী হইবার জন্ত ইচ্ছুক ছিলেন, তিনি চাহিয়াছিলেন "রাণী" উপাধি, তিনি চাহিয়াছিলেন নিজ নামে মুদ্রা প্রচার, তিনি চাহিয়াছিলেন সর্বতোভাবে স্বাধীনতা—অর্থলোলুপ বিদ্রোহী সিপাহীরা এই রাণীর নিকট হইতে অর্থলাভ না পাইলে মৃত রাজার অবৈধ পুত্র সদাশিব রাওকে ঝাঁসীর গদীতে বসাইবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাও যে রাণীর বিদ্রোহীদলকে সহায়তা করা অন্যতম কারণ নহে, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যে অন্যরূপ আমরা তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এইরূপ, সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়া রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের মত উত্তেজিতভাবে দলে দলে আসিয়া ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ অবরোধ করিল। দলের অধিনায়ক রাণীর নিকট তিন লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। অসহায় রাণী লোক মারফত তাঁহাদের জানাইলেন যে, তাঁহার তহবিলে তিন লক্ষ টাকা নাই, কোথা হইতে কি ভাবে তিনি টাকা দিবেন!

বিদ্রোহীদের নেতা জানাইল—টাকা দিলে আমরা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিব না, আমরা দিল্লী চলিয়া যাইব, নতুবা সদাশিব রাওকে ঝাঁসীর গদীতে বসাইব। আমাদের টাকাই প্রয়োজন, নতুবা তোপের মুখে রাজপ্রাসাদ উড়াইয়া দিব। রাণী তাহাদের এইরূপ উক্তিতেও ভীতা না হইয়া তাঁহার পিতা মোরো পন্তকে রাণীর অবস্থা বেশ ভালভাবে বুঝাইয়া বলিবার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন, বিদ্রোহীরা মোরো পন্তকে বন্দী করিল।

অবশেষে একান্ত নিরুপায় হইয়া রাণী তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া এক লক্ষ টাকা বিদ্রোহী দলের সর্দারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সিপাহীরা টাকা পাইয়া তাঁহার পিতাকে মুক্তি দিল এবং প্রফুল্লমনে "মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাকো, অম্মল রাণী লক্ষ্মীবাইকা" (The people are God's, the country is the Padshaha's and the Raj is Ranee Lutchmee Baee's.") চীৎকার করিতে করিতে দিল্লী অভিমুখে চলিয়া গেল।

ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঝাঁসী রাজ্য সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্মীবাইয়ের শাসনাধীনে আসিল।

সিপাহীরা চলিয়া গেলে পর লক্ষ্মীবাই গভর্ণমেণ্টের নিয়োজিত ফৌজদারী সেরেস্তাদার ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ গোপালরাওয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সাগর (Sagar) প্রদেশের কমিশনারের নিকট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সে সমুদয় বিষয় বিবৃত করিয়া পত্র দিলেন এবং ঝাঁসীর সম্বন্ধে এইরূপ অবস্থায় কি করা কর্তব্য তদ্বিষয়েও পরামর্শ চাহিয়া পাঠাইলেন। সে-সময়ে সাগর প্রদেশে কোনরূপ অশান্তির কারণ ঘটে নাই। রাণীর পত্র পাইয়া তাঁহারা সতর্ক হইয়া গেলেন, সেখানে আর বিদ্রোহ ঘটিতে পারিল না। সিপাহী বিদ্রোহের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত আপনা হইতেই ঝাঁসীরাজ্যের শাসনসংরক্ষণের ভার সম্পূর্ণ ভাবে রাণীর হাতে আসিয়া পড়িল।

এই সময়ে রাণী তাঁহার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাজ্যের উন্নতি করে আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রথমেই সৈন্যদল গঠনে ও তাহাদের সর্ববিধ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজপ্রাসাদ দৃঢ়ভাবে সংস্কৃত হইল। নূতন অস্ত্রাগার, বারুদাগার নির্ম্মিত হইল। টাকশাল নির্ম্মাণ করিয়া মুদ্রা তৈয়ারী ও প্রচার করিতে লাগিলেন। দুর্গমধ্যে প্রোথিত তিনটি কামান এবং রাজপ্রাসাদ মধ্যে লুক্কায়িত চারিটি কামান আনিলেন এবং চারিদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ধুঁধুপন্ত, নানাসাহেব প্রভৃতির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, বুন্দেলখণ্ডের সর্দারদের আহ্বান করিয়া এক দরবার করিলেন, সর্দারেরা ঝাঁসীতে সমবেত হইয়া ইংরাজ গভর্মেণ্টের আনুগত্য রক্ষা করিয়া রাণীকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বিদ্রোহী সিপাহীদের আক্রমণেই ঝাঁসীতে ইংরাজ কোম্পানীর প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল। ঝাঁসীর রাণীর আধিপত্য গ্রহণে ক্রুদ্ধ হইয়া সদাসিবরাও নারায়ণও ঝাঁসী অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া করেরা নামক দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইংরাজদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করেন। পরে কতকগুলি গ্রাম অধিকার করিয়া সদাসিব আপনাকে "ঝাঁসীর রাজা" বলিয়া প্রচার করিতে থাকেন। লক্ষ্মীবাই তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়া করেরা দুর্গ অবরোধ করিলে পর সদাসিব সিন্ধের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানে ঝাঁসী আক্রমণ করিবার জন্ত সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত

হইলেন। এইবার সদাশিব ঝাঁসী আক্রমণ করিলে পরাজিত ও বন্দী হন।

ব্রিটিশ প্রভাব বিলুপ্ত হইবার পর নিকটবর্ত্তী রাজা ও নবাবেরা ঝাঁসীর রাণীকে অসহায়া মনে করিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হন, তাহাদের মধ্যে তেহরীর বা বোরছার নবাবের দেওয়ান নত্থেখাঁ ঝাঁসী আক্রমণ করিলে রাণী যে অদ্ভুত সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হইতে পারেনা।

নত্থেখাঁর সঙ্গে ছিল কুড়িহাজার সৈন্য। এসময়ে রাণীর সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিলনা—তথাপি তিনি ভীতা না হইয়া নত্থেখাঁর আক্রমণ-গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এসময়ে রাণীর দরবারের কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহই যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন না। মন্ত্রী লক্ষ্মণরাও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ কেহই এই বিরোধের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহারা চাহিয়াছিলেন দেওয়ানের অধীনতা মানিয়া লইয়া সন্ধি করাই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা রাণী কোনরূপেই এই হীনতা ও দীনতা স্বীকার করিতে সম্মতা হইলেন না, তিনি কহিলেন:—"সিংহিনী কি কখনও ব্যাঘ্র ভয়ে ভীতা হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারে? সেকি কখনও সম্ভব! তোমরা পুরুষ হইয়া কোন মুখে এইরূপ হীন প্রস্তাব কর? তোমরা কি ভুলিয়া গেলে যে মহিষমর্দ্দিনী দেবী চণ্ডিকার অংশভূতা নারীশক্তি—বিনাযুদ্ধে পরাজয় মানিয়া লইবে? অসম্ভব সে কথা।" মন্ত্রিগণ, সর্দ্দারগণ সকলে এই বীরাঙ্গনার সাহস ও নির্ভীকতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহারাও অবশেষে রাণীর মতে মত দিলেন। ঝাঁসীর রাজ্যের সৈন্যগণ যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। তাঁহার সখী ও সঙ্গিনী চম্পা ও সুন্দরা ও অন্যান্য পুরনারীগণও পুরুষের বেশে রণসাজে সজ্জিতা হইলেন। সকলের হাতে শোভা পাইল উন্মুক্ত কৃপাণ।

রাণীর নিকট হইতে নত্থেখাঁ দূতমুখে সংবাদ পাইলেন, "ঝাঁসী এসময়ে আমার নিকট ইংরাজ কোম্পানীর গচ্ছিত রাজ্য, দ্বিতীয়তঃ আমি সহায়হীনা অবলা নারী, আপনার কর্ত্তব্য এই দুঃসময়ে আমাকে সাহায্য করা, তাহা না করিয়া আপনি আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ইহা কি বীরের ধর্ম্ম?"

নত্থে খাঁ রাণীর দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি ইংরাজদের নিকট হইতে যে বৃত্তি পান, সেই পরিমাণ টাকা, আমি আপনাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছি, আপনি ঝাঁসীর রাজ্য ও দুর্গ বিনা দ্বিধায়, বিনা যুদ্ধে আমার হস্তে সমর্পণ করুন।"

লক্ষ্মীবাঈ নত্থে খাঁর এইরূপ অসঙ্গত-প্রস্তাবে ক্রুদ্ধা হইলেন এবং যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন।

তিনি কুমার জওহর সিংহকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার ললাটে পরাইয়া দিলেন বিজয় তিলক, হাতে পরাইয়া দিলেন বীরবলয়। বীর জওহর সিংহ মহাউল্লাসে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধ যাত্রার জন্য সৈন্য সজ্জা করিতে লাগিলেন। রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের একজন অতি বিশ্বস্ত ও কৌশলী গোলন্দাজ ছিলেন, তাঁহার নাম গোলামগৌস।

'গোলাম গৌস এক সময়ে ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ গোলন্দাজ কিন্তু অনেককাল সেকার্য্যে বিরত ছিলেন, কিন্তু রাণীর আদেশে প্রবীণ গৌস খাঁ আবার নবীন উৎসাহে তোপগুলির সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ঘনগর্জ্জ, মহাকালী, ভবাণীশঙ্কর, বিজলী, নামক তোপগুলি পুনরায় পরিষ্কৃত ও ব্যবহারের যোগ্য হইয়া—বুরুজের উপর সজ্জিত হইল।

রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের নেতৃত্বাধীনে পুরুষ সেনাবাহিনীর সঙ্গে নারী সেনাও রণবেশে সজ্জিতা হইয়া নত্থেখাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। পেশোয়ার ভগোয়া ঝাণ্ডা, ব্রিটিশের ইউনিয়ান জেকের সহিত সম্মিলিত ভাবে দুর্গের ও প্রাসাদের সু-উচ্চ বুরুজের উপর পত্‌ পত্‌ শব্দে উড়িতে লাগিল।

এদিকে কর্ত্তব্যপরায়ণা রাণী—ঝাঁসীর এই শঙ্কটজনক পরিস্থিতির অবস্থা শ্রীগোপালরাও লগুটের দ্বারা সবিস্তারে লিখাইয়া মধ্যভারতের এজেণ্ট স্যার রবার্ট হেমিলটনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু নবনিযুক্ত অযোগ্য দেওয়ান একজন অযোগ্য অকৌশলী কর্ম্মচারীর দ্বারা এই পত্র প্রেরণ করিবার ফলে ফলিল বিপরীত ফল। ঝাঁসী ছিল ইন্দোরের এজেণ্টের অধীন। ইন্দোর যাইবার পথে—সে নত্থেখাঁর লোকদের দ্বারা ধৃত হইল—রাণীর পত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে এক পত্র লিখিয়া ঝাঁসীর রাণীর সম্পর্কে অনেক অসত্য কথা লিখিয়া এজেণ্টের নিকট পাঠাইয়া দিল। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রাণীর অদৃষ্টাকাশে দেখা দিল প্রলয়ের ধ্বংসলীলার ঘোর ঘনঘটার প্রকাশ। সেকথা পরে বলিতেছি। নত্থেখাঁর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রবল সেনাদল বন্যার প্লাবনের মত ছুটিয়া আসিয়া রাণীর সেনাদলকে আক্রমণ করিল। নত্থেখাঁ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রাণীর সৈন্য সংখ্যা অল্প। কাজেই অল্প সংখ্যক সৈন্যদিগকে সহজেই পরাজয় করা সম্ভব—এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল, এজন্য ভীম বিক্রমে তাঁহার সৈন্যেরা দুর্গের সমীপস্থ হইয়া দুর্গের দরজার উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল।

গোলন্দাজ শ্রেষ্ঠ গোলামগৌস, যেমন নত্থেখাঁর সৈন্যেরা দুর্গের নিকটে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন; দুর্গের ভবানীশঙ্কর, মহাকালী প্রভৃতি নামধের তোপ হইতে গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে চারিদিক নিনাদিত করিয়া শত্রুসৈন্যের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। নত্থেখাঁর সৈন্যদল এইরূপ দুর্গ হইতে অবিরত অগ্নিবর্ষণের ফলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাণীর সৈন্যদল তাহাদের পলায়নপর হইতে দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অল্প সময়ের মধ্যেই নত্থেখাঁর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ঝাঁসীর রাণীর কণ্ঠে বিজয়মাল্যখানি সযত্নে পরাইয়া দিলেন বিজয় লক্ষ্মী। নত্থেখাঁ পরাজিত হইয়া ভগ্নমনে প্রস্থান করিলেন—ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের বীরবত্তা সাহস ও রণনৈপুণ্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করিল।

আট

ইংরেজদের অনুপস্থিতিকালে রাণী লক্ষ্মীবাঈ দশমাস কাল পর্য্যন্ত ব্রিটিশ কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে ঝাঁসী রাজ্যের শাসন কার্য্য অতিশয় নিপুণ ভাবে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন।

এসময়ে তিনি যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই নারী জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয়। এবং ভারতের যে সমুদয় মহিয়সী মহিলা রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত রাণীর তুলনা করা অশোভন নহে।

বিচার কার্য্যে, শাসন সংরক্ষণে, সৈন্ত পরিচালনে, রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তিবিধানে ছিল তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মপটুতা। লক্ষ্মীবাঈ তখন মাত্র তেইশ বৎসর বয়স্কা যুবতী, দেখিতে ছিলেন অপূর্ব্ব রূপসী, তাঁহার সুগঠিত সুন্দর দেহ, একদিকে যেমন সৌন্দর্য্যের প্রতিমা রূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, আবার তেমনি ছিল তাঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি অশেষ গুণ। একদিকে যেমন ছিল তাঁহার চরিত্রের কঠোরতা, অন্ত দিকে ছিল তেমনি তাঁহার চরিত্রে কোমলতা। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি কোন সময়েই দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেন না। প্রজাগণ তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। নৈতিক চরিত্রে বলবতী, কঠোরব্রতাবলম্বিনী অনশনপরায়ণা এই বীরাঙ্গনা মহিলা ছিলেন সর্ব্ব বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্না মহীয়সী মহিলা।

যে দশ মাস কাল রাণী লক্ষ্মী বাই রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি প্রত্যেকটি কাজ নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন করিতেন। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম্ম কার্য্য, অধ্যয়ন পারিবারিক কার্য্য ইত্যাদি সম্পন্ন করিতেন। স্বর্গত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত রাণীর দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী বিষয়ের অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। "রাণী প্রতিদিন বেলা তিনটার সময় প্রায়শঃ পুরুষবেশে কখন কখন নারী বেশে সজ্জিত হইয়া, দরবারে উপস্থিত হইতেন পায়ে পায়জামা, অঙ্গে বেগুণী বস্ত্রের অঙ্গরক্ষা, মাথায় টুপী, উহার উপর পাঠানী পাগড়ী, কোমরে জরির দোপাটা, উহাতে লম্বমান রত্নখচিত অসি। তাঁহার এই রূপ পুরুষ বেশে তদীয় যৌবনোদ্ভাসিত গৌরকান্তি অধিকতর রমণীয় হইত। পতি বিয়োগের পর তিনি হাতে হীরার বালা, গলায় মুক্তার মালা এবং অনামিকায় হীরার অঙ্গুরী ভিন্ন আর কোন অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। তাঁহার কেশ প্রায় বদ্ধ থাকিত, শ্বেত সাটি ও শ্বেত কঞ্চলিকা তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। এই রূপ নারীবেশে তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী গৌরী বলিয়া বোধ হইত। তিনি দরবার ঘরে বসিতেন না। তাঁহার বসিবার ঘর দরবার ঘরের সংলগ্ন ছিল। এই গৃহের দ্বারদেশে পর্দ্দা থাকিত। সুতরাং বাহিরের লোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তিনি গদির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া, সমীপস্থ কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে যথাযোগ্য আদেশ দিতেন; কখন কখন আদেশপত্র তৎকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইত। তাঁহার যেমন রাজ্যশাসন ক্ষমতা, সেইরূপ দেবভক্তি, আশ্রিতজন প্রতিপালন প্রবৃত্তি ও দীন দুঃখীদের প্রতি দয়া ছিল। নত্থেখাঁর সহিত যুদ্ধের সময়ে তাঁহার অসীম দয়ার্দ্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। তিনি আপনার আহত সৈনিকদিগের চিকিৎসাকালে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন, প্রশংসাবাদে তাহাদের কষ্টের লাঘব করিতেন। এইরূপ সদয়ভাব, এইরূপ স্নিগ্ধ ব্যবহার, এইরূপ প্রীতিময় কোমলতায় তিনি প্রজালোকের মাতা ছিলেন। তাঁহার সভায় নানা দেশীয় গুণিগণের সমাগম হইত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, আপনাদের উপাস্যদেবী শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি ছিল। তিনি প্রতি শুক্রবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে প্রিয়তম পুত্র দামোদর রাওকে সঙ্গে লইয়া সরোবর মধ্যস্থিত মন্দিরে শ্রীমহালক্ষ্মীর দর্শনে যাইতেন।*

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাণী যে সংবাদ ইন্দোর মধ্যভারতের এজেণ্ট স্যার রবার্ট হেমিলটনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহা শত্রু হস্তগত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিল, বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের ফলে, কোথায় রাণী দশমাসকাল ঝাঁসী শাসন সংরক্ষণ করিবার জন্য পুরস্কৃত হইবেন, তাহা না হইয়া হইল তাহার বিপরীত।

ইংরাজ সেনাপতি স্যার হিউরোজ (Sir Hugh Rose) বিদ্রোহ দমন করিতে করিতে ঝাঁসীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি ঝাঁসী হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে চন্দনপুরে ছাউনি করিলেন। লক্ষ্মীবাঈ ভাবিলেন, আমি দশ মাস কাল ইংরাজদের পক্ষে থাকিয়া ঝাঁসীর সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়াছি, বিদ্রোহ দমন হইলেই ইংরাজ সরকার আমার কাজে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সমাদর করিবেন। এইরূপ আশা পোষণ করিয়া তিনি সমুদয় বিবরণ স্যার হিউরোজকে জানাইলেন, কিন্তু যে উত্তর আসিল, তাহাতে রাণী আপনাকে যারপরনাই অপমানিত মনে করিলেন। হিউজ বলিয়া পাঠাইলেন, "মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ যদি দুর্গ খালি করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় একা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে রাণী যে ইংরাজের পক্ষে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া কাজ করিয়াছেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন।"

রাণী এইরূপ প্রত্যুত্তরে প্রাণে আঘাত পাইলেন, বীরাঙ্গনা নারী এ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি ভবিষ্যতে ইংরাজের সহিত মিত্রভাব ও সৌহার্দ্দ্য বন্ধ করিয়া মিলিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, সেই আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সম্মুখে ভীষণ বিপদের আশঙ্কা করিয়া আত্মসম্মান ও রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করাই স্থির করিলেন।†

---

* সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত; পঞ্চম ভাগ ৪০৩—৪০৪ পৃষ্ঠা।

† ইংরাজ পক্ষ হইতে প্রকৃত কিরূপ সংবাদ আসে তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ বিভিন্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—কেহ কেহ বলেন, রাণী যদি অস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহার মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী সহ ইংরাজ শিবিরে গমন করেন, তবে ইংরাজেরা তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন, অপর মত এই যে, ইংরাজরা রাণী শিবিরে গমন করিলে তাঁহাকে বন্দী করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন এবং ইংরাজদের এই সিদ্ধান্তের বিষয় লোকমুখে রাণীর নিকট প্রচারিত হওয়ায় রাণী যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত হয় যে, রাণী যে ব্যক্তিকে ইংরাজের নিকট দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাহাকে ফাঁসী দিয়াছিল, এই সব নানা কারণে যেরূপ প্রবাদই সত্য হউক না কেন, রাণী লক্ষ্মীবাঈ ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

এবং সগর্ব্বে বলিলেন ঃ "মেরা ঝাঁসী নেহি দেয়েঙ্গে।" মহারাণী ও তাঁহার সেনানায়কগণ পরামর্শ করিয়া যুদ্ধের জন্ত বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইলেন। সে সময়ে ঝাঁসী সহরে ও দুর্গ মধ্যে এগারো হাজার সিপাহী ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহীদলভুক্ত ছিল। এই সেনার মধ্যে বুঁদেল, আফগান, ইত্যাদি রণনিপুণ সৈন্ত ছিল ইহেশীর ভাগ। এদিকে স্তার হিউরোজও ঝাঁসী আক্রমণ করিবার জন্ত স্বয়ং পদাতি-সৈন্তসহ ২০শে মার্চ্চ তারিখ ঝাঁসীতে উপনীত হইলেন।

স্তার হিউজ নগর ও দুর্গের মধ্যভাগে ছাউনি করিলেন। ঐ স্থানের দক্ষিণ ভাগে পাহাড়ের সারি বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাহাড়ের মধ্য দিয়াই ঝাঁসীর পথ চলিয়া গিয়াছিল—অন্তদিক দিয়া দতিয়ার পথ ছিল প্রসারিত। নগরের কাছাকাছি কতিপয় দেবমন্দির এবং তেঁতুল বৃক্ষের শ্রেণী। উত্তর দিকে উন্নত শিলাসঙ্কুল পর্ব্বতের উপর ঝাঁসীর দুর্গ উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান ছিল।

২১শে মার্চ্চ স্তার হিউরোজ ঝাঁসীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে নিয়োজিত রহিলেন এবং কি ভাবে নগর ও দুর্গ আক্রমণ করিবেন সে বিষয়ে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং যথাস্থানে সৈন্ত স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দূরবীণ যন্ত্র এবং হিলিয়োগ্রাফ ইত্যাদি ছিল। এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে ইংরাজ সেনানীরা দুর্গের আভ্যন্তরীন অবস্থা সহজেই জানিতে পারিত। ২২শে মার্চ্চ নগর এবং দুর্গ সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ সৈন্তগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। রাণী যুদ্ধের পূর্ব্বে এক আশ্চর্য্য রণচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি ঝাঁসীর নিকটবর্ত্তী স্থানের তৃণ সম্পূর্ণ-রূপে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

২৩শে মার্চ্চ—রাণীর ও ইংরাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইংরাজের তোপ দুর্গের দিকে গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ঝাঁসীর গোলন্দাজেরা যখন দুর্গ হইতে মহাকালী, 'ভবানী শঙ্কর, আর ঘনগর্জ্জ' নামক তোপ হইতে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ইংরাজ সৈন্ত প্রমাদ গণিল। ইংরাজেরা 'ঘনগর্জ্জ' তোপের নাম দিয়াছিলেন Whistling Dick—হুইস্‌লিং ডিক্। এই তোপের গোলা বড় ভয়ঙ্কর ছিল। এই তোপ হইতে গোলা বর্ষণের সময় ধূম দেখা যাইতনা, এই জন্ত কেহ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিত না এবং হঠাৎ গোলার আঘাতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইত। কাজেই আক্রমণকারীদের আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া গেল। ইংরাজ সৈন্ত ইহাতে নিরস্ত রহিল না, তাহারা রাত্রিকালে সুযোগ বুঝিয়া আবার আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। রাণীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাঁহার সৈন্তদলও রাত্রিকালেও সতর্ক দৃষ্টি ও সতর্ক ভাবে প্রস্তুত ছিল। রণদামামার ঘন-গভীর রবে, সৈন্তগণের কোলাহলে এবং প্রজ্জ্বলিত মশালের দীপ্তিতে নগর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন প্রভাত হইতেই গোলন্দাজেরা দুর্গ-প্রাকার হইতে গোলা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এইবারকার তোপের গোলা সেইরূপ ফলপ্রদ হইলনা, ইংরাজ সৈন্তদের মাথার উপর দিয়া পড়িতে লাগিল। ২৪শে মার্চ্চ তারিখের দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ইংরাজ সেনাগণ পশ্চিম দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিল। নগরের এই অংশ অরক্ষিত ছিল। সহস্র সহস্র নাগরিক ব্রিটিশের আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, চারিদিকে হাহাকার জাগিয়া উঠিল। রাজপথ জনশূন্ত হইয়া গেল। ইংরাজের তোপের নিক্ষিপ্ত শেল (কুলুপী গোলক) প্রবল বেগে নগরের দিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। ফলে ঘর বাড়ীতে আগুন লাগিল, নগরের সর্ব্বত্র ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইল। নগরবাসীরা অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল, কোথায় যাইবে ? সকল অবরুদ্ধ। সর্ব্বত্র অগ্নির লেলিহান জিহ্বা—সর্ব্বত্র ভস্মস্তূপ, সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ ও হাহাকার ; এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করিল।

এই বিপদমুহুর্ত্তে রাণী বিচলিতা হইলেন না। তিনি হতভাগ্য আহত ও গৃহহারাদের জন্ত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিলেন, আহারের জন্ত অন্নসত্র খুলিলেন। তাহাদিগকে স্নেহবাক্যে ও সেবার দ্বারা শান্ত ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ২৫শে মার্চ্চ, ১৮৫৮।

মহারাণী লক্ষ্মীবাইয়ের অবস্থা যে এ সময়ে কিরূপ দাঁড়াইয়া-ছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইতে হয়। একদিকে প্রজাদের রক্ষা ও পালন, অপর দিকে যুদ্ধের আয়োজন ও পরিচালন, তরুণী লক্ষ্মীবাই কোনরূপেই ভীতি বিহ্বলা হইয়া হাল ছাড়িলেন না। রাণীর সৈন্তেরা কোনরূপেই বিচলিত না হইয়া—আক্রমণকারীদের আক্রমণ নিবারণের জন্ত প্রকৃত বীরের ন্তায় সাহস ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করিতেছিল।

পঁচিশে তারিখ ইংরাজ সৈন্ত কর্ত্তৃক দুর্গের দক্ষিণ দিক্ আক্রান্ত হইল। এ সময়ে রাণীর গোলন্দাজ গোসাঁই দক্ষিণ দিকের বুরুজ হইতে এইরূপ ভাবে আক্রমণকারীদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িতে লাগিলেন যে—ইংরাজের তোপ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। লক্ষ্মীবাই—এই বীর পুরুষকে উপযুক্ত অর্থ পারিতোষিক স্বরূপ দান করিয়া তাহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ২৫শে তারিখ হইতে ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত আক্রমণকারীদের সহিত ঝাঁসীর রাণী ও তাঁহার সৈন্তগণ যেরূপ ভাবে উৎকৃষ্ট অস্ত্রাদি ব্যতীতও ইংরাজ সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়, এমন কি ইংরাজ সেনাপতিরা পর্য্যন্ত অকুন্ঠিত কণ্ঠে রাণীর বীরত্ব ও রণ-নৈপুণ্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

ক্রমে ইংরাজ সৈন্যের পরাক্রম বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাহারা নগরের প্রধান তোরণের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে উভয় পক্ষে ভয়ঙ্কর মারামারি ও কাটাকাটি চলিতে লাগিল। সে ভয়াবহ দৃশ্যের কথা কল্পনা করিতে পারা যায়না।

[ক্রমশঃ

করিতেই দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ যে রাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তাঁর উক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, এ সমুদয় প্রবাদমূলে তা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করা যায় এবং এ জন্যই যে রাণী ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ।

"বন-প্রকৃতির মায়ায় জড়ানো ধরণীর ভালবাসা"

[ফটো—রবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

……জাতীয়তা বলিতে বুঝা উচিত—সমস্ত মনুষ্য-সমাজের ঐক্যবন্ধন—এবং যাহাতে প্রত্যেক মানুষ আর্থিক অসচ্ছলতা, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত এড়াইতে পারে, তাহাই হওয়া উচিৎ জাতীয়তার উদ্দেশ্য। জাতীয়তার উদ্দেশ্য লাভ করিবার উপায়—কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, রাজ্য-পরিচালনা ও শিক্ষার প্রকৃত বিজ্ঞান ও সংগঠন-নীতির পুনরুদ্ধার। কৃষি, শিল্প অথবা বাণিজ্যের যে বিজ্ঞানে এবং সংগঠন-নীতিতে মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতা এবং পরমুখাপেক্ষিতা দূরীভূত হয় না, তাহা শুনিতে যত মধুর হউক না কেন, অথবা তাহা যতই প্রসিদ্ধ লোকের মস্তিষ্ক ও লেখনী হইতে প্রসূত হউক না কেন, তাহা যে ঐ ঐ বিষয়ক প্রকৃত বিজ্ঞান ও সংগঠন-নীতি নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।…

—সচ্চিদানন্দ

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

শ্রীকুমুদনাথ দাস

মিল্টনের ল্যাটিন কবিতাগুলি তাঁহার গ্রন্থাবলীর সহিত ছাপা হয়। মধুসূদন বিদেশীয় ভাষায় যে-সব কবিতা লিখিয়াছিলেন সেগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার গ্রন্থাবলীর সহিত ছাপিবার ব্যবস্থা করা যায় না? জাতীয় মহাকবির সমস্ত-রচনাই আদরের সহিত রক্ষা করা উচিত।

ইউরোপে সাহিত্যিকদের স্মৃতিরক্ষার জন্য দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের জন্মভূমিতে স্মৃতিসৌধ, মর্ম্মরমূর্ত্তি, পাঠাগার, মিউজিয়াম প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের দেশে কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মারা গেলে খবরের কাগজে দু'এক কলম লেখা ও দু'একটা শোকসভা ছাড়া বিশেষ কিছু হয় না। দেশ গরীব বুঝি, কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছার অভাবও নাই কি? ইউরোপ-বাসীদের মত আমরা গুণের আদর করিতে জানি না।

লোকপ্রিয়তাকে কেহ কেহ সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি ধরিয়া থাকেন। যদি সাধারণ পাঠকের রুচি মার্জ্জিত হয়, তবে ইহার বিরুদ্ধে বলিবার কিছু নাই। কিন্তু বাস্তব জগতে আমরা কি দেখি? সাধারণ লোক খুব হুজুকপ্রিয় এবং কি ভাল কি মন্দ বিচার করিতে পারে না। জনতা ব্রুটাস ও এণ্টনী উভয়ের বক্তৃতাতেই মাতিয়াছিল।

'The people's voice in odd.
It is not the voice of God.'

শীলার বলিয়াছেন, "Votes should be weighed and not counted." সাহিত্যবিচারেও এই নীতি অনুসরণ করিলে কিরূপ হয়?" ইস্কাইলাস অবিশেষজ্ঞদিগকে উপেক্ষা করিয়াছেন। মিল্টন 'fit audience, though few' চাহিয়াছিলেন।

কোন রচনা প্রকাশিত হইলে তাহা ভাল কি মন্দ, দশ জন বিচার করে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে লেখকের ভাল করিয়া দেখা উচিত, তাহা তাঁহাকে বিশেষ আনন্দ দান করে কি না। যদি না করে, তবে তাহা পাঠককেও আনন্দ দান করিতে পারিবে না—ইহাই তাঁহার ধরিয়া লওয়া উচিত। Jonbert বলিয়াছেন, "Never write anything that does not give you great pleasure; emotion is easily propagated from the writer to the reader. *

যে-বিষয়ে ভাল জানা নাই, সে-বিষয়ে না লেখাই উচিত।

রাস্কিন সকল শ্রেণীর গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সাময়িক ও সার্ব্বজনীন।

যে-সব বই কোন সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তাহাদের বিশেষ মূল্য নাই। কিন্তু যে-সব বই হৃদয়ের শাশ্বত ক্ষুধা নিবারণ করে, তাহাদের মূল্য অপরিমেয়. তাহাদের পাঠক শুধু সমসাময়িকগণ নয়, দূর ভবিষ্যদ্বংশীয়গণও।

গ্যেটে বলিয়াছেন, "কোন বই সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য, ইহা আমাকে কি আনিয়া দেয়, ইহাতে আমি কি আভাস পাই?" হাডসনের মতে প্রকৃত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের লক্ষণ এই যে, ইহা নূতন কথা নূতন ভাবে বলে।

আপন রুচি অনুসারে পাঠক লেখককে বিচার করিয়া থাকে। জনসন সেক্সপীয়র মিল্টন প্রের কবিতার নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু পোপের কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাহার মূলে তাঁহার রুচি—'He took it for granted that the kind of poetry which flourished in his time, which he had been accustomed to hear from his childhood, and which he had himself written with success was the best kind of poetry." *

একখানা বই পাঠক কি ভাবে বিচার করে তাহার দ্বারা সাহিত্যরুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তা' নয়, অনেক স্থলে সে যে কিরূপ লোক, তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

অনেক স্থলে যে রুচি দ্বারা যে লেখকের রচনা উপভোগ করিতে হইবে, তাহা তিনি সৃষ্টি করেন।

'My heart laments that virtue cannot live out of the teeth of emulation.' *

সাধারণ লোক মাৎসর্য্যের প্রচার এড়াইতে পারে না, [illegible] যাঁহারা সাধারণের অনেক উর্দ্ধে, তাঁহাদের মধ্যে যদি ইহার বিকাশ দেখা যায়, তাহা হইলে আর কোন আশার পথ থাকে না। বড় বড় কবি বৈজ্ঞানিক হইতে জগতে সমস্ত প্রেরণা আসে, কিন্তু তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে Green-eyed monster-এর প্রভাবে এমন ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার ভাব টিকিতে পারে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করিতে পারেন নাই। দেশবন্ধু রবীন্দ্রনাথকে দেখিতে পারিতেন না। উহার মূলে কি ছিল নির্ণয় করা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ১৩৩৩ সালে ৩রা বৈশাখ তারিখে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত তাঁহার পত্র হইতে পাওয়া যাইবে। সেই পত্রে এক জায়গায় আছে: 'অনেকে গল্প রচনা সম্বন্ধে শরৎকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে। তাতে আমার ভাবনার কারণ এইজন্য নেই যে, কাব্য রচনা সম্বন্ধে আমি যে শরতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সে-কথা অতিবড় নিন্দুকও অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না।" Last, infirmity of noble minds!

অনেক সময় স্বয়ং লেখকের নিকট একটা রচনা বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন রকম লাগিয়া থাকে, পাঠকের নিকট যে লাগিবে, তাহাতে বিচিত্র কি?

* "cf. "Take sidney's maxim, 'Look at thy heart and write. He that writes to himself writes to an eternal public. That statement only is fit to be made public, which you have come at, in satisfying your own curiosity."—Emerson.

* Shakespeare.

* ৩-১০-৪৪ তারিখের "আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত।

একখানা ভাল বইয়ের বিশেষত্ব এই যে, ইহা শ্রেষ্ঠ বন্ধুর মত হৃদয় জয় করিয়া বসে—দেশ, কাল, জাতি ও ধর্ম্মের কোন ব্যবধান এই জয়ের পথে বাধা হইতে পারে না।

যে জিনিষ একবার পড়িয়া আবার মধ্যে মধ্যে পড়িতে ইচ্ছা না হয়, তাহার বিশেষ সারবত্তা বা আকর্ষণী শক্তি নাই।

কোন ভাল জিনিষ পড়িলে তাহা বন্ধু-বান্ধবকে শুনাইতে এবং তাহার সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতে ইচ্ছা হয়।

সাহিত্যে যে-সব ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে নাই। এইরূপ প্রচেষ্টা হইতে ভবিষ্যতে উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে—"Out of pieces come master pieces as even out of evil cometh good. Peacocks will come when they will come. Mean-while let us smile for the cocks we have and not pine for the pea we have n't.'

'We have climbed a height indeed,
But alas, the highest is yet to come,'

জ্ঞানের জগৎ ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে—ভবিষ্যতে আরও ভাল ভাল লেখকের আবির্ভাব এবং আরও উন্নত সাহিত্যের যে সৃষ্টি হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বাণীর মন্দিরে অসংখ্য পূজারী নীরব সাধনায় নিমগ্ন। বাণীর কৃপায় কাহার লেখনী হইতে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে কিরূপ রচনা বাহির হইবে, তাহা কে জানে? এমন শক্তিশালী লেখকেরও আবির্ভাব হইতে পারে, যাহার কাছে রবির তেজও ম্লান।

একবার খুব নাম হইয়া গেলে লেখক নাম ভাঙ্গাইয়া খান। "Scott's celebrity made everything that fell from him, however trifling the dewdrops from the lion's mane—of value," অনেক সাহিত্যরথী সম্বন্ধে এ মন্তব্য খাটে।

বড় ছোট সব লেখকেরই একটা উদ্দীপনার কাল আছে, যখন তাঁহার লেখনী হইতে যাহা বাহির হয়, তাহাই উত্তম রচনা।

প্লেটো বলিয়াছেন, 'A poet cannot compose unless he becomes inspired.' রামায়ণ রচনার পূর্ব্বে বাল্মীকির মধ্যে যে উন্মাদনা আসিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহার জলন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন। নূতন উন্মাদনা আসিলে কবি যেন ছটফট করেন, কি যেন বলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। স্বপ্নভঙ্গের পর নির্ঝর যেমন প্রাণের আবেগ রুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া—

"মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ মাঝারে লুটিতে চায়—"

নূতন অনুপ্রেরণা আসিলে কবিও তেমনি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভাবটা ভাল করিয়া ব্যক্ত হয়, ততক্ষণ স্বস্তি পান না।

ইংরেজীতে প্রবচন আছে, 'সব ভাল যার শেষ ভাল।' সমস্ত রকম প্রতিকূল সমালোচনা সহ্য করিয়া যে গ্রন্থ টিকিয়া থাকে, তাহারই সারবত্তা আছে। চপলার মত ক্ষণিকের চমক আনিয়া যে গ্রন্থ লোপ পায় তাহা অসার।*

ক্লাশিক বা উৎকৃষ্ট সাহিত্য সেইসব গ্রন্থ, যেগুলি সময়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে। Sainte vauve খাঁটি ক্লাশিকের তিনটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'Energique, frais, et dispos'—তেজ, নবীনতা, উৎকৃষ্ট রচনাভঙ্গী।

যখন যে বিষয়ে কেহ কিছু লিখিবেন, সেই বিষয়ে তন্ময়চিত্ত হইবেন। এরূপ তন্ময়ভাব হইতেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

যিনি যে বিষয়ে লিখিয়া আনন্দ পান, সেই বিষয়েই লিখিবেন—তবেই দশ জনকে আনন্দ দিতে পারিবেন।

এই যুগকে 'press ridden' বলা হইয়াছে। এটা স্বাধীন চিন্তার যুগ। এ-যুগে কত বিচিত্র ভাবধারার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষেত্র চাই। সাময়িক পত্রিকাগুলি সেই অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে।

একখানি সাহিত্য-পত্রিকা দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। ইহা যেন সাহিত্য-সৃষ্টির একটা কারখানা। প্রবীণ লেখকদিগের চিন্তাধারার সহিত ইহা যেমন জনসাধারণকে পরিচিত করাইয়া দেয়, তেমনি নবীন লেখক সৃষ্টি করিয়া ইহা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। একখানি সুপরিচালিত পত্রিকার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

প্রায় পত্রিকার একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

প্রায় সাহিত্য-পত্রিকা ও সংবাদ-পত্রে পুস্তক সমালোচনার ব্যবস্থা আছে। সমালোচকদের দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার উপর পাঠকসমাজে সাহিত্য-রুচির বিশুদ্ধতা অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু তাঁহারা মাসে মাসে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিরূপ-ভাবে সম্পাদন করিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে হাডসন লিখিয়াছেন, "A new novel is published—a book perhaps with various admirable qualities and well deserving a word of cordial recognition. We turn to the notice of it in this or that journal, and we find the reviewer almost beside himself in a frenzy of wonder and excitement. The work is hailed as a masterpiece, its author pronounced on the spot a consummate artist compared with whom—if we are to take his language at anything like its literal meaning—Scott was a bungler and Dickens a mere novice. A few years go by, the great book and its author disappear from sight or drop back into the rank of the ephe-

* 'What glitters is for the moment; the genuine is for all time'—Goethe.

merals ; and the reviewer who seems incapable of learning from experience, unblushingly breaks forth into another pen over the arrival of another masterpiece from the pen of another genius of the highest order...."

রুচি বিভিন্ন। একই লেখকের সম্বন্ধে বিভিন্ন পাঠকের যে এক মত হইবে এরূপ আশা করা যায় না। কাহারও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা খুব ভাল লাগে, কাহারও লাগে না। শেলীকে কেহ 'angel' বলিয়াছেন, কিন্তু মেথ্যু আর্ণল্ডের মতে Shelly is a beautiful and ineffectual angel, beating in the void his luminous wings in vain'। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এককালে কত বিরুদ্ধ মত ছিল এবং এখনও যে নাই তাহা নয়।* এরূপ মতবৈচিত্র্য চিরকাল থাকিবেই। হ্যামলেটের সেই উক্তি, "Be thou chase as ice, as pure as snow, thou shalt not escape 'calumny' লেখকদের পক্ষেও খাটে—

'সর্ব্বথা ব্যবহর্ত্তব্যে কুতো হ্যবচনীয়তা।
যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ।"

যে লেখকের খুব নাম শুনা যায়, তিনিই যে সবচেয়ে বড় লেখক, এরূপ জোর করিয়া বলা চলে না। তাঁহার চেয়ে আরও ভাল লেখক থাকিতে পারে, কিন্তু হয়ত উপযুক্ত সমালোচনার অভাবে দেশবাসী এখনও তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। সেক্স-পীয়রের মৃত্যুর তিন শতাব্দী পর জার্ম্মানীর বিদগ্ধগণ যখন বলিলেন, তিনিই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, তখন তাঁহার দেশবাসিগণ তাঁহাদের সুরে সুর মিলাইল।* Bunyan's Pilgrim's Progress ছাপা হওয়ার পর দেড়শত বৎসর কাল অত্যন্ত অবজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। পরে মেকলে এডমণ্ড গোম ষ্টপফোর্ড ব্রুক প্রভৃতি সমালোচকের ভূয়সী প্রশংসার ফলে উহা সপ্তদশ শতকে ইংরেজী ভাষায় শ্রেষ্ঠ গদ্যগ্রন্থ বলিয়া এখন বিবেচিত হইতেছে।

যে-লেখককে যে-ভাবে পড়িতে এবং বুঝিতে হইবে, সেরূপ পাঠক চাই—নতুবা তাঁহার প্রতিভার সঠিক পরিচয় সাহিত্য-জগৎ পাইবে না।

জনসনকে বুঝিতে বসওয়েলকে চাই ; কিন্তু তার চেয়ে বেশী চাই স্বাধীন বিচারবুদ্ধি।

রাস্কিন পরামর্শ লইয়া বই পড়িতে বলিয়াছেন, বিজ্ঞাপন দেখিয়া নয়। এমার্সন যে-সব বই অন্ততঃ এক বৎসর পুরাতন প্রসিদ্ধ এবং পছন্দনীয় নয়, সেগুলি পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। লর্ড লিটন বিজ্ঞানে নূতন এবং সাহিত্যে পুরাতন বইয়ের পক্ষপাতী।

বড় কবি কিম্বা লেখক হইতে হইলে যে বড় পণ্ডিত হইতে হইবে, এমন নয়। জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকের মধ্যে সকলেই বড় পণ্ডিত ছিলেন না। স্বয়ং সেক্সপীয়র সম্বন্ধে উক্তি আছে যে, তিনি 'Small Latin and less Greek' জানিতেন। বার্ণস্ ডিকেন্স থ্যাকারে শরৎচন্দ্রের পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি ছিল না—ভিতর হইতে তাঁহারা যাহা পাইয়াছিলেন, তাহাই জগৎকে দিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যবিচারে যিনি প্রবৃত্ত হইবেন, আদমের মত মন লইয়া তিনি সব জিনিষ পাঠ করিবেন এবং অন্যে কি বলে, তাহার দ্বারা পরিচালিত না হইয়া নিজস্ব মতামত ব্যাখ্যা করিবেন। বিলাতে ছাত্রদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, যেন প্রত্যেকের একটা নিজস্ব মত গড়িয়া উঠে। আমাদের দেশের ছাত্রেরা বড় বড় লোক কি বলে কেবল তাহাই পারবার মত আবৃত্তি করিতে শিখে। অধিক দিন দাসত্বের ফলে এই দাসমনোভাবের উদ্ভব হইয়াছে।

Timon of Athens পড়িতে প্রথমে কি বই পড়া উচিত কোন ছাত্র জিজ্ঞাসা করায় আমেরিকার জনৈক অধ্যাপক Timon of Athens-এর নামই করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোন বই ভাল করিয়া বুঝিতে আগে তাহাই ভাল করিয়া পড়া উচিত, তারপর তাহার সম্বন্ধে যে-সব ভাল বই আছে, তাহা পড়িয়া নিজের ভাব সংশোধিত ও পরিপুষ্ট (correct and supplement) করিয়া লওয়া উচিত। 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া উচিত নয়।'

লেখকের জীবনে তিনটি করিয়া যুগ আছে—শিক্ষানবীশির যুগ (Apprentice Period), পূর্ণতার যুগ (Maturity Period), শক্তি হ্রাসের যুগ (Declining Period)। কালিদাসকে যেমন আমরা "full-summed in all his powers like Minerva" দেখি, এরূপ আর কাহাকেও দেখা যায় না।

কোন লেখকের প্রতিভার বিকাশ বুঝিতে তাঁহার গ্রন্থাবলীর রচনার কালানুক্রমে (chronologically) পাঠ করা উচিত।

কোন লেখককে বুঝিতে হইলে তিনি যে দেশ, যে জাতি, যে বংশ ও যে কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা জানা উচিত।

সাহিত্য হইতে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, কিন্তু প্রাণ হইতে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহার স্থান আরও উচ্চে—"The literature which, in Turgener's phrase, 'smella of literature', is always to be classed below that which carries with the native savour of life itself,"

এখন যাহারা আছে কালে তাহারা থাকিবে না। কিন্তু এ-যুগের লোকের পরিচয় ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ এ-যুগের সাহিত্য-পাঠে পাইবে। [ক্রমশঃ

---

* "My Life" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন. "I have gained a reputation in my country, but a strong current of antagonism still persists. Some say that my poems do not spring from the heart of national traditions ; some complain that they are incomprehensible, others that they are unwholesome. In fact, I have never had complete acceptance from my own people, and that too has been a blessing, for nothing is so demoralising as unqualified succss."

* "The glory of Shakespeare reached England from abroad. * ...It required three hundred years for England to catch there two words that the whole world shouted in her ear—'William Shakespaare'." —Shakespeare.

জীবনের একপাতা

শ্রীবেলা দে

কয়েক ঘর গৃহস্থকে নিয়ে একটী ক্ষুদ্র পল্লী; তারই এক অংশে বাস করে অমিতারা। অমিতার পিতা অক্ষয় বাবু গৃহস্থ হ'লেও কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা লাভ থেকে কোনদিনও বঞ্চিত করেন নি। কিন্তু আজ তিনি অমিতার বিয়ের জন্য বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অমিতা বলে—নাই বা বিয়ে করলাম বাবা? লেখাপড়া শিখেছি, যে কোন একটা কাজ নেব, তা' হলেই তো বেশ চলে যাবে? যেমন তেমন একটা বিয়ে ক'রে অশান্তির মধ্যে গিয়ে লাভ কি? মনে মনে ভাবে—তার আকাঙ্ক্ষা অনেক বড়, কাজেই অল্পেই সে সন্তুষ্ট হতে পারবে না কোনদিন। কন্যার অনিচ্ছায় পিতা চুপ করে যান। তাই তো, আমার সে সামর্থ্য নেই যে বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে দেব। অক্ষয় বাবু এই সব চিন্তা ক'রে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন; কিন্তু উপায় নেই।

বার বছর পরের কথা—অমিতা আজও বিয়ে করে নি বা হয় নি। এখন সে কোন এক মহিলা-সমিতির কর্ত্রী; কিন্তু আয় তার সামান্যই। দিনগুলি ওর কেটে যায় কোন রকম করে। কিন্তু একদিন পিতা অকস্মাৎ ওপারের ডাকে চলে গেলেন। সংসারে সে আজ সত্যই সহায়হীনা, একান্তই একা। অমিতা ভাবে—কেন তার মনে শান্তি নেই? কিসের যেন অভাবের তাড়নায় তার সমস্ত মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। তাদেরই পাড়ার ঐ শেষ বাড়ীখানার দিকে হঠাৎ আজ ক'দিন ধরে অমিতার লক্ষ্য পড়েছে। ছোট একখানা একতলা বাড়ী, কোন অজ্ঞাত অপরিচিত পথের নবাগত দুটী স্বামী-স্ত্রী এসে সেই ছোট বাড়ীতে বাসা বেঁধেছে, যেন চির নতুনের বেশে চির পুরাতনের খেলা সেই থেকে হয়েছে সুরু! কি সুখের দাম্পত্য জীবন তাদের—অমিতা ভাবে। ঘরে আসবাব-পত্র বিশেষ কিছু নেই। দেওয়ালগুলো সাদা, ছবি টাঙ্গিয়ে তাদের জর্জ্জরিত করা হয় নি। মেঝের উপর দু'খানি খাট, জামা-কাপড় রাখবার একটি বাক্স, ছোট একটি টেবিলের উপর খানকয়েক বই। অপর দিকে একখানি আয়না ও তার সামনে চিরুণী, বুরুষ, আলতার শিশি ও সিন্দুরের কৌটা। তারই পাশের ঘরে নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি বাসন-কোসন, চায়ের সরঞ্জাম, ছোট একটী তোলা উনুন, এ ছাড়া অনাবশ্যক সৌখীনতার বোঝায় ঘর দুটির নিশ্বাস রোধ করা হয় নি। দেখে মনে হয়,—সেবানিপুণ কর্ম্মপ্রিয় দু'খানি কোমল হাতের স্পর্শে দারিদ্র্যের মধ্যেও পরিচ্ছন্নতার শ্রী উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। সারা দিনের পর স্বামী আসেন ঘরে ফিরে, স্ত্রী চা ও জলখাবার নিয়ে এগিয়ে আসে স্বামীর কাছে, একটু হেসে স্বামী আদর করে স্ত্রীকে পাশে বসতে বলেন। জানালার পাশ থেকে যতদূর দৃষ্টি যায় অমিতা ওদের গতানুগতিক লক্ষ্য করে। মনে মনে ভাবে—ওর বাবাও তো একদিন কন্যার বিয়ে দিয়ে ওকে সুখী করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে রাজী হয় নি। আজ মনে হয়, এ জগতে যদি সেও ঐরকম কারুর উপর নির্ভর করতে পারত, তবে বোধ হয় তার আড়ালে বাস করে মনের এই অশান্তি বা অস্বস্তিকে ঝেড়ে ফেলতে পারত। মাথাটা ওর টন্‌টন্ করে ওঠে, সে উত্তর দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে উঠে আসে পশ্চিমের জানালার ধারে। হঠাৎ পাশের বাড়ীর উঠানের দিকে ওর দৃষ্টি পড়ল মা ও ক্ষুদ্র শিশুর খেলার প্রতি! মায়ের বার বার নিষেধ সত্ত্বেও শিশু হামা দিয়ে এসে অপরিষ্কার জলে হাত দেয়, মা বিরক্ত হয়ে শিশুর গালে এক চড় বসিয়ে দেয়। শিশুটি চীৎকার করে কেঁদে ওঠে! অমিতা আপন মনেই বলে ওঠে কি অশিক্ষিত—মা! ওর কি ন্যায়-অন্যায় বোঝবার শক্তি আছে? মা আবার ফিরে আসেন চোখের জল মুছতে মুছতে শিশুটীকে বুকে তুলে আদর করেন। অমিতা ভাবে—কি সুন্দর ছবি।

অন্যের সঙ্গে নিজের জীবনের তুলনা করে দেখা মানুষের চিরন্তন স্বভাব—অমিতাও আজ বার বার এই দুটী সংসার-জীবনের চিত্রের সঙ্গে নিজের জীবনের তুলনা করে! ওদের স্বামী পুত্র আছে, ওরা কত সুখী, ওদের কত বড় অবলম্বন; কিন্তু আমার তো কেউই নেই? এই কথাগুলো চিন্তা ক'রেই সে সব চেয়ে ব্যথিত হয়, সে একা এবং একান্তই একা, তবে কি বাবার কথা শুনে তারও বিয়ে করা উচিত ছিল? না-না, ভুল সে করে নি, আর করবেও না কোনদিন।

আকাশে সেদিন শুক্লা তিথির চাঁদ উঠেছে! স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় চারিদিক বেশ দেখা যায়! অদূরের বাড়ীগুলো স্পষ্ট আলোয় যেন ওর খুব কাছেই এগিয়ে এসেছে। দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঐ সুখী পরিবার-গুলির দিন বেশ ভালই কাটছে! কিন্তু অমিতার?

এমনি একটি দিনে অমিতার পিসীমা একখানি চিঠি লিখেছেন 'তোমার আর একা একা থাকা শোভা পায় না, বিয়ে-থা ক'রে এইবার সংসারী হও। আমার এক ভাসুরপোর সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করেছি, সব কথাই তোমায় খোলাখুলি লিখছি, গৃহস্থের ছেলে, মাত্র ৮০ টাকা মাইনে পায়, তবে ছেলেটি বেশ সজ্জন, তোমরা দুটিতে

সুখী হ'বে বলে এইখানেই আমি বিয়ের ঠিক করছি; শুধু তোমার মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।'

অমিতা ভাবে—সে একা, তার নিঃসঙ্গ জীবন আজ সত্যাই দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ৮০ টাকা মাইনের কেরাণীর স্ত্রী! ভাবতে ওর কষ্ট হয় কিন্তু কেন? ঐ যে দুটী সংসারের চিত্র দিনরাত ওর চোখের সামনে ভাসছে, ওদের স্বচ্ছন্দতা দেখে ওর মনে কত কথাই জাগে? তারাও তো কেরাণীর স্ত্রী! ওরাও তো ঐ আয়ের মধ্যে বেশ সুখে আছে!

সারারাত ভাবনা-চিন্তার পর অমিতা ওর পিসীমাকে লিখল—ঐখানেই সে বিয়ে করবে। কিন্তু ভাগ্যদেবতা অলক্ষ্যে বোধ হয় একটু হেসেছিলেন, তাই দুঃখের বিষয় চিঠির উত্তরে পিসীমা জানালেন, তাঁর ভাসুর-পোর নাকি হঠাৎ মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে বলছে—একজন কেরাণীর অত শিক্ষিতা বৌ কি হ'বে? সে কি তার এই সামান্য আয়ে সংসার চালিয়ে নিজে সুখী হ'তে পারবে? তাই সে এ বিয়েতে রাজী নয়। রাগে, দুঃখে, অভিমানে,অপমানে আজ অমিতার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে, কেন, সে কি লেখাপড়া শিখে অন্যায় করেছে? বিদ্যার কি কোন মূল্য নেই? যাকে অযোগ্য বলে মনে করেও সে তাকে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, আজ সে-ই তাকে প্রত্যাখ্যান করল? জগতের কাছে ওর যেন সমস্ত প্রয়োজনই ফুরিয়ে গেছে, সমুখে পড়ে আছে নিঃসঙ্গ ক্লান্তিকর অসহনীয় জীবনের বাকী দিনগুলো! অলস অনির্দ্দিষ্ট পাদক্ষেপে এই দীর্ঘপথ তাকে অতিক্রম করতেই হবে। এ অভিমানের মূল্যই বা তাকে কে দেবে? অমিতা আস্তে আস্তে উঠে এসে দাঁড়ায় সেই পশ্চিমের জানলার ধারটীতে সেই সুখী পরিবার দুটিকে দেখিবার আশায়। বিশেষ করে সেই মা ও শিশুর খেলা ওর বড় ভাল লেগেছে, তাই বার বার ছুটে এসে দাঁড়ায় এই জানালার পাশে। হঠাৎ প্রাঙ্গণের সেই ছোট শিশুটির লক্ষ্য পড়ল উপরের দিকের জানালায়; সে ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে মার আঁচল ধরে তাকে টেনে আনল সেখানে, আঙুল দিয়ে উপরে অমিতাকে দেখিয়ে বলে ঐ দেখ তোমার মতো আর একটি মা! অমিতার চোখে জল ভরে আসে, সে ভাবে ওরা করছে সুন্দর জীবনের তপস্যা, আর সে করছে আত্মহত্যার সাধনা।

আমার বিহঙ্গ আজো নীলনভচারী

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গম আকাশের প্রান্তচারী
থামো একবার,
আমার সবুজ ক্ষেতে, আমার সোনালী মাঠে
ঢেউ খেলে যায়,
আমার বনের ধারে খাল বিল ভ'রে গেছে
জল থৈ থৈ,
সেখানে তৃণের বুকে কোমল ঘাসের মেলা,
অ'য় নেমে আয়।

কত ঝড় উড়ে গেল নভচারী কত পাখী
নেমে গেল দূরে
আমারো বিহঙ্গ তাই নীড়হারা গৃহছাড়া
তাহাদের সাথে,
নিভন্ত রাত্রির মায়া আলোকের বিহঙ্গমে
ডাকে বারবার
তাই ত মনের মাটী সীমাহীন ধূধূ করে
সোনা-ছোঁয়া প্রাণে—

সবুজের হাসি মরে মাটীর দুকূল ছেপে
মাটীও হাসিছে,
কাশে কাশে সাদা হ'ল আমার নদীর চর,
বলাকার সারি
গ'লে যাওয়া সোনা রোদে মেলি দিল পাখা দুটী
দুটী সাদা পাখা,
খেয়ালী পাখীর সাথে আমার পাখীটী আজো
নীল নভ-চারী।

ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের হিন্দু সভ্যতা

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

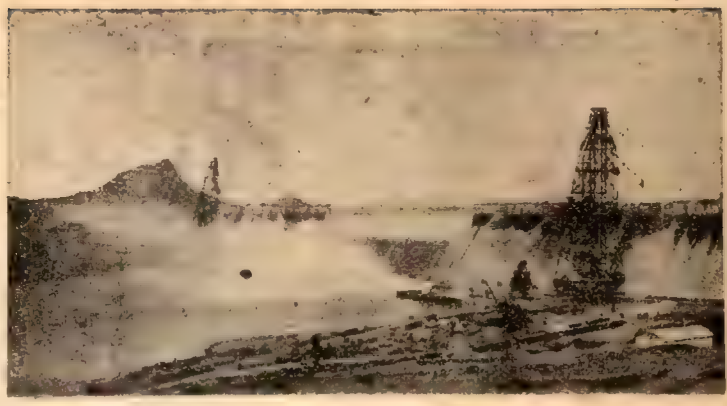

মেটটুর বাঁধ—কাবেরী নদী

আমরা 'সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বের হিন্দু সভ্যতা প্রবন্ধে সিন্ধু উপত্যকায় ৫ হাজার খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে অভিব্যক্ত সমুন্নত হিন্দুসংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। দূর দক্ষিণাপথের বক্ষে ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪ হাজার অব্দে হিন্দু-সভ্যতার এক প্রকার অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল। অল্পকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত অতীতের কতিপয় অবশেষ হইতে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিতেছি। দাক্ষিণাত্য অপেক্ষা উত্তর-ভারতকেই প্রাচীনতর সভ্যতার অভিনয়ভূমি বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু এই অবশেষগুলির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে—দক্ষিণাপথের স্থানে স্থানে অতি প্রাচীনকালেই সভ্যতার বিস্ময়কর না হউক, প্রশংসনীয় বিকাশ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। সিন্ধু উপত্যকার মোহেন-জো-দারো ও হারাপ্পার সভ্যতার যেরূপ আশ্চর্য্য পরিণতি সম্পাদিত হইযাছিল, মহীশূর-রাজ্যে আবিষ্কৃত সুদূর অতীতের এই সকল অবশেষ সেরূপ বিকাশের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করে না বটে কিন্তু ইহাদের দ্বারা প্রমাণিত হয়—খৃষ্টপূর্ব্ব ৪ হাজার অব্দে যখন দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অংশ সভ্যতালোকে সমুদ্ভাসিত হয় নাই তখন সভ্যতার এক প্রকার দীপ্তি এই অঞ্চলে প্রকটিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীনতা এবং কতিপয় সাদৃশ্যের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত-গণ মহীশূররাজ্যের এই ধ্বংসাবশেষকে 'দাক্ষিণাত্যের মোহেন-জো-দারো' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হইবামাত্র আমরা উহা দর্শনের জন্য আগ্রহান্বিত হই। ঐ সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু নীলগিরি অঞ্চল পরিভ্রমণের জন্য যাইলে মহীশূর-রাজ্যবাসী এক প্রত্ন-প্রেমিক বন্ধু আমাদিগকে ঐ রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া দর্শনীয় দৃশ্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে এই অভিনব প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলি দেখিতে অনুরোধ করেন। আমরা এইরূপ কোন আহ্বানের প্রতীক্ষাই করিতেছিলাম। সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিশালী সুহৃদটি তাঁহার মোটরখানি আমাদের জন্য পাঠাইয়া দিয়া অতুলনীয় সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা মেট্টুপালাইয়াম নামক (নীলগিরি অঞ্চলের) শহরে বন্ধুপ্রেরিত যানে চড়িয়া মহীশূর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হই। তথা হইতে ৬৪ মাইল পথ অতি-ক্রম করিবার পর ভবানী নামক নগরে পৌঁছাই। এই নগরের নিকটে ভবানী নদীর সহিত কাবেরী নদীর সম্মিলন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ভবানীর পথে আমরা পথিপার্শ্বে কতকগুলি বিরাট ও বিকট বিগ্রহ স্থাপিত দেখি। ইহারা এই অঞ্চলে রাত্রির রক্ষক আখ্যায় অভিহিত হয়।

ভবানী ও কাবেরীর সম্মিলন-স্থলে পৌঁছিবার পর আমাদের এক বন্ধু মেট্টুর বাঁধ এবং সেই বাঁধ হইতে সৃষ্ট সুদৃশ্য হ্রদ দেখিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। সেই প্রস্তাব আমাদের অধিকাংশের দ্বারা সমর্থিত হইলে মোটরচালককে সেই বাঁধের দিকে যাইতে বলা হইল। যাঁহারা মাদ্রাজের দিক হইতে নীলগিরির দিকে আসেন তাঁহাদের পক্ষে এই বাঁধ দেখা সহজ। আমি নিজে এই বাঁধ পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছিলাম। মাদ্রাজ হইতে প্রসারিত নূতন ট্রাঙ্ক রোড বাঁধের নিম্নে প্রবাহিত কাবেরী নদী একটি সেতুর সহায়তায় অতিক্রম করিয়াছে। পরে পথটি ভবানী নদীর দক্ষিণ তীর দিয়া আগাইয়া আসিয়াছে। বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্য তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই। অবশ্য অতি সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। এই বিরাট বাঁধনির্ম্মাণে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড অপেক্ষাও অধিক ব্যয় হইয়াছে এবং ইহা প্রস্তুত করিতে সাত বৎসর লাগিয়াছে। এই বাঁধের দ্বারা কাবেরীর জল জমিয়া যে হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার দৈর্ঘ্য ত্রিশ মাইল। এই প্রকাণ্ড পরিকল্পনার পরিণতিরূপে ১০ লক্ষ একর ভূমি সলিল-সিক্ত হইতেছে এবং দক্ষিণ ভারতের অনেক অংশে তাড়িতশক্তি সমুৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। বারিপ্রবাহকে বাঁধের সাহায্যে সংহত করিয়া তাহাকে মানুষের অশেষ কল্যাণসাধক মহাশক্তির আধারে পরিণত করিবার প্রবল প্রযত্ন সম্প্রতি পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই ব্যাপকভাবে সম্পাদিত হইতেছে। ভারতবর্ষও এ-বিষয়ে অগ্রসর হইতেছে, সন্দেহ নাই। সলিলের সাহায্যে শক্তি সমুৎপাদন সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে করিব। মেট্টুর বাঁধ এবং হ্রদ প্রস্তুত ব্যাপারে যে পূর্ত্ত-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ইহাদিগকে না দেখিলে উপলব্ধ হয় না। এই পূর্ত্তকীর্ত্তি আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতির বার্ত্তাই তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে। কাবেরী নদী কূর্গ অঞ্চলের গিরিশ্রেণী হইতে বাহির হইয়া উভয় পার্শ্বের জনপদসমূহকে প্রাণপ্রদ পয়োরাশি পরিবেশন করিতে করিতে অপার পারাবারে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। পূর্ব্বে দুইটি বাঁধের সাহায্যে ইহার প্রবাহকে সংহত করিয়া শক্তি-সমুৎপাদন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একটি শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণরাজ-সাগর বাঁধ, দ্বিতীয়টি শিবসমুদ্রম্ প্রপাতে প্রতিষ্ঠিত 'শিবসমুদ্রম্ পাউয়ার ওয়ার্কস্'। মেটটুর বাঁধ এই জাতীয় তৃতীয় প্রযত্ন।

আমরা মেট্টুর বাঁধ ও হ্রদ দর্শনের পর ভবানী হইতে দেড়

শত মাইল দূরবর্ত্তী ব্যাঙ্গালোর শহরের দিকে আগাইয়া চলিলাম। স্বঙ্কেরীদুর্গ এবং হোসুর নামক স্থানদ্বয় আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইল। আমরা 'হোসুরনীস' নামক (ভূতত্ত্ববেত্তাবর্ণিত) প্রস্তরাবলীর কথা 'প্রাগৈতিহাসিক ভারতে মনুষ্যেতর প্রাণী' প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল পাহাড়পূর্ণ প্রস্তরাকীর্ণ অঞ্চল পৃথিবীর প্রাচীনতম ভূখণ্ড গণ্ডোয়ানা-ল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। মহীশূররাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে আমাদের পথটি রয়াকোট্টা নামক স্থানের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইল। এখানে একটা প্রস্তরাকীর্ণ প্রকাণ্ড পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইল। উচ্চ পাহাড়টির গায়ে দুর্গম দুর্গসমূহ দণ্ডায়মান রহিয়া উহাকে অধিকতর গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত করিয়াছে। এই শৈলের শিখরটি চতুর্দ্দিকে বিরাজিত অন্যান্য শৈল হইতে উচ্চতর বলিয়া সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দুর্গমণ্ডিত প্রকাণ্ড গম্ভীর গিরিশৃঙ্গের আর একটি বৈশিষ্ট্য—বিভিন্ন দিক হইতে ইহার বিভিন্ন আকৃতি দৃষ্ট হইবে। এই শৈল হইতে ১৬ মাইল দূরে কৃষ্ণগিরি—যেখানে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে একটি বারুদাগার বিদীর্ণ হওয়ার জন্য তথাকার সেনানিবাসের বহু ব্যক্তি হত হইয়াছিল এবং দুর্গপ্রাকারের কতক অংশ ধ্বংস হইয়াছিল। আমরা প্রবন্ধান্তরে কৃষ্ণগিরি দর্শনের কথা বিস্তৃত-ভাবে বলিব।

জলাধারের ভিতর আবিষ্কৃত কতিপয় মৃন্ময় পাত্র

পূর্ব্বে বহু বৎসর ব্যাপিয়া ব্যাঙ্গালোর বৃটিশদিগের দ্বারা নাগরিক ও সামরিক বাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্যাঙ্গালোর দুর্গের তোরণতল দিয়া অধুনা অগ্রসর হইবার সময় পর্য্যটকের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন হয়—একদিন কি প্রচণ্ড কাণ্ড এই পথে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ বৃটিশবাহিনী বারুদের সাহায্যে ব্যাঙ্গালোর দুর্গ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আমরা দুইদিন ব্যাঙ্গালোরে সেই বন্ধুগৃহে অবস্থান করিলাম—যিনি আমাদের জন্য মোটর পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃত বাসস্থান মহীশূরের গ্রামাঞ্চলে হইলেও ব্যাঙ্গালোর ও মহীশূর শহরেও গৃহ রহিয়াছে। বৃষ্টির জন্য আমাদিগকে দুইদিন ব্যাঙ্গালোরে থাকিতে হইল। শুধু বৃষ্টি নয়, প্রবল ঝড়ও বহিতে লাগিল। তৃতীয় দিনে প্রকৃতি প্রশান্ত ভাব পরিগ্রহ করিলেন এবং আমরাও ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন দর্শনের জন্য চিতল দুর্গ নামক স্থানের দিকে অগ্রসর হইলাম। পথের উভয় পার্শ্বে সদ্যসঙ্ঘটিত বৃষ্টি ও ঝড়ের তাণ্ডব-লীলার নিদর্শনাবলী আমরা দেখিতে পাইলাম। কর্দ্দমাক্ত বারিরাশি বক্ষে লইয়া নদীগুলি দুর্দ্দম বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। জলাশয়গুলি কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। উৎপাটিত-মূল ভূলুণ্ঠিত বৃক্ষসমূহ ঝঞ্ঝার তাণ্ডব নৃত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিল।

ব্যাঙ্গালোর নগরের উপকণ্ঠগুলি পার হইবার অল্পক্ষণ পর অদূরে দণ্ডায়মান শিবগঙ্গা শৈল আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। এই মন্দিরমালামণ্ডিত পবিত্র পাহাড়ের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য—পূর্ব্ব দিক হইতে দেখিলে ইহাকে ষণ্ডাকৃতি, উত্তর হইতে দেখিলে সর্পাকৃতি, দক্ষিণ হইতে দেখিলে শিবলিঙ্গাকৃতি এবং পশ্চিম হইতে দেখিলে গণেশাকৃতি মনে হইবে। পাহাড়টির শিখরে এবং চারি পার্শ্বে মন্দির। তুমকুর নামক স্থান অতিক্রম করিয়া আমরা সিরা নামক প্রাধান্য নগরীর ভিতর দিয়া আগাইয়া চলিলাম। এখন ইহা সামান্য শহর কিন্তু এক সময় দুই লক্ষ নরনারীর বাসস্থল বিশাল নগর ছিল বলিয়া জানা যায়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে বিপ্লব বা বিপর্য্যয়ের ঝড় এই সকল অঞ্চলের উপর দিয়া সবেগে বহিয়া যায় তাহাই এই শহরকে প্রায় জনশূন্য ও ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ করিয়া ফেলে। বৃটিশ ও ফরাসীদের সঙ্ঘর্ষ এবং সেই স্বার্থমূলক সঙ্ঘর্ষের পরিণতি এই ধ্বংসকার্য্যের অন্যতম কারণ, সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্গালোর এবং শ্রীরঙ্গপত্তনে যে সকল সৌধ দেখা যায় তাহাদের অধিকাংশই দিলাওয়ার খাঁর প্রীতিপদ প্রসিদ্ধ প্রাসাদের আদর্শে প্রস্তুত। সিরার অন্যতম দর্শনীয় এই প্রাচীন প্রাসাদ। এই স্থানের দুর্গের চারিদিকে পরিখা।

আরও ২০ মাইল অতিক্রম করিবার পর আমরা হিরি-উরু পৌঁছিলাম। সিরার মত ইহাও এক সময় বড় শহর ছিল, বর্ত্তমানে ৩ হাজার লোকের বাসস্থল ক্ষুদ্র নগরে পরিণত। প্রধানতঃ হায়দার আলি এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরস্পর সংঘর্ষের ফলে এই নগর ধ্বংস হয় বলিয়া কথিত। পরবর্ত্তী দুর্ভিক্ষকে এই ধ্বংসের অন্যতম কারণ বলা চলে। হিরি-উরুকে পশ্চাতে রাখিয়া আরও ২০ মাইল পথ অতিক্রম করিবা আমরা চিতল দুর্গে উপনীত হইলাম। চিতল দুর্গের দুর্গটি অধিকার করিবার জন্য হায়দার আলির প্রচণ্ড চেষ্টা অবশেষে সাফল্য লাভ করে এবং ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইহা তাহার হস্তগত হয়। শিলা-সমাকীর্ণ দুরারোহ শৈলের উপর দুর্গটি নির্ম্মিত। দুর্গের প্রাকার বহু মাইলব্যাপী।

রূপ দুর্গম দুর্গ এই অঞ্চলে আর নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা স্তূপীকৃত রহিয়া ইহার দুর্গমতা বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

দুর্গ দর্শনের পর আমরা সুদূর অতীতের অবশেষ দেখিবার জন্য নিকটবর্ত্তী চন্দ্রবল্লী উপত্যকায় উপনীত হইলাম। চন্দ্রবল্লী না বলিয়া চন্দ্রপল্লী বলিলেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়, কারণ নামটির অর্থ চাঁদের গাঁ। চিতল দুর্গটির (এই দেশের লোক চিতলদ্রুগ বলে) প্রকৃত নাম চিত্রদুর্গ অর্থাৎ সুন্দর শিখর। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রবল্লী উপত্যকা দুর্গমণ্ডিত গুরুগম্ভীর গিরি-শ্রেণীর পদতলে প্রসারিত রহিয়াছে। শুধু হায়দার আলি ও টিপু সুলতান নয়, পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু রাজারাও এই দুর্গম গিরিশ্রেণী-পূর্ণ স্থানটির বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এখানে সৌধ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিয়াছিলেন।

বন্ধু মোটর-চালকের সহিত একখানি পত্র দিয়াছিলেন। সেই পত্রে দুর্গের রক্ষককে অনুরোধ করা হইয়াছে, আমাদিগকে সমস্ত দর্শনীয় দৃশ্যগুলি দেখাইবার এবং আমাদের বিশ্রামস্থান ও আহার সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবার জন্য। তিনি আমাদের সহিত দুর্গেই মিলিত হইবেন, ইহাও জানাইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা দুইদিন দুর্গে অবস্থান করিলেও তিনি যখন আসিলেন না, তখন আমরা রক্ষক-নির্ব্বাচিত একটি পথপ্রদর্শককে লইয়া ধ্বংসাবশেষ দর্শনে যাত্রা করিলাম। আমরা চন্দ্রবল্লী উপত্যকায় যেমন পদার্পণ করিয়াছি অমনই মোটরের হর্ণ আমাদের কর্ণগোচর হইল। অনুমানে বুঝিতে পারিলাম বন্ধু আসিয়াছেন। বন্ধু কার্য্যোপলক্ষ্যে দূরে গিয়াছিলেন এবং ঝড়বৃষ্টির জন্য ঠিক সময়ে আসা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই দ্রাবিড়ী বন্ধুকে বৃহৎ ও ব্যাপক ঠিকাদারী ব্যবসার জন্য সর্ব্বদা নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। নিজেও একজন পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার। মহীশূর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পরিচালক ডক্টর এম, এইচ, কৃষ্ণ (যাঁহাকে চন্দ্রবল্লী উপত্যকার ভূগর্ভে লুক্কায়িত ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার নিদর্শনসমূহের আবিষ্কারক বলা চলে) ইহার বিশেষ পরিচিত। বন্ধু পূর্ব্বে দুইবার এই সব পুরাকীর্ত্তি পরিদর্শন করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, এই উপত্যকার ভূগর্ভে দূর অতীতে অভিব্যক্ত সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থাকিতে পারে, এইরূপ অনুমান জাগরূক হইবার হেতু কি? বহুদিন পূর্ব্বে কতিপয় শ্রমিক এই উপত্যকায় খননকার্য্য করিবার সময় কয়েকটি মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। একজন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারের অধীনে শ্রমিকরা কাজ করিতেছিল। ইঞ্জিনীয়ারটি খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধানে খননকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। ঐ প্রাচীন মুদ্রাগুলি পুরাতত্ত্ববেত্তাদের দৃষ্টি এই উপত্যকার দিকে সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট করে। অবশ্য প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য ঐ প্রাপ্তির বহুদিন পরে আরম্ভ হয়। নানা প্রকার বিচিত্র জনশ্রুতি বা কিম্বদন্তী এবং কথা ও কাহিনী এই উপত্যকা সম্বন্ধে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচারিত রহিয়াছে। এইগুলিও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনে জিজ্ঞাসা জাগ্রত করিয়াছিল।

এই উপত্যকার একটি অংশকে ভীমকর্ত্তৃক হিড়িম্ব নামক রাক্ষসবধের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। পঞ্চপাণ্ডব এবং হিড়িম্ব উভয়েরই উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মন্দির এই অংশে স্থাপিত রহিয়াছে বটে কিন্তু ঐ মন্দিরগুলি দেখিলে প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে চন্দ্রহাস নামক নৃপতি রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার নাম হইতে এই উপত্যকার নাম চন্দ্রবল্লী, এইরূপ মত কেহ কেহ পোষণ করেন। হৈসালা বংশীয় নৃপগণের

পবিত্র পাহাড়ের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য

শাসন শেষ হইবার অব্যবহিত পরে এই উপত্যকা কেন পরিত্যক্ত হয়, তাহার কারণ নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। আমরা বর্ত্তমানে ইহার যে অবস্থা দেখিতেছি হৈসালা শাসনের অবসান সময় হইতে এইরূপ হইয়াছে। পরিত্যক্ত হইবার পর এই স্থানে আর কোন জনপদ গড়িয়া উঠিল না কেন—তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। কথা ও কিম্বদন্তী যে কারণ নির্দ্দেশ করে তাহা কুসংস্কারমূলক। নিকটবর্ত্তী চিতল দুর্গের চারি পার্শ্ব জনসমৃদ্ধ, অথচ চন্দ্রবল্লী উপত্যকা জনশূন্য—ইহা আমাদের বিস্ময় উদ্রিক্ত করিতে পারে।

হয়সালাবংশীয় নৃপগণের শাসনের সুস্পষ্ট চিহ্ন এই উপত্যকার ভূগর্ভের সর্ব্বোচ্চ স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। খননকার্য্যের ফলে হয়সালা-সময়ের প্রস্তরপ্রস্তুত দরজা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দরজাটি কোন দেবমন্দিরের বলিয়া মনে করা হয়। ভাস্কর্য্য কারুকার্য্যে কমনীয় এই দরজাটি এসময়ের শিল্পীদের দক্ষতার কথা জ্ঞাপন করে। নানাপ্রকার চিত্র দরজার স্তম্ভাকৃতি অংশগুলির গায়ে ক্ষোদিত করা হইয়াছে। দুই দিকে দুইটি হস্তী, মধ্যস্থলে উহাদিগকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান গজলক্ষ্মী হয়সালা-যুগের শিল্প-

পরিকল্পনার বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। আমরা দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দিরের গাত্রে গজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিয়াছি। সিংহলেও ইহা রহিয়াছে। মহাদেবের নন্দী নামক যে বৃষভের মূর্ত্তি শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে তাহাও হয়সালা-শিল্পের পরিকল্পনা। মহীশূরের বহু স্থানে এই নন্দী-বৃষমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। শিবপুরী বারাণসী উত্তর-ভারতে অবস্থিত বটে কিন্তু শৈবমত বা শিববাদ দক্ষিণাপথে যেরূপ প্রবল ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল তেমন উত্তর-ভারতে হয় নাই। অবশ্য শঙ্করাচার্য্যের প্রচার এই শৈবপ্রাবল্যের প্রধান কারণ। অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য জনসাধারণের মধ্যে (তাহারা সহজেই ধারণ বা ধারণা করিতে পারিবে বলিয়া) শিবার্চ্চনা প্রচার করিয়াছিলেন।

চন্দ্রবল্লী উপত্যকা

হয়সালা সময়ের কতকগুলি বীর-রায়ী হানস বা স্বর্ণমূদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এক একটি হানস বা মুদ্রায় ৬·২গ্রেন স্বর্ণ বিদ্যমান। অন্যান্য ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেবল হয়সালা শাসন-সময়ের নহে, মুদ্রাগুলির মধ্যে কয়েকটি চালুক্য-বংশীয় নৃপগণের, কতিপয় মুদ্রা রাজা তৃতীয় বীর বল্লাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, তাহা ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া প্রত্নতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চন্দ্রবল্লী উপত্যকার মধ্যভাগে বিরাজিত শিলাসমূহ হইতে একটি প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রাপ্ত হ'ন। এই শিলার গাত্রে একটি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিটি মোটামুটি আঁকা হইয়াছে, সূক্ষ্মভাবে নহে। এই শিলা-খণ্ডটির দিকে প্রথমে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। পরে উহার দিকে পুরাতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতদের নজর পড়ে। পাথরের গায়ে এইরূপ স্থূল অঙ্কন-প্রচেষ্টা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই অনুষ্ঠিত হইত। শুধু ভারতে নয়, ইউরোপের নানাস্থানে অঙ্কিত পশুমূর্ত্তিবিশিষ্ট শিলাসমূহ বাহির হইয়াছে। এই শিলাটি অতিপ্রাচীন—সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। পুরাতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা ব্যাঘ্রাকৃতি-আঁকা শিলাটির বয়স এখনও নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। হইতে পারে, ইহা নিয়োলিথিক বা পরবর্ত্তী প্রস্তর যুগের। এই প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর হইতে পুরাতত্ত্ববেত্তারা অনুমান করেন চন্দ্রবল্লী উপত্যকা প্যালিউলিথিক বা প্রাচীন প্রস্তরযুগ হইতে মানুষের বাসস্থলী।

এই উপত্যকার খননের ফলে অতীতের যে সকল অবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কতকগুলি খৃষ্টাবির্ভাবের পরবর্ত্তী সময়ের। কদম্ববংশীয় নৃপগণের দ্বারা উৎকীর্ণ যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে গুরুত্বে প্রসিদ্ধ নাসিক শিলালিপির সমকক্ষ বলা চলে। শতবাহনবংশীয় রাজ্ঞী গোতমীবালশ্রীর দ্বারা নাসিক শিলালিপি ক্ষোদিত করা হয়। কদম্ববংশীয় মৌরশর্ম্মণ নামক নৃপতির আদেশে উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করিয়া পুরাতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। মহীশূর-প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পরিচালক ডক্টর কৃষ্ণ ২৫৮ খৃষ্টাব্দকে মৌরশর্ম্মনের সিংহাসনারোহণকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাঁহাকে আরও পরবর্ত্তী যুগের বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। আমরা ডক্টর কৃষ্ণকেই সমর্থন করি। কারণ, তাঁহার উৎকীর্ণ শিলালিপি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের পরবর্ত্তী হওয়া অসম্ভব। এই শিলালিপিতে একটি জলাশয়ের কথা উল্লেখ আছে। শিলালিপির নিকটবর্ত্তী অংশে অনুসন্ধান করিয়া তিনটি বাঁধের ধ্বংসাবশেষ এবং ইষ্টকপ্রস্তুত ঘাটের খানিকটা পাওয়া গিয়াছে। ইহাই লিপি-বর্ণিত জলাশয়ের অংশেষ বলিয়া ডক্টর কৃষ্ণ মনে করেন।

ব্যাঘ্রাকৃতি আঁকা প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরখানির নিকটে কতকগুলি ভূগর্ভস্থ গুহা বাহির হইয়াছে। এই গুহাগুলির ভিতর কয়েকটি দেবগৃহ রহিয়াছে। কোন কোন কন্দর-মন্দিরে শিবলিঙ্গ এখনও বিদ্যমান আছে। আমরা এই গুহা-গৃহগুলিতে প্রবেশ করিয়া এই সকল লিঙ্গ দর্শন করিবার কালে আমাদের মনে বিচিত্র চিন্তা ও অনুভূতি সঞ্চারিত হইয়াছিল। এক প্রকার ক্ষণি আলোক এই সকল ভূগর্ভস্থ দেবগৃহ দর্শনের পক্ষে আমাদের সহায়ক হইয়াছিল, নচেৎ আমরা কিছুই দেখিতে পাইতাম না। দেখিতে দেখিতে স্বপ্নদৃষ্ট দৃশ্য বলিয়া মনে হইতেছিল। ভূগর্ভস্থ নিস্তব্ধতার ভিতর কর্ণে প্রবিষ্ট জল-কলধ্বনি দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য আরও বাড়াইতেছিল। আমরা শুনিলাম যে, পরদেশাপ্পা নামক একজন তাপস এই গুহাগৃহে (প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে) বাস করিয়াছেন। আমরা ভূগর্ভস্থ পথে গুহা হইতে গুহান্তরে গিয়া দর্শনীয় দ্রব্যগুলি দেখিতে লাগিলাম। এই সকল দ্রব্য কোন্ সুদূর অতীতের তাহা

নির্দ্ধারণ পুরাতত্ত্ববেত্তাদের পক্ষেও সহজ নহে। লৌহপ্রস্তর এবং লৌহপ্রস্তর ও লৌহে প্রস্তুত যে সকল বস্তু গুহাগৃহগুলিতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারা মানব-সভ্যতার প্রত্যূষের কথাই আমাদিগকে জানাইতেছে। লৌহ এবং মৃত্তিকা এই দুইটি পদার্থে প্রস্তুত বহু তৈজস আমরা দেখিতে পাইলাম। প্রাচীন এবং পরবর্ত্তী প্রস্তরযুগের নিদর্শন এই সকল তৈজস আমাদের মনকে কোন্ কল্পনাতীত কালের দিকেই লইয়া গেল। বাহিরের প্রবল পরিবর্ত্তন-প্রবাহ বিপুল বিপ্লব-প্লাবন ভূগর্ভস্থ এই গুহাগৃহগুলিতে প্রবেশ করে নাই বলিয়াই প্যালিওলিথিক ও নিয়োলিথিক যুগের অবশেষসমূহ অবিকৃত-ভাবে এখানে রক্ষিত থাকা সম্ভব হইয়াছে। কতকগুলি গুহা যাহারা অন্যান্যগুলি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর তাহাদের ভিতর আমরা প্রস্তরে প্রস্তুত খল বা হামানদিস্তার ন্যায় (পদার্থকে পিষ্ট বা চূর্ণ করিবার কার্য্যে ব্যবহৃত) বস্তু দেখিতে পাইলাম। গুহাগাত্রগুলি কোন লৌহনির্ম্মিত হাতিয়ারের দ্বারা ঘর্ষিত হইবার নিদর্শনও আমরা প্রাপ্ত হইলাম। এই সকল চিহ্ন নিয়োলিথিক বা নূতন প্রস্তরযুগের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রথম লৌহযুগের বলিয়া পুরাতত্ত্ববেত্তাদের অভিমত। প্যালিউলিথিক বা প্রাচীন প্রস্তরযুগে প্রস্তরের দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হইত, নিয়োলিথিক যুগেও লৌহের ব্যবহার প্রবর্তিত হয় নাই। পরবর্ত্তী আইরন এজ হইতে মানুষ লৌহ প্রস্তুত করিতে এবং লৌহের অস্ত্র ও তৈজস ব্যবহার করিতে শিখে।

এই জলাধারগুলি ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের

ভূগর্ভের নিম্নতর স্তরগুলি পরিদর্শন করিলে সন্দেহ থাকে না যে, আমরা ক্রমশঃ প্রাচীন হইতে প্রাচীনতর যুগের অবশেষ-সমূহের দিকে অবতরণ করিতেছি। যাঁহারা মোহেন-জো-দারোর ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করিয়াছেন তাঁহারা এই স্তরগুলির বক্ষে

চিতলদুর্গ

এমন অনেক বস্তু রক্ষিত দেখিবেন যাহা মোহেন-জো-দারোর সমসাময়িক বলিয়া মনে হইতে পারে। মৃন্ময় পাত্রগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব চারি হাজার অব্দের হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। এক স্থানে খানিকটা ভস্ম অর্থাৎ ছাই স্তূপীকৃত আছে। লৌহপ্রস্তর হইতে লৌহ প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টার পরিচায়ক কতিপয় পদার্থ দৃষ্টি-গোচর হইল। ইহা নিয়োলিথিক বা পরবর্ত্তী প্রস্তর-যুগের অবশেষ হওয়া অসম্ভব নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। লৌহ প্রস্তুত করিবার প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলিয়াই এইগুলিকে মনে হয়। লৌহাদি ধাতু গলাইবার মূচি (মৃন্ময়) এবং অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার ভস্ত্রা আমরা দেখিতে পাইলাম। জলাধার (মৃন্ময়), অ-রঞ্জিত ও অ-চিত্রিত মৃন্ময় পাত্র-সমূহ, মাদুলি, মুদ্রা ও সীল বা মোহর এই-গুলি দেখিতে দেখিতে মোহেন-জো-দারোর কথাই স্মৃতিপথে জাগরিত হইল। ইহাদের বয়স ঠিক নির্দ্ধারিত না হইলেও অতি প্রাচীনতা সংশয়াতীত। ইহারা অন্ততঃ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বের, সে সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববেত্তাদের সন্দেহ নাই। উহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর হওয়া অসম্ভব নয়।

চন্দ্রবল্লী উপত্যকায় এক সময় শত-বাহনবংশীয় নৃপগণের শাসন প্রবর্ত্তিত থাকা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঐ বংশীয় রাজাদের বহু মুদ্রা ধ্বংসাবশেষ-সমূহের ভিতর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রার ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র একটি সীসা-নির্ম্মিত মুদ্রা। এই মুদ্রার গায়ে একদিকে একটি ষণ্ডমূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে এবং ব্রাহ্মী বর্ণমালায় লিখিত আছে—মহারথীশ

সদাকণ কলালয়'। অপর দিকে ব্রাহ্মী অক্ষরেই লিখিত রহিয়াছে 'তদাকায়ির'। শতবাহনরাজ্ঞী নায়ানিকার পিতার নাম 'তদাকায়ির' ছিল বলিয়া এই মুদ্রার গুরুত্ব অসাধারণ। আমরা প্রসিদ্ধনামা নানাঘাট শিলালিপিতে রাজ্ঞী নায়ানিকার নাম উল্লিখিত দেখি। বৃটিশ যাদুঘরের অধ্যক্ষ মিঃ র‍্যাপ্‌সন 'তদাকায়ির'কেই 'মহারথীশ সদাকণ' বলিয়া মনে করেন। ইহা সত্য হইলে এই সীসা-নির্ম্মিত মুদ্রাটিকে খৃষ্টপূর্ব্ব ১৮০ অব্দের বলিতে হয়।

কতিপয় উত্তরভারতীয় নৃপতির মুদ্রাও এই অবশেষগুলির মধ্যে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, রোম-সাম্রাজ্যের কয়েকটি মুদ্রা এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রোমান মুদ্রাগুলির মধ্যে যে-টি প্রাচীনতম সেটি সুবিখ্যাতনামা সম্রাট্ অগাষ্টাস সীজারের। একটি চৈনিক মুদ্রাও এখানে পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাটি চীনের প্রসিদ্ধ হ্যানবংশীয় ইউ, তি নামক সম্রাটের। এই সম্রাট খৃষ্টপূর্ব্ব ১৩০ অব্দে চীনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সকল মুদ্রার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, চন্দ্রবল্লী উপত্যকার অধিবাসীদের সহিত রোম এবং চীনের আদান-প্রদান ছিল। দক্ষিণাপথের পণ্য রোমে

নর্দ্দমার সহিত সংযুক্ত চৌবাচ্চা

ও চীনে এবং রোম ও চীনের পণ্য দক্ষিণাপথে আসিত—এই সত্যই এই সকল বিদেশীয় মুদ্রাগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয়।

অনেকগুলি সীলমোহর চন্দ্রবল্লী উপত্যকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সীলগুলি সংখ্যায় মোহেন-জো-দারো ও হারাপ্পা সীলসমূহের সমকক্ষ না হইলেও ইহাদের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব কম নয়। ইহাদের ভিতর একটি মৃন্ময় সীল পাওয়া গিয়াছে। সীলটি যজ্ঞশ্রী নামক নৃপতির। একটি হস্তী তাহার শুণ্ড তুলিতেছে —এইরূপ চিত্র এই মোহরের গায়ে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। আর একটি সীলে নাগমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে এবং ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা আছে 'আমরা সমগারিলস' অপর একটি মোহরে 'সদাকণলয়া সশেবেশ' এইরূপ লিখিত রহিয়াছে।

কতকগুলি স্তরকে প্রত্নতাত্ত্বিকরা শতবাহন-স্তরাবলী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এবং ঐগুলিকে সময় অনুসারে আদি, মধ্য এবং শেষ শতবাহন-স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। যে ব্যাঘ্রাকৃতি আঁকা শিলাখণ্ডের কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি উহার নিকট একটি প্রস্তরে প্রস্তুত নর্দ্দমা বা জলনির্গমনপথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরে পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে ইহা ভূগর্ভস্থ নর্দ্দমার অবশেষ। নর্দ্দমার উপরে আচ্ছাদন আছে। এই নর্দ্দমা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চতর স্তরে একটি বৃহৎ জলাধার বা চৌবাচ্চা এবং কতিপয় মৃন্ময় পাত্র পাওয়া গিয়াছে। নর্দ্দমার উপরিস্থ প্রস্তরাচ্ছাদনের উপর দুইশ্রেণীর মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি মুদ্রা আদি শতবাহনযুগের এবং কতকগুলি মধ্য শতবাহনযুগের। পণ্ডিতগণ পর্য্যবেক্ষণের পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নর্দ্দমাটি প্রাচীনতর কালের এবং উচ্চতর স্তরে ইমারতের যে অবশেষ অবস্থিত রহিয়াছে উহারা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ের।

একটি পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট এবং ইষ্টকে সৃষ্ট নল নর্দ্দমাটির এক প্রান্তের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। এই নল ছাড়া ঐ প্রান্তের সহিত সংলগ্ন হইয়া একটি জলাধার বা চৌবাচ্চাও বিদ্যমান আছে। এই চৌবাচ্চাটি বড় বড় ইষ্টকে প্রস্তুত। এই নর্দ্দমা, নল ও চৌবাচ্চা প্রভৃতির দ্বারা বুঝা যাইতেছে চন্দ্রবল্লী উপত্যকার অধিবাসী নরনারীর মনে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে যে সুবুদ্ধি ও সুরুচি বিদ্যমান ছিল তাহা সংস্কৃতির পথে অগ্রগতির বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। নগর এবং গৃহনির্ম্মাণ ব্যাপারে তাহাদের জ্ঞান বহু পরিমাণে মোহেন-জো-দারোবাসীর অনুরূপ। মোহেন-জো-দারোর বক্ষে এই জ্ঞানের যে বিস্ময়কর নিদর্শন আমরা দেখি, ঠিক ততখানি না হইলেও দূর দাক্ষিণাত্যের বক্ষে বিরাজিত সুদূর অতীতের এই অবশেষগুলি আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, সন্দেহ নাই। যখন দক্ষিণাপথের অন্যান্য অঞ্চলে সভ্যতার পথে অনগ্রসর সম্প্রদায়সমূহ বসবাস করিত, তখন এই উপত্যকায় প্রায়ই সুমের ও মিশরের সমকক্ষ সভ্যতা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। নগর-নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে মোহেন-জো-দারো মিশর ও সুমেরকে অতিক্রম করিয়া আগাইয়া গিয়াছিল এই সত্য সংশয়াতীত। কতকগুলি বিষয়ে সিন্ধু উপত্যকায় প্রকটিত ও চন্দ্রবল্লী উপত্যকায় অভিব্যক্ত সভ্যতায় সাদৃশ্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। যতই আমরা ভূগর্ভস্থ অবশেষগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলাম ততই এই সাদৃশ্য ধরা পড়িতে লাগিল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন

চন্দ্রবল্লী উপত্যকায় খননের ফলে সুপ্রাচীন সৌধসমূহের যে সকল ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাদের ভিতর আমরা উৎকৃষ্ট ইষ্টকাবলীই দেখিতে পাই। মোহেন-জো-দারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও অনেকটা এইরূপ ইষ্টকই দৃষ্ট হইয়া থাকে। চন্দ্রবল্লীর ইষ্টকগুলি আকারে বৃহৎ। এক একটি ইষ্টক ১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৯ ইঞ্চি প্রশস্ত। ঘনত্ব সাড়ে তিন ইঞ্চি। ইহারা অগ্নির সাহায্যে সুপক্ক। দৃঢ়তাও অসাধারণ। এইরূপ সুদৃঢ় ইষ্টক আমরা আজকাল প্রায়ই দেখি না। ভিত্তি ছাড়া প্রাচীরেরও কতক অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে! প্রাচীরের ঘনত্ব ১৮ ইঞ্চির কম নয়। আমরা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেরূপ প্রণালীতে ইষ্টকগুলি বিন্যস্ত দেখি, ইহারা অনেকটা সেই রকম ভাবেই গাঁথা হইয়াছে। এই সাদৃশ্য আমাদিগকে বিস্মিত করিতে পারে। লাল মাটি সুড়কির কাজ করিয়াছে। ইষ্টকগুলি এই মাটির দ্বারা পরস্পর এরূপ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, সহজে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ছাদের অংশও বর্ত্তমান আছে। একপ্রকার টালির ছাউনি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে দাক্ষিণাত্যের ম্যাঙ্গালোর অঞ্চলে যে প্রকার টালি ব্যবহৃত হয় চন্দ্রবল্লী উপত্যকার এই অতি প্রাচীন টালিগুলির সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আমাদিগকে বিস্মিত করিতে পারে। ভিত্তির ভিতর কতিপয় মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। এই ভিত্তির অভ্যন্তরে আর একটি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। তাহা খল বা হামান-দিস্তার ন্যায় কোন বস্তু চূর্ণ বা পেষণ করিবার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যবিশেষ। ইহা চিকিৎসকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়।

বৃহত্তর গৃহের যে অবশেষ ভূগর্ভের অভ্যন্তর হইতে খননের ফলে বাহির হইয়াছে, তাহা কোন শতবাহন-নৃপতি বা তাঁহার অমাত্য বা অন্য কোন কর্ম্মাধ্যক্ষের। বহুসংখ্যক মুদ্রা ও সীল এই বৃহত্তর ভবনের ধ্বংসাবশেষের ভিতর পাওয়ার জন্যই পণ্ডিতরা অনুমান করেন—ইহার অধিকারী রাজা না হউন, উচ্চশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী ছিলেন সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই বড় বাড়ীটিতে বালুকাপ্রস্তরে প্রস্তুত একটি গণেশমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি মনোরম। স্বর্ণ এবং হস্তিদন্তনির্ম্মিত কতিপয় পদার্থ হইতে জানা যাইতেছে—গৃহের অধিকারী সঙ্গতিশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ভূগর্ভের যে স্তরে এইগুলি পাওয়া গিয়াছে উহাতে অনেকগুলি ছোট বড় পাথরের পুতুল বা মূর্ত্তিও বিদ্যমান আছে। এই ধরণের মূর্ত্তি আমরা মোহেন-জো-দারোতেও দেখি। মনুষ্যমূর্ত্তি ছাড়া কতকগুলি প্রাণি-মূর্ত্তিও রহিয়াছে। হস্তী, গরু এবং মোরগ—এই তিনটি মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতিমূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইলাম। কতকগুলি নগ্ন নারীমূর্ত্তি আমাদিগকে মোহেন-জো-দারোর যাদুঘরে দৃষ্ট কতিপয় এইজাতীয় মূর্ত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিল। ইহা হইতে আমাদের স্পষ্টই ধারণা হয় যে, শতবাহনযুগে চন্দ্রবল্লী উপত্যকায় সমুন্নত ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল, ইহাও আমরা অনুমান করিতে পারি। যাহাকে শতবাহনযুগের মধ্যবর্ত্তী অংশ বলা চলে সেই সময়ে এই উপত্যকায় বিকশিত সংস্কৃতির পূর্ণ পরিণতি ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন—খৃষ্টাবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই পরিণতি সংঘটিত হইয়াছিল। কাহারও মতে খৃষ্টের তিরোধানের একশত বা দুইশত বৎসরের

মধ্যেই শতবাহনযুগে অভিব্যক্ত সেই সভ্যতা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হইয়াছিল।

আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করিয়াছিল, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শনগুলি। প্যালিওলিথিক এজ বা প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নিয়োলিথিক এজ বা নূতন প্রস্তরযুগ এবং প্রথম লৌহযুগ—এই তিনটি অতি প্রাচীন সময়ের অবশেষ আমরা

আচ্ছাদিত বা ছাদবিশিষ্ট প্রাগৈতিহাসিক নর্দমা

চন্দ্রবল্লী উপত্যকায় ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন স্তরগুলির ভিতর পাইতেছি। যে সকল মৃন্ময় পাত্র এই সকল স্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারা কম চিত্তাকর্ষক বা গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রাচীন সভ্যতার লীলাস্থলী দেশগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে প্রত্নতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতরা বহু মৃন্ময় পাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এইগুলি পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা অনেক কিছুই জানিতে পারিয়াছেন। শুধু মোহেন-জো-দারোর নয়, আমরা পশ্চিম এশিয়ার বিলুপ্ত সভ্যতাসমূহের ধ্বংসাবশেষও পরিদর্শন করিয়াছে। মৃৎ-পাত্র ঐ সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বর্ণবিহীন, একবর্ণশালী এবং বহুবর্ণবিশিষ্ট—এই তিন প্রকার মৃৎপাত্র আমরা চন্দ্রবল্লী উপত্যকাতেও দেখিতে পাই। নিম্নতর স্তরেও কারুকার্য্য-কমনীয় মৃন্ময় পাত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণিত হইতেছে—ঐরূপ অতিপ্রাচীন সময়েও এই অঞ্চলে শিল্পকলার প্রশংসনীয় বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। একটা বড় কিন্তু সাদা-সিধা মৃৎভাণ্ড উপরে উল্লিখিত প্রাচীন গৃহের ভিত্তির নিকটে পাওয়া গিয়াছে। ভাণ্ডটির ব্যাস প্রায় আড়াই ফিট। লাল বর্ণে রঞ্জিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় কতকগুলি ভাণ্ড ঐ জায়গাটিতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতিপয় পাত্রের গাত্রে বিচিত্র চিত্র-রেখা সাদা ও লাল রঙে আঁকা হইয়াছে। মসৃণ, লাল, ঢাকনি-বিশিষ্ট ভাণ্ডও পাওয়া গিয়াছে। বড় বড় মৃন্ময় জলপাত্রও বিভিন্ন স্তরে বাহির হইয়াছে। কতকগুলি পাত্র শতবাহনযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের। প্রাগৈতিহাসিক স্তরগুলির বাস-গৃহাবশেষেই পাত্রসমূহ পাওয়া গিয়াছে তাহা নহে, শব সৎকারের স্থানেও কতিপয় পাত্র পাওয়া গিয়াছে। উর্দ্ধতর স্তরে সাদাসিধা এবং নিম্নতর স্তরে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক পাত্রাবলী পাইয়া পণ্ডিতরা অনুমান করেন—প্রাচীন কালে শিল্পকলার অধিকতর বিকাশ সাধিত হইয়াছিল। মোহেন-জো-দারোতেই আমরা এইরূপ দেখিতে পাই।

আমরা যে ব্যাঘ্রাকৃতি-আঁকা সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের কথা বলিয়াছি, উহার নিকটে অনেকগুলি বিচিত্র পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি মসৃণ বা চিক্কণ কৃষ্ণকায় কটোরা বা বাটি, (bowl) বোলজাতীয় জলপাত্র (সুদৃঢ় ভাবে সংলগ্ন ঢাকনিবিশিষ্ট), রেকাবি, বোতল বা শিশিও (অবশ্য মৃন্ময়) বিভিন্ন স্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোলের আচ্ছাদনের আকার প্যাগোডার ন্যায়। বড় বড় জলপাত্রগুলির নিম্নদেশ হস্তীর ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট। নিম্নস্তরের বর্ণসমৃদ্ধ ভাণ্ডগুলি সত্য সত্যই বিস্ময়জনক। যে স্তরকে খৃষ্টপূর্ব্ব চারিহাজার বৎসরের পরবর্ত্তী বলা চলে না, উহার বক্ষেও বর্ণসমৃদ্ধ কারুকার্য্য-কমনীয় পাত্ররাজি পাওয়া ঐ সময়ে চন্দ্রবল্লী উপত্যকায় সভ্যতার বিশেষ বিকাশের বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। একটা লালবর্ণ পাত্রের গায়ে বাঁশের দ্বারা কারু-কার্য্য করা হইয়াছে। কতকগুলি পাত্র অগ্নিপক্ক নয়, রৌদ্রপক্ক। কতকগুলি অগ্নির দ্বারা সুপক্ক। কতকগুলি মৃন্ময় পাত্র দেখিলেই বুঝা যায় মৃৎশিল্পী তাহা হাতে পিটিয়া পিটিয়া প্রস্তুত করিয়াছে। কতকগুলি এরূপ যে, কুম্ভকারের চক্রে উহারা গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া বেশ বুঝা যায়। কাদার সহিত অভ্র মিশাইয়া পাত্র প্রস্তুত করার প্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে ঐ অঞ্চলে অভ্র পাওয়া যাইত, ইহা হইতে এই সত্য আমরা উপলব্ধি করি। মাদ্রাজ অঞ্চলে অভ্রের খনি এখনও রহিয়াছে।

ধ্বংসাবশেষসমূহের ভিতর একটি ছাড়া মনুষ্যের করোটি ও কঙ্কাল একেবারেই না পাইয়া পণ্ডিতরা অনুমান করেন—মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কোন কোন বড় পাত্রে ভস্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ভস্মকে দেহাবশেষ বলিয়া অনুমান করা হয়। আরও কতিপয় চিহ্ন হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, দেহ দাহ করিবার প্রথাই এই অঞ্চলে অতি প্রাচীন কালেও প্রচলিত ছিল। এ বিষয়ে সংশয় নাই যে, এই দাহপ্রথাই স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। শুধু ভারতের নয়, আমরা কতিপয় অন্যদেশের প্রাগৈতিহাসিক মানবকেও এই প্রথা অনুবর্ত্তন করিতে দেখিতে পাই। দেহ দাহ

বার পর ভস্মাবশেষ একটি পাত্রে রক্ষা করা হইত। এইরূপ পাত্রের পার্শ্বে মুদ্রা দেখিয়া পণ্ডিতরা অনুমান করেন—উহা বৈতরণী পার হইবার শুল্ক বা মাশুলরূপে আত্মীয় বা প্রিয়জনের দেহাবশেষ-পার্শ্বে রাখার প্রথা এই অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। মিশরাদি দেশে শবের পার্শ্বে শুধু মুদ্রা নয়, বৈতরণী পার হইবার নৌকা পর্য্যন্ত রাখার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল।

নিম্নতম স্তরের অব্যবহিত ঊর্দ্ধে যে স্তরটি অবস্থিত, উহা প্রাগৈতিহাসিক লৌহযুগের বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। লৌহ-যুগের একটি নগরের অবশেষ এই স্তরে রহিয়াছে। যখন মানুষ লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়া উহার দ্বারা অস্ত্র-শস্ত্র ও তৈজসাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে তাহাই লৌহ-যুগ। যেখানে সুদূর লৌহযুগে নগর গঠিত হইয়াছিল, সেই উপত্যকার অভিব্যক্ত সভ্যতার অতিপ্রাচীনতা সম্বন্ধে কেহই কিছু মাত্র সন্দেহ করিতে পারেন না। মৎস্য ধরিবার বঁড়শি, লৌহখাদ এবং লৌহ-প্রস্তর হইতে লৌহ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি এই লৌহযুগের নগরের ধ্বংসাবশেষের ভিতর আমরা দেখিতে পাই। কোন কোন স্থানে লৌহযুগেরও পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়োলিথিক এজ বা পরবর্ত্তী প্রস্তর-যুগের লোকালয়ের অবশেষ পাওয়ার কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই সকল দেখিয়া পণ্ডিতরা বলেন—দাক্ষিণাত্যের মধ্যে চন্দ্রবল্লী উপত্যকা সেইরূপ একটি স্থান, যেখানে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ প্রস্তর-যুগ হইতে লৌহযুগে পদার্পণ করে এবং পরে ক্রমশঃ সভ্যতার পথে অনেক দূর আগাইয়া যায়।

এই সময় আমাদের এঞ্জিনীয়ার ও ঠিকাদার বন্ধুটির নিকট একখানি গুরুত্বপূর্ণ পত্র আসে—অবিলম্বে 'শিবসমুদ্রম্' বৈদ্যুতিক শক্তি-সমুৎপাদন সম্পর্কিত কারখানায় যাইবার জন্য। এই পত্র পাইবার পর একটি লোক আসিয়া তাঁহাকে শীঘ্র শ্রীরঙ্গপত্তন যাইতে অনুরোধ করে। আমরা বন্ধুর অনুবর্ত্তী হইব, না তাঁহাকে ছাড়িয়া নিজেদের ইচ্ছামত ভ্রমণে রত রহিব—এই প্রশ্ন আমাদের মধ্যে উত্থিত হইলেও অবশেষে তাঁহার অনুবর্ত্তী হওয়াই স্থির হয়। বন্ধুও বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন তাঁহার সঙ্গে যাইতে। প্রথমে শ্রীরঙ্গপত্তনে যাইয়া তাহার পর 'শিবসমুদ্রম্' যাওয়া স্থির হয়। আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক ধর্ম্মপ্রাণ জৈন সুহৃদ্। এই স্থানে বলা প্রয়োজন, আমাদের মহীশূরবাসী বন্ধুটিও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। মহীশূরে জৈনধর্ম্মের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অধিক। এই বন্ধুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় জৈন মহাতীর্থ পার্শ্বনাথ পাহাড়ে। বন্ধু মহীশূর হইতে জৈনদের পক্ষে অবশ্য দর্শনীয় (হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত) পার্শ্বনাথ পাহাড় পরিদর্শনে আগমন করেন। ঐ সময় আমিও তথায় গমন করিয়াছিলাম।

শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে আমরা গোমাতেশ্বর নামক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দর্শনার্থ গমন করি। শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে ইন্দ্র এবং চন্দ্র নামক পাহাড়দ্বয়। ইন্দ্র নামক পাহাড়টির শীর্ষে জৈনসাধু গোমাতেশ্বরের বিরাট বিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছে। ৯৮৩ খৃষ্টাব্দে ইহা চামুণ্ড রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইনি গঙ্গবংশীয় রাজা রাচমল্লের মন্ত্রী ছিলেন। অন্য কোন স্থানে প্রস্তুত করিয়া ইহা ইন্দ্রগিরিশীর্ষে আনীত হয়, না এই স্থানেই কোন প্রকাণ্ড শিলার গাত্র উৎকীর্ণ করিয়া নির্ম্মিত হয়—তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া পণ্ডিতরা শেষের মতটিকেই সমর্থন করেন। মূর্ত্তিটি যেরূপ বিরাট সেরূপ কোন কারুকার্য্য ইহাতে নাই। বিশালত্বই ইহার বৈশিষ্ট্য। মূর্ত্তির মুখ উত্তর দিকে এবং বহু মাইল দূর হইতে এই বিরাট বিগ্রহটি দেখা যায়। গিরিগাত্রস্থ গ্রানিটের গায়ে দশত সোপান বিদ্যমান এবং এই সোপানশ্রেণী আরোহণের পর গোমাতেশ্বর মন্দির পাওয়া যায়। শৈলশীর্ষ হইতে পার্শ্বস্থ চন্দ্রগিরি এবং উহার পার্শ্বে প্রসারিত জলাশয়টির দৃশ্য চিত্তাকর্ষক।

ভারতের অন্যান্য অংশেও জৈনদের অর্চ্চিত মূর্ত্তি আছে বটে; কিন্তু বিশালতায় এই মূর্ত্তির সমকক্ষ কেহই নহে। ফার্গুসনের মতে মিশরের বাহিরে এইরূপ মহান্ মূর্ত্তি কুত্রাপি দেখা যায় না। ফার্গুসন এই বিগ্রহের উচ্চতা ৭০ ফিট ৩ ইঞ্চি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মহীশূরবাসী বন্ধু ইহা ৫৭ ফিট উচ্চ বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। আমাদের মনে হয়, ফার্গুসন সাহেব অনুমানের আশ্রয়ে লিখিয়াছেন। বন্ধুটির এই বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান অপেক্ষাকৃত অধিক, সন্দেহ নাই।

গোমাতেশ্বর দর্শনের সময় সহসা আবিষ্কৃত হয় যে, আমরা কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ চিতলদুর্গে ফেলিয়া আসিয়াছি। তখন আমরা তিনজন তথা হইতে রেলপথে চিতলদুর্গ যাত্রা করি। প্রবন্ধান্তরে আমরা এই ভ্রমণ-কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ বিবৃত করিব।

সাহানা*

শ্রীঅরুণা চট্টোপাধ্যায়

সুরের কূজন কুহরে স্মৃতির কন্দরে,
যবে গো শুকায় প্রাণের নিঝর-ধারা
সুরভি ঘুমায় প্রাণের বিজন বন্দরে,
কুসুমের প্রাণ হয় গো যখন সারা।

গোলাপের দল মরণ গোধূলি মাঝে
বাসক-শয়ন সাজাবে বঁধুয়া লাগি
তোমারি স্বপন আমার জীবন মাঝে—
রহিবে ঘুমায়ে প্রিয়তম, অনুরাগী!

* (Shellyর "Music when soft voices die" কবিতার ভাবানুসরণে)

মৃত্যুর চেয়ে বড়

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

ছোট্ট দ্বীপ আইল অফ ম্যান। তারই পশ্চিম প্রান্তে পীল শহর। পীল থেকে আব মাইল দক্ষিণে এগিয়ে গেলেই যে উপত্যকায় এসে পড়ি তার নাম নকালো।

সমুদ্র থেকে খাড়া ওপরের দিকে উঠে গেছে রুক্ষ পাথরের পুঞ্জ। পাহাড়ের উপত্যকায় কয়েকটি খামার-ও জোতদারের বাড়ী ; তারপরই সুরু হ'লো বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র। এমনি একটি খামারের মালিক রবার্ট ক্রেজ। তাঁর মেয়ে মোনাই হ'লো আমাদের উপন্যাসের নায়িকা। মোনা কিন্তু খুব সুন্দর নয়। দীর্ঘ একহারা চেহারা তার। প্রত্যেকটা অঙ্গ সুডোল ও স্বাস্থ্যপূর্ণ। তাছাড়াও তার সমস্ত দেহে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ ভেসে রয়েছে যাকে উপেক্ষা করা যায় কিন্তু অস্বীকার করা চলে না।

জানালার পাশেই বিছানা। একটা নরম বালিশে হেলান দিয়ে মোনা বসেছিল। তার দৃষ্টি জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে সবুজ মাঠটার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। মোনা ভাবছিল অন্য কথা। পাশের ঘরে বৃদ্ধ পিতার কম্পিত কণ্ঠস্বর এতক্ষণে নিঃশব্দ হয়ে এলো। ওল্ড টেষ্টামেন্টের অংকের করুণ বিলাপ তাঁর কণ্ঠকণ্ঠে বক্তৃত হয়ে উঠছিল। বোধহয় তন্দ্রার ছায়া নেমেছে তাঁর বেদনার্ত দুই চোখে। বালিশের তলা থেকে মোনা বের করলে রবির চিঠি। রবি—তার বৃদ্ধ পিতার অবলম্বন, মোনার প্রিয়তম বড় ভাই রবার্ট। চিঠি লিখেছে সে ফ্রান্সসীমান্তের রণক্ষেত্র থেকে। রবির কথা মনে হ'লে মোনার সবল হৃদয়ও বেদনার্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘ তরুণ যুবক—মাথার তামু একরাশ কোঁকড়ান চুল। মোনার প্রধানতম সহচর সে; আজ বর্ব্বর জার্ম্মানের বিপক্ষে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। প্রত্যেক সপ্তাহেই তার চিঠি আসে, আজও এসেছে। হাতের মুঠোর মধ্যে খামটা আঁকড়িয়ে ধরলে মোনা। তার দুই চোখ সজল হ'য়ে উঠেছে। তন্দ্রালু বাবাবয়েরে মনে শুধু ভেসে উঠল আর এক দিনের ছবি।...

সেদিনও প্রত্যহের মতই দুধের চালান নিয়ে মোনা এসেছিল পীলে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। সমস্ত শহর ভরে জেগে উঠেছে এক বিপুল কর্ম্মব্যস্ততা। শহরের যুবকের দল অশ্রান্ত গুঞ্জনে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। নীল রঙের পরিচ্ছদে সামরিক কর্ম্মচারীরা স্ত্রী-পুত্রের কাছে বিদায় নিয়ে ছুটে চলেছে ষ্টীমার ষ্টেশনের দিকে। আশ্চর্য্য হ'য়ে মোনা পরিচিত একটী মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছে বল'ত।

—ও! তুমি শোননি বুঝি? আজ থেকে যে এখানে সৈন্য সংগ্রহের কাজ সুরু হ'লো।

—সৈন্য সংগ্রহ? কাদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বাধলো?

—কেন, জার্ম্মানী? জানো না, বর্ব্বরের দল বেলজিয়ম আক্রমণ করেছে। ওদেরকে এবার রীতিমত শিক্ষা দেওয়া দরকার।

—নিশ্চয়ই

বিপুল উত্তেজনা নিয়ে মোনা ছুটে এল বাড়ীতে। প্রথমেই দেখা হ'ল রবির সঙ্গে। হাঁফাতে হাঁফাতে মোনা বলল—যুদ্ধের খবর শুনেছ নিশ্চয়ই!

রবি উত্তেজিত হ'য়ে বলল—শুনেছি বইকি! এবার আমাদেরও ডাক এসেছে। কিচেনার যে আহ্বান জানিয়েছেন রাজা ও দেশের স্বার্থে আজ আমাদেরও প্রয়োজন।

রবির কালো চোখের তারাদুটী উৎসাহে জ্বলে উঠল। আরও অনেকদিন পরের কথা। শীতের আকাশ ধূসর হ'য়ে উঠেছে। এমনি এক অপরাহ্নে মোনা বাবার সঙ্গে চা পান করছিল। ঠিক এমনি সময়ে ঝড়ো হাওয়ার মত দুরন্ত বেগে প্রবেশ করল রবি। তার গলায় উত্তেজনা ঠিকরে উঠল—বাবা, আমি যুদ্ধে যোগ দিয়েছি, এইমাত্র সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে এলাম।

মোনার মুখ গৌরবে রাঙা হ'য়ে উঠল। সে ধীরে ধীরে এসে রবির দুইহাতে চুম্বনের রেখা এঁকে দিল। পরের দিন তার দীর্ঘ চঞ্চল দেহ আস্তে আস্তে পীলের পথে মিলিয়ে গেল।...

মোনা আস্তে আস্তে মাথা তুলল, জলে ভেজা চোখ দুটী তাদের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আজ শুধু এই একটি দিনের জন্য মোনা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল। এই নির্ভীক জার্ম্মান-বিদ্বেষী মেয়েটির মনে ভেসে উঠেছে এক রণশ্রান্ত সৈনিকের উন্নত সুন্দর দেহ। সে দেহ তারই ভাই রবির। রবিকে ঘিরেই বুঝি তাদের প্রাণ জেগে ছিল। এই আনন্দোজ্জ্বল শান্তিপূর্ণ বাড়ীটির সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আলোড়ন যেন রবির সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধাভিমুখী হয়েছে। ব্যথাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় ভ'রে উঠেছে সমস্ত নকালো।

আস্তে আস্তে তার মনে ভেসে এল বৃদ্ধ পিতার ক্ষমা-সুন্দর চোখের দৃষ্টি। মনে পড়ল তার এই ছ'মাসের প্রত্যেকটা দিনের কথা। বৃদ্ধ পিতা বাইবেল হাতে ছুটে আসেন সংবাদপত্র পড়বার জন্যে। বেলজিয়মে জার্ম্মান

Hall Gaine-এর The woman of Knockalo-এর অনুসরণে—

সৈন্যের অত্যাচারের কাহিনী শুনতে শুনতে মোনা যখন দুঃসহ ক্রোধে চীৎকার ক'রে ওঠে—'কেন ভগবান্ এই পশুর জাতকে পৃথিবী থেকে নির্ম্মূল করেন না তখন বৃদ্ধ নিঃশব্দে শুধু পড়ে যান—ইংল্যাণ্ড যাদের আশ্রয় দিয়েছিল, বিশ্বাস করেছিল, আজ জানা গেল তাদের বেশীর ভাগই জার্ম্মান গুপ্তচর। ইংলণ্ডে জার্ম্মান বিমান বোমাবর্ষণ করেছে। এ তাদের ইংলণ্ড আক্রমণের সূচনা। হঠাৎ মোনা গর্জ্জন ক'রে উঠল—ওদের সকলকে জেলে পুরে রাখা উচিত। বিশ্বাসঘাতক বর্ব্বর নরহন্তার দল।

বৃদ্ধ শুধু বাইবেলটা একবার খুলে ধরলেন, তারপর আবার বন্ধ ক'রে দিলেন। শুধু একটু হেসে বললেন—বড্ড কঠিন হ'য়ে পড়েছ মা, তুমিও নির্দ্দয় হয়ে উঠেছ। সৌম্য হাসিতে ভ'রে উঠল তাঁর দুই চোখ। শুধু অসহ্য জ্বালা ধরল মোনার অন্তরে। ক্ষমা? কাদের? বাবা বাইবেল নিয়ে ডুবে আছেন। সমস্ত মানুষকেই তিনি সমান চোখে দেখেন, কিন্তু মোনা কখনও ক্ষমা করবে না ওই পাশবিক দুরন্ত জাতকে।

মোনা আবার তার কল্পনা-সাগরে ডুব দিল।

দুই

দুই মাস চলে গেছে। বসন্তের প্রথম হাওয়ায় আকাশ আবার সুনীল হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ শীতের অবসানে গরুগুলিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মাঠে। এমনি এক চমৎকার সকালে মোনা ঝীল থেকে বাড়ী ফিরছিল—এমন সময় তার চোখে পড়ল তার বাবা আরও তিন জন ভদ্রলোকের সঙ্গে কি যেন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত। অন্য দু'জনের মাথায় সিল্কের টুপী আর গায়ে হাল্‌কা ওভার কোট। গোলাবাড়ীর গেটে প্রবেশ করবার সময় মোনা দেখল আরও একজন ভদ্রলোক পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। হাতে তাঁর একটি ধনুক আর সঙ্গে দুটি কুকুর। এই চতুর্থ লোকটি তাদের ল্যাণ্ডলর্ড। বাড়ীতে প্রবেশ করবার সময়ে শুধু এই ক'টি কথা শুনতে পাওয়া গেল—রবার্ট বললেন, কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ হবে তখন আমাদের ফার্ম্ম ও জমি-জমার কি হবে?"

উত্তরে ল্যাণ্ডলর্ড বললেন—আপনি ও আপনার ছেলে-মেয়েরা সারাজীবন এখানে থাকতে পারবেন।

মোনা অশ্বটিকে আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘরে এসে বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। খানিকক্ষণ পর বৃদ্ধ রবার্ট হাসতে হাসতে ফিরে এলেন। তিনি বললেন—যে তিন জন এসেছিলেন আমার কাছে তাঁদের মধ্যে একজন এই দ্বীপের গভর্ণর, আর অন্য দু'জন এসেছেন স্বরাষ্ট্র-সচিবের দপ্তর থেকে। শেষ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের গভর্ণমেন্টও দেখছি তোমারই মত কাজ করছেন।

মোনা বিস্মিত হ'য়ে চাইল—তার মানে?

যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন গ্রেট-ব্রিটেনের জার্ম্মান নাগরিকদের অন্তরীণ ক'রে রাখা হবে।

—রাজবন্দী?

—হ্যাঁ, আর গভর্ণর মনে করেন যে, নকালোই তাদের রাখবার সব চেয়ে উপযুক্ত স্থান।

মোনা স্তম্ভিত হ'য়ে গেল—সে কি! ওই ইতর জানোয়ারের দল এসে এখানে থাকবে, আর আমাদের কি চ'লে যেতে হবে?

—না, আমাদের যেতে হবে না। ওই ক্যাম্পে দুধ সরবরাহ করবার ভার পেয়েছি আমরা।

মোনার দুই চোখ প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলে উঠল—ওই জার্ম্মানগুলো প্যারীতে আমাদের ছেলেদের হত্যা করছে, আর ওদের বাঁচাবার জন্যে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে? আমাদের দিয়ে ও কাজ হবে না। আপনি গভর্ণরকে বলে দেবেন—তাঁরা যেন অন্য জায়গা দেখে ঠিক করেন।

স্নিগ্ধ হাসিতে বৃদ্ধের মুখ ভ'রে উঠ্‌ল—যুদ্ধের সময় অভিমান নিয়ে থাকলে চলে না মোনা। গভর্ণমেন্ট যা' চান আমাদের তা' করতেই হবে।

—বেশ তুমি থাকো, আমি এখানে থাকতে পারব না।

এবার অভিমানে বাপের চোখ ছলছলিয়ে উঠ্‌লো—তাতো যাবেই। আমি বুড়ো হ'য়ে পড়েছি; রবি রইল যুদ্ধে আর তুমিতো যাবেই।

মোনা অনুতপ্ত হ'ল। জার্ম্মানদের কাছাকাছি থাকা, বা তাদের জন্য দুধ জোগান দেওয়ার কল্পনাকেও মোনা ঘৃণা করে। কিন্তু তবুও বাবার জন্যে মোনাকে থাকতেই হবে।

তারপর দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ-দুইবেক কেটে গেল। বড় বড় গাড়ীতে বোঝাই হ'য়ে—ইট্, সুড়কি ও কাঠের বীম এসে জমা হ'তে লাগল মাঠে। সবুজ ঘাসের বুক ভেদ ক'রে জেগে উঠ্‌ল কঠিন পাথরে বাঁধানো পথ। অজস্র কুলী ও মজুরের সশব্দ পরিশ্রমে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল সমস্ত নকালো। তারপর দেখা গেল মাঝে মাঝে জানোয়ারের খাঁচার মত ক'রে কাঁটাতারে ঘিরে ক্যাম্প তৈরী করা হ'তে লাগল।

এক নম্বর কম্পাউণ্ডে যারা এল তারা প্রত্যেকেই ধনী ও ব্যবসায়ী। দু'নম্বরে এলো শুধু দরিদ্র নাবিক ও মাল্লার দল। দেখতে দেখতে তিন নম্বরও ভরে উঠ্‌লো লোকে। বড় রাস্তা দিয়ে সশব্দে মার্চ্চ ক'রে তারা এল।

এ দলে শুধু তরুণ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ও কেরাণীর সমাবেশ।

বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠ্‌ল মোনার সমস্ত মন। নকালো থেকে মেয়েরা অন্য জায়গায় চলে গেছে। এমন কি মোনার প্রিয় সহচরী ও তা'র দাদা রবির অনুরাগী লিজি পর্য্যন্ত। সমস্ত নকালোতে এখন সে-ই একমাত্র নারী। দুর্ভাগ্য নকালো···

বাবা এসে বললেন—জানিস মোনা, তিন নম্বর কম্পাউণ্ডে যারা এল তাদের প্রত্যেকেই বড়-ঘরের ছেলে, দেখতেও প্রত্যেকেই সুশ্রী। কিন্তু ওরা নাকি অনুযোগ করেছে, ওদের থাকবার জায়গা মোটেই ভাল হয়নি।

মোনা ভুরু কুঁচকে বলল—ওদের এই যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে।

—না মা, না! বুড়ো মাথা দুলোতে দুলোতে বললেন—ওরা বন্দী হ'য়ে এসেছে; মা বোন, ছেলে-মেয়ে সমস্ত থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রবাসী, এ' কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

মোনার চোখ রাগে জ্বলে উঠ্‌ল—ওরা জার্ম্মান, বিশ্বাসঘাতক বঞ্চকের দল।

বৃদ্ধ বাইবেল হাতে নিয়ে বললেন—তবু ঈশ্বর তো এক।

—না, মা, তুমি অত নির্দ্দয় হ'য়ো না। মানুষকে ভালবাসতে শেখ।

তবু মোনার জার্ম্মান-বিতৃষ্ণা ক্রমশঃ বেড়েই চলল। পঁচিশ হাজার জার্ম্মান বন্দীর মাঝখানে একমাত্র মেয়ে সে। যখন সে রাস্তায় বেরোয় কিম্বা জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে তখন মনে হয় যেন ওরা মোনার দিকে তাকিয়ে হাসে, নানা রকম অসভ্য ইঙ্গিত করে। মোনা রাগে গর্জ্জে ওঠে—জানোয়ারের দল!

সকালে ও সন্ধ্যায় যখন বন্দীরা প্রহরীবেষ্টিত হ'য়ে দুধ নিতে আসে তখন পরিচারকদের সামনে মোনাকে দাঁড়াতে হয়। ওরা চেষ্টা করত মোনার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। কিন্তু মোনা শুধু রূঢ় অভদ্রতায় তাদেরকে এড়িয়ে চলত।

এদের মধ্যে নিয়মিত ভাবে সবার শেষে আসত তিন নম্বর কম্পাউণ্ডের একটি কিশোর। হল্‌দে ফ্যাকাশে তার মুখ। সময় সময় কাশির ধমকে হাঁফিয়ে উঠ্‌ত। দেখলেই মনে হয় যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। কেবলমাত্র এই কচি বয়সের ছেলেটিকে দেখলে মোনার মন অনুকম্পায় ভরে ওঠে। তবুও—মোনা ভাবে—এও সেই বিষাক্ত আগাছারই একটি শাখা মাত্র।

কয়েকদিন পরে আবার রবির চিঠি এল। রবি এবার লেফ্‌টন্যাণ্ট পদে উন্নীত হয়েছে। শীগ্‌গিরই না একটা আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু হবে। তাই সে ব ব্যস্ত আছে। কিন্তু চিঠি নিয়মিত দেবেই। রবি আর লিখেছে—'এখন তা হ'লে কিছুদিনের মত বিদায় বাবা; আশীর্ব্বাদ কর যেন গৌরব অর্জ্জন করতে পারি। মোনাকে বোলো তা'র শেষ চিঠি আমি কয়েকজন অফিসার বন্ধুর কাছে পড়ে শুনিয়েছিলাম। তারা বল্‌লে তোমার বোন সত্যিই অপূর্ব্ব। আমাদের মেজর বললেন—'তোমার বোনের মত নির্ভীক ও উৎসাহী এক হাজারটী যুবককে যদি আমি পেতাম, তাহ'লে একমাসের মধ্যেই যুদ্ধ জয় করতে পারতাম।'

আরও একসপ্তাহ কেটে গেল। সংবাদপত্রে প্রত্যেক-দিন শত্রুপক্ষের পরাজয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। রবির চিঠি আসার সময়ও হ'য়ে এল। প্রত্যেকদিন যখন পিওন চিঠি বিলি করতে আসে তখন দেখা যায় বৃদ্ধ রবার্ট সম্মুখের সরু রাস্তায় পদচালনা করেন। মুখে ঘনঘন পাইপ টেনে চলেছেন। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আভায় একটি উৎকণ্ঠিত ভাব যেন তাঁর সারামুখে প্রস্ফুটিত। এমনি একদিন অপরাহ্নে জানলার ফাঁক দিয়ে মোনার দৃষ্টি পথের দিকে এগিয়ে গিয়ে পড়ল। মোনা দেখ্‌ল পিওন দীর্ঘপদবিক্ষেপে গেটের কাছে এগিয়ে এল তারপর পিতার হাতে একখানা চিঠি তুলে দিয়ে নিঃশব্দে ফিরে গেল। বুড়ো রবার্ট চিঠিখানা হাতে নিয়ে যেন একেবারে কেঁপে উঠলেন, মোনা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সে দেখল বাবা যেন চিঠিখানা অনেকক্ষণ ধ'রে পড়বার চেষ্টা করছেন কিন্তু কিছুতেই প'ড়ে উঠতে পারছেন না। অবশেষে কাঁপতে কাঁপতে মোনার হাতে টাইপ করা চিঠিখানা এগিয়ে দিলেন। মোনা পড়তে আরম্ভ করল। "যুদ্ধসচিব অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ ক'রে জানাচ্ছেন যে,···" মোনা থাম্‌লো, আর পড়বার দরকার ছিল না, রবি রণক্ষেত্রে শয্যাগ্রহণ করেছে। বৃদ্ধ হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন। তাঁর সমস্ত দেহ বজ্রাহতের মত থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। মোনার হাতে কোন রকমে ভর দিয়ে তিনি শয্যায় এসে মূর্চ্ছিতের মত অবসন্ন হ'য়ে শুয়ে পড়লেন।

ডাক্তার এলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। বৃদ্ধ অত্যন্ত বড় রকম একটা নার্ভাস শক পেয়েছেন, এখন কিছুদিন তাঁর বিছানা ছেড়ে নড়াচড়া করা চলবে না, বা কোন রকমে উত্তেজিত হবার সুযোগও দেওয়া হবে না।

মোনার চোখে নামল জল। অস্বাভাবিক একটা দ্যুতিতে নিষ্পলক হ'য়ে রইল তার চোখ। শুধু নাসারন্ধ্র দুটি বার বার ফুলে উঠতে লাগল।—ভগবান! ভগবান্

দি থাকেন তা'হলে শুধু জার্মানরাজের শিরে নয়, কাইজার-ফ্যামিলির ওপর নয়, যেন প্রত্যেকটি স্ত্রীলোক, প্রত্যেকটি শিশুর শিরেও তাঁর অমোঘ বজ্র নেমে আসে। জার্মানীর পথে পথে যেন জেগে ওঠে দুর্গতদের আর্ত্ত-ক্রন্দন।

তিন

তিন মাস পরের কথা। রাজবন্দীনিবাস এর মধ্যেই বিরাট হ'য়ে উঠেছে। চারপাশে পঁচিশ হাজার রাজবন্দী আর দুই হাজার প্রহরী ও অফিসারসহ একজন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ। এদেরই মাঝখানে বৃদ্ধ রবার্টের গোলাবাড়ী ও দুধের ডেয়ারী আর সমস্ত নকালো দ্বীপে এখন একমাত্র মেয়ে মোনা।

রবির মৃত্যুর পর তিন মাস কেটে গেল। বৃদ্ধ রবার্ট এখনও শয্যাশায়ী; মোনা তার জানালার কাছে এসে প্রায়ই বসে। হয়ত চিন্তাগভীর চোখ দুটি আকাশের পানে তুলে নিঃশব্দে বসে থাকে। হঠাৎ এক সময়ে লক্ষ্যে আসে কতকগুলি জার্মান তাকেই কেন্দ্র ক'রে অসভ্যের মত হাসাহাসি করছে। নির্ব্বোধ উল্লুকের দল ওরা—মোনা তার বাবার কক্ষে এল। অদৃষ্টের দুঃসহ রূঢ় আঘাতে পঙ্গু শয্যাশায়ী পিতা ; তাঁর উদার ও সুদূর-প্রসারী হৃদয় রণদেবতার নির্ম্মম পরিহাসে আজ সঙ্কীর্ণ, বিকৃত। রবার্টের ঘরে প্রবেশ করলেই শুনতে পাওয়া যায় তাঁর মৃদুমন্দ কণ্ঠ আবৃত্তির ঝোঁকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তিনি বারবার পড়ে চলেছেন শুধু সেই অংশটুকু—যেখানে ডেভিডের তীব্র আবেদন ঈশ্বরের কাছে—শত্রুদের তুমি ধ্বংস করো, চূর্ণ করো।

মোনা ঘরে প্রবেশ ক'রেই বল্লে—এ আমি জানতাম বাবা, ধুলোয় বসলে পায়ে ধুলো লাগবেই।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসুনেত্রে মোনার দিকে চাইলেন।

—হোম-সেক্রেটারী এসে তখন বল্লেন ওদের সহজে নিয়ে গিয়ে ক্ষেতে ও অন্যান্য জায়গায় নানা কাজের ভার দিতে। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে নাকি ওদের দেহ ও মন দুইই সুস্থ থাকবে ; কিন্তু এখন ?

বৃদ্ধের কানেও এসে পৌঁছেছে সব কথা। জার্মান বন্দীদের প্রত্যেকখানি চিঠি পরীক্ষা ক'রে তবে তাদের হাতে দেওয়া হয়। কয়েক দিন থেকে দেখা যাচ্ছে পীলের গ্যাংস্ বালিকারা—যা'রা কর্ম্মরত জার্মান বন্দীদের সাহচর্য্য লাভ করেছে, বেশীর ভাগ চিঠি আসে তাদেরই কাছ থেকে। মোনা বল্লে—আমাদের লিজি পর্য্যন্ত এর মধ্যে এসেছে। ছিঃ। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে প্রকাশ্য বাজারে এদেরকে চাবকাতাম।

রাগে মোনার গাল লাল হ'য়ে উঠল। মোনা ভাবে জার্মানদের সংস্পর্শে আসাও পাপ। তবু প্রবল অনিচ্ছা সত্বেও প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও সকালে দুধ দেওয়ার সময় তাকে দাঁড়াতে হয় এই জার্মানগুলোরই সামনে এসে। মোনার মন বিষিয়ে ওঠে।

চার

সেদিন সকাল সাতটার সময় মোনা এসে দাঁড়াল তার ডেয়ারীতে। বন্দীরা একে একে দুধ নিয়ে চলে গেল। মোনা কারুর মুখের দিকে কোনদিনই তাকায় না। বিতৃষ্ণায় সে মুখ ফিরিয়ে থাকে। শুধু জানে যে, সবার শেষে দুধ নিতে আসে এক ফ্যাকাশে-মুখ কিশোর—সব সময়েই সে কাশে। আজও মোনা দুধ দেওয়া শেষ হ'য়ে গেলে ফিরবার উপক্রম করল এমন সময় একটা গলার স্বর তার কানে এসে পৌঁছল—এ দুধটা কি আমার মিস্ ক্রেন ? মোনা হঠাৎ চমকে উঠল। সাধারণ বন্দীদের রূঢ় কর্কশ কণ্ঠ ত' এ না। কোমল গভীর ও ভাবপূর্ণ এ' কণ্ঠ এক মুহূর্ত্তের বিস্মৃতিতে মোনার মনে হ'ল এ রবির কণ্ঠ। সচকিত হ'য়ে সে মুখ তুলে তাকাল, সাতাশ আটাশ বছর বয়সের এক তরুণ ; দীর্ঘ ঋজু দেহ, কোঁকড়ানো কালো চুলের নীচে নীলায়ত চোখ—সে চোখের ভাষা মোনার অন্তর স্পর্শ করল। এ ত জার্মান নয় ; এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দ থেকে মোনা জিজ্ঞেস করল—কে আপনি ?

যুবক নত শিরে জানাল যে, যে ছেলেটি তিন নম্বর কম্পাউণ্ড থেকে দুধ নিতে আসত, আজ সকালে উঠেই সে রক্তবমি করায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মোনা বলল—আপনার নাম কি ?

—অস্কার হাইন। (Oskar Haine)

—তিন নম্বরে থাকেন ?

—হ্যাঁ।

এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে মোনা বলল—হ্যাঁ, আপনারই।

যুবক টুপী স্পর্শ করল—ধন্যবাদ।

যুবক প্রহরীর সঙ্গে ফিরে চলে গেল। মোনা ধন্যবাদের উত্তর দিতেও ভুলে গেল। কিন্তু এই প্রথম দেখা গেল মোনা এক দৃষ্টিতে সেই জার্মানের দিকে চেয়ে আছে। দরজা দিয়ে যখন আর দেখা গেল না, তখন সে এসে দাঁড়াল জানালায়। দিনটা কাটল অত্যন্ত অমনোযোগে। রাত্রে যখন বাবা বাইবেল শুনতে ডাকলেন, তখন সে জানাল, তার বড্ড মাথা ধরেছে। মোনা ঘুমোল অনেক রাত্রে।

এর পর দেখা গেল মোনা দিনের বেশীর ভাগ সময় তার বাবার ঘরেই কাটায়। যখন সে একলা থাকে

তাকে দেখলে মনে হয়, নিজের সঙ্গেও বুঝি তার সংগ্রাম সুরু হল। মোনা বিড়বিড় ক'রে ব'লে ওঠে—না, না, এ হ'তে পারে না, আমি জানি আমি তা' নই।

তাই সে ফিরে আসে বাবার কাছে। বৃদ্ধ রবার্ট যখনই মনে করেন—জার্ম্মানদের হাতে তাঁর ছেলের মৃত্যু হয়েছে, তখন অদম্য হয়ে ওঠে তাঁর আবেগ। বাইবেলে তিনি পড়ে যান—

"ঈশ্বর, তুমি জেগে ওঠ, তোমার শত্রুরা আজ চূর্ণ হ'য়ে যাক। জলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ কর ওদের দেহে; বহ্নিসাৎ হ'ক ওরা।" মোনাও এই প্রার্থনায় যোগ দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু হঠাৎ তা'র মনে পড়ে—এই গানগুলি যখন গাইত তখন ডেভিড ঈশ্বরের মোটেই প্রিয় ছিল না। তবু মোনা বন্দীদের বিরুদ্ধে তা'র মনকে বিরূপ ক'রে তোলে। অস্কার যখন আসে তখন মোনা অন্যদিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু একদিন সকালে হঠাৎ অস্কার বলল—লুডউইগ মারা গেল।

—লুডউইগ?

—হ্যাঁ, আমার আগে যে আসত।

—যে ছেলেটা অনবরত কাশ্‌ত?

—হ্যাঁ, সেই। আজ সকালে সমাধিস্থ হ'ল। একুশ বছর মাত্র বয়েস। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। তিনি যখন শুনবেন—উঃ! এ' আঘাত হয়ত সইতে পারবেন না।

—কিন্তু তিনিই ত একমাত্র মা ন'ন। যুদ্ধ যারা আনে, তাদের এর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। এই আঘাতই তাঁদের প্রাপ্য।

অস্কার বিস্মিত হ'য়ে একবার মোনার মুখের দিকে চাইল; তারপর নিঃশব্দে দুধের পাত্র নিয়ে ফিরে চলে গেল। মোনা আজ আবার অস্কারের অপস্রিয়মাণ দেহের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল—

ভগবান, আমায় ক্ষমা কর।

এক সপ্তাহ পরে অস্কার একটি কাঠের বাক্স ডেয়ারীর এক পাশে এনে নামাল, তারপর মোনার জিজ্ঞাসু নেত্রের দিকে চেয়ে বললে—এর মধ্যে কাঁচের ডোমে সাজানো কতকগুলি ফুল রয়েছে; লুডউইগের মা জানিয়েছেন এগুলি তার কবরের ওপর বিছিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমার ত' বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। আমি কি ক'রে দিই?

অস্কার বাক্সের ডালাটি খুলে কাঁচের ডোমটি তুলে ধরল। জার্ম্মান ভাষায় কি যেন তাতে লেখা ছিল। মোনা বলল—ও'তে কি লেখা আছে?

"আমার সীমাহীন ভালবাসার স্মৃতি—মা"

মোনার মনে হল যেন কোন তীক্ষ্ণ ছুরিকা তা'র বুকে বিঁধে রয়েছে। তবুও সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল তা আমি করব? আপনি ও' ফিরিয়ে নিয়ে যান।

অস্কার কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল; তারপর নিঃশব্দে ফিরে চলে গেল। বাক্সটি শুধু সেখানেই প'ড়ে রইল। সমস্ত দিন মোনা এই ঘটনাটিকে ভুলে থাকবার চেষ্টা করল। কিন্তু বাক্সটি বার বার তা'র চোখে এসে পড়তে লাগল।

নাঃ, এটাকে বরং বিদেয় ক'রে দেওয়াই ভাল।

মোনা বাক্সটি তুলে নিয়ে গির্জ্জায় এসে পৌছাল। তারপর সদ্যখনিত লুড্‌উইগের কবরের ওপর সযত্নে ফুলগুলি সাজিয়ে দিল। তা'র চোখের সামনে ভেসে উঠল সুদূর প্রবাসে মৃত একমাত্র পুত্রের মায়ের অশ্রুলীনা কাতর প্রতিমূর্ত্তি। মোনা বিড় বিড় করে ব'লল—মানুষের জন্যে এটুকু প্রত্যেক মানুষেরই করা উচিত।

কয়েকদিন পরে এক সকালে ব্রিটিশ কমাণ্ডাণ্ট বৃদ্ধ রবার্টের কক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁ'র হাতে চামড়ার কেশে একটি সামরিক পদক। বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি?

ভিক্টোরিয়া ক্রস। আপনার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্বের জন্যে এ পদক পুরস্কার পেয়েছে।

বৃদ্ধের মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে উঠল—কিন্তু এখন আমি এ পদক নিয়ে কি করব?

কমাণ্ডাণ্ট একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—আপনার মেয়ে এ পদক ধারণ করতে পারেন। আমার মনে হয়, সেইটাই ভাল হ'বে।

পরদিন সকালে বুকে পদকটি ঝুলিয়ে মোনা গর্ব্ব অনুভব করল। যখন অস্কার হাইন ডেয়ারীতে এসে প্রবেশ করল, মোনা গর্ব্বমিশ্রিত দৃষ্টিতে তা'র মুখের দিকে চাইল। অস্কারও পদকটি দেখতে পেয়েছিল; সে জিজ্ঞেস করল—এ আপনি কোথায় পেলেন? মোনা সদম্ভে মাথা তুলে জানিয়ে দিল তা'র দাদার কথা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে অস্কার বলল—তোমার দাদা সত্যিই দেশের গৌরব। মোনা চম্‌কে উঠে অস্কারের চোখে চোখে চেয়ে রইল। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বুঝি তার সমস্ত জার্ম্মান-বিতৃষ্ণা ঝরে পড়ল।

প্রত্যেকদিন ইংরাজী সংবাদপত্রে শুধু জার্ম্মানদের বর্ব্বরতার কথাই দেওয়া থাকে। আজ এক ইংরেজ সৈনিকের চিঠিতে শত্রুর উদারতার পরিচয়ও পাওয়া

দ। বেলজিয়মের রণক্ষেত্রে সৈনিকটি আহত হয়ে রা দিন পড়ে ছিল। রাত্রে সে বুকের ওপর ভর দিয়ে ওড়ি মেরে মাইল খানেক ঘুরে এক কৃষকের কুটীরে এসে উঠল। কৃষকটি বেরিয়ে আসতেই কিন্তু সে চমকে উঠল; সে জার্মান, আর তা'র বৈঠকখানাতেও কতকগুলি বিজয়ী জার্মান সেনাধ্যক্ষ ভোজনরত। কিন্তু কৃষকটি মৃতপ্রায় সৈনিকটিকে গোপনে একটি কক্ষে নিয়ে এল। সারারাত্রি পরিচর্য্যায় তাকে সুস্থ ক'রে সকালেই তার পলায়নের সুযোগ দিয়েছে।

অস্কারের চিন্তামিশ্রিত এক অস্পষ্ট ভাবাবেগ মোনার অন্তরে দোলা দিল। কাগজখানি হাতে নিয়ে সে উঠে এল পিতার কক্ষে।

—এই দেখ বাবা, এই জার্মান কৃষকটি কতখানি উদার। প্রত্যেক জাতেই নিশ্চয় এমনি ভাল-মন্দ লোক থাকে। ওদের মধ্যেও তেমনি ভাল লোক আছে ই কি!

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মোনার দিকে চাইলেন—এও ত' হ'তে পারে যে, এরই পুত্রের হাতের অস্ত্র আমার পুত্রের বক্ষ বিদীর্ণ করেছে। মোনার হাত থেকে কাগজখানি মাটিতে পড়ে গেল। সে ত্রস্ত হরিণীর মত ছুটে বেরিয়ে গেল নিজের কক্ষে। শিকারীর করনিক্ষিপ্ত শরের মতই তা'র পেছনে পেছনে ভেসে এল বৃদ্ধের ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠ—আমি বুঝতে পারছি না মোনা, কিছুদিন থেকে এ' পরিবর্ত্তন তোমার কেমন করে আসছে?

পাঁচ

দরজায় মৃদু করাঘাত হ'তেই মোনা চমকে উঠ্‌ল; দ্রুতপদে নীচে নেমে এসে দরজা খুলেই চমকে উঠ্‌ল। অস্কার হাইন! অস্কার হাতের মুঠোয় কোন জিনিস তুলে বল্‌ল—আপনার…

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই মোনা চমকে উঠ্‌ল—এ' কী, রবির ঘড়ি? এ আপনি কোথায় পেলেন?

আমারই এক বন্ধু পাঠিয়েছে।

কিন্তু তিনি কেমন ক'রে পেলেন?

অস্কার এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে সে-ইতিহাস বল্‌ল। ব্রিটিশ সৈন্যের অগ্রগতির সময় একদিন ব্রিটিশ ট্রেঞ্চের সামনেই অস্কারের বন্ধুর বুকে গুলি বিঁধ্‌ল। মাথার ওপর তখন অবিশ্রাম গোলাবর্ষণ চলছে। অস্কারের বন্ধুটি শুধু থেকে থেকে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। হঠাৎ ট্রেঞ্চের মধ্য থেকে কোন ইংরেজ সৈন্য ব'লে উঠ্‌ল—"না, ও'র এ'যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।" সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই ট্রেঞ্চের বাইরে লাফিয়ে প'ড়ে আহত যুবককে ভেতরে টেনে নিয়ে গেল; কিন্তু সে নামবার আগেই নিজেও আহত হ'য়ে ঘুরে পড়ল। অন্যান্য সকলে আহত সৈনিক দুটিকে পাশাপাশি শুইয়ে দিল। তারপর অগ্রগতির আদেশ আসবামাত্র আহতদের অপেক্ষা না করে চলে গেল। কিছুকাল পরে অস্কারের বন্ধু একটু সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু তার সঙ্গী তখন মৃত্যুপথযাত্রী। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে পকেট হাতড়ে বের করল একটি ঘড়ি, তারপর বিপক্ষকে বল্‌ল—'যদি আপনি বাড়ী ফিরতে পারেন, তা হলে এ ঘড়ি নকালো দ্বীপে আমার বোনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

সারা রাত্রি মোনা বালিশে হেলান দিয়ে ব'সে রইল। অন্ধকারে শুধু তার নিদ্রাহীন চোখ মাঝে মাঝে জ্বলে উঠ্‌তে লাগল। গোপনে ড্রয়ারে মোনা ঘড়িটি লুকিয়ে রেখেছিল। বাবাকেও দেখাতে সাহস হয়নি। এ বুঝি মৃতের নিষ্ঠুর তিরস্কার। কিন্তু কেন?

পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রে যে দু'টি নির্ভীক যুবক পাশাপাশি আহত হ'য়ে প'ড়ে রইল, তাদের মৃত্যুবেদনাকুল চিত্ত যে প্রিয়জনের স্মৃতিতেই ভোর হয়ে ছিল; তা'দের বন্ধুত্ব কি অমার্জ্জনীয়? মোনার সমস্ত চিত্ত মথিত করে ব্যাকুল প্রার্থনা জেগে উঠ্‌ল—উঃ ভগবান্, এ যুদ্ধের অবসান দাও।

সে রাত্রে মোনা স্বপ্ন দেখল। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির মধ্যে কে যেন তার কর স্পর্শ করল—

এ পৃথিবী বিদ্বেষের বিষে কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে। চল, আমরা যাই।

কোথায়?

যেখানে যুদ্ধ নেই।

কিন্তু তুমি কে?

তোমায় যে পথ দেখাবে।

না, না, আমি দেখতে চাই তোমাকে। কে তুমি বল।

মোনা ব্যাকুল হয়ে ছায়ামূর্ত্তির আবরণ তুলে ফেল্‌ল; সঙ্গে সঙ্গে কি এক গভীর আতঙ্কে দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল—তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অস্কার।

অস্কার?

মোনা ধড়মড় করে উঠে পড়ল। না, ঐ ত বাইরের দরজায় মৃদু করাঘাত। জান্‌লা দিয়ে অতি প্রত্যূষের ঈষৎ রক্তাভা মোনার উৎকণ্ঠিত নয়নে ছড়িয়ে পড়ল, মোনা দ্রুত নীচে নেমে এল। হ্যাঁ অস্কার। অস্কার মাতালের মত চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে ছিটকে ভেতরে এসে পড়ল। সমস্ত দেহ তার থর-থর করে কাঁপছে। দুইচোখ আগুনের মত উজ্জ্বল।

ভেতরে আসতে পারি।

হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে!

নীচেকার ঘরে বৃদ্ধ রবার্টের সোফায় অস্কার বসে পড়ল; তার বিরাট দেহ বুঝি গদীতে মিশিয়ে গেল। কতক্ষণ পরে সে পাংশু একখানা হাত বের ক'রে মোনার হাতে তুলে দিল একখানা চিঠি—চিঠিখানা আসছে ম্যানহিমের আমেরিকান কন্‌সালের কাছ থেকে—

"অপনাকে জানাইতে অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি যে, গত-রাত্রে ব্রিটিশ বম্বারের আক্রমণে আপনার গৃহ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। আপনার মা সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন, কিন্তু যে অংশে আপনার বোন নিদ্রিত ছিলেন, সে অংশটি বিধ্বস্তপ্রায়। ধ্বংসস্তূপ অন্বেষণে আপনার বোনের দেহ এখনও পাওয়া যায় নাই। আমাদের অনুমান এই যে...

উঃ! আর না!

কয়েক মুহূর্ত নিবিড় নৈঃশব্দ্যে সমস্ত ঘরটি নিশ্চুপ হয়ে গেল। পরক্ষণেই অস্কার শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

তোমার বোন!

হ্যাঁ, আমার বোন—এরই কথা সেদিন বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু...

মোনা অনুতাপে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

দশবৎসর মাত্র বয়স। আমার বড় প্রিয়, বড় আদরের, আমার একমাত্র বোন আজ। অস্কারের দু'চোখ বেয়ে অবিশ্রান্ত জলের ধারা ঝরে পড়তে লাগল। অশ্রুবিহ্বল চোখ তুলে সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—

—মিগ্‌নন্ আমার মিগ্‌নন।

মোনা রুদ্ধনিশ্বাসে নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি যে শুধু তোমাকেই বলতে চেয়েছি, আর কাকে বলব বল?

অস্কার উঠে দাঁড়াল। দু'খানি দুর্ব্বহ পা নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে চল্‌ল। মনে হল বুঝি এখুনি ভেঙে পড়বে। হঠাৎ মোনার সমস্ত অন্তর আলোড়িত হ'য়ে উঠল। এক নিমেষের মধ্যে সে এক দুর্দ্দমনীয় দুর্জ্জয় আবেগে অস্কারের কণ্ঠে তার দুই বাহু এলিয়ে দিয়ে শবের মত পাংশু মুখে ডাকলো—অস্কার!

রাত্রিশেষের বায়ুস্পর্শে বৃদ্ধ রবার্টেরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তাঁরও কানে এসে পৌঁছল বাইরের দরজায় অস্কারের মৃদু করাঘাত। কিছুক্ষণ পরে তিনি শুনলেন, নীচের ঘরে মৃদু কথোপকথনের স্পষ্ট গুঞ্জন। মোনার কণ্ঠ—আরও একটি পুরুষ-কণ্ঠ; কে সে? অকস্মাৎ কোন অশুভ চিন্তায় বৃদ্ধের গণ্ডদেশ কুঁকড়ে গেল। হাতের ওপর ভর দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ভর দেওয়ার ছড়িটা একবার হাতড়ে খুঁজে নিলেন। অস্পষ্ট অন্ধকারে তখনও নীচে নামবার সিঁড়ি অস্পষ্ট; একটা আপ্রাণ প্রচেষ্টায় রুদ্ধ নিশ্বাসে বৃদ্ধ দেহটাকে টেনে নিয়ে এলেন ঘরের খোলা দরজায়।

কতক্ষণ যে মোনা ও অস্কার পরস্পরের বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, ঠিক বুঝতে পারা যায় নি; হয়ত বা এক মুহূর্তের জন্যই। হঠাৎ তারা চমকে উঠে ফিরে তাকাল।

বৃদ্ধ রবার্টের মুখ কাগজের মত সাদা হ'য়ে গেল। এক অদ্ভুত উত্তেজনায় তাঁর দুই চোখ জ্বলে উঠ্‌ল। নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন—সে আর্ত্তনাদ রুদ্ধকণ্ঠে বিকৃত হ'য়ে ভেঙে পড়ল। তারপর চোখের তারা দুটি স্থির হ'য়ে এল। কাঁপতে কাঁপতে তাঁর দেহ মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ঘরের বিহ্বল অন্ধকারে মোনা স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল, নিশ্চল স্থাণুর মতই নিঃসাড়, প্রাণহীন। [ক্রমশঃ

সব পাওয়ারই গর্বে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার

আজ সব পাওয়ারই গর্বে আমার
বুক যে ওঠে ভ'রে,—
তুমি আপন হাতে পশরা মোর
দেছো পূর্ণ ক'রে।
যা কিছু মোর ছিল চাওয়ার
তার কিছু ত নেই বাকী আর,
রূপে, রসে, গন্ধে, গানে
করলে ধনী মোরে।
তাই সব পাওয়ারই গর্বে আমার
বুক যে ওঠে ভ'রে।

মন যে আমার তোমার টানে তোমার পানে
চায় না যেতে,
রইতে সে চায় আপন ঘরে ক্ষণিক সুখের
দোলায় মেতে।
সব পাওয়ার এ সর্বনাশের অহঙ্কারে
তোমারি নাম যাই যে ভুলে বারে বারে;
তাই তোমার দানের যোগ্য করি আজি হ'তে
লহ, হে নাথ, মোরে।
দেখো সব পাওয়ারই গর্বে আমার
বুক যে ওঠে ভ'রে।

সাহিত্য-বিশ্লেষ

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

মনের অব্যক্ত বেদনাকে ভাষায় রূপ দিতে পারাই হ'চ্ছে সাহিত্যের কাজ। কিন্তু এই অব্যক্ত বেদনা বস্তুটি কি? বেদনা হ'চ্ছে সৃজনের আকাঙ্ক্ষাসঞ্জাত। মঞ্জরী যেমন ফলের বিকাশ-সম্ভাবনায় আপনাতেই আপনি প্রাণ-চাঞ্চল্যে অধীর হ'য়ে ওঠে, মা যেমন একটি অজ্ঞাত প্রাণ-সত্তাকে আপনার প্রতিটি রক্তবিন্দুর মধ্য দিয়ে জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রকাশের উন্মাদনায় নিশীথিনীর প্রতিটি প্রহরকে অতৃপ্ত ক্ষুধায় কাঁপিয়ে তোলে, সাহিত্যও হ'চ্ছে ঠিক সেই প্রাণচাঞ্চল্য আর অতৃপ্ত ক্ষুধার যুক্তাত্মা এবং তার স্বাভাবিক বিকাশ। বেদনার রসে রঞ্জিত হ'য়েই তবে তাকে রসসিক্ত ক'রে তুলতে হয় সব কিছুকে। অ-বলাকে বলায় এই যে তপঃক্লিষ্ট প্রয়াস—এইটেই হ'চ্ছে সাহিত্যিক-মনের প্রকৃত বেদনা। এই বেদনাবোধ যার মধ্যে নেই, সৃষ্টিকার্য্যে সে ব্যর্থ। আমি যখন মনে করি, সংসারে আমারও কিছু ব'লবার আছে, আমারও কিছু দেবার আছে সমাজকে, দেশের মাটিতে কিছু রেখে যাবার মত আমারও হৃদয়ের কিছু সম্পদ আছে, অথচ এতবড় সত্যকে সমস্ত মন দিয়ে অনুভব ক'রেও তাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারছি না, সেইটেই হ'চ্ছে আমার সব চাইতে বেদনা। সেই অনুভূতিকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে একমাত্র ভাষা। ভাষা তাই সাহিত্যের প্রাণময় অবলম্বন ও বাহন। আমার সত্যের অনুভূতি তখনই রূপ নিয়ে দেখা দিল, যখন আমার কিছু একটা না-বলার অক্ষমতাকে ক্ষমতার সিংহাসনে অভিষেক ক'রলো ভাষা। ভাব ও ভাষার তাই জনক-জননী সম্বন্ধ। আসলে সাহিত্যসত্তাটা হ'চ্ছে তাদেরই ঔরসজাত ও গর্ভজাত একটা রূপময় সৃষ্টি। সাহিত্যিক তার নিজের ধ্যানী অন্তরে এই সৃষ্টিধারাকে ধারণ ক'রে থাকে সাধন-তপস্যায়: ফলের তপস্যায় যেমন থাকে বনানী, শিশুর তপস্যায় যেমন থাকে মা। আসলে সৃষ্টি-বস্তুটাও তপঃসিদ্ধ। কোনো একটি সুসংবদ্ধ ভাবকে সুসংবদ্ধ বিকাশের গতি দেওয়াই হ'চ্ছে সিদ্ধির কাজ। নিজের মধ্যে নিজে সিদ্ধ না হ'লে মুক্তিরও আনন্দ নেই। পূর্ণ স্বাধিকার আর করদ-রাজ্যাধিকার একবস্তু নয়। আপনার মধ্যে আপনার পূর্ণ সিদ্ধযোগে আসে ঐ পূর্ণ স্বাধিকার, আর সিদ্ধির পূর্ণতা যেখানে নেই, সেখানে পর-শাসনের আঁখি-ঠারের নীচে চলে প্রলেপ দেওয়া করদ রাজ্যাধিকারেরই কর-গণনার পালা মাত্র। অর্থাৎ সিদ্ধ সাধন-মনের বিকাশ যেখানে নেই, সেখানে ভাব ও ভাষা-সঙ্গমে সাহিত্যের কিছু একটা রূপসৃষ্টি হ'লেও তা' হয় বিকলাঙ্গ শিশুর মতই, মানুষের এমন কি নিজের সৃষ্টার মনের কটাক্ষদৃষ্টিকে কর দিতে দিতেই তাকে প্রভাতের অরুণিমায় সন্ধ্যার ম্লানিমাকে আহ্বান ক'রতে হয়; দীপ্ত সূর্য্যরশ্মির মত তার পক্ষে (স্থায়িত্ব-মাধুর্য্যে) বিজয়-গর্ব্বে দাঁড়ানো সম্ভব হয় না। কালস্থায়ী (age-long) শ্রেষ্ঠ রচনা আর ক্ষণস্থায়ী (momentary) সাধারণ রচনার ক্ষেত্রেও এই কথাই প্রযোজ্য।

সেই রচনাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ রচনা ব'লে মনে ক'রব, যার মধ্যে কাল-প্রতিনিধিত্বের (representation of age) দায়িত্বে শিল্পবস্তুর সাথে রস-বস্তুর এবং মননশীলতার সাথে বুদ্ধিশীলতার প্রীতিময় মিলন ঘটেছে এবং যার মধ্যে চিরকালীন মানব-মনের আবেদন প্রমূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে।

এর অভাব ঘটলেই মাছের ঝোলে লঙ্কা-নুনের অভাবের মত সাহিত্য শুধু রসহীনই হয় না, হয় ঐ বিকলাঙ্গ শিশুর মতই—যার জীবনীশক্তি পৃথিবীর বায়ু গ্রহণ ক'রেও আগামী কালের মধ্যে বেড়ে উঠবার সুযোগ পায় না। একেই সম্ভবতঃ বিশ্লেষণ ক'রে দেখাতে গিয়ে রাস্কিন এর সংজ্ঞা নিরূপণ ক'রেছেন 'Books of the hour' বা 'ক্ষণ-কালীন গ্রন্থ বা সাহিত্য' বলে। চিরকালীন মানবমনের আবেদন এখানে নাই থাকলো, নাই হ'লো বা খুব বড় একটা শিল্প-সার্থক, তবু রচনার জন্য রচনা হিসেবে তাকেও সাহিত্যবাচ্য বলে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি, কারণ, সংজ্ঞাবোধের মানদণ্ডের দিক দিয়ে, শ্রেয় কিছু না ঘটলেও প্রেয় হিসেবেও মানুষের মনে তার একটা আশ্রয় আছে—অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও যা পাঠক-মনকে বাস্তব-অবাস্তবতার রূপচর্য্যায় স্বপ্নময় ক'রে তোলে। সেই মুহূর্ত্তটুকুর জন্যেই সে সার্থক। তার পর কর্ম্মকোলাহলের আবর্ত্তে কখন আবার সে কোথায় বিলুপ্ত হ'য়ে যায়, পাঠক নিজেই তা' ব'লতে পারে না। এ যেন ঠিক ঊর্ম্মি-মুখর সমুদ্রের বুকে বুদ্বুদের মত। আসলে মানুষের মনই যে একটি বিশাল সমুদ্র। নানাজাতীয় সঙ্ঘাতময় আবর্ত্ত-চঞ্চল সেই সমুদ্র। সেখান দিয়ে বড় কিছু একটা বিচিত্র ভাবের জাহাজ ভেসে গেলেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার কথা এবং সে আকর্ষণ ক্ষণের মধ্য দিয়ে মহাক্ষণের স্মৃতিকেই জাগিয়ে রাখে, খণ্ডমাত্র কলার খোলাকে সেখানে দৃষ্টি তার নিজের দর্শনশক্তির মধ্যে ধ'রতেই পারে না। পারলেও স্থায়িত্ব তার সেই মুহূর্ত্তটুকুই মাত্র। এখানে ঐ কলার খোলাটাই সাধারণ, জাহাজটাই অসাধারণ—অর্থাৎ দর্শনের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। স্মৃতিতীর্থের যাত্রাপথেও শ্রেষ্ঠ রচনার স্থায়িত্বও আমরা এই ভাবেই লক্ষ্য করি। পাঠক-মনে সে ব'য়ে আনে এমন একটা ধ্যান-গম্ভীর সর্ব্বকালীন সাড়া, কাল

থেকে কালান্তরের মধ্যে যার ধ্বনি দেশের চিত্তে একই ভাবে এবং একই সুরে স্পন্দিত ও অনুরণিত হয়। ইলিয়ড ওডেসি এবং রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে আমরা সেই সুরের স্পন্দনই লক্ষ্য করি। শুধু মহাকাব্য ব'লেই নয়, শ্রেষ্ঠতম রচনার গুণই হচ্ছে এই, কারণ তার মধ্যে ঐ শিল্প, রস ও বুদ্ধি মিলিয়ে জেগে আছে কাল-প্রতিনিধিত্বের বাস্তব দায়িত্ব। যিনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, তাঁর ধ্যানী মনের কাছে এর কোনো একটি বস্তুই অপাংক্তেয় নয়; প্রত্যেকটি বস্তুকে তিনি তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে বিন্দু বিন্দু ক'রে গুছিয়ে নিয়ে ভাষার যাদুতে এমন একটি রস-সামগ্রীর সৃষ্টি করেন, যা শুধু পাঠককে রসাপ্লুত ও মোহিতই করে না, পাঠকের মনকে প্রকৃত মানবীয় সংজ্ঞায় ও মানবীয় মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে—যা তার প্রচলিত জীবনধারার মোড়টাকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দিয়ে এমন একটা অলৌকিক মাধুর্য্যে শ্রীসম্পন্ন ক'রে তোলে—পৃথিবীর স্বর্ণ-মাণিক্য আর রাজত্ব দিয়েও যার প্রভাবণ-মূল্য নিরূপণ করা চলে না। শ্রেষ্ঠ লেখকেরা তাই তৈরী হ'য়েই পৃথিবীতে জন্ম নেন, সাধারণ লেখকেরা জন্ম নিয়ে তৈরী হ'ন। প্রথম ভাগে যদি দেখি বিবেককুমার, সূর্য্যপ্রসাদ ও চন্দ্রেশ্বরকে, দ্বিতীয় ভাগে দেখতে পাবো কোনো শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী, ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বা আরও কোনো চঞ্চলকুমারকে।

কিন্তু এর মধ্যেও তর্কের সামান্য অবকাশ আছে। অনেক ক্ষেত্রে ঐ শ্রীপতি, ভুবনেশ্বর বা চঞ্চলকুমারের একাধিক রচনাও যে বিবেককুমার, সূর্য্যপ্রসাদ ও চন্দ্রেশ্বরের রচনার সমপর্য্যায়ে উন্নীত না হয়, বা না হ'তে পারে—এমন কোনো কথা নেই। নিধু ময়রা নামকরা প্রথম শ্রেণীর ভালো কারিগর নয় ব'লে যে সন্দেশ তৈরীর ব্যাপারে সর্ব্বদাই ভীমনাগের পিছনে প'ড়ে থাকবে, এই বা কেন? প্রতিযোগিতার ব্যাপারে সেও তো উৎকৃষ্টতর এমন কি ভীমপরাক্রমে একটা কিছু তম-পদার্থও সরবরাহ ক'রতে পারে। বাস্তবিকই পারে সত্য; কিন্তু তাই ব'লেই কি তাকে শ্রেষ্ঠ কারিগর ব'লবো? শ্রেষ্ঠত্বের বিচার চলে বহুতর সৃজনের ব্যাপারে। সাহিত্যের ব্যাপারটাও তেমনি। তেমন কিছু একটা হ'লে ঐ শ্রীপতি চক্রবর্ত্তী, ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বা চঞ্চলকুমারকে শ্রেষ্ঠ লেখক ব'লবো না, ব'লবো শক্তিশালী লেখক। কারণ তাদের যে প্রতিভা, তা অতুল হ'য়েও অতলস্পর্শী নয়, দৃষ্টি সুদৃঢ় হ'য়েও সুদূরপ্রসারী নয় এবং চিন্তাধারা সূক্ষ্ম হয়েও সঙ্কীর্ণ, ব্যাপক নয়। বহুতর সার্থক রচনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বাউলারের বল ঠিক মসৃণ গতিতে ব্যাটিংএর মুখে এসে পড়ে না, মাঠের অসমতলতা দোষ ব'লেই শেষ পর্য্যন্ত রেহাই পেতে হয়। আসলে বাউলারের বল পরিবেশন এবং ব্যাট-ম্যানের বল গ্রহণ—দু'টোর মধ্যেই ফাঁক থেকে যায়। দোষের ভাগী হ'য়ে মরে শুধু নিরপরাধী মাঠ। এখানে আসে ঐ করদ-রাজ্যগত কর-গণনারই পালা।

এর মধ্যে একটি বিশেষতম কথা আছে। গোড়ায় ব'লেছি, মনের অব্যক্ত বেদনাকে ভাষায় রূপ দিতে পারাই হ'চ্ছে সাহিত্যের কাজ। কিন্তু আসলে সাহিত্যের সংজ্ঞাটি কি? সাহিত্যের উৎপত্তি হ'চ্ছে দেশ, কাল আর মানুষেরই হৃদয়ের সংযোগে। এই সংযোগ অর্থাৎ 'সহিত' কথা থেকেই সাহিত্য কথাটির উৎপত্তি। এই সহিতই হচ্ছে দেশ, কাল ও মানুষের সঙ্গে সহিত হওয়া। যিনি শিল্পী বা সাহিত্যিক, আপনার ভাবাবেশে তিনি যত ছবি, যত গান আর যত সাহিত্যই রচনা করুন না কেন, যতক্ষণ না সেই ছবি, গান আর সাহিত্য মানুষের হৃদয় স্পর্শ ক'রছে, ততক্ষণ সেই সৃষ্টির কিছুমাত্র সার্থকতা নেই। বিশ্বনিয়মের একটি সূক্ষ্ম প্রাণসূত্রে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে বাঁধা। তাই আমি যখন কিছু ভাবি, যখন কিছু অনুভব করি, সজ্ঞাতে হোক, অজ্ঞাতে হোক, সেই চিন্তা ও অনুভূতি গ'ড়ে উঠ্ছে পৃথিবীর অখণ্ড জীবন-স্পন্দনকেই কেন্দ্র ক'রে। প্রতি মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে আমার সুখ-দুঃখ, প্রতি মানুষের ভালমন্দের সাথে আমার ভালমন্দ একই সাথে যুক্ত। তাই আমি যা কথা বলি, তা আমার নিজেকে কেন্দ্র ক'রে পাঁচজনেরই কথা, এবং পাঁচজনের হৃদয়কেন্দ্রগত আমারই কথা। এই যে চিন্তা ও অনুভূতির মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের আত্মজ-ধর্ম্ম, আসলে এইটে সাহিত্যেরও ধর্ম্ম। যিনি সাহিত্যিক—তিনি নিজের সত্তার মধ্যেই নিজে বন্দী ন'ন, প্রতি মানুষের সঙ্গে তিনি একাত্মা। তাই প্রতি মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ অহরহঃ তাঁর চিত্তপটে আবর্ত্তিত হ'চ্ছে; সেই আবর্ত্তের মধ্যেই সাঁতার মরালের মত বিচ্ছিন্ন চিন্তার সংগ্রথিত বুদ্বুদ রচনা ক'রে চলেন তিনি। সেইখানেই তাঁর নিজের ভাবনার সঙ্গে সবার ভাবনার মিলন এবং তাঁর নিজের মধ্যে সকলের ও সকলের মধ্যে নিজের সম্পূর্তি। যতক্ষণ এই সম্পূর্তির অভাব, ততক্ষণ সৃষ্টিরও সার্থকতার অভাব। এর বাহিরেও যে একশ্রেণীর সৃষ্টি না আছে, তা নয়; কিন্তু তা ঐ সাধারণ পর্য্যায়েরই। তা যত রূপ, রস আর গন্ধ নিয়েই দেখা দিক না কেন, তা ক্ষুধার্ত্ত চোখকে হয়ত আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু হৃদয় স্পর্শ ক'রতে পারে না; চোখের আড়াল হ'লেই তাই মুছে যায়। হৃদয়ের রাজ্যটা ঠিক ঐ

সার্ব্বভূতের ব্যাপার। সবার সঙ্গে নিজেকে যাচাই ক'রেই তবে সে সন্তুষ্ট। এই সন্তুষ্টি কালাতীত নয়, কালগত এবং কালগত হ'য়েই কালান্তরিত (not superficial by time, but being periodic it gets its longivity to endless and unknown future). শ্রেষ্ঠ রচনার ক্ষেত্রেই শুধু এই কাল থেকে কালান্তরের লীলা দেখ্‌তে পাই।

প্রসঙ্গতঃ এখানে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক। যে বিষয়টিকে আমরা সর্ব্বকালীন সাহিত্য ব'লে আখ্যা দিয়ে থাকি, তারও জন্মের একটি স্থানগত ও কালগত পরিবেশ আছে। এ যুগে রামায়ণ-মহাভারত অচল বা বঙ্কিম-সাহিত্য অচল কিম্বা আজ থেকে একশো বছর পরে রবীন্দ্র ও শরৎ-সাহিত্যও অচল হ'য়ে যাবে—এ ধরণের মতবাদ অনেকে পোষণ ক'রে থাকেন। কিন্তু অ-চলন এক বস্তু,আর যুগপরিবর্ত্তনে ও প্রয়োজনে এবং সংস্কৃতিগত সভ্যতার বহিরাঙ্গিক পরিমার্জ্জনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর (New Technque) প্রচলন এক বস্তু। আসলে প্রাণ-শীলতার ক্ষেত্র একই। রামায়ণ-মহাভারতের সীতা আর দ্রৌপদী, কালিদাসের শকুন্তলা, রবীন্দ্রনাথের কুমুদিনী, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী বা আয়েষা, শরৎচন্দ্রের নারায়ণী, বিরাজ বা মাধবী—নারী-হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, কোমল-কাঠিন্যের দিক দিয়ে তারা প্রায় একই প্রাণের স্পর্শ রেখে যায়। পুরুষ-চরিত্রের দিক দিয়েও এমনটাই বটে। অথচ তারা প্রত্যেকেই বিশেষ এক-একটি স্থানগত ও কালগত চরিত্র। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যুগ-পরিবর্ত্তনের জটিল আবর্ত্তের মধ্যে মন নানা সংঘাতে যখন বিবাদক্লিষ্ট ও বিপর্য্যস্ত, তার মধ্যেও ঐ চরিত্রগুলি কেমন যেন আত্মীয়ের মত অনবরত এসে চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তার কারণ হ'চ্ছে তাদের ঐ longivity to endless and unknown future, অর্থাৎ কালগত হ'য়েও কালান্তরিত দুশো বা দু' হাজার বছর পূর্ব্বের কাহিনী দুশো বা দু হাজার বছর পরে এসেও মনে ঠিক একই আবেদন নিয়ে দাঁড়ায়। এই দাঁড়ানোর মধ্যেই তাদের সৃষ্টির সার্থকতা নিরূপিত হচ্ছে। অধিক বাস্তববোধের সাথে সংবেদনশীল মনের মিলন ভিন্ন এমন সৃষ্টি সম্ভব নয়। সেই বাস্তববোধের মধ্যেই রসবোধ ও সৌন্দর্য্যবোধ—যা কিছু সবের সংমিশ্রণ। যিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক—তিনি যুগের মধ্য দিয়ে যুগ-সম্ভাবনাকে ধারণ করেন নিজের চিন্তা-শক্তিতে। এটাকে বলা যায়—Law of hypothesis বা এক থেকে বহুর ধারণা। এই ধারণাগুণেই দুশো বছর পরেও দুশো বছর আগের কাহিনীকে মনের মনন-ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে। আসলে বিশ্বনিয়মের ক্ষেত্রে স্রষ্টা এবং সৃজন-ফলভাগী উভয়েই শিল্পী লেখক এবং পাঠক—উভয়ের মধ্যেই শিল্পবোধ কম-বেশী জাগ্রত। নইলে লেখকের লেখা এবং পাঠকের পড়ার মধ্যে হৃদয়ের যোগ থাকত না; ঠিক ঐ ব'উলার আর ব্যাট-ম্যানের মতই। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মাত্রেরই ধর্ম্ম হ'চ্ছে তাই সর্ব্বমানবের যোগে সিদ্ধ হওয়া। সর্ব্বমানবের হাসি-কান্না,দুঃখ-বেদনার যেই মুহূর্ত্তে প্রমূর্ত্ত বিকাশ ঘটল রচনায়—সেই মুহূর্ত্তে রচনা শুধু সার্থক হ'ল না, ধরণীর ধূলিধূসরতার পথে মানুষের মনকে তা জীবন্তরূপে আকর্ষণ ক'রল তারই মধ্যে। জীবনকে জীবনের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়াই হ'চ্ছে সাহিত্যের প্রাণময় কাজ। সর্ব্বত্রই সেখানে বুদ্ধিবাদের প্রশ্ন জাগে না, হৃদয়বৃত্তির সহজ পথেই তার সব লীলার সব খেলার সম্পূর্ত্তি ঘটে। জীবনের মধ্যে জীবনকে জাগিয়ে তুলবার সাধনা যেখানে নেই, কালজয়ী শক্তিও সেখানে নেই। সেখানে যা কিছু সৃষ্টির প্রয়াস, তা ঐ ক্ষণস্থায়ী (momentary) সাধারণ সৃষ্টির রঙ-চটা অবস্থার মধ্যে গিয়েই পড়ে। তা না পারে মানুষের হৃদয় জয় ক'রতে, না পায় এই বাস্তব জগতের কোনো একটি শীলমোহরেও আত্মস্থাপনার অধিকার।

কিন্তু একমাত্র বাস্তববোধই কি সাহিত্যের সম্পূর্ণ প্রাণসত্তা হবে? তা নয়। বিশ্বচক্রে প্রতিনিয়ত কত বস্তুই তো ঘুরছে, কত ঘটনাই তো ঘটছে। সব তার সুসংবদ্ধভাবে দৃষ্টিগোচর হওয়াই কি সম্ভব? যেটুকু দৃশ্য—সাহিত্যিকের শিল্পানুভূতির মধ্যে তার আসল প্রাণবস্তু-টুকুই হ'চ্ছে রচনার বিষয়বস্তু। সমস্ত দেখার মধ্যে বিশেষ দেখাটুকুই হ'চ্ছে শিল্পীর কাজ, আর সেই দেখার সার্থক রূপায়নই হ'চ্ছে সাহিত্য; শিল্পী-মন ভিন্ন এই দেখাকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করানো সম্ভব নয়। জনসাধারণের মধ্যে একযোগে থেকেও কোনো বিশেষ একজন শিল্পী হ'য়ে দেখা দেন, আর তাঁরই চোখ দিয়ে বিশ্ব-বৈচিত্র্যকে অবলোকন করেন নির্ব্বিশেষেরা। বাস্তবতার সাথে কল্পনার মিলন হ'লেই তবে এখানে শিল্পধর্ম্ম রক্ষা পায়। শুধু রূঢ় বাস্তবতা কিম্বা শুধু একটান কল্পনা—কোনটাই সাহিত্যের আসল প্রাণধর্ম্ম নয়। গানে যেমন কথার সাথে সুর, জলে যেমন হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন, সাহিত্যেও তেমনি বাস্তবতার সাথে কল্পনার একাত্ম মিলন। মৃত-পুত্রকে বুকে জড়িয়ে কোনো মা ব'সে কাঁদছেন। এখানে এই দৃশ্যটা স্থূল চক্ষে দেখ্‌তে পাওয়াটাই বাস্তবতা, কিন্তু তার উর্দ্ধে কল্পনা হ'চ্ছে সেইটুকু—যেটুকু দিয়ে আমরা বুঝ্‌তে চেষ্টা করি—এই মুহূর্ত্তে ঐ শোক-সন্তপ্তা মাতৃহৃদয়ের সমস্তটুকু দুঃখ, বেদনা ও আঘাতকে, তার সমস্তটুকু নিঃস্বতাকে। এখানেও বুদ্ধিবাদের

চাইতে কল্পনাপ্রসূত হৃদয়বৃত্তিটাই বড—যার সোজা রাস্তাটা এসে মিশেছে এই বাস্তবজগতেরই রূঢ় সত্যের সীমার মধ্যে।

সাহিত্যের আর একটি প্রধানতম উপজীব্য বিষয় হ'চ্ছে ভাবের সাথে ভাবের মিলন। পূর্ব্বেই এর অনেকখানি ইঙ্গিত ক'রেছি। তোমার ভাবের সাথে আমার ভাব, আমার ভাবের সাথে তোমার ভাব যখন কথোপকথনে, আলাপে, ব্যবহারে, আচারে ও নিষ্ঠায় এসে যুক্ত হ'ল—তখনই আমার লেখনীতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হ'ল সামাজিক চিত্রকে। এর একটা পরিব্যাপ্ত ক্ষেত্রও আছে। সেটুকু হ'চ্ছে দেশগত, জাতিগত ও সংস্কৃতিগত মিলন নিয়ে। কোনো ইহুদীর সাথে কোনো মিশরীয়ের, কোনো ইংরেজের সাথে কোনো রাশিয়ানের, কোনো ভারতীয়ের সাথে কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয়ের বা বাংলার মাটিতেই কোনো হিন্দুর সাথে কোনো মুসলমানের জাতিগত ও সংস্কৃতিগত মিলনও সাহিত্যের একটি বিশেষতম উপজীব্য বিষয়। প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সংযোগেই সাহি[illegible] পূর্ণ। অন্তরের এই আভ্যন্তরীণ যোগ আছে ব'[illegible] একদেশের দুঃস্থ মানবাত্মা আর এক দেশের দুঃস্থ মা[illegible]ত্মায় সাড়া জাগায়, এক জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা[illegible]র এক জাতির মনে একই ভাবের অনুপ্রেরণা নিয়ে [illegible]াঁড়ায়। ডেনমার্কের খনিতে ধর্ম্মঘট ছড়িয়ে প'ড়[illegible] সে-ধর্ম্মঘট এসে ছড়িয়ে পড়ে আমাদেরও প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে। এই যে নাড়ীর সাথে নাড়ীর যোগ—এই যোগই সাহিত্যিক বা শিল্পীকে সাধনসিদ্ধ ক'রে তোলে খাঁটি চিত্র-রূপাঙ্কনে। শিল্পীর অন্তরের বেদনার রসে সঞ্জীবিত হ'য়েই তবে তা ভাষাকে আশ্রয় ক'রে প্রকাশের সুযোগ পায়। সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে ভাব ও ভাষার এই স্বাভাবিক সঙ্গমটি তাই সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

মধ্যবিত্তের স্ত্রী

অরুণবরণ চক্রবর্ত্তী

জীবনের দুর্ব্বহ বোঝা বীরেশ্বরবাবু আর বইতে পারছেন না। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়, নিজের ওজনের চেয়েও ভারী একটা পাথর পিঠে বেঁধে দিয়ে নিঃসীম সমুদ্রে যেন তাঁকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। হাবুডুবু খেতে খেতে তিনি ভেসে চলেছেন। কোথায় যে থই মিলবে তা তিনি জানেন না।

কী অভিশাপ নিয়েই যে যুদ্ধ এলো।

মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ থামলো বটে—কিন্তু দারিদ্র্যের সঙ্গে, অভাবের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, ক্ষুধাক্লিষ্ট মানুষের সেই আ-মরণ যুদ্ধের শেষ হ'ল না আজও। সুতরাং মার্চেন্ট অফিসের বাট টাকার কেরাণী বীরেশ্বরবাবু আর পারেন কী করে? তার ওপর স্ত্রী মনোরমা যদি পাইকারী ভাবে বছর বছর কন্যারত্ন প্রসব করে চলেন, তখন এক টাকার আফিঙ খেয়ে কিংবা গলায় দড়ি দিয়ে জীবনাবসান করবার ইচ্ছা মনে জাগা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। তবু যে তিনি এতদিন আত্মহত্যা করেন নি, তার কারণ, হয় তিনি মরতে ভয় পান, না হয় ভালভাবে মানুষের মত বাঁচার আশা এখনো তাঁর মনে আছে, দুর্য্যোগময় অন্ধকার আকাশের একান্তে একটি ক্ষীণ রক্তরেখার মত।

বিয়ে করবো না করবো না করে একটু বয়সেই তিনি বিয়ে করেছিলেন। আজ তাঁর বয়স চল্লিশ। পাঁচটি মেয়ের বাপ। বড়টির বয়স পনেরো। লাউ ডগার মত লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে, মা-বাপের বুকের ধড়ফড়ানি বাড়িয়ে। তবে বীরেশ্বরবাবুর ঋণের অঙ্ক-বৃদ্ধির গতি-বেগকে হারিয়ে নয়।

কিন্তু সংসারটি চালাবার জন্যে তিনি কি খাটেন কম? দশটা পাঁচটা ডিউটি করেও দুবেলা ছেলে পড়ান। দিনে দু'পয়সার বিড়ি ছাড়া আর কোন বাজে খরচ নেই তাঁর।

তবু যদি দৈন্য, অভাব, অভিযোগ-অনুযোগ চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ধরে, তখন কখনো স্ত্রীর ওপর চটে উঠলে, তাতে কি দোষ দেওয়া চলে? পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে অবশ্যই তিনি স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হন, দোষ স্বীকার করেন, মনে মনে মাপও চান। কিন্তু স্ত্রীর দিক থেকে কোন উত্তর না পেয়ে গুম হয়ে [illegible] থাকেন—জ্বলেন তুষের আগুনের মত। দুঃসহ জী[illegible] সমাপ্তির কামনা করেন। কিন্তু বাঁচা মরা [illegible] হাতে?

রাত্রে সেদিন খেতেই বসলেন বীরেশ্বরবাবু। [illegible] আর হ'ল না। অফিসের নিতাই পিওনের কাছে তিনি টাকা ধারেন পঞ্চাশটা। মেয়াদ পেরিয়ে অনেক দিন হয়ে যাওয়ায় নিতাই সেদিন বেশ দু'কথা শুনিয়েছে। তাতেই মন-মেজাজটা ছিল খুবই খারাপ। তার ওপর গ্রাসে গ্রাসে কাঁকড়। মুখে দিলেন আর

ফেললেন। অবশেষে তরকারী দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিয়েছেন। 'ওয়াক থু' করে ফেলে দিলেন।

এমন রান্না খেয়েছে কেউ বাপের জন্মে?—থালার মধ্যে জলভরা গেলাসটা ঢেলে দিয়ে উঠে পড়লেন।

স্ত্রী মনোরমা বললেন, তেল ছাড়া রান্না অমনই হয়। তেল না থাকলে আমি কি করব?

[illegible] পেরিয়ে বীরেশ্বর বাবু বাইরে গিয়েছেন, [illegible] মনোরমার এ কথায় আবার ঢুকলেন [illegible]।

তেল নেই বলেছিলে একবারও আমায়? ঝাঁঝি মেরে উঠলেন তিনি।

একবার কেন, একশ' বার বলেছি। সকালে যে মাথায় তেল দিতে পারলে না—মনে নেই?

সত্যি বটে, মনোরমা তেলের কথা অনেক বার বলেছেন। কিন্তু তেলের রেশনের দোকানে মাইলখানেক লম্বা লাইনে দাঁড়াবার সময় কোথায় তাঁর? আর অফিস কামাই করে দাঁড়ালেও যে তেল পাওয়া যাবেই তারও কোন ভরসা নেই। সুতরাং তিনি চেষ্টাও করেন নি। তবু মনোরমা চুপ করে গেলেই হয় ত ব্যাপারটা আর এগুত না। মনোরমার এ কথায় আগুনে ঘিয়ের ছিটে পড়লো।

কেন রে মাগী,—খিস্তি করে উঠলেন বীরেশ্বর বাবু পটলাদের বাড়ী থেকে একটু ধার করে আনতে পারলি না? দু'বেলা দু মুঠো ত পিণ্ডি গিলি—তাও তোমার দ্বারা হ'বে না?

কমলা কখন এসে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বোঝবার মত বয়স হয়েছে তার। মায়ের প্রতি বাবার এই কটূক্তিগুলি তাকেও বিঁধলো। সে প্রতিবাদ করে উঠলো—কী হচ্ছে বাবা?

বীরেশ্বর বাবু মেয়েকেও বাদ দিলেন না।

হতচ্ছাড়া মেয়ে, বয়েস ত কম হলো না, কি করে থাকার দিন? তোমাদের ওপরই আমার যত কর্ত্তব, না আমার জন্যে তোমাদের কোন কর্ত্তব্য নেই?

বলেই তিনি ঝাঁ করে বেরিয়ে গেলেন। কলতলায় হাত মুখ ধুয়ে বাইরে রোয়াকে গিয়ে বসলেন।

সে রাত্রে খাওয়া হলো না কারুরই।

এই ঘটনার জের চললো দিন সাতেক। স্বামী স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা বন্ধ রইলো। কমলার মধ্যবর্ত্তিতায় ভাবের আদান-প্রদান চললো। তারপর কখন কি ভাবে যে দুজনের ছেঁড়া মন আবার জোড়া লাগলো; পরে দু'জনেই তা ভেবে হয় ত আশ্চর্য্য হ'ন। বাবা-মাকে হেসে কথা কইতে দেখে কমলাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—অন্যান্য ছোট বোনগুলোও খুসী হয়ে ওঠে। তাদের মাথার ওপর থেকে একখানা ভারী কালো মেঘ যেন সরে যায়।

অফিসে বেরুবার সময় মনোরমা স্বামীর হাতে পানের ডিবেটা তুলে দিয়ে বললেন, কমলীর জন্যে একটা সাড়ী আনতে হবে। একখানা ফোল্ডার নিয়ে যাও। আসবার পথে কিনে নিয়ে এসো।

বীরেশ্বর বাবু বললেন, এখন টাকা কোথায়? মাস-কাবার হয়ে এলো।

আমার কাছে আছে—নিয়ে যাও। মাইনে পেয়ে আমাকে দিয়ে দিও। মেয়েটার কষ্ট আর দেখা যায় না।

আর তুমি বুঝি একটার জায়গায় দশটা কাপড় পরছ? স্ত্রীর গালে একটা মৃদু টোকা দিয়ে বীরেশ্বর বাবু বললেন।

মনোরমার শীর্ণ মুখে একটা সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠলো।

বললেন, আমার একটা হলেই হলো। বুড়ি হয়ে গেলাম—এখন আর সাধ-আহ্লাদ কিসের?

অর্থাৎ তুমি আমাকে বুড়ো বলতে চাও?—বীরেশ্বর বাবু বললেন একটু রসিয়ে।

মনোরমা আবার হেসে উঠলেন। দুর্য্যোগের মেঘ সরে গেলে চাঁদের স্নিগ্ধ কোমল হাসির মত।

কমলা এলো একখানা ফোল্ডার নিয়ে।

বন্ধ হয়ে গেলো তাঁদের কথাবার্ত্তা।

গম্ভীর মুখে বীরেশ্বর বাবু বললেন, না, বেলা অনেক হলো। বেরোই।

মনোরমা তাঁর হাতে পাঁচ টাকার একখানা নোট আর ক্লথ-ফোল্ডারখানা দিলেন।

শ্রীদুর্গা শ্রীদুর্গা!—

বীরেশ্বর বাবু কপালে দু' হাত ঠেকিয়ে রওনা হলেন অফিসে।

বন্যার বেগে মানুষ বেড়ে চলেছে কলকাতায়। কুড়ি লক্ষ চল্লিশ লক্ষতে এসে দাঁড়িয়েছে। না যায় রাস্তায় চলা—না যায় ট্রামে-বাসে ওঠা। তার ওপর অফিসের কর্ত্তাদের ব্যবহারও হয়েছে চরম উদ্ধত। দশটার এক মিনিট পরেই লেট-মার্ক পড়ে হাজিরা খাতায়।

বীরেশ্বর বাবু শত চেষ্টা করেও মাঝে মাঝে লেট হয়ে যান। বড়বাবুর কাছে কথা শোনেন সে-দিন। কয়েক মিনিট দেরী ক'রে আসার অপরাধে ছুটিও পান সে-দিন আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা পরে। আর রাত্রে তার শোধ নেন স্ত্রীর ওপর কোন একটা খুঁত ধরে। কখনো কখনো অকারণেই।

চিরাচরিত এই নিয়মের ব্যতিক্রম সে-দিনও হলো

না। ট্রামের তার কেটে যাওয়ার ফলে তিনি অফিসে এসে পৌছোন আধঘণ্টা পরে। শুধু বড়বাবু নন, ছোট সাহেবের কাছেও তাঁকে বকুনী খেতে হলো অকথ্য ভাষায়। বড়বাবু এমনই একটা কাজ চাপিয়ে দিলেন যে, সে-দিন বেরুতে তাঁর সাতটা হয়ে গেলো।

বাড়ী ফিরতে হলো আটটা। হাতে মুখে জল দিয়ে সেই জামাকাপড়েই তখনি তিনি তৈরী হলেন ছেলে পড়াতে যাবার জন্তে। কমলা একটা ডিসে ক'রে খানিকটা হালুয়া ও এক গ্লাস জল নিয়ে এলো।

দেখেই চটে গেলেন বীরেশ্বর বাবু।

ডাক ত তোর মাকে।

কমলা ভয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বীরেশ্বর বাবুর গলা শুনে মনোরমা দৌড়ে এলেন।

তোমাকে না একদিন না করেছি। আমার জন্তে জলখাবার করবে না।

সারাদিন এত খেটে এসে কিছু না খেলে শরীর থাকবে কেন?

বলি, এত খাওয়া আসবে কোথেকে? শেষবারের মত নিষেধ করছি, আর কখনো আমার জন্তে জলখাবার করবে না।

বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

মনোরমা বুঝলেন, অফিসে কোন গোলমাল হয়েছে।

ছেলে পড়িয়ে ফিরতে সে-দিন রাত হলো সাড়ে দশটা। গরম কাল। খেয়ে শুতে শুতে হলো বারোটা। শোবার সময় স্ত্রীকে বললেন, সকালে ঠিক ছ'টার সময় ডেকে দিও।

ঘুম থেকে উঠে উনোন ধরিয়ে মনোরমা যখন ঘরে এলেন, তখন প্রায় সাতটা। বীরেশ্বর বাবু এখনো ঘুমুচ্ছেন অঘোরে। ছ'টার সময় ডেকে দেবার কথা মনে পড়লো মনোরমার। ডাকেননি ইচ্ছে করেই। সারা দিনের খাটুনীর পর শুয়েছেন সেই বারোটার সময়। কি ক'রে ডাকেন তিনি? এখনো ত তাঁর ডেকে দিতে মন চাইছে না। তবু ডাকলেন।

ধড়ফড় ক'রে উঠে বসলেন বীরেশ্বর বাবু।

কিন্তু ঘড়ির দিকে নজর করতেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, এ কী! সাতটা বাজে? তোমায় না বলেছিলাম ছ'টার সময় ডেকে দিতে?

অত রাত্রে শুয়েছ তাই ডাকিনি।—শান্তকণ্ঠে বললেন মনোরমা।

কিন্তু অফিসে গিয়ে জবাবদিহি করবে তুমি—না আমি?

সকাল বেলা পাছে একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। এ ভয়ে মনোরমা আর কোন কথা না ব'লে চলে গেলেন।

বীরেশ্বর বাবুও উঠে পড়লেন।

পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে কলতলায় গেলেন। চোখে-মুখে কয়েক আঁজলা জলের ঝাপটা দিয়ে, কোঁচার খুঁট দিয়েই মুছতে মুছতে বেরিয়ে পড়লেন ছেলে প[illegible]

সাড়ে-আটটা হয়ে গেলো ফিরতে। [illegible] বাজারটাও রোজ সেরে আসেন। আজ আ[illegible] গেলেন না।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যে কোন রকমে নাওয়া-খাওয়া সেরে তিনি বেরুলেন। ছুটলেন ট্রাম লাইনের দিকে। বাধাঘাট থেকে হাওড়ার ট্রাম একখানা চলে গেলো।

ঐ যাঃ! খালি ট্রামটা চলে গেলো। আর একটু আগে এলেই হ'তো। এখন দেখ কতক্ষণে আবার আসে।

সাড়ে ন'টা বাজে, এমন সময় আর একটা ট্রাম এলো। অসম্ভব ভিড় তাতে। বীরেশ্বরবাবু ধস্তাধস্তি ক'রে কোন রকমে উঠলেন।

হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে আবার ধর্ম্মতলার ট্রামে চাপতে হবে। ঐ এক মহামারী ব্যাপার।

হাওড়া ষ্টেশনে ট্রাম থেকে নেমেই দেখেন, অন্য দিনের তুলনায় ভিড় অসম্ভব রকম বেশী। একটা লোকাল ট্রেন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এসে পৌছেছে।

ন'টা পঞ্চাশ।

দশটায় অফিস।

কাল ঐ ব্যাপারের পর আজ সময়মত হাজির না হওয়ায় মানে বড়বাবুর রক্তচক্ষুর অসহ্য দৃষ্টিকে হাসি-মুখে হাত কচলাতে কচলাতে শুধু সহ্য করাই নয়, তার ওপরেও আরও কিছু।

একটা ট্রাম এলো। হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকেই ভর্ত্তি হ'য়ে এসেছে। তবু থামা মাত্র অল্পপরিসর প্রবেশ-পথের মুখে যে ঠেলাঠেলি সুরু হলো, তা অকথনীয়। অনেকে জানালাদিয়ে গলে ঢুকতে আরম্ভ করলো। এমন কি স্যুটধারী বাঙালী সাহেবরাও।

বীরেশ্বরবাবু খানিকক্ষণ ধাক্কাধাক্কি ক'রে ফিরে এলেন। তাঁর মোটাসোটা গোলগাল শরীরটা ভিড়ের চাপে একেবারে যেন চেপ্টে গেছে।

পর পর আরো চার পাঁচটা ট্রাম এলো। তিনি চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হলেন। পকেট-ঘড়িতে দশটা দশ।

বীরেশ্বরবাবুর মনে রক্তচক্ষু বড়বাবুর নির্দ্দয় মুখখানা ভেসে উঠলো। গরমে ও অস্বস্তিতে কপাল দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়তে লাগলো।

অবশেষে রবার্টব্রুসের মত সপ্তমবারের চেষ্টায় তিনি সফল হ'লেন। গাড়ী থামতেই মোটা গোল শরীরটা জানালা দিয়ে কোনরকমে ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন।

পাশের এক ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

বীরেশ্বরবাবু বললেন, কি করি বলুন ত? ছটা ট্রাম মিস করেছি। নান্তঃ পন্থা। সুতরাং জানালা দিয়ে গলে আসতে বাধ্য হলাম। বুড়ো বয়সে মান-সম্মান আর রইলো না। আর কতদিন যে এ অভিশাপের জ্বালা ভোগ করতে হবে?

বীরেশ্বর বাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

পাশের সেই ভদ্রলোক বললেন, যতদিন না সবাই মরি।

ডালহৌসি স্কোয়ারে গাড়ী থামলো। বীরেশ্বর বাবু নেমে পড়লেন।

কিন্তু ভদ্রলোকের কপালটা আজ নেহাৎই খারাপ। অফিসে ঢুকতেই একেবারে সামনে পড়ে গেলেন বড়বাবুর।

তাঁর মেজাজ বুঝে ভুলে যাওয়ার কৈফিয়তে নাম সইটা ঘণ্টা দুই পরে করবেন ঠিক করেছিলেন। তা আর হলো না।

বড়বাবু বজ্র হুঙ্কার ছাড়লেন, আজও লেট?

হাত কচলাতে কচলাতে ম্লান হেসে বীরেশ্বর বাবু বললেন, এই ট্রামের জন্যে স্যার—

আমরাও এই ট্রামে চড়েই অফিসে আসি। আজ আর আমি কোন কথা শুনব না আপনার। আপনার নামে রিপোর্ট না করলে আপনি ঠিক হবেন না।

আজকের মত মাপ করুন, স্যার—

বড়বাবু তার কথা কানেই তুললেন না। ছোট সাহেবের ঘরের দিকে গট গট করে চলে গেলেন।

বীরেশ্বর বাবুর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো স্ত্রী মনোরমার ওপর। কেন সে তাঁকে ডেকে দিল না ছটার সময়?

স্বদেশ

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ধরার অনন্ত স্থান গিরি ভূমি জল
তবু দ্বন্দ্ব অহর্নিশি মানুষে মানুষে.
পশুরে তাড়ায়ে দূরে তার বাসস্থল
মানুষ কাড়িয়া লয় আফ্রিকা বা রুশে।

বিতাড়িত পশু ভাবে কবে বাসস্থান
ফিরিয়া পাইবে তারা নরহস্ত হতে;
ও-দিকে বিভিন্ন নর সুসভ্য সন্তান
অসভ্যরে বিতাড়িছে বনে জলে পথে।

স্বদেশ যাহারে বলি সে-দেশ কাহার?
শিক্ষিত তাড়ায় বলে অশিক্ষিত জনে;
অনার্য্যে তাড়ায় আর্য্য বলে দুর্নিবার—
শ্বেত জাতি বিতাড়িল দুয়েরে শাসনে।

আর্য্য ও অনার্য্য ভাবে পশুদের প্রায়
বিমুক্ত করিবে তারা বন্দিনী মাতায়॥

জয় স্বদেশ

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

জাগো রে জাগো মম দেশ।
দুর্দ্দম দুর্ব্বার পরি' রণবেশ॥
রুদ্রের নৃত্যের প্রায়
তূর্য্য বাজায়ে নাচো প্রলয়-লীলায়।
কর চুরমার যত ক্রন্দন-ক্লেশ।
ভাঙো লাঞ্ছনা, ভাঙো দুঃখের পাশ,
নয়ন-আগুনে করো ভ্রূকুটিরে নাশ।

হও আজি ভীম উন্মাদ,
চরণে পেষণ কর দুখ অবসাদ।
রণজয়ে মেতেছে ভুবন,
দলিত পীড়িত আজি তুলি' শির ফুঁসিছে ভীষণ।
যতেক দানবে আজি ধূলিতলে ফেল ধরি' কেশ।

জয় জয় দুর্ব্বল জয়,
প্রবলের হোক পরাজয়।
দম্ভ ও ব্যভিচারে কর কর লয়।
পদতলে দলো বলে মরণেরি ভয়।
প্রলয়ের নর্ত্তনে পাপে কর শেষ।

বেগার খাই নেবার

শ্রীপ্রভাতকুমার* মুখোপাধ্যায়

'পাকিস্থান' মানে তীর্থক্ষেত্র। কিম্বা বলা চলে, পাঞ্জাব, আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও সিন্ধের প্রত্যেকটির প্রথমাক্ষরের সংমিশ্রণ। সম্ভবতঃ এর মধ্যে বাঙলা দেশও অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা হ'লে বাংলাদেশ, হায়দ্রাবাদ ও অন্যান্য মুসলীম রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। ম্যাপ দেখলে বোঝা য'বে যে অন্ততঃ প্রথম চারটি একে অন্যের সঙ্গে স্বীকার্য্য ভাবে সংযোজিত এবং এ দাবীর উদ্দেশ্য হ'ল দিল্লী থেকে কন্সান্টিনোপল (Constantinopole) ও কায়রো (Cairo) পর্য্যন্ত মুসলমান-প্রধান রাজ্য সম্মেলনের সৃষ্টি করা। যদি কোন কারণে ভাবতে মুসলমান সংস্কৃতি বিপন্ন হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে একথা ভাবা অস্বাভাবিক নয় যে, তারা ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে মধ্যপূর্ব্ব শক্তিশালী মুসলমান-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হবার প্রচেষ্টা করবে। বর্ত্তমান যুগে, যখন বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতি ভৌগোলিক সীমানা ক্রমশঃ অবান্তর করে দিচ্ছে; তখন হিমালয়কে উপেক্ষা ক'রে হয়ত' কোনদিন দিল্লীর উত্তর সীমান্তে এক প্রবল পরাক্রমশীল মুসলমান রাজ্যপুঞ্জ গড়ে উঠবে এ রকম ধারণা করা অলীক স্বপ্ন নয়। তাহ'লে দক্ষিণাংশ থাকবে হিন্দুদের অধীনে। এরকম কোন পরিস্থিতি হয়ত' সম্ভব নাও হ'তে পারে কিন্তু তাহ'লেও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ এর ওপর ভারতীয় মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকখানি নির্ভর করে এবং আজ পর্য্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তাতে বোঝা যায় যে 'পাকিস্থান' অত্যন্ত অপরিণত পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক অবস্থা, মুসলমান রাজ্যপুঞ্জ গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনা এবং প্রসারিত সীমানার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিক্ষিপ্ত সংস্থিতি সবই এই পরিকল্পনার অন্তরায়। কিন্তু তা হ'লেও একথা বলা চলে না যে, সারা ভারতবর্ষে ন কোটি মুসলমানদের নিজেদের দেশ বলে কোন জিনিষ থাকবে না। আমি জানি, অনেক ভারতবাসী বললেন, সারা ভারতবর্ষই হবে তাদের দেশ। অতএব, কয়েকজন ভারতীয় নেতাদের মতামত বিচার করে দেখা যাক। প্রথমতঃ মাদ্রাজের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ রাজাগোপালচারীর কথা। তিনি ঠিক এই সমস্যাকে উপলক্ষ্য করে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। 'রাজাজী' (এই নামেই তিনি সর্ব্বজনবিদিত) সমিতির এক অধিবেশনে বলেন "এ বিষয়ে, সাহস করে, মুসলমানরা যা যা চায় তাই তাদের দেওয়া যাক। এটা একটা স্বপ্ন মাত্র। যদি আমরা পকেটে না রেখে টেবিলের ওপর মেলে রাখি তা'হলে একদিন তারাই বলবে যে এতে তাদের প্রয়োজন নেই। মুসলমানেরা তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে চায়। তাদের পক্ষে 'পাকিস্থান' যে ভালো নয় এ নিয়ে তর্ক তুলে কোন লাভ নেই। মনে করুন, ট্রেণ ধরবার জন্যে বাড়ী থেকে রওনা হবার সময় আপনার ছেলে আব্দার ধরল যে সে সামনের সীটে বসবে। তখন যদি আপনি তাকে বোঝাবার চেষ্টা আরম্ভ করেন যে, ও জায়গাটা আপনি আপনার এক বন্ধুকে দিয়েছেন, তা হ'লে, তর্ক আপনার অযৌক্তিক না হ'লেও ট্রেণ আপনি নিশ্চয় সময়মত ধরতে পারবেন না। বুদ্ধি থাকলে সে ক্ষেত্রে আপনার উচিত আপনার ছেলেকে সামনের সীটে বসতে দিয়ে ট্রেণ ধরা। আমার প্রস্তাব হচ্ছে মুসলমানদের বলা—আমরা তোমাদের ওপর জোর করতে চাই না। এটা যদি স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, মুসলমান-প্রধান দেশে তারা স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী এবং তারা নিজেদের শাসন-পদ্ধতি নির্দ্ধারণের উপযুক্ত, তা হ'লে এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপায় আছে। আমরা কি পারি আমাদের এই দেশকে বিভক্ত করতে? দিল্লী প্রস্তাবে বলা আছে যে, যদি কোন সীমানার লোক পৃথক থাকতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয় তা হ'লে তাদের মতের বিরুদ্ধে জোর করে ভারতীয় সম্মিলনীর মধ্যে তাদের আবদ্ধ রাখার কথা কার্য্যকরী সমিতি ভাবতেই পারেন না। 'হ'রিজন' পত্রিকায় গান্ধীজী বলেছেন যে, যদি এই বিশাল মুসলমান-সম্প্রদায় ভাবে যে, তারা ভিন্ন জাতি, তা হ'লে পৃথিবীর কোন ক্ষমতাই তাদের মত পরিবর্ত্তিত করতে পারবে না। 'পাকিস্থানী' ভূত আমাদের হত্যা করবে না। মুসলমান-প্রধান পাঞ্জাবে আজও 'শিখ' বিশেষভাবে জীবিত আছে। 'পাকিস্থান' একটা ভৌতিক কবিকল্পনা এবং আমাদের উচিত ভয় না পেয়ে তার সম্মুখীন হ'য়ে দাড়ি ধরে টান মারা।"

এই কথা বলেছেন ভারতের একজন সু-অভিজ্ঞ জননেতা। একশো পাঁচ ভোটে তাঁর প্রস্তাব পরাজিত হয়—অবশ্য তার একমাত্র কারণ তিনি কংগ্রেস-নীতির অনুসরণ করেন নি। কংগ্রেস সম্বন্ধে আমি কোন ভুল ধারণা প্রচার করতে চাই না। পেলিভানকার কংগ্রেস সম্বন্ধে যে কথা বলেন আমি তার সঙ্গে একমত। তিনি বলেন, কংগ্রেস হিন্দু প্রতিষ্ঠান নয়: হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু-মহাসভা প্রতিনিয়ত কংগ্রেসকে আক্রমণ করে, তাহ'লেও কংগ্রেসের আবহাওয়া বিশিষ্টরূপে হিন্দুত্বপূর্ণ। সাংসারিক হিন্দুত্ব নয়। সামাজিক কুসংস্কার সম্বন্ধে এরা সচেতন এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে কুসংস্কারের সঙ্গে চলেছে এদের সংগ্রাম—বিশেষ ক'রে অস্পৃশ্যতার। অনেক কংগ্রেস সভ্যের আছে হিন্দুত্বের প্রতি সহানুভূতি—কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে, গানে ও প্রার্থনায় অনবরত কংগ্রেস ও হিন্দুত্বের যোগাযোগ স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক। কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বপ্রধান অ-সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। অসীম ক্ষমতাপন্ন ও আন্তরিক শ্রদ্ধান্বিত এই প্রতিষ্ঠান যে কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের চাইতে শক্তিশালী।"

গান্ধীজী বলেন কংগ্রেসকে হিন্দু অথবা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলা সত্যের অপলাপ। "শ্রেষ্ঠ জাতীয়তার প্রতীক কংগ্রেস সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের ভিত্তি কেবল কংগ্রেসের মধ্যেই নয়, ছড়িয়ে আছে সারা ভারতবর্ষে, জাতিধর্ম-নির্ব্বিশেষে।" এই উক্তির উত্তরে কংগ্রেসের সভাপতি ও বিশিষ্ট মুসলমান আবুল কালাম আজাদ বলেন, "রাজাজী তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন।

* বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে লেখক তাঁহার ছদ্মনাম ত্যাগ করিয়া স্বনামে লিখিতে আরম্ভ করিলেন।—ঘঃ সঃ।

তিনি মনে করেন যে, কংগ্রেস-লীগ ব্যবধান দেশের পক্ষে ক্ষতি-কর, কাজেই সে ব্যবধান দূর করা উচিত। এ বিষয়ে সমিতির মত-বিরোধ থাকা সম্ভব নয়। আমরাও তাই মনে করি...কিন্তু—রাজাজীর পদ্ধতি ভ্রমাত্মক এবং তাতে তিনি নিজের উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি সাধন করবেন। এটা কারো দাবী উত্থাপন করা অথবা কারো তা স্বীকার করবার প্রশ্ন নয়। আমি আগেই বলেছি যে, সঠিক উপায় হল দু'দল থেকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত ক'রে সমস্তটা আলোচনা করা। আমি এখনও প্রস্তুত আছি এই সমস্যা সমাধানের জন্যে মুসলীম লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করতে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করতে।"

"মিঃ জিন্নার সঙ্গে আমার দু'বার দেখা হয়েছে, পণ্ডিত জওহর-লাল নেহেরুর সঙ্গে তিনি পত্রালাপ করেছেন এবং গান্ধীজীও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। গান্ধীজী প্রাণপণে চেষ্টাও করেছেন। হঠাৎ আমাদের সামনে এক অসম্ভব পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল। আমাদের সম্মুখীন হ'তে হ'ল দুটো মূল সমস্যার: প্রথমতঃ, আমাদের প্রায় পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস ভুলে গিয়ে পরিণত হ'তে হবে একটি হিন্দু-প্রতিষ্ঠানে। দ্বিতীয়তঃ সমগ্র ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মুসলীম লীগকে স্বীকার করে নিতে হবে। এ অসম্ভব প্রস্তাব স্বীকার না করে তাঁদের সঙ্গে কোন আলোচনাই সম্ভব নয়...আমার সুদৃঢ় মত, যাদের হাতে মুসলীম লীগের নেতৃত্বের ভার ছিল তারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করলেন—গড়ে তুললেন 'পাকিস্থান'—ইসলাম ধর্ম্মের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। তা' ছাড়া তার অন্তর্নিহিত আদর্শ প্রকাশ করা হয় নি। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি অস্পষ্ট ও অচিন্তিত। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মতন দায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কি করতে পারে?"

এ কথাগুলো হয়ত' খুব যুক্তিপূর্ণ এবং উৎকৃষ্ট রাজনৈতিকতা কিন্তু "স্বাধীনতা"র খুব মহৎ বিশ্লেষণ নয়। ব্রিটিশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মতন এই উক্তি, কংগ্রেসের আদর্শ পূর্ণ স্বরাজের মতন নয়—যা হওয়া উচিত। কিন্তু তা হ'লেও আলাপ-আলোচনার পথ তা সত্ত্বেও খোলা আছে। একমাস পরে মিঃ জিন্নার বিবৃতি শুনুন:—

"মুসলীম ভারত কখনও সম্পূর্ণ ভারতব্যাপী সম্মিলিত শাসন-পদ্ধতি স্বীকার করে নেবে না, কারণ তা' হলে মুসলমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ব প্রদেশগুলো হিন্দু শাসনাধীনে এসে পড়বে।...প্রাদেশিক শাসন-পদ্ধতির অনুশাসনে সুদীর্ঘ সাতাশ মাস আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে—যখন কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠ সম্প্রদায়, শাসন, রাজকীয় ও কার্য্যকরী ক্ষমতা লাভ করেছিলেন... এই সাতাশ মাস দুটি প্রদেশে হিন্দু কংগ্রেস, মুসলমানদের সংস্কৃতি সমাজ ও সাহিত্য দমনের অনেক চেষ্টা করেছে। এমন কি যে সব শিক্ষায়তনে কেবল মুসলমান ছাত্র ছিল সেখানেও মুসলমান সংস্কৃতিকে হীন ও হিন্দু সংস্কৃতিকে সুস্পষ্ট ভাবে মহৎ প্রতিপন্ন করা পাঠ্য পুস্তক অনুমোদন করতেও হিন্দু কংগ্রেস-সরকার দ্বিধা বোধ করেন নি।"

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধানের ভিত্তি সুদৃঢ় ও দুর্লঙ্ঘনীয়। আমরা ভিন্নজাতি, স্বতন্ত্র আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য, নাম ও পদবী, দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভূতি, আইন ও নীতিবোধ, সমাজ ও দিনপঞ্জী, ইতিহাস, আদর্শ ও ঐতিহ্য। এক কথায়, স্বাতন্ত্র্য আমাদের জীবন, পৃথক জীবনী দৃষ্টি। অন্তর্জ্জাতিক আইনানুসারে, আমরা ভিন্ন জাতি। কংগ্রেস চায় শাসন-ক্ষমতা, তাদের মধ্যে আমাদের সংমিশ্রণ ও সকলের ওপর শাসনের দণ্ডভার আর তা তারা চায় ব্রিটিশের অথবা বেওনেটের সাহায্য নিয়ে।"

এখানে আমরা এসে পড়লাম যুদ্ধক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ ঐক্যবাদীর উক্তি, অল্প বিস্তর হিটলারের প্রতিধ্বনি। এইবার নেহেরুর বক্তব্য শোনা যাক:—

"রাজাজীর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি বলতে পারি, কেবল আমার নিজের পক্ষ থেকেই নয়, আমার বোধ হয়, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও যে, মিঃ জিন্নার সঙ্গে দেখা করলে যদি আমাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তাহ'লে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও আমরা ইচ্ছুক কিন্তু যখন আলোচনার বিষয়-বস্তু এক হয় এবং যখন মূলতঃ মতের মিল থাকে তখনই এ ধরণের আলাপ-আলোচনা সম্ভব। যেমন, পাকিস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করে বিশেষ কোন লাভ নেই কারণ এ সম্বন্ধে আমাদের পারস্পরিক মিল নেই। ভারতের স্বাধীনতা অথবা ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী শাসকদের অপসারণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা এবং বিদেশী শক্তির বিনা হস্তক্ষেপে আমাদের সমস্যা আমাদের নিজেদেরই সমাধান করা—এটা যদি হয় আলোচনার বিষয়-বস্তু তা হ'লে মিঃ জিন্না পাকিস্থান সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দেই তাঁর মতামত পোষণ করতে পারবেন এবং আমি তার বিরুদ্ধে পোষণ করব আমার নিজের মতবাদ।"

নেহেরু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সপ্রতিভ, দয়ালু হৃদয়বান্ মনীষিদের মধ্যে অন্যতম—কিন্তু তাঁর এই উক্তির চাইতে উত্তেজক আর কিছু কি হ'তে পারে? আমি নেহেরুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি—সম্মান করি তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, তাঁর স্বকীয়তা, সহৃদয়তা, তাঁর চারিত্রিক বিশেষত্ব এবং মানসিক উৎকর্ষ—আমি ঘৃণা করি ব্রিটিশের সত্যের অপলাপ এবং অন্যায়প্রীতি—যে অন্যায় তাকে জেলে পাঠায়: ভবিষ্যত সম্বন্ধে মুসলীম ভীরুতায় আমার যথেষ্ট সহানু-ভূতি, জিন্নার মতবাদকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু পারলে এই দুটো অতি-বুদ্ধি মাথাকে আনন্দের সঙ্গে ঠুকে দিতাম।

কাজেই ব্যবধান। ব্যাবধানকে আমি স্বল্পায়তন করতে চেষ্টা করিনি, করলে চেকো-স্লোভাকিয়া কিম্বা স্পেনের সমস্যাকে উপেক্ষা করার মত ভুল করা হবে। এ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া মানে সমাধান সম্বন্ধে হতাশ হওয়া নয়—এ কথাও সমর্থন করা নয় যে, এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা না হ'লে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রাখায় ইংলণ্ড যুক্তিপূর্ণ। কোন্ সম্প্রদায়ে—চল্লিশ কোটি হ'ক—চার কোটি হক কিম্বা হ'ক চারজন—মতবিরোধ নেই? আর, ভারতবাসীরা কি স্বর্গের দেবতা না মস্তিষ্কহীন গর্দ্দভ, যে সবাই একমত হ'য়ে স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টা করবে?—এবং, এ থেকে প্রত্যক্ষভাবে আরও একটা প্রশ্ন

এসে পড়ে—তাই যদি হ'ত তা'হলে কি হ'ত? যদি পুরা ভারতবর্ষ আজ এক কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, গান্ধীর নেতৃত্বে তারা অহিংসা-নীতি অবলম্বন করবে, কিম্বা সুভাষের নেতৃত্বে তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিম্বা জিন্নার নেতৃত্বে করবে স্বাধীনতার সংগ্রাম, তাহ'লে কি হয়?—তখন প্রশ্ন উঠবে—এবং কংগ্রেস-নেতৃবর্গ সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি যে—এই গণতান্ত্রিক নয়া ঐক্যবাদ এবং ঐক্যবাদী ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'তে পারে না। "ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখবার বাসনা" ব্রিটিশের এই সদিচ্ছার পেছনে কোন ভণ্ডামী নেই, এ কথা যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে বলাই বাহুল্য যে, ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা ভারতবর্ষকে কিছুতেই স্বাধীনতা পেতে দেবে না—তা সে বিভক্ত ভারতবর্ষই হ'ক আর এক নেতা অথবা এক প্রতিষ্ঠানের অধীনে মিলিত ভারতবর্ষই হ'ক। অর্থাৎ, আসলে তারা চায় ওয়েষ্টমিনিষ্টারের আদর্শে অনুপ্রাণিত ভারতবর্ষ: সুস্পষ্ট জাতীয়তা ও ব্যবধানপূর্ণ প্রাণহীন মহাদেশ—সেখানকার শাসনপদ্ধতি হবে ছোট্ট পশ্চিমী দ্বীপের হাজার বছরের পুরাতন সংস্কারাচ্ছন্ন পরিষদ শাসন-প্রণালীর অনুরূপ।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের যে সব প্রচেষ্টা ব্রিটিশরা আজ পর্য্যন্ত করেছে বা করবে তার অসাফল্যের এইটাই একমাত্র কারণ। এ সমস্যা ব্রিটিশ চিন্তাধারা অথবা সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাদের পক্ষে এ সমাধান করা তেমনই অসম্ভব—যেমন তিব্বতী দালাই-লামা নির্বাচনে মার্কিনী ব্যবসায়ীর প্রয়াস কিম্বা ইংলণ্ডের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ষ্ট্যালিনের ভোট আদায়ের চেষ্টা।

ব্রিটিশ অথবা ভারতবাসী, যাঁরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখতে চান—তাঁরা স্বভাবতঃই কামনা করেন এবং আন্তরিক ভাবে ইচ্ছা করেন যে, অচিরেই এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার শেষ মীমাংসা হ'ক। কিন্তু, এই সমস্যার ওপর সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের জাতি-উপযোগী কোন বিশেষ শাসন-পদ্ধতি চাপিয়ে দিলে, কিম্বা ভার্সাইয়ে য়ুরোপের ওপর যেমন করে মিলনের মন্ত্র জোর করে চাপান হয়েছিল তেমনি করলে কোন উপযুক্ত সমাধান হবে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। য়ুরোপে ধর্ম্ম অথবা আচার ব্যবহারে বিশেষ কোন মতদ্বৈধ নেই, অবশ্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হ'লে যে কেউই বলবে যে, ভ্যাটিকান রুশ নাস্তিকতাকে কখনই সুনজরে দেখে না। নাস্তিকতাবাদী রুশের আধিপত্যে সম্মিলিত য়ুরোপে যদি রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায় নিজেদের বিপন্ন মনে করে, তা হ'লে, সম্ভবতঃ ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সমস্যার মতন একটা সমস্যার উদ্ভব হবে। ফলে কি হবে যুদ্ধ? এ ক্ষেত্রে জাপানে য়ুরোপীয় প্রভুত্বের কি কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে? এরকম কোন সম্ভাবনা হয়ত' সুদূরপরাহত হ'লেও সংখ্যানৈতিক হিসাবে, আন্তরিক বিশ্বাসে অথবা স্বত্বত্ববোধে এ সমস্যা অনেকটা ভারতীয় সমস্যার অনুরূপ। এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা মানেই প্রকট সংস্কার ও প্রবল ভাবাবেগ—যা কোন সরকারী ঘোষণা মুছে ফেলতে পারে না। হয়ত, যে সুদূর ভবিষ্যতের ওপর দৃষ্টি রেখে আমরা শাসন-পদ্ধতির প্রচলন করি, সেই সমস্যার মধ্যেও এ সমস্যার সমাধান হবে না। তা যদি হয়, ধর্ম্মাত্মবোধে এবং ঐতিহ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের যদি মূলতঃ এত ব্যবধান থাকে—যার জন্যে এক সম্প্রদায় অন্যকে ভয় পায়, অবিশ্বাস করে এবং পৃথক্ হ'য়ে যাবার ইচ্ছাকে সন্দেহ করে, তা হ'লে এটা ঠিকই যে, অন্ততঃ ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক ধারায় এ সমস্যার সমাধান হবে না।" অর্থাৎ, সমগ্র ভারতব্যাপী নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে যে কোন পরিষদ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের দুটো পরিণতি অবশ্যম্ভাবী; হয় কোন বিশিষ্ট গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্থায়ী আধিপত্য, না হয় প্রভূত ক্ষমতাপন্ন লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্থায়ী প্রতিনিধি-আধিক্য। অতএব ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুযায়ী চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান অসম্ভব এবং ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব অবসানের কোন সম্ভাবনাই নেই। হিউজ ওয়ালপোলের কথায় বলা চলে "আমাদের মধ্যে থেকেই সুখী।"

এই মতামতকে উপেক্ষা করা সহজ নয়, কারণ এতে যুক্তির চাইতে বিশ্বাস বেশী। যারা সত্যিই বিশ্বাস করে যে, "মধ্যস্থতার জন্য তৃতীয় দল হিসেবে ব্রিটিশ উপায় ও ন্যায়বিচারের" প্রয়োজন, তারা বিলম্বিত মীমাংসার আশা পোষণ করে এবং সেভাবে বিচার করলে তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। প্রকারান্তরে তারা অস্বীকার করে, যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেতে পারে। আসলে তারা মনে মনে আশা করে যে ভারতবর্ষে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হ'লেও ব্রিটিশ সংস্রবের অবসান অসম্ভব। এবং এ কথাও বলা যেতে পারে যে, এই রকম ভাবে যারা স্বাধীনতা অস্বীকার করে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে সমপর্য্যায়, কারণ কংগ্রেস মুসলমানদের পৃথক্ ভাবে স্বাধীনতা দিতে অনিচ্ছুক;—মুসলীম লীগেরও, কারণ তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চাইতে নিজেদের স্বাধীনতাকে অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে করে। ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও মুসলীমস নাতনপন্থী সকলেই মনে করেন যে, তাঁদের নিজেদের মতানুযায়ী যে স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর পক্ষে যারা মনে করেন যে, পূর্ব্ব-পৃথিবীতে কোন জাতির উপর আধিপত্য করার অধিকার শ্বেতকায় জমিদারদের নেই এবং যে পাশবিক ক্ষমতার দ্বারা তারা অনধিকার আধিপত্যকে বজায় রেখেছে—এই যুদ্ধে নাৎসীবাদীদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির মতন তারও অবসান প্রয়োজন:—তারা মূলতঃ এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য অতলান্তিক সনদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত। আমরা সত্যই যদি "প্রত্যেক জাতির আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের শাসন-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করার অধিকারকে সম্মান করি এবং যারা শাসনাধিকার ও স্বায়ত্ত-শাসন থেকে অন্যায় ভাবে বঞ্চিত হয়েছে, তাদের সে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া কামনা করি" তা হ'লে যে নীতি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাকে সমর্থন করে তা সে যতই যুক্তিপূর্ণ ও প্রশংসনীয় হ'ক না কেন—সে নীতি পরিহার্য্য। এবং বিশেষভাবে পরিহার্য্য, কারণ এই ব্রিটিশ রাজত্ব সমর্থনকারী নীতির সঙ্গে জড়িত "যুদ্ধের পর—আপাতত...যখন ভারতবর্ষ নিজেদের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে একমত হবে" প্রভৃতি অজুহাত আজকাল এত সাধারণ ও সস্তা হ'য়ে উঠেছে য, সেজন্যেই ধরা পড়ে।

যাই হ'ক আমাদের দায়িত্ব, যতই স্পষ্ট হ'ক না কেন, আমাদের স্বার্থ, কিম্বা, যুদ্ধের অবস্থা যে পরিস্থিতিরই দাবী করুক না কেন, ভারতবর্ষের ওপর কোন সর্ত্ত অথবা শাসন-পদ্ধতি আরোপ করার অধিকার ব্রিটিশের নেই। বিফল ও অজস্র অর্থব্যয়ী ব্যর্থ গোলটেবিল বৈঠক, সাইমন কমিশন, গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রভৃতি সম্পূর্ণ নিরর্থক। হয়ত' এ সবই সাধু-উদ্দেশ্য, অতএব এ ব্যর্থতা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। প্রভূত অর্থব্যয়ে তোলা চলচ্চিত্র, ছবি, সারগর্ভ বক্তৃতা এবং স্নান পরীক্ষার দ্বারা, মাংস যে উপাদেয়—এই কথা কোন নিরামিষাশীকে বোঝাবার মতন—এবং বোঝাতে না পেরে বিরক্ত হ'য়ে (কারণ আপনি নিজে জানেন যে মাংস খাওয়া প্রয়োজন) শেষকালে তাকে অজস্র গোমাংস গলধঃকরণ করিয়ে দেওয়ার মতন—এ প্রচেষ্টাও একেবারে নিরর্থক।

বহু বছরের পরীক্ষা ও ইংরাজি বিচার ও বিবেচনাপ্রসূত ব্রিটিশ পরিষদী রীতিনীতি ভারতের পক্ষে তেমনি অপ্রযোজ্য, যেমন চীন অথবা রাশিয়ার প্রতি, অথচ তা সত্ত্বেও আমাদের বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আইনজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞেরা পরম সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে কেবলই ভুল গাছে উঠছেন যেহেতু সেটি ইংরেজি গাছ।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ বলে, এ সমস্যার কথা উঠলে আমরা সহজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজ্যগুলি, কিংবা যুরোপীয় জাতীর সঙ্গে ভ্রমাত্মক তুলনা করতে আরম্ভ করি। ভুলে যাই যে, ভারতীয় ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক ততটা ভিন্ন এবং তা বদলানো তত শক্ত, যেমন আমাদের চামড়ার রং। সম্ভবতঃ নিজেদের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানের ভার ভারতবাসীদের ওপর ছেড়ে দিলে তারা বিফল নাও হ'তে পারে। এও হ'তে পারে যে, হয়ত ভারত পরিকল্পনায় আমাদের স্ব-আরোপিত সর্বস্থায়ী আনবে চরম নিষ্পত্তি—আবার এও হ'তে পারে যে, ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ শেষ হলেই হবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান।

এটাও আবার স্বীকার করা শক্ত, 'পরিকল্পনাই' যদি কিছু না করলাম তা হ'লে এ বিষয়ে লেখা কেন? এর উত্তর প্রাচ্য সম্বন্ধে কোন প্রতীচ্য পরিকল্পনাই কার্য্যকরী হ'তে পারে না। আমাদের গোলটেবিল প্রভৃতি সব বৈঠকই ব্যর্থ হ'য়েছে এবং অবশেষে আমরা আবার এসে পড়ছি সেই সিপাহী-বিদ্রোহের দিনে। ইংরেজ হিসাবে, আমি সানন্দে স্বীকার করছি যে 'ভারত' সম্বন্ধে কিছু লেখার কোন অধিকারই আমার নেই' আরও স্বীকার করছি যে বিধান্বিত আমি লিখছি অবাস্তব কথা। তা সত্ত্বেও "ভারতের জন্যে যা কিছু পরিকল্পনা সব ব্রিটেন করবে" এই ধরণের বহু সহস্র যুক্তি-পূর্ণ আলোচনার বিরুদ্ধে আমার মন্তব্যের অন্ততঃ কণামাত্র ছাপানো চাপাতে আমি বদ্ধপরিকর। ব্রিটেন যদি করে নিজের জন্যে কোন পরিকল্পনা করুক। ভগবান্ জানেন, এই ছোট্ট দ্বীপে, দশবদ্ধ জাতির মধ্যে 'বিভাগের পরিকল্পনা' নিয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধ হবে। কিন্তু তাই বলে, তিন হাজার বছরের সম্পূর্ণ ভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কারের ব্যবধানে বিভিন্ন, আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ বিপরীত, ব্রিটেনের চাইতে দশগুণ সংখ্যা-গরিষ্ঠ জাতি ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দাবী করা সম্পূর্ণ অর্থহীন।—এবং সেই জাতি দায়িত্ব ছাড়াও ভারতবর্ষ স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। যেহেতু ভারতবর্ষ দেড়শ' বছর পরাধীন এবং যেহেতু তাদের মধ্যে জটিল সাম্প্রদায়িক ও ধর্মাত্মক সমস্যা আছে, সেইজন্যে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ক'রতে অক্ষম, ব্রিটিশ নীতির এই দৃঢ়বদ্ধ মনোভাব কেবল ভ্রমাত্মকই নয়, ধৃষ্টতা। দেড়শ' বছরের আধিপত্যও শাসকজাতিকে পরিকল্পনার অধিকার অথবা ক্ষমতা দেয় নয়। সহজেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে, যে, ভারতের যে কোনো জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে ভাল বুঝবে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বেশী ভাববে। ভারতীয় আদর্শ অব্যাহত ভাবে কার্য্যকরী হ'লে বোঝা যাবে তারা কি ধরণের শাসন-পদ্ধতি প্রবর্তিত ক'রবে—রাজকীয় না প্রজাতান্ত্রিক, সম্মিলিত বা মিলিত পরিষদ, কিংবা সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক্ রাজ্যপুঞ্জে অপ্রতীচ্য সম্মিলন।

ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা, ভারতবর্ষের হাতে তাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ভার ছেড়ে দিতে অস্বীকার ক'রবে তিনটী অজুহাতে:

(১) ভারতবাসীরা দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে।

(২) ভারত ত্যাগের পরিণতি যদি হয় ঘরোয়া যুদ্ধ, তাহ'লে ব্রিটেন ভারত ছাড়তে পারে না।

(৩) ভারতের ঘরোয়া যুদ্ধ পরোক্ষভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টার অন্তরায়।

আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তিপূর্ণ হ'লেও এ অজুহাত সম্পূর্ণ ভিত্তি-হীন। ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে যাঁরা আছেন তাঁরা অন্য যে কোনো জাতির রাজনীতিজ্ঞদের চাইতে কোনো অংশে হেয় নন। গান্ধী অথবা নেহেরুর চাইতে চার্চিল, রুজভেল্ট অথবা ষ্ট্যালিনের কার্য্যকলাপ ইতিহাসে অধিকতর যশ, সম্মান অথবা স্থায়িত্ব লাভ ক'রবে এ ভবিষ্যৎ-বাণী যে করতে পারে সে দুঃসাহসী। মতবাদ ভিন্ন হ'লেই যে সেটা অর্থহীন, তার কোনো অর্থ নেই, এবং ভারতীয় আভ্যন্তরীণ মনোমালিন্য যুরোপীয় অন্তর্জ্জাতিক সমস্যা, এমন কি রাষ্ট্রসংঘের আভ্যন্তরীণ মনোমালিন্যের চাইতে কোনো অংশে বেশী নয়

আমাদের অনুপস্থিতিতে ঘরোয়া যুদ্ধের অজুহাত, আমাদের অবস্থানের সমর্থন মাত্র। হিউজ ওয়ালপোলের ভাষায় বলা চলে যে, "হিন্দু ও মুসলমান আমাদের সঙ্গে থেকেই সুখী" —বাতুলতা মাত্র। আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে ভারতবর্ষ জাপানের হাতে চ'লে যাবে—একথা বলা অবাস্তব। প্রথমতঃ ভারতবাসীদের পূর্ণ দায়িত্ব দিলে, তাদের মধ্যে ভেদাভেদ যে সাধারণ শত্রু জাপানের হাত থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার প্রচেষ্টার চাইতে বড় সমস্যা হ'য়ে উঠবে—এতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে এবং আমার মনে হয় অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ— জাপান যদি অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ অধিকার ক'রে নেয়, তা'হলেও স্বদেশ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় স্বাধীন ভারত, শাসিত ও লাঞ্ছিত ভারতের চাইতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিকতর প্রয়োজনীয় মৈত্রীরাজ্য হবে।

আসলে, সাম্প্রদায়িক, সমস্যার সমাধান এতই সহজ যে তা

কারো মনঃপূত নয়। আমি জানি যে, আমাদের এ যুগের চিন্তাধারা—যে চিন্তাধারা প্রত্যেক আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করতে চায়—সর্বোক্তিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন ক'রে তার সমাধান হবে তখনই, যখন সংখ্যাতত্ত্ব আর তথ্যতালিকা দিয়ে প্রমান করা হবে যে হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যেকে পাবে এতখানি জমি, এতগুলো প্রতিনিধিত্ব, এতখানি ক্ষমতা ...। কিন্তু, তথ্যতালিকার সর্বোক্তিক হিসেব ভারতীয় বিধান নয়: তাছাড়া, ভার্সাইএ য়ুরোপীয় সমস্যার সর্যৌক্তিক মীমাংসাগুলিও যে খুব সফল হয়েছিল তাও নয়। কোনো রাজনীতিজ্ঞ, লেখক অথবা সংস্কারক আজ পর্য্যন্ত এমন কোনো পরিকল্পনা দেন নি, যা ভারতের সমস্ত লঘিষ্ঠ সম্প্রাদায়ের মনঃপূত হবে। অতএব তাহ'লে আমরা সহজেই ধ'রে নিতে পারি যে—

(ক) ভারতে সাম্প্রদায়িক মিলন একটা স্বপ্নমাত্র।

কিংবা (খ) সাম্প্রদায়িক মিলনের সময় এখনও আসেনি।

কিংবা (গ) বিদেশী আধিপত্য থাকার জন্তে এবং বিভেদ সৃষ্টি তাদের শাসন-পরিচালনার আনুকূল্যে বলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

কিছু কিছু সত্য ওপরের তিনটিতেই আছে। সাম্প্রদায়িক মিলন স্বপ্নমাত্র—কারণ বিদেশী শক্তির ক্ষমতার দ্বারা আরোপিত কোনো শাসনযন্ত্রের কাঠামোতে এটা সম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক মিলনের সময় এখনও আসেনি—কারণ জাতীয় জাগরণ ও স্বায়ত্ত-শাসনের সহজগতিকে বিদেশী শাসন গলা টিপে রেখেছে। আধিপত্য—জাতীয়তাকে জাগরিত ক'রলেও ব্যবধানকে জটিল করে।

প্রত্যেক জাতির প্রয়োজন মিলনের প্রতীক: পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, রাজা, রাষ্ট্রপতি, দেশ। ভারতবর্ষে একমাত্র কংগ্রেসই এর প্রবর্ত্তন ক'রেছে। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস-পতাকা এবং "বন্দে মাতরম্" জাতীর মনে স্থায়ী আসন পেয়েছে। তেমনি অন্যান্যের বহু উর্দ্ধে ভারতবর্ষের সত্যিকার ধর্ম্মরাজ গান্ধী ভারতবাসীর মনে জাতীয়তার প্রতীক এবং তিনি কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে, গত বাট বছর ধ'রে ভারতের স্বাধীনতার প্রতীক অন্যান্য নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যতম—ভারতের দারিদ্র্যও অদৃষ্টের প্রতীক, তিনি যদি হিংসাবৃত্তি প্রবর্ত্তিত ক'রে যুদ্ধরাজ হ'তেন, তাহ'লে সহজে সমস্তদেশকে উদ্বুদ্ধ করে প্রতীচ্যকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত ক'রতে পারতেন। কিন্তু তাঁর মত ও তাঁর পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন; এবং ভিন্ন ব'লেই, যোদ্ধজাতি ও পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন ভারত-বাসীরা তাঁর কাছ থেকে সরে গেল। এই দু'এর মিলন—ধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধের, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিকতা। এই মিলনের মধ্যেই ভারতের সত্যিকার মিলনের আরম্ভ। এবং এই মিলনে আমাদের দান হবে, যাতে মিলন হয় সেই অবস্থার সৃষ্টি করা।

সে অবস্থার সৃষ্টি আর যা করেই হোক্, গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতাদের কারারুদ্ধ ক'রে হবে না। প্রভুত্ববাদের কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন দমননীতি দিয়েও নয়। ভারতবর্ষের জন্ত বৃটিশশাসন-পদ্ধতির বিভিন্ন পরিকল্পনাতেও নয়। রাজাজীকে মধ্যস্থতার অনুমতি না দিয়ে—গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান ক'রেও নয়। বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার ক'রবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিকিউরিটি কোরের দ্বারাও নয়। ভারতীয় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের দু'টো উপায় আছে। হয় তাদের ব্রিটিশ কামান দিয়ে আড়াল ক'রে রাখা, না হয় নিজেদের সমস্যা সমাধানের ভার ভারতবাসীদের ওপর ছেড়ে দেওয়া। যদি প্রথমোক্ত উপায় অবলম্বন করা হয় তা'হলে ভারতের ওপর আমাদের আধিপত্য হবে চিরস্থায়ী। এবং আমাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি কেবল মিথ্যা অজুহাত। যদি হয় দ্বিতীয়টা তা'হলে সময়ের বৃথা অপব্যয় না ক'রে জাতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত। জাতীয় গবর্ণমেণ্টই হোক আর যেই হোক কোনো দেশের কোনো গবর্ণমেন্ট আশা ক'রতে পারে না যে, প্রত্যেক লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করে সব সমালোচনার শেষ ক'রবে। সর্ব্বসন্তুষ্টি দাবী করা ভণ্ডামী। তাহ'লেও একটা জাতিকে গ'ড়ে তোলার কাজ জাতীয় গবর্ণমেন্টের দ্বারাই সম্ভব—বিদেশী গবর্ণমেন্টের নয়—বিদেশী মৈত্রীর প্রতীক লীগ অব নেশান্সের নয়।

কোনো গবর্ণমেন্টের অধীনে ভারতের সাম্প্রদায়িকতা যে রাতারাতি অন্তর্হিত হবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত কোনো বিদেশী শক্তি সর্ত্তপূর্ণ স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে প্রত্যেক লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে আপন আপন স্বার্থের জন্ত চীৎকার ক'রতে অনুপ্রাণিত ক'রবে ততদিন সাম্প্রদায়িকতার পরিসমাপ্তির আরম্ভ ত হবেই না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের নিষ্পত্তি সর্ত্ত ক'রে অথবা রক্তানীতি অবলম্বন ক'রে হবে না—সেই নিষ্পত্তি সর্ত্তাবলীর আলাপ আলোচনা হবে ভারতবাসীদের আপোষের মধ্যে, তাতে যতদিনই লাগুক্, যত বিরক্তিজনকই হোক আর তার আতঙ্ক ব্রিটিশ ধারণার যতই বিপরীত হোক্।

ভারতীয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্তে প্রয়োজন একটা বিশেষ "কেন্দ্র" যে কেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে সারা ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি উদ্বেলিত হ'য়ে উঠবে। এখনও এমন কোনো কেন্দ্র নেই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বন্ধ থাকলে কোনো কেন্দ্র থাকবে না। ৩০ শে মার্চ্চ ১৯৪২ সালে বেতার বক্তৃতায় স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপসকে উল্লেখ ক'রে ব'লতে পারি; "তোমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র তোমাদের নিজেদের ভেবে নির্দ্ধারিত করা উচিত। আমরা তোমাদের কার্য্যাবলীর ওপর সমনোযোগ দৃষ্টি রাখব। এবং আশা ক'রব যে এই নতুন বোমাকে তোমাদের জ্ঞান-তোমাদের পথপ্রদর্শক হোক্।"

দুঃসাহসিক উক্তি: যদি এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণমাত্রায় পালন করা হ'তো তা হ'লে বলার কিছুই থাকতো না। কিন্তু অন্যান্য প্রতিশ্রুতির মত এই প্রতিশ্রুতি উপলক্ষ্য ক'রেও ভারতবাসী ম্যাকবেথের মতন ব'লতে পারে;

"এই সব হঠকারীর শঠতায় ক'রোনা বিশ্বাস
যারা শুধু অকপটে প্রবঞ্চনা করে
কর্ণে যারা গুঞ্জরিত করে 'প্রতিশ্রুতি'
আশার কুহকে শুধু ভেঙে দিতে হায়।"

[ক্রমশঃ

সোহাগিনী দস্তিদার

(একাঙ্ক প্রহসন)

শ্রীযামিনী মোহন মতিলাল

পাত্রগণ

বিকাশ বাসু	কলেজের অধ্যাপক
হীরেন ঘোষ	ঐ ছাত্র
জ্ঞান	হীরেনের বন্ধু
শ্রীপতি চাকলাদার	আর্টিষ্ট বুরোর অরগানাইজার

ছাত্রগণ, প্রতিবেশীগণ,—ইত্যাদি—

পাত্রীগণ

লীলা বাসু	বিকাশের স্ত্রী
প্রতিমা	ঐ বন্ধু
কমলা	ঐ ভগ্নী

তরুণীগণ ইত্যাদি—

সংযোগস্থল—কলিকাতা।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—প্রোফেসার বাসুর ড্রয়িংরুম, (মিসেস বসু) লীলা অরগ্যানে গান গাহিতেছে।

লীলা—প্রাণ যদি চায় ভালবাসা
কেন গো তার এত বাধা
ধরতে গেলে যায় যে চলে
ধরা দিতে কতই সাধা ॥
হৃদয়ে হৃদয়ে মেশামেশি
নয়নে কতনা অমিয়রাশি
বিকাতে সদা যে অভিলাষী
পাগলকরা মধুর হাসি
লয়ে পরাণভরা প্রেমের সুধা ॥

(গান শেষ হইবার পূর্ব্বে চাকলাদার প্রবেশ করিল—নিঃশব্দে গাহিবার তারিফ করিল।)

চাকলাদার—নমস্কার, আজ আর ফাঁকি দিবার পারবেন না—

লীলা—কে ?

চাকলাদার—আইজ্ঞা আমি—শ্রীপতি চাকলাদার—আমারে চিন্‌বার পারছেন না—আমি আর্টিষ্ট বুরোর অরগানাইজার—

লীলা—ওঃ—সেই আর্টিষ্ট বুরো—আপনাকে না আমি একশো বার বলেছি যে, আমি আপনার বুরোর মেম্বর হব না—ফিল্মে নামা আমার পোষাবে না—

চাকলাদার—নামেন না নামেন—আমার বুরোর মেম্বর হইবার কোন বাধা লাগছে—মেম্বর হইলেই যে নামতে হইব, তা আপনারে কইলো কেডা—?

লীলা—না না, আমার যথেষ্ট বাধা আছে আপনাদের মেম্বর হ'বার—সে সব আপনার বোঝবার কোন প্রয়োজন নেই—যান, এখন আমার সময় নষ্ট করবেন না।

চাকলাদার—সময় নষ্ট ? কন কি ?—আমার দ্বারা এই কার্য্য সম্ভব নয়। দেখেন মিসেস বাসু—আপনারে কিছুই করতি হবে না—ক্যেবল এইখানডায় একডা সিগনেচার করলেই আমি যাইবার পারি—আপনার সহানুভূতি পাইলেই—আমাগোর ব্যাবসার বিশেষ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। ক্যেবল একডা—

লীলা—না না, আমি সই করবো না—আপনি তো আর জোর ক'রে আমাকে সই করিয়ে নিতে পারেন না—

চাকলাদার—আইজ্ঞা, জোর করবার পারি না কিন্তু ইসে—কি কই—অনুরোধ তো করবার পারি—যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার এই গরীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করেন—

লীলা—কৃপা কি বলছেন—আমি ঘৃণা করি—আমি—

চাকলাদার—শুনেন মিসেস বাসু—আপনাদের ঘৃণা পাইলেও মানবজনম ধন্য হইয়ে যায়, যদি ঘৃণা কইরাও একবার সইডা করেন আমি কৃতার্থ হই—আপনার সইডার উপর আমার ভবিষ্যতডা ঝুলছে—এই সইডা পাইলেই আমার যে কি প্রকার উপকারডা হইতে পারে—সেডা বুঝবার পারলে—

লীলা—খুব পেরেছি বুঝতে—বোঝবার আর বাকী কিছু নেই—মোট কথা, আপনি যান—আমি আপনাদের মেম্বার হ'ব না—হতেও চাই না—যান, আর বিরক্ত করবেন না—আমার কাজ আছে—যান, মিষ্টার বাসু এখনই এসে পড়বেন। জানেন তো তাঁর সামনে পড়লে এবার আর রক্ষা নেই—(বিকাশের প্রবেশ) এই যে বলতে না বলতে এসে পড়েছো, এই দেখ না—

বিকাশ—দেখবো আর কি, তুমিই দেখ—যা করে বেড়াচ্ছো—এই রকম কত মহা-মহারথীর আগমন হ'বে—তার ঠিক কি ? আমি কি করবো বল।

লীলা—কি আর করবে,—উপস্থিত তো বাঁচাও—তার পর আর আর রথিবৃন্দের যাতে আগমন না হয় তার ব্যবস্থাই করা হবে।

চাকলা—নমস্কার মিষ্টার বাসু, আমার প্রতি যদি অনুগ্রহটা—

বিকাশ—কি চান? কিসের অনুগ্রহ—

চাকলা—আইজ্ঞা—আমার আর্টিষ্ট—

বিকাশ—Hang your Artist a disturbing element Domn your আজ্ঞা—

চাকলা—আহা চটেন ক্যেন ম'শায়, যদি আমার বক্তব্যডা একবার দয়া করি শুনেন।—

বিকাশ—কোন কথাই শুনবো না—শুনতে চাই না—আমার বাড়ী থেকে আপনি এখনি চলে যান—নতুবা—পুলিশ ডেকে—

চাকলা—হঃ, পুলিশ ডাকবেন ক্যেন, আমি কি যাইব না কইত্যাছি, যাইত্যেছি—কিন্তু সইড়া—

বিকাশ—Damn সই—যান—যান বলছি—

চাকলা—আইজ্ঞা—আইজ্ঞা—

বিকাশ—যান, আমার সময় নষ্ট করবেন না—

চাকলা—আপনার অমূল্য সময় আর নষ্ট করবো না—এখন যাইত্যেছি—কিন্তু কাল আবার আসবো, নমস্কার—(প্রস্থান)

বিকাশ—উঃ! কি অবষ্টিনেট—

লীলা—আবার কাল আসবে বলে গেল যে—

বিকাশ—বেশ তো—মেম্বর হওনা—ওরিএন্টাল Darce করবে। তখন জানা ছিল না। সত্যি আমার কি মনে হয় জান—

লীলা—কি—কিসের কি মনে হয়—

বিকাশ—এই তোমাদের এই so called স্বাধীনতার—

লীলা—অর্থাৎ—তার মানে?

বিকাশ—তুমি মনে করো না, তোমাদের এই স্বাধীনতায় আমি বাধা দিচ্ছি—তুমি পার্কে বেড়াও—নাচের আসরে যাও—আমার আপত্তি নেই—কিন্তু এটা ঠিক জেনো লীলা, এটা স্বাধীনতা নয়, যথেচ্ছাচার। এতে মানুষ ঠিক থাকতে পারে না—আর একে সাহায্য করে রূপ—জেনে রেখো মেয়েমানুষের রূপই হ'ল প্রথম শত্রু—তার সাক্ষী এই দেখ না, এই ভূতটার ব্যবহার—তোমার রূপই ওকে আকৃষ্ট ক'রে এনেছে এখানে। এতটা নিজের উপর বিশ্বাসও ভাল নয়—তোমাদের ঐ আগুন-লাগান রূপে পুরুষ-পতঙ্গরা এসে যদি পুড়ে মরতে চয়, তাদের কি তুমি বাধা দিতে পার লীলা? সাধ্যি কি?

লীলা—মানে, সাধ্যি নেই কেন, নিশ্চয় আছে—কেন পারবো না বাধা দিতে।—ধ'রে নিলাম আমরা আগুন—আগুনকে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলেই পতঙ্গ কাছে আসে না। আর এক কথা, আগুনেরই দোষ কি বল—তা'রা তো আর পতঙ্গকে ডেকে আনে না—তারা আপনিই আসে—আপনিই ছাই হয়—আগুনের ক্ষতিই বা কি—আর তাতে তার কিই বা বয়ে গেল—

বিকাশ—ক্ষতি হয়, তুমি জান না—আগুনেরও পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারবার একটা প্রবল বাসনা থাকে—এই পুড়িয়ে মারতে পারলেই তাদের আনন্দ। তাই বলছি আমার ভয় হয় লীলা, কোন্ দিন তোমার ঐ আগুন লাগান রূপে আকৃষ্ট হয়ে চাক্‌লাদার না হোক ওর চেয়েও কোন ইন্‌টেলিজেন্ট—

লীলা—থাম—আর নয়—তুমি খুব সমঝদার—এ-সব লেকচার তোমার কলেজে গিয়ে দিও—ছাত্রেরা ভাল বুঝবে—আমি মুখ্যু মেয়ে মানুষ, এত বড় বড় আইডিয়া (idea) মাথার মধ্যে নিতে পারবো কেন।—আমার যা খুসী তায় করবো। সত্যি বলছি, আমার মনের উপর এইসব পতঙ্গদের কোন প্রভাবই খাটবে না—বিশ্বাস কর—জীবনে একমাত্র ভালবেসেছি—তোমাকে।—আমাকে সন্দেহ করা তোমার অন্যায়,—ছি!—আমি জানি তুমিই আমার হৃদয়রাজ্যের একমাত্র অধিকারী,—আমি জানি সতী কি?

বিকাশ—ছাই জান—সতীর defination হ'ল, "মনসা কর্ম্মণা-বাচা"—মন-কর্ম্ম বাক্যদ্বারা স্বামীর অনুগমন করা—তাকে ভালবাসা।—আজকাল বস্তুতঃ কোন মেয়েই জোর ক'রে এ-কথা বলতে পারে কি? আমার মনে হয় পারে না।

লীলা—কি যে বল,—কেন পারবে না—এর জন্যে কি চেষ্টা করতে হয়—আমরা হিঁদুর মেয়ে। ভুলে যাচ্ছ কেন। যে মাটীতে সীতা-সাবিত্রী জন্মেছে আমাদেরও জন্মভূমি সেই মাটী—আমাদের প্রত্যেক হিন্দুনারীরই মজ্জাগত ঐ একই আদর্শ। আর একটা কথা ব'লে দিই জেনে রেখো—যে ভালবাসে সে বাক্য-মন-কর্ম্মের দ্বারাই ভালবাসে।

বিকাশ—পাগল নাকি? চারিদিকের এই দূষিত আবহাওয়া—আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে এমন তো দেখি না।

লীলা—দেখবার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই দেখতে পাও না—একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে। আচ্ছা, তোমায় দেখিয়ে দোব একদিন। যাক্ এখন এ-সব কথা—তুমি খুব তার্কিক তা আমি জানি, তোমার ফিলোজফি—তোমার সাইকোলজি সবই আমার জানা আছে—আমার কথা শোন, বহুবার বলেছি—আবার

বলছি, তোমার এই স্বভাবটা ছাড়।—আমার মধ্যে সত্যি সন্দেহ করবার মত কিছুই নেই।—আমায় ঘাঁটিও না—সত্যি বলছি ঠকে যাবে—এমন শিক্ষা পাবে যে, জীবনে কোনদিন কোন মেয়েকে আর সন্দেহের চোখে দেখবে না।

বিকাশ—বেশ, সেই শিক্ষা পাবারই আশায় রইলাম, লীলা।—

লীলা—তাই থাক গে—তুমি আমার অনেক সময় নষ্ট ক'রে দিয়েছো—তিন দিন পরেই সো (show), গানগুলো এখনও ভাল তৈরী হয় নি—আজ আবার final Rehearsal দিতে হবে—বারকতক গেয়ে নিয়ে এখনি প্রতিমা দি'র বাড়ী যেতে হবে—তোমারও তো এখনও কলেজের দেরী আছে—বস না—শোন, গানটা কেমন হয়েছে?

বিকাশ—আচ্ছা, তা না হয় শুনছি কিন্তু এর একটা মীমাংসা আমায় করতেই হবে—

লীলা—সে যা হয় পরে করো—এখন চুপটী ক'রে বসে গান শোন তো?

বিকাশ—আচ্ছা, গাও—আমি আর কি বুঝবো—

লীলা—বুঝবে ছাই—আমার মাথা—যেখানটা ভাল লাগবে না—আমায় বলো—মন দিয়ে শোন—

বিকাশ—বেশ, গাও—

লীলা—তোমারে ধরা দিব

লুকোচুরি খেলবো না আর;
মনের মাঝে সকাল-সাঁঝে
যে বেদনা সদাই বাজে
শেষ যে প্রিয় করবো এবার
লুকোচুরি খেলবো না আর॥
উতল পবন দখিনা বায়
মিলন-কথা শ্রবণে শুনায়
তোমার সাড়া না পেলে হায়
বৃথাই হবে জীবনভার।
লুকোচুরি খেলবো না আর॥
নাও বা না নাও দেবার কথা
দিয়েই যাব সইবো ব্যথা
হৃদয় জুড়ে আছ প্রিয়
দুখের মাঝে সুখের স্বপন
তুমি আমার তুমি আমার
লুকোচুরি খেলবো না আর॥

বিকাশ—চমৎকার—আচ্ছা লীলা—

লীলা—এইরে! আবার বুঝি লেকচার সুরু হ'ল—না তুমি আমায় পাগল না করে ছাড়বে না দেখছি—

বিকাশ—সত্যি লীলা—প্রেম কি এমনি জিনিষ—যে নাও বা না নাও দেবার কথা দিয়েই যাব—প্রতিদান কিছুই চাইবো না—আমার বোধ হয়, ঠিক তার উল্টো—প্রেম চায় প্রেম—

লীলা—না গো না প্রেম কিছুই চায় না—প্রেম ও না—

বিকাশ—কিন্তু আমাদের যে বিয়ে—তাতে প্রেমের স্থান কোথা—ধরে বেঁধে বাপে মায়ে একটা বিয়ে দিয়ে দিলে—জানা নেই শোনা নেই—হয় তো মনের মতন হ'ল না—সেখানে কেমন করে প্রেম হ'তে পারে—কেমন করে কেবলই দিয়েই যেতে পারে।—আমার তাই ভয় হয়, হয়ত আমাকে তোমার পছন্দ হয় নি—হয়ত আমি তোমার ঐ ভুবন-ভোলান রূপের সম্পূর্ণ অযোগ্য—আমায় কি তুমি যথার্থই ভালবাসতে পেরেছো?

লীলা—না না, পারিনি পারিনি পারিনি—এরশবার বলছি পারিনি।—তুমি প্রফেসার হ'লে কি হবে, একটা গণ্ডমূর্খ—তোমার এই সব বিদ্‌ঘুটে আইডিয়া ছাড় বলছি শোন, আমি তোমায় খুব ভাল বাসি খু-উ-ব—ঠাট্টা নয়—সত্যি বলছি এমন ভাল বোধ হয় নিজেকেও বাসি না।—চল তোমার কলেজের দেরী হয়ে যাবে—

বিকাশ—আমায় তাড়াতে পারলেই বাঁচ দেখছি—আমি না গেলে বুঝি—তোমার প্রেম করবার সুবিধে হয় না?

লীলা—না তোমায় আর পারলাম না দেখছি—আবার আরম্ভ করলে।—দেখ, আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু এ রকমের কথা তোমার মুখ থেকে শুনলে আমার অসহ্য বোধ হয়।—ছি, ছি,—তুমি না সাইকোলজির লেক্‌চার দাও—আর আমার মনের এই ছোট্ট সাইকোলজিটা বুঝতে পার না। ও সব কথা মুখে বলা তো দূরের কথা, মনে আনাও পাপ—চল, আজ আর আমার যাওয়া হবে না দেখছি—প্রতিমাদিকে চিঠি লিখে দিই।

বিকাশ—সে কি—না না চল, চল—রাগ করো না লক্ষ্মীটী—ক'টায় যেতে হবে?

লীলা—ঠিক ছটো—এখনই তো ছটো বাজতে ১০ মিনিট—

বিকাশ—তবে যথেষ্ট সময় আছে—এই তো মোড়ের মাথায়—কতক্ষণই বা লাগবে—চল, চল—তোমায় ছেড়ে দিয়ে কলেজ যাব—আমারও ২॥০টায় ক্লাস (Class)—এস—

লীলা—চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য—

(কলেজ—মিঃ বাসুর চেম্বার—হীরেন বসিয়া আছে—মিঃ বাসুর প্রবেশ)।

হীরেন—নমস্কার।

বিকাশ—এই যে হীরেন, কতক্ষণ? বসো বসো—তোমার ছবিখানা আমি পেয়েছি—Thanks, আজই বাড়ী যাবে নাকি?

হীরেন—না Sir আজ আর যাওয়া হ'ল না—জ্ঞানের পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমায় থাকতেই হবে।—দু'জনে এক সঙ্গেই যাব। ভাল লাগে না—ভেবে পাচ্ছি না—কি করি—এই জন্যে এলাম আপনার কাছে—বলুন না Sir কি করা যায়।

বিকাশ—কি আর করবে।—দিন কুড়ি তো—বেড়িয়ে বেড়ালে কাজ হবে—এইখানিক Experience gains করবে তবু—

হীরেন···Experience Sir খুব হয়েছে—আর কাজ নেই।

বিকাশ—সে কি কে, বল কি—যতদিন বাঁচবে, শিখবে—এখনও কত জানবার বাকী। বাড়ী গিয়েই তো বিয়ে—তোমার দাদা তাই ব'লে গেছেন—পাত্রীও নাকি ঠিক হয়ে গেছে—কোথায় বিয়ে হ'ল? মেয়েটি দেখেছো?

হীরেন—না—

বিকাশ—The idea,—তুমি ভাবছিলে—কি ক'রে সময় কাটাবে—আমার কথা শুনবে?—

হীরেন—কোন দিন না শুনেছি Sir।

বিকাশ—তবে এক কাজ কর—Love জিনিষটা কি, তাই এ ক'দিনে শিখে ফেলো।—লোকে বিয়ে করার পর প্রেম শেখে—তুমি তার আগেই শিখে নাও।

হীরেন—হাঃ হাঃ হাঃ, ঠাট্টা করছেন Sir?

বিকাশ—না না—আমি Serious, তুমি প্রেম জিনিষটা শিখে নাও—

হীরেন—সে আবার কি Sir, Love কি অমনি শেখা যায়, নাকি Loveটা—লেখাপড়ারই মত শেখবার জিনিষ।

বিকাশ—শেখবার জিনিষ না হ'লে—এত Lecture এত বই—এত গবেষণার কোনই অর্থ হয় না হীরেন।

হীরেন—এ সবই Theory—

বিকাশ—হ্যাঁ Theory—তাই তো বলছি Practical Loveটা তুমি কেন শেখো না—বিয়ের আগেই তোমায় একজন অভিজ্ঞ Practical প্রেমিক ক'রে দিতে চাই—"

হীরেন—Practical Love? কিন্তু প্রেম তো ভার, উদার আকাশের সঙ্গে হবে না—

বিকাশ—No, No, আমি জানি আকাশ-বাতাসের সঙ্গে প্রেম হয় না। প্রেম করতে হ'লে একটা আধার চাই। তা আধারের আর ভাবনা কি—আজকাল পথে-ঘাটে, Bus-এ, ট্রামে কত রং-বেরঙের আধার দিবারাত্র শোভমানা—হাঃ হাঃ হাঃ।

হীরেন—হ্যাঁ—বেশ বলেছেন Sir; সেই সব আধারের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে মার খেয়ে বেকুব-বনে বাড়ী যাই আর কি?

বিকাশ—না না—সে দিনকাল আর নেই—মেয়েরা আজকাল স্বাধীন—Free Love আজকাল ছড়াছড়ি। ইচ্ছা করলেই Love করা যায়—এ-যে Free Love-এর যুগ।

হীরেন—কথাটা Sir মিথ্যে বলেন নি—কিন্তু—

বিকাশ—কিন্তু কি—কোন ভয় নেই। তুমি এক কাজ কর—পর্দা পার্ক নিশ্চয় জান—আজই সন্ধ্যায় গেটের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক। যাকে সব চেয়ে ভাল বলে মনে হবে—অর্থাৎ এই মানে যাকে তোমার ··· হবে—তাকে follow করবে—বাড়ীখানা চিনে আসবে—তারপর কি করতে হবে আমি ব'লে দেবো—এই হ'ল first lesson.

হীরেন—বুঝলাম সবই—কিন্তু Sir ভদ্র লোকের কি এই কাজ—

বিকাশ—তা নয় জানি কিন্তু আজকালকার মেয়েদের আর তাঁদের অভিভাবকদের যেমন দেখছি—তাতে এর মধ্যে কোন দোষই নেই। আমি চাই তাদের একটু শিক্ষা দিতে—

হীরেন—কিন্তু শিক্ষাটা যদি উল্টো দিকে হয়—

বিকাশ—তার ভাবনা কি—আমি আছি—

হীরেন—তা তো আছেন—কিন্তু আমার যেন কেমন বেয়াড়া লাগছে Sir,

বিকাশ—আমারও যে লাগছে না তা নয়—তবে এটা একটা নূতন আইডিয়া—অন্ততঃ আমার জন্যে তোমায় এটা করতেই হবে হীরেন।—আমি একবার দেখতে চাই যে, এই নারী-স্বাধীনতার কতখানি অপব্যবহার মেয়েরা করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাহ্যিক সাধুতার মুখোসটাও খুলে দিতে চাই—বলে, কি জানো—তারাও সীতা সাবিত্রীর মতই সতী—

হীরেন—তা আমাকে দিয়ে নতুন কি দেখাবেন Sir, এ তো নিত্য কাগজে দেখছেন।

বিকাশ—তা দেখছি কিন্তু আমি চাই first hand information—তোমায় করতেই হবে।—

হীরেন—আপনি যখন এত ক'রে বলছেন—আমি

স্বীকার হ'লাম—কিন্তু শেষটা যদি কোন গোলমাল হয় আপনি সামলাবেন।

বিকাশ—আমি তোমায় assurence দিচ্ছি, কোন গোলমালই হবে না—ভয় কি—young man. Go ahead, এই যুগে একটা নূতন কিছু হবে—আজ থেকেই কাজ আরম্ভ কর।

হীরেন—আচ্ছা—তাই—আজ থেকেই সুরু করবো—কিন্তু সার, পারবো তো—

বিকাশ—যদি কেউ পারে, তবে তুমিই পারবে—ভয় নেই—

হীরেন—ভয় নেই, তবে ভরসাও দেখি না। শুধু Sir আপনার জন্যে এই কাজে রাজী হ'লাম। আচ্ছা, আজ তবে যাই—

বিকাশ—এস—হ্যাঁ দেখ—একটু সাবধানে কাজ করবে—এখন কারুকে বলো না—

হীরেন—যে আজ্ঞা, নমস্কার—

বিকাশ—Cheerie, Wish your success young man.

(হীরেনের প্রস্থান)

চমৎকার Scheme, ঠিক হয়েছে, দেখতে চাই—লীলাকেও দেখাতে চাই—আজকালকার মেয়েরা কেমন।

(লীলার প্রবেশ)

এই যে লীলা—এইমাত্র তোমার কথাই মনে হচ্ছিল।

লীলা—তবু ভাল—দাসীকে তোমার মনে পড়ে প্রাণনাথ—

বিকাশ—চুপ চুপ—এটা কলেজ—

লীলা—ওঃ! আমি মনে করছিলাম যে আমাদের Drawing Room.

বিকাশ—আজ যে একেবারে College-এ হাজির—ভালই হয়েছে। আজ আর আমার Class নেই, চল বাড়ী যাই—তোমার Rehearsal এরই মধ্যে হয়ে গেল ?

লীলা—মণিবাবু সকাল সকাল চলে গেলেন—তাঁর কি কাজ আছে—কাল আবার বেলা ১টায়—শনিবার শো (show) মাঝে আর ক'টা দিন এইটে হয়ে গেলেই বাঁচি। চল বাড়ী যাই।

বিকাশ—চল যাই—আজ এক মজার Plan মাথায় এসেছে। তোমাদের সতীপণা কতখানি টেঁকসই তাই দেখাবার জন্যে আমার এক ছাত্রকে দিয়ে একটা Practical experiment করিয়ে নিচ্ছি।—তাকে বলেছি প্রেম শিক্ষা কিন্তু মূলে আমার কি উদ্দেশ্য বুঝেছো নিশ্চয়।—চল যেতে যেতে বলবো।—

লীলা—বটে, প্রাণনাথ, এইমাত্র শ্রীমুখে শুনলাম যে এই স্থানটির নাম কলেজ—আমাদের Drawing Room নয়—আজকাল কলেজে বুঝি এই হয়—তা' বেশ।—এখন এই ছাত্রটি কে ?

বিকাশ—হীরেন গো হীরেন—সেই যে সেদিন যার ছবিখানা নিয়ে গেছি—এইবার সাইকোলজিতে First হয়েছে—

লীলা—ও! বুঝেছি—আহা তার মাথাটা তুমি বুঝি এমনি করেই খাচ্ছ—বাহবা Brewo প্রাণনাথ—অভিনব পরিকল্পনা—এমন নইলে গুরু।—

বিকাশ—থাম, থাম,—চুপ চুপ—

লীলা—তোমার দেখছি চিকিৎসার প্রয়োজন Dr. Bose-কে একবার Call দিয়ে—তোমাকে ভাল করে একবার পরীক্ষা করান দরকার।

বিকাশ—আমায় পরীক্ষা করা দরকার মোটেই নেই—তোমাদের ভালবাসার পরীক্ষা—চল চল—

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

পর্দাপার্কের ভিতর: সুসজ্জিত মহিলাগণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। লীলা ও প্রতিমার প্রবেশ।

লীলা—আমার কথা তো তোমায় সবই বললাম।—আজকাল দেখছি এই এক নতুন বাতিক হয়েছে—এমন উপদ্রব যদি আর দিন কতক চলে, তবে হয় আমি পাগল হয়ে যাব, নয় তোমার ভগ্নীপতি পাগল হবেন। আবার মজার কথা—তিনি তাঁর এক ছাত্রকে দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দিতে চান যে আজকালকার মেয়েদের সতীত্ব বলে কিছু নেই—আর তাদের স্বাধীনতাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

প্রতিমা—কথাটা অবশ্য নেহাৎ অসার নয়—বিকাশ ঠিকই বলেছে—দিন দিন যা হবে উঠছে—আমাদের আবার ঘরের কোণে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

লীলা—সে যখন হবে তখন হবে, তাই বলে—আমি কেন এতটা সহ্য করবো।

প্রতিমা—তা সেই ছাত্রটীকে তুই চিনিস নাকি।

লীলা—সেও আবার এক মজা—ছাত্রটা আমারই would be ভগ্নীপতি—কর্তা এ-কথা জানেন না—যে শ্রীমান্ তাঁরই হবু ভায়েরা ভাই—কমলীর সঙ্গে কথাবার্তা সব স্থির—ছেলেটীর দাদার সঙ্গে আমার দাদার এই বিয়ের কথা একবারে পাকা, এমন কি দিন স্থির; আসছে বৈশাখে বিয়ে—

প্রতিমা—তবে তো মজাই হয়েছে—তুই কেন তাকে

দিয়েই বিকাশকে উল্টো শিক্ষা দিয়ে দে না—হবু ভগ্নীপতির সঙ্গে আলাপ নেহাত সম্পর্কবিরুদ্ধও হবে না, দেখেছিস তাকে—

লীলা—দেখেছি ছবিতে—আজই এখানে ঢোকবার সময় দেখেছি রাস্তার ও-পারে চোরের মত দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতিমা—তবে আর কি—

লীলা—মানে—তোমার মতলবটা কি—ও: বুঝেছি—ঠিক হয়েছে—এইবার বাছুকে একটু বিশেষ রকম শিক্ষা দিতে হবে—দিদি তোমার পায়ের ধুলো দাও—তোমার বুদ্ধির তারিফ করি—বাহবা—বেশ হবে—

প্রতিমা—অত লাফাস্‌নি—আয় ঐ বেঞ্চিটায় বসে একটু পরামর্শ করা যাক্।—(উভয়ে বেঞ্চে উপবেশন করিলেন।)

(কতিপয় তরুণী প্রবেশ করিলেন)

উমা—আজ ভাই আর ছাড়ছি না—তোমায় গান গাইতেই হবে হাসি—

হাসি—না ভাই, এই মাঠের মাঝে—কত অচেনা মহিলারা আছেন—এখানে কি গান গাইবার সুবিধা হয়। তা' ছাড়া এত লোকের মাঝে লজ্জা করে যে—

সুপ্রভা—হাঃ। লজ্জা আবার কি—এখানে আমরা সবাই স্বাধীন জেনানা—যার যা ইচ্ছা তাই করবো—কাউকে Care করি না—গা-না তুই।

হাসি—আচ্ছা ভাই গাইছি কিন্তু সুপ্রভা দি—তোমাকে আমার সঙ্গে গাইতে হবে—কোন গানটা গাইবো—

উমা—সেই বসন্তের গানখানা—

হাসি—আচ্ছা—সুপ্রভাদি—

সুপ্রভা—তুই ধর না—আমি গাইছি—

হাসি—এস বসন্ত জাগো বনে।

মদির গন্ধ, পবন আনন্দ
ঢাল সুরভিত উপবনে॥
উল্লাসে ধরা মাতোয়ারা
চঞ্চল যেন প্রিয়াহারা—
মধুপ ছুটিছে প্রিয়া মিলনে॥
ফুলতরু-শাখে আজি বিহগ জাগে
বিরহ সাধনা মিলন মধুর রাগে
আজি শীতল কর জীবনে।
এস মন-বন-ভবনে॥

উমা—চমৎকার গলা ভাই তোমার—আর একদিন তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুনবো।

হাসি—বেশ তো, এস না একদিন—

উমা—আজ তা' হলে আসি ভাই, সন্ধ্যা হয়ে এলো।—

সুপ্রভা—আমার আবার মাষ্টার এসে বসে থাকবে।—

হাসি—চল ভাই আমিও যাই।—

(সকলের প্রস্থান

লীলা—তা' হ'লে তুমি একবার দেখবে নাকি।—নেহাত গো-বেচারা বলেই তো বোধ হ'ল।—তোমার ভগ্নীপতির পাল্লায় গোল্লায় যাবার আর দেরী নেই।—

প্রতিমা—ও আর দেখবো কি—একবারে প্রফেসার সাহেবের অন্দর-মহলে গিয়েই দেখবো।

লীলা—এখন কারুকে কিন্তু ব'ল না দিদি—এমন কি জামাইবাবুকেও নয়—

প্রতিমা—সে আবার বলতে—এমন একটা surprise—আগে থেকে বললে সমস্ত মজাটাই মাটী হ'য়ে যাবে।

লীলা—যাক, এদিক তো একরকম ঠিক হ'ল—এইবার আমাদের Showটার কি হবে—মাঝে আর একটা দিন।

প্রতিমা—সে ঠিক হয়ে যাবে—তোর ভাবনা নেই—সবই তো তৈরী—

লীলা—তোমার তো ঐ এক কথা, সবই তৈরী—আমি কিন্তু আজ থেকেই নার্ভাস হয়ে পড়ছি।

প্রতিমা—কিছু না—চল বাড়ী যাই—

লীলা—চল না, আমার বাড়ী হয়ে যাবে—আজ আবার কর্ত্তার কি পার্টি আছে—কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই—অমনি গান করা Reheasal দিয়ে নেওয়া যাবে।

প্রতিমা—তাই চ—এক কাজে তিন কাজ হবে—তোকে পৌঁছান—শ্রীমানকে দেখা, আবার Researsal—তবে আমায় একঘণ্টার ভেতর ছেড়ে দিতে হবে—তোর জামাইবাবু বলে দিয়েছেন—আজ সকাল সকাল যেতে।

লীলা—না না, তোমাকে আমি বেশীক্ষণ রাখবো না—আহা তিনি পথ চেয়ে থাকবেন, আর আমি এই ছাই-পাঁশ Reseaasal-এর জন্যে কি তোমায় আটকে রাখতে পারি?

প্রতিমা—মুখে আগুন তোমার পোড়ারমুখী—চল—

লীলা—চল— (উভয়ের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ

এক দিক

শ্রীসুনীলচন্দ্র রায়

শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে শুনেছিলুম একদিন রবীন্দ্রনাথকে বহু মূল্য হীরক খণ্ডের সঙ্গে তুলনা ক'রতে। অত্যুজ্জ্বল কোহিনুর মণি অসংখ্য দিক থেকে কর্তিত, বহুকৌণিক এবং সেই অজস্র কোণগুলির প্রত্যেকটি থেকে জ্যোতির কণিকা বিচ্ছুরিত হচ্ছে— রবীন্দ্রনাথ যেন একটি কোহিনুর মণি, বহু বিচিত্র তাঁর প্রতিভা ও অভিব্যক্তি। অসংখ্যদিক থেকে তাঁকে দেখা যায়, বোঝা যায়। এত দিক আছে তাঁর যে সারাজীবন ধ'রে যদি কেউ রবীন্দ্রনাথকে দেখে তবুও তাঁকে দেখে শেষ ক'রতে পারবে না। কথাটা যে একটুও বাহুল্য নয়, তা যারা এল্মহার্ষ্টের রবীন্দ্র-জীবনী লেখবার প্রচেষ্টার কথা জানেন তাঁরাই স্বীকার ক'রবেন। রবীন্দ্রনাথের অসীম অনন্ত দিকের একটি মাত্র দিককে আমি এই প্রবন্ধে দেখবার চেষ্টা ক'রেছি—সেটি হ'চ্ছে অশ্রুজলে চিরশ্যাম ধরণীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের সীমাহীন প্রেমের দিক।

এই পৃথিবীকে রবীন্দ্রনাথ অতি গভীর, নিবিড় ভাবে ভালবেসেছেন। পৃথিবীর বহু কবিই এই ধরণীকে ভাল বেসে গেছেন, তার বন্দনা-গান ক'রেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এমন আত্মহারা হ'য়ে জীবনের সমস্ত চেতনা দিয়ে পৃথিবীকে এমনভাবে ভালবাসতে বোধ হয় কেউ পারেন নি। জীবনের প্রভাত থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত এই ধরণীর সৌন্দর্য্য, তার আকাশ-বাতাস, মাটি, তার আলো, ছায়া, গাছ-পালা—তাঁর কবি-মানসকে অপূর্ব্ব আনন্দ দান ক'রেছে, নিত্য নূতন বিচিত্র রূপে ও রসে কবি-হৃদয়কে হিল্লোলিত, মঞ্জরিত ক'রে এসেছে। বিশ্ব সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের একান্ত একাত্মতা তাই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন রাগিণীর মত বেজে চ'লেছে।

'ছিন্নপত্রে'র একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমি বেশ মনে ক'রতে পারি বহু যুগ পূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা ক'রচেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিন রাত্রি দুলচে এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলচে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান ক'রেছিলুম। নব শিশুর মত একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্য রস পান ক'রেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হ'ত। যখন ঘনঘটা ক'রে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মত স্পর্শ ক'রত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি——আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল প'রে ঐ নদীতীরে শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন—আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়চি।"

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এমন নিগূঢ় একাত্মতা জগতের আর কোন কবি প্রকাশ ক'রচেন ব'লে ত' জানি না। রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বপ্রেমিক সে শুধু বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর প্রীতির জন্যই নয়—বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিও তাঁর প্রেম অফুরন্ত। আর এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির অন্তরের যোগ রবীন্দ্র-সাহিত্যের সব চেয়ে বড় কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিশ্বলীলার সঙ্গে একাত্মবোধের ফলেই কবির 'মানস-তরঙ্গ'তলে বাণীর সঙ্গীত-শতদল বিকশিত হ'য়ে ওঠে।

অস্পষ্ট ও অস্ফুটরূপে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ পেলেও ধরণীর প্রতি নিবিড় প্রেমের অনুভূতি প্রথম সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ পেলো তাঁর 'ছিন্নপত্রে'র পত্রগুলিতে, গল্পগুচ্ছের গল্পে ও 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' যুগের কবিতায়। রূপে পুলকিত যে ধরার মাটি চোখের সামনে লুটাচ্ছে, কবি তাকে দেখলেন ও আঁকলেন। বললেন—

> শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
> চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে
> সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
> ভ'রে আসে আঁখি জল।
> বহু জনমের প্রেম দিয়ে ঢাকা
> বহু দিবসের সুখে-দুখে আঁকা
> লক্ষযুগের সংগীতমাখা
> সুন্দর ধরাতল।

এই অপরূপ অনুভূতিই কবির জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী দান ক'রেছে, এই অনুভূতিকেই তিনি দুঃখ সুখের লক্ষধারা পাত্র ভ'রে পান করিয়েছেন, এরই চরণে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধের ধন অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফল বাসনারাশি অর্পণ ক'রেছেন, এই অপূর্ব্ব অনুভূতিই কবির প্রাণলক্ষ্মী—যাকে শুধু উপলব্ধি করা যায়, দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না।

ধরণীর প্রতি প্রেম কবির কাছে এত সত্য এবং এত

বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে যে, 'খেয়া' 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' 'গীতালি'র অধ্যাত্মবোধের মধ্যেও তা বিলীন হ'য়ে যায় নি। মাটির প্রতি প্রেম কবির কাছে ভগবৎপ্রেমের চেয়েও বড় হ'য়ে উঠেছে। যৌবন-বেদনা রসে উচ্ছল দিনগুলি কবির জীবনে আবার ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ যে মানবজীবনের কবি, এই ধূলি মাটির কবি ধরণীর দেবতার চেয়ে ধরণীর জীবনই তাঁর কাছে অধিকতর প্রিয়—তারই পরিচয় পেলুম 'পূরবী'র কবিতায়—

এই যে দেখা এই যা ছোঁয়া; এই ভালো এই ভালো
এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গা যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি ডুব দিয়েছি ঘট ভ'রেছি নিয়েছি বিদায়।
এই ভালোরে প্রাণের সঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।

ধরণীর ধূলি মাটি, তৃণ-তরু, আলো-ছায়ার মধ্যে কবি-মানস গানে, গন্ধে, রসে, রূপে, প্রেমে ও আনন্দে অপূর্ব্ব রসময় হ'য়ে উঠল। এতদিন যেন তিনি এখানে পরবাসী হ'য়ে ছিলেন, সেই অতীত দিনের বাঁশি হারিয়ে ফেলে কবির সারা প্রাণ নিঃশ্বসিয়া উঠছিল—এমনি অবেলায় কবি আবার তাঁর সেই অপূর্ব্ব জীবন ফিরে পেলেন—"মাটির ডাক" পেলেন—

আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ
ছয় ঋতু ধায় আকাশ তলায়
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হ'তে না রইলো ব্যবধান।

জীবনের যে লীলাসঙ্গিনী কবিকে কাজে ফেলে কোন্ দূরে চলে গিয়েছিলো, সে আবার ফিরে এল, কঙ্কণ-ঝঙ্কারে কবেকার চেনা সুরে কবিকে আবার সে ডাক দিল। কবি যাকে বার বার খুঁজছিলেন, জীবন-গোধূলীতে তারই আহ্বান পেলেন—তার চেনার আলোকে নিজেকে নূতন ক'রে চিনলেন :—

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে, মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া
দীপখানি তুলে ধ'রে মুখে চেয়ে ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হ'তে মৃত্যুর আঁধারে
চ'লে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হ'তে অকস্মাৎ করো মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝিনা যে।
তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি গান গেয়ে উঠে—
"আছি আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি
বাঁচি আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গ'লে আসে
নৃত্য-কলরোলে॥

কবির মনে প্রশ্ন জাগে—

আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস-প্রতিমাগুলি?

হ্যাঁ, তাই। কবি নিজেকে নূতন ক'রে উপলব্ধি ক'রলেন, বিশ্বের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর নিবিড় চলাচলের যোগ নূতন ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, ধরণীর প্রেমের কবির কাব্য অপূর্ব্ব রহস্যময় ও রসঘন হ'য়ে উঠল, কবি নূতন ক'রে এই পৃথিবীর গান গেয়ে গেলেন, গান রেখে গেলেন আগামী দিনের মানুষের জন্য।

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভ'রবে আমের বোলে
তখন আমি কোথায় যাব চলে?
পূর্ণচাঁদের আসবে আসর মুগ্ধ বসুন্ধরা
বকুল-বীথির ছায়াখানি মধুর মূর্চ্ছাভরা;
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলনমালা গাঁথা
হ'য়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা;
সেদিন আমি আসবো না তো নিয়ে আমার দান
তোমার লাগি রেখে গেলাম গান॥

'পূরবী'-উত্তর জীবনেও কবির এই অপরূপ অনুভূতি, ধরণীর প্রতি প্রেম ম্লান হয়নি। 'সেঁজুতি'তে ধরণীর প্রতি নিবিড় প্রেম অত্যন্ত সহজ ও অপরূপ কয়েকটি কথায় ফুটে উঠেছে—

এই যে শিমুল এই যে সজিনা আমারে বেঁধেছে ঋণে
কত যে আমার পাগলামী পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে থাকা মধুর মৈতালিতে
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।
সকাল বেলার প্রথম আলোয় বিকাল বেলার ছায়ায়
দেহ-প্রাণ-মন ভরেছে সে কোন অনাদি কালের মায়ায়

পেয়েছি ওদের হাতে
দূর জনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে।

আরেকজায়গায় তিনি বলছেন—

"আমি ভালোবাসি অরণ্য, বড়ো বড়ো গাছ বনস্পতি। আমার যে কী ভালো লাগে বলতে পারিনে তার ছায়া প্রাণ মাতিয়ে তোলে। অনেকে আবার তা সহ্য ক'রতে পারেন না। যখনি দেখেন গাছ বড়ো হোলো—কি, কাটো তাকে। ঐ একটু একটু গাছে একটু একটু রং, ঐ নিয়েই তারা খুশী। আমি কতবার চেষ্টা ক'রেছি বড়ো গাছ তৈরী ক'রে আমি তার তলায় সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যেয় ঘুরে বেড়াব। রবীন্দ্রনাথ বিহ্বল চিত্তে তার তলায় কবিত্ব ক'রবেন; কিন্তু এ জন্মে তা আর হ'লে না। আসছে বারে আমি ঠিক Forest Officer হ'য়ে জন্মাব। আশ্চর্য্য, বড়ো গাছের মাথায় যখন মেঘ ক'রে আসে, তার সৌন্দর্য্য কিসে লাগে। তার সৌন্দর্য্যের কি তুলনা হয়, যখন সেই মেঘের ছায়া এসে পড়ে ঐ একটু একটু গাছের পরে তার সঙ্গে।"

এই যে ধরণীর প্রতি প্রেম, একেই কবি সারাজীবন ধ'রে কবিতায়, গানে, ঋতুর নাটকে বারবার প্রকাশ ক'রে গেছেন। তবু মনে হ'য়েছে যেন সে কথা ভাল ক'রে বলা হয়নি—

যে কথা বলিতে চাই
বলা হয় নাই—
সে কেবল এই
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।
ফাল্গুনের এ আলোর এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ
ওই খেয়াঘাট
ওই নীল নদীরেখা ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখী কাকলী কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চ'লে যাওয়া
এই আলো এই হাওয়া
এইমত অস্ফুট ধ্বনির গুঞ্জরণ
ভেসে যাওয়া মেঘ হ'তে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারে বারে ক'রেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

পূর্ব্বেই ব'লেছি যে ধরণীর প্রতি প্রেম কবির জীবনে সবচেয়ে বড় কথা। কিন্তু শুধু তাই নয়—পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে শেষ কথা। উদয়গিরিকে শেষ প্রণতি জানিয়েছেন এই কথাই ব'লে—

বেসেছি ভালো এই ধরারে
মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে
ফুলের দিনে দিয়েছি রচি গান
সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি
সে গানে মোর রহুক স্মৃতি
আর যা আছে হউক অবসান।

এই কথাই অত্যন্ত সুন্দর ক'রে, অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে অনবদ্য ভাষায় কবির মুখে ব্যক্ত হয়েছে "আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ"-এ। কবি ব'লছেন—

"আমি যে বেঁচে আছি তা কেবল এই পৃথিবীকে ভালবেসেছি ব'লে। এত ভালবেসেছি যে, ব'লতে পারিনে। প্রকৃতির আলো, বাতাস, গাছ, পাখী সব যে কী ভালোবেসেছি, কী অপরিসীম আনন্দ পাই, তা কতটুকু প্রকাশ ক'রতে পারি। প্রকৃতি আমার চোখে যে কী রূপ তার মেলে ধরে—তাতে আমি ডুবে যাই। শীতের সকালে যখন রোদ এসে উদয়নে পড়ে, আমার মনে হয় যেন এটা একটা fairy land. চারিদিক সোনালী রঙে ঝিকমিক ক'রতে থাকে। মনে হয় যেন কেউ সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে। চারিদিকের সেই রূপে মন-প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে। কতটুকু তার প্রকাশ ক'রতে পারি বল। তাই তো বলি বিধাতা একদিক দিয়ে দিতে আমাকে কার্পণ্য করেন নি। এত দিয়েছেন—ঢেলে দিয়েছেন আমায়। যাবার সময়ে এই কথাই শুধু ব'লে যাব যে, ভালো লেগেছিল, ভালবেসেছিলুম পৃথিবীকে, এমন ভালো কেউ কোনোদিন বাসতে পারে না।—"

* *

"ভালো, বড় ভালো, বড় সুন্দর এই পৃথিবীটা। দু' চোখ মেলে যা দেখেছি—তাই ভালো বেসেছি। 'এই তো ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়।' গেয়েছি, বড়ো খাঁটি কথাই গেয়েছি।"

* *

আরেক জায়গায় ব'লছেন—

'মরতে আমার দুঃখ নেই। নিজের জীবনের জন্যে একটুও ভাবিনে। কারো জন্যে এতটুকুও দুঃখ হবে না। কেবল ভাবি—এই যে পৃথিবীতে আমি এত ভালোবেসেছি—এই তার গাছপালা আলো-ছায়া—'

"ব'লতে ব'লতে তাঁর গলার স্বর ভারী হ'য়ে আসে, কথা শেষ ক'রতে পারেন না।"

রবীন্দ্রনাথ জগতের ধূলি থেকে আকাশের তারা পর্য্যন্ত এই জগতের সমস্ত বস্তুকে অপরূপ স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর সেই স্নেহ-দৃষ্টির মায়াতুলিকা তাঁর অপূর্ব্ব কাব্যাঞ্জনের সাহায্যে আমাদের চোখে লাগিয়ে এই সুন্দর পৃথিবীকে আমাদের কাছেও সুন্দরতর করে দিয়ে গেছেন। আজ আষাঢ়ের সজল ছায়াস্নিগ্ধ মেঘের দিকে, তৃণে পুলকিত শ্যামল ধারার দিকে চেয়ে মুগ্ধ বিস্মিত হই, ঋতুর বিচিত্র-লীলায় আমাদের চোখ আজ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে।

আমরা আজ যে ভাষায় কথা বলি, আলাপ করি, চিঠি লিখি, এমন কি স্বপ্ন দেখি সে ভাষা রবীন্দ্রনাথের

আমরা আজ যে কথা ভাবি, যে ধারায় চিন্তা করি, সেই ধারায় আবেগের সঞ্চার ক'রেছেন রবীন্দ্রনাথ।

আমরা আজ যে দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখি—সে দৃষ্টিও দান ক'রেছেন রবীন্দ্রনাথই না?

যিনি আমাদের অন্তরে ভাব দিয়েছেন, ওষ্ঠে ভাষা দিয়েছেন, চোখে দিয়েছেন দৃষ্টি, যিনি আমাদের চির-পরিচিত ধরণীকে আমাদের কাছে অপরূপ ক'রে তুলেছেন, আমাদের জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত্রি মাধুর্য্য সুধায় ভ'রে দিয়েছেন, তাঁকে যদি বলি আমাদের জীবন-স্রষ্টা, তা' হ'লে কী খুবই কিছু বেশী বলা হবে?

দিয়ে যাই ডাক্—

শ্রীপন্নালাল বসু

আমারে যে ডাক দেবে
বৈশাখের রুদ্ররূপে আমি তারে দিয়ে যাই ডাক্।
প্রতীক্ষিত দিনগুলি ব্যর্থতায় করে হাহাকার,
নাহিরে সময় আর,—আর্ত্তকণ্ঠে শুনি বারংবার,
নাহিরে সময় নাই;
সুন্দরের রূপে হেরি পড়িয়াছে কলঙ্কের কালি,
অট্টহাস্যে বারবার দানবেরা দেয় করতালি,
হরষ-অধীর। তাই—
তোমার গানের আগে
ঝঞ্ঝায় বাঁধিয়া বীণা মোর গান ঝংকারিয়া যাক্।
আমারে যে ডাক দেবে
বৈশাখের রুদ্ররূপে আমি তারে দিয়ে যাই ডাক্।
গম্ভীর সাধনে যক্ষ বক্ষে রহি' বিরহের জ্বালা,
প্রেমের কাঞ্চন-ফুলে গাঁথে বসি' অন্তরের মালা
আশাপথ চেয়ে কার;
দুঃসহ বেদনে তার সুধারস উচ্ছলিয়া পড়ে;
রক্তিম রাজিব দল পাখা মেলি স্তরে স্তরে
ফুটে ওঠে চারিধার;
সেই মত মোর প্রেম
তোমার সঙ্গীতে দিক্ মাধুর্য্যের সুললিত বাক্।
আমারে যে ডাক দেবে
বৈশাখের রুদ্ররূপে আমি তারে দিয়ে যাই ডাক্।
সুন্দরের পদতলে যে আদর্শ রহিল গোপন,
আমার হৃদয় রক্তে রচি আজ তারি সিংহাসন
সিদ্ধ সাধকবৎ;
বেদনার বহ্নি দিয়ে দীপ্ত যারে করেছি গো হায়,
তারে মুক্তি নাহি দিয়ে মোর মুক্তি নাহিক' ধরায়
লেখা আছে দাসখৎ।
তোমার প্রকাশ আগে
তাই মোর বজ্রালোকে তব রূপ নব মূর্ত্তি পাক্।
আমারে যে ডাক দেবে
বৈশাখের রুদ্ররূপে আমি তারে দিয়ে যাই ডাক্।
সাধন-ভ্রংশ-জীব আদর্শেরে হানি' বারংবার
সুন্দরের গতিবেগে স্থিরতায় আনে অন্ধকার
কদর্য্য পঙ্কিল;
সেইক্ষণে হেরি যোগী বৈশাখের উড়ে পদধূলি,
অচল বন্ধন ভেদি' আদর্শের জয়ধ্বনি তুলি'
খুলি' দিয়া সব খিল।
তোমার সকল বাধা
তাই মোর খড়্গাঘাতে ছিন্ন হয়ে ধূলিতে লুটাক্।
আমারে যে ডাক দেবে
বৈশাখের রুদ্ররূপে আমি তারে দিয়ে যাই ডাক্।
তমসারে ছিন্ন করি' স্থিরতারে করাঘাত হানি'
সুন্দরে জাগাব আমি জাহ্নবীর জলধারা আনি'
মন্ত্র উচ্চারণে;
সুকঠোর সাধনায় আদর্শের জন্ম করি' দান,
কপটের কণ্ঠ চাপি' অমৃতের করিব আহ্বান
দৃপ্ত হুঙ্কারণে।
তোমার খোলার আগে
তাই দ্বার খুলে যাই বাজাইয়া পাঞ্চজন্য শাঁখ।

আমারে যে ডাক দেবে
বৈশাখের রুদ্ররূপে আমি তারে দিয়ে যাই ডাক্।

দিদিরানীর ঘাট

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম-এ, বার-এট-ল

মেজবৌদির বাপের বাড়ী যাওয়ার কথাটা একবার উঠল কিন্তু তিনি এবারেও বাপের বাড়ী যেতে রাজী হলেন না।

বললেন, "আরও দিন কতক যাক্ না—আসুন না দাদা খুলনা থেকে ফিরে। মার চিঠি ত' কালও পেয়েছি। মা ভালই আছেন।" মেজবৌদির যাওয়াটা আবার পেছিয়ে গেল ভেবে মনটা খুসীই হ'ল।

মেজবৌদির বাপের বাড়ী যাবার আগ্রহটা তেমন নেই কেন—এ নিয়ে আমি যে মোটেই ভাবিনি তা নয়। বাইরে যতই চেপে থাকুন না কেন; সপ্তাহে সপ্তাহে মেজদার চিঠির জন্য মেজবৌদি যে কি রকম আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করেন—এইটুকু লক্ষ্য করা আমার পক্ষে কিছুই কঠিন হয় নি। তাই সিদ্ধান্ত করে নিলাম—সুদূর পল্লীগ্রামে গিয়ে বসলে পাছে মেজদার চিঠিপত্র পেতে কোন গোলমাল হয়, তাই বাপের বাড়ী যেতে মেজবৌদির মন তেমন সায় দেয় না। মেজদা মেজবৌদিকে নিয়মমত চিঠি লেখেন—তার কতক কতক মেজবৌদি আমাকে পড়িয়েও শোনান কিন্তু কোনও চিঠিই আমাকে আগাগোড়া পড়তে দেন না। অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু একখানা চিঠিও আগাগোড়া পড়ার সুযোগ করে উঠতে পারি নি। একবার ঠিক করেছিলাম মেজবৌদির চাবি চুরি করে বাক্স খুলে দু'একখানা চিঠি আগাগোড়া পড়ে দেখব। চাবী চুরি করতেও আমাকে বেগ পেতে হয় নি, কেন না, চাবীর গুচ্ছ সম্বন্ধে তিনি যে খুব সাবধান এ-কথা ঠিক বলা চলে না। কিন্তু তাঁর বাক্স খুলে চিঠিই খুঁজে পাইনি। কোথায় যে চিঠি লুকিয়ে রাখেন বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও আমি আজ পর্য্যন্ত তার কোন সন্ধান করে উঠতে পারি নি। একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলুম, "যাও না বাপের বাড়ী, চিঠি এলে খুলে আগাগোড়া পড়ে, তারপর পাঠাব কি না ভেবে দেখবো।"

সঙ্গে সঙ্গে মেজবৌদি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন "তা জবাবটাও আমার হয়ে তুমিই লিখে দিয়ো না—রেহাই পাই তাহ'লে। চিঠি লেখার দেনা-পাওনা তোমার উপর চাপিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

বললাম, "হাঁফ ছাড়বে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাঁচবে না—হার্টফেল হয়ে যাবে।"

বললেন, "যদি হার্টফেল হয়ও ক্ষতি কি—স্ত্রী আবার ঢের মিলবে। কিন্তু বোনের হার্টফেল হলে ত বোন পাওয়া যাবে না—তাই তোমার মেজদা এ-ব্যবস্থায় খুসীই হবেন।"

বললাম, "কথার জোরে জগৎ ভোলাতে পার জানি, কিন্তু আমাকে ভোলান অত সোজা নয়। চিঠির টানে ত' কলকাতা ছেড়ে নড়তে পার না—সে-কি আমি বুঝি না মনে ভাবছ।"

বললেন, "সে টান বোঝ বলেই ত' তোমার উপর চাপিয়ে দিয়ে মুক্তি পেতে চাই।"

বললাম, "সত্যি মেজ বৌদি মেজদার মতন লোক যে এ রকম নিয়মমত চিঠি এমন চমৎকার করে গুছিয়ে লিখবেন—এটা কিন্তু কোন দিনই ভাবিনি।"

কথাটা ঠিক। মেজদা শুধু মেজবৌদিকেই লেখেন না, আমাকেও দু'খানা চিঠি লিখেছেন এর মধ্যে, বাবাকে ত' প্রত্যেক মেলে চিঠি লেখেন। মেজবৌদির চিঠিগুলো অবশ্য খুবই বড় বড় কিন্তু আমার কি বাবার কাছে চিঠিও নেহাত ছোট নয়। নতুন আবহাওয়ায় নিজের বিষয় খুঁটিনাটি কত কথাই লেখেন—বাড়ীশুদ্ধ সকলে কি আগ্রহ নিয়ে না মেজদার চিঠি পড়ি। এমন কি বাবা পর্য্যন্ত, বাবার কাছে লেখা চিঠি নিজের একবার পড়া হয়ে গেলে, আমাকে আবার পড়িয়ে শোনাতে বলেন, এবং আমার পড়া শেষ হলে প্রশ্ন করেন, "মেজবৌমাকে চিঠিখানা

পড়তে দিয়ে জিজ্ঞেস করিস্ ত' তাঁর চিঠিতে আরও কোনও নতুন খবর আছে কি না।"

আমার কথার উত্তরে মেজবৌদি বললেন, "বন্দর বাঁধন শক্ত হলে দূরে গেলে টান বেশীই লাগে।"

বললাম, "তা শক্ত বাঁধন দিতে তুমি জান—এ কথা মানি।"

বললেন, "সময় হলে তোমায়ও ঠিক শিখিয়ে দেব ঠাকুরঝি—ভেব না।"

খুলনা থেকে রায়-বাহাদুরের চিঠি এল আট দশদিন পরে। চিঠি পেয়েই বাবা দাদাকে ডেকে পাঠালেন। খবর পেতে আমারও দেরী হল না—আমিও গিয়ে ছুটলাম বাবার ঘরে।

বাবা দাদার হাতে চিঠিখানা দিয়ে বললেন, "পড়ে দেখ।"

বললাম, "চেঁচিয়ে পড়না দাদা—আমিও শুনব।"

দাদা হেসে বাবাকে বললেন, "বুলার জমিদারী ব্যাপারে অসম্ভব আগ্রহ। ও 'মেয়ে' না হয়ে 'ছেলে' হলে ভালই হত।"

একটু মৃদু হেসে বাবা বললেন, "তা মেয়েরাও বড় বড় জমিদারীর কাজ সুনিপুণ ভাবে চালিয়ে গেছেন—এ দৃষ্টান্তের ত' অভাব নেই। রাণী রাসমণির নাম কে না জানে।"

দাদাও হেসে বললেন, "সেই ভাল। একটু বড় হলে বুলারাণীর হাতেই জমিদারী তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।"

রায়-বাহাদুরের চিঠিখানা দাদা চেঁচিয়ে পড়লেন—শুনলাম। চমৎকার চিঠি লিখেছেন রায়বাহাদুর। বাবাকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন। আমাদের সকলের কথা খুঁটিনাটী করে জানতে চেয়েছেন। দাদাকে কিছুদিন গিয়ে তাঁর ওখানে থাকবার জন্যও বিশেষ অনুরোধ করেছেন। আসল কথাটার উত্তরে লিখেছেন যে তিনি বাবার প্রস্তাব নিয়ে বিশেষ চিন্তা করে দেখেছেন, এবং যোগেশের সঙ্গেও এ-বিষয় পরামর্শ করেছেন। কিন্তু যোগেশের আজকাল কাজ এত বেশী যে তার পক্ষে আমাদের জমিদারীর ভার নেওয়া একেবারেই সম্ভব হয়ে উঠ্‌বে না। তবে, তিনি লিখেছেন যে, খুলনায় তাঁর একটী বিশেষ কার্য্যক্ষম ও বুদ্ধিমান্ উকিল—নাম অবনী-বাবু, বয়স বছর ৪০।৪৫, যোগেশেরই বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি এ-কাজের ভার নিতে পারেন এবং নিলে ভালই হবে। লিখেছেন যে, যদি অবনীবাবুকে ভার দেওয়া হয় তবে তিনি রায়বাহাদুর যতদিন বেঁচে থাকবেন তাঁর, এবং যোগেশের পরামর্শ অনুসারেই জমিদারীর কাজকর্ম্ম চালাবেন—এবং সেদিক দিয়ে আমরা অনায়াসেই নিশ্চিন্ত হতে পারি। এ কথাও লিখেছেন যে, তাঁর পারিশ্রমিক, দাদা যদি একবার খুলনা যান ত' দাদার সঙ্গেই কথা-বার্ত্তা হতে পারে এবং সেদিক দিয়ে বিশেষ কোনও বাধার সৃষ্টি হবে বলে তিনি মনে করেন না। দাদার সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা ঠিক হলে অবনীবাবু একবার কলিকাতায় এসে বাবার সঙ্গেও দেখা করে যাবেন, সে-কথাও লিখেছেন। উপসংহারে লিখেছেন, "মাধবপুরের জমিদারী সুশান্তর প্রাণের জিনিষ। আমি বেঁচে থাকতে যদি সেই জমিদারীর কোনও দিক দিয়ে কোনও ক্ষতি হয় সে পাপ আমার সইবে না। আজ তোমার চিঠির মধ্য দিয়ে সুশান্তর অন্তরের অনুরোধটাই আমার কাণে এসে পৌঁছেছে—সামর্থ্য থাকলে আমি নিজেই এ কাজের ভার নিতাম। এই জমিদারীর অন্নেই ত আমি ছেলে-বেলায় মানুষ হয়েছি।"

বাবা, দাদা দু'জনেই চিঠি পড়া শেষ হ'লে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কেন জানি না, আমার মনও বিশেষ অভিভূত হয়ে উঠ্‌ল—দাদুর বিষয় এমন দরদের কথা ইতিপূর্ব্বে কৈ কখনও ত' শুনিনি। প্রথম আমিই কথা কইলাম।

শুধালাম "ও কথা কেন লিখেছেন দাদা? যে জমিদারীর অন্নেই ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছেন?"

দাদা বললেন "ওঁর বাবা যে আমাদের মাধবপুর গ্রামের নামজাদা কবিরাজ ছিলেন।"

পরে বাবার দিকে চেয়ে বললেন—

"চমৎকার লিখেছেন। আমি তা' হ'লে দু'চার দিনের জন্য খুলনা ঘুরে আসি?"

বাবা সংক্ষেপে বললেন "হ্যাঁ, যাও।"

দু' দিন পরে রাত্রের গাড়ীতে দাদা খুলনা রওনা হয়ে গেলেন।

*

দাদা খুলনা রওনা হয়ে গেলে রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তিন তালায় গিয়ে শোবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম—মেজবৌদি তখনও আসেন নি। মস্ত বড় একটা সমস্যা যেন আমারই প্রাণের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসে ছিল, রায় বাহাদুরের চিঠিতে এবং পরে দাদার খুলনা রওনা হয়ে যাওয়াতে তার যেন একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল—এই রকম একটা হাল্‌কা মন নিয়ে মেজবৌদির অপেক্ষা ক'রতে লাগলাম। বেশ খানিকক্ষণ দেরী ক'রে মেজবৌদি ঘরে ঢুকলেন।

বললাম, "বাবা ! আজ তোমার হল কি ? এত দেরী ?

বললেন, "বাবা না ঘুমুলে ত আসতে পারি না—

মধু খেয়ে এসে বাবার ঘরে এলো—তার পরে এলাম।"

আজকাল মধু বলে একটা চাকর রোজ রাত্রে বাবার ঘরে শোয় এবং সে যতক্ষণ খেয়ে শুতে না আসে দাদাই রোজ বাবার ঘরে বসে বই পড়েন। আজ দাদা রওনা হয়ে গেছেন, সে কাজের ভার যে মেজ বৌদির উপরই পড়বে—এ-খেয়ালটা আমার ঠিক হয়নি।

শুধালাম, "বাবা ঘুমিয়েছেন ?"

বললেন, "হ্যাঁ"।

একটা ময়লা কাপড়ে পায়ের তলাটা ভাল ক'রে মুছে বিছানায় ব'সে একটা পান মুখে ফেলে দিয়ে ঠোঁটে চাপা হাসি মাখিয়ে মেজবৌদি বললেন—

"তারপর, মাধবপুরের মহারাণী ! তোমার রাজত্বে আমাদের মত গরীব প্রজাদের ঠাঁই হবে ত ?"

কথাটার তাৎপর্য্য হঠাৎ ঠিক বুঝতে পারিনি।

শুধালাম "ও কথার মানে কি ?"

বললেন, "রাণী রাসমণির মতন তুমিও ত একদিন মাধবপুরের রাণী হয়ে উঠবে—তাই শুধাচ্ছিলাম।"

ছ' দিন আগের দাদার কথাটা মনে প'ড়ে গেল।

হেসে বললাম, "ও, আড়ি পেতে সে কথাও শোনা হয়েছে দেখছি।"

বললেন, "এত বড় খবর কি আর আড়ি পেতে শুনতে হয়—হাওয়ায় কাণে আসে।"

বললাম, "জমিদারীর ব্যাপারে তোমারও ত আগ্রহ কম নয় দেখছি। মাধবপুরের রাণী আমি হব না তুমি ?"

বললেন, "রাণী হওয়ার যোগ্যতা ত আমার নেই ভাই, শুধু তোমার রাজত্বে একটু ঠাঁই পেলেই বাঁচি।"

রাজরাণীর মতন করেই বললাম—"ঠাঁই পাওয়ার যোগ্যতা যদি রাখ ত পাবে। নইলে আমার রাজত্বে মেজদার সুপারিশেও কুলোবে না।"

বললেন, "সুপারিশের প্রয়োজন হ'লে তোমার মেজদার চেয়ে ঢের বড় সুপারিশের লোক ততদিনে আমার জুটবে।"

চার

মেজবৌদির বড় সুপারিশের লোকটার আসবার ঠিক সময় হয়েছিল কিনা জানি না, তবে আমার প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরুবার পর বাবা বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন লোকটাকে খুঁজে বার করবার জন্য। দাদার সঙ্গে এ-নিয়ে আলোচনাও হয়ে গেল দু' দিন—আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে শুনেছি এ-কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। দাদার মোটামুটি বক্তব্যটা হচ্ছে—বেশী ব্যস্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই, লেখাপড়ার প্রতি আমার যে রকম আগ্রহ, তাতে আমার ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখাই উচিত। তবে অবশ্য যদি এর মধ্যে সর্ব্ব দিক দিয়ে মনের মতন পাওয়া যায়, না হয়, হয়ে যাবে—দাদার তাতে আপত্তির কোনও কারণ নেই। বাবার কথাটা হচ্ছে—মনের মতন পেতে গেলে এখন থেকেই চারিদিকে নজর রেখে চেষ্টা করা দরকার। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখার এমন বেশী প্রয়োজনই বা কি আছে ? দাদা সে-কথার প্রতিবাদ করলে, বাবা শেষ পর্য্যন্ত বলেছিলেন, "বেশী দেরী হ'লে হয়ত বুলার বিয়ে আমি আর দেখে যেতে পারব না।" আড়াল থেকে শুনে আমার মন মোটের উপর দাদার কথায়ই ষোল আনা সায় দিয়েছিল, তবে বাবার শেষের কথাটা বুকের মধ্যে কেমন যেন বেসুরো বাজতে লাগলো—সত্যিই বাবার যে রকম শরীরের অবস্থা, আমার বিয়ের সময় বাবা নাই, সে-কথা ভাবতেও যে পারি না। বড় বৌদির দূর সম্পর্কের কে এক পিসতুতো ভাই বাবা-মার সঙ্গে এলাহাবাদেই থাকে। সে নাকি এবার এলাহাবাদেই আইন পাশ ক'রে সবে ওকালতী সুরু করেছে। তাদের ঘরের অবস্থাও নাকি ভাল।

বাবা সেই ছেলেটার খবরাখবর নিতে দাদাকে বলতে দাদা শেষ পর্য্যন্ত "আচ্ছা" বলে উঠে দাঁড়ালেন। দাদার "আচ্ছা" কথাটা বলার ধরণেই বুঝতে আমার দেরী হয়নি যে, দাদার সেদিকে ইচ্ছে একেবারেই নেই।

যাই হোক, প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল আমার ভালই হ'ল। শুধু যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম, তা' নয়, মেয়েদের বৃত্তিও একটা জুটে গেল আমার অদৃষ্টে। বোধ হয় এক বড় বৌদি ছাড়া বাড়ীতে সকলেরই আর আনন্দ ধরে না এবং সব চেয়ে বেশী খুসী হলেন—দাদা। আমাকে ডেকে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "বুলা ! পরীক্ষায় ভাল পাশ করাই লেখাপড়া শেখার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। লেখাপড়ার মধ্যে একটা গভীর আনন্দ আছে। সে-আনন্দের সন্ধান পরীক্ষায় ভাল পাশ করেও অনেকেই পায় না। তুমি সেই আনন্দটুকু খুঁজে পাও—এই আশীর্ব্বাদ করি।"

বাবাও বিশেষ অভিভূত হয়েছিলেন। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বাবা বলেছিলেন "আমাদের বংশে তুমিই প্রথম পরীক্ষায় বৃত্তি পেলে। আশীর্ব্বাদ করি তোমার

মধ্য দিয়েই আমাদের বংশের নাম আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।" মেজবৌদি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "এত বড় পণ্ডিতকে নিয়ে একসঙ্গে বসবাস—সে-কি আমার সইবে?" বড়বৌদি সে-সময় আমাদের বাড়ীতেই ছিলেন। তিনিও মন্তব্য করতে ছাড়েন নি। বলেছিলেন, "মেয়েরা বেশী লেখাপড়া শিখলে লাভ হয় না, লোকসানই হয়।"

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত কলেজেও ভর্ত্তি হ'লাম। কলেজে পড়াতে বাবার বোধ হয় সে রকম ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু দাদার বিশেষ আগ্রহে বাবার আপত্তিটুকু চাপা পড়ে গেল; কোনও বাধারই সৃষ্টি করেনি। বাবা শেষ পর্য্যন্ত দাদাকে বলেছিলেন, "কলেজে পড়াবার তোমার যখন এত ইচ্ছে—পড়াও। কিন্তু আসল জিনিষটা ভুল না, সে-দিকে যেন নজর থাকে।" বাবা ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছেন, লাঠি ভর করে একটু আধটু হেঁটে বার দ্দায় এসেও মাঝে মাঝে বসেন আজকাল।

অনেক খবরাখবর নিয়ে দক্ষিণ কলিকাতায় এক মেয়েদের কলেজে দাদা আমাকে ভর্ত্তি করে দিলেন। কলেজের গাড়ী রোজ বেলা দশটা আন্দাজ আমাদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ায় এবং বিকেলে কলেজের গাড়ীই আমাকে পৌঁছে দিয়ে যায়—দু'বেলা গাড়ী চড়ে দক্ষিণ কলকাতায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে আমার ভালই লাগে। কলেজে যাওয়া আসা সুরু হওয়াতে যেন একটা নতুন জীবনের সূচনা হ'ল—যেন বাইরের জগৎটা এত দিন আমার চোখের আড়ালেই ছিল, দূর থেকে তার চাপা কলরব মাঝে মাঝে আমার কানে এসে পৌঁছত—এইমাত্র। কলেজে ঢোকার পর নানান অনুভূতির নব নব উত্তেজনায় মন আমার ভরপূর হয়ে রইল বেশ কিছু দিন। কলেজে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অধ্যাপকদের পড়াবার ভঙ্গী, নানান সমাজের বিভিন্ন ধরণের মেয়েদের একসঙ্গে সমাবেশ এবং তাদের মনোভাব, কথাবার্ত্তায় এবং সাজসজ্জায় নানান বৈচিত্র্য—সবই আমি লক্ষ্য করি, ভালই লাগুক আর মন্দই লাগুক, সবই যেন উপভোগ করি।

[ক্রমশঃ

ভেবেছিনু কতোকাল

শ্রীকরুণাময় বসু

ভেবেছিনু কতোকাল অকারণে গেয়ে যাব গান,
মালতীর ফুলশাখা করি অবসান
একখানি ফুলমালা দিয়ে যাব হাতে,—
পাখী ডাকা শরতের সোণালি প্রভাতে।
তুমি রবে বাণীহীন মুখপানে চেয়ে,
ভাবিবে অবাক হয়ে কোথা হতে এল কে-এ
প্রভাতের রাঙা পথ বেয়ে।
মুখ পানে চেয়ে মোর ক্ষণকাল পরে মৃদু হেসে,
কহিলে, দু'জন মোরা দুইটি প্রদীপ,
বিপরীত মুখে গেছি ভেসে;
কোথা আছে ফুলশাখা, কোথা তীর সাগরের দেশে।

তারপর গেছে কতোকাল,
মাঠের ঘাসের শীষে জমে আছে শিশিরের জাল
কুয়াশায় ম্লান হ'ল শীতের সকাল,
তারপর গেছে কতোকাল।
ভেবেছিনু আর বুঝি দেখা নাহি হ'বে,
জীবনের ভাঙা সেতু পার হ'য়ে চলে যাব একাকী নীরবে,
আর বুঝি দেখা নাহি হবে।

তবু দেখা হ'ল হায়!
পাখীরা ফিরেছে যবে আপন কুলায়
রাঙা রাঙা মেঘের ছায়ায়;
সেই ক্ষণে দেখা হ'ল হায়।
গাঁয়ের বনের ধারে আঁকাবাঁকা রাঙামাটি পথ,
হেথা এলে মনে হয় এই বুঝি সোণার জগৎ,
কুসুমের গন্ধে ভরা আঁকা বাঁকা পায়ে চলা পথ
হঠাৎ দেখিনু তারে।
গোধূলির আলোয় আঁধারে,
মনে হ'ল ফেলে আসা জীবনের সে যে কোন দূরের প্রতিমা,
কোথা আদি কোথা তার সীমা
কিছু নাহি জানি,
একটি নিমেষ তরে মুখে মোর ফুটিলনা বাণী।

তবু ভাবি মনে,
এজীবনে প্রাণপণে
যে কথাটি লুকায়ে এসেছি,
সেই কথা হবে নাকি বলা?
মেয়েটি চলিয়া গেল, বনভূমি রহিল উতলা।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

[১৯২০—১৯২৫]

ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৯২০ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রধান স্তম্ভ ছিলেন তিনজন মহামানব—মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তিনজনই ছিলেন ত্যাগী কর্ম্মবীর এবং অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন। কর্ম্মপন্থা সময় সময় পৃথক হইয়া পড়িলেও, উদ্দেশ্য দেশহিতব্রত থাকায়, পরে সকলেই এক স্থানে সম্মিলিত হইতেন। যদি ১৯২০ সালে মহাত্মাজী অসহযোগ প্রবর্ত্তিত না করিতেন, তবে কংগ্রেস এত শীঘ্র অগ্রগামী হইতে পারিত না। আবার যদি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পণ্ডিত মতিলালের সহায়তাবলে অসহযোগনীতিই পুষ্ট করিবার জন্য 'কাউন্সিল প্রবেশ' রূপ কর্ম্মপন্থা আঁকড়াইয়া না ধরিতেন—তবে কংগ্রেস এত তেজোবর্দ্ধক ও কার্য্যক্ষম থাকিত না। প্রথমে কিরূপে 'কাউন্সিল প্রবেশ' নীতি বর্জ্জিত হয়, পরে পৃথকভাবে উহাতে প্রবেশের অনিচ্ছাকৃত অনুমতি প্রদান করা হয়, এবং পরে আবার উহাই সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিমূলক পন্থা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, এই খণ্ডে তাহাই প্রদত্ত হইবে। স্বাধীনতার পথে এখনও উহাই সর্ব্বপ্রধান পন্থা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় খণ্ডে রাউলট আইন, মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ। জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচার কাহিনী ও অকিঞ্চিৎকর রিফর্ম্মের কথা বিবৃত করিয়াছি। অতঃপরে কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটী এবং হান্টার কমিটীর রিপোর্ট বাহির হয়, এবং তাহাতে তিনজন শ্বেতাঙ্গ কমিশনার অভিমত প্রকাশ করেন এক রকম, এবং দুইজন ভারতীয় কমিশনার করেন ভিন্ন রকম। ইতিপূর্ব্বে সাময়িক সংবাদ পত্রেও অত্যাচার কাহিনী বিশদভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "অমৃতসর কংগ্রেসের পরেই ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ২০শে তারিখে আমরা পবিত্র তীর্থক্ষেত্র কাশীধামে পাঞ্জাব এনকোয়ারী কমিটীর রিপোর্ট স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। আমাদের দাবী ছিল খুবই অল্প—লর্ড চেম্‌সফোর্ডের পদত্যাগ, স্যার মাইকেল ওডায়ারের পুনরাহ্বান, জেনারেল ডায়ার ও কর্ণেল জনসন প্রভৃতির বিচার, রাউলট আইন প্রত্যাহার ও সামরিক আইনানুসারে সংগৃহীত জরিমানার টাকা ফেরত প্রদান।"

শ্রীশিবপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের বাটীস্থ একটী সুন্দর বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া তাঁহারা সহি করিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহরু স্বাক্ষর করেন নাই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতিরূপে তিনিই উক্ত রিপোর্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর সংস্কার আইনে পরিণত (Government of India Act) হয়; এবং এই সম্বন্ধে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যে ঘোষণা করেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। রিফর্ম্ম কেবল অকিঞ্চিৎকর নয়, অপমানজনক হওয়া সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর ঐকান্তিকতার এবং মডারেট নেতৃবর্গের অনুরোধে অমৃতসর কংগ্রেস সংস্কারের সহযোগিতা করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট উহার ডেসপাচে (Despatch) হান্টার কমিটীর কেবল মেজরিটি কমিটী গ্রহণ এবং মাইনরিটি রিপোর্টও কংগ্রেস রিপোর্টের দাবীগুলি অগ্রাহ্য করিয়া জাতির প্রতি কৃত অপমান আরও বহু গুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। মেজরিটি রিপোর্টে স্যার মাইকেল ওডায়ার ও জেনারেল ডায়ারদের প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বর্ষিত হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় যে গভর্ণমেণ্ট অবিচারীর দণ্ড বিধান না করিয়া তাহাদিগকে পুরস্কৃত করেন। যাহাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছিল তাহাদের সম্বন্ধে ক্ষতির বিষয়ে অব্যাহতি দিয়া 'ইনডেমনিটী' বিল পাশ করেন। আবার সেই সমস্ত অপরাধিগণের স্মৃতি রক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল, মহিলাগণ নাচের ব্যবস্থা করিলেন এবং ভারতবর্ষেই ইংরাজগণ জেনারেল ডায়ারকে তিন লক্ষ টাকা উঠাইয়া দিলেন। ১৯২০ সালের ৩রা মে তারিখে মেজরিটি ও মাইনরিটি রিপোর্ট এবং গভর্ণমেণ্ট ডেসপাচ বাহির হইলে মাইনরিটি রিপোর্টে যেমন কংগ্রেস অনুসন্ধান কমিটীর রিপোর্ট মূলতঃ সমর্থিত হইল, অন্যদিকে আবার মেজরিটি কমিটীর রিপোর্টে দেশে তুমুল বিক্ষোভের সঞ্চার হইল। অবশেষে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী বারাণসীধামেই ২৯শে মে সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কেবল পাঞ্জাব সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যাপারেই যে মহাত্মা গান্ধী খুব ক্ষুব্ধ হইলেন তাহা নয়, খিলাফত ব্যাপারেও তিনি ভারতীয় মুসলমানগণের পক্ষ সমর্থনে তৎপর হইলেন।

১৯১৪ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত যে মহাসমর হয় তাহাতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, গ্রীস প্রভৃতি দেশ ছিল এক পক্ষে আর জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি ছিল একদিকে। ভারতীয় অনেক মুসলমান সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্রিটিস গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি পায় বলিয়াই ভারতীয় মুসলমানগণ তুর্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সম্মত হয়। তাহাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তুরস্কের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার হইবে না এবং তাহার প্রতি অবিচার (injustice) করা হইবে না। কিন্তু যুদ্ধ আসিবার পরে তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল হইতে সরাইয়া আনা হইয়াছে, ঐ নগরটিকে নানা জাতির সম্মিলিত শাসনের অধীন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের যে সব দেশে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক তাহাদিগকেও কোন না কোন ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতির অধীন করা হইয়াছে। তুরস্ক সাম্রাজ্যের সুলতানই তাহাদের খলিফ (প্যাগাম্বরের বংশধর ও প্রতিনিধি) তাহার পদগৌরব ও ক্ষমতার যাহাতে হ্রাস না পায় এবং অন্য কাহাকেও খলিফা খাড়া করিবার চেষ্টা না হয়, মুসলমানরা তাহাই চাহেন। এতদ্ভিন্ন তাহাদের তীর্থস্থানগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন মুসলমান নৃপতি (অর্থাৎ তুরস্কের সুলতানের) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে, মুসলমানরা ইহাই চান। কিন্তু মুসলমানদের তীর্থস্থানগুলির কোনটি বা খৃষ্টান দেশের অধীন, কোনটী বা নামে মাত্র স্বাধীন, কিন্তু কার্য্যতঃ

ইউরোপীয় খৃষ্টিয়ান জাতিবিশেষের করতলস্থ একজন অন্তর শাসনকর্ত্তার অধীন করিবার প্রস্তাব প্রায় স্থির হইয়াছে।

উপরোক্ত কারণে মুসলমানেরা বিশেষ ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। অতঃপরে খলিফার পদগৌরব ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে আন্দোলন হয়, তাহাই খিলাফত নামে খ্যাত হয়। আলি ভ্রাতাদ্বয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার কিচলু প্রভৃতি মুসলমান নেতৃবৃন্দ আন্দোলন পরিচালনে বিশেষ বদ্ধপরিকর হন এবং হিন্দুরাও তাহাদিগের ব্যথায় তুল্যানুরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন।

গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডের নিকট একটী ডেপুটেশন গিয়া (১৯ জানুয়ারী ১৯২০) এই সব অবস্থা জানাইয়াও কোন ফল পাওয়া যায়না। অতঃপরে মৌলানা মহম্মদ আলি খিলাফত কমিটীর প্রতিনিধি স্বরূপে বিলাত গিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া (১৭মার্চ ১৯২০) সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করেন ও তুরস্কের প্রতি ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, "কনষ্টান্টিনোপল সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই আসে না। ইহা তুরস্ক রাজ্যের অন্তর্গতই থাকিবে।" "We donot challenge the maintenance of the Turkish Empire in the homelands of the Turkish race with its capital at Constantinople এবং আরও বলিয়াছিলেন "Nor are we fighting to deprive Turkey of the rich and renowned land of Asia Minor and Thrace which are predominonsly Turkish in race." তিনিই এখন উত্তরে বলেন, "আপনারা ন্যায় বিচারের কথা বলিতেছেন! আমরা তো তুরস্কের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণা করি নাই। ১৮৭৮ সাল হইতে (ডিসরেলির সময়) গত যুদ্ধে আমরা তুরস্ককে কেবল সহায়তাই করিয়াছি, কিন্তু কৃষ্ণ-সাগরে অধিকার না পাওয়ায় আরও দুই বৎসর বেশী আমাদের যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। জার্ম্মাণী ন্যায় বিচার পাইয়াছে Alsace লরেন্ ফ্রান্সের ভাগে পড়ায়, অষ্ট্রীয়াতো শতধা ছিন্নভিন্ন, তুরস্ক ও জার্ম্মানীর অপেক্ষা কম ন্যায় বিচার পাইবেনা (He claims justice and justice she shall get)। তুরস্কান্তর্গত থ্রেস গ্রীসের হাতে গিয়াছে বটে, কিন্তু আর্ম্মেনিয়ার উপর কি অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সুলতান কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছে? থ্রেসবাসী গ্রীসের শাসনই পছন্দ করে। পোপের পদগৌরব যাওয়ার পর ধর্ম্মগত ক্ষমতার হ্রাস হয় নাই, সুলতান তুরস্কের জমি লইয়াই থাকুন—

March 11. Lord Curzon—Do not let any one imagine that the peace, we are going to conclude will spread peace over Asia as far from it

ক্ষুব্ধ হইয়া মৌলনা মহম্মদ আলি স্বদেশ-প্রত্যাগত হন। ইতিমধ্যে নিখিল ভারত খিলাফত কমিটি অসহযোগ সম্বন্ধে প্রস্তাব পাশ করে। ইহার পরেই ১৯শে মার্চ্চ তারিখে এই সম্বন্ধে জাতীয় শোক প্রকাশার্থ হরতাল হয়। মৌলানা সৌকতআলি একটী প্রস্তাব পাঠাইয়া দেন—যদি তুরস্কের ব্যাপারে সন্ধির সর্ত্ত গ্রহণ-যোগ্য না হয়, তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করা হইবে না।

ইহার পরে গভর্ণমেন্ট হইতে নির্দ্দেশ হয় যেন, সরকারী কর্ম্মচারী কেহ খিলাফতে যোগদান না করে।

মহাত্মা গান্ধী খিলাফতের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি অবিচারে এত সমবেদনা প্রকাশ করেন যে তিনি বড়লাট বাহাদুর লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখেন—

"যদি মুসলমানদের এই দুঃসময়ে আমি তাহাদের পার্শ্বে না দাঁড়াই, তবে আমি ভারতমাতার অযোগ্য সন্তান। তারা চায় তুরস্কের প্রতি যেন কোনরূপ দণ্ড না দেওয়া হয়, তাহাদের মনে আঘাত দেওয়া উচিত নয়—আমি যতদূর অবগত আছি হিন্দু এবং মুসলমান একসঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যরক্ষার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছে"—

পাঞ্জাব এবং খিলাফত ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিবার জন্য ৩০শে মে তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর একটী সভা আহ্বান করা হয় এবং ঐ সভায় অসহযোগ সম্বন্ধে এবং ১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে কংগ্রেসের এক প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচনা হইবে বলিয়াও বিজ্ঞাপিত করা হয়। সেই ৩০শে তারিখের সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ হয় তন্মধ্যে নিম্নটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"The Committee resolves that in view of the general situation in India with reference to Indian public feeling on the Turkish peace terms the action of His Majesty's Government regarding the Punjab atrocities and the policy being pursued in giving effect to the Reform Scheme through the proposed draft Rules and Regulations, a Special Session of the Congress be convened at Calcutta as early as possible and not later than the 15th September 1920 to consider the adoption of a policy of non-co-operation or of any other suitable course of action."

মহাত্মা গান্ধী এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী যে অসহ-যোগের কথা বলিলেন, ভারতবর্ষে তাহা নূতন নহে। যে সরকার দেশবাসীর ব্যথা বেদনায় কোনরূপ সহানুভূতি দেখাইবে না, আমাদের অভাব অভিযোগ বধিরের নিকট ক্রন্দনের ন্যায় বিবেচিত হইবে, তাহার সঙ্গে সহযোগিতা না করা ভারতবাসিগণ একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। বঙ্গভঙ্গের সময়ে এইরূপ কিছু করা সম্ভব কি না এই বিষয়ে মহামতি গোখেল কংগ্রেসের কাশীধামের অধিবেশনের (১৯০৫ খৃঃ) অভিভাষণেও বলিয়াছিলেন,

"If the opinions of even such men are to be brushed aside with contempt, if all the Indians, are to be treated as better than dumb, driven cattle; if man whom any other country would

delight to honour are to be thus made to realise the utter humiliation and helplessness of their position in their own country, then all I can say "is 'Good-bye to all hope of Co-operating in any way with the bureaucracy in the interests of the people. I can conceive of no greater indictment of British rule than that such a state of things should be possible after a hundred years of that rule."

১৯০৭ সালে লোকমান্য তিলকও একটি বক্তৃতায় অসহযোগের কথা বলিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালে পুনরায় মিঃ গোখেল লাহোর কংগ্রেসের দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, অসংখ্য নিবেদন তাহারা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কর্ণপাত করা হয় নাই, সুতরাং প্রতিশোধের সময় আগত হইয়াছে—"The Time has come for retaliation." তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে বলেন—

"What is the passive resistance struggle? It is essentially defensive in its nature, and it fights with moral and spiritual weapons. A passive resister resists tyranny by undergoing suffering in his own person. He pits soul force against brute force; he puts the divine in man against the brute in man; he pits suffering against oppression; pits conscience against might, he pits faith against injustice, right against wrong."

গোখেল ও তিলক যেন ভবিষ্যৎ ছবি প্রতিফলিত বলিয়াই অসহযোগের সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখিতেন। এতদিন মাঝে মাঝে যাহা বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসিয়া উঠিত, আজ মহাত্মা গান্ধীর ত্যাগ, সংযম ও সাধনায় তাহা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। ভারতীয় জমিও ছিল খুব উর্ব্বরা, রাউলট আইন ও পাঞ্জাবের অত্যাচারে, খেলনার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর সংস্কার প্রদানে এবং খিলাফতের প্রতি অন্যায্য বিচারে ভারতীয় মন তখন এমনই তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়াছিল, ভারতবাসী তখন সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ইংরাজের অনুরাগ সম্বন্ধে এমন ভাবে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিল যে, মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক এই নীতি প্রবর্ত্তনের কথা হইতে না হইতেই সাধারণ লোক উহার প্রতি একান্ত আগ্রহশীল হইয়া উঠিল।

কংগ্রেস ধীরে শনৈঃ শনৈঃ পদক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু নিখিলভারত খিলাফত কমিটী অসহযোগ সম্বন্ধেও আবার বেশী অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসেই তাহার দিল্লীতে মহাত্মাজীর পরামর্শানুসারে একটী সম্মিলন করিয়া স্থির করে, যদি খিলাফত সমস্যার মীমাংসা গভর্ণমেন্ট সন্তোষজনক ভাবে না করেন, তবে গভর্ণমেণ্ট হইতে আস্তে আস্তে তাহারা সহযোগিতা অপসারণ করিবে।

এইখানে ভাবিবার বিষয় আছে। ডিসেম্বর মাসে মহাত্মাজী কংগ্রেসকে রিফর্ম্মস সম্বন্ধে সহযোগিতা করিতে বলিলেন, আবার নভেম্বর মাসে খিলাফতকে অসহযোগ করিতে বলিলেন, এরূপ অসামঞ্জস্য কিরূপে সম্ভব মনে হয়? মোট কথা তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানকে দিয়া আবার একটা সুযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন গভর্ণমেণ্ট অটল অচল রহিয়াছে তখন কংগ্রেসকে দিয়াও অসহযোগ প্রস্তাব পালন করাইয়া লয়েন।

যাহা হউক, ইংলণ্ডে মৌলানা মহম্মদ আলীর অভিযান ব্যর্থ হইবার পরে মান্দ্রাজ খিলাফত সম্মেলনে ১৯২০ সালে ১৭ই এপ্রিল তারিখে সরকারী খিতাব, কাউন্সিল, গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পরিত্যাগ এবং ট্যাক্স বন্ধ করিতে বলিয়া প্রস্তাব পাশ করে—

"In consonance with the spirit of the resolution adopted by the All India Committee this Committee in the event of the present agitation proving futile and ineffective calls upon all Indian's to resort to progressive abstention from Co operation with Government in the following manner: Firstly to renounce all honorary posts, titles and membership of the Legislative Councils; secondly, to give up all remunerative posts under Government service; thirdly, to give up all appointments in the Police and Military Forces; finally, to refuse to pay taxes to Government."

প্রস্তাব উপস্থিত করেন মৌলানা সৌকতআলি, মান্দ্রাজের "হিন্দু" সম্পাদক মিঃ কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার উহা সমর্থন করেন।

এপর্য্যন্ত খিলাফতই অসহযোগ প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব পাশ করিয়া লয়। কংগ্রেস এখনও কিছু স্থির করে নাই। সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস স্থির করিবে। কিন্তু ২রা জুন ১৯২০ এলাহাবাদে দেশনায়কগণের একটী সম্মিলনে অসহযোগ গ্রহণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে মহাত্মাগান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, সর্দ্দার বিঠল ভাই প্যাটেল ও কয়েকজন মুসলমান নেতা লইয়া একটী সাবকমিটী গঠিত হয়। সাবকমিটী জুলাই মাসে কংগ্রেস কমিটীর কাছে যে বিবরণী পাঠায় তাহাতে স্কুল কলেজ এবং আইন আদালত বর্জ্জনের প্রস্তাবই প্রথমে হয়। ইহার পরে ১লা আগষ্ট তারিখে যে হরতাল হয়, তাহাতে প্রায় দোকান পাট বন্ধ থাকে। এবং অতঃপরে সাবকমিটীর বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাব সম্বন্ধে সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে জ্ঞাত করা হয়। নেতৃবৃন্দ আগষ্ট মাসে কি কি বিষয়ে বর্জ্জন প্রস্তাব হইবে, তাহারও একটা ঘোষণা করেন।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের খিলাফত এবং সংস্কার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের মনোভাব আরও সুস্পষ্ট হয়। গভর্ণমেণ্টের কমন্স ও লর্ড সভায় এমন সব তর্ক বিতর্ক হয় যে দেশের লোক গভর্ণমেণ্টের প্রতি শেষ বিশ্বাসটুকুও হারাইয়া ফেলে। এবং অতঃপরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর

তারিখে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তজ্জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ১৯২৮ সেপ্টেম্বর মাসে এলাহাবাদে এই লেখককে যাহা বলিয়াছিলেন, পাঠকের অবগতির জন্য পণ্ডিতজীর কথাতেই উহা এখানে বিবৃত হইল—

"১৯২০ সেপ্টেম্বর মাসে আমরা উভয়ে আরায় ছিলাম: তখন ডুমরাওন রাজ সংক্রান্ত মামলায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন, আমাদের পক্ষের সিনিয়র শ্রীযুক্ত এন্ সরকার তখন দ্বিতীয়বার বক্তৃতা করিতেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে এপ্রিল মাসে অল ইণ্ডিয়া খিলাফত কন্‌ফারেন্সের মাদ্রাজ অধিবেশনে মহাত্মার পরামর্শক্রমে অসহযোগ (non-co-operation) প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও জুন মাসে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে অসহযোগ পন্থার পক্ষপাতী হন। চিত্তরঞ্জন ও আমি উভয়েই নন্‌কোয়াপারেশন্ প্রোগ্রামের কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিতাম। এই বিষয় আরায় বসিয়া জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনাও হইয়াছিল। আমি একদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় আসি। দেশবন্ধু পরের দিন আসেন। আমি আসিবার পরে মহাত্মা আমাকে বলেন, "খিলাফত পাশ করায় সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় ইহার মতানুবর্ত্তী, হিন্দুর মধ্যেও অনেকে হাণ্টার রিপোর্টে ব্যথিত। এরূপ ক্ষেত্রে মেজরিটি যখন একদিকে হইবে, আপনারও এদিকে আসা উচিত।" "আমিও তখন দেখিলাম, এখন আপত্তি নিষ্ফল। তাই মহাত্মার মতানুবর্ত্তী হইলাম। অতঃপর আমি মিঃ দাসের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আসিয়া তখন পৌঁছিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "এবিষয়ে আপনার কি ঠিক ধারণা জন্মিয়াছে? Are you convinced?"

আমি বলিলাম, "এখন আপত্তি নিষ্ফল। এটা আমি বুঝতে পেরেছি।"

দাস—কার দোষ? মহাত্মা কেন তাড়াতাড়ি করিলেন?

আমি।—কিন্তু আপত্তি তো নিষ্ফল।

দাস।—It is upto Mahatma now to declare that he is wrong. মহাত্মার ভায় ব্যক্তির ত্রুটী স্বীকার করাই ন্যায় সঙ্গত।

আমি।—It is too much to enpect. First he honestly believes it, secondly that it is only three weeks that the declaration was made. The ink even is not dry. I am not going to oppose as I depended on majority. It is futile to oppose. If you can convince him, all right. If not, it is useless.

"আমি ভাই সেরূপ আশা করি না। কারণ তিনি কাউন্সিল ব্যবস্থা পরিবর্দের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, দ্বিতীয়তঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ডিক্লেয়ারেশন (প্রকাশ) করিয়া এখনই তিনি আবার উহা প্রত্যাহার করিবেন না। সোজা কথায় সেই কালীও এখন শুকায় নাই। যখন অধিক সংখ্যক লোক একদিকে, আমি আপত্তি করিব না। তুমি যদি তাঁকে বুঝিয়ে ফেরাতে পার ভাল, নতুবা আপত্তি নিষ্ফল।"

দাশ সংশোধন প্রস্তাব খুব জোরের সহিত উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং উপরোক্ত ঘটনার দরুণই তাহার বক্তৃতায় আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন—জনৈক সভ্যের আকস্মিক পরিবর্ত্তন Sudden conversion of some member.

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯২০), সভাপতির আসন গ্রহণ করেন লালা লাজপতরায়। এবৎসরের গোড়াতেই তিনি আমেরিকা হইতে দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তি মহাশয়। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গীত হইবার পরে তিনি দণ্ডায়মান হন। তাহার অভিভাষণ তিনি বেশ স্পষ্টভাবে পাঠ করিয়াছিলেন এবং শেষদিকে বেদের সজ্ঞবাণীটিও আবৃত্তি করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরীকে সভাপতিবরণের প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করেন। স্যার চৌধুরী প্রস্তাবটি খুব স্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর ইংরাজীতে পাঞ্জাবকেশরী (Lion of the Punjab) লালাজীকে বরণ করেন। প্রস্তাবটি দু-একজন সমর্থন করিবার পরে যখন মিসেস বেসান্ত উঠেন, তখন চারিদিক হইতে নিন্দোক্তি উত্থিত হইল। কেহ বলিল—ইনি বসুন, কেহ বলিল, আমরা ব্রিটিশ গোয়েন্দাকে শুনিতে চাই না। এরূপ লজ্জাকর উক্তি হইতে লাগিল যে অবশেষে মিঃ চক্রবর্ত্তী এবং গান্ধীজীকে দণ্ডায়মান হইয়া জনতা শান্ত করিতে হইল। প্রতিনিধি-বর্গ এসময়ে প্রকৃতই চিত্তাশূন্যতার পরিচয় দিয়াছিল।

একটী কথা মনে পড়ে। মিঃ চক্রবর্ত্তি যখন গভর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করেন, চিত্তরঞ্জন দাশ বলিয়া উঠেন, "What about the trusteeship? মিঃ চক্রবর্ত্তি তখনই উত্তর করেন, "আমাদের হাইকোর্টের একজন ব্রিটিশ জজ ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "All trustees are dishonest."

যাহাহউক ইহার পরে লালাজী তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে (কখনও পুস্তিকার সহায়তায় কখনও মুখস্থভাবে) তিনি পাঞ্জাবের অমানুষিক অত্যাচার কাহিনীরই জলন্ত ছবি ফুটাইয়া তোলেন।

প্রথম প্রস্তাবটিতে লোকমান্য তিলকের তিরোধানে শোক প্রকাশকালে তাহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, দেশের জন্য দুঃখভোগ, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য ঐকান্তিক সাধনা এবং দেশের স্বাতন্ত্র্য সাধন সম্বন্ধে তাহার অবিরাম প্রয়াস যে ভারতবাসীর হৃদয়ে তাহার স্মৃতি চিরউদ্দীপ্ত করিয়া রাখিবে, এই বিষয়ে উল্লেখ থাকে। অতঃপরে কংগ্রেস সাবকমিটির সভ্যগণ পাঞ্জাবের ব্যাপার অনুসন্ধান কার্য্যে যে পরিশ্রম, ন্যায়পরায়ণতা এবং সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেই বিষয়ে প্রস্তাব হয়।

হাণ্টার কমিটীর মেজরিটি রিপোর্ট—যে জাতিবৈষম্য-জনিত বিদ্বেষ দ্বারা কলুষিত, সাক্ষী-প্রমাণ কর্ত্তৃক অসমর্থিত—এবং ইহা যে কেবল পাঞ্জাব সরকার ও ভারত সরকারের দুরপনেয় দোষ ঢাকিবার জন্য এইভাবে বাহির করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য উহা একেবারে গ্রহণযোগ্য নয় এবং গভর্ণমেণ্টও অপরাধী সরকারী

কর্ম্মচারীগণের কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করেন নাই, এমন তখন গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের সমস্ত বিশ্বাস হারাইয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবই ছিল অসহযোগ সম্বন্ধে। পাঞ্জাব সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট যে ঔদাসীন্য ও অন্যায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তুরস্কের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট যেরূপ ভারতীয় মুসলমানগণের প্রতি পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন তাহাতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে দেশে আর কোনরূপ শান্তির সম্ভাবনা নাই। তাই কংগ্রেসের অভিপ্রায় যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত অন্যায়ের প্রতীকার না হয় এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠা না হয়, ক্রমিক অসহযোগ গ্রহণ ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। তাই কংগ্রেস সম্প্রতি যথাসম্ভব স্বল্প ঝুঁকি ও স্বল্প ত্যাগস্বীকার সাপেক্ষে উপদেশ দিতেছে—

(১) উপাধি ও অবৈতনিক পদ এবং দরবার প্রভৃতি সরকারি অনুষ্ঠান বর্জ্জন।

(২) গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া আসা এবং ন্যাশানাল স্কুল প্রতিষ্ঠা।

(৩) আদালত ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া আসা, এবং সালিশি প্রতিষ্ঠা।

(৪) মেসোপোটেমিয়ার গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে কেহ যাইবে না।

(৫) কেহ যেন নবসংস্কৃত কাউন্সিলে ভোট (নির্ব্বাচনপ্রার্থী) না হন। আর কোন লোক যেন কাহাকেও ভোট না দেন।

(৬) বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন।

(৭) স্বদেশী গ্রহণ এবং সূতাকাটা ও সেই সূতায় বস্ত্র বয়ন।

মহাত্মাজীর এই প্রস্তাব অধিকাংশ লোকই সমর্থন করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাঞ্জাব, খিলাফত এবং তুচ্ছ সংস্কার প্রদানে লোকের মন তখন এতই তিক্ত ও বিষাক্ত যে তখন যে যত অগ্রগামী পন্থার সন্ধান দিতে পারিত, তাহার দিকেই বেশী সমর্থন হইত। বিশেষতঃ মহাত্মাজী চরিত্রবল, দৃঢ়তা ও দুঃখভোগের দ্বারা তাঁহার নেতৃত্বশক্তি ইতিপূর্ব্বে বহু স্থানে দেখাইয়াছেন সুতরাং তাঁহার কথায় লোকের কোনরূপ সংশয়ই রহিল না।

পণ্ডিত মতিলাল হইলেন মহাত্মাজীর প্রধান সমর্থক। কিন্তু চিত্তরঞ্জন একা তখন ভিন্ন সুর ধরিলেন। মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার কোনরূপ অভাব ছিল না; কিন্তু কাউন্সিল বর্জ্জন তিনি কিছুতেই মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পারেন নাই। কারণ তাঁহার মতে কাউন্সিল দান নয়, আমাদের প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ আমরা অধিকার করিয়া লইয়াছি। ইহার সহায়ে আমরা আমাদের দায়িত্বমূলক স্বত্ব এবং অধিকার লাভে আরও অগ্রসর হইব তাই আগষ্ট মাসে (১৯২০) যখন প্রাদেশিক কংগ্রেসগুলির মত চাওয়া যায়, অন্যান্য প্রদেশ মত প্রদান করিলেন—বাঙ্গলা এবং মধ্য প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী সুস্পষ্ট উক্তি লিখিয়া পাঠায়—

"যেরূপ অবস্থা সমুপস্থিত তাহাতে 'ননকোয়াপারেসন'ই প্রকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু কাউন্সিল বর্জ্জনের কোন আবশ্যকতা নাই। বরং বহু সংখ্যক লোকেরই কাউন্সিলে যাওয়া উচিত যেন আবশ্যক মত কাউন্সিলেও অসহযোগ নীতি চালাইতে পারেন।"

কলিকাতার অধিবেশনেও বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতাগণ মহাত্মাজীর প্রস্তাবের একটী সংশোধন প্রস্তাব করেন, প্রস্তাবটি এই—

"ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর সহিত দেখা করিয়া পাঞ্জাব অনাচার এবং অন্যান্য অভিযোগ এবং এখনি যেন স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা বা অধিকার দেওয়া হয় প্রভৃতি বিষয় উপস্থিত করিবার জন্য এখনি একটী মিশন (দৌত্য) প্রেরিত হউক। যদি তিনি এই মিশনকে গ্রহণ না করেন অথবা ১৯১৯ রিফর্ম্মস আইন পরিবর্ত্তন করিয়া স্বায়ত্ত শাসন না দেন, তবে কাল-বিলম্ব না করিয়া অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ইতিমধ্যে বসিয়া না থাকিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত কর্ম্মপন্থা যেন দেশ গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় তজ্জন্য একটী প্রতিনিধিমূলক কমিটীর সহায়তায় দেশকে তৈয়ার করিতে হইবে।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন মাননীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং সমর্থন করেন চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। চিত্তরঞ্জন বলেন, "ক্রমিক" কথায় কি ফল হইবে—

জনতা—মহাত্মা গান্ধী আপনাকে উত্তর দিবেন।

চিত্ত—মহাত্মা গান্ধী যদি আমাকে সম্যক বুঝাইয়া দিতে পারেন, আমি সেইভাবে কাজ করিব।

কয়বার জনতার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর শুনিয়া পণ্ডিত মতিলাল বলেন—

"I rise to a point of order—Is a speaker entitled to argue with delegates.

চিত্তরঞ্জন বলেন—

"কাউন্সিলে যাওয়া আমি মনে করি—ননকোয়াপারেসনের বিরোধী নয়। আপনারা মনে করিবেন না যে, রিফর্ম্ম অ্যাক্ট দান। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে আপনি উহা ছিনাইয়া নিয়াছেন (Reforms have been wrung out. আপনি উহা অর্জ্জন করিয়াছেন—

"অস্ত্র এখন আপনার হাতেই রহিয়াছে (in the hollow of your hands). এখন, আমি চাই স্বরাজ লাভের জন্য এই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে—I want to make the Council an instrument to the attainment of Swaraj, and to use that weapon to wring out full complete Swaraj.

"পঁয়ত্রিশ বৎসরের পরিশ্রম ও সাধনায় আপনি যাহা পাইয়াছেন, তাহা কখনও ছাড়িবেন না।"

প্রস্তাবটি পাশ হইয়া যায়। মিঃ জিন্না ভিন্ন মৌলানা সৌকত আলি প্রমুখ সমগ্র মুসলমান প্রতিনিধিগণ মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কলিকাতা কংগ্রেসের পরে দাশ মহাশয় মোকদ্দমা উপলক্ষে আরা যান, আবার ফিরিয়া যান। সেখান হইতে কলিকাতায় আসিয়া ষ্টীমারযোগে ডিব্রুগড় যান। এই ডিব্রুগড়ে আমন্ত্রিত হইয়া তিনি বাঙ্গালীদের একটি সভায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলেন—

"কাউন্সিলে যাওয়া উচিত—গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য নয়, গবর্ণমেণ্টকে বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য (not for helping

ut for embarrassing the Government by making appointment of minister impossible by our voting.)"

ডিব্রুগড় হইতে আসিয়া তিনি ৺কাশীধাম যান। সেখানে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়া প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করেন। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় ৩০শে নবেম্বর তারিখে সাংবাদিকদের নিকটে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন—

"Non-co-operation is our only chance—Complete programme of Non-co-operation with renunciation of title of honourary offices at one end and refusal to pay taxes at the other should at once be adopted and worked out within the shortest possible time. The programme of Non-co-operation is an organic whole and work should be undertaken in all directions so that a call for the enforcement of complete programme may be made within the shortest time.

"I am not for boycott of Council as I wanted to work out the principle of Non-co-operation from within the council but in obedience to Congress resolution we withdraw our candidature and the matter has no practical experience now."

"(অনুবাদ) অসহযোগই আমাদের একমাত্র ভরসা। একদিকে উপাধি বর্জ্জন এবং অনারারী কার্য্য পরিত্যাগ এবং আর দিকে ট্যাক্স দিতে অস্বীকৃতির সহিত অসহযোগের পূর্ণ কার্য্য-পদ্ধতি অতি সত্বর গ্রহণ করা উচিত এবং যতদূর সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। অসহযোগ কর্ম্মপদ্ধতি একটি জীবন্ত (organic) প্রতিষ্ঠান। যাহাতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অসহযোগ কর্ম্মপদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় তার জন্য সকল দিক দিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

"আমি কাউন্সিল বয়কটের পক্ষপাতি নই। কারণ, অসহযোগ নীতি আমি কাউন্সিলের ভিতরেও অবলম্বন করিতে চাই কিন্তু কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব শিরোধার্য্য করিয়াই আমরা এবার নির্ব্বাচনপ্রার্থী হই নাই।"

কিন্তু সেই বৎসর (১৯২০) নির্ব্বাচনের বৎসর বলিয়া কলিকাতার কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাবিত মন্তব্য ও উহার সর্ত্তগুলি খুব জোরের সহিত লিপিবদ্ধ হয়। যেমন:

This Congress earnestly advises—

(f) - Withdrawal by candidates of their candidature for election to the reformed councils and refusal on the part of the voters to vote for any candidate, who may, despite the Congress advise, offer himself for election.

"নবপ্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রানুসারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন বর্জ্জন করিতে হইবে। কংগ্রেসের নিষেধ সত্ত্বেও যাঁহারা নির্ব্বাচন প্রার্থী হইবেন, ভোটারগণ তাহাদিগকে ভোট দিবেন না।"

এ সম্বন্ধে কলিকাতা কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন—

"আমি চাই সম্পূর্ণ দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র। এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। বোম্বাই-এ (১৯১৮ সেপ্টেম্বর) আমি ইহা চাহিয়াছিলাম, কিন্তু মডারেটরা যাহাতে আমাদিগকে ছাড়িয়া না যান সেই জন্য দাবী একটু হ্রাস করিয়াছিলাম। দিল্লীতে সেই দাবী আরও বাড়াইতে চাহিয়াছিলাম। (১৯১৮ ডিসেম্বর)। তারপর ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ও খিলাফতের অনাচার সংঘটিত হইল। আজ আমি আমাদের দাবী (demand) কমাইব কেন? নন্‌কোয়াপারেশন শ্রেষ্ঠ পন্থা সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট ধারণা চাই।"

যাহা হউক, অসহযোগ পাশ হইয়া যায় এবং প্রকারান্তরে চিত্তরঞ্জন পরাস্তই হন। স্বর্গীয় অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতি মনীষীগণও লেখককে ঐ সময়েই বলিয়াছেন—

"দেশের কথা কাউন্সিলে বক্তৃতার সময়ে নির্ভয়ে কোন রাজদ্রোহমূলক অভিযোগের আশঙ্কা না করিয়া যে কাউন্সিলে বলা যায়, এরূপ সুবিধা অপহৃত হওয়া ক্ষতিজনক।"

কলিকাতা অধিবেশনের তিন মাস মহাত্মাজী মৌলানা সৌকত আলীকে লইয়া সমস্ত স্থান ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসহযোগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন। মিঃ দাশও চুপ করিয়া থাকেন না। তিনিও এ বিষয়ে বিষম ভাবনায় পড়িয়াছিলেন। একদিকে পাঞ্জাব অত্যাচারের পরে গবর্ণমেন্টের উদাসীনতায় বুরোক্রেসীর সহিত সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগে দেশবাসীর প্রবল আগ্রহ অপরদিকে কাউন্সিল বয়কট সম্বন্ধে তাঁহার অনিচ্ছা। তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তবে ইতিমধ্যে নির্ব্বাচনের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইলেও ঐ বৎসর ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিল নির্ব্বাচনের কোন জাতীয়তাবাদীই (ন্যাসনালিষ্ট), যোগদান করিবেন না, তাহা স্থির করেন। মেসার্স দাশ, চক্রবর্ত্তী, যতীন সেনগুপ্ত, জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, কে, লাহিড়ী প্রভৃতির অনুপস্থিতিতে নব-গঠিত কাউন্সিল যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

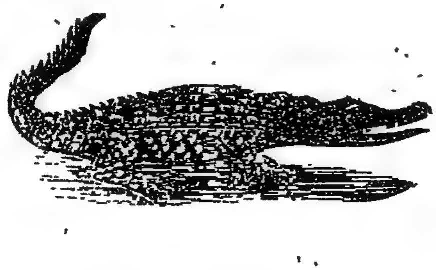

পুস্তক ও আলোচনা

শেষের গান : কাব্য। শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস্, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০ মাত্র।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে কবি কালীকিঙ্কর কাব্যসরস্বতীর বীণা-তারের সব চাইতে প্রয়োজনীয় তারটিই সঙ্গে নিয়া আসিয়াছেন। সেখানে যে সুর বাজে, তাহা শুধু শ্রবণেন্দ্রিয়কেই তৃপ্ত করে না, অন্তরকেও অভিষিঞ্চিত করে। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই হৃদয়ধর্ম্মী—যাহা কেবল মননপ্রধানই নয়, বুদ্ধিবৃত্তির সাথেও একত্রে সংযুক্ত। শেষের গানের নামীয় কাব্যটি কাহিনীপ্রধান—যাহার আবেদন একমাত্র প্রাণের বাছেই, এবং প্রাণের কাছে বলিয়াই অন্তরস্পর্শী। অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'অন্ধ ভ্রমর', 'স্বপ্নাতীত', 'দরবেশ', 'অন্ধ আঁখির কৃষ্ণকুসুম' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই পল্লী-প্রদীপের শিখার মতো স্নিগ্ধ ও মনোরম, কোথাও বিজলী বা গ্যাসালোকের উগ্রতা নাই।

জনকল্যাণে সোভিয়েট-বিজ্ঞান : শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ২৯, বাদুড়-বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন বিষয় লইয়া বাংলা সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই মার্ক্সীয় দর্শনবিষয়ক। রাশিয়ার প্রাণকেন্দ্র যে কৃষি ও শিল্পবিজ্ঞান—সে সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে তেমন উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয় নাই। আলোচ্য গ্রন্থের মধ্য দিয়া লেখক সেই গুরু অভাবের কথঞ্চিৎ নিরসন করিয়াছেন। রাশিয়ার ভৌগোলিক পরিবেশ-হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উদ্ভিদ, খনিজ, কৃষি ও বিভিন্ন শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে লেখক অতি প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করিয়াছেন। পৃথিবীর আদর্শ দেশ আজ রাশিয়া, তাহার সমস্ত কিছু উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই উদ্ভিদ, খনিজ প্রভৃতি। তৎসম্পর্কে কিছু না জানিলে বাহির হইতে রাশিয়াকে শুধু নামেই দেখা যাইবে, ঠিক তাহার প্রকৃত ক্ষেত্রে তাহাকে উপলব্ধি করা যাইবে না। গ্রন্থখানি শুধু পাঠ হিসাবেই নয়, ইহার দ্বারা আমাদের দেশকেও বুঝিতে পারা যাইবে, এবং রুশিয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কি ভাবে এ দেশেরও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্ভব, তাহারও প্রেরণামূলক ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

নতুন সূর্য্য : উপন্যাস। শ্রীমনসা চট্টোপাধ্যায়। ভারতীবীথি, ৪৩।১বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲ টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত মনসা চট্টোপাধ্যায় ক্ষুরধার লেখনী হাতে নিয়াই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়াছেন। প্রাঞ্জল ভাষা ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গীর স্বাভাবিক সংযোগে 'নতুন সূর্য্যের' কাহিনী হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে। গ্রন্থখানি স্বল্পপরিসরে সমাপ্ত; উপন্যাস না বলিয়া বড় গল্প বলিলেই গ্রন্থখানিকে ঠিক মর্য্যাদা দেওয়া হয়। দিবাকর, তমসা, মিনতি, সোমেশ, রেখা—প্রত্যেকেই ছোট ছোট চরিত্র; কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও তাহারা মনের উপর বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়া যায়। মনসা বাবু প্রধানতঃ রোমাণ্টিক-ধর্ম্মী লেখক। 'নতুন সূর্য্যে'ও তাঁহার সেই সহজাত ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকাশই লক্ষ্যে পড়ে।

NETAJI SPEAKS : Compiled by Sati Kumar Nag, Chayanika Publishing House, 52, Sitaram Ghose Street, Calcutta. Price Rs. 2/4/- only.

শিশু-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে শ্রীযুক্ত নাগ ইতিপূর্ব্বেই সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। নেতাজীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার সংকলিত এই গ্রন্থটিতে। নেতাজীর বিভিন্নকালীন বিবৃতি ও অভিভাষণ উদ্ধৃত করিয়া সাধারণ পাঠকের পক্ষে নেতাজীর বিপ্লবী জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়ায় শ্রীযুক্ত নাগ তাঁহার পাঠকবৃন্দের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থখানির সার্থক প্রচার হইবে বলিয়াই মনে করি।

বিদ্রূপ ও বহ্নি : কবিতা। শ্রীরঘুনাথ ঘোষ। প্রবর্ত্তক পাবলিসার্স, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৷০ মাত্র।

'বিদ্রূপ ও বহ্নি'র কবি বাংলা সাহিত্যে নবাগত হইলেও লেখনীতে তাঁহার ধার আছে। কবিতাগুলির অধিকাংশই সাম্প্রতিক কালের সমস্যা ও আন্দোলনের উপরে রচিত। তাহাতে কোথাও কবির লেখনী জলন্ত বিদ্রূপের বহ্নি প্রকাশ করিয়াছে, কোথাও বা অন্তর্মুখী ভাববিলাসের দিকে তীব্র শায়ক নিক্ষেপ করিয়াছে। অধিকাংশ কবিতার সুর প্রায় একই নীড়ে বাঁধা। কবি এখনও পুরাপুরি আত্মধর্ম্মী হইয়া উঠিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে আরও উচ্চ শ্রেণীর রচনা আশা করি।

রূপ-লোক

[বাংলা চলচ্চিত্র]

বাংলা চলচ্চিত্রের যে ক্রমেই মোড় ঘুরিতেছে, তাহা অত্যন্ত আশার লক্ষণ। গত কয়েকমাস যাবৎ ইহা লইয়া আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি এবং বিশেষভাবে শিক্ষামূলক চিত্রগ্রহণের জন্য বারংবার আমরা চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালকবৃন্দের নিকট আবেদন জানাইয়াছি। যে-দেশ শিক্ষার পথে অনগ্রসর এবং যে প্রপীড়িত জাতির জীবনে জ্ঞান ও মুক্তির বহুতর বিকাশের পথ আজও সার্থকরূপে উন্মুক্ত নয়, সেই দেশ ও জাতির জন্য ভাববিলাসী শিল্প শুধু মায়াচ্ছন্ন অসার্থকই নয়, ক্ষতিকারকও বটে। বাংলা দেশ সম্পর্কেও ইহাই প্রযোজ্য। রাশিয়া আজ সর্ব্বাঙ্গীণভাবে পৃথিবীর বৃহত্তর স্বাধীন দেশগুলির অন্যতম এবং শিক্ষার পথেও রাশিয়া আজ অন্যান্য জাতিসঙ্ঘের তুলনায় অগ্রগামী কম নয়, কিন্তু সেখানকার চিত্রশিল্পে দেখা যায়—শিক্ষা ও গঠনমূলক কর্ম্মধারার উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে বেশী। তাহারা জানে, জ্ঞান ও শিক্ষার সীমা নাই এবং জাতির সীমাহীন এই বিস্তৃতির পথে তাহারা বহুতর পরীক্ষা ও গবেষণার কাজে শিল্পমনকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। এই অমোঘ উদাহরণকে কথা বা গল্পাকারেই শুধু না রাখিয়া আমরা যদি জাতির সর্ব্বতোমুখী কল্যাণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হই এবং জনসাধারণের সস্তা রুচি অনুযায়ী চিত্র-শিল্পকে ব্যবহার না করিয়া শিক্ষামূলক পদ্ধতিতে সুশোভনাকারে ক্রমাগত জনসাধারণের কাছে তাহা তুলিয়া ধরি, তবে শুধু চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক মর্য্যাদাই অক্ষুণ্ণ থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে আদর্শগত দেশ ও জাতিগঠনও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। অনেকে আশঙ্কা করেন বটে যে, প্রচারমূলক শিল্প কখনও রসবস্তু ও শিল্পসার্থক হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু এ-ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। রসবস্তু নির্ভর করে কাহিনীকার ও পরিচালকের উপরে। তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিবে—জাতীয় প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সার্থক বস্তু পরিবেশনের মধ্যেও সুকুমার কলার যাহাতে সংযোজন রক্ষিত হয়। এই সুকুমার কলা যে কি বস্তু, তাহা আলোচনপ্রসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই তাহার সংযোজনা লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং ইহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কাহিনীকার ও পরিচালকেরই মার্জ্জিত রুচি ও মনোবিশ্লেষক জ্ঞানের প্রভাব (excellency of aesthetic taste and Psycho-cultural influence.)

'উদয়ের পথে', 'অভিযাত্রী', 'ভাবী কাল', 'পথের দাবী' 'নতুন বৌ' প্রভৃতি ছবিতে আমরা চিত্রপ্রগতিরই পরিচয় লক্ষ্য করি। কিন্তু এখনও যে জাতীয় কল্যাণের খাঁটি পথে গঠনমূলক চিন্তাধারায় বাংলা চিত্রশিল্প পূর্ণভাবে অগ্রগতির বেগ খুঁজিয়া পায় নাই, তাহা সুনিশ্চিত। চলচ্চিত্র জগতের একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ বিপুল সাড়া নিয়া আসিল 'উদয়ের পথে' এবং সেই হইতে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে, সস্তা ভাবপ্রবণ কাহিনীর সঙ্গে কতকগুলি 'জাগৃতি শব্দ' জুড়িয়া দিয়া সুবুদ্ধির ক্ষেত্রকেও প্রযোজকেরা ঘোলাটে করিয়া তুলিয়াছেন। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙালী দর্শকবৃন্দের হৃদয় আকর্ষণ করিলেও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা যে ইহা মার্জ্জনা করিয়া উঠিতে পারেন না, তাহার পরিচয় আমরা প্রায়ই পাইয়া থাকি। কিন্তু কথা হইতেছে, ঐ পাওয়া পর্য্যন্তই। চিত্র-প্রযোজকদের তাহাতে কিছু আসিয়া যাইতেছে না। তাহার প্রধান কারণ হইল, যাহা কিছু আমরা পাই, জীবনে হজম করিয়া যাই, তাহা লইয়া আন্দোলন তুলি না। 'চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি' নামেও একটি বৃহত্তর সমিতি কিছুকাল যাবৎ কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মপ্রয়াসও আজ পর্য্যন্ত কিছু একটা সার্থক আন্দোলন তুলিতে পারে নাই।

অনেকে বিষয়টাকে Theory of Evolution মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, বিবর্ত্তনশীল জগতে পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক এবং বাংলা চলচ্চিত্রেও একসময় সেই কার্য্যকরী পরিবর্ত্তন আসিবেই, কিন্তু ইহা হইল হবুচন্দ্র রাজার স্বপ্ন-দর্শনের কথা। নিষ্ক্রিয়তার লক্ষণই এই। Evolutionতো আছেই, কিন্তু তাহার সঙ্গে বিশেষভাবে প্রয়োজন সক্রিয় শক্তির। সেই সক্রিয়তার পরিচয় পাই কোথায়? দেখিবার প্রয়োজন —জাতির উন্নতিকল্পে কি, কি বস্তু আজ আবশ্যক। ফিসারিজ, পোল্‌ট্রি হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রন্থাগার, বৈজ্ঞানিক লেবরেটরী পর্য্যন্ত যাহা কিছু কাম্য ও আবশ্যক, প্রয়োজনবোধে তাহার প্রবর্ত্তনাও আজ আবশ্যক বৈ কি? নইলে দেশের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, শিক্ষার দারিদ্র্য ও পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্তি আসিবে কিসের উন্মাদনায়। লোকশিক্ষা ও জাতিগঠনের প্রধান মাধ্যমই হইতেছে চলচ্চিত্র। সেই কথা স্মরণে রাখিয়া শিক্ষিত ও ত্যাগী ব্যক্তিদের আজ এই পথে অগ্রসর হওয়া যে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভুলিলে শুধু দেশের ক্ষতিই হইবে না, অধঃপতনের পথে দেশের সংস্কৃতি ও জীবনীশক্তিও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

সম্পাদকীয়

নববর্ষ

এই নববর্ষে আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বন্ধুবান্ধবদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। সকলের চেষ্টায় দেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা হউক, ইহা আমাদের সর্ব্বপ্রাথমিক প্রার্থনা। ভারতবাসিগণ সম্পূর্ণ দায়িত্বমূলক ক্ষমতা গ্রহণে তখনই সমর্থ হইবে, যখন তাহারা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্ম-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ভগবান ভারতসন্তানগণকে এই সুমতি প্রদান করুন।

লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের দায়িত্ব

গত ২৩শে মার্চ্চ ভারতের নব নিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন এদেশে পদার্পণ করিয়াছেন। প্রকাশ, ইনি বিলাতের শ্রমিক ও সোসালিষ্ট সরকারের ঘোষিত ভারতত্যাগের নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উক্ত পার্টির মনোনীত ব্যক্তিরূপে ভারতের শেষ ভাইসরয় হইয়া এদেশে শুভাগমন করিয়াছেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে ফলাও করিয়া আরও প্রকাশ করা হইয়াছে যে, লর্ড ক্লাইভ প্রতিষ্ঠিত এবং হেষ্টিংস, ওয়েলেসলি, ড্যালহৌসী, লীটন পুষ্ট বৃটেনের এই সাম্রাজ্যবাদ-বিপণিটি বন্ধ করিবার কাজে লর্ড লুই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি, কারণ তিনি নাকি বহু বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। তিনি সুপুরুষ, উচ্চতায় ৬ ফিট চার ইঞ্চি, শ্মশ্রুমান। ভারত সাম্রাজ্যাধিপতি ৬ষ্ঠ জর্জ্জের তিনি নিকট আত্মীয়, সমুদ্র-শাসন বৃটিশ নৌ-বাহিনীর জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ এবং দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া কমাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব সর্ব্বাধিনায়ক। তদুপরি লর্ড লুইয়ের শৈশবের কতকটা সময় নাকি অতিবাহিত হইয়াছে এই ভারতেই, ভারতীয়দের মধ্যে তাঁহার বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি অনেকেই এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী কালীন গভর্ণমেণ্টের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহাদের অন্যতম।

দায়িত্বসম্পন্ন একই ব্যক্তির মধ্যে এতগুলি গুণের সমাবেশ প্রকৃতই শ্লাঘনীয়। তবু আমরা যাহারা সাধারণশ্রেণীর ভারতবাসী তাহাদের বিশ্বাস লর্ড লুই যে কার্য্যে নিযুক্ত, সে কর্ত্তব্য সম্পাদন উক্ত শ্লাঘনীয় গুণের কোনটাই তেমন গণ্য হইবে না। এ কার্য্যে গণ্য হইবার মত যাহা প্রয়োজন তাহা কেবল ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে পক্ষপাত-শূন্য ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সেই দৃষ্টি

ভারতের নবনির্ব্বাচিত ভাইসরয় লর্ড লুই মাউণ্ট্ব্যাটেন্

অনুযায়ী সুসংবদ্ধ কার্য্যবিধি। বর্ত্তমানে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা একটু জটিল—এ কথা নিঃসন্দেহ কিন্তু নিশ্চয়ই অস্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বৃটেনের সাম্রাজ্য রক্ষার কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে বৃটেন স্বাধীনতাকামী যুদ্ধমান ভারতের সহিত

আপোষপ্রার্থী। স্বাধীনতাকামী যুদ্ধমান ভারতের প্রতিনিধি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দও বৃটেনের সহিত আপোষ স্থাপনে আগ্রহশীল। কিন্তু সে জন্য বৃটেনের অনুগ্রহ-লালিত ব্যবচ্ছিন্ন ভারত তাঁহাদের কাম্য নয়। শক্তিমান্ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট-শাসিত শক্তিমান অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের একমাত্র অভিলাষ। অর্থনৈতিক সুযোগ আদায় করিবার জন্য বৃটেন চায় ভারত অখণ্ড থাকুক। এই অভিপ্রায় বৃটেনের আপোষ-পত্র ১৬ই মের ক্যাবিনেট মিশন ঘোষিত বিবৃতিতে স্পষ্টই ব্যক্ত হইয়াছে এবং সেই ঘোষণা কংগ্রেসও সম্পূর্ণভাবে মানিয়া লইয়াছে। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই পর্য্যন্ত অত্যন্ত স্বচ্ছ। মুসলীম লীগ-অবলম্বিত নীতির ফলে অবস্থা ইতিমধ্যে জটিল হইয়াছে, তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই অবিদিত নাই।

উপস্থিত মুহূর্ত্তে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দুইটি সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—একটি মুসলীম লীগ-ঘোষিত প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম-নীতির ফলে ভারতের ক্ষত-বিক্ষত নাগরিক জীবন, দ্বিতীয়টি মুসলীমলীগ কর্ত্তৃক গণপরিষদ বর্জ্জনের ফলে অচলাবস্থা। এই দুটি বিষয়েরই উপযুক্ত মীমাংসা করিবার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা লর্ড লুইয়ের করায়ত্ত। পূর্ব্বতন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের নির্লিপ্ততায় এবং ঔদাসীন্য-নীতিতে (Non-intervention) যে সাম্প্রদায়িক কলহাগ্নি ভারতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেনও যদি সেই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ থামাইবার সকল দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া না বসেন, তবে অনায়াসেই সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের, পাঞ্জাব প্রদেশের, বাঙ্গলা ও আসামের সাম্প্রদায়িক প্রাণহানিকর গোলযোগ তিনি অবসান করিতে পারিবেন। ১৬ই মের এবং ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি অনুযায়ী অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদানকারী মুসলীম লীগের সভ্যগণ গণপরিষদেও যোগদান করিতে বাধ্য, নতুবা অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার হইতে তাহাদের দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে—পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী এই সহজ কথাটাও লর্ড লুইয়ের স্পষ্ট, নির্ভীক ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অনতিবিলম্বে অভিব্যক্ত করা উচিত। লর্ড লুই মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না, পণ্ডিত জওহরলাল, মিঃ লিয়াকত আলি ও আচার্য্য কৃপালনী প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যে খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিতেছেন তাহা খুবই সঙ্গত, সন্দেহ নাই। কি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু আমাদের মতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মীমাংসা এবং মুসলীম লীগের প্রতি গণপরিষদে যোগদান সম্বন্ধে নির্দ্দেশ সর্ব্বাগ্রে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় ও সর্ব্বাগ্রে তাহাই করণীয়।

তৎপরেই (এমন কি সঙ্গে সঙ্গেই) ইহাও স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতে হইবে যে, অখণ্ড ভারতের নেতৃবৃন্দের (জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে) হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবে। ইহা যেমন ভারতের পক্ষে, তেমনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের হিতের পক্ষেও একান্ত আবশ্যক। কেননা, অখণ্ড ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশ ও স্বাধীন রাজ্য পরস্পর পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্যভাবে বাস করিয়া সমগ্র ভারতের কৃষ্টি, সম্পদ্ ও শক্তি বৃদ্ধি করিবে এবং সেই শক্তিশালী ভারত ইংলণ্ডের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একে অন্যের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সমগ্র জগতের উপর কৃষ্টি ও ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইবে, এই কথাটি সর্ব্বাগ্রে লর্ড লুইয়ের অবহিত হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আপাততঃ এই কথাটিই প্রধান বিবেচ্য ; ভারত ত্যাগের শেষ কৃত্যগুলি সুসম্পন্ন করিতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত অবশিষ্ট যে আলোচনা চালান হইবে—সেগুলি আস্তে আস্তে করিলেও চলিবে। কিন্তু অবশ্য করণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিতও এ পর্য্যন্ত ভারতবাসী পাইতেছে না। সাম্প্রদায়িক গোলযোগের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার কণ্ঠরোধ হওয়া দেশের সাম্যাবস্থার (equilibrium-এর) জন্য একান্ত দরকার এই বিষয়টি অনুধাবন করিয়া প্রকৃত ব্যবস্থা করা লর্ড লুইএর সর্ব্বাগ্রে করণীয়। ভরসা করি তিনি ইহাতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

এশিয়ার আত্মবিকাশ

প্রায় সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইবার পর পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচিত হইতেছে। এক নূতন মানবগোষ্ঠির এক নূতন জীবন-দর্শন হইবে এই অধ্যায়ের উপজীব্য। কত শতাব্দীর আত্ম-বিস্মরণ, কত যুগের নিপীড়ন ও অজ্ঞতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক নূতন মানবজাতি ধীরে ধীরে আত্মবিকাশ লাভ করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ঝলসিত অঙ্গরাগের পাশে আজও হয়তো এই নূতন আগন্তুকের উপস্থিতি ম্লান হইয়া আছে। আজ হয় তো অণুবোমার প্রচণ্ডতম নির্ঘোষে উহার কণ্ঠস্বর স্তিমিত—কিন্তু তবু দুর্জ্জয় পদক্ষেপে আগন্তুক অগ্রসর হইতেছে। শ্রুতিবিদারী বিস্ফোরণের সঙ্গেই সে উচ্চারণ করিতেছে মহামানবের বাণী—শান্তির সাম-গাথা। এই নূতন মানব এশিয়ার মানব। ইহাই ছিল রামমোহনের স্বপ্ন আর এই বাণীই এক শতাব্দী পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। মহাত্মা গান্ধী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্রও এই বাণীই সফল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন।

গত তিন শতাব্দী ধরিয়া এশিয়া ছিল শ্বেত সাম্রাজ্য-

বাদের লীলাভূমি। জনশক্তির বিরাট ভাণ্ডার এশিয়া, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধিশালিনী এশিয়া গত মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত কেবল শ্বেতজাতির লুণ্ঠনের থলি ভর্ত্তি করিয়াছে। পৃথিবী-জাত রবারের নব্বই ভাগ এইখান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। প্রতিবৎসর সমস্ত পৃথিবীতে যে পরিমাণ টিন পাওয়া যায় তাহার শতকরা ৬০ ভাগ এবং শতকরা ৯০ ভাগ কুইনিন এই বিরাট ভূখণ্ড হইতে ইয়োরোপে চালান গিয়াছে। ইহা ছাড়া, টাংষ্টেন, ম্যাঙ্গানিজ, চিনি, চাউল, চা, পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদ যে কত লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার তো কোন ইয়ত্তাই নাই। পাশ্চাত্যের বিরাট শিল্প-বাণিজ্যের প্রাণশক্তিই এই কাঁচা মালের সরবরাহের উপরে প্রধানতঃ নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু এই বিরাট সম্পদের বিনিময়ে এশিয়ার মানব ইয়োরোপ হইতে পাইয়াছে শুধু অজ্ঞতা, সীমাহীন শোষণ এবং শোচনীয় দারিদ্র্য।

এশিয়ার মানব ইউরোপের এই অমানুষিক শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে বহুবার। ১৯০৫ সাল হইতে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিয়াছে। ভারতের সেই সংগ্রামে এশিয়ার সমুদয় শোষিত অধিবাসী উদ্বুদ্ধ দৃষ্টিতে ভারতের দিকে চাহিয়া ছিল! কারণ ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়া ভারতই এশিয়ার প্রাণ-কেন্দ্র। ভারতের মুক্তিতে এশিয়ার মুক্তি। তার পর এশিয়ার মানব মুক্তি-আকুল চিত্তে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত করিয়াছিল নবজাগ্রত ও নূতন শক্তিতে প্রাণবন্ত জাপানের প্রতি। এশিয়াকে মুক্ত করিবার, এশিয়ার মৈত্রী-সংস্কৃতিকে পৃথিবীর দুয়ারে হাজির করিবার দুর্জ্জয়শক্তি জাপানের ছিল; কিন্তু ক্ষমতা-মত্ত জাপান উৎপীড়িত এশিয়ার মুক্তিসাধনে সেই শক্তি নিয়োজিত করে নাই বরং উৎপীড়ক পশ্চিমের সহিত হাত মিলাইয়া সে প্রথমে স্বজাতিকে শোষণ করিতেই সচেষ্ট হইয়াছে, পরে শোষণের ক্ষেত্রে সে হইতে চাহিয়াছে একক ও নিরঙ্কুশ। এশিয়াবাসী হিসাবে সে একাই এশিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ভাবে শোষণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। ফলে স্বার্থের সহিত স্বার্থের সংঘর্ষ বাধিয়াছে, আসিয়াছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এবারেও জাপান তার সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা ত্যাগ করিয়া প্রকৃতপক্ষে এশিয়ার মুক্তির জন্য শক্তি নিয়োগ করিল না। অবশ্য এশিয়াবাসীর সমর্থন লাভের জন্য মুখে সে এশিয়াবাসীর জন্য ছদ্ম কো-প্রস্‌পারিটি নীতি ঘোষণা করিল বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ পূর্ব্বের মতই এশিয়াবাসীকে সে শোষণেই রত রহিল। ফিলিপাইন, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্ম প্রভৃতি মুক্তিকামী দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যে দেশগুলি জাপানের ছদ্ম মৈত্রীর বাণীতে বিভ্রান্ত হইয়া বিপুল আবেগে তাহার দিকে সহায়ক হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল, তাহাদের মোহ অনতিবিলম্বেই ভাঙ্গিয়া গেল। এই সময়টা গত মহাযুদ্ধের শেষকাণ্ড। ইয়োরোপে তখন জার্ম্মানী পরাজিত, মিত্রশক্তি বিপুল শক্তিতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে জাপানের উপর আক্রমণ সুরু করিয়াছে। পশ্চিমের প্রভুত্ব-কবল হইতে সদ্যমুক্ত

সরোজিনী নাইডু

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার উক্ত দেশগুলি নবীন শোষক জাপানের কবল হইতে মুক্তিলাভের এই সুযোগ নষ্ট করিল না। জাপানের দেওয়া অস্ত্র ও সমর-রসদ লইয়াই স্ব স্ব দেশের অন্তঃস্থল হইতে সে জাপানী বাহিনীকে আঘাত করিল, অতঃপর মিত্রশক্তির সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া জাপানকে ভূমিচ্যুত করিল। এশিয়ার মানবের মুক্তি-সাধনায় এই পর্ব্ব প্রথম পর্ব্ব।

ইহার পর আসিল দ্বিতীয় পর্ব্ব। এই পর্ব্ব সাম্প্রতিক ইতিহাসের মাত্র বৎসরাধিক কালের ঘটনা। কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যেই যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ইতিহাসে এশিয়ার

ভূমিকা একটা বড় অংশ অধিকার করিয়াছে। এই ভূমিকাতেই তাহার বিশ্বজিৎ নূতন রূপ প্রকটিত। এশিয়ার জনশক্তির সহায়তায় জাপানকে পরাভূত করিয়া পুরাতন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ এশিয়ার বুকের উপরে আবার জাঁকিয়া বসিবার চেষ্টা করে। অবশ্য তাহার মুখে প্রশান্ত-মহাসাগরীয় সনদ ও চতুঃস্বাধীনতার নূতন ভাষা উচ্চারিত ছিল বটে—কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার হস্তে উদ্যত ছিল উদ্ধত অস্ত্র। কিন্তু নবজাগ্রত এশিয়া এবারে আর ভয়ে পিছু হটিল না। ইতিহাসের নূতন শিক্ষায় তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রে মরিচা ধরিয়াছে, মরণ-পণ করিয়া সেই অস্ত্রের বিরুদ্ধে অঘাত করিতে পারিলে সেই অস্ত্রেও ভাঙ্গন ধরানো যায়। তাই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ডাচ ও ফরাসী শক্তির সহিত ইন্দোনেসিয়াবাসী ও ভিয়েটনামের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ বাঁধিল, মালয়ের সকল জাতির অধিবাসী, ব্রহ্মের ফ্যাসি-বিরোধী জনসংঘ বৃটিশ শক্তির সহিত নৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল। ভারতের গণপ্রাণে আসিল নূতন জোয়ার। তবু শোষণের ঐতিহ্যগর্ব্বী পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ প্রথমে এশিয়ার এই নবশক্তিকে তাহার চিরাচরিত নিপীড়নেই দমিত করিতে চাহিল, জোট বাঁধিয়া সে তাহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা স্থাপনে কৃতযত্ন হইল। স্বার্থের সহিত স্বার্থের মিলন ঘটিল। কিন্তু এশিয়া দমিল না। অতঃপর ধীরে ধীরে ইতিহাসের নূতন অভিব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদেরও দৃষ্টিগোচর হইল। সে বুঝিল, তাহার পুরাতন প্রভুত্বের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িতেছে, অপরাজেয় এশিয়াকে এখন আর অস্ত্রের আস্ফালনে পদদলিত করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না, তাহার সহযোগিতা পাইতে হইলে মিত্ররূপেই সেই সহযোগিতা অর্জ্জন করিতে হইবে। এবার আর গ্রাস নয়, এবারে আপোষ। পাশ্চাত্যের এই নূতন উপলব্ধির ফল আমরা ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মিশর প্রভৃতি এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

কিন্তু আজও এশিয়ার মানব তাহার মুক্তি-যুদ্ধে সত্যকার জয়লাভে সমর্থ হয় নাই। আজও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের কূট ভেদনীতি এশিয়ার মৃত্তিকা ত্যাগ করিয়া যায় নাই। এশিয়ার জয়যাত্রা আজও নানা সংশয় ও পরস্পরের প্রতি নানা অবিশ্বাসে মন্থর। আজও প্যালেষ্টাইনে আরব-ইহুদির বিরোধ অমীমাংসিত, সুদানের সমস্যায় মিশরের পটভূমি আবর্ত্তিত, সাম্প্রদায়িক বিরোধে ভারতের মাটি রক্তরঞ্জিত, রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধে ব্রহ্মবাসী রুদ্ধশ্বাস, ভ্রাতৃযুদ্ধে চীনের দেহ জর্জ্জরিত। এই পারস্পরিক বিভেদকে সামনে রাখিয়া নূতন এক পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ নূতন ছদ্মবেশে আবার এশিয়ায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই সাম্রাজ্যবাদের অভিধা মার্কিন ডলার সাম্রাজ্যবাদ। উনিশ শতকের সংজ্ঞায় এই নূতন সাম্রাজ্যবাদকে ব্যাখ্যা করা যাইবে না, কারণ প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের মত প্রত্যক্ষ শোষণ ইহার ধর্ম্ম নয়, ঔপনিবেশিক প্রভুত্বও ইহার অনাকাঙ্ক্ষিত। ইহা চায় কেবল স্বদেশের উৎপাদিত যন্ত্রশিল্পের জন্য অবাধ বাজার। এশিয়ার উৎপাদন-ক্ষমতাকে নষ্ট করিয়া আমেরিকা এশিয়ার অর্থনীতিকে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল করিতে যত্নবান্।

অবশ্য এই নূতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে এশিয়ার সকল দেশের অধিবাসী আজও উপযুক্ত ভাবে সচেতন হইতে পারে নাই, কিন্তু এশিয়ার মানব একথা স্পষ্ট বুঝিয়াছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহাকে পাশ্চাত্য-প্রভাবমুক্ত নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন চিন্তাধারা অবলম্বন করিতে হইবে। যৌথ প্রচেষ্টায় তাহাকে পাশ্চাত্য-প্রভাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। এই উপলব্ধিরই আত্মপ্রকাশ আমরা দেখিলাম দিল্লীর পুরানা কিল্লা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনের অধিবেশনে। জাগতিক ইতিহাসে এই অধিবেশন একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। এশিয়ার সকল জাতির প্রতিনিধিরা এখানে মিলিত হইয়া এশিয়ার নূতন সঙ্কল্পে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এশিয়া হইতে ইয়োরোপ ও আমেরিকার সমুদয় প্রভাব দূরীভূত করিবেন, কিন্তু প্রতিরোধের অস্ত্রে নয়, মৈত্রীর আহ্বানে। নবপরিকল্পিত স্থায়ী এশিয়া-পরিষদের মাধ্যমে এশিয়ার সাম্য ও সহযোগিতার ঐতিহ্যকে তাঁহারা সমবেত ভাবে জগৎবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন। পৃথিবীর বুকে সর্ব্বযুগের ও সর্ব্বদেশের প্রার্থিত শান্তি এশিয়ার মানবই প্রতিষ্ঠিত করিবে।

আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলনের ঐতিহাসিক প্রথম অধিবেশন সর্ব্বতোভাবেই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, এই কথা সম্মেলনে আগত এশিয়ার সকল দেশের সমুদয় প্রতিনিধিই ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু তবুও একটি অপূর্ণতা ভারতবাসীকে কিছুটা ক্ষুব্ধ করিয়াছে। এই অপূর্ণতা সম্মেলনে ভারতীয় মুসলীম লীগের অনুপস্থিতি। কংগ্রেস সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য এই সম্মেলনের উদ্যোগ করিয়াছে, ইহাই ছিল লীগের অভিযোগ ও অভিমান। কিন্তু লীগের অভিযোগ কি প্রমাণিত হইয়াছে। এই সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্যের পিছনে কি কেবল জনপ্রিয়তা লাভেরই তাগিদ ছিল? একমাত্র মিঃ জিন্না ভিন্ন কি এশিয়ার কোন অধিবাসী কংগ্রেসের এই চালাকি ধরিতে পারেন? উক্ত সম্মেলনের অবিসম্বাদী সাফল্যই প্রশ্নের

উত্তর স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, কাজেই আপাততঃ এই সম্বন্ধে অধিক কিছু মন্তব্য প্রকাশে আমরা বিরত রহিলাম। সবিনয়ে কেবল একটিমাত্র কথা আমরা মুসলীম লীগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, কংগ্রেসের প্রতি অকারণ ঈর্ষ্যা তাহাদের সকল শুভবুদ্ধিকে আর কতদিন অচেতন করিয়া রাখিবে?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির প্রস্তাবাবলী সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম সর্ব্বদলের একটী সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। এখন দাঁড়াইল যে, কার্য্যকরী সমিতিই পরামর্শ করিয়াছে, তবে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় তৃতীয় ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

এই সব ব্যক্তিগণের মধ্যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ইহারা সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি সন্দেহ নাই। তবে ইহারা সকলেই বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে ইতিপূর্ব্বে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারা কেহই উপস্থিত ছিলেন না। বিরোধীয় মতানুবর্ত্তী লোকদের দূরে রাখিবার জন্যই এরূপ সংক্ষেপ ব্যবস্থা কি না, তা ঠিক বুঝা গেল না। সান্ধ্য আইনের অজুহাত খাটে না, কারণ, সভা ৬টার পূর্ব্বে শেষ হইলে কোন বাধা থাকিত না। বিশেষতঃ উপর্য্যুপরি ৪ দিনই ছিল ছুটি। বিষয়টি নিতান্ত সহজ নয়। একদিকে মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর অনাচারে বাঙ্গলার সমস্ত উন্নতি ও কৃষ্টি ব্যাহত হইতে বসিয়াছে, অন্যদিকে বাঙ্গলার প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে বাঙ্গলাকে কেবল খর্ব্ব নয়, নিশ্চিহ্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অবস্থায় যাহারা সম্পূর্ণ বঙ্গভঙ্গের পক্ষপাতী কেবল তাহাদিগকে লইয়াই পরামর্শ করার বিষয়টি সব দিক হইতেই সম্যক্ চিন্তিত হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাহা হউক, প্রস্তাবগুলি একবার আলোচনা করা সঙ্গত—

(১) ভারতের ঐক্যরক্ষা ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠার দাবী করার প্রস্তাব এবং ভারতের সর্ব্বত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার সহ যুক্ত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রস্তাব খুবই যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা এখন আর কল্পনার কথা নয়, অদূর ভবিষ্যতে ইহা বাস্তবে পরিণত হইতেছে। সুতরাং ভারতের ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং আশানুরূপ এই প্রস্তাব খুবই সময়োপযোগী।

(২) পরবর্ত্তী প্রস্তাবে ১৯৪৮ জুন মাসের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ভারতীয়গণের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। তবে ২০শে ফেব্রুয়ারীর প্রধান মন্ত্রী মিঃ এট্‌লির বিবৃতিতে যে প্রদেশবিশেষের উপর কর্তৃত্বভার দেওয়ারও ইঙ্গিত আছে, ইহার প্রতিবাদে ক্ষমতা যাহাতে ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া হয়, সেইরূপই বাঞ্ছনীয়। তাই প্রস্তাবটি খুব উপযুক্ত হইয়াছে। কারণ, ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন প্রদেশবিশেষকে ক্ষমতা দেওয়ায় ভারতের অখণ্ডত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে।

(৩) কংগ্রেস-কমিটি বাংলার ঐক্য রক্ষায় ইচ্ছুক কিন্তু সমগ্র ভারতের ঐক্যরক্ষা অধিকতর প্রয়োজন—

এই প্রস্তাবও খুবই যুক্তিযুক্ত এবং ইহাতে আমাদের সমর্থন আছে।

(৪) অখণ্ড ভারতের অন্তর্গত থাকিয়া অখণ্ড বাঙ্গলার আত্মনিয়ন্ত্রণ চলিবে, ইহা খুবই কাম্য।

(৫) গারো অঞ্চল, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রভৃতি অঞ্চল যাহাতে ভারতের ইউনিয়নের সহিত যুক্ত হইতে পারে—এই প্রস্তাবও খুবই সমীচীন।

(৬) বর্ত্তমানে অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলার আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাবেও আমাদের সমর্থন আছে।

(৭) বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে যে সাম্প্রদায়িক গভর্ণমেণ্ট একটি পৃথক্ সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের নিকটই ক্ষমতা হস্তান্তরে ইচ্ছুক হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলার যে-সব হিন্দুপ্রধান অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চায়, তাহাদের সে ইচ্ছা পূরণ করা উচিত।

এই প্রস্তাব খুবই সমীচীন, কারণ প্রধান মন্ত্রী এটলী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "অনিচ্ছুক, অংশের উপর কোন প্রকার শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া হইবে না।" সুতরাং মুসলীম লীগ যদি পাকিস্থান সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করে, তবে অন্ততঃ পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গলার হিন্দুপ্রধান স্থানগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যুক্ত করা খুবই গণতন্ত্রানুযায়ী—

এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটীর কার্য্যকরী সমিতি বাঙ্গলার যে সমস্ত অংশ ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত হইতে বাকী থাকিবে, তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি, তাহা না করিয়া একেবারে সবাসরিভাবে ভরা নৌকা বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই সম্বন্ধে কংগ্রেস-কমিটী নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পাশ করিয়াছে—

"যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ হিসাবে বাঙ্গলায় শাসনতন্ত্র রচিত হইলেও যদি (১) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য রক্ষাকবচ না থাকে (২) যৌথ নির্ব্বাচন না হয় (৩) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বিহিত না হয়, তবে বাঙ্গালাকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করা উচিত।"

যখন সমগ্র বাঙ্গলা কংগ্রেসের লক্ষ্য এবং তাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়াই ইহার পক্ষে অবশ্য করণীয়, তখন অর্দ্ধেক বাঙ্গলা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আনিয়া আর অর্দ্ধেক (যে অবস্থায়ই হউক্) একেবারে মুসলীম লীগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ায় কংগ্রেস কেবল সমগ্র বাঙ্গলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করিতে যে অসমর্থ হইয়াছে, তাহা নয়, পরন্তু পাকিস্থানেরও প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছে। মুস্লীম লীগের মন্ত্রীরা সাম্প্রদায়িকতার চরম দেখাইতেছে। এমতাবস্থায় অনিচ্ছুক হিন্দুপ্রধান স্থানসমূহকে রক্ষা করা যেমন কংগ্রেসের কর্ত্তব্য, সেইরূপ বাকী অংশগুলিকে একেবারে বিসর্জ্জন না দিয়া সেই-গুলির জন্য সমগ্র বাঙ্গলা দেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বে আন্দোলন

রিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে সেইগুলিও ইউনিয়নের সহিত যুক্ত রিতে সাফল্যলাভ করা যাইতে পারে, কংগ্রেসের তাহা করাও কান্ত কর্ত্তব্য। কংগ্রেস তাহা না করিয়া যে প্রস্তাবটি পাশ রিয়াছে, তাহা কেবল জাতীয়তা-বিরোধীই হয় নাই, পরন্তু ংগ্রেস তাহার গুরুতর দায়িত্ব সম্পাদন করিতে বিমুখ ইয়াছেন। ভাল ভাবে আন্দোলন না করার দরুণ যদি ক্ত নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত না হয়, তখন ভিন্ন পাকিস্থানী প্রদেশ হওয়া মাত্রই পূর্ব্ববঙ্গের এককোটি হিন্দুকে যে কেবারে বর্জ্জন করা হয় ও বাঘের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হয়, ংগ্রেস একবারও কি তাহা লক্ষ্য করিয়াছে? পূর্ব্ববঙ্গের হন্দুগণের প্রতি কর্ত্তব্যসম্পাদনের কোন উল্লেখ না করিয়া আজ াংলার কংগ্রেস-কমিটি যে ক্ষীণ দৃষ্টি ও অদূরদর্শিতা প্রদর্শন করিল হার ফলে বাঙ্গলার কৃষ্টির উপকার হওয়া তো দূরের কথা— াঙ্গলাকে যে কত খর্ব্ব করিবার প্রচেষ্টা হইল, তাহার ফল ভবিষ্য বাঙ্গলার সন্তানগণ হাড়ে হাড়ে বুঝিবে। কংগ্রেসের এই র্ব্বল নির্দ্দেশে মনে হয়, কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বিরোধিতা করা যে বস্থায়, তাহাপেক্ষা অদূরদর্শিতা এবং দুর্ব্বলতা কম অন্যায় নয়। বৎসরের অক্ষমতায় বর্ত্তমান বঙ্গীয় কংগ্রেস-কমিটী এই সত্যই প্রমাণ করিয়াছে। আজ যে কি বিষফল দেশবাসীকে সেবন করিতে কংগ্রেস অনুরোধ করিতেছে! ইহার পরিণাম আবার তাহাদিগকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি, কারণ, ইহাতেই ভারতের অখণ্ডত্ব বিলুপ্ত হইবে। এবং আশা করি অচিরে সমগ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি সম্মিলিত হইয়া এই অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে সাম্মিলিত যত্নে এবং আত্মরক্ষামূলক নীতির অবলম্বনে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। কংগ্রেসের শক্তির প্রতি এখনও আমরা নিরাশ হই নাই বিশেষতঃ এই বাঙ্গলার যুবকগণ এখনও সতুদ্দেশ্যে হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেও দ্বিধা করেন না। তাই আশা করি সকলে একসঙ্গে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া সেই যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা এবং সকলের ভোটাধিকার লাভে সমর্থ হইবে। আর কংগ্রেসও এই ভাবে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলে সকলেই কংগ্রেসের পতাকাতলে যোগদান করিতে বিরত হইবে না।

তারকেশ্বরে হিন্দু-মহাসভা

এবার তারকেশ্বরে তথাকথিত হিন্দু-মহাসম্মিলন হইয়া গিয়াছে। তথাকথিত কেন—ইহা উকীল-ব্যারিষ্টার এবং চাটুয্যে-মুখুয্যে অধ্যুষিত ব্রাহ্মণ-সভা বলিয়াই অনেকের ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। উকীল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি। বিমল চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক এবং ব্যারিষ্টার নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায় সম্মেলনের সভাপতি, উকীল দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মিঃ আশুতোষ লাহিড়ী ইহার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। ডক্টর এস,কে, গাঙ্গুলী, ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কানাইলাল গোস্বামী, ক্ষিতীশচন্দ্র গোস্বামী, জীবনকৃষ্ণ ব্যানার্জ্জি প্রভৃতি সম্মেলনের শ্রোতাগের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট ফোটোর মধ্যে সর্ব্বাগ্রে চোখে পড়ে সেইখানি, যাহার মধ্যস্থলে রহিয়াছেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আর দক্ষিণে মেজর জেনারেল চাটার্জ্জী এবং বামে সভাপতি এন, সি, চ্যাটার্জ্জী; উভয়েরই শিরোদেশে টুপি শোভা পাইতেছে। মেজর জেনারেল আজাদ হিন্দ বা ফরওয়ার্ড ব্লকের কি হিন্দু-মহাসভার টুপি পরিধান করিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা গেল না। যাহা হউক, সম্মিলিত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে সংগঠন বা শুদ্ধির কোন প্রস্তাব নাই; বরপণ-প্রথা এবং ছুঁৎমার্গ পরিহারের কোন কথা নাই। এই যে নোয়াখালীতে হিন্দুগণের প্রতি এত অনাচার অনুষ্ঠিত হইল, এ-সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব নাই, এই যে নিপীড়িত বা অস্পৃশ্য জাতিসমূহের অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া আবশ্যক, তাহার কোন উল্লেখ নাই, এই যে কৃষক, মুটে-মজুরদের দৈন্য ও দুর্দ্দশায় তাহারা জর্জ্জরিত হইতেছে, সে বিষয়ে কোন কথা নাই, এই যে মুসলীম লীগের অন্যায় আচরণ ও অনাচারে বাঙ্গালী হিন্দু নিষ্পেষিত হইতেছে—এই সম্বন্ধেও আত্মরক্ষামূলক কোন কথা নাই—আছে কেবল বজ্রনির্ঘোষে মঞ্চ-কম্পায়মান বক্তৃতা। সেই বক্তৃতার মধ্যে দেশের প্রধান প্রধান মহাত্মাগণকেও টানিয়া আনা হইয়াছে (অবশ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাদে)। সুভাষের নামও শতাধিকবার উচ্চারিত হইয়াছে (নতুবা যুবকগণ অসন্তুষ্ট হইতে পারে), কিন্তু অত্যাচার ও পীড়নের জন্য যে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে হইবে তাহারও কোন ইঙ্গিতই নাই। ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত নিপীড়িত জাতি-বর্জ্জিত এই সম্মিলনীর প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ মন্তব্য করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করা প্রয়োজনীয় মনে করি না, তবে এই সম্বন্ধে 'স্বরাজ' নামক দৈনিক কাগজখানির কয়েকটি উক্তি পাঠককে অনুধাবন করিতে বলি:

"নোয়াখালীর প্রচণ্ড বীভৎস মারের পর দেখিলাম হিন্দু সমাজপতিরা নড়িয়া বসিলেন। প্রথার বন্ধন শিথিল করিয়া ধর্ষিতা নারী ও ধর্ম্মান্তরিতদের বিনা প্রায়শ্চিত্তে সমাজে গ্রহণের পাতি দিলেন। রক্ষাকালী পূজা করিয়া আমরা সকল বর্ণ মিলিয়া অনাচরণীয় অংশের হস্তে প্রসাদ খাইতে লাগিলাম। মনে আশা হইল, প্রকৃতির মার খাইয়া হিন্দুরা বুঝি বা এতদিনে গৃহসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। এইবার বুঝি বা হিন্দু-মহাসভা বিবেকানন্দের পরিত্যক্ত ভেরী গ্রহণ করিয়া সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই বাঙ্গালী হিন্দুকে বাঁচাইবার, তাহার সনাতন 'সংস্কৃতি ও পারম্পর্য্য' রক্ষার অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুলভ পথ আবিষ্কৃত হইল—বঙ্গভঙ্গ। পাকিস্থানপন্থীরা অন্ধ বা

অপ্রস্তত হইলেই যদি হিন্দু রক্ষা পাইত, তাহা হইলে হিন্দুকুলে এমন কে পামর আছে যে, তাহার পোষকতা করিবে না! কিন্তু যাহাদের মনে সত্যকার সন্দেহ আছে এবং সে সন্দেহের বাস্তব ভিত্তি রহিয়াছে, তাঁহারা কেবলমাত্র বঙ্গভঙ্গের মধ্যেই বাঙ্গালী হিন্দুর বাঁচিবার পথ দেখিতেছেন না। বরঞ্চ এই আন্দোলন বাঙ্গালী হিন্দুর সংহতিকে দুর্ব্বল করিবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে।"

এই উক্তির সার্থকতায় একটা কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে—১৬ই আগষ্ট হইতে ৪।৫দিন পর্য্যন্ত যখন কলিকাতা নররক্তে প্লাবিত হইয়াছিল, তাহার পরে নানাদিক হইতে আত্মরক্ষা মূলক সমিতি ও সেবক-সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাবের হিড়িক পড়িয়া গেল। হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আজাদ হিন্দ পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, কংগ্রেস পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার খুব উৎসাহের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী আহ্বান করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া আশা ছিল। কারণ শুনিয়াছিলাম, অর্থ ও লোকের জন্য তাঁহার আবেদন নিষ্ফল হয় নাই। বিশেষতঃ আশুতোষ কলেজে সেবাদল গঠনের কথাও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু চৈত্রমাসের ঝড়ের মত সেই সব প্রতিষ্ঠান যে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার চিহ্নও নাই। তাই দেখিতেছি হিন্দুপ্রধান কলিকাতায়ও হিন্দু আজ সহায়হীন। ইহার স্থলে এখন ডক্টর মুখার্জ্জির এক বাণী—বঙ্গ-ভঙ্গ—তাহাতে বাঙ্গলার কৃষ্টি রক্ষা পাইবে, শিক্ষা রক্ষা পাইবে, হিন্দু রক্ষা পাইবে। ডক্টর মুখার্জ্জির বক্তৃতা করিবার শক্তি আছে, তাই সমর্থনও আছে। কিন্তু দুঃখ হয়, ঠিক রাস্তা তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীকে পাকিস্থান লড়িতে সংহতিসম্পন্ন হইতে বলেন না—'লড়কে লেয়েঙ্গে পাকিস্থান' বুলিও কার্য্যে ব্যর্থ করিবার কথা বলেন না—বাঙ্গলার যে সমস্ত স্থানে হিন্দুগণ নিঃসহায় অবস্থায় পীড়িত, লাঞ্ছিত, প্রহৃত এবং হত হইতেছে, তাহাদের সাহায্যার্থ বাঙ্গালী যুবককে আহ্বান করেন না—করিলে তাঁহার আহ্বানে অনেকেই সাড়া দিত—কেবল চাহেন বাঙ্গলাকে খণ্ড বিভক্ত করিয়া একটি প্রধান অংশ পরিবর্জ্জন করিতে। আত্মরক্ষার পথ ছাড়িয়া পলায়ন—সিংহবিক্রম কেদার রায়, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রের বাঙ্গলার সন্তানগণকে এই উপদেশ। অথচ হিন্দুমহাসভার সভাপতি বলেন—নেতাজী থাকিলে ইহা নিশ্চয়ই সমর্থন করিতেন। নেতাজীর সাধনা যে ছিল অখণ্ড বাঙ্গলাই, তাহা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অমিয় সেদিন প্রাঞ্জল বিবৃতিতে বলিবার পরেও নেতাজীর নামোল্লেখ না করাই বোধ হয় সঙ্গত।

যাহা হউক, হিন্দুমহাসভা যে এক লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক চাহিয়াছেন, এই প্রস্তাবটিতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। যদি এক লক্ষ হিন্দু যুবক একত্র হইয়া কাজ করিবার জন্য অগ্রসর হয়, তবে বঙ্গভঙ্গ হউক না হউক 'লড়কে লেয়েঙ্গে পাকিস্থান' বুলি এবং তদনুরূপ কার্য্যের যে বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব থাকিবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাঙ্গলার যুবক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হোক—তাহা হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতেই হউক, আজাদ হিন্দ হইতেই হউক, কি কংগ্রেস হইতেই হউক—তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। আমরা নিশ্চিত জানি যে, বাঙ্গালী যুবক নিজের বুক পাতিয়া অবলীলাক্রমে বুলেট গ্রহণ করিতে পারে, তাহার দ্বারা আত্মরক্ষাও সম্ভব, তাহাদের উপর আমাদের আশা আছে।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

গত ৫ই এপ্রিল ২২শে চৈত্র হইতে ৭ই এপ্রিল ২৪শে চৈত্র পর্য্যন্ত ৩ দিনব্যাপী কলিকাতা আশুতোষ কলেজ হলে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্ব্বিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন, এবং কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন।

সম্মেলনের বিভিন্ন শাখায় পৌরোহিত্য করেন যথাক্রমে—

শিল্পশাখা—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।
উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু
সাহিত্য-শাখা—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
উদ্বোধন করেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
বিজ্ঞান শাখা—ডক্টর পঞ্চানন নিয়োগী।
উদ্বোধন করেন ডক্টর হিমাংশুকুমার মিত্র
মহিলা-শাখা—শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর। উদ্বোধন বক্তৃতা করেন লেডী রাণু মুখোপাধ্যায়।
বৃহত্তর বঙ্গ শাখা—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু (সভাপতি)।

সম্মেলনের শেষ দিনে এক বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

দেখিতেছি, অভ্যর্থনা-সমিতি "প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য" সম্মেলন কলিকাতায় আহ্বান করিলেও, একমাত্র বৃহত্তর বঙ্গের সভাপতি ভিন্ন অন্য কোন প্রবাসী বাঙ্গালীকে কোন শাখার সভাপতি করিবার সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। অথচ বাঙ্গলার বাহিরে বিশিষ্ট সাহিত্যিক বহু মনস্বী আছেন, আমরা অবগত আছি। অভ্যর্থনা সমিতির বাছিয়া বাছিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিগণের উপরেই

এই ভার প্রদানের ইচ্ছা কেন হইল, তাহাও বুঝা দুঃসাধ্য। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার বিশিষ্ট অবদানের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই, সাহিত্যশাখার সভাপতিও বাহির হইতে আনিবার চেষ্টা হইলেই ভাল হইত। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক প্রবাসে বাস করিতেছেন, তাহাদের কেহ হইলেই অনুষ্ঠানটি শোভনীয় হইত।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অভিভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বলেন : "যে প্রশ্ন আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহা হইতেছে আমরা বাঙ্গালী হিন্দুরা বাঁচিব, কি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব। ৭০ লক্ষ বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে আছেন, কিন্তু ২ কোটি ৭০ লক্ষ বাঙ্গালী কি ক্রীতদাস হইয়া নিজ বাসভূমে পরবাসী রূপে থাকিবে, তাহারা কি যাযাবর ভ্রাম্যমাণ ইহুদী জাতির মতো ঘুরিয়া বেড়াইবে? তাহাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতা কি লুপ্ত হইবে, না আকাশে বাতাসে চারিদিকে ইহা ঘুরিয়া বেড়াইবে? এই কঠোর প্রশ্ন আমাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।"

হিন্দুর (সমগ্র বাঙ্গালীর নয়) এই বাঁচা মরার সমস্যাই সম্মিলনীর সভাপতিগণের অভিভাষণে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন, তাহা উদ্বোধন করিবার সময়ে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু কিছু স্পষ্টকথা বলিয়াছেন বটে, তবে অনেক কথাই অস্ফুট রাখিয়াছেন। বোধ হয় পারিপার্শ্বিক কারণে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বাবুর কাছে হিন্দু-মুসলমানের—অর্থাৎ বাঙ্গালীর প্রকৃত সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধানকল্পে সুচিন্তিত পরিকল্পনা পাইতেই লোকে আশা করিয়াছিল।

সাহিত্যশাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণটি সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

চাকুরী-সমস্যা, বাস্তু-সমস্যা এবং শিল্পসমস্যা—নানা সমস্যায় বাঙ্গালীজীবন সমাকীর্ণ। সে বিষয়টি সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় তাঁহার বিবৃতিতে প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 'বৃহত্তর বঙ্গ' শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিভাষণ খুবই মর্ম্মস্পর্শী ও তথ্যপূর্ণ। তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রাবল্যে বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এমন সতর্কভাবে করিয়াছেন যে, ইহাপেক্ষা সহজতর ভাবে অন্য কেহ পারিত কি না সন্দেহ। কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গের সভাপতি হইয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে বলিতে যাওয়া যে কত কষ্টকর, সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিতই করিতেছি। তবে সমগ্র বঙ্গালা এবং বৃহত্তর বাঙ্গলা সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক শাসনের অবসান কল্পে কোন গঠনমূলক কার্য্যের সন্ধান দিলেই তাঁহার পক্ষে অভিজ্ঞতানুরূপ কার্য্য হইত। মহিলা-শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুরের অভিভাষণটিতে উচ্ছ্বাস আছে, সজীবতাও আছে। তবে তিনি যে নূতন বাঙ্গলা গঠনের কথা বলিয়াছেন, তাহার রূপ কি, বা কার্য্যপন্থা কি তাহা তিনি অস্ফুট রাখিয়াছেন।

এইবার প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনও যে দলগত রাজনৈতিক ভাবে অনুপ্রাণিত, তাহা দেখিয়া দুঃখ হইল। তবে ভবিষ্যতে ইহা আরও সজীব, কর্ম্মপ্রবণ, সর্ব্বদলগত ও সার্ব্বজনীন হইলেই আশ্বস্তির কথা। আমরা এই বিষয়ে স্থায়ী সভাপতি নগেন্দ্রবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পরিশেষে এই দুর্ভোগের মধ্যেও কর্ম্মকর্ত্তাগণ যে কলিকাতায় সম্মেলনটির বার্ষিক কার্য্য সমাধা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদিগকে আন্তরিক সাধুবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী দল

গত ২৩ মার্চ্চ তারিখে জয়হিন্দ অফিসে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা হইয়াছিল। তাহাতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভায় যে সমস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা বহুদিন হইতে দেশসেবা করিয়া আসিয়াছেন এবং দেশসেবা করিয়া অনেক নিগ্রহও সহ্য করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বকসী, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত অনিল রায়, শ্রীযুক্তা লীলা রায়, ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অমূল্য রায় চৌধুরী অন্যতম। সকলেরই মত ছিল যে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং যুক্ত নির্ব্বাচনের স্বপক্ষে তীব্র আন্দোলন (Raging and tearing campaign) চালাইতে হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এবং অখিলচন্দ্র দত্তের উপরে কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ভার দেওয়া হয় এবং তাঁহারাও সে ভার নিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, ইহার পর আর কোনরূপ উচ্চবাচ্য শুনিলাম না। বাঙ্গলাদেশে এতগুলি ত্যাগী কর্ম্মী থাকিতেও কোনরূপ চেষ্টা হইল না। একতরফা 'বঙ্গভঙ্গের' কয়েকটা সভাই প্রবল হইয়া উঠিল এবং প্রকৃত উপায়ে বাংলার

সংহতি কৃষ্টিকার্য্যকল্পে কোন চেষ্টাই হইল না। ইহাপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? পুরাতন কর্ম্মীরাই বা কোথায়, ফরওয়ার্ড ব্লক বা আজাদ হিন্দ্‌ই বা কি করিতেছে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। বাঙ্গলার সুনাম ও প্রভাব কি এইভাবেই লুপ্ত হইবে? তবে একটু আশার কথা দেখিতেছি যে, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অনিল রায় ও শ্রীযুক্ত লীলা রায় ঢাকায় এই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের প্রচারকার্য্য সাফল্য মণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মিঃ স্যারওয়ার্দ্দী ও বঙ্গভঙ্গ

বাঙ্গলা মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সহিদ স্যারওয়ার্দ্দি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বঙ্গভঙ্গে বাঙ্গলার হিন্দুমুসলমান এবং নিপীড়িত ব্যক্তিগণের খুবই হানি হইবে এবং এই আন্দোলন করা বাঙ্গলার কৃষ্টির পক্ষে যে কত অনিষ্টকর, বাঙ্গালী অচিরে মধ্যেই তাহা বুঝিতে পারিবে। ঠিক একই সময়ে মহাত্মাজীও বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান ও বঙ্গভঙ্গ উভয়ই তুল্যভাবে নিন্দনীয়। মিঃ সহিদের বিবৃতিতে যে সত্য কথা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দু কেন এই আত্মঘাতী আন্দোলনের দিকে এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যে তাহা বুঝিতে পারেন না, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। হিন্দুগণ একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে তাঁহারই বা তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিগণের কৃতকর্ম্মের জন্য। গত আগষ্ট মাস হইতে সমগ্র বাঙ্গলাদেশ যে অ-মুসলমানগণের বাসের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে—ইহার একমাত্র কারণ, লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক একদেশদর্শিতা। ১৬ই আগষ্টের সভায় এমন গরম গরম বক্তৃতা হইল, মিঃ নাজিমুদ্দিন ও মিঃ গজনফরালী এমন উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলিলেন, কয়দিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল, এই সব যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস এবং তজ্জন্য সাধারণ ছুটির দিবস ঘোষণার ফলেই হইয়াছে, তাহা সকলেই সিদ্ধান্ত করেন। নোয়াখালীতে যে কিরূপ নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল, তাহার মর্ম্মান্তিক দৃশ্যের আজও অবসান হয় নাই। বেহারের হত্যাকাণ্ডের পরে পণ্ডিত জওহরলাল তিন দিনে সমগ্র বেহার শান্ত করিয়া দিলেন, আর স্যারওয়ার্দ্দী সাহেবের মন্ত্রিত্বকালে গত সাত মাস হইতে নোয়াখালী জিলা হিন্দুর বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, জোর করিয়া স্থানটিকে পাকিস্থানে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। গত কয় সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতায়ও আবার এমন অত্যাচার ও পীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে, হিন্দুর ভীতি এবং পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষার মনোবৃত্তি দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাবর্গকে শাসাইয়া এবং রাজশক্তিপ্রভাবে প্রজাশক্তি পঙ্গু করিয়া তারস্বরে সেই অত্যাচার অবলীলাক্রমে সহ্য করিতে বলায়, বক্তার কথায় কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না, ফলও বিষময় হয়। বিশেষতঃ নোয়াখালীতে এখনও যে অনাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তিনি জানিয়াও অজ্ঞতার ভান করিতেছেন বলিয়া আরও বিশ্বাস হারাইয়াছেন। আজ হিন্দুগণ দুর্ব্বল মনোভাব বশতঃই বঙ্গ ভঙ্গ চাহিতেছে। কিন্তু এখনও তাহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, যদি স্যারওয়ার্দ্দী সাহেব ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ বাক্যের সহিত কার্য্যেও বুঝাইতে পারেন যে, প্রত্যেক হিন্দু নিরাপদ এবং তাহাদের ধন, মান, জীবন রক্ষার জন্য স্যারওয়ার্দ্দী সাহেব ও লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী ন্যায়, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের খাতিরেই আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। আজ বাঙ্গলা যে নিজের গলায় ফাঁস পরিতেছে, সে কেবল লীগের দুর্ব্বিসহ অত্যাচারের দরুণই। স্যারওয়ার্দ্দী সাহেব কি সময় থাকিতে এখনও প্রজারক্ষা নীতি অবলম্বন করিবেন না? আশা হয় না—কারণ, মহাত্মাজী এতদিন থাকিয়া কত চেষ্টা করিলেন, পারিলেন কৈ? তাঁহার অনুপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচারিগণ আবার পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছে। আর সহিদ সাহেব কেবল নিশ্চেষ্ট নহেন, বরং আপত্তি জানাইয়া যাহারা দোষারোপ করিয়াছে, তাহাদের উপরেই দোষ দিতেছেন। মহাত্মাজী কয়দিন বেহারে থাকিয়াই অপূর্ব্ব ফল পাইলেন। আর তিনমাস সাঙ্গোপাঙ্গ সহ নোয়াখালী থাকিয়াও এই সত্যাগ্রহী মহাপুরুষ কিছু করিতে পারিলেন না, ইহাও মুসলীম লীগের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই। সহিদ সাহেব দেশবন্ধুর কাছেই স্বদেশ-সেবায় হাতেখড়ি পাইয়া ক্রমে এতবড় হইয়াছেন। সেই মহাপুরুষের নামেও একবার তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া এখনও যদি বাঙ্গলার অক্ষুণ্ণতা রাখিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে পারেন, তবেই সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃষ্টি ও সম্পদ রক্ষা পাইতে পারে। নতুবা বাঙ্গলা যাইতে বসিয়াছে, যাইবে এবং যাইবে—মুসলীম লীগের দুর্নিবার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্যই।

আসামে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে মুসলীম লীগের ফৌজ

বড়ই পরিতাপের বিষয়, আসামের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট এক অন্যায় সংগ্রামের সম্মুখে পতিত হইয়াছেন। আসামের মন্ত্রিসভা যে উচ্ছেদ-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রিমণ্ডলী নির্দ্ধারিত নীতির অনুসরণকল্পেই। আর বিনানুমতিতে বিনাসর্ত্তে অন্যপ্রদেশের লোক দল বাঁধিয়া যে আসামের স্থানবিশেষ অধিকার করিতে চাহিতেছে, তাহা ঘোরতর অন্যায় ও অনধিকারমূলক দাবী। আমরা বলপূর্ব্বক এইরূপ দাবী কায়েম করিবার প্রয়াসে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং ইহার তীব্র নিন্দা করি।

এই দাবী কায়েম করিতে বাঙ্গলা সরকার যে পঁচিশ হাজার ন্যাসনাল গার্ড পাঠাইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাও ঘোরতর অন্যায়। শুনা যায়, তাহাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ করিয়া তাহারা আসামকে পূর্ব্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিবে। এই দাবী এবং উহা সাব্যস্ত করিবার উদ্যম যে কত অসঙ্গত, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমাদের নাই।

শুনিতে পাইলাম যে, প্রসিদ্ধ লীগনেতা মৌলানা সাদুল্লা (প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী) সাহেবের এইরূপ কার্য্যে সমর্থন নাই। তিনি মনে করেন, আসামের ব্যাপার আসামই মীমাংসা করিয়া লইবে এবং বাহিরাগত কোন ব্যক্তি বা দলের সহায়তা তিনি

পোষণ করেন না। আসাম প্রদেশস্থ আরও কয়েকজন লীগ-নেতা ইতিমধ্যেই লীগের সম্পর্ক ছাড়িয়াছেন। জমিয়ত উলেমার জনৈক নেতাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, বাঙ্গলা বা বহিরস্থ অন্য প্রদেশের লীগদল এইরূপ প্রচেষ্টা করিলে আসামের হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে উহা প্রতিহত করিতে প্রয়াস পাইয়া আসামের সম্মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে। ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত আবদুল হক্‌ও এইরূপ বহিরাগত প্রচেষ্টা প্রতিহত করিতে আসামের সমগ্র হিন্দু-মুসলমানকে আহ্বান করিয়াছেন।

আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলুই মহাশয় অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াছেন, সারওয়ার্দি সাহেবকেও এই বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে প্রতিবিধান করিতে নিবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করে নাই। তবে কি লীগ হাইকমাণ্ডও এই বিষয়ে বাঙ্গলার এই অন্যায় প্রচেষ্টার সহায়তা করিতেছে? নতুবা মিঃ জিন্না এইরূপ বিপদ অচিরেই বিনষ্ট করিয়া দিতে পারিতেন।

যখন সব শান্তির প্রচেষ্টাই বিফল হইল, তখন আসাম সর্ব্বশক্তি প্রভাবে এইরূপ হীনচেষ্টা পণ্ড করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এই বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিশ্চয়ই আসাম গভর্ণমেণ্টকে সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়টি এখনও জানেন না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। ভরসা করি, আসাম সরকার ভারত সরকারকে এই বিষয়ে নিশ্চয়ই অবগত করিবেন। এবং আবশ্যক মত সাহায্য প্রার্থনা করিবেন।

'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান' যদি আসামে কার্য্যকরী হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বাঙ্গলারও বিশেষ ভয়। সুতরাং আসামের বিষয়ে সমগ্র ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, সেই সম্পর্কে আমরা তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন

৮ই এপ্রিলের এসোসিয়েটেড্ প্রেস কর্ত্তৃক নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ: কেন্দ্রিয় পরিষদে এবার (উৎপাদন ও ক্রয়) বিল, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক্ অব্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্ (সংশোধন) বিল, ১৯৩৪ সালের ইণ্ডিয়ান টেরিফ এ্যাক্ট্ (সংশোধন) বিল ও ১৯৩২ সালের শর্করা শিল্প (সংরক্ষণ) বিল গৃহীত হয়।

গৃহীত বিলগুলির মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্ সংশোধন বিলই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমান বিল দ্বারা উক্ত এ্যাক্টের ৪০।৪১ ধারা বাতিল করা হইয়াছে। উক্ত ধারাদ্বয়ের বিধানানুসারে ভারতীয় মুদ্রার সম্পর্ক ষ্টার্লিংএর সহিত রাখা হইয়াছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে আন্তর্জ্জাতিক তহবিলের সদস্য-ভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্রের মুদ্রার সহিত সম্পর্ক রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিলটী সম্পর্কে শ্রীযুক্ত অনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার বলেন,—ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ইতিহাসে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ভারতের কাছে বৃটিশের ঋণের ক্ষেত্রে ষ্টার্লিং সম্পর্কে যে অভিনয়ের চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার পর এইরূপ বিলের দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষে যে কতখানি সুবিধা হইয়া গেল, তাহা বলা বাহুল্য। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারই তাহার যথাযথ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কালের স্বাক্ষর

[শিল্পী—শ্রীবিমল রায়

'ফসলের দিন এলো এলো রে—'

[ফটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

চতুর্দ্দশ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৪ { ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

কবি য়েট্‌স

শ্রীমতিলাল দাশ

১৯৩৬ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর কবি-চূড়ামণি য়েট্‌সের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি তখন ডাবলিনের উপকণ্ঠে একটী বাড়ীতে বাস করিতেন। বাড়ীটির নাম রিভারডেল—এটি রাদারফার্ম নামক উপনগরের উইলব্রক রোডে। পথবান্ধবী মিস মার্জ্জরীর নির্দ্দেশ অনুসারে বাসে এখানে উপস্থিত হই। স্নিগ্ধ শীতের পরিবেশে পুষ্প-সমৃদ্ধ বাংলোটি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। অনুসন্ধান ও চেষ্টা সফল হইলে অপরিসীম আনন্দে অন্তর ভরিয়া গেল। কিন্তু গিয়া শুনিলাম কবি অসুস্থ। দেখা করিতে পারিবেন না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে আনন্দ দুঃখে পরিণত হইল। আমি পদাবলী-সাহিত্য হইতে ১৫১টি কবিতা ইংরাজী গদ্য কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলাম। মনস্বী রোঁলা তাহা পড়িয়া খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমার আশা ছিল, ভারতহিতৈষী য়েট্‌সের সুপারিশে আমার এই গ্রন্থখানির প্রকাশের একটা সুব্যবস্থা করিয়া লইব।

কিন্তু কবির অসুখের সংবাদে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তাঁহার সুন্দর তৃণবীথির দিকে অন্যমনে চাহিয়া রহিলাম। খানিক পরে মন স্থির করিয়া আমার কার্ডে আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য লিখিয়া পাঠাইলাম। ফল ফলিল। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পরিচারিকা প্রথমে আমাকে মিসেস য়েট্‌সের নিকট লইয়া গেল। তিনি আমাকে কবির একান্ত দুর্ব্বলতা ও চিকিৎসকের নিষেধের কথা বুঝাইয়া দিয়া কবির সহিত সামান্য কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন। কবি বিছানায় শুইয়া ছিলেন। আমি নমস্কার করিয়া পাশে বসিলাম—তিনি প্রতি নমস্কার জানাইলেন। আমার অটোগ্রাফে তিনি ও কবিজায়া নাম লিখিয়া দিলেন। আমি আর একদিন দেখা করিব বলিয়া ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু ডাবলিনে অধিক দিন থাকিতে না পারায় কবির নিকট আর আমার যাওয়া হয় নাই। য়েট্‌স গীতাঞ্জলির ভক্ত ও রবীন্দ্রনাথের বন্ধু বলিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণের নিকট পরিচিত। কিন্তু তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার বিশেষ কোনও সন্ধান আমরা রাখি না। এই সামান্য প্রবন্ধে এই একদিনের দরদী বন্ধুর সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দিয়া বন্ধুকৃত্য নিষ্পন্ন করিব।

বর্ত্তমান যুগে আয়ার্ল্যাণ্ড তিনজন সাহিত্যিকের জন্মভূমি বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে—সেই তিনজন কবি য়েট্‌স, এ, ই বা জর্জ্জ রাসেল এবং বার্ণার্ড শ। এই তিন জন বিশ্বসাহিত্যের দরবারে আপন আসন অধিকার করিয়া নিয়াছেন। ইঁহাদের তিনজনের মধ্যে আবার য়েট্‌স্‌কে বিশেষ ভাবে আয়ারের কবি বলা যাইতে পারে। সুন্দর

আয়ারের রহস্য-মাধুর্য্য ও লাবণ্য তাঁহার লেখাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আয়ারের আকাশ, বাতাস, আয়ারের নদী, বন ও মেঘমালা তাঁহার কাব্যে অপরূপ রূপ লাভ করিয়াছে। চিত্রকরের নৈপুণ্যে ও দীপ্ত বর্ণাভিরাম সজ্জায় তাঁহার লেখা আয়ারের বিশেষ রূপকে পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করে।

তাহার একটী বর্ণনা নিম্নে দিতেছি :—

All things uncomely and broken,
all things worn out and old,
The cry of a child by the road way,
the creak of a lumbering cant,
The heavy steps of the Ploughman,
Plashing the ninty mould.

বর্ণনার চাতুর্য্য নাই, কিন্তু সংক্ষিপ্ত সাবলীল ভাবে ইহা যেন আয়ারের একটি সুস্পষ্ট নিসর্গদৃশ্য আমাদিগের মনে জাগাইয়া তোলে। অথচ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত তাঁহাকে প্রকৃতির ভক্ত উপাসক বলা চলে না। য়েট্‌সের লেখার মূল সুর তাঁহার অলৌকিকতা। তাঁহার সমস্ত রচনার পিছনে যেন এক অদৃশ্য যাদু লুক্কায়িত আছে। দৃশ্য জগতের অন্তরালে যে মায়া তাহা যেন এক অপূর্ব্ব অবর্ণনীয় মাধুর্য্যে তাঁহার লেখাকে মধুময় ও মোহময় করিয়া তোলে। তাঁহার রসজগৎ বহুবিস্তীর্ণ নয়। সেক্‌স্‌পীয়ারের মত জীবনের সমস্ত রাগ-রাগিণী লইয়া তিনি লেনাদেনা করেন না। কিন্তু তাহার নিজস্ব সংকীর্ণ জগতের মাঝে রসের বিপুলতা, ভাবের নিবিড়তা, আনন্দ ও অনুরাগের প্লাবন, সুষমার পেলবতা এবং সুরের যাদু তাঁহার কাব্যকে চিরন্তন সম্পৎ করিয়া তোলে।

নীচের কবিতাটি কবি য়েট্‌সের রচনার মোহময় মাধুর্য্যে ভরপূর :—

Sweet heart do not love too long
I loved long and long
And grew to be out of fashion
Like an old song
All through the years of our youth
Neither could have known,
Their own thought from the other's
We were so much at one
But, O in a moment she changed
O do not love too long
Or you will grow out of fashion
Like an old song,

কবি য়েট্‌সের বাণীরূপের প্রেরণার উৎস তাঁহার অন্তরে। তিনি কদাচিৎ বাহির হইতে কাব্যের অনুপ্রেরণা লাভ করেন। তাঁহার আবেগ ও অনুরাগ, তাঁহার উন্মাদনা ও উত্তেজনা সকলই তাঁহার কল্পনার রসে রঙীন, বাস্তব জগতের দৃশ্য বা বস্তু তাঁহার চিত্তে আদৌ রেখাপাত করে না বলিলে চলে। যখনই তিনি এই অন্তঃপ্রেরণাকে এই জীবনদেবতাকে ভুলিয়াছেন, তখনই তাঁহার কবিতা শুষ্ক, নীরস ও ভাবহীন হইয়াছে।

কোলরিজ কবির কথায় বলিয়াছেন, যাহার হৃদয়ে সুর নাই, সে কখনও কবি হইতে পারে না। চেষ্টা, অভ্যাস ও সাধনায় অলঙ্কার, সুষ্ঠু শব্দচাতুর্য্য, ভঙ্গিমা এবং ভাব শিক্ষা করিয়া কবিতা গঠন করা যাইতে পারে, কিন্তু অন্তরে যদি সুরের আনন্দ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত উচ্ছ্বসিত না হইয়া উঠে, তবে কবি হওয়া সহজ নহে। কোলরিজের এই কথা কবি য়েট্‌সের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কবিতা তাঁহার নিকট সখ ও সৌখীনতা নহে—কবিতা তাঁহার জীবনের সাধনা, জীবনদেবতার বেদীতলে ভক্তের একনিষ্ঠ তপস্যা। এই সাধনার হোমানলে ভাবের সমস্ত লেখা দীপ্ত ও ভাস্বর হইয়াছে। তাহাদের অনবদ্য শোভা, তাহাদের অনন্য প্রোজ্জ্বল মহিমা অনশ্বর ভাতিতে চিরদিন কাব্যসাহিত্যের দেবায়তনে মণিদীপের মত জ্বলিতে থাকিবে।

কবি য়েট্‌সের অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত অবর্ণনীয় ভাবপ্রবণতার জন্য অনেকে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। সুস্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা কাব্যের সর্ব্বত্র গুণ নহে—যাহা আমাদের জীবনে অর্দ্ধস্ফুট, যাহা আমাদের চেতনার আলোকে সম্পূর্ণ ফুটিয়া ওঠে নাই, তাহাকে সরল ও সুব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। অব্যক্ত অভিব্যঞ্জনায় তাহাদিগকে প্রকাশ করিতে হয়। এই জন্য কবিতার মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তম তাহার মধ্যে এমনই একটি অলৌকিক মায়া বা যাদু থাকে।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার কাব্য কেবলই স্বপ্নজাল বোনে না। তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া কবি যে বাণী প্রকাশ করেন, তাহা তুচ্ছ বা উপেক্ষার নহে। তাঁহার সহিত মেটারলিঙ্কের রচনার সুগভীর সাদৃশ্য আছে। বিশ্ববিখ্যাত এই দুই কবির নিকটই অদৃশ্য জগৎ অসত্য নয়। The Oeltic Twilight, Ideas of Good and Evil প্রভৃতি গ্রন্থে য়েট্‌স্ তাঁহার এই অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মানুষ সত্যকে তর্ক ও বুদ্ধির সাহায্যেই ধরিতে পারে না, মানুষের গভীর কল্পনা ও অনুভূতি অনেক সময় বুদ্ধির অতীত সত্যকে আমাদের হৃদয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। কারণ, মহৎ প্রকৃতির যে অবিভাজ্য স্মৃতি সেই একক স্মৃতির সাহায্যেই আমরা জীবনে অনেক সময় অনেক অজানিত

রহস্যের সন্ধান পাই, অনেক অননুভূত ভাবের দর্শন পাই. আমাদের মনোলোকের প্রান্তরেখা কেবলই সীমা পরিবর্তন করে। বিশ্বমানসের সহিত তাহার গভীর ধ্যানের মুহূর্তে সংযোগ হয়, তখনই অনেক অকথিত বাণী অশ্রুত সুর আমাদের মনে আসিয়া ধরে।

ইহাকে সহজ ও সরল গদ্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়—ইহার জন্যই রূপক-কাব্য। মেটারলিক ও য়েট্‌স্ রূপক কাব্যে এই অজ্ঞাত লোকের রূপ, রস ও গন্ধকে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যখন আমরা জাগতিক চাঞ্চল্য ভুলিয়া মনকে শান্ত করিতে পারি, তখন সেই অদৃশ্য জগৎ আমাদের পাশে আসিয়া দাঁড়ায় এবং অদৃশ্য জগতের অশরীরী লোকেরা আমাদের কাছে তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়া মূর্ত্ত হইয়া দাঁড়ায়। য়েট্‌স তাই বুদ্ধিজীবী নয়. তিনি হৃদয়বত্তার কবি। তাঁহার নিকট ভাবাবেশের ক্ষণগুলিই জীবের সর্ব্বোত্তম ভাগবতক্ষণ।

এই ভাবালুতার প্রতি অনুরাগ য়েট্‌সকে বাস্তববিদ্বেষী করিয়া তুলিয়াছে। জীবের অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় জীবনের জয়গান তিনি করেন না—তিনি চান পলায়ন। জীবনের সংগ্রাম হইতে দূরে সরিয়া আত্মসমাধির মধ্যে নিগূঢ় আশ্রয়। ইহাকে অনেকে য়েট্‌সের দুর্ব্বলতা মনে করেন। যাঁহারা বাস্তববাদী, যাঁহারা জীবনের চল-চঞ্চল লীলায় অভিরাম মাধুর্য্য দেখেন, তাঁহারা অতীন্দ্রিয়বাদে নিশ্চয়ই দুর্ব্বলতা দেখেন। তাঁহারা বর্ত্তমানের জীবনের সংগ্রামে বিজয়লাভের বাসনাকেই বড় করিয়া দেখেন এবং পরিপূর্ণ সরল ও সুস্থ জীবনবাদের প্রচার করেন।

কিন্তু এই তর্ক অমীমাংস্য; কাজেই সেই দুরবগাহ ভাবের সমুদ্রে ডুব দিবার প্রয়োজন নাই। এ কথা অবশ্য সত্য—য়েট্‌সের নানা রচনা ও কাব্যের মধ্যে আত্মার ও জগতের নিত্যবিরোধ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বেদনায় আর্ত্ত হইয়া চান সুযোগ ও অবসর,—যুদ্ধের ও সংগ্রামের নয়, নিভৃত ধ্যানমগ্নতার এবং কল্পনার সুগভীর অনুভূতির রঙীন বিলাসের। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা এবং ভীরুতা স্বীকার করিলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার সমস্ত লেখা অধ্যাত্মরসের বহ্নিশিখায় দীপ্ত, রসবিদগ্ধ ভাবুক জন তাঁহার রচনার অতুলনীয় শক্তি এবং পেলব সৌকুমার্য্যে মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। তাঁহার সমস্ত লেখাই রসে ও রূপে সমুজ্জ্বল, বর্ণনায় সাবলীল, উপমায় অলঙ্কৃত এবং কল্পনার মহিমায় ভাস্বর।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার অতীন্দ্রিয়বাদে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত বিশ্বাসের গভীরতা নাই, প্রেমের বজ্রদৃঢ় আবেগ নাই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পেলবতা ও সঙ্গীতে য়েট্‌সের তুল্য ন'ন, কিন্তু প্রকৃতি ও জগতের প্রতি তাঁহার প্রেমে তাঁহার সমস্ত রচনা তাহাদের গদ্যপ্রবণতা সত্ত্বেও মহীয়ান্ ও বরীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রচনায় আধ্যাত্মিক সৌরভের আমোদ নাই—আছে সংশয়দোদুল চাঞ্চল্য, নাই সংযত তপস্যাদৃপ্ত প্রেমের বীর্য্য।

কথাটি বুঝাইতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ। য়েট্‌স ললিত ও মধুর রসের কবি। তিনি দীর্ণ ও জীর্ণ ধরণীর দুঃখরাশির মাঝে সৌন্দর্য্যের ও আরামের সুখ-নিকেতন গড়িতে চান। সেই চেষ্টায় তিনি অরূপ লোকের সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু এই অধ্যাত্মপ্রিয়তা যোগোজ্জ্বল নহে, তপস্যায় বিধৃত নহে। তাহা ভাবুক চিত্তের কল্পনা-বিলাস—তাহার পেছনে বুদ্ধিদীপ্ত কোনও দার্শনিক মতবাদ নাই, কোনও আন্তঃপ্রেরণায় সমুজ্জ্বল ঐক্যবদ্ধ বাণী নাই।

তাই য়েট্‌স মূলতঃ রূপের কবি ও রসের কবি। তিনি সৌন্দর্য্যের পূজারী—সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই তাঁহার কাম্য। তাঁহার নিকট কাব্যলোক মায়ালোক। তিনি মায়াবী যাদুকরের মত প্রতীক ও অলঙ্কারের সহায়তায় এক মায়াজগৎ গড়িয়া তোলেন—এই মায়াজগৎ শূন্যগর্ভ অনন্ত নহে—কারণ, ইহা বিশ্ব-মানবের অন্তর হইতে আমাদের স্তব্ধ ও শান্ত অন্তরে বর্ণে ও গন্ধে ভাসিয়া ওঠে।

With a heart of furious fancies
Where of I am commander ;
With a burning spear
And a horse of air,
To the wilderness I wander ;

এই একটি শ্লোকে য়েট্‌সের কাব্যের যাদুরূপের কথা বিশদভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটিকে ভাগ করিয়া সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা কিছুই পাইব না, কিন্তু সমস্ত মিলিয়া পাঠকের মনে একটী সুন্দর মায়ালোক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অনির্ব্বচনীয় প্রভাবের কারণ—তাঁহার সুরের যাদু, তাঁহার স্বপ্নালু উপমার পরিবেশ। য়েট্‌স তাঁহার নানা কবিতায় এই অব্যক্ত স্বপ্নলোকের পরিবেশকে ভাষা ও রূপ দিয়াছেন।

আর্ট সম্বন্ধে তিনি নিজে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের উপরের কথাগুলি সমর্থিত হইবে। "All art that is not mere story-telling or mere portraiture is symbolic, and has the purpose of those symbolic talismans which mediæval magicians made in the complex colours and forms, and bade their patients ponder over daily and guard with holy secrecy ; for it entangles, in complex colours and forms a part of the divine Essence".

আর্ট যেখানে গল্প বলে না বা ছবি আঁকে না, তাহা তখন বর্ণে ও গন্ধে রূপে ও রসে প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। মধ্যযুগের যাদুকরেরা যেমন নানা রঙের মাদুলি দিয়া রোগীকে তাহার নানা বিচিত্র রূপকে ধ্যান করিতে বলিত, কবিও তেমনই কবিতায় ভাগবত সভার বর্ণবিচিত্র ও রূপাভিরাম প্রতীক ফুটাইয়া তোলেন।

য়েট্‌সের বহুমুখী সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় দেওয়া সামান্ত প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। তাঁহার রূপক-নাট্যগুলির মধ্যে The land of Heart's dasire বাঙ্গলায় অনূদিত হইয়াছে। 'হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত দেশ' রূপক-নাটিকাটিতে বর্ত্তমানের এক অনুপম সৃষ্টির পরিচয় আমরা পাই। বইটি ক্ষুদ্র-পরিসর কিন্তু সেই ক্ষুদ্র কলেবর একেবারে মণি-মুক্তায় ভরা। ইহার লাবণ্য চিরন্তন উপভোগ্য। ইহার অপরাজেয় আকর্ষণ খুব কম কাব্যেই মেলে। রূপ, রঙ, রেখা সমস্তই সুসমঞ্জস, সমস্তই সুষীম, সমস্তের যেন এক দিব্যসৌরভময় মাধুর্য্য। প্রত্যেকটি চরণই যেন স্রষ্টার গভীর আত্মোপলব্ধিতে জীবন্ত, প্রত্যেকটি পংক্তি কাব্যরসে ভরপুর। প্রকৃতি এখানে কবির চোখে রঙের তুলিকা মাখাইয়াছে। যে বালক তার সবুজ পোষাকে নাট্যমঞ্চে আসিল, সে যেন সমস্ত বনভূমির শ্যামলতা তাহার সঙ্গে নিয়া আসিল। তাহার মধ্য দিয়া যেন বহিঃপ্রকৃতি আপন নৃত্য ও গীতি ফুটাইয়া তুলিল।

আইরিশ স্বাজাত্যবোধের ফলে আয়ারে সাহিত্যে ও জীবনে যে জাগরণ জাগে, তাহাতে য়েট্‌সের অবদান কম নয়। এ, বি, থিয়েটার তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি—এখানে বর্ত্তমান আইরিশ গণ-সাহিত্যের নানা বিচিত্র সৃষ্টি অভিনীত হইয়াছে। ডাবলিনে থাকিবার সময় এখানে আইরিশ বিদ্রোহ অবলম্বনে লিখিত একটি সুন্দর নাটক আমি দেখিয়াছিলাম। এই থিয়েটারে প্রথমে য়েট্‌সের The countess cathben অভিনীত হয়। এখানে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে The Hour-glass সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সাহিত্যিক ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। ইহার গদ্যরূপ অপেক্ষা শেষের পদ্যরূপ সাহিত্য হিসাবে অমরত্বের দাবী করিতে পারে। ইহার পরিপূর্ণতার লাবণ্য সকলকেই মুগ্ধ করে।

আমাদের দেশে আইরিশ সাহিত্যের অধিক আলোচনা হয় নাই। বার্ণার্ড শ আইরিশ কিন্তু তাঁহার লেখায় আইরিশ জাতীয়তা অপেক্ষা ইংরেজের দুর্ব্বোধ্য ব্যঙ্গ ও কৌতুক অধিক ফুটিয়াছে। আইরিশ সাহিত্যের যে রূপ আমাদের বাঙ্গালী হৃদয়ে বিশেষ ছায়াপাত করে তাহা তাহাদের কল্পনা-প্রবণ পেলবতা। কবি য়েট্‌সের মধ্যে এই আইরিশ হৃদয়ের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমরা পাই। য়েট্‌সের লেখাগুলির তাই বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, রবীন্দ্রনাথের জগজ্জয়ী জ্যোতিঃসৌরভ বিকীরণের মূলে ছিল য়েট্‌সের দরদী সহকর্ম্মিতা। ভারতবন্ধু এই মনস্বী কবিকে বাংলার পাঠকসমাজে যাঁহারা পরিচিত করিবেন, তাঁহারা জাতীয় ঋণই পরিশোধ করিবেন।

মনস্বী য়েট্‌সের লেখার পিছনে যেন বাঙ্গালীর মন ও হৃদয় আছে। বাঙ্গালীর মত তিনি আর্টকে সুন্দরের আয়তন হিসাবে দেখেন। কল্পনার পাখা ছাড়িয়া দিয়া তিনি ভাবের লহরে লহরে ডুবিতে চান। জীবনের সাধারণ সমস্যা তাঁহাকে ব্যাকুল করে না। তিনি ভাবরসের রসিক, সেই রসের মাঝেই জীবন তাঁহার নিকট অভিব্যক্ত। কুশ্রী ও কালো, অসৎ ও অসুন্দরকে বর্জ্জন করিয়াই তিনি স্বপ্নের নন্দনলোক গড়িয়া তোলেন। তাঁহার মূল্য আর্টের জগতে মহোচ্চ। গীতি-কবি, রূপক-কবি, মরমী কবি য়েট্‌সকে আমাদের হৃদয়ের একান্ত নিজস্ব আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। সেই আত্মীয়তা বাড়াইবার জন্য আমাদের দেশের কবি ও কাব্যরসপিপাসুদের অনুরোধ করি।

স্পষ্ট সত্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শাসন-যন্ত্রে কোনো ইস্ক্রুপ করা চলিবে না ঢিলা,
 সদা সতর্ক সজাগ রহিতে হবে,
কার্ম্মুকে তব ক্ষেপণোন্মুখ আরোপিত চাই ছিলা,
 তূণীরে সায়ক উদ্যত হয়ে রবে।
গতিতে উহার যতি নাই—নাই বিরামের অবকাশ,
 ছেদ দিয়ে শ্লথ করা চলিবে না কভু,
নীতি শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে দুষ্টের অভিলাষ
 রক্ষার যার শক্তি—সেই তো প্রভু।
গুরু অপরাধী দস্যুদলের সংসর্গও পাপ,
 তাদের দলন, দমন, দণ্ড চাই;
হত, লাঞ্ছিত নর-নারীদের পুঞ্জিত অভিশাপ
 দগ্ধ করিয়া রাষ্ট্রকে করে ছাই।
কোনো অছিলায় কোনো অজুহাতে চলে না সমর্থন
 নিশ্চেষ্টতা শাসক-মণ্ডলীর,
লুণ্ঠিত হয় দেশবাসীদের যদি মান, প্রাণ, ধন
 দোষী যে স্রষ্টা সে বিষ-কুণ্ডলীর।
স্ফীত মস্তক সাম্প্রদায়িক গুণ্ড আস্ফালন
 কর্ত্তব্যের পথে বাধা দিবে কি না?
ভেবে দেখ তুমি, যদি ধাও লয়ে স্বার্থান্বেষী মন
 প্রাপ্য তোমার যুগের যুগের ঘৃণা।

স্থায়ী উপকার

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ-তোরণের প্রথম সোপানে পদস্খলিত হইয়া পতিত হইলেও—দেবী ভারতীর কৃপালাভে অসমর্থ হওয়া সত্ত্বেও গণনাথ দেবী ইন্দিরার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত হইতে বঞ্চিত হন নাই। প্রথম যৌবনে ব্যবসায়ের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে লক্ষ্মীর সোণার ঝাঁপি হইতে তাঁহার উপর দেবীর আশিষধারা বর্ষিত হইয়াছিল।

গণনাথের ব্যবসায়-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তাঁহার সৌভাগ্য সম্বন্ধে নিতান্ত বিরুদ্ধাচারীরাও ভিন্ন মত পোষণ করিতেন না। ব্যবসা পরিচালন ব্যাপারে গণনাথ ভাগ্যক্রমে কয়েকজন অভিজ্ঞ, কর্ম্মঠ এবং চরিত্রবান্ সহকর্ম্মী লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কর্ম্মশক্তির তুলনায় গণনাথ অতি অল্পমাত্রায় পারিশ্রমিক দিবার ব্যবস্থা করিলেও অপর পক্ষ হইতে কোন প্রকার আপত্তি উঠে নাই। গণনাথের ভাগ্যদেবতা তাঁহার প্রতি ক্রমশই সুপ্রসন্ন ছিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্যবসায়ের শাখা-প্রশাখা এমন ভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল যে, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ গণনাথের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছের দৃষ্টান্ত সত্যই গণনাথ সম্বন্ধে অমোঘ ভাবেই প্রয়োগ করা চলিতে পারে, এ কথা পরিচিতগণ একবাক্যে বলিতে লাগিলেন।

য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে অতি সুবিধা দরে নানা প্রকার ছাপার কাগজ গণনাথের কার্য্যে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দেশীয় কাগজের কণ্ট্রাক্টও তিনি পাইতেছিলেন। প্রতিষ্ঠানের সুনামের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ের জন্য মুদ্রাযন্ত্র, হরপ, ছাপার কালি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদিও বিদেশ হইতে কার্য্যে আমদানী এবং কারখানায় প্রস্তুত হইতে লাগিল।

ম্যানেজার ধরণী বাবুর অসাধারণ কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও প্রতিভা গণনাথের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হওয়ায় অল্পকালের মধ্যেই গণনাথ এমন সাফল্য লাভ করিয়াছেন, একথা তাঁহারই কার্য্যালয় হইতে লোকের মুখে মুখে রটিয়া গিয়াছিল। অবশ্য গণনাথ প্রকাশ্যভাবে সে কথা কোনদিন স্বীকার করেন নাই। তবে যাহারা তাঁহার সহকর্ম্মী ছিল, তাহারা প্রতি পদেই ধরণীবাবুর সহিত তাঁহাকে পরামর্শ করিতে দেখিত এবং ম্যানেজারের নির্দ্দেশ অনুসারে সকল ব্যাপারেই শেষ মীমাংসা হইত, ইহা কাহারও অগোচর ছিল না। বিশেষতঃ এই ব্যবসায় ধরণীধরের বিশেষজ্ঞতা অনন্যসাধারণ, ইহা অন্য সমব্যবসায়ীরাও জানিত।

মনে যাহাই থাকুক, গণনাথ নিরালায় ধরণীবাবুকে প্রায়ই বলিতেন যে, ধরণী বাবুর অবিদ্যমানে তিনি কি করিয়া এই প্রতিষ্ঠানকে সুপরিচালিত করিতে পারিবেন তাহা তিনি ভাবিয়া পান না। ইহা ব্যবসাদারী চাল হইতে পারে। ধরণীধর এইরূপ মন্তব্যে শুধু নীরবে মৃদু হাসিতেন।

পূর্ব্বে যখন প্রতিষ্ঠানটি কূর্ম্মগতিতে চলিত, তখন কর্ম্মচারীদিগকে গণনাথ একসঙ্গে মাসের বেতন দিতে পারিতেন না। প্রতিদিনের উদ্বৃত্ত হইতে সকলকে কিছু কিছু করিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। ম্যানেজার ধরণী বাবুর আগমনের পরের মাস হইতে কর্ম্মচারীরা মাসে দুইবার করিয়া টাকা লইয়া বেতন বুঝিয়া পাইত। কিন্তু ৬মাস পরেই এমন অবস্থান্তর ঘটিয়া গেল যে, প্রত্যেকেই মাসের দুই তারিখের মধ্যে বেতন বুঝিয়া পাইতে লাগিল। এজন্য গণনাথ, মন্ত্রগুপ্তিতে অভ্যস্ত হইলেও, আনন্দের আতিশয্যে অন্তরঙ্গগণের কাছে এবং ধরণীবাবুর সম্মুখে বলিয়া ফেলিলেন, "ধরণী বাবু, আপনিই আমার পয় !"

বাস্তবিকই দেখা গেল, গণনাথের ধন, মান ও যশঃ দিন দিনই বর্দ্ধিত হইতেছে। পৈতৃক ঋণজাল হইতে বসতবাড়ীকে মুক্ত করিয়া ত লওয়াই হইয়াছিল, তাহা ছাড়া, কলিকাতায় নানাস্থানে নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে লাগিল। জলের দরে ক্রীত ভাল পাড়ায় সুদৃশ্য হর্ম্ম্যরাজিও গণনাথের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল।

ধন-সম্পদ্ বৃদ্ধির অনিবার্য্য লক্ষণগুলিও গণনাথের ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিলাসী বা ভোগী তিনি কোন কালে ছিলেন না। ধনৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির ফলে সে দিক দিয়া তাঁহার কোন বৈলক্ষণ্য কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। তবে দেবগৃহ, এলাহাবাদ, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধর্ম্মস্থানে তিনি এক একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ফেলিয়াছেন। বর্ত্তমান কাল জুড়ির যুগ নহে, সেজন্য দুই তিনখানি মোটরগাড়ী তাঁহাকে রাখিতে হইয়াছিল। ভোগী ও বিলাসী না হইলেও আধুনিক যুগের উপযোগী ব্যবস্থা আভিজাত্যের লক্ষণ। গণনাথ বংশের পূর্ব্বজগণের সাধারণ অবস্থার স্মৃতি পরিচিত সমাজের মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্যই ঐশ্বর্য্যের বিলাস প্রদর্শনে এতটা অবাহিত হইয়াছেন, একথা ছিদ্রান্বেষী একদল লোক প্রায়ই আলোচনা করিত।

কিন্তু ঐ সকল দুষ্টবুদ্ধি ছিদ্রান্বেষীও একথা স্বীকার করিত যে, গণনাথ আলস্যকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। সাধারণ কর্ম্মীর ন্যায় তিনি বেলা দশটা বাজিতে বাজিতেই তাঁহার আপিস-কক্ষে আসিয়া বসিতেন এবং রাত্রি ৭টার পূর্ব্বে, বিশেষ জরুরী কাজ না থাকিলে কখনও আপিস ত্যাগ করিতেন না।

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বহু সুযোগ্য কর্ম্মচারী থাকা সত্ত্বেও গণনাথ সকল বিষয়েই মাথা ঘামাইতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ইহাতেই প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার সহিত সাফল্য লাভ করিয়া থাকে। ব্যবসায়ী জাতিরা শ্রম বণ্টনের যে অমোঘ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন তাহা গণনাথের মনঃপূত হইত না। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির পর হইতেই তিনি পূর্ণমাত্রায় মনে মনে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী স্ব স্ব বিভাগের কর্ম্ম পরিচালনায় গণনাথের আদেশের প্রতীক্ষা করিবে—ইহা গণনাথ প্রত্যাশা করিতেন।

গণনাথের আর একটি মহৎ গুণ ছিল, যোগ্যতা অনুসারে পারিশ্রমিক প্রদান করা মূর্খতা বলিয়া মনে করিতেন, কারণ, কর্ম্মীরা যদি অভাবগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বদা নিজদিগকে বিপন্ন ও

অসহায় মনে না করে, তাহা হইলে তাহারা ভাল করিয়া কাজ করিবে না। অবশ্য অভাবগ্রস্ত কর্ম্মীরা এ জন্য প্রায়ই তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু অগ্রিম বেতন লইতে বাধ্য হইত। তাহার ফলে সকলেরই টিকি তাঁহার মুঠার মধ্যে আবদ্ধ থাকিত। বিশেষতঃ এই বেকারের যুগে তাহারা ধ্রুবত্যাগ করিয়া অধ্রুবের পশ্চাতে ধাবিত হইবার সুযোগই পাইত না। সুতরাং গণনাথ অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠানে হিটলারী নীতি চালাইয়া যাইতেছিলেন। তবে একটা বিষয়ে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। ম্যানেজার ধরণীবাবুকে তিনি কোন প্রকারেই অসন্তুষ্ট করিতেন না। বরং মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশার আলোক জালিয়া ধরিতেন।

দুই

ধরণী বাবুর বিশ্রামের অবসর ছিল না। প্রতিষ্ঠানের পরিধি যতই বিস্তৃত হইতেছিল, তাঁহার পরিশ্রম ততই বাড়িতেছিল। কি করিয়া ক্রেতার সংখ্যাবৃদ্ধি হয় এবং বিক্রেতার নিকট হইতে সুবিধা দরে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয় এবং কি প্রণালীতে বিক্রেয় পণ্য উৎপাদন করিতে পারিলে প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে—এজন্য তিনি তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতেন। উভয় পক্ষ—ক্রেতা ও বিক্রেতারা তাঁহারই সহিত দেখা করিতে আসিত। গণনাথ স্বয়ং আপনাকে সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে ভাবিলেও কার্য্যতঃ তাঁহার সহিত কদাচিৎ কোন পক্ষ আলোচনার জন্য সাক্ষাৎ করিতেন। কারণ, এ কথা সর্ব্বজন-বিদিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ধরণী বাবু ব্যতীত কোনও কার্য্যের সুমীমাংসা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহার এবং সৌজন্য সকলকেই তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃ আকৃষ্ট করিত। অপর পক্ষে গণনাথ চেষ্টা সত্ত্বেও নিজের দাম্ভিকতা এবং আলোচনা গোপন করিতে পারিতেন না। সময়ে সময়ে তাঁহার উক্তি ও ব্যবহারে এমন অশিষ্টতা রূপায়িত হইয়া উঠিত যে, কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তাঁহার সান্নিধ্য এড়াইতে পারিলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে, এইরূপ আলোচনা আফিসের মধ্যে প্রায়ই শুনা যাইত।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিবার পর সন্ধ্যাকালে ধরণীবাবু গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় গণনাথের খাস ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, বাড়ী যাইবার আগে তিনি যেন বাবুর সহিত একবার দেখা করিয়া যান।

গণনাথ তাঁহার আপিস-কক্ষে তখন একা বসিয়া ছিলেন। স্তাবকের দল সে সময়ে ছিল না। গণনাথ জানিতেন, ধরণীবাবু স্তাবকদিগকে সহ্য করিতে পারেন না।

"এই যে, ধরণী বাবু, আমি আপনারই প্রতীক্ষা করছি। সুষমার বিয়ের ব্যাপারে বড়ই ব্যস্ত আছি। আপনার বাড়ী আমরা গিয়েছিলাম। বিয়ের দিন আপনার স্ত্রী-কন্যাদের অবশ্য পাঠিয়ে দেবেন। আমার স্ত্রী নিজেই বলে এসেছেন।"

ধরণী বাবু বলিলেন, "সুষমার বিয়েতে আমরা নিশ্চয়ই আসব বৈ কি। আপনার প্রথম সন্তানের বিবাহ—না এসে কি পারি।"

পানের ডিবা খুলিয়া ধরণী বাবুর সম্মুখে ধরিয়া গণনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার বাড়ী দেখে আমার স্ত্রী কি বলেছেন জানেন? তিনি বলছিলেন, তোমার ম্যানেজারের টিনের বাড়ী, এতে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

আর সে মুখে ধরণীধর বলিলেন, "আমরা সামান্য লোক। টিনের বাড়ী যে আছে এই যথেষ্ট ভাগ্য বলে মানি।"

গণনাথ কণ্ঠস্বর মৃদুতর করিয়া বলিলেন, "আপনার কথা আমি অনেক সময় ভাবি। মনে করেছি, আপনার সম্বন্ধে এমন ব্যবস্থা করব, যাতে আপনার স্থায়ী উপকার হয়। কথাটা জানাবার জন্য আপনাকে ডেকেছি। বাস্তবিক আপনার মত যথার্থ উপকারী বন্ধু আমার আর কেউ নেই।"

গণনাথের কণ্ঠস্বর আবেগে ঈষৎ অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া ধরণীধরের মনে হইল। তিনি কৌটা হইতে কিছু জরদা মুখে ফেলিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, "দেখুন, গণনাথ বাবু, আপনার ভদ্র ব্যবহার এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার প্রেম যতদিন অটুট থাকবে, ততদিন আমাকে সব কাজেই পাবেন। অন্য কোন প্রকার লোভ বা লাভের আশা আমি রাখিনে।"

গণনাথ দ্রুতকণ্ঠে বলিলে, "আপনাকে আমি খুব চিনি, ধরণী বাবু। নীচতা আপনার ভেতর নেই। এ জন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। তারপর আপনি সাহিত্যিক। আমার স্ত্রী আপনার গল্প-উপন্যাসেরও বড় ভক্ত।

'আমার সৌভাগ্য' বলিয়া ধরণী বাবু আসন ত্যাগ করিলেন।

তিন

"গণনাথ বাবু, আমার শরীর বড় শ্রান্ত। মাসখানেক বিশ্রামের জন্য পুরী যেতে চাই। আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।"

"এক মাস!—অতদিন আপনি অনুপস্থিত থাকলে আপিস চলবে কি করে? জানেন ত, আমার শরীর কি রকম ভেঙ্গে পড়েছে। ৫ মাস মুসৌরী ছিলাম, তাতেও শরীর ভাল হল না।"

গণনাথের আননের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া ধরণীধর বলিলেন, "প্রায় উনিশ বছর এক ক্রমে কাজ করে আসছি। কোনদিন বিশ্রামের কথা ভাবিনি। এখন না গেলেই চলবে না। আমার স্ত্রী-পুত্র সব সেখানে।"

গণনাথের মুখমণ্ডল কালো হইয়া গেল। অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তিনি অন্য দিকে খানিক চাহিয়া থাকিবার পর বলিলেন, "আপনি পনের দিন পুরীতে থাকলেই বেশ সুস্থ হয়ে উঠবেন। পনের দিনের ছুটী মঞ্জুর করলাম।"

ধরণীবাবু ঈষৎ বিস্মিত হইলেন। ছুটী মঞ্জুর। এমন ভাবের কথা উনিশ বৎসরের মধ্যে গণনাথ কখনও তাঁহার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার গৌর আনন ঈষৎ আরক্ত হইল। কিন্তু আপনাকে প্রচণ্ড আয়াসে সংযত করিয়া তিনি বলিলেন, "কাজ আপনার চলে যাবে। আমি যে ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি, তাতে কোন রকম অসুবিধা হবে না। যদি বিশেষ কোন অসুবিধা কোন বিষয়ে হয়, আমার কাছে কাগজপত্র পাঠালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

গণনাথ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। বোধ হয়, প্রয়োজনবোধও করলেন না। এই দীর্ঘকালে গণনাথের ব্যবসা উন্নতির উর্দ্ধতম সোপানে পৌঁছিয়াছিল। অর্থ, সম্ভ্রম, পদ-মর্য্যাদার মোহ গণনাথের মস্তিষ্ককে সুস্থ অবস্থায় রাখিতে পারে নাই। অবস্থার পরিবর্ত্তনে সাধারণ মানুষের আচার, ব্যবহার এবং মানসিক স্থৈর্য্যের যেরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, অত্যন্ত সাধারণ মানুষ গণনাথের তাহাই হইয়াছিল।

গণনাথ নিয়ম করিয়াছিলেন, যতদিনের পুরাতন, কর্ম্মঠ ও সুযোগ্য কর্ম্মচারীই হউক না কেন, কার্য্যে অনুপস্থিত থাকিলেই বেতন বাদ যাইবে। এমন কি সপ্তাহে একদিন ছুটি থাকিলেও, তাহার পূর্ব্ব বা পরদিন যদি কেহ পীড়া অথবা অন্যবিধ দৈব দুর্ঘটনায় কার্য্যালয়ে আসিতে না পারে তবে সেই দিন ত বটেই—ছুটির দিনটিরও বেতন বাদ পড়িবে। গণনাথের প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা—বিনা বেতনে অবকাশ।

সহরের প্রায় যাবতীয় বড় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা বৎসরে পুরাবেতনে একমাস ছুটি পাইয়া থাকে, সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহের ত' কথাই নাই, কিন্তু গণনাথের কাছে ঐ প্রকার ব্যবস্থার কোন মূল্য নাই। টাকার বিনিময়ে কাজ; কাজের বিনিময়ে টাকা। তুলাদণ্ডের সমান ওজনের দিকে গণনাথের খরতম দৃষ্টি ছিল। ভীষণ অর্থনীতিক দুর্দ্দিন ও বেকার-সমস্যার দুর্ভাবনায় কর্ম্মীরা সকলেই এই ব্যবস্থা নতমস্তকে মানিয়া চলিয়া আসিতেছে।

ধরণীবাবু এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণনাথ বাবুকে অনেক যুক্তি দিয়াছিলেন, কিন্তু গণনাথ নিজ মুখে যাহা উচ্চারণ করিলেন তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব ছিল। কাজেই ধরণীবাবু বিরক্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

ধরণীবাবুর সহকর্ম্মী নরেনবাবু তাঁহাকে একান্তে পাইয়া বলিল, "ছুটীর বেতন পাবেন কি না সেটা জিজ্ঞাসা করে নিলেন না কেন, স্যার?"

কাগজপত্র সব গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে ধরণীধর নিতান্ত উপেক্ষাভরে বলিলেন, "ধরণী মিত্রের এমন স্বভাব নয় যে, ঐ সব তুচ্ছ ব্যবহারে মাথা ঘামায়। নিজের ইচ্ছামত এতকাল কাজ করে এসেছি। কারও হুকুম নেবার প্রয়োজন কোনদিন বোধ করিনি। নিজের বেতন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে আমি শুধু ঘৃণাবোধ করি না, অপমান বলে ভেবে থাকি।"

নরেনবাবু এই স্বল্পভাষী দৃঢ়চেতা মানুষটিকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। তিনি সে-বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না।

অল্পক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পনের দিন পরেই ত' ফিরবেন?"

সংক্ষেপে ধরণীধর বলিলেন, "যদি শরীর ভাল থাকে, তাহ'লে আসব বৈ কি। সামান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।"

খানিক মৌন থাকিয়া নরেনবাবু বলিলেন, "আর একটা কথা বলব স্যার?"

সবিস্ময়ে সহকর্ম্মীর মুখের দিকে তাকাইয়া ধরণীধর বলিলেন, "বলুন না। ভণিতার ত' কোন প্রয়োজন নেই।"

এদিক ওদিক চাহিয়া নরেন বাবু চাপা গলায় বলিলেন, "কিছু দিন ধরে বিশু চাটুজ্জে বাবুর কাছে ঘনঘন যাতায়াত করছে। সে নাকি আমাদের অপিসের সব রকম কাজ ভাল জানে।"

ধরণীধর নিতান্ত উপেক্ষাভরে বলিলেন, "বিশুবাবু ত অনেক কাল ধরেই গণনাথ বাবুর কাছে যাওয়া-আসা করেন। এ অপিসের যে সব কাজ তা উনি হয়ত জানেন। তাতে কি? বেচারা বেকার অবস্থায় পড়েছেন। নিজের সুবিধার জন্য চেষ্টা করবেন না?"

"না, স্যার, তা বল্‌ছিনে। তবে বাবুও চাটুজ্জে, উনিও তাই। বঙ্কিম বাবু লিখে গেছেন, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রক্ষা করিবে? আমাদের বাবুরও ব্রাহ্মণপ্রীতি আজকাল খুব জোরে জেগে উঠেছে—তাই বল্‌ছিলাম।"

প্রসন্ন হাস্যে ধরণীধরের আনন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তাতে দোষ ত নেই, নরেন বাবু। স্বগোত্রকে রক্ষা করাই ত উচিত।"

নরেন বাবু নিষ্পলক দৃষ্টিতে এই বিচিত্র মানুষটির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চার

সীমাহীন সমুদ্রের ফেনশীর্ষ তরঙ্গসমূহ বেলাতটে প্রতিমুহূর্ত্ত আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। মুক্ত বাতায়নপথে সে দৃশ্য দেখিয়া ধরণীধর আজ তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ স্থানে, উনিশ বৎসর ধরিয়া কারা-জীবন যাপনের ন্যায় দুর্ভাগ্য সহ্য করিবার পর প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সাতদিন পর্য্যন্তও স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগের অবসর তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। উদর দেশের এক প্রান্তে দুষ্টব্রণ দেখা দিয়া ক্রমেই বিপুলায়তন হইয়া উঠিতেছিল। সুতরাং শয্যার আশ্রয় ত্যাগ করা অসম্ভব। চিকিৎসক ব্রণটিকে কার্ব্বঙ্কল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সমুদ্রের উদার, বিশাল, বিচিত্র সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিবার মত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ধরণীধরের ছিল না। দুষ্টব্রণের যন্ত্রণা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু তথাপি, চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আধার নীলাম্বুধি মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছিল।

প্রায় দীর্ঘ উনিশবৎসর ধরিয়া তিনি বস্তুতান্ত্রিক কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে সৌন্দর্য্যরস সৃষ্টির প্রকৃতিদত্ত মনকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আজ রোগশয্যায় সেই চিন্তাই তাঁহাকে আরও পীড়া দিতেছিল। যাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি যে কঠোর পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন বিনিময়ে পনের দিনের অধিক অবসর-জীবন যাপনের মঞ্জুরী পর্য্যন্ত প্রদান করিতে তিনি অসম্মত।

বারংবার সেই কথাটাই ধরণীধরকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল।

আকস্মিক অসুস্থতার সংবাদ গণনাথ বাবুকে বিজ্ঞাপিত করার পর যে উত্তর আসিয়াছে, তাহা বাহ্য ভদ্রতাদ্যোতক হইলেও উনিশ বৎসরের একনিষ্ঠ কর্ম্মী বন্ধুর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিসূচক নহে,

ইহা ধরণীধরের পক্ষে অনুভব করিতে আয়াস পাইতে হয় নাই। পনের দিনের মধ্যে ঈশ্বরানুগ্রহে সুস্থ হইয়া ধরণীধর কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, গণনাথ এইরূপ আশা পোষণ করিতেছেন।

পত্নী সুরবালা এক পেয়ালা কমলালেবুর রস আনিয়া স্বামীকে বলিলেন, "এটুকু খেয়ে ফেল। অত কি ভাব্‌ছ বল ত?"

পত্নীর হস্ত হইতে পাত্রটি লইয়া ধরণীধর বলিলেন, "ভাব্‌ছি অনেক কথা। গণনাথ বাবুর চিঠিখানা পড়েছ ত। এখন কলকাতা যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

দৃঢ়স্বরে পত্নী বলিলেন, "না। ডাক্তার বাবু যাবার অনুমতি না দিলে, আমি এক পা তোমাকে এ অবস্থায় নড়তে দেব না।"

ক্লিষ্টস্বরে ধরণীধর বলিলেন, "আর দেরী করা চল্‌বে না। ৪।৫ দিনের মধ্যে কার্ব্বঙ্কলটা পেকে যাবে, ডাক্তার বাবু বলেছেন। কলকাতায় গেলে পর বাড়ী বসেও কাজকর্ম্ম অনেকটা করা যেতে পারবে।"

স্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সুরবালা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে রহিলেন। তারপর বলিলেন, "আমি তোমাকে ওখানে আর কাজ করতে দিতে চাইনে। গণনাথ চাটুজ্জের জন্য এত করে এতকাল প্রাণ পণে খেটে তোমার কি লাভ হয়েছে শুনি? বাঁধা মাইনে—তাও কাজের তুলনায় খুব বেশী বলা চলে কি? উনিশ বছর কাজ করেছ, একটা মাস পুরো মাইনে ছুটী দিতে যে চায় না, তার মত চামারের কাছে তুমি কি প্রত্যাশা কর? শুধু সস্তায় খাটিয়ে নেবার মতলব।"

ধরণীধর প্রতিবাদের মত কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন না। সমস্তই নিছক সত্য। যে পারিশ্রমিক তিনি পাইয়া আসিতেছেন তাহাও পরিশ্রম, দায়িত্ব এবং কর্ম্মনৈপুণ্যের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর।

উদার সমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গ-শীর্ষের দিকে চাহিয়া তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সুরবালা বলিলেন, "তোমার বই লেখার কাজ কমিয়ে দিয়ে তুমি ভাল করনি। উনিশ বছরে অন্ততঃ চৌদ্দ পনের খানা উপন্যাস যদি লিখতে পারতে তা থেকে খুব টাকা পেতে, না? কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে বইলেখা অনায়াসে চল্‌ত। তা না করে দিনরাত তুমি গণনাথ চাটুজ্জের ঐশ্বর্য্য গড়ে তুলবার জন্য পরিশ্রম করেছো, রাগ করো না, তোমাকে বোকা পেয়ে চতুর ব্রাহ্মণ মিষ্টি কথা দিয়ে তোমায় ভুলিয়ে রেখেছে।"

তিক্ত হাসি হাসিয়া ধরণীধর বলিলেন, "হয়ত তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু কাজে ফাঁকি দিতে কখনো শিক্ষা পাইনি। নিজের কাজ ভেবেই পরিশ্রম করে এসেছি। এর পর থেকে তোমার উপদেশ আমার মনে থাক্‌বে। তবে আসছে রবিবারে আমরা পুরী ছেড়ে চলে যাব। বিনোদকে গাড়ী রিজার্ভ করবার কথা বলতে হবে। তুমি তাকে ডেকে দাও।"

অপ্রসন্ন মুখে সুরবালা সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

বারিবিস্তারের উপর তখন প্রদোষের অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। সমুদ্রের অশান্ত গর্জ্জনে কাহার বার্ত্তা ভাসিয়া আসিতেছে? দিক্‌চক্রবালে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধরণীধর স্ফোটকের যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পাঁচ

দেড় মাস অনুপস্থিতির পর ধরণীধর কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রথম দিনেই অনুমান করিলেন, চারিদিকেই যেন কাণাকাণি ফিসফাস চলিয়াছে। ঠিক পূর্ব্বের আবহাওয়া যেন বিদ্যমান নাই।

পুরী হইতে ধরণীধর অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় আসিবার পর গণনাথ বাবু সৌজন্য প্রকাশের অজুহাতে তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ভদ্রতার অনুরোধে এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, ভালভাবে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন তিনি কার্য্যালয় যাইবার চেষ্টা না করেন।

সেদিন মাসের প্রথম তারিখ। সকলেরই মাহিনা হইয়া গেল, কিন্তু ধরণীধরের কাছে টাকা লইয়া ক্যাসিয়ার বাবু আসিলেন না। ধরণীবাবু জানিতে পারিলেন যে, গণনাথ বাবু তাঁহার বেতন দিবার আদেশ দেন নাই।

অপরাহ্ণ কালে কার্য্যোপলক্ষ্যে উভয়ের দেখা হইলে ধরণী বাবুকে গণনাথ বলিলেন, "কাজকর্ম্মের অবস্থা ভাল নয়, ধরণীবাবু। গত মাসের বেতন বাবদ পুরা ত দূরের কথা, অর্দ্ধেক এমন কি সিকিভাগ দেবার ক্ষমতাও আমার নেই।"

ধরণীবাবু এই মানুষটিকে ভাল করিয়াই চিনিতেন। তথাপি বলিলেন, "আমার সংসার তা হ'লে চল্‌বে কি করে?"

পানের ডিবা ধরণীবাবুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া মিষ্টস্বরে গণনাথ বলিলেন, "একটা মাস কোন রকমে চালিয়ে নিন।"

তাম্বূল চর্ব্বণের স্পৃহা না থাকিলেও শিষ্টতার অনুরোধে ধরণীধর একটা খিলি তুলিয়া লইলেন।

উনিশ বৎসর প্রাণপণ পরিশ্রমের পর মনিবের মুখে এমন সহানুভূতি-স্নিগ্ধ মন্তব্য উপভোগ্য বটে! উনিশ বৎসর ধরিয়া একদিনের জন্যও যিনি কার্য্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন নাই, প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে যাঁহার আসন, তাঁহার সম্বন্ধে ধনিক কর্ত্তার এমন ব্যবহার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কোন্ অক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য?

বিতৃষ্ণায় সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইল। ধরণীধর এ বিষয়ে আর কোন প্রকার আলোচনা আত্মসম্মানের পক্ষে অমর্য্যাদাকর বলিয়া মনে করিলেন।

প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার প্রেম কি অবিচলিত রহিল?

মনের আঘাত-বেদনা মুখে প্রকাশ করিবার মত অধীরতা তাঁহার ছিল না। যে-প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতেন, যে গণনাথ তাঁহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া ভদ্রতা ও শিষ্টতার পরিচয় দিতেন, তাঁহার নির্ম্মম ব্যবহারের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ধরণীধর বিস্মিত হইলেন না, কিন্তু হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিলেন।

কয়েক মাস অবিচলিত ধৈর্য্যের সহিত পরিশ্রম করিয়া প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও সম্ভ্রমের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি তিনি মনোযোগী হইলেন। ইদানীং গণনাথের ব্যবহারে ভিতরে ও

বাহিরে একটা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা কল্যাণকর নহে। কয়েকজন বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ পুরাতন কর্ম্মীকে গণনাথ বিদায় দিয়া অল্প বেতনে অনিপুণ কর্ম্মীদিগকে নিযুক্ত করায় কার্য্যালয়ের কর্ম্মিগণ বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল ও বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করিতেছিল। ধরণীধর তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্ম নানা উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাহাতে সাময়িক ভাবে বাহিরে শান্তির প্রলেপ প্রদত্ত হইলেও ভিতরে ভিতরে সকলেই এই অব্যবস্থিতচিত্ত ধনিক কর্ত্তার উপর অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

এই সময়ে প্রতীচ্য মহাদেশে প্রতীক্ষিত সমরানল জ্বলিয়া উঠিল।

*　　*　　*

পৌষের মধ্যাহ্নে ধরণীধর বাবুকে আপিস-ঘরে নিরালায় ডাকিয়া লইয়া গণনাথ বলিলেন, "আপনার শরীর এখন ভাল যাচ্ছে না বোধ হয় ?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে ধনিক কর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া ধরণীধর বলিলেন, "আপনার মনে এ রকম ধারণা জন্মাবার কি কারণ হ'ল ? আমি বেশ সুস্থ এবং সবলই আছি ত !

"না, তাই বলছিলাম। হয় ত আপনার শরীর ভাল নেই। আজকাল কাজে আপনার মনোযোগের যেন অভাব দেখা যাচ্ছে।"

স্থির দৃষ্টিতে গণনাথের দিকে চাহিয়া ধরণীধর বলিলেন, "আপনার মনে এই রকম ধারণা জন্মেছে না কি ?"

ধরণীধরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া গণনাথ বলিলেন, "দেখুন, কিছুদিন থেকে ভাবছি, আমার শরীরের যে রকম অবস্থা, তাতে সবদিক দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করার দরকার। যাঁরা এতে যোগ দেবেন, তাঁদের সঙ্গে হয়ত আপনার আদর্শগত সামঞ্জস্য থাকবে না। তাই আমি ঠিক করেছি, আপনি—"

বাধা দিয়া ধরণীধর বলিলেন, "খুব ভাল কথা। আমি বিদায় নিচ্ছি। বলেন ত কাল থেকেই আর আসব না।"

"না না, এ মাসটা আপনি থাকুন। অবশ্য আপনার সঙ্গে এতদিনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমি একেবারে ছাড়তে চাইনে। প্রতিষ্ঠানের আর একটি শাখা দক্ষিণ-কলকাতার দিকে গড়ে তুলতে চাই। পরে এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করব। নূতন প্রতিষ্ঠানের ভার আপনার ওপরই আমার দেবার ইচ্ছে।"

"ধন্যবাদ ! আপনার সাধু উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু ক্ষমা করবেন, আর এ-সব ব্যাপারে আমার স্পৃহা নেই।"

গণনাথ বলিলেন, "কিন্তু আপনার সংসার ত' চলা চাই।"

মৃদু হাসিয়া ধরণীধর বলিলেন, "চালাবার যিনি মালিক, তিনিই ব্যবস্থা করবেন। তবে জীবনে যে মস্ত বড় ভুলটা করে ফেলেছি, তার শাস্তি হওয়া দরকার। আপনার কাছ থেকে সেটা পাওয়া গেল, ভালই হ'ল।"

গণনাথের আনন কি মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল ?

তিনি পানের কৌটা খুলিয়া ধরণীধরের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "আমি কি আপনাকে শাস্তি দিলাম ?'

"ধন্যবাদ ! পানের স্পৃহা নেই।—নাঃ, আপনি আমার উপকারই করেছেন। দেবী ভারতীর পূজায় উনিশ বছর সমগ্র মনপ্রাণ দিতে পারিনি। ইন্দিরার পোষ্যপুত্রের প্রতিশ্রুত স্থায়ী আশার কুহকে আত্মবিস্মৃতই হয়েছিলাম। আচ্ছা, এখন বিদায়।"

দ্বারপথে বিশু চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষৌরিত গোলাকার বিপুল মুখমণ্ডল দেখা গেল। তিনি উভয়কে আলোচনারত দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

ধরণীধর প্রশান্ত হাস্য সহকারে বলিলেন, "এবার যোগ্য হাতে আপনার প্রতিষ্ঠানের ভার দিচ্ছেন জেনে সুখী হ'লাম। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

দৃঢ় চরণে ধরণীধর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পানের কৌটা বন্ধ করিয়া গণনাথ টেবলের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার আননে জয়লাভের দীপ্তি, না পরাজয়ের ছায়া ?

······বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক দেশেই যে দলাদলি অথবা বিবিধ রকমের সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ গবর্ণমেণ্টের আধুনিক গণতান্ত্রিকতা। মানব-সমাজের মধ্যে শিক্ষা এবং বিদ্যার প্রকৃত আদর্শ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মানুষ আজকাল গরলকে অমৃত মনে করিয়া থাকে, অমৃতকে গরল মনে করিয়া থাকে এবং তাহারই জন্য মানুষ এতাদৃশ সর্ব্বনাশকর তণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টেকেও আকাঙ্ক্ষণীয় ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিয়া থাকে। জগতের প্রত্যেক দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৩ জন যাদৃশ দুরবস্থায় বিধ্বস্ত হইতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি দিলে বলা যাইতে পারে যে ক্রমশঃ মানব জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া উঠিতেছে, অথচ মানুষ তাহার এই দুরবস্থার দিকে যথাযথভাবে দৃক্পাত পর্য্যন্ত করিতেছে না।······ —৺সচ্চিদানন্দ

শেলী থেকে

["An Indian Serenade"এর মর্ম্মানুবাদ]

শ্রীমণীশচন্দ্র মজুমদার

তোমারে স্বপনে হেরি,
উঠেছি জাগিয়া, হে আমার প্রিয়া,
করিনি কিছুই দেরী।
এ নিশীথে বয়ে যায় র'য়ে র'য়ে
সমীরণ ধীরে ধীরে।
উজলি আকাশে তারাগুলি হাসে
আঁধারেরে চিরে চিরে।
তোমারে স্বপনে হেরি
মিলেছি আসিয়া, হে আমার প্রিয়া,
করিনি কিছুই দেরী।
বোঝা নাহি গেল, কিসে নিয়ে এল
যন্ত্রচালিত সম ;
তব বাতায়ন- তলে আনমন,
আসিনু, প্রেয়সী মম।
বয়ে যেতে যেতে বায়ু ওঠে মেতে
কভু বা মূরছি পড়ে
নীরব নিবিড় কালো নদীটির
শীতল বুকের 'পরে।
চাঁপার সুরভি মিলায় সে সবই
মধুর স্বপন যথা।

আহা বিরহিণী কোন বিহগিনী
গায় হৃদয়ের ব্যথা।
সাড়া নাহি পেয়ে আপন হৃদয়ে
মরে গান ফিরে গিয়ে ;
তব হৃদি 'পরে চাই যেতে মরে
তোমারই বিরহে, প্রিয়ে।
আমারে লহ গো তুলি।
মরণ ঘনায়, মূরছি যে হায়,
শয্যা নিয়েছি ধূলি।
তব প্রেম-মেঘে পড়ে যেন বেগে
চুম্বন-ধারে ঝরে,
ললাটে আমার অধরেতে আর
আঁখির পাতার পরে।
হতাশ, বিফল, তুষার-শীতল,
মরণ-পাংশু মুখে
র'য়েছি পড়িয়া, দ্রুত নাচি হিয়া
আঘাত হানিছে বুকে।
আমারে লহ গো তুলি,
তব ওই বুকে মিশে যাই সুখে,
ভেঙে হয়ে যাই ধূলি।

বালুচর

শামসুদ্দীন

একদা সে এসে বেঁধেছিল নীড় এই নদীটির তীরে
নির্জন বালুচরে
সম্মুখে যার রিক্ত পাথার পিছনে অন্ধকার
সেথা হেসে আলো ক'রে।

মরু-বালুকায় ফুটেছিল ফুল, খর্জ্জুর-বীথিকায়
ফলেছে রসাল ফল,
চাঁদিনীর আলো মাটির মায়ায় এসেছে ভূতলে নামি
ঢেলেছে চোখের জল।

জানি না কেমনে ভুল হ'ল কার ছিঁড়িল মায়ার ডোর
ভাঙিল স্বপ্ন-খেলা,
গড়িয়া উঠিল মাঝখানে তার বিরাট সেতুর বাঁধ
ফুরাল রঙিন বেলা।

নেমে এল তবে চারিদিক ঘিরি
অতল অন্ধকার

কোথা এর শেষ সন্ধান মেলা
নহেক সহজ তার।

রাত্রি যখন গহীন নিশীথ
তারকারা হ'ল চুপ
মনে হ'ল যেন তার সাথে ওর
কথা হ'ল অপরূপ।

কোন্ দূরে তার তরণী চলেছে নদীর কিনার ভাঙি
নাহি তার সীমাশেষ
বালুর পথেতে যাত্রা শুরু যার কোন্খানে যাবে মিশে
শেষ হবে দুখ-ক্লেশ!

সেতু সে ভেঙেছে চিহ্ন মুছেছে একাকার আজি সব
নদী ও বালুর চর
উভয়ের শুধু নিশ্বাস ঘুরে অতল অন্ধকারে
নির্ম্মম খেলাঘর।

পারস্যের শিল্প ও সংস্কৃতি

শ্রীগুরুদাস সরকার

যে জাতীয়তাবোধ স্বাধীনতাকামী জনগণের রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন-প্রচেষ্টায় উদ্রিক্ত হয় তাহার সহিত সংস্কৃতির সম্বন্ধ তো রহিয়াছেই, শিল্পেরও যে সম্বন্ধ নাই তাহা বলিব কিরূপে? পারস্যে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযান আরম্ভ হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের শেষার্দ্ধ হইতে। কাজর বংশের সাহ নসিরুদ্দিন (নসির-অল্-দিন) পারস্যের সাহদিগের মধ্যে প্রতীচ্য খণ্ডে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৮৪৮ খ্রীঃ অব্দে, মহম্মদ সাহের মৃত্যুর পর। নসিরুদ্দিন নিজ প্রতিকৃতি অঙ্কন করাইয়া ইউরোপের বিভিন্ন রাজ-দরবারে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিতে আনন্দ বোধ করিতেন। ইহাতে দরবারী চিত্রশিল্পীরা চিত্রকর্ম্মের এই শাখার যে উপযুক্ত অনুশীলনের সুবিধা লাভ করিতেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ইঁহার অষ্ট চত্বারিংশৎ বর্ষব্যাপী (খ্রীঃ অঃ ১৮৪৮—১৮৯৬) রাজত্বকালে ইরাণে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব প্রবল হইয়া উঠে। নসিরুদ্দিন অনুক্ষণ মৃগয়া ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকিয়া রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন। তাঁহার বারত্রয় ইউরোপ ভ্রমণ করার ফলে বিদেশে ব্যয়বাহুল্য হেতু রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইয়া পড়ে। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে, মে মাসে, তেহরাণের সাত মাইল দূরবর্ত্তী একটি পবিত্র সমাধিস্থান দর্শনকালে এক ব্যক্তি তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ইহার পরিসমাপ্তি এইখানেই ঘটে নাই। তখন হইতে স্বেচ্ছাচারপরায়ণ রাজতন্ত্রের সহিত যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা নাসিরুদ্দিনের উত্তরাধিকারী, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সাহ মজঃফ্ফর্ উদ্দিনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মহম্মদ আলি সাহের রাজত্বকালে সমভাবেই বিদ্যমান থাকে। মজঃফ্ফর উদ্দিনের রাজত্বকাল খ্রীঃ অঃ ১৮৯৬ হইতে ১৯০৭ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত। তাঁহার মৃত্যুর পর, মহম্মদ সাহ, ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দেই সিংহাসন অধিকার করেন। যে রাজ-অমাত্য আমিন্-উস সুলতান, ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে সাহ নসিরুদ্দিন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহারই মধ্যস্থতায় সাহ মজঃফফর উদ্দিন রুসিয়া হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। প্রথমবার ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা হয় ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে, এবং দ্বিতীয়বার ১৯০০ অব্দে। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে, রুসিয়ার নিকট হইতে প্রাপ্ত, ঋণলব্ধ অর্থ, হস্তগত হইলে শূন্য রাজকোষ পুনরায় কতকাংশে পরিপূর্ণ হয়। এই ঋণ গ্রহণ জাতীয়তাবাদীদিগের অনুমোদন লাভ করে নাই। বৈদেশিক ঋণ যে, বৈদেশিক প্রভাব বর্দ্ধিত করিয়া, জাতীয় অভ্যুত্থানের পথে বাধাসৃষ্টি করিবে, এ কথা জননায়কদিগের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। সাহ মজঃফ্ফর উদ্দিন যথাক্রমে ১৯০০, ১৯০২ ও ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে. বারত্রয় ইউরোপ ভ্রমণ করায়, তন্নিবন্ধন ব্যয়বাহুল্যহেতু, ঋণ গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না।

১৯০৬ খ্রীঃ অঃ পারস্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। মজলিস নামক পারস্যের জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন হয় ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দের ৬ই অক্টোবর তারিখে। মজলিস প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভারূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯০৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে পারস্যে যে বিরূপ বিক্ষোভ ও রাষ্ট্র-

নৈতিক বিলোড়ন উপস্থিত হয়, তাহা আর বলিবার নয়। পারসীক মহিলা-আন্দোলনের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, এ বিপ্লব শুধু পুরুষদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। (১) পারসীক পার্লামেণ্ট (মজলিস) তাঁহাদিগের দাবীতে সম্মত না হইলে রুসিয়গণ যখন তেহরণ অধিকার করিবে বলিয়া ভয় দেখাইতেছিল, তখন শামসুল মিয়ালী (খানুম রায়েসে) নামক একজন অল্প-বয়স্কা রমণী মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা করিয়া, রুসাতঙ্ক হইতে দেশ রক্ষা করার জন্য দেশবাসিগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সাহ প্রতিনিধিমূলক শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, স্বেচ্ছাচার প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তনের প্রয়াসী হইলে তাঁহার এই হীন প্রচেষ্টা সে সময় ব্যর্থ হয় বটে কিন্তু ইহারই প্রায় ছয় মাস পরে, খ্রীঃ অঃ ১৯০৮ ২৩শে জুন তারিখে, দায়িত্ব বিহীন রাজশক্তির আধাররূপে সংহ পুনরায় পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হন এবং মির্জ্জা জাহাঙ্গীর খাঁ সুর প্রমুখ জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যে দিন শাসনধারার এই পরিবর্ত্তন (Coup d'etat) সংসাধিত হয়, সেই দিন যখন সাহের কসাক্ সৈন্যদল পারসীক পার্লামেণ্ট গৃহ, সিপাসলার মসজিদ ও জাহির উদ্দৌলার আবাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোলা বর্ষণ করিতেছিল, তখন জনৈকা পারসীক মহিলা এই সৈনিক-দলের মনুষ্যত্ব উদ্রিক্ত করিয়া এরূপ হৃদয়গ্রাহিভাবে দেশাত্মবোধের বাণী প্রচার করেন যে, তাহারা লজ্জা পাইয়া তাহাদিগের ধ্বংস-মূলক কার্য্য হইতে বিরত হয়। শুদ্ধান্তবাসিনী অসূর্য্যম্পশ্যা অবলাগণ অস্ত্র ধারণ করিয়া মজলিস গৃহে দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত হন, এবং তথায় আপনাদিগের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, সভাপতি ও সদস্যদিগকে জানাইয়া দেন যে, "দেশবাসী-দিগের প্রতিনিধি, মজলিসের সভ্যগণ, যদি দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ না হন, তাহা হইলে জাতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহারা স্ব স্ব স্বামী পুত্রকে হত্যা করিয়া নিজেদের প্রাণও স্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে পারসীক নারীগণ যে ক্রমেই প্রগতিশীলা হইতেছিলেন এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁহারাই যে আমূল পরিবর্ত্তনের সমধিক পক্ষপাতিনী ছিলেন, এ কথা পারস্যের পূর্ব্বতন অর্থসচিব, মার্কিণ রাজনীতিবিদ্ মর্গ্যান শুষ্টার (Morgan Schuster)ও স্বীকার করিয়াছেন।

এ-কথাও জানা গিয়াছে যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণের অপ্রীতিকর কোনও কার্য্যপ্রণালী সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত হইলে, প্রজাবর্গের অসন্তোষজ্ঞাপনের জন্য শুধু পুরুষেরা নয়, নারীবৃন্দও অগ্রণী হইয়া দলে দলে, বাজারে ও বিপণীসমূহে উপস্থিত হইতেন, এবং বাজার ও দোকানগুলি যাহাতে বন্ধ রাখা হয় তজ্জন্য বিপণিস্বামী ও বাজারের বিক্রেতাগণকে অনুরোধ করিতে বিরত হইতেন না (২)। বঙ্গদেশে নারীনেতৃগণের এই প্রকার রাজনৈতিক বিক্ষোভে সাক্ষাৎ অংশ গ্রহণ আরও চতুর্দ্দশ বৎসর পরের কথা (৩)। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, তাঁহার ভগ্নী উর্ম্মিলা দেবী এবং কংগ্রেসের মহিলা কর্ম্মী শ্রীমতী সুনীতি দেবী শান্তিপূর্ণভাবে পিকেট্ করিতে গিয়া ১৯২১ খ্রীঃ অব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার হন (৩)।

১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে, ১৩ই জুলাই তারিখে, জাতীয়তাবাদী নায়কবৃন্দ সসৈন্যে তেহরণে প্রবেশ করিলে, পারস্যাধিপ, মহম্মদ আলি সাহ, পলায়ন করিয়া রুশিয়ার দূতনিবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ইহার প্রায় দুই মাস পরে, রাজ্যহারা হইয়া, তেহরণ ত্যাগ করিয়া, অডেসা (Odessa) অভিমুখে প্রস্থান করেন। ইহার পর তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তাঁহার স্থানে, তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র আহম্মদ মীর্জ্জাকে সাহ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে, মহম্মদ আলি সাহ সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করিলে, ফিরুজকু'র যুদ্ধে তাঁহার পরাভব ঘটে এবং ইহারই ফলে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থমনোরথ হইয়া দেশ ত্যাগ করিতে হয়। আহম্মদ মির্জ্জা ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দেই সিংহা-সনের উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয় পাঁচ বৎসর পরে, ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে। পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিলে, ইরাণে যে পরি-স্থিতির উদ্ভব হয়, কাজরবংশীয় শেষ নরপতি আহম্মদ সাহ (আহম্মদ মির্জ্জা) তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া রাজ্য ও রাজমুকুট হইতে চিরতরে বঞ্চিত হন। আহম্মদ সাহের পতন ঘটিলে পর, পুর্-ই-দাবুদ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী কবিগণ, তাঁহাকে ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কাজরবংশোদ্ভব সাহদিগকে উচ্ছৃঙ্খল নরপিশাচ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাজর-দিগের রাজত্বকালে আর যাহাই ঘটুক না কেন, পারসীক শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা নিতান্ত বর্ণজ্ঞানহীন, তাঁহারাও "দিওয়ান" গ্রন্থাদির পুঁথি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন, এমন কি কোনও অশিক্ষিত রুটিওয়ালাও যে ফিরদৌসী, জামি, প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদিগের কাব্যগ্রন্থ পাঠক সাহায্যে পড়াইয়া লইত, তাহা সৈয়দ কেরামত আলি জৌনপুরী নামক হুগলী ইমামবাড়ার একজন ভূতপূর্ব্ব মোতোয়ালীর বর্ণনা হইতে জানা যায় (৪)। তাঁহাকে যে নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর কাব্যামোদী ব্যক্তির অনুরোধে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন কাব্য পাঠ করিয়া শুনাইতে হইয়াছে জৌনপুরী সাহেব এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বর্ণনা হইতে চারুশিল্পানুশীলনের কিম্বা তদ্বিষয়ক উৎকর্ষের কোনও পরিচয়ই পাওয়া যায় না। পারস্যে প্রবাস যাপনকালে সৈয়দ কেরামত আলি যে ফাত আলি সাহ (১৭৯৮—১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ) ও তৎপুত্র আব্বাস আলির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহার ইরাণের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তিনি এ-কথার উল্লেখ করিয়াছেন। মনে হয় প্রাচ্য দেশের সুপ্রচলিত প্রথানু-সারে পারস্যেও পণ্ডিতম্মন্য বিদেশী ব্যক্তির রাজসকাশে উপস্থিত হওয়া দুরূহ ছিল না। ফতে আলি সাহ সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী

(১) H. Dazemxadeb Iransohaler- La role de la femme dans la revolvtion Persane, Measages di Orient Cahier Persane, pp 140-141.

(২) Messages d'Orient, loc. cit. P. 139.

(৩) হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'দেশবন্ধুস্মৃতি, পৃঃ ২৯২।

(৪) Syed Ameer Ali's Persian Culture, p. 28.

ছিলেন বলিয়াই বিশ্বাস হয়। তাঁহার সভা-কবি (Poet Laverte) তেইশ হাজার শ্লোকে "সাহেন সাহ নামা" নামক এক ইতিবৃত্তমূলক মহাকাব্য রচনা করেন তাঁহার রাজত্বকালের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হেনরি মার্টিন (Henry Martyn) কর্ত্তৃক বাইবেলের নূতন ধর্ম্মপুস্তকের পারসীক ভাষায় অনুবাদ। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে শাসন-সংস্কার লইয়া পুনরায় যে রাজনৈতিক আন্দোলন উপস্থিত হয়, রেজা খাঁ পহ্লভী, পারসীক সৈন্যবহের প্রধান অধিনায়করূপে তাহার সহিত বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আহাম্মদ সাহের সিংহাসনচ্যুতি ঘটে, এবং ইহার কয়েকমাস পরেই রেজা খাঁ সাহরূপে মনোনীত হন। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল, এই ক্ষমতাবান সেনানায়ক, দেশে শান্তি সংস্থাপন করিয়া সংগঠনকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালেও যে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ নিরাপদ ছিল না— এ-কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। রেজা খাঁর একটি স্মরণীয় কীর্ত্তি পারস্যের সুপ্রাচীনকালে প্রচলিত ইরাণ নামটির পুনঃপ্রবর্ত্তন।

রেজা খাঁর রাজত্বারম্ভের প্রায় একাদশ দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে মির্জ্জা আকা ইমামী নামক এক প্রসিদ্ধ চিত্রকর প্রাচীন প্রথায় শিল্পের পুনর্গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং তৎকালে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন (৫)। তৎপ্রবর্ত্তিত চিত্র-শিল্প পুনরুজ্জীবন-প্রচেষ্টা যে একবারে বিফল হয় নাই এইরূপই ধারণা জন্মে, তবে সম্পূর্ণ শান্তিময় পরিস্থিতি না ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত, এই নবজাগরণের মূল্যাবধারণ সম্ভব নয়।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর, দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই, সাহ মিত্রশক্তির হস্তে বড়্যন্ত্রকারী জর্ম্মান পঞ্চম বাহিনীকে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করায়, পারস্য মিত্রশক্তির দ্বারা অধিকৃত হয়, এবং রেজা খাঁ পহ্লভী সিংহাসনচ্যুত হন। ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহাকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং সেইখানেই ১৯৪৪ খ্রীঃ অব্দে, ২৬শে জুলাই তারিখে, তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী মহম্মদ রেজা খাঁ, পারস্যের সাহপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে ১৫ই জুলাই তারিখে। জর্ম্মানবাহিনীর তথা অক্ষশক্তির প্রতিরোধকল্পে মিত্রশক্তি (ইংলণ্ড, মার্কিন ও রুশিয়া) পারস্যে যে সৈন্যসন্নিবেশ করেন তাহা অল্পদিন পূর্ব্বে, পারস্পরিক বাগ্বিতণ্ডার পর, অপসারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ত্রিশক্তির মধ্যে প্রধান দুইটি ইউরোপীয় শক্তির রেষারেষির জের এখনও সম্পূর্ণ মিটে নাই। গোল বাধিয়াছে উত্তর পারস্যে কেরোসিন তৈলের খনির ইজারা লইয়া। এই বিরাট তৈলক্ষেত্র একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত। পারস্যের প্রধান খনিজ সম্পদ কেরোসিন। ইংরাজ ও মার্কিণ ধনপতিরা এ ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। রুসিয়া উত্তর পারস্যের খনিগুলি বন্দোবস্ত লইতে চায়। পারসীক গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে তৈলক্ষেত্র ইজারা দিবেন না বলিয়া প্রকাশ করায় রুসিয়া ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। বিদেশীয়েরা এ ব্যবসা পরিচালনা করিলেও দেশীয় ধনিকদিগের স্বার্থ ইহার সহিত নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট। এই তৈলই দেশের ধনাগমের মূল, কিন্তু প্রজাদিগের জীবনযাত্রার মানবৃদ্ধির উপায় স্বরূপ না হইয়া ইহা এক্ষণে সত্যই অশান্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৈল সম্পর্কে বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থসংঘাতই ইরানে শান্তি সংস্থাপনের প্রধান অন্তরায়।

আসল আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে দেশেরই আভ্যন্তরিক অবস্থায়। মহম্মদ রেজা খাঁ সাহরূপে বৃত হইয়াছেন বটে, কিন্তু রেজা সাহ পেহ্লভীর পর হইতেই স্থায়িত্বশীল (static) শাসনধারা পারস্যে আর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে নাই। প্রাচীন জমিদারশ্রেণীর এবং ইঙ্গ-ইরানিয়ান তৈল কোম্পানীর সহায়তায় রেজা সাহ পহ্লভী যে ভাবে জবরদস্ত শাসন চালাইতেছিলেন, তাঁহার পুত্রের আমলেও সে নীতির এত দিন পর্য্যন্তও যে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, এইরূপই শুনা যায় (৫ ক)। প্রতিনিধি-সভা বিদ্যমান থাকিলেও, এবং নিয়মতন্ত্রমূলক রাজ্য (constitutional monarchy বলিয়া পরিচিত হইলেও, নিয়মতন্ত্রের বাহল্যের বালাই এখানে কোন কালেই ছিল না বলিয়া শুনা যায়; বরং এক প্রকার অ-নিয়মতন্ত্রই অদ্যাবধি বিরাজ করিতেছে। মজলিসের সদস্যগণ নাকি দলাদলি লইয়াই ব্যাপৃত, আপন আপন আত্মীয় বর্গের জন্য সুবিধামত চাকরী জুটাইতেই ব্যস্ত, একমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থই নাকি সকলের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী সাংবাদিকের এ বিবৃতি যে অন্ততঃ আংশিক ভাবেও সত্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রতিনিধিমূলক শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া সত্ত্বেও এরূপ অপবাদ প্রাচ্যের অন্যত্রও যে না শুনা গিয়াছে তা নয়।

[আগামীবারে সমাপ্য

(৫) প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৯, পৃঃ ৫৮৫।

(৫ক) . ইরাণের গণতান্ত্রিক অভিযান। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ৯।

সূর্য্যাস্তের সুর

অমিয় ভট্টাচার্য্য

যদি বল, এ-গল্পে নতুন কি আছে—কি হবে এ গল্প পড়ে। আমি বলব, কি দিয়েই-বা কি হয়। সবই তো ভূয়োদর্শন; না হয় খুব জোর করে বলা চলে একটা পরীক্ষা। গল্প গল্পই—মানুষের জীবনটাই নাকি একটা অতি বোকা-সোকা লোকের গল্প-কথা মাত্র। বের্গসঁর মতে বলতে পারি জীবনটা একটা ধূমকেতু। কোথা থেকে কোন নিয়মে যে বেরিয়ে এল, আবার জ্বলতে জ্বলতে কোন দেশে গিয়ে হোল তার শেষ।... তবু সত্যিই কি কিছু নেই? প্রতিমা বিসর্জ্জনের পরও কাঠামোটা, সব রং উঠে গেলেও নিরাভরণ শূন্য সাদা দেয়ালটা? সব সুর হারিয়ে গেলেও তার রেশটা? জানি সবই শেষ হয়ে যায়; তবু এমন একটা কিছু তো থাকে যা নিয়ে আমরা ভুলতে ভুলতে চলি, স্পন্দিত হই চাঞ্চল্যে, জ্বলে উঠি, আবার যার অভাবে একেবারে নিভে যেতে পারি। কে বলতে পারে এই রেখিণী নদীটি সুদূর সমুদ্রে গিয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠবে কি না। সব কি মনে, করে রাখা যায়? সব বাদ দিয়েও কিছুটা থাকে যা নইলে জীবন বেড়ে ওঠে না—এগিয়ে চলে না—মেলে দেয় না আপনাকে।

আমারও তো তাই। ছোটবেলাটা মানুষ হয়েছি পাড়াগাঁয়ে পিসেম'শায়ের বাড়ী। সেই সময় থেকে জীবনে সত্যিকার যা ভাললাগা, যে উন্মুখর স্পন্দন, তাদের খণ্ড খণ্ড স্মৃতিচিত্রগুলি মনে আঁকা আছে সূক্ষ্ম রেখায় টানা একটা স্কেচে। তাকেই যত্ন করে আঁকলে রং ফলান যায় বই কি। লোকে তারিফ করবে আমার গল্পের টেকনিক আর প্লটকে, আমার জীবন দর্শনের গভীর বোধকে। আমি কিন্তু আমার কথাই নিছক বলে গেলুম, যা এমনিই হয়ে উঠলো তাই।

পিসিমার ছেলেপুলে ছিল না—আর পিসেম'শায়ের টাকার জোরও ছিল। তাই মানুষ হয়েছি যত্নে আর স্বাধীনতায়—তা বলে কুপথে নয়। ভাল ছেলেই ছিলুম পড়াশোনায়। পিসেম'শায় ছিলেন পশ্চিমের কোন কলেজের ইংরিজি সাহিত্যের প্রফেসর, তাই রুচি আমার অভিজাত আর মার্জ্জিতই ছিল। গাঁয়ের জমিদার পশুপতিনাথ চক্রবর্ত্তী। আমার কৈশোরের অবসর সময়গুলো কেটেছে এই বিশেষ একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে। জমিদারীতে তখনই পড়ন্ত বেলার ছায়া হেলে পড়েছে, তবু ঠাট্ বজায় ছিল। ছিল বিরাট তিনমহল চক্‌মেলান বাড়ী আর তার রেলিংঘেরা চৌহদ্দির মাঝখানে সিংহদ্বার—দু'পাশে নহবৎ-খানা আবডাল—দেউড়ির বৈঠকখানা-ঘরে তখনো দেয়ালে আটকানো ঢালের ওপর বাঁকা তলোয়ার পুরোনদিনের পরাক্রম নিয়ে জেগে ছিল। প্রথম যে-দিন পিসেমশায়ের সঙ্গে পার হলুম সেই সিংহদ্বার সেদিন কি রোমাঞ্চ যে লেগেছিল—মনে হোলো এত চুপচাপ—এত বড় বাড়ী—এ-কি দৈত্যপুরী! পশুপতিবাবু আমাদের আপ্যায়ন করলেন, মনে পড়ে সেই জলদ-গম্ভীর কণ্ঠ—"তোমারই নাম ললিতাদিত্য?"

"হ্যাঁ।"

"তাই তো হে বাংলার বীর, চল তোমাকে আমার দুর্গ জয় করিয়ে নিয়ে আসি—কি বল হে রমেশ, এ্যাঁ?" কম্পিত ভীরু পায়ে পশুপতিবাবুর সঙ্গে একেবারে অন্দরে এসে দাঁড়ালুম। কেউ কোথাও নেই, খালি বড় বড় সাজান ঘর—চারিদিকে বারান্দা। পশুপতি বাবু হাঁকলেন, "মিনু, লীলা, মুন্না! কে এসেছে দেখবি আয়!" এক মিনিটও নয়—কলকণ্ঠে কোথা থেকে তিনটি মেয়ে এসে পড়ল!

"এই তোমার মিনতি-দি, এই লীলা—তোমার চেয়ে কিছু ছোট হবে, খুব ভাল গান গায়—আর এই আমার মুন্না" সবার ছোটটিকে কোলের মধ্যে টেনে এনে পশুপতি বাবু বল্লেন, "লীলার গানের সঙ্গে নতুন নতুন ঢঙে নাচে। আর মিনুমা আবার কবিতা লেখে যে—দেখাস তো মিনু তোর Otographএর খাতায় রবিঠাকুর কি লিখে দিয়েছেন। হ্যাঁ, এবার তোমাদের বলি—এর নাম ললিতাদিত্য—আমাদের রমেশের ভাই-পো—সেই যার কথা সেদিন তোদের বলছিলুম, আমার স্কুলে রেকর্ড মার্ক রেখে যে সেকেণ্ড ক্লাশে উঠলো এবার। ললিত; ভাব করো এদের সঙ্গে—জীবনে যাদের এরা হারিয়ে ফেলেছে, সেই সব হারানোদের অভাব আমার মধ্যে পরিপূর্ণ করে দাও দেবতা—আমি যেন পারি, যেন পারি এদের ভরিয়ে রাখতে—ওঃ লীলা, ললিতাকে চা খাবার দাও, কেমন? হ্যাঁ।"

পশুপতি বাবু অশ্রু-দুর্ব্বল হৃদয়ের নিভৃত কোণটিকে ঢেকে নিতে নিতে নীচে নেমে গেলেন। প্রথমে অস্বস্তি লাগলো ভয়ানক; কিন্তু কয়েক মিনিটেই মিনুদি আমাকে সহজ আবহাওয়ায় নামিয়ে নিয়ে এলেন। মুন্নার নাচ হোলো। আমি মিনুদির কবিতা চেঁচিয়ে পড়লুম। মিনুদি বল্লে "খুব মিষ্টি তো তোমার গলাটা—গান শেখনা লীলার কাছে!" লীলা কিন্তু গান গাইল না কিছুতেই! ও যেন কেমন। সামান্য দু'একটা প্রশ্ন করলে লজ্জায় রেঙে

ওঠে। ফেরবার সময় মিনুদি বার বার বলে দিলে "কাল এসো কিন্তু ললিত, বাড়ীতে আর কেউ নেই যে।"

ঘাড় নাড়লুম। রাস্তায় যেতে সেদিনের অফুরন্ত আনন্দের মাঝখানে একটি কথা মনে বিঁধেছিল—লীলা জমিদারেরই মেয়ে।

তার পর, দিন কাটতে লাগল—মিনুদি, পশুপতি বাবু, লীলা, মুন্নাকে নিয়ে নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়। আত্মীয়তার বাধা নেই কোন কালেই। স্কুলের ছেলের দল থেকে হোমর চোমরা সমাজপতির দল হয়ত গোপনে বলে ওঠেন—বড় ঘরের বড় কলঙ্ক! কিন্তু কলঙ্ক রটাবার ক্ষমতা কারুরই ছিল না—এত বড় বাড়িতে শুধু ক'টি মেয়ে আর নায়েব ঝি, চাকর, পুরুষ একমাত্র পশুপতি বাবু আমিও নেহাৎ ছেলেমানুষই বা কই! সন্দেহের কালো বীজ বাতাসেই ওড়ে, কিন্তু শক্ত মাটি পায় না। আমি ভালো ছেলে, আমি অভিজাত—সাহস পেল না কেউ। মিনুদি কি সহজ, কত কাছের মানুষ; আর মুন্না লাস্য-লাবণ্যময়ী চঞ্চল একমুঠো নদীর নীল জল। শুধু লীলা স্থির, গভীর—তার ঐ অগাধ কালো চোখের তলায় ডুব দিয়েও যেন কিছু তুলে আনা যাবে না,—তার শঙ্খশুভ্র মুখের মাঝখানে পলাশের মত পাতলা দু'খানি ঠোঁট কেন কলরব করে ওঠে না! ও যেন একটা তুঙ্গ তরঙ্গের স্থিতি, যে দিন তা ভেঙে পড়বে বিপুল উচ্ছ্বাসে ওর দেহতটে, তার অনুবৃত্তি হবে সেদিন ওর দেহের উপসীমা ছাড়িয়ে একটা নতুন দ্বীপান্তরে! লীলাকে অনেকবার দেখতুম পেছন থেকে সাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে কয়েকটা রহস্যময় বাঁকা রেখার টানা; মনে হত ও যেন প্রচণ্ড কি এক আবেগে উপহত—যেন দূরান্তরের দাবাগ্নির একটা আভাস, নীলাস্তের একটা স্নিগ্ধ ইসারা! ওকে জীবনের অবলম্বন করে নিতে খুসি ছিলুম—একথা আজ অস্বীকার করি না। ভাল যা লাগে তার জন্যে ভার বইতে লজ্জাও নেই, ভয়ও নেই। তবু জীবনকে আমি তখন থেকেই সহজ স্রোতে ছেড়ে দেবারই পক্ষপাতী ছিলুম। যা আসে তাকে তুলে নেওয়, যা পাব তা এমনিই পাব; যদি সজল শ্যামল পূরবৈয়া বায়ু অনুকূলে বয়, তবে ও আসুক না নিবিড় হয়ে আমার জীবনে। যাক, যা হয়নি তা নিয়ে আমার গল্প নয়, যা হয়েছিল তাই বলি। মাঝে মাঝে আমরা দল বেঁধে যেতুম সহরের সিনেমায—আমিই হতুম পুরুষপ্রধান! রাত্তে ট্রেণে করে ফেরা অল্প চাঁদের আলোয়। সেবার কার্ত্তিকের শেষাশেষি অনেক রাত্তে ট্রেণে করে সবাই ফিরছি সিনেমা দেখে। মিনুদি বল্লে, "ললিত, শীত করছে? এস আমার স্কার্ফ'এর মধ্যে—দিদির কাছে লজ্জা করতে নেই বোকা ছেলে। এস বলছি।" মিনুদি ওর গায়ের সঙ্গে আমার গাটা জড়িয়ে নিলেন। আমার গা হিম-ঠাণ্ডা, মিনুদির কোমল আশ্রয় উষ্ণ আরামের প্রলেপমাখান! সারা ট্রেণের পথে মিনুদি কথা কয় নি—যেন ঘুমের আবেশ ছিল ওর চোখে—আমি কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম! মনে আছে আমাদের ষ্টেশন আসবার একটু আগে জেগে উঠেছিলুম মিনুদির গানের মত ক'টি কথায়—"ললিত, দুষ্টু ছেলে, উঠবে না বুঝি?"

দিন যায়। মুন্না নাচ দেখায়, আমার কাছে Arabian Nights এর গল্প শোনে; মিনুদি আর আমি বিকেলের ফিকে হোলদে রদ্দুরে দক্ষিণের বারান্দায় বসে কোন দিন বা 'চয়নিকা' পড়ি—'গুপ্তপ্রেম', 'বধূ', 'স্বর্গ হইতে বিদায়।' কোন কোন দিন সন্ধ্যের মুখোমুখি মধুবর্ণ চাঁদ উঠে আসে আকাশের কোল থেকে—সামনের মাঠটা জ্যোৎস্নায় ধোয়া। মিনুদি বলে—"তুমি কেন কবি হওনি ললিত, কেবল বুদ্ধিতে শান দিয়ে দিয়ে পরীক্ষায় প্রথম হতেই শিখলে—মানুষের মনের খবর জানলে না। তুমি 'নষ্টনীড়' পড়েছ?"

"না।"

"দেখ, লীলাটা আজকাল একটা গানও গায় না; কি হয়েছে ওটার যে।"

সত্যি লীলা শুধু চায়ের সময় একটু আসে, ভাঁটা-পড়া নদীর গেরুয়া স্রোতের বৈরাগ্য নিয়ে—যা হাজার আঘাত খেলেও তীরে আছড়ে পড়ে প্রতিশোধ নিতে শিখবে না—এমনি নিস্পৃহ। ওর পায়ে আগত যৌবনের চঞ্চল নূপুরের চারু নিক্কনের বদলে অসহ সংহতি,—চোখে শুধু কি কোমল সজল পল্লবচ্ছায়া।

আর একদিন সন্ধ্যে হয় হয়, বাড়ী ঢুকতেই শুনলুম গান—'হে চঞ্চল যাবার আগে, মোর মিনতি রাখো, আর একটুক্ষণ থাকো।'

মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এল, "লীলার এত ভাল গলা!"

মিনুদি সামনেই ছিল, শুনতে পেয়েই বল্লে—"সত্যি ললিত, এত-বড Certificate দিলে! দাঁড়াও এর অধিকারিণীকে ডেকে আনি—লীলা! লীলা!!" মিনুদি হাসতে হাসতে পশ্চিমের ঘরের দিকে ছুটল। খানিকটা সময় একলাই কাটল, মিনুদি মুখে মিটমিটে হাসি নিয়ে ফিরে এল—নাঃ, কিছুতেই এল না তোমার 'গীত-ললিতা'—কিচ্ছু বোঝে না ললিত, কিচ্ছু বোঝে না!" ক্ষণিক লজ্জায় চোখ দুটো নামিয়ে নিই।

"ললিত, চোখে কাজল দিয়েছ নাকি—দেখি, দেখি"! কাছে টেনে নিল মিনুদি নিবিড় ক'রে, "ওঃ খুব ঠকাতে পারে তো তোমার চোখের কুঁচকানো পাতা দুটো।"

একটু চুপচাপ থেকে হঠাৎ মিনুদি বলে উঠল—"আচ্ছা, তোমার না সামনে টেষ্ট পরীক্ষা—পড়তে হবে না বুঝি! আজ আর সন্ধ্যের পর এখানে একটুও নয় কিন্তু!"

বেকুব বনে গিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লুম—"সত্যিই তো!" নেমে এলুম রাস্তায়, একটা তীব্র অভিমান নিয়ে। পেছনে দাঁড়িয়ে রইল মিনুদি, দু'চোখে স্নেহ, বিদ্রূপ বা অন্য কিছুর গহন রহস্য নিয়ে। আর তারও পেছনে হঠাৎ দেখে এসেছিলুম সেদিন আর একটি মেয়েকে, রাত্রের নদীর মত ধূসর, অস্ফুট—সে লীলা।

তারপর আমার জীবনের ওপর দিয়ে তিনটি বছর গড়িয়ে গেছে। Matric পাশ ক'রে বৃত্তি পেলুম—চলে এলুম কলকাতার নামকরা কলেজে—আরো ভালো ছেলে হব বলে রাজ্যের ইতিহাস, সাহিত্যে ডুব দিলুম—যুগবর্ত্তী হব বলে রাজনীতির ঘাগ্‌যুদ্ধে নামলুম—দু'একটা পত্রিকায় লিখলুম প্রবন্ধ, আমাদের ভাবী সমাজ-মানসের নিখুঁত চিত্র; কিন্তু ফল কি হোলো বলতে পারি? কিছুই নয়; জীবনে পথ চেয়ে বসে থাকাটাই বাতুলতা। তোমরা হয়ত ভেবেছিলে ইতিহাসে এম, এ, দিয়ে পিসে-ম'শায়ের কলেজের প্রফেসারীটি অনায়াসেই পাবে আমার মত পরীক্ষা-লড়নেওয়ালা ছেলে। কিন্তু জেনে রাখ এখন, বি, এ,-তে ইতিহাসে অনার্স-টা পেলুম কোনক্রমে, পরীক্ষায় লড়াইএর সখও মিটল—উৎসাহটাকে হঠাৎ শ্রান্তি এসে চেপে ধরল, ছেড়ে দিলুম পড়া। ইতিমধ্যে এ দিকের খবরও শোন—পিসেম'শায়এর অকালমৃত্যু হয়েছে, মিনুদির বিয়ে হয়ে গেছে একটি দ্বিতীয়পক্ষ জমিদার প্রৌঢ়ের সঙ্গে এক বছর আগে, নিমন্ত্রণ পেয়েও কবেকার একটা সূক্ষ্ম অভিমানের উজান ঠেলে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি। বেশ নিরিবিলি রইলুম কলকাতার মেসেই। শুধু লীলার নামটা কেন হাস্নুহেনার গন্ধের মত থেকে থেকে ভেসে আসে মনে।

লক্ষ্যটা হয় ত ঠিকই থাকে, বদলে যায় বুঝি লক্ষ্যে পৌঁছাবার আয়োজনটা। কৈশোরের মায়াদ্বীপ থেকে, ভেসে পড়েছি কতদিন; আজ এসে যৌবন-মধ্যাহ্নের উত্তাল উদ্দাম সাগরদোলায় দুলছি। আকাশ এখন স্বচ্ছ নীলিমায় নির্মুক্ত, নির্ঝরিত। তবু একদিন স্মৃতির কপোত আবার বয়ে নিয়ে এল কোনো অপগত জীবনের ধূম্র নীল চিহ্ন। হঠাৎ পেলুম পশুপতিবাবুর টেলিগ্রাম—Do Come Mino Dying। মিনুদি! তুমি কতদূর মিনুদি! কোন্ অচেনা রহস্যময় তীরভূমিতে তুমি মিলিয়ে যেতে চাইছ! পরম পরিচয়ের দূরবীক্ষণ দিয়ে তোমায় আবার দেখতে পেয়েছি—চল।

সেদিন সন্ধ্যায় সমুদ্র থেকে একটা হাওয়া কান্নায় নিঃস্বনিত হয়ে বার বার ফিরে আসতে লাগল, তটের স্থলভূমির দিকে, যাকে সে কোন দিন দারুণ দহন জ্বালায় ছেড়ে চলে যেতে পেরেছিল।

পশ্চিমের ঘরে আবার সেই বিকেলের হোলদে বাঁকা রোদ, যেন সকালের কচি আলোর সবুজ পাতাগুলো সারা দিনে শুকিয়ে পড়ে আছে ঘরে, আবার কোন অন্ধকারের ঝড়ে কোথায় উড়ে যাবে কে বলতে পারে। দিনশেষের ঘুঘু ডাকল—কেন ও ফুরিয়ে যাওয়া আলোর আয়ুর জন্য অত মিনতি করছে,—যা কিছু আপনিই তো আসে, এমনিই থাকে। আমিও তো মিনুদিকে রাখতে পারলুম না আমার অভিমানে পূর্ণ করে। দু'দিন আগে ও বলেছিলো, "ললিত, আমায় সমুদ্রে নিয়ে চল, সেখানে অনেক নিঃশ্বাস ছড়িয়ে আছে সহজ মুক্তিতে; তাদের বুকে ধরে আমি বাঁচি!" ও-ই তো বলেছিলো, "দাও ললিত, তোমার আয়ু কমিয়ে আমায় একটুও দাও; তোমার মধ্য দিয়ে আমি হয়ে উঠব, ফুটে উঠব, বাঁচব!" ওই যে টেবিলভরা দাগকাটা ওষুধের শিশি আর ঐ তো ড্রেসিং টেবিলে ওর একমুঠো চুল আঁকড়ে-রাখা চিরুনিটা কতদিন—কতদিন আর মনে পড়াবে একটা মুছে যাওয়া জীবনের ভাললাগাকে, যা স্নেহের সারল্যে বা রহস্য-নিবিড় প্রেম-মাধুর্য্যে আমাকে নিয়ত জড়িয়ে ছিল। আমি বুদ্ধিতে শান দেওয়া পরীক্ষা লড়নে-ওয়ালা ছেলে—আমি তার কিই বা জানলুম।... এখন ও একটা নিরুক্তি, একটা অবলুপ্তি—মন থেকে মিলিয়ে যাওয়া একটা কবিতার স্পন্দন।

বাড়ীটা অদ্ভুত স্তব্ধ এ ক'দিন—চলে যাই তবু আসতে যে হয়। কে যেন কোথা থেকে আসবে,—আসবে আমারই মধ্যে পূর্ণ হতে। বাতাসে বাতাসে তার অশ্রুসিক্ত নিঃশ্বাস। সত্যি, কেন এমন মনে হোল—কারো নিঃশ্বাস এসে লাগল যেন গায়ে, এই তো মুখের দু'পাশে!

"কে?" পেছন ফিরলুম। "ও, এত শেষে তুমি এলে!"

লীলা একরাশ চুলের বোঝা নিয়ে আমার পায়ের ওপর নুয়ে পড়ে বল্ল,—"হ্যাঁ এলুম, আর পারি না, পারছি না বলে; মিনুদির হ'য়ে আমি বাঁচবো তোমার জীবনে—আমাকে তুমি নাও!" লীলার চোখের জলে চাঁদের করুণা কাঁপতে লাগলো। অনেকক্ষণ লীলার মাথা কোলে নিয়ে বসেছিলুম—লীলারও তা হ'লে বাঁধ ভাঙ'লো, এতদিনকার কান্না ও কাঁদতে পারল।

আস্তে ডাকলুম—"লীলা!"

উত্তর এল—"বল!"

বল্লুম—"মৃত্যুর ভেতর দিয়ে তুমি আমার মধ্যে বেঁচে উঠতে চেয়ো না লীলা। তুমি ধৈর্য্যে, সবলতায় আর প্রতীক্ষায় আমাকে আবিষ্কার ক'রে নাও। আর কি

বললো—মিনুদি আমাকে চাইলেও আমি কোনদিনই তাকে চাইবার কল্পনাও করতে পারিনি! কেন জান? তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল আমার কৈশোরের এক স্বপ্নচারিণী—সে তুমি!"

লীলা আর আমি উঠে এলুম দক্ষিণের বারান্দা পার হ'য়ে; একটু দাঁড়াল ও আমার হাতটা ওর হাতের মধ্যে নিয়ে। তারপর—তারপর হঠাৎ কি হোল, আমার মধ্যে লীলা যেন তার সমস্ত ঝড় ডুবিয়ে দিয়ে ধৈর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হোল। বাইরে এলুম একটা হঠাৎ বোড়ো হাওয়া সঙ্গে নিয়ে; আকাশময় ঝড়-ছেঁড়া মেঘ ঝাপসা জ্যোৎস্নায় তামাটে দেখাচ্ছিল। চাঁদটা যেন আজ শান্তিতে সমর্পিত নয়—ও যেন একটা হাল-ভাঙ্গা বাঁধন-ছাড়া জাহাজের নতুন সমুদ্রে ভেসে পড়বার ইঙ্গিত। আমিও বেরিয়ে পড়লুম সেই রাত-ভোরে—শুধু নিয়ে গেলুম সঙ্গে করে সেই ঝোড়ো রাতের কোন নিবিড় মুহূর্ত্তে লীলার দেওয়া একটি চুম্বিত স্বাক্ষর।

তারপর ভাগ্যের ঘাটে ঘাটে বছর-খানেক ধরে ডিঙ্গি বেয়ে বেয়ে উঠলুম এসে খুলনায়। জুটে গেল হাইস্কুলে ৬০৲ টাকার ইতিহাসের মাষ্টারী, আর সকালে-বিকেলে ৩০৲ টাকার টিউশনি। বাড়ী পেয়েছিলুম ভৈরবের ধারেই, আর একটা ছেলেমানুষ চাকর। অভাবও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। বিবিধ জনতার ভীড়ে আমিও মিশে গেছি—পরিমিত হয়ে এসেছে জীবনের ব্যাপ্তি; একটা মাপ পেয়ে গেছি—তাকেই নানান ছাঁদে ভেঙ্গে গড়ে খেলছি সেই একই মাপের খেলা। যেন যৌবনের দুরন্ত নদ থেকে একটা নিঃসঙ্গ নির্জ্জন খাঁড়ি প্রবেশ করেছে কোন সুগভীর অরণ্যের অন্ধকারে; সে নিত্য কোন রহস্যময় একটানা ধ্বনির আবিষ্কারে আত্মস্থ—যৌবনের শীর্ণ প্রাণলীলায় ছলছল।

পিসিমাকে মধ্যে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাই; পিসিমার অভিযোগও শুনতে হয়—আমি একবারও ছুটিতে ওখেনে যেতে পারি না কেন।

পশুপতি বাবুদেরও খবর আসে—মিনুদির মৃত্যুর পর লীলা যেন কেমন হয়ে গেছে, তাই মুন্নার বিয়ে হয়ে গেছে গত শ্রাবণে—পশুপতি বাবুর শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, এই সব কত কি! অরণ্যের সম্পদ আহরণ করতে সুদূর সুসভ্য সহর থেকে তো কত নৌকা চলে আসে, তারা কি অরণ্যের নিগূঢ় স্তব্ধতায় কিছু সভ্যতার ছোঁয়া রেখে যেতে পারে? তবু মাঝে মাঝে মনে পড়ে লীলার কথা, তার চোখের সেই গহন অতলতা কি এখনো বাস্তবের পলিমাটিতে অগভীর হয়ে ওঠেনি। সে কি এখনো দ্বিতীয় তিথির চাঁদের মতো ক্লান্ত প্রতীক্ষায় ধৈর্য্য-জাগর! সকলের যা হয়, তারও কি তা হয়নি। তবুও কত-কত ভোরে আমি ভৈরবের বাঁকের দিকে তাকিয়ে দেখেছি আর মনে হয়েছে—ও যেন নতুন, ও যেন ফুরিয়ে যেতে জানে না—অদৃশ্য হয়েও যেন দৃশ্যমানতায় অটুট। সূর্য্য অস্ত গিয়েও যেমন তার সোনালি সুর ছড়িয়ে রাখে, আবার কোন নতুন দিন জন্ম নেবে তারই অনুকম্পনে। কি জানি লীলাও কি আসবে একদিন এমনি করেই আমার মধ্যে!

একদিন স্কুল থেকে ফিরেই পেলুম পশুপতি বাবুর এক চিঠি, লিখ্ছেন—"লীলার মনের কথা এতদিনে ও স্পষ্ট করে বল্লো। আমার এই ভাঙা দুর্গের শেষ অধিকারটুকু তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে আমিও নিশ্চিন্ত হই। তোমার নিজের কথা শুনতে ও নিজেই তোমার কাছে যেতে চায়! ওর ধৈর্য্য অসীম, আত্মবল অটুট; তাই ওকে মুক্তি দিতে আমি ইতস্ততঃ করিনি। তোমার জীবনে ওকে যদি ভার না মনে হয়, তবে দু'জনে তাড়াতাড়ি চলে এস আমার কাছে। তোমাদের যুগল-জীবনের সুখের দিকে চেয়ে আশীর্ব্বাদ করে যেতে চাই। তোমার পিসিমারও এতে অমত নেই জেনো। কাল অর্থাৎ মঙ্গলবার সন্ধ্যের ট্রেনে ষ্টেশনে ওর জন্য অপেক্ষা কোরো। এ কি কথা, এ কি আনন্দ! চিঠিটা হাতে করে চুপ করে বসে রইলুম।

খুলনা ষ্টেশন—সন্ধ্যে পৌনে সাতটা। জনসঙ্কুল প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে দু'টি উৎসুক চোখ আমার খুঁজছে আর দু'টি চোখকে—যার সঙ্গে জগতের অন্য যে কোন একজোড়া চোখও মিল পায় না। ভিড় পাতলা হয়ে আসে। হঠাৎ দেখি—ঐ তো আমার সামনেই অভাবনীয় মুক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লীলা! ওর তপস্যা-পাণ্ডুর মুখে পড়েছে বেলাশেষের ম্লান ছায়া—কিন্তু চোখে জড়িয়ে আছে প্রতীক্ষা-সাফল্যের একটা শান্ত স্বস্তির আভা।

সেদিন অনেক রাত করে চাঁদ উঠে এলো আকাশে—সমর্পণের বন্যায় সে টলমল। ঝিরিঝিরি বাতাসের সুরে মর্ম্মরিত মেঘগুলো যেন আনন্দ আর বইতে পারে না। বাড়ীর সামনের খোলা বারান্দায় ছিলুম আমি আর লীলা।

"সত্যি তুমি আমার জীবন নতুন স্পন্দনে ভরিয়ে দিতে এলে লীলা?"

"হ্যাঁ, আমার সবকিছু লজ্জা, বাধা দু'পায়ে মাড়িয়ে বাবার কাছ থেকে আমি মুক্তি চেয়ে নিয়ে এলুম;" আমার বুকের মধ্যে মুখ ঢেকে আবার সেই পুরোন দিনের মত বললে লীলা—"এবার আমায় তুমি নাও।"

জীবনে পেতে পেতে হারানো; বুঝে ওঠা যায় না মিনুদির চোখের গহন রহস্যকে—ধরে রাখা যায় না মুন্নার ঝর্ণার মত একমুঠো হাসির চপলতাকে; তবু এমনও হয়, এমনও তো আছে যা সূর্য্যাস্তের সুরের মত হারিয়েও হারায় না—যা থাকে, জীবনকে বাড়ায়, জীবনকে আচমকা মেলে ধরে রাতের অন্ধকার পার হয়ে নতুন কোন ভোরের হাওয়ায়; যা আসে এমনই—নয় কি?

ঝাঁন্সীর রাণী

শ্রীযোগেন্দ্র গুপ্ত

নয়

একাদশ দিন পর্য্যন্ত সমান ভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রতিদিন রাত্রিকালে ইংরাজদের তোপ হইতে যখন একমণ, দেড়মণ ওজনের গোলা বর্ষিত হইত, তখন চারিদিকে তাহার বিক্ষিপ্ত অংশগুলি রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলকের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িত। অন্ধকার রাত্রিতে এই গোলার দৃশ্য ভীষণ দেখাইত। দিনের বেলা প্রখর সূর্য্যালোকে ঐরূপ দেখা যাইত না। কে জয়ী হইবে বলা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কখনও বিজয়িনী হইতেন ঝাঁসীর রাণী, তাঁহার দুর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত তোপের ফলে ইংরাজের তোপ বন্ধ হইয়া যাইত। আবার কখন হইত ইংরাজের জয়, রাণীর পরাজয়। ইংরাজের ঘন ঘন নিক্ষিপ্ত তোপের গোলাগুলিতে নগরবাসীরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িত।

রাণীর তোপমঞ্চ ইংরাজের গোলার আঘাতে ভগ্ন হইয়া গেলে পর, রাণী রাত্রিকালেই আবার রাজমজুর নিযুক্ত করিয়া পুনরায় মঞ্চের সংস্কার করিতেন ও নূতন মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতেন। রাজমিস্ত্রীরা রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গে কালো কম্বল জড়াইয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

যুদ্ধের অষ্টম দিবসে ইংরাজ গোলন্দাজেরা দূরবীক্ষণের সাহায্যে দুর্গের মধ্যস্থিত জলরক্ষার বৃহদাকার চৌবাচ্চাগুলি লক্ষ্য করিয়া তোপ ছাড়ায় কয়েক জন জলবাহী ভৃত্যের প্রাণান্ত হইল; অনেকে পলায়ন করিল। তখন দুর্গের গোলন্দাজেরা জলের চৌবাচ্চা রক্ষার জন্য ইংরাজ গোলন্দাজদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভীষণ ভাবে তোপ ছাড়িতে লাগিল; তাহারই ফলে ইংরাজ গোলন্দাজদের তোপ বন্ধ হইল। জলের চৌবাচ্চাগুলি আবার জল পূর্ণ হইল। সকলে স্নান শেষ করিয়া আহার করিতে বসিয়াছে, এমন সময় শোনা গেল, ভীম ভৈরব রব, সে কি ভয়ঙ্কর শব্দ। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ গাঢ় ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণ পরেই জানা গেল রাজপ্রাসাদের সমীপবর্ত্তী প্রান্তরমধ্যস্থিত একটি বারুদখানায় ইংরাজের তোপ-নিক্ষিপ্ত একটি গোলার আঘাতে ঐরূপ ভয়ানক শব্দ হইয়াছে। এই শোচনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনায় ত্রিশটি পুরুষ, আটজন মহিলা এবং প্রায় পঞ্চাশ জন মহিলা অর্দ্ধদগ্ধ হইয়াছিল। এই অষ্টম দিনে ইংরাজসৈন্য অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। নগরের অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় এক হাজার লোক নিহত হয়। দুর্গ-প্রাকারে যে সমুদায় গোলন্দাজ ও সিপাহী ছিল তাহাদের মধ্যেও অনেকে সেদিন প্রাণ হারায়। লক্ষ্মীবাই সেদিন অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, রাণীর অপূর্ব্ব তেজস্বিতা এবং উৎসাহের ফলে ঝাঁসীর সৈনিকগণ নানারূপ বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও অমানুষিক সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, গোলাগুলি নিঃশেষপ্রায়, তবুও ৩১শে মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সৈন্যেরা দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

মেলিসন সাহেব এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—"The two following days the cannonading continued with great spirit. A breach had been effected, but it was barely practicable; the courage of the enemy continued unabated; danger seemed only to increase their resolution"* অর্থাৎ পরবর্ত্তী দুই দিন অনবরত ইংরাজপক্ষ হইতে মহাউৎসাহ সহকারে গোলাগুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। শত্রুপক্ষীয়েরা ইহাতে বিচলিত না হইয়া সমান ভাবে তোপ দাগিতে লাগিল। বিপদের ভিতরেও তাহারা বিচলিত না হইয়া দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

৩১শে মার্চ্চ সন্ধ্যার সময় স্যার হিউরোজ সংবাদ পাইলেন যে, উত্তর দিক হইতে একদল সৈন্য ঝাঁসীদুর্গের অবরুদ্ধদিগের উদ্ধারের জন্য আসিতেছে।

এই সৈন্য হইতেছে তাঁতিয়া টোপির (Ta'ntiatopi)। তাঁতিয়া টোপি ইংরাজ সেনানায়ক উইণ্ডহাম (Windham)কে পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু পরে প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ স্যার কোলিন ক্যাম্পবেল্ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গঙ্গানদী পার হইয়া অবশেষে নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাওসাহেবের আদেশে কাল্পিতে আসেন। রাওসাহেবের আদেশে চিরকারি (Chirka'ri) অধিকার করেন। সে সময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিল মাত্র চারিটি কামান এবং নয়শত সিপাহী। কিন্তু চিরকারি জয় করিয়া চব্বিশটি কামান ও তিনলক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। এ সময়ে রাওসাহেব ঝাঁসীর রাণীর নিকট হইতে সাহায্যপ্রার্থনার পত্র পাইলেন। তাঁতিয়া টোপি রাওসাহেবের নিকট হইতে ঝাঁসীর রাণীকে সাহায্য করিবার আদেশ পাইয়া তাঁতিয়া কুড়ি হাজার সৈন্য ও ২৮টি কামান লইয়া ঝাঁসী অবরোধকারী ইংরাজদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

এ সংবাদে স্যার হিউরোজ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সম্মুখে এখনও ঝাঁসীর দুর্গ অপরাজেয় ও অনধিকৃতরূপে সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্যার হিউজ আসন্ন বিপদের জন্য চিন্তিত হইলেও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। ইংরাজ-চরিত্রের ইহাই হইতেছে প্রধান বিশেষত্ব। বুদ্ধিমান্, সাহসী ও কৌশলী হিউরোজ দুর্গ অবরোধ করিবার জন্য সৈন্য ব্যবস্থা করিয়া তাঁতিয়া টোপির ঝাঁসীর দিকে আক্রমণ-গতি প্রতিহত করিবার জন্য তাঁতিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন।

তাঁতিয়া বেত্রবতী নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজের সৈন্যসংখ্যা যখন অল্প তখন আর ভাবনা কি?

কিন্তু রণদক্ষ কৌশলী স্যার হিউজ দুর্গ অবরোধের জন্য অল্প-সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া তাঁতিয়াকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। হিউজের আকস্মিক আক্রমণে তাঁতিয়ার [illegible] দল পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তাঁতিয়া [illegible]য়ের

* History of the Indian Mutiny. G. B. [illegible]lesan C. S. I. Volume III, P. 160—161.

আশঙ্কা করে নাই। তাঁতিয়ার ছাউনির নিকটে ছিল নিবিড় জঙ্গল, তাঁতিয়া সেই জঙ্গলে আগুন লাগাইয়া দিল। সারা আকাশ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এইরূপে ইংরাজদের আগমনপথ অগ্নিসঙ্কুল করিয়া বেত্রবতী পার হইয়া কাল্পীর দিকে প্রস্থান করিলেন। ইংরাজ সৈন্য সমুদয় বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া তাঁতিয়াকে পশ্চাদ্‌দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। ইহার ফলে প্রায় পনের শত বিদ্রোহী সৈন্য নিহত হইল এবং তাঁতিয়ার প্রায় সমুদয় কামানগুলিই পড়িল ইংরাজের হাতে।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁহার ভীষণ সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে যখন জয়-পরাজয় লইয়া চলিয়াছিল অদৃষ্টের পরীক্ষা, যখন দুর্গ অবরুদ্ধ জীবন-মরণ সমস্যা, সেই সময়ে তাঁতিয়া বহু সৈন্য ও তোপ লইয়া তাঁহার সাহায্যে আসিতেছেন শুনিয়া অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলেন, এবং দুর্গবাসী সৈন্যগণ মহা উৎসাহে প্রফুল্ল চিত্তে সারারাত্রি মশাল জালিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ নিজে সর্ব্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। যখন সংবাদ পাইলেন যে, তাঁতিয়া টোপি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, তখনও নিরাশ হইলেন না।

১লা এপ্রিল হইতে আবার তাঁহারা মহা উৎসাহের সহিত দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত সমান ভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১লা এপ্রিল দুর্গবাসীরা যেরূপ সাহস ও উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন, ২রা ও ৩রা এপ্রিল, দুর্গবাসীদের উদ্যম হ্রাস পাইতে লাগিল।

কৌশলী সৈন্যাধ্যক্ষ স্যার হিউজ রাণীর দিকের শক্তি যে হ্রাস পাইতেছে তাহা বুঝিতে পারিয়া মেজর গালের (Major Gall) অধিনায়কত্বে ১৪নং লাইট ড্রাগুন্‌স (Light Dragoons) সৈন্যদল সম্মুখের দিকে প্রেরণ করিলেন।

এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, যেমন গলের সৈন্যগণের কামান-ধ্বনি শোনা যাইবে, সেই সময়ে অপর দল নগরের দিকে অগ্রসর হইবে। ৩রা এপ্রিল রাত্রিশেষে তিনটার সময় ইংরাজ-সৈন্যের নগরপ্রবেশের সুযোগ ঘটিল। জনশ্রুতি এই যে, রাণীর পক্ষের দুলাজী ঠাকুর নামক একজন বুন্দেলা সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ ইংরাজ সৈন্য "বোরহা দরওয়াজা" অধিকার করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। গলের পরিচালিত সৈন্যদের নিকট পূর্ব্বসঙ্কেতমত তোপধ্বনি শুনিয়া—মেজর ষ্টুয়ার্ট (Major Stuart), কাপ্তেন লোথ (Captain Lowth) প্রভৃতি নীরবে নগর-প্রাচীরের তোরণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে রাণীর পক্ষ হইতে ভীষণভাবে গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। একজন ইংরাজ লেখক এ-বিষয়ে লিখিয়াছেন:—"For a time it appeared like a sheet of fire, out of which burst a storm of bullets, round shot, and rockets, destined for our annihilation." [Lowe's Central India.]

এইরূপ গোলাবর্ষণে কিয়ৎকালের জন্য ইংরাজপক্ষীয় সৈন্যরা নগর প্রবেশের পথে বাধা পাইলেও অবশেষে মইয়ের সাহায্যে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নগর-প্রাচীরের উপর উঠিতে পারিয়াছিল। এইভাবে ইংরাজ সৈন্য ঝাঁসী নগরে প্রবেশ করিলে পর তাহারা নগরের পথে অগ্রসর হইয়া পথের দুই দিকের ঘর-গুলিতে আগুন ধরাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে আগুন জ্বলিল, ও-দিকে আবার নগরবাসীরা আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ হারাইতে লাগিল। নগরবাসীরা যে যে-দিকে পারিল পলায়ন করিতে লাগিল। কোন কোন নগরবাসী গোঁফদাড়ী কামাইয়া নারীর বেশে আত্মরক্ষা করিল, অর্থাৎ এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, যে যেরূপে পারিল প্রাণরক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

স্যার হিউজ রোজ নগরে প্রবেশ করিয়া নগরের মধ্যস্থিত রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিলেন। যখন তাঁহার সৈন্যেরা প্রাসাদ আক্রমণ করিবার জন্য প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়, তখন প্রাসাদ-রক্ষী প্রহরীরা তাহাদিগকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রত্যেক কক্ষের সৈনিকেরা আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে থাকে, কিন্তু বেয়োনেট বা সঙ্গীনের সাহায্যে প্রহরী সৈনিকদিগকে সম্পূর্ণরূপে হটাইয়া দিতে সমর্থ হয়। এইভাবে রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হইল। দুই ঘণ্টার পরে দেখা গেল—যে, রাণীর দেহরক্ষী পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী রাজপ্রাসাদের অশ্বশালা রক্ষা করিতেছিল। তাহারা পর পর নাই সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইল। তাহাদের এই বীরত্ব ও প্রভুভক্তি এবং প্রভুর জন্য আত্মোৎসর্গ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই বিজয়লাভের পর—বিজয়ী ইংরাজ রাজপ্রাসাদে প্রাপ্ত ইউনিয়ান জ্যাক পতাকা হস্তগত করিলেন। এই পতাকার একটু ইতিহাস আছে—রাণীর স্বামী গঙ্গাধর রাওয়ের পিতামহকে তাঁহার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এই রেশমী ইউনিয়ান জ্যাক পতাকা দান করিয়াছিলেন। ["This was a Union Jack of silk, which Lord William Bentinck had given to the grandfather of the Rani's husband, with the permission to have it carried before him, as a reward for his fidelity." —Sir H. Rose's despatch.] এবং এইরূপ অনুমতি দিয়াছিলেন যে, কোনস্থানে যাতায়াত কালে তিনি সেই পতাকা সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন।

ইংরাজসৈন্য নগরে প্রবেশ করিলে রাণী দুর্গ হইতে শুনিতে পাইলেন আক্রমণকারিগণের নগর লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতির দরুণ হতভাগ্য প্রজার করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি। এই সময়ে শত্রুপক্ষীয়কে বাধা দিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। নগর ভস্মীভূত, গোলন্দাজ সৈনিকেরা অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কেমন করিয়া আর দুর্গ রক্ষা পাইবে, কাজেই তিনি তাঁহার প্রিয়তম রাজ্য ঝাঁসী পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন। পিতা মোরোপন্থ ও বিশ্বস্ত অনুচরগণ, সঙ্গিনী ও পরিচারিকাগণ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে পুরুষের বেশ পরিলেন—প্রিয়তম পুত্র দামোদর রাওকে নিজের পিঠে রেশমী কাপড় দিয়া বাঁধিয়া লইলেন এবং একটি হাতীর হাওদার মধ্যে মণি-মাণিক্য প্রভৃতি পুরিয়া দিলেন। তারপর ৪ঠা এপ্রিল রাত্রিতে সকলের

অলক্ষিতে কৃপাণ হস্তে নিজের বীর সৈনিক ও ধানুকীদের সহিত দুর্গের উত্তর দ্বার দিয়া বাহির হইলেন। শেষবারের মত আপনার দুর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বেগবান্ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাল্পীর দিকে চলিলেন। সে-দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীবাঈ নির্ব্বিঘ্নে কাল্পী পৌঁছিলেন। তাঁতিয়া টোপি সে সময়ে কাল্পীতেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

স্যার হিউরোজ ৫ই এপ্রিল (১৮৫৮ খৃঃ অঃ) ঝাঁসী দুর্গ অধিকার করিলেন। দুর্গ অধিকার করিতে তাঁহার পক্ষের ৩৪৩ জন সৈনিকের মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ৩৬ জন ছিলেন অধ্যক্ষশ্রেণীর। ঝাঁসীর পক্ষে পাঁচ হাজার সৈন্য হত হইয়াছিল আর অগ্নিদাহে ও ইংরেজ সৈন্যের হাতে প্রায় এক হাজার লোক নিহত হয়।

বিজয়ী স্যার হিউরোজ দুর্গে প্রবেশ করিবার পরেই যখন জানিতে পারিলেন যে, রাণী দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করিবার জন্য লেফ্‌টেন্যাণ্ট ওয়াকারকে পাঠাইলেন তাঁহার অনুসরণের নিমিত্ত। কর্ণেল ওয়াকার অতি বেগে পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে ঝাঁসী হইতে বাইশ মাইল দূরে রাণীর নাগাল পাইলেন। উভয়ে মুখোমুখী হইলে রাণী বিদ্যুদ্বেগে ওয়াকারকে আঘাত করিলেন. আহত ওয়াকার ভূপতিত হইল। রাণী সেই সুযোগে—অতি বেগে অশ্ব চালনা করিয়া কাল্পীতে গিয়া পৌঁছিলেন। কর্ণেল ওয়াকার ব্যর্থমনোরথ হইয়া ঝাঁসী ফিরিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্য-ক্রমে রাণীর পিতা মোরোপন্থ যে হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, সেই হস্তীর পৃষ্ঠেই দৈবক্রমে তাঁহার নিজ তরবারির আঘাতে তাঁহার জঙ্ঘাদেশ কাটিয়া গিয়াছিল। তিনি রুধির-প্লাবিত পরিচ্ছদে কোনরূপে ধনরত্ন ইত্যাদি সহ দাঁতিয়া রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। দাঁতিয়ার রাজমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। স্যার রবার্ট হ্যামিল্টনের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল।

রাণী ঝাঁসী পরিত্যাগ করিবার পর বিজয়ী ইংরেজসৈন্যরা প্রায় পাঁচ হাজার নিরীহ নগরবাসীকে হত্যা করিয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজ নিজ পরিবারের সম্ভ্রমহানির আশঙ্কায় নিজের হাতে পুরমহিলাদিগের প্রাণনাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, অনেক মহিলা আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য কূপে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে এ-কথা উল্লেখযোগ্য যে, "ইংরাজ সৈনিকেরা মহিলাদিগের প্রতি কোনরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করেন নাই। কথিত আছে, ইংরেজ সেনাপতি বিলুণ্ঠিত খাদ্যদ্রব্যাদি হইতে নগরের দুঃখী দরিদ্রদিগকে আহার্য্য বিতরণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

রাণী যখন কাল্পীতে পৌঁছিলেন—তখন সেখানে রাও সাহেব ও তাঁতিয়াটোপীর সাক্ষাৎ পাইলেন। রাণী রাও সাহেবের সহিত সাক্ষাতের পর প্রথমেই তাঁহাকে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং রাও সাহেবের সমক্ষে নিজের তরবারিখানা রাখিয়া বলিলেন—"আপনি পেশোয়ার উত্তরাধি-কারী। আমার এই তরবারি এক সময়ে পূর্ব্ব পেশোয়ারা আমার পূর্ব্বপুরুষদের দিয়াছিলেন। আমি অবলা নারী হইয়াও এই তরবারির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি। আমার হস্তে এ তরবারি কলঙ্কিত হয় নাই।

এখন এ তরবারি আপনি ফিরিয়ে নিন্, নতুবা আমার মান-মর্য্যাদা ও ঝাঁসী রক্ষার জন্য আমায় সাহায্য করুন। যেন আমি পুনরায় ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি।' [The first act of the Rani had been to implore the nephew of Nana Sahib, known as Rao Sahib, "to give her an army that she might go and fight." 3] রাণীর অনুরোধ রক্ষিত হইল। তাঁতিয়াটোপীর উপর সৈন্য পরিচালনার ভার অর্পিত হইল। স্থির হইল যে সমুদয় সৈন্য একস্থানে সমবেত হইলে তাঁতিয়া টোপি রাও সাহেবের সহিত মিলিত হইবেন। কাল্পীর চল্লিশ মাইল দূরে কূঁচ (Kunch) নামক নগরে তাঁতিয়া সসৈন্যে গমন করিলেন। স্যার হিউরোজও বিদ্রোহী দলের নেতা তাঁতিয়াটোপী ও রাণী লক্ষ্মীবাঈকে আক্রমণ করিবার জন্য কাল্পীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কূঁচ নামক স্থানে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে তাঁতিয়াটোপী পরাজিত হইলেন। রাণী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁতিয়া তাঁহার নিকট যুদ্ধ ও সৈন্য পরিচালনা সম্পর্কে কোনরূপ পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। এই যুদ্ধে পরাজয় হইলেও সৈন্যদলে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

কূঁচের যুদ্ধের পর ইংরাজ সেনার যুদ্ধ হইল যমুনার তীরবর্ত্তী গলাবলী নামক স্থানে। এই যুদ্ধে বাঁদার নবাব দুই হাজার অশ্বসাদী এবং কয়েকটি কামান লইয়া উপস্থিত ছিলেন। রাণীর উপর শুধু আড়াই শত অশ্বারোহী সেনা পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছিল। রাও সাহেব একজন মহিলার উপর সৈনিক দল পরিচালনার ভার দেওয়া অশোভন বলিয়া নিজেই সৈন্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাণী তাঁহার উপর যমুনার দিক রক্ষার যে ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহা বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। ইংরাজ সৈন্য গলাবলীর যুদ্ধেও বিজয়ী হইলেন। রাও সাহেব ও বাঁদার নবাব প্রভৃতি পলায়নের সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন কিন্তু রাণী তাঁহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া একদল সাহসী সৈনিক সহকারে এমন ভাবে অগ্রসর হইয়া ইংরাজ সৈন্যের দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন যে তাহাতে তাহারা হটিয়া গিয়াছিল। অশ্বে আরোহণ করিয়া এই বীরাঙ্গনা নারী সাহসী সৈনিকদল সহ শত্রুসৈন্যের উপর গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। যদি ইংরাজ পক্ষে নূতন একদল সৈন্য আসিয়া সে স্থান পূর্ণ না করিত তবে তাহাদের পক্ষে বিজয় লাভ সম্ভব হইত না।

কাল্পীর যুদ্ধে রাণী অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু রাও সাহেব পলায়ন করায় তাঁহাকেও রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কাল্পীতে তাঁতিয়াটোপী একটি কারখানা স্থাপন করিয়া কামান, বারুদ ও গোলাগুলি প্রস্তুত করিয়া ঐ সমুদয় যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। এ সমুদয়ই ইংরাজের হাতে পড়িল।

দশ

কাল্পী হইতে রাওসাহেব, তাঁতিয়া টোপি ও লক্ষ্মীবাঈ গোপালপুর আসিলেন। এই গোপালপুর—গোয়ালিয়র হইতে মাত্র ৪৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

এখানে অতঃপর কি ভাবে কর্ম্মপন্থা নির্দ্দিষ্ট হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মীবাঈ পরামর্শ দিলেন—এইরূপ ভাবে প্রান্তরে, প্রান্তরে ঘুরিয়া যুদ্ধ করিলে শত্রুসৈন্য পরাজয় করা সম্ভবপর নহে। যদি কোন দুর্গ অধিকার করিয়া সেখান হইতে আক্রমণ পরিচালনা করা যায় তাহা হইলে সবদিকেই সুবিধা হইতে পারে। গোয়ালিয়র দুর্গ দুরারোহ পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এই গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিতে পারিলে সবদিকেই সুবিধা হইবে। রাণীর এই পরামর্শ সকলেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তখন কি ভাবে গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাওসাহেব নিজের বংশের পূর্ব্ব সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া গোয়ালিয়রের মহারাজা জয়াজীরাও সিন্ধে এবং তাঁহার রাজমহিষী বাইজাবাই সিন্ধের নিকট পত্র লিখিয়া সে দিনই তাঁহারা (৩০শে মে তারিখে) গোয়ালিয়রে যাইবার জন্য গোপালপুর পরিত্যাগ করিলেন।

সে সময়ে গোয়ালিয়রে সর দিনকর রাও দেওয়ান সাহেব; মহারাজা জয়াজী রাও এবং বাইজাবাই প্রভৃতির ছিল ইংরাজদের সহিত সন্ধি। এই জন্য তাঁরা বিদ্রোহীদের সহিত মিলিত হইতে চাহেন নাই। স্যার দিনকর রাও ছিলেন বিজ্ঞ ও দূরদর্শী কূট রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ, তিনি গোয়ালিয়রে যে সমুদয় ইংরাজ পুরুষ ও নারী ছিলেন, তাঁহাদের নিরাপদে আগ্রা পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। —তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পেশোয়ার ভ্রাতা রাও সাহেব যদি গোয়ালিয়রে উপস্থিত হন তাহা হইলে দরবারের সৈনিকগণ—বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া রাওসাহেবের সেনাদলের সহিত মিলিত হইতে পারে। এইরূপ মনে করিয়া তিনি প্রকাশ্যে কোনরূপ বিদ্রোহভাব না দেখাইয়া বরং প্রকাশ্যে বিদ্রোহী দলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোপনে রাওসাহেব তাঁতিয়াটোপি ও রাণী লক্ষ্মীবাইর পরিচালিত সৈন্যদিগকে গোয়ালিয়র রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ইংরাজদিগকে আহ্বান করিলেন। এ সময়ে ইংরাজেরা মধ্যভারতের বহুস্থানে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। মন্ত্রী দিনকর প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী সেনাদলকে আক্রমণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ না করিয়া শুধু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। মহারাজা জয়াজীরাও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন কিন্তু পরে মন্ত্রীর উপদেশ ভুলিয়া গিয়া আপনার আত্মগরিমা ও বীরত্ব ইংরাজকে দেখাইবার জন্যই হউক বা যে কোন কারণেই হউক ১লা জুন তারিখে ৬০০০ হাজার পদাতি, ১,৫০০হাজার অশ্বারোহী এবং নিজের দেহরক্ষী ৬০০ সৈন্য এবং ৮টী কামান সঙ্গে লইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। মোরার নামক স্থানের দুই মাইল পূর্ব্বে জয়াজী রাও শিবির সন্নিবেশ করিয়া বেলা ৭টার সময় রাওসাহেব প্রমুখ বিদ্রোহী সেনাদলের বিরুদ্ধে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। রাওসাহেব এই গোলাবর্ষণ দেখিয়াও ভাবিতে পারেন নাই যে, জয়াজী রাও তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, জয়াজী রাও সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন এবং গোলাবর্ষণ দ্বারা তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানাইতেছেন। এজন্য রাওসাহেব নিশ্চেষ্ট রহিলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি তাঁহার তিনশত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়া জয়াজীরাওয়ের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। তিনি এমন ভাবে গোয়ালিয়ার সৈন্যদের উপর গিয়া পড়িয়াছিলেন যে, গোয়ালিয়রের গোলন্দাজেরা তাঁহার আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিলেন। মহারাজের শরীররক্ষক সৈনিকগণ—মহারাজাকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিল বটে—কিন্তু তাহারা লক্ষ্মীবাঈয়ের আক্রমণে পরাজিত ও অনেকে নিহত হইল। মহারাজা জয়াজীরাও রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন এবং আগ্রা গমন করিয়া সেখানকার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অশ্বরশ্মি সংযত করিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। মন্ত্রী দিনকর রাও এই পরাজয়ের সংবাদে বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং রাণীদিগকে নরুচর নামক স্থানে প্রেরণ করিয়া তিনিও আগ্রা গমন করিলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের অপূর্ব্ব বীরত্বপ্রভাবে গোয়ালিয়র বিদ্রোহীদের হস্তগত হইল। রাওসাহেব বিজয়গৌরবে গোয়ালিয়র নগরে প্রবেশ করিলেন। গোয়ালিয়র-দুর্গ, ধনাগার, অস্ত্রাগার সমুদয় তাঁহাদের হস্তগত হইল। রাও সাহেবের সৈন্যগণ এবং গোয়ালিয়র দরবারের সৈনিকেরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুরস্কার লাভ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইল। নানা সাহেব মহারাষ্ট্রের পেশোয়ার এবং রাওসাহেব গোয়ালিয়রের শাসনকর্ত্তা রূপে ঘোষিত হইলেন। গোয়ালিয়রের একজন অপদস্থ পারিষদ হইলেন রাও সাহেবের প্রধান মন্ত্রী।

কর্ম্মবীর স্যার হিউজ এ সময়ে ছুটি লইয়া বিলাত যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন গোয়ালিয়রের পতনের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি বিলাত যাত্রা স্থগিত রাখিয়া সসৈন্যে গোয়ালিয়রের দিকে যাত্রা করিলেন এবং অতি শীঘ্র গোয়ালিয়রের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন।

স্যার হিউরোজের ন্যায় রণকুশল বীরও কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ঝাঁসীর রাণী এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। স্যার হিউরোজ শারীরিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া অধিনায়কত্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া তিনি আবার সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া গোয়ালিয়রের দিকে যাত্রা করিলেন। বিদ্রোহীদের হাতে গোয়ালিয়র দুর্গ পড়ায় বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছিল—প্রথমতঃ শীঘ্রই বর্ষাকাল আসিবে, তখন গোয়ালিয়র অঞ্চলের কালো মাটি এমন কর্দ্দমাক্ত হইবে যে, তোপ ও সৈন্য সহকারে, রসদাদি লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই হইবে বিপজ্জনক; এমন কি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। গোয়ালিয়র পুনরায় অধিকার করিতে বিলম্ব হইলে তাঁতিয়া সৈন্যবল, লোকবল, অর্থবল, এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্যাদি প্রাপ্তির দরুণ এক

বিরাট সৈন্যদল গঠন করিয়া কাল্পীর পরাজয়ের ভীষণ প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইবে। সুচতুর রণকৌশলী তাঁতিয়া টোপী এই সুযোগে পেশোয়ার বিজয়-পতাকা দক্ষিণ ভারতের মারাঠা অঞ্চলে উত্থিত করিবে এবং একে একে শুধু মধ্যভারত নয়, ভারতের সর্ব্বত্রই বিদ্রোহীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া ইংরাজের বিজিত রাজ্যসমূহও পুনরায় হস্তচ্যুত হইবে।

স্যার হিউজের এইরূপ ভাবনার কারণ অলীক ছিল না। এজন্য তিনি গোয়ালিয়র বিদ্রোহীদের হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া—"He at once resumed the command which he had laid down, and leaving a small garrison at kalpi, set out on the 5th of June with a small force to overtake stuarts' column." [page 214 History of the Mutiny Vol. III]

স্যার হিউরোজকে গোয়ালিয়র পুনরধিকারের সাহায্যার্থ প্রধান সেনাপতি তারবার্ত্তার দ্বারা—কর্ণেল রিডেল (Riddell) ব্রিগেডিয়ার স্মিথ (Brigadier smith)—ইনি রাজপুতানার পদাতিক সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন,—কর্ণেল হিক্ (Lt Colonel Hicks of the artillery), এবং হায়দারাবাদ কন্টিন জেণ্টের মেজর ওর (Major orr) প্রভৃতিকে স্যার হিউজের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন।

৬ই জুন (১৮৫৮ খৃঃ অঃ) স্যার হিউরোজ এ সমুদয় সেনানায়ক, তোপাধ্যক্ষ প্রভৃতিকে বিভিন্ন দিক্ দিয়া তাঁহাদের সৈন্যদল সহ আগ্রা ও গোয়ালিয়রের পথ ধরিয়া—১৯শে জুন তারিখে যাহাতে এক স্থানে সকলে মিলিত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে নির্দ্দেশ দিয়া ক্রমশঃ গোয়ালিয়রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং ১৬ই জুন—সকাল ৬ ঘটিকার সময় বাহাদুরপুর নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি সেখানে পৌঁছিয়াই হায়দারাবাদ অশ্বারোহীদলের অধিনায়ক কাপ্তেন এবট্ (Captain Abbot) কে মোরারের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। কাপ্তেন এবট্ সেখানে পৌঁছিয়া জানাইলেন যে, বিদ্রোহীরা অশ্বারোহী, পদাতিক, কামান প্রভৃতি সাজাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। তাহাদের সৈন্যসংখ্যাও অনেক।

স্যার হিউরোজ এ সংবাদে উৎসাহিত হইলেন। রণকৌশলী সাহসী বীরের কাছে এইরূপ সুযোগ এবং শত্রুদিগকে আক্রমণ করিবার প্রলোভন দূর করা কি সম্ভব? এখানে তাঁহার নিজের কথা উদ্ধৃত করিতেছি—"আমার সৈন্যদল প্রখর রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। প্রখর রৌদ্রের মধ্য দিয়া চার পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করা তাহাদের পক্ষে যে কিরূপ ক্লান্তিপ্রদ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু বিলম্ব করাও চলে না, তখনও মোরারের অনেক সুন্দর সুন্দর বাংলো ও বাড়ী বিদ্যমান ছিল। এই সব বাড়ীঘরগুলিতে সৈন্যরা বাস করিবার সুযোগ পাইবে। কালবিলম্ব করিলে এই বাড়ীঘরগুলি বিদ্রোহীরা হয়ত পোড়াইয়া ফেলিবে। বিদ্রোহীদের আক্রমণ করা সম্বন্ধে বিলম্ব করা যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া আমি সেদিনই বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিবার আদেশ দিলাম।" [DesPatch of Sir Hugh Rose dated the I3th October 1858]

স্যার হিউরোজের সহিত বিদ্রোহীদের মোরারিতে ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে হিউরোজ এবং তাঁহার সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষগণের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদল পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। মোরার স্যার হিউরোজের অধিকৃত হইল। এ পরাজয়ের কারণ রাও সাহেবের অমনোযোগিতা ও অবহেলা, তিনি শত্রুর আক্রমণবার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া সৈন্যপরিচালনা সম্পর্কে এবং তাহাদের শৃঙ্খলাবিধানে অমনোযোগী হইয়া পড়া দশহরা পর্ব্ব উপস্থিত হওয়াতে যুদ্ধের আয়োজনকার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া পুণ্যসঞ্চয়ে ব্রতী হইয়াছিলেন।

১৬ই জুন তারিখে মোরার ইংরাজকর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইল তাহাই বলিতেছি।

রাওসাহেব প্রমাদ গণিলেন। রাণী তাঁহাকে পূর্ব্বেই সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে—ব্রাহ্মণ ভোজন অপেক্ষা এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে সৈনিকগণের শৃঙ্খলা বিধান এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করা, রাণীর কথা অবহেলা করিবার পরিণাম দাঁড়াইল—মোরারের পরাজয়!

১৭ই জুন—সেনানায়ক স্মিথের সহিত কোঠা-কি-সরাই [Kotah-ki-Serai] নামক স্থানে রাও সাহেবের যুদ্ধ হইল। এই স্থানের চারিদিক বেড়িয়া খাল থাকার দরুণ—অশ্বারোহী সৈনিকদের আক্রমণের সুযোগ ছিল না। এখানে সারাদিন যুদ্ধ হইয়াছিল।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ বীর পুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সৈন্যদলের শৃঙ্খলা বিধান ও উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বীরাঙ্গনা মহারাণীর উপর গোয়ালিয়রের পূর্ব্বভাগ রক্ষার ভার পড়িয়াছিল। তিনি তাঁহার প্রধান প্রধান সেনানায়কদের সংঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের পশ্চাতে ঘোড়সোয়ার এবং তৎপশ্চাতে পদাতিক সৈন্যদের সজ্জিত করিয়া এবং তোপগুলিকে যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাপতিরাও তাঁহার এই ব্যূহ রচনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইংরাজপক্ষের ব্রিগেডিয়ার স্মিথও রণনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন, তিনিও নিজ সৈন্যদল দিয়া ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষের বেশে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণরঙ্গিণী চণ্ডিকা দেবীর ন্যায় হাতে বিদ্যুৎছটার মত উজ্জ্বল কৃপাণ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বিউগল বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাণীর তোপ হইতে বিপক্ষদের লক্ষ্য করিয়া গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে রণক্ষেত্রে করুণ চীৎকার ও মৃতদেহের পর মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইতে লাগিল। সারাদিন ভীষণভাবে যুদ্ধ চলিল। লক্ষ্মীবাঈয়ের তরবারির আঘাতে শত্রুসৈনিকদের অনেকের মস্তক দেহচ্যুত হইতেছিল। রাণীর সৈন্যসংখ্যা ইংরাজ সৈন্যদের অপেক্ষা কম ছিল। ইংরাজ সৈন্যদের একদল ক্লান্ত

হইলে বিশ্রামের অবসর লইত এবং তাহাদের স্থলে অন্য এক সৈন্যদল আসিয়া অধিকার করিত। এইভাবে তিন দিন ধরিয়া অনবরত যুদ্ধ চলিয়াছিল—অবশেষে তাহাদের পরাজয় হইল এবং ইংরাজ পক্ষ হইলেন বিজয়ী। রাও সাহেব পরাজিত হইলেন।

তৃতীয় দিনের যুদ্ধাবসানে রাণীর বিশ্বস্ত অশ্বটি আহত হইল। এজন্য তিনি গোয়ালিয়রের অশ্বশালা হইতে একটি অশ্ব বাছিয়া লইলেন। এই অশ্বই হইল তাঁহার মৃত্যুদূত স্বরূপ। এই ঘোড়াটি দেখিতে ছিল যেমন সুন্দর, তেমনি ছিল সবল এবং দ্রুতগামী কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, ঘোড়াটির একটি দোষ ছিল যে হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিত।

রাণী যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের আর জয়ের আশা নাই, তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গিনী ও পরিচারিকা ও কতিপয় অনুচর সহ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

রাণী প্রবল ইংরেজসেনার বেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এ-সময়ে তাঁহার হাতে তীক্ষ্ণ তরবারি ব্যতীত অন্য কোনও অস্ত্র ছিল না। সঙ্গে সৈনিকদলও ছিল না। চারিদিক হইতে তখনও ইংরাজের তোপ হইতে গোলা বর্ষিত হইতেছিল। তথাপি রাণী অদ্ভুত শৌর্য্য ও বীরত্বের সহিত বিদ্যুদ্বেগে আক্রমণকারীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া সবেগে ধাবিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু দূরেই একটি সংকীর্ণ খালের নিকট আসিয়া পড়িলেন। ঘোড়া সেই খালের পারে আসিয়া জল দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এসময়ে শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি গোলা আসিয়া তাঁহার অঙ্গদেশ বিদ্ধ করিল। রাণী খাল পার হইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘোড়াটি কিছুতেই অগ্রসর হইল না। অঙ্গদেশে গুলি বিদ্ধ হওয়ায় রাণী অনেকটা বল হারাইয়াছিলেন, তবু সঙ্কল্পচ্যুত না হইয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। খালটি ছিল ক্যাণ্টনমেণ্টের কাছাকাছি। ঘোড়া কিছুতেই খাল পার হইতে চাহিল না। সে পদস্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কয়েকজন ইংরাজ অশ্বারোহী তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। তাহাদের সহিত রাণীর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত অসিযুদ্ধ হইল। অবশেষে একজন ইংরাজ অশ্বারোহীর অসির আঘাতে রাণীর মস্তকের দক্ষিণ ভাগ বিচ্ছিন্ন হইল। ইহার পরেও আঘাতকারী তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া সঙ্গীনের আঘাত করিল। এইরূপ অবস্থায়ও বীরাঙ্গনা রাণী সেই আঘাতকারী ও তাহার একজন সঙ্গীকে খড়্গের আঘাতে নিহত করিয়াছিলেন।

রাণীর বিশ্বস্ত অনুচর সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখকে ইঙ্গিতে নিকটে আসিতে আহ্বান করিয়া লক্ষ্মীবাঈ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, 'দেখ, মৃত্যু আমার নিকটে আসিয়াছে এখনই হয়ত আমার মৃত্যু হইবে, কিন্তু সর্দ্দার রামচন্দ্র, তোমাদের কাছে আমার এই মিনতি—আমার মৃতদেহ যেন ইংরাজের হাতে না পড়ে। তাহা হইলে আমার আত্মা কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না।' যে দুই তিন জন সর্দ্দার তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারা আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহাদের জীবন থাকিতে কখনও রাণীর দেহ ইংরাজের হস্তগত হইবে না।

সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও দেশমুখ ও অন্যান্য সর্দ্দারেরা তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী একটি পর্ণকুটীরে লইয়া গেলেন। সে কুটীরে বাস করিতেন গঙ্গাধর স্বামী নামে একজন সন্ন্যাসী। সাধারণতঃ তিনি গঙ্গাধর বাবাজী নামে পরিচিত ছিলেন। ভীষণ রক্তস্রাবের দরুণ লক্ষ্মীবাঈর জলপিপাসা লাগিয়াছিল,—বাবাজী তাঁহার মুখে গঙ্গাজল ঢালিয়া দিলেন। ঐ পবিত্র স্বাদু গঙ্গাবারি পান করিবার পর তাঁহার মূর্চ্ছা হইল—অন্তিম পিপাসা শান্ত করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পুণ্য আত্মা অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করিল। একবার শুধু শেষ বারের মত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র দামোদর রাওয়ের দিকে গভীর স্নেহভরে দৃষ্টি করিয়া অমরলোকবাসিনী ঝাঁসীর মহারাণী বীরাঙ্গনা ভারতমহিলা চলিয়া গেলেন—'মেরা ঝাঁসী নেহি দেঙ্গা' এই বীরবাণী যুগে যুগে তাঁহার বীরত্বের কাহিনী স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিবে।

১৯১৫ বিক্রমসংবতের জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে রাণী লক্ষ্মীবাঈ বীরলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন।

সর্দ্দার রামচন্দ্র রাও তাঁহার শব নিকটবর্ত্তী একটা তৃণস্তূপের মধ্যে রাখিয়া আগুন লাগাইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে চিতার আগুন আকাশ স্পর্শ করিল, দেখিতে দেখিতে বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের অপূর্ব্ব লাবণ্যময় দেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

গোয়ালিয়রের যে স্থানে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের পবিত্র দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেখানে একটি মর্ম্মর সমাধি-মন্দির স্থাপিত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তিকথা জনগণ সমক্ষে প্রচার করিতেছে।

তার পর কি হইল? ২০শে জুন ইংরাজকর্ত্তৃক পুনরধিকৃত আপনার গোয়ালিয়র রাজধানীতে জয়াজী রাও সিন্ধে ফিরিয়া আসিলেন।

ইংরাজ ঐতিহাসিক মালিসন্ সাহেব ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে এবং বীরত্ব সম্বন্ধে তৎপ্রণীত History of the Indian Mutiny নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—

"Amongst the fugitives in the rebel ranks was the resolute woman who, alike in Counci and on the field, was the soul of conspirators Clad in the attire of a man and mounted or horse back, the rani of Jhansi might have been seen animating her troops throughou the day. When inch by inch the British troop passed through the pass, and when reaching its summit Smith ordered the hurrars to charge the rani of Jhansi boldly fronted the British horsemen,"

"When her comrades failed her, her horse inspite of her efforts, carried her along with th

others, With them she might have escaped but that her horse, crossing the canal near the cantonment, stumbled and fell, A hurrar, close upon her track, ignorant of her sex and her ank, cut her down, She fell to rise no more. That night her devoted followers, determined that the English should not boast that they had captured her even dead, burned the body,"

"Thus died the rani of Jhansi. My opinion * * * whatever her faults in British eyes may have been her countryman will ever remember that she was driven by ill-treatment into rebellion, and that she lived and died for her country."

পূর্ব্বোল্লিখিত অংশের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শেষের অংশের অর্থ এই যে—ইংরাজদের চক্ষে রাণীর দোষ যতই থাকুক না কেন, তাঁহার স্বদেশবাসীরা এই কথা স্মরণ করিবে যে, ইংরাজের অবিচারের দরুণই ঝাঁসীর রাণী বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং তিনি দেশের জন্যই প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন এবং দেশের জন্যই প্রাণ দান করিয়া গিয়াছেন।* [Malleson's Indian Mutiny, vol iii p. 221]

* আমরা এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতে সাহায্য পাইয়াছি।

[1] History of the Indian Mutiny By Colonel G. B. Malleson, C. S. I, Vol I, II, III.

[2] Sir Hugh Rose's Despatch,

[3] Kaye, Sepoy war Vol, I, II, III,

[4] সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস—পঞ্চম ভাগ—রজনীকান্ত গুপ্ত।

[5] Lowe's Central India,

স্বর্গত চণ্ডীচরণ সেন, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর ও অন্যান্য কয়েকজন লিখিত 'ঝাঁসী রাণী' বইগুলি দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। কোথাও সংগ্রহ করিতে পারি নাই—যদি কাহারও নিকট থাকে জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

মৃত্যুর চেয়ে বড়

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

ছয়

ছ' মাস পরে উত্তোলিত হ'ল মোনার জীবনের দৃশ্যপট। এ ছ' মাসের মধ্যে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, সে-গুলি অবান্তর না হ'লেও উপেক্ষণীয়। সে-রাত্রে বৃদ্ধ রবার্টের ক্ষীণায়িত আর্ত্তনাদে পরিচারকেরা ছুটে এসেছিল ঘরে। তারাই রবার্টকে তুলে নিয়ে গেল তাঁর শয্যায়। কয়েক দিন পরে হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হওয়ায় বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটল। এবার মোনা একেবারে একা; না, একেবারে একা নয়, পৈতৃক সম্পত্তি সে লাভ ক'রেছে উইল অনুযায়ী।

পুরোনো পরিচারক ও পরিজনেরা তাকে ত্যাগ করেছে। অপরাধ? ওরা কাণাঘুঁষো করে—মোনাই নাকি পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী। তৃতীয় ঘটনা, সে রাত্রির পর অস্কার এই দীর্ঘ ছ' মাসের মধ্যে কদাচিৎ মোনার সামনে এসেছে।

অভিভাবকহীনা মোনার বন্ধুত্বকামী হ'ল অনেকেই। ছ' মাস পরে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটি হ'লো রক্ষী দলের নবাগত ক্যাপ্টেন। লোকটি দুর্বিনীত, চরিত্রহীন ও অধীনস্থ সকলেরই অপ্রিয়। মোনা প্রাণপণে এড়িয়ে চলত ক্যাপ্টেনকে। কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্যাপ্টেনও ক্রমান্বয়ে নির্লজ্জ হয়ে উঠল। হঠাৎ কোন এক সময়ে ডেয়ারীর ভেতরে ঢুকে পড়ত খবর না দিয়েই—সু-প্রভাত মিস্। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম; ভাবলাম একবার দেখা ক'রে যাই।

ধন্যবাদ, কিন্তু আমি এখন বড্ড ব্যস্ত।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্যাপ্টেনের সাহস হ'য়ে উঠলো দুর্দ্দমনীয়। একদিন বেশ একটু রাত্রে বাইরের দরজায় আঘাত পড়লো। সমস্ত নকালো তখন প্রায় নিঃশব্দ হ'য়ে এসেছে। মোনা অন্যমনস্কভাবে এসে দরজা খুলেই চমকে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে দরজায় আবার খিল আঁটবার চেষ্টা করলো। বাইরে দাঁড়িয়েছিলো ক্যাপ্টেন—সারা মুখে তার বীভৎস লালসা। কিন্তু মোনা দরজা বন্ধ করতে পারলে না; একখানা হাত গলিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন অনুনয় করলো ভেতরে আসবার জন্যে, তারপর ভয় দেখাল, শেষে জোর ক'রে ঢোকবার চেষ্টা করতে লাগল।

বোকামী কোরো না মিস্; আমায় ভেতরে ঢুকতে দাও।

মোনার শক্তি যতই বেশী হোক, ক্যাপ্টেনের শক্তি তার চেয়েও বেশী। তাই কয়েক মিনিটের ধস্তাধস্তিতে ক্যাপ্টেন দরজা খুলে ফেললো এবং ভেতরে ঢুকতে উদ্যত হ'ল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার পেছনে এক দীর্ঘ ছায়া-মূর্ত্তি জেগে উঠল। ছায়ামূর্ত্তি দুই হাতে তার গলা ধ'রে টেনে নিয়ে এলো রাস্তার ওপরে; তারপর মুহূর্ত্তেই

এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ক্যাপ্টেনকে অন্ততঃ দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেল্‌ল। মোনাকে কোন কথা না ব'লে সে নিঃশব্দে ফিরে গেল, যে-দিক থেকে এসেছিল সেই-দিকেই। নির্ব্বাক্ আতঙ্কে মোনা লক্ষ্য করল—সে অস্কার।

এর কিছুদিন পরেই এমন একটি কাণ্ড ঘটল, যার ফলে মোনার জীবনের গতি আগাগোড়া বদ্‌লে গেল। ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গতেই তার দৃষ্টি জান্‌লা দিয়ে বাইরে ক্যাম্পের দিকে গিয়ে পড়ল। দু' নম্বর কম্পাউণ্ডে কতকগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত নাবিক শ্রেণীর জার্ম্মাণকে অস্কার যেন অনেকক্ষণ ধ'রে কি বোঝাতে চাইছে। (অস্কার অবশ্য তিন নম্বর কম্পাউণ্ডের ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন মনোনীত হওয়ায় কাঁটাতারের সীমানার মধ্যে যেখানে ইচ্ছা যাবার অনুমতি পেয়েছিল)। এমন সময়ে এক নম্বরের এলাকা পেরিয়ে রক্ষীদলের ক্যাপ্টেনটা সেখানে এসে দাঁড়াল এবং সমবেত লোকগুলিকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অস্কারের দিকে এগিয়ে এল। তাদের কথোপকথনে কিছুই শোনা গেল না, শুধু দেখা গেল, অস্কার সেখান থেকে ধীরে ধীরে অন্যদিকে চলে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে মোনা তার ডেয়ারীর কাজে ব্যস্ত ছিল। এমন সময়ে একটি তীক্ষ্ণ গোলমালের শব্দ কাণে ভেসে আসতেই মোনা দরজায় এসে দাঁড়াল। দু' নম্বর কম্পাউণ্ডের প্রায় একশ' জন বন্দী বীভৎস চীৎকারে এক জন লোককে তাড়া ক'রেছে। রক্ষীদলের রাইফেল তাদের হস্তগত। লোকটির কোর্ট স্যুট ছিঁড়ে পড়েছে। উন্মুক্ত দেহ বয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে। এক বীভৎস দৃশ্য

মোনা উত্তেজনায় নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ল। হঠাৎ সে বুঝে উঠতে পারল না ব্যাপারটা কি, বা সে নিজে কি করতে চলেছে। শুধু অস্কারের কোন অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তা'র মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। ঝড়ের মত শূন্য গেট পেরিয়ে মোনা ছিটকে ভেতরে এসে পড়ল। তা'র দুই শুভ্র কনুই পর্য্যন্ত অনাবৃত বাহু দিয়ে ভীড় ঠেলতে ঠেলতে চীৎকার ক'রে উঠল—সরে যাও, সরে যাও বলছি।

মোনার কণ্ঠস্বরে উত্তেজিত জনতা শান্ত হয়ে স'রে দাঁড়াল। মোনা আহত ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছেই চমকে উঠ্‌ল; সর্ব্বাঙ্গে রক্তপ্লাবিত হ'য়ে ক্যাপ্টেনটা থেকে থেকে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ছিল। মোনা চেয়ে দেখল—চারিদিক থেকে সশস্ত্র সৈন্যের দল ছুটে আসছে ক্যাপ্টেনের সাহায্যার্থে।

সেদিন আরও ঘণ্টাখানেক পরে পাঁচজন সাধারণ বন্দী ও অস্কারকে গ্রেপ্তার ক'রে পীলে চালান দেওয়া হ'ল। মোনা শুধু বিস্মিত হয়ে উঠ্‌ল—অস্কার! কই সে ত' ভীড়ের মধ্যে ছিল না।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচজন সাধারণ শ্রেণীর মাল্লা ও অস্কারের উন্নত দেহ। বিচারকের আসনে গভর্ণর নিজে; তাঁর দুইপাশে সহরের বেলিফ ও ব্রিটিশ কমাণ্ডাণ্ট। কোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট বললেন—তা হ'লে ক্যাপ্টেন, আপনি সম্পূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করুন।

সেই উদ্ধত ক্যাপ্টেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গভর্ণরের দৃষ্টির সম্মুখে বিনয়ে নুইয়ে পড়ল। বার বার নমস্কার ক'রে অবশেষে সে বলে গেল—গতকল্য যখন সে প্রত্যহের মতই কর্ত্তব্যকার্য্যে দু'নম্বর কম্পাউণ্ডে এসে প্রবেশ করল, তখন হঠাৎ একদল বন্দী তাকে আক্রমণ করে। তারা সংখ্যায় অন্ততঃ দু'শ হ'বে। আর এই ছ'জনই তাদের পাণ্ডা। বিশেষ করে এই অস্কার হাইন লোকটিই সবচেয়ে সাংঘাতিক। ক্যাম্প-ক্যাপ্টেন হওয়ার দরুণ তার সর্ব্বত্র যাওয়ার অধিকার আছে; আর সেই ক্ষমতার সে অপব্যবহার করে।

বেলিফ—এ'কথা তুমি কেমন করে বলছ?

ক্যাপ্টেন—আমি গোপনে শুনেছি—ও বন্দীদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে।

গভর্ণর—তা হ'লে বল, তোমার বিরুদ্ধে ওর কোন রকম বিদ্বেষ আছে।

ক্যাপ্টেন—ভীষণ বিদ্বেষ হুজুর।

গভর্ণর—এর কারণ কি।

—কোন কারণই নেই হুজুর।

—বেশ, তা হ'লে অস্কার হাইনকে এখানে আসতে দাও।

মোনা শেষের দিকে একটি বেঞ্চিতে এসে বসে ছিল। বিচারের ফলাফল জানতে আসার লোভ সে সামলাতে পারেনি। অস্কার হাইন সমুন্নত শিরে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে আসতেই মোনার চিত্ত কেমন যেন এক অস্বস্তিতে ভ'রে উঠ্‌ল।

অস্কারের মুখ অত্যন্ত শান্ত ও নির্ভীক। এ্যাড্‌ভোকেটের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর সে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় দিয়ে গেল।

এ্যাড্‌ভোকেট বললেন—ক্যাপ্টেন যা বলে গেল, সমস্ত শুনেছ।

—সমস্তই শুনেছি।

তোমার সম্বন্ধে যা' বললো, তা' কি সত্য?

একবর্ণও না।

তুমি কি বন্দীদের ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলে ?

না, আমি করিনি ; তবে ওর ইতিহাস আগে জানতে পারলে, আমি ও'কে এই রকম শাস্তি দেওয়ার জন্তেই বন্দীদের উত্তেজিত করতাম।

গভর্ণর তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করলেন—তুমি ওর কি ইতিহাস জানতে পেরেছ ?

ওই ক্যাপ্টেন মিথ্যাকথায় বন্দীদের ঠকিয়ে আসছে, জোচ্চুরী করে ওদের অর্থ অপহরণ করেছে এমন কি ওদের অসৎপথে নিয়ে যাচ্ছে। আগে জান্‌লে আমি ওকে হত্যা করার পরামর্শ দিতাম।

এ' কথা তুমি স্বীকার করছ ?

হঁ্যা, আমি স্বীকার করছি।

গভর্ণর বেলিফের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—এর পর আর অগ্রসর হওয়া অনাবশ্যক। এ্যাডভোকেট উঠে বললেন —রক্ষীদলের একজন কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্যে বাধা দেওয়ায় ও তাকে এমনি নৃশংস ও ঘৃণিত ভাবে আক্রমণ করার জন্ম আসামীদের চরম দণ্ড দেওয়া উচিত।

কিছুক্ষণ ধরে বেলিফ উঠে রায় দিতে সুরু করলেন—এরা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধে অপরাধী। এভাবে এ ধরণের ঘটনা বেড়ে চল্‌লে সামরিক শৃঙ্খলারক্ষা করাও কঠিন হ'য়ে উঠবে। এর জন্তে আমাদের কর্ত্তব্য......

বেলিফের কণ্ঠ হঠাৎ একটি মৃদু গোলমালে তলিয়ে গেল। পরমুহূর্ত্তেই তীক্ষ্ণ স্ত্রী-কণ্ঠে ভেসে উঠল—অনুগ্রহ করে আরও এক মিনিট অপেক্ষা করবেন কি ?

পরমুহূর্ত্তেই জনতার ভীড় ঠেলে মোনা সামনে এসে দাঁড়াল।

—আর কারও কথা নয়, আমি শুধু ক্যাপ্টেনের বিষয়ে কয়েকটি কথা বলবো। হঠাৎ একটি বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল বিচারকদের মুখে মুখে। অবশেষে বেলিফ বললেন, বেশ, আপনি বলতে পারেন।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল মোনা। বিস্মিত জনতার দিকে চেয়ে তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হ'ল ; কম্পিত কণ্ঠে বার বার কথা আটকে গেল, অবশেষে সে নিজেকে সম্পূর্ণ সামলিয়ে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

—আমি বলতে চাই যে, এই ক্যাপ্টেন অত্যন্ত অসচ্চরিত্র, সমস্ত সৈন্যদলের কলঙ্কস্বরূপ।

গভর্ণর নাকের ডগায় চশমা তুলে মোনার দিকে তাকালেন ; কটুতিক্ত হাসি হেসে বললেন—আপনি সৈন্যদল সম্বন্ধে খবর রাখেন মনে হচ্ছে। আপনার বুকে ঝোলানো ওটি কিসের পদক ?

—ভিক্টোরিয়া ক্রস। আমার দাদা এই যুদ্ধেই মারা গেছেন। তাঁর বীরত্বে সম্রাট এই পুরস্কার দিয়েছেন।

গভর্ণরের দৃষ্টি আরও ধারাল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেলিফ বললেন—বেশ, আপনি বলে যান।

মোনা কাঠগড়ার রেলিং দু'হাতে চেপে ধরল। তার আঙুলগুলো বারবার কেঁপে উঠছে। আরম্ভ করতে গিয়েও বুঝি কথা হারিয়ে গেল ; অবশেষে দুই চোখ তুলে মোনা বলে গেল। বলে গেল—কেমন করে ক্যাপ্টেন একরাত্রে জোর ক'রে তা'র ঘরে ঢুকবার চেষ্টা করেছিল, আর অস্কার এসে তার কণ্ঠরোধ করে ছুঁড়ে ফেলেছিল পথের ওপর।

—কাজেই...মোনা বল্লে—অস্কারের ওপরই ক্যাপ্টেনের তীব্র বিদ্বেষ।

সমস্ত আদালত-গৃহ নিশ্বাস রোধ করে বসে রইল। সূচিপতনের শব্দও বুঝি শোনা যায় না। বেলিফ অস্কারের দিকে চাইলেন : একি সত্যি ?

মিস ক্রেন যে ঘটনাটি সবার সামনে প্রকাশ করলেন, এর জন্তে আমি দুঃখিত, কিন্তু এ'র প্রত্যেকটি অক্ষর সত্য, ক্যাপ্টেনের গলায় এখনও আঙুলের ছাপ বসে রয়েছে।

ক্যাপ্টেনের মুখ তার বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তখন অন্যান্য সাক্ষীদের ডাকা হ'ল। তারা এসে বল্লে কেমন করে ক্যাপ্টেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে তাদের বাজীর টাকা মিথ্যা কথা ব'লে আত্মসাৎ ক'রেছে। ওরা বল্‌লে —অস্কার আমাদের বলেছিল কমাণ্ডান্টের কাছে নালিশ জানাতে, কিন্তু একটু মদ খাওয়ার পর আমরা আর রাগ সামলাতে পারিনি।

ক্যাপ্টেন গর্জ্জন ক'রে উঠলো—সমস্ত মিথ্যে কথা।

—না, প্রত্যেকটি কথা সত্য।

বন্দীদের পেছন থেকে তাদেরই একজন রক্ষী সামনে এগিয়ে এলো। রক্ষীটির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হ'লে আরও দুর্নাম প্রকাশের ভয়ে বিচার দ্রুত শেষ করা হ'ল। আসামীদের হ'ল একদিনের কারাদণ্ড। তারপর কমাণ্ডান্ট ক্যাপ্টেনকে সম্বোধন করে বল্‌লেন—এর পর তুমি অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্ম প্রস্তুত হও ; তোমাদের মত দু'একজন নোংরা লোকের জন্যই শত্রুরা আমাদের দুর্নাম দেওয়ার সুযোগ পায়।

বিচারসভা শেষ হ'ল। মোনার পাশ দিয়ে বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হ'ল ; এতক্ষণে মোনার উত্তেজনা নিভে এল ; সঙ্গে সঙ্গে সে যেন নিজের অবস্থাটা কতকটা অনুভব ক'রল। প্রত্যেকের তীব্র বিষদৃষ্টির সম্মুখে মোনা যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। ভীড় কমে এলে মোনা বেরিয়ে এল বাইরে।

—ঐ সেই মেয়েটা, বিশ্বাসঘাতক।

—পোড়া কয়লার মত ওরা নিজের জাতকেই ধ্বংস করে—জাতের কলঙ্ক।

অদূরবর্ত্তী কয়েকটী মহিলার ভীড় থেকে ভেসে এল কথা কয়টি। সকলকে পাশ কাটিয়ে মোনা যখন অর্দ্ধেক রাস্তা এসে পড়েছে, তখন কমাণ্ডাণ্টের মোটর এসে থামল। মোটর থেকে মুখ বাড়ালেন তিনি। তাঁর সেই সহাস্য মুখমণ্ডল বর্ষামেঘের মতই বিষণ্ণ ও ভ্রূকুটি-কুটিল;—জানি না, হয়ত ন্যায়ের মর্য্যাদা রাখতেই তুমি এ'কাজ করেছ; তবু আমি দুঃখিত; মিস ক্রেন, অত্যন্ত দুঃখিত। কমাণ্ডাণ্টের মোটর বেরিয়ে গেল। টলতে টলতে মোনা যখন তার বাড়ীর পথে এসে পড়ল হঠাৎ তার চোখে ভেসে এল, কাঁটাতারের ভেতর দলে দলে বন্দীরা দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেই টুপী খুলে তাকে নমস্কার জানাল।

সমস্তটা দিন মোনা ডেয়ারীর কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখ্‌ল। আস্তে আস্তে যখন রাত্রির অন্ধকার নেমে এল পৃথিবীতে, তখন মোনা আগুনের পাশে বাবার সেই পুরোণো সোফার মধ্যে বসে পড়ল।

যে সত্যকে লুকিয়ে রাখবার জন্য এতদিন ধ'রে মোনা অন্তরের সঙ্গে অবিশ্রাম যুদ্ধ ক'রে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল, সেই সত্যই আজ সকলের সম্মুখে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ল। অস্কার হাইন। জার্ম্মানবিদ্বেষী মোনা ভালবাসে জার্ম্মান অস্কারকে। লোকে বলে মোনাই তা'র পিতাকে হত্যা করেছে, যদি তা' সত্য হয়, তবে এই দ্বিতীয়বার সে তাঁকে হত্যা করল তাঁর শুভ্র মর্য্যাদায় কলঙ্কের পসরা চাপিয়ে।

—কিন্তু তা' না করে আমি যে পারি না। মোনা আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌ল।

—জাতির কলঙ্ক! বিশ্বাসঘাতক?—তা'র উচিত নয় নকালোতে থাকা কিন্তু অস্কার...?

—উঃ ভগবান্; আমি...আমি কি করব?

মোনা দু'হাতে বুক চেপে ধ'রে উপুড় হয়ে পড়ল মাটিতে।

রাত্রি গভীর হয়ে এল। মোনা আস্তে আস্তে উঠে এল বাইরের দরজায় তালা দিতে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল; এক টুকরো কাগজ কে যেন দরজার ফাঁক গলিয়ে ভেতরে ঠেলে দিয়েছে। তা'তে লেখা রয়েছে—"ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন।"

হঠাৎ কাগজখানি বুকে চেপে ধ'রে মোনা নতজানু হয়ে বসে পড়ল। একটি অস্ফুট স্বর শুধু তা'র কম্পমান দেহ থেকে বেরিয়ে এল—না, আমি পারব না, আমি কিছুতেই পারব না, ঈশ্বর আমায় মার্জ্জনা করো।

তার পর এল খৃষ্টমাস...মহাযুদ্ধের শেষ খৃষ্টমাস। বন্দীনিবাস পরিদর্শন করবার জন্য দু'জন সুইস ডাক্তার নকালোতে এসেছিলেন। মোনার ডেয়ারীর পরিচ্ছন্নতা ও নিখুঁত ব্যবস্থায় প্রীত হ'য়ে তাঁদের একজন বল্লেন—সত্যিই আশ্চর্য্য আপনার শক্তি, আপনাকে দেখে মনে হয় যদি সত্যিই মনপ্রাণ দিয়ে খাটা যায় তা'হলে একজনই দশজনের সমান কাজ করতে পারে।

অপর ডাক্তার মোনার দিকে চেয়ে সহাস্যে বল্‌লেন—ঠিক এমনি ব্যবস্থা আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে করা সম্ভব হয়েছে বলেই আমরা জয়লাভ করতে পেরেছি।

মোনা চমকে উঠ্‌লো—জয়লাভ করেছি? যুদ্ধ কি তা'হ'লে শেষ হ'য়ে গেল?—

শীগ্‌গিরই হ'বে।

মোনার সমস্ত অন্তর দুলে উঠ্‌লো। সত্যিই কি যুদ্ধ শেষ হ'য়ে আসছে। যুদ্ধ শেষ হ'লে সে ও অস্কার দু'জনেই বুঝি শান্তি পায়। কেন অস্কার জার্ম্মান ব'লে নয়। জার্ম্মান আজ তা'র স্বদেশবাসীর সঙ্গে যুদ্ধরত হওয়ায় মোনা স্বদেশবাসীর বিরক্তিভাজন হ'য়ে উঠেছে। দেশের পার্থক্য নয়, তা'দের প্রেমের অন্তরায় বর্ত্তমান সংগ্রাম। সংগ্রামের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিঘ্নও হবে অপসারিত। ঈশ্বর, এ যুদ্ধ থামিয়ে দাও, এ যুদ্ধের অবসান কর।

খৃষ্টমাস সন্ধ্যায় বন্দীনিবাসের উপাসনা ঘর থেকে ভেসে এল সঙ্গীতের ধ্বনি. Ein feste Burg ist unser Gott এ ভাষা মোনার অজানা; কিন্তু সুর অত্যন্ত পরিচিত। a sure stronghold our God is still...ভগবান, নিশ্চিন্ত হ'য়ে একমাত্র তোমাকেই আমরা আশ্রয় করতে পারি। একই গান; এক ধর্ম্ম, এক ঈশ্বর, এক রক্ষাকর্ত্তা, তবু...

হঠাৎ চিন্তায় মোনার চিত্ত আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌ল। যদি এক ধর্ম্ম এক উপাসনা হয়, তবে মোনা কেন এ প্রার্থনায় যোগ দেবে না?

হঠাৎ উপাসনা-ঘরের নিঃশব্দতা ভঙ্গ ক'রে পাশের দরজার আগল নড়ে উঠ্‌ল; সঙ্গে সঙ্গে দুয়োর ঠেলে যে ভেতরে এসে দাঁড়াল তাকে সকলেই চেনে; বর্ত্তমান নকালো দ্বীপের একমাত্র নারী সে

যে জনতার মাঝ থেকে উঠে এসে বাহু স্পর্শ করে মোনাকে চেয়ারের কাছে নিয়ে গেল, তার প্রতিটি নিঃশ্বাসের শব্দও মোনার পরিচিত। গম্ভীর ও মধুর সুরে জার্ম্মাণ ভাষায় সকলে গেয়ে চ'লেছিল, হঠাৎ প্রত্যেকেই

অনুভব করলো তাদেরই সুরে সুর মিশিয়ে আর একজন গেয়ে চলেছে ইংরেজী ভাষায়। এক গান, এক সুর—

"Ein feste Burg ist unser Gott."
"A sure stronghold our God is still."

গান শেষ হ'লো। মোনার দৃষ্টির সম্মুখে প্রার্থনা-মগ্ন অস্কার। চোখে তার স্বর্গীয় দীপ্তি, মোনার অন্তর ভেদ ক'রে নিঃশ্বাস পড়ল—এ যুদ্ধ শেষ কর, ঈশ্বর, এ যুদ্ধ থামিয়ে দাও।

মোনা উত্তেজনায় অধীর হ'য়ে উঠেছে।

সংবাদপত্রে জলন্ত অক্ষরে ঘোষণা—মিত্রশক্তির সুস্পষ্ট জয়লাভ, জার্ম্মানের পরাজয়। যুদ্ধ এতদিনে শেষ হ'য়ে এল। মোনা উত্তেজনায় অধীর হ'য়ে উঠল। কিন্তু অস্কার কই? এ সংবাদে সে কি ভাবছে?

অস্কার এল অনেক রাত্রে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বেজে উঠ্‌ল, অস্কারের কণ্ঠ—মোনা!

এর আগে অস্কার কখনও ত' মোনার নাম ধরে ডাকে নি। মোনা দোর খুলে অস্কারের সামনে এসে দাঁড়াল।

—সব শেষ মোনা।

—কি শেষ অস্কার?

—জার্ম্মাণী পরাজিত; হিণ্ডেনবার্গ-লাইন বিধ্বস্ত; বার্লিনে বিদ্রোহ।

—যুদ্ধ ত' তা হ'লে শেষ হল?

—না হ'য়ে আর উপায় কি?

মোনা এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে রইল। তারপর স্পন্দিত অন্তরে ব'লে উঠ্‌ল—

—যুদ্ধ শেষ হওয়ায় তুমি সুখী হয়েছ ত' অস্কার?

—আমি...আমি তা' জানি না। আমি তা' বলতে পারি না। মোনার দৃষ্টি হঠাৎ অস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। অস্কারের পদশব্দ শুধু দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর, সমস্ত নকালো অফিসারদের কোয়ার্টারে এক বিপুল উত্তেজনা। বন্দীরা তাদের দৈনন্দিন কাজ ভুলে গেছে। উৎকণ্ঠায় আরক্ত মুখে মোনা ব'সে রয়েছে ঘড়ির দিকে চেয়ে। নির্ব্বিকার ঘড়ির বুকের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে মিনিটের পর মিনিট—প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তার অত্যন্ত দীর্ঘ, অত্যন্ত বিলম্বিত।

জার্ম্মাণ-সম্রাট্ কাইজার সিংহাসনচ্যুত, জার্ম্মাণবাসী সন্ধির জন্য ব্যাকুল। তাদের সন্ধির সর্ত্তগুলি দেওয়া হয়েছে। যদি জার্ম্মাণ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে, তা' হ'লে বেলা ১১টার সময় সেই খবর কামানের শব্দ ও সাইরেণ বাজিয়ে নকালোবাসীকে জানানো হবে সমস্ত নকালো প্রতীক্ষিত, স্তব্ধ।

অবশেষে পীলের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারটা বাজল; ঘড়ির শব্দ মিলাবার আগেই সমস্ত নকালো প্রতিধ্বনিত ক'রে কামানের গর্জ্জন জেগে উঠল। না, আর ভুল হ'বার কোন আশঙ্কা নেই, সমস্ত দ্বীপ এখনও থর থর ক'রে কাঁপছে। পাহাড়ের রন্ধ্রে প্রতিশব্দিত সাইরেণের অতি তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ। এক মুহূর্ত্তে নকালোর জনসাধারণ ছিটিয়ে পড়েছে এক উন্মত্ত উল্লাসে। শুধু পঁচিশ সহস্র জার্ম্মাণ-বন্দীর ক্যাম্প নিঃশব্দে শ্বাস রুদ্ধ ক'রে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। তাদের দেশ তাদের ফাদার-ল্যাণ্ডের পতন হ'ল।

কয়েক মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হওয়ার পর এই গুমোট ভাবটাও কেটে এল। বন্দীরা আবার উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল এই ভেবে যে, তাদের বন্দীত্বের অবসান হ'য়ে এল; এবার তারা ফিরে যেতে পারবে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কাছে।

মোনা স্পন্দিত বুকে তার ডেয়ারীর দুয়োরে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতি মুহূর্ত্তে সে যে কামনা জানিয়ে এসেছে এতদিনে তা' সফল হ'ল শান্তি। যুদ্ধের অবসানে পৃথিবীতে শান্তি নেমে এল। দুই দেশের মধ্যেকার বিরোধ ও বিদ্বেষের এতদিনে অবসান হ'ল। তারপর! তারপর...

কে যেন নিঃশব্দে মোনার পেছনে এসে দাঁড়াল। মোনা জানে সে কে। অশ্রু-সিক্ত হাসিতে মোনা বল্লে—এবার ত' তুমি বাড়ী ফিরতে পারবে। তুমি কি খুসী হওনি অস্কার? আর এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে ভ'রে উঠ্‌ল। অস্কার বল্লে—না, হইনি। এখনও কি বুঝতে পারনি? মোনার হাতের আঙুলগুলি অস্কারের করতলে ধরা পড়ল। মোনা অনুভব করল তার স্পন্দিত নাড়ীর উত্তাপ।

অবশেষে একদিন বন্দীদের মুক্তির আদেশ এল। কিন্তু সে আদেশে যে ভয়াবহতা ছিল, মোনার কানে আসতেই মোনা চমকে উঠল। যারা আজীবন ইংলণ্ডে কাটিয়ে এসেছে, বন্ধুবান্ধব, ব্যবসা-বাণিজ্য সবদিক দিয়ে যারা ইংলণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তাদেরকেও কেবলমাত্র জার্ম্মানে জন্ম ব'লে জোর ক'রে জার্ম্মানে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জার্ম্মানে যাদের জন্ম ইংলণ্ডে তাদের স্থান নেই।

মোনা স্তব্ধ হ'য়ে রইল। মনে হ'ল এ সমস্তই বিধাতার পরিহাস। দেশের সঙ্গে শুধু দেশের পার্থক্য; এক প্রদেশের সঙ্গে শুধু আর এক প্রদেশের। একই ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক প্রাদেশিকতাকে ক্ষমা করতে

শিখল না। যুদ্ধ মানুষের মধ্যে এতই বিভেদ জাগিয়ে তুলেছে।

হঠাৎ মোনা কি এক আশঙ্কায় চমকে উঠলো। দেহের অস্থিমজ্জাগুলি যেন ভেতরে ভেতরে শিউরে উঠল! অস্কার ··? অস্কারও কি চ'লে যাবে? তারপর ··?

সেই রাত্রেই অস্কার দরজায় আঘাত দিল। তার বিহ্বল চোখের পাতাগুলি থর থর ক'রে কাঁপছে!

—নিশ্চয়ই, তুমিও শুনেছ?

—হ্যাঁ! তোমাকেও চ'লে যেতে হবে?

—আমাকেও চ'লে যেতে হবে!

বন্দীদলের নবাগত ক্যাপ্টেনের মুখে জানা গেল,—সেই দিনই! কি গভীর বেদনায় মুহ্যমান হ'য়ে প'ড়েছে সদ্য মুক্ত বন্দীর দল!

জার্মান ত' তাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত। ইংলণ্ডেই তাদের বাড়ী-ঘর, বন্ধু, স্বজন সব কিছু। শুধু জার্মান ভাষা। শত্রুকে ইংল্যাণ্ড স্থান দিতে পারে না। শুধু যে-সমস্ত জার্মান ইংরাজ-মহিলার পাণিগ্রহণ করেছে, তাহারাই পাংক্তেয়, শুধু তারাই এদেশে থাকবার অনুমতি পাবে।

মোনার অন্তর দুলে উঠল। তার দ্বিধান্বিত ত্রস্ত মন হঠাৎ যেন এক নতুন আলোর সন্ধান পেলো। অস্কার যদি জার্মানে না ফেরে, সে অনায়াসে নকালোতে থাকতে পারবে। মোনারই সঙ্গে তার বাড়ীতে। এ কল্পনায় সে শিউরে উঠলো।

বন্দীদের মধ্যে প্রত্যেকদিন আড়াইশো জনকে জাহাজে ক'রে পাঠান হচ্ছিল। প্রথমে মুক্তি লাভ করল এক নম্বর কম্পাউণ্ডের ধনী ও ব্যবসায়ীর দল। তৃতীয় দল চলে যাওয়ার পর মোনা একদিন তার ইজারাদারের দুয়ারে এসে থামল। চকিতে একবার ভেসে এল চার বছর আগেকার একদিনের প্রায় ভুলে-যাওয়া কথা। ইজারাদার তা'র বাবাকে বলেছিলেন—আপনি কিছু ভাববেন না, মিষ্টার ক্রেন। এ ফার্ম আপনাকে ও আপনার ছেলেমেয়েদের চিরদিনের জন্য দেওয়া রইল, চারবছর পরে সেদিনের কথা অকারণেই হঠাৎ মনে পড়ল। মাস ছ'য়েকের খাজনা বাকী পড়েছে। সেটা দিতে এসে মোনা এক মুহূর্তের কল্পনা-বিলাসে তলিয়ে গিয়েছিল।

তার ল্যাণ্ডলর্ড বাড়ীতেই ছিলেন। মোনাকে তিনি বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন, তারপর মোনার দিকে চেয়ে বল্লেন—খাজনাটা দিতে এসেছেন আশা করি।

ব্যাঙ্ক্ নোট ক'খানি গুণে নিয়ে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ভাব-ভঙ্গীতে মনে হ'ল তিনি যেন মোনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চান। মোনা শক্ত হ'য়ে বসে জিজ্ঞেস করল—কিন্তু এর পর ইজারা দেবেন আমাকে সে'বিষয়ে একটা ঠিক হ'য়ে যাক।

—ওঃ! সে'সব কথা পরে হবে এখন।

—না আজই হ'বে। আমাকে আবার কতকগুলি কাজ সারতে হ'বে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এক মুহূর্তের জন্য বোধ হয় একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। তারপর দৃঢ়ভঙ্গিতে বললেন—বেশ, তা হ'লে তোমায় সত্য কথাই বলি। আমি অন্য জায়গায় বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি।

মোনা বজ্রাহতের মতই নিস্পন্দ হ'য়ে গেল:—কিন্তু আপনি না আমার বাবাকে বলেছিলেন, আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন........

—কিন্তু তোমার বাবাও মারা গেছেন, তাঁর ছেলেও বেঁচে নেই।

—তাঁর মেয়ে ত বেঁচে আছে, সে কি করেছে।

—সে কি করেছে তা' আর আমায় জিজ্ঞেস কোরো না মিস্।

—না, আমি জানতে চাই; আপনাকে বলতেই হ'বে।

—তবে শোন, আমি চাই, যে আমার ফার্ম নেবে সে সত্যিকার ভালো লোক হ'বে, শত্রুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন লোক নয়।

মোনা কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুঃসহ ক্রোধে তার কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ বিপুল বেগে কেঁদে ফেলে মোনা বিদ্যুতের মত ছুটে বাইরে চলে এল মাঠের পথে। অপেক্ষমাণ অস্কার এসে দাঁড়ালে তার সামনে। তারই হাতে হাত রেখে মোনা ফুঁপিয়ে উঠল—যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে, নকালোতে আর আমারও যে স্থান নেই!

সারারাত্রি ধ'রে মোনা ভাবলো। সে ভাবনার কোন কিনারা নেই।

একদলের পর আর একদল বন্দী প্রত্যহ নকালো ছেড়ে চলে যাচ্ছে। একদিন অস্কারের পালা আসবে; অস্কারও চলে যাবে। কিন্তু মোনা· ·নকালোতে যে তা'র সহস্র স্মৃতি জড়িয়ে আছে; এ দ্বীপ সে ছাড়বে কেমন ক'রে? মোনা ভাবল অনেকক্ষণ ধ'রে। না হয়, সে আর একটি ফার্ম্ম ভাড়া নেবে। নকালোর অপর প্রান্তে বুঝি একটি ভাড়ার অপেক্ষায় ছিল; সে কথা মনে হতেই মোনা যেন আশ্বস্ত হ'ল কিছুটা। খট্, খট্, খট্—নীচের দরজায় অনেক্ষণ থেকেই কে আঘাত করছিল; শব্দটা কাণে আসতেই মোনা সচকিত হ'য়ে উঠল। জানলা দিয়ে উঁকি দিতেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল; জন করলেট। এই লোকটি একদিন প্রণয় গুঞ্জনে মোনাকে

অস্থির ক'রে করে তুলেছিল। অত্যন্ত বিরক্ত মন নিয়ে মোনা নেমে এলো।

—নমস্কার মিস ক্রেন, আপনি শুনেছেন বোধ হয়, আমি এ ফার্ম্ম বন্দোবস্ত করে নিয়েছি। আপনি এখানে কত দিন থাকবেন তাই জানতে এসেছিলাম শুধু।

—যতদিন আমার থাকবার অধিকার আছে ততদিন নিশ্চয়ই।

আর কিছু জানতে চান?

একটু নির্লজ্জ হাসির রেখা ফুটে উঠলো করলেটের দুই চোখে। সে বললে—

—কিন্তু বন্দীনিবাস উঠে গেল, এর পর আপনার দুধের ব্যবসা চলবে কেমন করে?

—যেমন করে আগে চলত।

—ওঃ, আপনি বড্ড ভুল করেছেন মিস্। আপনার কাছ থেকে আর কেউ দুধ নেবে না বলে সঙ্কল্প করেছে।

মোনার দুই চোখে জ্বালা ধরল। সে কথা না বলে ফিরবার উপক্রম করল।

—দাঁড়ান মিস ক্রেন, আমার কথা শেষ হয় নি। ক্ষতিপূরণের কি করবেন?

—ক্ষতিপূরণ?

—ওহো! ভুলে গেছেন বুঝি। আইন অনুসারে জমীর অনিষ্ট হ'লে সে ক্ষতিপূরণ করতে আপনি বাধ্য। পঁচিশ হাজার লোক চার বছর যেখানে ক্যাম্প করে বাস করলো সেখানে ফসল ফলতে দেরীই হবে।

মোনা কথাটা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল। একটু নরম সুরে সে বললে—

—এর জন্য আমায় কত দিতে হ'বে বলে আপনি মনে করেন?

করলেট একটি বিরাট অঙ্কের নাম করলে। টাকার পরিমাণ শুনে মোনার মুখ সাদা হয়ে গেল। একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে মোনা বললে—

—অত টাকা দিতে গেলে আমিও যে কপর্দ্দক শূন্য হয়ে পড়বো।

করলেটের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো—তাতে ক্ষতি কি? তুমি ত—এ দেশে থাকছ না। হয় ত শীগ্‌গিরই কারও সঙ্গে আর এক দেশে চলে যাবে।

মুহূর্ত্তমধ্যে জন করলেট তার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল ও বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল। মোনা আস্তে আস্তে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। চোখে বুঝি আর এক ফোঁটাও জল নেই। সম্মুখে শুধু দুস্তর অন্ধকার।

অস্কারের মনেও বুঝি এমনি বিপর্য্যয় জেগে উঠেছিল। জার্ম্মানী তার স্বদেশ, পিতৃভূমি; তবু সেখানে ফিরে যাবার সমস্ত উৎসাহ নষ্ট হয়ে এক গভীর উদ্বেগের ঘন মেঘে ভরে উঠল তার মন—এ কি শুধু এক নির্ভীক ও উদারচিত্ত নারীর করুণ অসহায়তায়! যে নারী আজ তারই জন্য হৃতসর্ব্বস্ব ও রিক্ত; মানুষকে ভালবাসার অপরাধে যে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত; আজ তার মর্ম্ম-বেদনার ব্যাকুলতা অস্কারের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

অস্কার জানে মোনা তাকে ভালবাসে। বিদ্বেষ ও কলঙ্কের আগুন ডিঙিয়ে সে ভালবাসা ভাস্বর ও মধুর হয়ে এসেছে। অস্কার কি আজ সেখানে টেনে দেবে বিচ্ছেদের যবনিকা। মনে পড়ল সন্ধ্যের কথা। অস্কার যখন শুনল আজ তারই জন্য মোনা নকালো থেকে বিতাড়িত, বিহ্বল হয়ে সে ছুটে এসেছিল মোনার কাছে।

—মোনা, আমায় ছেড়ে দাও. আমি ফিরে যাই আমার দেশে। মোনার দুই চোখ অশ্রুর বাষ্পে ঘোলাটে হ'য়ে উঠলো। আস্তে আস্তে সে বললো—তুমি চাও আমি তোমার সংস্পর্শ ত্যাগ করি; না অস্কার?

অস্কার উত্তর দেয়নি। মোনা আবার বল্লে—তুমি তোমার দেশে ফিরে যাবে, আর আমি তোমাকে ভুলবার সাধনা করব—এ ইত?

এবারেও সে উত্তর দিল না।

—বলো, তোমায় বলতেই হ'বে; তুমি কি সত্যিই এই চাও?

অস্কার বলতে চাইলো—সে এইই চায়। কিন্তু তার সমস্ত ইচ্ছা জমে একটি মাত্র কথায় ফুটে উঠলো—ভগবান্ জানেন, আমি তা' চাইনা।

সমস্ত দিন অস্কার বিমর্ষ হ'য়ে রইল। বিক্ষিপ্ত চিন্তার টুকরোয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল রাত্রি। দিন তিনেক পর হঠাৎ সেদিন দেখা গেল অস্কারকে। উত্তেজনায় ও আগ্রহে তার মুখ রাঙা; দীর্ঘ পদক্ষেপে ক্যাম্পের মাঠ পেরিয়ে এল। অত্যন্ত শব্দ করে গেটটা খুলে ফেলল তারপর অতিরিক্ত জোরে আঘাত দিল দরজায়।

[ক্রমশঃ

আমি কিন্তু একেবারেই একটুখানি নই,
মস্ত বড় এ সংসারের কেবল ঝক্কি বই।

[ফটো—শ্রীনীহাররঞ্জন মল্লিক

বাণিজ্য-নীতি যাহাই হউক না কেন, যতদিন পর্য্যন্ত জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার এবং সমগ্র কৃষকবৃন্দ বৎসরের মধ্যে সাত মাস পরিশ্রম করিয়া সমগ্র কৃষক-পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের অথবা তন্মূল্যের তিন গুণ পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত জনসাধারণের অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি দূরীভূত হইতে পারে না।

বঙ্গশ্রী—অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার একদিক

অধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা বা বুনিয়াদি শিক্ষা-পদ্ধতি এ দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা। ১৯৩৮ সালে গান্ধীজীর প্রেরণায় এটি রচিত হয়। এর মূল কথাগুলো এই :—

সাত থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত—এই সাত বছর—প্রত্যেককে আবশ্যিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এতে ইংরাজী শেখানো হবে না। তার পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী শিখতে হবে। আর বাকী সব মাতৃভাষাতেই শেখানো হবে। শিক্ষার মূলসূত্র হবে পরস্পরের সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। এই সহযোগিতা মূর্ত্ত হবে কর্ম্মের মধ্য দিয়ে। তাই ছেলেমেয়েরা সব একসঙ্গে খেলবে, এক সঙ্গে কাজ করবে। সব চেয়ে প্রধান কথা প্রত্যেককে একটা বিশেষ শিল্প শিখতে হবে। এবং এই শিল্পকেই কেন্দ্র ক'রে তাকে অন্যান্য পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করিতে হবে। ধরুন, যদি কেউ শিল্প হিসাবে 'তাঁত বেছে নেয়, তবে এই 'তাঁতশিল্প'কেই উপলক্ষ্য করে তাকে ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, সাহিত্য প্রভৃতি শিখতে হবে। যেটুকু এই উপলক্ষ্য ক'রে শেখানো যাবে না, সেটুকু অবশ্য সাধারণ ভাবে শেখানো হবে।

ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনার অনেক ব্যবস্থাই অতি চমৎকার। এই যে সাত থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারিত করা হয়েছে—এ অতি বিবেচনা-প্রসূত। সাত বছর বয়সের আগে অক্ষরজ্ঞান হতে পারে সত্য, কিন্তু একটা বিষয় হৃদয়ঙ্গম করবার মত শক্তি ছেলেদের হয় না। আর চৌদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, এই সময়টাতে তাদের বয়ঃসন্ধিকাল যায়। এ অবস্থাটা দুর্ব্বার অবস্থা। এই বয়সটাতে বিদ্যালয়ের পরিবেষ্টনে থাক্‌লে, তাদের পক্ষে শুভই হবে।

তবে সাতবছরে কতখানি শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'বে—সেটা একটা চিন্তার বিষয়। গান্ধীজী অবশ্য মনে করেন—ম্যাট্রিক পাশ ক'রে, দশবছরে ছেলেরা যা শেখে, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার ফলে সাতবছরেই তারা তা শিখ্‌বে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেশীই শিখ্‌বে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তো মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা হ'য়েছে। কিন্তু দশ বছরেও ছেলেরা শিক্ষণীয় বিষয়গুলো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারছে কি-না সন্দেহ। সেইজন্যই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়-পরিষদ্ এগার বছরে ম্যাট্রিক শিক্ষার কথা তুলেছে।

গান্ধীজী শিল্পশিক্ষাকে মুখ্য স্থান দিয়েছেন তিনটি কারণে। প্রথমতঃ, হাতের কাজকে যাতে লোকে ছোট ক'রে না দেখে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পদ্রব্য বিক্রী ক'রে যে অর্থ আস্‌বে, তার ফলে প্রত্যেক বিদ্যালয় স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠ্‌বে। তৃতীয়তঃ, হাতের কাজের মধ্য দিয়ে ছেলে-মেয়েদের মানসিক বৃত্তিরও বিকাশ ঘটবে। এ-সবের বিরুদ্ধে কিছু বল্‌বার নেই। তবে শিক্ষাকে এত বেশী শিল্পকেন্দ্রিক করলে, কিছু অসুবিধা অবশ্যম্ভাবী। প্রথম কথা, এত শিল্পজানা লোক করবে কী? দেশে তো শিল্পীর অভাব নেই ; তাদেরই অন্নবস্ত্র জুট্‌ছে না। তা ছাড়া কল-কারখানা না বাড়ালে, হাজার হাজার শিল্পজানা লোক বেরুলেও কোন কাজ হবে না। প্রচুর কল-কারখানা ও শিল্পব্যবসায়ের সুযোগ থাক্‌লে, শিল্পশিক্ষা ব্যতিরেকেও ফল ভাল হবে। তা না হ'লে, শিল্পশিক্ষার প্রভূত ব্যবস্থা ক'রেও কোন ফল হবে না। যদি কেউ বলেন যে, তারা কলকারখানায় যোগদান করবে কেন? —তারা গড়বে কুটীরশিল্প। কিন্তু কুটীরশিল্পের উৎপাদন কখনও যন্ত্রশিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে পারে না।

শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটা কথা বল্‌বার আছে। যদিও শিল্প-শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন অবশ্য-স্বীকার্য্য, তবুও এমন ছেলেও আছে যাদের শিল্পের দিকে কোন মন নাই। এমন কি ঘোরতর বিরাগই আছে। অথচ সে সব ছেলেকে যদি সাধারণ শিক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তবে সে এককালে হয় তো একটা বড় কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, অধ্যাপক বা দার্শনিক হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু জোর ক'রে তাকে যদি একটা শিল্প শেখানো হয়, তবে তার ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয় প্রতিভার বিকাশে সেটা একটা শোচনীয় বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে। এখনও এই ধরণের ব্যাপার অনেক ঘটে। আই-এস্‌-সি পাশ ক'রলে সব লাইন খোলা থাকবে, এই-জন্যে অনেক অভিভাবক কিছুমাত্র বিবেচনা না ক'রেই ছেলেকে বিজ্ঞান-কোর্সে ভর্ত্তি করিয়ে দেন। কিন্তু এমন ছেলে আছে, যাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশের প্রতি রীতিমত বিরাগ এবং অঙ্ক, বিজ্ঞান এ-সব ভাল লাগে না। ফলে তাদের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় না। অনেক সময় এই-জন্য ভাল ভাল ছেলেদেরও পরীক্ষায় শোচনীয় ফললাভ করতে হ'য়েছে। শিক্ষার কাজ প্রত্যেকের নিজস্ব মানসিক বৃত্তির বিকাশে সাহায্য করা। যাদের সাহিত্য, কলা, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি অশিল্পীয় বিষয়ের দিকে মন, বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থা তাদের প্রতিভার স্বাধীন বিকাশে একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করবে—যদি না পরিকল্পনার মধ্যে এই বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা করা হয়।

স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস

শ্রীসুশীল চন্দ্র দাস

স্বতঃস্ফূর্ত্ত কবিত্বশক্তি নিয়ে ভাওয়ালের গোবিন্দদাস পরিবর্ত্তন-যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দুঃখ-দৈন্য ছিল এ-কবির আমরণ সঙ্গী। ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর কাব্যকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। কল্পনাবিলাসী মন নিয়ে কবি কাব্য সাধনা করেন নি—তাঁর প্রায় অধিকাংশ কবিতাই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। সেই জন্য তাঁর সৃষ্ট কাব্য এতটা জীবন্ত, প্রাণস্পর্শী। পাহাড়ী ঝর্ণার জলের মত স্বচ্ছ তাঁর কবিতা—পাষাণের গায় ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সুন্দর সুর ওঠে ঝর্ণার জলের—তেমনি তাঁর জীবনের যত নিরাশা তাঁর কবিতাকে দিয়েছিল মধুর ছন্দ-সুর। ফুলের মত বিকশিত হয়ে ওঠে তাঁর কবিতা-গুচ্ছ বাংলার বাতাসে, দিকে দিকে ছড়ায় আনন্দ-সুবাস। বাংলার নদীর মত এ-কবির কবিত্বপ্রবাহ তার পথ করে চলেছিল। বিদেশী সাহিত্যের কোন ছায়াই পড়েনি তাঁর কাব্যে—তাঁর কাব্য বাংলার কাব্য; বাংলার আবেষ্টনের মাঝেই এর জন্ম, বাংলার মাটির খাঁটি রসে পরিপুষ্ট। কৃত্রিমতা বা পাণ্ডিত্য কোথাও নেই তাঁর কবিতায়, কবি-জীবনের অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহজ প্রকাশ এতে—তাই তিনি স্বভাব-কবি।

নির্ঝরের অবিরাম গতি-প্রবাহের ন্যায় তাঁর কবিতার স্রোত প্রবহমান। সরল শব্দচয়ন, মধুর ধ্বনি, রচনার ভঙ্গীতে খাঁটি বাঙালী মনের স্পর্শ, কবির অনুভূতির সর্বত্র সহজ বিকাশ—পড়তে কোথাও বাধে না। কবি বাজিতপুর বিলের ছবি আঁকছেন বাংলার বর্ষার পল্লীর সঙ্গে যার পরিচয় আছে—তার কাছে এ-ছবি বাস্তব (Realistic) বলে মনে হবে।

বরষার বিল,
এমন পবিত্র স্থান, বাতাসে জুড়ায় প্রাণ,
অজানা অবশে করে হৃদয় শিথিল।
পানা, জল, ঘাস গাছে, কত কি মাধুরী আছে,
ভুলাইছে একেবারে ভুবন নিখিল।
ডাকে জলচর পাখী, দাম দলে থাকি থাকি;
এত কি ললিতে গায় বসন্তে কোকিল?
সন্ধ্যার ললাটে হাসে অর্দ্ধচন্দ্র এক,
রজত-সলিলে ভাসে শশী সহস্রেক।
ঘাসের ছায়ার গায়; কুমুদী হারায়ে যায়
সাঁতারিয়া শশী যেন খুঁজিছে অনেক।
কি সুন্দর লুকোচুরি, জানে এ কুমুদী ছুঁড়ী,
লগে লগে থেকে ধরা দেয় না বারেক।

'শ্রাবণ' কবিতায় আছে—

ঝুম্ ঝুম্ গুম্ গুম্ গুরু গরজন,
চল চল ছল ছল উছলে শ্রাবণ।
নাহি পথ নাহি ঘাট,
ডুবিয়ে গিয়েছে মাঠ,
অবিরল নবজল ঘন বরষণ।

'শরতের ঊষা' কবিতায় কবি কয়েকটি মাত্র কথার সাহায্যে প্রকৃতির কি নয়নাভিরাম একখানি ফটোগ্রাফ নিয়েছেন—

শরতের সোণা ঊষা ঘুম ভেঙ্গে চায়,
জগৎ ভিজিয়ে আছে শিশিরের জলে,
সুন্দর সবুজ মাঠ কিবা শোভা পায়,
সাদা পুঁতি গাঁথা যেন শ্যামল অাঁচলে।

কবি তাঁর জন্মভূমির শোভা এমন নিখুঁত সুন্দরভাবে এঁকেছেন, যার ছাপ প্রত্যেক কাব্য পাঠকের মানস-চক্ষেই চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

দিগ্ দিগন্ত আছে ব্যাপি
ঊর্দ্ধে উঠছে আকাশ ছাপি
হাজার হাজার গজার বনের সবুজ শোভারাশি,
সিন্ধু যেন শ্যাম তরঙ্গে
খেলছে বনের অঙ্গে অঙ্গে
শীত বসন্তে সমান শোভা ফেন পুষ্পহাসি।
বনভরা সব যত টিলা
মাথায় আছে আকাশ মিলা
মরকত-মন্দিরের মত শোভা পত্রকাশি
ঝাঁকে ঝাঁকে মেলে পাখা
উড়ছে মায়ের শ্বেত পতাকা
বৈশাখ মাসে বকের শোভা দিক্ দিগন্তে ভাসি।
শুকনা বিলে শুকনা খালে
বন-বরাহ পালে পালে
খুঁজছে শালুক পদ্মনালে সলিল-পিপাসী
বৈশাখে চাতকের ডাকে
নবীন জলদ থমকে থাকে
বনবালা পূজছে দিয়ে ভাটি ফুলের রাশি।
বর্ষাকালে বেলাই বিলে
শাপলা শালুক সুন্দী মিলে
কমল বনে ফুটে উঠে কমলার সে হাসি
ভারতী কি স্নেহের ভরে
বীণা রেখে কবির করে
পদ্মসরে হয়ে আছেন পদ্মবনবাসী।

নারী সম্বন্ধে তিনি অনেক কবিতাই লিখেছেন। যদিও এ ধরণের অধিকাংশ কবিতাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত, তবুও নারীজাতিকে কবি যে উপেক্ষার চক্ষে দেখেন নি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্বরূপ একটি মাত্র কবিতার উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে মনে করি। নারী পুরুষের শুধু ভোগের নয়, নারীর সাহায্য পুরুষকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে চলে। পথের যত বাধা-বিঘ্ন সবই কণ্টকশূন্য হতে পারে। যে পুরুষ নারীর সহায়তা একবার লাভ করেছে, তার আশ্রয়ে পুরুষ পাবে অভয় জীবন।

ধর্ম্মের সহায় নারী তপস্তার প্রাণ
সিদ্ধির সাধনা নারী, যাগ যজ্ঞ সব তারি,
তাহার সাহায্য বিনা মিলে না নির্ব্বাণ ?
জননী, ভগিনী, নারী, নারী সমুদয়,
বিপদে বন্ধুর মত, উপদেশ দেয় কত,
শীতল ছায়াটী যেন বুক ঢেকে রয়!

কিন্তু নারী-মনোবিজ্ঞান দুর্জ্ঞেয়, সেই সত্য তিনি তাঁর 'নারী-হৃদয়' কবিতায় বলে গেছেন।

কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
কতকাল চক্ষু খেয়ে, দেখিলাম চেয়ে চেয়ে,
পাইনি তোমার বুকে প্রবেশের দ্বার!
কতকাল দিনে রেতে, রহিয়াছি কান পেতে
পারি নি প্রাণের কথা কভু শুনিবার!

কবি-চিত্তের সমস্ত একাগ্রতা, সারা প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রিয়তমাকে ভালবেসে ফেলেছেন। এখন একান্ত নিঃস্ব হয়ে প্রিয়ার সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষায় কবি ব্যাকুল। তিনি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছেন।

বাকী নাই—যা করেছি—এই শেষ তার,
বল কি করিব আর ?
পাইতে তোমার মন,
কি না করিয়াছি বল,
বল দেখি প্রিয়তম! কি করিব আর ?
দেখাব চিরিয়ে বুকে,
আছে কিনা একটুক,
অনাদর—অবিশ্বাস, হৃদয়ের তল,
আর দেখাইব শিরা ছিঁড়িয়া সকল!

মাত্র কয়েকটি কথায় কবি তাঁর প্রিয়ার ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

শুনিয়া হাসিল প্রিয়া,
বদনে অঞ্চল দিয়া,
অর্দ্ধনিমীলিত চারু-নব-নীলোৎপল,
লাজে অবনত মুখে নিরখে ভূতল!

কবির ভালবাসা পূর্ণতা লাভ করেনি বলে খেদ করে বলছেন,

দেবি, তোমার আমার!
আশা ভালবাসা যত, সকলি জন্মের মত,
অপূর্ণ রহিল, পূর্ণ হইল না আর,
শুধু হাহাকার করি, জলিয়া পুড়িয়া মরি,
আর ত হবে না আহা দেখা দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার!

যক্ষ মেঘদূতকে দিয়ে তার প্রাণ প্রিয়ার কাছে তার মনের গভীরের বার্ত্তা পাঠিয়েছিল। আমাদের নির্ব্বাসিত বিরহী কবিও শশীকে নিযুক্ত করছেন তাঁর প্রিয়ার কাছে মনের ব্যাকুলতাভরা কথা পৌঁছে দিতে।

দেখিলে বলিও শশি সেই রমণীরে,
সেদিন করিয়ে ভুল, নিয়েছি যে যুঁইফুল,
ভাসায়ে এসেছি তাহা 'চিলাইর' নীরে!
তার কওয়া যত কথা, হাসি অশ্রু ব্যাকুলতা,
নিয়ে যাও নিয়ে যাও, দিও তারে ফিরে!
ভালবাসা যত তার, কিছুই নাহি সে আর,
আপনি সে ফিরে নিছে ক'য়ো রমণীরে!
যা আছে—বিরহ আছে, দিতেছি তোমারি কাছে,
বাঁচায়ে রেখেছি তাহা আঁখিনীরে নীরে!
নিয়ে যাও নিয়ে যাও, দিয়ো তারে ফিরে!

দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতি কবি ও তাঁর প্রিয়ার পরস্পরের পরিচয়ের মাঝে বিস্মৃতির আবরণ টেনে দিতে পারে। কিন্তু অনাগত কালে যদিই তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে, তাই কবিমনের জিজ্ঞাসা—

ভুলিবে যেদিন, প্রিয়ে ভুলিবে যেদিন,
পাষাণ হইতে তব হৃদয় কঠিন,
সেদিন কালের বশে হ'লে দেখাদেখি'
জিজ্ঞাসিব দুইজনে "চেন কি ? চেন কি ?"
ক্ষুদ্রতম সে কুটীরে, সেই সরসীর তীরে,
হইয়ে কৌতুকী,—
জিজ্ঞাসিবে প্রতিধ্বনি, "চেন কি ? চেন কি ?"

কবির 'এই এক নূতন খেলা' কবিতাটি কোন কোন সমালোচকের কাছে অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এও কি সত্যি নয় আধুনিক অনেক প্রেম-কবিতার নগ্নতা চমকপ্রদ কথার যাদু-স্পর্শে ঢাকা পড়ে আছে।

ভালবাসায় আধ্যাত্মিকতা কি থাকতে পারে কবি তা জানেন না। তাঁর ভালবাসা পৃথিবীর নর-লোকের ভালবাসা। পবিত্র প্রীতি কাকে বলে, আত্মায় আত্মায় যোগে কি আনন্দ আছে, তা কবির অবিদিত। তাঁর

ভালবাসায় আছে কামের পূর্ণ ছাপ—আছে জীবের আদি-ধর্ম্মের বিকাশ। কবি লোকনিন্দার জন্য সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাই অকপটে বলতে পেরেছেন—

আমি তোরে ভালবাসি অস্থি-মাংস সহ,
অমৃত সকলি তার মিলন বিরহ!
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেম-কথা,
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ!

রবীন্দ্রনাথের গভীর আধ্যাত্মিকতার প্রভাব গোবিন্দদাসের কবিতায় একান্তই বিরল। কীর্ত্তিনাশার বর্ণনাতে নবীনচন্দ্র "মানবের ভীষণ শিক্ষক" বলে আক্ষেপ ক'রে জীবন-তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। সেখানে কবিত্বের প্রবাহ সহজ প্রকাশধর্ম্মী গতি পায় নি। এই কীর্ত্তিনাশার বর্ণনাতে গোবিন্দদাসের কবিতা কোথাও তত্ত্বের কঠিন স্তূপে আঘাত লেগে গতিমন্থর হয় নি।

বিস্তীর্ণ বিশাল পদ্মা বিনাশ-অক্ষরে,
সৈকতে লিখিয়া যায় গত ইতিহাস,
হংস বক কাদা খোঁচা বালু চরে চরে,
পদচিহ্ন পরিশিষ্ট করিছে প্রকাশ।

*

বল্লালের দগ্ধ অস্থি ভস্ম কোহিনূর,
তোমারি পথের ধূলি হে বিক্রমপুর!

কবি নিজের জীবনে পেয়েছিলেন কঠিন দারিদ্র্যকে, তাই তাঁর কবিতা বাঙ্গালীর প্রতিদিনকার কবিতা, বাঙ্গালীর মর্ম্মের কবিতা। রবার্ট বার্ণসের সঙ্গে এদিক দিয়ে গোবিন্দদাসের কাব্যের মিল দেখা যায়। বার্ণস্ ছিলেন কৃষকের ছেলে—দুঃখ-দৈন্য তাঁর জীবন-সাথী ছিল। তারই ইতিহাস তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছিল।

স্বদেশহিতৈষিতার পবিত্র-মন্ত্রে গোবিন্দদাসের প্রাণ দীক্ষিত ছিল। তাঁর জীবনের বিনিময়ে যদি দেশের কল্যাণ করা সম্ভব হয়, তিনি তার জন্য জীবন দিতে মোটেই কুণ্ঠিত হবেন না। তাঁর কণ্ঠে সেই বাণীই শোনা গিয়েছিল—

ভাওয়াল আমার অস্থি-মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তাঁর নির্ব্বাসিত অধম সন্তান।
বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুঃখ-নিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পুরি,
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান।

"কালীয়দমন" কবিতায় স্বাদেশিকতারই চরম প্রকাশ দেখতে পাই। তিনি ঘৃণিত ভাবে জীবন যাপন করতে পারেন না। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁর নির্ভীক অভিযান। অপর ভীরুর মত পলায়নতৎপর হবেন না।

দেশ নাশে দস্যু চোর,
কারো নাই গায়ে জোর,
সবাই মূষিক গর্ত্ত কর অন্বেষণ!
পৃথিবী বিদারে যাতে,
সে লাঙ্গল আছে হাতে,
পার না শত্রুর বক্ষ করিতে কর্ষণ?
বিদেশীরা নানা ছলে,
ভীরু কাপুরুষ বলে,
কেমনে সহিছ বল এত কুবচন?
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন?

*

আমি দৈত্যদর্পহারী,
আমি দৈত্য ধ্বংসকারী,

*

ঝাঁপায়ে কালিন্দীজলে,
বিষহ্রদে কুতূহলে,
মহাবলে কালীয়েরে করি আকর্ষণ,
চরণে চূর্ণিব শির,
ক্রূর সর্প সে পাপীর;
নাকে-মুখে ফেনরক্ত করিবে বমন!

"নববর্ষ" (১২৯১) কবিতায় কবি ভারতের দুর্ভিক্ষ, অসংখ্য লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য রোগশোক—তাদের ওপর বিদেশীয় এবং স্বদেশীয় শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থবাদীদের অবর্ণনীয় অশেষ অত্যাচারের কথা মুক্ত কণ্ঠে বলে গেছেন।

নববর্ষ!
তব আগমন ফল বলহ বিশেষ,
সেদিন নাহিক আর, তেজবীর্য্য গরিমার,
আগে ছিনু সিংহ রাশি, আজি মোরা মেষ!

*

কারে সিংহাসন দিয়া, কোহিনূর পরাইয়া
কোন্ চণ্ডালেরে তুমি করিলে নরেশ?
কারে বা করিলে মন্ত্রী, কোন্ শনি মড়যন্ত্রী,
আরো কি নূতন ট্যাক্সে প্রজা হবে শেষ?

*

আরো কি চাষার প্রাণ, নিত্য করি বলিদান,
তুষিবে হে জমিদার রাক্ষস-বিশেষ?

"নববর্ষ" (১২৯১) দ্বিতীয় কবিতায় কবি গেয়েছেন সাম্যের গান। যে জাতিভেদ আমাদের উন্নতির পথে বাধা-স্বরূপ, পরস্পর অনৈক্যের মূলে সক্রিয়, তার উচ্ছেদ কবি কামনা করেছেন। জাতিগত, সম্প্রদায়গত ভেদা-

ভেদ ভুলে ভারতবাসী এক-গোষ্ঠীভুক্ত হতে পেরেছে, কবি তা দেখবার জন্তে মন-প্রাণের সমস্ত ঔৎসুক্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন—তা দেখে নয়ন সার্থক করবার জন্ত।

সমগ্র-ভারতে সাম্য করুক বিরাজ,
না থাকুক পরস্পরে উচ্চ নীচ ভেদ,
নয়ন সফল হয় যেন দেখি আজ
না আছে ভারতবর্ষে জাতীয় বিচ্ছেদ।

কবি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা যা দেখেছিলেন তা "চীন-জাপান যুদ্ধ" (১৩০১) কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। রাজনীতিতে যে তিনি অজ্ঞ ছিলেন না তারই প্রমাণ এখানে পাই। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আজ প্রতিটি অক্ষরে মিলে গেছে।

"আমরা হরিহর" কবিতায় কবি জাতিভেদ, ধর্মাধর্ম, বর্ণ-বৈষম্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে ভারতমাতাকে পরাধীনতার নিগড় হ'তে মুক্ত করবার জন্ত সকলকে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। যে দিন ভারত-সন্তান সকলে মিলে ভারতমাতার সেবায় ব্রতী হবে সেদিন আর পরাধীনতার নাগপাশ থাকবে না।

আমরা হরিহর

আমরা বঙ্গ আমরা আসাম,
হোক্ না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সদিয়া সিন্ধু সেতু-রামেশ্বর,
আমরা নাগা আমরা গারো,
কেহই ত পর নাহি কারো,
খড়গী বর্গী গুর্খা জাঠ্ আর পার্শী সওদাগর,
পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা?
কেউ বা কালো কেউ বা রাঙ্গা একই কলেবর,
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্ত-মাংস আমরা পরস্পর।

"বাঙ্গালী" কবিতায় কবি যে ভাবে স্বজাতি-চরিত্রের সমালোচনা করেছেন তাকে অত্যুক্তি বলা চলে না। Grim satire হলেও আমরা নিজ চরিত্র যদি নিরপেক্ষ ভাবে নিজেরাই অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করি, তবে দেখব কোথাও অতিরঞ্জিত করে আমাদের হীন প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস কবি দেখান নি।

বার্ণস্ কৃষক-জীবনের নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলছেন তাঁর কবিতায়, তাই তিনি সর্বহারাদের প্রিয় কবি। তাঁর কবিতায় নৈরাশ্যের সুরই দেখতে পাই। গোবিন্দদাসও কঠিন দারিদ্র্যের কশাঘাতে পিষ্ট হয়ে জীবনের যাত্রা-পথে চলেছিলেন। প্রতিবেশী দরিদ্র বাঙালীর কাহিনী নিয়েই তাঁর কবিতা সৃষ্টি। নিরাশার ছাপ মাঝে মাঝে থাকলেও ব্রাউনিং-এর মত বলিষ্ঠ মনের পরিচয় তাঁর অধিকাংশ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবি তাঁর লেখনী ধরেছিলেন। যে নির্মম সমাজ-ব্যবস্থা হিন্দু বালবিধবাদের জন্ত করা হয়েছে তার প্রতিবাদে ব্যথিত কবি বলেছেন,

অবোধ বালিকা মেয়ে শরৎ আমার,
মুটি মুটি দু'টী দু'টী খায় কতবার!
নাহি বোঝে কিবা ধর্ম্ম, নাহি বোঝে কিবা কর্ম্ম,
কেবল সরল সত্য প্রাণে আপনার!
হায়রে তাহারি জন্ত, একাহার হবিষ্যার,
একাদশী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বিধাতার।
যোগিনী তাপসী বেশ, কর্কশ চাঁচর কেশ;
হায় কি ধর্ম্মের শেষ এই অবলার?
ধিক্, ধিক্, নাহি লাজ, হা ভারত! হা সমাজ!
কি পাপে এ অধঃপাত হয়েছে তোমার?

তদানীন্তন কবি হেমচন্দ্রের কবিতায়ও ঐ বেদনাভরা উক্তি দৃষ্ট হয়। সুরেন্দ্র মজুমদারের মহিলা-কাব্যে এই প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে। দীনেশ চরণ বসুর "তুই কি বুঝিবি শ্যামা মরমের বেদনা" কবিতার সঙ্গে এখানে তুলনা করা চলে।

পাণ্ডিত্যের দিক থেকে বিচার করলে গোবিন্দদাসের অনেক কবিতার হয় ত তেমন মূল্য থাকবে না, কিন্তু তার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যাবে না।

কবির "দিগ্বিজয়ী বীর" কবিতাটি Personal impersonal বলা চলে। তাঁর স্ত্রী প্রমদাকে নিখিল মাতৃ-জাতির এবং পুত্র ভোলাকে বিশ্বের সকল শিশুর প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এঁকেছেন।

মধুসূদনের কাছে কপোতাক্ষের ন্যায় গোবিন্দদাসের কাছে "চিলাই" নদী। এই চিলাইর নাম তাঁর কত কবিতারই না স্থান পেয়েছে।

কবি ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায়ও পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সে-সময়কার কোনো পত্রিকাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর "কংগ্রেস" কবিতাটি পড়লেই তা বোঝা যাবে। "হুঁকা" একটি হাস্যরসাত্মক কবিতা।

কি তপস্যা কোন্ ব্রত কোন পুণ্যফলে
পবিত্র ভারতবর্ষে লভিলি জনম?
সমাদরে চুম্বে তোরে মানব-মণ্ডলে,
জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে,—এ কি ভাগ্য কম!

যে প্রিয়জন একান্তই আপনার তাকে অন্যের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে দেখলে হৃদয়ের যে ঈর্ষ্যার উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক, তারই ছবি গোবিন্দদাসের "সতিনী" কবিতায় দেখি।

কবি কত সুন্দর ভাবেই না গল্প করতে জানতেন। তাঁর এই অভিনব সংলাপ কোন্ শিশু-মনকে না আকৃষ্ট করবে? এত সহজ করে বলার শক্তি খুব কম কবির মাঝেই দেখতে পাবে।

এক যে আছিল মেয়ে, সে খেলিত বনে যেয়ে,
　　　　সাজিত সে বনরাণী ফুলে ফুলে ফুলে,
তুলিয়া যূথিকা বেলী, তমালের গাছে হেলি,
　　　　গাঁথিত ফুলের মালা ফুলের আঙ্গুলে।
এক যে আছিল ছেলে, একদিন সেথা এলে,
　　　　দেখিয়া সে ফুলমালা বালিকার হাতে,
হাসিমুখে হাত মেলে, আনন্দে চাহিল ছেলে,
　　　　দিল না বালিকা, মুখ ফিরাল পশ্চাতে।
তারপর সেই মেয়ে, তেমনি বাগানে যেয়ে,
　　　　রোজ মালা গাঁথে কিন্তু পারে না গলায়,
জড়াইয়া পাকে পাকে, তমালের ডালে রাখে,
　　　　এইরূপে কত মালা শুকাইয়া যায়।

"নির্ব্বাসিতের আবেদন"এ কবি গোবিন্দদাস দেশবাসীর কাছে করুণ প্রার্থনা জানিয়ে সুবিচার চেয়েছেন। আমরা দেখেছি তাঁকে বিশ্বদেবতার ধ্যানে বিভোর হয়ে থাকতে। পরম-পিতা পরমেশ্বরের কোলে স্বেচ্ছায় নিজেকে একটু আশ্রয়ের আশায় সঁপে দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

　　　　"আমি তোমার।"
নিঃশঙ্ক প্রাণে, নির্ভয় প্রাণে, মুক্ত কণ্ঠে,
প্রাণ ভরিয়া, মন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া,
আবার আজি তোমায় বলিলাম,
　　　　"আমি তোমার।"
শান্তিময় ঈশ্বর! প্রেমময় ঈশ্বর!
নিষ্ঠুর পাষাণ মানুষের মত,
করিও না ইহা অস্বীকার।

প্রবন্ধের যবনিকা টানতে যেয়ে কবি স্মরণে আমার মন-প্রাণের সকল প্রীতি-শ্রদ্ধা নিয়ে কবির ভাষায়ই আমার প্রণতি নিবেদন করছি।

সত্যই কবি কি মরে? বোঝে না অবোধ নরে,
কবি করে ত্রিদিবের নব আয়োজন,
আনন্দে অমর বন্দে কবির চরণ।

সাধকের সঙ্কল্প

শ্রীকরুণাময় মুখোপাধ্যায়

জপিছে সাধক নিজ মনে মনে, 'এ কেমন হ'লো ধারা'।
মাকে দেওয়া বলি, বুঝি সবে মোরা, নাহি দিই কেন ধরা?
রহিব লুকায়ে, কোথায় এ সময়ে? ঘুরি ফিরি আনমন,
জননীর ববে চলেছে কৃপাণ সব ঠাঁই সারাক্ষণ।
দুইদিন মাগো, হয় না ত পার, চাতালে লুটাবে শির,
নাহি কেন সাধি নিজে বলিদান, নিজে অসি ধরি ধীর?
ব্রহ্মময়ীর উপাদান মোরা গড়িতে তাঁহার পুতুল নানা,
প্রহর পোহাল বৃথা কেন বল, সাধিতে তাঁহার কাজেতে হানা।
বলিদান যবে হবে সমাধান নাহিক তাহাতে ভুল,
মা মা রবে মাগো আছাড়িয়া পড়ি কেন না হইতে ধূল।
করালিনী কালী ছেদিবার আগে মুঠায় ধরিয়া চুল,
কেন বা সাজিব চরণের পথে চন্দন মালা ফুল?
কেন নিবেদন, বাঁধন, তোষণ, ছেদনের হুড়াহুড়ি?
নিজে বলি দিব যাই সরাসরি, চল যাই সারি সারি।
মঙ্গল মোর করতলগত জান এই বলি সার,
কে মোরে পালিবে, বাঁধিবে সঁপিবে মায়ের চরণে তার।
মরিবার এর আছে অধিকার, মারিবার বল কোথা?
কেন পিছাইয়া মায়ের কর্মে ঘনাইব মনোব্যথা?
মহাকালী হের মাতিছে সময়ে অশুভ সারাক্ষণ,
অশুভ নাশিছে, শিব না হেরিলে, কে রোধে এ ঘোর রণ?
করিছে যোজনা হরমনোরমা আপনি শিবের রাজ্য
ল'য়ে যত সাথি, রণঘোরে মাতি, নাশিতেছে পাপ ত্যাজ্য।
যতদিন ভবে উজলি না শোভে নবীন সুপ্ত কাশী,
প্রেতিনী ডাকিনী নাচিবে হাসিবে, পারে কি থামিবে অসি?
যবে পড় পড় শিব পরে খাড়া অশিবের নাশ হেতু,
স্তুতি মঙ্গল নিবারিবে অমা, সাঙ্গ হইবে ক্রতু।
অশিবনাশিনী শিববিলাসিনী দলিত না করি শিবে,
শিবমাঝে শেষে মগন রহে যে মঙ্গলময় ভবে।
সমাহিত চিতে না হেরিয়া ভিতে আপনা করবে দান,
হ'লে শবাসনা পূর্ণ বাসনা অশুভে পাইবে ত্রাণ।
স্মরিতে মিটাব যতই কামনা আপনা করিয়া দান।
ভত না স্মরিতে মায়ের মিলাবে ছিন্ন মস্তা ভাণ।

প্রশ্ন

শ্রীঅরুণেন্দ্রমণি দত্ত

ট্রেণে দেখা। আমাদের গাঁয়ের কবিরাজ ম'শাই-এর সঙ্গে।

বৃষ্টির জন্ম দেরী হ'য়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে এসে উঠতে উঠতেই ট্রেণ দিল ছেড়ে। সঙ্গে মালপত্র বেশী ছিল না, আমার ছোট পুটলিটা হাতে করে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

বেশ ভিড় হয়েছে গাড়ীতে। নানা রকমের লোক-জনে সমস্ত কামরাই প্রায় ভর্ত্তি। ওদিকের বেঞ্চিতে একদল লোক খুব হাসি-ঠাট্টা করতে করতে চলেছে একটি নববিবাহিতা ছোট মেয়ে এক গলা ঘোমটার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে, লাজুক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইছে। তার পাশের লোকটার সর্ব্বাঙ্গে সস্ত সৌখীনতার হাসি। পরণে গরদের পাঞ্জাবী, মাথায় বড় বড় চুল, পিছনটা সাফ করে কামানো, হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে লোকটা বিড়ি টানছিল আর মাঝে মাঝে মৃদু হেসে আশেপাশে সকলের কথায় সায় দিয়ে ইসারায় বউটিকে দেখিয়ে দিচ্ছিল। বরযাত্রীর দল!—ওই বোধ হয় স্বামী নববিবাহিতা মেয়েটির? মাঝের বেঞ্চি কটাও ভরে গিয়েছে। ওদিকে দরজাটার সামনেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে। কিন্তু এত ভিড় তো হয় না কোনদিন! শনিবার,—কলকাতার চাকুরে বাবুরা বাড়ী ফিরছে বোধ হয়?

বাইরের দিকে তাকালাম। ট্রেণ চলেছে। দু'পাশেই চষা ক্ষেত। রাঙামাটি বৃষ্টি জলে কালচে মত হ'য়ে উঠেছে। দূরের শ্যামল বনরেখাও আর দেখা যায় না, টিপি টিপি বৃষ্টির মধ্যে সে সব অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বাইরের দিকেই চেয়ে ছিলাম। এমন সময় আমার নাম ধরে কে যেন ডাকলেন।

পিছন ফিরে তাকালাম, কিন্তু ঠিক চিনতে পারলুম না। আমাকে চেয়ে থাকতে দেখে তিনি আবার বললেন, "সিতু না? আমাদের দত্তপুলের নিবারণ চক্কোত্তির ছেলে? চিন্‌তে পারচো না? আমি তোমাদের গাঁয়ের কোবরেজ ম'শাই,—সিঁদরীণি দত্তপুলের বিষ্টু কোবরেজ?"

এইবার ঠিক বুঝতে পারলুম। আমাদের গাঁয়ের কবিরাজ ম'শাই। অনেক দিন পরে দেখা, তাই প্রথমটায় ঠিক চিন্‌তে পারি নি।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। পায়ের ধুলো নিতে যেতেই তিনি বাধা দিয়ে উঠলেন, "থাক, থাক, হ'য়েছে, বেঁচে থাক। প্রথমটায় ঠিক চিনতে পারো নি বুঝি?—হি, হি, আমি কিন্তু তোমায় ঠিক চিনেছি, দেখেই ধ'রেছি আমাদের নিবারণের ছেলে! দেশের লোক ত; তোমরা না হয় বাইরে থাক' ব'লে ভুলে যেতে পারো কিন্তু আমরা ত' আর তা পারি নে!...বসো, বসো বাবা,...কেষ্ট, পোটলাটা ওর হাত থেকে নিয়ে রাখ, বাবা বেঞ্চির তলায় কিম্বা বাক্সের ওপর...হ্যাঁ!"

একটি বছর দশবারোর ছেলে আমার হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে ওপরে তুলে রাখল। বেঞ্চির ওপর ছড়ানো পা-টা টেনে নিয়ে কবিরাজ মশাই বললেন, "আমাদের গাঁয়ের লোক রে কেষ্টা? নাও সিতু, ভালো হ'য়ে ব'সো।

বসলাম।

—"তারপর, খবর কি বল? তোমার মা ভালো আছেন? বাবা? তাঁর ত' মাঝে চোখের কি একটা গোলমাল শুনেছিলুম। ভালো হ'য়ে গেছেন? তা' ভালো। নিত্যানন্দের কৃপায় সব ভালো থাকলেই ভালো, বুঝলে না বাবা। দূরে থাক, খবর টবর বড় একটা তো পাইনে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি?"

"আমি?—হাঁ আছি। ঐ এক রকম; তেমন আর কই! কেটে যাচ্ছে কোন রকমে; সবই নিত্যানন্দের ইচ্ছা।। তা যাক, এখানে কোথায় এসেছিলে?"

"ছোট্‌দির শ্বশুরবাড়ী।"

"ও ছোটদি; মানে, তোমার দাদার পরে যে বোন?—ফুটু; ফুটুর শ্বশুরবাড়ী?"

"বললাম, "না, ফুটু ত' আমার বড়দির নাম। অনিদি'র—

"হাঁা, হাঁা! ভুলে যাই সব, "বাধা দিয়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "অনি, অনিই ত' তোমার ছোটদির নাম না? তারই বুঝি বিয়ে হ'য়েছে দমদমায়?...জামাই কি ক'রে? ফ্যাক্টারীতেই বুঝি? ও, তা ভালো! "যাক, এখন চ'লেছ কোথায়,—দত্তপুলে? এবার কিন্তু অনেক দিন পরে যাচ্ছ সিতু। তোমরা এসেছিলে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, গেল বছরের আগের বছর ভাদ্দর মাসে, না?"

বললাম, "হাঁ ঐ ভাদ্দরের শেষাশেষি বোধ হয়।

"হি-হি-হি, কবিরাজ ম'শাই হেসে উঠলেন, "ঐ হোল; দেখেছ, সিতু এখনো মনে আছে আমার, সব মনে থাকে আমার। হি-হি—"

কবিরাজ ম'শায়ের এই সামঞ্জস্যহীন হাসিটা কেমন যেন বিসদৃশ ব'লে মনে হচ্ছিল। এর আগে ওঁকে দেখে-

ছিলুম গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ; নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা কইতেন না। আজকে হঠাৎ এমনি প্রাণখোলা হাসির মধ্যে ওঁকে দেখে একটু অবাক্ মত মনে হোল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনিও ও' দেশের দিকেই যাবেন?"

"দেশে মানে?" আমার দিকে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন, "তোমাদের দত্তপুলে?—না; না, দত্তপুলে না! ও'; ওখানে ও' যাইনে আমি আর" তারপর আগের মত হেসে বললেন, "হি-হি, বুঝলে, ও আর যাইনে, তা' ছাড়া, কি কত্তেই বা যাবো?"

একটু বিস্মিত হ'লাম। জিজ্ঞাসা করলুম, "যান্ না, কেন কাকীমারা কেউ নেই ওখানে?"

আমার কথাটা শুনে তাঁর মুখের হাসি কেমন যেন আস্তে, আস্তে মিলিয়ে গেল। চুপ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, "জানো না সিতু?—ওখানে ওরা ত' কেউ নেই, মানে তোমার কাকীমা-টাকীমা?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তবে?"

তিনি একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, "গেল পৌষমাসের মাঝামাঝি সে মারা গেছে বাবা!"

চমকে উঠলাম। কাকীমা মারা গিয়েছেন!

কবিরাজমশায়ের স্ত্রীকে আমরা কাকীমা বলতুম। বয়স এমন খুব বেশী নয়; গায়ের রঙ একটু ময়লা হলেও ভারি সুন্দর দেখতে ছিল তাঁকে। সব চেয়ে সুন্দর ছিল তাঁর মুখখানি; ডাগোর ডাগোর, টানা টানা দুটি চোখ আর লালিত্যপূর্ণ চিবুকের টানটি। মনে আছে, বেস্পতি-বারদিন লক্ষ্মীপুজো সেরে তিনি যখন আমাদের প্রসাদ দিতে আসতেন তখন মা তাঁর চিবুক ধরে বলতেন, "আহা, বৌমা আমার সাক্ষাৎ যেন লক্ষ্মীপ্রতিমা, হাতে করে প্রসাদ দিতে এসেছে, তা মনে হ'চ্ছে, মা যেন নিজে আসছেন আশীর্ব্বাদ করতে। মানুষ বলেই পার পেয়ে গেলে বৌমা, নয় তো ঠিক দেখতে ভাঁড়ার ঘরে পুরে চাবি দিয়ে দিতুম!" লজ্জায় কাকীমা মাথাটা একটু নীচু করতেন; হ্যারিকেনের অল্প আলোয়, তাঁর সেই সলজ্জ মুখ কী অপূর্ব্বই যে হ'য়ে উঠতো!—সেই কাকীমা কি না মারা গিয়েছেন? মনে আছে, গেল বার আমরা যখন দেশ থেকে চলে আসি, তখন গরুর-গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আমার হাত দু'খানি ধ'রে বলেছিলেন, "চিঠিপত্তর লিখবে তো বাবা? না, কি, গিয়েই ভুলে যাবে; কাকীমাকে তোমার ভুলো না, কেমন?" তারপর যতক্ষণ না কুশ-বেড়ের বাঁক ঘুরি; ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুটি সজল চোখ কী গভীর আগ্রহেই আমাদের গরুর-গাড়ীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছিল?"

কবিরাজমশাই মুখটা বাইরের দিকে ফিরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "তা হ'লে গোড়ার থেকেই বলি শোন বাবা।—

"অঘ্রান্‌মাসের শেষাশেষি, বাঁড়ুয্যেবাড়ীর মেয়ে নীতি?—তার বিয়ে হোল; বেশ ধুমধাম করেই হোল। খুব খরচপত্তর করলে সতীশ বাঁড়ুয্যে। আর কেনই বা করবে না বল, ঐ তো একটি মাত্তর মেয়ে! ক'লকাতা থেকে গড়ের বাজনা এলো, ঝিটকিপোতা থেকে মুটু ময়রার যাত্রার দল নিয়ে এলো, খুব হৈ হৈ কাণ্ড সারা গাঁয়ে। মুটুময়রার নাম শুনেছ তো?—শোন'নি! তা তোমরা আর কি করে শুনবে বলো, দেশে-ঘরে তো বড় একটা আসো না।—মুটু ময়রার দলের মত কেউ পার্ট করতে পারে না ওদিগের। খুব নামডাক তার; সিদ্রীনী, বাজিৎপুর ওদিকের বাঁশবেড়ে, আঁশমালি, পূর্ব্বনগর যত গাঁ আছে, মুটু ময়রার দলকে চেনে না—এমন লোক বোধ হয় খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তা সেই দলকে বায়না দিয়ে বাঁড়ুয্যেরা নিয়ে এলো।

প্রথম দিন তো যাত্রা হোল; ওদের বিয়ে-খাওয়ার ব্যাপারও সব চুকে গেল। তারপর শুনলুম গাঁয়ের লোকেরা বুঝি ঘরপিছু চাঁদা তুলছে, ময়রার দলকে দিয়ে আরও দু'দিন যাত্রা করাবে বলে।—সত্যি সিতু, ভারি চমৎকার পালা করেছিল তারা। আমি অবিশ্যি যাইনি, তোমার কাকীমারা সব গিয়েছিল; সুরুর দিন বাঁড়ুয্যেবাড়ী 'রাধিকের বিরহ' দেখে এসে বউ'এর সুখ্যাতি আর ধরে না! আমায় বল্‌লে, "তুমি দেখতে পেলে না,—কেষ্টকে হারিয়ে, রাধিকে যখন, "কোথা গেলে প্রাণনাথ, কোথা গেলে প্রাণনাথ বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তখন কার সাধ্যি চোখের জল চেপে রাখে! মজুমদারদের সেজ-খুড়িমার সে কি কান্না তাই দেখে, আহা, বুড়ি-মানুষ অত শত কি কিছু বোঝেন, সকলে ধরাধরি ক'রে শেষে ভেতরে নিয়ে গেল।'

সেদিন সারারাত জেগে যাত্রা দেখে এসেছে। বুঝেছো সিতু; তা' আমি বললুম, তা হোক আজ আর তোমার যেতে হবে না। শীতের রাত, হিম লাগিয়ে যাত্রা তোমার দেখতে হবে না।" শুনে তখন তো কিছু বললে না; রাত্তিরে আমায় পান দিতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলুম কি জন্যে। কি আর করি বলো, বললুম, 'যাচ্ছ যাও কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো, রাত জেগে হিম্ লাগিয়ে অসুখ বাধালে, আমি কিন্তু কিছু জানিনে।' তাই শুনে তাড়া-তাড়ি ও' চলে গেল, কিন্তু ফিরলে সেই তার পরের দিন

সকালবেলা। চোখমুখ তো একেবারে বসে গিয়েছে। বড় রাগ হোল, খুব বকলুম। আর তুমিই বলো বাবা, এতে কোন মানুষের আর রাগ না হয়? তারপর জানো ও' কি রকম অসুখের ধাত!—আমার বকুনি শুনে ও' সারাদিন মুখ ভার করে রইল; একটি কথাও বললে না। মাঝে একবার শুনলুম, পাশের বাড়ীর কাকে বুঝি ব'লছে, 'ও মিনু তোরা যাত্রা শুনতে যাবি না? নিমাই-সন্ন্যেসের পালা হবে আজ; আমার কি ইচ্ছেই যে ছিল যাবার; কিন্তু আজ আর আমার যাওয়া হবে না ভাই!' শারদার পিসি না কে, পুঁইশাক দিতে এসেছিল, শুনলুম, তাঁকেও আবার বলছে, 'ও পিসিমা, আপনারা পালা দেখতে যাবেন, আমার কাছ থেকেও কিছু 'প্যালা' নিয়ে যাবেন, যাবার সময়। আমার ত' আজ যাওয়া হবে না' আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে যে অতবার করে কথাগুলো বলতে লাগলো বুঝতে পারলুম। রাত্তিরে আমাকে খেতে দিলে। তারপর নিজে কিছুটি না খেয়ে একা আঁচল বিছিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর শুয়ে রইলো। আমার আবার সেদিন কুশবেড়ের বাবুদের ওখান থেকে ডাক এসেছে, লোক দিয়ে গাড়ী পর্য্যন্ত তাঁরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। যাবার আগে বেশ ভালো করেই বলে গেলুম, নিমাই-সন্ন্যেস আর যে সন্ন্যেসই হোক, যাত্রার ওখানে যেন না যাওয়া হয়। তা সে কথার কোন উত্তরই দিলে না, একা সেই অঘ্রাণমাসের হিমে চুপ করে দাওয়ার ওপর পড়ে রইল।

রাত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ওখান থেকে ফিরে এলুম। ফিরে দেখি তখনো ঠিক তেমন হয়েই শুয়ে আছে। যে জন্য অত করে বলে গেলুম, আমার ওপর গোঁ ধরে সেই হিমই লাগাল? বড় রাগ হয়ে গেল; রাগ হ'লে আমার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বাবা; ছুটে গিয়ে—

তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন। মুখটা ফেরাতেই চোখে-চোখি হ'য়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, "তারপর?"

আমার কথাটা যেন শুনতেই পান্‌নি, এমনভাবে বাইরের দিকেই তিনি কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, তারপর, না তারপর আর কি! রাগ ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার আগে শুধু দেখেছিলুম, কপালটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে! সারাটা দিন এখানে সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যের দিকে বাড়ী ফিরলুম। দেখি তখনো সে তেমন হ'য়ে শুয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে গিয়ে কপালটায় হাত দিলুম; দেখি গাটা আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে! আমার দিকে একবার আচ্ছন্নের মত চেয়ে আবার চোখ বুজলো!

তার পর শীতের রাতে শুয়ে থাকলে যা হয়!—বুকে পিঠে সর্দ্দি বসলো, আর সেই সঙ্গে জ্বর। দিন তিনেক পরে হঠাৎ কান্না জুড়ে দিলে বাপের বাড়ী যাবে! কি আর করি বল বাবা, চিঠি লিখলুম ওর বাপের বাড়ী বাঁশবেড়ে। বাঁশবেড়ে জানো তো? আমাদের ইছেমতীর ওপার থেকে কোশ ছয়েকের পথ! তা সেখান থেকে ওর ছোটভাই এসে নিয়ে গেল ওকে।

কোটের হাতটা দিয়ে চোখের জল মুছলেন, "ওখানে গিয়ে বোধ হয় দিন পাঁচেক ভালো ছিল, তারপরেই খবর পেলুম অবস্থা নাকি খারাপ, আমায় যেতে হবে। শীতকাল,তারপর আবার ক'দিন থেকে বাদলা নেমেছিল! জলকাদায় পথঘাট সমস্তই একশা, ওদের ওখানে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যে। একটা ছোট ঘর, শিয়রের দিকে টিম্‌ টিম্‌ করে পিদিম জলছে, চৌকির ওপর চুপ করে শুয়েছিল। অমন ত' চেহারা ছিল দেখেছিলে, কিন্তু কী যে হয়ে গিয়েছিল ওই কদিনের মধ্যে। আমি যেতেই হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে, আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরলো।—এটা কোন ইষ্টিশান গেল বাবা?"

বললাম" হালিসহর।"

কেষ্টকে জিনিষপত্রগুলি নামিয়ে রাখতে বলে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, শোন' সিতু, ও বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল আর বাঁচবে না, তাই সেদিন ওর অত কান্না, অত করে চোখের জল ফেলা!—সত্যিই আর সে ভালো হয়ে উঠলনা। আর সে আমার ওপর রাগ করলে না, অভিমান করলে না, যে নিমেই সন্ন্যেসের কাছে যাবার জন্য অত কান্না, অত কিছুই, তিনিই তাকে আজীবনের মত নিজের কোলে তুলে নিলেন।—

"ওকে যখন চিতের ওপর তোলা হয় তখনো দেখেছিলুম কপালের কোণে সেই কাটা জায়গাটা,—রাগের মাথায় আমি হ্যারিকেন ছুঁড়ে মেরেছিলুম, লাল রক্তটা জমাট বেঁধে তখনো কালচে মত হ'য়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "সে মারা যাবার পর গাঁয়ের লোকেরা, আবার আমায় বিয়ে করতে বলেছিল, কিন্তু সোনার প্রতিমাকে ছাই করে, বিয়ে আর আমি করবো না বাবা, কখনো নয়!—তার পর থেকেই," আগের মত হি, হি করে হেসে কবিরাজমশাই বললেন, "আর আমি যাইনে তোমাদের দত্তপুলে!—এই তো মাস আষ্টেক হোল বোধ হয় গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি।" বাইরের দিকে চেয়ে বললেন, "কি রকম মেঘ করেছে দেখছো? উঃ!—সকাল থেকে সেই যে দুর্য্যোগ আরম্ভ হ'য়েছে, তার আর যেন বিরাম-বিশ্রান্তি নেই, না?"

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললাম, "কাঁচড়াপাড়ার কোথায় যাবেন?"

"কাঁচড়াপাড়ায়?—আমার ছোটবোনের বাড়ী। ত সে বোন ত' এই কেষ্টকেই প্রসব করার সময় মারা গেল এতদিন আমার কাছেই ছিল, এখন ওকে দিতে যাচ্ছি ওর বাপের কাছে। বাপ অবিশ্যি আবার বিয়ে করেছে, একঘর ছেলেপিলে এখন।"

ট্রেণের গতি মন্দ হয়ে এলো। ষ্টেশন আসতেই কবিরাজ ম'শাই নেমে গেলেন।—যাচ্ছি সিতু? নিত্যানন্দ করলে আবার দেখা হবে' খন। আসি।

প্ল্যাটফরমের লোকজনের ভিড়ে কবিরাজ ম'শাই মিলিয়ে গেলেন।

ট্রেণ ছেড়ে দিল।

বছর কয়েক পরের কথা।

রাণাঘাটে গিয়েছি। ট্রেণ ছাড়বার দেরী ছিল, প্ল্যাটফরমের ওপর পায়চারি করছি। এমন সময় ওদিকের লাইনে আর একখানি গাড়ী এসে দাঁড়ালো। অনেক লোকজন উঠলো নামলো। একটি রোগা মত ছোকরা কিছু দূরে, একটা কামরার সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিল। পিছন থেকেই কেমন যেন চেনা, চেনা বলে মনে হোল। এগিয়ে যেতেই চিনতে পারলাম। বল্লুম, "কেষ্ট না?—ভাল আছ তো?"

বিড়িটা পিছন দিকে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলে ছেলেটি আমার দিকে অবাক্ হ'য়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তারপরেই পান-খাওয়া লাল দাঁতগুলি বের করে বললে "ও আপনি—সেই তো সেবার ট্রেনে মামাবাবুর সঙ্গে—ইঃ! অনেককাল পরে দেখা, ভালো আছেন তো?—

বল্লাম "তা আছি; কিন্তু তোমার মামাবাবুর খবর কি?

"মামাবাবু?—ভালই আছেন। কেষ্টনগরে শ্রো থাকেন আজকাল।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেষ্টনগরে?"

"হ্যাঁ, সেখানেই তো থাকেন আজ বছর দুইতিন হল। বিয়ে করেছেন।—"

"বিয়ে করেছেন?"

"বাঃ! একঘর ছেলেপিলে;—সেই আপনার সঙ্গে যেবার দেখা হোল? তারই তো মাস ছয়েক পরে বিয়ে করেন মামাবাবু।"

ওদের ট্রেনটা ছেড়ে দিল। কেষ্ট গাড়ীতে উঠলো কিছুদূর থেকে ঝুঁকে পড়ে বল্লে, "এখনেই থাকেন নাকি?

উত্তর দিলাম, "না।—"

আমার কথা সে বোধহয় শুনতে পায়নি। চীৎকার স্বরে বললে "আসবো একদিন আপনাদের বাড়ী, বুঝলেন?" ট্রেনের লাল আলোটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

আমাদের গাড়ীটারও ছাড়ার সময় হোল। দূরের অন্ধকারে ডাউন সিগ্ন্যালের আলোটা বদলে গিয়েছে। আস্তে আস্তে গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। রাত্রির ট্রেন, সে জন্য অধিকাংশ কামরাই খালি পড়ে রয়েছে, গার্ডের বাঁশীর শব্দ শোনা গেল।

ষ্টেশনের কোলাহল-মুখর আবেষ্টনীটা পার হতেই দুদিকে বিস্তীর্ণ মাঠ। ম্লান চন্দ্রালোকিত তারাভরা রাত্রি অনেক দূরে অস্পষ্ট দিক্ রেখায় ছায়াঘন গাছপালার শ্রেণী স্বপ্নের মত হ'য়ে উঠেছে। একা বসে মনে হোল 'কবিরাজ মশাই আবার বিয়ে করেছেন; একঘর ছেলেপিলে তাঁর? বছর কয়েক আগে, এই ট্রেনের কামরাতে বসে তাঁরই মুখের কতকগুলি কথা মনে পড়ে গেল, "বুঝলে বাবা, সোনার প্রতিমাকে ছাই করে বিয়ে আর আমি করবো না।" তাঁকে দোষী করতে চাইনে, মানুষের জীবনের একটা মস্তবড় উপেক্ষিত দিক্ আজই যেন প্রকট হয়ে দাঁড়াল। নতুন জীবনের স্বপ্ন, এক আনন্দভরা উচ্ছ্বাসে সেদিনের সেই অশ্রুভারাক্রান্ত স্মৃতিটুকু আজ হয়ত তাঁর মন থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছে; অভিমানিনী, শ্যামলা বধূটিও আজ হয়ত তাঁর কাছে একেবারেই স্বপ্ন, নিতান্তই অনাবশ্যক। কিন্তু, নারীজীবনেরও যে ঐকান্তিক মহাসত্য আজও মহাকালের রথচক্রে নিষ্পেষিত হচ্ছে সেও কি তার যথার্থ মূল্য কোন দিন ফিরে পাবে না?

কি জানি কেন কাকীমার কথ মনে পড়ে আমার চোখে জল এল।

অফসোস্

শ্রীসুধীন সেন

পৃথিবীর সীমানায়,
জীবনের মোহনায়,
ফিরে চাই উৎসের,—
প্রাণখানি হর্ষের।

মনে পড়ে অতীতের,
বেলাখানি ফাগুনের,—
কেটেছিল কিসে সেই—
পাতালের পরীদেশেই

পাহাড়ের কোল ঘুরে,
চলে গেছি কতদূরে,
অজানার গন্ধে,
নৃত্যের ছন্দে।

আজ খালি আফ্‌সোসে,
আনমনে বসে বসে,
ভবাগাঙে দাঁড় বাই
অতীতের গান গাই।

জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাস

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যে অসহযোগ-প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ের সহিত প্রায় একমত হইলেও, কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তিনি মনে করিতেন কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াও অসহযোগ-নীতি সাফল্যের সহিত পরিচালনা করা যায়। কিন্তু তখন দেশের জনসাধারণ মহাত্মার নির্দ্দেশে এতই আশ্বাস স্থাপন করেন যে, দেশবন্ধুর কথা কেহ কর্ণপাত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এদিকে চিত্তরঞ্জন মহাত্মার নীতি এবং চরিত্রবলের প্রতি এতই শ্রদ্ধাবান্ যে তাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিলেও তাঁহার প্রবর্ত্তিত কাউন্সিল বর্জ্জন-নীতি কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এ অবস্থায় তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন।

যাহা হউক; নাগপুর পর্য্যন্ত এই বিষয় লইয়া চিত্তরঞ্জন একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি প্রথমেই নভেম্বর মাসে মালব্যজী ও লালা লাজপত রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে কাশীধাম্ গমন করেন। মহাত্মাও পরে এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তৎপরে সে স্থান হইতে তিনি নাগপুরে মিঃ অভয়ঙ্কর, ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি তথাকার নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে মহাত্মাজী কলিকাতায় আসেন ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বক্তৃতা দেন। দাশ মহাশয় ও বিপিন পাল মহাশয় তখন ঢাকায় গিয়াছিলেন। মহাত্মাজীও মৌলানা সৌকত আলিকে লইয়া সেখানে যান। দাশ মহাশয় ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে নিজে ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে স্বীকার করিয়া ঢাকায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এবং ছাত্রগণকে গভর্ণমেণ্ট-স্কুল পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। ১৬ই ডিসেম্বর মহাত্মা ও তিনি ঢাকার পুরাতন পলটনের জমিতে একটী সভায় উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার উকীল শ্রী প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয় বলেন, "এই সভায় আমরা উভয়েই গিয়াছিলাম। মহাত্মা মিঃ দাশকে প্রাকৃটিস্ ছাড়িতে অনুরোধ করেন। রাস্তায় আমার সঙ্গে কথা হয়। আমি বলি, ৫ বৎসর পরে প্রাক্‌টিস ছাড়িবেন। তিনি বলেন, পাঁচ বৎসরের বেশী আমি কিছুতেই এ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিব না। Five years will be the longest period I shall remain in the profession."

মৌলানা সৌকত আলি সেই সভায় বলিয়াছিলেন, "খাটিয়া খাটিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছি। সি, আর, দাশ কেন ব্যবসায় কার্য্য স্থগিত রাখিয়া এই কার্য্য পরিচালনা করুন না, আর আমরা তাঁর বাড়ীতে ব'সে একটু বিশ্রাম করি।" অতঃপর দাশ মহাশয় বক্তৃতায় বলেন, "আমি নিজ ব্যয়ে একটি জাতীয় বিদ্যালয় চালাইব।" মহাত্মার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় চিত্তরঞ্জন বলেন, "পাঁচ বৎসর পরে সম্পূর্ণ অসহযোগ করিবেন, এখন দেশকে সেইভাবে তৈয়ারী করুন। এর মধ্যে যদি ওরা কিছু না করে, আমি সম্পূর্ণ রূপে ঝাঁপাইয়া পড়িব। মহাত্মা তাহাতে স্বীকৃত হ'ন নাই। তিনি অচিরেই দাশ মহাশয়কে ব্যবসা ছাড়িয়া অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করিতে বলেন। নেতৃবৃন্দ কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন এবং দাশ মহাশয় আরও ভাবিতে লাগিলেন। মহাত্মাও বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় এই পথ গৃহীত না হইলে অসহযোগ ভারতে চলিবে না। আর যদি দাশ মহাশয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হন, তবেও বাঙ্গালায় কোন ফলোদয় হইবে না। চিত্তরঞ্জনও জানিতেন মহাত্মার সম্পূর্ণ দৃষ্টি তাহার উপরেই নিবদ্ধ ছিল। অতঃপর নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। মহাত্মা তাঁহাকে খুব ধীরভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, সেখানেও দেশবন্ধু ৫ বৎসর দেশকে তৈয়ার করিয়া পরে সম্পূর্ণ অসহযোগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মহাত্মা বলেন, "এখনই ক্ষেত্র প্রস্তুত, এই পাঞ্জাব, এই খেলাফত ও অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতার ছায়াটুকুর মাত্র লাভ। এখন দেশ অপমানে তিক্ত হইয়াছে। ইংরাজের উপরে বিশ্বাস হারাইয়াছে। এই সুযোগ ছাড়িলে আর সুযোগ নাও আসিতে পারে।"

একদিকে চিত্তরঞ্জন রিফর্ম্স সম্বন্ধে কলিকাতা (১৯১৭) বোম্বাই (১৯১৮); দিল্লী (১৯১৮) অমৃতসর (১৯১৯) প্রভৃতি কংগ্রেসের অধিবেশনে যেরূপ রাজনীতিজ্ঞতা এক নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পশ্চাৎপদ হইতে তাহার প্রাণ চাহিতেছে না। অন্যদিকে কাউন্সিল বর্জ্জন তিনি হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। অবশেষে এমন একটা আপোষ হইল যাহাতে মহাত্মার সহিত একত্র মিলিত হইয়া কাজ করিতে কোনরূপে বাধা রহিল না। নাগপুর মূল প্রস্তাবে বয়কট বিষয়ে বিদ্যালয় বর্জ্জন এবং আদালত বর্জ্জন রহিল, কিন্তু কাউন্সিল প্রস্তাব স্থান পাইল না। সে বৎসর কাউন্সিল নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বয়কটের মধ্যে তাহার উল্লেখ উঠাইয়া দিতে মহাত্মা কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। তবে যাহারা কাউন্সিলে গিয়াছে, তাহারা জাতীয়তাবাদী নহে, সেই নরমপন্থিগণ। তাঁহারা দেশবাসিগণের প্রতিনিধি নহেন এবং দেশবাসিগণ ভোটের ক্ষমতা ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই

তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেন না; সুতরাং প্রস্তাবের শেষদিকে মন্তব্য ছিল যে,জনমত-বিরোধী বলিয়া জনমতের দিক (democracy) হইতে সেই সমস্ত কাউন্সিল সভ্যগণ যেন শীঘ্রই স্ব স্ব সভ্যপদ পদত্যাগ করেন। এই মন্তব্য হয় জনমতের (democracy) খাতিরে, বয়কট প্রসঙ্গে নহে।

এই মাঝামাঝি আপোষমূলক ব্যবস্থায় চিত্তরঞ্জনেরও আপত্তি রহিল না। বিশেষতঃ অন্যান্য বিষয়গুলি কলিকাতার প্রস্তাব হইতে এত জোরালো হইল যে, সানন্দে তিনি তাহাতে মত দিয়া মহাত্মার সঙ্গে হাতে হাত রাখিয়া কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নাগপুর কংগ্রেসের ও কলিকাতা বিশেষ অধিবেশনের প্রস্তাবাবলী পাঠ করিলেই এই বিষয়ে পাঠকের সম্যক্ ধারণা হইবে। তাই এইখানে এই দুইটী প্রস্তাব প্রদত্ত হইল।

নাগপুরের কংগ্রেস-অধিবেশনে জাতীয়তার চূড়ান্ত জয় সূচিত হইল। মহাত্মা ও দেশবন্ধু একত্র কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

Nagpur Congress Resolution No. 2.

NON-CO-OPERATION. Dec. 1920.

Whereas in the opinion of the Congress the existing Government of India has forfeited the confidence of the country, and—whereas the people of India are now determined to establish Swaraj; and—whereas all methods adopted by the people of India prior to the last special Session of the Indian National Congress have failed to secure due recognition of their rights and liberties and the redress of their many and grievous wrongs, more specially in reference to the Khilafat and the Punjab,—now this Congress while reaffirming the resolution on non-violent Non-Co-Operation passed at the Special Session of the Congress at Calcutta declares that the entire or any part or parts of the scheme of non-violent Non-Co-Operation, with the renunciation of voluntary association with the present Government at one end and the refusal to pay taxes at the other, should be put in force at a time to be determined by either the Indian National Congress or the All-India Congress Committee and that in the meanwhile, to prepare the country for it, effective steps should continue to be taken in that behalf:

(a) By calling upon the parents and guardians of school children (and not the children themselves) under the age of 16 years to make greater efforts for the purpose of withdrawing them from such schools as are owned, aided or in any way controlled by Government and concurrently to provide for their training in national schools or by such other means as may be within their power in the absence of such schools;

(b) By calling upon students of the age of 16 and over to withdraw without delay, irrespective of consequences, from institutions owned, aided or in any way controlled by Government, if they feel that it is against their conscience to continue in institutions which are dominated by a system of Government which the nation has solemnly resolved to bring to an end, and advising such students either to devote themselves to some special service in connection with the Non-Co-Operation movement or to continue their education in national institutions;

(c) By calling upon trustees, managers and teachers of Government, affiliated or aided schools and Municipalities and Local Boards to help to nationalise them;

(d) By calling upon lawyers to make greater efforts to suspend their practice and to devote their attention to national service including boycott of law courts by litigants and fellow-lawyers and the settlement of disputes by private arbitration.

(e) In order to make India economically independent and self-contained by calling upon merchants and traders to carry out a gradual boycott of foreign trade relations, to encourage hand-spinning and hand-weaving and in that behalf by having a scheme of economic boycott planned and formulated by a committee of experts to be nominated by the All-India Congress Committee;

(f) and generally, in as much as self sacrifice is essential to the success of Non-Co-Operation, by calling upon every section and every man and woman in the country to make the utmost possible contribution of self-sacrifice to the national movement;

(g) by organising Committees in each village or group of villages with a provincial central organisation in the principal cities of each Province for the purpose of accelerating the progress of Non-Co-Operation;

(h) by organising a 6 and of national workers for a service to be called the Indian National Service; and

(i) by taking effective steps to raise a national fund to be called the ALL-INDIA TILAK MEMORIAL SWARAJYA FUND for the purpose of financing the foregoing National Service and the Non-Co-Operation movement in general.

This Congress congratulates the nation upon the progress made so far in working the programme of Non-Co-Operation, specially with regard to the boycott of councils by the voters,

and claims, in the circumstances in which they have been brought into existence, that the new Councils do not represent the country and trusts that those, who have allowed themselves to be elected inspite of the deliberate abstention from the polls of an over-whelming majority of their constituents, will see their way to resign their seats in the council, and that if they retain their seats inspite of the declared wish of their respective constituences in direct negation of the principle of democracy, the electors will studiously refrain from asking for any political service from such Councillors.

This Congress recognises the growing friendliness between the Police and the Soldiers and the people, and hopes that the former will refuse to subordinate their creed and country to the fulfilment of orders of their officers, and, by courteous and considerate behaviour towards the people, will remove the reproach hitherto levelled against them that they are devoid of any regard for the feelings and sentiments for their own people.

And the Congress appeals to all people in Government employment, pending the call of the nations for resignation of their service, to help the national cause by importing greater kindness and stricter honesty in their dealings with their people and fearlessly and openly to attend all popular gatherings whilst refraining from taking any active part theirin and, more specially, by openly rendering financial assistance to the national movement.

This Congress desires to lay special emphasis on Non-Violence being the integral part of the Non-Co-Operation resolution and invites the attention of the people to the fact that Non-Violence in word and deed is as essential between people themselves as in the respect of the Government, and this Congress is of opinion that the spirit of Violence is not only contrary to the growth of a true spirit of democracy but actually retards the enforcement (if necessary) of the other stages of Non-Co-Operation.

Calcutta Special Congress Resolution

September—20, 1920

In view of the fact that on the Khilafat question both the Indian and Imperial Governments have signally failed in their duty towards the mussalmans of India, and the Prime Minister has deliberately broken his pledged word given to them and that it is the duty of every Non-moslem Indian in every legitimate manner to assist his mussalman brother in his attempt to remove the religious calamity that has overtaken him.

And in view of the fact that in the matter of the events of April 1919 both the said Governments have grossly neglected or failed to protect the innocent people of the Punjab and punish officers guilty of unsoldierly and barbarous behaviour towards them and have exonerated Sir Michael O'Dwyer who proved himself directly or indirectly responsible for most of the official crimes and callous to the sufferings of the people placed under his administration and that the debate in the House of Commons and specially in the House of Lords betrayed a woeful lack of sympathy with the people of India and showed virtual support of the systematic terrorism and frightfulness adopted in the Punjab and that the latest Viceregal pronouncement is proof of an entire absence of repentence in the matters of the Khilafat and the Punjab.

This Congress is of opinion that there can be no contentment in India without the redress of the two afore-mentioned wrongs and that the only effectual means to vindicate national honour and to prevent a repetition of similar wrongs in future is the establishment of Swarajya. This Congress is further of opinion that there is no course left open for the people of India but to approve of and adopt the policy of progressive non-violent Non-Co-Operation inaugurated by Mr. Gandhi until the said wrongs are righted and Swarajya is established.

And in as much as a beginning should be made by the classes who have hitherto moulded and represented public opinion and in as much as Government consolidates its power through titles and honours bestowed on the people, through schools controlled by it, its law-courts and its Legislative Councils and in as much as it is desirable in the prosecution of the movement to take the minimum risk and the call for the least sacrifice compatible with the attainment of the desired object, this Congress earnestly advises :—

(a) Surrender of titles and honorary offices and resignation from nominated seats in local bodies ;

(b) Refusal to attend Government levees, durbars and other officials and semi-official functions held by Government official or in their honour ;

(c) Gradual withdrawal of children from Schools and Colleges owned, aided or controlled by Government and in place of such Schools and Colleges establishment of National Schools and Colleges in the various Provinces ;

(d) Gradual boycott of British courts by lawyers and litigants and establishment of private arbitration courts by their aid for the settlement of private disputes ;

(e) Refusal on the part of the military, clerical and labouring classes to offer themselves as recruits for service in Mesopotamia ;

(f) Withdrawal by candidates of their candidature for election to the Reformed Councils and refusal on the part of the voters to vote for any candidate who may, despite the Congress advice, offer himself for election ;

(g) Boycott of foreign good ;

And in as much as Non-Co-Operation has been conceived as a measure of discipline and self-sacrifice without which no nation can make real progress, and in as much as an opportunity should be given in the very first stage of Non-Co-Operation to every man, woman and child, for such discipline and self-sacrifice, this Congress advises adoption of Swadeshi in piece-goods on a vast scale, and in as much as the existing mills of India with indigenous capital and control do not manufacture sufficient yarn and sufficient cloth for the requirements of the nation and are not likely to do so for long time to come, this Congress advises immediate stimulation of further manufacture on a large scale by means of reviving hand-spinning in every home and hand-weaving on the part of the millions of weavers who have abandoned their ancient and honourable calling for want of encouragement.

মহাত্মা গান্ধির প্রস্তাব (কলিকাতার)

(১) উপাধিধারিগণ উপাধি ও অবৈতনিক চাকুরী ও মিউনিসিপ্যাল ও জেলাবোর্ড ও লোকাল বোর্ডের মনোনীত সভ্যপদ ত্যাগ করুন।

(২) গবর্ণমেণ্টের লেভি, দরবার রাজপুরুষদের আহুত আমোদ-উৎসব সভা, প্রভৃতিতে গমন করিতে অস্বীকার করুন।

(৩) গবর্ণমেণ্টের নিজস্ব, গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত ও গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন স্কুল ও কলেজ হইতে সন্তানদিগকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যাও এবং প্রত্যেক প্রদেশে জাতীয় স্কুল ও কলেজ স্থাপন কর।

(৪) আইন-ব্যবসায়ীরা ক্রমে ক্রমে আদালত ত্যাগ করুন এবং তাঁহাদের সহায়তায় সালিসী আদালত স্থাপন করিয়া আপন আপন বিবাদ মিটাইয়া ফেলুন।

(৫) সৈন্ত, কেরাণী বা কুলি হইয়া কেহ মেসোপোটেমিয়া যাইও না।

(৬) কেহ ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হইও না ; যদি কেহ কংগ্রেসের মত অবহেলা করিয়া সভ্যপদপ্রার্থী হয়, তবে ভোটারগণ তাহাকে ভোট দিও না।

(৭) বৃটিশ বাণিজ্যদ্রব্য বর্জ্জন করা।

সংশ্রব বর্জ্জন আত্মশাসন ও স্বার্থত্যাগের নামান্তর, যাহা ব্যতীত জাতীয় উন্নতি হয় না। প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে সংশ্রব বর্জ্জনের প্রথম ধাপে আত্মশাসন ও স্বার্থত্যাগের সুযোগ দেওয়া উচিত। সুতরাং কংগ্রেস এই অনুরোধ করিতেছেন যে, সকলেই বস্ত্র ব্যবহার বিষয়ে স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করুন কিন্তু ভারতীয় অর্থে ও ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে যে-সকল কাপড়ের কল আছে, তাহাতে ভারতবাসীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র উৎপাদন হয় না এবং বহুদিন হওয়ারও সম্ভাবনা নাই, এই কংগ্রেস এই অনুরোধ করিতেছেন যে, বিস্তারিত ভাবে চরকায় সুতা কাটা হউক এবং লক্ষ লক্ষ তাঁতী যাহারা উৎসাহের অভাবে তাঁহাদের প্রাচীন ও সম্মানজনক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারা হাতের তাঁতে বস্ত্র বয়ন করিতে আরম্ভ করুন।

বিপিন বাবুর সংশোধক প্রস্তাব (কলিকাতার)

(১) নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস-কমিটীর দ্বারা নির্ব্বাচিত কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধির দৌত্য স্বীকার করিবার জন্ত প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হউক ; এই প্রতিনিধিরা ভারতের অভাব-অভিযোগের কথ তাঁহাকে জ্ঞাপন করুন এবং অচিরাৎ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের জন্ত দাবী করুন।

(২) যদি তিনি এই দৌত্য গ্রহণ না করেন অথবা ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের পরিবর্ত্তে অচিরাৎ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান না করেন, তাহা হইলে এমনভাবে সহযোগিতা-বর্জ্জন-নীতি অবলম্বন করা হইবে, যাহাতে বৃটিশ জাতি নিঃসন্দেহ হইবেন যে, ভারতবাসী অতঃপর পরাধীনের মত শাসিত হইতে চাহেন না।

(৩) ইতিমধ্যে কংগ্রেস দেশকে মহাত্মা গান্ধির সহযোগিতা-বর্জ্জনের প্রোগ্রামটী ধীরভাবে এবং সুনয়নে দেখিয়া শেষে গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন ; অবশ্র সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে অথবা কোনও বিশেষ প্রদেশের পক্ষে যাহা সংশোধন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন করা আবশ্রক, তাহা একটা জয়েণ্ট-কমিটি নির্দ্ধারণ করিবেন ;

এই জয়েণ্ট-কমিটীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন—

(ক) নেশনাল কংগ্রেস
(খ) মসলেম লিগের
(গ) সেণ্ট্রাল খেলাফৎ কমিটীর প্রতিনিধি থাকিবে।
(ঘ) প্রত্যেক হোমরুল লিগের

(ঙ) শিখ লিগের

(৪) ইতিমধ্যে কংগ্রেস গোড়াপত্তন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কার্য্যের পথ অনুসরণ করিতে দেশের লোককে অনুরোধ করিতেছেন।

(ক) সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন এবং সহযোগিতাবর্জ্জন-নীতি সম্বন্ধে নির্ব্বাচনাধিকারীদিগকে শিক্ষিত করা।

(খ) জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা,

(গ) সালীশ-আদালত প্রতিষ্ঠা করা,

(ঘ) সরকারি খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া।

(ঙ) সরকারী লেভি, দরবার প্রভৃতি বর্জ্জন করা।

(চ) শ্রমিকগণকে ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত কর।

(ছ) ক্রমশঃ য়ুরোপীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় হইতে ভারতীয় মূলধন ও শ্রমজীবী সরাইয়া লওয়া।

(জ) সৈন্য, কেরাণী ও শ্রমিকগণকে ভারতের বাহিরে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিষেধ করা।

(ঝ) স্বদেশী ব্রত গ্রহণ এবং হাত-চরকা ও তাঁতের পুনঃ প্রচলন।

নাগপুরে চিত্তরঞ্জন অনেক ডেলিগেট লইয়া যান। মাদ্রাজের বিজয়রাঘবাচারীকেও এই উদ্দেশ্যে ৬০০৲ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু নাগপুরে গিয়া মহাত্মাজীর সহিত কাজ করিলে দেশ ক্রমেই অগ্রসর হইবে, স্থির জানিয়া এইভাবে পরিবর্ত্তিত প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া আসেন।

কলিকাতা ও নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাব (resolution) পাঠ করিলে বাস্তবিকই মনে হয় দেশবন্ধু নন্‌কো-অপারেশন্ (অসহযোগ) সম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যাপারে—মহাত্মার সম্পূর্ণ মতাবলম্বী হইলেও কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া বাধাদানমূলক নীতি অবলম্বন বিষয়ে তাঁহার স্বীয় মত তিলমাত্রও পরিহার করেন নাই। প্রথমতঃ কাউন্সিল বর্জ্জনের কথা নাগপুরের প্রস্তাবপত্রে নাই. দ্বিতীয়তঃ লিবারেলরা যাহাতে কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি বরাবর চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেন। এমন কি নাগপুর প্রস্তাবের পর এখন যদি কোন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে চাহিত, জাতীয়তাবাদিগণ তাহাকে সমর্থন করিলে তবে তাঁহারা কংগ্রেসের বিধিনিষেধ অমান্য করিয়াছেন এরূপ বলা যাইতে পারিত না।

এই নাগপুরের প্রস্তাবে আরও অনেক বিশেষত্ব আছে—

(১) স্বরাজ লাভ সম্বন্ধে কলিকাতার প্রস্তাবে স্পষ্ট কোন উদ্দেশ্যের কথা ছিল না। পাঞ্জাব ও খিলাফতের কথাই অধিকতর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিত। প্রিয়েম্বোলে (Preambele) পঞ্জাব ও খিলাফতের কথাই শোভা পাইয়াছে। এই সমস্ত ঘটনার পুনরভিনয় বন্ধ করা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে সম্ভব নয়, এইরূপ কথা ছিল। আর নাগপুরে ছিল খিলাফত, পঞ্জাব এবং অন্যান্য নানাবিধ অনাচারের জন্য বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আমাদের বিশ্বাস হারাইয়াছে, তাই স্বরাজ লাভে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি এবং তজ্জন্য অর্থাৎ স্বরাজলাভের জন্য আমরা নন্‌কোপারেশন নীতি অবলম্বন করিব। অর্থাৎ উপরোক্ত অনাচার দূর হইলেও আমরা স্বরাজলাভের সঙ্কল্প ছাড়িব না। কলিকাতায় সবজেক্ট (Subjects) কমিটিতে স্বরাজের কোন কথাই ছিল না, কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সংশোধন-প্রস্তাবের পরে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। কলিকাতা অধিবেশনের সময় মহাত্মা গান্ধী স্পষ্টই বলিয়াছিলেন. "Swaraj was not an independent demand. It was made because of the Punjab." নাগপুরে স্বরাজ সাধনই হইল মূল উদ্দেশ্য।

(২) কলিকাতার প্রস্তাবে অসহযোগের কোন বিশিষ্ট রূপ ছিল না, কোন বিশেষ ত্যাগের কথা ছিল না, যেন কংগ্রেস অনুরোধ করিতেছে (earnestly desire) যে ছেলেরা এবং উকীলরা যেন ক্রমে ক্রমে (gradual withdrawal) স্কুল ও আদালত ছাড়িয়া দেয়। আর নাগপুরের প্রস্তাবে ছিল—Effective steps should be taken. এই বয়কট সাফল্যের জন্য প্রবল উদ্যম প্রয়োগ করিতে হইবে—এইরূপ কথাই ছিল।

(৩) কলিকাতায় ক্রমে ক্রমে আরম্ভ করিয়া বয়কট্ করিতে হইবে এইরূপ কথা ছিল—কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নাগপুরের প্র্যাক্‌টিস্ সাস্‌পেণ্ড করিয়া (কিছু দিনের জন্য ব্যবসা স্থগিত রাখিয়া) উকীল ব্যারিষ্টার যাহাতে জাতীয় সেবায় আত্মনিয়োগ করে—এইরূপ প্রস্তাব হয় (By calling upon lawyers to make greater efforts to suspend their practice and to devote attention to national service) কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব নাগপুর Resolution অধিক কার্য্যকারী (practical ও effective)।

(৪) কলিকাতার প্রস্তাবে Minimum risk and least sacrifice যৎসামান্য ক্ষতি বা ত্যাগের উল্লেখ ছিল, আর নাগপুরে সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্সের কথা ছিল—Renunciation of voluntary association with the present Government at one end and the refusal to pay takes at the other—অসহযোগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্ব প্রদানে অসম্মতি পর্য্যন্ত সমস্ত পন্থাই দেশবাসীর পক্ষে অবলম্বনীয়, তবে কোনটা কখন গ্রহণ করিতে

হইবে তাহা কংগ্রেস বা অল্-ইণ্ডিয়ার অনুমতি-সাপেক্ষ ইহার বলেই সভাসমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক সম্বন্ধীয় আইনের প্রতিবাদে বাঙ্গালায় সত্যাগ্রহ করিয়া ১৬০০০ লোক স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কারাবরণ করিয়া জেলে গিয়াছিল।

(৫) কলিকাতার প্রস্তাবে ছাত্রদের ধীরে ধীরে বিদ্যালয় ত্যাগের কথা ছিল, নাগপুরে ছিল যে ১৬ বৎসর বা ততোধিক-বয়স্ক ছাত্রগণ যেন Irrespective of consequences পরিণাম চিন্তা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট স্কুল ছাড়িয়া আসিয়া হয় ন্যাশনেল সার্ভিসে (জাতীয় সেবাব্রত) জীবন যাপন করে অথবা জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়ে করে—এইরূপ কথা ছিল। এই প্রস্তাবের ফলেই বাঙ্গলায় নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। অসহযোগ গ্রহণের পরে ছাত্রগণের প্রতি আবেদন ও নির্দ্দেশই চিত্তরঞ্জনের প্রথম প্রথম কার্য্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, চিত্তরঞ্জন মহাত্মার সহিত যোগদান করিলেন বটে, কিন্তু নিজের সমস্ত ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া। নাগপুরের প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপিও তিনিই প্রস্তুত করেন। যাঁহারা বলেন, দাশ মহাশয় পরাজয় স্বীকার করিলেন অথবা মহাত্মার নিকট প্রথমে অবনত হইয়া পরে মহাত্মাকেও স্ববশে আনয়ন করিবেন এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত। চিত্তরঞ্জন সম্পূর্ণ শুদ্ধ চিত্তেই আসিয়াছিলেন—আসিয়াছিলেন কোন অভিসন্ধি না লইয়া, শুদ্ধ দেশসেবার জন্য, দেশের মুক্তি সাধনের জন্য। এইখানেই তাঁহার জীবনের গতিধারা ভোগের উপত্যকা হইতে একবারে নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগের পথে প্রধাবিত হয়। একদিকে কোন বিষয়েই তিনি স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করেন নাই, প্র্যাক্টিস পরিত্যাগ করিয়া জেলে যাইতে বেশান্তের অন্তরীণের সময় সভা বন্ধ হইলে (১৯১৭) ইতিপূর্ব্বেই তিনি চাহিয়াছিলেন, ময়মনসিংহেও প্রাদেশিক সম্মেলনের বৈঠকে (১৯১৯) সত্যাগ্রহ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। অন্যদিকে মহাত্মার দেবভাব, মহাত্মার আত্মোৎসর্গ, মহাত্মার ভারতীয় আদর্শে গভীর শ্রদ্ধা ও মহাত্মার চরিত্রবল বরাবর তাঁহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছিল বলিয়াই, মহাত্মার আন্দোলন প্রেম ও ধর্ম্মসম্ভূত (ইংরেজী রাজনীতির সংস্রব-বর্জ্জিত) মনে করিয়াই, ইতিপূর্ব্বে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর মহাত্মার এই আত্মশুদ্ধি-প্রণোদিত সত্যোজ্জ্বল আন্দোলনে তিনি প্রাণ ঢালিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। আবার, এ কথাও সত্য যে, দাশ মহাশয় যদি তাঁহার সমস্ত সাধনা, তাঁহার ত্যাগের আদর্শ, তাঁহার দেবভাব ও তাঁহার বিরাট নেতৃত্ব লইয়া ঐ সঙ্কট সময়ে মহাত্মার সহিত যোগদান না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার মূলনীতি বা Soul-force এবং অহিংসার অর্থ অধিক-লোকের কর্ণে পৌঁছিত না। বাস্তবিক এই গান্ধী-দাশ সাহচর্য্যে একজন আর একজনকে গ্রাস করেন নাই। উভয়েই পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ, উভয়েই শক্তিমান্ ও উভয়েই পুষ্ট। এই মিলনে উভয়েই স্বাধীন ও অপরতন্ত্র, কেহই গতানুগতিক নহেন, উভয়েই তাঁহাদের সমবেত শক্তিতে জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই শুভসম্মিলন হরিহর মিলনের মতই অপূর্ব্ব। আর এই সম্মিলনে ভারত যে উন্নত আদর্শ জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে, তাহা যুগে যুগে দেশে দেশে ধ্রুবতারার মতই পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

একটি সময়ে এমন দুইজন শক্তিশালী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখা যায় না। কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ডিজ্‌র্যালী ও গ্লাডষ্টোনকে দেখা যায়। দুই জনই খুব বড় ছিলেন, অথচ দু'জন বিভিন্ন প্রকৃতির। ডিজর্যালী ও গ্ল্যাডষ্টোন কখনও সম্মিলিতভাবে কাজ করেন নাই, কিন্তু মহাত্মা ও দেশবন্ধু একত্র মিলিত হইয়াছিলেন ও এক-সঙ্গে দেশ ও জাতির প্রতিষ্ঠা বাড়াইয়াছিলেন। প্রেম ও শক্তির এই অপূর্ব্ব সম্মেলন জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

যে রাত্রে পরামর্শ-বৈঠকে সমস্ত স্থির হইয়া যায়, তাহার পরে বিপিনবাবু দাশ মহাশয়কে সকালে অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বলিয়াছিলেন, "আমাদিগকে না জানিয়ে কে, কে তোমায় এতে মত দিতে ব'লেছে?" উত্তরে চিত্তরঞ্জন বলিলেন "কে আর বলবে, এ ছাড়া আর কোন পথ নাই বলে, আমি নিজেই করেছি। এতে কি আত্মকর্তৃত্ব থাক্‌তে পারে না?"

১৯১৭ সালের অধিবেশনের পর হইতে কংগ্রেস সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দলকে হারাইল। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর অধিবেশনের পর কংগ্রেস বেশান্তকে পূর্ব্বের ন্যায় আর উৎসাহী ভাবে পাইল না, ১৯২০ বিশেষ অধিবেশনের পর তাহাকে একেবারে হারাইল আর ১৯২৭ ডিসেম্বরের পর হইতে মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাকেও একেবারে হারাইল।

প্রথম প্রস্তাবটি ২য় কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্র বা সর্ত্ত উপলক্ষে (Creed); পূর্ব্বে ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য উপনিবেশগুলির ন্যায় আইনসঙ্গত-উপায়ে স্বায়ত্তশাসন লাভ (Self Government similar to that enjoyed by the Self Governing Members of the British Empire by Strictly Constitutional Means.)

সুরাট কংগ্রেসের পরে ন্যাশনাল কনভেনসনে এই সব নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হয়।

এবার ক্রীড হইল (Attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means) অর্থাৎ সর্ব্ব-প্রকার বৈধ এবং নিরুপায় পন্থাবলম্বনে স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

এই 'ক্রীড' লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচনী সভায় মৌলানা মহম্মদ আলি এবং মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে বিশেষ বাদানুবাদ হয় এবং কিছু উত্তেজনারও সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রকাশ্য অধিবেশনে মিঃ জিন্না একটি দীর্ঘ অভিভাষণে বলেন, এই প্রস্তাবটিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বুঝায়। যদি তাই হয় তবে অর্জ্জনের উপায়ও স্থির করিতে হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা রক্তপাত ছাড়া হয় না। তাই প্রস্তাবে সেই কথাও বলা দরকার। শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে স্বাধীনতা আসে না। যদি ইহা কেবল বিজ্ঞপ্তি হয় (notice) তবে সেই ভাবে প্রস্তাব হওয়া উচিত। প্রস্তাবটিতে যদি ব্রিটিশ সম্পর্কের ইঙ্গিতও থাকে, অথচ ব্রিটিশ সম্পর্কচ্ছেদের কথাও থাকে, তবে দুইপন্থী লোক এক সঙ্গে কি রকমে কাজ করিবে? চালাকির দরকার কি! আমি মহাত্মা গান্ধীকে এখনও রাশ টানিয়া লইতে অনুরোধ করি। তিনি নিরস্ত হউন।

এখানে মিঃ জিন্নার বক্তৃতাটি সম্যক্ভাবে বুঝিবার জন্য ইংরাজীতে দেওয়া হইল—

"The first part of the Resolution is the attainment of Swaraj. In my opinion this means a declaration of Complete Independence. Does it mean it retains British Connection? I venture to say it does not. Mahatma Gandhi and Lala Lajpat Rai explained that it is with or without British connection, I agree with Lala Lajpat Rai in the most part of his indictments that he levelled against the Government I do not think there is any difference between him and me. Our wrongs are of an enormous character which have made our blood boil. Lala Lajpat Rai has told you in 1907 those who adopted the existing Creed of the Congress felt that there was neither the will nor means of making the propossd declaration. Today he said majority have the will. I entirely agree that the majority have the will. But the second point is have we got the means? The means placed today before you by Mr. Gandhi, (voices—say Mahatma Gandhi)—yes Mahatma Gandhi (laughter) are legistimate and peaceful but I make bold to say you will never get independence without bloodshed. Thus you make a declaration which you have not the means to carry out. On the other hand you are exposing your hands to your enemies. What is the use of the camouflage? Again, is it possible for us to stand on the same platform one saying he wants to keep British connection and another that he does want it. Do not blind yourselves, do not in your temper, in your desperation take a step in haste for which you have to regret.

The moment you pass this resolution you are going to tell the people that the Congress has made a bid for Complete Independence or as Mahatma Gandhi has said you want to destroy the British Empire. But how are you going to destroy the British Empire in my opinion? To-day it is a mere dream in spite of the fact that we are 30 Crores of Indians The only reason I have been able to see for a change in the creed beyond mere sentimental feelings was given to me in the Subjects Committee by Mr. Mohomed Ali (cries of Moulana) no I will not be dictated by you—Mr. Mohomed Ali gave me was that some people find it impossible to sign the present (existing) cried. This is no sufficient reason. The creed must be changed at least with the object in view that you see about a quarter of a Century ahead of you. The creed is neither politically wisen or capable of execution. Knowing that Mahatma Gandhi has vast influence over the majority of the audience, I make a personal appeal to him to cry halt."

প্রস্তাব পাশ হইয়া যায়। এবং সাতাইশ বৎসর মধ্যে (Quarter of a Century) স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত সর্ত্ত এবং উপায় উভয়ই সাফল্য লাভ করিয়াছে। আর এখনও মিঃ জিন্না রক্ত-পাতের (Blood-shed) প্রসঙ্গ তুলিতে পারেন নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নাগপুরে ব্যবসা ছাড়িবেন ঘোষণা করিবার পরেই "নূতন বাঙ্গলার" সৃষ্টির সূচনা হইল। পঞ্চাশ হাজার টাকা মাসিক আয়ের ব্যবসা ছাড়িয়া, সমস্ত বিলাস-ব্যসন ত্যাগ করিয়া, দানধ্যান সব জলাঞ্জলি দিয়া, ভবিষ্যতের আশা ছাড়িয়া দিয়া চিত্তরঞ্জন যখন দধীচির ত্যাগ, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম এবং শঙ্করাচার্য্য বিবেকানন্দের দিগ্বিজয়ী বাগ্মিতা লইয়া স্বরাজ সাধনায় প্রথম আসিয়া সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন, বাঙ্গলার এক নবভাবের সৃষ্টি হইল। আত্মত্যাগী মহাপুরুষের স্মরণে, দর্শনে, স্পর্শনেই কেবল লোক ধন্য হইয়াই তৃপ্ত হইল না, জিলায় জিলায় সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে এমন সাড়া পড়িয়া গেল যে, ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া আসিয়া, উকীল-ব্যারিষ্টাররা নিজেদের লাভবান ব্যবসা ত্যাগ করিয়া অধ্যাপক অধ্যা-পনা ছাড়িয়া ও চাকুরে চাকুরী ছাড়িয়া তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইলেন। সমগ্র বাঙ্গলা সম্মুখে সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গদেবের দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইল, সমগ্র জাতি দেশ-বন্ধুর কার্য্যে সহানুভূতি করিতে লাগিল। সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ-প্রস্তাব

গৃহীত হইলেও বাঙ্গলাদেশে কোনরূপ উদ্দীপনার সঞ্চার হয় নাই। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার পতাকাবাহী হইলেও ইহার কোনরূপ প্রভাব অনুভূত হয় নাই। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের আগমনের পরেই পুরাতন, শুষ্ক পতনোন্মুখ বটবৃক্ষ একেবারে শাখা-প্রশাখায় সতেজ পত্র-গুল্মে বিশাল পল্লবিত মহীরুহে পরিণত হইল।

বিস্তৃত বিবরণ দেশবন্ধুর জীবন-চরিতেই শোভা পাইবার উপযোগী, এখানে কেবল কতকগুলি স্থূল স্থূল ঘটনার উল্লেখ করিব—

১০ই ১১ই জানুয়ারীতে ছাত্রগণকে আহ্বান করিয়া যখন বলেন, "বাংলার তরুণগণ, তোমরাই তো দেশের একমাত্র আশা, তবে তোমরা কেন নিশ্চেষ্ট? স্বরাজ সংগ্রামে কেন তোমরা পরাঙ্মুখ? কেন কাপুরুষোচিত ব্যবহার করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠা তোমরা কলঙ্কিত করিবে?"

বলা বাহুল্য, বাঙ্গলার ছাত্রগণ সে সময়ে তাঁহার আহ্বানে পূর্ণভাবে সাড়া দিয়া বাঙ্গলার মান রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই।

কলিকাতার ছাত্রগণের সহযোগিতা পাইয়া তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, চাঁদপুর এবং সেখান হইতে মৌলভীবাজার, শ্রীহট্ট, হবিগঞ্জ হইয়া কুমিল্লা যান। অতঃপরে চট্টগ্রাম হইয়া কলিকাতা আসেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অখিলচন্দ্র দত্ত, সূর্য্যকুমার সোম প্রভৃতি অসংখ্য উকীল-ব্যারিষ্টার ব্যবসা ছাড়িয়া দেশের কার্য্যে লাগিয়া যান। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়, আর বরিশালে ২৬শে মার্চ্চ ১৯২১, প্রাদেশিক সম্মেলন যেন মহোৎসবে পরিণত হয়। এই খানেই বিপিনচন্দ্রের সহিত চিত্তরঞ্জনের সংস্রব বর্জ্জিত হয়।

ইহার পরে তিনি বেজওয়াদায় অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সভায় উপস্থিত হন। সেখানে স্থির হয় (৩১শে মার্চ্চ—তিন-মাস মধ্যে অর্থাৎ ৩০-শে জুন মধ্যে) সমগ্র ভারতে এককোটি কংগ্রেসের সভ্য করিতে হইবে, অল ইণ্ডিয়া তিলক মেমোরিয়াল স্বরাজ্য ফণ্ডের জন্য এককোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ২০ লক্ষ চরকার প্রচলন করিতে হইবে। উক্ত টাকা প্রত্যেক প্রদেশের গঠনমূলক কার্য্য ও জাতীয় সেবকমণ্ডলীর সহায়তাকল্পে ব্যয় করিতে হইবে। বাঙ্গলার অংশে পড়ে ১৫ লক্ষ টাকা। এই সময় Civil Disobedience করিতে এখনও কর্ম্মীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। প্রধান প্রস্তাবটী সমর্থন কল্পে অন্যান্য কথার সঙ্গে চিত্তরঞ্জন বলেন:

"*Swaraj* is not a particular system of Government. It means our right to determine our own affairs and that we must have our form of goverment."

কলিকাতা আসিয়াই ১৫লক্ষ টাকা এবং পনের লক্ষ সভ্য করিতে এবং চরকার প্রচলনে তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। প্রথমেই আবেদন করেন—

"Time passes—India calls. Are we to remain idle or shall respond to the Call of the Mother?"

এপ্রিল মাসে নানাস্থানে কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হইতে থাকে। তারপরে হুগলী, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মালদহ, রাজসাহী, নওগাঁও, নাটোর, রংপুর, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, সৈদপুর, ঈশ্বরদী, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে চাঁদপুরের কুলীদের নিদারুণ কাহিনী শুনিয়া গোয়ালন্দ হইয়া নৌকাযোগে চাঁদপুরে গিয়া উপস্থিত হন। অতঃপর সেখান হইতে মাদারীপুর, বরিশাল ও খুলনা হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসেন।

৩০শে জুনের তখন মোটে ৭।৮ দিন বাকী। দিন রাত্রি খাটিয়া ঐ কয়দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্ম্মিগণের মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া বাঙ্গলার মান রক্ষা করেন। ৩০শে জুন কলেজ স্কোয়ারের সভায় যেন টাকার বৃষ্টি হইয়াছিল। অতঃপর জুলাই মাসে নবগঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটীর কাজকর্ম্ম সারিয়া এবং অন্তর্বিপ্লব সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করিয়া ২৮শে জুলাই (১৯২১) বোম্বাই অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটীতে উপস্থিত হন।

সেখানে স্থির হয় যে, যুবরাজ এডওয়ার্ড (প্রিন্স অব্ ওয়েলস) যে ভারতে পদার্পণ করিবেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার উপরে কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব না থাকিলেও কলিকাতা ও নাগপুরের অসহযোগ-প্রস্তাবানুযায়ী তাঁহার অভ্যর্থনা বা অভিনন্দনে প্রত্যেকেই যেন কোনরূপ অংশগ্রহণ করিতে বিরত হন। জনমত সন্তুষ্ট করিতে অশক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং দেশবাসীর পুঞ্জীকৃত অসন্তোষ এবং অশান্তি থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার যে যুবরাজকে আসিতে জেদ করিতেছেন—এই জন্যই এই প্রস্তাব করা হইল বলিয়া অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটী মন্তব্য করেন।

আগামী দুই মাস (আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর) যেন বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জিত হয় (Boycott of foreign cloth)—এইরূপ আর একটী প্রস্তাব হয়। দেশী কদ্দরের যাহাতে ব্যবস্থা করা হয় এবং বিলাতী বস্ত্র সংগৃহীত করিয়া নষ্ট করা হয়, এবং বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসায়িগণকে আর বস্ত্র আমদানী না করিতে, অনুরোধ করা হয় (A.I.C.C. invites importers of foreign cloth and yarn to stop all foreign orders etc.)

বিদেশী বস্ত্র (foreign cloth) বয়কট শেষ হওয়া মাত্র সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স করা হইবে বলিয়া আশা করা হয়। তবে যদি কোন প্রাদেশিক কমিটী এরূপ সত্যাগ্রহ করিতে চায়, তবে ওয়ার্কিং কমিটীর অনুমতি সাপেক্ষে হইতে পারিবে।

মহাত্মা গান্ধী এই সভার কথা বলিয়াছেন, "দেশবন্ধুর সৎপরামর্শ ও ধীশক্তির সহায়তায় তিনি প্রত্যেক বিষয়েই উপযুক্ত ব্যবস্থায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন।" উক্ত সভার পরেই বোম্বাই চৌপটির তীরে বিদেশী বস্ত্রের এমন এক বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় যে, বয়কটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই আশান্বিত হইয়া উঠে। দেশবন্ধুর চেষ্টায় কলিকাতায়ও বয়কট সাফল্যমণ্ডিত হয়। ২৪শে আগষ্ট কলিকাতায় ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে যুবরাজকে সম্বর্দ্ধনার আয়োজনের জন্য কলিকাতার সেরিফ একটী সভা করেন। সভায় দেশবাসীর জনতা এত অধিক হয় যে, সরকার পক্ষ এখানে সভা না করিয়া টাউন হলে সভা করেন। কিন্তু এখানে দেশবন্ধু যুবরাজ-অভ্যর্থনা বর্জ্জনের প্রস্তাব পাশ করিয়া যে অভিভাষণ দেন, পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম—

"ভারতবর্ষের একমাত্র লোক-প্রতিনিধিমূলক সভা অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস-কমিটি (নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি)। এই সমিতির আদেশানুসারে যুবরাজের অভ্যর্থনানুষ্ঠান পরিবর্জ্জন করিতে বাধ্য। ইংরাজের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, আমাদের অভিযোগ যে শাসনতন্ত্র আমাদিগকে নিষ্পেষিত করে— সেই বুরোক্রেসী বা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আমাদের শত্রু এই বুরোক্রেসী, আমাদের জাতীয় জীবন নষ্ট করিতেছে এই বুরোক্রেসী এবং আমাদিগকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না এই বুরোক্রেসী। ইহারই বিরুদ্ধে আমরা অহিংস যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি। আমাদের শত্রু এই বুরোক্রেসীর আহ্বানে তাহারই অতিথিরূপে তাহাকে পরিপুষ্ট করিবার জন্যই আজ যুবরাজ ভারতে পদার্পণ করিতেছেন। সম্রাটই হউন বা তাঁহার যোগ্য পুত্র যুবরাজই হউন, যিনি এই বুরোক্রেসীর শক্তিবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে এখানে আসিবেন, আমরা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে পারি না। কংগ্রেসের আদেশ আমরা মানিব, তাতে আমাদের যতই ক্ষতি স্বীকার করিতে হউক। কেহ কেহ বলেন, যুবরাজ আমাদের অতিথিস্বরূপ আসিতেছেন, অভ্যাগতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের ধর্ম্মানুমোদিত। বটেই তো! কে আহ্বান করিতেছে যুবরাজকে? আমরা? না, আমাদের বুরোক্রেসী?

টাউন হলে সভাপতি হন বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে। অভিনন্দন-প্রস্তাব করেন চীফ্ জাষ্টিস্ স্যার লান্সলট স্যাণ্ডারসন্, স্যার সুরেন্দ্রনাথ সমর্থন করিতে উঠিলে, জনসঙ্ঘ "Shame Shame" বলিতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে বলেন "Shame on You, তোমরা প্রাচ্য দেশের উদারতার ভাব ও আতিথেয়তার কথা ভুলিয়া গিয়াছ, যুবরাজ পার্টির উপরে, পলিটিক্সের উপরে, তাঁহাকে আমরা অভ্যর্থনা করিবই। সভায় সুরেন্দ্রনাথ কয়েকজন অসহযোগীর বাধায় উত্তেজিত হইয়া বলেন, "I can disperse the meeting with the help of Police" তবে লর্ড রোণাল্ডসের ধীরতায় গোলযোগ বন্ধ হয়। "Wait Sir Surendranath" বলিয়া তিনি নিজেই আস্তে আস্তে সব কথা বলিতে আরম্ভ করেন।

অতঃপরে মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদ আলী আসাম ঘুরিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইতিপূর্ব্বে ১৭ই আগষ্ট কলিকাতায় একদিন থাকিয়া তিনি আসামের নেতা তরুণরাম ফুকনের অভ্যর্থনায় আসাম যান। ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতায় ছয়টি স্থানে সভা হয়। প্রতি সভায়ই দেশবন্ধু এবং মহাত্মা উপস্থিত হন। দেশবন্ধু যখন বলেন—

"এই যে কটিবস্ত্র-পরিহিত সর্ব্বত্যাগী ঋষি আর কর্ম্মবীর মৌলানা সাহেব আপনাদের সম্মুখে অতিথিরূপে উপস্থিত, তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মানের জন্য আপনারা কি বিলাতী বস্ত্রগুলি বিসর্জ্জন দিতে পারেন না?"

রাশি রাশি বস্ত্র চতুর্দ্দিক হইতে যেন অজস্র শিলা-বর্ষণের মত মঞ্চের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল, আর সেই স্তূপে মহাত্মাজী অগ্নিসংযোগে প্রজ্জ্বলিত করেন।

অতঃপর মহাত্মাজী ও মৌলানা মহম্মদ আলী, যখন ওয়ালটেয়ারে যান, ষ্টেশনে মৌলানা সাহেব পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হন। মহাত্মাজী সভায় গিয়া সকলকে অনুত্তেজিত রাখেন।

ওয়ালটেয়ারে যে মৌলনা মহম্মদ আলী ধৃত হন, ২৮শে সেপ্টেম্বরে এনকোয়ারীতে তাঁহারা দায়রায় সোপর্দ্দ হন। মহাত্মাজী ও মৌলনা একসঙ্গে সভায় যাইতেছিলেন, আলীসাহেব ধৃত হন, মহাত্মাজী সভায় গিয়া সকলকে অনুত্তেজিত থাকিতে পরামর্শ দেন।

মৌলানা মহম্মদ আলী যে প্রস্তাবটির জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সমস্ত স্থান হইতে ঐ প্রস্তাবটি পুনরুত্থাপিত ও প্রতিধ্বনিত করিবার জন্য এই সময় সমস্ত নেতৃবৃন্দের সম্মতি লইয়া একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়।

দেশবন্ধু পদ্মাতীরস্থ লৌহজঙ্গ হইতে নিজের নাম পাঠাইয়া এই ইস্তাহার প্রকাশে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

ইতিমধ্যে জুলাই ১৪ই অক্টোবর সুভাষচন্দ্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াও বাঙ্গালী-জীবনের এই ইন্দ্রপদ পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির সেবাকল্পে আত্মোৎসর্গ করেন। এই অকৃত্রিম তেজস্বী, ধীমান্ কর্ম্মীটিকে পাইয়া দেশবন্ধুর আনন্দের অবধি রহিল না। প্রথমেই জাতীয় বিদ্যালয়ের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। কংগ্রেসের প্রচার-বিভাগের কার্য্যও তিনিই সম্পাদন করিতেন। স্বরাজ সাধনায় সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা জাতীয় ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করিল।

বলিদান

শ্রীশচীন্দ্র বিশ্বাস

ধলভূম অঞ্চলের সাঁওতালদের মধ্যে একটী প্রচলিত কাহিনী ও-অঞ্চলে গেলেই শুনতে পাওয়া যায়—সাঁওতালরা সকলেই জানে। সেই কাহিনীটি বলি।

*   *

উন্মত্তপ্রায় সাঁওতালের দল আজ এসেছে মা রুয়াসিনীর দ্বারে—অনোন্যপায় হ'য়ে...

মাদলের 'পর পড়ছে ঘা দমাদম্-দমাদম্; সাঁওতালের দল নাচছে তারই তালে, পা ফেলে ধুমা ধুম্ ধুমা ধুম্।...

আর মার কাছে নতজানু হয়ে জানাচ্ছে নিবেদন—তাদের সর্দ্দার—"মা বলে' দে। দে মা বলে'—কী—চাই তোর ? কিসে মিটবে তোর এই সর্ব্বনাশী সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষা ?..."

গাঁয়ের পর গাঁ যাচ্ছে তাদের উজাড় হ'য়ে—

আগুনে—মারীতে—অনাবৃষ্টিতে—অজন্মায়—

খানা ডোবা সব গেছে শুকিয়ে,—সম্বল মাত্র তাদের ক্ষীণ-তোয়া নদীটির জল—

গোয়াল আজ তাদের শূন্যপ্রায়,—উঠানে আজ তাদের চরে না—ছাগল, হাঁস, শূকর, মুরগীর দল...কার এ ভয়ঙ্করী—প্রলয়ঙ্করী অভিশাপ-দৃষ্টি পড়েছে তাদের গাঁয়ের 'পর।...

ভীত সন্ত্রস্ত সাঁওতালের দল আজ হয়ে উঠেছে মরিয়া—আঘাতের পর আঘাত পেয়ে প্রথমটায় তারা ভবিতব্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নিষ্ফল জেনে—শুধু কাতরভাবে 'ভূত' 'প্রেত' 'বোঙ্গা' 'দেবতা' 'উপদেবতা' সকলের নিকট জানিয়েছে প্রার্থনা—দিয়েছে এনে অনেক উৎকোচ—'হাঁড়িয়া' 'সাড়া' 'কাঁড়া'—যেন অজানা ক্রুদ্ধ দেবতাটি শান্ত হন্—নেন টেনে তিনি তাঁর সর্ব্বসংহারী বাণটি।...

কিন্তু বুঝি তাদের কাতর ক্রন্দন পৌঁছায়নি সে রুদ্র দেবটির পদতলে—তাই আজ বছর ঘুরে এলেও, তাদের গাঁয়ে মারীর পর মারীর শেষ হ'লো না—!—

প্রতি রাত্রে তারা সর্দ্দারের নির্দ্দেশমত মাদল বাজায় সারা রাত ধ'রে—তাদের শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে—মেয়েরা সে উন্মত্ত তালের সাথে পা ফেলে নাচতে থাকে—কঠোর বন্ধুর মাটির বুকের পর ফেলে তারা পা—মাটী সে আঘাতের প্রতিশোধ নেয়—তাদের পদতল রক্তাক্ত ক'রে দিয়ে—নিজ রক্তের অলক্তরাগে তারা পা দু'টি রাঙিয়ে নাচে—দেবতার ক্রোধ উপশম করবার ব্যর্থ-প্রচেষ্টায়।...

মাদলের পর মাদল যায় টুটে—দুর্ম্মদ আঘাতে—তবু আজও ব্যর্থমনোরথ তারা।...

হাঁড়ি হাঁড়ি 'হাঁড়িয়া' গলাধঃকরণ করে' আবার লেগে যায় তারা—দেবতা-তুষ্টির দানব অভিনয়ে।...

রুক্মিণী দেবীর দ্বারে 'জয়' 'বিজয়'—

মানব-ত্বক্-নির্ম্মিত ঢাক দুটি বাজিয়ে দিয়েছে তারা তাঁর পূজা—তবু তিনি রইলেন বিমুখ।—

আজ তারা তাই এসেছে—মা রুয়াসিনীর দ্বারে—রুষ্ট দেবীর তুষ্টির শেষ প্রচেষ্টায়—বুলু সর্দ্দারের পরামর্শে—

গত রাত্রে পঞ্চায়েতে সর্দ্দার তাদের শুনিয়েছে মা রুয়াসিনীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা।—

বুলু সর্দ্দারের পিতার ঠাকুর্দ্দার ঠাকুর্দ্দার আমলের সে ঘটনা—

মানভূমের ভুঁইয়ারা আসছিল হাজারে হাজারে দলে দলে—সাঁওতালদের সিংভূম জয় কর্ত্তে। ভীত ছত্রভঙ্গ সাঁওতালগণের ক্ষমতা ছিল না তাদের রুখে দাঁড়ায়—সম্মুখে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে ওদের সাথে। সেই দিন তারাও এসেছিল অনোন্যপায় হয়ে—মা রুয়াসিনীর দ্বারে—(আজ যেমন এসেছে তারা)।

সে-দিন মা তাদের কাতর ক্রন্দনে সাড়া দিয়েছিলেন—(আজ দেবেন না তিনি ?)

তিনি তাদের অভয় দিয়েছিলেন যে, সেই রাতটি সারারাত ধরে তিনি গড়ে' তুলবেন—মানভূম ও সিংভূমের মাঝে—অভেদ্য দুস্তর এক প্রস্তর-প্রাকার—কিন্তু ঊষার প্রথম কিরণকণকের চিহ্ন যেই পড়বে এই সূচিভেদ্য অমানিশার আঁধারের বুকে—তখনই তিনি নিরস্ত হ'বেন—এই গঠনকার্য হ'তে!—

সারা রাত সাঁওতালগণ মশাল প্রদীপ নির্ব্বাপিত ক'রে নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে রইলো মার দ্বারে—

কী গহন সে অন্ধকার, কী গভীর সে নিস্তব্ধতা—প্রকৃতি দেবীও বুঝি রুদ্ধ-শ্বাসে দাঁড়িয়ে গেলেন—সেই মহামুহূর্ত্তের মহালীলার বিরাট আয়োজনের সামনে!

গাছের একটীও পাতা নড়লো না—বনে একটি শিবারও ডাক উঠলো না, সকলে যেন সই বিশাল—লীলা-লীলার সামনে মুগ্ধমত্ত হয়ে পড়েছে ; সেই বিরাট শক্তির বৈদ্যুতিক স্পর্শ লেগেছে যেন সেখানকার সব কিছুতেই।

বুলু সর্দ্দারের বাপের ঠাকুর্দ্দার ঠাকুর্দ্দা ভদ্রু সর্দ্দার শুধু রুদ্ধশ্বাসে অপলক-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পূবের পানে—মনে মনে সূর্য্যদেবকে আবেদন জানাতে জানাতে—"হে দেব, তোমার ঐ বিশ্বজয়ী রথের গতি আজ একটু সম্বরণ কর! টান রাশ তোমার অশ্ব-সপ্তকের মুখে!"

সেই মহানিশার মসি-বর্ণ এই বুঝি আসে বিবর্ণ হয়ে! রুদ্ধ শ্বাসে তাকিয়ে থাকে ভদ্রু সর্দ্দার—

বাম-ঘোর আজ করে না বাম-ঘোষণা, রাত্রিও আর বুঝি শেষ হয় না ; এদিকে অধীর হয়ে ওঠে নির্ব্বোধ সাঁওতালের দল—শুধু নিঃশ্বাসটি পর্য্যন্ত তারা জোরে ফেলে না।

ক্রমে পূবের আকাশের মসি-লিপ্ত মুখখানি হয়ে উঠলো ঈষৎ বিবর্ণ ; সে বিবর্ণতা ধরা পড়লো ভদ্রু সর্দ্দারের কঠোর নজরে, হতাশ হয়ে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। টুটে গেল সেই বিরাট নিস্তব্ধতার কুহক-জাল—সকলের চমক্ ভাঙ্গলো, একসাথে সকলে বলে' উঠলো—"মা"।

পূবের আকাশের সেই বিবর্ণ ধূসর আলো পূর্ব্বদিকের উচ্চ পর্ব্বতমালা পার হয়ে যখন তাদের কাছে এসে পৌঁছল, তখন সে আলোয় ধরেছে রক্তরাগ, তার লালিমার খানিকটা ঝাঁপিয়ে পড়লো সাতগুড়ুরের জলের পরে হঠাৎ করে! দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী তখনও রয়েছে অন্ধকারের আবরণে সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে, এই পুঞ্জীভূত বিরাট অন্ধকারের তলে গুড়ুরের জল শুধু লাল লাল!

সাঁওতালগণ অবাক্ হয়ে দেখলো নদীর জলের মাঝখান থেকে উঠেছে এক বিরাট শিলা-স্তম্ভ বহু ঊর্দ্ধে, কিন্তু তার শিখর-দেশ ঘোষণা করছে অসমাপ্তির অসম্পূর্ণতা! মনে পড়ে গেল সকলের মা হুয়াসিনীর বাণী : "উষার প্রথম কিরণ-রেখা যেদিন পড়বে বেই এই সূচিভেদ্য অমানিশার অন্ধকারের বুকে, তখনই নিরস্ত হব এই গঠনকার্য্য থেকে"—

ভূলুণ্ঠিত হয়ে বার বার প্রণাম জানাল সকলে মাকে।

"মাগো আজ তুই মুখ রাখলি, মান রাখলি তোর ভদ্রু বেটা! নে মা নে ভদ্রুর বুক চেরা রক্ত।" তার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে হাড্ডের খড়্গের খোঁচায় দিল বুক চিরে ভদ্রু সর্দ্দার! ঝর ঝর ক'রে ঝরে পড়লো অজস্র রক্তধারা তার বুক হতে, আর ঝরলো অঝোরে আনন্দধারা তার নয়ন হ'তে!—

মানভূমের ভূঁইয়ারা আর কখনও পারেনি অগ্রসর হ'তে সিংভূমের দিকে। সেই অবধি 'মা হুয়াসিনী' বসে আছেন সেই স্বল্পপরিসর গিরিপথটুকু আগলে!

এ গল্প শুনেছে সাঁওতালগণ বহুবার ইতিপূর্ব্বে, কিন্তু কখনও ত তা' এমন করে' তাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি—আজ যেমন করল—আজ যেমন করল বুলু সর্দ্দারের মুখে এ কাহিনী শুনে!

আজ তারা এসেছে হুয়াসিনীর দ্বারে, আর তাদের বুলু সর্দ্দার কাতর কণ্ঠে নিবেদন জানাচ্ছে, "মা বলে দে! দে মা বলে—কী চাই তোর? কিসে মিটবে তোর এই সর্ব্বনাশী সর্ব্বগ্রাসী বুভুক্ষা?"

মার বাণীর আশায় সকলে রয়েছে দাঁড়িয়ে নতনেত্রে রুদ্ধ শ্বাসে—

হঠাৎ সর্দ্দার চীৎকার করে বলে উঠলো—"কি? রাজার যে সব চেয়ে প্রিয়? মা গো মা দেবো! দেবো!! তাই দেবো তোকে!!—শুধু নে মা তোর আরক্ত রোষ-কষায়িত লোচন ফিরিয়ে!"—প্রণাম করে' উঠে সর্দ্দার হেঁকে উঠ্‌লো—"ওঠ, ওঠ সব, ওঠ—চল্ জোরসে চল্ আর এতটুকুও সময় নষ্ট করিস্ না—রাজার কাছে যেতে হ'বে!—সেকি আর এখানে? যেতে হবে অনেক কোশ—তবে না ধলভূম!"

গাঁয়ে ফিরে এসে সর্দ্দার সকলকে জানিয়ে দিল—আজ তাদের দুঃখ-নিশার অবসান হ'লো! 'মা হুয়াসিনী' তাকে জানিয়েছেন—তাদের গাঁয়ের আবার মঙ্গল হ'বে!—তাদের রুক্ষ শুষ্ক ক্ষেত আবার হ'য়ে উঠবে শস্য-শ্যামল।

তাদের খানা-ডোবা সব আবার জলে ভরে' উঠবে!

তাদের গোয়াল আবার উঠবে ভরে গাই-বলদে!

গাছে গাছে আবার ফুটবে মহুয়ার ফুল—গন্ধে দশদিক আকুল হ'য়ে উঠ্‌বে!

শুষ্ক শালের ডালে আবার গজাবে কচি পাতা।

মাঠে মরা চারা আবার উঠে দাঁড়াবে মাথা তুলে! তাদের উঠানে মাঠে আবার চরে বেড়াবে শূকর, ছাগল, হাঁস, মুর্গির দল।

তাদের প্রাঙ্গণে আবার হাসবে শিশু খল্ খল্ ক'রে তাদের ক্ষীণকায়া স্বল্পতোয়া সোনার নদী—আবার দুকূল ভাসিয়ে যাবে কল্ কল্ বেগে!—

"আর তোদের দুখ্ খু থাকবে না রে! নে খা তোরা হাঁড়িয়া পেট ভরে—ভাঁটি আন লুঠ করে'—বাজা-বাজা! মাদল বাজা!!"

ঘরে ঘরে সে আনন্দ-মন্ত্রে বেজে উঠলো মিলিত-কণ্ঠে জয়নাদ—"জয় মা হুয়াসিনীর জয়!"

সর্দ্দার চল্‌লো ধলভূম গড়ের দিকে কয়েকটি মাত্র অনুচর নিয়ে রাজার সন্নিধানে। যতই অপ্রিয় হোক্ না তাদের এই অভিযান, তবু তাদের যেতে হ'বে এগিয়ে—বহুর মঙ্গলের জন্য দিতে হ'বে বলিদান রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জনকে!—বড় ভাল তাদের এই রাজা—চিরানন্দ অমায়িক! কখনও কোন অবিচার করেননি, এতটুকু ক্ষতি করেন নি কোন প্রজার। এই রাজাকে গিয়ে শোনাতে হ'বে এই নিদারুণ বাণী!—না না, এ যে মার বাণী—এ অশুভ হ'তে পারে না! শুভ! শুভ!—

রাজবাটীর দ্বারে সর্দ্দার শুনলো রাজা গৃহে নাই, গেছেন মৃগয়ায়—

সর্দ্দার চল্‌লো অন্দরের দিকে। অন্তঃপুরে আঙিনায় রাণী ছিলেন বসে, একমাত্র শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে—সর্দ্দারকে দেখে অজানা ভয়ে দুরু দুরু কেঁপে উঠলো তাঁর মাতৃ-হৃদয়। বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরলেন তিনি পুত্রকে—বিহ্বল নেত্রে তিনি রইলেন

চেয়ে সর্দারের পানে ! রুদ্ধ বেদনায় তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল—কোন প্রশ্নই তিনি শুধাতে পারলেন না !

সর্দার প্রয়োজনাতীত জোর কণ্ঠে শুনাল তার অমোঘ বাণী—"রাণী মা, তোমার মহুয়াকে আমাদের চাই"—

ব্যাকুল কণ্ঠে রাণী বল্লেন—"আমার ম-হু-য়াকে ? কেন ?"

"মা হুয়াসিনীর আদেশ—গাঁয়ের পর গাঁ আমাদের শেষ উৎসন্ন হয়ে,—মা জানিয়েছেন, রাজার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় যে, তাকে দিতে হ'বে বলি মার দ্বারে—তবেই শান্ত হ'বে তাঁর এই সর্ব্বনাশী ক্রোধ !"

এই বলে এগিয়ে গিয়ে সর্দার ধর্‌লো মহুয়ার ছোট্ট ফুলের মত নরম একখানি হাত। মহুয়া ভয়ে জড়িয়ে ধর্‌লো মার কণ্ঠ, ক্ষুদ্র বাহুটি দিয়ে !

রাণী ডুকুরে কেঁদে উঠলেন, বল্লেন—"ভুল করছ সর্দার !—মস্ত ভুল করছ—মহুয়া রাজার সবচেয়ে প্রিয় নয়"—

বাণীকে বাধা দিয়ে সর্দার বলে' উঠলো—"না, ভুল আমি কর্‌ছি না, মহুয়া রাজার একমাত্র সন্তান,—বংশধর। সেই ত রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়"—সজোরে রাণীর কোল হ'তে নিল সে মহুয়াকে ছিনিয়ে—

শিশুর ও জননীর যুগপৎ ক্রন্দনে ভরে উঠলো আকাশ বাতাস

রাণী চীৎকার ক'রে কেবলই বলতে লাগলেন, "না-না মহুয়া নয়—আমি ! আমি !"—ক্রন্দনাকুল জননীর অবশ দেহ লুটিয়ে পড়লো প্রাঙ্গণ 'পরে।

গৃহাভিমুখী রাজার কানে পশেছিল রাণীর সে ব্যাকুল রোদন—ক্ষিপ্রপদে এলেন তিনি এগিয়ে রাজবাটি পানে। এক হাতে তাঁর তীর ধনুক অন্য হাতে মৃগয়ালব্ধ একটি পাখী মহুয়ার জন্য—আদরিণী রাণীকে ভূলুণ্ঠিতা দেখে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। রাণী রাজাকে দেখে বলে উঠলেন, "মহুয়া ! মহুয়া ! আমার মহুয়াকে ওরা নিয়ে গেল। ওগো আন ফিরিয়ে ! ফিরিয়ে আন আমার বাছাকে।"

ব্যথিত হৃদয়ে রুদ্ধকণ্ঠে রাণী জানালেন রাজাকে সব কথা, তারপর ব্যাকুল নয়নে রাজার পানে তাকিয়ে বললেন," এনে দাও, ওগো এনে দাও আমার বাছাকে ফিরিয়ে—ওরা ভুল করেছে—ওরা জানে না, আমি জানি, মহুয়া তোমার প্রিয়তম নয়—আমি আমিই তোমার প্রিয়তম !"

রাজা পড়লেন উভয় সঙ্কটে। এ কি অগ্নিপরীক্ষা—ভগবান ! মহুয়া—একমাত্র নয়নানন্দ পুত্র, প্রিয় বড়ই প্রিয় সে, হতো-প্রিয়তো একমাত্র সেই প্রিয়তম—যদি না রাণী হ'তেন তাঁর প্রিয়তম।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থেকে তিনি রাণীকে সান্ত্বনা দিলেন—"রাণী, ওরা ভুল করেনি, সত্যই তো মহুয়া আমার বড়ই প্রিয়—একমাত্র সন্তান—বংশধর !—মার আদেশ মানতেই যে হ'বে রাণী।"

ক্ষিপ্তপ্রায় রাণী চীৎকার করে বললেন, "তুমি ভোলাবে আমাকে ? জানি না আমি তোমার চোখের ভাষা ! বুঝি না আমি তোমার অন্তরের কথা ! মহুয়া প্রিয়তম নয়—আমি, আমিই তোমার প্রিয়তম !"

নিমেষমধ্যে রাণী দৌড়িয়ে বাহির হ'লেন পথে,—রাজা নানা প্রকারে তাঁকে শান্ত কর্তে চেষ্টা কল্লেন—কিন্তু সবই বিফল হ'ল। সন্তান-হারা নারী না মানে দেশাচার, না মানে শোভন-অশোভনের বিচার। সে ক্ষিপ্তপ্রায় ছুটতে থাকে শুধু সামনের পথে—যে পথে নিয়ে গেছে তারা, তার বুক হ'তে ছিনিয়ে তাঁরই বুকের ধন !

*

রাণীর কোমল চরণ দু'টি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল—যে পথে গেলেন, সে পথে ঝরে পড়লো না বটে তাঁর হৃদয়-মথিত রক্ত-ধারা—কিন্তু ক্ষত-বিক্ষত তাঁর পদতলের, রক্ত-রেখা লিখে গেল, মাটি-মার বুকের পরে সন্তানহারা জননীর অন্তরের ব্যথা।

পথের শেষ নেই—রাণী ছুটেছেন তো ছুটেছেনই। তাঁর অন্তরের যে অপত্যস্নেহধারা ছুটেছে, খরস্রোতা নদীর মত ধেয়ে তাঁর বুকের ধনের পানে—সেই স্নেহধারাই দিচ্ছে তাঁকে জুগিয়ে এই অমানুষিক শক্তি—তার সন্তানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে !

*

মা হুয়াসিনীর সম্মুখে যূপকাষ্ঠে নিস্পন্দ দেহে পড়ে আছে মহুয়া—

উত্তোলিত খড়্গ হস্তে সর্দার মাকে জানাচ্ছে নিবেদন, "মা, তুই যা চেয়েছিলি তাই এনেছি মা ! নে মা ! গ্রহণ কর ! তুষ্ট হ'। তোর আদেশ মত এনেছি, রাজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়-বস্তু বলি দিতে তোর কাছে।"

পাগলিনী রাণী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মহুয়ার উপর, বুকের মাঝে তাকে আড়াল ক'রে দিলেন, নিজ মরাল-গ্রীবা বাড়িয়ে দিলেন যূপকাষ্ঠে। শেষ শক্তিটুকু দিয়ে বল্লেন, "ভুল করেছ, সর্দার, ভুল করেছ ; মহুয়া নয় ! আমি আমিই রাজার প্রিয়তম !"

নিমিষের মাঝে সর্দারের নিদারুণ খড়্গ পড়লো রাণীর কোমল গ্রীবার ওপর ! লুটিয়ে পড়লো মার-দ্বারে জননীর ছিন্ন মস্তক !!

বাঙালী

গোপাল বটব্যাল

বাঙালী তুমি কি এতো হীন জাতি
জগৎ-সভায় অপাংক্তেয় ?
সারা বিশ্বের দরবারে তুমি
হয়েছো আজিকে এতোই হেয় ?
কোথা গেল তব বিজয়সিংহ
সে দিগ্বিজয়ী নাবিকদল—
সাগরের বুকে ভাসালো যাহারা
অর্ণব যতো অচঞ্চল ?
কোথা সে প্রতাপ, কোথায় কেদার
ইতিহাস সব হল কি লীন ?
ক্ষণেক থমকি ভেবেছো বাঙালী
কোথা গেল সেই সোনার দিন ?
তুমি মর নাই, মরিতে পার না,
অভিশাপ শুধু শতাব্দীর :
পঙ্গু তোমারে করিয়া রেখেছে,
চোখে তাই ঘুম বিপ্লবীর।
তোমার নয়নে হইবে জ্বালাতে
তীব্র দাহন বহ্নিশিখা ;
ঘুম থেকে জাগো, ললাটেতে পরো
বিপ্লব-রাঙা রক্তটীকা।
ভেঙে ফেলো সব, কর চুরমার
শৃঙ্খল যতো তারে গুঁড়াও,
চিরবিপ্লবী মৃত্যুর পণে
দৃঢ়-মুষ্টিতে অস্ত্র নাও।
মানুষের মত যদি নাহি পারো
বাঁচিবারে আজি, মৃত্যু ভালো।
ধ্বংস-আগুনে ইন্ধন দাও,
জ্বলে পুড়ে যাক, আগুন জ্বালো।
বিদেশের দূর প্রান্তর হ'তে
নেতাজী ও তার সেনানী-দল
যে স্বাধীনতাকে স্বপ্নে দেখেছে
ডুবে যাবে সে কি সাগরতল ?
ফাঁসির মঞ্চে রজ্জুর ফাঁস,
মণিপুরে পূব পাহাড়তলী,
সাক্ষী তাহারা বীর যোদ্ধার,—
জীবন যাহারা দিয়েছে বলি ?
সে তুমি—তোমার আত্মা অজেয়
মুক্তি-তৃষায় সে থরো থরো,
অপূর্ণ কাজ পূর্ণ করিতে
সারথি তোমার বল্গা ধরো।
সমাধি-মগ্ন হে বাঙালী ওঠো,
বিলাস-শয্যা পুড়ায়ে দাও।
যাযাবর মত মন্ত্রসাধনে
তোমার অস্ত্র তুলিয়া নাও।

এই সকাল

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

কি নির্বোধ !
এই সকাল এমন রোদ
ভেসে এক টুকরো ঢেউ
হারায় কেউ ?
শিউলি বন
জাগালো মন।
কি উল্লাস !
কাশ-বনে বনে দোদুল কাশ !
কি অন্যায় ! কি অন্যায় !
জীবনের পটে হঠাৎ দাগালো এই সকালের অপব্যয় !
সত্যি নয় ? এই সকাল ফাঁকা খালি ?
আকাশে মাটিতে পাতালো মিতালি
সত্যি নয় ? কে বলে নয় ?
দাও ভেঙে : দাও ভেঙে তবে এ সংশয় !
জিজ্ঞাসা : এই সকাল আর পাবে !
ঠুনকো আঘাতে ঢেউএর মতন ভেঙে যাবে।
কি মায়া-জড়ানো স্মৃতিভারে নত এই সকাল
ছাড়বে নাও, তুলবে পাল—
তারপরে, ছায়ায় মায়ায়
ঝাপসা চোখের সামনে হারায়
এই সকাল : কাঁচা রোদ-ঢালা এমন সত্যি এই সকাল !

চণ্ডীতলা

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

সরস্বতী নদীর বর্ত্তমান অবস্থা। ইউরোপীয় লেখকগণ এই নদীকে 'সতের্গা রিভার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চণ্ডীতলা হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন স্থান; শ্রীমন্ত সওদাগর প্রতিদিন যে চণ্ডীদেবীর পূজা করিতেন, সেই দেবী অদ্যাপি এইস্থানে বিদ্যমান আছেন এবং ঐতিহাসিকগণ উক্ত চণ্ডীদেবী হইতেই এই স্থানের চণ্ডীতলা নামকরণ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুদূর অতীত কাল হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম ভারতের প্রসিদ্ধ শহর ও ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের প্রধানতম বন্দর এবং সরস্বতী নদী তৎকালে সমুদ্র-যাত্রার একমাত্র পথ ছিল। সরস্বতী-তীরবর্ত্তী এই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানটি বর্ত্তমানে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিলেও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ইউরোপীয় উপনিবেশকারিগণ ভাগীরথীতীরে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত শিয়াখালা, জনাই-বাক্সা, কৃষ্ণরামপুর প্রভৃতি স্থানগুলি ধনাঢ্য, সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের লীলাভূমি ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন; সেই সময় শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দুদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার সাহায্যে সংস্কৃত-সাহিত্য ও দর্শনাদির নানারূপ গবেষণা হয়। তাঁহার উজীর গোপীনাথ বসু ওরফে পুরন্দর খাঁ এই স্থানের শিয়াখালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গোপীনাথ প্রথম জীবনে বঙ্গেশ্বরের অধীনে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং নিজ বীরত্বে নবাবকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার সেনাপতি হন। পরে, পুরন্দর নামক স্থানে নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন বলিয়া গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে "পুরন্দর খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র তাঁহার "পুরন্দর খাঁ" নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল:

"পুরন্দর খাঁ হোসেন শাহের একজন প্রধান মন্ত্রী এবং রূপ ও সনাতন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। পুরন্দর দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশোদ্ভব ও মাহীনগর সমাজের বসুবংশের সমুজ্জ্বল রত্ন। বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত চণ্ডীতলা থানার অধীন কৌশিকী-নদী-সনাথ সেয়াখালা গ্রাম পুরন্দরের জন্মস্থান। এক্ষণে কৌশিকীর অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র আছে।

যে নদীপথ দ্বারা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শ্রীমন্ত সওদাগর পোতে গমন করিয়া মগরায় মহাঝড় ও বৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে সমুদ্রপথ দ্বারা সিংহলে গিয়াছিলেন, সে নদীর এক্ষণে চিহ্নমাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান ভাগীরথী, কালীঘাট উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে টালীর নালায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সরস্বতী ও রূপনারায়ণের খাঁড়ী এক্ষণে ভাগীরথীর পরিদৃশ্যমান মুখ এবং তাহা ইংরাজবাহাদুর-কর্ত্তৃক হুগলী নামে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ভাগীরথীর মুখ নহে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে খিদিরপুর হইতে সাঁখরাল পর্য্যন্ত নদীর চিহ্নমাত্র ছিল না। ভাগীরথীর সহিত সরস্বতীর যোগ প্রথমতঃ একটি খাল কাটিয়া সম্পাদিত হয়। জলপ্রবাহে ঐ খাল ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে 'কাটিগঙ্গা' হইয়াছে। 'কাটিগঙ্গা' এক্ষণে হুগলীর একাংশ।"

পুরন্দর অত্যন্ত মেধাবী, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা গোবিন্দ বসু ও প্রাণবল্লভ বসু, উভয়েই নবাবের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং নবাব তাঁহাদিগকে "গন্ধর্ব্ব খাঁ" এবং সুন্দরবর খাঁ" উপাধি দেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বঙ্গভাষায় বহু রচনা অদ্যাপি তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিতেছে। নবাব হোসেন শাহ তাঁহার রচনায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে 'যশরাজ খান' উপাধি দেন বলিয়া, নগেন্দ্রনাথ বসু 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। পুরন্দরের জ্ঞাতি ভ্রাতা মালাধর বসু ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামক অমূল্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করায় নবাবের নিকট হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন। মালাধর বসুর পৌত্র রায় রামানন্দের নাম বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত। ইনি দ্বারকা নগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সহিত পর্য্যটন করেন এবং মহাপ্রভু ইহাকে 'মিত্র' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রায় রামানন্দ উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং 'জগন্নাথ-বল্লভ' নামক নাটক রচনা করেন।

পুরন্দর খাঁ "শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল" নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন, নিম্নে উক্ত পুস্তক হইতে দুই লাইন উদ্ধৃত হইল; এই

ভনিতা হইতে তিনি যে "যশরাজ খান" উপাধি পাইয়াছিলেন, তাহাও দৃষ্ট হয়।

"শ্রীযুত হুসেন জগতভূষণ সোহ এ রসজান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশরাজ খান।"

পুরন্দরের অন্যতম জ্ঞাতি পরমানন্দ বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া নিজ বাহুবলে সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন

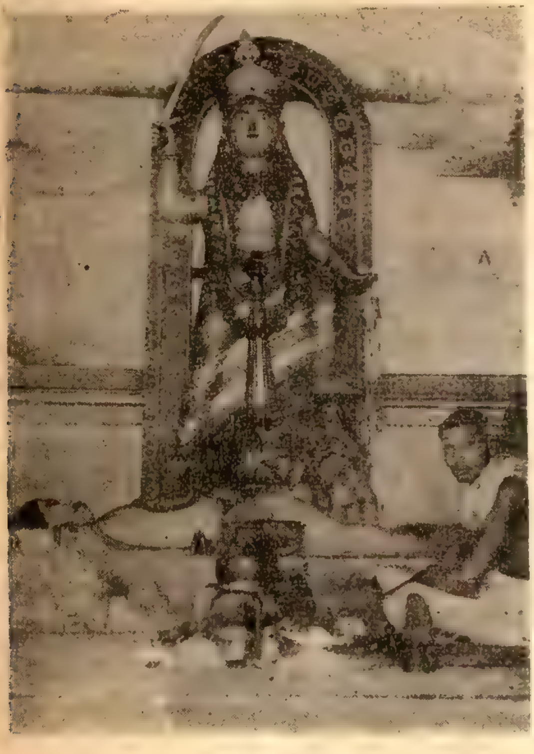

শিয়াখালায় উত্তরবাহিনীর বিগ্রহ

"বসুবংশ ছত্রধারী, চন্দ্রদ্বীপের অধিকারী" এই প্রবাদবাক্য আজও সমগ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা' শীর্ষক গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতেছি :

"হোসেন সার পূর্ব্বে গৌড়ের রাজসরকারে উচ্চতর বিভাগে রাজকার্য্যে হিন্দুর নিয়োগের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্যাত-নামা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু হোসেন সার উজীর ছিলেন। ইনি পুরন্দর খাঁ উপাধি লাভ করেন। বর্ত্তমান হুগলী জেলার সেয়াখালা গ্রাম পুরন্দর খাঁর জন্মস্থান। অদ্যাপি তথায় পুরন্দরনগর বিদ্যমান আছে। পুরন্দর খাঁর পিতামহও গৌড় সরকারে চাকুরী করিয়া সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।"

গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ বাল্যকালে পুরন্দরের পিতামহ সুবুদ্ধি খাঁর অধীনে চাকুরী করিতেন এবং সুবুদ্ধি খাঁর চেষ্টায় হুসেন রাজ-সরকারে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে, স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি-প্রভাবে তিনি বঙ্গের রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন। এই সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তাঁহার History of India নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি :

"Hussen had been in early life the servant of a Kayastha officer of the state named Subudhi Khan. He entertained great respect for the Hindoos, two of whom Rup and Sanatan had high offices under him."

শিয়াখালায় 'পুরন্দর-গড়' ব্যতীত পুরন্দরের স্মৃতিচিহ্ন কিছু না থাকিলেও, বহু প্রাচীন মন্দির শিয়াখালার পূর্ব্ব-গৌরব আজও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। শিয়াখালার উত্তর-বাহিনী দেবীর মন্দির হুগলী জেলায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় চৌধুরী-বংশ এই বিগ্রহের সেবায়েত; বর্ত্তমান প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তিটি ডাঃ যামিনীকান্ত বলের চেষ্টায় নির্ম্মিত হয়। উত্তর-বাহিনী জাগ্রতা দেবী, এবং দেশদেশান্তর হইতে বহু নরনারী উঁহার পূজা দিবার জন্য এইস্থানে সমবেত হন। প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে, স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় বর্ত্তমান গৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছে। দেবীর প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি এই অঞ্চলের একটি বিশেষ দর্শনীয় বস্তু।

শিয়াখালার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম মশাটও এক সময় সমৃদ্ধ জনপদ ছিল এবং এইস্থানের মিত্রবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। এইস্থানের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল মিত্র বিশ্বেশ্বরের মন্দির সংস্কারার্থে এবং একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন। রমানাথপুরের স্বর্গীয় সত্যপ্রিয় পাল এবং তাহার ভ্রাতা কুমিরমোড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ পাল, স্বর্গীয় আশুতোষ পাল এবং ননীলাল পালের স্মৃতি রক্ষার্থে কুমিরমোড়া গ্রামে "আশুতোষ ননীলাল উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শিয়াখালা, গরল-গাছা এবং জনাই গ্রামেও উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় বহুদিন যাবৎ আছে; তন্মধ্যে জনাই গ্রামের বিদ্যালয়টি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

চণ্ডীতলার নিকট গরলগাছা গ্রামে হাইকোর্টের বিচারপতি এবং বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভার সভাপতি স্বর্গীয় স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টার মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জী এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ পি, সি, কুমার তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেব শ্যামাচরণ কুমারের স্মৃতিরক্ষার্থে চণ্ডীতলায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত দাতব্য-চিকিৎসালয়ের স্যার শিবপ্রসাদ সিংহ রায় কর্ত্তৃক উদ্বোধন হয়। হুগলী জেলা-বোর্ড বর্ত্তমানে ইহার তত্ত্বাবধান করেন।

সরস্বতীতীরবর্ত্তী বুইতা গ্রামে বেহুলা লখীন্দরের ঘট-স্থাপিত চণ্ডীদেবী একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষমূলে এরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, বৃক্ষের শিকড়গুলি ঘটটিকে আবৃত করিয়া যেন একটি গৃহমধ্যে রাখিয়া

দিয়াছে। দেবীর সেবার জন্য বহু জমিজমা ছিল। পরবর্ত্তী কালে পৃথক্ ব্রাহ্মণের উক্ত বৃক্ষমূলে উঠিয়া পূজা করিতে অসুবিধা

বাক্সা গ্রামের 'দ্বাদশ শিবমন্দিরের' প্রথম ছয়টি মন্দিরের চিত্র।

হওয়ায় বর্ত্তমান গৃহে ঘটস্থাপিত চণ্ডীদেবীকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

চণ্ডীতলার নিকটবর্ত্তী জনাই এবং বাক্সা গ্রাম বহু সম্ভ্রান্ত বংশ এবং অসংখ্য দেবালয়ে সুশোভিত; জনাই-বাক্সার মধ্য দিয়া সরস্বতী নদী মগরার নিকটবর্ত্তী ত্রিবেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া রাজগঞ্জ অবধি অতি প্রবলা ছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায় এবং বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ এবং বাক্সা গ্রামের মিত্র, চৌধুরী ও সিংহ বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত অনুবাদক মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের আদি নিবাস বাক্সা গ্রামে; পাটনার চীফ্ মিঃ মিডল্টন ও স্যার টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

জনাই মুখোপাধ্যায়-বংশের কীর্ত্তি-কলাপ এই অঞ্চলে বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ; এই বংশের ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে মুৎসুদ্দির কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন এবং হিন্দুধর্ম্মোক্ত বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহার পুত্র রামজয় ওরফে কালীবাবু চাতরায় একটি ঘাট এবং কাশীতে একটি মঠ এবং শিব স্থাপনা করেন। তাঁহার ভ্রাতা জগন্নাথ, চণ্ডীতলা হইতে জনাই পর্য্যন্ত এই চার মাইল রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া বেহুলা-লখীন্দরের চণ্ডীর দেউল দেখিবার পথ সুগম করিয়া দেন। কলিকাতায় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এই পরিবারের পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জনাই গ্রামে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্বন্ধে ১৮৫৮ সালের 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' (১৬ই জুন) পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল:

"২৯শে মে ১৮৫৮ সালে জনায়ের জমিদার বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও ব্যয়ে তাঁহার নিজ বাটিতে "শকুন্তলা" নাটক অভিনীত হয়। ১৮৫৭ সালে কলিকাতায় নূতন থিয়েটারগুলি দেখা দিবার পর বৎসরই তিনি জনাই গ্রামে তাঁহার নিজ বাটিতে একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন"।*

দ্বাদশ শিবমন্দিরের দ্বিতীয় ছয়টি মন্দির।

এই বংশের রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ১২৪০ সালে পরলোক গমন করিলে 'সমাচার-দর্পণ' পত্রে (১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪০) বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করা হয়। উক্ত পত্রে লিখিত হয় যে, "তাঁহার রূপ, গুণ, দয়া-ধর্ম্মাদি স্মরণ হওয়াতে নয়ননীরে পত্র আর্দ্র হইতে লাগিল। শীলতা ও লোকলৌকিকাতায় কি পর্য্যন্ত লোককে তিনি সন্তুষ্ট করিতেন;-তাহা যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইয়াছে, তিনিই জানেন।" প্রসিদ্ধ পার্ব্বতী মুখোপাধ্যায় এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

জনায়ের গঙ্গোপাধ্যায়-বংশের রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় হাজারিবাগ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তাহার পৌত্র কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় Reis & Rayet পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং বর্দ্ধমানের মহারাজা কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া 'সাহিত্যরথী' বলিয়া প্রসিদ্ধ হন ও ভারত সরকার হইতে অতিরিক্ত মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া বৃত্তি পান। ইহার পুত্র হরিচরণ শাস্ত্রী রিপণ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, পরে ল-কলেজে হিন্দু আইনের অধ্যাপনা করেন এবং রঘুবংশ ও ভট্টির কলেজ-সংস্করণ প্রকাশ করেন।

এই স্থানের 'মনোহরা' সন্দেশ বঙ্গবিখ্যাত, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভীমনাগের আদি নিবাস এই জনাই গ্রামে। কলিকাতায় ইংরাজ রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর, তাহার পিতা পরাণচন্দ্র নাগ কলিকাতার বৌবাজার অঞ্চলে প্রথম ব্যবসা আরম্ভ করেন। ভীম নাগের পুত্র আশুতোষ মোদক-সমাজের উন্নতিকল্পে মোদক-সমাজকে একত্রে সম্মিলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন।

বাক্সা চৌধুরী পরিবারের স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ এ্যাডভোকেট এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি-কলাপাদি রক্ষাকল্পে

* জনায়ের নাট্যশালার বিষয়, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিত Indian Stage Vol, I, নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

প্রতি বৎসর গ্রামে আসিয়া তিনি বস্ত্র বিতরণাদি করিতেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চৌধুরী, তাঁহার স্বর্গত পিতা শ্যামাপদ চৌধুরীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্থানে শ্যামাপদ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন এবং হুগলী জেলা-বোর্ড বর্ত্তমানে ইহার তত্ত্বাবধান করেন। বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই বংশে জন্ম

ভ্রুকুটরায় মিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাক্‌সা গ্রামে
শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর মন্দির।

গ্রহণ করিয়াছেন এবং দোল-দুর্গোৎসবাদি প্রাচীন কালের ন্যায় অদ্যাপি এই বংশে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

সিংহ পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। জোড়াসাঁকোতে পরবর্ত্তী কালে তিনি বসবাস করিলেও অদ্যাপি উক্ত বংশের একটি শাখা এই স্থানে বসবাস করেন এবং হিন্দুধর্ম্মোক্ত ক্রিয়াকলাপাদি পূর্ব্বের ন্যায় এই বংশেও অনুষ্ঠিত হয়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ এই পরিবারে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী-সভার প্রতিষ্ঠাই তাঁহার সাহিত্যানুরাগের পরিচায়ক। বঙ্গদেশে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন এবং মালতীমাধব, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। হুতোম পেঁচার নক্সা রচনা করিয়া বাঙ্গালী সমাজের দূষিত চিত্র দেখাইয়া তৎকালে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। এতদ্ব্যতীত পরিদর্শক ও হিন্দু পেট্রিয়ট নামক দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্র পরিচালনা করেন। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বঙ্গের তৎ-কালীন পণ্ডিতবর্গের সাহায্যে তিনি মহাভারতের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে তাহা বিতরণ করেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার বিশেষ দরদ ছিল এবং ইহার প্রসারকল্পে তিনি অজস্র অর্থব্যয় করেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করিলে তিনি তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে কয়েক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন এবং তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহের সম্পাদনা ত্যাগ করিলে, তিনি কিছুকাল যোগ্যতার সহিত উক্ত পত্র সম্পাদনা করেন। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায়, রেভারেণ্ড লং সাহেবের একমাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। কালীপ্রসন্ন উক্ত অর্থদণ্ড প্রদান করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিলে তিনি নিজ বাটিতে এক সভা আহ্বান করিয়া, অমর কবিকে এক অভিনন্দন ও রৌপ্যনির্ম্মিত ক্লারেট পানপাত্র প্রদান করেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ বাটীতে ‘বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার’ প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাবু, বেণী সংহার, ভানুমতী, বিক্রমোর্ব্বশী, রাজা পুরুরবা প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনয় করান এবং স্বয়ং প্রধান ভূমিকায় লক্ষাধিক টাকার বহুমূল্য পোষাক পরিয়া অবতীর্ণ হন। সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বল্প জীবনকাল সাহিত্য-সেবা ও জ্ঞানানুসন্ধানে অতিবাহিত করিয়া মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন।

বাক্‌সা সিংহ পরিবারের স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র সিংহ এবং তাঁহার দুই পুত্র স্বর্গীয় গুরুদাস সিংহ এবং স্বর্গীয় রামচন্দ্র সিংহ দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠিত শীতলা দেবীর মন্দির অদ্যাপি এই স্থানে দৃষ্ট হয় এবং দোল-দুর্গোৎসবাদি হিন্দুধর্ম্মোক্ত ক্রিয়াকলাপ দেওয়ান শান্তি রামের আমলে যে ভাবে হইত, অদ্যাপি সেইরূপ ভাবেই মহা-সমারোহের সহিত এইস্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত এই সমস্ত প্রাচীন বংশগুলিতে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি আছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ম্যালেরিয়ার প্রকোপে কেহই গ্রামে বসবাস করেন না। জঙ্গলা-বৃত অট্টালিকাগুলি দেখিলে পথিকের অন্তঃকরণ বিষাদিত হইয়া উঠে। পুরাকালের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে প্রতি বাড়ীতে অদ্যাপি দুর্গোৎসব হইয়া থাকে; বঙ্গের কোন থানায় এত অধিক দুর্গোৎসব হইতে দেখা যায় না। কিন্তু দুর্গোৎসব হইলে কি হইবে, সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায় পূর্ব্বের সে শ্রী যেন চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে; ভবিষ্যতে সরস্বতী

কাটাইয়া জল নিকাশের সুব্যবস্থা না করিলে এই অঞ্চলের গৌরব-রবি যে পুনরায় উদিত হইবে না, তাহা সুনিশ্চিত।

জনাই গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বদিকে বাক্‌সা গ্রামের শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর নবরত্নের সুবৃহৎ মন্দির বঙ্গের প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। বাক্‌সার মিত্রবংশোদ্ভব দেওয়ান ভবানীচরণ মিত্র ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রত্যেকটি মন্দির ষাট ফুট উচ্চ এবং প্রতি বৎসর এই স্থানে চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় লক্ষাধিক লোক উহাতে যোগদান করেন। সরকারী গ্রন্থে দ্বাদশ মন্দির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :

"The monument consists ot twelve temples built all in a line on the bank of the Saraswati river. They are all of the same size and in height nearly sixty feet. Adjoining the temples there is a large tank with a magnificient masonry ghat with seats all round. They are all dedicated to Siva named Isanesvar. They were built by Bhabani Charan Mitra in 1187 B. S. corresponding to A. D. 1780. In honour of the Siva an annual fair or mela is held on the ground adjoining those temples on the last day of the Bengali year, which is resorted to numerously by the people of the neighbouring villages."

বাক্‌সার রঘুনাথজীউর রথের ন্যায় সুবৃহৎ নবরত্নের মন্দির স্থাপত্য-শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এইরূপ মন্দির বঙ্গদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ভ্রূকুটরাম মিত্র এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার দৈনিক সেবার জন্য তিনি বহু জমি দান করিয়া যান। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব তাঁহার Statistical account of Bengal নামক গ্রন্থে এই মন্দির সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। নিম্নে List of Ancient Monument in Bengal নামক সরকারী গ্রন্থে রঘুনাথজীউর মন্দির সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত হইল :

Temple of Raghunath—This is a big temple with nine pinnacles of the present car fashtion dedicated to the. God Raghunathji. It was built by Bhurkut Ram Mitra in the Bengali year 1199, corresponding to A. D. 1792.

দেওয়ান বাণীচরণ মিত্র পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শিবমন্দির ব্যতীত গ্রামের মধ্যে আরও ছয়টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি করিয়া তিনটি বিভিন্ন স্থানে উক্ত মন্দিরগুলি বিদ্যমান আছে। চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বহু গ্রামে প্রায় শতাধিক শিবের প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি দৃষ্ট হয় ; ইহা হইতে এই অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল হইতে শৈব ধর্ম্মের যে প্রতিপত্তি ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা সুদূর অতীত কাল হইতে এই স্থানে প্রচলিত থাকিলেও, সেন রাজাগণের সময় হইতেই শৈব ধর্ম্মের এইস্থানে প্রাদুর্ভাব হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার চণ্ডীকাব্যে শিবপূজা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল :

"যেই জন চন্দনে করয়ে শিবপূজা।
কত জন্ম অবনীমণ্ডলে হয় রাজা॥
শিবের মন্দিরে যেবা করে শঙ্খধ্বনি।
অভিপ্রায় বুঝি তার শিব হয় ঋণী॥
চামর ঢুলায় যেবা হরি সন্নিধানে।
স্বর্গলোকে চলি যায় চড়িয়া বিমানে॥"

বাক্‌সা গ্রামে সরস্বতীনদীতীরস্থ শ্মশানের পাকাঘর স্বর্গীয় যদুনাথ মিত্রের পুত্র, স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মিত্র ১৩১৭ সালে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। শ্মশানের আচ্ছাদন-গৃহের গাত্রে প্রস্তরফলকে নিম্নোক্ত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে :

পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺যদুনাথ মিত্রের পরলোকগত স্মৃতিতে এই আচ্ছাদন প্রতিষ্ঠা করিলাম। ইতি তাং ২২শে মাঘ, সন ১৩১৭ সাল। সেবক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র। বাক্‌সা বিদ্যালয় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত চৌধুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

মিলন-বিরহ

শ্রীমন্মথনাথ সরকার

সব চেয়ে মোর সেই বুঝি পর
ভালবাসি যারে প্রাণ ভ'রে।
শত শত ডোরে বেঁধে বেঁধে আজো,
পারি না বাঁধিতে শেষ ক'রে।
যত কাছে পাই আরো কাছে চেয়ে—
দূরে রাখি হায় বাসনায় ছেয়ে—
সব চেয়ে ব্যথা সেই দিতে পারে,
রাখি যারে আমি বুকে ধ'রে।

পাওয়ার মাঝেই হারিয়ে যে যায়—
আমার গানের পালা,
দিবা রাতি তাই অশ্রু-আঁধারে,
তার সাথে জেগে থাকি ;
এ যেন আমার মিলন-বিরহ—
প্রাণপণে তাই সহি অহরহ,
মিলনের মত কি আছে মিলন
আমার জীবনে দাও গড়ে'॥

রঙ একই

কানাই বসু

"তুমি কে?"

"তুমি কে গো, বল না?"

"আমায় বলছ? কী বলছ খোকা?"

"তুমি কি মোছলমান?"

"কেন বল তো?"

"আগে বল না, তুমি মোছলমান কি না?"

"কে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বল্লে খোকা?"

"কেউ বলে নি, আমি আপনি জিজ্ঞেস করছি। বল না, তুমি কি আমাকে মারবে?"

"সে কী? তোমাকে মারব কেন বাবা?"

"তুমি আমাকে কেটে ফেলবে না?"

"না, না, কাটব কেন; ছি ছি!"

"দেখলে! ওরা এত মিছি মিছি ভয় দেখায়! বলে ঐ যে দাড়ি আছে ও ঠিক কেটে ফেলবে। আর তাই জন্যে মা আমাকে একবারও ঘর থেকে বেরোতে দেয় না।"

"হা আল্লা!"

"আজ ঠিক হয়েছে, পালিয়ে এসেছি। কোথাও খুঁজে পাবে না মা, হ্যাঁ গো; দাড়ি থাকলে কি ছেলে মানুষদের কাটতে আছে? কাটতে নেই, কেমন? কাটলে বড্ড লাগে, রক্ত পড়ে, না গো? ছোট ছেলেদের কাটতে নেই।"

"না বাবা, কারুকে কাটতে নেই। এ কী হ'ল দুনিয়া! হায়! হায়!"

"তুমি বেশ ভাল লোক। সেই যে আমার জ্যাঠামণি ছিল না? তোমার মতন দাড়ি ছিল; সেই যে? জ্যাঠামণিও খুব ভাল লোক ছিল। কোথায় চলে গেছে, আর আসে না। তুমি দেখেছ জ্যাঠামণিকে?"

"তোমার বাড়ী কোথা খোকা?"

"উই দিকে। বল না, জ্যাঠামণিকে দেখেছ তুমি?"

"তুমি বাড়ী যাবে না বাবা? সন্ধ্যে হয়ে গেল যে। মার কাছে যাবে না?"

হ্যাঁ, বাড়ী যাব। তুমি নিয়ে চল না।"

"কোথায় তোমাদের বাড়ী বাবা?"

"আমাদের বাড়ী জান না? সেই যে, যেখানে মা থাকে, কাকামণি থাকে, জ্যাঠামণিও থাকতো। তারপর বাবা, মিটু, মা সব থাকে, সেইখানে।"

"তোমার মা বাবা কোথায় থাকেন?"

"সব্বাই তো আমাদের বাড়ীতেই থাকে গো। তুমি কিচ্ছু জান না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম। তা এবার তুমি বাড়ী যাও খোকা। অন্ধকার হয়ে এল।"

"আমাকে বাড়ী নিয়ে চল। আমার ভয় করছে।"

"কোন দিকে তোমার বাড়ী, আমি জানি না তো।"

"অই দিকে।"

ও দিকে?"

"হ্যাঁ,"

"না, এই দিকে?"

"হ্যাঁ। এই দিকে। নিয়ে চল না। আমাকে কোলে কর। আমার পা ব্যথা করছে!"

"তাই তো। কোনদিকে তোমার বাড়ী তা তো বুঝতে পারছি না।"

"বল্লুম তো ওই দিকে। আমাকে কোলে নাও না, আমি দেখিয়ে দোব।

"এস। কিন্তু কেউ দেখতে পেলে গোলমাল করবে বাবা, তাই ভাবছি।"

"কী গোলমাল করবে?"

"মেরেই বসবে হয় তো। মারে মারবে, চল।"

"হ্যাঁ, মারবে বই কি। আমি এক ঘুষি লাগিয়ে দেব না? তোমার দাড়িগুলো বেশ নরম, হাত দিতে বেশ লাগে। ঠিক জ্যাঠামণির দাড়ির মতন। কে তোমাকে মারবে বললে না?"

"তোমার বাবাই যদি মারেন।"

"না, আমি বাবাকে বলব, বাবা মেরো না। ও আমার নতুন জ্যাঠামণি হয়। মারতে নেই।"

"যা আছে নসীবে তাই হবে। চল দেখি বাবা তোমাদের বাড়ী খুঁজে দেখি।"

"ঐ তো, ঐ যে একটা ছেলেকে—"

"আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোকুলের ছেলেটাই তো? ঐ যে কোলে করে—"

"ওগো, ঐ তো আমার খোকা, ওগো বাবা তোমরা রক্ষে কর, ঐ যে গুণ্ডা ধরে নিয়ে যাচ্ছে,—ও নিতাই, ওগো ঠাকুরপো—"

"আহা, থামো বৌদি!

"আপনি কাঁদবেন না, ভয় কি —"

"ওরে আমার খোকা রে—"

"এই রে, সব মাটি করলে, শুনতে পেলে এখুনি পালাবে।"

"পালাবে কোথায়? একবার যখন দেখতে পাওয়া

গেছে। আর প্রাণ নিয়ে পালাতে হচ্ছে না। আপনি থামুন, আর যাবেন না, এইখানে দাঁড়ান।"

"উঃ, কী সাহস দেখেছ বেটার! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।"

"ও বাবা খোকা রে—"

"আঃ, কাঁদবেন না, কোন ভয় নেই।"

"ও জ্যাঠামণি, ওখানে অত ভিড় কেন? উই যে ওদিকে—, আরে মা এসেছে, জ্যাঠামণি আমার মা, উই যে, উই লোকগুলোর পেছনে। আমায় নাবিয়ে দাও জ্যাঠামণি? ওমা, এই দেখ আমার কেমন নতুন জ্যাঠা—"

"শালা এখন ছেলে নাবিয়ে দিলেই ভাবছ পার পাবে? পালাবে—"

"ওগো তোমরা মারছ কেন? ওমা আমার জ্যাঠামণিকে মারছে, ও কাকাবাবু—"

"আঃ এটাকে নিয়ে যা না এখান থেকে'।"

"চুপ, কোনও গোল—"

"ওমা আমার জ্যাঠামণি পড়ে মরে গেল গো! না' আমি যাব না, আমায় ছেড়ে দাও, আমি জ্যাঠামণির কাছে যাব। ওগো কেন মারছ—"

"ওটা কী রে? মিলিটারি গাড়ী না কি? বেটারা এমন অসময়ে আসে। পালা, পালা।"

"যাক, আর নড়ছে না। আসুক শালা মিলিটারি। চলে আয়।"

"কোথা যাচ্ছেন? ছ'টা বেজে গেছে। ঘণ্টা পড়ছে শুনতে পাচ্ছেন না? আর ভিজিটার যাবার সময় নেই।"

"পাঁচ মিনিট মেম সাহেব। খালি যাব আর আসব, এই ছেলেটা বড় কাতর হয়েছে। পাঁচ মিনিট।"

"বড় মুস্কিল করেন আপনারা। যান, পাঁচ মিনিটের বেশী দেরি করবেন না।"

"কোথায় যাচ্ছ বাবা? এখানে এলে কেন? জ্যাঠামণি কই?"

"কথা কইতে নেই খোকা, মেম সায়েব রাগ করবে।"

"এরা সকলে শুয়ে আছে কেন বাবা, ও বাবা, দেখ কত ন্যাকড়া জড়িয়েছে ওর মাথায়, এত ন্যাকড়া বেঁধেছে কেন?"

"আঃ, চুপ কর খোকা। মিঞা সাহেব, মিঞা সাহেব কি ঘুমোচ্ছেন?"

"কে? কে আপনি?"

"আমি—আমি—আমি আপনার—কি বলব—"

"বাবু সাহেব, আপনার ভুল হচ্ছে বোধ হয়—"

"না, মিঞা সাহেব, আমি অনেক খুঁজে—"

"ও বাবা, এই তো আমার জ্যাঠামণি গো। জ্যাঠামণি আমি এসেছি—"

"য়্যাঁ, কে? জ্যাঠামণি এসেছ? এসেছ বাপ্‌জান।"

"আহা হা, কী করলেন? উঠতে গেলেন কেন মিঞা সাহেব? শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। এঃ! কী হল দেখুন তো—"

"ও কিছু না বাবু সাহেব! ওরকম কত পড়ছে। ঐটুকুতে শরীর যাবে না।"

"জ্যাঠামণি তোমার মাথায় এত বাঁধা কেন? দাড়ি রাঙা হয়ে গেল যে?"

"মিঞা সাহেব, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। ক্ষমা চাইবার মুখ নেই আমার। আমি ছিলুম না সেদিন কিন্তু আমারই পাড়ার, আমারই আত্মীয়-বন্ধু তো তারা—"

"আমার কাছে ক্ষমা চাইবার কী আছে বাবু সাহেব? দেশ জুড়ে এই কাণ্ড চলছে।"

"আমার স্ত্রী কাঁদছে। খোকা রাতদিন আপনাকে ডাকে, রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও—"

"হ্যাঁ জ্যাঠামণি, তোমার জন্য আমার বড্ড মন কেমন করে! আমি কাকার সঙ্গে আড়ি করে দিইছি, কেন তোমাকে মারলে—"

"খোদা তোমাকে ভাল রাখুন বাবা! বুকটা ঠাণ্ডা হ'ল আমার।"

"আমি আপনার ছোট ভাই, আপনি মার্জ্জনা না করলে আমার খোকা—"

"জ্যাঠামণি—তোমার দাড়িতে রক্ত পড়েছে বুঝি? তাই এত রাঙা হয়েছে, না?"

"না, বাপজান, রক্ত পড়বে কেন। রক্ত পড়ে নি।"

"হ্যাঁ, আমি জানি, আমি বুঝতে পেরেছি ও রক্ত। আমার যেমন একদিন কপাল কেটে গিয়েছিল অমনি লাল রক্ত বেরিয়েছিল—"

"না, না এ রক্ত নয় জ্যাঠামণি।"

"হ্যাঁ, রক্ত। রক্ত না বাবা? নইলে অত লাল কেন? আমি জানি সব রক্তই ঐ রকম লাল টকটকে, ঠিক আমার রক্ত যেমনি লাল, না বাবা।"

"হ্যাঁ খোদা! ঠিক বলেছ জ্যাঠামণি, সব রক্তই এক রকম লাল!"

"আপনি আর কথা বলবেন না। হিমারেজ বন্ধ হচ্ছে না।"

"না হোক নার্স! যানে দিজিয়ে।"

"পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে বাবু, এখুনি ডাক্তার বাবু এসে দেখলে রাগ করবেন।"

"যাই মেম সাহেব। দাদা, আমি অনেক খুঁজে আপনার সন্ধান পেয়েছি। অনেক ভাগ্যে আপনাকে জীবিত দেখতে পেয়েছি। আমাকে মাফ করুন।"

"একটা মাকে কী হবে ভাই সাহেব, ভুল কি একটা হয়েছে ? আগাগোড়া ভুল, সকলের ভুল, তামাম দেশের লোকের ভুল, লক্ষ লক্ষ মাকের দরকার। যদি পারেন তবে ওদের দুই দলকে দয়া করে এই কথাটা শুনিয়ে দিন, জ্যাঠামণি যা শেখালেন সব রক্তই সমান লাল ! সব রক্তই এক।"

"আর সময় নেই। না, আর একমিনিটও নয়। আসুন।"

"এস খোকা।"

"না আমি যাব না। আমি জ্যাঠামণির কাছে থাকব।"

"না জ্যাঠামণি, বাবার সঙ্গে যাও বাবা, আবার কাল এসো।"

"আসি দাদা, চলুন মেমসাহেব।"

"উনি কি আপনার কেউ হন ? না আপনি তো দেখছি—

"হ্যাঁ মেমসাহেব, আমার দাদা !"

"কিন্তু উনি তো—"

হ্যাঁ, আমার দাদা উনি।"

"ও যে আমার জ্যাঠামণি গো।"

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

বাঙালীর নামে একটা অপবাদ আছে যে, তাহারা কাহিনী ও কথায় মজবুত —ইহার কারণ অনেকে বলেন তাহাদের অল্পে সন্তুষ্ট নির্ব্বিবাহ জীবনযাত্রা ও বাংলার প্রাকৃতিক অবস্থা এবং নৈসর্গিক বিচিত্রতা। বাঙলার আকাশে নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি, আষাঢ়ের ঘনবর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও মহিমা, এবং শ্রাবণের দিবারাত্র অবিরাম বর্ষণধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি। ষড়্ ঋতুর বিচিত্র নৃত্যলীলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে বাঙালীর কবিমানসের উৎস কোথায়। শরতের নীলাকাশে কূলে কূলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে, কাশের শ্বেত হাসিতে নদীকূল ভ'রে উঠে, হেমন্তের পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্বের নিরসন মেলে। শীতার্ত্ত কুহেলী রাত্রির অবগুণ্ঠিত মায়াজালে নিদ্রিত ধরণীর যে জড়িমা, মানুষের আশা ও নিরাশার অঙ্কুর তারই মধ্যে প্রথম প্রকাশিত, বসন্তের বাতাসে নূতন উন্মাদনার সঙ্গে নবীন জীবনের সঞ্চার তারই মধ্যে নিহিত। ছয়টী ঋতুর এ বিচিত্র খেলা। প্রকৃতির চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যের সে ঐশ্বর্য্য যে বাঙালীর মনকে কাব্য-জগতে আকৃষ্ট ক'রেছে, তাতে বিচিত্র কি ? কেবলমাত্র ঋতুর লীলা বলে নয়— বাঙলার নৈসর্গিক সংগঠনের বৈচিত্র্যও কম নয়। সমুদ্রমেখলা সোনার বাঙলা, মাথায় তার হিমালয়ের কিরীট, আ-কটিকণ্ঠ জড়ানো গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-মেঘনা তার মালা। পশ্চিম বাঙলায় শালবন আর কাঁকরের পথ—দিগন্তে প্রান্তর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে আসে। শীর্ণ জলধারার গভীর রেখা কাটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী। বাতাসে তীব্রতার আভাষ, তপ্ত রৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায়। রাত্রিদিনের অনন্ত অন্তরাল মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রালোকে মূর্চ্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস করে তোলে।" * * * পূর্ব্ব বাঙলার দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের মাঝে "রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা। পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোত-ধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস। * * * কূলে জল ভরে ওঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্য্যময়ী"...তাই তাহারা কেবল মানুষের জীবনের অবচেতনলোকের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া কবিতাকারে বসন্তকালের অপর্য্যাপ্ত পুষ্প-মঞ্জরীর মত বাংলা কাব্যকে অলঙ্কার-চাতুর্য্যে ও শব্দমাধুর্য্যে পূর্ণ করিয়াছে, নচেৎ তাহাদের দেবদেবীর মহিমাকীর্ত্তন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মপ্রবণ নিরহঙ্কার মন তাহাদের দেবতাকে সুদূর কল্পলোকে আসন দেয় নাই—তাহারা দেবতাকে আসন দিয়াছে তাহাদের চিরপরিচিত পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে—আকাশের পাখীর ডাকে, বনভূমির পত্র-মর্ম্মরে, নদীজলকল্লোলে, বনবীথি-তলে ছায়ালোকের লীলা-চঞ্চল প্রবাহে, দূর প্রসারিত শ্যাম শস্য-ক্ষেত্রে, কালকাসন্দে ও ঘেঁটু ফুলের বেড়া দেওয়া পুষ্করিণীর পথে ঘটকক্ষ বধূর শিথিল অবগুণ্ঠন প্রভৃতির মধ্য দিয়া সেকালের কবিরা ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া আমাদের অন্তর-আকাশের উপর শারদা-কাশের লঘুমেঘের চঞ্চল ক্রীড়ার গতিবেগ আনিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এত সবের মধ্যেও তাহারা দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার কথা ছাড়িয়া দেন নাই—ধর্ম্মপ্রবণ মনের মাঝে অর্থনৈতিক সমস্যা কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাই তাঁহারা তাঁহাদের প্রথম উপাস্য দেবতা শিবঠাকুরকে করিলেন চাষা এবং বিত্তশালী নন্দ ঘোষের পুত্রকে করিলেন রাখাল। যে ভাবে সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া তাহাদের দিন চলে তাহার ভিতরেই বাঙালী তাহার দেবতাকে আনিয়া অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছে। সেইজন্য বৈষ্ণব কবিতা বাদ দিয়া বাংলা মঙ্গল-কাব্যের ভিতর আমরা দেখিতে পাই যে বাঙালী জীবন-সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ নহে—তাই তাহারা তাহাদের সাহিত্যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাব জাতীয়

---

* বাঙলার কাব্য—হুমায়ুন কবীর।

ও ব্যক্তিগত জীবনে কিরূপ সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছে ও তাহা তাহাদের সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছে।

কৃষি—বাঙালীর জীবিকা নির্ব্বাহের প্রথম এবং প্রধান উপায় কৃষিকর্ম্ম—তাই তাহার সাহিত্যে কৃষিকর্ম্মের প্রাধান্য, কৃষিকর্ম্মের উপযোগী মৃত্তিকা, আবহাওয়া এবং যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উল্লেখের ভিতর দিয়া আমরা বুঝতে পারি বাঙালী কৃষিকার্য্যে কতদূর অগ্রণী ছিল।—উমা মহেশ্বরকে বলিতেছেন:

পূর্ব্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হৈলে এবে। আর নাকি ভিখ মাগা শোভা করে শিবে॥ পুরুষে উপায় নাই খেতে হৈল চেন। দিন দুটি হেল্যায় ছড়ায় পাঁচসের॥ চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন। চাষ চষ বারেক বর্ত্তুক পরিজন॥ চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে। লক্ষার বাণিজ্য বসি বাকুড়ির কোনে॥ পরিজন পোষে চাষী শুধে সাধু রাজা। লক্ষ্মী পোষী চাষী করে সবাকারে তাজা।*

গৃহিণীর কর্ত্তব্য হইল সংসার প্রতিপালন করা কিন্তু শিবের এ কি রকম ব্যবসা! দুষ্টু ছেলেগুলি ভিক্ষার চাউল অর্দ্ধেক ছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়, সেইজন্য সুগৃহিণী উমা স্বামীকে চাষের ভবিষ্যৎ দেখিয়া চাষ করিতেই বলিতেছেন। ইহার মধ্য দিয়া আমরা অস্বচ্ছল গৃহের, গৃহিণী গৃহকর্ত্তাকে যেন চাষের দ্বারা সংসারে স্বচ্ছল অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার উপদেশ দিতেছেন—দেখিতে পাই। শুধু চাষে যে প্রচুর ধান্য হইবে তাহা নহে উপরন্তু আমরা দেখিতে পাই শিশির-ধোয়া প্রভাতে একজন সম্পন্ন চাষীর ক্ষেতে বেড়ার ধারে ধারে শিমপাতায় চতুর্দ্দিক্ সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, ক্ষেতে ক্ষেতে মূলো, সরষে আর কার্পাসফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে—যেন দুধ আর হলুদের ফেনার বন্যা বহিয়া যাইতেছে, শুধুই কি তাই! কৃষিকর্ম্মের কল্যাণে গৃহের রমণীদের 'গোয়ালে গরু মরাইয়ে ধান, সিঁথেয় সিঁদুর মুখে পান' এবং 'আলনায় কাপড় দলমল' করিতেছে চতুর্দ্দিকে স্বচ্ছলতার অপূর্ব্ব সম্ভাবনা—সেইজন্য শিবকে অনুরোধ করিতেছেন—

রজনী পরভাতে ভিক্‌খার লাগি জাই।
কুথাএ পাই কুথাএ না পাই॥
হত্তুকী বএড়া তাহে করি দিনপাত।
কত হরস গোঁসাঞি ভিক্‌খার ভাত॥
আহ্মর বচনে গোঁসাঞি তুহ্মি চস চাস।

—

ঘরে ধান্ন থাকিলেক পরভু সুখে অন্ন খাব।
অন্নর বিহনে পরভু কত দুখ পাব॥
তিল সরিষা চাষ কর গোঁসাই বলি তব পাএ।
কত না মাখিব গোঁসাই বিভুতিগুলা গাএ॥
মুগ বাটলা আর চসিহ ইখু চাস।
তবে হবেক গোঁসাই পক্কামতর আস॥
কাপাস চসহ পরভু পরিব কাপড়।
কত না পরিব গোঁসাই কেওদা বাঘের ছড়॥
সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধম্মপূজার বেলা॥*

এত উপদেশ শুনিয়াও মহেশ্বর কৃষিকর্ম্ম করিতে রাজী নহেন। তখন আবার উমা বলিতেছেন—তুমি যেরূপ সহজ সরল মানুষ তাহাতে তোমার পক্ষে চাষ করাই উপযুক্ত—কবি যেন তাঁহার স্বজাতির মনের প্রকৃতিরই একখানি ছবি আমাদের নিকটে আঁকিয়াছেন।

...

বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী সে তোমাকে নয়॥
পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
মহেশের সে ত নাহি সকলি অমূল॥
আর এক ব্যবসায় রাজসেবা আছে।
সেব্য হয়ে যাবে কোন সেবকের কাছে॥‡

উমা কতই না বুঝাইলেন, তবুও মহেশ রাজী না হইয়া বলিলেন—চাষের পক্ষে অনেক প্রাকৃতিক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়—মোটের উপর বাঙালী চাষীকে চাষ করিতে গিয়া কি কি বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় ও কেমন করিয়া তাহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে—কবি তাহার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। নরম মাটিতে চাষ করা অত্যন্ত কঠিন। জঙ্গলপূর্ণ জমিকে অথবা জলা জমিকে চাষের উপযুক্ত করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার! ইহাতে যে কী কষ্ট হয় তাহা কৃষকেরাই জানে, কত দুর্ভাবনা, কত নিরাশার সম্মুখীন তাহাদিগকে হইতে হয়। তাহার উপর আছে প্রকৃতির পরিহাস, কোন বৎসর বর্ষায় স্বাভাবিক বারিপাত হয়, আবার কোন বৎসর প্রচুর বৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক ভরিয়া যায় উন্মত্ত বন্যায়, কৃষকের আশা-ভরসা নির্ম্মূল হয়। মাঠে একটি ধানের শীষও থাকে না, নূতন ধান দিয়া কেমন করিয়া লক্ষ্মীপূজা হইবে তাহার চিন্তাই হয় অধিক। আগনের (অগ্রহায়ণের) ফসল নষ্ট হওয়া মানে "সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত।" আবার কোন বৎসর খরার (draught) ফলে অজন্মা হয়। শস্য একটু বড় হইলে ক্ষেতে নিড়ানী দিবার সময় মশা, জোঁক (zeech) সাপ প্রভৃতির সম্মুখীন চাষীদিগকে নিত্যই হইতে হয়।

ক্ষেতে বসি কৃষাণে ইষাণ বলে ভাল।
চারিদণ্ডে চৌদিকে চৌরস করে চাল॥
আড়ি তুলে ধারে ধারে ধরাইব ধান।
হাঁটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
দল দুর্ব্বা সোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেশুর।
গড় গড় নানা খড় উপাড়ে প্রচুর॥‡

এত কষ্ট করিয়া ধান গোলাজাত করিবার পর আসে মহাজনের তাগিদ প্রবং দালালদের প্রবঞ্চনার পালা। এমনি করিয়া কৃষকদিগের জীবন কাটাইতে হয়—কৃষকের এত কষ্ট শুনিয়াও উমা,—মহেশ্বরকে বিরতি দিলেন না—তখন উমার যুক্তিতে—ইন্দ্রের নিকট হইতে আনিলেন চাষ করিবার হুকুম নামা—যমের নিকট হইতে

* শিবায়ন (বঙ্গবাসী সংস্করণ)—রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী

* শূন্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিত (১১শ শতাব্দী)

‡ শিবায়ন—(চাষপালা) রামেশ্বর

* পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা—মলুয়া ‡ খনার বচন

আনিলেন মহিষ এবং নিজের সাধের ত্রিশূলের কিছু অংশ দিয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা লাঙ্গলের ফাল এবং জলুই, দা, কাস্তে, পাসি, মই, পাঁচনবাড়ি প্রভৃতি তৈরী করাইয়া লইলেন এবং পরিশেষে শুভক্ষণে হলচালনা করিলেন ।—

শস্তের পুষ্ট হওয়ার পথে কত বাধা কত বিপত্তি কিন্তু বাঙালী চাষী তাহাদের পিতৃ-পিতামহের অভিজ্ঞতা-সঞ্চিত প্রবচন অনুযায়ী কাজ করিয়া শস্তের সকল বিপদ দূর করিয়া দেয় । তাহারা জানে, "মানুষ মরে যাতে গাছলা সারে তাতে," "গোয়ে গোবরে বাঁশে মাটী" "আষাঢ়ে কাড়ান নামকে—শ্রাবণে কাড়ান ধানকে" "ছায়ায় পান রোদে ধান" "সরিষা বনে কলাই মুগ—বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক," "যদি থাকে টাকা করিবার গোঁ—তবে চৈত্রমাসে ভুট্টা রো, "তামাক বুনে গুঁড়িয়া মাটী বীজ পুঁতো গুটি গুটি—ঘন ঘন পুঁতো না—পৌষের অধিক রেখো না" *

বাকী অন্যান্য চাষ ত সেকালের কৃষকেরা করিতই কিন্তু কলা গাছের উপর তাহাদের আগ্রহ ছিল যেন বেশী । শিবের গানে দেখিতে পাই "সকল চাস চস পরভু আর রুইও কলা" আবার কলা গাছ কেমন করিয়া চাষ করিতে হয় তাহা লইয়া সেকালের কবিরা অনেক কিছুই বলিয়াছেন—

"আগে পুতে কলা । বাগ-বাগিচে ফলা ।
কলা লাগাবে মায়ে পুতে
কলা লাগিয়ে না কাটো পাত । তাতেই কাপড় তাতেই ভাত ।
তিন শত ষাট ঝাড় কলা রুয়ে । থাক গৃহী ঘরে শুয়ে ।
ডাক ছেড়ে বলে রাবণ । কলা রোবে আষাঢ় শ্রাবণ ।" †

কত নামের কত আকারের যে কলার বর্ণনা দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই । বর্ত্তমানে আমরা যে সব কলা দেখিতেছি তাহা ছাড়াও ডিঙ্গামাণিক, মোহনবাঁশী, সবরী প্রভৃতি কলার চাষও তখন হইত এবং সেগুলি লোকপ্রিয়ও ছিল ।

এইভাবে সেকালের কবিরা চাষীদের অভিজ্ঞতার কথা তাহাদের সাহিত্যে রূপায়িত করিয়া তৎকালীন চাষীদের জীবনের ছোট ছোট ব্যাপারগুলিও আমাদের নিকট মায়া-কাজলের তুলি দিয়া অপূর্ব্ব সুষমায় রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন । ক্ষেতের ধূমল মাটী শ্যামল হইয়া পরিশেষে সোনার বরণ হইয়াছে, আবার ধূমল হইয়াছে । শস্য গোলাজাত করা হইয়াছে—কত না বর্ণের কত না গন্ধের ধান আসিয়াছে : দুগ্‌গাভোগ, মুক্তাহার, তিলসাগরী, লতামৌ, খেজুরছড়ি, গন্ধতুলসী, সীতাশালি, হরিকালী, নাঁগর-ঘুয়ান, গন্ধমালতী, অসতী, খুদ্দদুধুরাজ, রসজয়, বেগুনবীচি, বাঁশ-মতী, কেলেকায়ু, কুসুমশালী, কপোতকণ্ঠী, পূর্ণিমা, কল্মীলতা, গুয়াথুপী, জামাইলাড়ু, ঝিঙ্গাশালী, কনকলতা, লক্ষ্মী-কাজল, রূপনারায়ণ, শঙ্করজটা ‡ ইত্যাদি—

আনন্দে কৃষকের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—এত শ্রম, এত দুর্ভাবনা—আজ তাহার অস্ত হইয়াছে, অমা-রজনীর পরে রবি-করোজ্জল, প্রভাত আসিয়াছে ঘরে ঘরে ঢেঁকির শব্দ উঠিতেছে—ঢেঁকি যে ঘরে আছে সে ঘর লক্ষ্মীমন্ত—লক্ষ্মী অচলা হইয়া সেথায় রহিয়াছেন :—

"যাহার ঘরে নাহি ঢেকি মুষল । সে বহুঝির নাহিক কুশল ।"

ঢেঁকিতে নূতন ধান কুটা হইতেছে—তাহাদের নবান্ন হইবে । নূতন ধানের চাল প্রথমে দেবতার ভোগে লাগিবে, তাই এত আনন্দ এত আয়োজন । চাষী দেবতা শিবের গৃহে নবান্নের দিন, শিব কার্ত্তিক গণেশকে লইয়া খাইতে বসিয়াছেন, উমা আজ অন্ন-পূর্ণা হইয়া অন্ন দিতেছেন :

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী ।
দুটী সুতে সপ্ত মুখ পঞ্চ মুখ পতি ।
তিনজনে একুনে বদন হলো বারো ।
গুটি গুটি দুটি হাতে বণ্ড দিতে পারো ।
তিনজনে বারো মুখে পাঁচ হাতে খায় ।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায় ।
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে ।
অন্নপূর্ণা অন্ন আনো রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে ।
গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আনো মা ।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরে খা ।
মূষিকী মায়ের বাক্যে মৌন হয়ে রয়,
শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয় ।
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে ।
যত পাবো তত খাবো ধৈর্য্য হবো বটে ।
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে ।
ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে ।
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি ।
সূপ হইল সাঙ্গ আন আর আছে কি ।
চট-পট পিশিত মিশ্রিত করি যূষে ।
বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হইয়া আইসে ।
চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর ।
রণরণ কিঙ্কিণী কঙ্কন ঝনৎকার ।
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর ।
শ্রমে হৈল সজল কোমল কলেবর ।
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে ।
মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্যুতের মাঝে । †

উমা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহাই পাইয়াছেন—সংসার স্বচ্ছ-লতায়, স্নেহে, প্রীতিতে, কৌতুকে, প্রশান্তিতে মনোরম হইয়াছে । বাঙ্গালী গৃহিণী যাহা চাহে তাহাই কবি এখানে চিত্রিত করিয়া-ছেন । আজ গৃহিণীরা আনন্দের আমেজে শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার গানেও কৃষি-ঐশ্বর্য্যের কথাই বলিতেছেন—

আম-কাঁঠালের বাগান দোব ছায়ায় ছায়ায় যেতে ।
রসকরা নাড়ু দেব শাশুড়ী ভুলাতে ।
উলকি ধানের মুড়কি দেব নারেঙ্গাধানের খই ।
গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়িভরা দই । *

* খনার বচন

† খনার বচন ।

‡ শূন্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিত

† শিবায়ন—রামেশ্বর

* ছেলেভুলান ছড়া—লোক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ।

এত স্বচ্ছলতা ও আনন্দের মূল হইল কৃষিকার্য্য। বাংলা দেশে হেমন্ত ও শীতকাল ফসল তোলবার সময়। এক অজ্ঞাত-নামা কবি সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বেকার শীতকালের বাংলা পল্লীর সমৃদ্ধির সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন।

শালিচ্ছেদসমৃদ্ধহালিকগৃহাঃ সংসৃষ্টনীলোৎপল—
স্নিগ্ধশ্যামযবপ্ররোহনিবিড়ব্যাদীর্ঘসীমোদরাঃ।
মোদন্তে পরিবৃত্তধেষনডুহশ্ছাগাঃ পলালৈর্নবৈঃ
সংসক্তস্বনদিক্ষুযন্ত্রমুখরা গ্রামা গুড়ামোদিনঃ॥

চাষীদের গৃহে ধান্যস্তূপ ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপন করছে, নীলোৎপলের সংযোগে নবপ্ররূঢ় শ্যামল যবাঙ্কুর ক্ষেত্রের সীমাকে দীর্ঘায়ত করে দিয়েছে, গোরু, ষাঁড়, ছাগল ঘরে ফিরে এসে নোতুন খড় খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে, গ্রাম সব আখমাড়াই কলের শব্দে মুখর আর নূতন গুড়ের গন্ধে আকুল হয়ে উঠেছে। *

সেই জন্য বাঙ্গালী কবি তাঁহার দেবতাকে করিয়াছেন চাষী, এবং তাঁহার কাব্যকে করিয়াছেন বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। বাঙ্গালী কবিরা তাঁহাদের দেবতাকে চাষী করিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তি ও অনুরাগে দেবতাকে রাঙাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রবণতা—কাব্য ও অর্থনৈতিক সমস্যা সব একাকার হইয়া গিয়াছে, তাই বাঙ্গালী কবি অনায়াসে গাহিতে পারিয়াছেন,—

"মন রে কৃষি-কাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।" †

*

শিল্প——সে যুগের বাংলা লক্ষ্মী-শ্রীতে পূর্ণ ছিল। মানুষ আনন্দের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সংসারে ছিল কম অভাব, তাহার মধ্যেই যাহার কোন কিছু বিলাসদ্রব্য বা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আবশ্যক হইত তাহা দেশের শিল্পীরা দেশের লোকের জন্যই প্রস্তুত করিত। গ্রামে চলিত চাষ-বাস, কুলুনাদিনী গ্রামপার্শ্ববাহিনী নদীতে চলিত খেয়াপারা পার, কামারের ঘরে তৈয়ারী হইত লাঙ্গলের ফাল, তাঁতীর ঘরে কাপড়, স্বর্ণকারের ঘরে নানা রকমের অলঙ্কার—এমনি ভাবে সেকালের বাঙালীদের দিন চলিত আশায়, আনন্দে, সুখে ও দুঃখে এবং বাঙালীকবি সেই "বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড" ভাবগুলিকে লইয়া, ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের জিনিষ করিয়া ধরিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ যেন "গ্রামের মধ্যে প্রতিদিনের বিচিত্র কাজও চলিতেছে এবং তাহার ছিদ্রে ছিদ্রে চিরদিনের একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে"—‡ ইহাতে সুর বেসুর যাহাই লাগুক তবুও সেকালের লোক যে-জীবনকে প্রতিদিন ভোগ করিয়াছে—সেকালের কবিরা সেই জীবনকে তাহাদের স্বকীয় ছন্দে, তালে ছন্দায়িত করিয়া দেশবাসীর জীবনে ভাষা দান করিয়াছে, তাই তাহাদের জীবনের চাষ-বাসের প্রয়োজনীয় লাঙ্গল জোয়াল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিল্পগুলি যাহা তাহাদের মনোহরণ করিত কবিরা তাহার কোনটী তাঁহাদের কাব্যে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে কারু-শিল্পময় বহু জিনিষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে অধিকাংশই এমন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল—যাহার জন্য বিদেশেও সেই সমস্ত শিল্পের নাম সমাদরের সহিত কীর্ত্তিত হইত কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যেন বস্ত্রশিল্পের অনুশীলন এদেশে হইত বেশী। প্রাচীন কত নামের কত শোভার না শাড়ীর ও নানাবিধ বস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে সিল্কের শাড়ীই ছিল কত প্রকারের— "বাপেতে কিনিয়া দিত অগ্নি পাটের শাড়ী। সেই অঙ্গে পইয়া থাকি জোলার পাছুড়ী।১"

কৃতঘ্ন কঙ্কন-দাসী নিজে রাণী হইয়া কাজল-রেখাকে দাসী করিয়াছে। যে রাজার রাণী, সে কত না ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়া থাকিবে কিন্তু আজ গ্রহের দোষে তাহাকে সামান্য দাসী হইতে হইয়াছে—সে তাহার পিতার গৃহে আগুন পাটের শাড়ী (ঘোর লাল রঙয়ের) পরিত কিন্তু এখন তাহাকে সামান্য জোলা তাঁতির নির্ম্মিত মোটা পাছুড়ী পরিতে হইতেছে। এই অগ্নিপাটের শাড়ীর কথা বাঙ্গলার বহু কবিই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে অন্যান্য সিল্ক সাড়ীর মধ্যে অগ্নিপাটের সাড়ীর প্রচলন ছিল অধিক। ইহার পরেই স্থান ছিল কালপাটের শাড়ীর—

"কাল নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
কাল হার কাড়ি লয় কালপাটের শাড়ী"।২

শ্রীরাধিকা আর পারেন না, জলের ছল করিয়া ঘাটে গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার উপায় নাই, সেখানে বাঘিনী ননদিনী আর গৃহে আছেন দজ্জাল শাশুড়ী, তিনি কৃষ্ণ (কাল) নাম উচ্চারণ করিতে দেন না, কাল হার কাড়িয়া লইয়াছেন আর সঙ্গে সঙ্গে কাল রংয়ের পাট-শাড়ীটিও। তাঁহার গৌর অঙ্গে কাল রংএর শাড়ীটি মানাইত ভাল। কৃষ্ণের রংএর সহিত শাড়ীটির বর্ণসাদৃশ্য ছিল বলিয়া তাঁহার প্রিয় শাড়ীটিকেও শাশুড়ী লইয়াছেন। সেকালের সৌখীন ও সুন্দরী মহিলাদের নিকট কাল পাটের শাড়ী যথেষ্ট আদরের বস্তু ছিল—ইহার পরেই স্থান ছিল কাঁচা পাটের সাড়ীর।

"খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের শাড়ী"।৩

এই ধরণের বস্ত্র সাধারণতঃ বিধবা মহিলারা পরিতেন। ইহার প্রান্তে কোন নক্সা ও চিত্র ইত্যাদি প্রায়ই কিছু থাকিত না এবং ইহা অগ্নিপাট এবং কালপাট শাড়ীর ন্যায় সূক্ষ্মভাবে নির্ম্মিত হইত না। ইহা ছাড়া আরও কত বর্ণের ও কত নামের সৌখীন শাড়ী ছিল তাহার বর্ণনা করিতে পারা যায় না। ময়নামতীর গানে দেখিতে পাই "অদুনা রাণী শাড়ী পরিতেছেন, প্রথম পরিলেন নীলাম্বরী,—নীলাভ নক্ষত্র-খচিত কৃষ্ণ মেঘমালার ন্যায় স্বর্ণখচিত নীলাম্বরী ঝলমল করিয়া উঠিল। তার পরে মেঘ-ডুম্বুর—

* প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী—ডাঃ সুকুমার সেন।
† শ্যামা-সঙ্গীত—রামপ্রসাদ
‡ লোক-সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ

১। কাজলরেখা, ময়মনসিংহ-গীতিকা।
২। বৈষ্ণব-পদাবলী, বলরাম দাস।
৩। মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্ত।

তাহা একেবারে গাঢ় কৃষ্ণ,—ইহাও পছন্দ হইল না, তখন পরিলেন গঙ্গাজলী, একেবারে হরিদ্বারের নির্ম্মল শুভ্র গঙ্গাধারাকে জয় করিয়া সেই শাড়ীর স্বচ্ছতা প্রকাশ পাইল—এইরূপ করিয়া কত বার পেটিকা খুলিলেন এবং কত প্রকার দুর্লভ ও মহামূল্য শাড়ী বাহির করিয়া কোন্‌টি ঠিক তাঁহার শ্রীঅঙ্গের উপযোগী তাহাই বিচার করিতে লাগিলেন। * বহু কবি তাঁহাদের কাব্যে এই সমস্ত শাড়ীর নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন : "তার পর পরাইল শাড়ী নামে আসমানতারা। ভূমিতে থুইলে যেন আসমান পার। হস্তেতে লইলে শাড়ী ঝলমল করে। শূন্যেতে থুইলে শাড়ী শূন্যে উড়া করে।† তখন তিনি আসমানতারা শাড়ী পরিলেন। সে শাড়ী মিহিসূতায় নির্ম্মিত। শাড়ীর প্রান্তে আছে সূক্ষ্ম সূচীকার্য্য এমনই সে শাড়ীর সৌন্দর্য্য যে—শাড়ীটি আকাশের বর্ণের সহিত সমান—হাতে করিয়া দেখিলে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়—উঁচুতে তুলিয়া ধরিলে বুঝিতে পারা যায় না যে কোন বস্ত্র সেখানে আছে। মনসা দেবী তাঁহার 'ক্ষীণ কটিদেশ বেড়ি পরে গঙ্গাজঙ্গী শাড়ী' ✝ তাহার পরেও ছিল "ময়ূরপেখম"—ময়ূরের পেখমের বিচিত্রবর্ণ সমষ্টি লইয়া মিহি শাড়ী। হীরামন পাখীর বর্ণের সহিত সৌসাদৃশ্য রাখিয়া হীরামন শাড়ী নির্ম্মিত হইত। মৃত লক্ষীন্দরকে বাঁচাইবার জন্য যখন বেহুলা স্বর্গপুরে দেবসভায় নৃত্য করিতে যাইতেছিলেন তখন তিনি নানাবর্ণের শাড়ী পরিয়া নিজ অঙ্গের রংয়ের সহিত মিলাইলেন—কবি তাহার বর্ণনা দিতেছেন—প্রথমে পরিলেন যাত্রাসিদ শাড়ী, মনোমত হইল না, তাহার পর খুঞ্চানেত লইলেন, তাহাও তদ্রূপ, পরে লইলেন নাকর মঞ্জাফুল শাড়ী—যাহার নির্ম্মাণের জন্য একতোলা সুতার দাম তখনকার দিনেই ছিল পঞ্চাশ টাকা, তাহাও পছন্দ হইল না তাই অবশেষে লইলেন—

সাড়ী নামে অগ্নিফুল। কাপড়া সুন্দরী দুহে হইল সমতুল।
সে কাপড় পরিয়া বালি আগে পাছে চায়।
মনোরম্য হইল কাপড় নাচিয়া বেড়ায়। * *

বেহুলার মনোমত হইল অগ্নিফুল শাড়ী, পরিয়া তিনি চলিলেন স্বর্গের দেবসভায়। পাটের ভূনি নামক আর এক প্রকার শাড়ী উচ্চ বর্ণের মহিলাগণ পরিত—রাজবধূ সীতা পরিতেন পাটের ভূনি "পরিতে দিলেন সীতাকে বিচিত্র পাটের ভুনি।**"

এই সমস্ত বিচিত্র শাড়ীর নামোল্লেখের মধ্য দিয়া আমরা কেবলমাত্র যে তৎকালীন মহিলাদিগের সৌখীন রুচির পরিচয় পাই তাহাই নহে উপরন্তু তৎকালীন বঙ্গীয় তন্তুবায়গণ যে কতদূর কৃতী বস্ত্রশিল্পবিদ ছিল তাহাও কবি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা কবির সহিত ঐতিহাসিকের ঐকমত্য দেখিতে পাই। "For over eighteen centuries, European kings, queens, and princes, not to speak of Asiatic Monarchs have taken a delight in possessing some of the best specimens of Indian silk manufactures, either pure or worked with gold and silver, such as chandtara (moon & stars), Mazehar (ripplies of silver), Dup-chan (ধূপছায়া) (sun shine & shade) Bulbul chasm (nightingales' eyes), Murgala (peococks' neck), and shikargah (the huntiug grounds).*" তাছাড়া মহিলাগণের কাঁচুলী প্রভৃতি ক্ষুদ্রায়তন বস্ত্র সেকালের তন্তুবায়গণ বয়ন করিত। সেগুলি কত সুন্দর ছিল তাহা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যে দেখিতে পাই। শুধু মুকুন্দরাম কেন, তৎকালীন অন্যান্য সমস্ত মঙ্গলকাব্যের কবিগণ কাঁচলির বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্ম সূচী শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বুঝিতে পারি, কবিদিগের কাঁচুলীর বর্ণনায়। কাঁচুলীর উপর চিত্র থাকিত দশ অবতারের, শ্রীকৃষ্ণলীলার, আরও কত কি।

মহিলাগণের শাড়ীর কথা বাদ দিয়া আমরা পুরুষদিগের নানাবিধ বস্ত্রের উল্লেখও প্রাচীন কাব্যে দেখিতে পাই। ব্রতী বিপ্রগণের ধূতি-চাদর এবং বণিকদিগের ধূতি-চাদর, কোট-পাগড়ী প্রভৃতি মহিলাগণের বস্ত্রনির্ম্মাণের মত সমান যত্ন লইয়া তৈয়ার করা হইত।

বাংলার বিশেষ করিয়া ঢাকার তন্তুবায়গণের নির্ম্মিত অতুলনীয় বস্ত্র মসলিনের নাম জগতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ও মসৃণতার জন্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর আদরণীয় ছিল। রোম সম্রাট্‌গণ আইন করিয়া রোমে প্রাচ্য মসলিনের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দিলেও গোপনে রাজ-রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিতেন। সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার নিকট ভারতের মসলিন অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানও আদরের সহিত মসলিন পরিধান করিতেন। মসলিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে; কিন্তু সেগুলি কেবল মাত্র কিম্বদন্তীই নহে, ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যও আছে। মলমল খাস, সবনম, নয়ানসুখ প্রভৃতি শাড়ী এত সূক্ষ্ম ছিল যে, রাত্রির শিশিরে মেলিয়া রাখিলে প্রভাতে অদৃশ্য হইয়া যাইত। আলমগীরের কন্যা সাতপ্রস্থ পুরু মসলিন পরিধান করিয়া আলমগীরের নিকটে আসিলে, তিনি কন্যাকে লজ্জাহীনা বলিয়া ভৎর্সনা করেন। ইহা দ্বারা সেকালের মসলিন যে কি ভাবে নির্ম্মিত হইত তাহা বুঝিতে পারি। সেই জন্যই আমাদের কবিরা পূর্ব্বোদ্ধৃত অনুচ্ছেদগুলিতে ঐরূপভাবে ঐ সমস্ত বস্ত্রের নানাভাবে প্রশংসা করিয়াছেন। বৈদেশিক সমালোচক বলেন—"With all our mechinery and wondrous apptiances, we have either to been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the 'woven air of' Dacca – Dr Forbes watson অথবা Pyrard de Laval ঢাকাবাসীর মসলিনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, the inhabitants of Bengal both men

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (পরিশিষ্ট পৃঃ ৫৯৩) ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

† কমলা—ময়মনসিংহ গীতিকা।

✝ মনসামঙ্গল, বংশীদাস।

* * মনসামঙ্গল, জগজ্জীবন ঘোষাল।

* * * রামায়ণ, কৃত্তিবাস।

* The poverty problem in India—P. C. Roy.

and women are wondrously adroit in all such manufactures as of cotten, cloth and silks and needlework, such as enbroideries which are worked so skillfully, down to the smallest stiches that nothing prettier is to be seen any where"—The second city of the Empire.

বস্ত্রশিল্প ছাড়া বঙ্গের শিল্পিগণ আরও নানাপ্রকারের দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেন। তাহা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে উল্লিখিত আছে—গ্রীষ্মকালের পাখা-ই কত বিচিত্র—দণ্ড পাখা, আবের পাখা, লক্ষবিয়নি প্রভৃতি পাখা সেকালের শিল্পীরা নির্ম্মাণ করিত। "গ্রীষ্মকালে বদন ত দিমু দণ্ডপাখার বাও"—মলুয়া। চিরুণী ও শাঁখা তদানীন্তন শিল্পীগণ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে পূর্ণ করিয়া প্রস্তুত করিত—লক্ষ্মীবিলাস ও কুলুপিয়া শঙ্খের নাম কবিগণ বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। উমা লক্ষ্মী-বিলাস শঙ্খ মহাদেবকে চাহিলেন—কিন্তু কড়ার ভিখারী ত্রিলোকেশ্বর মহাদেব তাহা দিতে পারিলেন না—তখন উমা ক্রোধ করিয়া পিতৃগৃহে চলিলেন—মহাদেবের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তিনি ব্যথিত চিত্তে বলিলেন—"পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি"। অবশেষে মহেশ্বর নিজে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক লক্ষ্মীবিলাস শঙ্খ নির্ম্মাণ করাইয়া নিজেই শাঁখারী সাজিয়া উমাকে শাঁখা পরাইয়া তাঁহার মান ভঞ্জন করাইলেন। অন্যত্র দেখিতে পাই—

"আবের কাকই লইল রাজা আবের চিরুণী।
আবেতে বান্ধিয়া লইল খাড়ি আর বিউনি॥"

—রূপবতী—

"পরে দিব্য পাটশাড়ী কনক-রচিত চুড়ী
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ"।

—চণ্ডী—

ইহা ছাড়া ছাতা, জুতা, কম্বল, কার্পেট, শামিয়ানা, শয্যাদ্রব্য, চান্দুয়া, মশারী, নেতের মাদুর, আয়না প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের উল্লেখ মঙ্গলকাব্য ও মাণিক চাঁদের গান ও ময়মনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকার মধ্যে দেখিতে পাই।

তখনকার শিল্পীরা চারুশিল্পে কতদূর কৃতী ছিলেন তাহা আমরা যদুনন্দন দাসের অনূদিত গোবিন্দ-লীলামৃত কাব্য হইতে বুঝিতে পারি—শ্রীরাধিকা বেশ করিতেছেন :—

"প্রথমতঃ ভিতরকার রক্তবর্ণ বস্ত্র (সায়ার মতন কাপড়) পরিয়া তাহার উপর রাধা ভ্রমরের মত নীলাভ মেঘডুমুর শাড়ী পরিলেন। ললিতা সোনার চিরুণী দিয়া রাধার কেশ বিনাইয়া সেই আর্দ্রকেশরাশি ধূপধুনার ধোঁয়া দিয়া শুকাইয়া লইল। তৎপর কেশরাজি সুকুঞ্চিত করিয়া তাহাতে উৎকৃষ্ট সুগন্ধ তৈল মাখাইল।...দুটী বেণী সুচারুরূপে গাঁথিয়া ক্ষুদ্র একটী বকুলফুলের মালা দিয়া যেন আর একটী বেণীতে পরিণত করা হইল। এই তিন বেণী একত্র করিয়া প্রথমতঃ পট্টজাদ (রেশমী ফিতা) দিয়া বাঁধিয়া তাহা পুনরায় সোনার সূক্ষ্ম তার দিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার পর—চন্দন, কর্পূর এবং কাশ্মীরের অগুরু দিয়া সখীরা একটা সুগন্ধ তৈরী করিল—এই সুগন্ধ সখীরা রাধার অঙ্গে মাখাইয়া দিল"—বৃহৎ বঙ্গ। ইহার পর শ্রীরাধা পরিলেন কনক বলয়, কঙ্কণ, কেয়ূর, কাঁচুলি, নীবিবন্ধ, বঙ্করাজমল' নূপুর ইত্যাদি। কবি গহনাগুলির আকার আমাদের নিকট নামান নাই, যাহা দিয়াছেন তাহা 'সুন্দরকে নবশ্রী প্রদান করে, কোথাও শ্রীহীন করে না'। "বাঙ্গালী যে প্রাচীন শিল্পজ্ঞান বহু শতাব্দীর দৌরাত্ম্য ও বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও অটুট রাখিয়াছিল ইহা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। ইহা ছাড়াও সুকুমার কুসুম ও চিত্র-শিল্পে বাঙ্গালার যে প্রভাব দেখিতে পাই তাহা অদ্বিতীয়; কবিরা ইহার অনেক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দেখিতে পাই, "মালিনী ফুল আনিয়া দিল, সুন্দর বিচিত্র কারিগরী করিয়া এক মালা গাঁথিলেন—মালার মধ্যে ফুলের পাতায় ফুলের কৌটা—তার ভিতর নানা ফুলে রচিত রতি-মদন—হাতে ফুলবাণ, ফুলধনু—তাহাতেও কল—কৌটা খুলিতে গেলেই বুকে বাণ ছোটে—অবশ্য ফুলবাণ; শুধু তাই নহে, তার মধ্যে আবার সংস্কৃত শ্লোক—চিত্রকাব্যে নিজ পরিচয়"—(বঙ্গের কবিতা) মালিনী বিদ্যাকে এই চিকন গাঁথনিয়া মালা দিলেন, বিদ্যার মাথা ঘুরিয়া গেল—"কৌতূহল ভরে বিদ্যা কৌটা খুলিতে গিয়া ফুলবাণের আঘাত খাইলেন, কল দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, শ্লোক পড়িয়া বিকল হইয়া পড়িলেন।" মালিনী এবং সুন্দরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এমনই কুসুম-শিল্পের গুণ। সেই জন্যই বোধ হয় "আওরঙ্গজেব-পুত্র যুবরাজ মহম্মদ, পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—কি আর মণিমুক্তা চুনি-পান্নার লোভ দেখাও পিতা, বাংলার কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কার সকলকে হেলায় পরাজয় করে—এমনটী তুমি দেখ নাই।" (বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা) চিত্র-শিল্পেও বাঙলী যে বিশিষ্টতা সে যুগে অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা আমরা পল্লী-গীতিকাগুলি হইতে বুঝিতে পারি-কন্যা কাজল-রেখা তাহার অঙ্কিত চিত্রে "শুধু ফুলপল্লব ও তরুরাজি ফুটাইতে দক্ষ ছিলেন না; মানুষের প্রতিকৃতি ঠিক স্বভাবের অনুযায়ী করিয়া আঁকিতে পারিতেন।" বাঙালী রমণীদের ব্রত ও আলপনার ভিতর দিয়াও চিত্র-শিল্পের স্ফূর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রতে মেয়েরা ছড়া গাহিতে গাহিতে তাঁহাদের মনের আবেগ মিশাইয়া আলপনা আঁকে এবং বলে :—"আমরা পূজা করি পিটালির চিরুণী। আমাগো হয় যেন সোনার চিরুণী।" (বাংলার ব্রত) কেবল মাত্র আলপনা ও পটুয়াদিগের আঁকা চিত্রেই বাংলার চিত্র-শিল্প নিবদ্ধ ছিল না। শ্রীযুত মুকুল দে প্রভৃতি খ্যাতনামা চিত্রশিল্পিগণ বলেন "অজন্তার অনেক চিত্রকরই বাঙালী ছিলেন।" শ্রীযুত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অপরাপর লেখকেরা অনুমান করিয়াছেন—জাভার বরবোদর মন্দিরে যে সকল শিল্পনিদর্শন আছে তাহা বাঙ্গালী ও কলিঙ্গবাসীদের কীর্ত্তি।"—তাই কবির কথা মনে পড়িয়া যায়—"আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায় আমাদের পট অক্ষয় করে রেখেছে অজন্তায়।"—সত্যেন্দ্রনাথ।

"এখনও বাঙলার কুটিরশিল্পের অজস্র নিদর্শন ও মৌলিকতার প্রমাণ দেশময় ছড়াইয়া রহিয়াছে। এরূপ অধিক পরিমাণে শিল্প-

নিদর্শন আর্য্যাবর্ত্তের আর কোথাও আছে বলিয়া আমরা জানি না।" আর আমাদের কবিরা তাঁহাদের রচিত কাব্যে এই সমস্ত শিল্পীর সুনিপুণ সৃষ্টিকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

"উড়ুপ-যোগে দু'দিন আগে হিন্দু যেত সিন্ধুপার।
মিশর, পেরু, রোম, জাপানে ছুটত নিয়ে পণ্যভার।"

—সত্যেন্দ্রনাথ

আধুনিক কবি ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফল লইয়া উপরোক্ত কথা বলিতে পারিয়াছেন কিন্তু মধ্যযুগের অখ্যাত পল্লীগ্রামের জীর্ণ কুটীরে বসিয়া যে সমস্ত কবিগণ তাঁহাদের কাব্যে বাঙ্গালীর পণ্য ও বাণিজ্যযাত্রা সম্বন্ধে যে সমস্ত কাহিনী আমাদের নিকট দিয়া গিয়াছেন তাহাও অবহেলার সামগ্রী নহে। সেই সময়ে বাঙ্গালীরা নৌ-নির্ম্মাণে উপযুক্ত দক্ষতা দেখাইয়াছিল। গাম্ভারী, তমাল, পিয়াল, কাঁঠাল প্রভৃতি কাঠের নৌকায় করিয়া সে যুগের বণিকগণ দূর সমুদ্রে বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইতেন। সেই সমস্ত পণ্যবাহী জাহাজের গতি এত দ্রুত ছিল যে,মহাভারতের কবি ঐ সমস্ত জাহাজকে মনপবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে দেখিতে পাই "তরণী পবনে সুখে নদী হল পার" তাহার পর ভাসানের যুগের কবিরা তাঁহাদের কাব্যের প্রত্যেক নায়ককেই সমুদ্রে পাঠাইয়াছেন। সেই জন্য চৌদ্দডিঙ্গা মধুকরের বিস্তৃত গঠন-কৌশল বিবৃত করিয়াছেন এবং তাহাদের গতি ও আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন নামকরণও করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা যে তখনকার দিনে নৌ-নির্ম্মাণে কতদূর অগ্রণী ছিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এমন কি পলাশীর যুদ্ধের পরও বাঙ্গালীর প্রাচীন নৌকারই সমাদর ছিল বেশী। বাঙ্গালার ঘাটবৈঠার ছিপে চড়িয়া মীরকাশেম একরাত্রেই গোদাগিরি হইতে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন! এমনই ছিল বাংলার নৌকার গতি। মঙ্গল কাব্যের কবিরা তাঁহাদের কাব্যে বাণিজ্যিক নৌকার নাম দিয়াছেন—মধুকর বিজুসিজু, গুয়ারেখী, শঙ্খচূড়, উদয়তারা, ইত্যাদি—এইরূপ নৌকা বা জাহাজেই চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত প্রভৃতি বণিকেরা পুরী, কলিঙ্গ, চিল্কাচুলী, বানপুর, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, লঙ্কা, লাক্কাদ্বীপপুঞ্জ ও গুজরাটের পাটন এবং ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে বাণিজ্যের জন্য যাইত। কবির কাহিনী ঐতিহাসিকের সহিত মিলিয়া যায়—

Mahuan observes "The rich build ships, in which they (Bengalees) carry on commerce with foreign countries"—Journal of Royal Asiatic society of Gt B & I, 1895.

সেই সময়ে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী তমলুক ছিল প্রধান বন্দর। সেইখান হইতে সকল বণিক সমুদ্রযাত্রার জন্য বাহির হইত। বাংলার বীর সন্তান বিজয়সিংহ এইখান হইতেই লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

"সিংহলের মুখে সাধু চলে শীঘ্রগতি।
বাহ বাহ বলে নৌকা কিবা দিবারাতি।"

সদাগর সঙ্গে এদেশীয় নানা পণ্য-সামগ্রী লইয়াছেন যথা :—

"লবঙ্গ কর্পূর লেই সুগন্ধি চন্দন।
সোনা রূপা লেই আর বস্ত্র আভরণ।
জোড় ধূতি লেই বেন্যা চিকণ বনাত।
আনন্দাই শাড়ী চেলী মলমল সহিত।
ছিট ওড়নী লেই গরভ সুতী ভুয্যা।
নীল শাড়ী লেই সাধু বড় যত্ন কর্য্যা।
পাট পাটম্বর লেই শালমের থান।
ভোট কম্বল লেই সাধু অতি অনুপম।
হীরা মণি মাণিক লেই রত্নের কঙ্কন।
চামর লইল তবে বণিক্‌নন্দন।
শঙ্খ লেই সিন্দুর লেই চান্দ সদাগর।
নারীর ভূষণ লেই গন্ধ মনোহর।
গুবাক নারিকেল আর মুগা (প্রবাল) মতি নিল।
ঔষধ কিনিঞে নিল যেখানে যে ছিল।

—মনসামঙ্গল—ক্ষেমানন্দ

এই সমস্ত পণ্যদ্রব্য লইয়া চাঁদ দক্ষিণ পাটনে গেলেন। এইখানে কবি তাঁহার কাব্যে "সুপারি ও নারিকেল লইয়া কিছু রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।" চাঁদ সদাগরের উপহারদ্রব্যের মধ্যে পান ছিল, তাহার, লাল রং দেখিয়া রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারীরা ভীত হইলেন। তাহার পর চাঁদ রাজাকে নারিকেল উপহার দিলে একজন বৃদ্ধ লোককে খাইতে দেওয়া হইল। সে শুকনা নারিকেলে দাঁত বসাইয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং মূর্চ্ছিত হইল। সে মরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া চাঁদকে বন্দী করা হইল—বৃদ্ধ যারীর পত্নী আসিয়া "চান্দর বুকেতে গিয়া মারিলেক লাথি।" পরে অবশ্য চাঁদ নিজে নারিকেল খাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তখন রাজা চাঁদকে পরম মিত্র জ্ঞানে তাঁহার দেওয়া চটের কাপড় পরিয়া বসিয়া আছেন এবং চাঁদকেও ওল কচুর বদলে সমান তৌলে হীরা দিতেছেন, শুটকি মাছের বদলে চন্দনকাষ্ঠ, মূলার বদলে গজদন্ত, ছাগলের বদলে সোনা, বাঁদরের বদলে হাতী প্রভৃতি লইয়া চাঁদ তাঁহার নৌকা পূর্ণ করিয়াছেন। এইভাবে শঠতার দ্বারা চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর পূর্ণ করিয়া চাঁদ দেশে ফিরিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু ফিরিবার পূর্ব্বে যাহার নিকট নানা ধনরত্ন লইলেন তাহাকে সাধুভাষায় গালি দিতেও ছাড়িলেন না। তবু রাজা পান ও নারিকেল খাইয়া এমনই মোহিত হইয়াছিলেন যে, নির্ব্বিকার চিত্তে চাঁদের শ্লেষোক্তিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছেন।—

"চান্দ বলে মিত্র তুমি বড় ভাগ্যবান্।
পাত্রমিত্র যত তোমার দেবতা সমান।
আপনি মহাশয় দেবতা চরিত্র।
আমার দেশেতে হইত হালের নিশ্চিন্ত।
তোমার সমান আমার দেশের দেবতা।
তাহার যথেক গুণ শুন এহি কথা।
সাক্ষাতে বিষ্ণু অংশে দেবতা-চরিত্র।
পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত ভুবন পবিত্র।
বনের তৃণ খায় লোক পরিতোষে।
যে জনে তাহারে সেবে লক্ষ্মী তথা বৈসে।
সংসার পবিত্র হয় পড়ি পদধূলি।
গো-দেবতা করি আমরা তারে বলি।

সেই দেবতার লক্ষণ আছে তোমার ঠাঁই।
সবে মাত্র মিতা তোমার লেজ শিঙ্গা নাই।
এই দুইখান যদি থাকিত তোমার।
যে মারিত গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত তার।

সমুদ্রে গমনাগমনের সময় বণিক ও নাবিকদিগকে সমুদ্রের যে-সব বিপদের সম্মুখীন হইতে হইত কবি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন—জোঁক পরিপূর্ণ দহে চূণ দিয়া, উত্তাল তরঙ্গে তৈল ঢালিয়া নাবিকগণ বিপদ উত্তীর্ণ হইতেন। সমুদ্রযাত্রা এত বিপদ-সংকুল ছিল ...য়া নাবিক ও বণিক-রমণীরা সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত, তাহারা ...ত ভাদুলী ব্রত; "বৃষ্টির পরে আত্মীয়-স্বজনের বিদেশ থেকে, ...াত্রা থেকে, জলপথে, স্থলপথে নিরাপদে ফিরে আসার ...য়"। জোড়া ছাতা মাথায় জোড়া নৌকায় ভাদুলীর ...আঁকিয়া তাহার পাশে নদী, সাগর, হিংস্রজন্তু ও কাঁটাবন ...ত এক একটী আলপনায় ফুল দিয়া তাহারা বলিত—

"ছোটমেয়ে—নদী-নদী কোথায় যাও?
বাপ-ভায়ের বার্ত্তা দাও।
ছোট বৌ—নদী নদী কোথায় যাও?
সোয়ামী-শ্বশুরের বার্ত্তা দাও।"

বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্র।

তাহার পর যখন বণিক ও নাবিকগণ বহু দিনের পর অর্থবান্ হইয়া গৃহে ফিরিত তখন উঠিত গৃহে গৃহে আনন্দ-কোলাহল।

যদিও বাঙালী কবিরা তাঁহাদের কাব্যে বাঙালীর নৌকা ও বাণিজ্যের অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়াছেন বুঝিতে পারি, তাহা হইলেও তাহাদের অধিকাংশ কথা সত্য। ময়মনসিংহ-গীতিকায় উল্লিখিত কোশা বজরা পিন্সিগুলি সত্যই অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্রুত গমনাগমনের জন্য ও আনন্দ-বিহারের জন্য ব্যবহৃত হইত। তাই আমরা দেখিতে পাই, তখনকার বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ ছিল—নৌ-সম্পদ। বাঙালী তাহার আপন পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছে! আবার কবে সে নূতন সাহসে উদ্বুদ্ধ হইয়া বলিবে:—

"শাস্ত্রশাসন, রইল মাথায়, তর্ক মিছে—নেইক ফল;
বন্দরে ওই দাঁড়িয়ে জাহাজ—বেরিয়ে পড় বন্ধুদল!"

ডাইনী

শ্রীসুজাতা ঘটক

মার কাছ হ'তে প্রায়ই পত্র আসছে—অনেক দিন দেশমুখো হইনি, তাই জননী বড় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন—প্রবাসী মেস-অন্নভুক্ত পুত্রের জন্য। সামনে ইষ্টারের লম্বা ছুটী, পল্লী-জননীর কোলে বিশ্রাম করতে পাড়ি দিলাম।

ছোট্ট গ্রাম্য ষ্টেশনটি বড় শান্তিপূর্ণ। ওপারে কয়েকটি যাত্রীবাহী গোযান অপেক্ষা করছে। আমার ছোট ভাই মণ্টু আর ছোট বোন মীণা এসেছে আমায় অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যেতে। তাদের হাত ধরে লাল কাঁকর ফেলা পথ ধ'রে বাড়ীর পানে চলি। পেছন ফিরে দেখি যানের বাহক জীবগুলো গাছতলায় শুয়ে পরম আরামে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করছে; আমারও চক্ষু যেন বন্ধ হ'য়ে যেতে চায়। কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনে এমন মধুর শান্ত আবহাওয়া মনে যেন একটা আবেশ আনে, শরীরটা যেন আপনা থেকেই জুড়িয়ে যায়।

আম-বাগানের পাতলা ঝোপের মাঝ দিয়ে চেয়ে দেখি—মা আকুল হ'য়ে পথের পানে চেয়ে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁর চোখ-মুখ যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। আমারও মন আনন্দে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো—গতি বাড়িয়ে দিই; ছোট বাঁশের বেড়ার দরজা ঠেলে বাড়ী ঢুকে পড়ি। অনেকদিন পরে টুনি আমায় দেখে প্রথমে বোধ হয় অপরিচিতভ্রমেই ডেকে ওঠে 'ঘেউ' 'ঘেউ' স্বরে; কিন্তু কাছে এসেই তার উগ্রভাব বদলিয়ে যায়—পরিচয়ের নিবিড় আনন্দে তার মনের উচ্ছ্বাস আধখানা লেজের মুহুর্মুহুঃ সঞ্চালনে প্রকাশ পায়। মার পায়ের ধূলা নিতে যেই হাত তুলেছি, কে যেন বিকট স্বরে হেসে উঠলো—হাঃ হাঃ হাঃ।—চমকে উঠি। মা চীৎকার করে ওঠেন। ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি যেন সেখানে এক মহা আশঙ্কার ছায়া এসে জমেছে। বলেন,—"দূর হ'—দূর হ' ডাইনী। কতদিন পরে বাছা আমার ঘরে এলো,—এ সময় তুই কেন রে?"—সুমুখের মেঠো রাস্তাটার দিকে তাকাই, দেখি এক শীর্ণা কঙ্কাল-সার নারী। মুখে তার বীভৎসতা মাখানো,—চোখে তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি,—মাথার চুলগুলো জট পাকিয়ে ইতস্ততঃ ছড়ানো, পরণে মলিন অতি জীর্ণ বাস। রাস্তার ধারে বেলগাছ তলায় দাঁড়িয়ে আপন মনে মাঝে মাঝে বিকট হাসি হাসছে আর কি যেন বিড় বিড় ক'রে বলে চলেছে।

আশ্চর্য্য হয়ে যাই। মাকে শুধাই,—"ও কে মা? আর কোন দিন তো দেখি নি ওকে?"

মা যেন মহাবিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। বলেন, "পরে সব বলছি বাবা, এখন ঘরে এসে বিশ্রাম করবে চলো।—যত সব অমঙ্গল এসে জোটে।" পরে পাগলীর

উদ্দেশ্যে তাঁকে ডেকে চেঁচিয়ে বলেন,—"এই পালা পালা, শীগ্‌গীর পালা বলছি এখান থেকে, নইলে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবো।—

আমি তখন মা'র পাশে, দেখি অর্দ্ধদগ্ধ কাঠের মত সরু লিক্‌লিকে কঙ্কালবৎ হাত দুটো তুলে ও মোড়ের দিকে এগিয়ে যায়। একটা অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে বলতে বলতে গেল,—হবে হবে, ঠিকই ভাল হ'বে,—কীনু ভাল হবেই—মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়। অনেক দূর থেকে বাতাসে একটা বিকট আওয়াজ ভেসে আসে—"হাঃ হাঃ—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ"— মা নিজের মনেই বলে ওঠেন,—"ষাট! ষাট!!"—পরে আতঙ্ক-মিশ্রিত বিরক্তি ভরে আমায় একটু তিরস্কারের স্বরে বলেন, "সেই থেকে বলছি, ঘরে চল্; তা' আমার কথা গ্রাহ্যই হয় না। ঘরে গিয়ে আগে ওঁর ছবিকে প্রণাম করবি চল্।" এবং নিজেই আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে আমায় ঘরে আনেন।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর একথা ওকথা হ'তেই মা পাগলী-প্রসঙ্গের অবতারণা করেন।

তখন মণ্টু, মীনা কেউ হয় নি। তুই তখন বছর পাঁচেকের হবি। সেই আমাদের আগের বাড়ীর পাশেই ছিল ওদের বাড়ী।

হারাণ আর পরাণ দুই ভাই। বড় রাস্তার ওপর ছিল ওদের মুদীখানার দোকান। দুই ভাইয়ে কী ভাব, যেন সাক্ষাৎ রাম-লক্ষণ। দুই ভাইয়ের দুই বউ,—তারাও দু'টিতে ছিল হরিহর-আত্মা। বড়টির নাম 'নয়ন', আর ছোটটির নাম 'দুলালী'।

ওরা যখন ও-বাড়ীতে আসে, তখন বছর পাঁচেকের কথা। তার মাঝে হ'য়ে গেছে ওদের সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন; ওদের শ্বশুর-শাশুড়ী পর পর চলে গেল স্বর্গের সংসারে, আর ওরাই হ'ল গিন্নী।

আমাদের নিজে চোখে দেখা, এত ভাব বুঝি মায়ের পেটের বোনেদের মধ্যেও হয় না। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত 'নয়ন' কেবল ব্যস্ত, কী করে 'দুলালী'কে খাওয়াবে, যত্ন করবে। আর দুলালী' ও সর্ব্বদাই ঘুর ঘুর ক'রে দিদির পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দিদির কী কাজে সাহায্য করবে।

এমনি মজা, ঠিক এক কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন দু'টি বউ-ই প্রসব করলে দু'টি ছেলে,—ভারি সুন্দর টুলটুলে ছেলে দু'টো, যেন একটা ডালে দু'টি ফুল।

দিনে দিনে বাড়তে লাগলো ছেলে দু'টি। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বোঝা গেল 'দুলালী'র ছেলেটি হাবা। 'নয়নে'র ছেলের মুখে বুলি ফোটে আধো আধো, আর 'দুলালী'র ছেলে—মুখ দিয়ে বা'র করে অদ্ভুত এক শব্দ মাত্র।

দুলালী দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়ে খান্ খান্ হয়ে নিজের ঘরে। পরাণ ওকে সান্ত্বনা দেয়,—নয়ন ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আদর ক'রে, বলে, "দুলু, তিনুকে তুই নে, 'কিনু'কে আমায় দে।" দুলালী মাথা সরিয়ে নেয়, ওর মাথাটা যেন জ্বালা করে নয়নের বুকের উ[illegible] তাপে।

এখান থেকেই সুরু হ'লো মন-নদীর এক দিক[illegible] ভাঙন। নয়নের মনে জেগেছে দুলালীর প্রতি সহানু[illegible] সে তাকে সব সময়ে ভুলিয়ে রাখতে চায় এই অ[illegible] শয্যটুকু ছাড়া ব্যবহার ও অন্তরের টানে নতুন [illegible] হয়নি, ঠিক আগের মতই সে আছে। কিন্তু, দু[illegible] মনে পরিবর্ত্তন এসে গেছে। নয়নকে যেন সে আর[illegible] করতে পারে না, সব সময়েই তার মনে হয়, নয়ন [illegible] ওকে এখন করুণাই করে,—তার মুখে চোখে [illegible] বিদ্রূপের হাসি।

তবু হাবা ছেলেকে সর্ব্বদা বুকের মধ্যে টেনে রা[illegible] আর তার অমন শরীর দিন দিন শুকিয়ে যায় বাসি ঝর[illegible] ফুলের মত। অন্ধকার ঘরে ছোট্ট প্রদীপ জেলে ছেলের ছোট্ট মুখ-গহ্বর পরীক্ষা করে দেখতে চায়—কেন তার অমন সাধের খোকা শেষ পর্য্যন্ত বোবা হয়ে রইল। সে কান্নায় ফুঁপিয়ে ওঠে। হঠাৎ বাইরে থেকে সাড়া আসে, "দুলু, ও-দুলু, দিন-রাত ঘরের মধ্যে কী করিস? আয় বাইরে আয়।" বলতে বলতে নয়ন ঘরে এসে ঢোকে। বলে রাত দিন এমনি করে ছেলে কোলে নিয়ে ঘরে বসে বসে কাঁদ্‌লেই কী সব হবে? শরীরের কী হাল হয়েছে একবার আয়নায় দেখ দেখি?"

"আমার ছেলে হাবা-বোবা বলে ওকে কোলে করাও কি দোষ, দিদি?" দুলালী হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে। বলতে বলতে তার গলা বুঁজে আসে।

নয়ন সহজ সুরেই জবাব দেয়,—"ষাট, ষাট! তুই যেন দিন দিন কী হচ্ছিস, দুলু। কী কথা থেকে কী কথা যে টেনে আনিস! তোর ভালর জন্যই বলছিলাম।" দুঃখে ভরে ওঠে নয়নের বুক,—আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে।

"আমার ভালো-মন্দ কাউকে দেখতে হবে না।" সশব্দে নয়নের পেছনেই দরজায় খিল পড়ে।

এমনি করে দিন কাটে কোনমতে। সুন্দর হাসি-খুসী-ভরা সংসারে কোথা হতে যেন অশান্তির কাল ছায়া পূর্ণিমার রাতে রাহুর মত হাত বাড়িয়ে গ্রাস করতে এল। হারাণ বলে, "পরাণ, বৌমাকে ডাক্তার দেখা,

শেষে মাথার রোগ হ'য়ে যাবে!" পরাণের জবাবে একটু উত্তাপ থাকে,—"ভাল মানুষ আবার পাগল হ'তে যাবে কোন্ দুঃখে?" সে সেখান থেকে স'রে য'য়।

মানদার সঙ্গে দুলালীর দেখা পুকুর-ঘাটে। মানদা বলে হাত-মুখের বিচিত্র ভঙ্গী করে,—হ্যাঁ-গো হ্যাঁ, সব জানা আছে! পাছে তোমার ছেলেটি ভালো হয়, তাই ও-সব বড় বৌএর কারসাজি।"

দুলালীর মনের মাঝে একটা সন্দেহের আলোকপাত হয়। তবুও ঢোক গিলে কম্পিত স্বরে বলে ফেলে, "না না, কী যে বল! এ ক'রে দিদির লাভ-ই বা কী?"

"তুমি বড় ন্যাকা মেয়ে, মা—"মানদা মুকিয়ে ওঠে। "নিজের ছেলেটি ভালো হ'লে সব সম্পত্তি ও-ই পাবে, ভাগ হবে না, বুঝেছ? বলে, কত দেখেছি! কিন্তু বাছা, এ সব ওষুধ ধারণে বিশ্বাস না থাকলে উল্টো ফল ফলে। তুমি আগে মন স্থির কর।"—ফরফরিয়ে ঘাট ছেড়ে চলে যায় মানদা।

দুলালী কাতর হ'য়ে বলে, না, না, ও মানদা, তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আমার পেটে'র ছেলে ত' আগে!" ছুটে গিয়ে মানদার হাত দুটো চেপে ধ'রে দুলালী কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে,—"তুমি রাগ ক'রো না, মানদা, মন আমার ঠিকই আছে।"

শয়তানী হাসি হেসে মানদা বলে, "তবে কাল সাঁঝের বেলায় এই খানে এসো, ওষুধ নিয়ে যেও। আর, হ্যাঁ, দামটাও নিয়ে আসতে ভুলো না।"

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় পেছনের বাঁশ-শ্যাওড়া গাছ-তলায় দুলালী গিয়ে দাঁড়ায়। চারি দিকে ঘন আঁধার ছেয়ে আসে। দুলালীর গা-টা ছম্ ছম্ করতে থাকে। তবু খুব শক্ত হয়েই সে মানদার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। মনের মধ্যে চিন্তা,—না-না, প্রতিশোধ তার নিতেই হবে,—এমনি করে আমার বাছাকে ওষুধ করা!

মানদা এসে পড়ে, হাতে তার একটা কাগজের মোড়ক। দুলালী শুষ্ক স্বরে বলে, "ওর ছেলেটার আবার কাল রাত থেকে বেদম জ্বর হ'য়েছে, চোখ মেলছে না—গলাটা ভিজিয়ে নেয় ঢোক গিলে।

মানদা আশ্বাস দেয়,—"ও সব ঠিক হয়ে যাবে! আজ রাতেই কিন্তু খাওয়ানো চাই বাটিতে গুলে। দেখবে, কালই তোমার ছেলের মুখে কথা এসে যাবে আর ওর ছেলেটা চিরদিনের মত বোবা হয়ে থাকবে।"

তারপর হঠাৎ মানদা তার হাতখানা এগিয়ে দিয়ে বলে, "তা' হলে, এবার আমার পাওনা দিয়ে বিদেয় দেও; একটু ঝট-পট কর মা, আমার আবার অন্য কাজ আছে।" বলে একবার আশে-পাশে উকি মেরে দেখে নেয়।

দুলালীর মন তখন আশা-আনন্দে মাতাল হ'য়ে আছে; ওর ছেলে কানু তা' হলে কাল থেকেই কথা বলতে পারবে! ওকে ডকবে 'মা' বলে। ভাবতেই শরীরখানা আনন্দে যেন শিউরে উঠ্‌লো। চট্ ক'রে বাঁ-হাত থেকে তাগাগাছটা খুলে মানদাকে দিতে দিতে বললে,—"ছেলের প্রাণের কাছে আবার এ-সবের দাম!"

গভীর নিশুতি রাত। দূরে দুই একটা শেয়াল ডাকছে। দুলালী বিছানা ছেড়ে ওঠে। বাটিতে গোলা ওষুধ। ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় নয়নের ঘরের দিকে। জ্বরের ঝোঁকে শিশু কেমন অবশ হ'য়ে আছে। নয়ন ক্লান্ত হ'য়ে চোখ বুঁজেছে, বাহুর বাঁধনে ওর খোকা। দুলালীর মাথাটা কেমন চন্ চন্ ক'রে ওঠে, হিংসার বিষে জলে ওঠে ওর চোখ দু'টো। কিসের একটা ধাক্কা খেয়ে ওর হাতের বাটির গোলা ওষুধ টুকু চল্‌কে সব ছিটিয়ে পড়ে ছেলের চোখে মুখে।

মা একটু থামলেন বল্‌তে বল্‌তে। আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুন ছিলাম, বললাম, "তারপর কি হ'ল, মা?"

মা বলতে লাগলেন,—তারপর যা হবার হ'ল। নয়নের ছেলেকে কেউ বাঁচাতে পারলে না। তারপর দিন সকালে সকলেই দেখলে দুলালী পাগল হ'য়ে গেছে। কি বিষ ছিল বাটিতে! হয় ত, ছেলেটা অসুখ থেকেই বাঁচতে পারত কিনা সন্দেহ,—হয়ত আরও দুএকদিন বাঁচলেও বেঁচে থাকতে পারত, কিন্তু দুলালীর বিষে তাকে আর দু'ঘণ্টাও থাকতে হ'লোনা। দুলালীর হাবা ছেলেটাও কিছুদিন পরেই মারা যায় শুনেছি। নয়নও ছেলের শোকে আর বেশী দিন বাঁচতে পারলে না। এর কিছুদিন পরে ওরা ও-বাড়ী ছেড়ে চলে যায়! পাগলীটারও আর সন্ধান পাওয়া যায় না। হঠাৎ এই কিছুদিন হ'ল সেই পাগলী দুলালী কোথা থেকে এইখানে এসে হাজির হয়েছে, আর পাড়ার সবাইকে জ্বালাতন ক'রে মারছে। সাক্ষাৎ ডাইনী রে, সাক্ষাৎ ডাইনী—ওর দৃষ্টি পড়লে ছেলে পুলেদের কি আর মঙ্গল আছে? সবাই ওকে তাড়ায়, চলে যায়, আবার কখন কোথা থেকে এসে হাজির হয়। ওর গলার স্বর পর্য্যন্ত বাতাসে যতদূর ভেসে যায়, ততদূর পর্য্যন্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা হয়।

রাত অনেক হ'য়ে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। শুধু ঝিল্লির একটানা সুর তখনও ভেসে আসছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুলালীর কথাটাই ভাবতে লাগলাম। অভাগিনীর পরিণাম! মাথায় মন্টা টনটন্ ক'রে উঠতে লাগল। মনে হ'তে লাগল, সেই সঙ্গে দুই হাতে সে কেমন ক'রে সকলের ঘৃণা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ এতটা ঘৃণার পাত্রী সে হয়তো নয়। একটা সহানুভূতি মন-খানাকে তার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

বহির্বিশ্ব

নগেন দত্ত

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ মানিয়া লইয়াছেন। এবং ইহার রাজনৈতিক মর্য্যাদা ইতিপূর্ব্বে যাহাই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে যে তাহার অন্যথা হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কথা হইতেছে ইন্দোনেশিয়া এই নূতন রাজনৈতিক মর্য্যাদা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে টিকিয়া থাকিতে পারিবে কিনা। জাপান প্রাচ্য দেশে শ্বেত জাতিকে পুরোপুরি হটাইয়া দিয়া যে প্রভুত্ব সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা হারাইল। কেন হারাইল, সে প্রশ্ন অনেকটা অবান্তর। হারাইল ইহাই হইল বর্ত্তমানের ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীনের সমগ্র মুক্তি-সংগ্রাম বিচার করা উচিত। জাপান যেখানে ভুল করিয়াছে অর্থাৎ যেখানে জনগণকে অবিশ্বাস করিয়াছে অথচ তাহাদের নিকট হইতে পুরাপুরি কাজ উশুল করিয়াছে, সেইখানে মিত্রশক্তি আপনাদের ভবিষ্যৎ প্রভুত্ব ফিরিয়া পাইবার জন্ম অনেকখানি ঔদার্য্য দেখাইয়াছে। মিত্রশক্তির পক্ষে প্রাচ্য দেশে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রধান অন্তরায় ছিল এক সমাজগত বিশেষ একটা মনোভাব। অর্থাৎ শ্বেত জাতির বিরুদ্ধে সামাজিক ঘৃণার অপ্রতিহত প্রকাশই ছিল প্রাচ্য দেশের নিপীড়িত জাতির একমাত্র মানসিক শক্তি। জাপান যুদ্ধে নামিয়া অবধি এই ঘৃণাটাকে যত্নসহকারে লালন-পালন করিয়াছে। মানসিক শক্তিতে বিশেষ করিয়া ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ও বর্ম্মা প্রভৃতি দেশের জাতিগুলির মধ্যে এই মানসিক শক্তি বিকাশ করিয়াছিল। মিত্রশক্তি এই বিকাশকে সত্যিকারের বাধা বলিয়া মনে করিতেন।

মিত্রশক্তি প্রথমেই এইসব বাধাকে অতিক্রম করিবার জন্ম এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিলেন। এই পন্থা প্রথমে তাহাদের সহায়ক হইয়া পরে বিপদের কারণ হইল। বিপদ কি করিয়া ঘনাইয়া আসিল, তাহা বিচার করিতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়িবে একটি ঘটনা। যে বিভিন্ন শক্তি জাপানকে পরাজিত করিবার জন্য নিজেদের প্রয়োজনে দল বাঁধিয়া ছিল, তাহারাই নিজ নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। জাপানের পরাজয়ের পর মার্কিণ কূটনীতি ও ব্রিটিশ কূটনীতি সোভিয়েট রাশিয়াকে সায়েস্তা করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল। বাকি যাহারা রহিল, তাহারা হইতেছেন পুরাতন প্রভু। তাহারা তাহাদের হৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইতে হাত বাড়াইল। কিন্তু ইতিমধ্যে যে গণতন্ত্রের শিক্ষা মিত্রশক্তির পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে কাজ করিয়াছিল, তাহাই পুরাতন প্রভু—ওলন্দাজ ও ফরাসী —বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। গণতন্ত্রের আদর্শে শিক্ষিত হইয়া প্রথমেই ইন্দোনেশিয়াও ওলন্দাজদের জানাইয়া দিল যে, গণতন্ত্রের প্রয়োগ ইন্দোনেশিয়ায় হউক। ওলন্দাজরা বুঝিল ছাত্রের শিক্ষা ঠিকই হইয়াছে, তবে প্রয়োগস্থল ঠিক হয় নাই। বড় বড় আদর্শের পরীক্ষা চিরকালই পরের ঘাড়ে চালাইতে হয়, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রবাদীরা এইরূপ ভাবিতেই অভ্যস্ত—তাহা যে একেবারে তাহাদের নিজেদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে, তাহা প্রথমে ঠাহর করিতে পারে নাই। তাই প্রথম লজ্জা সামলাইয়া লইয়া, সোজা বন্দুক ধরিল। গণতন্ত্রের আসল স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল ইন্দোনেশিয়া ইহা যে বুঝিতে পারে নাই, এমন নহে, নচেৎ জন-বল ও মন-বল এত সত্বর কোথা হইতে আসিল।

যে কোন রাজনৈতিক ঘটনা আজ জগতে দুইটি রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। এক দিক তাহার অন্তর্বিশ্ব, আর এক দিক তাহার বহির্বিশ্ব। ইহা যে শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেই প্রকাশ পায় এমন নহে, জাতি বা রাষ্ট্রের জীবনেও এই রূপ ঘটিয়া থাকে, যতদিন কোন বিশেষ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিরোধ শুধু মাত্র সেখানকার জনগণকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে ততদিন পর্য্যন্ত সেই রাজনৈতিক বিরোধ তাহার অন্তর্বিশ্বে বাস করিতেছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু এই সীমানা অতিক্রম করিলেই রাজনৈতিক বিরোধ অন্য রূপ পরিগ্রহ করিবে। অর্থাৎ বর্হিবিশ্বে আসিয়া পড়িবে। ইন্দোনেসিয়ার রাজনৈতিক বিরোধ তাহার আবাসস্থল ডিঙাইয়া বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইয়াছে কেননা, অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরা ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করিয়াছে। এমন কি, মার্কিনরাও কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে। এবং কেউ কেউ এরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মার্কিনরা তাহাদের দেয় মাল-মসলা কোন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে প্রয়োগ করায় বিশেষ আপত্তি করিয়াছে। তাই ইন্দোনেশিয়ার ও ওলন্দাজদের মধ্যে এত সহজে মীমাংসা হইল। ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার অবকাশ এস্থলে নাই। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় হঠাৎ ঘটনার গতি পরিবর্ত্তন হইবার মূলে বিশেষ কোন একটা শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে। ইহাই হইল ইন্দোনেশিয়া সমস্যা। বাইরের রূপ তাই। এশিয়াবাসী আজ এই ঘটনাকে তাহাদের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির দিক হইতে দেখিয়া থাকে। এশিয়াবাসীর যে মহামিলনের ক্ষেত্র সেদিন দিল্লীতে রচনা হইয়া গেল, তাহা বর্ত্তমানে ইতিহাসের অতি বিস্ময়কর ঘটনা। য়ুরোপবাসীদের জীবনে আজ কৃষ্টি ও সভ্যতার স্থান নগণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই তাহারা বিনা রাজনৈতিক স্বার্থে কেহ কাহারও সাথে মিলিবার অবকাশ পায় না। য়ুরোপের আন্তর্জ্জাতিকতা আজ বিক্ষুব্ধ চিত্তের ঔদাসীন্য ও হতাশা লইয়া দেখা দিয়াছে। তাই তাহার সৃজনী শক্তি লোপ পাইয়াছে। এশিয়ার নব্য আন্তর্জ্জাতিকতা বোধ তাহার রাজনীতিকে অনেক অংশে প্রভাবিত করিবে সত্য কিন্তু যেন সন্দেহবাদ স্থান না পায়। তাই ছোট ছোট রাজনৈতিক বিরোধ অন্যান্য এশিয়াবাসীর সহানুভূতি পাইতেছে। এই বৃহত্তর রাজনৈতিক চেতনার দিক হইতে ইন্দোনেশিয়ার বর্ত্তমান রাজনৈতিক মর্য্যাদা ও মুক্তি বিশেষ একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

মস্কো-সম্মেলন

মস্কো-সম্মেলন একটা নগ্ন সত্য ধরা পড়িয়াছে, যাহা এতদিন চাপা ছিল তাহা প্রয়োজনের পথ ধরিয়াই চলাফেরা করিত। কাজেই প্রয়োজনের পথটা যতদিন বিঘ্নসঙ্কুল ছিল না ততদিনই নগ্ন সত্য প্রকাশ হয় নাই। তার মানে রাজনৈতিক বিশ্বে কেহ টের পায় নাই যে, চতুঃশক্তির মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। কাণাঘুষা অবশ্য অনেক কথাই শোনা গিয়াছিল, বিশ্ববাসীকে সবাই বারণ করিয়া দিয়াছে—যাহা সরকারী ভাবে সমর্থিত নহে এমন খবরে আস্থা স্থাপন করা সমীচীন হইবে না। না হয় এত দিন বিশ্ববাসী সেই সাবধানবাণী মানিয়া লইয়াছে, কিন্তু আজ? আজ কি হইল, সবাই যাহা সন্দেহ করিয়াছিল তাহাই সত্যে পরিণত হইতে চলিল। মনে হইতেছে, জার্ম্মানীকে পরাজিত করা ইহার চাইতে কম সহজ ছিল, বস্তুতঃ হইয়াছেও তাহাই, হিটলার বধের নিমিত্ত দেশ ও জনসাধারণকে ক্ষ্যাপাইয়া যে দুর্দ্ধর্ষ মানসিক প্রস্তুতি তৈরী করা হইয়াছিল তাহা হিটলারবাদ উত্তেজনার মুখেই ধ্বংস করিয়াছে, কিন্তু হিটলারবাদকে ধ্বংস করিয়া নূতন কি সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইবে তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ মিত্রশক্তির (war aims) যুদ্ধ-আদর্শের মধ্যে ছিল না, সবাই মিলিয়া ভাঙ্গিবার কাজে ব্যস্ত ছিল তাই আজ গড়িবার বেলায় কেহই নাই।

পশ্চিম গণতন্ত্র, অর্থাৎ যাহার ব্যাখ্যা ইঙ্গমার্কিণ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি যাহা ভাল বোঝে, এবং পূর্ব্বদেশীয় গণতন্ত্র অর্থাৎ যাহার ব্যাখ্যা সোভিয়েট-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি ভাল বোঝে—ইহা লইয়া বিরোধ বাধিয়াছে,দুইটি দৃষ্টি ভঙ্গীর একে অন্যের প্রতি সন্দেহ করিয়া আগাইতেছে অথচ উভয়েই য়ুরোপে শান্তি বিরাজ করুক এই কথা জোর গলায় প্রচার করিতেছে। আজ বিশ্ববাসীর মনে প্রশ্ন জাগিতেছে, যে আসল বিরোধটা কোথায়? গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া কি এত গোলযোগ? সোভিয়েট তাহার প্রভাবের ডানা যেভাবে বিস্তার করিতেছে তাহাতে ইঙ্গমার্কিণ শক্তিবর্গের দুশ্চিন্তার কারণ আছে। জার্ম্মানীকে খণ্ড ছিন্ন করিয়া চারিজনে চারিটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ লইয়া নব্যধারা প্রবর্ত্তন করিবার তালে আছে। অথচ বেচারী জার্ম্মানীর নিজের বলিবার মত কিছু নাই! তার যে-অংশ যার আওতায় সেই অংশেই একটি করিয়া নেতা গজাইতেছে। ইঁহারাই প্রভুর স্বর অনুকরণ করিতেছেন। আসল সমস্যা লইয়া প্রশ্ন উঠিলেই শক্তিবর্গেরা গোসা করিতেছে, ফরাসীর কয়লার অভাব সে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছে যে রুশের কয়লা না পাইলে তাহার চলিবে না, রুশরা বলিয়া দিয়াছে তাহাদের জার্ম্মানীর সঙ্গে লড়াই করিয়া সবার চেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে, অতএব তার এখনই ক্ষতিপূরণ চাই এবং তাহা জার্ম্মানীর চল্‌তি উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্য হইতে সমাধা করিয়া দিতে হইবে। মার্কিণরা কহিতেছে যে জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অবস্থায় চল্‌তি উৎপন্নদ্রব্য রাশিয়ার যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ নহে, এমতে ব্রিটেনও সায় দিতেছে, ব্রিটেন ফরাসীকে কয়লা দিয়া যদি সাহায্য করিতে যায় তবে জার্ম্মানীর সব শিল্পসম্ভার, যাহা ব্রিটেনের আওতায় রহিয়াছে, তাহা অচল হইয়া পড়ে। এত সব ভেদ ও বিভেদের মধ্যে একমাত্র ব্রিটেন ও মার্কিণের মধ্যে খানিকটা সখ্যভাব বিরাজ করিতেছে। ইহার হয়ত অন্য কারণ থাকিতে পারে। তাছাড়া, প্রকৃত পক্ষে কেহই নিজের স্বার্থের গণ্ডি ছাড়িয়া বাহিরে আসে নাই. অথচ সব চাইতে মজার বিষয় হইল, চারিটি রাষ্ট্রের চারজন ধুরন্ধর ব্যক্তি একই সম্মেলনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কথা ছিল, জার্ম্মানীর দুর্ভাগ্যের নিষ্পত্তি এইখানেই হইয়া যাইবে। কিন্তু যাহার ভাগ্য পরের স্বার্থের উপর নির্ভরশীল তাহা কি এত সহজে মিটে। জার্ম্মানী আজ যে শিকল গলায় পরিয়াছে তাহা ছিঁড়িতে অন্ততঃ পঁচিশ বছর লাগিবে।

রাশিয়া পশ্চিমী গণতন্ত্রের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল যে, জার্ম্মানীকে সংহত কেন্দ্রীভূত শক্তিতে পরিণত করা হউক,জার্ম্মানী স্থিত স্বার্থ—মর্জ্জার কার্টেল ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক, আর এমন কতকগুলি শিল্প গড়িয়া উঠুক যাহা শান্তিপর্ব্ব রক্ষায় সমর্থ হইবে। ইহা মোটামুটি ভাবে একটা দাবীর খসড়া মাত্র। কিন্তু ইহাতে সবার চাইতে আঁতে ঘা পড়িল তাদের, যারা স্বাধীন ও অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিপোষক, বর্ত্তমান ধনকুবেরের দেশ মার্কিণ অবাধ ব্যবসায়-বাদ সাধিবার জন্য রাশিয়া দোষারোপ করিতেছে। ইহাতে নাকি গণতন্ত্রের কোন অর্থই থাকেনা, যদি স্বাধীন ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ শোষণকার্য্য না করা যাইবে তবে ছাই গণতন্ত্র কি? তা ছাড়া মার্কিণ ধনিকরা এমন গণতন্ত্র বোঝে না যাহাতে অবাধ বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়। অবাধ বাণিজ্য যে বিশ্বের কত বড় সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা না বুঝিবার সুনিপুণ অভিনয় মার্কিণ প্রতিনিধিরা মস্কো-সম্মেলনে করিয়াছে, এই না বুঝিবার অভিনয়টি হইল মস্কো-রঙ্গমঞ্চের প্রধান দৃশ্য বস্তু। সুরসিক পর্য্যবেক্ষক ইহা বুঝিয়া লইবেন যে, শেয়ানে শেয়ানে চিরকালই কোলাকুলি চলে কিন্তু কোন দিন খোলাখুলি আলোচনা চলে না, আর খোলাখুলি আলোচনা যে করিবে তাহারই সমূহ ক্ষতি হইবে। শস্ত্রযুদ্ধে যদি বা ক্ষতি স্বীকার অনেক সময় দায় পড়িয়া করিতে হয় কিন্তু কুটনৈতিক যুদ্ধে অসম্ভব।

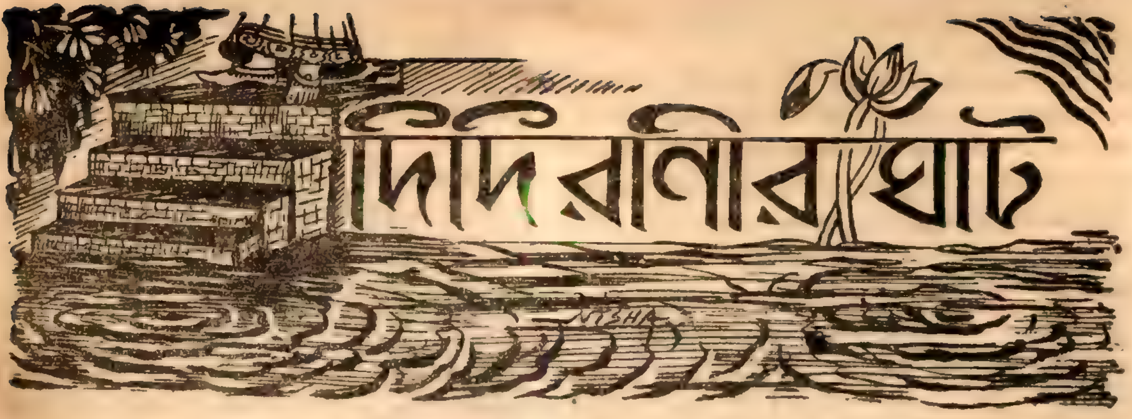

দিদিরাণীর ঘাট

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত, এম-এ, বা'র-এট-ল

ক্রমে কলেজের মেয়েদের মধ্যে একটী মেয়ের সঙ্গে আমার ভাব বিশেষ রকম জমে উঠল। মেয়েটীর নাম মাধুরী—দীর্ঘ একহারা নিটোল গড়ন, এবং যদিও গায়ের রং ঠিক ফর্সা বলা চলে না, তবুও মুখখানা ভারী মিষ্টি—আমার বিশেষ ভাল লাগে। অবশ্য পাতলা ছোট ছোট দুটী ঠোঁট ছাড়া মুখের মধ্যে আর কোনও বিশেষত্ব এমন কিছু লক্ষ্য করার নাই, তবুও সমস্ত মিলিয়ে এমন একটী মাধুর্য্য ভেসে উঠেছে মুখের উপরে যে, তার 'মাধুরী' নামটী যেন ষোল আনা সার্থক হয়েছে—অস্বীকার করা একেবারেই চলে না। আমারই মতন সেও ক্লাসে চুপচাপ বসেই থাকে ; কারও সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা বলে না। কিন্তু আমার সঙ্গে ভাব জমে ওঠার পর ক্রমে লক্ষ্য করলাম যে, কথাবার্ত্তা সে বেশ কইতে জানে—এবং তার কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে তার প্রাণের প্রাচুর্য্যের পরিচয় বারে বারে পাওয়া যায় এবং সেদিক দিয়েও মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। সবই তার কেমন শান্ত, সমাহিত—ধীরে চলে, ধীরে নীচু গলায় কথা বলে এবং ধীর মৃদু হাসি মাঝে মাঝে মুখের উপর যেন একটা স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে দেয়। কলেজের কাছাকাছি ভবানীপুর পাড়াতেই মেয়েটী থাকে এবং দু'বেলা হেঁটেই কলেজে যাতায়াত করে—কলেজের গাড়ী ব্যবহার করে না।

মেয়েটীর সঙ্গে ভাব হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, তার জীবন তার এক কাকার অনুপ্রেরণায় বিশেষ অনুপ্রাণিত। মেয়েটীর কাকা কলকাতার কাছাকাছি এক মফঃস্বল-কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক—প্রতি শনিবার কলকাতায় আসেন এবং হয় সোমবার ভোরে না হয় রবিবার রাত্রে কর্ম্মস্থলে ফিরে যান। কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে ওদের নিজেদেরই বাড়ী—বাবা মা অর্থাৎ মাধুরীর দাদাম'শাই এবং ঠাকু'মা এখনও বেঁচে আছেন। মাধুরীর দাদাম'শাই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ৫।৬ বছর হল অবসর গ্রহণ করে, কলকাতায় নিজেদের বাড়ীতেই বাস করছেন। মাধুরীর বাবা বেঁচে নেই ; তিনি বছর ৪।৫ হ'ল হঠাৎ বসন্ত রোগে কলকাতার বাড়ীতেই মারা যান, তিনি আলীপুর কোর্টের উকীল ছিলেন। মাত্র বছর ৩৫।৩৬ বয়সে বড় ছেলের এই আকস্মিক মৃত্যুতে মাধুরীর দাদাম'শাই এবং ঠাকু'মা বিশেষ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং সে শোক তাঁরা এখনও সামলে উঠতে পারেন নি। তাই তাঁদের একান্ত ইচ্ছা ছোট ছেলে অর্থাৎ মাধুরীর কাকা বৃদ্ধ বয়সে কলকাতায় তাঁদের কাছেই থাকেন এবং সেইজন্যই নাকি মাধুরীর কাকা শুধু ছুটিতেই নয়, প্রতি শনি, রবিবার এসে বাবা মাকে দেখে যান এবং বিশেষ চেষ্টায় আছেন যদি কলিকাতার কোনও কলেজে অধ্যাপকের কাজ জোগাড় করে নিতে পারেন। মাধুরীর একটী ছোট ভাই আছে, স্কুলে পড়ে এবং ভাই বোন বিধবা মায়ের সঙ্গে দাদু ঠাকু'মার কাছেই থাকে—দাদু ঠাকু'মা নাকি ওদের প্রাণের চেয়েও বেশী ভাল বাসেন। মাধুরীর কাকা—বয়স কম হয়নি, ৩৫ বছরেরও বেশী, কিন্তু এখনও বিবাহ করেন নি, কেন—মাধুরী তা ঠিক জানে না।

যাই হোক, এই কাকার প্রতি মাধুরীর মন যে ভক্তি-শ্রদ্ধায় সব সময় নুয়ে আছে এটা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। মাধুরীর কাকাও যে মাধুরীকে অত্যধিক স্নেহ করেন সে পরিচয় পেতেও আমার দেরী হয় নি। মাধুরীর একখানি সুন্দর বাঁধান খাতা আছে—মাধুরীর গত জন্মদিনে মাধুরীর কাকা মাধুরীকে উপহার দিয়েছিলেন। প্রতি রবিবার দিন কলিকাতায় এসে, মাধুরীর কাকা সেই খাতাখানির একটী পাতার উপরের দিকে ২।১ লাইন কোনও একটা কিছু লিখে দিয়ে যান এবং সমস্ত সপ্তাহ ধরে মাধুরীকে সেই লেখাটী নিয়ে ভাবতে হয়। শুধু তাই নয়, পরের রবিবারের আগেই ওর কাকার লেখাটীর নীচে দু পাতা সেই বিষয় ভেবে, যা মাধুরীর মনে হয়েছে, বিস্তারিত লিখে রাখতেও হয়। পরের শনিবার কি রবিবার ওর কাকা সেই লেখাটী এসে পড়েন, সে বিষয় মাধুরীর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং নিজের মন্তব্য পাশে দুচার লাইন হয়ত লিখেও দেন।

এ সব কথা আমার কাছে প্রকাশ হওয়ার পর আমি মাধুরীকে বিশেষ অনুরোধ করে বসলাম—খাতাখানি একদিন কলেজে নিয়ে এসে আমাকে দেখাতে। খাতাখানি কলেজে নিয়ে আসতে মাধুরীর বিশেষ মত ছিল না, পাছে অন্য কোনও মেয়ে খাতাখানি দেখে ফেলে এবং তাই নিয়ে কোনও রকম বিদ্রূপ করে। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত একদিন নিয়ে

আসতে রাজী হল এবং যেদিন খাতাখানি নিয়ে এল—সে দিনটা হচ্ছে বুধবার। বুধবার দিনটা কলেজে আমরা দুজনেই প্রায় দুঘণ্টা বিরাম পাই। সে সময় অন্য অন্য বিষয় পড়ান হয় এবং তার সঙ্গে আমাদের দুজনার কারোরই কোনও যোগ নেই। সেই সময়টা খাতাখানি নিয়ে আমরা দুজনে কলেজের একটা ফাঁকা ঘরে এক কোণে নিরিবিলি গিয়ে বসলাম। খাতাখানি আমার হাতে দিয়ে মাধুরী বললে—

"এবার কাকু যা লিখে দিয়ে গেছেন, আমি ত ভাই সে বিষয় কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।"

"কৈ দেখি?"

"জীবনে সুন্দরের মধ্য দিয়েই ভগবানকে দেখতে হয়—তবেই সুন্দর হয় সার্থক।"

এই কথাগুলি খাতার একটা পাতার উপরের দিকে লেখা রয়েছে, প্রথমেই মনে হল—কি সুন্দর হাতের লেখা, পরিষ্কার অথচ অক্ষরগুলি যেন মেপে সুনিপুণ ভাবে সাজান।

খাতাখানি উল্টে উল্টে দেখতে লাগলাম। আগের দিকে চার পাঁচটা বিষয় নিয়ে লেখা হয়ে গেছে। প্রত্যেক বিষয়টা নিয়ে উপরে দু এক লাইন কাকার হাতের লেখা এবং তার নীচে পাতা দুই মাধুরীর লেখা এবং তার নীচে কিম্বা পাশে মাধুরীর কাকার মন্তব্য। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে মাধুরী নিজের হাতের লেখাটাও কাকার নকলে তৈরী করার চেষ্টা করছে এবং অনেকটা করেও এনেছে।

বললাম, "হাতের লেখাটাও যে কাকারই মতন তৈরী করছ।"

বললে, "কি সুন্দর হাতের লেখা কাকুর—না ভাই? ইংরাজী লেখাও চমৎকার।"

আগের লেখার বিষয়গুলির মধ্যে একটি বিষয় আমাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করল এবং মনোযোগের সঙ্গে সে বিষয় সবটাই পড়ে দেখলাম। বিষয়টা হচ্ছে মাধুরীর কাকার হাতের লেখা—"কবিরা জীবনে এত বড় কেন?" মাধুরীও এ বিষয় পুরো দু' পাতাই লিখেছে। মোটের উপর মাধুরীর বক্তব্যটা হচ্ছে—জীবনে কবিরা এত বড় তার কারণ তাঁদের অনুভূতির গভীরতা সকলের চেয়ে বেশী এবং আমাদের মনে সেই গভীরতা তাঁরা জাগিয়ে তুলতে পারেন। আমি হলেও বোধ হয় এই কথাই লিখতাম, তবে একটা জায়গায় মাধুরী লিখেছে, ভাল, পড়ে বিশেষ ভাল লাগল। মাধুরী লিখেছে "কবিরা জীবনে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন, সুন্দরের প্রতি আমাদের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেন। তাই কবিতা পড়লে জীবনও হয়ে ওঠে সুন্দর।" কিন্তু মাধুরীর লেখার পাশে তার কাকার মন্তব্যটা পড়ে কবিতার বিষয় একটা যেন নতুন দিক দেখতে পেলাম—এ দিকটা ত কখনও ভাবিনি। তিনি লিখেছেন, "আমাদের চোখ-কাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধরা দেয় যে-জীবন আমরা সেইটুকুই বুঝি, আমাদের সাধারণ অনুভূতিগুলির ভিত্তি তারই উপরে। কিন্তু তার বাইরে যে মহান্ বিরাট একটা কিছু আছে, যার বিষয় আমরা কিছু জানি না বুঝি না, আমাদের কাছে তার আভাষ এনে দেয় কবিরা—তার অনুভূতির গভীরতায় জীবন হয়ে ওঠে মহিমময়—বুঝতে পারি তার সত্যকারের মূল্য।"

বললাম, "এ কথা চমৎকার লিখেছেন ত তোমার কাকা। কবিতার এদিকটা ত কখনও ভাবিনি।"

মাধুরী বললে, "যতটা লিখেছেন তার চেয়েও অনেক বড় করে সহজ ভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অনেক কথা ভেবে দেখবার আছে ওদিক দিয়ে।"

বললাম, "একদিন ভাই তোমার কাকার কাছে আমাকে নিয়ে চল।"

বললে, "বেশ ত। এক রবিবার দিন এস না আমাদের বাড়ীতে।"

বললাম, "আমার এক দাদা আছেন, তিনিও অনেক বিষয় জানেন এবং আমাকে অনেক জিনিষ বুঝিয়ে দেন! তাঁকে নিয়ে যাব।"

বললে, "সে ত খুব ভাল হয়। তোমার দাদাও বুঝি প্রফেসার?"

বললাম, "না, হাইকোর্টের উকিল। তবে পড়াশুনা নিয়েই বেশীর ভাগ থাকেন।"

বললে, "আমার কাকাকেও হাকিম বা উকিল করবার বিশেষ ইচ্ছে ছিল দাদুর। কিন্তু তিনি প্রফেসার ছাড়া আর কিছু হতে একেবারেই রাজী হন নি।"

ঠিক হল, এক রবিবার দাদাকে নিয়ে ওদের বাড়ী যাব এবং ওদের বাড়ীর ঠিকানা আমার খাতায় টুকে নিলাম।

এবারকার বিষয়টা নিয়ে মাধুরীর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে আলোচনা হল। অনেক ভেবে শেষ পর্য্যন্ত বললাম, "দেখ, আমার মনে হচ্ছে যে কবিতার বিষয় তোমার কাকা যা মন্তব্য করেছেন সেই দিক দিয়ে ভেবে দেখলেই অনেক বলবার কথা পাওয়া যায়।"

মাধুরী শুধাল, "কি রকম?"

বললাম, "ভগবান ত আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধির বাইরে থাকেন। তাই জীবনে যা কিছু সুন্দর তার মধ্য দিয়েই তাঁর আভাষ আমাদের কাছে এসে পৌছায়।"

একটু ভেবে মাধুরী বললে, 'তা কথাটা ভেবে দেখবার। এক কাজ করা যাক—এবারকার বিষয়টা নিয়ে ভাই তুমি লেখ। আমি কাকুকে বলব—আমার এক বন্ধু লিখে দিয়েছে। মজা হবে মন্দ না।"

বললাম "না, না, না। সে কিছুতেই হতে পারে না।"

মাধুরীও ছাড়বে না। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হল মাধুরী পাতা দেড়েক লিখবে এবং বাকীটা আমি কিছু লিখে দেব।

বললাম "কিন্তু ভাই, তোমার কাকা হয়ত রাগ করবেন।"
মাধুরী বললে. "সে কি কথা। কাকা অত্যন্ত খুশী হবেন।

আমি তোমার কথা বলেছি কাকুকে।"

আগ্রহ হল।

শুধালাম "কি বলেছ ভাই?"

একটু হেসে মাধুরী বললে, "বলেছি—একটী পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার বিশেষ ভাব হয়েছে, তার মনের রূপও বাইরের চেয়ে কিছু কম নয়।"

বিশেষ ইচ্ছে হল প্রশ্ন করি—শুনে তোমার কাকা কি বললেন। কিন্তু বোধ হয় লজ্জা হল।

বললাম, "বাজে কথা বলতেও তুমি জান দেখছি।"

+ + +

মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে দু এক রবিবারের মধ্যেই দাদাকে ধরে নিয়ে মাধুরীদের বাড়ী যাব—কিন্তু হ'ল না। কলেজে বসেই শুক্রবার দিন মাধুরীর লেখাটার নীচে পাঁচ ছয় লাইন লিখে দিয়েছি—আমি যেদিক দিয়ে ভেবেছিলাম সেই কথাগুলিই লিখে দিয়েছিলাম এবং তা নিয়ে কি ভাবে ঠিক গুছিয়ে লেখা যায়—বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র—এই তিন দিন দিনরাত ভেবেছি। মাধুরী, আমার কথাগুলি নিয়ে কিছুই লেখেনি—বোধ হয় সেটা আমার জন্যই রেখে দিয়েছিল।

কেন যাওয়া হল না সেই কথাটাই এবার বলি।

বাবার শরীর কিছুদিন থেকে আবার খারাপ হতে সুরু হয়েছে। রোজই সন্ধ্যেবেলা একটু একটু জ্বর হয় এবং ক্রমেই যেন বড্ড কাহিল হয়ে পড়ছেন। আবার ডাক্তারদের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে আমাদের বাড়ীতে এবং দাদা কোনও দিক দিয়ে চিকিৎসা কিংবা পরিচর্য্যার কোনও ত্রুটী না হয় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলেন। অনেক ওষুধও খাওয়ান হল, ডাক্তাররা ইন্‌জেকসানও অনেকগুলো দিলে কিন্তু সন্ধ্যেবেলার সেই ঘুষঘুষে জ্বরটা কিছুতেই বন্ধ হ'ল না।

যে-শুক্রবার মাধুরীর খাতায় লিখে দিয়েছিলাম, তার বোধ হয় পাঁচ ছ'দিন পরে একদিন বিকেলের দিকে জ্বরটা খুব বেশী হল এবং পরের দিনও সে জ্বরটা ছাড়ল না। শুধু পরের দিনও নয়, ক্রমে দশ বার দিন কেটে গেল, জ্বরটা কম বেশী হয় বটে, কিন্তু একেবারে আর ছাড়ে না! বাড়ী শুদ্ধ আমরা সবাই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠলাম বাবার জন্যে।

দিন বার চৌদ্দ এইভাবে কাটল এবং তার পরে ক্রমে জ্বরটা মাত্রায় গেল কমে কিন্তু সামান্য একটু জ্বর দিনরাতই শরীরে থাকে—কিছুতেই ডাক্তাররা সেইটুকুকে তাড়াতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তাররা বোধ হয় হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, "হাওয়া বদলান দরকার—হাওয়া বদলালেই এ-জ্বরটুকু যাবে ছেড়ে।"

আমার কলেজের পূজার ছুটীর তখন বোধ হয় দিন পনেরো কুড়ী বাকী—বর্ষা তখনও মাঝে মাঝে হচ্ছে—তাই অনেক পরামর্শের পর ঠিক হ'ল যে আমার কলেজের ছুটী হ'লে পশ্চিমে কোথাও বাবাকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে যাওয়া হবে। দাদা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খবর নিতে লাগলেন—পশ্চিমে বেশ ভাল জায়গায় কি রকম বাড়ী পাওয়া যায়। পশ্চিমে বেড়াতে যাব—এ-বিষয় আমার আগ্রহও যে খুব বেশী হয়ে উঠ্‌ল সে-কথা বলাই বাহুল্য। সন্ধ্যাবেলা দাদার সঙ্গে প্রায়ই সে-বিষয়ে আলোচনা হয়—মাধুরীদের বাড়ী যাওয়ার কথাটা চাপাই পড়ে গেল। কলেজে মাধুরীকে বললাম, "বাবার ভাই খুব অসুখ চলেছে, বাবার অসুখ না কমলে তোমাদের বাড়ী যাওয়া হয়ে উঠ্‌বে না।"

মাধুরীও আর পেড়াপিড়ি করে নি।

অনেক খবরাখবর নেওয়ার পর দাদা দেওঘরে একখানা বাড়ী ঠিক করলেন—ঠিক হ'ল আমি ও দাদা বাবাকে নিয়ে দেওঘরে যাব এবং মেজবৌদি সেই সময়টা বাপের বাড়ী ঘুরে আসবেন। বড়বৌদির নিজের অমতের দরুণই হোক্ কিংবা দাদার অনিচ্ছার কারণেই হোক্ বড়বৌদির আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথা কিছু উঠ্‌লই না। দাদা চিঠিপত্র লিখে ব্যবস্থা করলেন যে, মাধবপুর থেকে একজন কর্ম্মচারী সেই সময়টা আমাদের কলকাতার বাড়ীতে এসে থাকবেন। এবং মেজ বৌদিকে তাঁর বাপের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর সম্পর্কে কাকা—এক প্রৌঢ় ভদ্র-লোক কলকাতায় আমাদের বাড়ীতে কিছুদিনের মধ্যে এসে হাজির হলেন।

দিন-ক্ষণ দেখে আমার পূজোর ছুটী হওয়ার সাত আট দিন পরে বিদেশ যাত্রার দিন ঠিক হ'ল। আমরা রাত্রের ট্রেণে হাওড়া ষ্টেশন থেকে রওয়ানা হব এবং মেজবৌদিও সেই রাত্রেই শেয়ালদা ষ্টেশন দিয়ে বাপের বাড়ী রওয়ানা হয়ে যাবেন—এই রকমই ব্যবস্থা হল। মেজবৌদিকে অবশ্য দাদা আগেই রওয়ানা হয়ে যেতে বলেছিলেন কিন্তু মেজবৌদি যেতে রাজী হন নি।

বিদেশ যাওয়ার গোছগাছ চলতে লাগলো। বাবার জ্বরটুকু চলেছে, কিছুতেই ছাড়ে না কিন্তু আর বাড়েও নি।

দাদা বললেন, "ডাক্তারদের কথাই ঠিক—এই একভাবে এতদিন ঐ বিছানায় শুয়ে আছেন, দেখিস নতুন জায়গায় গেলেই জ্বরটুকু যাবে ছেড়ে।"

ওষুধপত্র প্রভৃতিও দাদা সব সঙ্গে গুছিয়ে নিলেন। চেয়ারে করে বাবাকে উপর থেকে নামিয়ে মোটরে হাওড়া ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে আবার চেয়ারে করে কি ভাবে ট্রেণে তোলা হবে—সে-সব দিক দিয়েও পরিপাটী ব্যবস্থা হল।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিদেশ যাওয়ায়ও বাধা পড়ল, কেন—সেই কথাটা এইবার বলি। [ক্রমশঃ

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

শ্রীকুমুদনাথ দাস

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্'—এই ছিল প্রাচীন কালের লোকের মনের ভাব এবং তখন যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার (Spiritualism) প্রভাবই অধিক ছিল। এ-যুগে মানবের মন বস্তুতান্ত্রিকতার (Materialism) দিকে। 'The world is too much with us.' এ-যুগে যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে বস্তুতান্ত্রিকতার ভাবটাই অধিক ফুটিয়াছে।

সে যুগের সাহিত্যের বিষয় ছিল রাজা-রাজড়া—'the princes and prelates'; এ-যুগে সাহিত্যের বিষয় সব-হারাদের দল—

'The ranker, the tramp of the road.
The slave with sack on his shoulders pricked on with the good,
The man with too weighty a burden, too weary a load'

এ যুগের সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারপন্থী।

The centre of gravity in literature has shifted from spiritualism to Materialism, from the king to the people, from the classes to the masses from conservatism to reformism.

যে স্রোতস্বতীর বারি পান করিয়া সমস্ত নরনারী বাঁচিবে, তাহার ধারা যদি কলুষিত হয়, অথবা তাহার মুক্ত গতি অবরুদ্ধ হয়, তাহা যদি ভয়ানক অমঙ্গলের কথা হয়, তবে যে সাহিত্য পাঠ করিয়া সমগ্র জাতি বাঁচিবে, তাহার আদর্শ যদি বিকৃত হয়, অথবা তাহার মুক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়, তাহাও কি ভয়ানক অমঙ্গলের কথা নয়? যাহাদের কোন কাজ নাই, তাহারাই সাহিত্য লেখে এবং যাহাদের কোন কাজ নাই তাহারাই সাহিত্য পড়ে, এই যাহাদের ধারণা, তাহারা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে, কিন্তু জাতির জীবনীশক্তি কোথায়, এ বোধ যাহাদের আছে, তাহাদের জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন হইলে চলিবে না।

একটা জাতিকে বড় হইতে হইলেএই তিনটি জিনিষ চাই—স্বাধীনতা, সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য, প্রচুর ধনসম্পদ্।

যে জাতির বাহুবল ও ধনবল আছে, কিন্তু সাহিত্য নাই, সে জাতি শক্তিশালী কিন্তু বোবা।

অন্য ধনসম্পদ্ কালে ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে জাতির যে সম্পদ নিহিত, তাহার ক্ষয় নাই—তাহা কালজয়ী।

রচনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া তৎ-সম্বন্ধে পাঠকের মনে ধারণা সৃষ্টি সমালোচকের কাজ।

A critic will show 'what the book really is'—its content, its spirit, its art, and this done, he will leave it to justify and appraise itself.

লাওয়েল বিজ্ঞ-সন্দিগ্ধতা (wise passiveness') ভাল সমালোচকের সর্ব্বপ্রথম গুণ বলিয়াছেন। হাড্‌সন বলিয়াছেন—

A critic must be mentally alert and flexible, keen in insight, quick in response to all impressions, strong in grasp of essentials; he must, moreover, as Mathew Arnold will tell us, be able to see a thing as it really is, and not through a mist of his own idiosyncracies and prepossessions, which means that he must be entirely disinterested and free of all kinds—bias of individual Pastes, from bias of education, bias of creed, sect, party, class nation.'

কিন্তু এরূপ সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জ্জিত-নূতন নূতন সত্য ও অনুভূতি গ্রহণ করিতে সক্ষম (Reviewers are many, but critics few); সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন দক্ষ সমালোচক সাহিত্যে বিরল।

ভাল সমালোচকের হাতেও যে ভাল লেখকের সুবিচার নাই তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। সমৃদ্ধিশালী সমালোচক লেখকের যশ কিছু দিবের জন্য ম্লান করিতে পারেন, চিরদিনের জন্য নয়—'A work of real merit finds fovour at last' ব্রাউনিং-জায়া বলিয়াছেন—

"What the poet writes,
He writes; mankind accept if it suits.
And that's success: if not, the poem's passed
From hand to hand, and yet from hand to hand
Until the nuborn snatch it, crying out
In pity on their fathers' being so dull,
And that's success too."

পর্ব্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া তাহার উচ্চতা ঠিকভাবে মাপ করা যায় না। কোন লেখককে ঠিক ভাবে বুঝিতে হইল কালের ব্যবধান চাই। এমার্সন বলিয়াছেন—

"They who make up the final verdict upon every book are not the partial and noisy readers of the hour when it appears; but a court as of angels, a public not to be bribed, not to be entreated, and not to be over-awed, decides upon every man's little to fame."

পরবর্ত্তিগণ সেক্সপীয়ারকে যে গৌরবের উচ্চাসন দিয়াছেন সমসাময়িকগণ তাহা দেন নাই। এক কালে

পোপের কবিতার কত আদর ছিল। জনমনের স্তুতি ছাড়িয়া দিলাম, ভল্টেয়ারের মত সাহিত্য-সব্যসাচীও—তাঁহাকে তৎকালীন সমাজ শুধু ইউরোপের নয়, সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছিলেন। কিন্তু এখন? পোপ আদৌ কবি কি না, পাঠকের মনে সন্দেহ দেখা দিয়াছে।

সাহিত্যের ন্যায় সমালোচনাও জীবন হইতে উপাদান সংগ্রহ করে এবং সেই হিসাবে সমালোচনাও একটা সৃষ্টি।* অনেক সময় মূল গ্রন্থ যেমন উপভোগের জিনিষ, তাহার সমালোচনাও তেমনি।

সমালোচককে অনেক লেখক পছন্দ করেন না, কিন্তু সমালোচক ছাড়াও লেখক উঠিতে পারেন না। সমালোচনা না থাকিলে সাহিত্যে মুড়ি-মিছরীর এক-দর হইত। †

বঙ্গসাহিত্যে সমালোচনা-গ্রন্থের অত্যন্ত অভাব। ইংরেজি সাহিত্যে অনেক ভাল ভাল সমালোচনার বই আছে এবং প্রত্যেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সঠিক সংস্করণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে কৃতবিদ্য লেখকের অভাব নাই। উপযুক্ত ব্যক্তির সম্পাদকতায় এরূপ ধরণের পুস্তক বঙ্গভাষায় বাহির হয় ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

এ যুগ তুলনামূলক সমালোচনার যুগ। মানুষের মন প্রায় সমভাবে সব দেশে কাজ করিতেছে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকের ভাবধারার মধ্যে সাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। এই সাদৃশ্য-নির্দ্দেশ অতি মনোরম জিনিষ। 'All higher knowledge is gained by comparison, and rests on comparison,' একটি গাছ একাকী দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দেখিতে একরকম, সমস্ত Landscape-এর মধ্যে দেখিতে অন্যরকম। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী বা কীট্‌স ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়িতে একরূপ, সমস্ত রোমান্টিক সাহিত্যের সহিত এক করিয়া পড়িতে অন্যরূপ। Internationalism-এর হাওয়া এখন প্রত্যেক সাহিত্যে বহিতেছে। বঙ্গসাহিত্যের উপর প্রতীচ্য সাহিত্যের প্রভাব অনেকটা পড়িয়াছে; ভারতের অতীত সাহিত্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের সহিত ইহার অনেক Points of analogy আছে। তুলনামূলক সমালোচনা-সূত্রে এই সব points 'সূত্রে মণিগণা ইব' গ্রথিত হইলে অতি উপাদেয় জিনিষ হইবে, সন্দেহ নাই।

*True criticism draw its matter and inspiration from life, and in its own way it likewise is creative.
—Hudson

† 'Criticism, the muse's handmaid proved to dress her charms and make her more beloved.
—Pope.

Quarterly Reviur এ Endymion-এর বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা কীট্‌সের হৃদয় কিরূপ বিদ্ধ করিয়াছিল, ইংরেজি সাহিত্যের পাঠকগণের নিকট তাহা বিদিত। সমালোচনার তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ হইয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে কোন বন্ধুর নিকট চিঠিতে আপনার ঢাক আপনিই পিটিতে হইয়াছিল। সমালোচনার তীব্র শ্লেষে রবীন্দ্রনাথকেও একদিন কম ব্যথিত হইতে হয় নাই। * বাইরণ কিন্তু সমালোচককে এমন আঘাত দিয়াছিলেন যে, তিনি আর মাথা তুলিতে পারেন নাই।

'The Pythion of the age an arrow sped
And smiled! The spoilers tempt no second blow,
They fawn on the proud feet that spurn then lying low.

কিন্তু এরূপ self-assertion-এর দৃষ্টান্ত বিরল। অধিকাংশ লেখকই সমালোচনার প্রত্যুত্তর না দিয়া আপনার কাজ আপনি করিয়া যান—

'যে তোরে পাগল বলে
তারে তুই বলিস্ না কিছু।
আজকে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধূলো দেবে,
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আস্‌বে যে তোর পিছু পিছু।'

সমালোচককে উপেক্ষা করিয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—

"Again and again history has proved that the best interests of literature have been subserved by open defiance of the critic's 'this will never do'. If the critic's had had their way, there would have been no shakesperian drama and no Romantic movement."

বাংলাদেশে লাইব্রেরীর অভাব নাই, কিন্তু এরূপ লাইব্রেরী খুব কমই আছে, যেখানে প্রাচীনকাল হইতে আজপর্য্যন্ত যত বাংলা-সাহিত্যের বই বাহির হইয়াছে সব পাওয়া যায়। এরূপ লাইব্রেরী দেশে কয়েকটি চাই এবং একদল সুশিক্ষিত পাঠক চাই, যাঁহারা এই সব বই আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া বঙ্গভাষা-রূপ খনিতে কত মণি আছে তাহার সন্ধান দেশবাসীকে দিবেন (কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই জন্য গবেষণা-বৃত্তি স্থাপিত করিলে ভাল হয়)। উপযুক্ত সমালোচনার অভাবে হয়ত অনেক লেখকের প্রতিভার সঠিক পরিচয় দেশবাসী এখনও পায় নাই। তাঁহাদিগকে সেই পরিচয় দিতে

*রবি-রশ্মিতে 'নিন্দুকের প্রতি' কবিতার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

হইবে। অনেক লেখকের সম্বন্ধে হয়ত দেশবাসী একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। তাঁহাদিগকে সেই ভ্রান্তি দূর করিতে হইবে। বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে যেরূপ সমালোচনা হওয়া উচিত, তাহা কিছুই হয় নাই। তাঁহারা সেই আলোচনা করিবেন এবং নব নব গবেষণা করিয়া বঙ্গবাসীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিবেন। বাংলার শিক্ষিত-সমাজের সম্মুখে একটা অনাবিষ্কৃত স্বর্ণখনি পড়িয়া আছে। যিনি এখানে সাগ্রহে অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহার আয়াস ব্যর্থ হইবে না।

যে দেশের—

'শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট, সাগর-ঊর্ম্মি ঘিরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—ব্রহ্মপুত্র মেঘনা গঙ্গা।'

যে দেশের মাঠে মাঠে সবুজ ধান্য, উদ্যানে উদ্যানে কুসুমরাজি, কাননে কাননে বিহঙ্গধ্বনি, সে দেশে কেন কবি-ভাবুকের অভাব হইবে? মাঝে মাঝে জাতীয় সাহিত্যের উপর অবসাদ আসিলেও তাহা স্থায়ী হইবে না।

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি ইংরেজীতে প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করা যায় না? তাহাতে বিদেশে বঙ্গ-ভাষার সম্মান আরও বাড়িয়া যাইবে। Prof. Jules Block গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন—

'I wish more translations in English of your modern writers be done: Bankim and, Rabindranath are much, but their is more worthy to be known, as you excellently show I donot despair of seeing once one of my pupils translate with the helf of a Bengali friend some still unknown works directly in French.

বিদেশে এরূপ উৎসুক পাঠকের অভাব নাই। তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য এবং বঙ্গভাষার আন্তর্জ্জাতিক সম্মান বাড়াইবার জন্য এইরূপ অনুবাদের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ইংরেজীতে প্রকাশিত না হইলে, তিনি কি নোবেল-প্রাইজ পাইতেন অথবা বিদেশে তাঁহার খ্যাতি হইত? শরৎচন্দ্র নোবেল প্রাইজ পান নাই, তাহার অন্যতম কারণ, বিদেশে তাঁহার গ্রন্থাবলীর যেরূপ প্রচার হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই। দেশে দানশীল ব্যক্তির অভাব নাই। এই উদ্দেশ্যে কিছু মোটা টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে দিবার লোক জুটিবে না? দেশের সমস্ত বড় বড় লাইব্রেরী এবং ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি এই সব অনুবাদ-গ্রন্থের ক্রেতাসংখ্যায় পূর্ব্ব হইতে নাম লিখিয়া দেন, কাজটি আরও সুগম হইতে পারে। ইহাতে শুধু বাংলাভাষার নয়, বাঙ্গালী জাতিরও সম্মান বিদেশে বাড়িয়া যাইবে। বঙ্গবাণী আজ গৌরবের রত্ন-কিরীট মাথায় পরিয়া বিশ্ববিজয়ে বাহির হইয়াছেন। এই বিজয়াভিযানে প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই যথাসম্ভব সহায়তা করা উচিত।

[সমাপ্ত]

সোহাগিনী দস্তিদার

শ্রীযামিনীমোহন মতিলাল

চতুর্থ দৃশ্য

কলেজ।—মিঃ বাগ্‌চীর গৃহ।

(বিকাশ ও হীরেন মুখোমুখী বসিয়া আছেন)

হীরেন—বাড়ী দেখে এসেছি Sir,—মানে হ'ল ভাড়াটে বাড়ী, ছোট্টো দোতলা—অবস্থা দেখে মনে হয় মধ্যবিত্ত—চাল্ চলনও তেমন নয়—

বিকাশ—দেখেছো—গাড়ী চড়বার ক্ষমতা নেই—পায়ে হেঁটেই পার্কে যাওয়া চাই—কতদূর উন্নতি!—তারপর মেয়েটী দেখতে কেমন?

হীরেন—আমার চোখে তো খুব সুন্দরী বলে মনে হ'ল—a Real beauty Sir.

বিকাশ—তোমাদের নূতন চোখ তা দেখবে বৈ কি—কত বয়স হবে?

হীরেন—তা প্রায় ২০ হবে—

বিকাশ—হুঁ,—বিয়ে হয়েছে—

হীরেন—তা ঠিক বলতে পারি না—বোধ হয় বিয়ে হয়েছে—কি হয় তো কুমারী—

বিকাশ—ও কুমারীই হবে—না হ'লে—মাথায় সিঁদুর দেখলে—ও আজকাল বিবাহিতারাও আবার সিঁদুর পরেন না—That is no indication—যাক, তারপর—

হীরেন—তারপর আর কি—এইবার বলুন কি করবো?

বিকাশ—এইবার তাঁর বাড়ীর ধারে রোজ একবার অন্ততঃ ঘুরে আসা—তারপর আমায় জানাবে—তাঁর ব্যবহার—অর্থাৎ রকম সকম—তোমায় দেখেন কি না—মোট কথা—এই কোন রকম advance আর কি—বুঝেছো!—যদি তেমন কিছু দেখ আলাপ করবার চেষ্টা করবে—তারপর আমায় জানাবে।

হীরেন—বেশ কথা—যদি এমন কিছু জানতে পারি যে, তিনি আমায় চান—

বিকাশ—আরে তাই তো আমি চাই—তিনি তোমায় চান এই তো আমি চাই—আমার object তো তাই, সেইখানেই তো হোল Love এর চরম—climex;

হীরেন—আচ্ছা Sir, ধরুন যদি আমাকে যাবার জন্য লেখেন বা জানান—

বিকাশ—যাবে—তবে খুব সাবধানে—জানতো নিট্‌সে বলেছেন " do not forget they whip when thou Goest to woman"—আমাদের চাণক্য-নীতি, "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু—"একটু অঁাট ঘাট বেঁধে যেতে হবে—সে আমি বলে দোবো পরে।

হীরেন—তারপর ধরুন তিনি কুমারী—আমায় বিয়ে করতে চাইলেন।

বিকাশ—তা চাইতেও পারেন—কিন্তু আমার মতে চাইবেন না।—কেননা লুকিয়ে প্রেম করেন—বিবাহের বাঁধা-ধরার মধ্যে যেতে চাইবেন্ না—বিয়ে করলেই প্রেমের মজা কোথায়—Free Love তা হ'লে আর হ'লো কোথায় ?—বিয়ে করলেই সেই ছেলে মেয়ে, চ্যাঁ-ভ্যাঁ—ও সব Botheration সহ্য হবে কেন ?

হীরেন—তবেই তো !

বিকাশ—অর্থাৎ—তুমি কি তাঁকে বিয়ে করতে চাও না কি ? —না না সে হয় না—ওদের মত মেয়েকে বিয়ে করবার তোমার অবস্থা কোথায় ?—ও যে হাতী পোষা, পারবে কেন ? আজ ডাইজেনট পাড় সাড়ী, কাল জড়োয়ার আরম্‌লেট, পরশু Momio-six—এ তোমার অবস্থায় কুলোবে কেন ?

হীরেন—তবে কি শুধুই—

বিকাশ—হ্যাঁ শুধুই—এর নামই প্রেম, নি-খরচায় নিশ্চিন্ত মজা—বুঝলে—ও তুচ্ছ রূপ—হাল ফ্যাসানের পাউডার-মাখা রাঙ্গা মুখ দেখে মজলে চল্‌বে না—

হীরেন—কিন্তু Sir সত্যি সুন্দরী—এমন সুন্দরী আমি তো দেখেছি বলে মনে হয় না।

বিকাশ—মানলাম সুন্দরী—কিন্তু যদি তিনি ধর বিবাহিতা হ'ন—তবে ?

হীরেন—তা হলে তো আরও মুস্কিল।

বিকাশ—হ্যাঁ বোঝ—আমার বোধ হয় বিবাহিতাই হবেন—

হীরেন—কেমন করে জানলেন ?

বিকাশ—এ আর শক্ত কি—এত বড় মেয়ে রকম-সকমে বোধ হয়, বিবাহিতাই হবেন—আর যদিই বা কুমারী হন—তাতেই বা কি—বুঝে দেখ যে মেয়ে কুমারী অবস্থায় একজন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করতে পারেন তিনি বিয়ে করেও অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে প্রেম করবেন না—তার কি গ্যারাণ্টি আছে ? তোমাকে আধুনিক প্রেম শেখবার কথা বলেছি—শিখে নাও, তার বেশী আর কিছুই নয়—তা নায়িকা সুন্দরীই হোক আর অপ্সরীই হোক—কিছুই এসে যায় না। young man তোমার রকম দেখে মনে হচ্ছে Love at first sight—কিন্তু এর সবটাই বিলিতি—শকুন্তলা নয় হোলিউডের film star

হীরেন—কিন্তু—

বিকাশ—আবার কিন্তু—No কিন্তু—কিন্তুর স্থান নেই এখানে —No argument—আগে দেখ এই শেষ পর্য্যন্ত—তারপর আপনিই বুঝতে পারবে—সহরের আবহাওয়ার Modern মেয়েদের কতখানি পতন হয়েছে ; তারপর তখন নিজেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে।

হীরেন—মেয়েটী তো ভাল বলেই মনে হয়—খুব যে Modern তা তো বোধ হয় না।—তবে আপনি বলছেন—দেখি শেষ পর্য্যন্ত —তার পর—

বিকাশ—yes,—তারপর—That's Good. আজ তবে যা বললাম তাই করগে, যা further divelopment হবে আমায় জানিও—good luck

হীরেন—আচ্ছা—তাহলে চল্‌লাম—নমস্কার।

বিকাশ—নমস্কার (হীরেনের প্রস্থান) so far so good —তারপর—দেখা যাক।—লীলাকে শিক্ষা দেবার একটা Ideal scheme!—ছেলেটার রকম দেখে হাসি পায়—আহা বেচারা—

পঞ্চম দৃশ্য

মিঃ বাসুর বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তা। দু'একটি পথিক যাইতেছে, দু'একটি ফিরিওয়ালা যাইতেছে। হীরেনের প্রবেশ।

হীরেন—কদিন তো রোজই ঘুরছি। মধ্যে মধ্যে নায়িকা জানালায় দাঁড়ান—আমার দিকে উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকেন—বোধ হয় কি যেন বল্‌তে চান—পার্কে যাবার সময় ফিরে ফিরে দেখেন—মুচকে হাসেন—কিন্তু কৈ তেমন তো কিছু বোঝা যায় না। সাহসও হয় না—কি জানি যদি একটা হাঙ্গামা হয়। ঐ না আসছেন। আজ যা হয় একটা শেষ করে ফেলতে চাই—আলাপ করতেই হবে—এই ধরা পড়েও ধরা না দেওয়ার ভাব আর ভাল লাগে না।

(চাকলাদার প্রবেশ করিল—ভাল করিয়া হীরেনের দিকে তাকাইয়া বলিল)

চাকলা—হঃ ঠিক হইব।—মশায়—আপনারে তো দেখছি কয়দিন যাবত একবার এই দিকডায় আসা-যাওয়া করছেন। মতলবডা কি কয়েন তো ?

হীরেন—মানে ? What do you mean ?

চাকলা—মানে—আপনিও কি আমার মত বরুয়া করবার কিকির কর্‌ছেন না কি ম'শায়—

হীরেন—কি. কি করবার কথা বল্‌ছেন—বরুয়া।কি আবার—

চাকলা—বরুয়া বরুয়া, অর্থাৎ বরুয়া এই ইশে—বুঝছেন না, বরুয়া কি না—এই বঙ্গভাষায় যারে কয়—দল দল—

হীরেন—বরুয়া—দল—ওঃ বুঝেঁছি বুঝেঁছি বলুন—

চাকলা—আমি তো বরুয়া কইছি—আপনি শুনছেন বরুয়া। আমি একডা বরুয়া খুলছি—যত আর্টিস আমার এই বরুয়ার মেম্বর। এই ছিনামায় নামাইতে যারে যারে আবশ্যক হইব—আমারে কইতে হইব—আমি চাপলাই দিব—অবশ্য কিছু অর্থের বিনিময়ে। তা আপনারে তো দেখি বেশ সুন্দর—ফিল্মে মানাইবও চমৎকার—আপনি আমার বরুয়ার মেম্বর হয়েন না কোন—

হীরেন—আমি এখানে থাকি না—মফঃস্বলে আমার বাড়ী—সিনেমায় নাম্‌তে দিতে আমার গর্জ্জেনরা রাজী হবেন না—

চাকলা—হঃ! কি কন মশায়—আপনার গার্জ্জেন! আপনি নিজে এখনও কোন কনট্রাক্ট করবার পারেন না—নাবালক—হাঃ হাঃ হাঃ—কিন্তু সত্য কইত্যাছি আপনারে দেখি তো সাবালক বলে মনে হয়।

হীরেন—না না, সাবালক বৈ কি—তবে দাদা আছেন—তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

চাকলা—হাঁঃ হাঁা, জিগাবেন তখন পরে, এখন এইখানডায় একডা সই—ব্যাস—দাড়ান দাড়ান, ঐ মেইয়া লোগটা আমার একডা মস্ত বড় ক্লায়েন্ট।

(লীলার প্রবেশ)

চাকলা—(লীলার প্রতি) স্যার, এই গরীবকে যদি একবার কৃপা করেন—

লীলা—আবার আমায় বিরক্ত করছেন—

চাকলা—বিরক্ত—হঃ করেন কি—অমি বিরক্ত করবার পারি—আমি সে ধাতুর গড়া নই, এই দেখেন, সারটিফিকেট আমার সাথেই আছে—

লীলা—আছে, তাতে আমার কি—আপনার সার্টিফিকেট দিয়ে তো আমার মালা কিনবেন না।

চাকলা—হঃ কি কয়েন—ইসে আপনার মত লোগের যদি মাথা কেনবার পারতাম তা হলে তো বকুয়ার কোন আবশ্যক ছিল না—স্বয়ং একডা film কোম্পানী করবার পারতাম—একবার সইডা করলেই আর আপনার কাছে আসি তো আমারে কুকুর কইবেন।

লীলা—আঃ! ভাল জ্বালা যা হোক—

চাকলা—একডা সই—

লীলা—সই করবো না—আচ্ছা মুস্কিল তো—পথ ছাড়ুন—(হাত হইতে রুমাল ফেলিয়া দিলেন)

হীরেন—আঃ কি করছেন মশাই, দেখছেন উনি বিরক্ত হচ্ছেন পথ ছাড়ুন না (,রুমাল কুড়াইয়া লইলেন।)

চাকলা—হঃ পথ তো ছাড়বই, আমার প্রতি কৃপা কইরা যদি সইডা করেন।

লীলা—আঃ ভাল চান তো চলে যান, নইলে এখনি পুলিস ডাক্‌বো—

হীরেন—যান না মশাই, পথের মাঝে মহিলাকে এমন বিরক্ত করছেন- shame—ছি—ছি—শেষকালে সত্যিই পুলিস আসবে।

চাকলা—পুলিসরে আর আসতি হইব না—আমি যাইত্যাছি—কিন্তু আজ শুভদিনডা আছে—সইডা করলিই ভাল হইত।

লীলা—আবার সই—আমি—oh my god! মশাই—

চাকলা—হঃ! আস্তিন গুটান ক্যান—(হীরেন ধাক্কা দিল) ওঃ—যাইত্যাছি যাইত্যাছি—কল্য একবার সুবিধামত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবো—আপনার ঠিকানাডা—

হীরেন—এই যে একেবারে ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি—

[ঘুসি তুলিলেন]

চাক্‌লা—হঃ হঃ করেন কি, করেন কি,—আমি—আমি—

হীরেন—যান—যান—

চাক্‌লা—আপনার ঠিকানাডা। [প্রস্থান]

লীলা—উঃ বাবা—এমন সাংঘাতিক লোক—তাড়িয়ে দিলেও যায় না—আপনাকেও ধরেছে নাকি—

হীরেন—না ধরে নি; তবে কি সব Artist বুর্ঝোর কথা বলছিল—আপনি এসে পড়লেন।

লীলা—বাক বেঁচে গেছেন—ওর পাল্লায় একবার পড়লে -

হীরেন—(হাসিয়া) বুঝতেই পারছি—হ্যাঁ দেখুন, এই রুমালখানি বোধ হয় আপনার—

লীলা—আমার—এ রুমাল তো আমার নয়—দেখি দেখি—By job—দিন দিন—উঃ! আপনি আমার ভারী উপকার করলেন, thanks—আমি বুঝতেই পারি নি, আমার হাত থেকে slip করে এই রুমালখানা কখন পড়ে গেছে—ভাগ্যে আপনি, দেখতে পেয়েছিলেন, নইলে আজ আর রক্ষা ছিল না। রুমালটা সামান্য—এমন কত গণ্ডা হারিয়ে যায়—কিন্তু এটার পিছনে একটা বড় ইতিহাস আছে—আপনি আমার বড়ই উপকার করেছেন, আপনাকে শত ধন্যবাদ।

হীরেন—কি আর উপকার—এতে আর ধন্যবাদের কি আছে—এ—এ—এ—

লীলা—বিলক্ষণ, আপনি জানেন না যে আপনি আজ আমার কি উপকার করেছেন। আপনাকে দেখে চেনা চেনা বোধ হচ্ছে—কোথায় যেন দেখেছি—কোথায় বলুন তো ?

হীরেন—কোথায় আর—এই এইখানেই হবে, আচ্ছা আসি তা হ'লে, নমস্কার।

লীলা—সে কি এরই মধ্যে চলে যাবেন কি—আসুন না, এই তো আমাদের বাড়ী, একটু চা-টা খেয়ে—

হীরেন—আজ থাক—আর একদিন যাব এখন, আপনার সঙ্গে যখন আলাপ হল—

লীলা—কেন আজই চলুন না—লজ্জা করছে বুঝি—

হীরেন—না লজ্জা কিসের—

লীলা—এই একাকী একটা অর্দ্ধপরিচিতা নারীর সঙ্গে তার বাড়ী যেতে লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক।

হীরেন—সত্যি বলতে কি তা যে কতকটা নয় তা বলতে পারি না—তবে কেউ যদি কিছু বলেন—

লীলা—অর্থাৎ আমার স্বামী—সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি রাত্রি ১০টার আগে বাড়ী ফেরেন না—ঘরে একটা উড়ে বেয়ারা ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণীও নেই—আসুন, আসুন—

হীরেন—আজ থাক—আর একদিন একবার—

লীলা—মানে—একবার কারুকে জিজ্ঞাসা করে আস্‌বেন নাকি ?

হীরেন—না—না—

লীলা—তবে এত ভাবনার কি আছে। শুনুন, যাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে কাল তখন জিজ্ঞাসা করে আসবেন—আজ চলুন, একটু আলাপ করা যাবে, একা একা সন্ধ্যাটা মোটেই ভাল

লাগে না। আপনি আমার পরম উপকারী বন্ধু—প্রথম চাক্‌লাদার, দ্বিতীয়, এই রুমাল—আপনি আমায় রক্ষা করেছেন —আপনার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় না করে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া আমার অন্যায় হয় কিনা আপনিই বলুন না ?

হীরেন—মাপ করবেন—আজ থাক, আজ আমার একটা বিশেষ কাজ আছে আচ্ছা, কথা—দিচ্ছি কাল নিশ্চয় আপনার বাড়ী আস্‌বো—

লীলা—ও আমি বুঝেছি—কাজ-টাজ ও সব বাজে কথা—আমি জানি, আপনি কেবল দর বাড়াচ্ছেন। থাক তবে, আজ যখন একান্তই যাবেন না—কাল কখন আসবেন বলুন ?

হীরেন—যে সময় আপনার সুবিধা, এখন আমার ছুটি আছে।

লীলা—এই সময়ই ভাল—এই ৫টা থেকে ৫।০টার মধ্যে।

হীরেন—বেশ, আপনি দুঃখিত হবেন না, আমি নিশ্চয় আসবো। আজ তবে আসি।

লীলা—আচ্ছা আসুন তবে—হ্যাঁ দেখুন, যদিও আজকাল-কার এটিকেট নয়, তবু নির্লজ্জের মতই জিজ্ঞাসা করছি—আপনার নামটা যদি—

হীরেন—আজ্ঞে,—শ্রীহীরেন্দ্র কুমার ঘোষ।

লীলা—বেশ নাম আপনার—

হীরেন—যদি কিছু মনে না করেন—আপনার নামটা—

লীলা—বিলক্ষণ—কিন্তু হীরেন বাবু—আমার নামটা মোটেই ভাল নয়, এই নামের জন্য আমার রাগ হয় তাঁদের উপর, যাঁরা আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন—এমন নাম যে, ভদ্র-সমাজে উচ্চারণ করা যায় না।

হীরেন—তবে থাক্, নাই বা বললেন—থাক—থাক—

লীলা—বিলক্ষণ—থাক্‌বে কি হীরেন বাবু, নাম যতই খারাপ হোক—আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, আপনাকে নাম না বলা আমার অকৃতজ্ঞতা। আমার নাম—সোহাগিনী দস্তিদার—ছি ছি—এর চেয়ে যদি তাঁরা অর্থাৎ বাপ-মারা যদি সাহারা কি রাজপুতানা কি নিদেন পক্ষে রাশিয়াও রাখতেন তা হ'লে বরং ভদ্র সমাজে উচ্চারণ করতে পারা যেতো।

হীরেন—না না, সোহাগিনী দেবী, আপনি এত কিন্তু হচ্ছেন কেন, আপনার নাম তো বেশ ভাল নাম, আমার খুব পছন্দ—এমন চমৎকার আপনার নাম—

লীলা—ছাই—আপনি দেখছি নেহাত সেকেলে।

হীরেন—তা হোক—আপনার নাম কিন্তু অতি সুন্দর নাম। কাল তখন কথা হবে—আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, আজ তবে আসি—

লীলা—কাল আসবেন তো ঠিক ৫টায়—আমি অপেক্ষায় থাক্‌বো—নমস্কার—

হীরেন—নমস্কার। (প্রস্থান)

লীলা—হাঃ! হাঃ! হাঃ।

[প্রতিমার প্রবেশ]

প্রতিমা—চমৎকার! মাছ তো টোপ গিলেছে দেখছি—এই বার খেলিয়ে তোলা। এতও জানিস—এ সব শিখলি কোথায়—

লীলা—তোমার কাছে দিদি—তুমিই তো গুরু। বেশ হ'ল, না—এত সহজে যে কার্য্যোদ্ধার হবে ভাবিনি, নেহাত ছোট মাছ, খেলাবার দরকার হবে না দিদি—এক টানেই ডাঙায় উঠবে।

প্রতিমা—তাই বটে—

লীলা—আমার ভাই গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে।

প্রতিমা—এই রাস্তার মাঝেই—তুই খেপলি নাকি ?

লীলা—তবে ভাই বাড়ীর ভেতর ঢুকি চল—গান আমায় গাইতেই হবে, নইলে দম বন্ধ হয়ে যাবে—

[দরজায় প্রবেশ করিয়াই গীত]

ফাঁদে পাখী ধরা কি পড়ে,
শক্ত বাঁধন না হলে সই
জাল ছিঁড়ে সে যায় যে উড়ে।
হাওয়ায় পাতি প্রণয় [illegible]
ধরতে চাই যে হৃদয়-চাঁদে
প্রেমের বাঁধন সোহাগ যতন
আদর যদি না চায় রতন
চাই না ধরে রাখতে তারে—
ফিরে যাক সে আপন নীড়ে—
আঁখিতে যার মন না পড়ে।

লীলা—কেমন দিদি—

প্রতিমা—বেশ—কিন্তু সত্যি কি পাগল হবি নাকি ?

লীলা—না—না—পাগল হব কেন; পাগল করে ছাড়বো—চল। (উভয়ের প্রস্থান)

[ক্রমশঃ

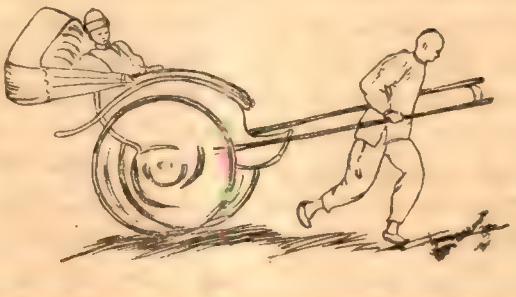

"বেগার মাই নেবার"

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতের তৃতীয় বড় বিভাগ হ'ল আধ্যাত্মিকতা বনাম বস্তু-তান্ত্রিকতা। ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী পুরুষদের নিয়ে ভারতের একটা গরিমা আছে। যারা তাদের অনুসন্ধানে ভারতে যায় এবং গিয়ে দেখতে পায় শুধু হৃষ্ট-পুষ্ট কেরাণী কিম্বা মগুপায়ী দেশীয় রাজা, আর দেখে বেশ কয়েকজন ধড়িবাজ কুটিল ব্যবসায়ী— যারা বেশ কিছু টাকা জমিয়েছে, তখন তারা স্বভাবতঃই একেবারে বিপরীত মত পোষণ করে বলবে, ভারতবাসীরা পুরোদস্তুর বস্তু-তান্ত্রিক। অনেক ভারতবাসী সত্যিই তাই। যে কোন সাধারণ ইংরেজ ভারতবর্ষে থাকা কালীন যদি, ওপর ওপর ভাবে পাঁচ থেকে ছ' হাজার ভারতবাসীর সঙ্গে পরিচিত হয় তা হ'লে সে ভাগ্যবান। সাধারণতঃ ভাগ্যে জোটে পাঁচ থেকে ছ'শো। এরা যদি সকলেই হয় বস্তু-তান্ত্রিক তা হ'লে একথা প্রমাণিত হয় না যে, ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি লোকই তাই— বরঞ্চ এ কথাই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে এদের ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিকতার মূলে আছে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। এবং একথাও ঠিক যে ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিক ভারতবাসীও, সাধারণ য়ুরোপীয়ের চাইতে সরল ভাবে জীবন-যাপন করে। হয়ত' সে আপনাকে কোন বড় হোটেলে কিম্বা কোন য়ুরোপীয় মহিলার পরিকল্পনায় সাজানো তার নিজের প্রাসাদে ভুরিভোজন করাবে, কিন্তু তা হ'লেও তার ব্যক্তিগত জীবন ভারতের অন্য অংশের বাসিন্দা সরল গ্রামবাসীদের চাইতে খুব স্বতন্ত্র নয়। নেওয়ারের খাট কিম্বা তক্তপোষ, ধুতি কিম্বা আচকান, মনোরম কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর এবং সস্তা চটি কিম্বা স্যাণ্ডেল, হুকো, খাওয়ার মধ্যে ভাত এবং পানীয়ের মধ্যে জল—এই হল সাধারণ ভাবে তার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।—কিন্তু তা সত্ত্বেও, সে দরিদ্র কিম্বা অসুখী—একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। যে কোন ভারতীয়ের বাড়ীর ছাদে বন্ধুবান্ধবদের সমন্বয়, পায়রার ঝাঁক শিষ দিয়ে ওড়াতে ওড়াতে গৃহস্বামীর আলাপ, কিম্বা কাঁচের গুড়ো দিয়ে ঘসা সুতো দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে প্রতিবেশীর ঘুঁড়ি কাটা—এসবই মনুষ্যসমাজের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণের অন্যতম। সত্যি, হয়ত' কোন ভাঙন-ধরা মহারাজা কিম্বা ভুঁইফোড় বড়লোক, কিম্বা হয়ত' কোন অতি-ধনীর মূর্খ পুত্র পাশ্চাত্য পুতুলের মোহে মুগ্ধ হ'য়ে টাকার শ্রাদ্ধ করে, কিম্বা চমৎকার মোটর-গাড়ী অথবা প্রকাণ্ড রেডিওগ্রাম দেখিয়ে চমক্ লাগায়—নিজের কিম্বা আপনার—কিন্তু আমার নিজের কেবলই মনে হয়েছে যে, সে নিজে এই সবের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট নয়—এই ধরণের লোকের চাইতে পাশ্চাত্ত্যের লোকের বস্তু-মোহ অনেক বেশী। একজন দেশীয় রাজার একটি ঘরে ৮৬টি রেডিও সেট ছিল, আর ছিল, সেই সব সেটগুলো একসঙ্গে চালাবার বদ-অভ্যাস। একবার তাকে লণ্ডন-অনুষ্ঠান অনুরোধ জানাতে তিনি তাঁর নিরীহ মেকানিককে আদেশ দেন, এবং সে না পারায় তার চাকরী যায়। অন্য একজন তার দু'শোটি কুকুরের জন্য একটি ছোট্ট রেল-গাড়ী নির্ম্মাণ করেন। কয়েকটি খারাপ কুকুর দেখিয়ে তিনি বলেন, এইগুলো কংগ্রেস-কার্য্যকরী সমিতির সভ্য তাই ট্রেনের তৃতীয় কামরায় এদের স্থান। এবং আমার আলাপী একটি সুপ্রিয় ভারতীয় যুবকের একটি গাড়ী ছিল. সেটে পেছন দিকে একশো মাইল বেগে ছুটতে পারত'। "পেছন দিকে কেন?" প্রশ্ন করায় সে বলে, "লোকের চমক লাগে!"

মিঃ স্মিথের দ্বারা শাসিত ভারতবর্ষে এ-ধরণের ধনিত্ব খুব আশ্চর্য্যজনক কিছু নয়। আমার স্থির বিশ্বাস, ঐ অদ্ভুত গাড়ীটি যদি ভেঙে যায়, চুরি যায়, কিম্বা যায় হারিয়ে, আমার বন্ধু বিশেষ বিচলিত হবে না। পাশ্চাত্ত্যে বিজ্ঞাপনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করার ও অধিকার করার যে অদ্ভুত মনোবৃত্তি মাথা তুলেছে এবং যার ফলে আরম্ভ হয়েছে হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষ্যা এবং যুদ্ধ—এই হীন মনোবৃত্তি—আমি লক্ষ্য করেছি কোন ভারতবাসীকে স্পর্শও করতে পারে নি। ভারতের অন্যতম আশ্চর্য্য—বর্ত্তমান যুগে আশ্চর্য্য বৈ কি—যে কোন ভারতবাসী, য়ুরোপ-প্রদত্ত যে কোন জিনিষ সহজেই জীবন থেকে বর্জ্জন করতে পারে এবং ক'রে সে একবিন্দুও দুঃখিত হবে না। তাদের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিরস্থায়ী হ'ক।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় অধিকার করার মনোবৃত্তি কি একটা সংক্রামক ব্যাধি নয়? বিজ্ঞাপনের বিস্তারে, স্বার্থের সঙ্ঘাতে এবং "রপ্তানীর সৃষ্টি ক'রে আমদানীর বৃদ্ধি করা" ইত্যাদি ধূমায় ধূমায়িত প্রতিবাসীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারানোর যে মনোবৃত্তি— সেই মনোবৃত্তিই কি আমাদের আজকের দুর্দশার মূল কথা নয়? অথচ এই য়ুরোপীয় মনোবৃত্তি ধনীদের একচেটিয়া নয়—মিসেস জেমস্ এর চেয়ে ভালো খাট চাই, কিম্বা সোফা—গরীবের এই চিৎকার থেকে এর উৎপত্তি, খুবই স্বাভাবিক: অধিকারী মনোবৃত্তির তীব্রতার অন্তরালে গরীবের ছুটে চলার প্রবৃত্তি অসম্ভব নয়। যে সভ্যতায় মানুষের প্রচেষ্টার চরম পুরস্কার বেণ্টলি কার, রেডিও কিম্বা ফার কোট—সেই ভাঙন-ধরা সভ্যতা যে প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে লুটের মাল ভাগ করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তা ছাড়া, যুদ্ধ ব্যতীত অনেকভাবে এ সভ্যতা নিজেকে

ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায় এবং বিশেষজ্ঞরা হিসেব ক'রে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং আজ পর্য্যন্ত তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি যে, প্রায় ৯০ বছরের মধ্যে বৃটেনের লোক সংখ্যা চারশো লক্ষ থেকে চারে নেমে আসবে এবং রাশিয়া ছাড়া অন্য প্রায় সব য়ুরোপীয় দেশেই এই একই অবস্থা হবে। যে সমাজে অধিকার করার মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পায় এবং সম্পত্তি দেখিয়ে চমক লাগাবার লোভ, সে সমাজে ছেলে-মেয়ে মানুষ করার ব্যয় বিলাসিতা মাত্র! সেই জন্য আজ চোদ্দ বছরের কম বয়স্ক শিশুর সংখ্যা গত যুদ্ধের চাইতে কুড়ি লক্ষ কম, কুকুরের সংখ্যা কুড়ি লক্ষ বেশী। আসবাবের মতন কুকুর নিয়ে বড়াই করা চলে, কিন্তু শিশুরা সময়ের অপব্যবহার করে আর করে ব্যয়বৃদ্ধি। কাজেই আমরা সম্পত্তি বাড়াই জীবনের বিনিময়ে এবং শিশুর বিনিময়ে ঘর সাজাই—তারপর বলি যে; ভারতের শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে আমাদের অধিকার—ধনা লেডি অ্যাষ্টারের ভাষায় "আমি চাই, আমেরিকা ও বৃটিশ প্রবর্ত্তিত নতুন সমাজে চীন ও রাশিয়া নিজেদের গড়ে তুলুক—এবং বৃটিশ ভাবধারার চিন্তা করুক। "News Chronicle, October, 1942.

১৯৩৭ সালে আমি মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী রাজাজীর সঙ্গে দেখা করি, ঐ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত দুটো বেতার-কেন্দ্রের জন্য, সহযোগীতা না হ'লেও আশীর্ব্বাদ প্রত্যাশা ক'রে। কথাপ্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাল-মন্দ বিচারের তর্ক ওঠে, রাজাজীর স্পষ্ট মত, বেতারের প্রয়োজন নেই (বলা বাহুল্য, তিনি দুটো বেতার-কেন্দ্রেরই উদ্বোধন করেন)। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মতামত আমাকে এত আকৃষ্ট করে যে, হোটেলে ফিরে গিয়ে আমি আমাদের আলাপ-আলোচনা যতদূর স্মরণ ছিল লিপিবদ্ধ করে রাখি। রাজাজী বলতে আরম্ভ করেন যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-প্রসূত কোন জিনিষেরই প্রয়োজন ভারতবর্ষের নেই। বেতার ভারতীয় জীবনে সম্পূর্ণ বৈদেশিক, কারণ এতে আন্তরিকতার একান্ত অভাব। বিরক্ত হ'য়ে আমি বললাম, 'টেবিলে আপনার টেলিফোন, কাজে এসেছেন কারে! তা ছাড়া, ভারতে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, রেডিওতে শ্রোতার অনেক সুবিধে এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রভাব ও আন্তরিকতার অভাব হয় না।"

"আমার সন্দেহ আছে!" রাজাজী বললেন, "আমি যন্ত্রকে অবিশ্বাস করি! তাছাড়া, খরচ এবং তোমাদের এই ত্বরা! তাড়াতাড়ি কিসের জন্য সমস্ত বেতার-কেন্দ্র তৈরী কর', সকলকে দিয়ে রেডিও কেনাতে চাও?"

কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগল না, কারণ ভারতবাসীদের দায়িত্বপূর্ণ করছি—এ ছাড়া অন্য কোন উত্তর আমার ছিল না। বললাম, "পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তো আটকানো যাবে না, রেডিও আসবেই, যেমন এসেছে ট্রেণ, টেলিফোন।"

টেবিল চাপড়ে, বিরক্ত হ'য়ে রাজাজী বললেন, "তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা!"

কি এসে যায় তাতে আমাদের? দেখছ' না, তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতা একে অন্যকে ধ্বংস করছে! আরও! আরও! আরও! —এই আরো—চাওয়ায় তোমাদের আদর্শে আমাদের ঘৃণা—এই মনোবৃত্তিই তোমাদের ধ্বংস করবে!"

আমাদের আলাপ-আলোচনা শুধু কাগজেই নয়, আমার মনেও লিপিবদ্ধ আছে। সব জিনিষেরই আরো, আরো, আরো—এই কথাই চিরদিন বলছে পৃথিবীর সাম্যবাদীরা ক্যাপিটালিষ্টের দল। পার্থিব সব কিছুই আরো চাই—আরো জাহাজ, আরো এরোপ্লেন আরো কামান—আরো মোটর, আরো বাড়ী আরও রেডিও, আরও সব কিছু—আরো আরো—আরও যুদ্ধ—তাছাড়া আর কি? যে মানুষ চায় তার প্রতিবেশীর চাইতে বেশী, তার প্রতিবেশীর চাইতে আরো ভাল পরতে, ভাল থাকতে, ভাল খেতে, ভাল গাড়ী চড়তে (বিজ্ঞান তো এই অধিকতর ভালর ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে!)—সে এই সবের জন্য এবং নিজের স্বার্থের জন্য প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করবে এবং এই বাতুল প্রতিযোগিতায় সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। আমি স্থূল সাম্যবাদ প্রচার করছি না—সাম্য প্রকৃতির রীতি নয় এবং নিয়ন্ত্রিত সাম্য মানুষের বিকৃত ধারণাই শুধু নয়, এর সঙ্গে বিশিষ্ট ধর্মযাজকদের বাণীরও কোন যোগ নেই। অন্ন খেয়েই মানুষ বাঁচেনা, কিন্তু আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতা কি এই কথাই উচু গলায় প্রচার করে না যে "অন্ন খেয়েই মানুষ বাঁচে!"

ভারতীয় সভ্যতা সে কথা বলে না। পার্থিব অধিকারের চাইতে ভারতীয়ের কাছে বড়—অন্ততঃ আমার কেবলই মনে হয়—তার ধর্ম, তার বিশ্বাস,তার আদর্শ! সেই জন্যই তারা আজও—এবং যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা আমাদের বিজ্ঞাপন, আমাদের লভ্যাংশ আমাদের রপ্তানী—ইত্যাদি দিয়ে তাদের সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত তারা অধ্যাত্মিকতায় আমাদের চাইতে অনেক উঁচুতে! এবং সেইজন্য 'অধিকার-মনোবৃত্তি'-সম্পন্ন য়ুরোপীয় সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত কেন্দ্র ভারতবর্ষ আজ কেবল বড় সমস্যাই নয়, য়ুরোপীয় সভ্যতার বড় সঙ্কট।

[ক্রমশঃ

গৈরিশি ছন্দের স্রষ্টা

নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রথম নাটক 'আনন্দ রহো'। ১৮৮১ সালের ২৮শে মে তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারে ইহা প্রথমে অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় তারিখেই গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন, ইহা দর্শক কর্ত্তৃক সমাদৃত হইবে না। সুতরাং বাড়ী আসিয়াই অমৃত মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, শিবু, "পৌরাণিক নাটক" ছাড়া হবে না—লিখো— "ধর বৎস,

ধর উপদেশ, রাখ বাক্য জননীর।"

অমৃত বাবু তখন গিরিশের শ্রুতিলিপি-লেখকের কাজ করিতেন।

এই 'রাবণ-বধ' অভিনীত হয় ৩০শে জুলাই ১৮৮১। এই নাটকেই গিরিশ প্রথমে নাটকের প্রকৃত ছন্দ অর্থাৎ সহজ সরল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। ইতিপূর্ব্বে মধুসূদন পদ্মাবতীতে কলির মুখে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা বসাইয়া দেন। দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনী এবং লীলাবতীতে নূতন ছন্দের প্রচেষ্টার প্রমাণ আছে। কিন্তু এই সব গিরিশের মনঃপূত হয় নাই। তিনি প্রকৃত হৃদয়গ্রাহী ও মনোরম ছন্দের বিষয়ই বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সার" প্রচ্ছদপটের কয়েকটি ছত্র তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয়। লাইন কয়টি এই—

হে সজ্জন!
স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে
রহস্য-রসের রঙ্গে
চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে,
কৃপাচক্ষে হের একবার,
শেষে বিবেচনা মতে
তিরস্কার কিম্বা পুরস্কার—যাহা হয়
দিও তাহা মোরে,
বহুমানে লব শির পাতি।"

এই কয়টি ছত্রই হয় গিরিশের পথপ্রদর্শক। অতঃপর তিনি যে ছন্দ নাটকে ব্যবহার করেন, তাহাই "গৈরিশি ছন্দ" নামে পরিচিত। আর ক্ষীরোদপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া অপরেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র এবং আধুনিক নাট্যকারগণ কেহই এই গৈরিশি ছন্দের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই।

রাবণবধের ভাষাও প্রণিধানযোগ্য, যেমন—

"যদি যায় প্রাণ মাতঃ, কর গো কল্যাণ,
সেই দর্পে, সেই শরাসন করে
সেই রণক্ষেত্রে—আনন্দ যথায় মম—
হইব ধরণীশায়ী অনন্ত শয্যায়॥"

এই নব-প্রবর্ত্তিত ছন্দে মুগ্ধ হইয়াই স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনা ঠাকুর "ভারতীতে" লেখেন—

"গিরিশবাবুর অমিত্রাক্ষর ছন্দই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ, আমরা ইহার পক্ষপাতী—অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত না হইয়াও ইহা হৃদয়ের ছন্দ, তিনি আমাদিগকে প্রকৃতই সাহায্য করিলেন।" ভারতী, মাঘ ১২৮৮।

সাহিত্যরথী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার লেখেন—

"গিরিশের কৃপায় এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।" গিরিশ নিজেও কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়কে গৈরিশিছন্দে যে উপহাসের কথা আছে, তার কৈফিয়তে বলেন—

"...আর এক লাভ—ভাষা নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজে উঠ্‌বে। সে সুবিধা চৌদ্দয় কিছু কম। কাব্যে তাহার বিশেষ প্রয়োজন নাই, কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময়ে তার প্রয়োজন।"

সহজ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক হিসাবে গত সত্তর বৎসর যাবৎ শক্রমিত্রের নিকটে তিনি অবিমিশ্র প্রশংসা ও সাধুবাদ লাভ করিলেও, সম্প্রতি অকস্মাৎ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি তর্ক উত্থাপন করিয়া বলেন—

"ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তকরূপে যে সম্মান রাজকৃষ্ণরায়ের ন্যায্য প্রাপ্য, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত হইয়া আসিতেছেন। গিরিশচন্দ্রের জীবনীকারগণ প্রচার করিয়াছেন, 'রাবণবধ নাটকে' গিরিশচন্দ্রই ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন।" কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকের সহিত পরিচয় থাকিলে বা ইহার প্রকাশ কাল সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকিলে, তাঁহারা কখনই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত খুবই ভ্রমাত্মক এবং সমস্ত ঘটনা না বুঝিয়া, জীবনীলেখকগণের প্রতি অযথা অজ্ঞতা আরোপ করিয়া তিনি আর একটী অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতাদোষে অপরাধী হইয়াছেন। সমস্ত অবস্থা পাঠকের নিকট বুঝাইয়া বলিতেছি—

'আনন্দরহোর' পরেই ন্যাশনাল থিয়েটার দুই তিন মাসে রিহার্সেল দিয়া রাবণবধ নাটকের অভিনয় করেন ১৮৮১ সালের ৩০শে জুলাই, সুতরাং নূতন অমিত্রাক্ষরের কবিতা অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের মুখে মুখেই এই নয়মাস প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। রাজকৃষ্ণের হরধনুর্ভঙ্গের প্রকাশকাল ২৮শে জুলাই অর্থাৎ রাবণবধ অভিনয়ের দুই দিন পূর্ব্বে। সুতরাং এ-কথা ঠিক, গিরিশচন্দ্র দুইদিন মধ্যেই রাজকৃষ্ণবাবুর ছন্দটি শিখিয়া, নাটক লিখিয়া, রিহার্সেল দিয়া, নিশ্চয়ই তাঁহার 'রাবণবধ' মঞ্চস্থ করেন নাই, এবং এরূপ অনুমান বা যুক্তি প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। অন্যপক্ষে বরং সম্ভাবনা খুবই বেশী।

রাজকৃষ্ণবাবু নিজেই ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "৫।৬ দিন

মধ্যেই তিনি নাটকখানি শেষ করেন।” এই সময় তাঁহার একটী প্রেসও ছিল, উহার নাম বীণাযন্ত্র। সুতরাং ১০২ পৃষ্ঠার পদ্যের একখানি বহি নিজে ৫।৬ দিনে লিখিতে ও নিজের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে সর্ব্বসমেত উর্দ্ধসংখ্যা ১৫ দিন লাগিতে পারে। আড়াই মাস পূর্ব্ব হইতে রাবণবধ অভিনয়ের কথা ও কবিতার আবৃত্তি সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছে, সেই সন্ধানটুকু অবলম্বন করিয়া কোন কবি ও নাট্যকুশল ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিমত যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করিতে পারেন, তাহা অসম্ভব নয়। সুতরাং রাবণবধ অভিনয়রাত্রির দুইদিন পূর্ব্বে হরধনুর্ভঙ্গের প্রকাশকাল হইলেও রাবণবধই মৌলিক, দ্বিতীয়খানি মৌলিক না-ও হইতে পারে—এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক। আর আড়াই মাস পূর্ব্ব হইতে সকল স্থানের অভ্যাস হওয়ায় রাবণবধেই নূতন স্বচ্ছন্দগতি সাবলীল অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তনের সম্মান যে গিরিশচন্দ্রেরই, সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যেক বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিই না করিয়া পারিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রজেন্দ্র বাবু কতকগুলি অনুমানের উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত নির্ভর করিয়া আরও বিচারহীনতা ও অনুসন্ধান-শক্তি শূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে বলেন, “হরধনুর্ভঙ্গের প্রকাশকালের পূর্ব্বে উহা বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হইয়াছিল” ইহা নিতান্তই অলীক ও কাল্পনিক কথা। তিনি কোন তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া ‘প্রথার’ দোহাই দিয়াছেন। তিনি বলেন, “নাটক প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই রঙ্গালয়ে উহার অভিনয় হইয়া থাকে—ইহাই প্রথা।” ইহা প্রথা নয়—কোন কোন নাট্যকারের বেলা তাহা হয় বটে, কিন্তু বাহিরের অধিকাংশ নাট্যকারের বেলাই তাহা হয় না। সুতরাং ইহা প্রথা নয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি—সুপ্রসিদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের বহু নাটক—রাণাপ্রতাপ, ভীষ্ম, পাষাণী, সীতা প্রভৃতি রচিত হইবার বহু পরে অভিনীত হইয়াছে। ভীষ্ম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীতই হয় নাই; ক্ষীরোদপ্রসাদেরও এইরূপ অনেক নাটক পরে অভিনীত হইয়াছে। কোনখানি বা অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই যুগেও রবীন্দ্রনাটক প্রকাশলাভ করিলেও কয়খানি মঞ্চস্থ হইয়াছে? তারপর সে সময়ে বঙ্গরঙ্গভূমিতে হরধনুর্ভঙ্গ নাটকাভিনয়ের কোন প্রমাণই নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু কোন থিয়েটারের সহিত তখন সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তাহার “বীণা-থিয়েটার” প্রতিষ্ঠিত হয় ছয় বৎসর পরে। তাঁহার সুঅভিনীত প্রহ্লাদচন্দ্রও ৩।৪ বৎসর পরে বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত হয়। ইহার পরেই রাজকৃষ্ণ বাবু নাটক-রচয়িতা বলিয়া পরিচিত হন। আর এই সময়ে উক্ত রঙ্গভূমিতে অশ্রুমতী, পাষাণ-প্রতিম প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও

হইতেছিল। বঙ্গীয় নাট্যশালায় রাবণবধেই সেই সময়ে পৌরাণিক যুগ আরম্ভ। ‘রাবণবধ’ সম্বন্ধেও সকলের আশঙ্কা ছিল, তবে গিরিশচন্দ্রের গুণে উহা উৎরাইয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

“রাবণবধ যেদিন প্রথমে অভিনীত হয়, আমাদের বড়ই ভাবনা হইয়াছিল যে, পৌরাণিক নাটক মঞ্চে চলিবে কি না, কিন্তু…যখন রামচন্দ্রবেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগম্ভীর কণ্ঠ হইতে শেষ দুই ছত্র—

“তারার চরণে ভক্তি-অস্ত্র বিনে
কি পারে বিন্ধিতে আর!”

উচ্চারিত হইল, তখন দর্শকমণ্ডলী ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে যেরূপ সমবেত উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখন আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, ভক্তিপ্রধান বাঙ্গালী তাহার জন্মগত সংস্কার ভুলে নাই—ধর্ম্মপ্রাণ জাতির মর্ম্মস্থান এ নাটক ঠিক স্পর্শ করিয়াছে।”

সুতরাং সেই ঐতিহাসিক নাটকের যুগে হরধনুর্ভঙ্গ অভিনয়ের কাল্পনিক কথা প্রচার করিয়া ব্রজেন্দ্র বাবু সাধারণকে ভ্রান্তপথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন; একই বৎসরের প্রকাশিত দুইখানি নাটকের রাবণবধের অভিনয় তারিখ ১২৮৮, ৬ই শ্রাবণ, স্পষ্ট উল্লিখিত আছে, আর হরধনুর্ভঙ্গ নাটকে অভিনয়ের কোন তারিখের উল্লেখ নাই; পূর্ব্বে অভিনীত হয় নাই বলিয়া তারিখেরও উল্লেখ নাই, অভিনীত হইলে থাকিত। বিশেষতঃ নাটকের ভূমিকায় উল্লিখিত আছে যে, বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষ শরৎ বাবু অনুরুদ্ধ হইয়াও রাজকৃষ্ণ বাবুকে ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিতে নিষেধই করিয়াছিলেন। শরৎবাবুর উৎসাহে রচিত হইলে শরৎবাবুর উল্লেখ থাকিত আর শরৎ বাবু সেই যুগে নূতন নাট্যকারের ভাঙ্গা অক্ষরে পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করিতে কিছুতেই রাজী হইতে পারেন না।

সর্ব্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে, গিরিশচন্দ্রের ও রাজকৃষ্ণ বাবুর ছন্দে অনেক পার্থক্য। রাজকৃষ্ণ লেখেন—

“মহাদেব দেব ত্রিলোচন, সমাধি করিয়া শেষ
লয়ে দেবগণে, যাইতেছিলেন সুখে বিলাসের স্থলে
হেনকালে সে অনঙ্গ তার চিত্তমাঝে
উৎপন্ন করিলা ভ্রমে দারুণ বিকার।”

পূর্ব্বে বঙ্গরঙ্গভূমির অভিনেতাগণ মেঘনাদবধ যেমন গদ্যের মত করিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া আবৃত্তি করিতেন, উদ্ধৃত কবিতাও সেইরূপ। সাবলীল এবং নীচ হইতে বিনা চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজে উঠিতে পারে, এরূপ ভাবা একমাত্র গিরিশচন্দ্রের ছন্দেই আছে।

উপসংহারে বলিতে চাই, সহজ কবি ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাবান্ নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, প্রকৃত ঘটনা ও ইতিহাস

ভারতের স্বাধীনতা সনদ

এই গণ-পরিষদ এই সুদৃঢ় মহান্ সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে যে, এতদ্দ্বারা ইহা ভারতকে এক স্বাধীন র্বভৌম রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থার জন্য একটি 'আইন-অনুশাসন' onstitution) প্রণয়ন করিবে ;

বর্ত্তমানে যে-ভূম্যংশ বৃটিশ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত, যে-ভূম্যংশ দেশীয় রাজ্যসমূহের অন্তর্গত এবং যে সকল ংশ বৃটিশ-ভারত অথবা দেশীয় রাজ্যের বহির্ভূত, সেই সমুদয় এবং অন্যান্য সকল ইচ্ছুক ভারতীয় ংশকে মিলিত করিয়া এই পরিষদ উক্ত অনুশাসনদ্বারা স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ভারতকে একটি ইউনিয়ন গঠিত করিবে ;

বর্ত্তমান সীমানা সহ অথবা অবস্থাবিশেষে এই গণপরিষদ দ্বারা স্থিরীকৃত যথানুরূপ ব্যবস্থানুযায়ী অন্যতর না সহ উক্ত ভূম্যংশসমূহ অত্র অনুশাসনের বলে এক একটি স্বতন্ত্র ও শায়ত্তশাসিত ইউনিট রূপে বিগণিত হইবে ; এবং ইউনিয়নের উপরে ন্যস্ত অথবা প্রদত্ত ক্ষমতা ও কার্য্যধারার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ ত অন্যান্য সকল প্রকার শাসনসম্বন্ধীয় ক্ষমতার প্রয়োগে অথবা কার্য্যধারার সম্পাদনে সমুদয় অধিকার গ করিতে পারিবে ;

এই অনুশাসনে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ভারতের এবং তত্রস্থ সকল ভূম্যংশের শাসন সম্পর্কীয় সমুদয় হ কেবলমাত্র জনসাধারণের অনুমোদনক্রমেই গ্রাহ্য হইবে ;

এই অনুশাসনে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ত হইবে ; সকল সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক মর্য্যাদায়, জীবিকার্জ্জনের সুযোগদানে এবং আইনের রে অভিন্ন সমতা রক্ষা করা হইবে ; এবং ন্যায় ও নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী ভারতের সকল সম্প্রদায় অনুশাসনদ্বারা চিন্তা, আত্ম-অভিব্যক্তি, ধর্ম্মবিশ্বাস, উপাসনা, ইচ্ছানুরূপ জীবিকাগ্রহণ এবং ইচ্ছানুরূপ মলন ও সামাজিক সক্রিয়তায় সম-স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিবে ;

এই অনুশাসনে সমুদয় মাইনরিটি সম্প্রদায়, অনুন্নত ট্রাইবেল শ্রেণী ও তপশীলী অধিবাসীদের বিশেষ ক্ষণের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা থাকিবে ;

এতদ্দ্বারা অন্যান্য সভ্যদেশের প্রচলিত ন্যায়-নীতি ও আইনাদির অনুসরণে এই রিপাব্লিকের সমুদয় নর অভিন্নতা সুদৃঢ় করা হইবে এবং স্থল, সমুদ্র ও বিমানক্ষেত্রের উপর অক্ষুণ্ণ অধিকার রক্ষিত হইবে ; এতদ্দ্বারা—

এই প্রাচীন ভূমি বর্ত্তমান জগতে তাহার ন্যায়সঙ্গত-রূপে প্রাপ্য ও সম্মানিত আসন গ্রহণ করিবে, এবং ান্তি ও সর্ব্বমানবের কল্যাণকল্পে তাহার পরিপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবে।

[২২শে জানুয়ারী (১৯৪৭) গণ-পরিষদে যে-প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, তাহার অনূদিত অনুলিপি]

কবি-ব্রত

"দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ।"

ইহা কেবল কবি-উক্তি নহে। বাঙলা বর্ষপঞ্জীর এই স্মরণীয় দিনটি সত্য সত্যই সভ্যজগতের সকল বিদগ্ধজনকে আহ্বান করিয়া বলে—"আজ হইতে ৮৭ বৎসর পূর্ব্বে আমার এই পুণ্য-তিথিতে এক জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল,—সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করো তোমরা।"

বাঙালীকে ডাক দিয়া এই তিথি আহ্বান জানায়—"তোমার ভাষার প্রাদেশিকতাকে বিশ্বরূপে অলঙ্কৃত করিয়াছেন যে-মহা রূপকার, সেই রবীন্দ্রনাথ আমারই এই তিথিতে তোমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তোমার ঐতিহ্য, তোমার সংস্কৃতি, তোমার চিন্তার আদর্শকে তিনিই উদ্দীপিত করিয়াছেন। তোমার উজ্জীবিত ঐতিহ্য তাই আজ পৃথিবীর সংস্কৃতি-সমাজে বরেণ্য। স্মরণ কর তাঁহাকে, উদ্‌যাপিত কর আমাকে।"

ভারতবাসীকে ডাকিয়া এই তিথি বলে—"ভারতের সত্যকার পরিচয় তাহার চিন্ময় প্রকাশে, তাহার অবিভক্ত ভাব-মানসে, তাহার আইডিয়া-রূপ সত্তায়। ইতিহাসের স্থূল হস্তাবলেপে ভারতের ভৌগোলিক দেহ বহুবার ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, বহুবার রাজনৈতিক স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার যূপকাষ্ঠে ভারতের মৃন্ময় অভিন্নতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু ভারতের অক্ষত ভাব-মানসকে কেহ কোনদিন আঘাত করিতে পারে নাই। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতের এই বিস্মৃত সত্তার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যিনি, তিনি রবীন্দ্রনাথ। তিনি আমারই এই পুণ্য তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই বরণ করো ভারতের এই সত্তাকে, স্মরণ করো সেই উজ্জীবককে, পালন করো আমাকে।"

পৃথিবীর মানুষকে এই তিথি আহ্বান জানাইয়া বলে—"আঘাতের পর আঘাত পাইয়া নিজের ভবিতব্য সম্বন্ধে তুমি নিরাশ হইয়াছ। অকল্যাণ ও পশুধর্ম্মের অন্তহীন উন্মত্ততা তোমার সাধের সভ্যতাকে বিকৃত করিয়াছে। শোচনীয় সংশয়ে আজ তোমার সকল শুভেচ্ছা পঙ্গু। কিন্তু হতাশ হইও না, তোমার বিশ্বাসকে অক্ষত রাখো। শোন, আমার এই তিথিতে জাত সত্যদ্রষ্টা ঋষি কি বলিয়াছেন—'আজ পারের দিকে যাত্রা ক'রেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করবো। আশা ক'রব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলের সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত [illegible] অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার [illegible] অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার ম[illegible] পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহী[illegible] চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ ব[illegible] করি।'—হে পৃথিবীর মানুষ, জীবনদ্রষ্টার এই [illegible] জীবন-বাদে আস্থা রাখো। 'বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব' —বিশ্বপাপের যে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়াছে, সংশয়-জিৎ আত্ম-বিশ্বাসে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো। স্মরণ করো, এই বিশ্বাসের বজ্রবাণী শুনাইয়াছেন যিনি, সেই মহামানবকে, আর উদ্‌যাপিত করো আমাকে—তাহার জন্মতিথিকে।"

আসামী চিত্র

গত কয়েক মাস হইতে আসামের সিলেট জিলা এ[illegible] বাঙ্গলা ও আসামের সীমান্ত হইতে লীগের ভক্ত [illegible] অনুচরদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ এখা[illegible] আসিয়া পৌছিতেছে, এখনও পর্য্যন্ত তাহা ভয়াবহ রূ[illegible] গ্রহণ না করিলেও, চিন্তাশীল বাঙ্গালীদের কাছে তাহ[illegible] নিতান্ত উদ্বেগের বিষয়-রূপেই প্রতীয়মান হইতেছে, কারণ, লীগচমূর উচ্ছৃঙ্খল কার্য্যকলাপ দৈনন্দিন ঘট[illegible] প্রবাহের সাম্প্রতিক খাতেই যদি চলিতে থাকে [illegible] চলিতে চলিতে শেষ পর্য্যন্ত তাহা যদি চরমে গিয়া [illegible] এবং তদনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় আসাম গবর্ণমেণ্টের প্র[illegible] রোধও যদি অনিবার্য্যভাবেই চরম হইয়া ওঠে, তবে [illegible] শেষ বিষময় ফল বাঙ্গলার নিরীহ জনসাধারণকে [illegible] ভোগ করিতে হইবে। এবং সেই বিষময় ফলে[illegible] অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি হয়তো ময়মনসিংহ প্রভৃতি বঙ্গ-আসামের সীমান্তবর্ত্তী জেলাগুলিতে নোয়াখালির তাণ্ডবলীলারূপে পুনঃ অনুষ্ঠিত হইবে। আমাদের [illegible] মন্তব্যের উত্তরে সম্ভবতঃ অনেকেই তীব্রভাবে প্রতি[illegible] করিয়া বলিবেন, আসামের ঘটনার শেষ পরিণ[illegible] আসামেই ঘটিবে, তাহার জের আবার বঙ্গদেশে আসিয়া জুটিবে কোন যুক্তিতে? এই আপত্তির উত্তর আমরা পরে দিতেছি। তৎপূর্ব্বে আসামের উক্ত ঘটনার পিছনে যে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে, আমরা তাহার এ[illegible] সংক্ষিপ্ত আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পাঠকদের সমক্ষে উপস্থি[illegible] করিতে চাই।

সকলেই জানেন, আসামের বর্ত্তমান সমস্যাটা বহি[illegible] গতদের সম্পর্কে। মুসলিম লীগ-পরিচালিত আন্দোলনে[illegible] কল্যাণে অধুনা এই সমস্যাটা সাম্প্রদায়িকতার রূপ পরি[illegible] করিলেও মূলতঃ ব্যাপারটা অর্থনৈতিক। বহুদিন পূ[illegible]

তুলনায় জনসংখ্যা ছিল প্রভৃতি জেলার সীমান্তবর্ত্তী ওয়ারীশ অবস্থায় পড়িয়া ছিল, মহীন বহু কৃষক আসিয়া দখল খানকার জঙ্গল প্রভৃতি সাফ করিয়া াকিভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। অবস্থা বহুদিন পর্য্যন্ত চলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আসামী কদের উপযুক্ত পরিমাণে জমি বিলির জন্য বহিরা-দের এই বে-আইনী জমি দখলকে রোধ করিবার য়াজন অনুভূত হয়—এবং সেটা হয় আসামস্থ হিন্দু ও লমান উভয় সম্প্রদায়েরই ইচ্ছাক্রমে। যতদূর জানা মুসলীম লীগের লাহোর প্রস্তাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ামের লীগভক্তদেরও ইহার অনুরূপ ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু লাহোর প্রস্তাব-গৃহীত হইবার পরেই অবস্থার ল পরিবর্ত্তন ঘটে। লাহোর-প্রস্তাব পূর্ব্ব-পাকিস্তানের হিসাবে আসামকেও দাবী করে। কিন্তু মুসলীম া গরিষ্ঠতার যুক্তি সেখানে চলে না, কেননা আসামের লমান জনসংখ্যা শতকরা প্রায় সত্তর জন। সুতরাং উপায়ে হোক্ বাড়াও আসামের মুসলমান জনসংখ্যা। -কর্ত্তৃক আসামে মুসলীম জনসংখ্যা বাড়াইবার এই চেষ্টা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ১৯৪৩ সালে। কংগ্রেস-ত্যক্ত মন্ত্রিত্ব দখল করিয়া সাদুল্লা মন্ত্রীসভা সেই সময় সরকারের 'গ্রো মোর ফুড' আন্দোলনের সুযোগ যথেচ্ছ সংখ্যায় বহিরাগতদিগকে আসামের জমি করিবার সুযোগ দেয়। ইহাতে আসামের ভূমি-ব্যবস্থায় এক নিদারুণ অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্য্যন্ত স্বপ্রদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে সাদুল্লা সাহেবকেও বিচলিত হইয়া আসামের রাজনৈতিক দলের সহিত বহিরাগতদের সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে হয়। এই ঘটনাটা সালের প্রথমার্দ্ধের।

ক চুক্তিই সাদুল্লা-বরদলৈ-চুক্তি নামে ভারতের তিক ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। চুক্তিটির লি মোটামুটি এইরূপ :

) আসামের গোচারণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সমস্ত আবাদযোগ্য জমির এক-তৃতীয়াংশ রিজার্ভ রাখিবার পরে যে পতিত জমি থাকিবে, তাহা অসমিয়া ও ট্রাইবেল নের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বহিরাগত জমিহীনকেও প্ল্যান করিয়া দেওয়া হইবে;

(২) সমগ্র জমিবিলির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য সরকারী গোচারণ রিজার্ভগুলির (grazing reserves) যে সব জমি বহিরাগতরা বেদখল করিয়াছে, সেগুলিতে উচ্ছেদকার্য্য প্রয়োগ করিতে হইবে—এবং উচ্ছিন্ন বহিরাগতদের মধ্যে যাহারা ১৯৩৭-এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত জমি দখল করিয়াছে, তাহাদের অন্যত্র জমি দিতে হইবে।

(৩) এইভাবে জমিবিলি ইত্যাদি হওয়ার পর তিন বছরের মধ্যে বর্ত্তমান 'লাইন-প্রথার' অবসান করা হইবে।

(৪) বাংলা হইতে বহিরাগতদের আসার পথ বন্ধ করা হইবে।

আসামের শাসনভার গ্রহণের পর হইতে বরদলৈ মন্ত্রিসভা যথাযথ এই চুক্তি অনুসারেই বহিরাগতদের উচ্ছেদের প্ল্যান কার্য্যে পরিণত করিতে সুরু করেন। ইতিমধ্যে রাজনীতি-ক্ষেত্রে কংগ্রেস-লীগের সম্পর্কে বিরোধ উপস্থিত হয়। মুসলীম লীগ নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিত্যাগ করিয়া 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-নীতি ঘোষণা করে; কলিকাতা, নোয়াখালি, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশে চলে দানবীয় হত্যাকাণ্ডের নারকীয় মহোৎসব এবং সর্ব্বশেষে মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূচনা আসাম ও বঙ্গ-আসামের সীমান্তে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

আসামে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের চেহারাটা অন্যান্য মুসলীমপ্রধান স্থানে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্বাস করিলে বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গলা ও আসামের লীগের ভক্তরা একেবারে পুরোপুরি সামরিক কায়দায় আসাম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকাশ, বাঙ্গলা ও আসামের সীমান্ত রেখায় ইতিমধ্যেই নাকি তিনটি পাকিস্থানী কেল্লা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং সেখানে হাজার হাজার সশস্ত্র মুসলীম ন্যাশনাল গার্ড জমায়েৎ হইয়া অস্ত্রচালনা শিক্ষা করিতেছে। প্রথমে—লীগ এই আন্দোলনের অজুহাতে অভিযোগ তুলিয়াছেন যে, বরদলৈ মন্ত্রিসভা সাদুল্লা-বরদলৈ চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আগত বহিরাগতদেরও উচ্ছেদ করিয়াছেন,—কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্ট সেই অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করিবার জন্য একটি নিরপেক্ষ অনুসন্ধান-কমিশন নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু লীগের কর্ম্মপরিষদ্ কর্ত্তৃক সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার চেষ্টা এই ভাবে বিফল হইলে পর বরদলৈ-মন্ত্রিসভা শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত সাদুল্লা-

বরদলৈর চুক্তিরও পুনরালোচনা করিতে রাজী হইয়াছিলেন, এবং আলোচনা কিছুদিন চলিয়াছিলও। কিন্তু শেষ অবধি লীগের কর্ম্মপরিষদ্ সেই আলোচনাও ভণ্ডুল করিয়া দিয়াছেন। আলোচনার অসাফল্যের হেতুনির্ণয়ে মুখে অবশ্য তাহারা বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস সরকারের কোন আন্তরিক পরিবর্ত্তন হয় নাই, আলোচনার সময়েও লীগ-আন্দোলনকারীদের উপর লাঠি ও গুলি চালনো হইয়াছে—কিন্তু আসলে লীগ কর্ত্তারা শান্তি ও আপোষের পথে আসিতে নারাজ। ইহার প্রমাণও অনুপস্থিত নয়। ২১শে বৈশাখের 'স্বাধীনতায়' (লীগের অন্যতম প্রধান সমর্থক কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র) আসাম কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পাদক বীরেশ মিত্র লিখিতেছেন—'ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সাদুল্লা-প্রমুখ লীগ-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সঙ্গে যখন আপোষ আলোচনা চলিতেছিল, ঠিক তখনই হঠাৎ সিলেট কাছাড়ে লীগের আইন-অমান্য-আন্দোলন বেপরোয়া ভাবে কড়া হইয়া উঠিল।' লীগ-আন্দোলনকারীদের উপর লাঠি ইত্যাদি চালনা অভিযোগের উত্তর এই উক্তিতেই সুব্যক্ত হইয়াছে।

অতঃপর ঘটনার পরিণতি যে সম্ভাবনা গ্রহণ করিতে চলিয়াছে, সেটাই হইল আমাদের উদ্বেগের বিষয়। নিবন্ধের প্রথমে আমরা এই আশঙ্কার উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, এই পরিণতির বিষময় ফল আসামের সীমান্তবর্ত্তী বাঙলার জেলাগুলিতে নোয়াখালির তাণ্ডবলীলার পুনরানুষ্ঠান হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে, সেই আশঙ্কারও কারণ এই সম্ভাবিত পরিণামের মধ্যে মিলিবে। লীগের কর্ম্মপরিষদের সহিত ক্রমাগত বারবার আপোষ-মীমাংসায় ব্যর্থ হইয়া কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্টও শেষ পর্য্যন্ত অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং লীগকে প্রায় সোজাসুজিই জানাইয়া দিয়াছেন যে, হুমকি দিয়া কোন কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, তরবারি নিয়া বোঝাপড়ার জন্য আগাইয়া আসিলে গভর্ণমেণ্টকেও অনন্যোপায় হইয়া তরবারি ধারণ করিতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের এই মনোভাব আসামের সমুদয় অ-মুসলমান সম্প্রদায় একবাক্যে সমর্থন করিয়াছেন এবং বাঙলা হইতে লীগের এই অভিযানকে রোধ করিতে অসমিয়া হিন্দু, ট্রাইবেল, চা-বাগানের শ্রমিক, নেপালী এবং মারোয়াড়ী, বিহারী ও বাঙালী হিন্দু এবং শিখ সকল সম্প্রদায় প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে কংগ্রেসের ডাকে খুব আগ্রহের সহিত সাড়া দিতেছে।" (স্বাধীনতা, ৯ই বৈশাখ)। পরিস্থিতির এই বারুদপূর্ণ অবস্থায় লীগের চমূ অভিযান অব্যাহত থাকিলে পরের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়—আসামে অনিবার্য্যভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া যাইবে এবং সেই দাঙ্গায় সরকারের প্র
হইয়া আসামের অ-মুসলমান
সকল মুসলমানের উপর খড়্গহ
ও তজ্জাতীয় অন্যান্য আনুষঙ্গিক
বিচার করিলে আসাম-অভিযানে
অপরিহার্য্য। পরাজয় ঘটিলে বিপক্ষের প্র
মনোভাব তীব্রতর হইবে, কিন্তু অসমিয়াদের উপর
প্রতিহিংসাও চরিতার্থ করা সম্ভব হইবে না। ফলে
পরাজয়ের জন্য যাহারা দায়ী,সেই অসমিয়া অমুসলমান
বাগে না পাইলেও কথামালার 'নেকড়ে বাঘ ও মেষশা
গল্পের যুক্তি অনুযায়ী অসমিয়া অমুসলমানদের সগে
বাঙালী অমুসলমানদের সহজেই বাগে পাওয়া যাই
এবং আসামের পরাজয় শোধ কড়ায় গণ্ডায় আদায়
যাইবে। অতঃপর ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি আসা
সীমান্তসংলগ্ন জেলাগুলিতে নোয়াখালির-ঘটনার পুন
বৃত্তিকে কে রোধ করিবে?

রোধ করিতে পারেন বাঙালার লীগ-কর্ত্তৃপক্ষ। কা
আসামের সম্ভাবিত অভিযানের প্রধান উদ্যোক্তা ইহারা
আসাম গভর্ণমেণ্ট অবশ্য এমনও অভিযোগ করিয়াছি
যে, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টও স্বয়ং এই আন্দোলনের সা
অংশীদার। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট এই অভিযোগ অস্বী
করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন,—আমরাও তাহা
বিশ্বাস করিতেছি। কিন্তু বাঙলার লীগ-কর্ত্তৃপক্ষ
অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারিবেন কিরূপে? ক
বাঙলা ও আসামের ষাট হাজার ন্যাশনাল গা
সম্মেলনে সালারে সুবা যে কথা উচ্চস্বরে ঘো
করিয়াছিলেন এবং যে-কথা গত ৪ঠা মার্চ্চের 'আ
পত্রিকায় বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপিত হইয়াছি
"আসামের সংগ্রামে বাংলার মোসলেম ন্যাশনাল গা
যোগদান করিবে"—সেই কথাই তো তাহাদের
অস্বীকৃতির প্রতিবাদ করিবে। এতদ্ব্যতীত ১
মার্চ্চ আসাম লীগের সম্পাদক যে কথা স্বীকার ক
বলিয়াছিলেন যে, 'বাংলা আমাদের পিছনে আ
দাঁড়াইয়াছে', সেই কথাও তো বাংলার লীগ কর্ত্তৃপ
অস্বীকৃতিকে সমর্থন করিবে না—এই জন্যই বলিতেছি
যে, আসামে লীগচমূর এই অশান্তিকর অভিযান
তজ্জনিত বাঙ্গলার সম্ভাবিত অশান্তির সম্ভাবনাকে
করিতে পারেন বাংলার লীগকর্ত্তৃপক্ষ। ইহাদের সাম্প্র
বিবৃতি হইতে মনে হয় যে, আধুনা তাঁহারা বাংলা
সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপনের যে প্রচেষ্টায় হাত দিয়া
তাহা সম্ভবতঃ আন্তরিক। কিন্তু আন্তরিকতার

ধু বিবৃতিতে হয় না, সেই প্রমাণ গ্রাহ্য করিতে কার্য্যের প্রয়োজন। আসাম সীমান্ত হইতে বাংলার মুকে সরাইয়া লইলেই বঙ্গীয় মুসলীম লীগের রিকতার সেই বাস্তব প্রমাণ মিলিবে।

সাবধান-বাণী

ত ২৮শে এপ্রিল হইতে দিন সাতেক ধরিয়া গণ-দের তৃতীয় অধিবেশনের বৈঠক চলিয়াছিল। রর অধিবেশনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটা বৈশিষ্ট্য —বরোদা, পাতিয়ালা প্রভৃতি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের নিধিদের এই অধিবেশনে যোগদান। নিঃসন্দেহে ্যাপারটাকে ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতির ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। যুগান্তকারী পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও এবারে গণপরিষদ খুব পূর্ণ কোন একটা সিদ্ধান্তে পৌছিতে সক্ষম হ'ন নাই। কর্ত্তৃক শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে ীয় পরিস্থিতিতে মুসলীম লীগের ভূমিকা যে সংশয় ধাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে, সেই দিকে বাস্তব দৃষ্টি র ফলেই যে গণ-পরিষদের এই অসাফল্য—এটা বুঝা যায়। আর স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, কংগ্রেস -পরিষদের অন্যান্য সদস্যরাও এই সন্দেহ ও দ্বিধা মুক্ত ছিলেন না।

ই সন্দেহ ভালো কি মন্দ অথবা যুক্তিসঙ্গত কি না, শ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু পরিসরের স্বল্পতার জন্য ততঃ এই প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা আমাদের সম্ভব নয়। ভারতের পরিস্থিতি এক্ষণে অত্যন্ত ্ব হইয়া পড়িয়াছে। অখণ্ড ভারতের যে মহিমান্বিত একদিন প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ াছিল, ঘটনাপ্রবাহ দেখিয়া মনে হয়, সেই চিত্র র পড়িতেছে। ভারতের এই বিভ্রান্তি দূর করা গভর্ণমেণ্টেরই দায়িত্ব, কারণ স্বাধীনতাকামী তর সংগ্রামমুখিতার সহিত তাঁহারাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আপোষ করিতে চাহিয়াছেন, এবং ঘোষণা ছেন যে, বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট শতকরা শতভাগ রিকতার সহিত ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ যাইবেন। (লণ্ডনস্থ ভারতীয় ছাত্রদের কাছে ভারত-সচিব লর্ড লিষ্টওয়েলের বিবৃতি)। ত আলোচনায় আমরা বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের এই ত আন্তরিকতা সম্বন্ধে কয়েকটি সাবধান-বাণী উচ্চারণ ত চাই মাত্র।

ীশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের প্রথম সাবধান ারতের দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে। কয়েকটি প্রধান রাজ্য ইতিমধ্যেই গণ-পরিষদে যোগদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দেশীয় রাজ্যের বিরাট আয়তনের তুলনায় এ সংখ্যা এখনও নগণ্য। বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের উচিত, যে-সব দেশীয় রাজ্য এখনও ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে ইচ্ছুক নয়, তাহাদের গণ-পরিষদে যোগদান করিতে চাপ দেওয়া। ইহাতেই তাহাদের বিজ্ঞাপিত ষোলআনা আন্তরিকতার প্রমাণ হইবে। কিন্তু ভারতীয়-দের মধ্যে যাঁহারা কূটনীতিতে বিশারদ তাঁহারা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন যে, বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের নাকি আপাততঃ সে সদিচ্ছা নাই, বরঞ্চ পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট গোপনে গোপনে নাকি এই চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে অবশিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়ন হইতে পৃথক থাকিয়া বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের তাঁবে বৃটেনের এম্পায়ার ডিফেন্স রুটের এক একটি ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সার্ব্ব-ভৌম হায়দ্রাবাদ এবং পশ্চিম ভারতীয় রাজ্যগুলি কর্ত্তৃক কনফেডারেল ইউনিট গঠনের পরিকল্পনা এই ষড়যন্ত্রেরই প্রমাণ। পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি গণ-পরিষদে অনাগত এইজাতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, অতঃপর ইহাদের বিরোধী পক্ষ (hostile) বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। পণ্ডিতজীর এই সাবধানী বাণীর পুনরুক্তি করিয়া আমরাও বলি যে, বর্ত্তমান ভারতীয় নেতৃত্বের প্রবল আপোষেচ্ছার দুর্ব্বলতায় বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট এই ষড়যন্ত্র হয় তো আপাততঃ কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবেনও, কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারতের আপোষের মোহমুক্ত সন্তানেরা বৃটীশ ও দেশীয় নৃপতিদের এই ষড়যন্ত্র আদৌ ক্ষমা করিবে না। জাতীয় স্বার্থের জন্য ভারতের সহিত অক্ষুণ্ণ সদ্ভাব রাখার যে প্রয়োজন বৃটেনের পক্ষে অপরিহার্য্য, সেই সদ্ভাবের মনোভাবও দূষিত হইয়া যাইবে।

বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের দ্বিতীয় সাবধান বাণী—ভারতের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্ত সম্বন্ধে। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান—এই চারটি প্রদেশ লইয়া ভারতের এই সীমান্ত গঠিত। ভারতীয় কূটনীতিজ্ঞরা সন্দেহ করেন যে, যেহেতু এই বিরাট ভূম্যংশ সোভিয়েট-রাশিয়ার সীমান্তবর্ত্তী এবং যেহেতু বৃটেনের আশঙ্কা যে ভবিষ্যতের ভারতের সম্পর্ক রাশিয়ার সহিতই অধিকতর বন্ধুত্বপূর্ণ হইবে, সেই হেতু ভারতের উপর সম্ভাবিত সোভিয়েট ভাবাদর্শের পথ বন্ধ রাখা (এটিও এম্প্যায়ার ডিফেন্স রুট অক্ষত রাখার জন্যই) এবং তজ্জন্য উক্ত ভূম্যংশকে বৃটীশ পররাষ্ট্রদপ্তরের প্রভাবাধীন রাখা প্রয়োজন। আর এই অংশটিকে মুসলীম-প্রার্থিত পাকিস্থানে পরিণত করিতে পারিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। উক্ত কূটনীতিজ্ঞদের ধারণা, অধুনা

সীমান্ত প্রদেশ হইতে কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্টকে অপসারিত করিবার যে ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে সেটাও নাকি বৃটীশ গভর্ণমেণ্টেরই পরোক্ষ প্ররোচনার ফল। বিজ্ঞাপিত আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হইলে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে এই ষড়্‌যন্ত্র হইতে সরিতে হইবে, নতুবা বর্ত্তমান অচলাবস্থার চাপে তাঁহাদের উক্ত ষড়্‌যন্ত্রপূর্ণ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলেও ভবিষ্যতের ভারতীয়গণ তাহাদের স্বদেশের বুকে-চাপ এই বহিঃপ্রভাব ক্ষমা করিবে না।

মস্কো-বৈঠকের পশ্চাদ্‌পটে

গত মাসের দিনকয়েক ধরিয়া মস্কোতে পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের পররাষ্ট্র-সচিবদের মধ্যে যে দেনা-পাওনার বৈঠক চলিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বজাত ফল প্রকাশিত হইয়াছে, অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় রাষ্ট্রসম্মেলনের ফলাফল দ্রষ্টব্য)।

বৈঠকের কার্য্যসূচীর মধ্যে প্রধানতঃ ছিল পরাজিত জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া সম্বন্ধে রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে সন্ধি-চুক্তির খসড়া প্রণয়ন, জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্দ্ধারণ এবং জার্ম্মানী-কর্ত্তৃক মিত্রপক্ষকে গত যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ দান। ঘোষিত হইয়াছিল যে, পূর্ব্বানুষ্ঠিত ইয়াল্‌টা ও পটস্‌ড্যাম প্রভৃতি অধিবেশনের গোপনীয় চুক্তির ভিত্তিতেই উক্ত কার্য্যবিধি সম্পন্ন হইবে এবং তৎপূর্ব্বে ইহাও প্রতিষ্ঠিত সত্য বলিয়া ঘোষিত ছিল যে, উক্ত দুই অধিবেশনের চুক্তিসমূহ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং রাশিয়ার সরকার-প্রতিনিধিগণের সর্ব্বসম্মতিক্রমেই সম্পাদিত হইয়াছিল—তবু পৃথিবীকে বিস্মিত ও হতাশ করিয়া মস্কোর বৈঠক বিফল হইয়াছে। এখন এই বিফলতার পর সমবেত রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের প্রতিনিধিগণ স্ব-স্ব দেশে ফিরিয়া যে-কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, সেই সম্বন্ধেও আমাদের অভিজ্ঞতা পুরাতন হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা স্বকৃত বিফলতার জন্য এখন পরস্পরের প্রতি দোষারোপে প্রযত্নশীল হইয়াছেন।

বর্ত্তমান আলোচনার প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসাবে উক্ত দোষারোপগুলির বক্তব্য ও উপজীব্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানে আরও একটি বিষয় বাহুল্য হইলেও উল্লেখ করিয়া রাখা ভাল যে, উক্ত রাষ্ট্রচতুষ্টয় দুই শিবিরে বিভক্ত; যথা প্রথম, আমেরিকার সহযোগে পশ্চিম ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এবং দ্বিতীয় রাশিয়া। ভৌগোলিক নিশানায় ইয়োরোপের বহির্ভূত রাষ্ট্র হইলেও আমেরিকাই প্রথম শিবিরের নেতা। এই শিবির মস্কো অধিবেশনের বিফলতার জন্য রাশিয়াকে মূলতঃ দায়ী

করিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, রাশিয়া মুখে য
ও গণতন্ত্রের মন্ত্র উচ্চারণ করুক না কেন, আ
স্বাজাতিক প্রাধান্য ও গণতন্ত্র-বিরোধী একনা
পৃষ্ঠপোষক। জার্ম্মানীতে সে যে অর্থনৈতিক
সহিত শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণের উপর
দিয়াছে, তাহা শুধু জার্ম্মানীকে রুমানিয়া, বুলগে
পোল্যাণ্ডের মত কমিউনিষ্টপন্থী একনায়কত্বের ব
করার উদ্দেশ্যেই। জার্ম্মানীতে সমস্ত গণতান্ত্রিক
তন্ত্রবাদী ও কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিকে পুঁজিবাদের ও ক
স্বার্থের বিরুদ্ধে মিলিত করিবার যে প্রস্তাব মঁ মো
উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও উক্ত অসদুদ্দে
বীজ উপ্ত আছে। অর্থাৎ এক কথায় সোভিয়েট ইউ
ভূতপূর্ব্ব নাৎসি জার্ম্মেনিরই মত সমস্ত ইয়োরোপে-
বিস্তারে যত্নপর। এতদুপরি রাশিয়া পর্য্যুদস্ত জা
জাতির দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া যে নিতান্ত শো
মতই তাহাদের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছে
ইতিমধ্যে জার্ম্মানীর বহু সম্পদ লুটিয়া লইয়াছে, ইঙ্গম
শিবির সেই অভিযোগও প্রচার করিয়াছে।

অন্যপক্ষে রাশিয়া ও অন্যান্য সোভিয়েট-সুহৃদবর্গ
অভিযোগ করেন যে,, গণতন্ত্রবিরোধী রাশিয়া নয়,—
নৈতিক গণতন্ত্র এবং অনিয়ন্ত্রিত ও প্রতিযোগি
বাণিজ্য-প্রচেষ্টার ছদ্ম-নীতির আড়ালে আমেরি
ইংল্যাণ্ডই পৃথিবীতে একচেটিয়া কায়েমী স্বার্থের ব
স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছে। ইহারই জন্য জা
শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রীয়করণকে শিথিল করিয়া এ
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব পেশ করা হইয়াছে।
আত্মবিস্তারের যে অভিযোগ রাশিয়ার বিরুদ্ধে
হইয়াছে, সেটা তো শুধু স্ব-অপরাধকে গোপন ক
জন্য। ইঙ্গমার্কিণ সমর-মৈত্রী, দক্ষিণ-আমেরিকার
মিলিত জঙ্গী-চুক্তি, গ্রীস ও তুরস্কের গণশক্তিকে চূর্ণ ক
জন্য উক্ত দেশ দুটির প্রতিক্রিয়াশীল গভর্ণমেণ্ট
আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান, কো
প্রতিক্রিয়াশীল দলকে গভর্ণমেণ্ট গঠনের সু
দান—প্রভৃতি এ কাজগুলি কি আত্মবিস্তার
এগুলি কি নাৎসী জার্ম্মানীর 'ওয়ার্ল্ড ডমি
নীতি' হইতে কিছুমাত্রও পৃথক্? দৃষ্টান্ত
বলা যায়, পশ্চিমী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রত্রয় যে জা
সোস্যাল ডেমক্রেটিক পার্টি ও কমিউনিষ্ট পার্টি
মিলনের বিরোধিতা করিয়াছেন, তাহাও তো
পুরাতন নাৎসীতন্ত্রেরই নবরূপকে উজ্জীবিত ক
জন্যই। তবে আর রাশিয়াকে গণতন্ত্র এবং বিশ্ব
বিরোধী বলিয়া দুষ্ট অভিযোগ করা কেন?

র ভূতপূর্ব্ব সহকারী প্রেসিডেন্ট ও রুজভেল্টের সহযোগী মিঃ ওয়ালেসও তো সম্প্রতি যুক্ত- ই প্রসারশীল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে অভিযুক্ত হয়েছেন।—ইত্যাদি।

ন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির পণ্ডিত না হইয়াও এ কথা র করা বিশেষ কঠিন হয় না যে, পৃথিবীর বৃহৎ শক্তি র এই যে দুই পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ- আনয়ন করিয়াছেন, এই অভিযোগগুলির পারস্পরিক নার মধ্যেই বিশ্বশান্তির বীজ লুকানো রহিয়াছে। মীমাংসা করিবে কে? ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ প্রাণদানকারী সাধারণ নরনারী ভাবে আশা করিয়াছিল যে, এইবারে হয়তো ীর বুক হইতে যুদ্ধ-দানব অপসারিত করা সম্ভব হইবে, র বুঝি সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশা ও দুর্ভিক্ষের ন হইয়া স্ব স্ব দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক নেতৃবৃন্দের ত প্রচেষ্টায় পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সাধারণ মানুষের মোহ ভাঙ্গিয়াছে, আজ সে তছে, তাহাদের স্ব-স্ব ভাগ্যনিয়ন্ত্র করা একমাত্র শক্র- কার্য্য ভিন্ন আর কোন বিষয়েই একমত হইতেছেন যুদ্ধোত্তর কালের সাধারণ নরনারীর বর্দ্ধিত দুঃখ- প্রতি তাঁহারা নির্ম্মম ভাবে উদাসীন। অথচ মুখে শান্তি, সাম্য ও সম্মিলিত বিশ্ব-গভর্ণমেন্টের ঘোর রবে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পরস্পরের সন্দেহ ও সংশয়ে তাহাদের সেই আদর্শ বিকৃত ধারণ করিয়াছে।

ন্তু কেন এই সন্দেহ? কেন আজ পৃথিবীর গণ- বৃহৎ শক্তি কয়টির আদর্শ বিকৃত হইয়াছে? কেন দ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় বৃহত্তর মহাযুদ্ধের মানুষের প্রগতিকে বিভ্রান্ত করিতেছে? এই উত্তর মস্কো-অধিবেশনের পাদ-প্রদীপের সম্মুখে ব না, মিলিবে ইহার পশ্চাৎপটে যে যুদ্ধোত্তর লী ও মনোভাবের সমাবেশ—তাহার মধ্যে। কিন্তু র-সন্ধান বিস্তৃততর পরিসর-সাপেক্ষ। তবু পৃথিবীর ঃ ভারতের বিভ্রান্ত সাধারণ নরনারীকে মস্কোর শনের পশ্চাৎপটের কয়েকটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় টি জানিয়া রাখিতে হইবে, নহিলে পৃথিবীর জটিল া আমাদের আরও বিভ্রান্ত করিবে।

প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে বিশ্বযুদ্ধ দুইটি বাধিয়াছিল মূলতঃ একটি প্রত্যক্ষ সেটি হইল ইয়োরোপে একটি একক একাধি-পতি শক্তি-উদ্ভবের আশঙ্কা। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই আশঙ্কার সবচেয়ে বড় অংশীদার ছিল বৃটেন—ইয়োরোপে এই কারণেই সে 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' নীতির সব চেয়ে বড় সমর্থক ছিল। এই কারণেই সে প্রথম মহাযুদ্ধে কাইজার উইলহেল্‌মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইল জার্ম্মেনির ধ্বংসে, ব্যালান্স অব পাওয়ার নীতির সমর্থক শক্তিবৃন্দ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইল, যাক্ ইয়োরোপে এখন আর দ্বিতীয় একাধিপতিশীল কোন শক্তির আবির্ভাব ঘটিবে না। কিন্তু ইতিহাস এক রহস্যময় রাসায়নিক—ইহার বহুবিধ অণু-যন্ত্রের অভ্যন্তরে যে কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব ঘটনার পরিণতি লুক্কায়িত থাকে, তাহা যুধ্যমান কোন পক্ষেরই জ্ঞাত থাকে না। যুদ্ধ শেষের কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঘটনাবলীর সেই অচিন্ত্যপূর্ব্ব রাসায়নিক পরিণতি কালের পটভূমিকায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—নিত্য প্রগতিশীল ও বর্দ্ধমান শক্তি সোভিয়েট-রাশিয়া। 'ব্যালান্স অব পাওয়ার' নীতির সমর্থকগণ প্রমাদ গণিলেন; বর্দ্ধিষ্ণু সোভিয়েট-শক্তির সহিত শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করিতে তাঁহারা নাৎসী জার্ম্মেনি ও ফ্যাসিষ্ট ইটালীর সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু আবার এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঐতিহাসিক ঘটনার পরিণতি তাহাদের সেই ভারসাম্যকে বানচাল করিয়া দিল। তাহাদেরই সৃষ্ট জার্ম্মেনি বিশ্ব-প্রভুত্ব অর্জ্জনের নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কাঁধিল দ্বিতীয় মহাসমর। এ যুদ্ধের আরও একটি অবশ্য লক্ষ্যণীয় বিষয় প্রথম হইতেই প্রকট রহিয়াছে। সেটা হইল ইয়োরোপের নূতন রাজনৈতিক দর্শন—জিওপলি-টিক্‌স্ (geo-politics)—এবং তাহার অনিবার্য্য অনুচর বৃহৎ শক্তিবর্গের অন্যদেশ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা। এই আশঙ্কা আজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরও বেশী প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। এবং সাম্প্রতিক পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা ব্যালান্স অব পাওয়ার নীতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

মস্কোর বর্ত্তমান পররাষ্ট্রসচিব-সম্মেলন যে কাঁপিয়া গেল, তাহার কারণ প্রধানতঃ এই পারস্পরিক আশঙ্কা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট-রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিচয় দুইটি পরম শক্তিমান্ রাষ্ট্ররূপে প্রকাশিত। তন্মধ্যে রাশিয়া ইয়োরোপ ও এশিয়ার মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে ইহার শ্রেষ্ঠতা অবিসম্বাদী। রাশিয়ার অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টনের কাঠামোও অত্যন্ত সুসংবদ্ধ—পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের অনুসরণে বাহিরের বাজার ও কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ইহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই, প্রয়োজনও নাই। তথাপি সোভিয়েটের ভূতপূর্ব্ব অনুরাগীরা আজ পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য-

করিতেছেন—আত্মরক্ষিতারে; ইহা জারশাসিত রাশিয়ারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ইহার মূলে সেই অন্য রাষ্ট্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী শক্তিমান রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকার বিরাট উৎপাদন-ক্ষমতা পৃথিবীর বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু এই বিপুল উৎপাদন-ক্ষমতাই তাহার রাষ্ট্রনীতিকে জটিল করিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে আমেরিকার উদ্বৃত্ত সম্পদ্ আজ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন যুদ্ধের পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু তাহার পরিমাণ উপেক্ষণীয় ছিল। আজ উদ্বৃত্ত অংশের পরিমাণ তাহার শিরঃপীড়ার কারণ হইয়াছে। আজ এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন মার্কিন রাজনীতিবিদ্‌দের সামনে মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—কোথায় আজ যুদ্ধকালীন সুবিপুল উদ্বৃত্ত উৎপাদন বণ্টন করা হইবে? কোথায়ই বা যুদ্ধ হইতে আগত অগণিত জনসংখ্যাকে কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে?

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হইল যে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর প্রগতিশীল অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির আত্মরক্ষার জন্য বহু যন্ত্রপাতি ও উৎপন্ন মালের প্রয়োজন হইবে, আমেরিকা প্রথম কয়েক বৎসর হয়তো এইসবগুলিতে তাহার উদ্বৃত্ত উৎপাদনকে সহজেই বণ্টন করিতে পারিবে। কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রণকামী দেশগুলি তো চিরকালই আমেরিকার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে না, তাহারাও তো স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে চাহিবে। তারপর পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির অধিকাংশই প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে বৃটেনের স্বার্থাধীন। অর্থশাস্ত্রীরা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, এই যুদ্ধের পর নানা অনিবার্য্য কারণে বৃটেনের বাৎসরিক বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ তিনশতকোটি পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩৯০০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। স্বভাবতঃই এই ঘাটতি সে পূরণ করিবার চেষ্টা করিবে—তাহার পূর্ব্বায়ত্ত উপনিবেশগুলির অর্থনীতির উপর চাপ দিয়া। উদ্বৃত্ত উৎপাদনের বণ্টনের নীতিতে বৃটেনের এই ভূমিকা আমেরিকার খুব আকাঙ্ক্ষিত না হইলেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়াইবার জন্য আমেরিকা বৃটেনের সহিত আধাআধি বখরা করিতে চাহিবে, ক্ষীণশক্তি বৃটেনও এই আপোষে গররাজি হইবে না, কেননা সর্ব্বনাশের আবির্ভাবে অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধেক রাখাই পণ্ডিতজনোচিত। এই মনোভাবের ফলেই আজ বিশ্ব-রাজনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রীর উদ্ভব ঘটিয়াছে। এবং এই দুরভিসন্ধিমূলক মৈত্রীই আজ পৃথিবীর উপরে এক নূতন সাম্রাজ্যবাদ গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মোটামুটি এই হইল মস্কো-বৈঠকের প… ঘটনাবলী ও মনোভাবের বিবরণ। একদিকে অ… ফলে সোভিয়েট-রাশিয়ার ইঙ্গমার্কিন শক্তি কর্ত্তৃক… হইবার আশঙ্কা-জনিত সম্প্রসারণ, অন্যদিকে ইঙ্গ… শক্তির অর্থ-নৈতিক আত্মরক্ষার জন্য সম্প্রসারণী, আ… জন্য এই দ্বিবিধ সম্প্রসারণের সংঘর্ষেই বৃহত্তর র… ব্যাপৃত—ইহার মধ্যে তাঁহারা পৃথিবীকে রক্ষা করিব… গ্রহণ করিবেন কিরূপে? এখন অনুন্নত এশিয়া ও আফ্রি… কার জাতি ও রাষ্ট্রগুলি যদি এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেত… হইয়া সমবেত চেষ্টায় আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়, সাধার… মানব ও পৃথিবীর শান্তি হয়তো-তবেই রক্ষা পাইবে, নচে… তৃতীয় মহাযুদ্ধ যদি সংঘটিতই হয়, তবে তার জন্য বৃ… শক্তিনিচয়কে দায়ী করা চলিবে না। কারণ, কাজের ক্ষ… ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গ মুখে যতই শান্তি ও গণতন্ত্রের বু… উচ্চারণ করুন না কেন, কাজ ফুরাইলে তাঁহাদের কা… স্বার্থপরতার আদর্শই জীবনের সব চেয়ে বড় ব… আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়।

হেনরি ওয়ালেস্

আমেরিকার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল মহল বলেন যে… দেশের রাজনীতিতে আজ যে নূতন সাম্রাজ্যবাদ… ধরিতে সুরু করিয়াছে, সেই নীতির কর্ণধার… ওয়ালষ্ট্রীটের পুঁজিপতিগণ। ইহাদেরই পুঁজিবাদ… উৎপাদনের উদ্বৃত্ত পৃথিবীর বাজার গ্রাস করি… পথ… হইয়াছে। ইহারাই বিদেশের প্রতিক্রিয়াশীল কা… বিবিধ অনুগ্রহে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। কারণ,… অন্যতর পরিণতিতে অনুন্নত দেশগুলিতে… জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গণশক্তির প্র… সাধারণতঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের আদর্শে প্রভাবিত,—… বা মিত্রভাবাপন্ন বাহিরের কোন শক্তিকেই সে… স্বদেশের বাজারে আধিপত্য করিতে দিতে চাহে… না। ইহার উপরে আছে পুঞ্জীভূত কা… আশা… বিরুদ্ধে গণশক্তির স্বভাবজাত সমাজতান্ত্রি… যাহা… বিদেশের বাজারে উদ্বৃত্ত বণ্টনের ব্যাপারে এই… কোনটিই বিশেষ বাঞ্ছিত বস্তু নয়। সেই জন্য অন্য… বাজারকে স্থায়ী ভাবে ধরিয়া রাখিতে হইলে সে… দেশের কায়েমী স্বার্থভোজী প্রতিক্রিয়াশীল দলকে… তোষণ করিতে হয়। এই তোষণের অভিব্যক্তি… প্রত্যক্ষ করিয়াছি গ্রীসে ও তুরস্কে। প্রত্যক্ষ ক… দক্ষিণ কোরিয়ায়, জাপানে।

বস্তুতঃ আমেরিকার নূতন সাম্রাজ্যবাদ আরও ব… ইহা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল শক্তির… পৃথিবীর সমুদয় প্রতিক্রিয়াকে একত্রিত করিয়া তুলি…

র বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে ব্যষ্টিনিচয়ের স্বার্থকে। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাহার তিক জেহাদ, এটাও উক্ত কর্ম্মপদ্ধতিরই এক প্রকাশ। ফলে তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুর্যোগ ভাগ্যাকাশে ক্রমে ঘনাইয়া উঠিতেছে।

ক্ষীণ আশার বিষয় এই যে, আমেরিকার রাজচেতনার এইটিই সমগ্র চিত্র নয়। এই চিত্রের দিকও আছে। অবশ্য এ-কথা অনস্বীকার্য্য যে, পুঁজিবাদী স্বার্থের উৎকট চড়া রঙের তুলনায় নিষ্প্রভ, তবু এই চিত্র পৃথিবীর প্রগতিকামী দের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। আমেরিকার এই অর্থনৈতিক প্রগতিবাদে আমেরিকার বর্ত্তমান দী রূপ স্বীকৃত হইয়াছে, শুধু স্বীকৃতই হয় নাই, আবেগে তাহা নিন্দিতও হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের পন্থী রাজনৈতিক দর্শনের বিরোধী এই নূতন কর্ণধার হইলেন ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্য-সচিব মিঃ ওয়ালেস্।

ওয়ালেস্ সম্প্রতি বৃটিশ সমাজতন্ত্রবাদী পত্রিকা টস্‌ম্যান এণ্ড নেশনের" সম্পাদকের আমন্ত্রণে ফরে আসিয়াছিলেন। সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা নামখ্যাত বি-বি-সি হইতে) ও বিবৃতির মারফৎ থিবীর সকল প্রগতিবাদীকে আমেরিকার নূতন বাদী ভূমিকাসম্বন্ধে সচেতন করিয়া বলেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কেবল লাল জুজুর টি বাঁধিলেই চলিবে না। কমিউনিজমের চেয়ে ক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পৃথিবীর অগণন ক্ষুধিত দের সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে। বৃটেনের ঔপন্যাসিক মিঃ জে, বি, প্রিষ্টলে ওয়ালেসের খ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

Wallace) demands that America should h the agency of the United Nations, orld a New Deal, just as Roosevelt e more Radical Democrats offered the w Deal after the crisis of 1929-30, ican money should be spent. camp around the Soviet l and industrial equipment civil engineering projects, to raise the living standard o give men hope every-

দের বিরোধী নন, সমাজতন্ত্র- । এমন কি, বক্তৃতা ও বিবৃতি- বহুবার 'capitalist অথবা ই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তবু যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান দূষিত রাজনীতির তুলনায় তাঁহার মতবাদ সাধারণ মানুষের মনে যে অনেকখানি আশার সঞ্চার করিবে, একথা স্বীকার করিতে আমরা সাধারণ ভারতবাসী দ্বিধাবোধ করির না।

চীনের গৃহ-যুদ্ধের এক অধ্যায়

চীনের গৃহযুদ্ধ প্রায় একযুগ বয়সী; কিন্তু ১৯৩০ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা রোমহর্ষক বা চাঞ্চল্যকর পরিণতির সন্ধান মিলে নাই। আজ কুওমিন্‌টাঙএর জয়, কাল কমিউনিষ্টদের পুনরধিকার অথবা ইহার বিপরীত, ইহাই ছিল চীনের গৃহযুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনা। শুধু একটা ঘটনা প্রধান ছিল যে, কমিউনিষ্ট-বাহিনী ধীরে ধীরে চৈনিক জনসাধারণের সমর্থনে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহাও ছিল অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। সংবাদপত্রের হেড লাইনে চমক্ লাগাইবার মত কোন সংবাদ বা তথ্য সে গতিতে উপস্থিত ছিল না। গত ১৯শে মার্চ্চের ঘটনায় কিন্তু সেই বিষয়ে এক আকস্মিক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে—উক্ত দিবসে কমিউনিষ্ট বাহিনীর রাজধানী ও প্রধান ঘাঁটি ইয়েনানের পতন হইয়াছে।

ইয়েনানের পতনকে কুয়োমিন্‌টাঙ-সংবাদ পত্রগুলি খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপেই বর্ণিত করিয়াছে, এবং ঘোষণা করিয়াছে যে, চীনের গৃহ-যুদ্ধে এবার এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল। এখন হইতে নান্‌কিঙ্ গভর্ণমেণ্টের উচ্চতর সমর-সজ্জার ও শক্তির কাছে কমিউনিষ্টদের নিত্য পরাজয় বরণ করিয়া লইতে হইবে—অর্থাৎ চার্চ্চিলের ভাষায় ইহা হইল—'beginning of the end।' বস্তুতঃ আমেরিকার নিকটে ৮ কোটি ডলারের সমর-উপকরণ লাভের পর কুওমিন্‌টাঙ-এর এই সাফল্য আপাত-দৃষ্টিতে প্রকৃতই বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সংবাদপত্রীয় স্টাট বা চমক কাটিবার পরই আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছি যে, বাস্তব অবস্থা পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসের বিপরীত। এই ঘটনা সম্বন্ধে কুওমিন্‌টাঙ-সরকারের অন্যতম প্রধান সমর্থক লণ্ডন টাইম্‌স্‌-এর সংবাদদাতা আমাদের জানাইলেন:

'ইয়েনানের পতনের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রয়োজন নাই। নানকিন-এর সরকারী মহল যদিও দাবী করিতেছেন যে, অতঃপর চীনের গৃহযুদ্ধের সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিবে, তত্রাচ স্থানীয় অধিবাসীদের মনে এই ব্যাপারটা খুব বেশী রেখাপাত করিতে পারে নাই। অধিকাংশ লোকেরই বিশ্বাস যে, সামরিক মূল্য হিসাবে ইয়েনানের পতন অতি তুচ্ছ ঘটনা। কারণ, কমিউনিষ্ট ষ্ট্রাটেজিতে স্থায়ী ঘাঁটি রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন

হয় না, সেই হিসাবে এই ঘটনা কেবলমাত্র কুওমিনটাঙ-এর প্রেষ্টিজ-বিজয়রূপেই মূল্যবান্ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

'বহুদিন হইতেই কমিউনিষ্টরা এই স্থান ছাড়িয়া যাইবার আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই কারণে এইখানকার সংঘর্ষে খুব বেশী প্রতিরোধ হয় নাই। ইতিমধ্যেই কমিউনিষ্টরা এক নূতন কেন্দ্র হইতে তাঁহাদের বেতার-প্রচার আরম্ভ করিয়াছে। এবং তাহাদের নূতন প্রতিরোধ সুরু হইয়াছে শানটুঙ প্রদেশে। কিন্তু এই রণক্ষেত্রে সরকারী বাহিনী বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে, সিঙটাও এবং সিয়ানফু রেলপথ পুনরায় কমিউনিষ্ট বাহিনী দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে।'

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ইয়েনানের পতনে কমিউনিষ্টদের তেমন গুরুতর ক্ষতি সাধিত হয় নাই, বরঞ্চ প্রেষ্টিজ রক্ষার দায়ে নাহক অনেকগুলি গোলাগুলি ছুঁড়িয়া কুওমিনটাঙ সরকারই তাদের মূল্যবান্ সমর-উপকরণের অনেকখানি অপব্যয় করিয়াছেন। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়, চীন গৃহযুদ্ধের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বদেশে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের নামে জেনারেলিসিমো চিয়াঙ কাইশেক মার্কিন ডলার সাম্রাজ্যবাদকেই প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে বলশালী করিয়া তুলিতেছেন, আর শক্তিশালী করিতেছেন চীনের মুক্তিকামী জনসাধারণকে।

শোক-সংবাদ

ডাঃ পি, কে, সেনগুপ্ত

মানুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাশবিক বর্ব্বরতার ইতিহাসে কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ পি, কে, সেনগুপ্তের শোচনীয় মৃত্যু একটি বিশেষ মর্ম্মান্তিক ঘটনা। ডাঃ তাঁহার পার্ক-সার্কাসস্থ বাস-ভবনে জনৈক চিকিৎসারত অবস্থায় আততায়ীর পিস্তলের নিহত হইয়াছেন।

একথা সত্য যে গত ১৫ই আগষ্টের পর ভারতের নানা স্থানে ব্যাপকভাবে অনেক শো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাঠে আমরা জানিয়াছি যে, মানুষ পিটাইয়া ছেঁচিয়া এমন কি জীবন্ত পোড়াইয়াও করিয়াছে। সুতরাং সে-তুলনায় পিস্তলের গুলিতে হওয়াকে তো নিতান্ত সভ্য-মৃত্যুই বলিতে তাহাকে ঐতিহাসিক বর্ব্বরতা বলিয়া বর্ণন করা যা যুক্তিতে? কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ডাঃ সে হত্যাকাণ্ডটাকেই আমরা পাশবিক বর্ব্বরতা উল্লিখিত করিয়াছি; মৃত্যুর অভিব্যক্তিটাকে চিকিৎসকের জীবিকা সভ্যজগতে সর্ব্বাপেক্ষা তদুপরি ডাঃ সেনগুপ্ত এই জীবিকাকে গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র নিজেকে মানবসেবায় নিয়োগ পারিবেন বলিয়া, সরকারী চাকুরির মোহ, ব্যক্তিগ সব কিছুকে তুচ্ছ করিয়া তিনি কেবল দরিদ্রের সাতেই ব্যাপৃত ছিলেন। শুনিয়াছি, তাঁহার পার্কস বাসভবনটি নাকি একটি ছোটখাটো দাতব্য হাঁসপ পরিণত হইয়াছিল—সেখানে তিনি দরিদ্র হিন্দু-মুসল শুধু চিকিৎসাই করিতেন না, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। এহেন মানবপ্রেমিকের হত্যা ঐতিহাসিক বর্ব্বরতা ভিন্ন আর কি বলা চলে।

বর্ষ শেষ

বর্ত্তমান জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সঙ্গে বঙ্গশ্রীর চতুর্দ্দশ বর্ষ সমাপ্ত হইল। আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে বঙ্গশ্রী পঞ্চ পদার্পণ করিবে। বিগত বৎসরের 'দুঃখের আঁধার রাত্রি'গুলি যে ভাবে বারংবার আমাদের দুয়ারে হানা দিয়া করি বঙ্গ-ভারতীর ভাগ্যবিধাতার পরম করুণায় ও আশীর্ব্বাদে আগামী বৎসরের প্রহরগুলির মধ্য উত্তীর্ণ হইয়া আলোক-স্নিগ্ধ পথে চলিতে পারিব। এই সুদীর্ঘকাল যাঁহাদের ঐকান্তিক সহানুভূ দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছে, ভরসা করি, আগামী নতুন পঞ্চদশ সব শুভানুধ্যায়ী পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সর্ব্বসাধারণ অনুরূপ সহানুভূতি ও সা প্রকাশকার্য্য সুগম করিয়া তুলিবেন। নব বর্ষের কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ-প্রত্যাশায় পুরাতন বৎসরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

CAL CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY